উদ্বোধন।

৭৫তম বর্ষ ১৩৭৯

উদ্বোধনের নিয়মাবলী

মাঘ মাস হইতে বৎসর আরম্ভ। বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতে অন্ততঃ এক বৎসরের জন্য (মাঘ হইতে পৌষ মাস পর্যন্ত) গ্রাহক হইলে ভাল হয়। শ্রাবণ হইতে পৌষ মাস পর্যন্ত ষাণ্মাসিক গ্রাহকও হওয়া যায়; কিন্তু শ্রাবণ মাস হইতে বার্ষিক গ্রাহক হওয়া যায় না, **বার্ষিক মূল্য সডাক ৮৲ টাকা, ষাণ্মাসিক ৪·৫০ টাকা।** প্রতি সংখ্যা ৭৫ পয়সা। নমুনার জন্য ৭৫ পয়সার ডাকটিকিট পাঠাইতে হয়। মাসের ২৫ তারিখের মধ্যে পত্রিকা না পাইলে সংবাদ দিবেন, আর একখানি পত্রিকা পাঠানো হইবে।

রচনা :—ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, ভ্রমণ, ইতিহাস, সমাজ-উন্নয়ন, শিল্প, শিক্ষা, সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়। আক্রমণাত্মক লেখা প্রকাশ করা হয় না। প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায়, এবং বামদিকে অন্ততঃ একইঞ্চি ছাড়িয়া স্পষ্টাক্ষরে লিখিবেন। **পত্রোত্তর বা প্রবন্ধ ফেরত পাইতে হইলে উপযুক্ত ডাকটিকিট পাঠানো আবশ্যক।** কবিতা ফেরত দেওয়া হয় না। প্রবন্ধাদি ও তৎসংক্রান্ত পত্রাদি সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন।

সমালোচনার জন্য দুইখানি পুস্তক পাঠানো প্রয়োজন।

বিজ্ঞাপনের হার পত্রযোগে জ্ঞাতব্য।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন, **পত্রাদি লিখিবার সময়** তাঁহারা যেন অনুগ্রহপূর্বক তাঁহাদের **গ্রাহক-সংখ্যা উল্লেখ করেন।** ঠিকানা পরিবর্তন করিতে হইলে পূর্ব মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে আমাদের নিকট পত্র পৌঁছানো দরকার। পরিবর্তিত ঠিকানা জানাইবার সময় পূর্ব ঠিকানাও অবশ্যই উল্লেখ করিবেন। উদ্বোধনের চাঁদা মনি-অর্ডারযোগে পাঠাইলে **কুপনে পুরা নাম-ঠিকানা ও গ্রাহকনম্বর পরিষ্কার করিয়া লেখা আবশ্যক।** অফিসে টাকা জমা দিবার সময় : সকাল ৭½টা হইতে ১১টা; বিকাল ২½টা হইতে ৫টা। রবিবার কেবল বিকাল ৩টা হইতে ৫টা।

কার্যাধ্যক্ষ—উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা ৩

উদ্বোধন, মাঘ, ১৩৭১

বিষয়-সূচী

বিষয়-সূচী

ভাল চা বলতে
টসের
চা
AIR TIGHT
A TOSH & SONS CALCUTTA
এ, টস্ এণ্ড সন্স
ফোন
২২-৪৭৮৫
কলিকাতা—১

দিব্য বাণী

চতুর্যুগান্তে বেদানাং জায়তে কিল বিপ্লবঃ।
প্রবর্তয়ন্তি তানেত্য ভুবি সপ্তর্ষয়ো দিবঃ॥ —বিষ্ণুপুরাণ, ৩।২।১৪

চারিটি যুগের অবসানকালে বেদ-বিপ্লব আসে—
লোপ পেতে বসে ধর্মাচরণ, সঠিক ধর্ম জ্ঞান,
সপ্তর্ষিরা আসিয়া তখন ধরায় মোদের পাশে—
মানুষ হইয়া আমাদেরই মাঝে করিয়া অবতরণ
করেন আবার সনাতন সেই জ্ঞানের প্রবর্তন

অবতরণ

স্বামী সারদানন্দ

ঐ স্তিমিতচিৎ-সিন্ধু ভেদি উঠিছে কি জ্যোতি ঘন।
মায়া- খণ্ডিত অখণ্ড বারি, বুঝে লীলা কেবা হেন॥
কোটী সূর্য গলাইয়ে ছাঁচে ঢালা কান্তি যেন॥
দেখ উজল বালকবেশে, অখণ্ড ঘর প্রবেশে,
প্রেমঘন বাহুপাশে কাহারে করে ধারণ॥
বলে, চাহ বীর আঁখি মেলি, রাখ ধ্যান চল চলি,
ধরণী ডুবাল বুঝি অবিদ্যা কাম কাঞ্চন॥
সুধীর ধীর পরশে যোগী চায় সহরষে,
কণ্টকিত তনু মন, নীরবে ভাসে নয়ন॥
তারা জ্বলি ছায়াপথে পশে ধরা আচম্বিতে,
পুণ্যভূমে উদে আজি পুনঃ নরনারায়ণ॥ —উদ্বোধন, ১ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা
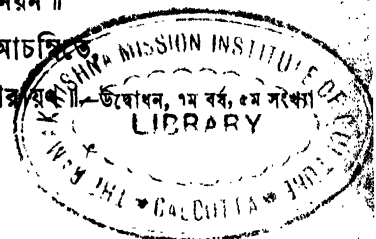
কথাপ্রসঙ্গে

উদ্বোধনের নববর্ষ—৭৫তম বর্ষ

শ্রীভগবানের কৃপায় 'উদ্বোধন' এবার, ১৩৭৯ সালের ১লা মাঘ নববর্ষে—৭৫তম বর্ষে পদার্পণ করিল। ভারতাত্মার প্রাণবাণীর যুগোপযোগী রূপ—নবযুগের 'উদ্বোধনী' প্রাণ-ধারা—রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবগঙ্গা হৃদয়ে ধারণ করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ-প্রবর্তিত এই পত্রিকাখানি প্রথম আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল ১৩০৫ সালের ১লা মাঘ, ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জানুআরি। সেই শুভক্ষণ হইতে শুরু করিয়া ৭৩ বৎসরের পথযাত্রায় সে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অটুট রাখিয়া চলিয়াছে;—বাংলা পড়িতে পারেন এমন অসংখ্য ব্যক্তির হৃদয়কে এই গঙ্গাবারি-সিঞ্চনে পবিত্র করিবার, স্বামীজীর একান্ত কাম্য 'মানুষ' হইবার জন্য উদ্বুদ্ধ করিবার, তামসিকতার নিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠিয়া লক্ষ্য লাভ না করা পর্যন্ত না থামিয়া চলিবার জন্য প্রেরণাদানের ব্রত হইতে কখনো সে বিরত হয় নাই।

এই উদ্বোধন পত্রিকা এবং ইহারই প্রকাশ ও পরিচালনার জন্য স্থাপিত 'উদ্বোধন কার্যালয়' হইতে প্রকাশিত রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্য[1] জনসাধারণের, বিশেষ করিয়া জাতীয় জাগরণের ঋত্বিকদের জীবনে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, ইতিহাসই তাহার সাক্ষ্য বহন করিতেছে। মানবজাতির, বিশেষ করিয়া ভারতবাসীর সেবায় তাহার এই অধিকারের জন্য এবং ৭৪ বৎসরের এই সুদীর্ঘ যাত্রাপথে বিভিন্ন সময়ে দেশে আগত বহুবিধ বিপরীত চিন্তার দুর্যোগ সত্ত্বেও সর্বাবস্থায় নিজস্ব ভাব আঁকড়াইয়া থাকিয়া চলার জন্য উদ্বোধন পত্রিকা তৃপ্তি ও গৌরবের সঙ্গেই ৭৫তম বর্ষে পদার্পণ করিতেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণের আশীর্বাদ ভিক্ষা করিয়া, স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ, স্বামী সারদানন্দপ্রমুখ পত্রিকার প্রবর্তক ও সম্পাদক-মণ্ডলীর চরণে প্রণাম করিয়া, পূর্বগ লেখক-গণকে সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাইয়া এবং বর্তমান লেখক, গ্রাহক, পাঠক, শুভানুধ্যায়ী প্রভৃতি সকলেরই সক্রিয় সহানুভূতি প্রার্থনা করিয়া আমরা ৭৫তম বর্ষের যাত্রাপথে নামিতেছি। আমাদের ব্যক্তিগত বহু দোষ-ত্রুটি মার্জনা করিয়া এই পত্রিকার উন্নতিকল্পে তাঁহারা সকলেই যথাপূর্ব সহায়তা করিয়া চলিবেন, এ বিশ্বাস আমরা রাখি।

শ্রীরামকৃষ্ণের আশীর্বাদ আমাদের যাত্রা-পথকে শুভ করুক, এই প্রার্থনা।

১ তৎকালে এ অঞ্চলে উদ্বোধন কার্যালয়ই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্য প্রকাশের একমাত্র কেন্দ্র ছিল, ইংরেজী ও বাংলা উভয় ভাষারই। স্বামীজীর জীবৎকালেই তাঁহার ১ খানি মূল বাংলা, ৪ খানি অনুবাদ ও ৭ খানি ইংরেজী গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল এবং উদ্বোধন পত্রিকায় প্রথমবর্ষ হইতেই স্বামীজীর রাজযোগ, বর্তমান ভারত, পরিব্রাজক (বিলাতযাত্রীর পত্র) প্রভৃতি গ্রন্থ এবং কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতে শুরু করে।

উদ্বোধন পত্রিকা ও উদ্বোধন কার্যালয়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস*

গোড়ার কথা

ধর্মই ভারতীয় জাতির প্রাণ—যথার্থ ধর্ম-জীবনের উন্নতি ও অবনতির সঙ্গে ভারতের জাতীয় জীবনেরও উন্নতি-অবনতি ঘটিয়া আসিতেছে। বিগত সহস্রবর্ষব্যাপী অবনতি যখন ভারতীয় জাতিকে ধ্বংসের প্রায় কিনারায় টানিয়া আনিয়াছিল, তখন "প্রকৃত ধর্ম কি" তাহা দেখাইতে, "কালবশে নষ্ট এই সনাতন ধর্মের সার্বলৌকিক, সার্বকালিক ও সার্বদেশিক স্বরূপ স্বীয় জীবনে নিহিত করিয়া, লোকসমক্ষে সনাতন ধর্মের জীবন্ত উদাহরণস্বরূপ আপনাকে প্রদর্শন করিতে" শ্রীরামকৃষ্ণদেব অবতীর্ণ হন। স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ তাঁহার সন্ন্যাসী সন্তানগণ তাঁহার ভাবধারা যথাযথরূপে গ্রহণ করিয়া জগতের দ্বারে দ্বারে তাহা বিতরণ করেন। বিশেষ করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ-ভাবরাশিকে আধুনিক চিন্তার ছাঁচে ঢালিয়া আধুনিক মানুষের গ্রহণোপযোগী করিয়া গিয়াছেন এবং জীবনের বিভিন্ন ব্যবহারিক ক্ষেত্রে উহা প্রয়োগের পন্থা দেখাইয়া গিয়াছেন।

কোন অবতারপুরুষ বা আচার্য যখন দেহধারণ করিয়া থাকেন তখন তাঁহাদের মুখে শোনা কথা, সংস্পর্শ, দৃষ্টি এমন কি ইচ্ছা-মাত্রই অপরের জীবনে ভাবজগতে রূপান্তর আনিবার পক্ষে যথেষ্ট। তাঁহাদের তিরোধানের পর তাঁহাদের বাণীই সে কাজ করে—তাঁহাদের, সত্যদ্রষ্টাদের কথায় প্রচণ্ড শক্তি নিহিত থাকে। তবে, সমকালীন অধিকাংশ মানুষই তাহা ধারণা করিতে পারে না—সর্বসাধারণের জীবনে তাহার অনুপ্রবেশ সময়সাপেক্ষ। সেজন্য তাঁহাদের ভাবগুলির যথাযথভাবে রক্ষণ ও প্রচার একান্ত প্রয়োজন। স্বামী বিবেকানন্দ তাহা বুঝিয়া তাঁহার অতি অল্পকালের, মাত্র নয় বৎসরের সক্রিয় জীবনেই নিজেই তাহার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতাগুলি গুড্‌উইন-কর্তৃক লিখিত ও পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশিত হইবার সময়ই তিনি বলিয়াছিলেন, "সাংকেতিক প্রণালীতে আমার বক্তৃতাগুলি লিখে নেবার ফলে অনেকটা সাহিত্য গড়ে উঠছে দেখে আমি খুশী", "এমন কতকগুলি পুস্তক রাখিয়া যাইতে চাই, যেগুলি আমি চলিয়া গেলে আমার কাজের ভিত্তিস্বরূপ হইবে।" কেবল কতকগুলি পুস্তকই নয়, তাহার অন্তর্নিহিত ভাবগুলি লইয়া নিয়মিত আলোচনার জন্য পত্রিকাপ্রকাশের প্রয়োজনীয়তাও তিনি অনুভব করিয়াছিলেন এবং সেজন্য ইংলণ্ড ও আমেরিকায় কয়েকটি পত্রিকা-প্রকাশে সহায়তা এবং ভারতে কয়েকটি পত্রিকা প্রকাশ করাইয়াছিলেন নিজেই। প্রেরণা, উৎসাহ রচনা, এমনকি অর্থ দিয়াও তিনি সহায়তা করিয়াছিলেন এই কাজে। তাঁহার সেই প্রচেষ্টার অন্যতম ফল 'উদ্বোধন' পত্রিকা। ভারতে প্রথম প্রকাশিত হয় মাদ্রাজ হইতে 'ব্রহ্মবাদিন্' পত্রিকা (ইংরেজী) ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের ১৪ই সেপ্টেম্বর, তাহার পর 'প্রবুদ্ধ ভারত' (ইংরেজী); তাহারও পরে 'উদ্বোধন' প্রকাশিত হয়।

* উদ্বোধন ৬০তম বর্ষে প্রকাশিত স্বামী জীবানন্দ-লিখিত 'উদ্বোধনের ষাট বছর' শীর্ষক প্রবন্ধ, ৭১তম বর্ষে প্রকাশিত অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু-লিখিত 'স্বামী বিবেকানন্দ-প্রবর্তিত সাময়িক পত্র' প্রবন্ধে এবং উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত 'শ্রীশ্রীমায়ের বাটী ও উদ্বোধন কার্যালয়' পুস্তিকায় বিস্তৃততর বিবরণ পাইবেন।

ভাবরাশির রক্ষণ ও প্রচারের জন্য গ্রন্থ-ও পত্রিকাপ্রকাশ ছাড়াও যাহা প্রয়োজন, অধিক প্রয়োজন, তাঁহার ব্যবস্থাও তিনি নিজে করিয়া গিয়াছেন। তাহা হইল, জীবন-পরম্পরায় সেই ভাবরাশিকে মূর্ত রাখা। তিনি বলিয়াছিলেন, "অন্তত: ভারতে এমন একটি যন্ত্র চালু করিয়া গেলাম, কোন শক্তিই যাহাকে থামাইতে পারিবে না।" ভারতের প্রাণবাণীর নবরূপকে অবিচ্ছিন্ন ধারায় জীবনে রূপায়িত রাখিবার জন্য তিনি রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন।

উদ্বোধন পত্রিকা প্রকাশ

পূর্বেই বলিয়াছি, উদ্বোধন পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জানুআরি। একখানি দৈনিক প্রকাশ করাই স্বামীজীর ইচ্ছা ছিল, অর্থাভাবে তাহা সম্ভব হয় নাই। উদ্বোধন পত্রিকাকেও কেবল বাংলা নয়, "আদ্দেক বাংলা, আদ্দেক হিন্দী" করার ইচ্ছা ছিল তাঁহার, সেই সঙ্গে এখান হইতে আর একখানি ইংরেজী পত্রিকাও (স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, পত্র নং ১১৬)। শেষে তাহা সম্ভব নয় বুঝিয়া কেবল বাংলা পত্রিকা প্রকাশের জন্য তাঁহার গুরুভাইদের নিকট বারবার তাগাদা দিতে থাকেন: "যে খবরের কাগজ বাহির হইবার কথা ছিল, তাহার কি হইল? (১৫৬ নং পত্র)।" "মাষ্টার মশায় ও তোমরা এককাট্টা হয়ে একটা কাগজ যাতে বের করতে পারো, তার চেষ্টা দেখ দিকি।...তোমরা মহোৎসবে তো লুচি সন্দেশ বাঁটলে,...কি spiritual food দিলে তা তো শুনলাম না? (১৭০ নং পত্র)", "হরমোহন নাকি একটা কাগজ বার করার যোগাড় করছিল, তার কি হল? (২৩৯ নং পত্র)", "সারদা কি বাংলা কাগজ বের করবে বলছে? সেটার বিষয়ে সাহায্য করবে (২৪০ নং পত্র)", ইত্যাদি। উদ্বোধন পত্রিকার প্রথম সম্পাদক স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ (পূর্ব পত্রে উল্লিখিত 'সারদা'), যিনি কেবল পত্রিকার সম্পাদনাই নয়, প্রেস কেনা ও পরিচালনা প্রভৃতি সব কাজই অদম্য উৎসাহ ও প্রাণপাত পরিশ্রমে করিয়া পত্রিকার প্রকাশ সম্ভব করিয়াছিলেন, তাঁহাকে সরাসরি লেখেন ইহার কিছুদিন পরে, ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের জানুআরিতে: "তোর কাগজের idea অতি উত্তম বটে, উঠে পড়ে লেগে যা, পরোয়া নেই। ৫০০ টাকা পত্রপাঠ পাঠিয়ে দেবো। ...লেখক চাই ...শশী, শরৎ, কালী প্রভৃতি সকলে পড়ে (মিলে) লিখতে আরম্ভ কর। (২৪০ নং পত্র)" এবং এইমাসেরই অন্যপত্রে: "তুমি খবরের কাগজ এখন বার করতে লেগে যাও।...তোদের মুখে হাতে বাগ্‌দেবী সরস্বতী বসবেন, ছাতিতে অনন্তবীর্য ভগবান বসবেন। (২৪৬ নং পত্র)"

পত্রিকা-প্রকাশে দেরী হইল অর্থাভাবের জন্য। শেষে সে সমস্যা মিটল—স্বামীজী ১,০০০ টাকা দিলেন, হরমোহন মিত্রের নিকট আরও ১,০০০ ধার লইয়া কাজ আরম্ভ হইল। "কলিকাতা, শ্যামবাজার স্ট্রীট, কম্বুলেটোলা, নং ১৪ রামচন্দ্র মৈত্রের লেন" -এ স্থাপিত 'উদ্বোধন কার্যালয়' হইতে উদ্বোধন প্রকাশিত হইতে শুরু করিল।

পত্রিকার নামকরণ করিয়াছিলেন স্বামীজী নিজেই।

উদ্বোধন প্রথমে পাক্ষিক পত্রিকারূপে আত্মপ্রকাশ করে। নয় বৎসর পাক্ষিক থাকিবার পর দশম বর্ষ হইতে মাসিক পত্রিকায় রূপান্তরিত হয়। ১ম হইতে ৯ম বর্ষ পর্যন্ত উদ্বোধনের আয়তন ছিল ডিমাই ⅛ সাইজের

৩২ পৃষ্ঠা প্রতি সংখ্যায়।[২] ৩২ তম বর্ষ পর্যন্ত সাইজ ডিমাই ⅛ ই থাকে, তবে ১০ম বর্ষ হইতে পাক্ষিক থেকে মাসিক পত্রিকায় রূপান্তরের জন্য প্রতি সংখ্যা ৬৪ পৃষ্ঠা করা হয়। ৩৩ তম বর্ষ হইতে সাইজ হয় ⅛ রয়্যাল, প্রতি সংখ্যায় ৫৬ পৃষ্ঠা; এখনো তাহাই চলিতেছে; শারদীয়া সংখ্যায় এবং বিশেষ প্রয়োজনে অন্য সংখ্যায় পৃষ্ঠাসংখ্যা কিছু বাড়ানোই হয়।

উদ্বোধন-এর প্রচ্ছদে মুদ্রিত আদর্শ-বাণী ছিল প্রথম বর্ষের প্রথম দুই সংখ্যায় "তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো!"[৩] তৃতীয় সংখ্যায় মুদ্রিত হয় "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত", এবং সেই সময় হইতে ইহাই উদ্বোধনের আদর্শ-বাণী। উদ্বোধন পত্রিকার প্রথম সম্পাদক স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ। স্বামী শুদ্ধানন্দ প্রথম সহকারী সম্পাদক; উদ্বোধন কার্যালয়ের "ম্যানেজার" বলিয়া বিজ্ঞাপনের নীচে তাঁহার নাম দেওয়া হইত; স্বামীজীর ইংরেজী রচনাগুলির বঙ্গানুবাদ অধিকাংশ তিনিই করিয়াছিলেন।[৪]

উদ্বোধনের জীবনোদ্দেশ্য

উদ্বোধনের জীবনোদ্দেশ্য কি, পত্রিকার ১ম বর্ষের ১ম সংখ্যার প্রথম প্রবন্ধে, স্বামী বিবেকানন্দ-রচিত "উদ্বোধনের প্রস্তাবনা"য় (গত বৎসরের মাঘ সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত) তাহা বিবৃত হইয়াছে। যাহার সার কথা হইল:

গ্রীক সভ্যতাই আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার মূল, জাগতিক উন্নতিই তাহার প্রধান লক্ষ্য। প্রাচ্য সভ্যতার, ভারতীয় সভ্যতার প্রধান লক্ষ্য আধ্যাত্মিক উন্নতি। এই দুয়ের মিলনই মানবজাতির যথার্থ প্রগতির পথ। বিভিন্ন যুগে যখনই এই মিলন কম-বেশী ঘটিয়াছে, তখনই মানবসভ্যতা পূর্বাপেক্ষা অধিকতর সমৃদ্ধ, সম্মুখে অধিকতর অগ্রসর হইয়াছে। আধুনিক যুগে আবার সে মিলন ঘটিতেছে। এই মিলনের ফলেই মানবসভ্যতা সামগ্রিকভাবে খুব উন্নত হইবে, বিশেষ করিয়া ভারতের গৌরব তাহার সমস্ত প্রাচীন গৌরবকে ছাড়াইয়া যাইবে। জগৎকে এই মিলনের আদর্শ এবার দেখাইবে ভারত—

২ ১ম বর্ষের ৩য় সংখ্যার কভার ৩য় পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপনে রহিয়াছে, "ডিমাই আট পেজী ৬৪ পৃষ্ঠা, মূল্য সডাক দুই টাকা বার্ষিক।" মনে হয় মাসে ৬৪ পৃষ্ঠা হিসাব করিয়াই এরূপ লেখা হইয়াছিল।

প্রথম বর্ষের ২৪টি সংখ্যার মোট পৃষ্ঠা ৭৬৮; দ্বিতীয় বর্ষ হইতে নবম বর্ষ পর্যন্ত প্রতি বছর ২২টি করিয়া সংখ্যা বাহির হইয়াছে, (প্রতি বর্ষে মোট ৭০৪ পৃষ্ঠা)—চৈত্র মাসের দ্বিতীয়ার্ধের সংখ্যা এবং কার্তিক মাসের প্রথমার্ধের সংখ্যা—এই দুটি সংখ্যা প্রকাশিত হইত না।

৩ প্রথম সংখ্যার কভারটি আমাদের কাছে নাই। দ্বিতীয় সংখ্যার কভার দেখিয়া প্রথম সংখ্যার কভারও অনুরূপ ছিল, ধরিয়া লওয়া হইয়াছে।

৪ স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ চার বৎসর সম্পাদক ছিলেন। পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে তিনি নিজের নাম 'স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ' নয়, 'স্বামী ত্রিগুণাতীত' লিখিতেন। স্বামীজী এক পত্রে তাঁহার দীর্ঘ নাম লইয়া ঠাট্টা করিয়া লিখিয়াছিলেন, "তোর নামটা একটু ছোটখাট কর্ দেখি বাবা, কি নামরে বাপ! একখানা বই হয়ে যায় এক নামের গুঁতোয়।... এখন বোধ হয় আর হবে না, ঢাক বেজে গেছে।" বোধ হয় এই জন্যই তিনি যেটুকু সম্ভব ঐ নামই ছোট করিয়াছিলেন। পরে তিনি আমেরিকা গমন করিলে স্বামী শুদ্ধানন্দ

"এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ।"

ইহার জন্য আমাদের কি করিতে হইবে? স্বামীজী বলিয়াছেন, বর্তমান পাশ্চাত্যজাতি জাগতিক বিষয়ে অতি উন্নত, তাহারা গ্রীক জাতির "সমুন্নত মুখোজ্জ্বলকারী সন্তান", কিন্তু "আধুনিক ভারতবাসী আর্যকুলের গৌরব নহেন।" তাহা না হইলেও, বর্তমানে আমরা আধ্যাত্মিকতায় অতি অবনত, ঘোর তামসিকতায় আচ্ছন্ন থাকিলেও ধর্মভাব প্রচ্ছন্নভাবে আমাদের মজ্জাগত হইয়াই আছে—"ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় এই আধুনিক ভারতবাসীতেও অন্তর্নিহিত পৈতৃক সম্পত্তি বিদ্যমান। যথাকালে মহাশক্তির কৃপায় তাহার পুনঃস্ফুরণ হইবে।" কাজেই আমাদের কাজ দুইটি—তামসিকতা কাটাইয়া উঠিবার জন্য পাশ্চাত্যের রাজসিকতা, তাহার বিপুল "কর্মোদ্যম", "আপাদমস্তক শিরায় শিরায় সঞ্চারকারী রজোগুণ"-এর বিকাশ ঘটাইতে হইবে, আর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিকতারও বিকাশ ঘটাইবার চেষ্টা করিতে হইবে—ধর্মকে আঁকড়াইয়া থাকিয়াই সব করিতে হইবে। ভারতের নিজস্ব ভাবকে আঁকড়াইয়াই আমাদের সম্মুখে পদক্ষেপ করিতে হইবে—নির্ণয় করিতে হইবে পাশ্চাত্যের কি গ্রহণ করিব, আমাদের বর্তমানে প্রচলিত কোন্ প্রথা ত্যাগ করিব, প্রাচীন কোন্ বিষয়ই বা গ্রহণ করিব। তাহা হইলে একদিকে রাজসিকতার পর সাত্ত্বিকভাব আনা সম্ভব হইবে—রজঃ সংযত থাকিবে, আর অপর দিকে নিজস্বতার বিনাশেরও ভয় থাকিবে না। এরূপ না করিতে পারিলে ভয় আছে, এই মিলন ঘটাইতে যাইয়া "পাশ্চাত্য বীর্যতরঙ্গে আমাদের বহুকালার্জিত রত্নরাজি বা ভাসিয়া যায়, ভয় হয়, পাছে প্রবল আবর্তে পড়িয়া ভারতভূমিও ঐহিক ভোগলাভের রণভূমিতে আত্মহারা হইয়া যায়—ভয় হয়, পাছে অসাধ্য অসম্ভব এবং মূলোচ্ছেদকারী বিজাতীয় ঢঙের অনুকরণ করিতে যাইয়া আমরা 'ইতোনষ্টস্ততোভ্রষ্টঃ' হইয়া যাই।" ইহার জন্য স্বামীজী সর্বসাধারণের নিকট আমাদের "ঘরের সম্পত্তি"—ভারতের সুপ্রাচীন ভাবরাশি—তুলিয়া ধরিতে বলিয়াছেন। সেই ভাবস্নাত হইয়া আমাদের নির্ণয় করিতে হইবে কিভাবে আমরা প্রাচ্য ও

ইহার সম্পাদক হন, তাহার পর স্বামী সারদানন্দের নাম দেখা যায়; বস্তুতঃ স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের পর তিনি উদ্বোধন পত্রিকা পরিচালনার ভার স্বামী শুদ্ধানন্দের সহায়তায় নিজস্কন্ধে বহন করিয়াছিলেন। সম্পাদকরূপে অপরের সহিত যুগ্মভাবে ইহাদের নাম পরেও দেখা যায়। উদ্বোধন-সম্পাদকগণের তালিকা: স্বামী ত্রিগুণাতীত (১৩০৫ মাঘ—১৩০৯ পৌষ); স্বামী শুদ্ধানন্দ (১৩০৯ মাঘ—১৩১৪ পৌষ); স্বামী সারদানন্দ (১৩১৪ মাঘ—১৩১৮ পৌষ); স্বামী প্রজ্ঞানন্দ (১৩১৮ মাঘ—১৩২০ পৌষ); ব্রহ্মচারী নির্মল (স্বামী মাধবানন্দ) (১৩২০ মাঘ—১৩২২ পৌষ); ব্রহ্মচারী বিমল (স্বামী দয়ানন্দ) ও ব্রহ্মচারী শান্তিচৈতন্য (স্বামী গঙ্গেশানন্দ) (১৩২২ মাঘ—১৩২৬ পৌষ); স্বামী বাসুদেবানন্দ (১৩২৬ মাঘ—১৩২৯ শ্রাবণ); স্বামী সারদানন্দ ও স্বামী বাসুদেবানন্দ (১৩২৯ ভাদ্র—১৩৩৪ শ্রাবণ); স্বামী শুদ্ধানন্দ ও স্বামী বাসুদেবানন্দ (১৩৩৪ ভাদ্র—১৩৪২ আশ্বিন); স্বামী শুদ্ধানন্দ ও স্বামী সুন্দরানন্দ (১৩৪২ কার্তিক—১৩৪৩ আশ্বিন); স্বামী সুন্দরানন্দ (১৩৪৩ কার্তিক—১৩৫৮ চৈত্র); স্বামী শ্রদ্ধানন্দ (১৩৫৯ বৈশাখ—১৩৬৩ পৌষ); স্বামী নিরাময়ানন্দ (১৩৬৩ মাঘ—১৩৭১ পৌষ); স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ (বর্তমান সম্পাদক) (১৩৭১ মাঘ—)।

পাশ্চাত্য ভাবের মিলন ঘটাইব।

এই কাজই—পৈতৃক সম্পত্তিকে, ভারতের সনাতন অধ্যাত্ম-ভাবরাশিকে সর্বসাধারণের নিকট তুলিয়া ধরাই এবং জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবের মিলনের সময় যে-সব সমস্যা জাগে তাহার সুষ্ঠু সমাধানের জন্য ব্রতী থাকাই উদ্বোধনের জীবনোদ্দেশ্য। বিভিন্ন বিষয়ে সুপণ্ডিত, বিভিন্ন সমস্যার সহিত সুপরিচিত, আবার সেই সঙ্গে সেই সব সমস্যার সমাধান বিষয়ে স্বামীজী কী ইঙ্গিত দিয়া গিয়াছেন তাহাও যথাযথভাবে ধরিতে সমর্থ, এরূপ বহু মনীষীর সমবেত প্রচেষ্টা ছাড়া ইহা করা, চলার পথে নিত্য সমাগত বিবিধ সমস্যার উপর স্বামীজীর সমাধানের আলোকসম্পাত করা সম্ভবপর নয়। তাই স্বামীজী 'উদ্বোধন'কে তার সেবাকার্যে সহায়তা করিবার জন্য "সহৃদয় প্রেমিক বুধমণ্ডলীকে" আহ্বান জানাইয়াছেন। আমরা আজ তাঁহাদিগকে স্বামীজীর সেই আমন্ত্রণই জানাইতেছি। ইহার প্রয়োজন এখনো সমভাবেই রহিয়াছে, বরং বাড়িয়াছে—রাজনৈতিক স্বাধীনতালাভের পর হইতেই যেন স্বামীজীর চিন্তারাশির দিকে আমরা ক্রমেই কম করিয়া তাকাইতেছি।

উদ্বোধন কার্যালয়

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে, ১,৫০০ টাকায় দুটি প্রেস কেনা হয় উদ্বোধনের জন্য। প্রথমে বড়বাজারে একটি গুদাম ভাড়া করিয়া সেখানে উহা রাখা হয়, পরে ১৪ নং রামচন্দ্র মৈত্রের লেন-এ গিরীন্দ্রলাল বসাকের বাড়ীতে 'উদ্বোধন প্রেস' লইয়া আসা হয়। উদ্বোধন কার্যালয়ও স্থাপিত হয় সেখানেই। গিরীন্দ্রলালের মৃত্যুর পর ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে ৩০ নং বোস পাড়া লেন-এ 'উদ্বোধন কার্যালয়' স্থানান্তরিত হয়; প্রেসটি পূর্বেই বিক্রয় করিয়া দেওয়া হইয়াছিল (উদ্বোধন পত্রিকার প্রথম চারি বর্ষ 'উদ্বোধন প্রেসে'ই ছাপা হইয়াছিল, পরে সারদা প্রেস, বৃটিশ ইণ্ডিয়া প্রিণ্টিং, লক্ষ্মী প্রিণ্টিং প্রভৃতি এ পর্যন্ত পরপর আরো দশটি প্রেসে পত্রিকা ছাপা হইয়াছে)। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে সেখান হইতে ১২, ১৩ নং গোপালচন্দ্র নিয়োগী লেনে (বর্তমান ১নং উদ্বোধন লেন) নিজস্ব ভবনে চলিয়া আসে। (বাড়ীটির দক্ষিণ দিকের রাস্তার নাম গোপালচন্দ্র নিয়োগী লেন এখনো আছে; ঠিকানা বাড়ীর উত্তর দিকের রাস্তা 'মুখার্জী লেন'-এর নামে পরে করা হইয়াছিল, মুখার্জী লেনেরই নাম আরও পরে 'উদ্বোধন লেন' হয়।) সেই সময় হইতে উদ্বোধন কার্যালয় এখানেই রহিয়াছে।

উদ্বোধন কার্যালয়ের এই নিজস্ব ভবনটি স্বামী সারদানন্দ নির্মাণ করিয়াছিলেন দুইটি প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য: শ্রীশ্রীমায়ের কলিকাতায় আসিয়া থাকিবার একটি নিজস্ব বাড়ীর প্রয়োজন খুবই অনুভূত হইতেছিল; উদ্বোধন কার্যালয়ের নিজস্ব ভবনেরও। এ ভবনটি নির্মিত হওয়ায় উভয় প্রয়োজনই সিদ্ধ হয়—দোতলাটি প্রধানত: শ্রীশ্রীমায়ের জন্য এবং একতলাটি উদ্বোধন কার্যালয়ের জন্য নির্দিষ্ট হয়। বাড়ীটি এই উভয় প্রয়োজনই সিদ্ধ করে বলিয়া ইহা "শ্রীশ্রীমায়ের বাটী" এবং "উদ্বোধন কার্যালয়"—এই উভয় নামেই এখনো পরিচিত। খড়-ব্যবসায়ী কেদারচন্দ্র দাস ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ১৮ই জুলাই তিনকাঠা চার ছটাক জমি মঠকে দান করিয়াছিলেন; তাহারই উপর ভবনটি নির্মিত হইবার পর ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে উদ্বোধন

কার্যালয় এখানে উঠিয়া আসে এবং শ্রীশ্রীমায়ের শুভ পদার্পণ ঘটে ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ২৩শে মে। (বিস্তারিত বিবরণ উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত 'শ্রীশ্রীমায়ের বাটী ও উদ্বোধন কার্যালয়' পুস্তিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।)

পরে ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ১৮ই ডিসেম্বর এই বাটীর পূর্বসংলগ্ন ১ কাটা ৪ ছটাক জমি কিনিয়া এবং ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে ইহার উপর গৃহ-নির্মাণ করিয়া বাটীর পরিসর কিছু বাড়ানো হয়; ইহার দোতলার ঘরটি স্বামী সারদানন্দের বাসগৃহ হয়। ইহার পর ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে 'ঘটক প্রোপার্টি কোম্পানী লিমিটেড'-এর দানে বাটীর পূর্বসংলগ্ন আরো ১ কাটা ৪ ছটাক জমি পাওয়া যায় এবং তাহার উপর গৃহ নির্মাণ করিয়া বাটীটিকে বর্তমান রূপ দেওয়া হইয়াছে।

কিন্তু ইহাতেও স্থানসঙ্কুলানের খুবই অসুবিধা হইতেছিল। সম্প্রতি ইহার সন্নিকটে (মাত্র ২০০ ফুট দূরে) নয়নকৃষ্ণ সাহা লেনে ১২ কাঠা ৪ ছটাক জমি ক্রয় এবং তাহার উপর একটি চারতলা বাড়ী নির্মাণ করিয়া (চার-তলাটি অর্থাভাবে এখনো অসম্পূর্ণ) সেখানে গত ১৯৭১ খৃষ্টাব্দের ৮ই জুলাই, গুরুপূর্ণিমার দিন উদ্বোধন কার্যালয়ের অধিকাংশই স্থানান্তরিত করা হইয়াছে—একতলায় সেল্‌স্‌-রুম ও আপিস এবং পুস্তকাদির ষ্টোর রুম, এবং তেতলায় সম্পাদকীয় বিভাগ। দোতলাটি প্রকাশন বিভাগের জন্য—সেখানে প্রকাশন বিভাগ স্থানান্তরিত করা বর্তমানে সম্ভব হইয়া উঠে নাই। একতলার ষ্টোররুমের ঠিক উপরে দোতলার হল-টি লাইব্রেরী এবং তেতলার হলটি সভাগৃহ—যেখানে প্রতি সপ্তাহের বৃহস্পতিবার ও রবিবার নিয়মিত ক্লাস এবং সাময়িক সভানুষ্ঠান হইয়া থাকে।[৫]

উদ্বোধন কার্যালয়ের এই নূতন বাড়ীটি হওয়ায় স্থানাভাবজনিত অসুবিধা দূর হইয়াছে। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বর্তমান অধ্যক্ষ স্বামী বীরেশ্বরানন্দ ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দের ১৭ই জানুআরি বাড়ীটির ভিত্তিস্থাপন এবং ১৯৭১ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা এপ্রিল উদ্বোধন করিয়াছিলেন।

৫ উদ্বোধন, ৭৩তম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যার ২১৮ পৃষ্ঠায় তিনটি তলের পৃথক্‌-পৃথক্‌ নক্সা দেওয়া আছে।

[১ম বর্ষ।]　　১লা চৈত্র (১৩০৫)　　[৫ম সংখ্যা।]

ম্যাক্‌সমুলার কৃত রামকৃষ্ণ ও তাঁহার উক্তি।

(স্বামী বিবেকানন্দ লিখিত।)

অধ্যাপক ম্যাক্‌সমুলার পাশ্চাত্য সংস্কৃতজ্ঞদিগের অধিনায়ক। যে ঋগ্বেদসংহিতা পূর্ব্বে সমগ্র কেহ চক্ষেও দেখিতে পাইত না, ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিপুল ব্যয়ে ও অধ্যাপকের বহুবর্ষব্যাপী পরিশ্রমে, এক্ষণে তাহা অতি সুন্দররূপে মুদ্রিত হইয়া সাধারণের পাঠ্য। ভারতের দেশদেশান্তর হইতে সংগৃহীত হস্তলিপি পুঁথির অধিকাংশ অক্ষরগুলিই বিচিত্র এবং অনেক কথাই অশুদ্ধ ; বিশেষ, মহাপণ্ডিত হইলেও বিদেশীর পক্ষে সে অক্ষরের শুদ্ধাশুদ্ধি-নির্ণয় এবং এবং অতি রল্লাক্ষর জটিল ভাষ্যের বিশদ অর্থ বোধগম্য করা কি কঠিন, তাহা আমরা সহজে বুঝিতে পারি না। অধ্যাপক ম্যাক্‌সমুলারের জীবনে ঋগ্বেদ-মুদ্রণ একটী প্রধান কার্য। এতদ্‌ব্যতীত আজীবন প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁহার বসবাস, জীবন-যাপন, কিন্তু তাহা বলিয়াই যে, অধ্যাপকের কল্পনায় ভারতবর্ষ বেদ-ঘোষ-প্রতিধ্বনিত ও যজ্ঞ-ধূম-পূরিত-গগন, বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র-জনক-যাজ্ঞবল্ক্যাদি বহুল, ঘরে ঘরে গার্গী-মৈত্রেয়ী-সুশোভিত, শ্রৌত ও গৃহ্য সূত্রের নিয়মাবলী পরিচালিত, তাহা নহে। আধুনিক বিজাতি-বিধর্ম্মি-পদ-দলিত, লুপ্তাচার, লুপ্তক্রিয়, ম্রিয়মাণ ভারতের কোন্ কোণে কি নূতন ঘটনা ঘটিতেছে, তাহাও অধ্যাপক সদা জাগরুক হইয়া সংবাদ রাখেন। এদেশের অনেক আংগ্লো ইণ্ডিয়ান, অধ্যাপকের পদযুগল কখনও ভারত-মৃত্তিকা-সংলগ্ন হয় নাই বলিয়া ভারতবাসীর রীতিনীতি আচার ইত্যাদি সম্বন্ধে তাঁহার মতামতে নিতান্ত উপেক্ষা প্রদর্শন করেন। কিন্তু তাঁহাদের জানা উচিত যে আজীবন এদেশে বাস করিলেও অথবা এদেশে জন্মগ্রহণ করিলেও যে প্রকার সঙ্গ, সেই সামাজিক শ্রেণীর বিশেষ বিবরণ ভিন্ন অন্য শ্রেণীর বিষয়ে, আংগ্লো ইণ্ডিয়ান রাজপুরুষকে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ থাকিতে হয়। বিশেষ, জাতি-বিভাগে বিভক্ত এই বিপুল সমাজে এক জাতির পক্ষে অন্য জাতির আচারাদি বিশিষ্টরূপে জানাই কত দুরূহ। কিছুদিন হইল, কোন প্রসিদ্ধ অ্যাংগ্লো-ইণ্ডিয়ান কর্ম্মচারীর লিখিত "ভারতাধিবাস"-নামধেয় পুস্তকে এরূপ এক অধ্যায় দেখিয়াছি —"দেশীয় পরিবার-রহস্য"। মনুষ্যহৃদয়ে রহস্য-জ্ঞানেচ্ছা প্রবল বলিয়াই বোধ হয় ঐ অধ্যায় পাঠ করিয়া দেখি যে, আংগ্লো-ইণ্ডিয়ান-দিগ্‌গজ তাঁহার মেথর, মেথরাণী ও মেথরাণীর জার-ঘটিত ঘটনা-বিশেষ বর্ণনা করিয়া স্বজাতিবৃন্দের দেশীয় জীবন-রহস্য সম্বন্ধে উগ্র কৌতূহল চরিতার্থ করিতে বিশেষ প্রয়াসী এবং ঐ পুস্তকের আংগ্লো-ইণ্ডিয়ান সমাজে সমাদর দেখিয়া লেখক যে সম্পূর্ণরূপে কৃতার্থ, তাহাও বোধ হয়। শিবা বঃ সন্তু পন্থানঃ, আর বলি কি ? তবে, শ্রীভগবান বলিয়াছেন, "সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে" ইত্যাদি। যাক, অপ্রাসঙ্গিক কথা ; তবে অধ্যাপক ম্যাক্‌সমুলারের আধুনিক ভারতবর্ষের দেশদেশান্তরের রীতি নীতি ও সাময়িক ঘটনা-জ্ঞান দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়, ইহা আমাদের প্রত্যক্ষ।

বিশেষতঃ, ধর্ম্ম-সম্বন্ধে ভারতের কোথায় কি নূতন তরঙ্গ উঠিতেছে, অধ্যাপক সেগুলি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অবেক্ষণ করেন এবং পাশ্চাত্য জগৎ যাহাতে সে বিষয়ে বিজ্ঞপ্ত হয়, তাহারও বিশেষ চেষ্টা করেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কেশবচন্দ্র সেন কর্ত্তৃক পরিচালিত ব্রাহ্মসমাজ, স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী প্রতিষ্ঠিত আর্য্য-সমাজ, থিয়সফি সম্প্রদায়, অধ্যাপকের লেখনী-মুখে প্রশংসিত বা নিন্দিত হইয়াছে। সুপ্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মবাদিন্ ও প্রবুদ্ধ-ভারত নামক পত্রিকাদ্বয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি ও উপদেশের প্রচার দেখিয়া এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারক বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার লিখিত শ্রীরামকৃষ্ণের বৃত্তান্তপাঠে, রামকৃষ্ণ-জীবন তাঁহাকে আকর্ষণ করে। ইতিমধ্যে ইণ্ডিয়া হাউসের লাইব্রেরিয়ান টনি মহোদয়-লিখিত রামকৃষ্ণ-চরিতও ইংলণ্ডীয় এসিয়াটিক কোয়ার্টারলি রিভিউ নামক প্রসিদ্ধ মাসিক পত্রিকায় মুদ্রিত হয়। মান্দ্রাজ ও কলিকাতা হইতে অনেক বিবরণ সংগ্রহ করিয়া অধ্যাপক নাইনটিন্থ সেঞ্চুরি নামক ইংরাজি ভাষার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মাসিক পত্রিকায় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও উপদেশ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করেন। তাহাতে ব্যক্ত করিয়াছেন যে, বহু শতাব্দী যাবৎ পূর্ব্ব মনীষিগণের ও আধুনিক কালে পাশ্চাত্য বিবুধবর্গের প্রতিধ্বনিমাত্রকারী ভারতবর্ষে নূতন ভাব নূতন ভাষায় নূতন মহাশক্তি পরিপূরিত করিয়া সম্পাতকারী নূতন মহাপুরুষ সহজেই তাঁহার চিত্তাকর্ষণ করিলেন। পূর্ব্বতন ঋষি মুনি মহাপুরুষদিগের কথা তিনি শাস্ত্রপাঠে বিলক্ষণই অবগত ছিলেন, তবে এ যুগে, এ ভারতে আবার তাহা হওয়া কি সম্ভব? রামকৃষ্ণ-জীবনী এ প্রশ্নের যেন মীমাংসা করিয়া দিল। আর ভারত-গত-প্রাণ মহাত্মার ভারতের ভাবী মঙ্গলের, ভাবী উন্নতির আশা-লতার মূলে বারি সিঞ্চন করিয়া নূতন প্রাণ-সঞ্চার করিল।

পাশ্চাত্য জগতে কতকগুলি মহাত্মা আছেন, যাঁহারা নিশ্চিত ভারতের কল্যাণা-কাঙ্ক্ষী। কিন্তু ম্যাক্সমূলারের অপেক্ষা ভারত-হিতৈষী ইউরোপ খণ্ডে আছেন কিনা, জানি না। ম্যাক্সমূলার যে শুধু ভারত-হিতৈষী, তাহা নহেন, ভারতের দর্শনশাস্ত্রে, ভারতের ধর্ম্মে তাঁহার বিশেষ আস্থা; অদ্বৈতবাদ যে, ধর্ম্মরাজ্যের শ্রেষ্ঠতম আবিষ্ক্রিয়া, তাহা অধ্যাপক সর্ব্বসমক্ষে বারম্বার স্বীকার করিয়াছেন। যে সংসারবাদ* দেহাত্মবাদী খ্রীষ্টিয়ানের বিভীষিকাপ্রদ, তাহাও তিনি স্বীয় অনুভূতি-সিদ্ধ বলিয়া দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করেন, এমন কি, বোধ হয় যে, ইতিপূর্ব্ব জন্ম তাঁহার ভারতেই ছিল এবং পাছে ভারতে আসিলে এই বৃদ্ধ শরীর সহসা সমুপস্থিত পূর্ব্ব স্মৃতিরাশির প্রবল বেগ সহ্য করিতে না পারে, অধুনা এই ভয়ই ভারতাগমনের প্রধান প্রতিবন্ধক। তবে গৃহস্থ মানুষ, যিনিই হউন, সকল দিক বজায় রাখিয়া চলিতে হয়। যখন সর্ব্বত্যাগী উদাসীনকেও অতিবিশুদ্ধ জানিয়াও লোকনিন্দিত আচারের অনুষ্ঠানে কম্পিত-কলেবর দেখা যায়, শূকরী-বিষ্ঠা মুখে বলিয়াও যখন প্রতিষ্ঠা-লাভ, অপ্রতিষ্ঠার ভয়, মহা উগ্র তাপসেরও কার্য্যপ্রণালীর পরিচালক, তখন সর্ব্বদা লোক-সংগ্রহেচ্ছু বহুলোকপূজ্য গৃহস্থের যে, অতি সাবধানে নিজের মনোগত ভাব প্রকাশ করিতে হইবে, ইহাতে কি বিচিত্রতা? যোগ-শক্তি ইত্যাদি গূঢ় বিষয়-সম্বন্ধেও যে অধ্যাপক একবারে অবিশ্বাসী, তাহাও নহেন।

---

* সংসারবাদ—পুনর্জন্মবাদ

"দার্শনিক-পূর্ণ ভারতভূমিতে যেসকল ধর্ম্ম-তরঙ্গ উঠিতেছে", তাহাদের কিঞ্চিৎ বিবরণ ম্যাক্সমূলার প্রকাশ করেন, কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, অনেকে "উহার মর্ম্ম বুঝিতে অত্যন্ত ভ্রমে পড়িয়াছেন এবং অত্যন্ত অযথা বর্ণন করিয়াছেন।" ইহা প্রতিবিধানের জন্য এবং এসোটেরিক বৌদ্ধমত, থিয়সফি প্রভৃতি বিজাতীয় নামের পশ্চাতে "ভারতবাসী সাধু-সন্ন্যাসীদের অলৌকিক ক্রিয়াপূর্ণ অদ্ভুত যেসকল উপন্যাস ইংলণ্ড ও আমেরিকার সংবাদপত্র-সমূহে উপস্থিত হইতেছে, তাহারও মধ্যে কিঞ্চিৎ সত্য আছে." ইহা দেখাইবার জন্য অর্থাৎ ভারতবর্ষ যে কেবল পক্ষিজাতির ন্যায় আকাশে উড্ডীয়মান, বা পদভরে জলসঞ্চরণকারী অথবা মৎস্যানুকারী জলজীবী, মন্ত্র, তন্ত্র, ছিটা-ফোঁটা যোগে রোগাপনয়নকারী সিদ্ধিবলে ধনীদিগের বংশরক্ষক, সুবর্ণাদি-সৃষ্টিকারী, সাধুগণের নিবাস ভূমি, তাহা নহে, প্রকৃত অধ্যাত্মতত্ত্ববিৎ, প্রকৃত ব্রহ্মবিৎ, প্রকৃত যোগী, প্রকৃত ভক্ত, যে একেবারে বিরল নহেন এবং সমগ্র আর্য্যজাতি এখনও এতদূর পশুভাব প্রাপ্ত হন নাই যে, শেষোক্ত নরদেবগণকে ছাড়িয়া পূর্ব্বোক্ত বাজিকর-গণের পদলেহন করিতে আপামর সাধারণ দিবানিশি ব্যস্ত, ইহাই ইউরোপীয় মনীষিগণকে জানাইবার জন্য ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের অগষ্ট সংখ্যক নাইনটীন্থ সেঞ্চুরি নামক পত্রিকায় অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার "প্রকৃত মহাত্মা" শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ-চরিত্রের অবতারণা করেন।

ইউরোপ ও আমেরিকার বুধমণ্ডলী অতি সমাদরে এ প্রবন্ধটী পাঠ করেন এবং উহার বিষয়ীভূত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতি অনেকেই আস্থাবান হইয়াছেন,—আর সুফল হইয়াছে কি? এই ভারতবর্ষ পাশ্চাত্য সভ্য জাতিরা নরমাংস ভোজী, নগ্ন-দেহ, বলপূর্ব্বক বিধবা-দাহন-কারী, শিশুঘাতী, মূর্খ, কাপুরুষ, সর্ব্বপ্রকার পাপ ও অন্ধতা-পরিপূর্ণ, পশুপ্রায় নরজাতিপূর্ণ বলিয়া ধারণা করিয়া রাখিয়াছিলেন—এই ধারণার প্রধান সহায়, পাদরী সাহেবগণ ও বলিতে লজ্জা হয়, দুঃখ হয়, কতকগুলি আমাদের স্বদেশী। এই দুই দলের প্রবল উদ্যোগে যে একটী অন্ধতামসের জাল পাশ্চাত্যদেশনিবাসীদের সম্মুখে বিস্তৃত হইয়াছিল, সেইটি ধীরে ধীরে খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইতে লাগিল। যে দেশে শ্রীভগবান রামকৃষ্ণদেবের ন্যায় লোকগুরুর উদয়, সে দেশ কি বাস্তবিক যে প্রকার কদাচারপূর্ণ আমরা শুনিয়া আসিতেছি, সেই প্রকার? অথবা কুচক্রীরা আমাদিগকে এতদিন ভারতের তথ্য সম্বন্ধে মহাভ্রমে পাতিত করিয়া রাখিয়াছিল? স্বতই এ প্রশ্ন পাশ্চাত্য মনে সমুদিত।

পাশ্চাত্য জগতে ভারতীয় ধর্ম্ম দর্শন-সাহিত্য-সাম্রাজ্যের চক্রবর্ত্তী অধ্যাপক ম্যাক্স-মূলার যখন শ্রীরামকৃষ্ণচরিত অতি ভক্তিপ্রবণ হৃদয়ে ইউরোপ ও আমেরিকার অধিবাসী-দিগের কল্যাণের জন্য সংক্ষেপে নাইনটীন্থ সেঞ্চুরীতে প্রকাশ করিলেন, তখন পূর্ব্বোক্ত দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে যে ভীষণ অন্তর্দাহ উপস্থিত হইল, তাহা বলা বাহুল্য।

মিশনরী মহাশয়েরা হিন্দু দেবদেবীর অযথা বর্ণন করিয়া তাঁহাদের উপাসকদিগের মধ্যে যে যথার্থ ধার্ম্মিক লোক কখন উদ্ভূত হইতে পারেন না, এইটি প্রমাণ করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিলেন; প্রবল বন্যার সমক্ষে তৃণগুচ্ছের ন্যায় তাহা ভাসিয়া গেল, আর পূর্ব্বোক্ত স্বদেশী সম্প্রদায় শ্রীরামকৃষ্ণের শক্তি-সম্প্রসারণরূপ প্রবল অগ্নি নির্ব্বাণ করিবার উপায় চিন্তা করিতে করিতে হতাশ হইয়া পড়িয়াছেন। ঐশী শক্তির সমক্ষে জীবের শক্তি কি?

অবশ্যই দুই দিক হইতেই এক প্রবল আক্রমণ বৃদ্ধ অধ্যাপকের উপর পতিত হইল, বৃদ্ধ কিন্তু হটিবার নহেন। এ সংগ্রামে তিনি বহুবার পারোত্তীর্ণ। এবারও বেলায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন এবং ক্ষুদ্র আততায়িগণকে ইঙ্গিতে নিবৃত্ত করিবার জন্যও "যে মহাপুরুষ ইদানীং ইউরোপ ও আমেরিকায় বহুল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, যথায় তাঁহার শিষ্যেরা মহোৎসাহে তাঁহার উপদেশ প্রচার করিতেছেন এবং বহু ব্যক্তিকে এমন কি, খৃষ্টিয়ানদের মধ্য হইতেও অনেককে রামকৃষ্ণমতে আনয়ন করিয়াছেন," "একথা আমাদের নিকট আশ্চর্যবৎ এবং কষ্টে বিশ্বাসযোগ্য," "তথাপি প্রত্যেক মনুষ্য হৃদয়ে ধর্ম্ম-পিপাসা বলবতী, প্রত্যেক হৃদয়ে প্রবল ধর্ম্মক্ষুধা বিদ্যমান, যাহা বিলম্বে বা শীঘ্রই শান্ত হইতে চাহে"। "এইসকল ক্ষুধার্ত প্রাণে রামকৃষ্ণের ধর্ম্ম বাহিরের কোন শাসনাধীনে আসে না" বলিয়াই অমৃতবৎ গ্রাহ্য হয়। "অতএব, রামকৃষ্ণ ধর্ম্মানুচারীদের যে প্রবল সংখ্যা আমরা শুনিতে পাই, তাহা কিঞ্চিৎ অতিরঞ্জিত যদ্যপিও হয়,...তথাপি যে ধর্ম্ম আধুনিক সময়ে এতাদৃশী সিদ্ধি লাভ করিয়াছে এবং যাহা বিভূতির সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে সম্পূর্ণ সত্যতার সহিত জগতের সর্ব্ব প্রাচীন ধর্ম্ম ও দর্শন বলিয়া ঘোষণা করে, এবং যাহার নাম বেদান্ত অর্থাৎ বেদশেষ- বেদের সর্ব্বোচ্চ উদ্দেশ্য, তাহা অস্মদাদির অতি যত্নের সহিত মনঃসংযোগার্হ।" সেই মহাপুরুষ ও তাঁহার ধর্ম্ম যাহাতে সর্ব্বসাধারণে জানিতে পারে, সেইজন্য তাঁহার অপেক্ষাকৃত সম্পূর্ণ জীবনী ও উপদেশ সংগ্রহ করিয়া "রামকৃষ্ণ ও তাঁহার উক্তি" নামক পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন।

এই পুস্তকের প্রথম অংশে মহাত্মাপুরুষ, আশ্রম-বিভাগ, যোগ, দয়ানন্দ সরস্বতী, পবহারী বাবা, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাধাস্বামী সম্প্রদায়ের নেতা রায় শালিগ্রাম সাহেব বাহাদুর প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনীর অবতরণ [অবতারণা] করা হইয়াছে।

অধ্যাপকের বড়ই ভয়, পাছে সকল ঐতিহাসিক ঘটনা সম্বন্ধে, যে দোষ আপনা হইতেই আসে— অনুরাগ বা বিরাগাধিক্যে অতিরঞ্জিত হওয়া—সেই দোষ এ জীবনীতেও প্রবেশ করে। তজ্জন্য ঘটনাবলী-সংগ্রহে তাঁহার বিশেষ সাবধানতা। বর্ত্তমান লেখক শ্রীরামকৃষ্ণের ক্ষুদ্র দাস। তৎসঙ্কলিত রামকৃষ্ণ-জীবনীর উপাদান যে অধ্যাপকের যুক্তি ও বুদ্ধি উদূখলে বিশেষ কুট্টিত হইলেও ভক্তির আগ্রহে কিঞ্চিৎ অতিরঞ্জিত হওয়া সম্ভব, তাহাও বলিতে ম্যাক্সমুলার ভুলেন নাই, এবং ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারক শ্রীযুক্তবাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ ব্যক্তিগণ দোষোদ্‌ঘোষণ করিয়া অধ্যাপককে যাহা কিছু লিখিয়াছেন, তাহার প্রত্যুত্তর-মুখে দুই-চারিটি কঠোর, মধুর কথা যাহা কিছু বলিয়াছেন, তাহাও পরশ্রীকাতরতা ও ঈর্ষ্যা-পূর্ণ বাঙ্গালীর বিশেষ মনোযোগের বিষয়, সন্দেহ নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ-কথা অতি সংক্ষেপে সরল ভাষায় পুস্তকমধ্যে অবস্থিত। এ জীবনীতে সভয় ঐতিহাসিকের প্রত্যেক কথাটি যেন ওজন করিয়া লেখা, "প্রকৃত মহাত্মা" নামক প্রবন্ধে যে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ মধ্যে মধ্যে দেখা যায়, এবার তাহা অনেক যত্নে আবরিত। একদিকে মিসনরি, অন্যদিকে ব্রাহ্ম-কোলাহল, এ উভয় আপদের মধ্য দিয়া অধ্যাপকের নৌকা চলিয়াছে। "প্রকৃত মহাত্মা" উভয় পক্ষ হইতে বহু ভর্ৎসনা, বহু কঠোর বাণী অধ্যাপকের উপর আনে; আনন্দের বিষয়, তাহার প্রত্যুত্তরের চেষ্টাও নাই, ইতরতা নাই, আর

গালাগালি সভ্য ইংলণ্ডের ভদ্রলেখক কখনও করেন না, কিন্তু বর্ষীয়ান্ মহাপণ্ডিতের উপযুক্ত ধীর-গম্ভীর, বিদ্বেষশূন্য অথচ বজ্রবৎ দৃঢ় স্বরে মহাপুরুষের অলৌকিক হৃদয়োত্থিত অমানব ভাবের উপর যে আক্ষেপ হইয়াছিল, তাহা অপসারিত করিয়াছেন।

আক্ষেপগুলিও আমাদের বিস্ময়কর বটে,—ব্রাহ্মসমাজের গুরু স্বর্গীয় আচার্য্য শ্রীকেশবচন্দ্রের শ্রীমুখ হইতে আমরা শুনিয়াছি যে, শ্রীরামকৃষ্ণের সরল মধুর গ্রাম্য ভাষা অতি অলৌকিক পবিত্রতা-বিশিষ্ট; আমরা যাহাকে অশ্লীল বলি, এমন কথার সমাবেশ তাহাতে থাকিলেও তাঁহার অপূর্ব্ব বালবৎ কামগন্ধহীনতার জন্য ঐ সকল শব্দ-প্রয়োগ দোষের না হইয়া ভূষণ-স্বরূপ হইয়াছে, অথচ ইহাই একটি প্রবল আক্ষেপ !!

অপর আক্ষেপ এই যে, তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া স্ত্রীর প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছিলেন। তাহাতে অধ্যাপক উত্তর দিতেছেন যে, তিনি স্ত্রীর অনুমতি লইয়া সন্ন্যাসব্রত ধারণ করেন এবং যতদিন মর্ত্ত্যধামে ছিলেন, তাঁহার সদৃশী স্ত্রী পতিকে গুরুভাবে গ্রহণ করিয়া স্বেচ্ছায় পরমানন্দে তাঁহার উপদেশ অনুসারে আকৌমার ব্রহ্মচারিণী-রূপে ভগবৎ সেবায় নিযুক্তা ছিলেন। আরও বলেন যে, শরীর-সম্বন্ধ না হইলে কি বিবাহে এতই অসুখ? "আর শরীর-সম্বন্ধ না থাকিলেও ব্রহ্মচারী পতি ব্রহ্মচারিণী পত্নীকে অমৃতস্বরূপ ব্রহ্মানন্দের ভাগিনী করিয়া পরম পবিত্রভাবে জীবন অতিবাহিত করিতে পারেন, একথা উক্ত ব্রত-ধারণকারী ইউরোপনিবাসীদিগের সম্বন্ধে কার্য্যে পরিণত হয় নাই, মনে করিতে পারি, কিন্তু হিন্দুরা যে অনায়াসে ঐ প্রকার কামজিৎ অবস্থায় কালাতিপাত করিতে পারে, ইহা আমরা বিশ্বাস করি।" অধ্যাপকের মুখে ফুলচন্দন পড়ুক; তিনি বিজাতি, বিদেশী হইয়া আমাদের একমাত্র ধর্ম্মসহায় ব্রহ্মচর্য্য বুঝিতে পারেন এবং ভারতবর্ষে যে এখনও বিরল নহে, বিশ্বাস করেন, আর আমাদের ঘরের মহাবীরেরা বিবাহে শরীর-সম্বন্ধ বই আর কিছুই দেখিতে পাইতেছেন না !! যাদৃশী ভাবনা যস্য ইত্যাদি।

আবার অভিযোগ এই যে, তিনি বেশ্যাদিগকে অতিশয় ঘৃণা করিতেন না—ইহাতে অধ্যাপকের উত্তর বড়ই মধুর; তিনি বলেন, শুধু রামকৃষ্ণ নহেন, অন্যান্য ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকেরাও এ অপরাধে অপরাধী।

আহা! কি মিষ্ট কথা—শ্রীভগবান বুদ্ধদেবের কৃপাপাত্রী বেশ্যা অম্বাপালী ও হজরৎ ঈশার দয়া-প্রাপ্তা সামরীয়া নারীর কথা মনে পড়ে। আরও অভিযোগ, মদ্যপানের উপরও তাঁহার তাদৃশ ঘৃণা ছিল না। হরি! হরি! একটু মদ খেয়েছে বলে সে লোকটার ছায়াও স্পর্শ করা হবে না, এই না অর্থ? দারুণ অভিযোগই বটে! মাতাল, বেশ্যা, চোর, দুষ্টদের মহাপুরুষ কেন দূর দূর করিয়া তাড়াইতেন না, আর চক্ষু মুদ্রিত করিয়া চাঁদি ভাষায় সানাইয়ের পোঁ'র সুরে কেন কথা কহিতেন না; আবার সকলের উপর বড় অভিযোগ, আজন্ম স্ত্রী-সঙ্গ কেন করিলেন না !!!

আক্ষেপকারীদের এই অপূর্ব্ব পবিত্রতা এবং সদাচারের আদর্শে জীবন গড়িতে না পারিলেই ভারত রসাতলে যাইবে !! যাক্, রসাতলে, যদি ঐ প্রকার নীতি-সহায়ে উঠিতে হয়।

জীবনী অপেক্ষা উক্তি-সংগ্রহ এ পুস্তকের অধিক স্থান অধিকার করিয়াছে। ঐ

উক্তিগুলি যে সমস্ত পৃথিবীর ইংরাজী-ভাষী পাঠকের অনেক ব্যক্তির চিত্তাকর্ষণ করিতেছে, তাহা পুস্তকের ক্ষিপ্র বিক্রয় দেখিয়াই অনুমিত হয়। উক্তিগুলি তাঁহার শ্রীমুখের বাণী বলিয়া মহাশক্তিপূর্ণ এবং তজ্জন্যই নিশ্চিত সর্ব্বদেশে আপনাদের ঐশীশক্তি বিকাশ করিবে। বহুজনহিতায়, বহুজনসুখায় মহাপুরুষগণ অবতীর্ণ হন। তাঁহাদের জন্ম কর্ম্ম অলৌকিক এবং তাঁহাদের প্রচার-কার্য্যও অত্যাশ্চর্য্য।

আর আমরা? যে দরিদ্র ব্রাহ্মণকুমার স্বীয় জন্ম দ্বারা পবিত্র, কর্ম্ম দ্বারা উন্নত এবং বাণী দ্বারা রাজ-জাতিরও প্রীতি-দৃষ্টি আমাদের উপর পাতিত করিয়াছেন, আমরা তাঁহার জন্য করিতেছি কি? সত্য সকল সময়ে মধুর হয় না, কিন্তু সময় বিশেষে তথাপিও বলিতে হয়, আমরা কেহ কেহ বুঝিতেছি. আমাদের লাভ, কিন্তু ঐস্থানেই শেষ। ঐ উপদেশ জীবনে পরিণত করিবার চেষ্টা করাও আমাদের অসাধ্য। যে জ্ঞান-ভক্তির মহাতরঙ্গ শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তোলিত করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে অঙ্গ বিসর্জ্জন করা ত দূরের কথা। যাঁহারা বুঝিয়াছেন, এ খেলা, বা বুঝিতে চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদিগকে বলি যে, শুধু বুঝিলে হইবে কি? বোঝার প্রমাণ কার্য্যে। মুখে বুঝিয়াছি বা বিশ্বাস করি বলিলেই কি অন্যে বিশ্বাস করিবে! সকল হৃদ্গত ভাবই ফলানুমেয়; কার্য্যে পরিণত কর, জগৎ দেখুক।

যাঁহারা আপনাদিগকে মহাপণ্ডিত জানিয়া এই মূর্খ, দরিদ্র, পূজারী ব্রাহ্মণের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করেন, তাঁহাদের প্রতি আমাদের নিবেদন এই যে, যে দেশের এক মূর্খ পূজারী সপ্ত সমুদ্র পার পর্য্যন্ত আপনাদের পিতৃপিতামহাগত সনাতন ধর্ম্মের জয়-ঘোষণা নিজ শক্তিবলে অত্যল্প কালেই প্রতিধ্বনিত করিল, সেই দেশের সর্ব্বলোকমান্য শূরবীর আপনারা মহাপণ্ডিত, আপনারা মনে করিলে আরও কত অদ্ভুত কার্য্য স্বদেশের, স্বজাতির কল্যাণের জন্য করিতে পারেন। তবে উঠুন, প্রকাশ হউন, দেখান, মহাশক্তির খেলা, আমরা পুষ্প-চন্দন-হস্তে আপনাদের পূজার জন্য দাঁড়াইয়া আছি। আমরা মূর্খ, দরিদ্র, নগণ্য, বেশমাত্রজীবী ভিক্ষুক; আপনারা মহারাজ, মহাবল, মহাকুল-প্রসূত, সর্ব্ব বিদ্যাশ্রয়।

আপনারা উঠুন; অগ্রণী হউন, পথ দেখান, জগতের হিতের জন্য সর্ব্বত্যাগ দেখান, আমরা দাসের ন্যায় পশ্চাদ্গমন করি, আর যাহারা শ্রীরামকৃষ্ণনামের প্রতিষ্ঠা ও প্রভাবে দাসজাতি-সুলভ ঈর্ষ্যা ও দ্বেষে জর্জ্জরিত-কলেবর হইয়া বিনা কারণে, বিনা অপরাধে নিদারুণ বৈরপ্রকাশ করিতেছেন, তাহাদিগকে বলি যে, হে ভাই, তোমাদের এ চেষ্টা বৃথা। যদি এই দিগ্‌দিগন্তব্যাপী মহাধর্ম্মতরঙ্গ—যাহার শুভ্রশিখরে এই মহাপুরুষমূর্ত্তি বিরাজ করিতেছেন, আমাদের ধন, জন বা প্রতিষ্ঠা-লাভের উদ্যোগের ফল হয়, তাহা হইলে তোমাদের বা অপর কাহারও চেষ্টা করিতে হইবে না, মহামায়ার অপ্রতিহত নিয়ম-প্রভাবে অচিরাৎ এ তরঙ্গ মহাজলে অনন্তকালের জন্য লীন হইয়া যাইবে, আর যদি জগদম্বা-পরিচালিত মহাপুরুষের নিঃস্বার্থ প্রেমোচ্ছ্বাসরূপ এই বন্যা জগৎ উপপ্লাবিত করিতে আরম্ভ করিয়া থাকে, তবে হে ক্ষুদ্র মানব, তোমার কি সাধ্য, মায়ের শক্তি-সঞ্চার রোধ কর?

আশাবাণী।

(লাহোর ট্রিবিউনের সম্পাদক প্রসিদ্ধ লেখক বাবু নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত লিখিত।)

ভারতবর্ষের প্রান্ত হইতে প্রান্ত পর্য্যন্ত এই যে অস্ফুট শব্দ শুনিতে পাইতেছি, আসন্ন প্রভাত-সমীরণের ন্যায় যাহা এই জীর্ণজরা দেশে সঞ্চারিত হইতেছে, এ শব্দ আশাজনক না ভীতিবিধায়ক? ইহা জাগরণের সূচনা না মৃত্যুর পূর্ব্বলক্ষণ? নৈরাশ্যের আক্ষেপ শুনিতেছি চারিদিকে, আশার বাণী কদাপি শ্রবণে প্রবেশ করে। আক্ষেপের কারণ অনেক আছে, স্বীকার করি। যুগব্যাপী পরাধীনতা জাতীয়তার পক্ষে মঙ্গলকর নহে। বলক্ষয়ের সহিত অন্যান্য অবনতিও প্রবেশ করিয়াছে। জগতের অবিশ্রান্ত আলস্য-শূন্য কর্ম্মে আমরা যোগ দিতে পারি না। যে দেশ-বাৎসল্যে দেশকে, জাতিকে জীবিত করিয়া তুলে, সে প্রগাঢ় অনুরাগ আমাদের নাই। কেমন করিয়া আমরা পৃথিবীর মধ্যে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইব? কে আমাদিগকে গণনার মধ্যে আনিবে?

আমাদের কি নাই? কিসের অভাব আমাদিগকে শোক-সন্তপ্ত করিতেছে? যদি সেই অভাব পূর্ণ হয়, তাহা হইলে কি আমরা শোকশূন্য হইব? এই জীর্ণ পুণ্য-ভূমি কি আবার আনন্দ-পূর্ণ হইবে? নাই কি, আমরা সহজেই বলিতে পারি। ইউরোপের মত অথবা মার্কিনের মত কর্ম্মঠ আমরা নহি, সে অধ্যবসায়, সে কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা, সে মৃত্যুভয়শূন্যতা আমাদের নাই; স্বদেশের প্রতি সে অচলা ভক্তি, স্বজাতির উন্নতিতে সেই অকৃত্রিম গৌরব আমাদের নাই; নাই আমাদের জিগীষা, নাই আমাদের রাজনীতি, নাই আমাদের অক্লিষ্ট কর্ম্ম, নাই সে বীরদর্প, নাই সে দিগ্বিজয়ীর অপ্রতিহত গতি। যদি এমন অঘটন ঘটে, যদি অলৌকিক সম্ভব হয়, যদি ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় আমাদের এই সকল অভাব পূর্ণ হয়, তাহা হইলেই কি আমাদের মহত্ত্বের পথ মুক্ত হয়? এই কথাটা একবার বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত। যদি আমরা রুসিয়ার মত পরাক্রমশালী কিম্বা মার্কিনের মত ঐশ্বর্য্যশালী হইতে পারি, তাহা হইলেই কি সুখ-শান্তির পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইব?

অপরাপর সৌভাগ্যশালী জাতিতে যাহা দেখিয়া আমাদের নয়ন, মন আজি লুব্ধ হইতেছে প্রাচীনকালে অন্যান্য জাতিতেও সেইসকল গুণ বর্ত্তমান ছিল। প্রাচীন মিসরে কি ঐশ্বর্য্য, বাণিজ্য, শিল্পকলা, যুদ্ধকৌশল ছিল না? পারস্য, বাবিলন, ফিনীশিয়ায় কি সহস্র সহস্র ধন-কুবের বাস করিত না? অন্য দেশের কথায় কাজ কি, এই ভারতবর্ষে কি মোগলের ঐশ্বর্য্যকীর্ত্তির চিহ্ন অদ্যাবধি নাই? কিন্তু যাহারা এই কীর্ত্তিস্তম্ভসমূহ স্থাপন করিয়াছিল, তাহারা কোথায় গেল? তাহাদিগের কীর্ত্তির চিহ্নও আজি না হয় কালি বিলুপ্ত হইবে। গ্রীস, রোম, মিশর ঐতিহাসিক উপকথার অন্তর্গত। হয়ত, এমন কত প্রভাবশালী, ঐশ্বর্য্যশালী জাতি জন্মিয়া থাকিবে, যাঁহাদের উল্লেখ ইতিহাসেও দেখিতে পাওয়া যায় না। এইরূপ মহত্ত্বের জন্য কি আমরা লালায়িত? সাম্রাজ্য স্থাপিত করিব, বাণিজ্যে ভাণ্ডার ধনপূর্ণ করিব, ঐশ্বর্য্যজনক বহুবিধ ভোগসুখে কালযাপন করিব, তাহার পর?—তাহার পর বৃন্তচ্যুত পত্রের ন্যায় খসিয়া পড়িয়া, ভস্মীভূত হইয়া জগৎকর্ত্তৃক বিস্মৃত হইব। এই মহত্ত্বের তরে লালসা?

ইহারই অভাবে এত শোক ? যদি বল যে চিরকাল কিছুই থাকে না, যেমন মানুষ যায়, তেমনি মানুষের কীর্ত্তিও যায়, তাহা হইলে যাহা নশ্বর, ক্ষণভঙ্গুর, তাহার কামনা করিব কেন, তাহার জন্য হা হুতাশ করিব কেন ? যাহাকে এই-জাতীয় গৌরব বা মহত্ত্ব বলি প্রকৃতপক্ষে তাহা কি ? ঐশ্বর্য্য কি ? না, ধরণীর গর্ভ হইতে প্রাপ্ত কতকগুলা উজ্জ্বল ধাতু বা প্রস্তরের সমষ্টি। ভোগ কি ? না ক্ষয়। সহজেই এই দেহ পতনশীল, আবার ভোগের হুতাশন জ্বালিয়া শীঘ্র শীঘ্র তাহার দাহ-কার্য্য সমাধা করি। যদি কিছু চাহিতে হয়, কোন সামগ্রীর জন্য প্রার্থিত হইতে হয়, তাহা হইলে যাহা অবিনশ্বর, যাহা চিরস্থায়ী, তাহার জন্য প্রার্থনা করিব। আর যদি এই ভারত-ভূমিতে এমন প্রার্থনা না করিব, ত, এ শিক্ষা আর কোথায় পাইব ?

সাম্রাজ্য-গৌরবের পরিণাম—জড়ের উপাসনা। মূর্ত্তিপূজা প্রকৃত জড়ের উপাসনা নহে, ভোগের বৃদ্ধিই বাস্তবিক জড়ের উপাসনা। দেহের বিন্যাস, নব নব ভোগসুখের আবিষ্কার, ক্ষণিক ঐশ্বর্য্যের গৌরব, ইহাই জড়োপাসনা। যে জাতির প্রাণ জড়ে লিপ্ত, সে জাতি অসাধারণ ক্ষমতাশালী হইলেও তাহার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। যে জাতির প্রাণ ধর্ম্মগত, সেই জাতির বিনাশ নাই। ভারতবর্ষ ইহার দৃষ্টান্ত। ভারতবাসীর নানাদিকে নানারূপ পতন হইয়াছে, দুরবস্থার সীমা নাই, কিন্তু ধর্ম্মের মূল এ দেশ হইতে কখন উৎপাটিত হয় নাই। বিকার বহুবিধ হইয়াছে, অপধর্ম্ম প্রবল হইয়াছে, কিন্তু ধর্ম্মমূল কখন বিনষ্ট হয় নাই। এই পরাধীন, পদ-দলিত জাতির এই বিশেষত্ব আছে। প্রাণশূন্য, আশাশূন্য, উদ্যমশূন্য, ভগ্নমেরুদণ্ড ভারতবাসী অনেকের চক্ষে ঘৃণা ও অনুকম্পার পাত্র। ধর্ম্মে কুসংস্কার প্রবেশ করিয়াছে, সমাজে নীচতা, শঠতা প্রবল, বিশ্বাস অন্ধ, সৎসাহসের অভাব, এইরূপ অসংখ্য দোষ জন্মিয়াছে। রাজনৈতিক, সামাজিক, কোনপ্রকার প্রকৃত উদ্যম আমাদের দেশে বহুদিন হইতে নাই। কিন্তু ধর্ম্মক্ষেত্রে এরূপ আলস্য বা অবনতি দেখিতে পাইবে না। এমন শতাব্দী হয় নাই, যাহাতে কোন না কোন মহাপুরুষ, ধর্ম্মবীর জন্মগ্রহণ করেন নাই। যখনই ধর্ম্মভাব শিথিল বা বিকৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছে তখনই কোনও না কোন মহানুভব ধর্ম্মসংস্কারকের আবির্ভাব হইয়াছে। বৌদ্ধ, মুসলমান, খ্রীষ্ট ধর্ম্ম কেহই সনাতন ধর্ম্মের মূল-ছেদন করিতে পারে নাই। যখন কোন নূতন ধর্ম্মের তরঙ্গ আসিয়াছে, তখনই কোনও শক্তিশালী মহাপুরুষ সেই তরঙ্গ রোধ করিয়াছেন। সমগ্র জাতি ভোগ-সুখ-নিরত হইয়া কোন কালে জড়ান্ধ হয় নাই। ত্যাগের আদর্শ সর্ব্বদা জাগ্রত রহিয়াছে। সংসারে অনাস্থা, ভোগবিলাসে অনাস্থা, কামিনী-কাঞ্চনে বিরক্তি কোনকালে এ দেশ হইতে লুপ্ত হয় নাই। জাতীয় দীর্ঘ-জীবনের ইহাই একমাত্র কারণ। ধর্ম্ম যত দিন আছে, ততদিন সকল আশাই আছে। জাতীয় জীবন যতদিন ধর্ম্ম-প্রধান, ততদিন বিনাশের আশঙ্কা নাই। এই মহাবাক্য যেদিন আমরা বিস্মৃত হইব, সেইদিন হইতে আমাদের প্রকৃত বিনাশের সূত্রপাত আরম্ভ হইবে। ঐশ্বর্য্যবিভবের, বিপুল সসাগরা সাম্রাজ্যের কামনা যেন আমরা কখন না করি, জড়ের জন্য যেন লালায়িত না হই। ত্যাগের জন্য যেন আমরা প্রার্থনা করি, মরণাতীত সত্যের প্রতি দৃষ্টি যেন স্থির রাখি। ক্ষীণ বায়ুমর্ম্মরের তুল্য এই যে দেশব্যাপী চাঞ্চল্য লক্ষিত হইতেছে, ইহা সনাতন সত্যের বিকাশ, আশাপ্রদ, শঙ্কাজনক নহে।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী

স্বামী প্রভানন্দ

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী একটি বিশেষ দিন। অবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেবের লীলাবিলাসের একটি চিহ্নিত দিন, 'সেই একই অবতার যেন ডুব দিয়ে এখানে উঠে কৃষ্ণ হলেন, ওখানে উঠে যীশু হলেন', ইদানীং তিনিই রামকৃষ্ণ হয়েছেন। আর সকল অবতারেই সেই এক ভগবান। অবতার জগদ্গুরু, অবতার আসেন তারণ করতে। অবতার-শরীরে দেব- ও মানুষভাবের অদ্ভুত সম্মিলন। প্রায়ই অবতারপুরুষের শরীর-মনের বাঁধ অতিক্রম করে তাঁর অমানুষী দৈবী-শক্তির স্ফুরণ ঘটে। আলোচ্য দিনটিতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর দৈবীশক্তি অসাধারণ-ভাবে অনাবৃত করে ভক্তগণকে অকৃপণহস্তে কৃপা করেছিলেন, তাঁর দয়াঘনস্বরূপ প্রকট করেছিলেন। স্বামী সারদানন্দ মন্তব্য করেছেন, "ঐরূপ উচ্চাবস্থায়···'বিশ্বব্যাপী আমি' বা শ্রীশ্রীজগন্মাতার আমিত্বই ঠাকুরের ভিতর দিয়া প্রকাশিত হইয়া নিজানুগ্রহসমর্থ গুরুরূপে প্রতিভাত হইত।···তখন কল্পতরুর মত হইয়া তিনি ভক্তকে জিজ্ঞাসা করিতেন, 'তুই কি চাস?'—যেন ভক্ত যাহা চাহেন তাহা তৎক্ষণাৎ আমানুষী শক্তিবলে পূরণ করিতে বসিয়াছেন! দক্ষিণেশ্বরে বিশেষ বিশেষ ভক্তদিগকে কৃপা করিবার জন্য ঐরূপ ভাবাপন্ন হইতে ঠাকুরকে আমরা নিত্য দেখিয়াছি; আর দেখিয়াছি ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারীতে।"[১]

সেদিন ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু ঠাকুর পুরাণ-প্রসিদ্ধ কল্পতরুর ন্যায় ভক্তদের অপূর্ণ বাসনা পূরণ করেছিলেন। তিনি তাঁর 'অহেতুক কৃপাসিন্ধু' নাম সার্থক করে ভক্তজনকে অকাতরে প্রেম বিলিয়েছিলেন। সেদিন ছিল তাঁর 'পূর্বকথিত প্রেমভাণ্ড ভঙ্গ করিবার দিন', সেদিনকার বিশেষ লীলানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে লীলাময় ভগবান তাঁর 'লীলারহস্য পরিসমাপ্ত' করেছিলেন। ভক্তপ্রিয় ভগবানের কল্পতরু-রূপটি ভক্তজনের বিশেষ প্রিয়। সেইকারণে দিনটির নামকরণ হয়েছে 'কল্পতরুদিবস।'[২]

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্ত্যলীলার অন্যতম প্রত্যক্ষদর্শী আলোচ্য দিনটি সম্বন্ধে লিখেছেন:

প্রভুর প্রতিজ্ঞা ছিল শুন বিবরণ।
হাটেতে ভাঙ্গিব হাঁড়ি যাইব যখন।
সেই হাঁড়ি-ভাঙ্গা রঙ্গ আজিকার দিনে॥[৩]

অচিন গাছের মত অবতারকে জনকয়েক গুণধর ব্যক্তি ভিন্ন অপরে চিনতে জানতে পারে না। কিন্তু তিনি যখন দয়াপরবশ হয়ে তাঁর দয়াঘনস্বরূপটি সর্বজনসমক্ষে তুলে ধরেন, তখন আর কারোরই দ্বিধা সংশয় থাকে না। আলোচ্য দিনটিতে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছিলেন। তিনি প্রকাশ্যে তাঁর আত্মপরিচয় প্রদান করেছিলেন, তাঁর

১। স্বামী সারদানন্দ: শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, গুরুভাব, পূর্বার্ধ, পৃঃ ১১৭-১৮

২। ইহা রামচন্দ্র দত্ত প্রমুখ ভক্তগণের অভিমত। (রামচন্দ্র দত্ত: শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত, সপ্তম সংস্করণ, পৃঃ ১১৬ দ্রষ্টব্য।)

৩। অক্ষয়কুমার সেন: শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি, পঞ্চম সংস্করণ, পৃঃ ৬১৩

অমানুষী দিব্যশক্তি দেহমনের সঙ্কীর্ণতা অতিক্রম করে উপছিয়ে পড়েছিল। অবতারের আত্মপ্রকাশলীলা বা হাঁড়িভাঙা রঙ্গ অনুষ্ঠিত হয়েছিল বলে এই দিনটির লীলা-ঐশ্বর্য ভক্তগণকে সর্বদা আকৃষ্ট করে।

এই ধরনের বিভুবিলাসে যে চিচ্ছক্তির স্ফুরণ ঘটে তার সংস্পর্শে চৈতন্যোদয় হয়, চৈতন্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে স্বরূপানন্দ উপস্থিত হয়। আলোচ্য দিনে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর দিব্যস্পর্শ বা শুধুমাত্র ইচ্ছাশক্তির দ্বারা উপস্থিত ভক্তদের চৈতন্য উদ্দীপ্ত করেছিলেন, তাঁদের হৃদয়ে পরমানন্দ ঢেলে দিয়েছিলেন। 'সুহৃদং সর্বভূতানাম্'[৪]—তিনি বিশ্বজনের কল্যাণাকাঙ্ক্ষী। তিনি পৌরাণিক কল্পতরুর মত ভালমন্দ-নির্বিচারে প্রার্থীর সব প্রার্থনা মঞ্জুর করেন না, হিতাকাঙ্ক্ষী সুহৃদের মত তিনি শুধুমাত্র কল্যাণ সম্পাদন করেন। আলোচ্য দিনে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সর্বব্যাপী কল্যাণশক্তি সর্বসমক্ষে প্রদর্শন করেছিলেন, মানুষ-সত্তায় অনুস্যূত দেবত্বকে উদ্বোধিত করে আশ্রিতজনকে নিঃশ্রেয়স-কল্যাণের পথে অগ্রসর হতে সর্বপ্রকারে অভয় দান করেছিলেন। সেইকারণে রামকৃষ্ণ-জীবনীর ভাষ্যকার স্বামী সারদানন্দ সেদিনকার ঘটনার মধ্যে আবিষ্কার করেন, "ঠাকুরের অভয়প্রকাশ[৫] অথবা আত্মপ্রকাশপূর্বক সকলকে অভয়প্রদান।"[৬]

দেবত্ব ও মানবত্বের সংমিশ্রণে অবতারের জীবন। অসাধারণত্ব ও অলৌকিকত্ব মিশানো থাকায় অবতার-জীবনের ঘটনা অনেক সময়েই রহস্যাবৃত। আপাত-ব্যাপারের ন্যায় সে-সকল ঘটনার তাৎপর্য সব সময়ে যুক্তির নিক্তিতে তৌল করা যায় না, ঘটনার কার্য-কারণ বুদ্ধির দর্পণে ধরা পড়ে না। কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শীর অনুভবের স্পষ্টতা ও তীব্রতা ঘটনার সত্যতা অস্বীকার করতে দেয় না। তা ছাড়াও অনুভবকারীর পশ্চাদনুগ অভিজ্ঞতা ও অনুস্মরণের প্রভা ঘটনাকে অবিস্মরণীয় করে তোলে। ইংরেজী বছর পয়লাতে ঘটনায় উপস্থিত ব্যক্তিদের প্রত্যক্ষ ও সংগৃহীত সাক্ষ্য অনুসরণ করে আমরা অভূতপূর্ব আপাত-ব্যাপারটির রসাস্বাদনের চেষ্টা করব।

পটভূমিকায় দেখা যায় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর গলরোগের চিকিৎসার জন্য কলকাতায় শ্যামপুকুরে একটি ভাড়াবাড়ীতে বাস করছিলেন। কিছুদিনের মত বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ ঘোষণা করেন, গলরোগ দুরারোগ্য কর্কট-রোগ। স্বরভঙ্গের লক্ষণ দেখা দেয়, শরীর

৪। গীতা, ৫।২৯

৫। স্বামী সারদানন্দের মতে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ কৃপাপ্রার্থীর নিকট শুধুমাত্র নিগ্রহানুগ্রহসমর্থ ঈশ্বরাবতাররূপে উপস্থিত হননি। তিনি বলেন, "...তাঁহাদের (ঈশ্বরাবতারদের) অনুভবাদি প্রত্যেক মানবের মহামূল্য জীবনাধিকারসম্পত্তি বলিয়া নির্ধারণ করিলে তাঁহাদিগকে বিশেষরূপে আপনার করিয়া মানবকে আশা ভরসা ও বিশেষ-শক্তিসম্পন্ন করে। তাঁহাদের উচ্চগতি দেখিয়া মানব আপনার উচ্চগতিতে বিশ্বাসবান হয় এবং সেও সেই বংশপ্রসূত, অতএব সকল ধনের অধিকারী বলিয়া আত্মনিহিত শক্তিতে নির্ভর করিয়া দাঁড়াইতে শিখে।" (উদ্বোধন, ৫ম বর্ষ, ২১ সংখ্যা, পৃঃ ৬৫৬—৫৭)। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ঐ দিনে ভক্তগণের অন্তর্নিহিত শক্তির উদ্বোধন করে তাদের কল্যাণমার্গে অগ্রসর করিয়ে দিয়েছিলেন।

৬। লীলাপ্রসঙ্গ, দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ, পৃঃ ৩৯৬

অতিশয় জীর্ণ-শীর্ণ হয়ে পড়ে। চিকিৎসকগণের পরামর্শে দ্বিতীয়বার স্থানপরিবর্তনের সিদ্ধান্ত করা হয়। ঠাকুরের অনুমতি নিয়ে ৯০ নং কাশীপুর রোড ঠিকানায় প্রায় চৌদ্দ বিঘা জমির উপর একটি বাগানবাড়ী ভাড়া নেওয়া হয়। অগ্রহায়ণ মাসের সংক্রান্তির একদিন পূর্বে (১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ১১ই ডিসেম্বর) অপরাহ্ণে ঠাকুর কাশীপুর উদ্যানবাটীতে এসে বাস করতে থাকেন।

"...নিরন্তর চারি মাস কাল কলিকাতা-বাসের পর ঠাকুরের নিকট উহা রমণীয় বলিয়া বোধ হইয়াছিল। উদ্যানের মুক্ত বায়ুতে প্রবিষ্ট হইবামাত্র তিনি প্রফুল্ল হইয়া উহার চারিদিক লক্ষ্য করিতে করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। আবার দ্বিতলে তাঁহার বাসের জন্য নির্দিষ্ট প্রশস্ত ঘরখানিতে প্রবেশ করিয়াই প্রথমে তিনি উহার দক্ষিণে অবস্থিত ছাদে উপস্থিত হইয়া ঐস্থান হইতেও কিছুক্ষণ উদ্যানের শোভা নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন।"[৭]

নূতন পরিবেশে ঠাকুরের স্বাস্থ্যের কিঞ্চিৎ উন্নতি দেখা গেল। "কাশীপুরে আসিবার কয়েকদিন মধ্যেই ঠাকুর একদিন উপর হইতে নীচে নামিয়া বাটীর চতুঃপার্শ্বস্থ উদ্যানপথে অল্পক্ষণ পাদচারণ করিয়াছিলেন।...ভক্তগণ উহাতে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিল। কিন্তু... ঠাণ্ডা লাগিয়া বা অন্যকারণে পরদিন অধিকতর দুর্বল বোধ করায় কিছুদিন পর্যন্ত আর ঐরূপ করিতে পারেন নাই। শৈত্যের ভাবটা দুই-তিন দিনেই কাটিয়া যাইল,...উহা (কচি পাঁঠার মাংসের সুরুয়া) ব্যবহারে কয়েক-দিনেই...দুর্বলতা অনেকটা হ্রাস হইয়া তিনি পূর্বাপেক্ষা সুস্থ বোধ করিয়াছিলেন। ঐরূপে এখানে আসিয়া কিঞ্চিদধিক একপক্ষকাল পর্যন্ত তাঁহার স্বাস্থ্যের উন্নতি হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। ডাক্তার মহেন্দ্রলালও—ঐ বিষয় লক্ষ্য করিয়া হর্ষ প্রকাশ করিয়াছিলেন।"[৮]

কাশীপুর এসে ঠাকুর চার-পাঁচ দিন পরে একবার বাগানে পায়চারি করেছিলেন, তারপর প্রায় পনোরো দিন উদ্যানবাড়ীর দোতলায় আবদ্ধ থাকেন।[৯] ইতিমধ্যে চিকিৎসার না হলেও চিকিৎসকের কিছু পরিবর্তন ঘটেছিল। "কলিকাতার বহুবাজার পল্লীবাসী......রাজেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার আলোচনায় ও উহা শহরে প্রচলনে ইতিপূর্বে যথেষ্ট পরিশ্রম ও অর্থব্যয় স্বীকার করিয়াছিলেন।...মহেন্দ্রলাল সরকার উহার সহিত মিলিত হইয়াই...ঐ প্রণালী অবলম্বনে চিকিৎসায় অগ্রসর হইয়াছিলেন।... রাজেন্দ্রবাবু ঠাকুরকে দেখিতে আসেন এবং...লাইকোপোডিয়াম্ (২০০) প্রয়োগ করেন। ঠাকুর উহাতে এক পক্ষেরও অধিককাল বিশেষ উপকার অনুভব

৭। লীলাপ্রসঙ্গ, দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ, পৃঃ ৩৮০

৮। ঐ, পৃঃ ৩৮৬

৯। লীলাপ্রসঙ্গ, গুরুভাব, পূর্বার্দ্ধ, পৃঃ ১১৮ উল্লেখ আছে, "ঠাকুর কিন্তু এখানে (কাশীপুরে) আসা অবধি বাটীর দ্বিতল হইতে একদিন একবারও নীচের তলে নামেন নাই বা বাগানে বেড়াইয়া বেড়ান নাই। আজ (১লা জানুয়ারী, ১৮৮৬) শরীর অনেকটা ভাল থাকায় অপরাহ্ণে বাগানে বেড়াইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।" আবার লীলাপ্রসঙ্গ, দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ খণ্ডে ৩৮৬ ও ৩৯২ পৃষ্ঠায় দুবার উল্লেখ পাই যে, ঠাকুর কাশীপুর বাগানে আসার কয়েকদিন পরে, সম্ভবতঃ ১৫।১৬ই ডিসেম্বর একদিন বাগানে পায়চারি করেন। আমরা সারদানন্দজীর দ্বিতীয় মত যুক্তিগ্রাহ্য বলে গ্রহণ করেছি।

করিয়াছিলেন। ভক্তগণের উহাতে মনে হইয়াছিল, তিনি বোধ হয় এইবার অল্পদিনেই পূর্বের ন্যায় সুস্থ ও সবল হইয়া উঠিবেন।"[১০]

এইসময়ে একদিন[১১] ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, "এই অসুখ হওয়াতে কে অন্তরঙ্গ, কে বহিরঙ্গ বোঝা যাচ্ছে। যারা সংসার ছেড়ে এখানে আছে তারা অন্তরঙ্গ।" এভাবে অন্তরঙ্গ বাছাই হতে থাকে, সেইসঙ্গে নীরবে নিভৃতে তাঁদের বিশেষ শিক্ষা দীক্ষা সাধন ভজন চলতে থাকে। ঠাকুর বলতেন, "ভক্ত এখানে যারা আসে—দুই থাক্। এক থাক্ বলছে, 'আমায় উদ্ধার কর, হে ঈশ্বর!' আর এক থাক্, তারা অন্তরঙ্গ; তারা ওকথা বলে না। তাদের দুটি জিনিষ জানলেই হল; প্রথম আমি (শ্রীরামকৃষ্ণ) কে! তারপর তারা কে—আমার সঙ্গে সম্বন্ধ কি?"[১২] অন্তরঙ্গ ভক্তদের এই জানাজানির প্রচেষ্টায়, তাঁদের অন্তরের অনুরাগের অভিব্যক্তিতে কাশীপুরের দিনগুলি সমুজ্জ্বল। 'শ্রীম' ঠাকুরকে বলেন, "পাঁচ বছরের তপস্যা করে যা না হতো, এই কয় দিনে ভক্তদের তা হয়েছে। সাধনা, প্রেম, ভক্তি।"[১৩] কিন্তু তাঁদের ধ্যান ভজন পাঠ সদালাপ শাস্ত্রচর্চাদি ছিল গৌণ, তাঁদের মুখ্য লক্ষ্য প্রাণপ্রতিম ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সেবা-শুশ্রূষা। অন্তরঙ্গদের মধ্যে প্রায় বার জন যুবক ঘর সংসার ভুলে নরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে দৃঢ় নিষ্ঠার সঙ্গে ঠাকুরের সেবাযত্নে মন প্রাণ ঢেলে দেন। তাঁদের সেই সময়কার মনের ছবিটি দেখতে পাওয়া যায় বীর ভক্ত নিরঞ্জনের উক্তিতে। তিনি বলেন, "আগে, (ঠাকুরের প্রতি) ভালবাসা ছিল বটে,—কিন্তু এখন ছেড়ে থাকতে পারবার জো নাই।"[১৩ক] গৃহী ভক্তগণও নিষ্ক্রিয় ছিলেন না। ঠাকুরের চিকিৎসা ও সেবাশুশ্রূষার যাবতীয় অর্থব্যয়ের দায়িত্ব তাঁরা গ্রহণ করেন, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সেবাকাজে সাহায্য করতে থাকেন। পথ্য প্রস্তুত করা ইত্যাদির দায়িত্ব নেন শ্রীমাতাঠাকুরানী। তাঁকে সাহায্য করেন লক্ষ্মীদেবী ও অন্যান্য স্ত্রীভক্তগণ। এইভাবে ঠাকুরের কালব্যাধির চিকিৎসা ও সেবাযত্নের সুব্যবস্থা হওয়াতে ঠাকুর কিছুটা সুস্থ ও সবল বোধ করেন, চিকিৎসক ও ভক্তগণের মনে আশার আলো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

শ্রীরামকৃষ্ণের পূর্বে ঘোষিত অন্ত্যলীলার লক্ষণগুলি, যেমন ঠাকুরের কলকাতায় রাত্রিবাস, যার-তার হাতে আহার করা, অপরকে প্রদত্ত আহারের শেষাংশ-গ্রহণ, শুধুমাত্র পায়েস খেয়ে থাকা ইত্যাদি লীলাবসানের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত করছিল। কিন্তু অপ্রিয় রূঢ় বাস্তবকে মন মানতে চায় না। সমাগত দিনমণির অবসান ভুলে মানুষ দিনমণির অস্তরাগের রূপ দেখে মুগ্ধ হয়। তেমনি অবতারপুরুষের অন্ত্যলীলায় চিৎশক্তির ঐশ্বর্য, আনন্দ-প্রভার বিচ্ছুরণ ভক্তগণকে বিস্মিত করে মুগ্ধ করে রাখে।

কালব্যাধিতে ঠাকুরের সুঠাম দেহের দ্রুত অবক্ষয় চিকিৎসক ও সেবক ভক্তগণের চিন্তার কারণ হয়। কিন্তু আনন্দপুরুষ ঠাকুরের সেদিকে বিশেষ কোন লক্ষ্য ছিল না। "এই নিদারুণ রোগের যন্ত্রণা তিনি হাস্যাননে সহ্য করিতেন। একদিনও বিমর্ষ অথবা চিন্তিত

১০। লীলাপ্রসঙ্গ, দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ, ৩৯২-৯৩
১১। ২৩শে ডিসেম্বর, ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ
১২। শ্রীম কৃ, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৪।১৪।১
১৩, ১৩ক। কথামৃত, ৪।৩১।১

হন নাই। যখনই যে গিয়াছে, তাহারই সহিত ঐশ্বরিক বাক্যালাপ করিয়াছেন। লোকে ব্যাধির বিভীষিকা দেখাইলে তিনি হাসিয়া উঠিতেন এবং বলিতেন, 'দেহ জানে, দুঃখ জানে, মন তুমি আনন্দে থাক।'"[১৪] জলভারে চঞ্চল মেঘমালার ন্যায় করুণার দায়ে ভারগ্রস্ত ঠাকুর মানুষকে ত্রিতাপ, সন্তাপ থেকে শান্তি দেবার জন্য সদা ব্যগ্র। তাঁকে দেখে স্বতঃই মনে হত একমাত্র "বহুজনহিতায় বহুজন-সুখায়"[১৫] তাঁর জীবনধারণ। কথামৃতকার ঠাকুরের এই সময়কার মনোভাবটি তুলে ধরেছেন। তিনি লিখেছেন, "(ঠাকুরের) এতো অসুখ—কিন্তু এক চিন্তা—কিসে ভক্তদের মঙ্গল হয়। নিশিদিন কোন-না-কোন ভক্তের বিষয় চিন্তা করিতেছেন।"

অবতারের স্বরূপ অধিকাংশের নিকট অপরিজ্ঞাত থাকে। ঠাকুর নিজেই বলতেন, "তারে কেউ চিনলি না রে! ও সে পাগলের বেশে (দীনহীন কাঙালের বেশে) ফিরছে জীবের ঘরে ঘরে।"[১৬] কিন্তু কাশীপুর উদ্যানে অবতারপুরুষ যে প্রেমের হাট বসান, তার রসমাধুর্য আস্বাদন করতে কারোরই অসুবিধা হয় না। ঠাকুর অকাতরে প্রেমদান করতে থাকেন, কৃপাস্পর্শে ভক্তদের চৈতন্যবান করতে থাকেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ২৩শে ডিসেম্বরের বিবরণীতে কথামৃতকার লিখেছেন, "আজ সকালে প্রেমের ছড়াছড়ি। নিরঞ্জনকে বলছেন, 'তুই আমার বাপ, তোর কোলে বসব।' কালীপদর[১৭] বক্ষ স্পর্শ করিয়া বলিতেছেন, 'চৈতন্য হও' আর চিবুক ধরিয়া আদর করিতেছেন। আর বলিতেছেন, 'যে আন্তরিক ঈশ্বরকে ডেকেছে বা সন্ধ্যা আহ্নিক করেছে, তার এখানে আসতেই হবে।' আজ সকালে দুইটি ভক্ত স্ত্রীলোকের উপরেও কৃপা করিয়াছেন। সমাধিস্থ হইয়া তাহাদের বক্ষ চরণ দ্বারা স্পর্শ করিয়াছেন। তাঁহারা অশ্রু-বিসর্জন করিতে লাগিলেন; একজন কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, 'আপনার এত দয়া!' প্রেমের ছড়াছড়ি। সিঁথির গোপালকে[১৮] কৃপা করিবেন বলিয়া বলিতেছেন, 'গোপালকে ডেকে আন।'" সেদিনই সন্ধ্যাবেলা ঠাকুর বলছেন, "লোকশিক্ষা বন্ধ হচ্ছে—আর বলতে পারি না। সব রামময় দেখছি।" সমাধি-ভঙ্গের পর বলেন, "দেখলাম সাকার থেকে সব নিরাকারে যাচ্ছে।...এখনও দেখছি নিরাকার অখণ্ড সচ্চিদানন্দ এই রকম করে রয়েছে।..."

ঊর্জিতা প্রেমভক্তির উচ্ছ্বাসে চতুর্দিকে প্লাবন। প্রেমদাতা শ্রীরামকৃষ্ণ প্রেমবিতরণের জন্য ব্যাকুল। প্রেমবিতরণ যেন তাঁর এক বিষম দায়। তিনি আপনমনে গাইতেন,

এসে পড়েছি যে দায়, সে দায় বলব কায়।
যার দায় সে আপনি জানে, পর কি জানে
পরের দায়।

১৪। রামচন্দ্র দত্ত : শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত, পৃঃ ১৭৪

১৫। মহাবস্তু অবদানম্, Sanskrit College, Calcutta, Vol. II, p. 193

১৬। কথামৃত ৩।১২।৩

১৭। কালীপদ ঘোষ কাগজ-বিক্রেতা জন ডিকিন্সন কোম্পানীতে কাজ করতেন। তাঁর বুদ্ধিমত্তা ও কর্মদক্ষতার ফলে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হন। রামকৃষ্ণ-পরশমণি তাঁর জীবনকে স্বর্ণখণ্ডে পরিণত করেছিল। ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে গিরিশচন্দ্র ও কালীপদ নবযুগের জগাই-মাধাই বলে পরিচিত ছিলেন।

১৮। পরবর্তীকালে ইনিই স্বামী অদ্বৈতানন্দ নামে পরিচিত হন।

হয়ে বিদেশিনী নারী, লাজে মুখ
দেখাতে নারি,
বলতে নারি, কইতে নারি, নারী হওয়া
একি দায় ॥[১৯]

তিনি দক্ষিণেশ্বরে কুঠীবাড়ীর উপর থেকে আরতির সময় ব্যাকুলভাবে ডাকতেন, 'ওরে, কে কোথায় ভক্ত আছিস্ আয়।' শুদ্ধ ভক্ত নিয়ে আসার জন্য জগজ্জননীর কাছে বারংবার প্রার্থনা জানাতেন। একদিন যুবক ভক্ত লাটু খতিয়ে দেখেন মাত্র একত্রিশ জন যোগ্য পাত্র জুটেছেন। শুনে প্রেমদাতা শ্রীরামকৃষ্ণ যেন অনুযোগ করে বলেন, "কৈ, তেমন বেশী কৈ?"[২০] 'প্রেমপাথার' শ্রীরামকৃষ্ণের একটি চিত্র অঙ্কন করেছেন ভক্ত গিরিশচন্দ্র। তিনি বলেন, "একদিন পরমহংসদেবের নিকট যাইয়া দেখি তিনি ঝর্ ঝর্ করিয়া কাঁদিতেছেন ও বলিতেছেন, নিতাই আমার হেঁটে হেঁটে ঘরে ঘরে প্রেম দিয়েছিলেন, আমি কি না গাড়ী না হলে চলতে পারি না। আর একসময়ে বলেছিলেন, আমি সাত খেয়েও পরের উপকার করব।"[২১] মানুষকে প্রেমভক্তি শিখাবার জন্য ঈশ্বর মানুষ হয়ে, অবতার হয়ে আসেন, তাছাড়া "অবতারের ভিতরেই তাঁর প্রেমভক্তি আস্বাদন করা যায়।" ভগবৎ-প্রেম-আস্বাদনের একটি বিশেষ দিন ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী।

সেদিন শুক্রবার, ১৮ই পৌষ, কৃষ্ণা একাদশী তিথি। নির্মল আকাশ, শীতের সূর্য প্রীতি বিকিরণ করছে, অনেকদিন পর ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আজ বেশ সুস্থ ও প্রফুল্ল বোধ করছিলেন। অবতার-গোমুখ হতে যে করুণাগঙ্গা নিরত ক্ষরিত হচ্ছিল আজ সকাল বেলাতেই তা শতধারায় ঝরতে থাকে। ভক্তবৎসল শ্রীরামকৃষ্ণের করুণাঘন কৃপামূর্তি ভক্তগণকে কৃপা করার জন্য উদ্‌গ্রীব।

নববর্ষে অপরূপ রূপে পরমেশ।
ভবনে বিরাজমান কল্পতরুবেশ ॥[২২]

"পূর্ব সপ্তাহে তাঁহার কোন সেবক হরিশ মুস্তফীর[২৩] পরিত্রাণের জন্য পরমহংসদেবের নিকটে প্রার্থনা করিয়াছিলেন। সে দিবস তিনি কোন উত্তর দেন নাই। ১লা জানুয়ারীর দিন হরিশবাবু পরমহংসদেবের নিকটে গমন করিবামাত্র তাঁহাকে কৃতার্থ করেন, হরিশ আনন্দে উন্মত্তের ন্যায় অশ্রুপূর্ণলোচনে নিয়ে আসিয়া উপরোক্ত সেবককে কহিলেন, 'ভাই রে, আমার আনন্দ যে ধরে না! একি ব্যাপার! জীবনে এমন ঘটনা একদিনও দেখি নাই।' সেবকেরও চক্ষে জল আসিল। তিনি কহিলেন, 'ভাই, প্রভুর অপূর্ব মহিমা।'"[২৪]

শুধু যে হরিশ বিস্মিত হয় তা নয়, উপস্থিত ভক্তগণ হরিশের হরিষ দেখে মুগ্ধ হন।

১৯। পুঁথি, পৃঃ ৩২১
২০। কথামৃত, ২।৪।২
২১। Minutes of the 14th meeting of the Ramkrishna Mission held on 25.7.1897
২২। পুঁথি, পৃঃ ৬১৩
২৩। ইনি দেবেন্দ্রনাথ মজুমদারের মাতুল। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, মানুষ যারা জ্যান্তে মরা যেমন হরিশ। ইনি জাতিতে তিলি, বৃত্তিতে ব্যায়ামশিক্ষক, বাড়ী কলকাতার গড়পার। আকৃতি লৌহসদৃশ, প্রকৃতি ছিল অতি কোমল।
২৪। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত, পৃঃ ১৭৪-৭৫

"উথলিত কৃপাসিন্ধু প্রভুর এখন।" তিনি কৃপা দান করতে উন্মুখ। তিনি দেবেন্দ্রনাথ মজুমদারকে ডেকে পাঠালেন। তিনি তখন রামদত্ত প্রভৃতি ভক্তগণের সঙ্গে বাড়ীর নীচে হলঘরে সদালাপ করছিলেন। কিছুক্ষণ পরে দেবেন্দ্র ঠাকুরের ঘর থেকে ফিরে এসে উপস্থিত ভক্তগণকে জানালেন, "পরমহংসদেব আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'রাম যে আমায় অবতার বলে, একথা তোমরা স্থির কর দেখি। কেশবকে তাঁহার শিষ্যরা অবতার বলিত।'" "একথার অর্থ কেহ বুঝিতে নারিল। কথার সুগূঢ় মর্ম কথায় রহিল॥"

বছর ১লা ছুটির দিন। ঠাকুর দুপুরে আহারের পর সামান্য বিশ্রাম করে উঠেছেন। একে একে বেশ কয়েকজন ভক্ত বাগানবাড়ীতে উপস্থিত হয়। মধ্যাহ্নের পর উপস্থিতের সংখ্যা ত্রিশ ছাড়িয়ে যায়। ভক্তেরা দলে দলে ভাগ হয়ে নীচে হলঘরে বসেছিলেন, উদ্যান-প্রাঙ্গণে শীতের মিঠে রোদ উপভোগ করছিলেন, বা গাছের ছায়ায় বসে ঠাকুরের লীলামৃত আলোচনা করছিলেন। উপস্থিত ব্যক্তিদের কয়েক জনের নাম লীলাপ্রসঙ্গকার উল্লেখ করেছেন: "গিরিশ, অতুল, রাম, নবগোপাল, হরমোহন, বৈকুণ্ঠ, কিশোরী (রায়), হারাণ, রামলাল, অক্ষয়, 'কথামৃত'-লেখক মহেন্দ্রনাথও বোধ হয় উপস্থিত ছিলেন।" পুঁথিকার এঁদের অতিরিক্ত উপেন্দ্রনাথ মজুমদার ও রাঁধুনি ব্রাহ্মণ 'গাঙ্গুলি'র উল্লেখ করেছেন। এছাড়াও স্বামী অভেদানন্দ[২৫], ভাই ভূপতি ও উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের এবং স্বামী অদ্ভুতানন্দ[২৬], 'হরিশ ভাইয়ের' উপস্থিতি উল্লেখ করেছেন। এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, ঠাকুরের ভক্তদের মধ্যে যাঁরা আজীবন ত্যাগব্রত অবলম্বন করেছিলেন সে-সকল অন্তরঙ্গ ভক্তদের কেউ সেদিনকার ঘটনায় প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করেননি। আবার ত্যাগী বা গৃহী কোনও স্ত্রীভক্ত সেখানে উপস্থিত ছিলেন বলে জানা যায় না। তাছাড়াও দেখা যায় যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা প্রত্যেকে ঠাকুরের নিকট সুপরিচিত; রবাহূত বা সদ্যপরিচিত কাউকে দেখা যায় না।

তখন বেলা প্রায় তিনটা। ঠাকুর রামলালকে ডেকে বললেন, "দেখ্ রামলাল, আজ ভাল আছি বলে মনে হচ্ছে, তা চল্ একটু নীচে বেরিয়ে আসি।"[২৭] ঠাকুরের পরণে ছিল একটি লালপেড়ে ধুতি, একটি সবুজ রংয়ের পিরাণ, লালপাড় বসানো একখানি মোটা চাদর, সবুজ-রংয়ের কানঢাকা টুপি, পায়ে মোজা ও ফুল-লতা-আঁকা চটিজুতা, হাতে একটি ছড়ি। রামলাল তাড়াতাড়ি একখানি চাদর গায়ে জড়িয়ে নেন। তিনি এক হাতে গামছা গাড়ু নিয়ে ঠাকুরকে ধরে উপর থেকে নীচতলায় নিয়ে আসেন।[২৮] ঠাকুর নীচের হলঘরটি ভাল করে দেখেন। নরেন্দ্র ও অন্যান্য কয়েকজন যুবকভক্ত গতরাত্রিতে ঠাকুরের সেবা অথবা সাধনভজনের জন্য রাত্রি-জাগরণে ক্লান্ত থাকায় হলঘরের পাশে ছোট ঘরে ঘুমোচ্ছিলেন। ঠাকুর হলঘরের

২৫। স্বামী অভেদানন্দ: আমার জীবনকথা, পৃঃ ৮৪

২৬। চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়: শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতিকথা, পৃঃ ২৫২

২৭। কমলকৃষ্ণ মিত্র: শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও অন্তরঙ্গপ্রসঙ্গ (রামলালদাদার স্মৃতি থেকে সংগৃহীত), পৃঃ ৩৫; লাটু মহারাজের স্মৃতিকথাতে (পৃঃ ২৫২) পাই, "তিনি রামলালদাদার সঙ্গে উপর থেকে নেমে বাগানে বেড়াতে গেলেন।"

২৮। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও অন্তরঙ্গপ্রসঙ্গ, পৃঃ ৩৫

পশ্চিমের দরজা দিয়ে বেরিয়ে সুড়কির রাস্তা ধরে দক্ষিণদিকের ফটকের দিকে ধীর পদক্ষেপে অগ্রসর হন। ঠাকুরকে হঠাৎ নীচে নামতে দেখে কয়েকজন ভক্ত ঠাকুরের পিছু নেন। সেবক লাটু এতক্ষণ পর্যন্ত ঠাকুরের সঙ্গে ছিলেন,[২৯] ভক্তদের অনুসরণ করতে দেখে তিনি ক্ষুদ্র পুষ্করিণীর দক্ষিণপাড় পর্যন্ত এসে ফিরে যান। তিনি অপর এক যুবক ভক্ত শরৎচন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে ঠাকুরের বসবাসের ঘরখানি ঝাঁটপাট দিয়ে পরিষ্কার করেন ও বিছানাপত্র রৌদ্রে দেন।

ঠাকুরকে বেড়াতে দেখে ভক্তদের আজ বিশেষ আনন্দ। কেউ ছুটে এসে তাঁকে প্রণাম করেন, কেউ বা চুপচাপ তাঁকে অনুসরণ করেন। গৃহী ভক্তদের মধ্যে গিরিশচন্দ্রের তখন প্রবল অনুরাগ। তিনি নিজের সম্বন্ধে বলেছেন, "মন তখন আনন্দে পরিপ্লুত। যেন নূতন জীবন পাইয়াছি। পূর্বের সে ব্যক্তি আমি নই—হৃদয়ে বাদানুবাদ নাই। ঈশ্বর সত্য—ঈশ্বর আশ্রয়দাতা—এই মহাপুরুষের আশ্রয়লাভ করিয়াছি, এখন ঈশ্বরলাভ আমার অনায়াসসাধ্য। এইভাবে আচ্ছন্ন হইয়া দিন-যামিনী যায়। শয়নে স্বপনেও এই ভাব,—পরম সাহস—পরমাত্মীয় পাইয়াছি—আমার সংসারে আর কোনও ভয় নাই। মহাভয়—মৃত্যুভয়—তাহাও দূর হইয়াছে।"[৩০] ঠাকুরও তাঁর ভৈরবভক্ত গিরিশ সম্বন্ধে বলতেন, "গিরিশের পাঁচসিকে পাঁচ-আনা বিশ্বাস।" গিরিশ ঠাকুরকে ঈশ্বরের[৩১] অবতারজ্ঞানে ভক্তিশ্রদ্ধা করতেন এবং প্রকাশ্যে তাঁর মহত্ত্ব বলে বেড়াতেন। রামদত্ত, অতুল প্রভৃতি ভক্তদের সঙ্গে গিরিশ পশ্চিমের একটি আম-গাছের তলায় বসে আলাপ করছিলেন। হঠাৎ তাঁদের নজরে পড়ে আনন্দমূর্তি শ্রীরামকৃষ্ণ রাস্তা ধরে ধীরে ধীরে হেঁটে আসছেন। তাঁরা দেখেন,

আজি মনোহর বেশ প্রভুর আমার।
বারেক দেখিলে কভু নহে ভুলিবার॥

শ্রীঅঙ্গের মধ্যে খোলা বদনমণ্ডল।
কান্তিরূপে লাবণ্যেতে করে ঝলমল॥
দারুণ বিয়াধি-ভোগে শীর্ণ কলেবর।
কিন্তু বয়ানেতে কান্তি বহে নিরন্তর॥
মনে হয় অঙ্গবাস সব দিয়া খুলি।
নয়ন ভরিয়া দেখি রূপের পুতুলি [৩২]

(ক্রমশঃ)

২৯। লীলাপ্রসঙ্গ, গুরুভাব, পূর্বার্ধ, পৃঃ ১১৯-২০

৩০। কুমুদবন্ধু সেন: গিরিশচন্দ্র, পৃঃ ১৭০। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত গিরিশ বক্তৃতাবলী।

৩১। রামকৃষ্ণ মিশনের চতুর্দশ অধিবেশনে গিরিশচন্দ্র ভাষণ দেন, "……আমি শাস্ত্রে ঈশ্বর কাহাকে বলে জানি না কিন্তু এই ধারণা ছিল যে, আমি যেমন আমাকে ভালবাসি, তিনি যদি আমাকে সেইরূপ ভালবাসেন তাহা হইলে তিনি ঈশ্বর। তিনি আমাকে আমার মত ভালবাসিতেন। আমি কখনও বন্ধু পাই নাই কিন্তু তিনি আমার পরমবন্ধু, যেহেতু আমার দোষ তিনি গুণে পরিণত করিতেন। তিনি আমার অপেক্ষা আমায় বেশী ভালবাসিতেন।"

৩২। পুঁথি, পৃঃ ৬১৪। উপস্থিত রামচন্দ্র দত্ত লিখেছেন, "সেইদিনকার রূপের কথা স্মরণ হইলে আমরা এখনও আশ্চর্য হইয়া থাকি। তাঁহার সর্বশরীর বস্ত্রাবৃত এবং মস্তকে সবুজ বনাতের কান-ঢাকা টুপি ছিল, কেবল মুখমণ্ডলের জ্যোতিতে দিঙ্‌মণ্ডল আলোকিত হইয়াছিল। মুখের যে অত শোভা হইতে পারে, তাহা কাহারও জানা ছিল না। (সেইরূপ আর একদিন ইতিপূর্বে নবগোপাল ঘোষের বাটীতে সঙ্কীর্তনের সময় দেখা গিয়াছিল)।": পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত, পৃঃ ১৭৫

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতাৎ উদ্ধৃতিঃ

[রামকৃষ্ণ মিশন কলিকাতা বিদ্যার্থী আশ্রম ইত্যাখ্য-প্রতিষ্ঠান-প্রকাশনম্]

ভাবরাজ্যং রূপদর্শনঞ্চ।

সমাধিস্থো দেবতাত্মা—চিরং ভাবাবিষ্টঃ সন্ উপবিশয়াস্তে। ন স্পন্দতে শরীরং, নিশ্চলং চক্ষুঃ, অশক্যবোধো নিঃশ্বাসপাতঃ দেবতাত্মনস্তদানীম্।

অথ ব্যতীতে বহুক্ষণে ইন্দ্রিয়রাজ্যং পুনঃ প্রত্যাগচ্ছন্নিব দীর্ঘনিঃশ্বাসমমুঞ্চদ্ দেবতাত্মা।

শ্রীরামকৃষ্ণঃ (প্রাণকৃষ্ণং প্রতি)—ন কেবলং নিরাকার এব সঃ, অপি তু পুনঃ সাকারোঽপি। দ্রষ্টুং শক্যতে তদ্রূপম্। ভাবভক্তিমহিম্না অতুলনীয়ং তদ্রূপমীক্ষিতুং শক্যম্। বিবিধরূপৈর্দর্শনমর্পয়তি মাতা।

[গৌরাঙ্গদর্শনম্—রক্তিমাতৃবেশেন মাতা]

হ্যো দৃষ্টা মাতা। সীবনরহিতপ্রান্তসীমানং গৈরিকবর্ণমঙ্গাবরণমাদধতী মাতা ময়া সহ ভাষণমকরোৎ।

অথ অন্যস্মিন্নহনি ম্লেচ্ছকন্যারূপিণী মাং নিকষা সমাগতবতী। শিরসা তিলকং বিভ্রতী পুনর্দিগম্বরী। ষড়্ভিঃ সপ্তভির্বা বয়োভিরাক্রান্তা বালিকা ময়া সার্দ্ধং ভ্রমন্তী চাপল্যাদিকমাচরৎ।

যদা হৃদয়স্য ভবনে আসম্—তদা গৌরাঙ্গদর্শনং মে জাতম্—তত্রভবান্ কৃষ্ণপ্রান্তশোভং বসনমাদধান আসীৎ।

হলধারী আহ স্ম—ভাবাভাবয়োরতীতা খলু সা ইতি। অহং পুনর্মাতরমুপগম্য অপৃচ্ছম্—জননি! এবংবাচং ব্রবীতি হলধারী—কিং নু তর্হি রূপাদিকং সর্বং মৃষৈব? রক্তিমাতৃবেশধারিণী মাতা মৎসমীপমুপেত্য প্রাহ—'ত্বং খলু ভাবেনৈব তিষ্ঠে'তি। অহমপি হলধারিণং তদেব উক্তবান্।

কচিৎ পুনরেতদ্বাক্যং বিস্মরামীতি কষ্টং ভোঃ। ভাবৈরনবস্থিতস্য মে দশনানি ভগ্নানি প্রায়ঃ। ততো দৈববাণী প্রত্যক্ষং বা যদি ন ভবেৎ তর্হি ভাবেনৈব স্থাতব্যং—ভক্তিমাদায় স্থাতব্যং ময়া। কিং পুনর্মন্যতে?

প্রাণকৃষ্ণঃ—বাঢ়ম্।

[কথং ভক্ত্যবতারঃ? রামস্য ইচ্ছা]

শ্রীরামকৃষ্ণঃ—কথং বা পুনস্ত্বামেব পৃচ্ছামি? অস্যাভ্যন্তরে কশ্চিদেকস্তিষ্ঠতি। মামাদায় তেনৈবং ক্রিয়তে। কচিদন্তরাঽন্তরা প্রায়ঃ দেবভাবঃ প্রাদুর্ভূতঃ—ন হি সপর্যাং বিনা শান্ততা মে অভবৎ।

অহং যন্ত্রমাত্রম্। যন্ত্রী পুনঃ স এব। স যথা যথা কারয়তি তথৈব করোমি, যথা বা কথয়তি তথা ব্রবীমি চ।

(গানম্) আহ প্রসাদো ভবসাগরেঽস্মিন্
বিস্তার্য্য ভেলাং নিভরাং স্থিতোঽস্মি।
পয়োবিবৃদ্ধৌ বিপরীতগামী
হ্রাসে জলানামনুকূলগন্তা ॥

ঝঞ্ঝাবাতসমুচ্ছিষ্টপত্রং বায়ুরভসা উড্ডীয়মানং কচিদুত্তমে স্থানে বা পততি, কচিৎ পুনঃ পয়ঃপ্রণাল্যাং বা পতেৎ,—যথা বায়ুঃ প্রবহতি তথৈব যাতি পত্রম্।

তন্তুবায়েনোক্তং—রামেচ্ছয়ৈব চৌর্যসাহসমভূৎ, রামেচ্ছানুসারত এবাহমপি নগররক্ষকৈর্বদ্ধঃ, পুনারামেচ্ছয়ৈব বিমুক্তশ্চাহমিতি।

নিবেদিতং হনুমতা—হে রাম! শরণাগতোঽহং, শরণাগতশ্চাস্মি। তথৈবাশিষো মে প্রদীয়ন্তাং যথা তব চরণসরোজে শুদ্ধাভক্তিঃ স্যাৎ। ন পুনরপি যথা ভুবনমোহিন্যা তব মায়য়া বিমুগ্ধো বা স্যামিতি।

ভেকপ্রকাণ্ডো মুমূর্ষুরাহ—ভো রাম! ভুজঙ্গেনাক্রান্তঃ 'রাম! মাং পাহীতি' সকাতরমাক্রন্দামি, সাম্প্রতং রামকার্মুকবিদ্ধো ম্রিয়ে ইতি জোষমাতিষ্ঠামি।

প্রাক্ প্রত্যক্ষদর্শনমভূৎ—অনেনৈব চক্ষুষা, যথা ত্বাং পশ্যামীতি। ইদানীং পুনর্ভাবাবস্থায়ামেব দর্শনং জায়তে।

সতি পরমেশ্বরলাভে বালস্বভাবাবতারো ভবেৎ। যো যথা ধ্যায়তি স তথৈব ধ্যেয়সত্তামবাপ্নোতি। বালকবৎখল্বীশ্বরস্বভাবঃ। যথার্ভকঃ ক্রীড়াগৃহং নির্মাতি পুনর্ভনক্তি চ তথৈব ভগবানপি সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ান্ বিধত্তে। যথা কস্যাপি গুণস্য বশীভূতো ন ভবেদ্ বালকঃ—সোঽপি ন তথা সত্ত্বরজস্তমসাং ত্রিগুণানাং বশীভূতঃ, গুণাতীতঃ খলু সঃ।

অতএব কারণাৎ পরমহংসলক্ষণৈস্তত্রভবদ্ভিঃ স্বভাবারোপণার্থং দশ বা বিংশতির্বার্ভকাঃ সহচরত্বেন গৃহীতাঃ।"

আগড়পাড়াখ্যস্থানাৎ বিংশতিদ্বাবিংশত্যোরন্যতরসংখ্যকবয়োভাগী কশ্চিদ্ যুবা সমাগতঃ। যদৈবাসৌ আগচ্ছতি তদৈব ইঙ্গিতেন দেবতাত্মানং রহসি সমানীয় স অপরাশ্রাব্যস্বরেণ স্বচিত্তগতং কথয়তি। ন চিরং তস্য গমনাগমনাদিকং সমারব্ধম্। অদ্য পুনর্যুবা স সমীপমাসাদ্য কক্ষভূমাবুপবিষ্টঃ।

[প্রকৃতিভাবঃ কামজয়শ্চ, সরলতেশ্বরলাভশ্চ]

শ্রীরামকৃষ্ণঃ (যুবানং প্রতি)—"সতি আরোপে ভাবঃ পরিবর্তিতো ভবেৎ। প্রকৃতিভাবারোপণেন তু ক্রমেণ কামাদয়ো রিপবো বিনশ্যন্তি। সর্বথৈব যোষিতামিব ব্যবহারঃ সম্পদ্যতে। অভিনয়ে স্ত্রীভূমিকামভিনয়তাং স্নানসময়ে নারীতুল্যং দন্তমার্জনং তথা ভাষণঞ্চ পরিলক্ষিতে ময়া।

ত্বং কদাচিদস্মকুঞ্জয়োরন্যতরদিবসে সমাগচ্ছেঃ।

(প্রাণকৃষ্ণং প্রতি)—ব্রহ্মশক্ত্যোরভেদঃ। শক্তেরনঙ্গীকরণে জগন্মিথ্যা স্যাৎ—অহং, ত্বং, গৃহং, বাটী, পরিবারশ্চেতি সর্বং মিথ্যা। তত্রভবতী আদ্যাশক্তিরস্তীতি জগদবস্থিতং

তিষ্ঠতি। প্রতিমাবিধারককাষ্ঠময়সংস্থানে যদি সুষ্ঠুসংযোগো ন ভবেৎ তর্হি তাদৃশ-সংস্থানমেব ন সম্পদ্যতে,—তদভাবে তত্র মনোহরদুর্গাপ্রতিমানির্মাণমপি ন নিষ্পদ্যতে চ।

বিষয়ধীবর্জনমৃতে চৈতন্যমেব নোদেতি—ন বা ভগবৎপ্রাপ্তিঃ। বিষয়বুদ্ধিসত্ত্বমেব কাপট্যং জনয়েৎ। ন পুনরনৃজুনা স লব্ধুং শক্যতে নাম।

কাপট্যং পরিহায় ভক্তিরমলা চিত্তে সমালম্ব্যতাম্

সেবাবন্দনমস্য নাম বশতা রামস্য প্রাপ্তিক্ষমাঃ।

যে নাম বিষয়কর্মসু নিযুক্তাঃ, কার্যালয়কর্মাদিকং বাণিজ্যং বা কুর্বতাং তেষামপি সত্যে স্থিতিরুচিতা। সত্যভাষণং খলু কলৌ তপঃ।"

প্রাণকৃষ্ণঃ—অস্মিন্ ধর্মে মহেশি স্যাৎ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ।

পরোপকারনিরতো নির্বিকারঃ সদাশয়ঃ॥

মহানির্বাণতন্ত্রে এবমুক্তমস্তি।

রামকৃষ্ণঃ—"বাঢ়মুক্তম্। এতানি পুনর্ধারণীয়ানি।"

(দেবতাত্মনঃ শ্রীরামকৃষ্ণস্য যশোদাভাবঃ সমাধিশ্চ)

দেবতাত্মা ক্ষুদ্রখট্টামারুহ্য বীরাসন উপবিশন্নাস্তে স্ম। সদৈব ভাবৈরাপ্লুতঃ। ভাবময়েন চক্ষুষা রাখালমবলোকয়ংস্তিষ্ঠতি স্ম। রাখালং পশ্যতো বাৎসল্যরসাবির্ভাবস্তস্য। অথ পুলকিতমঙ্গম্। ঈদৃশেনৈব চক্ষুষা যশোদয়া গোপালঃ সমবলোকিতঃ কিমু? অথ পশ্যতাং সর্বেষাং পুনঃ সমাধিমাপন্নো দেবতাত্মা। গৃহস্থৈর্ভক্তৈর্নির্বাগ্ভাবেন নিস্তব্ধতয়া চ দেবতাত্মনঃ শ্রীরামকৃষ্ণস্য পরমাদ্ভুতেয়ং ভাবাবস্থা বিলোক্যতে। অথ কিঞ্চিৎপ্রকৃতিমাপন্নঃ সমভাষত—"কথং রাখালস্য দর্শনমাত্রেণ ভবেদুদ্দীপনম্? যাবদগ্রে গমনং তাবদেব ঐশ্বর্য-ভাগোঽপি ক্ষোদীয়ান্ স্যাৎ। প্রথমসন্দর্শনং তু সাধকৈঃ দশভুজধারিণ্যাঃ পরমেশ্বর্যাঃ স্যাৎ। তস্যাং মূর্তৌ প্রকাশবাহুল্যমৈশ্বর্যস্য। ততো দ্বিভুজাদর্শনম্—ন তদানীং দশ ভুজা বিদ্যন্তে —ন বা তাদৃশমস্ত্রাদিকমপি। ততশ্চ গোপালমূর্তিসাক্ষাৎকারঃ,—ন কিমপি ঐশ্বর্যম্—পরং কোমল-বালকমূর্তিরেব। ততঃ পরমপি অস্তি—কেবলং জ্যোতিরপরোক্ষম্।

[সমাধেরনন্তরং প্রকৃতব্রহ্মজ্ঞানাবস্থা, বিচারাসক্ত্যোঃ পরিত্যাগঃ]

"সতি তল্লাভে—তস্মিন্নেব সমাধিপ্রতিষ্ঠস্য ন পুনর্জ্ঞানবিচারঃ অবতিষ্ঠতে।

অপি জ্ঞানবিচারঃ কিয়ৎপর্যন্তম্? যাবদনেকত্বাবভাসঃ,—

যাবদ্ধি জীবো জগৎ, মমেদং মদৌ চৈতে তিষ্ঠন্তি। সতি চ যথার্থত একত্বাববোধে সর্বং বিলীয়তে, কেবলং তূষ্ণীং সমবস্থানম্। যথা তত্রভবাংস্ত্রৈলঙ্গস্বামী।

ননু কিমু ন দৃষ্টং ব্রাহ্মণভোজনম্? আদৌ মহান্ কোলাহলঃ। যথা যথা জঠর-পূরণং তথা তথা কোলাহলহ্রাসঃ। যদা দধিমিষ্টান্নাদিকং সমাপতিতং তদা পুনঃ কেবলং 'সুপ্-সাপ্' শব্দঃ, ন পুনরপরঃ শব্দস্তদানীম্। ততঃ পরং সুপ্তিঃ—সমাধিরিতি। ন চ তদা কোলাহললেশোঽপি বর্তেত।"

উনিশ শতকের বাঙলা সাময়িকপত্রে দ্বন্দ্ব

ডক্টর অনিলচন্দ্র বসু

উনিশ শতকের গোড়ার দিকে বাংলা দেশে যে নবজাগরণ সুরু হয়েছিল, তার ঢেউ সমসাময়িক সমাজ, ধর্ম, শিক্ষা, চিন্তা ও ভাবনায় এনে দিয়েছিল গভীর আলোড়ন। ইংরেজ মিশনারিরা খ্রীষ্টধর্মপ্রচারের গতিকে প্রবল ও ব্যাপক করে তোলার উদ্দেশ্যে হিন্দুশাস্ত্রের বিকৃত ব্যাখ্যার মাধ্যমে হিন্দু-ধর্মের হেয়ত্ব প্রতিপন্ন করতে সচেষ্ট হলেন। মিশনারিদের এ অপচেষ্টার বিরুদ্ধে দৃঢ়-প্রতিবাদ জানাবার জন্য মসীযুদ্ধে লিপ্ত হলেন রাজা রামমোহন রায়। তাছাড়া রামমোহন হিন্দুধর্মকে গোঁড়ামী ও কুসংস্কার থেকে মুক্ত করবার জন্য সমসাময়িক রক্ষণশীল হিন্দু-সমাজের সঙ্গেও দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হলেন। এক দিকে রাজা রামমোহন বেদান্তপ্রতিপাদ্য পরব্রহ্মের উপাসনাকে শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলে প্রচার এবং নারীর স্বাধিকার-প্রতিষ্ঠার জন্য নিরলস প্রচেষ্টায় ব্যাপৃত, অপরদিকে সমগ্র রক্ষণ-শীল হিন্দুসমাজ তাঁর বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ-প্রকাশে লিপ্ত। একদিকে দ্বারকানাথ ঠাকুর রাজা রামমোহনের সকলপ্রকার সংস্কার-প্রচেষ্টার সহায়ক, অপরদিকে রাধাকান্ত-দেব, রামকমল সেন প্রভৃতি রামমোহনের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান। সমাজ ও ধর্মবিষয়ে উক্ত পারস্পরিক দ্বন্দ্ব কেবল যে সেকালের সাময়িক পত্রের মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার লাভ করেছিল তা নয়, এ দ্বন্দ্বের প্রয়োজনে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহারের জন্য কয়েকখানা নতুন সাময়িকপত্র জন্মও নিয়েছিল।

সেকালের বাঙলা সাময়িকপত্রগুলোর মধ্যে সমাচারদর্পণের নাম প্রথমেই উল্লেখ-যোগ্য। ইংরেজ মিশনারিদের পরিচালিত এ সাপ্তাহিক পত্রে তখন হিন্দুধর্ম ও সমাজের গ্লানিসূচক লেখা প্রকাশিত হত। এসব লেখার প্রতিবাদে কিছু লেখা হলে তা' বড় একটা প্রকাশ করা হত না। ১৮২১ সালের জুলাই মাসে সমাচারদর্পণে "কোন বিজ্ঞ-ব্যক্তির দূরদেশ হইতে কয়েক প্রশ্ন সম্বলিত" একখানা পত্র প্রকাশ করা হল। রাজা রাম-মোহন এ পত্রখানাকে মিশনারিদের পক্ষ থেকে হিন্দুধর্মের প্রতি আক্রমণ বিবেচনা করে এর প্রতিবাদ করা সমীচীন মনে করলেন। তিনি শিবপ্রসাদ শর্মার নামে উক্ত পত্রে প্রকাশিত প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর সমাচারদর্পণে প্রকাশ করবার জন্য প্রেরণ করলেন। কিন্তু সমাচার-দর্পণের সম্পাদক তা' প্রকাশ করতে অনিচ্ছা জ্ঞাপন করলেন। অগত্যা রামমোহন ১৮২১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে শিবপ্রসাদ শর্মার নামে "ব্রাহ্মণসেবধি" প্রকাশ করলেন। এ পত্রের মাধ্যমে রামমোহন উক্ত পত্রে প্রকাশিত প্রশ্নের যথোচিত উত্তর প্রচার করলেন।

অন্য ধর্মের প্রতি বিদ্বেষপ্রকাশ ও অন্য ধর্মকে হেয় প্রতিপন্ন করবার উদ্দেশ্য সমাচার-দর্পণের সম্পাদক স্বীকার না করলেও এ পত্রিকায় এমন কিছু কিছু "প্রেরিতপত্র" প্রকাশিত হত, যেগুলোতে হিন্দুশাস্ত্র ও কুলীনদের সম্পর্কে অত্যন্ত বিদ্রূপ সমালোচনা ও তীক্ষ্ণ কটাক্ষ থাকত। সুতরাং প্রতি-আক্রমণ ও আত্মপক্ষ-সমর্থনের উদ্দেশ্যে এক-

খানা সাময়িকপত্র প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা তখন বিশেষভাবে অনুভূত হল। এর ফলে ১৮২১ সালের ডিসেম্বর "সংবাদকৌমুদী" নামে একখানা নতুন সাপ্তাহিক পত্র জন্ম নিল তারাচাঁদ দত্ত ও ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের যুক্ত প্রচেষ্টায়। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, রামমোহন এ পত্রিকার সঙ্গেও বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন। রামমোহন যতকাল মিশনারিদের আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতি-আক্রমণের জন্য শাস্ত্রীয় যুক্তিতর্কের অস্ত্র ধারণ করেছিলেন, ভবানীচরণ ততকাল তাঁর একান্ত অনুগত সমর্থক ও সহায়ক ছিলেন। কিন্তু সমাজসংস্কার বিষয়ে উভয়ের মধ্যে মতভেদ দেখা দিলে ভবানীচরণ সংবাদকৌমুদীর সঙ্গে যুক্ত থাকতে কুণ্ঠা বোধ করলেন। অবশেষে সহমরণের প্রতি তারাচাঁদ দত্তের কটাক্ষকে ভবানীচরণ হিন্দুধর্ম ও সমাজের প্রতি বিদ্বেষ-প্রকাশ বিবেচনা করে উক্ত পত্রের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করলেন।

কৌমুদী ত্যাগ করে ভবানীচরণ ক্যালকাটা গেজেটে "সমাচারচন্দ্রিকা" নামে একখানা সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশের ইস্তাহার প্রকাশ করলেন। কৌমুদীর হরিহর দত্ত উক্ত ইস্তাহারে প্রকাশিত বক্তব্যের প্রতিবাদ জানিয়ে অপর একটি ইস্তাহার ক্যালকাটা গেজেটে প্রকাশ করলেন। এ ইস্তাহারে তিনি জানিয়ে দিলেন যে, ভবানীচরণ তাঁর ইস্তাহারে যা' বলেছেন তা' মিথ্যা এবং দুষ্টবুদ্ধি ও ঈর্ষ্যা-প্রণোদিত। তাছাড়া, তিনি আরো বলেছেন যে, ভবানীচরণ কখনো কৌমুদীর সম্পাদক ছিলেন না, ছিলেন সম্পাদকের সহকারীমাত্র। এর থেকে বোঝা যায় যে, "সমাচারচন্দ্রিকা" প্রকাশের গোড়া থেকেই সংবাদকৌমুদীর সঙ্গে কিভাবে শত্রুতা সুরু হল। উভয় পত্রিকার মধ্যে ঘোরতর দ্বন্দ্ব অনেকদিন পর্যন্ত চলেছিল। এ বিবাদের ফলে উভয় পত্রিকাতেই পরস্পরের প্রতি অশালীন নিন্দা-বাদ প্রচারিত হতে লাগল। সহমরণের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করায় সংবাদকৌমুদী অনেকের বিরাগভাজন হয়েছিল এবং রক্ষণ-শীলদলের মুখপত্র সমাচারচন্দ্রিকা প্রকাশিত হওয়ায় কৌমুদীর গ্রাহকসংখ্যাও আশাতীত হ্রাস পেয়েছিল।

১৮২৩ সালের আগস্ট মাসে কৃষ্ণমোহন দাস "সংবাদতিমিরনাশক" নামে একখানা সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করলেন। সংবাদ-তিমিরনাশকও রক্ষণশীলদের পক্ষ সমর্থন করত এবং উদারপন্থীদের বিরূপ সমালোচনা করতেও দ্বিধা করত না। ১৮৩১ সালের জানুয়ারী মাসে কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সম্পাদনায় "সংবাদপ্রভাকর" প্রকাশিত হল। সমাচারচন্দ্রিকায় এরূপ মন্তব্য করা হয়েছিল যে, প্রভাকর-প্রকাশকও হিন্দুধর্মনাশেচ্ছুক-দিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবার সম্ভাবনার প্রতি ইঙ্গিত করেছিলেন। নব্যপন্থীদের প্রতি ঈশ্বর গুপ্তের বিরূপ মনোভাব ছিল, একথা একেবারে অস্বীকার করা যায় না। তিনি অনেকটা রক্ষণশীলদের মতেরই সমর্থন করতেন।

১৮৩১ সালের জুন মাসে "ইয়ং বেঙ্গল"দের মুখপত্র "জ্ঞানান্বেষণ" প্রকাশিত হল। জ্ঞানান্বেষণ সেকালের একখানা উল্লেখযোগ্য সাময়িকপত্র। দক্ষিণানন্দন মুখোপাধ্যায় ছিলেন এর সম্পাদক। লোকের বাক্যপ্রপঞ্চে প্রতারিত এ দেশের বিশিষ্টবংশোদ্ভব ব্যক্তিদের প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রের আলোচনার দ্বারা ভ্রান্তির নিরসন করাই ছিল জ্ঞানান্বেষণের প্রস্তাবিত উদ্দেশ্য। দক্ষিণানন্দন সম্পাদক

হলেও সম্পাদকের যাবতীয় কাজ করে দিতেন গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ। জ্ঞানান্বেষণ প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই সংবাদতিমিরনাশক এবং সমাচারচন্দ্রিকা—এ দুখানা রক্ষণশীলপন্থী সাময়িকপত্রের দ্বারা আক্রান্ত হতে লাগল। জ্ঞানান্বেষণের সম্পাদনায় রত উক্ত দু'জনের উদ্দেশ্যে সংবাদতিমিরনাশক মন্তব্য করেছিল যে, দক্ষিণানন্দন লেখাপড়া কিছুই জানতেন না, এমনকি বাঙলা কথাও বলতে পারতেন না, তথাপি বাঙলা সংবাদপত্রের "এডিটর" না হলেই নয়। তিনি মাতামহের সঞ্চিত অর্থ ব্যয় করে এ পদ লাভ করেছিলেন। আর একজন নাটুয়ে ভাট মদ্যপায়ীকে পণ্ডিত জেনে চাকর রাখা হয়েছিল। সে নাস্তিক হিন্দুদ্বেষী কাগজ প্রকাশের প্রথম দিন থেকেই কেবল ধার্মিকবর চন্দ্রিকাসম্পাদককে কটু-কাটব্য করতেন, আর হিন্দুশাস্ত্র ভাল নয় বিবেচনা করেই তারই দোষ আপনবুদ্ধিতে যা খুঁজে পেতেন তাই প্রচার করতেন। এজন্য ভদ্রলোকেরা এ কাগজ পড়তেন না, কাগজ প্রকাশ করে কয়েকজন লোকের বাড়ীতে পাঠিয়ে দেওয়া হত। উক্ত মন্তব্য থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায় যে, উভয় পত্রিকার মধ্যে বিরোধ কেবল মত ও আদর্শের বিষয়ে সীমিত ছিল না, তা' অনেকটা ব্যক্তিগত আক্রমণের পর্যায়ে নেমে এসেছিল।

মধুসূদন দাসের পরিচালনায় এবং রামচন্দ্র পালের সম্পাদনায় ১৮৩১ সালের আগস্ট মাসে "সংবাদরত্নাকর" নামে আর একখানা সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হয়। এ পত্রও রক্ষণশীলদের অনুপন্থী ছিল এবং প্রচলিত ধর্ম ও আচারের সমর্থনেই এ পত্রিকায় লেখা প্রকাশিত হত। রত্নাকরের সম্পাদক নাস্তিক-হন্তা হয়ে বিধাতার বাক্যপালনে অবোধদিগের বিলক্ষণ প্রবোধ-প্রদানে ক্ষমতা প্রকাশ করেছিলেন বলে সমাচারচন্দ্রিকায় উল্লেখ করা হয়েছিল। কিন্তু সমাচারদর্পণ থেকে জানা যায় যে, সংবাদরত্নাকরে খুবই কটু-কাটব্য প্রকাশিত হত, ছ'মাস যেতে না যেতেই এর "গো-লোক" প্রাপ্তি হয়েছিল। সংবাদরত্নাকরকে কেন্দ্র করে যে পারস্পরিক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছিল তা সমাচারচন্দ্রিকা এবং সমাচারদর্পণ—এ দু'খানা পরস্পর বিপরীত-ধর্মী সাময়িক পত্রের উক্ত মন্তব্য থেকেই সুস্পষ্ট বোঝা যায়।

১৮৩৯ সালের মার্চ মাসে শ্রীনাথ রায়ের সম্পাদনায় "সংবাদভাস্কর" প্রকাশিত হয়। কিন্তু জ্ঞানান্বেষণ থেকে জানা যায় যে, গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ প্রকৃতপক্ষে এ পত্রিকার পরিচালক ছিলেন এবং পরে তিনি এ পত্রিকার প্রধান সম্পাদক হয়েছিলেন। সংবাদভাস্করে প্রকাশিত গৌরীশঙ্করের নিজের কথা থেকে জানা যায় যে, তিনি স্বদেশের কুপ্রথা, সহমরণ-নিবারণ, বিধবাবিবাহ এবং স্ত্রীলোকের বিদ্যাভ্যাস ইত্যাদি বিষয়ে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। এর থেকে বোঝা যায় যে, তিনি উদারপন্থী ছিলেন। সুতরাং রক্ষণশীলদের সঙ্গে তাঁর বিরোধ হওয়া মোটেই অপ্রত্যাশিত ছিল না। গৌরীশঙ্করের নিজের উক্তিতে এ বিরোধের স্পষ্ট আভাস রয়েছে। তিনি বলেছেন—"এক্ষণেও সে ভাবের ভাবক আছি। সহস্র সহস্র কি লক্ষ লক্ষ লোক যদি আমারদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন, তথাচ আমরা বালিকাদিগের বিদ্যালয়ের অনুকূল বাক্যই কহিব।"

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ও বাংলার রঙ্গমঞ্চ

অধ্যাপক প্রণবরঞ্জন ঘোষ

বাংলা রঙ্গমঞ্চের শতবর্ষপূর্তি উৎসব অনুষ্ঠিত হলো ৭ই ডিসেম্বর (১৯৭২)। যদিচ আজ অবধি নানা কারণে আমাদের জাতীয় রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হয়নি, তবু ঐদিন কলকাতার দুটি জায়গায় 'নীলদর্পণ' নাটক পুনরভিনীত হয়ে মনে করিয়ে দিল যে, বাংলার নাট্য-আন্দোলন কৃতজ্ঞচিত্তে সেই শুভক্ষণটিকে স্মরণ করে থাকে। একশো বছর আগে যাঁরা 'নীলদর্পণ' নাটকে অভিনয় করেছিলেন, তাঁরা এ অভিনয় দেখে কতটা আনন্দিত হতেন তা অনুমানের বিষয়। কিন্তু প্রত্যক্ষ একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, 'নীলদর্পণ' আজও বাঙালী দর্শককে অভিভূত করার ক্ষমতা রাখে। কেবল একটি তাৎক্ষণিক অত্যাচারের দলিলরূপে নয়, অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামশীল মানবাত্মার কোনো চিরন্তন বাণী সে নাটকে ধ্বনিত। দীনবন্ধু মিত্র শুধু বাংলার ন'ন, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নাট্যকারদের একজন।

গেরাসিম লেবেডেফ থেকে অধুনাতন রঙ্গালয় অবধি গোটা ইতিহাসের কথা অনেকের মনেই এ সূত্রে জেগে থাকবে। নাট্যমঞ্চ, নাট্যকার, অভিনেতা-অভিনেত্রী—এসব কিছুরই সার্থকতা দর্শকরূপী নরনারায়ণের পরিতৃপ্তিতে। জাতির মানসভোজে বাংলা রঙ্গমঞ্চের উদ্যোক্তারা, অভিনেতা-অভিনেত্রীবৃন্দ, বিভিন্ন যুগের নাট্যকার—এঁরা যেমন স্মরণীয়, তেমনি স্মরণীয় গত একশো বছরের অনুরাগী দর্শকমণ্ডলী। এঁদেরই উৎসাহ, অনুপ্রেরণা ও পৃষ্ঠপোষকতায় আজকের বাংলা রঙ্গমঞ্চ শত বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও অপরাজেয় প্রাণশক্তিতে রসিকজনের তৃপ্তিসাধন করে চলেছে।

বাংলা রঙ্গমঞ্চের দর্শকমণ্ডলীতে উনবিংশ শতাব্দী থেকেই বিশিষ্ট জ্ঞানী-গুণীদের সমাবেশ ঘটেছে। বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, কেশবচন্দ্র প্রমুখদের কথা ভাবতে ভাবতে সে যুগের বিশিষ্টতম যে দর্শকটির কথা মনে পড়ে, তিনি অধ্যাত্মসাধনার ঘনীভূত বিগ্রহ পরমহংসদেব।

বস্তুতঃ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে বাংলা রঙ্গালয়ের সম্বন্ধ ঘটার পর থেকে জাতীয় জীবনের মহত্তম আদর্শের ক্ষেত্রে রঙ্গমঞ্চের স্থান বাঙালী হৃদয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত। বিশেষভাবে পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের ক্ষেত্রেই এ ঘটনা আরও তাৎপর্যবহ। সেকালের পারিবারিক রঙ্গমঞ্চের অভিজাত পরিবেশে নয়, একেবারে নিয়মিত অভিনয়ের রঙ্গশালায় এসে সেদিনের নট-নটীদের অসাধারণ অভিনয়-নৈপুণ্যে মুগ্ধ শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁদের প্রাণভরে আশীর্বাদ করেছিলেন। এই সব অভিনেতা-অভিনেত্রীদের বেশীর ভাগই তখন দর্শকসাধারণের অশেষ আনন্দ বিতরণ করেও সামাজিক দৃষ্টিতে হীন ও পতিতরূপে বিবেচিত হতেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মতো উন্নততম নীতিবাদী ও সাধকশ্রেষ্ঠের অভিনন্দন লাভ করে এই নট-নটীরা ও সাধারণভাবে বাংলার রঙ্গমঞ্চ যে কী অপরিমেয় মর্যাদার অধিকারী হয়েছিল, সেকথা বাংলার সাধারণ রঙ্গমঞ্চের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে বিশেষভাবে স্মরণীয়।

কোনো সন্দেহ নেই, জাতীয় রঙ্গমঞ্চেই জাতীয় চরিত্র প্রতিবিম্বিত হয়। সেদিক

থেকে বাংলার রঙ্গমঞ্চে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে স্বদেশী (সংস্কৃত) ও বিদেশী (ইংরেজী ও ফরাসী) যেসব নাটকের অনুবাদ বা অনুসরণের অভিনয় হয়েছে, পরবর্তী বাংলা নাটকে তাদের অল্পবিস্তর প্রভাব থাকলেও তখন অবধি ঠিক ঠিক জাতীয় নাটক গড়ে ওঠেনি। এদিক থেকে বরং সেকালের প্রহসনগুলি দ্রুত পরিবর্তনের মুখে আমাদের মানসসত্তার আংশিক পরিচয় কৃতিত্বের সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছিল। মধুসূদন বা দীনবন্ধুর প্রহসনে তার শ্রেষ্ঠ পরিচয়।

প্রহসন জীবনসত্যের তির্যক প্রতিচ্ছবি, কখনোই সমগ্র জীবনদর্পণ নয়। সেদিক থেকে পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের শুভ উদ্বোধনে 'নীলদর্পণে'রই প্রথম সম্মান। কিন্তু গণ-অভ্যুত্থানের ব্যাপক ব্যঞ্জনার চেয়ে পারিবারিক বিয়োগান্ত নাটকের দিকেই 'নীলদর্পণে'র ঝোঁক বেশি। তাই জাতীয়মানসের মর্মস্থলকে স্পর্শ করতে পারে, এমন নাটকের প্রয়োজন তখনও থেকেই গেল। মনোমোহন বসুর পৌরাণিক নাটকের ইঙ্গিতসূত্রে গিরিশচন্দ্রের নাটকেই তার বিকাশ সম্পূর্ণ হলো। পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের সূচনার বারোবছর পরে গিরিশচন্দ্রের "চৈতন্যলীলা" (১৮৮৪) অভিনীত হয়ে বাংলার রঙ্গমঞ্চ ও দর্শকসমাজের হৃদয়-সম্বন্ধ সবচেয়ে দৃঢ়বন্ধনে আবদ্ধ হলো।

এর কারণ হিসাবে প্রথমেই স্মরণীয় যে, গিরিশচন্দ্রের 'চৈতন্যলীলা' মূলতঃ বৃন্দাবনদাসের "চৈতন্যভাগবতে"রই নাট্যরূপায়ণ। বাঙালীর গণচেতনায় শ্রীচৈতন্য-আবির্ভাবের ঐতিহাসিক ও আধ্যাত্মিক তাৎপর্যকে বৃন্দাবনদাস যেভাবে রূপায়িত করেছেন, তার তুলনা সমকালীন বাংলাসাহিত্যে তো নেই-ই, অন্যান্য দেশের জীবনীগ্রন্থের পক্ষেও বৃন্দাবনদাসের ইতিহাসদৃষ্টি বিশেষ প্রশংসনীয়। পরবর্তী মহাকবি কৃষ্ণদাস কবিরাজ পূর্বসূরীর বন্দনায় স্বাভাবিকভাবেই মনে করেছেন—'বৃন্দাবনদাসমুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য'।

রাধাকৃষ্ণলীলা-সংকীর্তনের দেশ বাংলা। শ্রীচৈতন্য-আবির্ভাবের পর এই রাধাকৃষ্ণই বাঙালীহৃদয়ে সম্মিলিত ভাবমূর্তিরূপে চৈতন্য-জীবনকাহিনীতে রূপায়িত। ভাবের দিক থেকে মধুর কোমলকান্ত, জীবনের দিক থেকে পৌরুষ ও স্বাধীনচিত্ততায় দৃপ্ত মনুষ্যত্বের প্রতিমূর্তি—এই চৈতন্যজীবনই একদিক থেকে বাঙালী জাতির স্রষ্টা। চৈতন্যলীলার বিষয়-নির্বাচনে গিরিশচন্দ্রের পটুতা যেমন স্মরণীয়, তেমনি স্মরণীয় চৈতন্য-চরিত্রের রূপদানে সেকালের শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী বিনোদিনীর জীবনসাধনা।

বিনোদিনীর নিজের ভাষায়—"এই 'চৈতন্যলীলা'র রিহারসালের সময় 'অমৃত-বাজার পত্রিকা'র এডিটার বৈষ্ণবচূড়ামণি পূজনীয় শ্রীযুক্ত শিশিরবাবু মাঝে মাঝে যাইতেন এবং আমার ন্যায় হীনার দ্বারা সেই দেবচরিত্র যতদূর সম্ভব সুরুচিসংযুক্ত হইয়া অভিনয় হইতে পারে, তাহার উপদেশ দিতেন এবং বারংবার বলিতেন যে, আমি যেন সতত গৌরপাদপদ্ম চিন্তা করি। তিনি অধমতারণ, পতিতপাবন, পতিতের উপর তাঁর অসীম দয়া। তাঁর কথামত আমি সতত ভয়ে ভয়ে মহাপ্রভুর পাদপদ্ম চিন্তা করিতাম। আমার মনে বড়ই আশা হইত যে, কেমন করিয়া এ অকূল পাথারে কূল পাইব। মনে মনে সদাই ডাকিতাম, 'হে পতিতপাবন গৌরহরি, এই পতিতা অধমাকে দয়া করুন।' যেদিন প্রথম চৈতন্যলীলা অভিনয় করি তাহার আগের রাত্রে প্রায় সারা রাত্রি নিদ্রা যাই নাই;

প্রাণের মধ্যে একটা আকুল উদ্বেগ হইয়াছিল। প্রাতে উঠিয়া গঙ্গাস্নানে যাইলাম; পরে ১০৮ দুর্গানাম লিখিয়া তাঁহার চরণে ভিক্ষা করিলাম যে, 'মহাপ্রভু যেন আমার এই মহাসঙ্কটে কূল দেন; আমি যেন তাঁর কৃপা লাভ করিতে পারি।' কিন্তু সারাদিন ভয়ে ভাবনায় অস্থির হইয়া রহিলাম। পরে জানিলাম, আমি যে তাঁর অভয় পদে স্মরণ লইয়াছিলাম, তাহা বোধ হয় ব্যর্থ হয় নাই।"

শিল্প যতদিন সাধনায় রূপান্তরিত না হয়, ততদিন তার মর্মে পৌঁছানো যায় না। বিনোদিনী তাঁর অভিনয়-সাধনার দ্বারাই চৈতন্যচরিত্রের মর্মোপলব্ধি করেছিলেন এবং সে উপলব্ধি তাঁর অভিনয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। ১৮৮৪ সালের ২রা আগস্ট স্টার থিয়েটারে (তখনকার স্টার থিয়েটার ছিল বিডন স্ট্রীটে, সে রঙ্গমঞ্চের নাম পরে পরিবর্তিত হয়, আরো পরে সে থিয়েটার লুপ্ত হয়ে এখন সেখান দিয়ে চিত্তরঞ্জন এভিনিউ চলে গেছে) 'চৈতন্যলীলা'র প্রথম অভিনয়দিন থেকেই দর্শকসাধারণের অভাবিত সমাদরে রঙ্গালয় পরিপূর্ণ হতে থাকে। আর বিনোদিনীরও সাধনা ও অভিনয়ের যুগপৎধারায় ধীরে ধীরে জীবনের পরম লগ্নটির জন্য প্রস্তুতি চলেছিল।

মাস দেড়েকের একটু বেশী সময় কেটে গেল। ১৮৮৪-র ২১শে সেপ্টেম্বর (১২৯১ সালের ৫ই আশ্বিন, রবিবার) রামকৃষ্ণদেব 'স্টার থিয়েটারে' 'চৈতন্যলীলা' দেখতে এলেন। নিয়ে এসেছেন তাঁর অনুরাগী ভক্ত মহেন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে। কথা হচ্ছিল, 'একটাকার সিট থেকে বেশ দেখা যায়।' কিন্তু মহেন্দ্রবাবুর কাছে পরমহংসদেব এসেছেন শুনে গিরিশচন্দ্র বক্সে বসে অভিনয় দেখার বন্দোবস্তই করেছিলেন। তখনও রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ গড়ে ওঠেনি।

ওই দিনের আর এক সঙ্গী মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত ('কথামৃতকার' শ্রীম-) 'কথামৃতে'র বিবরণে লিখেছেন—"গিরিশ পরমহংসদেবের নাম শুনিয়াছেন। তিনি চৈতন্যলীলা-অভিনয় দর্শন করিতে আসিয়াছেন শুনিয়া পরম আহ্লাদিত হইয়াছেন।"

আর প্রথম দিন স্টার থিয়েটার রঙ্গমঞ্চে এসে রামকৃষ্ণদেবের কি মনে হয়েছিল? চারদিকে চেয়ে শিশুর মতো আনন্দে তিনি বলে উঠলেন, "বাঃ, এখানে বেশ! এসে বেশ হলো! অনেক লোক একসঙ্গে হলে উদ্দীপন হয়। তখন ঠিক দেখতে পাই, তিনিই সব হয়েছেন।"

অভিনয় দেখতে কলকাতায় আসার আগে দক্ষিণেশ্বরে তাঁর ঘরটিতে ব'সে যখন ভক্তদের কেউ কেউ বলেছিলেন, "বেশ্যারা অভিনয় করে।"—শ্রীরামকৃষ্ণ তখন জানিয়েছিলেন,—"আমি তাদের মা আনন্দময়ী দেখবো। তারা চৈতন্যদেব সেজেছে, তা হ'লেই বা! শোলার আতা দেখলে সত্যকার আতার উদ্দীপন হয়।"

রঙ্গালয়, অভিনেতা-অভিনেত্রী, সমবেত দর্শকমণ্ডলী—সব কিছুই যখন এক দিব্য অনুভূতিতে পরমসত্যের জ্যোতির্ময় আবির্ভাবে ভাস্বর, তখন যাঁর দৃষ্টিতে এই উদ্ভাসন, সেই সত্যদ্রষ্টার অমেয় মহিমার পরিমাপ করবে কে? বিস্মিত পাঠক হিসাবে আমরা শুধু লক্ষ্য করতে পারি, একদিকে রঙ্গমঞ্চে চৈতন্যলীলার অভিনয়, আর একদিকে শ্রীরামকৃষ্ণদৃষ্টিতে সর্বময় চৈতন্যের প্রকাশে 'আসল নকল এক' হয়ে যাওয়া। জগৎ-রঙ্গমঞ্চে এমন অভিনয়-তদ্‌গতির উদাহরণ যে কতো দুর্লভ সেকথা অভিনয়রসিক-মাত্রেই জানেন। কিন্তু সেদিনের দর্শকবৃন্দের মিলিত অভিনন্দনের চূড়ান্ত মুহূর্তটি ছিল শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মুহুর্মুহুঃ সমাধিস্থ হওয়ার তন্ময়তায়। সে তন্ময়তা অবশ্য অধিকাংশের চোখের আড়ালে কিছু মরমী ভক্তের দৃষ্টিতেই ধরা পড়েছিল। [ক্রমশঃ]

বিবেকানন্দ-স্মৃতি বিশ্রামগৃহ

স্বামী জীবানন্দ

ক্ষণজন্মা মহাপুরুষের স্মৃতিপূত সব স্থানই সংরক্ষণযোগ্য নিঃসন্দেহ; তবু এক একটি স্থান মহাজীবনের এমন বিশিষ্ট ঘটনার সাক্ষ্য বুকে ধারণ ক'রে বিদ্যমান থাকে, যা ভক্তচিত্তে চির-অবিস্মরণীয়।

যুগপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দের পরিব্রাজক জীবনের ঘটনা। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দ। স্বামীজী আসছেন নৈনিতাল থেকে আলমোড়া, সঙ্গে আছেন স্বামী অখণ্ডানন্দজী। পথে এক অশ্বত্থগাছের তলায় তাঁর যে চিরন্তন সত্যের অপূর্ব অনুভূতি হয়েছিল, তা তাঁর নিজের ভাষায় অভিব্যক্তি লাভ করেছে: I have just passed through one of the greatest moments of my life, I have found the oneness between the macrocosm and the microcosm. I have seen the whole Universe within an atom.—আমার জীবনের এক অমূল্য ক্ষণ উপস্থিত হয়েছিল। আমি ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড ও বিরাট ব্রহ্মাণ্ডের একাত্মতা অনুভব করেছি, বিশ্বের যা কিছু সব এই ক্ষুদ্র দেহমধ্যে আছে, দেখলাম প্রতি পরমাণুমধ্যে সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিদ্যমান। অখণ্ডানন্দজী দেখেছিলেন স্বামীজীর মুখমণ্ডল অনির্বচনীয় আনন্দে, দিব্য জ্যোতিতে উদ্ভাসিত।

দুই গুরুভ্রাতা এগিয়ে চলেছেন। কঠিন বন্ধুর পাহাড়িয়া পথ! ক্রোশের পর ক্রোশ পদব্রজে অতিক্রান্ত হচ্ছে। উভয়েই অভুক্ত, পথশ্রমে ক্লান্ত। স্বামীজী ক্ষুধায় অবসন্ন ও মূর্চ্ছিতপ্রায় হয়ে মাটিতে শুয়ে পড়লেন, স্বামী অখণ্ডানন্দ জলের সন্ধানে গেলেন। সামনেই মুসলমানদের একটি গোরস্থান। ঐ গোরস্থানের রক্ষক একজন ফকির কাছেই একটি কুটিরে থাকেন। ঘটনাক্রমে তিনি ঐ সময়ে ঐ স্থান দিয়ে যাচ্ছিলেন। স্বামীজীর অবস্থা-দর্শনে তাঁর মনে দয়ার উদ্রেক হ'ল। তিনি একটি শশা এনে তাঁকে খেতে দিলেন। শশা খেয়ে স্বামীজী কিঞ্চিৎ সুস্থ বোধ করেন।

পরবর্তী কালে স্বামীজী এই ঘটনার উল্লেখ ক'রে বলতেন: লোকটি বাস্তবিক সেদিন আমার প্রাণরক্ষা করেছিলেন, কারণ আর কখনো আমি ক্ষুধায় অতটা কাতর হইনি।

এর কয়েক বৎসর পরে আমেরিকা-ইওরোপ থেকে স্বামীজী বিশ্ববিজয়ী বিবেকানন্দরূপে স্বদেশে ফিরে এলে যখন আলমোড়াবাসীরা জগদ্বিখ্যাত মহাপুরুষকে অভ্যর্থনা করবার জন্য মহাসমারোহে আয়োজন করেছিলেন, তখন সেই বিরাট সভার এক কোণে স্বামীজী সেই মুসলমান ফকিরকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পান। ফকির অবশ্য তাঁকে চিনে উঠতে পারেননি; কিন্তু জনতার মধ্যে স্বামীজী তাঁকে দেখেই চিনতে পারেন এবং সাদরে কাছে নিয়ে এসে সমাগত জনমণ্ডলীর নিকট নিজের প্রাণরক্ষক ব'লে তাঁর পরিচয় দেন, তাঁকে আলিঙ্গনাবদ্ধ ক'রে বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করেন।

যেখানে স্বামীজী ক্ষুধাতৃষ্ণায় আর পথক্লান্তিতে অতি দুর্বল হয়ে পড়ে গিয়েছিলেন এবং ফকিরের শশা খেয়ে সুস্থ হয়েছিলেন, সেখানে নির্মিত হয়েছে বিবেকানন্দ-স্মৃতি

বিশ্রামগৃহ, শ্বেত প্রস্তরে উৎকীর্ণ হয়ে রয়েছে এই ঘটনার উল্লেখসহ লিপিগুলি:

Vivekananda Memorial Rest-Hall, established July 4th, 1971

The Rest-Hall, constructed as a memorial to Swami Vivekananda for the benefit of the public, is associated with the place where Swami Vivekananda fell down from exhaustion after walking from Nainital on his first visit to Almora in 1890, and where he was revived by the humble offering of a cucumber from the Muslim Fakir in charge of the adjoining grave-yard.

বিশ্রামগৃহের চারদিকে কিছু ফুলের গাছ লাগানো হয়েছে, গাছে গাছে সুন্দর মরসুমী ফুল ফুটে রয়েছে। একটি জলের কল—পিপাসার্ত পথিকের জলপানের জন্য। বসবার স্থানগুলি সুন্দর। নতুন তৈরী ব'লে সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঝকঝক করছে, নির্মিত হয়েছে এখনো দেড় বছর হয়নি। মোটের উপর বিশ্রাম-নিকেতনটি সুপ্রশস্ত না হলেও নয়নাভিরাম। বিশ্রামগৃহের নিয়মাবলীতে আছে: জলের কলটির চারদিক যেন পরিষ্কার থাকে। পুষ্পোদ্যানের সৌন্দর্য যেন নষ্ট করা না হয়। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে ইত্যাদি।

এখানে সবচেয়ে আকর্ষণীয় হ'ল—শ্বেত-প্রস্তরে খোদিত স্বামীজীর বাণী। বিশ্বাস, ঐক্য, চরিত্র, কর্ম, সেবা, ধর্ম, সত্য প্রভৃতি শিরোনামে মহাপুরুষের যে বাণীগুলি এখানে তুলে ধরা হয়েছে, তা সঙ্কলন-কর্তিত্বের দাবি রাখে।

উৎকীর্ণ রয়েছে: আমাদের প্রণাম সকল ঈশ্বর-প্রেরিত মহাপুরুষের উদ্দেশে—যাঁদের জীবন ও বাণী উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছি আমরা; তাঁদের ধর্ম জাতি মত পথ যাই হোক না কেন, তাঁদের উদ্দেশে আমাদের প্রণতি। দেবতাসদৃশ সকল মানবমানবীর উদ্দেশে আমাদের প্রণাম; যাঁদের জীবন মানবতা-রক্ষায় সমর্পিত তাঁদের জন্ম জাতি ধর্ম যাই-ই হোক না কেন, তাঁদের উদ্দেশে আমাদের প্রণাম।

উৎকীর্ণ রয়েছে: আমরা ব্যাবহারিক জীবনে দেখাব হিন্দুদের আধ্যাত্মিকতা, বৌদ্ধদের করুণা, খৃষ্টানদের কর্মপরায়ণতা, মুসলমানের ভ্রাতৃত্ববোধ।...জগৎ যা চায় তা হ'ল চরিত্র। জগতের প্রয়োজন এমন মানুষের—যাঁর মধ্যে বিদ্যমান নিঃস্বার্থ উদ্দীপ্ত ভালবাসা। এমনি ভালবাসা থাকলে প্রত্যেকটি কথা বজ্রের মতো শক্তি ধরে। ওঠ জাগো মহাপ্রাণ, জগৎ দুঃখের অনলে জলছে, তুমি কি ঘুমুতে পার?

ক্লান্ত শ্রান্ত পথিক—যখন এই বিশ্রামগৃহে উপবেশন করবেন, তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হবে বিধৃত বাণীগুলির প্রতি: সত্য অনন্তের। সত্য কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। কোন জাতি বা ব্যক্তি সত্যের স্বাধিকার দাবি করতে পারে না। আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম—সত্য।... আমার স্থির বিশ্বাস—কোন জাতি বা ব্যক্তি অন্য জাতি বা ব্যক্তি থেকে সম্পূর্ণ বিচ্যুত হয়ে বেঁচে থাকতে পারে না; মহত্ব নীতি ও শুচিতার দোহাই দিয়ে যখনই এরূপ প্রচেষ্টা হয়েছে, তখনই ফল হয়েছে বিপরীত ও মারাত্মক।...কেউ রাজনৈতিক বা সামাজিক স্বাধীনতা লাভ করতে পারে, কিন্তু যদি কাম-ক্রোধাদি রিপুর দাস হয়, তবে প্রকৃত

স্বাধীনতার আনন্দ উপভোগ করতে পারে না। ...আমার জন্মভূমির প্রতি আমার অন্তরের শ্রদ্ধাবিমিশ্র ভাব পোষণ করি। যদি আমার সহস্রবার জন্মগ্রহণ করতে হয়, তবে আমার জীবনের প্রতিটি ক্ষণ আমার জন্মভূমির সেবায় হবে উৎসর্গীকৃত।

ইংরেজী হিন্দী ও উর্দু ভাষায় লিখিত হয়েছে স্বামীজীর বাণীগুলি—সারা ভারতের তথা সমগ্র বিশ্বের মানুষের কল্যাণের জন্য।

২৫শে অক্টোবর, ১৯৭২, বুধবার সকালে আলমোড়া শ্রীরামকৃষ্ণ কুটির থেকে বহির্গত হয়ে পনরজে মাইল খানেকের কিছু কম পথ অতিক্রম ক'রে এই বিবেকানন্দ-স্মৃতি বিশ্রামগৃহ দর্শন করি। পরিবেশটির প্রবল আকর্ষণে পরের দিনও সকালে এখানে গিয়ে কিছুক্ষণ কাটাই। এখান থেকে দেখা যায় দেবতাত্মা হিমালয়ের নন্দাকোট, নন্দাদেবী, ত্রিশূল, নীলকণ্ঠ প্রভৃতি কয়েকটি শিখরের চিরতুষারাবৃত রূপ। মনে পড়ে, হিমালয়ের প্রতি স্বামীজীর কী গভীর প্রাণের টান ছিল! আলমোড়ায় তিনি তিন-বার এসেছিলেন—১৮৯০, ১৮৯৭ ও ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে। তাঁর ও তাঁর পাশ্চাত্য শিষ্যগণের জীবনের কত পুণ্যক্ষণের স্মৃতিই না আল-মোড়ার সঙ্গে জড়িত!

বিশ্বমহাবিত্ত

শ্রীজীবনকৃষ্ণ শেঠ

তোমার পায়ের চিহ্ন বিশ্বের প্রান্তরে
আজিও অম্লান-রেখা কালের অক্ষরে।
মহাকাল বক্ষে ধরি তোমার প্রতিমা
সবিস্ময়ে চাহি আছে নাহি পায় সীমা।
মূর্তিমান জীবপ্রেম, অধ্যাত্ম সাধন,
জীবে সেবি, জীবে পূজি, সেবি বিশ্বজন,
ঋষিলব্ধ ভারতের অধ্যাত্ম সম্ভার
জগৎ সমক্ষে উদ্বোধিলে বারবার
সবল উদাত্ত দৃপ্ত কণ্ঠে : "উত্তিষ্ঠত
জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"—কত
ঘুমাইবে? ওঠ, জাগ, চল পুরোভাগে
থামিও না লক্ষ্যলাভ করিবার আগে।
এই বীরবাণী উদ্বোধিছে সারা চিত্ত,
এই তব প্রাণমন্ত্র, বিশ্বমহাবিত্ত।

ভারতীয় রাষ্ট্রদর্শন-পরিচয়

[পূর্বানুবৃত্তি]

ডক্টর শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়

মহাভারতের রাজনীতি :
কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস

"মহাভারত বিশিষ্ট প্রকারে রাজনৈতিক কাব্য অর্থাৎ ঐতিহাসিক কাব্য, ইতিহাসের উপর নির্মিত কাব্য।"—বঙ্কিমচন্দ্র

মহাভারতের স্বরূপ :

ভারতের প্রাচীন গ্রন্থসমূহের মধ্যে রামায়ণ ও মহাভারতই ইতিহাসের মর্যাদা পেয়েছে। এ ব্যাপারে আবার এই দুই মহাকাব্যের মধ্যে মহাভারতের দাবিই বেশী। অবশ্য মহাভারতে এমন অনেক ঘটনা আছে যা, বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায়, 'স্পষ্টতঃ অলীক, অসম্ভব, অনৈতিহাসিক'।[১] তবুও কিন্তু লক্ষণবিচারে, সামগ্রিকভাবে না হলেও, মহাভারতকে ইতিহাস বলেই গণ্য করতে হয়। রামেন্দ্রসুন্দরকে উদ্ধৃত করে বলা যায় : "মহাভারতের বর্ণিত ইতিহাস মানবসমাজের বিপ্লবের ইতিহাস।...হয়তো কোন প্রাদেশিক ঘটনার স্মৃতিমাত্র অবলম্বন করিয়া মহাকবি আপনার চিত্তবৃত্তির সমাধিকালে মানবসমাজের মহাবিপ্লবের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন; এবং সেই স্বপ্নদৃষ্ট ধ্যানলব্ধ মহাবিপ্লবের,—ধর্মের সহিত অধর্মের মহাসমরের চিত্র ভবিষ্যৎ যুগের লোকশিক্ষার জন্য অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন।"[২]

রবীন্দ্রনাথ অবশ্য মহাভারতকে অন্যতম সংহিতা বা সংগ্রহগ্রন্থ হিসাবে দেখে লিখেছেন : "আর্যসমাজে যতকিছু জনশ্রুতি ছড়াইয়া পড়িয়াছিল তাহাদিগকে তিনি (ব্যাসদেব) এক করিলেন। জনশ্রুতি নহে, আর্যসমাজে প্রচলিত সমস্ত বিশ্বাস, তর্ক-বিতর্ক ও চরিত্রনীতিকে এই সঙ্গে এক করিয়া একটি জাতির সমগ্রতার এক বিরাট মূর্তি এক যায়গায় খাড়া করিলেন। ইহার নাম দিলেন মহাভারত......ইহা ব্যক্তিবিশেষের রচিত ইতিহাস নহে, ইহা একটি জাতির স্বরচিত স্বাভাবিক ইতিহাস।"[৩]

জাতির সমগ্রতার এই বিরাট মূর্তি কতটা এককভাবে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস-কৃত, তা নিয়ে যথেষ্ট মতবিরোধ আছে। আবার কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস ঠিক কে তা নিয়েও পণ্ডিতগণ একমত নন।

প্রথম বিষয়টি সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন : "আদিম মহাভারত ব্যাসদেবের প্রণীত হইতে পারে, কিন্তু আমরা কি তাহা পাইয়াছি? প্রক্ষিপ্ত বাদ দিলে যাহা থাকে তাহা কি ব্যাসদেবের রচনা?"[৪] এই প্রক্ষিপ্ত অংশ-ব্যাপারে তিনি আরও বলেছেন : "অন্য কোন দেশে কোন ইতিহাসগ্রন্থ মহাভারতের ন্যায় আদর বা গৌরব প্রাপ্ত হয় নাই। সুতরাং ভারতবর্ষীয় লেখকগণের পক্ষে মহাভারতে স্বীয় রচনা প্রক্ষিপ্ত করিবার যে লোভ ছিল, অন্য কোন দেশীয় লেখকদিগের সেরূপ ঘটে নাই।" তবে "...অন্য দেশের লেখকেরা আপনার যশ বা তাদৃশ অন্য কোন কামনার বশীভূত হইয়া গ্রন্থপ্রণয়ন করিতেন...কিন্তু ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণেরা

১ কৃষ্ণচরিত্র ২ মহাকাব্যের লক্ষণ ৩ ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা ৪ কৃষ্ণচরিত্র

নিঃস্বার্থ ও নিষ্কাম হইয়া রচনা করিতেন। লোকহিত ভিন্ন আপনাদের যশ তাঁহাদিগের অভিপ্রেত ছিল না। অনেক গ্রন্থে তৎপ্রণেতার নামমাত্র নাই…ঈদৃশ নিষ্কাম লেখক, যাহাতে মহাভারতের ন্যায় লোকায়ত গ্রন্থের সাহায্যে তাঁহার রচনা লোকমধ্যে বিশেষ প্রকারে প্রচারিত হইয়া লোকহিত সাধন করে, সেই চেষ্টায় আপনার রচনাসকল তাদৃশ গ্রন্থে প্রক্ষিপ্ত করিতেন…।"[৫]

এই প্রসঙ্গে রাজশেখর বসুর প্রায় অনুরূপ উক্তিটিও উদ্ধৃতি করা যেতে পারে: "সকল দেশেই কুশীলব বা plagiarist, যাঁরা পরের রচনা চুরি করে নিজের নামে চালান। কিন্তু ভারতবর্ষে কুশীলবের বিপরীতই দেখা যায়। এঁরা কবিযশপ্রার্থী নন, বিখ্যাত প্রাচীন গ্রন্থের মধ্যে নিজের রচনা গুঁজে দিয়েই কৃতার্থ হন। এই প্রকার বহু রচয়িতা ব্যাসের সহিত একাত্ম হবার ইচ্ছায় মহাভারত-সমুদ্রে তাঁদের ভালমন্দ অর্ঘ্য প্রক্ষেপ করেছেন।"[৬]

মোটকথা নিষ্কাম লেখক লোকহিতের জন্যই হোক, আর সকাম লেখক কৃতার্থ হবার জন্যই হোক মহাভারতে নিজের রচনা অনেক ক্ষেত্রেই গুঁজে দিয়েছেন। অর্থাৎ মহাভারত একজনের রচনা নয়—সংহিতা বা সংকলনগ্রন্থ হলেও সংকলন করেছেন একাধিক সংকলক। তবুও কিন্তু মনে হয়, মহাভারতের যে যে অংশে রাজনৈতিক ও সামাজিক তত্ত্ব ও ধারণা আছে, সেই সেই অংশ এক জনেরই রচনা, কারণ এই সব তত্ত্ব ও ধারণার মধ্যে বিশেষ চারিত্রিক সমতা লক্ষ্য করা যায়।

সেই একজন হলেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস। কিন্তু ব্যাসদেব কে? মনু সংখ্যায় চৌদ্দ হলে ব্যাসের সংখ্যা আরও বেশী—আঠাশ। 'ব্যাস' শব্দের একটি অর্থই সংকলক। অর্থাৎ যিনিই এই সংকলনকার্যে হাত দিয়েছেন, তিনিই ব্যাস নামে পরিচিত হয়েছেন।

যাঁরা মহাভারত পড়েছেন তাঁরা জানেন যে, মহাভারতে ব্যাসদেবের নিজের জন্মবৃত্তান্ত আছে। ব্যাসের জন্মবৃত্তান্তের পর মহাভারতে আছে: তিনি (ব্যাস) "বেদ এবং পঞ্চম-বেদ[৭] জৈমিনি, পৈল, স্বীয় পুত্র শুক এবং বৈশম্পায়নকে শিখাইলেন। তাঁহারা পৃথক্ পৃথক্ ভারত-সংহিতা প্রকাশিতা করিলেন।"[৮]

এই বিভিন্ন ভারতসংহিতার সংকলক প্রত্যেকেই হয়ত ব্যাস নামে পরিচিত হন। অনুরূপ ভাবে যিনি বা যাঁরা ব্যাসদেবের জন্মবৃত্তান্ত এবং তৎপূর্ববর্তী ঘটনাবলীর সংকলন করেছিলেন, তিনি বা তাঁরাও ব্যাস আখ্যা পান।

তবে মনে হয়, যিনি বৈশম্পায়ন প্রভৃতিকে 'পঞ্চম বেদ' শিখিয়েছিলেন তিনিই কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস। এবং আমাদের যা আলোচ্য বিষয়—মহাভারতের রাজনীতি, তা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস কর্তৃকই উক্ত। পরে কিছু কিছু অংশ প্রক্ষিপ্ত হলেও মূল রাজনৈতিক তত্ত্ব ও ধারণার মধ্যে একটা ঐক্যবদ্ধতা লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, সভাপর্বে দেবর্ষি নারদ-নির্দেশিত রাজধর্ম এবং শান্তিপর্বে ভীষ্ম-বর্ণিত রাজধর্মে প্রকৃতিগত কোন পার্থক্যই নেই। সুতরাং এই সব তত্ত্ব ও ধারণাকে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস অন্ততঃ পরিস্ফুটিত করেছিলেন, এবং তারপর এদের আর বিশেষ প্রকারভেদ ঘটেনি। এই

৫ একই গ্রন্থ

৬ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস-কৃত মহাভারত—সারোদ্ধার

৭ "মহাভারতকে পঞ্চম বেদ স্বরূপ ধর্মগ্রন্থও বলা হয়।"—রাজশেখর বসু

৮ আদিপর্ব ৬৩ অঃ। ৮৯-৯০—বর্ধমানরাজ অনুবাদ

সিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই আলোচনায় অগ্রসর হওয়া যেতে পারে।

মহাভারতের রাজনীতির প্রকৃতি:

অষ্টাদশ পর্ব (হরিবংশ ধরলে উনবিংশ পর্ব) মহাভারতে শান্তিপর্বেই পাওয়া যায় রাজনৈতিক তত্ত্ব ও ধ্যানধারণার সম্যক পরিচয়। অবশ্য ওপরের আলোচনা থেকে এ অনুমানও করা যাবে যে, অন্যান্য পর্বেও এই তত্ত্ব ও ধারণা বেশ কিছু কিছু ছড়ানো আছে। যেমন, আদিপর্বে আছে যে, ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ বলে জ্যেষ্ঠ হলেও রাজ্যলাভে বঞ্চিত হন (১০৯।২৫); রাজ্য অরাজক হলে তার আর দুর্দশার অন্ত থাকে না (৪১।২৭-৩১); ইত্যাদি। অন্ধ ব্যক্তি রাজ্যশাসনে অসমর্থ বলে যে রাজপদে অভিষিক্ত হতে পারে না তা মনু শুক্রাচার্য প্রভৃতিও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছেন; আর নৃপতিবিহীন রাজ্য যে অভিশাপেরই নামান্তর, তা মহাভারতের একাধিক পর্বে উক্ত হয়েছে।

সভাপর্বে দেবর্ষি নারদ-নির্দেশিত রাজধর্ম এবং শান্তিপর্বে ভীষ্ম-কথিত রাজধর্মের মধ্যে উল্লিখিত সমতার ব্যাখ্যাও করা যেতে পারে। পাণ্ডবদের সভায় এসে নারদ যুধিষ্ঠিরকে প্রশ্ন-কালীন নিম্নলিখিত উপদেশ দিলেন:

"মহারাজ, তুমি অর্থচিন্তার সঙ্গে সঙ্গে ধর্মচিন্তাও কর তো? কালবিভাগ করে সমভাবে ধর্ম অর্থ ও কামের সেবা কর তো? তোমার দুর্গসকল যেন ধনধান্য জল অস্ত্র যন্ত্র যোদ্ধা ও শিল্পিগণে পরিপূর্ণ থাকে। কঠোর দণ্ড দিয়ে তুমি যেন প্রজাদের অবজ্ঞাভাজন হয়ো না। বীর, বুদ্ধিমান, পবিত্রস্বভাব, সদ্বংশজ ও অনুরক্ত ব্যক্তিকে সেনাপতি করবে। সৈন্য-গণকে যথাকালে খাদ্য ও বেতন দেবে। শরণাগত শত্রুকে পুত্রবৎ রক্ষা করবে। পররাজ্য জয় করে যে ধনরত্ন পাওয়া যাবে তার ভাগ প্রধান প্রধান যোদ্ধাদের যোগ্যতা অনুসারে দেবে। তোমার যা আয় তার অর্ধেক বা এক-তৃতীয়াংশে বা এক-চতুর্থাংশে নিজের ব্যয় নির্বাহ করবে। গণক (হিসাব-রক্ষক) ও লেখকগণ (করণিক) প্রত্যহ পূর্বাহ্নে তোমাকে আয়-ব্যয়ের হিসাব দেবে। লোভী, চোর, বিদ্বেষী আর অল্পবয়স্ক লোককে কার্যের ভার দেবে না। তোমার রাজ্যে যেন বড় বড় জলপূর্ণ তড়াগ থাকে, কৃষি যেন কেবল বৃষ্টির উপর নির্ভর না করে। কৃষকদের যেন বীজ সার ও খাদ্যের অভাব না হয়, তারা যেন অল্প সুদে ঋণ পায়। তুমি নারীদের সঙ্গে মিষ্টবাক্যে আলাপ করবে কিন্তু গোপনীয় বিষয় বলবে না। ধনী আর দরিদ্রের মধ্যে বিবাদ হলে তোমার অমাত্যরা যেন ঘুষ নিয়ে মিথ্যা বিচার না করে। অন্ধ মূক পঙ্গু অনাথ ও ভিক্ষুদের পিতার ন্যায় পালন করবে। নিদ্রা আলস্য ভয় ক্রোধ মৃদুতা ও দীর্ঘসূত্রতা—এই ছয় দোষ পরিহার করবে।"[১]

উক্ত উপদেশ রাজধর্মের ওপর শিক্ষামূলক বক্তৃতা (discourse) ছাড়া আর কিছুই নয়। এই রাজধর্মেরই বিশ্লেষণ করা হয়েছে শান্তিপর্বে ভীষ্মের মুখ দিয়ে। ফলে শান্তিপর্বের এই অধ্যায়ের নাম হল রাজধর্মানুশাসনপর্বাধ্যায়।

শান্তিপর্বের অন্য একটি অধ্যায়কে মহা-ভারতকার 'আপদ্ধর্মপর্বাধ্যায়' বলে অভিহিত করেছেন। এই অধ্যায়ে নৃপতি আপদ্গ্রস্ত হ'লে কিভাবে আচরণ করবেন সে সম্বন্ধেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। স্পষ্টতই এই সব

১ রাজশেখর বসুর অনুবাদ

নির্দেশ ভূয়োদর্শনভিত্তিক এবং ফলে মেকিয়াভেলির কাছাকাছি গিয়ে পড়েছে। তবুও কিন্তু মহাভারতের কোথাও ধর্ম বা চূড়ান্ত বিধি-বিচ্যুত হবার কথা বলা হয়নি। আপদ্ধর্মও রাজধর্ম—আপদ্‌গ্রস্ত রাজার আচরণবিধি। সুতরাং সুপ্রতিষ্ঠিত নৃপতির আচরণবিধি থেকে তাকে পৃথক করে দেখতেই হবে। অভিজ্ঞ চিকিৎসক যেমন দুরূহ ব্যাধির ক্ষেত্রে বিষের ব্যবস্থা করতে কুণ্ঠিত হন না, তেমনি বিধি-প্রণেতা (Law-giver) আপদ্‌গ্রস্ত রাজার জন্যও পৃথক ধর্মাচরণপদ্ধতি নির্দেশ করতে বাধ্য। মহাভারতকার তাই-ই করেছেন। আবার তিনি স্মরণও করিয়ে দিয়েছেন—নৃপতি যেন কোন ক্ষেত্রে সীমা অতিক্রম না করেন, কারণ শেষ পর্যন্ত তাঁকে ধর্মের কাছে দায়ী হতে হবে।[১০]

লক্ষ্য করতে হবে, দেবর্ষি নারদের রাজধর্ম সম্বন্ধে উপদেশের মধ্যে এমন কয়েকটি বিষয় আছে যা আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে কল্যাণ-ব্রতী রাষ্ট্রেরই (Welfare State) দ্যোতক। উদাহরণস্বরূপ, কৃষির জন্য জলসেচ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যবস্থার উল্লেখ করা যেতে পারে। এমনকি সুলভ কৃষি-ঋণ-সংগঠনের কথাও বলা হয়েছে। প্রাচীনরাও কি আধুনিক (Are Ancients also modern)? ডিকিন্‌সন অন্তত তাই প্রমাণ করতে চেয়েছেন।[১১]

আরও একটি বিষয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আজকের দিনে আমরা যাকে 'জনপ্রিয় সার্ব-ভৌমিকতা' (Popular sovereignty) আখ্যা দিয়ে থাকি, মহাভারতে তার ওপরও গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। শান্তিপর্বে ভীষ্ম রাজধর্মের বিশ্লেষণকালে বলেছেন: "শাস্ত্রে ছয় প্রকার দুর্গের কথা বলা হয়েছে, তার মধ্যে মনুষ্যদুর্গ সর্বাপেক্ষা দুর্ভেদ্য।" অনেকে এই মনুষ্যদুর্গের (মনুসংহিতায় 'নৃদুর্গ') অর্থ করেছেন 'সেনাপরিবেষ্টিত দুর্গ'। কিন্তু, এই প্রসঙ্গে ভীষ্মের উপদেশটি অনুধাবন করলে অর্থ সম্বন্ধে কোন সংশয়ই থাকে না। ভীষ্মের উপদেশ হল, মনুষ্যদুর্গ সর্বাপেক্ষা দুর্ভেদ্য। রাজা প্রজা-গণের প্রতি যথাযুক্ত ব্যবহার করবেন যাতে তারা অনুরক্ত থাকে। অর্থাৎ, বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় বলা যায়, 'প্রজার শক্তিতেই রাজা শক্তিমান, নহিলে রাজার নিজ বাহুতে বল কত?' এই তত্ত্ব জনপ্রিয় সার্বভৌমিকতার ইঙ্গিত সুস্পষ্টভাবে বহন করে না কি? স্বামী বিবেকানন্দকেও উদ্ধৃত করে বলা যায়: "সমাজের নেতৃত্ব বিদ্যাবলের দ্বারাই অধিকৃত হউক বা বাহুবলের দ্বারা বা ধনবলের দ্বারা, সে শক্তির আধার—প্রজাপুঞ্জ। যে নেতৃসম্প্রদায় যত পরিমাণে এই শক্ত্যাধার হইতে আপনাকে বিশ্লিষ্ট করিবে, তত পরিমাণে তাহা দুর্বল।"[১২] রাজধর্মের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে এই হ'ল মহা-ভারতের মূল সুর।

অবশ্য মহাভারতে আছে, অনুরক্ত স্বল্প সৈন্য নিয়েও পৃথিবী জয় করা যায়। কিন্তু এ হ'ল আপদ্ধর্মাচরণ-প্রসঙ্গে স্মারক (reminder), স্বাভাবিক বা শান্তির সময়ে রাজ-আচরণবিধির অন্তর্ভুক্ত নয়। (ক্রমশঃ)

১০ Ghosal: Hindu Political Theories এবং D. M. Brown: White Umbrella

১১ See Dickinson: Greek View of Life

১২ বর্তমান ভারত

কণিকাপঞ্চক

শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ

এক

এ নৌকাতে নেইকো হাল
শতেক ঝড়ে ছেঁড়েনা পাল
        নেইকো এতে
            দিক্‌দর্শন যন্ত্র।
এ নৌকাতে তুমিই হাল
নেই সন্ধ্যা নেই সকাল
        পালের হাওয়া
            তোমার অভয়মন্ত্র।

দুই

শুধু নাম   অবিরাম   সেই নাম
মনে মনে   বার বার   শুধু ডাকা।
নিরুপম   সেই সুর   সেই গান
সেই পথ   চেয়ে শুধু   বসে থাকা।
সেই নাম   সেই গান   অভিরাম
মনে মনে   বার বার   শুধু ডাকা॥

তিন

নিঝুম রাত   তন্দ্রা নেই   ফুল ফোটে   ফুল ঝরে।
নীল ছায়া   কাঁপছে নীল   অরণ্যের   মর্মরে॥

চার

তুমি না জানালে কিছুতে যায় না জানা,
তোমার অরূপ রূপের ঠিক-ঠিকানা।

পাঁচ

যুগযুগান্ত যে সুর বাজছে
        কান পেতে শোনো ধ্বনি তা'র,
যে সুরে আকাশ গাঁথে অনন্ত
        নক্ষত্রের মণিহার!

রহস্য

ডক্টর গোপেশচন্দ্র দত্ত

মৃত্যুর রহস্য আছে কোথা ?
কেউ কি জেনেছে বিশ্বে, কেউ কি বলেছে কোন কথা ?
বুদ্ধ বুঝি জেনেছিল কিছু তার, তাই সে দেখালো নীরবতা !
ভীষ্ম কিছু বুঝেছিল শরশয্যা পেতে তাঁর সমর-প্রাঙ্গণে,
জীবনের উত্তর অয়নে :
তাই সে জানালো তাঁর সব কথা অন্তিম শিয়রে,
শান্তিপর্ব হলো সৃষ্টি প্রজ্ঞার নির্যাসখানি ধ'রে।

নচিকেতা অনুভব করেছিল নিজের সে প্রবুদ্ধ আত্মায়—
জীবনের গূঢ়বাণী, মৃত্যুর প্রখর ইসারায়।
তাই তার আসে ত্যাগ, তপস্যার বিপুল উল্লাস ;
মৃত্যু এক নিস্তব্ধতা, নেই কোন কথার প্রকাশ !
বিষণ্ন পাণ্ডব-জ্যেষ্ঠ মহাপ্রস্থানের পথে যেতে যেতে একা,
মৃত্যুকে কেমন ক'রে দেখেছিল নেই কিছু লেখা !
প্রেমের বিহ্বল রূপে মৃত্যু এলো চৈতন্যের কাছে,
অশ্রুর ভাবের বন্যা দিল রূপ যত কথা আছে।

মৃত্যু ও জীবন পাশাপাশি,—
চলে যাওয়া ধরে রাখা ভালোবাসাবাসি ;
অনন্তের অভিসার,—তারি পাশে বন্ধনের টান :
সৃষ্টি যেন মাঝখানে একখানি গম্ভীর পাষাণ।
সে-পাষাণে মাথা খুঁড়ে ধরিত্রীর কাঁদে মনোপাখী;
মৃত্যুর রহস্য ভেবে জন্মের রহস্যে ডুবে থাকি !

যে তীর্থ আজও আছে পঞ্চনদের দেশে

[পূর্বানুবৃত্তি]

শ্রীনির্মলচন্দ্র ঘোষ

নয়না দেবী

প্রসীদ ভগবত্যম্ব প্রসীদ ভক্তবৎসলে।
প্রসাদং কুরু মে দেবি দুর্গে দেবি নমোঽস্তু তে ॥*

[হে মাতঃ ভগবতি, আমার প্রতি প্রসন্না হউন। হে ভক্তবৎসলে, আমার প্রতি প্রসন্না হউন। হে দেবি, আমাকে কৃপা করুন। হে দুর্গে, আপনাকে প্রণাম করি।]

আনন্দপুর সাহেবের প্রায় দশ কিলোমিটার উত্তরে একটি পাহাড়ের উপরে নয়না দেবীর মন্দির। পাহাড় আনন্দপুরের সমতল ক্ষেত্র হতে প্রায় তিন হাজার ফুট উচ্চ।

নয়না দেবীর মন্দিরে শ্রীদুর্গাবিগ্রহ পূজিত হয়। দুর্গার নামই নয়না দেবী। মন্দিরটি খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে রাজা বীরচাঁদ নির্মাণ করেন। এ অঞ্চলে এরূপ প্রাচীন মন্দির নেই। পাহাড়ের উপরে ছিল বলেই বোধ হয় রক্ষা পেয়েছে। প্রতি বৎসর নবরাত্রির সময়ে শ্রাবণ শুক্লা প্রতিপদ হতে প্রায় এক সপ্তাহ ধরে মন্দিরের সম্মুখে মেলা হয়।

কিংবদন্তি, এক রাখাল প্রতিদিন তার একটি গরুকে পাহাড়ের চূড়ায় একটি শ্বেত পাথরের উপরে আপনা আপনি দুধ দিতে দেখে, সেখানে গিয়ে দেখে যে শ্বেত পাথরটি একটি দেবীর মূর্তি। পরে এই দেবী-মূর্তি মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হয়।

কথিত আছে, মোগল সম্রাটের বিরুদ্ধে অভিযান করার পূর্বে গুরু গোবিন্দ সিংহ দেবীর আশীর্বাদের জন্য এই তীর্থে আগমন করেন। পূজা ও যাগযজ্ঞ করার জন্য গুরুজী কাশী হতে একজন পুরোহিত আনিয়েছিলেন। কয়েক মাস ধরে যজ্ঞ করার পর দেবী আবির্ভূতা হন। গুরুজী প্রথমে দেবীকে দেখে ভীত হন, কিন্তু তারপরেই তিনি প্রকৃতিস্থ হয়ে আপনার তরবারি তাঁকে অর্পণ করেন। দেবী নিজ হস্তে তা স্পর্শ করে অন্তর্হিতা হন। পরে পুরোহিত গুরুজীকে বললেন যে, দেবীকে দর্শন করে তাঁর ভয় পাওয়া ঠিক হয় নাই। এই ক্রটি হতে মুক্ত হওয়ার জন্য তাঁর একটি পুত্র উৎসর্গ করতে হবে দেবীর কাছে। গুরুজী রাজী হলেন, কিন্তু গুরুপত্নীদ্বয় আপত্তি জানালেন। তখন গুরুজীর এক অন্তরঙ্গ শিষ্য নিজেকে দেবীর কাছে বলি দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, কারণ শিষ্যও পুত্রের মতই প্রিয়। তখন দেবীর নিকট তাকে বলি দেওয়া হল। দেবী আবার গুরুজীকে দর্শন দিলেন এবং বর দিলেন তাঁর শিষ্যগণের জয় হবে। গুরু গোবিন্দ পূর্ব জন্মেও শক্তির আরাধনা করেছিলেন। একথা তিনি নিজেই বিচিত্র নাটকে লিখে গেছেন।

সপ্তশৃঙ্গ তিহ নাম কহবা।
পাণ্ডুরাজ যাহা যোগ কমাবা ॥
তহি হাম অধিক তপস্যা সাধি।
মহাকাল কালিকা আরাধী ॥*

[(হিমালয়ের উপরে) সপ্তশৃঙ্গ তাহার নাম যেখানে পাণ্ডু রাজা যোগ করিয়াছিলেন, আমি সেখানে কঠোর তপস্যা করিয়া মহাকাল

* শ্রীশ্রীচণ্ডী

* গীতগোবিন্দ (বিচিত্র নাটক)

ও কালিকার আরাধনা করিয়াছিলাম।]

বিলাসপুর

প্রাতর্ভজামি শিবমেকমনন্তমাদ্যং
বেদান্তবেদ্যমনঘং পুরুষং মহান্তম্।
নামাদিভেদরহিতং ষড়্‌ভাবশূন্যং
সংসাররোগহরমৌষধমদ্বিতীয়ম্॥

[যিনি অদ্বিতীয়, অনন্ত, সর্বপ্রথম, বেদান্ত-গোচর, যিনি নিষ্পাপ, নামাদিভেদরহিত, ষড়্‌ভাবশূন্য ও ভবরোগ নাশ করার অব্যর্থ ঔষধ, আমি প্রাতঃকালে সেই মহান পুরুষ শিবের ভজনা করি।]

কিরাতপুর সাহেব হতে বিলাসপুর মোটর-পথে প্রায় পঁচিশ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে। কিরাতপুর অম্বালা-নান্‌গল-বাঁধ রেল লাইনে একটি ষ্টেশন।

বিলাসপুরে অতি প্রাচীন শিবমন্দির আছে। ঠাকুরের নাম রঘুনাথ শিব।

বিলাসপুরের প্রায় বার কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে এবং ব্রহ্মপুখুর হতে ছয় কিলোমিটার দূরে প্রাচীন মার্কণ্ডেয় তীর্থ। কিংবদন্তি, পুরাকালে মার্কণ্ডেয় ঋষি এই পুণ্য স্থানে তপস্যা করেছিলেন। যাত্রিগণ তীর্থে অব-গাহন করে। বৈশাখী পূর্ণিমায় বড় মেলা হয়। মার্কণ্ডেয় তীর্থের কাছেই বড়ী কিষণ নামে আর একটি তীর্থ আছে।

গোবিন্দ গড় (ভাটিণ্ডা)

গোবিন্দ গড় রেলপথে দিল্লী হতে দুই শত আট কিলোমিটার দূরে। পূর্বে সহরটি পাতিয়ালা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। গোবিন্দ গড়ের অপর নাম ভাটিণ্ডা।

গোবিন্দ গড়ে কেল্লার মধ্যে শিখদের দশম ও শেষ গুরু গোবিন্দ সিংহের নামে একটি প্রসিদ্ধ মন্দির আছে।

ভাটিণ্ডা রেল ষ্টেশন হতে ঊনষাট কিলো-মিটার দূরে, ভাটিণ্ডা হতে অম্বালা যাওয়ার রেলপথে, হড়িয়াইয়া রেল ষ্টেশন। নবম গুরু তেগ বাহাদুরের নামে এখানে একটি গুরুদ্বার ও পুণ্য পুষ্করিণী আছে।

ধোসি

ঋতং সত্যং পরং ব্রহ্ম পুরুষং কৃষ্ণপিঙ্গলম্।
ঊর্ধ্বরেতং বিরূপাক্ষং বিশ্বরূপায় বৈ নমঃ॥*

[যিনি পরব্রহ্ম তিনিই পারমার্থিক সত্যস্বরূপ; তিনি পরমপুরুষ, তাঁর বর্ণ কৃষ্ণ ও পিঙ্গল। তিনি ঊর্ধ্বরেতা, ত্রিনেত্র ও বিশ্বরূপ।]

নারনৌল রেল ষ্টেশন হতে ছয় কিলো-মিটার দূরে, পাহাড়ের উপরে সমতল ক্ষেত্রে ধোসি গ্রাম। নারনৌল রেবাড়ি জংশন হতে একান্ন কিলোমিটার দূরে।

ধোসিতে পাহাড়ের উপরে চন্দ্রকূপ নামে একটি পুণ্য কূপ আছে। পাহাড়ে ওঠার রাস্তায় সূর্যকুণ্ড এবং নামবার রাস্তায় শিবকুণ্ড নামে পবিত্র জলাশয় আছে।

প্রতি সোমাবতী অমাবস্যায় ধোসিতে মেলা হয়। কার্ত্তিক ও চৈত্র মাসে বড় মেলা হয়।

কিংবদন্তি, ধোসিতে চ্যবন মুনির আশ্রম ছিল।

নারনৌলের প্রায় দশ কিলোমিটার দক্ষিণ দিকে কমনিয়া গ্রামের নিকটে রামনাথ কাশী নামে একটি তীর্থ আছে। এখানে রামনাথ শিবের মন্দির প্রসিদ্ধ। এতদ্ভিন্ন আশেপাশে সাকেতবিহারী (রাম), অমরনাথ (শিব), দুর্গা ও হনুমানের মন্দিরও আছে। শিবরাত্রির সময় রামনাথ কাশীতে বড় মেলা হয়।

নারনৌলের প্রায় চব্বিশ কিলোমিটার দক্ষিণে ঢাকোরা গ্রামে রাধাকৃষ্ণের মন্দির প্রসিদ্ধ। এখানে একটি পুণ্য পুকুরও আছে।

ঢাকোরার প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দক্ষিণে

* স্তবকুসুমাঞ্জলি

দুর্গা-কা মাম্‌গল গ্রামে া দেবীর মন্দির প্রসিদ্ধ।

নমস্তে শরণ্যে শিবে সানুকম্পে
নমস্তে জগদ্ব্যাপিকে বিশ্বরূপে।
নমস্তে জগদ্বন্দ্য-পাদারবিন্দে
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥

[হে শরণাগত পালিকে, মঙ্গলময়ী, করুণাময়ী আপনাকে নমস্কার। হে জগদ্ব্যাপিকে, বিশ্বরূপিণি, আপনাকে নমস্কার। হে সকলের প্রণম্য, আপনার চরণপদ্মে নমস্কার। হে জগতের উদ্ধারকারিণী দুর্গা দেবী, আপনাকে নমস্কার; আপনি আমাকে পরিত্রাণ করুন।]

কপালমোচন

অম্বালা সহরের আটান্ন কিলোমিটার দূরে জগাধ্রি রেলষ্টেশন। জগাধ্রির প্রায় ষোল কিলোমিটার উত্তরে বিলাসপুর। বিলাসপুরের তিন কিলোমিটার উত্তর--উত্তর-পূর্বে প্রসিদ্ধ কপালমোচন* তীর্থ।

কপালমোচন তীর্থ একটি পুষ্করিণী। ব্রহ্মা যখন তাঁর কন্যা সরস্বতীর রূপে মুগ্ধ হয়ে তার পেছনে ছুটছিলেন, দেবাদিদেব মহাদেব ব্রহ্মার এই অন্যায় আচরণ দেখে তাঁর মস্তকে দারুণ আঘাত হানলেন। ব্রহ্মা নিবৃত্ত হলেন, কিন্তু তাঁর সেই কপাল ও চুল মহাদেবের হাতে লেগে রইল এবং মহাদেবের শরীরের রঙও কালো হয়ে গেল। তিনি তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করতে লাগলেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁর হাত হতে ব্রহ্মার কপাল ও চুল খসল না, আর গায়ের রঙও স্বাভাবিক হল না। অবশেষে কপালমোচন তীর্থের নিকটে এসে তিনি যখন একদিন রাত্রে এক গোশালায় অবস্থান করছিলেন, তখন সেই গোশালায় এক গরু ও তার বৎস ছিল। বাছুরটি জানতে পেরেছিল যে গৃহস্বামী পরদিন তাকে বলদ করার জন্য অস্ত্রোপচার করবে। বাছুরটি এজন্য খুব দুঃখিত ছিল। রাত্রে সে তার মাকে বলল, "আমরা গৃহস্বামীকে কাল হত্যা করব।" গৃহস্বামী ছিল ব্রাহ্মণ; তাই গরুটি তার বৎসকে বলল, "তাহলে আমাদের ব্রহ্মহত্যার মহা পাপ হবে"। তখন বাছুরটি বলল, "মা, আমি একটি পুণ্যতীর্থ জানি, সেখানে স্নান করলে আমাদের ব্রহ্মহত্যার পাপ দূর হয়ে যাবে।" অগত্যা গরুটি তার বৎসের কথায় রাজি হল। শিব গোশালায় থেকে তাদের এই কথা শুনলেন এবং সকালে তাদের অনুসরণ করে দেখতে পেলেন যে, তারা তাদের পূর্বরাত্রের সঙ্কল্প অনুযায়ী গৃহস্বামীকে গুঁতিয়ে হত্যা করল। তাদের গায়ের রঙ কাল হয়ে গেল। তারপর তারা নিকটে এক তীর্থে যেয়ে তাতে স্নান করল; তখন তাদের গায়ের রঙ আবার স্বাভাবিক হল। শিবও স্নান করে ব্রহ্মহত্যার পাপ হতে মুক্ত হলেন এবং তাঁর হাত হতে ব্রহ্মার কপাল ও কেশ খসে পড়ল। তীর্থের নাম হল কপালমোচন।

উপরি-উক্ত গরু-বাছুরের কাহিনীটি এই তীর্থ সম্বন্ধে এতদঞ্চলে প্রচলিত।

কপালমোচন তীর্থের ধারে কয়েকটি প্রাচীন মন্দির আছে, আর আছে ঋণমোচন তীর্থ নামে আর একটি জলাশয়।

কার্ত্তিক মাসে কপালমোচন তীর্থে মেলা হয়।

জিন্দ

জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী।
দুর্গা শিবা ক্ষমা ধাত্রী স্বাহা স্বধা
নমোঽস্তু তে॥

[হে দেবি, আপনি জয়ন্তী, মঙ্গলা, কালী,

* এই নামে ভারতে আরও তীর্থ আছে।

ভদ্রকালী, কপালিনী দুর্গা, শিবা, ক্ষমা, ধাত্রী, স্বাহা (দেবপোষিণী) ও স্বধা (পিতৃপোষিণী); আপনাকে নমস্কার।]

জিন্দ্ সহর রেলপথে রোহ্তক সহর হতে চল্লিশ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। দিল্লী হতে জিন্দ্ এক শত আঠাশ কিলোমিটার। সহর পশ্চিম যমুনা খালের (West Yamuna Canal) তীরে অবস্থিত।

জিন্দে জয়ন্তী দেবী, ভূতেশ্বর মহাদেব ও হরি-কৈলাসের মন্দির প্রসিদ্ধ। মন্দিরগুলি প্রাচীন। এতদ্ভিন্ন সহরে সোনা-ভূতেশ্বর ও সূর্যকুণ্ড নামে দুইটি পবিত্র জলাশয় আছে।

কিংবদন্তি—পুরাকালে পাণ্ডবগণ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে জয়লাভের জন্য জিন্দের জয়ন্তী দেবীর অর্চনা করেছিলেন। জিন্দ হতে পাণিপথের পথে, নয় কিলোমিটার দূরে, পাণ্ডু-পিণ্ডারা তীর্থ। রেলস্টেশন আছে। এখানে একটি পবিত্র জলাশয়ের ধারে কয়েকটি মন্দির আছে। যাত্রীরা তীর্থে শ্রাদ্ধ ও তর্পণ করে। প্রতি সোমাবতী অমাবস্যায় মেলা হয়।

কালাইয়াত্

নরবানা হতে কৈথলের রেলপথে কালাইয়াত্ দূরত্ব মাত্র সতের কিলোমিটার।

কালাইয়াতে কপিল মুনির তীর্থ নামে একটি পবিত্র জলাশয়, আর দুইটি প্রাচীন মন্দির আছে। কিংবদন্তি মন্দিরদ্বয় পুরাকালে রাজা শালিবাহন নির্মাণ করেছিলেন। পূর্বে এখানে আরও অনেক মন্দির ছিল, তা ঔরঙ্গজেব ধ্বংস করেছে।

পাতিয়ালা

এষা সা বৈষ্ণবী মায়া মহাকালী দুরত্যয়া।
আরাধিতা বশীকুর্যাৎ পূজাকর্তুশ্চরাচরম্॥

[এই অপার বিষ্ণুমায়া আরাধনা করিলে পূজকের বিশ্বজগৎ বশীভূত হয়।]

অম্বালা সহরের চল্লিশ কিলোমিটার পশ্চিমদিকে পাতিয়ালা সহর। রেলপথে পাওয়া যায়।

পাতিয়ালায় মহাকালী ও রাজেশ্বরী দেবীর মন্দির প্রসিদ্ধ। মন্দিরে সংস্কৃতে লেখা অতি প্রাচীন পাণ্ডুলিপি রক্ষিত আছে। কিংবদন্তি—এই পাণ্ডুলিপি মহাভারত-প্রণেতা ব্যাসদেবের লেখা।

পাতিয়ালায় একটি শিখদের গুরুদ্বারাও আছে।

সহরের প্রায় ছয় কিলোমিটার দূরে, উত্তর-পূর্বদিকে, বাহাদুর গড় কেল্লা। পাতিয়ালার মহারাজা করম সিংহ তেগ্ বাহাদুরের স্মৃতিরক্ষার্থে ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে এই কেল্লা তৈরি করেন। গুরু তেগ্ বাহাদুর শিখদের নবম গুরু। পূর্বে তিনি এই স্থানে এসেছিলেন। ঔরঙ্গজেব তাঁকে দিল্লীতে লয়ে হত্যা করে। কেল্লার সম্মুখে একটি গুরুদ্বারা আছে। বৈশাখ মাসে বাহাদুর গড়ে মেলা হয়।

পাতিয়ালা সহরের সাইত্রিশ কিলোমিটার পশ্চিমে ভবানীগড় রেলস্টেসন। ভবানীগড়ে, কেল্লার মধ্যে, ভবানী দেবীর মন্দির প্রসিদ্ধ। কিংবদন্তি—যেখানে মন্দির, পূর্বে সেখানে একটি মেষ একা দুটি নেকড়ে বাঘকে ঘায়েল করেছিল। ভবানীগড়ের অপর নাম দোধন।

পাতিয়ালা হতে চুয়ান্ন কিলোমিটার দূরে পেইল সহর। চাবা পেইল রেলস্টেসন হতে পেইল প্রায় দশ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে। পেইলে 'দশ নাম কা আখরা' নামে একটি

মহাদেবের মন্দির আছে, আর আছে একটি পুণ্যতীর্থ, নাম গঙ্গাসাগর।

মহেশঃ পরমং ব্রহ্ম শান্তঃ সূক্ষ্মঃ পরাৎপরঃ।
সর্বান্তরঃ সর্বসাক্ষী চিন্ময়স্তমসঃ পরঃ॥

সিরহিন্দ্‌

অম্বালা রেলস্টেসনের প্রায় ছিয়াল্লিশ কিলোমিটার দূরে সিরহিন্দ্‌ একটি উল্লেখযোগ্য সহর। রেলপথে যাওয়া যায়।

সিরহিন্দ্‌ রেলস্টেসনের প্রায় দশ কিলোমিটার দূরে, পশ্চিম দিকে, ফতেহগড় মন্দির রেলস্টেসনের নিকটে, প্রসিদ্ধ ফতেহগড় গুরুদ্বারা। যেখানে এই গুরুদ্বারা অবস্থিত, সেখানে ঔরঙ্গজেবের সময়ে সিরহিন্দের মুসলমান শাসনকর্তা দশম গুরু গোবিন্দ সিংহের দুই বালক-পুত্রকে অতি নৃশংসভাবে ভাবে হত্যা করে। সে বালক দুটিকে একটি ঘরে বন্দী করে, তারপর সেই ঘরের দরজা জানালা ইট গেঁথে বন্ধ করে দেয়। ফলে বালক দুটি শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যায়। পরে শিখগণ তাদের মৃতদেহ উদ্ধার করে নিকটবর্তী স্থানে সৎকার করে। যেখানে সৎকার করা হয়, সেখানে তারা একটি মন্দির তৈরি করেন, নাম 'গুরুদ্বারা জ্যোতিস্বরূপ'।

মচ্ছিবারা

জ্বালাকরালমত্যুগ্রমশেষাসুরসূদনম্।
ত্রিশূলং পাতু নো ভীতে র্ভদ্রকালি
নমোঽস্তু তে॥*

[হে ভদ্রকালি, আপনার ভীষণ, উজ্জ্বল, অতি তীক্ষ্ণ ও অসংখ্য অসুর-বিনাশক ত্রিশূল আমাদিগকে রক্ষা করুক।]

পাঞ্জাবের লুধিয়ানা সহরের প্রায় বত্রিশ কিলোমিটার পূর্বদিকে, রুপর যাওয়ার রাস্তায়, মচ্ছিবারা সহর।

মচ্ছিবারায় ভদ্রকালীর একটি প্রাচীন মন্দির আছে। দেবীর নাম দেওয়ালি দেবী।

অমৃতসর

অমৃতসর পাঞ্জাবের এক বিখ্যাত সহর। রেলপথে অম্বালা হতে অমৃতসরের দূরত্ব প্রায় দুইশত পঞ্চাশ কিলোমিটার।

অমৃতসর শিখদের একটি বড় তীর্থ। এখানে তাদের বিখ্যাত স্বর্ণমন্দির ও অমৃতসর বা অমৃতসরোবর নামে পুষ্করিণী আছে। স্বর্ণমন্দিরে কোন মূর্তি বা বিগ্রহ নাই; গ্রন্থসাহেব নামে শিখদের ধর্মগ্রন্থের পূজা ও পাঠ হয়। পূজারিগণ প্রতিদিন গ্রন্থসাহেব হতে ভগবানের স্তব স্তুতি ও ভক্তি-ভাবোদ্দীপক গান নিয়মিত পাঠ করেন। গ্রন্থসাহেব গুরুমুখী ভাষায় লেখা।

স্বর্ণমন্দির ও পুণ্যতোয়া অমৃতসর ছাড়াও অমৃতসরে আরও মন্দির ও পুণ্যতোয়া দীঘি আছে। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল দুর্গিয়ানা (দুর্গাদেবীর মন্দির), সত্যনারায়ণের মন্দির, লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দির এবং সন্তোষসর, রামসর, কমলসর ও বিবেকসর।

অমৃতসরের ইতিহাসের সঙ্গে একটি অলৌকিক কাহিনী জড়িত। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধে, চতুর্থ শিখ-গুরু রামদাসের সময়ে, পাঞ্জাবে এক ধনী দম্পতি বাস করতেন। তাঁদের একটি অবিবাহিতা যুবতী কন্যা ছিল। মেয়েটি ঘটনাচক্রে কয়েকজন ধর্মপ্রাণা শিখ মহিলার সম্পর্কে শিখধর্মের প্রতি খুব অনুরক্ত হয়। সে বাড়ীতে গ্রন্থসাহেবের ভগবৎভাবোদ্দীপক স্তবস্তুতি প্রায়ই আবৃত্তি করত। তার বাবা মা তাকে বারে বারে এইরূপ ভজন করতে বারণ করা সত্ত্বেও সে শিখদের মত ভজন করতে লাগল। মেয়ের

* শ্রীশ্রীচণ্ডী

এই একগুঁয়েমিতে বিরক্ত হয়ে শেষে তারা এক গরীব কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত যুবকের সঙ্গে তার বিয়ে দিয়ে দিল। মেয়েটি অতি সৎ ছিল। সে নিজের অবস্থা মেনে নিয়ে তার কুষ্ঠ-ব্যাধিগ্রস্ত স্বামীর সেবাই জীবনের ব্রত করল। যে পাপের জন্য কুষ্ঠ হয়েছে তা হতে মুক্ত হওয়ার জন্য যুবকটি তার নববিবাহিতা পত্নীর কাছে তীর্থভ্রমণের ইচ্ছা প্রকাশ করলে যুবতী মেয়েটি তাকে একটি ঝাঁকার মধ্যে বহন করে নানা তীর্থ ভ্রমণ করতে করতে শেষে অমৃত-সরের তীরে নিয়ে এল। শিখগুরু রামদাস তখন এই সরোবর খনন করছিলেন। যুবতী স্বামীকে তীরে বসিয়ে রেখে ভিক্ষার জন্য নিকটবর্তী গ্রামে গেল। যুবক ঐখানে বসে দেখতে পেল দুটি রাজহংস অমৃতসরের জলে ক্রীড়া করছে। আসলে ঐ রাজহংসদ্বয় ছিল মানসসরোবরের পরমহংস। যুবকটির ইতিমধ্যে তৃষ্ণা পাওয়ায় এবং গরম বোধ হওয়ায় সে ধীরে ধীরে জলের ধারে গেল এবং তীরবর্তী একটি গাছের ডাল এক হাতে ধরে স্নান করল এবং জল পান করল। স্নান করার সঙ্গে সঙ্গেই তার গায়ের ঘা সব দূর হয়ে গেল এবং তার পূর্বের সৌন্দর্য ফিরে এল। যুবতী ভিক্ষা করে এসে তার স্বামীকে দেখে চিনতে পারল না। সে মনে করল, এই যুবক তার পতিকে হত্যা করে এখন তার সতীত্ব নষ্ট করতে চায়। যুবক তার বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য জলের অলৌকিক গুণের কথা বলল। কিন্তু সে কিছুতেই তা বিশ্বাস করতে পারল না। আশেপাশে যে দুচার জন লোক এই অলৌকিক ঘটনা দেখেছিল, তারা বললেও যুবতীর সন্দেহ দূর হল না। অনন্যোপায় হয়ে শেষে তারা দুজনকে গুরু রামদাসের কাছে লয়ে তাঁকে এই সব কথা খুলে বলল। গুরুজী সব শুনে যুবতীকে বললেন যে, এই যুবকই তার পতি, অমৃতসরের জলে স্নান করে সে তাঁর পূর্বশ্রী ফিরে পেয়েছে। প্রমাণ হিসাবে তিনি দেখালেন যুবকের এক হাতের কয়েকটি আঙ্গুলে তখনও কুষ্ঠের ঘা আছে। ঐ হাত দিয়ে যুবক গাছের ডাল ধরে ছিল, তাই আঙ্গুলে সরোবরের জল লাগে নাই। গুরুজীর আদেশে তখন যুবক অমৃতসরের জলে তার সেই আঙ্গুলগুলি ধুয়ে ফেলল। সকলে তারপর দেখল আঙ্গুলে আর কুষ্ঠব্যাধির চিহ্নও নাই। এবার যুবতীর সন্দেহ দূর হল। তার আনন্দের আর সীমা রইল না। এই ঘটনার পরে সরোবরের নাম হল 'দুঃখ-

। কিংবদন্তি—বহুকাল পূর্বে বর্তমান অমৃতসরের স্থানে ছিল এক স্বচ্ছসলিলা পুণ্য-তীর্থ। তার চারদিকে ছিল ঘোর জঙ্গল। আদিগুরু নানক দেখেছিলেন এই তীর্থ। এই জলাশয়ের তীরে তিনি কিছুকাল ধ্যান-ধারণায় অতিবাহিত করেন। তৃতীয় গুরু অমরদাস এখানে একটি মন্দির স্থাপন করতে ইচ্ছুক হয়ে চতুর্থ গুরু রামদাসকে তা সমাপন করার ভার দেন। গুরু রামদাস এখানে একটি সহর পত্তন করেন। সহরের তখন নাম হল রামদাসপুর বা চক্ রামদাস। ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে গুরু রামদাসের শিষ্যগণ জলাশয়টি বড় ও গভীর করার কাজ আরম্ভ করেন এবং দীঘির তখন নাম হল অমৃতসরোবর বা অমৃতসর, যেহেতু তার জলের রোগ নিরাময় করার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। দীঘির নামানুসারে রামদাসপুরের নাম করা হল অমৃতসহর বা অমৃতসর। ১৫৮৯ খৃঃ পঞ্চম গুরু অর্জুনদেবের এক মুসলমান ভক্ত অমৃতসর দীঘির মধ্যে স্বর্ণমন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করেন। (ক্রমশঃ)

স্বামী শিবানন্দের অপ্রকাশিত পত্র

(১)

শ্রীশ্রীগুরুদেব-শ্রীচরণভরসা

Hathiramjee Mutt, Otacamund, Madras, 20. 7. 26.

শ্রীমান সুবোধচন্দ্র,

তোমার ১৩।৭ তারিখের পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। প্রভুর শরণাপন্ন হইয়া কাতরে তাঁর শ্রীপাদপদ্মে প্রার্থনা করিও, তিনি ঠিক পথে তোমায় চালিত করিবেন। তুমি আমাকে তোমার সম্যক্ ভার লইতে বলিয়াছ উহা ভুল ; মানুষ মর্ত্ত্য মানুষ—সে কখন জীবের 'সব' ভার লইতে পারে? আমার যিনি সমস্ত ভার লইয়াছেন, আমি তোমায় তাঁর শ্রীপাদপদ্মে সমর্পণ করিয়াছি, এখন তিনিই তোমার সমস্ত ভার লইয়াছেন, ইহা নিশ্চয় জানিও। কায়মনোবাক্যে তাঁর শরণাপন্ন হও, বিশ্বাস ভক্তি জ্ঞান প্রীতি বিবেক বৈরাগ্যের জন্য তাঁর কাছে সকাতরে প্রার্থনা কর, তিনি ঈশ্বরাবতার, জীবের কল্যাণের জন্য আসিয়াছেন—এই বিশ্বাস হৃদয়ে দৃঢ় কর, তোমার পরম মঙ্গল হইবে। তিনিই জীবের অন্তরাত্মা, তোমারও অন্তরাত্মা—প্রার্থনা করিলেই বুঝিতে পারিবে, সাড়া পাবে। অধিক আর কি লিখিব, যা লিখিলাম, ইহা সার কথা।...প্রভু তোমার সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণ করুন। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

(২)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

Godavari House, Ootacamund, S. India. 21. 9. 26

শ্রীমান সুবোধ,

তোমার পত্র যথাসময়ে পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। আমার অধিক পত্রে লিখিবার নাই। আন্তরিক প্রার্থনা করি, ঠাকুর তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন। আর অধিক কি, আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্ব্বাদ তুমি জানিবে। অবশ্য শরীরের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া জপাদি করিবে। শরীর খারাপ হইলে কিছুই হইবে না। স্মরণ-মননটা সব সময় রাখিতে চেষ্টা করিবে। সমস্তই তাঁর কৃপার উপর নির্ভর। কেবল তাঁর কৃপার জন্য প্রার্থনা করিবে। সাধন ভজন হাজার করিলেও তাঁর কৃপা না হইলে সিদ্ধি হয় না। কেবল 'প্রভু, দয়া কর, আমি ভজনহীন, সাধনহীন, ভক্তিহীন, জ্ঞানহীন, আমাকে দয়া কর'—এই প্রার্থনা প্রাণের সহিত করিবে, তিনি নিশ্চয় তোমায় দয়া করিবেন। ঠাকুর নিজে এইরূপ করিয়া জগৎকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, আমরাও তাহাই করি এবং আমাদের কাছে যারা শিক্ষা করিতে আসে তাদেরও তাহাই বলি, ইহা অপেক্ষা সহজ সাধনা আর নাই। কেবল প্রাণের সহিত প্রার্থনা করা। ইতি

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

সমালোচনা

শ্রীশ্রীমা ও জয়রামবাটী—স্বামী পরমেশ্বরানন্দ। শ্রীশ্রীমাতৃমন্দির, জয়রামবাটী, বাঁকুড়া হইতে প্রকাশিত। পৃঃ ১৪২। মূল্য চারটাকা।

শ্রীশ্রীমায়ের একান্ত সেবক স্বামী পরমেশ্বরানন্দ ১৩১১ সালে শ্রীশ্রীমাকে প্রথম দর্শন করেন। সেইদিন হইতে ১৩২৬ সালের ১২ই ফাল্গুন শ্রীশ্রীমায়ের জয়রামবাটী হইতে শেষবার কলিকাতা যাত্রা পর্যন্ত জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমায়ের সহিত তাঁহার অবস্থানের স্মৃতি পুস্তকটিতে বিধৃত। ইহা ছাড়া, শ্রীশ্রীমায়ের তিরোধানের পর জয়রামবাটীতে মাতৃমন্দির-স্থাপন প্রভৃতির বিস্তৃত ইতিহাসও পুস্তকটিতে সংযুক্ত। সুদীর্ঘ ১৫ বৎসরকাল যাবৎ যিনি শ্রীশ্রীমায়ের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং এখন পর্যন্ত জয়রামবাটী আশ্রমেই রহিয়া গিয়াছেন, শ্রীশ্রীমার সম্বন্ধে তাঁহার লেখা স্মৃতিকথা এবং জয়রামবাটী আশ্রমের ইতিহাস—উভয়ই প্রামাণ্য এবং অতি মূল্যবান বিষয়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী-লিখিত ভূমিকা হইতে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিটিই এই পুস্তকে বিধৃত বিষয়বস্তুর শ্রেষ্ঠ পরিচায়ক: "জয়রামবাটী আশ্রমে শ্রীশ্রীমা কিরূপ স্বচ্ছন্দে থাকিতেন এবং স্থানীয় গ্রামবাসীদের সহিত কিরূপ সরলভাবে মেলামেশা করিতেন ও নানা দিগ্‌দেশাগত ভক্তদের জীবনে গুরুভাবের সহিত মাতৃভাব প্রতিষ্ঠিত করিতেন, তাহার বহু চিত্র এখানে পাওয়া যায়। সর্বোপরি সাংসারিক জীবনের মধ্যেও আধ্যাত্মিকতার বিকাশ কিভাবে সম্ভব, তাহারও বহু ইঙ্গিত এখানে পাওয়া যায়।"

সহজ সরল ভাষায় লিখিত, শ্রীশ্রীমায়ের কথা-সংবলিত এই পুস্তকটি যে পাঠকালে পাঠকের মনকে জয়রামবাটীতে লইয়া যাইবে, শ্রীশ্রীমায়ের সান্নিধ্যের অমৃতে সিঞ্চিত করিবে, সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। এই কারণেই পুস্তকটির বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীমদ্ভগবতীগীতা—মহোপাধ্যায় শ্রীকৈলাসচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত, পোঃ নবদ্বীপ, গানতলা রোড, জেলা নদীয়া। পৃষ্ঠা ৮০+৪; মূল্য এক টাকা।

ভগবতীগীতা মহাভাগবত মহাপুরাণের অন্তর্গত অনুপম যোগশাস্ত্র, অধ্যাত্মতত্ত্বপূর্ণ অতি উপাদেয় গ্রন্থ। মুক্তিকামী তত্ত্বজিজ্ঞাসু হিমালয়কে ব্রহ্মময়ী ভগবতী দুর্গা ভববন্ধন ছিন্ন করিবার যে উপায় নির্দেশ করিয়াছেন তাহাই এই গ্রন্থে বিধৃত। জীবের স্বরূপ, কর্মফল, ভক্তি, মুক্তি, বিদ্যা, অবিদ্যা, সাধনতত্ত্ব, ফলশ্রুতি প্রভৃতি সংস্কৃত শ্লোকে নিবদ্ধ।

দুষ্প্রাপ্য এই গ্রন্থখানি অশীতিপর বৃদ্ধ পণ্ডিত স্মৃতিতীর্থ মহাশয় প্রকাশ করিয়া শক্তি-দেবতার আরাধক মাতৃভক্ত জনসাধারণের বিশেষ ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। 'ভগবতী-গীতামৃতলহরী' শিরোনামে সুললিত পদ্যে বঙ্গানুবাদ সংযোজিত হওয়ায় গ্রন্থখানি সহজবোধ্য হইয়াছে। প্রারম্ভে প্রদত্ত সুলিখিত মনোজ্ঞ ভূমিকাটিতে জ্ঞাতব্য অনেক বিষয়ই উপস্থাপিত।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসব

বেলুড় মঠ ঃ গত ১১ই পৌষ (২৬.১২.৭২) মঙ্গলবার পুণ্য কৃষ্ণাসপ্তমীতে পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী সারদাদেবীর ১২০তম শুভ-জন্মতিথি উপলক্ষে বেলুড় মঠে সারাদিন-ব্যাপী আনন্দোৎসব হইয়াছিল।

প্রত্যুষে শ্রীশ্রীমায়ের মন্দিরে বেদপাঠ দ্বারা উৎসবের শুভারম্ভ হয়। তৎপরে ভজন, বিশেষ পূজা, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ ও হোমাদি হইয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরেও বিশেষ পূজাদি অনুষ্ঠিত হয়। পূর্বাহ্ণে 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' পাঠ ও কালীকর্তন হইয়াছিল।

অপরাহ্ণে মঠপ্রাঙ্গণে আয়োজিত জনসভায় স্বামী গম্ভীরানন্দ মহারাজ সভাপতিত্ব করেন। স্বামী নিরাময়ানন্দ, ডক্টর গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়, স্বামী রুদ্রানন্দ এবং সভাপতি মহারাজ শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্য জীবন ও বাণী অবলম্বনে সুচিন্তিত ভাষণ দেন।

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দিরে আরতির পর শ্রীশ্রীমায়ের মন্দিরে আরতি হয়। তারপর নাটমন্দিরে ভজন হইয়াছিল।

সারাদিন প্রায় বিশ হাজার ভক্ত নরনারী বেলুড় মঠে সমবেত হইয়াছিলেন। প্রসাদ হাতে হাতে বিতরিত হয়।

শ্রীশ্রীমায়ের বাটী ঃ কলিকাতা বাগবাজার পল্লীর ১নং উদ্বোধন লেনে শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্য-স্মৃতিধন্য ভবনে সারাদিনব্যাপী আনন্দোৎসবে শ্রীশ্রীমায়ের ১২০তম জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। পূর্বাহ্ণে বিশেষ পূজা, হোম, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ ও ভজনাদি হয়। নূতন ভবনের সভাগৃহে পূর্বাহ্ণে সারদাপীঠ (বেলুড়) ও রহড়া আশ্রমের সাধু ও ছাত্রগণ ভজন করেন এবং স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' হইতে শ্রীশ্রীমায়ের কথা পাঠ ও তাঁহার জীবন আলোচনা করেন। সন্ধ্যারতির পর এখানে ইচ্ছাময়ী কীর্তন সম্প্রদায়ের কালীকীর্তন হয় এবং স্বামী নিরাময়ানন্দ সদ্যপ্রকাশিত 'শ্রীশ্রীমা ও জয়রামবাটী' পুস্তক হইতে শ্রীশ্রীমায়ের কথা পাঠ করেন।

সকাল হইতে রাত্রি পর্যন্ত মোট প্রায় পাঁচ হাজার ভক্ত শ্রীশ্রীমায়ের পাদপদ্মে ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদন করিতে আসিয়াছিলেন। অন্যান্য বারের তুলনায় এবার ভক্তসমাগম অনেক অধিক হইয়াছিল। ভোরে মঙ্গলারতির পর হইতে রাত্রি পর্যন্ত হাতে হাতে প্রসাদ বিতরিত হইয়াছিল।

কল্পতরু উৎসব

কাশীপুর উদ্যানবাটীতে গত ১লা জানুআরি, ১৯৭৩, বাংলা ১৭ই পৌষ, ১৩৭৯ সোমবার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্য 'কল্পতরু-দিবস' উদ্‌যাপিত হয়। এতদুপলক্ষে উক্ত তারিখ হইতে দিবসত্রয়ব্যাপী মহোৎসব শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কল্পতরু-লীলাভূমি কাশীপুর উদ্যানবাটীতে অগণিত জনসমাবেশে প্রচুর আনন্দ ও উদ্দীপনা সহকারে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

প্রথম দিবস ১লা জানুআরি ভোর হইতে বেলা দেড় ঘটিকা পর্যন্ত মঙ্গলারতি, ঊষাকীর্তন, ধর্মসঙ্গীত, বিশেষ পূজা, হোম প্রভৃতির পর 'কথামৃত' পাঠ ও আলোচনা করেন স্বামী

রমানন্দ। পরে কালীকীর্তন, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাগীতি ও পদাবলীকীর্তন হয়।

অপরাহ্ণে আয়োজিত জনসভা স্বামী চিদাত্মানন্দের সভাপতিত্বে মনোজ্ঞভাবে অনুষ্ঠিত হয়। বক্তা ছিলেন স্বামী প্রমথানন্দ, স্বামী আত্মানন্দ ও স্বামী বুধানন্দ। স্বামী আত্মানন্দ হিন্দীতে এবং অপর সকলে বাংলায় ভাষণ দেন। সভান্তে রামায়ণ-গান (শবরীর প্রতীক্ষা) পরিবেশিত হয়।

২রা জানুআরি মধ্যাহ্নের পর কথা ও গানে শ্রীরামকৃষ্ণলীলাকীর্তন হইবার পর স্বামী নিত্যানন্দ গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পরে স্বামী লোকেশ্বরানন্দের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তৃতা করেন স্বামী নিরাময়ানন্দ ও স্বামী ভাস্করানন্দ। তৎপরে রামায়ণ-গান (লবকুশের অস্ত্রযুদ্ধ) হইয়াছিল।

৩রা জানুআরি বেলা ১টা হইতে খোল-লহরা, পল্লীগীতি, বাউল গান ও নরেন্দ্রপুর আশ্রমের বালকগণ কর্তৃক 'শ্রীশ্রীমা' কথা ও গানে পরিবেশিত হইবার পর উপনিষদ্ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। পরে স্বামী ভূতেশানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে ভাষণ দেন। সন্ধ্যায় বাংলাদেশের কবিগান (গান্ধারী ও শ্রীকৃষ্ণ) পরিবেশনের মাধ্যমে উৎসবের সমাপ্তি হয়।

কল্পতরু শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদন করিতে উদ্যানবাটীতে প্রতিদিন সমবেত হইয়াছিলেন প্রায় ত্রিশ হাজার করিয়া (বিকালের দিকে প্রায় দশহাজার করিয়া) ভক্ত নরনারী। প্রায় ১৮ হাজার ভক্তকে হাতে হাতে খিচুড়ী প্রসাদ দেওয়া হয়।

কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানে গত ১লা জানুআরি কল্পতরু-উৎসব যথারীতি পালিত হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ পূজা, হোম, পাঠ ও ভজনাদি উৎসবের অঙ্গ ছিল। সারাদিনই আশ্রমে লোকসমাগম হইতে থাকে। প্রসাদ হাতে হাতে বিতরিত হয়।

সেবাকার্য

বাংলাদেশে সেবাকার্য: বাংলাদেশে যে ৮টি সেবাকেন্দ্রের মাধ্যমে দুঃস্থ জনগণের জন্য সেবাকার্য পরিচালিত হইতেছে তাহাতে ১৯৭২ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ২৪,১০,৫৯৬'৫৯ টাকা ব্যয়িত হইয়াছে, এই টাকার মধ্যে দানস্বরূপে প্রাপ্ত জিনিসপত্রের মূল্য ধরা হয় নাই। নিম্নে গত নভেম্বর মাসে বিভিন্ন কেন্দ্রে পরিচালিত সেবাকার্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল:

ঢাকা কেন্দ্র কর্তৃক ১,৫৩৮ জন রোগীর চিকিৎসা করা হয় এবং নিম্নোক্ত দ্রব্যাদি বিতরিত হয়: কম্বল ৩,৫৩৮ খানি, শাড়ী ৬,৩১৭ খানি, ধুতি ৪৬৯ খানি, লুঙ্গি ২৪১টি, সোয়েটার ১,০৪৪টি, পুরাতন বস্ত্রাদি ৩,০৪০টি, শিশুদের পোশাক ১০টি, গামছা ২ খানি, গুঁড়া দুধ ৬,৮০০ পাউণ্ড, শিশুখাদ্য ৬৪'৩৫ কেজি, 'পত্রবক' বেবি ফুড ৩৪৩ বাক্স এবং সাবান ২১০ খানি।

বাগেরহাট কেন্দ্র কর্তৃক বিতরিত: কম্বল ৭২ খানি, শাড়ী ১৮ খানি, ধুতি ৬ খানি, লুঙ্গি ১২টি, সোয়েটার ৫৫টি, কোট ৯টি, বিস্কুট ৩৩ কেজি, গুঁড়া দুধ ২,৭২৪ পাউণ্ড, শিশুখাদ্য ও অন্যান্য টিন-ফুড ২০৫'৬৪ কেজি, বার্লি ১২'২৬ কেজি এবং চিনি ৪৬ কেজি। এতদ্ব্যতীত এই কেন্দ্র কর্তৃক ৫টি নলকূপ বসানো হইয়াছে এবং ৩,৩৪৪ পীড়িত জনের চিকিৎসা করা হইয়াছে।

দিনাজপুর কেন্দ্র কর্তৃক ১,৯২৯ জন রোগী চিকিৎসিত হন এবং বিতরিত

নিম্নলিখিত দ্রব্যাদি : শাড়ী ২,৬৬৬ খানি, ধুতি ২৪ খানি, কম্বল ৬৪ খানি, সোয়েটার ১১৩টি, পুরাতন বস্ত্রাদি ৫২৫টি, গুঁড়া দুধ ২,৫০০ পাউণ্ড, শিশুখাদ্য ১৩$\frac{1}{2}$ কেজি, সাবান ২৭টি, জুতা ৫ জোড়া।

ফরিদপুর কেন্দ্র কর্তৃক বিতরিত: কম্বল ১,৪৯৬ খানি, শাড়ী ১৪২ খানি, ধুতি ৪৩টি, বিস্কুট ৪০ কেজি এবং চিড়া ১১ কেজি।

বরিশাল কেন্দ্র কর্তৃক ২৭ খানি পাঠ্য পুস্তক দেওয়া হয়।

কেন্দ্র কর্তৃক ২০টি গৃহ নির্মিত হয় এবং ৯৪৬ জন রোগীর চিকিৎসা করা হয়। বিতরিত দ্রব্যাদি : কম্বল ৯৭৩ খানি, পুরাতন বস্ত্রাদি ১৯০টি, পলিথিন শীট ১ রোল, শিশুখাদ্য ৩৮০'২৫ কেজি।

আসাম উদ্বাস্তু সেবাকার্য : কাছাড় জেলায় **শিলচর** আশ্রম কর্তৃক ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় দাঙ্গাবিধ্বস্ত অঞ্চলে আর্তত্রাণকার্য এখনও চালাইয়া যাওয়া হইতেছে।

কোয়েম্বাতুর বন্যাত্রাণকার্য : **মাদ্রাজ** ও **সালেম** কেন্দ্র কর্তৃক যুক্তভাবে কোয়েম্বাতুর জেলায় ভবানী ফির্কা (Bhawani Firka) অঞ্চলে বন্যার্তদিগের মধ্যে সেবাকার্য আরম্ভ করা হইয়াছিল। ২৫. ১২. ৭২ পর্যন্ত ১৯টি গ্রামের ১,৭১৪ পরিবারের মধ্যে বিতরিত দ্রব্যাদি : ২,২৮৪ খানি ধুতি ও শাড়ী, ৫১টি টাওয়েল, ১,৪০০ সেট অ্যালুমিনিয়াম বাসন। ইহা ছাড়া কুটীর-নির্মাণের সরঞ্জাম বিতরণ করা হয়। এই সেবাকার্যে এখন পর্যন্ত খরচ হইয়াছে ৫০,০০০ টাকা।

বিবিধ

মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমে স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজ সেখানকার হাসপাতালের নূতন পাকভবনের (Kitchen Block) উদ্বোধন করিয়াছেন গত ৭ই ডিসেম্বর।

তমলুক শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে আয়োজিত এক সভায় স্বামী রঙ্গনাথানন্দ ২১.১১.৭২ তারিখে এক মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। পরে তিনি পাঁশকুড়া কলেজ, নাইকুড়ি উচ্চতর বিদ্যালয় এবং আশ্রমের দুইটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বক্তৃতা করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীকে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত করেন।

কাঁথি রামকৃষ্ণ মঠে আয়োজিত সভায় গত ২৫ ও ২৬ নভেম্বর, ১৯৭২, স্বামী রঙ্গনাথানন্দ 'ভক্ত ও ভগবান' এবং অন্যান্য বিষয়ে ভাষণ দেন। ২৫ তারিখ বিকাল ২টায় স্থানীয় প্রভাতকুমার কলেজে ও ২৬ তারিখ সকাল ৯টায় দীঘায় 'জীবনের লক্ষ্য' সম্বন্ধে তিনি বক্তৃতা করিয়াছেন।

কার্যবিবরণী

রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠান (৯৯, শরৎ বোস রোড, কলিকাতা ২৬) : এই প্রতিষ্ঠানের পূর্বনাম শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠান; ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত। বর্তমানে এটি কলিকাতা মহানগরীর বৃহৎ হাসপাতালগুলির অন্যতম। এখানে মেডিকেল, সার্জিক্যাল, রেডিওথেরাপি, রেডিওলজি প্রভৃতি সকল বিভাগই সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত। শয্যাসংখ্যা ৪২৫ (পুরুষদের জন্য ১১৪, মহিলাদের জন্য ২৫৬, শিশুদের জন্য ৫৫); ইহার মধ্যে ১৬০টি শয্যা ফ্রি। বিভিন্ন বিভাগে সুযোগ্য অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ নিযুক্ত আছেন। ল্যাবরেটরি, শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত অপারেশন থিয়েটার, ব্লাড ব্যাঙ্ক, এক্স-রে ইউনিট, ইলেক্ট্রিক লনড্রি প্রভৃতি বহুতলবিশিষ্ট সেবাপ্রতিষ্ঠানের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।

নার্সিং ও ধাত্রীবিদ্যা-শিক্ষণ বিদ্যালয় দক্ষতার সহিত যথারীতি পরিচালিত। এই

বিদ্যালয়ের দুইটি বিভাগ—সাহায্যকারী (auxiliary) ও সাধারণ (general)। নার্সিং-ছাত্রীনিবাস ও স্টাফকোয়ার্টারে প্রায় চারশত জন অবস্থান করেন।

সেবাপ্রতিষ্ঠানের ১৪তম বার্ষিক কার্য-বিবরণী (এপ্রিল, ১৯৭১—মার্চ, ১৯৭২) প্রকাশিত হইয়াছে।

ইনডোর: অন্তর্বিভাগে আলোচ্য বর্ষে মোট চিকিৎসিতের সংখ্যা ১১,৮৭৪; এতদ্ব্যতীত ৪,৭৫৭টি শিশুর জন্ম হয়।

আউটডোর: বহির্বিভাগে চিকিৎসা লাভ করেন মোট ১,১৩,২৩৬ জন, তন্মধ্যে নূতন ও পুরাতন রোগীর সংখ্যা যথাক্রমে ৪৯,৯৬২ ও ৬৩,২৭৪। আউটডোরে শতকরা ৫০ ভাগেরও বেশী রোগী বিনা-ব্যয়ে চিকিৎসিত হন এবং সকল রোগীই বিনা খরচে চিকিৎসাবিষয়ক উপদেশ ও ব্যবস্থাদি লাভ করেন।

সেবাপ্রতিষ্ঠানের স্নাতকোত্তর শিক্ষণ ও গবেষণা বিভাগটিতে এম-ও. এম-ডি, এম-এস ডিগ্রী কোর্সে শিক্ষাপ্রদানের ব্যবস্থা আছে।

বারাণসী রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের (রামকৃষ্ণ রোড, বারাণসী ১) ৭১তম বর্ষের (এপ্রিল, ১৯৭১—মার্চ, ১৯৭২) কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। পুণ্যক্ষেত্র বারাণসী-ধামে রামকৃষ্ণ মিশনের এই প্রাচীন সেবা-কেন্দ্রটি সুদীর্ঘকাল নিষ্ঠাসহকারে জাতিধর্ম নির্বিশেষে আর্তনারায়ণের সেবায় নিরত।

আলোচ্য বর্ষের কর্মধারা:

ইনডোর জেনারেল হাসপাতাল: শয্যা-সংখ্যা ১৮৬। ১৯৭১ খৃষ্টাব্দে অন্তর্বিভাগে রোগীর সংখ্যা ২,৮২২ (পুরুষ ১,৬৩৩, মহিলা ১,০৯৭ শিশু ৯২)। অস্ত্রোপচারের সংখ্যা ১,৫৩০। গঙ্গার ঘাট ও রাস্তা হইতে আনীত ৩৭ জন রোগীর চিকিৎসা করা হইয়াছে।

১৯৬৮ খৃষ্টাব্দে যে ব্লকটির নির্মাণকার্য আরম্ভ করা হইয়াছিল, সেই অপারেশন থিয়েটার সহ সার্জিকেল ব্লকটি গত ১২. ৯. ৭১ তারিখে শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ উদ্বোধন করিয়াছেন, এখানে ১৬টি কেবিন ও ২০টি সাধারণ শয্যা আছে।

আউটডোর: বহির্বিভাগে চিকিৎসার্থে প্রতিদিন গড়ে ৪৯২ জন রোগীর সমাগম হয়। সেবাশ্রমের শিবালা শাখা সহ ১৯৭১ খৃষ্টাব্দে আউটডোরে মোট চিকিৎসিতের সংখ্যা ৫২,৩৮৮, পুনরাবৃত্ত সংখ্যা ১,২৭,৪০৪ অস্ত্র-চিকিৎসা ও ইন্‌জেকশন যথাক্রমে ৪,০০৭ ও ৪৫,৫২৯।

হোমিওপ্যাথি বিভাগ: লাকসা ও শিবালা উভয় স্থানে ৫ জন হোমিওপ্যাথ রোগীদের চিকিৎসাকার্যে নিযুক্ত আছেন।

ক্লিনিক্যাল প্যাথলজিক্যাল বিভাগ এবং এক্স-রে ও ইলেকট্রোথেরাপি বিভাগ সুপরি-চালিত। ব্লাড-ব্যাঙ্কের কাজও উল্লেখযোগ্য।

বৃদ্ধ ও অসমর্থদের জন্য আশ্রয় ভবন: পুরুষদের আশ্রয়ভবনে ৪ জন ও মহিলাদের আশ্রয়ভবনে ২৭ জন অবস্থান করেন।

সাহায্য: ৫৪ জন দরিদ্র অসহায় ও অসমর্থ মহিলাকে যে অর্থসাহায্য দেওয়া হয়, তাহাতে খরচ হয় ১,৭৩১.৬০ টাকা। এতদ্ব্যতীত ১,২৭০.২২ টাকা মূল্যের কম্বল বিতরিত হয়।

গ্রন্থাগার: লাইব্রেরীতে ২,৭৪০ খানি পুস্তক আছে; ৩টি দৈনিক ও ২৪টি সাময়িক পত্রিকা রাখা হয়।

সেবাশ্রমের অধিকাংশ সেবামূলক কর্ম ত্যাগব্রতীদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে বিভিন্ন চিকিৎসা-বিভাগে অভিজ্ঞ চিকিৎকগণ চিকিৎসাকার্যে নিরত আছেন।

স্বামী শৈলানন্দের দেহত্যাগ

আমরা অত্যন্ত দুঃখিত চিত্তে জানাইতেছি, গত ৯.১২.৭২ রাত্রি ১০টা ৩৫ মিনিটের সময় স্বামী শৈলানন্দ মহারাজ ৯১ বৎসর বয়সে বারাণসী সেবাশ্রমে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বিকল হওয়ায় দেহত্যাগ করিয়াছেন। বার্ধক্যজনিত রোগে তিনি অসুস্থ ছিলেন।

তিনি শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন, ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে বাগবাজার মঠে যোগদান করেন এবং বহু বৎসর গড়বেতা আশ্রমের অধ্যক্ষ ছিলেন। গত কয়েক বৎসর যাবৎ তিনি অবসর-জীবন যাপন করিতেছিলেন।

তাঁহার আত্মা ভগবচ্চরণে চিরশান্তি লাভ করিয়াছে।

পরলোকে চক্রবর্তী রাজগোপালাচারী

ভারতের বয়োজ্যেষ্ঠ প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ্, ভারতের প্রথম ভারতীয় গভর্নর জেনারেল চক্রবর্তী রাজগোপালাচারী গত ২৫শে ডিসেম্বর মাদ্রাজ জেনারেল হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। দেহত্যাগকালে তাঁহার ৯৪ বৎসর বয়স হইয়াছিল। পরদিন সন্ধ্যায় কৃষ্ণমপেট শ্মশানে তাঁহার শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

প্রবীণ নেতা রাজগোপালাচারী তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনের ৬০ বৎসরকাল ভারতবর্ষের উত্থানপতন ও গতিবেগের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। তাঁহার বুদ্ধিমত্তা দূরদৃষ্টি ও প্রজ্ঞাকে সকলেই স্বীকৃতি দিতেন। পশ্চিম-বঙ্গের রাজ্যপাল থাকাকালে দক্ষ প্রশাসক হিসাবেও তিনি সর্বসাধারণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও স্বামী বিবেকানন্দের উপর তাঁহার বিপুল শ্রদ্ধা ছিল। তাঁহার একখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'শ্রীরামকৃষ্ণোপনিষৎ'। তীক্ষ্ণ মেধার সহিত তাঁহার চারিত্রিক দৃঢ়তাও ছিল অসাধারণ।

সালেম পৌরসভার চেয়ারম্যান হিসাবে তিনি অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন, মাদ্রাজের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন তিনি মদ্যপান-নিরোধের প্রচেষ্টা করেন। ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে ভারত সরকার তাঁহাকে 'ভারতরত্ন' উপাধি প্রদান করিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন। তামিল ভাষায় তাঁহার রচিত বহু গল্প এবং গীতা ও বেদান্তের উপর গ্রন্থ আছে; তাঁহার সম্পাদনায় প্রকাশিত 'স্বরাজ্য' পত্রিকা মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

রাজনীতির ক্ষেত্রে তিনি শেষে স্বতন্ত্র পার্টির প্রতিষ্ঠাতা হইলেও তাঁহার বলিষ্ঠ চিন্তাধারার প্রতি সর্বস্তরের মানুষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইত।

আমরা এই সর্বজনশ্রদ্ধেয় দেশনায়কের আত্মার শাশ্বত শান্তি কামনা করি।

উৎসব-সংবাদ

গত ২৬শে ডিসেম্বর, ১৯৭২ নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে প্রভাতফেরী, পূজা, পাঠ, হোম, ভজন ও প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি-উৎসব পালিত হইয়াছে।

ক্ষেপুত শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও বাণী আলোচিত হয়।

দোমড়া রামকৃষ্ণ আশ্রমে প্রায় তিন হাজার নরনারীকে বসাইয়া প্রসাদ দেওয়া হইয়াছে। সন্ধ্যারতির পর ভজন গীত হয়।

মাকড়দহ (হাওড়া) আশ্রমে রামায়ণগান, কালীকীর্তন, ছায়াছবি-প্রদর্শন, লীলাগীতি, পদাবলীকীর্তন প্রভৃতির মাধ্যমে চারদিন-ব্যাপী এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। শেষ দিন ২৬শে ডিসেম্বর আয়োজিত ধর্মসভায় সভাপতি স্বামী বিশ্বদেবানন্দ এবং প্রধান অতিথি স্বামী প্রত্যয়ানন্দ শ্রীশ্রীমায়ের সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন প্রায় দুই হাজার জন।

কসবা চিত্তরঞ্জন বিদ্যালয়ে দক্ষিণ কলিকাতা শ্রীশ্রীসারদা রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রচেষ্টায় গত ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৭২ শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসব পালিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে আয়োজিত সভায় স্বামী জীবানন্দ ও অধ্যাপিকা বিজয়া সেন শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও বাণী আলোচনা করেন। সভান্তে 'এণ্টালী মাঙ্গলিক' মাতৃগীতি পরিবেশন করেন।

অবলোহিত তারকা

বিজ্ঞানীদের ধারণা, মহাশূন্যে ভাসমান বস্তুকণাগুলি (প্রধানতঃ ইলেকট্রন, প্রোটন ও হাইড্রোজেন-অণু) একত্রিত হইয়া প্রথমে হালকা গ্যাসের মেঘের আকার ধারণ করে, পরে কেন্দ্রাভিমুখী আকর্ষণের ফলে আবর্তিত হইতে থাকায় উহার আকার ক্রমে ছোট হইতে এবং ঘনত্ব ও তাপ ক্রমে বাড়িতে থাকে। পরিণামে উহা লোহিতবর্ণ এবং শেষে শ্বেত-বর্ণের তারকারূপে আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। লোহিতরশ্মি-বিকিরণের পূর্বাবস্থায় তারকাটি অবলোহিত-রশ্মি বিকীর্ণ করে, যাহা আমরা দেখিতে পাই না। আধুনিক যুগের অবলোহিত-রশ্মিগ্রাহক যন্ত্র সহায়ে এরূপ অনেকগুলি অবলোহিত তারকার অস্তিত্ব জানা গিয়াছে। সুদূর ভবিষ্যতে এগুলি দৃষ্টিগোচর হইবে।

তারকাই বিশ্বের বিভিন্ন বস্তুর জননী। নিজ-গর্ভে হাইড্রোজেন-পরমাণুর কেন্দ্রীণে একটির পর একটি প্রোটন জোড়া দিয়া বিশ্বের বিভিন্ন বস্তুর মৌলিক পরমাণু সে গড়িয়া তোলে।

পরলোকে

গভীর দুঃখের সহিত আমরা দুইজন ভক্তের পরলোকগমন-সংবাদ জানাইতেছি।

জিতেন্দ্রমোহন চৌধুরী

শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য, পাটনার প্রাচীনতম ভক্ত জিতেন্দ্রমোহন চৌধুরী গত ১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৭২ দুপুরবেলা ৮৭ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। ১৩১৮ সালে তিনি শ্রীশ্রীমায়ের কৃপা লাভ করেন। তাঁহার জন্মস্থান ছিল ঢাকা বিক্রমপুর।

সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ

সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ গত ২রা ডিসেম্বর, ১৯৭২ রাত্রে পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৮৪ বৎসর হইয়াছিল। তিনি স্বামী শিবানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণচরণে ইঁহাদের আত্মার সদ্গতি কামনা করি।

স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী

সন্ন্যাসীর গীতি—১৬শ সংস্করণ। স্বামীজী-রচিত 'Song of the Sannyasin'-নামক ইংরেজী কবিতা ও উহার পদ্যে বঙ্গানুবাদ। মূল্য ২০ পয়সা।

ঈশদূত যীশুখৃষ্ট—৫ম সংস্করণ, ভগবান ঈশার জীবনালোচনা—মূল্য ০'৪০, উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে মূল্য ০'৩৫।

সরল রাজযোগ—৫ম সংস্করণ। স্বামীজী আমেরিকায় তাঁহার শিষ্যা সারা সি. বুলের বাড়িতে কয়েকজন অন্তরঙ্গকে 'যোগ' সম্বন্ধে যে বিশেষ উপদেশ দান করেন, বর্তমান পুস্তক তাহারই ভাবান্তর। মূল্য ০'৬০।

পত্রাবলী—১ম ও ২য় ভাগ। অভিনব পরিবর্ধিত সংস্করণ। প্রায় ১০৫০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। স্বামীজীর বহু অপ্রকাশিত পত্র ইহাতে সংযোজিত হইয়াছে। তারিখ অনুযায়ী পত্রগুলি সাজানো হইয়াছে। পরিচয়- এবং নির্ঘণ্ট-সংযুক্ত। মনোরম বাঁধাই। স্বামীজীর সুন্দর ছবি-সংবলিত। প্রত্যেক ভাগ মূল্য ৫'৬০; উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে মূল্য ৫৲।

ভারতে বিবেকানন্দ—১৪শ সংস্করণ। আমেরিকা হইতে প্রত্যাবর্তনের পর স্বামীজীর ভারতীয় বক্তৃতাবলীর উৎকৃষ্ট অনুবাদ। ৫৯৯ পৃষ্ঠা; মূল্য ৫'০০; উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে মূল্য ৪'৫০।

দেববাণী—৯ম সংস্করণ। আমেরিকার 'সহস্র-দ্বীপোদ্যান'-নামক স্থানে কয়েকজন অন্তরঙ্গ শিষ্যকে স্বামীজী যে-সকল অমূল্য উপদেশ প্রদান করেন, ঐগুলির একত্র সমাবেশ। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি, ২১৪ পৃষ্ঠা; মূল্য—২৲ উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে মূল্য ১'৮০।

শিক্ষাপ্রসঙ্গ—৪র্থ সংস্করণ। শিক্ষা-সম্বন্ধে স্বামীজীর বাণীসকল সংকলিত ও ধারাবাহিক-ভাবে সন্নিবেশিত। ১৮৮ পৃষ্ঠা; মূল্য ১'৭৫।

কথোপকথন—৭ম সংস্করণ। স্বামীজীর ছবিযুক্ত। ডবল ক্রাউন, ১৬ পেজি, ১৪২ পৃষ্ঠা। মূল্য ১'২৫। উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে মূল্য ১'১৫।

মদীয় আচার্যদেব—স্বামী বিবেকানন্দ-প্রণীত; ১১শ সংস্করণ, ৬৪ পৃষ্ঠা। স্বীয় গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনী ও শিক্ষা-সম্বন্ধে আমেরিকাবাসীদের নিকট স্বামীজীর বিবৃতি। মূল্য ০'৭৫; উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে মূল্য ০'৬৫।

জ্ঞানযোগ-প্রসঙ্গে—বিভিন্ন বক্তৃতার সারসংক্ষেপ—ইংরেজীতে প্রকাশিত Discourses on Jnana Yoga পুস্তকের অনুবাদ। 'স্বামীজীর বাণী ও রচনা' হইতে পৃথক পুস্তকাকারে প্রকাশিত। আত্মতত্ত্ব ও বেদান্ত-বিষয়ক বহু কঠিন বিষয় সরলভাবে আলোচিত। 'জ্ঞানযোগ' গ্রন্থ পড়িবার পক্ষে সহায়ক। মূল্য দুই টাকা।

স্বামি-শিষ্য-সংবাদ—(পূর্বকাণ্ড — ১৩শ সংস্করণ; উত্তরকাণ্ড—১১শ সংস্করণ)। শ্রীশরৎ-চন্দ্র চক্রবর্তী প্রণীত। স্বামী বিবেকানন্দজীর মতামত অল্প কথায় জানিবার উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। স্বামী-জীর জীবিতকালে তাঁহার সহিত প্রশ্নোত্তরচ্ছলে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য-দেশীয় আচার-নীতি, দর্শন-বিজ্ঞানাদি এবং ধর্ম ও সমাজগত সমস্যামূলক নানা বিষয়ের বিশদ আলোচনা। সরস ও হৃদয়গ্রাহী এই সব বর্ণনা সত্যিই আনন্দদায়ক। বর্তমান যুগের বহু সমস্যার আদর্শানুগ সমাধানও ইহাতে পাওয়া যাইবে। জীবনতত্ত্ব বিষয়ে এই পুস্তকদ্বয় অমূল্য রত্নের সন্ধান দিবে। ২২০ ও ২১০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য প্রতি কাণ্ড ২'২৫।

মহাপুরুষ-প্রসঙ্গ—১৬শ সংস্করণ। ১৫৪ পৃষ্ঠা। ইহাতে রামায়ণ, মহাভারত, জড়-ভরতের উপাখ্যান, প্রহ্লাদচরিত্র, জগতের মহত্তম আচার্যগণ, ঈশদূত যীশুখ্রীষ্ট, ভগবান বুদ্ধ প্রভৃতি বিষয় আছে। কোমলমতি বালক-দিগের চরিত্রগঠনে ও ভারতীয় সংস্কৃতিতে তাহাদিগকে শ্রদ্ধাবান্ করিতে ইহা বিশেষ সহায়তা করিবে; মূল্য ৩'০০; উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে মূল্য ২'৭০।

প্রাপ্তিস্থান :—উদ্বোধন কার্যালয়, বাগবাজার, কলিকাতা ৩

শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা এবং স্বামী বিবেকানন্দ-সম্বন্ধীয় পুস্তকাবলী

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ—শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের জীবনী ও শিক্ষা-সম্বন্ধে অপূর্ব পুস্তক। স্বামী সারদানন্দ-প্রণীত। দুই ভাগে রেক্সিন-বাঁধাই। মূল্য—১ম ভাগ ১০, ২য় ভাগ ১০৲

উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে " ৯৲ " ৯'০০

সাধারণ বাঁধাই পাঁচ ভাগে:

	মূল্য	উঃ গ্রাঃ পক্ষে
১ম ভাগ	২'৫০	২'২৫
২য় "	৪'৭৫	৪'২৫
৩য় "	৩'৫০	৩'১৫
৪র্থ "	৩'০০	২'৭০
৫ম "	৩'৫০	৩'১৫

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি— ৯ম সংস্করণ। অক্ষয়কুমার সেন-প্রণীত। সুললিত কবিতায় শ্রীশ্রীঠাকুরের বিস্তারিত জীবনী ও অলৌকিক শিক্ষা-সম্বন্ধে এরূপ গ্রন্থ আর নাই। ৬৪০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য—বোর্ড বাঁধাই ১৫৲, উদ্বোধন-গ্রাহক পক্ষে ১৪৲।

পরমহংসদেব—ষষ্ঠ সংস্করণ; শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু-প্রণীত। সুললিত ভাষায় অল্প কথায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দিব্য জীবনবেদ। ১৪০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য—১'৭৫।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ—১২শ সংস্করণ শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য-প্রণীত। বালক-বালিকাদিগের জন্য সরল ভাষায় লিখিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনী। মূল্য—০'৭০।

শ্রীরামকৃষ্ণ-চরিত — ২য় সংস্করণ। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চৌধুরী-প্রণীত। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাবলীর অপূর্ব সমাবেশ। বোর্ড-বাঁধাই ডিমাই সাইজ। মূল্য—৪'০০।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ—১৮শ সংস্করণ। সুরেশচন্দ্র দত্ত-সংগৃহীত। ২৬৫ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য—৩৲।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-উপদেশ—স্বামী ব্রহ্মানন্দ সঙ্কলিত। ২২শ সংস্করণ। মূল্য—৭৫ পয়সা। কাপড়ে বাঁধাই ১৲ টাকা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-মহিমা—শ্রীরামকৃষ্ণ-চরিত-মহাকাব্য শ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথির অমর লেখক অক্ষয়কুমার সেনের লেখনী-প্রসূত গ্রন্থ। মূল্য—২'০০।

রামকৃষ্ণের কথা ও গল্প—১৪শ সংস্করণ স্বামী প্রেমঘনানন্দ-প্রণীত। এই সুচিত্রিত সুদৃশ্য সুলভ পুস্তকখানি ছেলেমেয়েদের ধর্মীয় ও নৈতিক জীবনগঠনের সহায়তা করিবে। মূল্য—২'০০।

শ্রীমা সারদাদেবী—৪র্থ সংস্করণ। স্বামী গম্ভীরানন্দ-প্রণীত। শ্রীশ্রীমায়ের বিস্তারিত জীবনীগ্রন্থ। পৃষ্ঠা ৭১০; মূল্য ৮৲।

জননী সারদাদেবী—স্বামী নির্বেদানন্দ-প্রণীত। পৃষ্ঠা ১১০। মূল্য—২'০০।

শ্রীশ্রীমা সারদা—স্বামী নিরাময়ানন্দ-প্রণীত। পৃষ্ঠা ৯৮; মূল্য ১'৫০।

শ্রীশ্রীমায়ের কথা—শ্রীশ্রীমায়ের সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ সন্তানদের 'ডাইরী' হইতে সংগৃহীত সারগর্ভ উপদেশ। সংসারতাপে সান্ত্বনাদায়ক ও অধ্যাত্মরাজ্যে পথপ্রদর্শক। দুই ভাগে সম্পূর্ণ। প্রতি ভাগ—৫'৫০।

মাতৃসান্নিধ্যে—২য় সংস্করণ; স্বামী ঈশানানন্দ-প্রণীত। পৃষ্ঠা ২৫৬; মূল্য ৪৲ টাকা।

যুগনায়ক বিবেকানন্দ—স্বামী গম্ভীরানন্দ-প্রণীত। স্বামীজীর অধুনাতন মূল্যবান প্রামাণিক জীবনীগ্রন্থ। তিন খণ্ডে প্রকাশিত। প্রতি খণ্ড ৮৲ করিয়া। একত্রে লইলে ২৩৲। উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ২২৲।

স্বামী বিবেকানন্দ—৩য় সংস্করণ, শ্রীপ্রমথনাথ বসু-রচিত। দুই খণ্ডে প্রকাশিত স্বামীজীর জীবনী। ৯৬৩ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য—প্রতি-খণ্ড ৪৲; উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ৩'৬০; দুই খণ্ড একত্র বাঁধাই ৮'৫০।

স্বামী বিবেকানন্দ—১১শ সংস্করণ। শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য-প্রণীত। স্বামীজীর জীবনের প্রধান প্রধান সকল কথাই বলা হইয়াছে। মূল্য—০'৭০।

বিবেকানন্দ-চরিত—৯ম সংস্করণ। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার-প্রণীত। মূল্য—১০'০০

পাঞ্চজন্য—স্বামী চণ্ডিকানন্দ-রচিত পাঁচ শতের অধিক সঙ্গীতের সমাবেশ। মাতৃসঙ্গীত, শিবসঙ্গীত, গুরুসঙ্গীত, মহামানব-সঙ্গীত, রামকৃষ্ণ-লীলাগীতি, সারদা-লীলাগীতি ও দেশাত্মবোধক সঙ্গীত। মূল্য—ছয় টাকা।

উদ্বোধন-প্রকাশিত অন্যান্য পুস্তকাবলী

দশাবতারচরিত্র—৫ম সংস্করণ। শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য-প্রণীত। এই পুস্তক-পাঠে চরিত্র-কথার গল্পপ্রিয় পাঠক এবং ভক্তগণ ধর্ম ও ধর্মতত্ত্বের সন্ধান পাইবেন। মূল্য ২'০০।

শঙ্কর-চরিত—শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য-প্রণীত—৫ম সংস্করণ; আচার্য শঙ্করের অদ্ভুত জীবনী অতি সুললিত ভাষায় লিখিত। মূল্য ১৲।

হার্ভার্ড বিশ্ববিত্মালয়ে বেদান্ত—স্বামী বিবেকানন্দ প্রণীত। ১৮৯৬ খৃঃ মার্চ মাসে হার্ভার্ড বিশ্ববিত্মালয়ে প্রদত্ত বক্তৃতা এবং তৎপরবর্তী প্রশ্নোত্তর ও আলোচনা। বেদান্তের মূলতত্ত্ব অতি স্পষ্টভাবে ব্যক্ত। প্রশ্নোত্তর ও আলেচানায় ভারতীয় কৃষ্টি ও হিন্দুধর্মের মূল ভাবসাহসিকতার সহিত সরলভাবে উপস্থাপিত। পৃষ্ঠা ৫৫; মূল্য এক টাকা।

শিব ও বুদ্ধ—৭ম সংস্করণ। ভগিনী নিবেদিতা-প্রণীত। ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য রচিত সরল ও সুখপাঠ্য আখ্যান। মূল্য ০'৬৫।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ—শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সর্বপ্রথম অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের সবিস্তার ধারাবাহিক জীবনী। মূল্য—৩'০০।

ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ—৭ম সংস্করণ। স্বামী ব্রহ্মানন্দের কথোপকথন এবং পত্রাবলীর সংগ্রহ। প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু-লিখিত সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা। মূল্য ২'৫০।

মহাপুরুষ শিবানন্দ—স্বামী অপূর্বানন্দ-প্রণীত। ৩য় সংস্করণ। শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজীর বিস্তারিত জীবনী। মূল্য—৫'০০।

শিবানন্দ-বাণী—২য় ভাগ—৩য় সংস্করণ। স্বামী অপূর্বানন্দ-সঙ্কলিত। মূল্য—২'৫০।

শ্রীরামানুজ-চরিত—স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ-প্রণীত, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, ২৪৮ পৃষ্ঠা। শ্রীসম্প্রদায়ে প্রচলিত আচার্য রামানুজের বিস্তৃত জীবনবৃত্তান্ত বাংলা ভাষায় প্রকাশিত। আচার্যের জীবদ্দশায় খোদিত প্রতিমূর্তির ছবি এই গ্রন্থে আছে। মূল্য ৬৲। উঃ গ্রাঃ পক্ষে ২'৭৫।

স্বামী অখণ্ডানন্দ—স্বামী অন্নদানন্দ-প্রণীত। এই পুস্তকে শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্নিধানে, তিব্বতে ও হিমালয়ে, স্বামীজীর সঙ্গে, দুর্ভিক্ষে সেবাকার্য, সেবাব্রতের প্রাণপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতি অধ্যায়ে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্যের পথিকৃৎ স্বামী অখণ্ডানন্দের ধারাবাহিক জীবনী। ডিমাই সাইজ, ৩১০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৪৲।

সাধু নাগমহাশয়—শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী-প্রণীত। ১১শ সংস্করণ। যাঁহার সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন, "পৃথিবীর বহু স্থান ভ্রমণ করিলাম, নাগমহাশয়ের ন্যায় মহাপুরুষ কোথাও দেখিলাম না!"—পাঠক! তাঁহার পুণ্য জীবন-বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া ধন্য হউন। মূল্য ২'০০।

গোপালের মা—স্বামী সারদানন্দ-প্রণীত (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ হইতে সঙ্কলিত)। অতুলনীয়-সাধননিষ্ঠ, পরমভক্ত গোপালের মা-র আদর্শ জীবনের সংক্ষিপ্ত কাহিনী। মূল্য ৫০ পয়সা।

লাটু মহারাজের স্মৃতিকথা—শ্রীচন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়-প্রণীত। ২য় সংস্করণ। শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও ঠাকুরের শিষ্যবর্গ সম্বন্ধে বহু অপ্রকাশিত ঘটনাবলীর সমাবেশ। নিজ জীবনের কঠোর ত্যাগ-তপস্যার কথার অদ্ভুত প্রকাশভঙ্গীতে পাঠকগণ চমৎকৃত হইবেন। মূল্য—৪'০০।

স্বামী তুরীয়ানন্দ—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ-প্রণীত। বাল্যাবধি বেদান্তী এই মহারাজের জীবনের অদ্ভুত ঘটনাবলী-পাঠে চমৎকৃত হইবেন। ৩৪০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য—৩'৫০।

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিষ্যগণের সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত একত্র এই প্রথম প্রকাশিত হইল। দুই ভাগে সম্পূর্ণ। প্রতি ভাগের মূল্য—৫'৫০।

ভগিনী নিবেদিতা—স্বামী তেজসানন্দ-প্রণীত। ইহাতে তাঁহার জীবনের মুখ্য ঘটনাবলীর সম্যক্ আলোচনা রহিয়াছে। ইহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে "ভগিনী নিবেদিতা-স্মৃতি বক্তৃতামালা"র প্রথম বক্তৃতা। মূল্য—১'৫০

প্রাপ্তিস্থান:—**উদ্বোধন কার্যালয়**, বাগবাজার, কলিকাতা ৩

উদ্বোধনের নিয়মাবলী

মাঘ মাস হইতে বৎসর আরম্ভ। বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতে অন্ততঃ এক বৎসরের জন্য (মাঘ হইতে পৌষ মাস পর্যন্ত) গ্রাহক হইলে ভাল হয়। শ্রাবণ হইতে পৌষ মাস পর্যন্ত ষাণ্মাসিক গ্রাহকও হওয়া যায়; কিন্তু শ্রাবণ মাস হইতে বার্ষিক গ্রাহক হওয়া যায় না, **বার্ষিক মূল্য সডাক ৮৲ টাকা, ষাণ্মাসিক ৪·৫০ টাকা।** প্রতি সংখ্যা ৭৫ পয়সা। নমুনার জন্য ৭৫ পয়সার ডাকটিকিট পাঠাইতে হয়। মাসের ২৫ তারিখের মধ্যে পত্রিকা না পাইলে সংবাদ দিবেন, আর একখানি পত্রিকা পাঠানো হইবে।

রচনা :—ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, ভ্রমণ, ইতিহাস, সমাজ-উন্নয়ন, শিল্প, শিক্ষা, সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়। আক্রমণাত্মক লেখা প্রকাশ করা হয় না। প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায়, এবং বামদিকে অন্ততঃ একইঞ্চি ছাড়িয়া স্পষ্টাক্ষরে লিখিবেন। **পত্রোত্তর বা প্রবন্ধ ফেরত পাইতে হইলে উপযুক্ত ডাকটিকিট পাঠানো আবশ্যক।** কবিতা ফেরত দেওয়া হয় না। প্রবন্ধাদি ও তৎসংক্রান্ত পত্রাদি সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন।

সমালোচনার জন্য দুইখানি পুস্তক পাঠানো প্রয়োজন।

বিজ্ঞাপনের হার পত্রযোগে জ্ঞাতব্য।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন, **পত্রাদি লিখিবার সময়** তাঁহারা যেন অনুগ্রহপূর্বক তাঁহাদের **গ্রাহক-সংখ্যা উল্লেখ করেন।** ঠিকানা পরিবর্তন করিতে হইলে পূর্ব মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে আমাদের নিকট পত্র পৌছানো দরকার। পরিবর্তিত ঠিকানা জানাইবার সময় পূর্ব ঠিকানাও অবশ্যই উল্লেখ করিবেন। উদ্বোধনের চাঁদা মনি-অর্ডারযোগে পাঠাইলে **কুপনে পুরা নাম-ঠিকানা ও গ্রাহকনম্বর পরিষ্কার করিয়া লেখা আবশ্যক।** অফিসে টাকা জমা দিবার সময়: সকাল ৭½টা হইতে ১১টা: বিকাল ২½টা হইতে ৫টা। রবিবার কেবল বিকাল ৩টা হইতে ৫টা।

কার্যাধ্যক্ষ—উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা ৩

উদ্বোধন, ফাল্গুন, ১৩৭১

বিষয়-সূচী

বিষয়-সূচী

ভাল চা বলতে
টসের
চা
A TOSH & SONS CALCUTTA
AIR TIGHT
এ, টস এণ্ড সন্স
ফোন
২২-৪৭৮৫
কলিকাতা—১

দিব্য বাণী

বিভর্ষি রূপাণ্যববোধ আত্মা ক্ষেমায় লোকস্য চরাচরস্য।
সত্ত্বোপপন্নানি সুখাবহানি সতামভদ্রাণি মুহুঃ খলানাম্ ॥ ২৯
ত্বয্যম্বুজাক্ষাখিলসত্ত্বধাম্নি সমাধিনাবেশিতচেতসৈকে।
ত্বৎপাদপোতেন মহৎকৃতেন কুর্বন্তি গোবৎসপদং ভবাব্ধিম্ ॥ ৩০
স্বয়ং সমুত্তীর্য সুদুস্তরং দ্যুমন্ ভবার্ণবং ভীমমদভ্রসৌহৃদাঃ।
ভবৎপদাম্ভোরুহনাবমত্র তে নিধায় যাতাঃ সদনুগ্রহো ভবান্ ॥ ৩১

শ্রীমদ্ভাগবত, ১০।২

আত্মা তুমি দেব শুদ্ধজ্ঞানময়, তবুও সাধিবারে জগত-কল্যাণ
বিবিধ রূপ ধর সত্ত্বগুণময়— সতের নিকটে যা সুখদ সুমহান,
খলের নিকটে যা ভীষণ ত্রাসালয়!

সত্ত্বগুণময় সে রূপ ধ্যান করে সমাহিত চিত যে জন করে তায়
অম্বুজাক্ষ! তব চরণতরী ভবজলধিপারে তাহারে নিয়ে যায়
গোষ্পদসম সাগরে জ্ঞান করি।

আপনি তরি তারা ঘাটেতে রেখে যায় তব চরণ-তরী, যাত্রী বহুজন
ওপারে যেতে যাতে পারে সে নৌকায়; সুহৃদ্ বিশ্বের সেসব সজ্জন—
স্বধামে ফিরিবার সরণী রচি যায়!

কথাপ্রসঙ্গে

'তাঁহাকে দেখা যায়'

'তাঁহাকে দেখা যায়', ভগবানকে প্রত্যক্ষ করা যায়—এটি কোন অনুমানসিদ্ধ তত্ত্ব মাত্র বা শোনা কথা মাত্র নয়, এটি ভারতের অন্তরাত্মার উপলব্ধ সত্য ভারতের মর্মবাণী। যুগে যুগে ভারতে ইহা উপলব্ধ হইয়া আসিতেছে। অবশ্য সাধারণ মানুষের মনে ঈশ্বরের অস্তিত্বে সন্দেহও জাগিয়াছে যুগে যুগে, কিন্তু উহা বিশালাকার হইয়া ঈশ্বরাস্তিত্বে ভারতের বিশ্বাসকে চূর্ণ করিবার অবকাশ কখনো পায় নাই—যখনই এরূপ হইবার উপক্রম হইয়াছে, তখনই ভগবান মানুষ হইয়া আসিয়া বা কোন সত্যদ্রষ্টার অতিশুদ্ধ হৃদয়াসনে আসীন হইয়া বার বার সে সংশয় দূর করিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, 'ঈশ্বর আছেন, তাঁহাকে দেখা যায়।' আর বলিয়াছেন, তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করাই শোক-দুঃখ-মরণের পারে যাইবার, অমৃতত্বলাভের, একমাত্র পথ। কিভাবে তাহা করিতে হয়, তাহাও বার বার বলিয়া গিয়াছেন তাঁহারা—পথের কথা কেবল জানিলেই হইবে না, পথে চলিতে হইবে, সাধন করিতে হইবে।

সুদূর অতীতে ভারতের তপোবনে এ সত্য ঘোষিত হইয়াছে, ঈশ্বরাস্তিত্ব কল্পনামাত্র নয়, তাঁহাকে দেখা যায়, 'আমি তাঁহাকে দেখিয়াছি।' উপনিষদের যুগেই একজন ঋষি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছেন, 'বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্। আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।' মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের সীমায় তুমি ঈশ্বরকে দেখিতে পাইতেছ না, সে চরম সত্যকে প্রত্যক্ষ করিবার পক্ষে এ জ্ঞান অন্ধকারস্বরূপ ঠিকই, কিন্তু আমি এই মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের সীমা, এই তমসা ছাড়াইয়া তাহারও পারে গিয়াছি এবং সেখানে সূর্যালোকের মতো নিঃসংশয় সত্যালোকে উদ্ভাসিত সেই মহান্ পুরুষকে, ঈশ্বরকে দেখিয়াছি। বলিলেন না, তাঁহাকে দেখিয়াছেন এমন একজনের মুখে তাঁহার অস্তিত্বের কথা শুনিয়াছি; বলিলেন না, যুক্তি-বিচার-অনুমানাদি সহায়ে এই বৌদ্ধিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি; বলিলেন—'বেদাহম্'—আমি দেখিয়াছি, প্রত্যক্ষ করিয়াছি (উপনিষদে জানা অর্থে, জ্ঞান অর্থে সাক্ষাৎ উপলব্ধিকেই বুঝায়, বৌদ্ধিক ধারণাকে নয়) আর বলিলেন, এই তমসার রাজ্যে, মন-বুদ্ধির সীমায় অমৃতত্বের সন্ধান বৃথা; মরণকে জয় করিতে হইলে ইহার পারে যাইয়া সেই 'আদিত্য-বর্ণ' পুরুষকে—যাঁহাকে প্রকাশ করিবার জন্য মন-বুদ্ধি প্রভৃতির আলোকের প্রয়োজন হয় না, যিনি সূর্যের মতো স্বপ্রকাশ, যিনি জ্ঞানস্বরূপ, সেই ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করা ছাড়া দ্বিতীয় আর কোন পথ নাই—'তমেব বিদিত্বাঽতি মৃত্যুমেতি। নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।'

এই স্বপ্রকাশ চরম সত্য চির-অবিনাশী, আনন্দস্বরূপ, 'শুদ্ধবোধস্বরূপ', এবং 'তিনিই আমাদের সকলের স্বরূপ।' তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করা আর নিজের স্বরূপকে জানা—তাঁহাকে দেখা আর ব্রহ্মজ্ঞ, আত্মবিদ্ হওয়া তাই একই কথা। নিজেই এই অবিনাশী আনন্দময় স্বরূপ ভুলিয়া নিজেকে দেহ-মন-বুদ্ধি বলিয়া ভাবিয়া সেই সীমিত অস্তিত্বকেই একমাত্র সত্য বলিয়া বোধ করাই তমসার রাজ্যে বিচরণ করা; এই অন্ধকারময় রাজ্যই মৃত্যু-দুঃখ-শোকাদি বোধের ক্ষেত্র। মরণকে জয় করিতে হইলে, শোকাদির পারে যাইতে হইলে তাই সাধনসহায়ে এই

তমসার পারে, দেহ-মন-বুদ্ধিতে 'আমি'-বোধের পারে যাওয়া ছাড়া দ্বিতীয় পথ আর কিছুই নাই। বৌদ্ধিক ধারণা এই তমসার রাজ্যেরই অন্তর্ভুক্ত, তাই তাহা আমাদের শোক-দুঃখ-ভয়াদির অতীত অমৃতের রাজ্যে কখনই লইয়া যাইতে পারে না; তাহার জন্য সাধন সহায়ে সেই 'আদিত্যবর্ণ মহান্ পুরুষকে', নিজের স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহাতীত স্বরূপকে প্রত্যক্ষ করিতেই হইবে। ইহাই সনাতন ভারতের মর্মবাণী, যাহা যুগে যুগে বিভিন্ন ভাষায়, বিভিন্ন ভাবে ঘোষিত।

বৌদ্ধিক ধারণামাত্র সহায়ে যে এই সত্যলাভ হয় না, উপনিষদে তাহার বহু বিবৃতি—একটি যেমন :

বহু সত্যান্বেষী একত্র হইয়া জগৎকারণ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে বসিয়াছেন—কি দিয়া, কাহার দ্বারা, কিভাবে এই বিশ্ব সৃষ্ট হইয়াছে, চলিতেছে? সৃষ্টিতে এই যে জীবনের বিকাশ ঘটিয়াছে, যে জীবন আমরা পাইয়াছি, যে জীবনে সুখ-দুঃখাদি ভোগ করিতেছি, ইহার মূলে কি আছে? এ সবের নিয়ন্তা কি বা কে?

আশ্চর্যের বিষয়, এই বৌদ্ধিক আলোচনায়—কয়েকহাজার বছর পূর্বের সত্যান্বেষীদের আলোচনায় আধুনিক যুগের চিন্তাশীল মানুষ, আধুনিক যুগের বিজ্ঞানীরা যুক্তি-বিচার, ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ-লব্ধ পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফল, অনুমান প্রভৃতি সহায়ে জগৎকারণ সম্বন্ধে যাহা কিছু ভাবিয়াছেন ও ভাবিতেছেন তাহা প্রায় সবই স্থান পাইয়াছে;—বিশ্বনিয়ন্তারূপে মন-বুদ্ধিহীন অচেতন বস্তুর নিজস্ব ধর্ম, প্রাকৃতিক নিয়ম, কোন চেতন সত্তা—নিউটনের অনুমিত বিরাট বুদ্ধি বা স্যর জেমস জীন্‌সের অনুমিত বিরাট মন, এ সবই চিন্তিত হইয়াছে; এমনকি কোন আকস্মিক ঘটনা দ্বারাও সৃষ্টি আরম্ভ হইতে পারে, এই চিন্তাও বাদ যায় নাই। তাঁহারা আলোচনা করিলেন: প্রাকৃতিক নিয়মে, জড়প্রকৃতির নিয়মের বশে, বস্তুর নিজস্ব গুণেই কি সৃষ্টি চলিতেছে? অথবা ইহার মূল কোন আকস্মিক ঘটনা? অথবা জড়প্রকৃতির নিয়মের মতো সূক্ষ্ম প্রকৃতির নিয়মবশে—কর্মফল যে নিয়মের অন্তর্ভুক্ত এই জগৎ ও জীবন নিয়ন্ত্রিত? অথবা এ সব কিছুর মিলিত প্রভাবই বিশ্বনিয়ন্ত্রণ করিতেছে? যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে এসব কিছুকে সংহত করিয়া পরিকল্পনানুসারে চালাইবার জন্য নিয়ন্তারূপে তো চেতন কোন সত্তা থাকা প্রয়োজন? তবে কি প্রাণীর মধ্যে মন-বুদ্ধি-বিশিষ্ট যে চেতনার বিকাশ দেখা যায় সেই চেতনাই—জীবাত্মাই বিশ্বকারণ? বিচার করিয়া দেখিলেন যে, তাহাও হইতে পারে না, কারণ জীবাত্মা নিজেই সূক্ষ্মপ্রকৃতির নিয়মে চালিত—যে নিজেই নিয়মাধীন, সে আবার চালক হইবে কিভাবে?

সর্বশেষ তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিলেন, যাহা ভারতের চিরকালের সিদ্ধান্ত সেই সিদ্ধান্তই করিলেন—যুক্তি বিচারাদি সমন্বিত বুদ্ধির রাজ্য তমসাবৃত—ইহার ভিতর জগৎকারণের সন্ধান মিলিবে না, ইহার পারে যাইতে হইবে, এবং মন-বুদ্ধিকে একাগ্র স্থির করাই, ধ্যান করাই ইহার পারে যাইবার একমাত্র পথ। তাঁহারা তখন ধ্যানে বসিলেন এবং বুদ্ধির পারে যাইয়া জগৎকারণ ঈশ্বরের সন্ধানও পাইলেন—পূর্বোক্ত ঋষির ভাষায় বলা যায়, তমসার পারে যাইয়া সূর্যসম স্বপ্রকাশ সত্যকে প্রত্যক্ষ করিলেন। প্রত্যক্ষ করিলেন, কাল, স্থূল ও সূক্ষ্ম প্রাকৃতিক নিয়ম, জীবাত্মা প্রভৃতি যেসব কিছুকে জগৎকারণ বলিয়া পূর্বে তাঁহারা অনুমান করিতেছিলেন, এই অদ্বিতীয় চৈতন্যসত্তাই নিজশক্তি সহায়ে সেসব-কিছুই হইয়াছেন (বা হইয়াছেন বলিয়া প্রতিভাত হইতেছেন)। প্রত্যক্ষ করিলেন, তিনিই

আমাদের বিশ্বের সব কিছুর স্বরূপ, তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিলে—নিজের সহিত এই চরম সত্যের অভিন্নতা উপলব্ধি করিলেই মানুষ অমর হয়।

উপনিষদের অন্যত্র, একটি উপাখ্যানে একই সত্য উদ্ঘোষিত : বুদ্ধিরথে চড়িয়া যতদূরই বিচরণ কর চরমসত্যের সন্ধান, অমৃতত্বের সন্ধান সেখানে মিলিবে না, তাহা লাভ করিবার উপায় শ্রদ্ধাভরে, নিষ্ঠাভরে সংযম ও ধ্যানের অভ্যাস। নারদকে সনৎকুমার ইহা বলিয়াছিলেন। নারদের পাণ্ডিত্য ছিল বিশাল—সত্যলাভের আশায় তিনি শুধু বেদ-বেদান্ত-পুরাণাদি সমস্ত ধর্মগ্রন্থই নয়, রসায়ন, জ্যোতির্বিজ্ঞান, ভূগর্ভবিজ্ঞান, এমনকি যুদ্ধবিদ্যা, বিবিধ শিল্পবিদ্যা, নৃত্য-গীত-বাদ্যাদি বিদ্যাও শিখিতে বাকি রাখেন নাই। শেখার যা কিছু ছিল তখন, সবই শিখিয়াছিলেন। কিন্তু শেষে একদিন তিনি উপলব্ধি করিলেন, যাহা চাহিয়াছিলেন, এত সব শিখিয়াও, বুদ্ধিগত করিয়াও তাহা তিনি পান নাই—চরম সত্য লাভ করিতে, 'আত্মবিদ্' হইতে তিনি পারেন নাই, তোতাপাখীর মতো কতকগুলি শব্দ কণ্ঠস্থ করাই, মস্তিষ্কে একরাশ শব্দ সঞ্চয় করাই সার হইয়াছে, 'মন্ত্রবিদ্' মাত্র হইয়াছেন তিনি। আত্মবিশ্লেষণ করিয়া ইহা বুঝিলেন, দেখিলেন, আত্মবিদ্ পুরুষ শোকাতিগ হন, শোক-দুঃখ-ভয়াদি তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না বলিয়া যেমন শুনিয়াছিলেন, এত পাণ্ডিত্য অর্জন করা সত্ত্বেও তাঁহার তো সেরূপ কিছু হয় নাই, অশিক্ষিত লোকের মতোই তিনি সমভাবে শোকাদিতে বিচলিত হইতেছেন! বুঝিলেন, বুদ্ধিরথে চড়িয়া ঘুরিলে শোক-দুঃখাদি-সমন্বিত তমসার রাজ্যে ঘোরাই সার হয়, ইহার পারে যাওয়া যায় না। তখন তিনি ব্যাকুল হইয়া ইহার পারে যাইবার পথের সন্ধানে সনৎকুমারের কাছে আসিয়াছিলেন।

'আমি বুদ্ধিমান, আমি পণ্ডিত, বুদ্ধি দিয়াই জগতের সব রহস্যের সমাধান করিব'—এ অভিমান অতি দৃঢ়মূল অভিমান, আধুনিক যুগের বহু মনীষীর মধ্যেও যাহা অতি প্রকট। ভগবৎ-কৃপা ছাড়া এ অভিমান যায় না। আমাদের একজন শিক্ষাগুরুর মুখে শুনিয়াছি, তাঁহার শিক্ষা-গুরু, একজন বেদান্তের পণ্ডিত, বৃদ্ধবয়সে একদিন বলিয়াছিলেন, 'বাবা, সারাজীবন তো পড়িলাম, তোমাদের বহুজনকে পড়াইলাম, বুঝাইলাম, "ব্রহ্ম সত্য, নাম-রূপ মিথ্যা, সবই ব্রহ্মময়"; কিন্তু আজও আমি এই টেবিলটাকে টেবিলই দেখিতেছি, ব্রহ্ম বলিয়া তো প্রত্যক্ষ করিতেছি না!' ভগবৎ-কৃপা ভিন্ন এ বোধটুকুও আসে না।

স্বামী বিবেকানন্দও (নরেন্দ্রনাথ) সত্যলাভের জন্য প্রয়োজনীয় সাধন সংযম ও একাগ্রতা-অভ্যাস নিষ্ঠাসহ নিয়মিতভাবে করিলেও ভাবিতেন, বুদ্ধি সহায়েই সত্যলাভ করা সম্ভব। বলা যায়, নারদের মতোই অজস্র বই পড়িয়াছিলেন তিনি—কেবল এদেশের ও পাশ্চাত্যের অজস্র ধর্ম ও দর্শনের গ্রন্থই নয়, দেশ-বিদেশের ইতিহাস, বিজ্ঞান এমনকি স্নায়ুতত্ত্ব জানিবার জন্য শরীর-বিদ্যার (অ্যানাটমি) বই পড়িতেও বাকি রাখেন নাই। পরিশেষে তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, এ-পথে সত্য-লাভ করা সম্ভব নয়, অন্ধকারে ঘুরিয়া বেড়ানোই সার হয়। তাই তিনি খুঁজিতেছিলেন এমন একজন সহায়ক, গুরু, যিনি তমসার পারে গিয়া সেই 'আদিত্যবর্ণ মহান্ পুরুষ'-কে, ঈশ্বরকে, প্রত্যক্ষ করিয়াছেন যিনি সেই উপনিষদের ঋষির মতো কম্বুকণ্ঠে বলিতে পারেন 'বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম'। খুঁজিয়া পাইলেনও একদিন শ্রীরামকৃষ্ণকে, যিনি বলিলেন, 'আমি ঈশ্বরকে দেখিয়াছি', শুধু তাহাই নয় 'যদি চাও, তোমাকেও দেখাইতে পারি।' বলিলেন, তাঁহাকে দেখা যায়, তাঁহার সঙ্গে 'কথা বলা যায়—এই যেমন তোমার সঙ্গে কথা বলিতেছি।' এই নরেন্দ্রনাথই,

রাশি-রাশি বাই-পড়া নরেন্দ্রনাথই পরে একদিন শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট বলিয়াছিলেন, 'এমন একটা ওষুধ দিতে পারেন, যা খেলে যা শিখেছি সব ভুলে যাই!' পরবর্তী কালে তিনিই লিখিয়াছিলেন, 'যতদূর যতদূর যাও বুদ্ধিরথে করি আরোহণ, এই সেই সংসার-জলধি, সুখ-দুঃখ করে আবর্তন।'

সেই স্বপ্রকাশ পুরুষকে যেমন নিজেরই নির্গুণ নিরাকার অদ্বয় স্বরূপ রূপে প্রত্যক্ষ করা যায়, তেমনি আবার সাকার সগুণ ঈশ্বর রূপেও প্রত্যক্ষ করা যায়, তিনিই জগতের সব কিছু হইয়া রহিয়াছেন, ইহাও প্রত্যক্ষ করা যায়। তিনিই আবার তমসার রাজ্য হইতে আলোকের রাজ্যে যাইবার, আমাদের 'আমি'-বোধকে মৃত্যু ও শোক-দুঃখাদির আধার দেহ ও মনবুদ্ধি হইতে সরাইয়া লইয়া নিত্য আনন্দময় স্বরূপে স্থিত করিবার পথ দেখাইবার জন্য এই তমসার রাজ্যেই আমাদের মনবুদ্ধিগ্রাহ্য হইয়া, মানুষ হইয়া আসেন। ভীষ্মদেব শরশয্যায় শুইয়া এই সত্যটি ঘোষণা করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম জানাইতেছেন; বলিতেছেন, 'মহতস্তমসঃ পারে পুরুষং জ্বলনদ্যুতিম্। যং জ্ঞাত্বা মৃত্যুমত্যেতি তস্মৈ জ্ঞেয়াত্মনে নমঃ॥'—'মহা তমসার পারে জাজ্বল্যমান জ্যোতির্ময় যে পুরুষ, যাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিয়া মানুষ মৃত্যুকে অতিক্রম করে—হে কৃষ্ণ, তুমিই সেই বোধস্বরূপ, তোমাকে নমস্কার করি।' বেদান্তবেদ্য অরূপ অসীম ব্রহ্মই সসীম শ্রীকৃষ্ণরূপ পরিগ্রহ করিয়া আমার সম্মুখে অবস্থিত!

ঈশ্বরে অবিশ্বাসের, বুদ্ধিসর্বস্বতার এই যুগে সেই 'আদিত্যবর্ণ' 'জ্বলনদ্যুতি' পুরুষ, যাঁহাকে মনবুদ্ধি-ইন্দ্রিয়ের রাজ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না, ইন্দ্রিয়সীমিতজ্ঞান যাঁহাকে প্রকাশ করিবার পক্ষে অন্ধকারস্বরূপ, তিনিই রামকৃষ্ণদেহ ধারণ করিয়া আসিয়াছিলেন এই অন্ধকারের রাজ্যে আলোকের রাজ্যের সংবাদ আনিয়া দিতে, সেখানে যাইবার পথ দেখাইতে, অবিশ্বাস-সন্দেহের ধূলিতে আচ্ছন্ন ভারতের মর্মবাণীকে সর্বসন্দেহনির্মুক্ত করিয়া ভারতবাসীর চোখেই শুধু নয় বিশ্ববাসীরই চোখের সামনে আবার তুলিয়া ধরিতে:—মনবুদ্ধিগ্রাহ্য যে সত্য আমরা প্রত্যক্ষ করি, তাহারও অতীত সত্য রহিয়াছে—'ঈশ্বর আছেন, তাঁহাকে দেখা যায়', 'আমি তাঁহাকে দেখিয়াছি।' শুধু আমি দেখিয়াছি নয়, যে চাহিবে সেই-ই তাঁহাকে দেখিতে পাইবে। দেখার উপায়, পথ? পথ তো একটাই—এই অন্ধকারের মধ্যে তাঁহাকে খুঁজিলে দেখা যাইবে না, ইহার পারে যাইতে হইবে; কেবল বুদ্ধির এলাকায় ঘুরিলে চলিবে না, নিষ্ঠাভরে শ্রদ্ধাভরে সংযম ও একাগ্রতার অভ্যাস করিতে হইবে। অতি সহজ সরল ভাষায় বলিয়া গেলেন, কেবল পাণ্ডিত্য দিয়া, শাস্ত্র পড়িয়া তাঁহাকে পাওয়া যায় না—'পাজিতে লিখেছে বিশ আড়া জল, কিন্তু পাজি টিপলে এক ফোঁটাও পড়ে না, এক ফোঁটাই পড়্—তাও পড়ে না।' 'বই, শাস্ত্র, এসব কেবল ভগবানের কাছে পৌঁছাবার পথ বলে দেয়।' 'শুধু পাণ্ডিত্যে কি হবে? অনেক শ্লোক, অনেক শাস্ত্র পণ্ডিতের জানা থাকতে পারে। কিন্তু যার সংসারে আসক্তি আছে, তার শাস্ত্র ধারণা হয় নাই, মিছে পড়া।' বলিতেছেন সব শাস্ত্র পড়িলেও, বুদ্ধির পাখায় ভর দিয়া বহু ঊর্ধ্বে উঠিলেও, মন যদি নীচের দিকে, 'কামিনী-কাঞ্চন দেহের সুখ আর টাকায়' পড়িয়া থাকে, তাহা হইলে দেহাত্ম-বোধের সীমা সে ছাড়াইবে কিরূপে? সত্যলাভ করিতে হইলে তাঁহাকে পাইবার পথ জানিয়া লইয়া 'কর্ম আরম্ভ করিতে হয়।' কর্ম—সাধনা—'করা'—পথে চলা, কেবল খবর জানা নয়। জগন্নাথ দর্শন করিতে হইলে কেবল বসিয়া বসিয়া পুরী কিভাবে যাওয়া যায় সে সম্বন্ধে রাজ্যের তথ্য সংগ্রহ করিলেই তো আর জগন্নাথদর্শন হইবে না, পুরীর পথে নামিয়া পুরীর দিকে চলিতে হইবে।

যে-সব তথ্য জানিয়াও বসিয়া বসিয়া তাহার আলাচনা করিতেছে, তাহা অপেক্ষা শুধু পথের খবরটুকু লইয়াই যে পথে নামিয়া পুরীর দিকে দু-পাও অগ্রসর হইয়াছে, সে জগন্নাথের অধিকতর নিকটবর্তী। শাস্ত্র কিছু না পড়িয়াও যে সাধন-পথ জানিয়া লইয়া ঈশ্বরলাভের জন্য একটুও সাধন করিয়াছে, সাধনহীন শাস্ত্রজ্ঞের চেয়ে ভগবানের সে অধিকতর নিকটবর্তী। এমন কি, শ্রীরামকৃষ্ণদেব এতদূর পর্যন্ত বলিতেছেন, পথ না জানিয়াও জগন্নাথদর্শনের জন্য ব্যাকুল হইয়া পথে নামিয়া যদি কেহ ভুল পথেও চলে, তাহা হইলেও তাহার জগন্নাথদর্শন হইবে, কেহ না কেহ তাহাকে ঠিক পথ দেখাইয়া দিবে।

এই পথ-চলার প্রেরণাই শ্রীরামকৃষ্ণের কথায় কথায়।

আর কথায় কথায় বলা 'তাঁহাকে দেখা যায়', 'আমি তাঁহাকে দেখিয়াছি'। শাস্ত্রের উদ্ধৃতি দিতেছেন না, অপর কোন প্রত্যক্ষদর্শীর কাছে শোনা কথা বলিতেছেন না, যুক্তি-বিচার-অনুমান সহায়ে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি ইহাও বলিতেছেন না, বলিতেছেন, 'আমি দেখিয়াছি'। নচিকেতার প্রশ্নের, মানুষের চিরন্তন প্রশ্নের—'কেহ বলে দেহের নাশেই মানুষ বলিতে যাহা কিছু সব ফুরাইয়া যায়, আবার কেহ বলে তাহা নয়, মৃত্যু যাহাকে ভাবি, তাহা দেহেরই নাশ মাত্র, আসল মানুষের মৃত্যু বলিয়া কিছু নাই—ইহার কোন্‌টি সত্য?'—এই প্রশ্নের উত্তর শ্রীরামকৃষ্ণের কথায় খুঁজিলে পাইবেন, 'আমি দেখিয়াছি'—অক্ষয়ের মৃত্যুর সময় 'দেখলাম' মানুষ কি করিয়া মরে—'দেখলাম' 'খাপ থেকে যেন তলোয়ারটা বের করে নিল, খাপটা পড়ে রইল, তলোয়ারটার কিছুই হল না।'। ঈশ্বর আছেন কিনা? তাঁহাকে দেখা যায় কিনা?—আজ পর্যন্ত সারা পৃথিবীর মানুষ যত ভাবে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছে—বিবিধ সাকাররূপে, বিশ্বের সব কিছুর ভিতর ওতপ্রোতরূপে, নিজের সঙ্গে অভেদরূপে—সবই তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। 'তখন দেখতাম', 'দেখেছি', 'দেখলাম', 'মা দেখিয়ে দিলেন', 'দেখছি', 'ঠিক ঠিক দেখতে পাইরে!'—মনবুদ্ধির অতীত সত্য সম্বন্ধে, তমসার পারে যে স্বপ্রকাশ সত্য তাহার সম্বন্ধে তাঁহার এইরূপ অজস্র বিবৃতি—'বেদাহম্'—'আমি দেখিয়াছি', 'তাঁহাকে দেখা যায়।'

শ্রীশ্রীঠাকুর

শ্রীজীবনকৃষ্ণ শেঠ

সর্বভূতাত্মভূতাত্মা নেহার তাঁহারে
স্থলে জলে অন্তরীক্ষে, দেবতা-মন্দিরে,
অথবা ভজনালয়ে ব্রহ্মজ্যোতি স্থির
সগুণ বা গুণহীন নিত্য নিরাকারে।
'যত মত তত পথ' বাণী সূত্রাকারে
সত্যের শাশ্বত রূপ দিব্য সুগভীর
আশ্বাস-বিশ্বাসভরা, মর পৃথিবীর
মহারত্ন—প্রকাশিছে তব তপস্যারে।

'শিবজ্ঞানে জীবসেবা—জীবে-দয়া নহে'
এ বাণীর সার্থকতা তব কর্ম বহে,
বিশ্ব জুড়ে এ বাণীর অন্তর্জ্যোতিঃ-শিখা
আশাহত মানবের মঙ্গল-দীপিকা।
সে আলোকে চিত্ত মোর নিত্য থাক ভরি,
হে শরণ্য, যাত্রা মোর তোমারেই স্মরি।

শ্রীরামকৃষ্ণ

স্বামী ভূতেশানন্দ

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে'র পরিবেশক শ্রীম যখন তাঁর বাড়ীতে ভক্তদের সঙ্গে প্রসঙ্গ করতেন, বলা বাহুল্য যে, সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ ছাড়া অন্য কোন কথা বিশেষ আলোচিত হ'ত না। যদি বা কখনও কেউ অন্য কথা তুলতেন তো শ্রীম বা মাষ্টার মশায় তৎক্ষণাৎ সেই বিষয়টিকে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিষয়ে পরিবর্তিত ক'রে নিতেন। কথা বলার তাঁর সৌষ্ঠব ছিল অপূর্ব। একটি ভক্ত আমাদের উপস্থিতিতে বলছেন, একটু উপনিষদের কথা বলুন। মাষ্টার মশায় উপনিষদের কথাগুলি অতি মধুরভাবে বলতেন, খুবই চিত্তাকর্ষক হ'ত। তিনি শুনেই বললেন, এই তো উপনিষদেরই কথা হচ্ছে গো!—ঠাকুরের প্রসঙ্গ চলছিল। বললেন, এই তো উপনিষদের কথাই হচ্ছে গো! ব'লে বললেন, ঋষি যখন প্রশ্ন করছেন, 'উপনিষদং ভো ব্রূহি'—আমাদের উপনিষদ্ সম্বন্ধে বলুন, উত্তর এল 'উক্তা তে উপনিষদ্, ব্রাহ্মীং বাব তে উপনিষদম্ অব্রূম।'—বলছেন, উপনিষদের কথাই বলেছি, ব্রহ্মবিষয়ে যে উপনিষদ্, সেই উপনিষদই বলছি। ঠাকুরের কথার যে প্রসঙ্গ চলছে, এই তো উপনিষদ্। কথাটি খুব ছোট্ট কিন্তু খুব গূঢ় অর্থপূর্ণ। শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে যাঁরা অল্পবিস্তর আলোচনা করেছেন, তাঁরা বিশেষভাবে দেখেছেন যে, তাঁর এক একটি কথা কত গভীর অর্থপূর্ণ, তার ভিতর দিয়ে আমাদের জীবনের কত জটিল রহস্যের, কত কঠিন সমস্যার সমাধান হয়ে যায় অপূর্বভাবে। এটি অনুধাবন করবার জিনিস।

শাস্ত্র মানে কি? নিশ্চল দাস এক জায়গায় বলেছেন, 'ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্ম হো তো, তাকো বাণী বেদ।' যিনি ব্রহ্মবিদ্ তিনি ব্রহ্মস্বরূপ এবং তিনি যা বলেন তার নাম বেদ। বেদ মানে কেবল কতকগুলি পুঁথি নয়। বেদ বলতে বোঝায় সেই অনাদি সত্য, ভগবানের বাণী, যা পরম্পরাক্রমে ঋষিদের মুখ দিয়ে নিঃসৃত হয়ে চারিদিকে প্রসারিত হয়েছে। সেই বাণীকে আমরা বর্ণরূপ দিয়ে ধরে রেখেছি—এর নাম বেদ। বেদ মানে চিরন্তন সত্য।

স্বামী বিবেকানন্দ প্রসঙ্গক্রমে বলেছেন, বেদ-বেদান্তকে আমাদের চরম প্রমাণরূপে গ্রহণ করতে হবে, কিন্তু সেই বেদ-বেদান্তকে বুঝতে হবে শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনালোকে। বেদ অনন্ত জ্ঞানের খনি, কিন্তু তা হলেও সেই খনি থেকে রত্ন উদ্ধার করা কম কথা নয়। যাঁরা একটু বেদের আলোচনা করেছেন, অথবা সংস্কৃতজ্ঞ না হলেও যাঁরা অনুবাদের ভিতর দিয়েও দেখেছেন, তাঁরা নিশ্চয় বুঝেছেন যে, এই বিশাল অরণ্য থেকে তত্ত্ব আহরণ করা কত কঠিন। সেই জন্যে স্বামীজী বলছেন, তত্ত্ব যদি জানতে চাও, তাহলে শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনালোকে তা পড়তে হবে। বেদ কতকগুলি শব্দ, সে শব্দগুলির অর্থ নির্ণয় করতে বড় বড় দার্শনিকেরা হয়রান হয়েছেন। এক একজন তার অর্থ গ্রহণ করেছেন এক এক রকম ক'রে এবং এই বিভিন্ন অর্থগুলির মধ্যে কোন্‌টি সত্য তাই নিয়ে বিবাদ আজ পর্যন্ত চলছে। মীমাংসা এখনো হয়নি। সুতরাং আমরা বেদের তাৎপর্য যদি জানতে চাই, তা হলে কেবল বেদ অধ্যয়ন করলেই হবে না, যেখানে অপূর্ব ব্যক্তিত্বের,

আলোকে বেদ প্রকাশিত হয়েছে সেখানে বেদের মর্ম খুঁজতে হবে। স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন, শ্রীরামকৃষ্ণরূপ অপূর্ব জ্যোতিতে যেভাবে বেদের মর্ম উদ্ভাসিত হয়েছে, এমন আর পূর্ব পূর্ব যুগে কখনও হয়নি। অবশ্য অন্য অন্য অবতারে বেদের সারমর্ম ভগবান আমাদের কাছে দিয়েছেন, কিন্তু আমরা এমন দুর্বল যে, সেই মর্মগুলিকে ধরে রাখতে পারিনি। আমরা জানি সমস্ত উপনিষৎ-সমুদ্রকে মন্থন ক'রে গীতারূপ অপূর্বরত্ন উদ্ধার করেছেন শ্রীকৃষ্ণ। পরিবেশন করে গেছেন সেই গীতাকে যা সমস্ত বেদের সার। কিন্তু সেই গীতার উপরেই কত না টীকা-টিপ্পনি, ভাষ্য! তার ব্যাখ্যার ভিতরে কত না মত-মতান্তর! পরিণাম কি হ'ল? না, সেই দ্বন্দ্ব-কোলাহল, সেই সংশয় আমাদের ক্রমাগত চলেই আসছে।

প্রশ্ন হচ্ছে, শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনালোকে দেখলে কি সংশয় দূর হবে? শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেই বলছেন, 'দ্যাখ্, নবাবী আমলের টাকা বাদশাহী আমলে চলে না।' তার মূল্য কমে যায়! কেন না, মানুষের ভিতর নতুন সংশয়ের উদ্ভব হয়, নতুন নতুন সমস্যা দেখা দেয়। সেগুলির সমাধানের জন্য আবার নতুন আলোকের সন্ধান করতে হয়। যদিও আমরা বিশ্বাস করি, বেদের ভিতর সমস্ত সমস্যার সমাধান নিহিত আছে, কিন্তু সেই সমাধান প্রত্যক্ষীভূত করা, তত্ত্বকে আবিষ্কার করা আমাদের মতো কলুষিত বুদ্ধি দিয়ে সম্ভব নয়। তাই যে জীবনে তত্ত্ব পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে, যে জীবনে তত্ত্বগুলি মূর্তিলাভ করেছে, সেই জীবনের সাহায্য আমাদের প্রয়োজন হয়। এই জন্য শ্রীরামকৃষ্ণকে বলে বেদমূর্তি। বেদ যেন মূর্তি ধারণ ক'রে আমাদের সামনে তার ভাণ্ডার খুলে ধরেছে, চারিদিকে অকাতরে সেই রত্নগুলি পরিবেশন করছে, যাতে আমাদের কোন সমস্যার সমাধান যেন আর বাকি থেকে না যায়। কথাগুলি খুব বড় কথা ব'লে মনে হতে পারে, কিন্তু আমরা যদি শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন অনুধ্যান করি, তাঁর উপদেশগুলির মর্ম যদি বোঝবার চেষ্টা করি তাহলে হয়তো এই সত্যের কিছুটা হৃদয়ঙ্গম করতে পারব।

শ্রীরামকৃষ্ণের কথাগুলি অতি সাধারণ। সাদা কথায়, যাতে গ্রামের লোকও বুঝতে পারে, পণ্ডিতমূর্খ নির্বিশেষে সকলে ধারণা করতে পারে, এ ভাবে বলা। আমরা তথাকথিত পণ্ডিত যারা, তারা সাধারণত: মনে করি, এত সাদা কথায় কি কঠিন তত্ত্বকে ব্যক্ত করা সম্ভব? এই প্রশ্ন স্বভাবত: আমাদের মনে জাগে। এখানে কবিত্ব নেই, শ্লোকের ছড়াছড়ি নেই, সংস্কৃত ভাষা বা অন্য কোন দুর্ভেদ্য আবরণে কথাগুলিকে ঢাকা হয়নি। অতি সাদা কথায়, সহজ বাংলায়, গ্রামের ভাষায় সমস্ত তত্ত্ব পরিবেশিত হয়েছে। কিন্তু একেবারে সমস্ত দার্শনিকতার আড়ম্বর থেকে মুক্ত ক'রে এমন সরলভাবে সত্যকে পরিবেশন করার যে অপূর্ব দৃষ্টান্ত এই শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত বা তাঁর উপদেশের ভিতর দিয়ে পাই, এর যেন আর কোথাও তুলনা নেই। কাজেই শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনালোকে যে বেদ-বেদান্ত বুঝতে হবে, এ কথাটি কেবল কথার কথা নয়, একটি নিগূঢ় সত্য।

যাঁরা দার্শনিকতাপ্রিয়, যাঁরা প্রখর বুদ্ধির অধিকারী, এমন অনেক বড় বড় পণ্ডিতও শ্রীরামকৃষ্ণকথার যে মূল্যায়ন করেছেন, তা অনুধাবনযোগ্য। তাঁরা বলেছেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণের এক একটি কথা সমস্ত শাস্ত্রের নির্যাস, সমস্ত শাস্ত্রের মর্ম যেন সংগৃহীত হয়ে তাঁর এক একটি কথার ভিতর দিয়ে প্রকাশিত

হচ্ছে। পণ্ডিতেরা মুগ্ধ! আর সাধারণ মানুষের তো কথাই নেই! সাধারণ মানুষ দেখে যে, যে ভাষায় উপদেশ, সে তাঁর নিজেরই ভাষা। সুতরাং সে জানে এ উপদেশ তার জন্য। আবার পণ্ডিতেরাও বোঝেন, এ উপদেশ তাঁদের জন্য, কারণ তাঁদের সংশয়ের বেড়াজাল থেকে মুক্ত হওয়ার অন্য উপায় নেই। পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি, যিনি তখনকার দিনের প্রখর বক্তা এবং গভীরশাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন ব'লে খ্যাতিলাভ করেছিলেন, তিনি ঠাকুরের কথা শুনে বলছেন, 'আমরা এতদিন শাস্ত্রের মধ্য থেকে কেবল ঘোলই খেয়েছি। আর ইনি—এর ভিতর থেকে মাখনটি উদ্ধার করেছেন।' শাস্ত্রের ভিতরে সব জিনিস মেশানো আছে। ঠাকুরের নিজের কথা, 'শাস্ত্রে বালিতে চিনিতে মেশানো আছে।' যাঁরা উপযুক্ত অধিকারী, যাঁরা প্রকৃত জিজ্ঞাসু, তাঁরা এর ভিতর থেকে বালি পরিহার ক'রে চিনি সংগ্রহ ক'রে নেন। কিন্তু এই যে পৃথক্করণ, বালি থেকে চিনিকে আলাদা ক'রে নেওয়া, এ কি সাধারণের কাজ? তাই দয়াময় শ্রীরামকৃষ্ণ দেহধারণ ক'রে এসে আমাদের জন্য পৃথক্করণ করেছেন। এই জন্য সকলের সমস্যার সমাধান অনায়াসে হয়, কত বিভিন্ন প্রকারের সমস্যার সমাধান পাওয়া যায় তাঁর কথা থেকে!

যদি আমরা গভীরভাবে অন্বেষণ করি তবে দেখতে পাব, এক দিক দিয়ে যেমন দুরূহ তত্ত্বের, নানা দার্শনিক সমস্যার সমাধান শ্রীরামকৃষ্ণের কথায় আছে, তেমনি আছে আধ্যাত্মিকতার পথে চলতে গিয়ে যেসব সংশয় জাগে, তার নিরাকরণ—যাতে আমরা পরিষ্কার ক'রে বুঝতে পারি কোন্ পথে আমাদের চলতে হবে, আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অগ্রগতির পথে যেসব বাধা তা কিভাবে দূরীভূত হবে। এমন উপদেশ আমরা তাঁর 'কথামৃতে'র ছত্রে ছত্রে পাচ্ছি। কম কথা নয় এটি। আমরা এর ভিতরে দুরূহতা পাই না। সত্যকে তর্কজালের আড়ম্বর দিয়ে আচ্ছন্ন করবার চেষ্টা এখানে নেই। সর্ব-আবরণ-মুক্তরূপে সত্য এখানে পরিবেশিত হচ্ছে।

শ্রীরামকৃষ্ণের এক একটি কথা যেন এক একটি অমূল্য রত্ন। এ রত্নকে বোঝার জন্য খুব বড় জহুরী না হলেও চলে। সাধারণ লোকেই এর মূল্য বুঝতে পারে, যদিও যেমন যেমন আমরা সাধনপথে এগিয়ে যাব, যেমন যেমন আমাদের অন্তর শুদ্ধ হবে, আমাদের বুদ্ধি নির্মল হবে, তেমনি তেমনি আমরা এর ভিতরে যে গূঢ় তাৎপর্য নিহিত তা আরও বেশী বেশী ক'রে বুঝতে পারব। যেমন স্বামীজীর কথা থেকে শুনতে পাই। একদিন স্বামীজী বলেছেন যে, ঠাকুরের এক একটি কথা নিয়ে ঝুড়ি ঝুড়ি দার্শনিক গ্রন্থ লেখা যায়। তাঁর একজন গুরুভাই বললেন, 'কেন ভাই, আমরা তো এ-রকম কিছু দেখি না। ঠাকুরের কথার ভিতরে এ-রকম দার্শনিকতার তো কোন ছায়া পাই না সাদা কথা।' স্বামীজী তখন ঠাকুরের একটি সাধারণ কথা তুলে তার ব্যাখ্যা আরম্ভ করলেন। শোনা যায়, সাতদিন ধরে তার ব্যাখ্যা চালিয়েছিলেন। তাঁর গুরুভাইরাও কম বুঝতেন না, তথাপি জানি না তাঁরাও এই দীর্ঘ ব্যাখ্যার কতটুকু ধারণা করতে পারলেন। অসাধারণ ব্যাপার! তাঁরা লিখছেন, 'স্বামীজীর এই ব্যাখ্যা শুনে আমরা অবাক! আমরা তো ঠাকুরের কথার ভিতরে এত যে গভীর অর্থ আছে তা কোন দিন ভাবিনি।' ভাবার প্রয়োজন নেই। কারণ, এক একটি শব্দ তিনি বলেছেন, বিভিন্ন ব্যক্তির হৃদয়ে তা বিভিন্ন রূপে প্রতিভাত হচ্ছে। যে যেমন

অধিকারী সে তার ভিতর থেকে তেমনি ভাবে সেই তত্ত্ব, সেই রহস্য নিচ্ছে এবং নিজের সমস্যার সমাধান খুঁজে পাচ্ছে। জীবনে আমরা আধ্যাত্মিকতার গভীরে যত বেশী প্রবেশ করব, সেই কথার তাৎপর্য তত বেশী প্রকাশিত হবে। সুতরাং দার্শনিকতার আবরণ দিয়ে তাঁর উপদেশ-গুলিকে আচ্ছন্ন করবার দরকার নেই। আমরা সাদা কথায় তাঁর উপদেশগুলি বুঝতে পারি যদি, তাই যথেষ্ট।

একজন বলেছেন যে, 'কথামৃতে'র অর্থ তো স্পষ্ট, তার আবার ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে নাকি? বাস্তবিক খুব প্রয়োজন নেই। কেন নেই? কারণ 'কথামৃত' সর্বসাধারণের জন্য পরিবেশিত হয়েছে—পণ্ডিতের জন্য যেমন, মূর্খের জন্যও তেমনি; গৃহস্থের জন্য যেমন, সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর জন্যও তেমনি। এর ভিতরে এত রকমের উপদেশ আছে যে, যে-কোন পিপাসু ব্যক্তি এই মন্দাকিনীর তীরে আসবে, সে এই মন্দাকিনীর ধারা পান ক'রে পরিতৃপ্ত হবেই। যত রকমের বিচিত্র মনোভাব নিয়েই আসুক, সকলেই এর ভিতর থেকে নিজ নিজ গ্রহণযোগ্য কিছু পাবেই এবং তাদের জীবনে তা কাজে লাগবেই। যদি কোথাও এমন কোন কথা থাকে যা হয়তো কোন কোন লোকের জীবনে প্রয়োগ করা সম্ভব নয়, তাহলে, ঠাকুর সঙ্গে সঙ্গে বলেছেন, 'এ আমি বললুম, এর ভিতর থেকে তোমরা ন্যাজা-মুড়ো বাদ দিয়ে নিও।' ন্যাজা-মুড়ো বাদ দেবার অধিকার তিনি দিয়ে দিচ্ছেন। কারণ তাঁর সকলকে উপদেশ দিতে হবে, সবার জীবনে যা কার্যকর, এমন উপদেশ; কাজেই তাঁকে এমনভাবে উপদেশ দিতে হবে, সব অধিকারীই তা গ্রহণ করতে পারে। তিনি তো অনেক সময় এমন বলছেন, 'দেখো বাপু, ভগবানের জন্য সব না ছাড়লে হবে না। সমস্ত ছেড়ে ভগবানকে ধরতে হবে।' বলছেন, 'নাচতে হলে এক হাত তুলে, এক হাত বগলদাবা ক'রে নাচলে হবে না। দুহাত তুলে নাচো। ভগবানকে সব সমর্পণ ক'রে নিশ্চিন্ত হয়ে তাঁর শরণাগত হও।'

কিন্তু প্রশ্ন এই যে, আমাদের সব সমর্পণ করতে বললেই কি আমরা তা করতে পারি? কাজেই তিনি সমাধান দিচ্ছেন, যদি তা না পার তো তাঁর কাছে প্রার্থনা করো। তিনি তোমাকে সর্ব বাসনা থেকে, সমস্ত বন্ধন থেকেই মুক্ত ক'রে তাঁর পাদপদ্মে স্থান দেবেন। শুনে মন আশ্বস্ত হয়, তাহলে এ তো এমন একটা পথ, যা সকলে গ্রহণ করতে পারে। গিরিশ ঘোষের সেই প্রসঙ্গ আপনারা জানেন। গিরিশবাবুকে যখন ঠাকুর বলছেন, 'দ্যাখো, আর কিছু করতে না পার তো অন্ততঃ দুবেলা কায়মনোবাক্যে তাঁকে স্মরণ ক'রো।' গিরিশবাবু চুপ ক'রে আছেন। 'দুবেলা স্মরণ কোরবো! তা কি ক'রে সম্ভব? আমার কর্মব্যস্ত জীবন। অনেক সময় খেয়ালই থাকে না দিন কোথা দিয়ে চলে যায়! কাজেই দুবেলা কি ক'রে স্মরণ কোরবো? আর গুরুর কাছে কথা দিয়ে পালন না করা তো উচিত হবে না'—তাই তিনি মৌন অবলম্বন ক'রে রয়েছেন। ঠাকুর দেখলেন যে, এ তো নিতে রাজী নয় এ উপদেশ। বলছেন, 'আচ্ছা' অন্ততঃ দিনান্তে একবার তাঁকে স্মরণ কোরো।' গিরিশবাবু তখনও নিরুত্তর। কারণ, তাঁর মন বিচার ক'রে দেখলে যে, এমন দিন অনেক চলে যায় যখন সমস্ত দিনের ভিতর একবারও ভগবানকে স্মরণ করা হয় না। সুতরাং দিনান্তে একবারও তাঁকে স্মরণ কোরবো, এও সম্ভব নয়। তিনি চুপ ক'রে রইলেন। ঠাকুর তাঁর ভাব বুঝলেন, বললেন, 'তুমি যদি দিনে একবারও ভগবানকে স্মরণ করতে না পার তাহলে আমাকে বকলমা দাও। আমার

উপরে ভার দাও, যা কিছু করবার আমি কোরবো।' গিরিশবাবু নিশ্চিন্ত হলেন। তিনি বুঝলেন যে, তাঁর ইহকালের পরকালের দায়িত্ব গুরু কর্ণধাররূপে গ্রহণ করেছেন, তাঁর জীবনে আর কোন শঙ্কা নেই, আরকিছু করণীয় নেই, আর কোন চিন্তা ভাবনা নেই। নিশ্চিন্ত গিরিশবাবু। কিন্তু পরজীবনে গিরিশবাবু বলছেন, 'তাঁকে তো বকলমা দিয়েছি; কিন্তু বকলমা দিয়ে বিপদে পড়ে গেছি।' এই বকলমা দেওয়ার কিছুদিন পরের কথা, একদিন গিরিশবাবু কথায় কথায় ঠাকুরের কাছে বলছেন, 'মশায়, আমাকে অমুক জায়গায় যেতে হবে', 'বা অমুক কাজটা করতে হবে।' ঠাকুর শুনে বললেন, 'সে কি গো! তুমি না আমায় বকলমা দিয়েছ, তুমি না আমার উপর সব ছেড়ে দিয়েছ? এখন এটা করতে হবে, ওটা করতে হবে—এসব প্রশ্ন মনে উঠছে কেন? বল—তিনি করান তো করব।' গিরিশবাবু দেখলেন, সত্যই তো। তাঁর শেষ জীবনের কথা। একদিন বলছেন, 'গুরু যখন আমার সব ভার নিলেন, বললেন যে, আমাকে বকলমা দিয়ে নিশ্চিন্ত হও, আমি সত্যই নিশ্চিন্ত হলুম। কিন্তু যতদিন যাচ্ছে তত দেখছি এই বকলমা দেওয়া যত সোজা মনে করছিলুম তত সোজা নয়। প্রতিটি কাজ এই ভেবে করতে হয় যে, আমি করছি না, তিনি করাচ্ছেন। এমনকি শ্বাস-প্রশ্বাসের সময়ও ভাবতে হয় যে, আমি করছি, না তিনি করাচ্ছেন।' এই যে গভীর তাৎপর্য, এর কথা গিরিশের মনে প্রথম ওঠেনি; কিন্তু যত দিন গেছে, যত তিনি এগিয়ে গেছেন লক্ষ্যের দিকে তত তিনি ধীরে ধীরে বুঝতে পেরেছেন যে, বকলমা দেওয়ার তাৎপর্য কত গভীর! সুতরাং আমরা ঠাকুরের ছোট ছোট কথাগুলিকে যে অর্থেই গ্রহণ করিনা কেন, তাতেও দোষ নেই, কারণ তার ভিতরের গূঢ় অর্থ যা, তা ক্রমশঃ প্রতিভাত হবেই।

তাঁকে আমরা কি সবটা বুঝে ফেলেছি? এই প্রসঙ্গে মনে হয় ঠাকুর তাঁর নিজের সম্বন্ধে অনেক জায়গায় অনেক রকম উক্তি করেছেন, যে উক্তিগুলি আমাদের কাছে অপূর্ব ব'লে মনে হয়, উপনিষদ্ তার কাছে যেন ফিকে হয়ে যায়। বলেছেন, 'দেখো, বাউলের দল এল, নাচলে গাইলে, চলে গেল, কেউ চিনলে না।' অবতার আসেন, লীলা করেন তাঁর পার্ষদদের নিয়ে, তারপর লীলাসংবরণ ক'রে অন্তর্হিত হন; কিন্তু তাঁকে আমরা কেউ চিনতে পারি না। কেউ বলি পাগল, কেউ বলি ভক্ত বটে খানিকটা, কেউ বলি একটু ছিট আছে; কেউ বা অন্যরকম ক'রে বলি—অপূর্ব ভাব-ভক্তি; আবার কেউ কেউ তাঁকে ঈশ্বরাবতারের পর্যায় পর্যন্ত তুলে ধরি। তিনি নিজে এ বিষয়ে উদাসীন। তিনি কখনও এ সম্বন্ধে কোন বিশেষ আলোচনা করছেন না। নির্লিপ্তভাবে নিজের জীবনকে যেন দেখছেন সাক্ষিরূপে। তিনি কি দেখছেন? দেখছেন, 'এই খোলটার ভিতরে জগন্মাতা ছাড়া আর কিছু নেই। দেখছি, এর ভিতরে তিনি পরিপূর্ণরূপে ভরে রয়েছেন।' সুতরাং যা কিছু কথা হচ্ছে, যা কিছু উপদেশ বর্ষিত হচ্ছে, যা কিছু কার্যকলাপ—'সব সেই জগন্মাতার ইচ্ছায়, তাঁরই দ্বারা হচ্ছে এবং তিনিই করাচ্ছেন।' ঠাকুর যে এখানে বলেছেন, 'আমি যন্ত্র, তিনি যন্ত্রী'—এ কথাটি কথার কথা মাত্র নয়, গভীর অর্থপূর্ণ কথা। তিনি নিজে তাঁর কোনও কর্মের জন্য দায়ী নন। যিনি যন্ত্রী, যিনি এই যন্ত্রকে চালাচ্ছেন, তিনিই জানেন এর তাৎপর্য। যন্ত্র কেমনভাবে কাজ করবে, কি সুরে বাজবে—তা যন্ত্রী জানেন, যন্ত্র জানে না। ঠাকুরকে আমরা এইভাবে দেখছি—তিনি বলছেন, এটা যন্ত্র অর্থাৎ এই খোলটা যন্ত্র,

এর ভিতরে কেবল মা কাজ করছেন, আর কিছু নেই। কখনও বলছেন, 'ছাখো, অবতার কি রকম জান? যেন অচিনে গাছ। গ্রামে অনেক জায়গায় এরকম গাছ দেখা যায়, সে গাছ লোকে কেউ জানে না। অন্য সাধারণ গাছ সবাই চেনে, কিন্তু সেসব কোন গাছের সঙ্গে এ গাছটির মিল নেই; তাই লোকে তার নাম দেয় অচিনে গাছ। অবতার সেইরকম অচিনে গাছ, যাঁকে কেউ চেনে না।' কিন্তু এরকম অচিনে গাছের আমাদের দরকার কি?

দরকার সেই অচিনকে চেনাবার জন্যে। অবতারের ভিতর যে তত্ত্ব প্রতিভাত হয়, যে আলোক তাঁর ভিতর দিয়ে প্রকাশিত হয়, তা অবতার ছাড়া আর কোন জায়গা দিয়ে আসতে পারে না। ঠাকুর আর একটা উপমা দিচ্ছেন, বলছেন, 'জান, তোমার সামনে একটা বিরাট মাঠ, কিন্তু সামনে একটা প্রকাণ্ড দেওয়াল থাকায় মাঠটা তুমি দেখতে পাচ্ছ না। এখন ধর দেওয়ালের ভিতরে একটি ছোটো ছিদ্র আছে। সেই ছিদ্রের ভিতর দিয়ে তুমি মাঠের একটু অংশ দেখতে পাও। যদি ছিদ্রটা একটু বড় কর, তাহলে মাঠের আরও খানিকটা অংশ দেখা যাবে। অবতার হচ্ছেন যেন একটা প্রকাণ্ড ছিদ্র, যার ভিতর দিয়ে ঐ ব্রহ্ম-প্রান্তরের অনেকখানি দেখা যায়। এভাবে, অবতারের ভিতর দিয়ে দেখা ছাড়া মানুষের সাধ্য নেই সেই বাক্যমনের অতীত তত্ত্বকে অনুভব করবার। শাস্ত্র এবং অন্যান্য অবতারেরা বলেছেন, 'আমার ভিতর দিয়ে তত্ত্বের অন্বেষণ কর, আমার ভিতর দিয়ে সেই তত্ত্বকে দেখ।' ঠাকুর এই কথা পরিষ্কার ক'রে বলছেন, 'তোমরা ব্রহ্মের সম্বন্ধে অন্যভাবে ধারণা করতে পারবে না। অগাধ ব্রহ্মসমুদ্র, কার সাধ্য যে তাকে মাপে! সুতরাং তোমাদের বুঝতে হলে অবতারের ভিতর দিয়ে বুঝতে হবে।' অবতারের উপদেশ অনুসারে জীবন নিয়ন্ত্রিত করতে হবে, তাঁর জীবনালোকে শাস্ত্রকে জানতে হবে। স্বামীজী যেমন বলেছেন, তাঁর জীবনালোকে বেদকে জানতে হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ আমরা নানা ভাবে আলোচনা করি। প্রত্যেকটি ভাবের আলোচনাই আমাদের জীবনে উপযোগী, কারণ কিছু না কিছু আলোক তাঁর ভিতর থেকে আমরা পাই এবং আমাদের পথ খানিকটা প্রকাশিত হয়। আমরা যত বেশী অনুধ্যান করব, যত আমরা জীবনকে শুদ্ধ করব, তত এর ভিতর থেকে গভীর, গভীরতর তাৎপর্য বুঝতে পারব। এই কথাটি বোঝাবার জন্যে ঠাকুর অনেক সময় তাঁর পার্ষদদের এক এক জনকে আলাদা আলাদা ক'রে বলতেন, 'আচ্ছা, তোমার আমাকে কি মনে হয় বল দেখি?' 'আমার কতখানি জ্ঞান হয়েছে, কতটুকু ভক্তি হয়েছে—দু'আনা হবে, কি চার-আনা হবে?' একজন ভক্ত বলেছেন, 'মশায়, ও দু-আনা চার-আনার হিসাব জানি না। তবে এইটুকু বুঝি যে, আপনার ভিতর দিয়ে যে প্রকাশ দেখছি তা অসাধারণ, এরকম আর কোথাও নেই।' ঠাকুর হেসে বললেন, 'শালা বলে কিরে!'

একদিন এই পুণ্যভূমিতেই যে ঘটনাটি হয়েছে, তারই আবার পুনরাবৃত্তি করছি। ঠাকুর একদিন প্রকাশিত হয়েছেন রাম, গিরিশ প্রভৃতি ভক্তদের সামনে। সেখানে ভক্তেরা বসে বসে আলোচনা করছিলেন। ঠাকুর এসে গিরিশকে উদ্দেশ ক'রে বলছেন, 'গিরিশ, তুমি যে সকলকে এত কথা (আমার অবতারত্ব সম্বন্ধে) ব'লে বেড়াও, তুমি (আমার সম্বন্ধে) কি দেখেছ ও বুঝেছ?' গিরিশবাবু কবি, বক্তা; তিনি হাতজোড় ক'রে নতজানু হয়ে বলছেন, 'ব্যাস, বাল্মীকি যাঁর বর্ণনা করতে পারেননি, আমি তাঁর কি বর্ণনা করব?' এমনভাবে সেখানে তাঁর স্তুতি

করলেন—যেমনভাবে ঋষিরা পরমেশ্বরের স্তব করেন, তাঁদের মুখে যেমন পরমেশ, পরমাত্মার স্তুতি শুনি, সেইরকম অপূর্বভাবে বিভোর হয়ে গিরিশবাবু তাঁর স্তুতি করলেন! ঠাকুর সমাধিস্থ হয়ে তখন তাঁদের বলছেন, 'তোমাদের চৈতন্য হোক!' এই ক্ষেত্রে, এই পুণ্যভূমিতেই সেই লীলার প্রকাশ হয়েছে। আপনারাও পূর্ব পূর্ব বক্তাদের কাছ থেকে নিশ্চয় শুনেছেন এবং গ্রন্থাদি থেকেও নিশ্চয় জেনেছেন।

এই যে আত্মপ্রকাশ—এই আত্মপ্রকাশ তিনি যদি না করেন, কার সাধ্য যে তাঁকে জানে? 'কে তোমারে জানতে পারে, তুমি না জানালে পরে!' মথুরবাবু একবার বলছেন, 'বাবা, তুমি নিজে না চেনালে, কার সাধ্য তোমাকে চিনতে পারে?' তিনি স্ত্রী কি পুরুষ—তা পর্যন্ত চেনা যায় না, মানুষ কি দেবতা—তা তো দূরের কথা। তাঁর অবতারত্ব সম্বন্ধে লোকে কত কি বলছে! শুনে ঠাকুর বলছেন, 'কেউ থিয়েটার করে, কেউ ডাক্তার, আর বলে কিনা, অবতার! অবতারের ওরা বোঝে কি? কত বড় বড় পণ্ডিত—সব শাস্ত্রপারঙ্গত—তাঁরাও অবতার বলেছে। অবতার কথায় ঘেন্না ধরে গেছে।' কথা বলে তো কিছু কাজ হবে না। কথা হচ্ছে, আমরা কিভাবে জীবনকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে তাঁর ছাঁচে ঢালতে পারি। শ্রীরামকৃষ্ণ আবির্ভূত হয়েছেন পরিপূর্ণ নিখুঁত একটি ছাঁচরূপে। তাঁর কৃপায় যদি আমরা সেই মুদ্রায় নিজের নিজের জীবনকে ঢালতে পারি, তাহলেই আমাদের জীবন সার্থক। আমরা এই যে শুভক্ষণে জন্মেছি, সেই জন্ম আমাদের সার্থক হয়, যদি আমরা সর্বতোভাবে এই শুভক্ষণে জন্মাবার সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারি। কিন্তু আমরা সেভাবে শরণাগত হয়ে, ছাঁচে ঢেলে নিজেদের গড়বার জন্য চেষ্টা করছি কিনা দেখতে হবে। আমরা কতটুকু বুঝেছি সেটা বড় কথা নয়। আমরা হয়তো, পণ্ডিতরা যেভাবে বোঝেন, সেইভাবে তাঁর কথা বুঝিনি, কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না। আমরা এর ভিতর দিয়ে জীবনের লক্ষ্য স্থিরীকৃত করতে পারি কিনা এবং দৃঢ়পদে সেই লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে পারি কিনা, সেটাই বড় কথা, তারই জন্য চেষ্টা করতে হবে। যদি চেষ্টা করি, অল্প দুর্বল চেষ্টাও যদি হয়, তাহলেও ভয় নেই; কারণ ঠাকুর নিজে বলেছেন, 'তুমি তাঁর দিকে এক পা বাড়ালে তিনি তোমার দিকে দশ পা এগিয়ে আসবেন।' সুতরাং এই শুভ মুহূর্তে আমি তাঁর শ্রীচরণে এই প্রার্থনা ক'রে বক্তব্য শেষ করি যে, তিনি তাঁর পাদপদ্মে আমাদের সকলের মনকে আকর্ষণ করুন। হে প্রভু, আমাদের বিষয়াভিভূত মন তোমার দিকে দিতে পারছি না, তুমি আমাদের দুর্বলতা জান, সুতরাং দয়া ক'রে তুমি আমাদের মন আকর্ষণ কর, তোমার পাদপদ্মে লীন কর তাকে, যাতে আমাদের এই শুভ দিনে জন্ম সার্থক হয়।*

*১.১.৭৩ তারিখে কাশীপুর উদ্যানবাটীতে কল্পতরু উৎসবে প্রদত্ত ভাষণের অনুলিখন।—সঃ

পথে-প্রান্তরে শ্রীরামকৃষ্ণ

স্বামী চেতনানন্দ

আমরা শ্রীরামকৃষ্ণকে মঠে-মন্দিরে ঘরে পূজার সিংহাসনে, প্রাচীর গাত্রে দেখতে অভ্যস্ত। কিন্তু তিনি কেবল সেখানেই ? তাঁর কথা ছিল, 'ঘরে ঘরে এর (আমার) পূজা হবে'। এখন আর তিনি কেবল ঘরে ঘরেও নাই। তিনি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছেন। পল্লীর চাষীর কুটীরে, ধনীর প্রাসাদোপম অট্টালিকায়, হিমালয়ের উত্তুঙ্গ শিখরে পাহাড়ীদের কুঠিয়ায়, শহরের ট্যাক্সিতে ট্যাক্সিতে, দোকানে দোকানে, চলতি মানুষের পকেটে পকেটে শ্রীরামকৃষ্ণ বিরাজ করছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ পথ চলতে ভালবাসতেন। তিনি নিজে চলে অপরকে দেখাতেন কীভাবে পথে চলতে হয়। শরীর তাঁর পটু ছিল না, তাই দুঃখ করে বলেছিলেন - নিতাই-গৌর দ্বারে দ্বারে হরিনাম বিলিয়ে বেড়ালেন, আর আমি ঘোড়ার গাড়ী ছাড়া চলতে পারি না। তবুও তিনি ঘোড়ার গাড়ীতে, নৌকায়, হেঁটে, রেলে, গরুর গাড়ীতে, পাল্কীতে—যেমনভাবে পারেন তাপিত-পীড়িত, সংসারের আবর্তে ঘূর্ণিত মানুষকে উঠাবার জন্য ঘুরে বেড়াতেন। যেখানেই আন্তরিকতা-ব্যাকুলতা লক্ষ্য করতেন, সেখানেই ছুটতেন। তার জন্য কোন নিমন্ত্রণ বা সামাজিকতার বালাই ছিল না। তাঁর অন্তরের ভাব ছিল : ওগো, তুমি ভক্ত ; ঈশ্বরের চিন্তা কর—তাই তোমার কাছে এসেছি। 'আমি এসেছি'—ঐটুকুই ছিল যথেষ্ট। 'মানুষ এক পা এগুলে তিনি শত পা এগিয়ে আসেন।' আবার এমন ভক্তও ছিল—যিনি সগর্বে বলতেন, 'আমি এক পা-ও এগুইনি ; তিনিই (শ্রীরামকৃষ্ণ) শত-সহস্র পা ফেলে আমার কাছে এসেছেন।'

যদিও জাগতিক ব্যাপারে তাঁর হুঁশ থাকত না, তবুও ব্যাকুল আত্মার সন্ধানে তিনি ঘুরে বেড়াতেন। কোন পরিচিতের সঙ্গে দেখা হলে বলতেন, 'হাঁগা, তুমি অনেকদিন যাও নাই কেন বল দেখি ? তোমার আড্ডাটা কোন্ ঠিকানায় ?' শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদের ঠিকানা মনে গেঁথে অলিতে গলিতে ঘুরে বেড়াতেন—তাদের মঙ্গলকামনায়। কোন ক্ষুধার্ত উন্নতিপিপাসু আত্মার তীব্র আর্তি তাঁকে রাতদুপুরে টেনে নিয়ে যেত দক্ষিণেশ্বর থেকে কলকাতায়। যদি তার সঙ্গে দেখা করার কোন বিশেষ বিঘ্ন থাকত, তবে পরিচিত ভক্তের বাড়ীতে বসে তাকে ডাকিয়ে এনে তার প্রাণের ক্ষুধা মিটিয়ে তবে ফিরতেন।

মানুষ বেঁচে থাকে স্মৃতিতে। স্মৃতিকে ধরে সে হাসে, কাঁদে, উঠে, চলে, জীবনের রস সম্ভোগ করে। স্মৃতি কখনও থাকে বিলীন, কখনও বা ভাস্বর—জীবনদোলায় সদা দোদুল্যমান। শ্রীরামকৃষ্ণকে স্থূল শরীরে হয়ত আমরা এখন আর কামারপুকুর-জয়রামবাটীর রাস্তায়, কাশী-বৃন্দাবন তীর্থপথে, কলকাতার অলিতে গলিতে, রাজপথে—দেখতে পাব না। তবুও তিনি যে সব পথে চলতেন সে সব পথ এখনও রয়েছে। আমরা দিনের পর দিন সে সব পথ দিয়ে কার্যব্যপদেশে ছুটে চলি, বেড়াই। সংসারের ভারে অবনত, অভাব-অনটনে জর্জরিত, আধি-ব্যাধিতে প্রপীড়িত আমাদের মত সাধারণ মানুষের ঐসব ভাববার অবসর কোথায় ? কেউ যদি চলার পথে বলে দেয়—এ পথ মাড়িয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেব গেছেন—তখন ক্ষণিকের জন্যও মনকে সেই অপূর্ব দেব-মানবের পুণ্যস্মৃতি দোলা দিয়ে যায়।

ঠনঠনের বেচু চ্যাটার্জী স্ট্রীটের উপর 'শ্রীম' (মাষ্টার মহাশয়) যখন সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতেন তখন পথচারীরা ভাবত—এ লোকটা পাগল। আর সেই পাগল জানত—এ পথ দিয়ে স্বয়ং ভগবান বিচরণ করে গেছেন। এ পথ দিয়ে চললে মানুষ যোগী হয়। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের স্মৃতিতে বেঁচে ছিলেন।

মাষ্টার মহাশয় শুধু নিজে ভগবৎস্মৃতিতে বেঁচে ছিলেন না, পরবর্তীকালের অগণিত মানুষের জন্য রেখে গেছেন অমর সব স্মৃতিচিত্র। শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গে 'কথামৃত' ছাড়াও অন্যান্য গ্রন্থ থেকেও শ্রীরামকৃষ্ণের পথচিত্র সংগ্রহ করে আমরা অনুপম আনন্দ উপভোগ করব। স্মৃতিচারণ করতে করতে আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরব। চলার পথে তাঁর হৃদয়গ্রাহী কথোপকথন শুনব। তাঁর তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে যা ভেসে উঠবে—তা থেকে শিক্ষা নেব। অবশ্য তাঁর সঙ্গে চলা সব সময় সুখকর হবে না ; কারণ দিব্য ভাবে গর্গর মাতোয়ারা ব্যক্তিটির যখন তখন accident (দুর্ঘটনা) হতে পারে সে উদ্বেগে আমাদের কাল কাটাতে হবে। অগ্রে আমরা এ বিষয়ে কিছু প্রমাণ পাব।

এ প্রবন্ধটিকে আমরা তিনটি পর্বে ভাগ করে নিয়েছি—কামারপুকুর পর্ব, তীর্থযাত্রা পর্ব ও কলকাতা পর্ব। কলকাতা পর্বে কলকাতার আশেপাশের সব জায়গা ধরে নিতে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণের পথ-প্রান্তরের চিত্রগুলি আমাদের মনকে তাঁর সান্নিধ্য পাইয়ে দেয় যদি, তবেই এ লেখা সার্থক হবে।

॥ ১ ॥

॥ কামারপুকুর পর্ব ॥

শৈশব থেকে যৌবনের প্রারম্ভ পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন কামারপুকুরের নিভৃত পল্লীর ক্রোড়ে কেটেছে। সেখানকার পথ, ঘাট, মাঠ সর্বত্রই ছিল তাঁর অবাধ যাতায়াত। তিনি আপনমনে প্রকৃতির সৌন্দর্যনিচয়ের সঙ্গে একাত্মভাবে অবস্থান করতেন। তিনি পুঁথিগত বিদ্যার স্কুল ছেড়ে দুরন্ত পড়াশুনায় মগ্ন হলেন। তিনি পাঠ করতেন বিশ্বপ্রকৃতিকে! স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, 'শ্রীরামকৃষ্ণ কখনও আমাদের মত অপরের বমি (অর্থাৎ চিন্তা) খাননি। তিনি নিজের মনগ্রন্থখানি তন্ন তন্ন করে পাঠ করতেন। আর মানুষ যখন নিজের মন পাঠ করতে শুরু করে তখনই প্রকৃত মজা শুরু হয়ে যায়।' পরবর্তীকালে তাঁর শিক্ষার অধিকাংশ এসেছে এই প্রকৃতিপাঠের ফল থেকে। সংসারীদের থাকতে হবে কি ভাবে?—নর্তকীর মত, যে মাথায় কলসী রেখে হেলে দুলে চলেছে। অথবা ঢেঁকিতে চিড়ে তৈরীরতা নারীর মত—যে এলে দিচ্ছে, বাচ্চাকে দুধ খাওয়াচ্ছে, ধান ভাজছে, খরিদ্দারের সঙ্গে কথা বলছে ; কিন্তু অত কাজের মধ্যেও মন রয়েছে হাতের উপর। বক্তৃতা দিতে গেলে ঈশ্বরের হুকুম বা চাপরাশ চাই ; সেখানে দিয়েছেন হালদার পুকুরের ঘাটপাড়ে সিপাই-এর নোটীশ টানানর দৃষ্টান্ত। এরূপ অজস্র ছবি শ্রীরামকৃষ্ণের অমর কথায় রূপ পেয়েছে।

তিনি ঘুরতেন মাঠে মাঠে। কখনও মাঠের পথে যেতেন দূরে কোন এক তীর্থযাত্রায়। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম জীবনে দুবার সমাধি হয় ; আর দুবারই হয় দিগন্তপ্রসারী প্রান্তরে অনন্ত আকাশের নীচে। প্রথমবারের ঘটনা তাঁর আত্মকথায় : 'ওদেশে ছেলেদের ছোট ছোট টেকোয় মুড়ি খেতে দেয়। ছেলেরা কেউ টেকোয় ; কেউ কাপড়ে মুড়ি নিয়ে খেতে খেতে মাঠে ঘাটে বেড়িয়ে বেড়ায়। একদিন সকাল বেলা টেকোয় মুড়ি নিয়ে মাঠের আলপথ দিয়ে খেতে খেতে যাচ্ছি। আকাশে একখানা সুন্দর জলভরা মেঘ উঠেছে ; এমন সময় এক ঝাঁক সাদা দুধের মত বক ঐ কাল মেঘের কোল দিয়ে উড়ে

যেতে লাগল। সে এমন এক বাহার হলো! দেখতে দেখতে অপূর্ব ভাবে তন্ময় হয়ে পড়ে গেলুম—মুড়িগুলো আলের ধারে ছড়িয়ে গেল।' রং তুলি দিয়ে এ দৃশ্য যতটা ফোটানো যেত, তার চেয়ে বেশী ফুটিয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণের কথা-শৈলী। পড়তে লাগলে মনে হয় ছবি দেখছি।

দ্বিতীয়বারের ঘটনা: আপনমনে দেবতাদের পুণ্যকথা, লীলাকীর্তন, ভক্তিপূর্ণ ভজন গেয়ে বেড়াতেন তিনি পল্লীর পথে মাঠে। যারা শুনত, বলত, 'গদাইয়ের (শ্রীরামকৃষ্ণের বাল্যবয়সের নাম) গান শুনে আর কোন গান মিঠে লাগেনি। গদাই কান খারাপ করে দিয়েছে।' গাঁয়ের মেয়েদের সঙ্গে একদিন চললেন তিনি দূর গ্রাম আনুরে—দেবী বিশালাক্ষীদর্শনে। প্রান্তরের মধ্যেই ঘটল অভাবনীয় ঘটনা। দেবীর মাহাত্ম্য কীর্তন করতে করতে শ্রীরামকৃষ্ণ হয়ে পড়লেন সংজ্ঞাহীন।

যুবক শ্রীরামকৃষ্ণকে তাঁতিনী-বেশে সন্ধ্যার সময় তাঁর কোন পরিচিত বন্ধু যদি কামারপুকুরের রাস্তায় দেখত—সে নিশ্চয়ই চিনতে পারত না। এমনই ছিল তাঁর নিপুণ বেশবিন্যাস এবং অনুকরণের ক্ষমতা। তিনি ঐভাবে পল্লীর দুর্গাদাস পাইনের অভিমান চূর্ণ করেন এবং নারীদের অবরোধপ্রথার সম্বন্ধে মন্তব্য করেন: 'অবরোধ-প্রথার দ্বারা রমণীগণকে কখনও কি রক্ষা করা যায়? সংশিক্ষা ও দেবভক্তি-প্রভাবেই তাঁহারা সুরক্ষিত হন।'

হালদার পুকুরের ঘাটে স্নানরতা নারীদের দর্শনে বালক গদাইকে কেউ যদি গাছের আড়াল থেকে উঁকি মারতে দেখেন, তিনি নিশ্চয়ই অবাক হবেন, 'দেখতে নেই', এসে তিরস্কার করবেন। কিন্তু সেই তিরস্কারকারিণী বর্ষীয়সী রমণীর প্রতি বালকের সগর্ব উক্তি ছিল: 'পরশু চারিজন রমণীকে স্নানকালে লক্ষ্য করিয়াছি, কাল ছয়জনকে এবং আটজনকে ঐরূপ করিয়াছি; কিন্তু কৈ আমার কিছুই তো হইল না।' পরে জননী চন্দ্রার কথায় বালক নিরস্ত হন। নিজেকে তিনি যাচাই করে নিতেন। কেউ কিছু বললেই তিনি মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁর মনের গতিই ছিল সিদ্ধান্তাভিমুখী।

নিভৃত প্রান্তরে এক বৃক্ষমূলে কোন বৃদ্ধ ব্যক্তি যদি প্রেমকম্পিত হস্তে দণ্ডায়মান বালক গদাইয়ের গলায় বনফুলের মালা পরিয়ে মুখে বড় বড় জিলিপী গুঁজে দেয়—সে দৃশ্যটা নেহাত অসুন্দর নয়। বৃদ্ধ চিনু দরবিগলিত নয়নে বলে চলল আপন প্রাণের কথা: 'গদাই, আমি বুড়ো হয়েছি, বেশী দিন বাঁচব না। তুমি এবারে যে কত লীলাখেলা করবে, তা দেখতেও পাব না। সে যাই হোক, গদাই, আমার তায় ক্ষোভ নাই, আমায় কৃপা কর, আমার জন্ম সার্থক কর।'

প্রত্যেক মানবশিশুই শৈশবে ক্রীড়াকৌতুক করে থাকে—একথা সত্য। কিন্তু নূতন কাপড় ছিঁড়ে কৌপীন পরে তিলক কেটে সন্ন্যাসীর সাজে সজ্জিত মানবশিশুর সংখ্যা জগতে বিরল। বয়স্যাদের সঙ্গে তিনি মানিকরাজার আমবাগানে রামযাত্রা ও কৃষ্ণযাত্রা অভিনয় করতেন। লোকে তাঁর উদ্ভাবনীশক্তি ও দক্ষ অভিনয়ে মুগ্ধ হ'ত।

প্রত্যেক মানুষই পরিণত বয়সে বাল্যস্মৃতি মন্থন করতে ভালবাসে। তখন তাদের থামানোই মুস্কিল। তরতর ক'রে বেরুতে থাকে সুখ-দুঃখ-মাখানো সব পুরাণো কথা। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন: 'ওদেশে (কামারপুকুরে) সদাব্রত অতিথিশালা যেখানে দেখতুম সেখানে যেতুম। গিয়ে অনেক-ক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতুম। কোনখানে রামায়ণ কি ভাগবত পাঠ হচ্ছে, তা বসে বসে শুনতুম। তবে যদি ঢং ক'রে পড়ত, তাহলে তার নকল করতুম, আর অন্য লোকদের শোনাতুম।

[শেষাংশ ৮৯ পৃষ্ঠায়]

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী

[পূর্বানুবৃত্তি]

স্বামী প্রভানন্দ

বসতবাটী ও ফটকের মাঝামাঝি ঠাকুর পৌঁছলে গিরিশ, রাম প্রভৃতি তাঁর নিকট উপস্থিত হন। অকস্মাৎ ঠাকুর গিরিশকে বলেন, "তুমি যে সকলকে এত কথা বলে বেড়াও, তুমি কি দেখেছ, কি বুঝেছ?" গিরিশের অগাধ বিশ্বাস। তিনি এই আকস্মিক প্রশ্নে বিচলিত হন না। তিনি সসম্ভ্রমে রাস্তার উপর ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পদতলে জানু পেতে উপবিষ্ট হয়ে করজোড়ে গদ্‌গদ স্বরে বলেন, "ব্যাস বাল্মীকি যাঁর ইয়ত্তা করতে পারেননি, আমি তাঁর সম্বন্ধে অধিক কি আর বলতে পারি!" গিরিশের উক্তির প্রতি ছত্রে তাঁর অন্তরের সরল বিশ্বাস অভিব্যক্ত হয়। গিরিশের এই অপরূপ স্তব ঠাকুরের দৈবী কল্যাণী শক্তিকে উদ্দীপ্ত করে তোলে। দেখা গেল ঠাকুরের সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত। তিনি গভীর ভাবসমাধিতে মগ্ন হন। শরীর স্পন্দনহীন, নয়ন স্থির! মুখে দিব্য হাসির ঝলক। বাহ্যশূন্য। আর সে মানুষ নয়। মুগ্ধ বিস্ময়ে সবাই দেখেন, ঠাকুরের রূপমাধুর্য যেন শতগুণে বেড়েছে। মহা উল্লাসে গিরিশচন্দ্র 'জয় রামকৃষ্ণ' 'জয় রামকৃষ্ণ' ধ্বনি দিয়ে বারবার ঠাকুরের পদরজ গ্রহণ করতে থাকেন।

অক্ষয় মাষ্টার প্রমুখ কয়েকজন 'গাছের উপর···ডালে ডালে বানর বানর' খেলা করছিলেন। ঠাকুরকে বাগানে পায়চারি করতে দেখে দৌড়ে তাঁর নিকটে উপস্থিত হন। অক্ষয় মাষ্টারের হাতে ছিল দুটি জহরচাঁপা ফুল। সমাধিস্থ ঠাকুরকে দেখে ভাবের আবেগে—

"পদপ্রান্তে গিয়া মুই এমন সময়ে
তোলা দুটি চাঁপা ফুল দিনু দুটি পায়ে।"

কিছুক্ষণের মধ্যে ঠাকুরের অর্ধবাহ্যদশা দেখা গেল। তিনি সহাস্যবদনে উপস্থিত সকলের দিকে দৃষ্টিপাত করেন। ভক্তগণের প্রতি প্রেম ও প্রসন্নতায় আত্মহারা হয়ে—

"ভক্তগণে আশীর্বাদ করিলেন রায়॥
তুলিয়া দক্ষিণ হস্ত বলিলেন তিনি।
চৈতন্য হউক আর কি বলিব আমি॥"

প্রেমবিহ্বল ঠাকুর এই আশীর্বাণী উচ্চারণ করেই ভাববিষ্ট হয়ে পড়েন। এদিকে দিব্যশক্তিপূত আশীর্বাণী ভক্তদের অন্তরে আলোড়ন তোলে, ভাবের উচ্ছ্বাসে তারা যেন স্থান কাল ভুলে যায়। ভাবের উচ্ছ্বাসে কেউ জয়ধ্বনি দেয়, কেউ গাছ থেকে ফুল তুলে ঠাকুরের শ্রীচরণে অঞ্জলি দেয়, কেউ বা পুষ্পবৃষ্টির মত ফুল উপরের দিকে ছুড়ে দেয় ঠাকুরের পদধূলি নেবার জন্য হুড়োহুড়ি লেগে যায়। ঠাকুর আরোগ্যলাভ না করা পর্যন্ত তাঁহারা ঠাকুরের দিব্যদেহ স্পর্শ করবেন না তাঁদের এই সঙ্কল্প ভুলে যান। তাঁদের বোধ হয় যে, তাঁদের দুঃখে দরদী কোন দেবতা তাঁদের কল্যাণ-আশ্রয়দানের জন্য সস্নেহে আহ্বান করছেন। প্রথম ব্যক্তি ঠাকুরের পদধূলি গ্রহণ করে দাঁড়াতেই ঠাকুর ভাবাবস্থায় তাঁর বক্ষ স্পর্শ করে নীচ থেকে উপরের দিকে হাত চালনা করে বলেন, 'চৈতন্য হোক্'। দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রণাম করলে তাঁকেও অনুরূপ কৃপা করলেন; তৃতীয় ব্যক্তিকে, চতুর্থ ব্যক্তিকে, একে একে সমাগত সব ব্যক্তিকে তিনি ঐরূপ দিব্যস্পর্শ

দান করলেন।[৩৩] "আর সে অদ্ভুত স্পর্শে প্রত্যেকের ভিতর অপূর্ব ভাবান্তর উপস্থিত হইয়া কেহ হাসিতে, কেহ কাঁদিতে, কেহ বা ধ্যান করিতে, আবার কেহ বা নিজে আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া অহেতুক দয়ানিধি ঠাকুরের কৃপালাভ করিয়া ধন্য হইবার জন্য অপর সকলকে চিৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিলেন।"[৩৪] সবাই আনন্দে মেতে উঠেছে। সেই সময় হারাণচন্দ্র দাস[৩৫] ঠাকুরের পদধূলি পরমভক্তিভরে গ্রহণ করেন। ঠাকুরকে প্রণাম করা মাত্র ঠাকুর ভাবাবেশে তাঁহার মস্তকে পাদপদ্ম স্থাপন করেন। ধন্য হারাণচন্দ্র! দেখে মনে হয়, পুরাকালে যেমন নারায়ণ গয়শিরে পদার্পণ করে পিতৃপুরুষদের মুক্তিক্ষেত্র সৃষ্টি করেছিলেন, সেরকম আজ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ পদাধররূপে ভক্তকে কৃপাদান করে কাশীপুরকে মহাতীর্থে পরিণত করলেন। কিছু সময়ের মধ্যে ঠাকুরের ভাবের উপশম হল। এভাবে তিনি উপস্থিত ব্যক্তিদের মাতিয়ে নাচিয়ে কাঁদিয়ে হাসিয়ে নিজে হাসতে হাসতে ভবনের দিকে অগ্রসর হন। তাঁর কৃপাদৃষ্টি পড়ে অক্ষয় মাষ্টারের উপর।

৩৩। স্বামী সারদানন্দ 'লীলাপ্রসঙ্গ, দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ' পৃঃ ২৯৫, লিখেছেন, "কোন কোন ভক্তের প্রতি করুণায় ও প্রসন্নতায় আত্মহারা হইয়া দিব্যশক্তিপূত স্পর্শে তাঁহাকে কৃতার্থ করিতে আমরা ইতিপূর্বে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে প্রায় নিতাই দেখিয়াছিলাম, অদ্য অর্দ্ধবাহ্যদশায় তিনি সমবেত প্রত্যেক ভক্তকে ঐ ভাবে স্পর্শ করিতে লাগিলেন।"

৩৪। লীলাপ্রসঙ্গ, গুরুভাব, পূর্বার্ধ, পৃঃ ১২২।

এই ঘটনার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আরেকটি চিত্র পাই ভগিনী নিবেদিতার লেখা থেকে। তিনি লিখেছেন,

"......a story was told me by a simple soul, of a certain day during the last few weeks of Sri Ramakrishna's life, when he came out into the garden at Cossipore, and placed hand on the heads of a row of persons, one after another, saying in one case, 'Aj thak' 'To day let be ?' in another, 'chaitanya hauk !' 'Be awakened !' and so on. And after this, a different gift came to each one thus blessed. In one there awoke an infinite sorrow. To another, everything about him became symbolic, and suggestive ideas. With a third the benediction was realised as over-welling bliss. And one saw a great light, which never thereafter left him but accompanied him always everywhere, so that never could he pass a temple, or a wayside shrine without seeming to see there, seated in the midst of this effulgence,—smiling or sorrowful as he at the moment might deseve—a Form that he knew and talked of as 'the spirit that dwells in the images.'"

—The Complete works of Sister Nivedita, Vol. I

৩৫। হারাণচন্দ্র বেলেঘাটায় বাস করতেন। তিনি কলকাতায় ফিনলে মিওর কোম্পানীর অফিসে কাজ করতেন। স্বামী সারদানন্দ এই ভাগ্যবান ব্যক্তিটির প্রতি ঠাকুরের বিশেষ কৃপাদান সম্বন্ধে লিখেছেন, "ঐরূপে কৃপা করিতে আমরা তাঁহাকে অল্পই দেখিয়াছি।" হারাণচন্দ্র প্রতিবৎসর এই দিনে মহাকৃপার স্মরণোৎসব করতেন।

অক্ষয় মাষ্টার লিখেছেন,

পরে প্রভু ফিরিলেন ভবনের পথে।
দাঁড়ায়ে আছিনু মুই অনেক তফাতে ॥[৩৬]
দূরে থেকে সম্ভাষিয়া কি গো বলি মোরে
পরশিয়া হস্ত দিয়া বক্ষের উপরে ॥
কানে কিবা বলিলেন আছয়ে স্মরণে।
মহামন্ত্রবাক্য তাই রাখিনু গোপনে ॥
কি দেখিনু কি শুনিনু নহে কহিবার।
মনোরথ পূর্ণ আজি হইল আমার ॥[৩৭]

অক্ষয় মাষ্টার এই অপ্রত্যাশিত ও দুর্লভ স্পর্শের আবেগ যেন সহ্য করতে পারেন না। কৃষ্ণকায় কদাকার অক্ষয় সেনের (যাঁকে স্বামী বিবেকানন্দ আদর করে ডাকতেন শাঁকচুন্নী) দেহ বেঁকে চুরে অদ্ভুত আকার ধারণ করে। আনন্দাশ্রু বিসর্জন করতে থাকেন তিনি, দিব্যস্পর্শে কৃতকৃতার্থ বোধ করেন।[৩৮]

ইতিমধ্যে কৃপাধন্য রামদত্ত নবগোপাল ঘোষকে গিয়ে বলেন, "মশায়, আপনি কি করছেন—ঠাকুর যে আজ কল্পতরু হয়েছেন। যান, যান, শীঘ্র যান। যদি কিছু চাইবার থাকে তো এই বেলা চেয়ে নিন।" নবগোপাল দ্রুত ঠাকুরের কাছে গিয়ে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করে বলেন, "প্রভু, আমার কি হবে?" ঠাকুর একটু নীরব থেকে বলেন, "একটু ধ্যান জপ করতে পারবে?" নবগোপাল উত্তর দেন, "আমি ছা-পোষা গেরস্ত লোক; সংসারের অনেকের প্রতিপালনের জন্য আমার নানা কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়, আমার সে অবসর কোথায়?" ঠাকুর একটু চুপ করে আবার বলেন, "তা একটু একটু জপ করতে পারবে না?" উত্তর—"তারই বা অবসর কোথায়?" "আচ্ছা, আমার নাম একটু একটু করতে পারবে তো?" উত্তর—"তা খুব পারব।" ঠাকুর প্রসন্ন হয়ে বলেন, "তা হলেই হবে—তোমাকে আর কিছু করতে হবে না।" তারপর উপস্থিত হন উপেন্দ্রনাথ মজুমদার। "উপেন্দ্র মজুমদারে করি পরশন। লোহার তাঁহার তনু করিলা কাঞ্চন।" তারপর কৃপালাভ করেন রামলাল চট্টোপাধ্যায়। তিনি তাঁর স্মৃতিকথায় বলেছেন, "আমি ভাই ঠাকুরের পিছনে দাঁড়িয়ে ভাবছি যে, সকলের ত একরকম হ'ল, আমার কি গাড়ু গামছা বয়া সার হ'ল? একথা যেমন মনে হওয়া তিনি অমনি পিছন ফিরে বললেন,

৩৬। 'কথামৃতে' (৩।১৩।৪) জানা যায়, দেবেন মজুমদারের বাড়ীতে অক্ষয় মাষ্টার ও উপেন্দ্র মুখোপাধ্যায় ঠাকুরের পদসেবার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন, কিন্তু ভক্তগোষ্ঠীতে প্রচলিত ছিল যে ঠাকুর শ্রীঅঙ্গ অক্ষয় মাষ্টারকে স্পর্শের অধিকার দিতেন না। তার জন্য অক্ষয় মাষ্টারের খেদের শেষ ছিল না, তিনি তাঁর 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণমহিমা' (পৃঃ ৩৫-৪) পুস্তকে লিখেছেন, "আমার সঙ্গে ঠাকুর যে রকম ব্যবহার করতেন, এমন যদি অন্য কোন লোকের সঙ্গে হ'তো, তা হ'লে সে প্রাণ গেলেও আর তাঁর কাছে যেত না।......আমার বাপকে আমি যেমন ভয় করতাম, ঠাকুরকেও তেমনি ভয় করতাম।" আলোচ্য দিনে ভক্তরা যখন ঠাকুরের পদধূলি নিতে ব্যস্ত, অক্ষয় মাষ্টার সে-সময় ভয়ে সরে দাঁড়িয়েছিলেন।

৩৭। পুঁথি, পৃঃ ৬১৫

৩৮। অক্ষয়কুমার সেন লিখেছেন, "রামকৃষ্ণদেব এখন আমাকে যা দেখিয়েছেন, যা বুঝিয়েছেন, তাতে বেশ দেখতে পেয়েছি এবং বুঝতে পেরেছি যে, তিনিই সেই ভগবান, ভগবানের অবতার, দুনিয়ার মালিক, সর্বশক্তিমান সেই রাম, সেই কৃষ্ণ, সেই কালী, সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ—মনবুদ্ধির অতীত আবার মনবুদ্ধির গোচর।" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণমহিমা, পৃঃ ১৮)

'কিরে রামলাল, এত ভাবছিস কেন? আয় আয়।' এই বলে আমায় সামনে দাঁড় করালেন, গায়ের চাদর খুলে দিলেন। বুকে হাত বুলিয়ে দিলেন আর বললেন—'দেখ্ দিকিনি এইবার।'" রামলাল বলেন, "আহা, সে যে কি রূপ, কি আলো জ্যোতি! সে আর কি বলব।"[৩৯] তিনি স্বামী সারদানন্দকে আরও বলেন, "ইতিপূর্বে ইষ্টমূর্তির ধ্যান করিতে বসিয়া তাঁহার শ্রীঅঙ্গের কতকটা মাত্র মানস নয়নে দেখিতে পাইতাম, যখন পাদপদ্ম দেখিতেছি তখন মুখখানি দেখিতে পাইতাম না, আবার মুখ হইতে কটিদেশ পর্যন্তই হয়ত দেখিতে পাইতাম, শ্রীচরণ দেখিতে পাইতাম না, ঐরূপে যাহা দেখিতাম তাহাকে সজীব বলিয়াও মনে হইত না; অদ্য ঠাকুর স্পর্শ করিবামাত্র সর্বাঙ্গসুন্দর ইষ্টমূর্তি হৃদয়পদ্মে সহসা আবির্ভূত হইয়া এককালে নড়িয়া চড়িয়া ঝলমল করিয়া উঠিল।"[৪০] তারপর কৃপালাভ করেন গিরিশচন্দ্রের ভাই অতুলকৃষ্ণ ও কিশোরী রায়।[৪১] ইতিমধ্যে ভাই ভূপতি ঠাকুরকে প্রণাম জানিয়ে সমাধি প্রার্থনা করেন। ঠাকুর তাঁকে কৃপা করে আশীর্বাদ করেন, "তোর সমাধি হবে।"[৪২] তারপর উপস্থিত হন উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। দারিদ্র্যের কশাঘাতে জর্জরিত উপেন্দ্রনাথ নীরবে প্রার্থনা জানান অর্থসাচ্ছল্যের জন্য। ঠাকুর তাঁকে কৃপা করে বলেন, "তোর অর্থ হবে।"[৪৩]

ঠাকুরের দিব্যশক্তিস্পর্শে কয়েকজন কৃতকৃতার্থ হবার পর বৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যাল ঠাকুরকে প্রণাম করে প্রার্থনা জানান, "মশায়, আমায় কৃপা করুন।" ইতিপূর্বে বৈকুণ্ঠ ইষ্টদর্শনলাভের জন্য ঠাকুরের কাছে কয়েকবার প্রার্থনা জানিয়েছিলেন। প্রত্যেকবার ঠাকুর তাঁকে আশ্বস্ত করে বলেছিলেন, "রোস্ না, আমার অসুখটা ভাল হোক্। তারপর তোর সব করে দিব।" এখন ঠাকুর প্রসন্নভাবে তাঁকে বলেন, "তোর তো সব হয়ে গেছে।" বৈকুণ্ঠ প্রার্থনা জানান, "আপনি যখন বলছেন তখন নিশ্চয় হয়ে গেছে, কিন্তু আমি যাতে অল্পবিস্তর বুঝতে পারি তা করে দিন।" "আচ্ছা" বলে ঠাকুর ক্ষণেকের জন্য বৈকুণ্ঠের হৃদয় স্পর্শ করেন ও বলেন, "মা, জাগ জাগ।" "অমনই সে তাহার অন্তর-বাহিরে, পুত্তলিবৎ ভক্তমণ্ডলীমধ্যে, উদ্যানের পাদপপত্রে ও গগনে সর্বময় শ্রীরামকৃষ্ণরূপ দেখিয়া এক অনির্বচনীয় অবস্থায় উপনীত হয়। পাণ্ডুরোগে আঁখিতে যেমন সকল পদার্থই হরিদ্রাভ দেখায়, তাঁহার

৩৯। শ্রীরামকৃষ্ণ ও অন্তরঙ্গপ্রসঙ্গ (প্রথম সংস্করণ), পৃঃ ৩৫

৪০। লীলাপ্রসঙ্গ, দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ, পৃঃ ৩৯৬-৭

৪১। কৃষ্ণনগরের লোক, বৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যালের বন্ধু। দীর্ঘ শ্মশ্রু রাখাতে নরেন্দ্রনাথ তাকে ডাকতেন আবদুল!

৪২। স্বামী অভেদানন্দ: আমার জীবনকথা, পৃঃ ৮৩

৪৩। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য একটি ঘটনা লিখেছেন স্বামী অখণ্ডানন্দ। "সে (উপেন্দ্রনাথ) যখন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিত, তখন একদিন ঘরভরা ভক্তদের মধ্যে ঠাকুর অঙ্গুলি-নির্দেশে উপেনকে দেখাইয়া বলিয়াছিলেন, 'এ ছেলেটি আমার কাছে কিছু অর্থ কামনা করে আসে যায়।'"—(স্মৃতিকথা, পৃঃ ১৮২)। আশীর্বাদ পূর্ণ হয়েছিল। তিনি উত্তরকালে বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের স্রষ্টা ও মালিকরূপে প্রভূত ধনসম্পদের অধিকারী হন ও তাঁর সম্পদের সদ্ব্যবহার করেন।

ঠিক সেইরূপ হইয়াছিল। ক্ষণিক আবেগে এক আধ ঘণ্টা বা একদিন নহে, ক্রমান্বয়ে দিবসত্রয় এইরূপ দর্শনে সে যেন উন্মাদের মত হইয়াছিল।"[৪৪] বৈকুণ্ঠ প্রবল আনন্দে অধীর হয়ে উঠেন। সে সময়ে শরৎ লাটু প্রভৃতিকে ছাদে দেখতে পেয়ে তিনি 'কে কোথায় আছিস্ এই বেলা চলে আয়' বলে চীৎকার করে ডাকতে থাকেন। ঠাকুর তাঁকে নিরস্ত হতে ইঙ্গিত করেন। ইতিপূর্বে আনন্দে উন্মত্ত গিরিশ ও রাম চীৎকার করে ভক্তদের আহ্বান জানাচ্ছিলেন। কে কোথায় বাদ পড়ে গেল, সেই খোঁজে গিরিশ রান্নাঘরে যান, দেখেন পাচক ব্রাহ্মণ গাঙ্গুলি রুটি বেলতে বসেছে। গিরিশ তাকে টেনে নিয়ে ঠাকুরের সামনে উপস্থিত করলেন, দয়াময় ঠাকুর তার প্রতি কৃপা করেন।[৪৫]

"...কয়েকজনের পরিত্রাণ হইলে, হরমোহন মিত্রকে[৪৬] সম্মুখে আনয়ন করা হইল। তিনি হরমোহনকে স্পর্শ করিয়া বলিলেন, 'তোমার আজ থাক্।' (ইতিপূর্বে হরমোহনের নিমিত্ত আর একবার পরমহংসদেবের নিকট কৃপা প্রার্থনা করা হইয়াছিল; কিন্তু সেবারেও 'এখন থাক,' বলিয়াছিলেন।")[৪৭] মহানন্দের দিনে কৃপালাভে বঞ্চিত হয়ে তিনি বিমর্ষ হন। পরে শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন তাঁকে ও আজকের দিনে কৃপা-বঞ্চিত অপর এক ব্যক্তিকে স্পর্শ করে কৃপা করেছিলেন। উত্তরকালে হরমোহন জনৈক ভক্তকে বলেছিলেন যে, ঠাকুরের দিব্যস্পর্শের ফলে তাঁর অনেক অনুভূতি লাভ হয়েছিল. তিনি ভ্রূযুগলমধ্যে অনেক দেবদেবীর দর্শনলাভ করেছিলেন।

ভক্তদের উল্লাস ও আনন্দোচ্ছ্বাস দেখে মনে হল, 'বসেছে ক্ষ্যাপার হাট-বাজার', ক্ষ্যাপার হাটে বিনে-মাদুলে প্রেম বিকায় রামকৃষ্ণ রায়। "চীৎকার ও জয়রবে ভক্তেরা কেহ বা নিদ্রা ত্যাগ করিয়া, কেহ বা হাতের কাজ ফেলিয়া ছুটিয়া আসিয়া দেখেন, উদ্যানপথমধ্যে সকলে ঠাকুরকে ঘিরিয়া ঐরূপ পাগলের ন্যায় ব্যবহার করিতেছেন এবং দেখিয়াই বুঝিলেন, দক্ষিণেশ্বরে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির প্রতি কৃপায় ঠাকুরের দিব্যভাবাবেশে যে অদৃষ্টপূর্ব লীলার অভিনয় হইত তাহারই অদ্য এখানে সকলের প্রতি কৃপায় সকলকে লইয়া প্রকাশ!"[৪৮] ত্যাগী যুবক ভক্তেরা ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছতেই[৪৯] ঠাকুরের দিব্য

৪৪। শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যাল : শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলামৃত, পৃ: ২৯

৪৫। পুঁথি, ৬১৫

৪৬। হরমোহন সিমলাপল্লীতে তাঁর মাতুল রামগোপাল বসুর নিকট মানুষ হন। তিনি নরেন্দ্রনাথের সহাধ্যায়ী ছিলেন। শ্রীম তাঁকে শ্রীরামকৃষ্ণের সাঙ্গোপাঙ্গদের মধ্যে নির্দেশ করেছেন।

৪৭। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত, পৃ: ১৭৬

৪৮। লীলাপ্রসঙ্গ, গুরুভাব, পূর্বার্ধ, পৃ: ১২২

৪৯। যুবক ভক্তদের মধ্যে লাটু ও শরৎ ঠাকুরের ঘর গোছগাছ করছিলেন। লাটু ভক্তদের চীৎকার শুনেও নীচে নামেননি। পরবর্তীকালে জনৈক ভক্ত তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনি সেদিন উপর থেকে নেমে এলেন না কেন? শুনেছি সেদিন তিনি কল্পতরু হয়েছিলেন—যে যা চাইছিলো তাকে তাই আশীর্বাদ করেছিলেন।' লাটু মহারাজ উত্তর

ভাবাবেশ অন্তর্হিত হল, সাধারণ সহজ ভাব উপস্থিত হল। ভক্তগণ তখনও বিস্মিত স্তব্ধ বিমূঢ়। যা ঘটে গেল তখনও তার অনুবৃত্তি প্রত্যেকের নিজ নিজ অভিজ্ঞতায় জাজ্বল্যমান। উপস্থিত ব্যক্তিদের এই অবস্থায় ফেলে

রাশি রাশি কৃপা ঢালি প্রভু ভগবান।
উপরে দ্বিতলভাগে করিলা পয়ান॥

নিজের ঘরে ফিরে ঠাকুর সেবক রামলালকে বলেন, "শালাদের (সকল ভক্তদের) পাপ নিয়ে আমার অঙ্গ জ্বলে যাচ্ছে। গঙ্গাজল নিয়ে আয় গায়ে মাখি।" রামলাল 'ব্রহ্মবারি' গঙ্গাজল আনলে ঠাকুর তা গ্রহণ করে সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে দেন, তখন দেহের জ্বালার নিবারণ হয়। যুবক নিরঞ্জন সিঁড়ির দরজায় পাহারায় বসেন, ভক্তদের ঠাকুরের ঘরে প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়।

রামকৃষ্ণ-লীলার জটিলা-কুটিলা প্রতাপচন্দ্র হাজরা কিছুদিনের জন্য কাশীপুর উদ্যানবাড়ীতে বাস করছিলেন। ঠাকুর যখন তাঁর বরাভয়-কল্যাণমূর্তি প্রকট করেন সে সময়ে তিনি দুর্ভাগ্যক্রমে অনুপস্থিত ছিলেন। কৃপাবিতরণের হাটবাজার থেকে প্রত্যাবর্তন করে ঠাকুর নিজের ঘরে বিশ্রাম করছিলেন। সে সময় হাজরা উদ্যানবাড়ীতে ফিরে এসে আনন্দমেলার বিস্তারিত খবর শুনেন। অনুপস্থিত হওয়ায় তাঁর খুব মনস্তাপ হয়। নরেন্দ্রের সঙ্গে তাঁর বিশেষ মিতালি; নরেন্দ্র হাজরাকে সঙ্গে করে ঠাকুরের ঘরে উপস্থিত হন এবং তাঁকে কৃপা করার জন্য ঠাকুরকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। "উত্তরে কহিলা রায় এবে নাহি হবে। সময়সাপেক্ষ কালে শেষেতে পাইবে॥"

সন্ধ্যার পূর্বে ভক্ত চুনীলাল বসু উপস্থিত হন। চুনীবাবু ঠাকুরের কৃপাবিতরণের অপূর্ব কাহিনী শুনে মুগ্ধ হন। নরেন্দ্রনাথ চুনীলালকে আড়ালে ডেকে চুপি চুপি বলেন যে, হয়ত ঠাকুরের শরীর আর বেশীদিন থাকবে না। চুনীলালের প্রার্থনীয় কিছু থাকলে যেন এখনই নিবেদন করেন দরজায় পাহারাদার নিরঞ্জনকে অতিক্রম করা অসম্ভব জেনে চুনীলাল সুযোগের অপেক্ষা করেন। এক সময়ে নিরঞ্জন কোন কাজে সরে যেতেই নরেন্দ্র ইঙ্গিত করেন, চুনীলাল ঠাকুরের ঘরে প্রবেশ করে ঠাকুরকে প্রণাম করেন। অযাচিত-কৃপাসিন্ধু ঠাকুর সপ্রেমে জিজ্ঞাসা করেন, "তুমি কি চাও?" চুনীলাল মুখ ফুটে কিছু বলতে পারেন না। ঠাকুর তখন নিজের দেহ দেখিয়ে বলেন, "এটাতে ভক্তি-বিশ্বাস রেখো, তোমারও হবে।" তিনি ঘরের বাইরে এসে নরেন্দ্রনাথকে সব জানালে নরেন্দ্র সোৎসাহে বলেন, "তবে আর আপনার ভয় কি?"[৫০]

আনন্দের হাট থেকে আনন্দ-সওদা হৃদয়-ঝুলিতে পুরে গৃহী ভক্তগণ ফিরে যান। তখনও কেউ ভাবের আবেগে অধীর, কেউ আনন্দের আতিশয্যে বেসামাল, কেউ বা ঠাকুরের কৃপা-অনুধ্যানে বিভোর। এইভাবে

দেন. "তিনি তো আশীর্বাদ দিয়ে আমাদের ভরপুর করে দিয়েছেন। আবার কি চাইবো তাঁর কাছে?" (শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতিকথা, পৃঃ ২৫২)। শরৎচন্দ্রও ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে কিছু প্রার্থনা না জানাবার কারণ পরবর্তী কালে বলেছিলেন, "পাবার ইচ্ছা তো মনে আসেনি, তা ছাড়া তিনি যে আমাদেরই ছিলেন।" (ভক্তমালিকা. প্রথম ভাগ, ৩১১)।

৫০। স্বামী গম্ভীরানন্দ: শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা, দ্বিতীয় ভাগ, পৃঃ ৪১১

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের সেদিনকার কৃপাপ্রকট লীলার পরিসমাপ্তি হয়। কিন্তু তাঁর কৃপা-বিচ্ছুরণ অব্যাহত থাকে। কৃপাবর্ষণে কখনও ক্ষীণ ধারা, কখনও বা প্রবল বেগ। পরের দিন ঘটনায় দেখা যায়, নরেন্দ্রনাথ ধ্যানে বসে কুণ্ডলিনীর জাগরণ অনুভব করেছেন। ঠিক দুদিন পরেই ঠাকুর তাঁকে সমাধি থেকে উঁচু অবস্থাপ্রাপ্তির ভরসা দিচ্ছেন। কৃপার মলয়-পবন অব্যাহত ধারায় বইতে থাকে।

অধ্যাত্মজগতের পরশমণি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কৃপা করে যাঁদের স্পর্শ করেছেন বা মনের কোণে ঠাঁই দিয়েছেন, উত্তরকালে তাঁদের প্রত্যেকে রূপান্তরিত হয়েছেন খাঁটি সোনায়। কৃপাবলে তাঁদের ধর্মজীবন প্রদীপ্ত হয়েছে, অধ্যাত্মশক্তির বিকাশে জীবনপথ প্রস্ফুটিত হয়ে নিজের ও বিশ্বজনের হিতসাধন করেছে। এই কৃপা কি বস্তু? কৃপার স্বরূপ বুঝতে সমর্থ একমাত্র কৃপাধন্য ব্যক্তি। কৃপাধন্য ব্যক্তিই কৃপাসাগরে ডুব দিয়ে মণিমাণিক্য সংগ্রহ করতে সক্ষম।

সেদিনকার কৃপাবিতরণ-উৎসবে অন্যতম কৃতার্থ ব্যক্তি কৃপা সম্বন্ধে লিখেছেন,

কৃপায় আনন্দ কি বা হৃদয়ে না ধরে॥
কৃপা নহে কাড়ি পাতি নহে রাজ্যধন।
কিংবা নহে মনোহর কামিনী কাঞ্চন॥
সুস্বাদু ভোজন নয় নয় গাঁজা সুরা।
নহে মাদকীয় কিছু ক্ষণানন্দধারা॥
তথাপি কৃপার মধ্যে হেন বস্তু আছে।
তুলনায় যাবতীয় রাজ্যধন মিছে॥
কৃপায় আনন্দরাশি বহে শতধার।
ধন্য সে আধার যা'হে কৃপার সঞ্চার॥[৫১]

আলোচ্য দিনটিতে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ অকাতরে কৃপাবিতরণ করেছিলেন, যেন কল্প-তরুর রূপ ধরেছিলেন। সেদিন তিনি তাঁর নিজের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেছিলেন, তাঁর অবতারত্বের প্রমাণ দিয়েছিলেন। সেদিন তিনি প্রেমভাণ্ড ভেঙ্গে দিয়ে প্রেমের হাট গুটিয়ে ফেলার সূচনা করেছিলেন, তাঁর প্রকট-লীলা সাঙ্গ করার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। সেদিন তিনি শরণাগত ভক্তদের অভয়াশ্রয় দিয়েছিলেন, তাদের হৃদয়ে বল ভরসা উৎসাহ উদ্দীপ্ত করেছিলেন। সর্বোপরি কৃপাময় অবতারপুরুষই একমাত্র সর্বভূতের সুহৃদ্‌রূপে মানুষের কল্যাণের জন্য দেহধারণ করে থাকেন—তার সুস্পষ্ট প্রমাণ দিয়েছিলেন। সেই কারণেই ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী বিশেষ স্মরণীয়।

৫১। পুঁথি, পৃঃ ৬১৪

স্বামী অখণ্ডানন্দের স্মৃতিসঞ্চয়

[পূর্বানুবৃত্তি]

['ভক্তে'র ডায়েরি হইতে]

৫.১.৩৭—সকালে শ্রীশ্রীঠাকুরের মঙ্গলারতি ও ভজনের পর ভক্তেরা প্রণাম করিতে গিয়া দেখে 'বাবা'* আগেই হলে চেয়ারে বসিয়া আছেন, প্রণাম করিয়া উঠিলে পর বলিলেন, "কাল কি রকম লাগল?" ভক্তেরা বলিল, 'আপনার এত কষ্ট হ'ল সারারাত।' বাবা বলিলেন, "আরে আমার যদি কষ্টই হ'ত আগেই শুয়ে পড়তুম। সত্যি বলছি—তখন দেহাদিভাবশূন্য হয়ে গিছলাম, বেশ ছিলাম, অত রোগযন্ত্রণা—সব ভুলে ছিলাম। তারপর আবার সব এল।"

সকালের দিকে 'স্মৃতিকথা'-লেখাপ্রসঙ্গে খেতড়ির অনেক কথা বলিলেন। সেখানে ক্রীতদাসদের পাঠশালা এবং প্রজাদের রাজ-দর্শনের ব্যবস্থা কিভাবে করিয়াছিলেন, তাহাও বলিলেন। শেষে বলিলেন, "'স্মৃতিকথা'র জন্য একখানি খেতড়ির রাজার ছবি চাই। কিন্তু কোথায় পাওয়া যাবে?" একজন ভক্ত বলিল, সে কলিকাতায় হ্যারিসন রোডে ফুট-পাথে পুরাতন বই-এর স্তূপের মধ্যে একবার একখানা হিন্দি বই দেখিয়াছিল—'স্বামী বিবেকানন্দ ঔর খেতড়ি-নরেশ'—তাহাতে ঐ ছবি আছে। বাবা তখনি বলিলেন, "কাকেও চিঠি লিখে দাও—কিনে পাঠিয়ে দেবে।" বলা বাহুল্য, চিঠি লেখা হয় এবং যথাসময়ে বইও আসে।

সন্ধ্যাবেলা বাবা বলিতেছেন, "শরণাগত, শরণাগত। শরণাগত মানে 'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।' সর্বত্যাগ না হলে শরণাগতি হয় না, আর শরণাগত হলেই হয়ে গেল। 'যো যাকো শরণ লিয়ে সো তাকো রাখে লাজ। উলট জলে মছলী চলে বহি যায় গজরাজ॥' এসব এমনি হয় না—সাধুসঙ্গ চাই। 'দয়া ধরম কী মূল হৈ নরক মূল অভিমান। তুলসী দয়া ন ছোড়িয়ে যব কণ্ঠাগত প্রাণ॥' সেই দয়া কি ক'রে হয়? 'তুলসী ইয়ে জগমে পাঁচো রতন হৈ সার। সাধুসঙ্গ হরি-কথা দয়া দীন উপকার॥' সাধুসঙ্গ থেকেই হরিকথা (ভগবৎপ্রসঙ্গ), হরিকথা থেকে দয়া দীনতা; সেই দয়া থেকে ধর্ম। তবেই বোঝ—দয়া ধরম কী মূল। আবার দয়ার মূল হরি-কথা। আর হরিকথার মূল সাধুসঙ্গ।"

৬.১.৩৬ সন্ধ্যাবেলা সকলে আসিলে বাবা প্রথমেই বলিলেন, "Be active, at the same time sensible (কর্মতৎপর, সঙ্গে সঙ্গে সংবেদন-শীল হও।) ঠাকুর আর কিছু করুন আর না করুন, খুব হুঁসিয়ার করেছেন আমাদের, কখনও বেহুঁস করেননি। ঘুম তো বেহুঁস অবস্থা—অচৈতন্য। এই শরীরের এত যত্ন! ঘুমুলে—কুকুরে যদি মুখে পেচ্ছাপ ক'রে দিয়ে যায়, তাও টের পায় না! এই তো?

"কি! আবার সেদিনকার মতো হবে নাকি? তোমরা পারবে না, ঘণ্টা পড়লেই উঠে পড়। ভগবানকে ডাকা কি সময় ধরে হবে? সময় তো relative (আপেক্ষিক)। ২।৪টি গান গাও।

"'নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে ও রূপ-রাশি। তাই যোগী ধ্যান ধরে হয়ে গিরিগুহা-বাসী।' ব্রাহ্ম সমাজের গান। ওরা ভাব সব শেষ পর্যন্ত রাখতে পারে না। এই দেখ না-

---

* স্বামী অখণ্ডানন্দ

(গান): মা তোর কোলে
আমি লুকিয়ে থাকি,
থেকে থেকে চেয়ে চেয়ে,
চেয়ে চেয়ে তোর মুখপানে
মা, মা বলে ডাকি।

এর পর আছে—যোগানন্দ নিদ্রারসে। এ আবার কি বাবা! ছোটছেলে মায়ের কোলেই খুশী, 'মা' 'মা' বলে ডেকেই আনন্দ। তার মধ্যে আবার ঢোকালে কিনা, 'যোগানন্দ নিদ্রারসে'!"

আবার গান: বল্ রে জবা বল্,
কোন্ সাধনায় পেলিরে তুই
শ্যামা মায়ের চরণতল।

দু-এক জনের সঙ্গে বাবা গাহিলেন:
রাঙা জবা কে দিল তোর পায়
মুঠো মুঠো।
দে না মা সাধ হয়েছে পরিয়ে দেনা
মাথায় দুটো।

গতকালের গায়ক ভক্তটি গাহিল:

(১) কালো মেয়ের পায়ের তলায়,
দেখে যা আলোর নাচন,
রূপ দেখে দেয় বুক পেতে শিব
যার হাতে মরণ-বাঁচন।
... ...
বিশ্বে মায়ের রূপ ধরে না,
মা আমার তাই দিগ্-বসন।

(২) বুকের ব্যথার আসন পাতা
বস্ মা হেথা দুঃখ-দুলালী।
আর লুকাবি কোথা মা কালী।

বাবা চুপ করিয়া গানটি শুনিলেন, শেষে খানিকক্ষণ নিস্তব্ধতার পর বলিলেন, "কি সুন্দর কথাগুলি, ভাবও তেমনি!" তারপর একজন গান ধরিল: 'ঐ যে দেখা যায় আনন্দধাম, ভবজলধির পারে জ্যোতির্ময়।' সুর-তাল-লয়-যোগে সমবেত কণ্ঠে গানটি খুব জমিয়া উঠিল। বাবাও করতালিসহ যোগ দিলেন। অনেকক্ষণ পরে গানটি থামিলে সব নিস্তব্ধ হইয়া গেল খানিক পরে নীরবতা ভঙ্গ করিয়া বাবা ধীরে ধীরে বলিলেন, "এই গানটির association (সম্বন্ধ, অনুষঙ্গ) বড় করুণ। শেষ সময়ে মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দজী) একবার আমাকে খুঁজেছিলেন, বলেছিলেন, 'সে এলো না এখনও।' যখন গেছি তখন ঐ গান। মৃত্যুটা যেন দুঃখের কিছু না, বরং আনন্দের—আবার প্রভুর কাছে। শরৎ মহারাজের (স্বামী সারদানন্দজী) সময়ে রাত ২টা থেকে ঐ গান ভোর পর্যন্ত। হরি মহারাজের (স্বামী তুরীয়ানন্দজী) সময়েও ঐ গান। ঐ গান আমাদের বড় প্রিয়।"

৭.১.৩৭—একজন এক মহিলা বাবাকে চিঠি দিয়াছেন—তাঁহার বড় সাধ যেন তিনি সব কিছুতে ভগবানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া চলিতে পারেন। চিঠি-পড়া শুনিয়া বাবা খুব খুশী হইলেন এবং উত্তরে লিখিতে বলিলেন, "তুমি ঠাকুরের হাতে সব ছেড়ে দিতে চাও—তাঁর ইচ্ছায় যেন তোমার এই ইচ্ছা পূর্ণ হয়। গীতায় ভগবান অর্জুনকে সতেরো অধ্যায়ে সাংখ্য জ্ঞান কর্ম ভক্তি যোগ সব ব'লে অষ্টাদশের শেষে বলছেন, 'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।' 'শরণাগতি'-র চেয়ে বড় কথা আর নেই।" চিঠিলেখার পর ভক্তের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "শরণাগত, শরণাগত—এটিও একটি মন্ত্র। ঠাকুর কতবার বলেছেন।"

'ভক্ত' নিজেকে ধন্য কৃতার্থ মনে করিতে লাগিল। বহুদিন আগে গীতাপাঠের কথা শুনিয়া বাবা বলিয়াছিলেন, গীতার অর্থ বুঝাইয়া দিবেন। অভাবনীয় ভাবে উহা পূর্ণ

হওয়ায় তাহার অতিমাত্রায় আনন্দ হইল। এই সম্পর্কে আর একটি কথা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না—বাবা দীক্ষাকে বলিতেন—শরণাগতি, দীক্ষিতকে বলিতেন—শরণাগত।

৮. ১. ৩৭—সন্ধ্যায় সকলে উপস্থিত, কুমিল্লার ডা: কামিনীবাবুও আছেন। সম্প্রতি কামিনীবাবু সাধুসঙ্গের জন্য যেখানে সেখানে যান। তাই বাবা সাবধান করিয়া দিতেছেন, "সাধুসঙ্গ খুব সাবধানে করতে হয়। সাধু চেনা বড় শক্ত। যা তা সাধুর সঙ্গে মিশো না—তাতে হানি হয়। জয়পুরে '৩০০৲কে ৭০০৲ ক'রে দেব' ব'লে এক সাধু এক কৃপণের কাছে টাকা আদায় করে। এমনি তো দেয় না, শেষে ব্রাহ্মণ ভোজনের নাম ক'রে কিছু টাকা বার করে। সাধু ৭০০ টাকা আর দেয় না। কৃপণ তো ৮০ হাত কুয়োয় ডুবে মরল। সাধুর বিচার হ'ল। সাধু ব'লে ফাঁসি হ'ল না—দু-বছর জেল হ'ল।

"বদরী অঞ্চলে এক কৃপণ কিছুতেই সাধু-ভোজন করাবে না। শেষে একজন লম্বা চওড়া সাধু এসে বলল, 'তিন দিনে তোমার রূপোর টাকা সোনা ক'রে দেব।' তখন কৃপণ দিলে অনেক টাকা। ঐ সাধু করলে কি! ঐখানে যত সাধু ছিল সকলকে জানিয়ে দিলে—অমুক দিন অমুক জায়গায় সাধুসেবা হবে। তিন দিন পরে ঠিক দুপুরে কৃপণ তাগাদা দিচ্ছে 'কই সোনা?' লম্বা সাধুটি তাকে ডেকে এনে দেখালেন—'ঐ দেখ, তোমার টাকায় সাধুসেবা হচ্ছে—এর চেয়ে সোনা আর কি আছে?'

"সাধুরা প্রথমেই জয় দিল 'জয় রামকৃষ্ণকী জয়'। কেমন ঠাকুরের নাম হয়ে গেল! তারপর জয়-জানকী মাঈ কী! জয় অযোধ্যা কী, সরযূ কী। লছমনজী কী, ভরতজী কী! হনুমান কী, বাগান কী, ঝোপ কী, ঝাড় কী! যত কিছু আছে সব।" [সকলে খুব হাসিতে লাগিল।]

৯. ১. ৩৭—'স্মৃতিকথা' লেখার কথা হইতেছে। "আসল প্রতিমার পেছনে চালচিত্র থাকে; আসল ঘটনার পেছনে তেমনি নানা কথা, গল্পচ্ছলে নানা ঘটনা। আগে ভাবছিলুম এগুলো লিখব না। তা '—' বললে, আপনা থেকে যা মনে আসছে, সব লিখুন, কেবল serious (গম্ভীর), সে ভাল না শুধু bare facts-এ (মোটামুটি ঘটনাগুলোতে) repulsion (বিরক্তি) হয়। এতে interest (কৌতূহল) বাড়ায়। ইচ্ছে আছে সেবা-ব্রতের পর ভ্রমণের কথাটা শেষ করবো।"

একজনের প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন, "হ্যাঁ, 'তিব্বতে তিন বৎসর' অসম্পূর্ণ।" আর একজনের কথার উত্তরে বলিলেন, "কাশীপুরের কথা মনে নেই।"

"আমরা তো সারাটা জীবন কষ্টই করেছি, প্রথম বরানগর মঠে, তারপর হিমালয়ে—তীর্থে তীর্থে। তারপর রাজপুতানায়, শেষে মুর্শিদাবাদে। সে-সব কথা নিজে আর কি ব'লব? আমরা জানি কষ্টের ভেতর দিয়েই তাঁর কাছে থাকা যায়।"

১১.১.৩৭—সকালে প্রণাম করার পর সকলকেই চুপি চুপি বলিতেছেন ঠাকুরের স্বপ্নাদেশ হওয়ার কথা, বাসন্তীপূজার কথা। "ভোরবেলা স্বপন দেখছি—ঠাকুর বলছেন, 'দুর্গাপূজা কর্।' আমি বললাম—'কোথা দুর্গাপূজো? সে তো অনেক দেরী।' তখন বললেন, 'কেন? বাসন্তীপূজা কর্।' তারপরই দেখি বকুলতলায় চালার নীচে মায়ের মূর্তি জল্ জল্ করছে। আর ঠাকুর দেখছেন ওপরের বারান্দা থেকে। লোকজন হৈ হৈ

করছে—কত লোক এসেছে! মায়ের নামে সে কি আনন্দ!"

পূজার নামে সকলে আনন্দ করিতেছে, তখন বাবা বলিলেন, "আরে কবে আছি, কবে নেই। রাত কাটে না। মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দজী) বাসন্তীপূজো ক'রব ব'লে দেখে যেতে পাননি, দাদাও (স্বামী শিবানন্দজী) না। এখন দেখ—আমারই বা কত দূর কি হয়।" সকলের মুখে একটা গভীর ছায়াপাত হইল।

খানিক পরে বাবা আবার বলিতেছেন, "বাসন্তীপূজোর মধ্যেই অন্নপূর্ণাপূজো। ঐদিন দুর্ভিক্ষের সময় এখানে আসি ৪০ বছর আগে। মন্দির-প্রতিষ্ঠা—সেও ঐদিন। পূর্বে চালায় ঠাকুরের ছবি নিয়ে ছেলেদের খেলাঘরে ঠাকুরঘর ছিল। তারপর মন্দির হ'ল। ঠাকুরের আসা আর হয় না। একলা ভাবছি—ধ্যানের মতো—যখন শুধু ঠাকুর আর আমি—তখন ঠাকুর যেন বলছেন, 'সমষ্টিরূপে আমার প্রকাশ শিবরাত্রির পরের দ্বিতীয়ায়, ব্যষ্টিরূপে এখানে তোর কাছে আমি অন্নপূর্ণা।' তাই পূজোর দিন—কি আশ্চর্য! ঠিক সেই দিনই ঠাকুর এসে মন্দিরে বসলেন।"

শ্রীরামকৃষ্ণবন্দনা

শ্রীনিখিলরঞ্জন মহাপাত্র

প্রেমময় দেব শ্রীরামকৃষ্ণ
ত্রিতাপদুঃখহারী
তব শ্রীচরণ-পরশন দেয়
অজ্ঞান অপসারি।
'আর্ত মানবে সেবা কর সবে,
শিবজ্ঞানে জীবসেবা।
সেবাই কর্ম, সেবাই ধর্ম—
জীবসেবা শিবসেবা।'
কী মহান বাণী ছড়ালে বিশ্বে
প্রেম অমৃতক্ষরা,
পুণ্য হইল এভারত ভূমি,
ধন্য মানিল ধরা।
করুণাঘন পতিতপাবন
নমো হে, নমো হে, নমঃ।
সংসার-দাবদাহ-যন্ত্রণা
দূর কর প্রিয়তম।

'যত মত তত পথ' এ সত্য
জানালে বিশ্বজনে—
'সব পথে মিলে প্রেমের ঠাকুর
বিশ্বাস ও আরাধনে।'
রামরূপ ধরে এসেছিল যেই,
এসেছে কৃষ্ণরূপে,
সেই প্রেমময়ই এল যে এবার
শ্রীরামকৃষ্ণরূপে
ত্যাগীরে শোনাতে মুক্তির বাণী
গৃহীরে দেখাতে পথ,
অমিয়-সেচনে উজলি তুলিতে
জাতির ভবিষ্যৎ।
অসুর-দলনে নহে ধনু-বাণ,
সেবা-প্রেম অনুপম
অস্ত্র এবার; পতিতপাবন,
নমো হে, নমো হে, নমঃ।

ভারতীয় রাষ্ট্রদর্শন-পরিচয়

[পূর্বানুবৃত্তি]

ডক্টর শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়

এইবার মহাভারতের রাজনীতির দুই দিক—রাজধর্ম ও আপদ্ধর্মাচরণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া যেতে পারে।

ক। **রাজধর্ম :**

যুধিষ্ঠিরের প্রতি দেবর্ষি নারদের উদ্ধৃত উপদেশাবলী থেকেই আলোচনা শুরু করা যেতে পারে। ঐতিহ্যপরম্পরায় হিন্দুর জীবনের প্রথম তিনটি লক্ষ্য ধর্ম অর্থ ও কাম—এর মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান করা। এই চূড়ান্ত লক্ষ্যকে হিন্দুর জীবনবেদ বলে অভিহিত করা যায়।[১৩] তাই নারদ জিজ্ঞাসা করলেন: "মহারাজ, তুমি অর্থচিন্তার সঙ্গে সঙ্গে ধর্মচিন্তাও কর তো? কাল বিভাগ করে সমভাবে ধর্ম অর্থ ও কামের সেবা কর তো?"

নারদের উপদেশে তারপর আছে দুর্গ-প্রকৃতি বা রাজপুর সম্বন্ধে, দণ্ডনীতি সম্বন্ধে, রাজ্যরক্ষায় বলপ্রয়োগ-পদ্ধতি সম্বন্ধে, রাজকোষ সম্বন্ধে এবং দণ্ডনীতির অপরদিক—লোকপালনী বিদ্যা সম্বন্ধে নির্দেশ।

শান্তিপর্বে এই সকল বিষয়ের পরিস্ফুটন ছাড়াও ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত কয়েকটি রাজনৈতিক ধারণার পর্যালোচনা আছে—যথা. সার্বভৌম শক্তি বা ঐ শক্তির আধার রাষ্ট্রের উদ্ভব, রাষ্ট্রের গঠন, রাজনৈতিক আনুগত্যের প্রকৃতি, গণ বা সাধারণতন্ত্র এবং আপৎকালীন অবস্থার কাম্য রাজ-আচরণ-বিধি। এই ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত রাজনৈতিক ধারণাসমূহের ব্যাখ্যাই আগে করা প্রয়োজন।

১। **সার্বভৌম শক্তি বা রাষ্ট্রের উদ্ভব :**

ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরাদিকে বললেন: পুরাকালে রাজা, রাজ্য ও দণ্ড-ব্যবস্থা ছিল না। সেই সময় মানুষ ধর্মানুসারে পরস্পরের প্রতি ব্যবহার করত এবং পরস্পরকে রক্ষা করত। ক্রমে কিন্তু ধর্মের স্থলে মোহই প্রাধান্য লাভ করল। ফলে বেদ লুপ্ত হ'ল এবং অরাজকতার হ'ল উদ্ভব। এই অবস্থা দেখে দেবতারা ব্রহ্মার শরণ নিলেন। ব্রহ্মা প্রথমে ধর্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ বিষয়ক একটি জীবনবেদ এবং একটি দণ্ডনীতি প্রণয়ন করলেন। তখন বিরজা নামে এক মানসপুত্রের সৃষ্টি করলেন। বিষ্ণুর এই মানসপুত্র বিরজার সপ্তম পুরুষ পৃথুই প্রথম 'প্রজারঞ্জক' বা 'রাজা' বলে গণ্য। ইনি বেদ-বেদাঙ্গ ও ধনুর্বেদে পারদর্শী এবং দণ্ডনীতিতেও।[১৪]

রাষ্ট্র বা সার্বভৌম শক্তির উদ্ভব সম্বন্ধে ভীষ্ম-কথিত এই তত্ত্ব ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদের (Divine Origin Theory) চেয়ে সামাজিক চুক্তিমতবাদেরই দ্যোতক। এবং এর মধ্যে লক (Locke) ও রুশো (Rousseau)—উভয়েরই ধারণার সমর্থন মেলে। লকের মতে, রাষ্ট্রের উদ্ভবের পূর্বে মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রিত হ'ত স্বাভাবিক ন্যায়বোধের নীতি-প্রসূত স্বাভাবিক আইন (Natural Laws) দ্বারা। তারপর স্বাভাবিক নীতিবোধ নষ্ট

১৩ কৌটিল্যও দাবি করেছেন, তাঁর 'অর্থশাস্ত্র' এই জীবনবেদ অভিমুখেই প্রসারিত

১৪ রাজশেখর বসু: মহাভারত

হওয়ার ফলে অরাজকতার উদ্ভব হওয়ায় মানুষ শৃঙ্খলাবদ্ধ সামাজিক জীবনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করল।

স্বাভাবিক ন্যায়বোধের নীতিপ্রসূত স্বাভাবিক আইনের কার্যকারিতা এবং 'ধর্মানুসারে পরস্পরকে রক্ষা করা'র মধ্যে মৌল পার্থক্য বিশেষ আছে কি? আবার সংগঠিত সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধির ব্যাপারে মহাভারতকার ও লকের ধারণার মধ্যে মৌল প্রকারভেদই বা কোথায়?

রুশোর মতে, আদিম কালে মানুষ মর্ত্যের স্বর্গতুল্য প্রাকৃতিক অবস্থার (State of Nature) মধ্যে বাস করত। ক্রমে কিন্তু জনসংখ্যাবৃদ্ধি এবং আপন-পর চেতনার উন্মেষের ফলে এই মর্ত্যের স্বর্গ একপ্রকার নরকেই পরিণত হয়। তখন তারা রাষ্ট্রগঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি ক'রে প্রয়োজনীয় চুক্তি সম্পাদন করে।

এই আপন-পর জ্ঞানোদয়ের অর্থ হ'ল জীবনদর্শন থেকে একত্বকে (unity) বিদায় দেওয়া। অদ্বৈত বেদান্তের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে একে ধর্মজ্ঞানলুপ্তি ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। অতএব, মহাভারতকার হলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী দার্শনিক রুশোর পূর্বজ্ঞাতা।

২। রাষ্ট্রের গঠন ও সার্বভৌমিকতার প্রকৃতি:

ভারতে রাষ্ট্র শব্দটি ঋগ্বেদের সময় থেকেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে। মহাভারতে অবশ্য রাষ্ট্রের স্থলে 'রাজ্য' শব্দেরই প্রয়োগ দেখা যায়। শান্তিপর্বে 'রাষ্ট্র' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে জনপদের অর্থে।

রাষ্ট্র বা রাজ্যের সাতটি অঙ্গ: নৃপতি অমাত্য সুহৃৎ রাজকোষ দুর্গ সেনাবাহিনী এবং জনপদ। এর মধ্যে রাজা হলেন সার্বভৌম শক্তির আধার। তিনি বলপ্রয়োগের চরমক্ষমতাসম্পন্ন হলেও স্বৈরাচারী নন—প্রজারঞ্জনই তাঁর ধর্ম বা রাজধর্ম। ভীষ্ম বলেছেন, যে রাজা প্রজারক্ষার কর্তব্য পালন করেন না সেই রাজাকে ক্ষিপ্ত কুকুরের ন্যায় বিনষ্ট করা উচিত।[১৫] শান্তিপর্বে আবার বলা হয়েছে, বিষ্ণুর মানসপুত্র বিরজার অংশুন পুরুষ বেণ অধার্মিক ও প্রজাপীড়ক ছিলেন বলে ঋষিগণ মন্ত্রপূত কুশ দিয়ে তাঁকে বধ করেন।

অতএব, মহাভারতে ক্ষেত্রানুযায়ী প্রজাবিদ্রোহ সমর্থন করা হয়েছে এবং ঋষি বা সমাজনেতৃবৃন্দের ওপর ভার দেওয়া হয়েছে প্রজাপীড়ক নরপতিকে অপসারিত করবার। এ ব্যাপারেও ইংলণ্ডের ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দের গৌরবজনক বিপ্লবের (Glorious Revolution, 1688) সমর্থক লকের কথা স্বাভাবিকভাবেই মনে পড়ে।

অবশ্য বলা যেতে পারে, বিদ্রোহ কাম্য হলেও কখনও আইনসঙ্গত নয়। কিন্তু প্রাচীন ভারত আইন বা Law-কে কখনও বড় করে দেখেনি। আইনের চেয়ে বড়—সবার ওপরে হ'ল ধর্ম। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় "মহাভারতীয় কবিগণের বুদ্ধিতে "Law" কোন স্থান পাইয়াছিল কিনা, আমি বলিতে পারি না। তবে ইহা বলিতে পারি, যাহা "পর" উপরে, যাহা হতে "Law", তাহা তাঁহারা ভালরূপে বুঝিয়াছিলেন"[১৬]		(ক্রমশঃ)

১৫ অনুশাসনপর্ব, ১০শ পরিচ্ছেদ
১৬ কৃষ্ণচরিত্র

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ও বাংলার রঙ্গমঞ্চ

[পূর্বানুবৃত্তি]

অধ্যাপক প্রণবরঞ্জন ঘোষ

এক ফাল্গুনে দু'জনেই অবতীর্ণ—শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বের নিরিখ আর এক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বের দ্বারাই সম্ভব। চৈতন্যদেবকে ঠিক ঠিক চিনতে পারেন রামকৃষ্ণদেবের মতো অবতারপুরুষ। চৈতন্যলীলা দেখতে এসে তন্ময় শ্রীরামকৃষ্ণ সমগ্র অভিনয়ের আদ্যন্ত ভগবৎ-অনুভূতিতে বিভোর হয়ে প্রমাণ করলেন—

অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গৌররায়।
কোনো কোনো ভাগ্যবান দেখিবারে পায়॥

নাটক দেখতে সেদিন কত লোকই এসেছিলেন, কিন্তু সে নাটক-উপলব্ধির মন ও চোখ দু' একজনেরই ছিল। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের অনুসরণে আমরাও সেদিনের 'চৈতন্যলীলা' মনশ্চক্ষে আবার দেখতে পারি।

'চৈতন্যলীলা'র প্রথম অঙ্ক প্রথম গর্ভাঙ্কে পাপ ও ছয় রিপুর সভা। গিরিশচন্দ্র কি এ দৃশ্যে কিছুটা মিল্টনের 'প্যারাডাইস লস্টের' প্রথম সর্গের দ্বারা প্রভাবিত? তবে পাপ নিজের ক্ষমতার সীমা সম্বন্ধে প্রথম দৃশ্য থেকেই সচেতন, কোনো দিক থেকেই পাশ্চাত্ত্য কল্পনার 'শয়তানে'র মতো গিরিশচন্দ্রের 'পাপ' চরিত্র ঈশ্বরের প্রায় সমকক্ষ হয়ে উঠতে পারেনি। দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে বিবেক, বৈরাগ্য ও ভক্তির কথোপকথনে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশের চিন্তাধারাও কিছু পরিমাণে প্রতিফলিত। বিবেকের সংলাপে আধুনিক বিজ্ঞানের বস্তুমুখী মনোভাব সম্বন্ধে উদ্বেগ নিশ্চয়ই ষোড়শ শতাব্দীর সমস্যা নয়। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাববার্তা যথার্থতা যে ঘোষিত হলো ভক্তির সংলাপে—

এল আনন্দের দিন, চিন্তা কর দূর,
গোলকবিহারী হরি, ধরায় উদয়!
হেরি জীবের দুর্গতি –
আপনি শ্রীপতি, নবভাবে অবতার;
একাধারে রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলা,
দ্রব হবে শিলা,—
হরিনাম শুনে তাঁর মুখে।
... ...
বাহ্য রাধা—অন্তঃ কৃষ্ণ অপূর্ব এ ভাব;
হেন ভাব হয় নাই কোনো যুগে।
... ...
ধন্য ধরা—নদীয়ায় এল গোরা!
দেখ, দেখ না বিমানে বিদ্যাধরীগণে,
আসিতেছে হরি দরশনে,
দেখ প্রেমানন্দে হইয়ে বিহ্বল,
মুনি ঋষি আসিছে সকল······

এরপর ছদ্মবেশী বিদ্যাধরী ও মুনিঋষিগণের প্রবেশ ও স্তবসংগীত। এই গানটি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম প্রিয় গানে পরিণত হয়েছিল। গিরিশ-চন্দ্রের সঙ্গীতরচনার নৈপুণ্যের দিক থেকে এ গানটি বাংলাসাহিত্যে স্মরণীয়। দেশ-মিশ্র-রাগে গেয় এ গানটির বাণী—

কেশব কুরু করুণা দীনে, কুঞ্জ-কাননচারী।
মাধব-মনোমোহন, মোহন মুরলীধারী॥
হরিবোল হরিবোল হরিবোল মন আমার!
ব্রজ-কিশোর, কালীয়হর, কাতর-ভয়ভঞ্জন,
নয়ন বাঁকা, বাঁকা শিখিপাখা, রাধিকাহৃদিরঞ্জন,
গোবর্ধনধারণ, বনকুসুমভূষণ, দামোদর
কংসদর্পহারী।
শ্যাম রাসরসবিহারী॥
হরিবোল হরিবোল হরিবোল মন আমার!

এই স্তবসঙ্গীতটি শুনতে শুনতে ভাববিভোর

শ্রীরামকৃষ্ণ পাশে উপবিষ্ট মহেন্দ্রনাথ গুপ্তকে বলছেন, "আহা! কেমন দেখো!"

গানের মধ্যে যেখানে আছে 'নয়ন বাঁকা, বাঁকা শিখিপাখা, রাধিকাহৃদিরঞ্জন' সে অংশটি শুনতে শুনতে শ্রীরামকৃষ্ণদেব গভীরসমাধিস্থ।

শিশু নিমাইয়ের রঙ্গলীলা গিরিশচন্দ্র নিপুণ-ভাবে দ্বিতীয় অঙ্কের পাঁচটি গর্ভাঙ্কের মধ্যেই ফুটিয়ে তুলেছেন। চঞ্চল নিমাই যে 'হরিবোল' ধ্বনিত হলেই শান্ত হতো, সেকথা নানাভাবে গিরিশচন্দ্র ফুটিয়ে তুলেছেন। তবে বিশ্বরূপ যে শিশু নিমাইয়ের জীবনে কিছুকাল উপস্থিত ছিলেন, সেকথা তিনি রঙ্গমঞ্চে আর উপস্থাপিত ক'রে দেখাননি। বিশেষতঃ স্মরণীয়, অতিথি ব্রাহ্মণের নিবেদিত অন্ন বারবার তিনবার খাওয়ার দিনের ঘটনায় বিশ্বরূপ উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু গিরিশচন্দ্রের নাটকে সে কথা নেই। 'চৈতন্য-ভাগবতে'র আদি খণ্ডের তৃতীয় অধ্যায়ে বিধৃত এ ঘটনাটিকে যথাযথ রাখলেই নাট্যরস আরো সার্থক হয়ে উঠতো। আসলে ঐতিহাসিক ঘটনাবিন্যাসের কথা না ভেবে গিরিশচন্দ্র চৈতন্য-দেবের অবতারসত্তা সম্বন্ধেই বেশী অবহিত। তাই বিদায় নেবার সময় অতিথি ব্রাহ্মণ বন্দনা গাইছেন—

জয় নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র, জয় জয় ভবতারণ।
অনাথ-ত্রাণ জীব-প্রাণ ভীত ভয় বারণ॥

ভক্তের কাছে অবতারের নিত্যলীলা। শ্রীরাম-কৃষ্ণদেব এই স্তবটি শুনতে শুনতে 'ভাবে বিভোর'।

গিরিশচন্দ্রের শ্রীচৈতন্য শিশুকাল থেকেই মধুরভাবের সাধক। রাধাকৃষ্ণসম্মিলিতস্বরূপ এই নিমাই তাই মাঝে মাঝেই বৃন্দাবনলীলার স্মৃতি-চারণে গান গেয়ে ওঠে। যদিচ তাঁর সখার দল, নবদ্বীপের নরনারী বা তাঁর জনকজননী কেউই এসব গানের তাৎপর্য ঠিক বুঝে উঠতে পারেন না।

দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে গঙ্গাতীরে ভক্ত নারীদের পূজার নৈবেদ্য কেড়ে নেওয়ার দৃশ্যে যেখানে 'হরিবোল' ধ্বনি শুনে নৈবেদ্য-অপহারী নিমাই ফিরে আসছেন, সে দৃশ্যটি দেখে ভক্ত মহেন্দ্রনাথ (মণি) 'আহা' ব'লে আপন ব্যাকুলতা প্রকাশ করলে শ্রীরামকৃষ্ণদেবও "আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। 'আহা' বলিতে বলিতে মণির দিকে তাকাইয়া প্রেমাশ্রু বিসর্জন করিতেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ (বাবুরাম ও মাষ্টারকে) —দেখ, যদি আমার ভাব কি সমাধি হয় তোমরা গোলমাল ক'রো না। ঐহিকেরা ঢং মনে করবে।"

উপনয়নের দৃশ্যে (দ্বিতীয় অঙ্ক—পঞ্চম গর্ভাঙ্ক) গিরিশচন্দ্র গৈরিকধারী নিমাইকে দেখে শচীদেবীর উৎকণ্ঠার একটি স্বাভাবিক রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন। কিন্তু এ দৃশ্য দেখে শ্রীরামকৃষ্ণের কোনো উৎকণ্ঠা নেই, তিনি তো জানেন এই চৈতন্যের স্বরূপ। উপনয়নকালে শিশু নিমাইকে বৃন্দাবনদাস তাঁর 'চৈতন্যভাগবতে' বামনাবতারের সঙ্গে তুলনা করেছেন। গিরিশচন্দ্রের নাটকে উপনয়নকালেও নিমাই রাধাভাবে বিভোররূপে উপস্থাপিত। আর এই নিমাইয়ের বন্দনা করতে এসেছেন দেবদেবীরা ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীর ছদ্মবেশে—

চন্দ্রকিরণ অঙ্গে, নম বামনরূপধারী।
গোপীগণমনোমোহন মঞ্জু কুঞ্জচারী॥

—গানটি শুনতে শুনতে শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিস্থ। লক্ষণীয়, গিরিশচন্দ্র বৃন্দাবনদাসের বামনাবতারের উপমাটি মনে রেখেছেন।

তৃতীয় অঙ্কের ছয়টি গর্ভাঙ্কে গিরিশচন্দ্র নিমাই পণ্ডিতের ভক্তরূপে রূপান্তর খুব দ্রুতগতিতে সাধন করেছেন। নাটকীয় গতিবেগের দিক থেকে চৈতন্যজীবনের অনেকগুলি উপকরণ এখানে একত্র সমাবেশিত হলেও নিমাইয়ের

ভক্তিতন্ময়তার আদর্শটি পরিপূর্ণ আবেগের সঙ্গে প্রকাশিত।

সাধারণতঃ চৈতন্যজীবনীগ্রন্থে গয়াধামে যাবার আগে নিমাইপণ্ডিত প্রধানতঃ বিদ্যারসের রসিক। অধ্যাপক, আদর্শ গৃহী, রঙ্গব্যঙ্গপরায়ণ নিমাই পণ্ডিত নিজের ভক্তস্বরূপটি এতকাল প্রচ্ছন্ন রেখেছিলেন। গয়াধামে বিষ্ণুপাদপদ্ম-দর্শনের পরেই তাঁর ভক্তিময় সত্তার পূর্ণাঙ্গ বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু গিরিশচন্দ্র নিমাইয়ের শৈশব থেকেই আপন অধ্যাত্মস্বরূপ সম্বন্ধে সচেতনতা দেখিয়েছেন ব'লে গয়াধামে বিষ্ণুপাদপদ্মদর্শন ও ঈশ্বরপুরীর কাছে দীক্ষা নেওয়ার দৃশ্যটি আর উপস্থাপিত করা প্রয়োজন মনে করেননি।

তৃতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে নবদ্বীপে বৈষ্ণব সমাজের তিন প্রধান—অদ্বৈত আচার্য, শ্রীবাস পণ্ডিত ও হরিদাসের কথোপকথনে বৈষ্ণবভাব-পরিমণ্ডলটি উপস্থাপিত। এ দৃশ্যে মুকুন্দের কণ্ঠের গানটি শুনে শ্রীরামকৃষ্ণ কণ্ঠমাধুর্যের প্রশংসা করলেন। গ্রামবাসীদের ও জগাই-মাধাইয়ের কথোপকথনে বৈষ্ণবদের প্রতি সেকালের সাধারণ গৃহস্থদের অবজ্ঞার ভাবটিও সুপরিস্ফুট। এ দৃশ্যের পটভূমিতেও স্বাভাবিকভাবেই 'চৈতন্যভাগবত' গ্রন্থের কথাই মনে পড়বে। ঘটনা-সংস্থাপনে ও ঐতিহাসিক পটভূমিরচনায় 'চৈতন্যভাগবত'ই গিরিশচন্দ্রের অবলম্বন, তবু শ্রীচৈতন্যদেবের অবতারতত্ত্ব তিনি ষড়্‌গোস্বামীর চিন্তাধারায় অভিস্নাত কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত' থেকেই গ্রহণ করেছেন। ফলে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গী গিরিশচন্দ্রের 'চৈতন্যলীলা' ও 'নিমাইসন্ন্যাস' নাটক দুটিতে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়ে এক উচ্চ আধ্যাত্মিক মানের নিদর্শন রেখেছে।

তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে শ্রীবাসপত্নী মালিনীর কাছে চৈতন্যদেবের স্বরূপপ্রকাশের পাশাপাশি শচীদেবীর পুত্রস্নেহের কাতরতা উচ্চাঙ্গের নাট্য-কৌশলের পরিচায়ক। আবার প্রথম গর্ভাঙ্ক থেকেই জগাই-মাধাই-চরিত্র দুটির একান্ত স্বাভাবিক উপস্থাপনায় এ নাটকের হাস্যরস যেমন দানা বেঁধেছে, তেমনি এঁদের চরিত্র দুটির পটভূমিকায় নিমাই ও নিতাইয়ের অধ্যাত্মসত্তার জ্যোতির্ময় বিকাশেরও সার্থক প্রস্তুতি।

চতুর্থ গর্ভাঙ্কে শচীদেবীর সংলাপে নিমাইয়ের গয়াধামে যাত্রা ও সে যাত্রার পরিণতির কথা এই-ভাবে রূপায়িত—

> যে অবধি গেছে বিশ্বরূপ,
> প্রাণ মম কাঁপে নিরন্তর,
> পাছে হয় নিমাই সন্ন্যাসী!
> ... ...
> ছিল ভাল,
> যতদিন গয়াধামে না যাইল।

শ্রীবাস পণ্ডিতের কাছে তাই শচীদেবীর অনুরোধ—

> কহ তুমি বুঝাইয়ে নিমা'য়ে আমার,
> গৃহধর্মে দেয় মন,—
>
> আঁধার-সংসারে দীপ নিমাই আমার!

শচীদেবীর অনুরোধের উত্তরে শ্রীবাস বললেন··

> পুত্র তব নহে সাধারণ,
> হরিসঙ্কীর্তন হেতু জনম তাহার।—

এমন কথা হ'তে হ'তে ভক্তিবিগলিত অশ্রু-ধারাসিক্ত নিমাই সেখানে এলেন। শ্রীবাসকে দেখে তাঁর পা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে নিমাই বললেন—

> কই প্রভু কই মম কৃষ্ণভক্তি হলো,
> অধম জনম বৃথা কেটে গেল।
> বল প্রভু, কৃষ্ণ কই, কৃষ্ণ কোথা পাব,
> দেহ পদধূলি, বনমালী যেন পাই।

এই দৃশ্য দেখতে দেখতে ('কথামৃতে'র ভাষায়) "শ্রীরামকৃষ্ণ মাষ্টারের দিকে তাকাইয়া কথা কহিতে যাইতেছেন, কিন্তু পারিতেছেন না। গদগদ স্বর! গণ্ডদেশ নয়নজলে ভাসিয়া গেল। একদৃষ্টে দেখিতেছেন, নিমাই শ্রীবাসের পা জড়াইয়া রহিয়াছেন। আর বলিতেছেন, 'কই প্রভু, কৃষ্ণভক্তি ত হলো না'।"

মধুররতির এই কৃষ্ণপ্রেম-আস্বাদন তো তাঁর জীবনের অনুভবসত্য! (ক্রমশঃ)

[৭২ পৃষ্ঠার পর]

এক এক যাত্রায় সমস্ত পালা গেয়ে দিতে পারতাম। কেউ কেউ বলত আমি কালীয়দমন যাত্রার দলে ছিলাম।' (কথামৃত, ৫।৬২-৬৬)

শ্রীরামকৃষ্ণের কোন জীবনীপাঠক যদি তাঁকে সেজেগুজে মালাচন্দন পরে তিন চার মাইল পথ হেঁটে বা পাল্কীতে বিয়ে করতে যেতে দেখে—সে ব্যক্তি মজা দেখবার জন্য নিশ্চয়ই রাস্তার পাশে বর ও বরযাত্রীদের দেখবার উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে যাবে। অসংসারী ভগবানের সংসার একটা দর্শনীয় বস্তু বৈকি! পুঁথি-প্রণেতা শ্রীরামকৃষ্ণের এ বিবাহযাত্রার সঙ্গে নন্দীভৃঙ্গীসহ শিবের বিবাহ-যাত্রার এক হাস্যোদ্দীপক ছবি তুলে ধরেছেন।

দক্ষিণেশ্বর থেকে দেশে মনে হয় তিনি বর্ধমানের পথ দিয়েই যেতেন; তাঁর কথাতে ঐরূপই প্রকাশ পায়। পথে যা যা ঘটত তিনি ভক্তদের কাছে অকপটে বিবৃত করতেন: 'আচ্ছা, আমার এ কি অবস্থা বল দেখি? ওদেশে যাচ্ছি। বর্ধমান থেকে নেমে, আমি গরুর গাড়ীতে বসে—এমন সময় ঝড় বৃষ্টি। আবার গাড়ীতে সঙ্গে কোত্থেকে লোক এসে জুটলো। আমার সঙ্গের লোকেরা বললে—এরা ডাকাত! আমি তখন ঈশ্বরের নাম করতে লাগলাম। কিন্তু কখনও রাম রাম বলছি, কখনও কালী কালী, কখনও হনুমান হনুমান সব রকম বলছি; এ কি রকম বল দেখি?' (কথামৃত, ৩।৩৮)

'ও-দেশ থেকে বর্ধমান আসতে আসতে দৌড়ে একবার মাঠের পানে গেলাম—বলি দেখি, এখানে জীবরা কেমন করে খায়, থাকে। গিয়ে দেখি মাঠে মাঠে পিঁপড়ে চলেছে! সব স্থানই চৈতন্যময়।' (কথামৃত, ৪।৪৩)

জমিজমা-সংক্রান্ত ব্যাপারে শ্রীরামকৃষ্ণকে একাধিকবার টানাটানি করা হয়েছে। তাঁকে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে কখনও জমি রেজেষ্ট্রী ব্যাপারে, কখনও বা মামলার সাক্ষ্য দিতে। পাঠক হয়তঃ এটাকে তাজ্জব ব্যাপার মনে করছেন—তাই শ্রীরামকৃষ্ণের কথা তুলে ধরছি। তাঁর সব কথার মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে জাগতিক মানুষের বন্ধনচ্ছেদের দিগ্‌দর্শন: 'আমি তিন ত্যাগ করেছিলাম—জমিন, জরু, টাকা। রঘু-বীরের নামের জমি ওদেশে রেজেষ্ট্রী করতে গিছলাম। আমায় সই করতে বললে, আমি সই করলুম না। "আমার জমি" বলে তো বোধ নেই। কেশবসেনের গুরু বলে খুব আদর করেছিল।' (কথামৃত, ৪।৬০)

একবার হৃদয়ের ভাই রাজারামের সঙ্গে সিহড়-গ্রামের এক ব্যক্তির মারামারি হয়। রাজারাম তার মাথায় আঘাত করলে সে বিষ্ণুপুরে গিয়ে ফৌজদারী মামলা রুজু করে এবং শ্রীরামকৃষ্ণকে সাক্ষী মানে। সে জানত শ্রীরামকৃষ্ণ যদিও রাজারামের মামা তবুও তিনি সত্যবাদী এবং সত্য সাক্ষ্য দেবেন। উপায় ছিল না। কোর্টের পরোয়ানা। তাই ঠাকুরকে হেঁটে বা গরুর গাড়ীতে সুদূর পথ অতিক্রম করতে হ'ল। তারপর ঠাকুরের তিরস্কার খেয়ে, ভয় পেয়ে রাজারাম মামলা মিটিয়ে নিল; আর তাঁকে সাক্ষীর কাঠ-গড়ায় উঠতে হ'ল না। ঐ অবসরে তিনি বিষ্ণুপুরের মদনমোহন ও মৃন্ময়ী দর্শন করেন।

(লীলাপ্রসঙ্গ, ৪।২)

পরমহংসের স্বভাব বালকের মতো। আমরা যা সব অচেতন দেখি, সবকে চৈতন্যময় দেখে বালক। শ্রীরামকৃষ্ণের আত্মকথা: 'পরমহংসের স্বভাব ঠিক পাঁচ বছরের বালকের মত। সব চৈতন্যময় দেখে। যখন আমি ওদেশে (কামার-

পুকুরে), রামলালের ভাই (শিবরাম) তখন ৪।৫ বছর বয়স—পুকুরের ধারে ফড়িং ধরতে যাচ্ছে। পাতা নড়ছে—আর পাতার শব্দ পাছে হয়, তাই পাতাকে বলছে, "চোপ"। আমি ফড়িং ধরবো। ঝড়বৃষ্টি হচ্ছে, আমার সঙ্গে ঘরের ভিতর সে আছে; বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে—তবুও দ্বার খুলে খুলে বাহিরে যেতে চায়। বকার পর আর বাহিরে গেল না। উঁকি মেরে মেরে এক একবার দেখছে বিদ্যুৎ—আর বলছে, "খুড়ো, আবার চকমকি ঠুকছে।" ফড়িং ধরা, বিদ্যুৎ চমকানো আর চকমকি ঠোকার ভেতর দিয়ে আমরা পরমহংস-চরিত্রের ছবি পেলাম।

সিহড়ের রাস্তায় শ্রীরামকৃষ্ণকে যদি কোন ক্রন্দনরত বালকের সঙ্গে 'মা যাব', 'মা যাব' ব'লে ভেউ ভেউ ক'রে কাঁদতে দেখেন তবে পাঠকের আশ্চর্য হবার কিছুই নাই। কারণ তাঁর প্রথম মাতৃদর্শন হয়েছে ব্যাকুলতা আর অশ্রুর দ্বারাই। দেশে গেলে তিনি সিহড়েও যেতেন বেড়াতে। গ্রামের রাস্তার দুপাশে বনবীথি শহরের ইটের পর ইট দিয়ে সাজান বাড়ীর চেয়ে তাঁর ভাল লাগত। তিনি কখনও যেতেন হেঁটে, কখনও বা পাল্কীতে। একবার পাল্কী ক'রে যাবার কালে তিনি দেখেন তাঁর ভিতর থেকে দুটি সুন্দর কিশোর বালক বেরিয়ে এল। তাঁরা কখনও বনমধ্যে বিচরণ, কখনও বা হাস্য-পরিহাস, কথোপকথন করতে করতে তাঁর সঙ্গে চলল। আবার তাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে ঢুকে গেল। এই দর্শনের কথা শুনে পরবর্তীকালে ভৈরবী ব্রাহ্মণী বলেছিলেন, 'বাবা, এবার নিত্যানন্দের খোলে চৈতন্যের আবির্ভাব। শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীচৈতন্য এবার একসঙ্গে একাধারে তোমার ভিতর রয়েছেন।'

শ্রীরামকৃষ্ণের ভিতর ছিল এক অসম্ভব আকর্ষণী শক্তি। আর এই শক্তির জন্য তাঁর কাছে পিল পিল করে পিঁপড়ের সারের মতো লোক আসত। তাঁকে খেতে শুতে দিত না। দূরের সব গ্রাম থেকে 'তাকুটী তাকুটী' ক'রে খোল বাজাতে বাজাতে আসত সব কীর্তনীয়া। পল্লীর প্রান্তরে চলত রাতদিন কীর্তন। পাঁচিলে—গাছে লোক উঠে দেখত। এতই ছিল ভিড়। লাগ ভেল্কী লাগ! হরিলীলায় যোগমায়ার আকর্ষণ। শ্রীরামকৃষ্ণ ভিড় সহ্য করতে না পেরে গ্রামের তাঁতীদের বাড়ীতে আত্মগোপন করতেন—কিন্তু রেহাই ছিল না। তারপর পাছে তাঁর সর্দিগর্মি উপস্থিত হয়—তাই সেবক হৃদয় চুপি চুপি তাঁকে টেনে নিয়ে যেত খোলামাঠে। তাতেও যখন অব্যাহতি হ'ল না তখন রাতের অন্ধকারে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন।

শ্রীরামকৃষ্ণ যখন দেশে যেতেন, বিকালে ঘাটপাড়ে মা চন্দ্রামণির সঙ্গে ছোট বালকটির মতো বসে থাকতেন। মেয়েরা ঘাটে জল নিতে আসত, আর তাঁকে ঘিরে সব কথা শুনত। গদাইয়ের কথা শুনবার জন্য কেউ বা দু'মাসের গরুর জাব কেটে রাখত, কেউ বা বোনের কাছে কোলের বাচ্চাকে রেখে এসে ঘাটপাড়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে যেত। (Days in an Indian Monastery : Devamata)

তাঁকে দেখবার জন্য অনেক সময় রাস্তায় লোক দাঁড়িয়ে থাকত। কারণ তিনি যখন বেরুতেন, হৃদয়ের ভাষায় 'অপূর্ব দেখাত'। তিনি একদিন 'তুচ্ছ হাড়মাসের খাঁচাদর্শনকারীদের' ধিক্কার দিয়ে ক্ষোভে পথে বেরুনো বন্ধ করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের বিশ্বাসে কোন ভেজাল ছিল না। তিনি সবার কথা শুনতেন এবং এই শোনার দরুন অনেক সময় হিতে বিপরীত হ'ত। বিপরীত হলে তিনি আর সেই ব্যক্তির কথা নিতেন না। তাঁর সরল উক্তি: 'কামারপুকুরের ঘাসবনে একদিন কি কামড়ালে। আমি শুনেছিলাম সাপে যদি আবার কামড়ায়, তাহলে বিষ তুলে লয়। তাই

গর্তে হাত দিয়ে রইলাম। একজন এসে বল্লে—ও কি কচ্ছেন? সাপ যদি সেইখানটায় আবার কামড়ায়, তাহলে হয়। অন্য জায়গায় কামড়ালে হয় না।' (ক. ৪।১৯১)

'শরতের হিম ভাল শুনেছিলাম। কলকাতা থেকে গাড়ী করে আসবার সময় মাথা বার করে হিম লাগাতে লাগলাম।' তারপর সর্দি হয়েছিল শ্রীরামকৃষ্ণের। তখনকার দিনে গাড়ী ঘোড়া কম ছিল, তাই বাঁচোয়া!

শ্রীরামকৃষ্ণ শুধু পথ দিয়ে চলেই ক্ষান্ত ছিলেন না। পথের কোন বিশেষ অংশের সঙ্গে যদি কোন ইতিবৃত্ত জড়ানো থাকত—তাও জেনে নিতেন। তারপর শুরু হ'ত সব গল্প তাঁর সেই তুলনাহীন ভঙ্গিতে: 'তপস্যার জোরে নারায়ণ সন্তান হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। ওদেশে যাবার রাস্তায় রঞ্জিত রায়ের দীঘি আছে। রঞ্জিত রায়ের ঘরে ভগবতী কন্যা হয়ে জন্মেছিলেন। এখনও চৈত্র মাসে মেলা হয়। আমার বড় যাবার ইচ্ছা হয়।' তারপর শুরু হ'ল সেই অপূর্ব কাহিনী। অতি সংক্ষেপে রূপ তুলে ধরছি। রঞ্জিত রায় জমিদার। তপস্যার জোরে সর্বগুণে বিভূষিতা ভগবতী কন্যা পান। একদিন ব্যস্ততার মধ্যে অন্যমনস্ক হয়ে মেয়েকে 'তুই এখান থেকে দূর হ' বলে গাল দেন। কন্যা বিদায় নিল। পথে এক শাঁখারীর কাছ থেকে শাঁখা পরে বাড়ীতে কুলুঙ্গি থেকে টাকা নিতে বলে সে দৃষ্টির বাইরে চলে গেল। যখন বাপ সব জানলেন তখন কেঁদে আকুল হলেন এবং শেষবারের মত দীঘির মধ্য থেকে কন্যার শাঁখা-পরা হাতটি দেখলেন। সেই শেষ দেখা। বারুণীর দিনে সেই থেকে সেখানে ভগবতীপূজা এবং তদুপলক্ষে মেলা হয়। (ক ৪।২২১)

ভক্তেরা কেউ ঈশ্বরদর্শনের পথ কি,—উপায় কি—জিজ্ঞাসা করা মাত্র তিনি পথের উদাহরণ দিয়ে সব উত্তর দিতেন। সবাই বুঝত তাঁর কথা। তিনি গাঁয়ের পথ ও শহরের পথ—সব পথ দেখে চরম পথের কথা বলে দিতেন। 'তাঁর নামগুণকীর্তন সর্বদা করতে হয়। বিষয়-চিন্তা যত পার ত্যাগ করতে হয়। তুমি চাষ করবার জন্য ক্ষেতে অনেক কষ্টে জল আনছো, কিন্তু ঘোগ (আলের গর্ত) দিয়ে সব বেরিয়ে যাচ্ছে। নালা কেটে জল আনা বৃথা পরিশ্রম হলো।'

'চিত্তশুদ্ধি হলে, বিষয়াসক্তি চলে গেলে ব্যাকুলতা আসবে; তোমার প্রার্থনা ঈশ্বরের কাছে পৌছুবে। Telegraph-এর তারের ভিতর অন্য জিনিস মিশাল থাকলে বা ফুটো থাকলে তারের খবর পৌছুবে না।' (ক ৫।১৪৯)

ভগবান লাভ করলে সাধকের কি অবস্থা হয়? তাও সেই পথ-ঘাট, ঝোপ-ঝাড়ে যা দেখেছেন—তাই তিনি বলে চলেছেন: যে ঈশ্বরকে সর্বদা দর্শন করছে তার শুচি অশুচি বোধ থাকে না। হয়ত বাহ্যে করতে করতে কুল খাচ্ছে, বালকের মত। তাঁর 'আমিটা' নাম মাত্র থাকে—যেমন নারকেলের বেল্লোর দাগ। বেল্লো ঝরে গেছে—এখন কেবল দাগ মাত্র। (ক, ৫।১৬২-৬৩)

আর একটি মাত্র ঘটনার উল্লেখ ক'রে আমরা কামারপুকুর পর্ব শেষ করব। শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে কেউ যদি সাহায্য চাইত বা শরণ নিত তার আর ভাবনা ছিল না—সে মানুষই হোক বা ইতর প্রাণীই হোক। ঠাকুর একদিন বর্ষাকালে জল-প্লাবিত পথ দিয়ে যাচ্ছেন। একটা মাগুর মাছ উজিয়ে এসে তাঁর পায়ের কাছে ঘোরাফেরা করছে দেখে তিনি তাকে তুলে লাহাদের পুকুরে ছেড়ে দেন। হৃদয় সব শুনে বলল: 'মামা, ছেড়ে দিয়ে এলে? আনলে ঝোল রেঁধে খাওয়া যেত।' প্রত্যুত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন: 'নারে হৃদু, ও যে আমার শরণ নিয়েছে।' শরণাগতি থেকে মুক্তি।

(মাতৃসান্নিধ্যে, ২৪৫ পৃঃ)

॥ ২ ॥

॥ তীর্থযাত্রা পর্ব ॥

'তির্থী কুর্বন্তি তীর্থানি' তীর্থযাত্রীরাই তীর্থ সৃষ্টি করে। মানুষ যুগযুগ ধরে জপ-তপ, ধ্যান-ধারণা, প্রার্থনা-উপাসনার দ্বারা তীর্থক্ষেত্রে একটা জমাটবাঁধা অধ্যাত্মিকতা সৃষ্টি করে। তাই সেখানে গেলে সহজেই উদ্দীপন হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন: 'ঈশ্বর সব জায়গায় সমানভাবে থাকলেও এইসব স্থানে তাঁর বেশী প্রকাশ। যেমন মাটি খুঁড়লে সব জায়গাতেই জল পাওয়া যায়, কিন্তু যেখানে পাতকো, ডোবা, পুকুর ও হ্রদ আছে সেখানে আর জলের জন্য খুঁড়তে হয় না। যখন ইচ্ছা জল পাওয়া যায়, সেই রকম।'

পাঠক লক্ষ্য করবেন শ্রীরামকৃষ্ণের জ্ঞান আমাদের মতো কেবল পুঁথিপত্র থেকে আসছে না—আসছে পথ-প্রান্তর থেকে, বিশ্বপ্রকৃতি থেকে। ছান্দোগ্য উপনিষদে আমরা দেখি সত্যকামের জ্ঞান আসছে ষাঁড়, অগ্নি, হাঁস, মদ্গুপাখী থেকে। ঠাকুরের জীবনেও আমরা উপনিষদের পুনরাবৃত্তি দেখি: 'ঝাউতলা থেকে আসছি। পঞ্চবটীর দিকে দেখি সঙ্গে একটা কুকুর আসছে। তখন পঞ্চবটীর কাছে একবার দাঁড়াই, মনে করি, মা যদি একে দিয়ে কিছু বলান।' (ক, ৫।১০২)

এ জগতে শুভকর্মে সব সময়ই বাধা পড়ে। তাই তীর্থযাত্রা নিয়ে স্বামী-স্ত্রীতে একটা মধুর কোন্দল সৃষ্টি হ'ল। জগদম্বা মথুরকে বললে—হাঁগা, চল না আমরা তীর্থ ক'রে আসি।

মথুর—তীর্থে গিয়ে কি হবে? যদি ঠাকুর-দেবতা দেখতে যেতে হয়, তা বাবাকে (শ্রীরামকৃষ্ণকে) দেখলেই হ'ল। আমার ত ওসব ভাল লাগে না; আমার মনে হয় ওতে কেবল কতকগুলা টাকার শ্রাদ্ধ আর শরীরের কষ্ট। যাঁকে দেখলে সর্ব তীর্থের ফল হয়, যাঁর কটাক্ষে ভক্তি-মুক্তি মেলে, সেই তিনি আমার ঘরে। তাঁকে ফেলে কোথায় যাব! আমি ত কোথাও যাচ্ছি না, তোমার যেতে ইচ্ছা হয় নিজে যাও। আমি যাব না।

জগদম্বা—তা কেন? বাবাকে ফেলে যাবে কেন? বাবাকেও নিয়ে চল।

মথুর - বেশ, বাবা যান ত যাব।

আদুরে মেয়ে যেমন ছুটতে ছুটতে নিজের বাবার কাছে কিছু আদায় করতে দৌড়ে যায়, তেমনি স্বামীর কথা শুনে জগদম্বা ঠাকুরের কাছে দ্রুত গিয়ে বলল, 'বাবা, আপনি যেতে রাজী হন। আপনি না গেলে হবে না বাবা।' কী করেন আর তিনি। ভক্তের কাতরতা দেখে সম্মতি দিলেন।

শুরু হ'ল তীর্থযাত্রার আয়োজন। মথুরের আপত্তি পরিণত হ'ল উৎসাহে। তিনখানা তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ী, পাচক-ব্রাহ্মণ, দাস-দাসী, দারোয়ানদের জন্য এবং একখানা দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ী শ্রীরামকৃষ্ণ, হৃদয় ও মথুরের পরিবারবর্গের জন্য নির্দিষ্ট হ'ল। মোট যাত্রীর সংখ্যা হ'ল একশ এবং তীর্থযাত্রায় ব্যয় হয়েছিল, তখনকার দিনে লক্ষ টাকার উপর।

প্রথম তীর্থ বৈদ্যনাথধাম। সাঁওতাল পরগনার এক পল্লীতে অর্ধনগ্ন, জীর্ণ, শীর্ণ, ক্ষুধায় কাতর সর্বহারাদের মধ্যে বসে শ্রীরামকৃষ্ণকে যদি কেউ কাঁদতে দেখেন, তিনি হয়ত অবাক হয়ে ভাববেন এ সব কি? বাবা ত দিব্যি ধনী মথুরের সঙ্গে তীর্থদর্শনে বেরিয়েছেন; বেশ বিলাসের সঙ্গে কাটাবেন। তা না কতকগুলা নিঃস্ব মানুষের দুঃখমোচনের জন্য ধনীর কাছে আবেদন-নিবেদন, তারপর 'এদের ফেলে যাব না তীর্থে' বলে অবস্থান ধর্মঘট! হাঁ, শ্রীরামকৃষ্ণ বুঝতেন মানুষের দুঃখ-যন্ত্রণা। তাদের ব্যথায় ব্যথিত হয়ে কাঁদতেন মায়ের কাছে। আর সেই দেবমানবের অশ্রু-জড়ানো প্রার্থনা কি বিফল হবার? তিনি শুধু

ধনী মথুরের আরাধিত নন, ঐ সর্বহারাদেরও

পথে চলতে গেলে train fail, accident—এসব হয়ে থাকে। শ্রীরামকৃষ্ণও এসব ব্যাপার থেকে নিষ্কৃতি পাননি। কাশী যাবার পথে মোগলসরাইয়ের এক স্টেশন আগে তাঁকে হৃদয়ের সঙ্গে কার্যান্তরে নামতে হয়। এমন সময় ট্রেন দিল ছেড়ে। মথুর বন্দোবস্ত মতো তাঁর রিজার্ভ কামড়াগুলিকে কেটে দিতে বলতে যাচ্ছিলেন; কিন্তু পারলেন না। ছুটতে ছুটতে ট্রেনে উঠে কাশীতে পৌঁছে 'তার' করলেন যাতে পরবর্তী ট্রেনে শ্রীরামকৃষ্ণকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। বাবাকে ফেলে শূন্য মনে মথুর কাশীধামে নামলেন। অবশ্য পরবর্তী ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করতে হয়নি। রেলের জনৈক বিশিষ্ট কর্মচারী, বাগবাজারনিবাসী শ্রীরাজেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় একখানি স্পেশ্যাল গাড়ীতে ক'রে ঠাকুর ও হৃদয়কে কাশীধামে পৌঁছে দেন

প্রবাদ আছে—ভারতবর্ষে যতদিন শিবপুরী কাশী থাকবে ততদিন ভারত থেকে কেউ ধর্ম সরাতে পারবে না। শ্রীরামকৃষ্ণ নৌকাযোগে বারাণসী প্রবেশকালে ভাবচক্ষে দেখেন যে শিবপুরী বাস্তবিকই স্বর্ণনির্মিত। যুগ-যুগান্তর ধরে সাধুভক্তদের কাঞ্চনতুল্য সমুজ্জ্বল ভাবরাশি স্তরে স্তরে পুঞ্জীভূত ও ঘনীভূত হয়েই এই কাশী স্বর্ণময়। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন তো কথার কথা নয়। দর্শনের ফলে দেখা দিল আর এক দুর্ভাবনা। তাই তো, শৌচাদির দ্বারা কী ক'রে তিনি এই স্বর্ণপুরীকে অপবিত্র করেন! তাঁর চোখে তো কাশীর পথ, ঘাট, মাঠ, বাগান, মঠ, কূপ, তড়াগ সব জ্বল জ্বল করছে। এ তো ইট-কাঠ-মাটির পৃথিবী নয়। 'তাঁহার শ্রীমুখে শুনিয়াছি, এজন্য তিনি মথুরকে বলিয়া পালকির বন্দোবস্ত করিয়া কয়েকদিন অসীর পারে গমন ও তথায় (বারাণসীর বাহিরে) শৌচাদি সারিয়া আসিতেন। পরে ঐ ভাবের বিরামে আর ঐরূপ করিতে হইত না।' (লী ৪।১২৮-১২)

প্রতিদিন প্রভাতে মথুর বাবাকে একখানি পালকিতে লইয়া, একপাশে নিজে অপরপাশে হৃদয় এবং আগে পিছে বহুসংখ্যক রৌপ্যমণ্ডিত ছত্রদণ্ডধারী দারোয়ান সমভিব্যাহারে দেবদেবী-দর্শনে যেতেন। এ ছিল এক অপূর্ব শোভাযাত্রা! ধনীর বেশে সুসজ্জিত মথুরকে মনে হ'ত বাবার দেহরক্ষী। যাঁর জন্য এত সব - তাঁর অবস্থা? কখনও অন্তর্দশা, কখনও অর্ধবাহ্যদশা। আপন-ভাবে বিভোর। হৃদয় জোর ক'রে হাত ধরে মন্দিরে মন্দিরে নিয়ে যেত। কেদারনাথের মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধি অধিক গভীর হ'ত।

মথুর বাবাকে নিয়ে নৌকায় কাশীর গঙ্গাবক্ষে ঘুরে বেড়াতেন। মণিকর্ণিকার ঘাটের কাছে এসে হঠাৎ ঠাকুর আনন্দে রোমাঞ্চিত কলেবরে ছুটে নৌকা থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন। মারাত্মক accident-এর ভয়ে মথুরের পাণ্ডারা, মাঝিমাল্লারা ছুটল ধরতে। তার প্রয়োজন হ'ল না। তিনি আপনভাবে হাসিমুখে নিশ্চেষ্ট হয়ে অতীন্দ্রিয় দর্শনে মশগুল হয়ে রইলেন। বাবার ভাব বোঝা মুস্কিল; তাই মথুর ও হৃদয় দুই দুরন্ত দেহরক্ষী তাঁকে ঘিরে রইল। মথুর যে কী ভাবে তীর্থ করেছিলেন তা তিনিই জানেন। বাবার কখন কি ঘটে যাবে—সেই ভাবনাই তাঁর ভাবনা। তীর্থযাত্রার আগে তাই স্ত্রীকে বলেছিলেন, 'বাবাই সব তীর্থ'। বাবার আবদার মিটাতে মথুর কখনও কার্পণ্য করেননি।

সাধারণ মানুষ উপকারী ধনী-মানী ব্যক্তির সামনে তাঁর দোষ বলা তো দূরের কথা, একটা কৃতজ্ঞতা-মিশ্রিত সঙ্কোচের মধ্যে অবস্থান করে। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের ও-বালাই ছিল না। তুমি বড় লোক হতে পার তাতে কি আসে যায়।

তিনি ধনীর ধার ধারতেন না। সকল মানুষের কল্যাণের জন্যই ছিল তাঁর সজাগ দৃষ্টি। তীর্থে মথুরের মুখে বিষয়ের কথা শুনে তিনি তীব্র আর্তনাদে ফেটে পড়েছেন: আমায় তীর্থে এনে এ কোথায় রাখলি, মা? আমি দক্ষিণেশ্বরে ত বেশ ছিলুম। সেখানে কেমন সৎ চর্চা হত। আর এখানে কিনা, কেবল রাতদিন সাংসারিক কথা। আমার গা জ্বলে যাচ্ছে, মা। তুই আমাকে এখান থেকে নিয়ে চল।

বন্ধুকে বন্ধু অভ্যর্থনা করে নানাভাবে। আলিঙ্গন, করমর্দন, নেশার বস্তু নিবেদন প্রভৃতি বহু রীতি আছে। পরমহংস ত্রৈলঙ্গস্বামী পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণকে অভ্যর্থনা করেছিলেন একটিপ নস্য দিয়ে। স্বামীজীকে সম্মান দেবার জন্য তিনি তা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের মিলন হয় মণিকর্ণিকার ঘাটে। ঐ ঘাটেই তিনি মৌনী হয়ে পড়ে থাকতেন। তিনি তখন গঙ্গার ধারে একটা ঘাট বাঁধাচ্ছিলেন। হৃদয়কে হৃষ্টপুষ্ট দেখে তিনি তাকে ইশারা ক'রে চার কোদাল মাটি দিতে বলেন। হৃদয় প্রথমে অসম্মত, পরে ঠাকুরের অনুরোধে মাটি কেটে দেন।

প্রয়াগের পথে অঘটন কিছু ঘটেনি। প্রয়াগ সম্বন্ধে তাঁর একটিমাত্র মন্তব্য আছে: 'পইরাগে গিয়ে দেখলাম সেই পুকুর, সেই দূর্বা, সেই গাছ, সেই তেঁতুলপাতা।' কেবল পার্থক্য দেখেছিলেন পশ্চিমের লোকের হজমশক্তির। প্রয়াগে প্রথা-মত মথুর প্রভৃতি মুণ্ডন করেন; কিন্তু ঠাকুর ওসব কিছু করেননি। সন্ন্যাসী সব প্রথার পারে, তাই তাঁর ওসব প্রয়োজন ছিল না।

ব্রজের পথ, মাঠ, ঘাট শ্রীকৃষ্ণের স্মৃতি দিয়ে ঘেরা। যেখানে বিলাস-বিভব নেই, কপটতা নেই, বিষয়োন্মুখতা নেই—সে জায়গা শ্রীরামকৃষ্ণের মনঃপূত হবেই হবে। এ ব্রজমণ্ডল ঐশ্বর্যময় রাজা কৃষ্ণের নয়, নিরৈশ্বর্য বালকৃষ্ণের লীলাভূমি। ব্রজের অনুপম শোভা, ফলফুলে শোভিত বনরাজি, বনমধ্যে মৃগ ও ময়ূরের নিঃশঙ্ক বিচরণ, সাধু-তপস্বীদের নিরন্তর ঈশ্বরচিন্তায় দিনযাপন, ব্রজ-বাসীদের কপটতাশূন্য সশ্রদ্ধ ব্যবহার, কালিন্দীর দিগ্‌দিগন্তবিস্তৃত তটভূমি আর তার পাশ দিয়ে এঁকে বেঁকে চলে গেছে পরিক্রমার পথ—এসব মিলে শ্রীরামকৃষ্ণের উদাসী মনকে আরও বিহ্বল করে তুলেছিল। আমরা এবার ঠাকুরের শ্রীমুখ থেকে শুনব তাঁর ব্রজতীর্থের কথা: 'মথুরার ধ্রুবঘাট যেই দেখলাম, অমনি দপ্ করে দর্শন হলো বসুদেব কৃষ্ণ কোলে লয়ে যমুনা পার হচ্ছেন। যমুনার তীরে সন্ধ্যার সময় বেড়াতে যেতাম। সন্ধ্যার সময় যমুনা-পুলিনে বেড়াচ্ছি, বালির উপর ছোট ছোট খোড়ো ঘর, বড় কুলগাছ, গোধূলির সময় গাভীরা গোষ্ঠ থেকে ফিরে আসছে। দেখলাম হেঁটে যমুনা পার হচ্ছে। যাই দেখা, আমার কৃষ্ণের উদ্দীপন হলো। উন্মত্তের ন্যায়—কোথায় কৃষ্ণ, কোথায় কৃষ্ণ—বলে বেহুঁস হয়ে গেলাম।' (ক. ৪।৫০)

এবার আমরা শুনব সেই অপূর্ব ছড়ার কথা: 'শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড গিরিগোবর্ধন। মধুর মধুর বংশী বাজে (এই সে) বৃন্দাবন॥' বাবা বায়না ধরলেন, 'আমি বীণা শুনব।' মথুর তাঁকে খুশী করবার জন্য খুব চেষ্টা করলেন, কিন্তু ভাল বীণ-কার বৃন্দাবনে পাওয়া গেল না। তারপর কলকাতায় ফিরবার কালে সেই বীণা তিনি কাশীর মদনপুরায় অভিজ্ঞ বীণকার মহেশচন্দ্র সরকারের কাছে শোনেন। মধুর বংশী যখন শোনা হ'ল না, তখন শ্যামকুণ্ড, রাধাকুণ্ড, গিরিগোবর্ধন তো বাদ যেতে পারে না। বৃন্দাবনে তাঁহার বাসস্থান ছিল নিধুবনের কাছে। সেখান থেকে শ্যামকুণ্ড-রাধাকুণ্ড অনেক দূর। মথুর বাবার জন্য পালকি ঠিক ক'রে দিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের আত্মকথা: শ্যামকুণ্ড-রাধাকুণ্ড দর্শন করতে ইচ্ছা হয়েছিল।

পাল্কী করে আমায় পাঠিয়ে দিলে। অনেকটা পথ—লুচি জিলিপী পাল্কীর ভিতর দিলে। মাঠ পার হবার সময় এই ভেবে কাঁদতে লাগলাম—কৃষ্ণ রে, তুই নাই কিন্তু সেই সব রয়েছে—সেই মাঠ, তুমি গরু চরাতে। হৃদে রাস্তায় সঙ্গে সঙ্গে পিছনে আসছিল। বেয়ারাদের বলে দিচ্ছলো—খুব হুঁশিয়ার! আমি চক্ষের জলে ভাসতে লাগলাম। বেয়ারাদের দাঁড়াতে বলতে পারলাম না। শ্যামকুণ্ড-রাধাকুণ্ডর পথে যাচ্ছি, গোবর্ধন দেখতে নামলাম। দৌড়ে গিয়ে গোবর্ধনের উপর দাঁড়িয়ে পড়লাম। ব্রজবাসীরা গিয়ে আমায় নামিয়ে আনে। শ্যামকুণ্ড-রাধাকুণ্ড গিয়ে দেখলাম, সাধুরা একটি একটি ঝুপড়ির মত করেছে। তার ভিতরে পিছন ফিরে সাধন-ভজন কচ্ছে—পাছে লোকের উপর দৃষ্টিপাত হয়। দ্বাদশবন দেখবার উপযুক্ত।' (ক. ৪।৩০)

বৃন্দাবনে ঠাকুর ভেক ধারণ করেছিলেন ১৫ দিন ধরে। কালীয়দমন ঘাটে হৃদয় তাঁকে রোজ স্নান করাতে নিয়ে যেত। তিনি চেয়েছিলেন বৃন্দাবন পরিক্রমা করতে। বালককে যেমন নানারূপ ভয় দেখিয়ে বুঝিয়ে-শুঝিয়ে কোন কাজ থেকে নিবৃত্ত করা হয়, মথুরও তেমনি পরিক্রমার নানারূপ কষ্টের কথা ব'লে ঠাকুরকে নিরস্ত করেন।

নিধুবনের সামনে রাস্তার উপর বা বাগানের ভিতর কেউ যদি দেখে শ্রীরামকৃষ্ণের এক হাত ধরে এক বর্ষীয়সী নারী 'আমার দুলালী' বলে টানছে, আর অপর হাত এক যোয়ান মদ্দ 'আমার মামা' বলে টানছে,—তিনি নিশ্চয়ই মজার ব্যাপার দেখবার জন্য দাঁড়িয়ে যাবেন। মথুরেরও আশঙ্কা হয়েছিল—তাই তো বাবা যদি বৃদ্ধা গঙ্গা-মার শ্রদ্ধা ও যত্নে বশীভূত হয়ে এখানে থেকে যান—তবে আমার উপায়! তিনি হৃদয়কে বললেন, 'ভাই হৃদু, বাবাকে এখান থেকে নিয়ে যাবার ভার তোমার উপর।' হৃদয়—'তুমি ভেবো না, আমি মামাকে ঠিক নিয়ে যাবো।' তারপর শুরু হ'ল টানা হেঁচড়া আর ঝগড়া। হৃদয় ভয় দেখালে মামাকে যে তাঁর পেটের অসুখ হলে কে দেখবে? গঙ্গা-মা বললেন—'আমি দেখব।' তারপর ঠাকুরের নিজের গর্ভধারিণীর কথা মনে পড়ায় তাঁদের প্রত্যাবর্তনের পথ সুগম হল।

দূরপাল্লার পথে শ্রীরামকৃষ্ণকে নিয়ে যাওয়া মুস্কিল ছিল। 'একা একশ' মথুরই বাবার ঝক্কি পোহাতে পারতেন। বাবা সঙ্গে না থাকলে তিনি নিজেকে সঙ্গিহীন ও শূন্য বোধ করতেন। তখনকার দিনে বড়লোকদের একটা ফ্যাশান ছিল বজরায় গঙ্গাবক্ষে হাওয়া খাওয়া। মথুর বাবাকে সঙ্গে নিয়ে চললেন। 'সেজোবাবুর সঙ্গে কদিন বজরা করে হাওয়া খেতে গেলাম। সেই যাত্রায় নবদ্বীপেও যাওয়া হয়েছিল। বজরাতে দেখলাম মাঝিরা রাঁধছে। তাদের কাছে দাঁড়িয়ে আছি। সেজোবাবু বললে, বাবা, ওখানে কি করছ? আমি হেসে বললাম, মাঝিরা বেশ রাঁধছে। সেজোবাবু বুঝেছে, ইনি এবারে চেয়ে খেতে পারেন। তাই বললে, বাবা, সরে এসো, সরে এসো।' (ক, ২।১৪৪) মথুর ভালবাসতেন তাঁর বাবাকে। এমন কি পীরসাধনকালে হিন্দু বাবুর্চি দিয়ে রান্না করিয়ে খাইয়েছেন, সুতরাং মুসলমান মাঝির রান্না খাবার বায়না উঠবার আগেই বাবাকে সরিয়ে নিয়েছেন।

কাশীর মতো নবদ্বীপেও নৌকার উপর থেকে পড়ে ঠাকুর দুর্ঘটনা ঘটাচ্ছিলেন। তাঁর কথায়: 'দুটি সুন্দর ছেলে—এমন রূপ দেখিনি, তপ্ত কাঞ্চনের মত রং, মাথায় একটা করে জ্যোতির মণ্ডল, হাত তুলে হাসতে হাসতে নিকটে এসে এর (নিজের শরীর) ভিতর ঢুকে গেল, আর বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেলুম। জলেই পড়তুম,

হৃদে নিকটে ছিল; ধরে ফেললে।' মথুরের সঙ্গে কালনায় ভগবানদাস বাবাজীকেও দেখতে যান।

বাবা হলেন নিজের লোক। তাই তাঁকে নিয়ে একঘরে শোয়া থেকে নিজের জন্মস্থান সুদূর খুলনা জেলার সাতক্ষীরা মহকুমার সোনা-বেড়ে গ্রাম, নিজের জমিদারি রাণাঘাটের কলাই-ঘাটা গ্রাম প্রভৃতি জায়গায় মথুর তাঁকে নিয়ে ঘোরেন। বাবার হুকুম সঙ্গে সঙ্গে তামিল হ'ত। গ্রামের বাড়ীতে যাবার কালে মথুর ঠাকুরের জন্য পাল্কী এবং নিজের জন্য হাতী ব্যবস্থা করেন। কিন্তু বাবার বায়না 'আমি হাতিতে চড়ব'। ব্যস্! বাবা হাতির পিঠে উঠে হেলে দুলে চললেন বালকের মতো সগর্বে সানন্দে।

রাণাঘাটে এসে মানুষের দুঃখ দেখে বাবার হুকুম হ'ল: 'এই গরীব প্রজাদের এক মাথা করে তেল, একখানা করে নূতন কাপড়, এক পেট করে খাবার এবং এক বছরের খাজনা মকুব করে দাও।' সে কথার দ্বিরুক্তি করে কার সাধ্য! বিষয়ী মথুর ওজর-আপত্তি তুললে ঠাকুর বললেন, 'তুমি মায়ের ভাঁড়ারীমাত্র! দীন-দুঃখীর সেবার জন্য মার ঐশ্বর্য তোমার ঘরে।' লৌকিক দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন রাসমণির মন্দিরে ৭৲ টাকা বেতনের পুরোহিত কর্মচারী মাত্র। কিন্তু ব্যাপারটা ছিল অন্যরকম। শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন মনেপ্রাণে মায়ের ছেলে আর মথুর 'মায়ের ভাঁড়ারী মাত্র'। সুতরাং 'মা আনন্দময়ীর রাজ্যে এত দুঃখকষ্ট' বোঝার ক্ষমতা পুত্রের অধিক এবং মার কর্মচারীকে আদেশ করবার অধিকারও তার।

॥ ৩ ॥

॥ কলিকাতা পর্ব ॥

সমাজ-সামাজিকতা, বিধি-নিষেধ, আদব-কায়দা, আইন-শৃঙ্খলা—এসব মানুষের গতিকে নিয়ন্ত্রিত করে, সীমিত করে, জীবনযাত্রাকে যন্ত্রবৎ চালিত করে। স্বাধীনতার নামগন্ধ থাকে না যে জীবনে—সে কি আবার জীবন! তাই শহুরে সভ্যতা—কাপুড়ে সভ্যতা, যান্ত্রিক সভ্যতা। শ্রীরামকৃষ্ণ ঐ সব কিছুর ঊর্ধ্বে ছিলেন। তিনি চলতেন আপন মনে। অপরের ভালমন্দ বলার তোয়াক্কা রাখতেন না। তিনি কোনদিন মানুষের মুখের দিকে তাকিয়ে চলেননি, চলেছিলেন তাঁর চির আরাধিতা মা জগদম্বার মুখপানে চেয়ে। বয়সে প্রৌঢ় হলেও তিনি ছিলেন জগদম্বার ক্রোড়ে ক্রীড়ারত শিশু।

কলকাতার রাজপথে তখন বইছিল এক দুরন্ত ঝড়। সে ঝড়ের উৎপত্তিস্থান ছিল জড়বাদী পাশ্চাত্ত্য জগৎ। সেই ঝড়ের ধুলাবালি ছিল ইন্দ্রিয়-সুখ ও ভোগলিপ্সা; গতি ছিল কামকাঞ্চনাসক্তির দিকে। ঐ ঝড়ের উচ্ছৃঙ্খলতা, কামোন্মাত্ততা, মদালুতা তোলপাড় করছিল ভারতের কৃষ্টিকেন্দ্র কলকাতাকে। ঐ ভোগের ঝড়ে তদানীন্তন সমাজ বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। কেউ কেউ আপসের দ্বারা ঘরের ভিতর বসে চেষ্টা করছিলেন ঐ ঝড় রুখবার। কিন্তু ঐ দারুণ সাইক্লোন থামাতে পিছন-টানা সংসারী ঘরমুখো মানুষের ক্ষমতার বাইরে ছিল। প্রয়োজন ছিল এমন একজন সাহসী বন্ধনহীন মানুষের, যে কলকাতার রাজপথে দাঁড়িয়ে যুঝতে পারে, কলঙ্কের মধ্যে নিষ্কলঙ্ক থাকবার হিম্মত রাখে। গড়ের মাঠে সাহেবপাড়ায় ঘুরে, গোরাপল্টনদের কেল্লার মধ্যে ঢুকে, লাটসাহেবের বাড়ীকে চুনসুরকির ঢিপি বলে ধিক্কার দিয়ে দাঁড়াবার স্পর্ধা রাখে। যুগপ্রয়োজন মিটাতে এবং বিষয়রসকে বৈরাগ্যবহ্নি দিয়ে পোড়াতে এসেছিলেন ত্যাগীর বাদশা শ্রীরামকৃষ্ণ।

(ক্রমশঃ)

সমালোচনা

যোগবাশিষ্ঠসার : স্বামী ধীরেশানন্দ। উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৩ হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা—২১৮+২৪। দাম—চার টাকা।

শ্রদ্ধেয় স্বামী ধীরেশানন্দজী দ্বারা অনূদিত 'যোগবাশিষ্ঠসারঃ' গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত পড়িয়া নিরতিশয় তৃপ্তি ও আনন্দ লাভ করিলাম। অদ্বৈত-সিদ্ধান্ত বুঝিবার এবং অদ্বৈতসিদ্ধান্তে স্থির হইবার পক্ষে 'যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ' একখানি অতি প্রসিদ্ধ প্রামাণিক গ্রন্থ। প্রায় ৩২,০০০ শ্লোকপূর্ণ এই বিশাল গ্রন্থে বশিষ্ঠদেব শ্রীরামচন্দ্রের আত্মজ্ঞান-উৎপাদন-মানসে নানা উপাখ্যান ও যুক্তির সাহায্যে জগতের মিথ্যাত্ব-প্রতিপাদন-পূর্বক অদ্বৈত-সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন, ইহা দেখা যায়। যোগবাশিষ্ঠ অতি উচ্চকোটির বেদান্ত-গ্রন্থ, ইহাতে বেদান্তের দৃষ্টিসৃষ্টিবাদ ও অজাতবাদ স্থাপিত হইয়াছে। ইহা নিদিধ্যাসন-গ্রন্থ—মনোযোগ-সহকারে এই গ্রন্থ পড়িলে চিত্ত স্বতঃই সমাহিত হয়। পূর্বে বঙ্গভাষায় যোগবাশিষ্ঠের কয়েকখানি সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল এবং তখন এই গ্রন্থের পাঠকও ছিল। কিন্তু আজকাল বাজারে বঙ্গভাষায় লিখিত যোগবাশিষ্ঠের কোন অনুবাদ পাওয়া যায় না—ইহা আধ্যাত্মিক হিন্দুজাতির আত্মবিস্মৃতির পরিচায়ক। যাহা হউক, বিশালকায় যোগবাশিষ্ঠ গ্রন্থখানি পড়িয়া সাধারণে উহার সার-সংগ্রহে অসমর্থ হইবে ভাবিয়া পরে কোন অজ্ঞাতনামা মহাত্মা যোগবাশিষ্ঠের সার কথাগুলি মাত্র ২২০। ২২৩ শ্লোকে লিপিবদ্ধ করিয়া 'যোগবাশিষ্ঠসারঃ' নাম দিয়া একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন—যাহাতে জিজ্ঞাসু ও মুমুক্ষুগণ অল্পায়াসেই যোগবাশিষ্ঠের তাৎপর্য গ্রহণ করিতে পারেন। সম্প্রতি স্বামী ধীরেশানন্দজী ঐ গ্রন্থের বঙ্গভাষায় সরল অনুবাদ ও ব্যাখ্যা প্রকাশ করায় মূল যোগবাশিষ্ঠ গ্রন্থের অভাবের কিছুটা পূরণ হইবে এবং বৈরাগ্যবান্ ও শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিগণ এই গ্রন্থ হইতে তত্ত্বাবধারণ করিয়া হৃদয়ে আনন্দানুভবও করিবেন।

স্বামী ধীরেশানন্দজী উত্তম গুরুমুখে বেদান্ত শ্রবণ ও শিক্ষা করিয়াছেন এবং নানা শাস্ত্র পাঠ ও মননদ্বারা শাস্ত্র-তাৎপর্য ও সিদ্ধান্ত অবগত হইয়াই এই গ্রন্থের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সেইজন্যই তাঁহার অনুবাদ ও ব্যাখ্যা খুব সরল, পরিস্ফুট ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানির ব্যাখ্যায় স্বামী ধীরেশানন্দ নানা শাস্ত্রের ও আচার্যগণের বচন উদ্ধৃত করিয়া নিজ ব্যাখ্যার সমর্থন করিয়াছেন। আধুনিক কোন কোন বেদান্তীর মতো এই গ্রন্থে অদ্বৈতসিদ্ধান্তের বিরোধী কোন স্বকপোলকল্পিত মনগড়া উক্তি নাই। আধুনিক কোন কোন শিক্ষিত ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ বেদান্তীকে বলিতে শুনিয়াছি যে, আচার্য শঙ্কর জগৎকে মিথ্যা বলেন নাই। কিন্তু স্বামী ধীরেশানন্দের গুরুমুখীন ব্রহ্মবিদ্যা তাঁহাকে ভ্রান্তপথে পরিচালিত করে নাই। গ্রন্থমধ্যে যোগীর লয়পূর্বক সমাধির এবং জ্ঞানীর বাধপূর্বক সমাধির পার্থক্য, বিবর্তবাদ, পরিণামবাদ, সৃষ্টিদৃষ্টিবাদ, দৃষ্টিসৃষ্টিবাদ প্রভৃতির স্বরূপ এবং বেদান্তের আরও অনেক শিক্ষণীয় সূক্ষ্ম বিষয় সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। অদ্বৈত-মার্গানুরাগী পাঠক একটু অভিনিবেশ-সহকারে বইখানি পড়িলেই ঐ বিষয়গুলি বুঝিতে পারিবেন—কারণ, গ্রন্থকারের অদ্বৈত-বেদান্তের উপর দখল থাকায় তিনি ঐগুলি সরল ও সুখবোধ্যরূপে পরিবেশন করিয়াছেন। কিন্তু শাস্ত্র হইতে তত্ত্বাবধারণ করিয়া সাধক যদি

বিষয়চিন্তা ত্যাগপূর্বক সর্বদা অদ্বৈততত্ত্বনিষ্ঠ না হন, তবে তিনি অদ্বৈতসিদ্ধান্তে স্থিত হইতে পারেন না, স্বামী ধীরেশানন্দ এই গ্রন্থে উহাও দেখাইতে ত্রুটি করেন নাই—গুরু ও শাস্ত্র কেবল পথ-প্রদর্শক, সাধন-ভজন শিষ্যকেই করিতে হয়। এই গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া বিদ্বৎসমাজের বিশেষ কল্যাণ করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি ধন্যবাদার্হ। পূর্বে 'বেদান্ত-সংজ্ঞা-মালিকা' পুস্তকখানি প্রকাশ করিয়া তিনি বেদান্ত-শিক্ষার্থীর খুবই উপকার করিয়াছেন। এই প্রকার শাস্ত্রসিদ্ধান্তপূর্ণ উদার ও নির্ভুল অদ্বৈত-গ্রন্থের যত প্রচার হয়, ততই মানবের কল্যাণ।—**শ্রীঅমূলপদ চট্টোপাধ্যায়**

ছান্দসিকী: শ্রীদিলীপকুমার রায়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা: ২৯০ + ১৬; মূল্য ৬'০০ টাকা।

বিখ্যাত ব্যক্তির বিখ্যাত গ্রন্থের (প্রথমের পরবর্তী সংস্করণের) সমালোচনা করা বিশেষ দুরূহ কাজ। কারণ, সমালোচনা ইতিমধ্যেই বিভিন্ন স্থানে হ'য়ে গেছে, এবং যার দরুন প্রথম সংস্করণে দোষ ত্রুটি যদি কিছু থেকেও থাকে তা (লেখক স্বীকার করে নিলে) দূর করা হয়েছে।

ছান্দসিকীর বর্তমান বা দ্বিতীয় সংস্করণে শ্রীদিলীপকুমার রায় কোন পরিমার্জন, পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করেছেন কিনা, তা এই সংস্করণের ভূমিকা থেকে জানা যায় না। আর গ্রন্থখানির প্রথম সংস্করণের সঙ্গে মিলিয়ে দেখবারও সুযোগ হয়নি। এই সব কারণের জন্যে ঠিক সমালোচনার পথে না গিয়ে গ্রন্থখানির পরিচয় প্রদানই করলাম।

প্রতিভা যা কিছুকে স্পর্শ করে তাকেই সজীব করে তোলে কিনা, জানি না। তবে ছান্দসিকীতে শ্রীদিলীপকুমার রায়ের প্রতিভা বা সৃজনক্ষমতা বিশেষভাবে প্রকাশিত। এর ওপর আছে তাঁর অনুসন্ধিৎসা, নিষ্ঠা, বৈদগ্ধ্য এবং সত্যে উপনীত হবার জন্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রয়াস। ফলে গ্রন্থখানি বাংলা কাব্যজিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য অবদান, যাকে বহু ছান্দসিকই স্বীকার করে নিয়েছেন এবং যাকে অবলম্বন করে এপর্যন্ত বহু ছাত্রছাত্রীই পরীক্ষাসমুদ্র পার হয়েছে।

দিলীপকুমার ছন্দশিক্ষায় প্রথম পাঠ নেন শ্রীঅরবিন্দের কাছে এবং মাধ্যমিক পর্যায়েও তাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা, পত্রালাপ ইত্যাদির মাধ্যমে নিজের খটকা দূর করে নিয়েছেন। আর পত্রালাপ করেছেন শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেনের সঙ্গে, যাঁকে তিনি এ-যুগের ছান্দসিকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য করেন।

প্রবোধচন্দ্রের সঙ্গে সকল ক্ষেত্রে দিলীপকুমার একমত হতে পারেননি, আর পারেননি একমত হতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে (প্রধানতঃ স্বরবৃত্ত ছন্দের প্রকৃতি নিয়ে)। কিন্তু এই ধরনের মতানৈক্যের ফলেই আসে সূক্ষ্মতা, যা শাস্ত্রকে বিশেষ মর্যাদা দান করে। দিলীপকুমারের ছান্দসিকী বাংলা ছন্দের মূলসূত্রনির্ধারণের ক্ষেত্রে সূক্ষ্মতার পথ যে প্রশস্ত করেছে তাতে কোন সন্দেহই নেই।

তবুও কিন্তু দিলীপকুমার অভিনবের পথ যে সব সময় খোলা থাকে তা স্বীকার করেছেন, কারণ তা না হলে আনন্দের বিকাশ হয় না। এই আনন্দই কাব্যপাঠের মূললক্ষ্য—একে কাব্য-রসাস্বাদনও বলা যায়। ছান্দসিকের কাজ হ'ল পাঠককে এই রসাস্বাদনে সহায়তা করা এবং কবিদেরও কলাকৌশল-সম্পর্কিত প্রকৃত চারু-শিল্পের (শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় artistry of technique)-এর সন্ধান দেওয়া। তবে কলা-কৌশলের ওপর বেশী দৃষ্টি দিলে রস ক'মে যেতে পারে যেমন সুইনবার্নের শেষ জীবনের কয়েকটি কবিতায় তাই হয়েছে বলে কোন কোন কাব্য-বিচারকের ধারণা। তাই মধ্যপন্থাই অবলম্বন করতে হবে। দিলীপকুমার কবিদের—এমনকি বর্ষীয়ান কবিদেরও এই নির্দেশ দিতে দ্বিধা করেননি—**শ্রী.**

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব

বেলুড় মঠে গত ১১ই মাঘ (২৫. ১. ৭৩) বৃহস্পবার পুণ্য কৃষ্ণা সপ্তমী তিথিতে পরমপূজ্যপাদ আচার্য শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ মহারাজের শুভ ১১১তম জন্মোৎসব মহানন্দে ও বিপুল উৎসাহ সহকারে বিবিধ অনুষ্ঠানসূচীর মাধ্যমে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

ব্রাহ্মমুহূর্তে শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরে মঙ্গলারতির পর প্রত্যুষে স্বামীজীর মন্দিরে মঙ্গলারতি ও বেদপাঠ দ্বারা উৎসবের শুভ সূচনা হয়। তৎপরে স্বামীজীর ঘরে ভজন হয়। স্বামীজীর মন্দিরে বিশেষ পূজা হোমাদি ও শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ হইয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরেও বিশেষ পূজাদি অনুষ্ঠিত হয়। পূর্বাহ্নে নাটমন্দিরে স্বামী বোধাত্মানন্দ কঠোপনিষৎ পাঠ ও আলোচনা করেন, তৎপরে কালীকীর্তন হইয়াছিল। দ্বিপ্রহরে সমাগত প্রায় ১৪,০০০ ভক্ত হাতে হাতে প্রসাদ গ্রহণ করেন।

অপরাহ্নে মঠ-প্রাঙ্গণে স্বামী চিদাত্মানন্দের সভাপতিত্বে একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। স্বামী লোকেশ্বরানন্দ ইংরেজীতে এবং অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু ও সভাপতি মহারাজ বাংলায় স্বামীজীর বিষয় আলোচনা করেন।

স্বামী সারদানন্দের জন্মোৎসব

উদ্বোধনে শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীতে গত ২৬শে পৌষ (১০.১.৭৩) বুধবার শুভ শুক্লা ষষ্ঠী তিথিতে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম লীলাপার্ষদ শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজী মহারাজের পুণ্য জন্মোৎসব বিশেষ আনন্দ সহকারে বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

পূজ্যপাদ মহারাজের ঘরে ও পার্শ্ববর্তী কক্ষে এবং নূতন বাড়ীর বক্তৃতাগৃহে তাঁহার প্রতিকৃতি পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা সুন্দরভাবে সাজানো হইয়াছিল। মঙ্গলারতি, বিশেষ পূজা, হোম, ভোগরাগ, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, ভজন, জীবনী-আলোচনা প্রভৃতি উৎসবের প্রতিটি অঙ্গ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়।

পূর্বাহ্নে স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ' পাঠ এবং পূজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দজী মহারাজের পুণ্যজীবন আলোচনা করেন।

সকালের দিকে সমস্ত কৃত্যই 'শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী'তে অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যারতির পর নূতন বাড়ীর হলে বহু ভক্ত-সমাবেশে নরেন্দ্রপুর আশ্রম-বালকবৃন্দের 'শ্রীরামকৃষ্ণলীলাগীতি' ও বাউল সঙ্গীত উপভোগ্য হইয়াছিল।

বহু সাধু ও ভক্তের সমাগমে উদ্বোধন-ভবন সারাদিন আনন্দমুখর থাকে। সমাগত ভক্তগণকে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়।

শ্রীশ্রীমায়ের উৎসব

কালিম্পং রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত ২৬শে ডিসেম্বর স্থানীয় অধিবাসীদের উদ্যোগে একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্য জন্মতিথি উদ্‌যাপিত হয়। ঐদিন মধ্যাহ্নে শ্রীশ্রীঠাকুর ও মায়ের ভোগারতির পর সাড়ে তিন শতাধিক নরনারীকে বসাইয়া খিচুড়ি প্রসাদ বিতরণ করা হয়। স্বামী জিনানন্দ শ্রীশ্রীঠাকুর ও মায়ের আরতির পর ভাবগম্ভীর পরিবেশে কয়েকখানি ভজন গান গাহিয়া সমবেত ভক্তমণ্ডলীকে আপ্যায়িত করেন। সারাদিন ধরিয়া আশ্রম উৎসবমুখর থাকে। সন্ধ্যায় আরতির পর আবার

ভজনগান হয়। সকল সম্প্রদায়ের লোকই এই উৎসবে যোগদান করেন।

সেবাকার্য

বাংলাদেশে সেবাকার্য: জানুআরি, ১৯৭৩ পর্যন্ত বাংলাদেশে ৮টি সেবাকেন্দ্রের মাধ্যমে দুঃস্থ-সেবাকার্যে ২৫,০০,৭০৫·৬৩ টাকা ব্যয়িত হইয়াছে; প্রাপ্ত দানসামগ্রীর মূল্য এই টাকার অন্তর্ভূত নহে।

১৯৭২ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত সেবাকার্যের বিবরণ:

ঢাকা: কেন্দ্র কর্তৃক ২,৭৩৮ জন চিকিৎসিত হন এবং বিতরিত হয়: মিল্ক পাউডার ৪,২০০ পাউণ্ড, টিন্ড ফুড ৪ কুইণ্ট্যাল ১'১৭'১৫ কেজি, 'পদ্রবক' শিশুখাদ্য ৩৩৬ বাক্স, কম্বল ৯৭০ খানি, ধুতি ৮৫ খানি, শাড়ি ১,৬৭২ খানি, লুঙ্গি ১৪টি, সোয়েটার ৭৭৫টি, গামছা ৫টি, পুরাতন পোশাক ৩,৭৫৭, মশারি ৫৮টি, জুতা ৬০ জোড়া, সাবান ৮৩ খণ্ড, লিকুইড সোপ ৩০ কেজি। এই কেন্দ্র কর্তৃক ২০০টি বাসোপযোগী কুটীরও নির্মিত হইয়াছে।

বাগেরহাট: কেন্দ্র কর্তৃক ২২টি নলকূপ বসানো হইয়াছে এবং ৩,৭৫৩ জন রোগী চিকিৎসিত হইয়াছেন। বিতরিত দ্রব্যাদি: বিস্কুট ১২ কেজি, বার্লি ৯'৫৩ কেজি, টিন্ড ফুড ৩৭'৭৫ কেজি, কম্বল ২.১৭৭ খানি, ধুতি ২ খানি, শাড়ি ১৫৭ খানি, লুঙ্গি ১৭টি, সোয়েটার ৩৭৮টি, পুরাতন বস্ত্রাদি ৩২৩ খানি, নূতন সার্ট ৭০টি, কোট ১৯৬টি এবং জামার কাপড় ৬৫ গজ।

দিনাজপুর: কেন্দ্র কর্তৃক ৩৮টি কুটীর নির্মিত হইয়াছে এবং ২,১৪০ জন রোগীর চিকিৎসা করা হইয়াছে। বিতরিত দ্রব্যাদি: টিন্ড ফুড ৬'৩০ কেজি, কম্বল ৬২৮ খানি, ধুতি ১৬ খানি, শাড়ি ১,১৭৫ খানি, সোয়েটার ১,৩২৫টি, পুরাতন জামাকাপড় ৮৮৫, পুরাতন কোট ১৮টি, সাবান ৩৯০ খণ্ড, জুতা ৪৬ জোড়া এবং ভিটামিন ট্যাবলেট ১৯,৫২৯টি।

শ্রীহট্ট: কেন্দ্র কর্তৃক ৭৪৩ জন রোগী চিকিৎসিত হন। বিতরিত দ্রব্যাদি: টিন্ড ফুড ৫৫২ টিন, কম্বল ৯১১ খানি, পুরাতন বস্ত্রাদি ১৫০টি।

বাগেরহাট আশ্রমে অনুষ্ঠান

বাগেরহাট: আশ্রমে পুনর্নির্মিত মন্দিরের শুভ উদ্বোধন গত ৫.১.৭৩ সুসম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষে বিশেষ পূজা, প্রসাদবিতরণ, দরিদ্র জনগণকে বস্ত্রবিতরণ, সাধারণ সভা প্রভৃতি অনুষ্ঠান উল্লেখযোগ্য। সভায় বহুজনসমাগম হয়, স্বামী চিদাত্মানন্দ সভাপতিত্ব করেন।

স্বামী সন্তোষানন্দের দেহত্যাগ

গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি, গত ১৪ই জানুআরি রাত্রি ৯-১৫ মিনিটের সময় স্বামী সন্তোষানন্দ রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যার্থী আশ্রমে (বেলঘরিয়া) ৭৮ বৎসর বয়সে হৃদ্‌রোগে দেহত্যাগ করিয়াছেন। পরদিন ১৫ই জানুআরি বেলুড় মঠে তাঁহার মরদেহের শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

স্বামী সন্তোষানন্দ শ্রীশ্রীমায়ের নিকট হইতে মন্ত্রদীক্ষা, স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের নিকট হইতে ব্রহ্মচর্যদীক্ষা এবং ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমায়ের মন্দির-প্রতিষ্ঠার দিন স্বামী সারদানন্দের নিকট হইতে সন্ন্যাসদীক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্বনাম ভরতচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, জন্ম ফরিদপুর জেলার (বর্তমান বাংলাদেশের) বৌল গ্রামে, ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের বৈশাখী পূর্ণিমায়। হাওড়ায় আত্মীয়গৃহে থাকিয়া তাঁহার ছাত্রজীবনের অধিকাংশ অতিবাহিত হয়। হাওড়ায় থাকাকালীনই তিনি বেলুড় মঠের ও শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসিসন্তানগণের সংস্পর্শে আসেন এবং

সেখানকার আরো কয়েকটি যুবকের সঙ্গে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাব-প্রচারে উদ্যোগীও হন। পরে বি. এ. পড়িবার সময় স্বামী শিবানন্দ মহারাজের নির্দেশে ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে রামকৃষ্ণ মিশন কলিকাতা বিদ্যার্থী আশ্রমে ছাত্ররূপে আসেন। এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী নির্বেদানন্দের প্রতি এবং এই প্রতিষ্ঠানটিকে স্বামীজীর ইচ্ছানুরূপ আদর্শ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানরূপে গড়িয়া তুলিবার জন্য তাঁহার ভাবাদর্শ ও জীবনোৎসর্গের সংকল্পের প্রতি এই সময় তিনি গভীরভাবে আকৃষ্ট হন এবং ১৯২০ খৃষ্টাব্দে বি. এ. পরীক্ষার পর শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘে যোগদান করিয়া তাঁহার কার্যের সহায়করূপে বিদ্যার্থী আশ্রমেই রহিয়া যান। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত রামকৃষ্ণ মিশনের এই প্রতিষ্ঠানটিতে থাকিয়া এখানকার 'মানুষ গড়া'র কাজেই তিনি নিজেকে সর্বতোভাবে উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। দীর্ঘকাল স্বামী নির্বেদানন্দের প্রধান সহায়করূপে, ১৯৫০ খৃষ্টাব্দ হইতে সেক্রেটারিরূপে, এবং ১৯৬৭ হইতে ইহার সহ-সভাপতি ও ১৯৭১ হইতে শেষদিন পর্যন্ত ইহার সভাপতিরূপে তিনি সঙ্ঘের সেবা করিয়া গিয়াছেন। ইহা ছাড়া, বেলুড় সারদাপীঠের ও টাকী আশ্রমের সভাপতি এবং রহড়া বালকাশ্রমের সহসভাপতি ছিলেন তিনি।

তাঁহার সাধুজীবন, তাঁহার আদর্শনিষ্ঠা, তাঁহার ভালবাসা বহুজনের হৃদয়ে গভীর ছাপ রাখিয়া গিয়াছে, তাঁহার মৃত্যুঞ্জয় শেষ প্রয়াণও। শেষদিন রাত্রি ৮-৩০ মিনিটের সময় শরীর খারাপ বোধ করেন, তাহার পূর্ব পর্যন্ত সম্পূর্ণ সুস্থ ছিলেন; ৮-৫০ মিনিটের সময় আশ্রমের জনৈক কর্মীকে বলেন, 'ছেলেদের তাড়াতাড়ি খাইয়ে দাও, ১০টার মধ্যেই শরীর যাবে', এবং ইহার অল্প কিছুক্ষণ পরেই বলেন, 'তুমি দিয়ে চলে যাব!' তাঁহার পরই শ্রীশ্রীমায়ের নাম করিতে করিতে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি-অর্পণের জন্য গত ৪ঠা ফেব্রুআরি বেলঘরিয়া বিদ্যার্থী আশ্রমে পূর্বাহ্ণে পূজা-ভজন-প্রসাদবিতরণাদি এবং অপরাহ্ণে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী গম্ভীরানন্দের সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

তাঁহার আত্মা শ্রীশ্রীমায়ের চরণে চিরশান্তি লাভ করিয়াছে।

প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণার দেহত্যাগ

গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি, শ্রীসারদা মঠ ও রামকৃষ্ণ-সারদা মিশন (দক্ষিণেশ্বর)-এর অধ্যক্ষা (প্রেসিডেন্ট) প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণা গত ৩০শে জানুআরি অপরাহ্ণ ২-৫০ মিনিটে ৭৯ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীমায়ের নিকট হইতে তিনি মন্ত্রদীক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী সারদানন্দ তাঁহাকে তন্ত্রমতে অভিষিক্ত করিয়া নাম দিয়াছিলেন শ্রীভারতী। ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে শ্রীশ্রীমায়ের তিথিপূজার দিন স্বামী শঙ্করানন্দের নিকট হইতে তিনি সন্ন্যাস ও প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণা পুরী নাম প্রাপ্ত হন।

তাঁহার পূর্বনাম পারুলদেবী, পিতা রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। বাল্যকালে কলিকাতা বাগবাজারের বোসপাড়া লেনে মাতামহীর গৃহে বাসকালে ১৯০২ খৃষ্টাব্দে তিনি নিবেদিতা বিদ্যালয়ে ভরতি হন, এবং এই সূত্রে স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানগণের বহুজনকে দর্শন করার সৌভাগ্য লাভ করেন। এখানেই ভগিনী সুধীরার ত্যাগ-বৈরাগ্যময় জীবন তাঁহাকে ভগবানলাভের জন্য উদ্বুদ্ধ করে; তাঁহারই সহায়তায় তিনি শ্রীশ্রীমায়ের সান্নিধ্যে আসেন এবং তাঁহারই সহায়তায় ১৯১১ খৃষ্টাব্দে গৃহের সহিত সব সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া সরলাদেবী নামে বহু দিন গোপনে বাস করেন। পরবর্তীকালে এই সরলাদেবী নামেই তিনি সুপরিচিতা। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে শ্রীশ্রীমায়ের সেবার অধিকার পাইয়া তিনি উদ্বোধন, কোয়ালপাড়া প্রভৃতি স্থানে তাঁহার সহিত দীর্ঘকাল বাস করিয়াছেন। শ্রীশ্রীমায়ের দেহত্যাগের পর উদ্বোধনে থাকিয়া গোলাপমা এবং যোগীনমার সেবাও তিনি করিয়াছিলেন। পরে, ১৯২৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত কাশীধামে সাধনভজনে অতিবাহিত করেন।

শ্রীশ্রীমায়ের শতবার্ষিকীর অঙ্গরূপে বেলুড়-মঠের কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীসারদা মঠ নাম দিয়া স্বামী বিবেকানন্দের ঈপ্সিত স্ত্রীমঠ স্থাপিত হইবার সময় তিনিই ইহার প্রথম প্রেসিডেন্ট হন। এই পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া শেষদিন পর্যন্ত তিনি বহুজনকে স্নেহ ও কৃপা বিতরণ করিয়া গিয়াছেন। ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দে তিনি মাদ্রাজে সারদা মঠের ও ১৯৭০ খৃষ্টাব্দে দিল্লীতে রামকৃষ্ণ-সারদা মিশনের শাখাকেন্দ্রের উদ্বোধন করেন। সমীপাগত সকলেরই হৃদয় তাঁহার স্নেহধারায় সিঞ্চিত, তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাবনত হইত।

শ্রীশ্রীমায়ের চরণে তাঁহার আত্মা চিরশান্তি লাভ করিয়াছে।

বিবিধ সংবাদ

বারাসত রামকৃষ্ণ-শিবানন্দ আশ্রমে স্বামী শিবানন্দ মহারাজের ১১৭তম জন্মোৎসব গত ৩১ ডিসেম্বর হইতে আটদিন ধরিয়া অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

প্রথম দিবস উপনিষদাদি পাঠ, বারাসত সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ে রক্ষিত মহাপুরুষজীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান, লীলা-কীর্তন, রামনাম-কীর্তনাদি হয়। ধর্মসভায় স্বামী শিবানন্দের জীবন ও বাণীর বিভিন্ন দিকের বিশদ আলোচনা করেন সভাপতি স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দ, স্বামী অপূর্বানন্দ, স্বামী ব্যোমানন্দ, স্বামী আত্মানন্দ, শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত ও শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার।

অন্যান্য দিবস বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন শিক্ষণ-মন্দিরের পরিচালনায় কুমারসম্ভব ছায়ানাট্য, শ্রীঅতুলকৃষ্ণ চাটার্জির কথায় ও গানে প্রহ্লাদ-চরিত্র, ডঃ গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়ের ভাগবত-ব্যাখ্যা, রামায়ণগান, লোকগীতি, তরজা-গান, ব্রঃ দেবদাসের গীতাব্যাখ্যা, শ্রীসত্যেশ্বর মুখার্জির মুকুন্দদাস-সঙ্গীত, চণ্ডীগীতি-আলেখ্য প্রভৃতি অনুষ্ঠান হয়।

শেষদিন শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভৃতির প্রতিকৃতিসহ এক বিরাট শোভাযাত্রা নগর পরিক্রমা করে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন শ্রীকিরণচন্দ্র ঘোষাল, শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত ও শ্রীহীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। ধর্মসভায় সভাপতি স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, অধ্যাপক শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ ও অধ্যাপক শ্রীঅমূল্য গুপ্ত স্বামী শিবানন্দের মহাপুরুষত্ব, আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। আনন্দোৎসবে উপস্থিত কয়েক হাজার নরনারীর মধ্যে অন্নপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

পাঁচগ্রাম (মুর্শিদাবাদ) শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাশ্রমে ২৬শে ডিসেম্বর শ্রীশ্রীসারদা মায়ের শুভ জন্মতিথি পূজা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে কিছুসংখ্যক দরিদ্রনারায়ণ সহ ভক্তগণ-মধ্যে অন্ন এবং সর্বসাধারণকে ফলমূলাদি প্রসাদ দেওয়া হয়।

রাত্রে ভক্তিমধুকর শ্রীঅশ্বিনীকুমার মণ্ডল মহাশয়ের দল কর্তৃক কীর্তনের মাধ্যমে ভক্তিমূলক যাত্রাগান হয়।

চাঁদপুর (বাংলাদেশ) শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ১লা হইতে ৩রা জানুআরি বিপুল উৎসাহ-উদ্যমে শ্রীশ্রীঠাকুরের শুভ কল্পতরু উৎসব উদ্‌যাপিত হইয়াছে। এই তিন দিবস সকালবেলা বেদ উপনিষদ গীতা ও শ্রীশ্রীচণ্ডী পাঠ, পূজা, বাইবেল কোরান এবং ধম্মপদ সম্পর্কে আলোচনা, বৈকালে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা এবং শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দজীর জীবন এবং বাণী সম্পর্কে আলোচনা হয়। পণ্ডিত শ্রীরাসমোহন চক্রবর্তী মহাশয় প্রত্যহ আলোচনা-সভায় ভাষণ দেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র পাণ্ডে, শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ রায়, শ্রীধীরেন্দ্রচন্দ্র সোম, শ্রীদীনেন্দ্রচন্দ্র দাস এবং সম্পাদক শ্রীবিমলচন্দ্র বসু বক্তৃতা দেন।

প্রত্যহ বহু শত নর-নারীকে লুচি ও হালুয়া প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

এই উৎসবে ঢাকা আশ্রমের সাধু মহারাজগণ যোগদান করেন।

আরিট (হাওড়া) শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব উপলক্ষে গত ২৫শে জানুআরি পূজা, পাঠ, আলোচনাদি অনুষ্ঠিত হয়। ২৬শে জানুআরি স্বামী জীবানন্দ একটি প্রাথমিক

বিদ্যালয়ের ভিত্তিস্থাপনের পর স্বামীজীর বিষয় আলোচনা করেন ; ডক্টর কমলকৃষ্ণ নন্দী এবং অধ্যাপক নিকুঞ্জবিহারী চৌধুরী আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন স্বামী জীবানন্দ।

'সুরবিতান'-এ গত ২৫শে জানুআরি স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব-দিবস পালিত হইয়াছে। সংস্থার শিল্পীরা ভক্তিমূলক সংগীত পরিবেশন ও শ্রীরবীন্দ্র বসু স্বামীজীর বিষয় আলোচনা করেন।

পরলোকে

গভীর দুঃখের সহিত দুইজন ভক্তের পরলোক-গমন-সংবাদ জানাইতেছি।

আশুতোষ দাশ

স্বামী শিবানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিষ্য আশুতোষ দাশ গত ১৭ই জানুআরি পরিণত বয়সে পরলোক-গমন করিয়াছেন। বর্ধমান জেলার কামারকিতা গ্রাম তাঁহার জন্মস্থান। তিনি স্বগ্রামে শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতি স্থাপন করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবপ্রচারে যথাসাধ্য ব্রতী ছিলেন।

কাশীনাথ রায়

শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য কাশীনাথ রায় ৭১ বৎসর বয়সে বাংলাদেশে গত ২রা অক্টোবর, ১৯৭২ শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন। নেত্রকোণা মহকুমার কুতুবপুর গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্রাবস্থাতেই তিনি শ্রীশ্রীমায়ের কৃপালাভে ধন্য হইয়াছিলেন।

ইঁহাদের বিদেহী আত্মা শ্রীরামকৃষ্ণচরণে চিরশান্তি লাভ করুক, এই প্রার্থনা।

উদ্বোধন, ১ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা

(১লা চৈত্র, ১৩০৫)

[পুনর্মুদ্রণ]

('শ্রীরামানুজচরিত'-এর অব্যবহিত পূর্বাংশ পাইবেন কার্ত্তিক, ১৩৭৯-এর ৬০১ পৃষ্ঠায়।)

শ্রীরামানুজ-চরিত

(স্বামী-রামকৃষ্ণানন্দ-লিখিত।)

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

দ্বিতীয় অধ্যায়—শ্রীশ্রীগুরুপরম্পরা-প্রভাব

শ্রীসম্প্রদায়ী কোন বৈষ্ণব যখন...অতএব মহর্ষি অগস্ত্য-উদ্ভাবিত তামিল ভাষায় প্রকৃত ভক্তের যে 'আলোয়ার' নাম দেওয়া হইয়াছে, তাহা যে সর্বতোভাবে সম্যক্ হইয়াছে, ইহা বলা বাহুল্য।*

(ক্রমশঃ)

আমার তিব্বত ভ্রমণের এক পরিচ্ছেদ।†

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

আমাদের সঙ্গী আলেখিয়ারা, বোধ হয়, ভৈরব-ঝুলিধারী ছিল। কারণ, ইহারা কুকুরগণের জন্য ভোজনাবশিষ্ট রুটি রাখিত ; কুকুরগণকে ভৈঁরো বলিত। ইহাদের এক-জনের নাম মহেশ্বরপুরী, অপরের নাম মঙ্গলপুরী। প্রথমটি বৃদ্ধ ও দ্বিতীয়টি যুবক। আমরা অবশ্য ইহাদের চরিত্র-দৃষ্টে সাধারণকে সমুদয় সাধুর সম্বন্ধে একটি হঠাৎ সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিতে বলি না, কিন্তু সত্যের অনুরোধে ইহাদেরও যথাযথ ছবি পাঠকবর্গকে প্রদান করিব। ইহারা কেদারনাথ, বদরিকাশ্রম দর্শন করিয়া মানসসরোবরের দিকে আসিতেছিল। ইহাদের সম্বল বিশেষ কিছুই নাই, গাত্রবস্ত্রাদি অথবা গরম কাপড় কিছু ছিল না বলিলেই চলে। জটা আছে, ভস্ম মাখে, গঞ্জিকাদি প্রায় সর্ব্বপ্রকার নেশাই ইহাদের আছে—মদ পর্য্যন্ত। ইহারা বলিত, আমরা 'শঙ্খিয়া' খাই। শঙ্খিয়া—শেঁকো বিষ—arsenic, ঈশ্বর জানেন, ইহারা তাহা খাইত কিনা, তবে আমার বোধ হয়, অনেক সাধু অল্প অল্প পরিমাণে এই বিষ খাওয়া অভ্যাস করিয়া শরীরকে উত্তপ্ত করিয়া রাখে। ইহারা স্বয়ং পাক করিয়া আহার করিত, স্বপাকে ভোজন করার প্রশংসা করিত ও প্রকারান্তরে মাধুকরী-গৃহীত পকান্ন-ভোজনের নিন্দা করিত। সাধারণ সন্ন্যাসিগণের নিয়ম—তাহারা গৃহস্থের বাটীতে অথবা কোন ভক্ত-প্রতিষ্ঠিত ছত্রে পকান্ন-ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া ভোজন করে ; অবশ্য অনেকেই

* উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ-রচিত "শ্রীরামানুজ-চরিত" গ্রন্থের (৩য় সংস্করণ) প্রথম ভাগ, প্রথম অধ্যায় (পৃঃ ৪-৭) দ্রষ্টব্য।

এখন হইতে পুনর্মুদ্রণ সংক্ষিপ্ত করিবার জন্য আমরা যে-সব প্রবন্ধ পুস্তকাকারে পরে প্রকাশিত হইয়াছে এবং প্রচলিত আছে, সেগুলির শিরোনাম এবং কোন্ পুস্তকের কোথায় তাহা আছে—পুনর্মুদ্রণে কেবল সেটুকুই উল্লেখ করিব। অবশ্য, ক্ষেত্রবিশেষে ইহার ব্যতিক্রম থাকিবে।—বর্তমান সম্পাদক

† স্বামী শুদ্ধানন্দ-লিখিত—বর্তমান সম্পাদক

ব্রাহ্মণ-গৃহে পাইলে অন্য জাতির গৃহে ভিক্ষা করে না। পূর্ব্বোক্ত আলেখিয়ারা সন্ন্যাসিগণের মধ্যে একটু নিম্নপদস্থ—ইহাদিগকে নাগাও বলিয়া থাকে। আমাদের পক্বিত রন্ধন করিলেও ইহারা ভোজন করিত। মহেশ্বরপুরী ততদূর পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জাতিবিচার করিত না, কিন্তু মঙ্গলপুরী করিত। বাঙলা দেশে এই নাগা সন্ন্যাসীই অনেকে আসিয়া থাকে, ইহা হইতেই আমরা সন্ন্যাসি-জীবন সম্বন্ধে একটা সিদ্ধান্ত করিয়া লই, কিন্তু কাশীর দশনামী সন্ন্যাসিগণকে না দেখিলে ভারতে যে সন্ন্যাসি-শক্তি এখনও সঞ্চিত রহিয়াছে, তাহার মহিমা অবগত হওয়া যায় না। কাশীর সন্ন্যাসিগণ অনেকে পণ্ডিত—ভদ্র। ইঁহাদিগকে নাগা সন্ন্যাসিগণের ন্যায় ভাবিয়া হাত দেখাইতে যেন কেহ না যায়। আমি এ উপদেশ অনর্থক লিখিতেছি না। আমার কাশী অবস্থানকালে একটী বাঙ্গালী নূতন কাশীদর্শনে আসিয়া অদ্বিতীয় পণ্ডিত দণ্ডী স্বামী বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতীকে হাত দেখাইতে গিয়াছিলেন। ইহাতে তিনি বড় অসন্তুষ্ট হন। বাঙ্গালী জাতি ভারতীয় অন্যান্য ভারতীয় জাতি হইতে—অন্যান্য জাতির আচার-ব্যবহার হইতে আপনাকে পৃথক্ রাখিয়া আপনার জাতীয়তা হারাইতে বসিয়াছে—বাঙ্গালী জাতির এ বিষয়ে শীঘ্র সাবধান না হইলে আর উপায় নাই। যত কিছু আর্য্যদিগের কীর্ত্তি, যত কিছু আর্য্যজাতির মহত্ত্ব, সমুদয়ই বঙ্গ-বহির্ভূত প্রদেশে দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙ্গালী জাতি যদি বঙ্গ-বহির্ভূত ভারতের প্রদেশসমূহে ভ্রমণ করিয়া অপরাপর ভারতীয় জাতির সদ্গুণ নিজ জীবনে গ্রহণ করিতে কৃতকার্য্য হয়, যদি সমুদয় ভারতীয় জাতিকে এক ভ্রাতা বলিয়া বুঝিতে শিখে, যদি বঙ্গ-বহির্ভূত প্রদেশের ধর্ম্মসম্প্রদায় ও সাধারণ অধিবাসীর আচার ব্যবহারের উৎকৃষ্ট অংশ নিজ-জীবনে পরিণত করিতে পারে, তবেই বাঙ্গালী জাতির পুনরুত্থান সম্ভব। ইহার প্রধান ও সহজ উপায়, দীর্ঘকাল তীর্থ-ভ্রমণ। ইউরোপে বালকগণের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ভ্রমণ ও কার্য্যকরী জ্ঞান-শিক্ষা ব্যতীত সমাপ্ত হয় না, আমাদেরও সেই বিষয় অনুকরণ করিতে হইবে। তবে দুটি চক্ষু বুজিয়া ভ্রমণ করিলে কি হইবে? Evenings at Home-এ Eyes and no eyes শীর্ষক একটী গল্প আছে। তাহাতে এইরূপ বর্ণনা আছে দুইটী বালক এক পথে ভ্রমণ করিয়া আসিলেও এক জনের পক্ষে সেই ভ্রমণ অতি নীরস বোধ হইয়াছিল। অপরকে কিন্তু তাহা অনেক নূতন বিষয় শিখাইয়াছিল। ভারতবাসীর একটী গুণ—সে বাহ্য-দৃষ্টি উপেক্ষা করিয়া অন্তর্দ্দৃষ্টিপ্রিয়। এই অন্তর্দ্দৃষ্টিপ্রিয়তা এত অধিক পরিমাণে অন্য জাতির নাই। কিন্তু সাধারণ ভারতীয়-সমাজ এই অন্তর্দ্দৃষ্টিপ্রিয়তার ভানে বাহ্য জগতের তীব্র পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা একেবারে উপেক্ষা করিয়া থাকেন। এই উপেক্ষা ভারতীয়ের বাহ্য বিষয়ে এতদূর অবনতির কারণ হইয়াছে। ভারতীয়ের শিক্ষা কেবল পুস্তকে—কার্য্যগত শিক্ষা নাই। কবে আমরা কার্য্যকরী শিক্ষাকে আদর করিব? কবে আমরা ইউরোপীয়গণের ন্যায় বাহ্যজগতের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিতে শিখিব?

ইহারা প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে ধুনি জ্বালিয়া থাকে। ধুনি অর্থে কতকগুলি কাষ্ঠ লইয়া অগ্নি-প্রজ্বালন; এই অগ্নি তাহারা সমস্ত রাত্রি জাগাইয়া রাখে। ইহাতে তাহাদের রাত্রে শীতনিবারণ ও ধূমপানের সুবিধা হয়। এই ধুনিকে তাহারা বড় পবিত্র বলিয়া

বিশ্বাস করে। ধুনির নিকট আরতি করে ; আরতির সময় হিন্দীতে মহাদেবের স্তব-পাঠ করিত, এই স্তব অতি মনোহর, বড়ই দুঃখের বিষয়, পাঠকবর্গকে ঐ স্তব উপহার দিতে পারিলাম না।

অতিশয় ভক্তিপূর্ণ সেই স্তব যখন তাহারা সায়ংকালে গান করিত, তখন হৃদয় যে কি অপূর্ব্ব ভক্তি-রসে পরিপূরিত হইত, তাহা কি বলিব? আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের যদি আর কিছুই না থাকে, তাহা হইলেও এই ভক্তি-সঙ্গীতসমূহ চিরকাল জাতীয় জীবনে তাহাদের পূর্ণ প্রভাব বিস্তার করিবে। আরও, মহাদেবের সহিত যেন হিমালয়ের একটী স্বাভাবিক সম্বন্ধ আছে। পর্ব্বতের ধীর গম্ভীর অভ্রভেদী শৃঙ্গের গাম্ভীর্য্যময় সৌন্দর্য্য আর যোগাসনোপবিষ্ট মহাদেব যেন একজাতীয়। এখানে মহাদেবের স্তব-শ্রবণে যেন সেই কুমারসম্ভবের—"অবৃষ্টিসংরম্ভমিবাম্বুবাহমপামিবাধারমনুত্তরঙ্গং অন্তশ্চরাণাং মরুতাং নিরোধান্নিবাতনিষ্কম্পমিব প্রদীপম্"—(অন্তর্ব্বর্ত্তী প্রাণনিরোধবশতঃ মহাদেব বৃষ্টি-আরম্ভের পূর্ব্বকালীন জলধরতুল্য, তরঙ্গরহিত জলাশয়তুল্য ও বায়ুরহিত-স্থান-রক্ষিত প্রদীপবৎ প্রতীয়মান হইতেছেন।) বর্ণনা মনে পড়ে। যে জাতির শ্রেষ্ঠ কবি এই মহাদেবের বর্ণনা করিয়াছেন, সে জাতির আধ্যাত্মিক কোন ভাবনা নাই। সেই হিমালয়ের নিস্তব্ধতার মধ্যে মহাদেবের স্তব পরম রমণীয়, গভীরভাবোদ্দীপক—প্রাণের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে অপূর্ব্ব শক্তি-সঞ্চারক। সাধকগণ, সাধনের পূর্ণতা করিতে চাহ ত, একবার হিমালয় পর্ব্বতে গমন করিও—সার্থক হইবে।　(ক্রমশঃ)

পরমহংসদেবের উপদেশ

(স্বামিব্রহ্মানন্দ প্রদত্ত)

(১) যেমন গ্যাসের আলো একস্থান হ'তে এসে সহরের নানা স্থানে নানাভাবে জ্বল্‌ছে, তেমনি নানাদেশের নানা জাতের ধার্ম্মিক লোক সেই এক ভগবান্ হ'তে আসছে।

(২) লোহা যদি একবার স্পর্শমণি ছুঁয়ে সোনা হয়, তাকে মাটীর ভিতর চাপা রাখ, আর আঁস্তাকুড়ে ফেলে রাখ, সে সোনা। যিনি সচ্চিদানন্দ লাভ করেছেন, তাঁর অবস্থাও সেই রকম। তিনি সংসারেই থাকুন, আর বনেই থাকুন, তাহাতে তাঁহার দোষ স্পর্শ করে না।

(৩) যেমন লোহার তলোয়ার স্পর্শমণি ছোঁয়ালে সোনার তলোয়ার হয়, আকার প্রকার সেই রকমই থাকে, কিন্তু তাতে আর হিংসার কাজ চলে না, সেই রকম ভগবানের পাদপদ্ম স্পর্শ করলে তার দ্বারা আর কোন অন্যায় কাজ হয় না।

(৪) ছাতের উপর উঠতে হলে মই, বাঁশ, সিঁড়ি ইত্যাদি নানা উপায়ে যেমন উঠা যায়, তেমনি এক ঈশ্বরের কাছে যাবার অনেক উপায় আছে। প্রত্যেক ধর্ম্মই এক একটী উপায়।

(৫) ঈশ্বর এক, তাঁর অনন্ত নাম ও অনন্ত ভাব। যার যে নামে ও যে ভাবে ডাকতে ভাল লাগে, সেই নামে ও সেই ভাবে ডাকলে দেখা পায়।

(৬) মার পাঁচটী ছেলে আছে। তিনি কাহাকেও খেলনা. কাহাকেও পুতুল, কাহাকেও বা খাবার দিয়ে ভুলিয়ে রেখে দিয়াছেন। তার মধ্যে যে ছেলেটী খেলনা ফেলে দিয়ে মা কোথায় বলে কাঁদে, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাকে কোলে নিয়ে ঠাণ্ডা করেন। হে জীব! তুমি কামিনী, কাঞ্চন নিয়ে ভুলে আছ। এসব ফেলে দিয়ে যখন ঈশ্বরের জন্য কাঁদবে, তখন তিনি এসে তোমায় কোলে করে নেবেন।

ঝালোয়ার দুহিতা।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কবিবর গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত।

শত্রু-সৈন্য বিমুখ করিয়া, যে দিকে হরিনাম হইতেছে, দ্রুতপদে রাণা সেই দিকে চলিলেন। যথায় হরিনাম উন্মাদিনী মীরা, তথায় উপস্থিত হইলেন। মীরা সাষ্টাঙ্গে রাণার পদতলে প্রণাম করিলেন। রাণাকে দেখিয়া অম্বা, বম্বা সসম্ভ্রমে কহিলেন, "রাণা", রাণা কহিলেন, "মীরা! তোমার আবার একি নূতন লীলা? একা কত লোককে প্রেম বিলাইবে?" মীরা উত্তর করিলেন; "মহারাণা! এ নূতন কি? আমি ত হরিনাম করিয়া থাকি।" " ভাল, ভাল, চল, বৈরাগীরা অনাথ হইয়া শয্যায় শুইয়া থাকে, তোমার প্রতীক্ষা করিতেছে, চল, তোমাকে লইয়া যাই!" মীরা বলিলেন, "মহারাণা! বৈরাগীরা কাহারও প্রতীক্ষা করে না। কৃষ্ণে তাঁহাদের মন আকৃষ্ট হইয়াছে, কৃষ্ণ ভিন্ন তাঁহারা আর কিছুই জানেন না।" রাণা কহিলেন, "মীরা! তোমার কলঙ্ক হইতেছে, তুমি বুঝনা. নিষ্কলঙ্ক কুলে তুমি কলঙ্ক অর্পণ করিতেছ, তোমার বুঝা উচিত, রাজকুলে কলঙ্ক অর্পণ করিও না। তোমার নিকট প্রতিশ্রুত আছি, কখনও জোর করিয়া কোন কথা কহিব না। হরিনাম করিবে, কর; বৈষ্ণব-সেবা করিবে, কর; যত অর্থ চাও, দিতেছি, সুযোগ্য লোক নিযুক্ত করিতেছি, স্বয়ং তত্ত্বাবধান করিব, প্রতিজ্ঞা করিতেছি, তোমার প্রেমে বঞ্চিত হইয়াছি, তাহাও সহ্য করি, কিন্তু এ কলঙ্ক, এ দুর্নাম আমার সহ্য হয় না। একাকী রমণী, পুরুষের সহিত রজনী-যাপন কর, এ তোমার ভাল নয়!" মীরা উত্তর করিলেন, "মহারাণা! কলঙ্কিনীকে দূর করিয়া দিন! বৈষ্ণব-সেবায় অভাগিনীকে বঞ্চিত করিবেন না।" রাণা কহিলেন, "তুমি রাজরাণী, তোমাকে রাজরাণীর মত রাখিব, রাণাবংশীয় রাণীকে কখনও চন্দ্র সূর্য্য দেখে না, তোমাকেও কেহ দেখিবে না!" মীরা উত্তর করিলেন, "মহারাজ! বন্দী করুন, কৃষ্ণ আমার বন্ধন মোচন করিবেন! কৃষ্ণের ইচ্ছায়, বৈষ্ণব-সেবায় কেহ আমায় বঞ্চিত করিতে পারিবে না।" রাণা কহিলেন, "বুঝিব!" মীরা গৃহাভিমুখে ফিরিলেন! রাণার ইঙ্গিতে কয়জন প্রহরী তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। বিষণ্ণ-চিত্তে, বীর-পদ-সঞ্চালনে মীরা প্রেম-বঞ্চিত রাজপুত, ঝালোয়ার রাজকুমারী বিশ্রাম মন্দির অভিমুখে চলিলেন! পর্ব্বতোপরি সুরম্য মন্দির, কিশোরী দাসদাসী-পরিবেষ্টিতা. কিন্তু মীরাকে

কেহ কখনও তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনে নাই, অপহৃতা হইয়া কয়দিন আহার করেন নাই! কয়দিন পরে বিনা অনুরোধে আহার করিলেন। দিবসে নিদ্রা যান, রজনীযোগে সুসজ্জিত হইয়া গবাক্ষদ্বারে দাঁড়াইয়া মন্দার অভিমুখে চাহিয়া থাকেন, লক্ষ্য করিলে মন্দারে একটি আলো জ্বলিতেছে, দেখা যায়, সেই আলোর প্রতি লক্ষ্য করিয়া থাকেন।

মন্দার পর্ব্বতের আলোক একটি অপূর্ব্ব প্রেম-সঙ্কেত। কিশোরী নির্জ্জন গৃহে সমস্ত রাত্রি একটা আলো জ্বালিয়া বসিতেন, মনে মনে ভাবিতেন, মন্দার পর্ব্বত হইতে কি এ আলো দেখা যায়? না জানি, নিরাশ রাজকুমার কি করিতেছেন, তিনি কেমন আছেন, এ শক্রপুরে আসিয়া কিশোরীকে কে সংবাদ দিবে? তিনি যে রাজকুমারকে ভুলেন নাই, দিবারাত্রি তাঁরই ধ্যানে নিযুক্ত থাকেন, তাহা কি রাজকুমার জানে? একদিন দেখেন, দূরে একটা আলো, রাজকুমারী একবার ভাবিলেন, বুঝি তাঁহার গৃহে আলো দেখিয়া কুমার আলো জ্বালিয়াছে। আলো কখন উজ্জ্বল, কখন ক্ষীণজ্যোতি, যেন কুমারের হৃদয়ের আশা, নৈরাশ্য প্রকাশ করিতেছে। আবার ভাবিলেন, কুহকী আশা, কেন প্রবঞ্চনা কর? কুমার এতদিন ভুলিয়া গিয়াছেন, অপর কোন আলো দেখিতেছি। কিন্তু সে আলো নিত্যই দেখিতে পান, তাঁহার ঘরে জ্বলিলেই জ্বলে, ও কি কুমারের গৃহের আলো? কিশোরীর অনুমান সত্য, সত্যই বীরেন্দ্র সিংহ আলো জ্বালিয়াছেন, যখন মন্দার রাজকুমার রুগ্ন শয্যায়, উল্লিখিত চোহান কবি ধন্নু তাঁহার শুশ্রূষায় নিযুক্ত থাকিত। রাজকুমার তাঁহাকে সখা বলিতেন, ভাদ্র মাসের কৃষ্ণ চতুর্দ্দশীর রজনী, বীরেন্দ্র সিংহকে ধন্নু দেখাইল, ঐ দেখ, কুম্ভমীরে আলো জ্বলিতেছে, ঐ ঘরে তোমার কিশোরী বন্দী, কাহারও সহিত আলাপ করে না, একাকিনী সমস্ত রাত্রি আলো জ্বালিয়া বসিয়া থাকেন, শুনিবামাত্র কুমার নিজ গৃহে একটী বৃহৎ আলো জ্বালাইলেন. সকলেই সেই আলো দেখিত, কিন্তু কেহ তাহার মর্ম্ম বুঝিত না, একদিন প্রকাশ পাইল ;—

কিশোরীর মনস্তুষ্টির নিমিত্ত তাঁহার মন্দিরে সুকণ্ঠ গায়িকা আসিয়া গীত শুনাইত; তিনি কর্ণপাতও করিতেন না, একদিন একজন গাহিল ;—

গীত।

মেঘ—ধামার।

ক্ষীণ আলোক নেহারি, নিবিড় আঁধার বারি।

ঘোর পবন বহে আলোক-হারী, হেরি হেরি আশা ক্ষীণ আলোক হেরি

আশানল জ্বলে জ্বলে ধিকি ধিকি তাপ ভারি, তবু হেরি দহে তাপ ভারি।

নিবিড় বিরহ মেঘজাল, হাহারব কঠোর কুলিশ করাল,

চমকি চমকি নিভে চপলা চিত চঞ্চলা ঘন-হৃদি-বিহারী।

দিন বহে, কত সহে, সন সন সমীরণ বহে, নিরাশ ভাব কহে;

ক্ষীণ আলোক দহে, সহি সহি, দহি দহি, তবু হেরি, পারি হারি।

কিশোরী ব্যগ্র হইয়া গান শুনিতে লাগিলেন, রাণা গান শুনিলেন, দেখিলেন, দূর মন্দারপর্ব্বতে আলো জ্বলিতেছে, গানের অর্থ কিশোরী ও রাণা উভয়েই বুঝিলেন। রাণা

গায়িকার নিকট শুনিলেন যে, এক ব্যক্তি গায়িকাকে ঐ গানটী শিখায় ও কিশোরীর মন্দিরে গাইতে উপদেশ দিয়া বলে যে, রাণা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইবেন ও বিস্তর পারিতোষিক দিবেন। সেই ব্যক্তির অঙ্গুরী গায়িকার হস্তে, রাণা দেখিলেন, বহুমূল্য অঙ্গুরী। রাণা ও কিশোরী উভয়েই বুঝিলেন, উপদেষ্টা মন্দার রাজকুমার। তদবধি কিশোরী সেই আলোর প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া প্রাণেশ্বরের ধ্যানে রজনী যাপন করেন। (ক্রমশঃ।)

আচার্য্য শঙ্কর ও মায়াবাদ।

(পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ লিখিত*।)

দেশের শিক্ষিত ও তত্ত্বজিজ্ঞাসু সম্প্রদায়ের মধ্যে বেদান্তশাস্ত্রের অনুশীলন দেখিলে মনে একটী নূতন আশা জাগিয়া উঠে, আশা কেন জাগিয়া উঠে তাহা বলি,—

হিন্দু-সমাজের গঠন-প্রণালীর প্রতি ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, অন্যান্য জাতির ন্যায় আমাদের ধর্ম্ম ও সমাজ পৃথক্ নহে, সমাজ ও ধর্ম্ম বলিলে ইউরোপ ও আমেরিকায় যাহা বুঝায়, তাহা হইতে আমাদের ধর্ম্ম ও সমাজ অত্যন্ত বিভিন্ন প্রকারের। বর্ত্তমান শতাব্দীর ইউরোপ ও আমেরিকার খ্রীষ্টিয়ানগণের সহিত খৃষ্টধর্ম্মের যে প্রকার সম্বন্ধ, তাহা দেখিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, খৃষ্টধর্ম্ম খৃষ্ট-সমাজের অংশ হইলেও এজগতের অনেক কার্য্য প্রতিদিন সাধন করিতে গিয়াও প্রকৃতপক্ষে আধুনিক খৃষ্টীয় সমাজ খৃষ্টধর্ম্মের কোন অপেক্ষা রাখে না। বর্তমান খৃষ্টধর্ম্ম একেবারে নষ্ট হইয়া গেলেও উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপ বা আমেরিকার খৃষ্টীয় সমাজসকলের কোন বিশেষ ক্ষতি হয়, তাহা বোধ হয় না। রোমান্ ক্যাথলিক ও প্রোটেষ্টাণ্ট যাজকগণের মধ্যে মতের অনৈক্য আছে বলিয়া বিলাতের খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ের কোনপ্রকার সামাজিক উন্নতির স্রোত প্রতিরুদ্ধ হইয়াছে, এমন বোধ হয় না।

রাজনৈতিক একতাই যাহাদের সমাজ-শরীরের মেরুদণ্ড—ধর্ম্ম-বন্ধন শিথিল হইলেও তাহাদের সামাজিক উন্নতি প্রতিরুদ্ধ হয় না। ভারতের ভাগ্যে কিন্তু বিধির লিখন অন্যরূপ। রাজনৈতিক একতা এদেশে কোনদিন ছিল না, এখনও নাই, কোনদিন যে হইবে, সে আশাও বড় কম। রাজনৈতিক একতার সহিত আমাদের সমাজ কোনদিন সংশ্লিষ্ট ছিল না। পারলৌকিক বিশ্বাসের সুপ্রশস্ত ও উর্ব্বরা ক্ষেত্রে ধর্ম্মস্বরূপ সুদৃঢ় মূলকে আশ্রয় করিয়া হিন্দুসমাজ জগতে বিকাশ পাইয়াছে। সেই মূলের বলেই এখনও দাঁড়াইয়া আছে। যদি কখনও আবার ফলবান হয়, তাহাও সেই ধর্ম্মরূপ মহামূলের উপরেই নির্ভর করিবে, তাহাও স্থির। এই ধর্ম্ম-মূলের জীবনী-শক্তি যখনই কালবশে ক্ষীণ হইয়া পড়ে, আমাদের সমাজও সেই সময় একান্ত দুর্ব্বল হয় এবং অবশেষে আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া পড়ে। বৌদ্ধধর্ম্মের অতি বিস্তারের ফলে যে সকল অগণ্য উপধর্ম্ম ভারতকে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছিল, কাপালিক অঘোরী প্রভৃতি দুরন্ত সম্প্রদায়ও যখন ভয়, বিস্ময় অথচ সম্মানের বিষয় হইয়াছিল, বিভিন্ন প্রকার বিশ্বাসের বলে পরিচালিত হইয়া বিবেকহীন ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়সকল যখন স্বজাতির বিদ্রোহ সাধন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া আমাদের সামাজিক ধ্বংসের পথকে প্রশস্ত করিতেছিল,

সেই ভীষণ দুর্দ্দিনে আমাদের সমাজ শাঙ্করদর্শনের উজ্জ্বল আলোকের সাহায্যে আবার নিজের গন্তব্যপথ দেখিতে পাইয়াছিল এবং উন্নতির মনোহর ফল পাইবার জন্য ন্যায্যরূপে সেই পথকে একমনে অবলম্বন করিতে সক্ষমও হইয়াছিল।

বৌদ্ধবিপ্লবের দিন আমাদের সমাজে যে বিপদ আসিয়াছিল, তাহা অপেক্ষা এখনকার সামাজিক বিপদ অধিক বলিয়া বিশ্বাস হয় না। যে বেদান্তের প্রকৃত অনুশীলনের ফলে বৌদ্ধবিপ্লবের চিতাক্ষেত্রে শয়ান হইয়াও আমাদের সমাজ পুনর্ব্বার সবলে দাঁড়াইতে পারিয়াছিল, হিন্দুসমাজের গৌরবোদ্ভাসিত ধর্ম্ম আবার সম্মানের সহিত সকল জাতির মধ্যে আলোচিত হইয়াছিল, হিন্দুসমাজের গন্তব্যপথের একমাত্র আলোক বেদান্ত দর্শন যদি এদেশে আবার নিজের প্রকৃত প্রভা বিকীর্ণ করিতে সক্ষম হয়, অনেকের বিশ্বাস, তাহা হইলে এই অধঃপতিত সমাজের আবার সুখের দিন ফিরিয়া আসিবে, ইহা স্থির।

তাই বলিতেছিলাম, আমাদের দেশে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বেদান্তচর্চ্চা বড়ই আশার অবলম্বন বলিয়া বোধ হয়। ভীষণ সামাজিক সংঘর্ষের প্রজ্বলিত অগ্নিক্ষেত্রে অমৃতধারার প্রবাহ বহাইয়া যে বেদান্তদর্শন হিন্দুসমাজের জীবনী শক্তিকে জাগাইয়া দিয়াছিল, সেই বেদান্ত-দর্শনের আলোচনার জন্য দেশের শিক্ষিত সদম্প্রায়ের বর্ত্তমান ঔৎসুক্যকে আশার ধন বলিতে আপত্তি করা অপেক্ষা মানিয়া লইলে বোধ হয়, অনেকের অন্তরাত্মা অধিক পরিমাণে পরিতোষ লাভ করে।

এইসকল ভাবিয়া ও বেদান্তদর্শনের আলোচনা করিতে দিন দিন দেশের উৎসাহ বাড়িতেছে দেখিয়া —আশা আরও জাগিয়া উঠে—উল্লাসের সহিত বেদান্তদর্শনের আলোচনা করিবার জন্য মনঃ দৃঢ়সংকল্প হইয়া উঠে। সুতরাং, এ প্রকার অবস্থায় বেদান্তদর্শনের সর্ব্বস্ব মায়াবাদ সম্বন্ধে বিস্তৃত অনুশীলন যে লোকের প্রিয় হইবে, তাহা অনেক পরিমাণে আশা করা যায়।

মায়াবাদের নিগূঢ়তত্ত্বের মধ্যে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে মায়াবাদ-প্রচারক আচার্য শঙ্করের জীবনবৃত্তের অনুশীলন বিশেষ প্রয়োজনীয়। মায়াবাদ আচার্য্য শঙ্করের কল্পনা-কাননের মহাসৌরভময় কুসুম না হইতে পারে—অতি প্রাচীন বৈদিক ঋষিমণ্ডলীর বিশাল হৃদয়াকাশে ধ্রুবনক্ষত্রের ন্যায় মায়াবাদ শান্তিময় কিরণ বর্ষণ করিত, একথাও বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে —উপনিষদের পবিত্র বর্ণমালায় অপরিস্ফুট মায়াবাদ, আচার্য্য শঙ্করের মায়াবাদের মূলও হইতে পারে।

তথাপি এক্ষণে যে মায়াবাদের আলোচনার জন্য সকল দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় বিশেষ প্রযত্ন করিতেছেন, সে মায়াবাদের সঙ্গে আচার্য শঙ্করের সম্বন্ধ এতই ঘনিষ্ঠ ও এত অনুশীলনার্হ যে মায়াবাদের আলোচনার পূর্ব্বে আচার্য্য শঙ্করের পবিত্র চরিত্র বিষয়ে আলোচনা না করিলে মায়াবাদের প্রকৃত লক্ষ্য বুঝিতে পারা অসম্ভব হইয়া পড়ে।

---

* ইনি পূর্ব্বে কাশীর দ্বারভাঙ্গা মহারাজার সংস্কৃত কলেজে দর্শনের অধ্যাপক ছিলেন, অধুনা, সংস্কৃত-কলেজে মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়ের স্থানে স্মৃতির অধ্যাপক।

স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী

সন্ন্যাসীর গীত—১৪শ সংস্করণ। স্বামীজী-রচিত 'Song of the Sannyasin'-নামক ইংরেজী কবিতা ও উহার পদ্যে বঙ্গানুবাদ। মূল্য ২০ পয়সা।

ঈশদূত যীশুখৃষ্ট—৫ম সংস্করণ. ভগবান ঈশার জীবনালোচনা—মূল্য ০·৪০, উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে মূল্য ০·৩৫।

সরল রাজযোগ—৫ম সংস্করণ। স্বামীজী আমেরিকায় তাঁহার শিষ্যা সারা সি. বুলের বাড়িতে কয়েকজন অন্তরঙ্গকে 'যোগ' সম্বন্ধে যে বিশেষ উপদেশ দান করেন, বর্তমান পুস্তক তাহারই ভাষান্তর। মূল্য ০·৬০।

পত্রাবলী—১ম ও ২য় ভাগ। অভিনব পরিবর্ধিত সংস্করণ। প্রায় ১০৫০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। স্বামীজীর বহু অপ্রকাশিত পত্র ইহাতে সংযোজিত হইয়াছে। তারিখ অনুযায়ী পত্র-গুলি সাজানো হইয়াছে; পরিচয়- এবং নির্ঘণ্ট-সংযুক্ত। মনোরম বাঁধাই। স্বামীজীর সুন্দর ছবি-সংবলিত। প্রতি ভাগ মূল্য ৬·৫০; উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে মূল্য ৫৲।

ভারতে বিবেকানন্দ---১৪শ সংস্করণ। আমেরিকা হইতে প্রত্যাবর্তনের পর স্বামীজীর ভারতীয় বক্তৃতাবলীর উৎকৃষ্ট অনুবাদ। ৫১৯ পৃষ্ঠা; মূল্য ৫·০০। উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে মূল্য ৪·৫০।

দেববাণী—৯ম সংস্করণ। আমেরিকার 'সহস্র-দ্বীপোদ্যান'-নামক স্থানে কয়েকজন অন্তরঙ্গ শিষ্যকে স্বামীজী যে-সকল অমূল্য উপদেশ প্রদান করেন, ঐগুলির একত্র সমাবেশ। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি, ২১৪ পৃষ্ঠা; মূল্য—২৲ উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে মূল্য ১·৮০।

শিক্ষাপ্রসঙ্গ—৪র্থ সংস্করণ। শিক্ষা-সম্বন্ধে স্বামীজীর বাণীসকল সংকলিত ও ধারাবাহিক-ভাবে সন্নিবেশিত। ১৮৮ পৃষ্ঠা; মূল্য ১·৭৫।

কথোপকথন—৭ম সংস্করণ। স্বামীজীর ছবিযুক্ত। ডবল ক্রাউন, ১৬ পেজি, ১৪২ পৃষ্ঠা। মূল্য ১·২৫। উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে মূল্য ১·১৫।

মদীয় আচার্যদেব—স্বামী বিবেকানন্দ-প্রণীত; ১১শ সংস্করণ, ৬৪ পৃষ্ঠা। স্বীয় গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনী ও শিক্ষা-সম্বন্ধে আমেরিকাবাসীদের নিকট স্বামীজীর বিবৃতি। মূল্য ০·৭৫; উদ্বোধন-গ্রাহক পক্ষে মূল্য ০·৬৫।

জ্ঞানযোগ-প্রসঙ্গে—বিভিন্ন বক্তৃতার সারসংক্ষেপ—ইংরেজীতে প্রকাশিত Discourses on Jnana Yoga পুস্তকের অনুবাদ। 'স্বামীজীর বাণী ও রচনা' হইতে পৃথক্ পুস্তকাকারে প্রকাশিত। আত্মতত্ত্ব ও বেদান্ত-বিষয়ক বহু কঠিন বিষয় সরলভাবে আলোচিত। 'জ্ঞানযোগ' গ্রন্থ পড়িবার পক্ষে সহায়ক। মূল্য দুই টাকা।

স্বামি-শিষ্য-সংবাদ—(পূর্বকাণ্ড — ১৩শ সংস্করণ; উত্তরকাণ্ড—১১শ সংস্করণ)। শ্রীশরৎ-চন্দ্র চক্রবর্তী প্রণীত। স্বামী বিবেকানন্দের মতামত অল্প কথায় জানিবার উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। স্বামী-জীর জীবিতকালে তাঁহার সহিত প্রশ্নোত্তরচ্ছলে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য-দেশীয় আচার-নীতি, দর্শন-বিজ্ঞানাদি এবং ধর্ম ও সমাজগত সমস্যামূলক নানা বিষয়ের বিশদ আলোচনা। সরস ও হৃদয়গ্রাহী এই সব বর্ণনা সত্যই আনন্দদায়ক। বর্তমান যুগের বহু সমস্যার আদর্শানুগ সমাধানও ইহাতে পাওয়া যাইবে। জীবনতত্ত্ব বিষয়ে এই পুস্তকদ্বয় অমূল্য রত্নের সন্ধান দিবে। ২২০ ও ২১০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য প্রতি কাণ্ড ২·২৫।

মহাপুরুষ-প্রসঙ্গ—১৬শ সংস্করণ। ১৫৪ পৃষ্ঠা। ইহাতে রামায়ণ, মহাভারত, জড়-ভরতের উপাখ্যান, প্রহ্লাদচরিত্র, জগতের মহত্তম আচার্যগণ, ঈশদূত যীশুখ্রীষ্ট, ভগবান বুদ্ধ প্রভৃতি বিষয় আছে। কোমলমতি বালক-দিগের চরিত্রগঠনে ও ভারতীয় সংস্কৃতিতে তাহাদিগকে শ্রদ্ধাবান্ করিতে ইহা বিশেষ সহায়তা করিবে; মূল্য ৩·০০; উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে মূল্য ২·৭০।

প্রাপ্তিস্থান :—উদ্বোধন কার্যালয়, বাগবাজার, কলিকাতা ৩

শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা এবং স্বামী বিবেকানন্দ-সম্বন্ধীয় পুস্তকাবলী

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী ও শিক্ষা-সম্বন্ধে অপূর্ব পুস্তক। স্বামী সারদানন্দ-প্রণীত। দুই ভাগে রেক্সিন-বাঁধাই। মূল্য—১ম ভাগ ১০৲ ২য় ভাগ ১০৲
উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে „ ৯৲ „ ৯'০০
সাধারণ বাঁধাই পাঁচ ভাগে :

মূল্য		উঃ গ্রাঃ পক্ষে
১ম ভাগ	২'৫০	২'২৫
২য় „	৪'৭৫	৪'২৫
৩য় „	৩'৫০	৩'১৫
৪র্থ „	৩'০০	২'৭০
৫ম „	৩'৫০	৩'১৫

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি— ৭ম সংস্করণ। অক্ষয়কুমার সেন-প্রণীত। সুললিত কবিতায় শ্রীশ্রীঠাকুরের বিস্তারিত জীবনী ও অলৌকিক শিক্ষা-সম্বন্ধে এরূপ গ্রন্থ আর নাই। ৬৪০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য—বোর্ড-বাঁধাই ১৫৲, উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ১৪৲।

পরমহংসদেব—ষষ্ঠ সংস্করণ। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু-প্রণীত। সুললিত ভাষায় অল্প কথায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দিব্য জীবনবেদ। ১৪০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য—১'৭৫।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ—১২শ সংস্করণ শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য-প্রণীত। বালক-বালিকাদিগের জন্য সরল ভাষায় লিখিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনী। মূল্য—০'৭০।

শ্রীরামকৃষ্ণ-চরিত — ২য় সংস্করণ। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চৌধুরী-প্রণীত। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাবলীর অপূর্ব সমাবেশ। বোর্ড-বাঁধাই ডিমাই সাইজ। মূল্য—৪'০০।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ— ১৮শ সংস্করণ। সুরেশচন্দ্র দত্ত-সংগৃহীত। ২৬৪ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য—৩৲।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-উপদেশ—স্বামী ব্রহ্মানন্দ সঙ্কলিত। ২২শ সংস্করণ। মূল্য—৭৫ পয়সা। কাপড়ে বাঁধাই ১৲ টাকা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-মহিমা—শ্রীরামকৃষ্ণ-চরিত-মহাকাব্য শ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথির অমর লেখক অক্ষয়কুমার সেনের লেখনী-প্রসূত গ্রন্থ। মূল্য—২'০০।

রামকৃষ্ণের কথা ও গল্প—১৪শ সংস্করণ স্বামী প্রেমঘনানন্দ-প্রণীত। এই সুচিত্রিত সুদৃশ্য সুলভ পুস্তকখানি ছেলেমেয়েদের ধর্মীয় ও নৈতিক জীবনগঠনের সহায়তা করিবে। মূল্য—২'০০।

শ্রীমা সারদাদেবী—৪র্থ সংস্করণ। স্বামী গম্ভীরানন্দ-প্রণীত। শ্রীশ্রীমায়ের বিস্তারিত জীবনীগ্রন্থ। পৃষ্ঠা ৭১০; মূল্য ৮৲।

জননী সারদাদেবী—স্বামী নির্বেদানন্দ-প্রণীত। পৃষ্ঠা ১১০। মূল্য—২'০০।

শ্রীশ্রীমা সারদা—স্বামী নিরাময়ানন্দ-প্রণীত। পৃষ্ঠা ৯৮; মূল্য ১'৫০।

শ্রীশ্রীমায়ের কথা—শ্রীশ্রীমায়ের সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ সন্তানদের 'ডাইরী' হইতে সংগৃহীত সারগর্ভ উপদেশ। সংসারতাপে সান্ত্বনাদায়ক ও অধ্যাত্মরাজ্যে পথপ্রদর্শক। দুই ভাগে সম্পূর্ণ। প্রতি ভাগ—৫'৫০।

মাতৃসান্নিধ্যে—২য় সংস্করণ; স্বামী ঈশানানন্দ-প্রণীত। পৃষ্ঠা ২৫৬; মূল্য ৪৲ টাকা।

যুগনায়ক বিবেকানন্দ স্বামী গম্ভীরানন্দ-প্রণীত। স্বামীজীর অধুনাতন মূল্যবান প্রামাণিক জীবনীগ্রন্থ। তিন খণ্ডে প্রকাশিত। প্রতি খণ্ড ৮৲ করিয়া। একত্র লইলে ২৩৲। উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ২২৲।

স্বামী বিবেকানন্দ—৩য় সংস্করণ, শ্রীপ্রমথনাথ বসু-রচিত। দুই খণ্ডে প্রকাশিত স্বামীজীর জীবনী। ৯৬৩ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য—প্রতি-খণ্ড ৪৲। উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ৩'৬০। দুই খণ্ড একত্র বাঁধাই ৮'৫০।

স্বামী বিবেকানন্দ—১১শ সংস্করণ। শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য-প্রণীত। স্বামীজীর জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনা কথায় বলা হইয়াছে। মূল্য—০'৭০।

বিবেকানন্দ-চরিত—৯ম সংস্করণ। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার-প্রণীত। মূল্য— ১০'০০

পাঞ্চজন্য—স্বামী চণ্ডিকানন্দ-রচিত পাঁচ শতের অধিক সঙ্গীতের সমাবেশ। মাতৃসঙ্গীত, শিবসঙ্গীত, গুরুসঙ্গীত, মহামানব-সঙ্গীত, রামকৃষ্ণ-লীলাগীতি, সারদা-লীলাগীতি ও দেশাত্মবোধক সঙ্গীত। মূল্য—ছয় টাকা।

প্রাপ্তিস্থান :—**উদ্বোধন কার্যালয়**, বাগবাজার, কলিকাতা ৩

উদ্বোধন-প্রকাশিত অন্যান্য পুস্তকাবলী

দশাবতারচরিত—৫ম সংস্করণ। শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য-প্রণীত। এই পুস্তক-পাঠে চরিত-কথার গল্পপ্রিয় পাঠক এবং ভক্তগণ ধর্ম ও ধর্মতত্ত্বের সন্ধান পাইবেন। মূল্য ২'০০।

শঙ্কর-চরিত—শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য-প্রণীত—৫ম সংস্করণ; আচার্য শঙ্করের অদ্ভুত জীবনী অতি সুললিত ভাষায় লিখিত। মূল্য ১৲।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বেদান্ত—স্বামী বিবেকানন্দ প্রণীত। ১৮৯৬ খৃঃ মার্চ মাসে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত বক্তৃতা এবং তৎপরবর্তী প্রশ্নোত্তর ও আলোচনা। বেদান্তের মূলতত্ত্ব অতি স্পষ্টভাবে ব্যক্ত। প্রশ্নোত্তর ও আলোচনায় ভারতীয় কৃষ্টি ও হিন্দুধর্মের মূল ভাব সাহসিকতার সহিত সরলভাবে উপস্থাপিত। পৃষ্ঠা ৫৫; মূল্য এক টাকা।

শিব ও বুদ্ধ—৭ম সংস্করণ। ভগিনী নিবেদিতা-প্রণীত। ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য রচিত সরল ও [illegible] আখ্যান। মূল্য ০'৬৫।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ—শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সর্বপ্রথম অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের সবিস্তার ধারাবাহিক জীবনী। মূল্য—[illegible]।

ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ—৭ম সংস্করণ। স্বামী ব্রহ্মানন্দের [illegible] কথোপকথন এবং পত্রাবলী সংগ্রহ। [illegible] শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু-লিখিত সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা। মূল্য [illegible]।

মহাপুরুষ শিবানন্দ—স্বামী অপূর্বানন্দ-প্রণীত। ৩য় সংস্করণ। [illegible] স্বামী শিবানন্দজীর বিস্তারিত জীবনী। মূল্য—৫'০০।

শিবানন্দ-বাণী—[illegible] ৩য় সংস্করণ। স্বামী অপূর্বানন্দ [illegible]। মূল্য [illegible]।

শ্রীরামানুজ-চরিত—স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ-প্রণীত, ৩য় সংস্করণ, [illegible] পৃষ্ঠা। শ্রীসম্প্রদায়ে প্রচলিত আচার্য [illegible] বিবৃত ভাবানুকারে বাংলা [illegible] আচার্যের জীবদ্দশায় [illegible] এই গ্রন্থে আছে। মূল্য [illegible]।

স্বামী অখণ্ডানন্দ—স্বামী অন্নদানন্দ-প্রণীত। এই পুস্তকে শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্নিধানে, তিব্বতে ও হিমালয়ে, স্বামীজীর সঙ্গে, দুর্ভিক্ষে সেবাকার্য, সেবাব্রতের প্রাণপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতি অধ্যায়ে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্যের পথিকৃৎ স্বামী অখণ্ডানন্দের ধারাবাহিক জীবনী। ডিমাই সাইজ, ৩১০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৪৲।

সাধু নাগমহাশয়—শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী-প্রণীত। ১১শ সংস্করণ। যাঁহার সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন, "পৃথিবীর বহু স্থান ভ্রমণ করিলাম, নাগমহাশয়ের ন্যায় মহাপুরুষ কোথাও দেখিলাম না।"—পাঠক! তাঁহার পুণ্য জীবন-বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া ধন্য হউন। মূল্য ২'০০।

গোপালের মা—স্বামী সারদানন্দ-প্রণীত (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ হইতে সঙ্কলিত)। অতুলনীয়-সাধননিষ্ঠ, পরমভক্ত গোপালের মা-র আদর্শ জীবনের সংক্ষিপ্ত কাহিনী। মূল্য ৫০ পয়সা।

লাটু মহারাজের স্মৃতিকথা—শ্রীচন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়-প্রণীত। ২য় সংস্করণ। শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও ঠাকুরের শিষ্যবর্গ সম্বন্ধে বহু অপ্রকাশিত ঘটনাবলীর সমাবেশ। নিজ জীবনের কঠোর ত্যাগ-তপস্যার কথার অদ্ভুত প্রকাশভঙ্গীতে পাঠকগণ চমৎকৃত হইবেন। মূল্য—৪'০০।

স্বামী তুরীয়ানন্দ—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ-প্রণীত। বাল্যাবধি বেদান্তী এই মহারাজের জীবনের অদ্ভুত ঘটনাবলী-পাঠে চমৎকৃত হইবেন। ৩৪০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য—৩'৫০।

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিষ্যগণের সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত একত্র এই প্রথম প্রকাশিত হইল। দুই ভাগে সম্পূর্ণ। প্রতি ভাগের মূল্য—৫'৫০।

ভগিনী নিবেদিতা—স্বামী তেজসানন্দ-প্রণীত। ইহাতে তাঁহার জীবনের মুখ্য ঘটনাবলীর সম্যক্ আলোচনা রহিয়াছে। ইহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে "ভগিনী নিবেদিতা-স্মৃতি বক্তৃতামালা"র প্রথম বক্তৃতা। মূল্য—১'৫০

-আপনার নিত্য প্রয়োজনে
দীপ্তি লণ্ঠন
এনামেলের বাসন
খাস জনতা
দি ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ
৬৭, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

টসের
চা
এ, টস এণ্ড সন্স
ফোন
২২-৪৭৮৫
কলিকাতা—১
AIR TIGHT

উদ্বোধন, চৈত্র, ১৩৭১

বিষয়-সূচী

বিষয়-সূচী

দিব্য বাণী

অভিসন্ধায় যো হিংসাং দম্ভং মাৎসর্যমেব বা।
সংরম্ভী ভিন্নদৃগ্‌ভাবং ময়ি কুর্যাৎ স তামসঃ ॥৮
বিষয়ানভিসন্ধায় যশ ঐশ্বর্যমেব বা।
অর্চাদাবর্চয়েদ্ যো মাং পৃথগ্‌ভাবঃ স রাজসঃ ॥ ৯

শ্রীমদ্ভাগবতম্, ৩।২৯

(ঈশ্বর আমি জগৎ—এ সবই
ভিন্ন ভিন্ন বস্তুচয়—
এই বোধ যার ভেদদর্শী সে,
অভেদদৃষ্টি সেজন নয়।)
ভেদদর্শী ও ক্রোধী যেই জন
সকাম হইয়া ফলের আশে
করে মোর পূজা আরাধনা আদি
হিংসা দ্বেষ ও দম্ভবশে,
তামস ভক্ত বলি তারে জেনো।

রাজস ভক্ত জানিও তায় —
ভেদদর্শী যে, সকাম, যাহার
ভগবানলাভে লক্ষ্য নাই—
ধন-মান-আদি লাভ-আশে শুধু
পূজে যে আমায় প্রতিমায়।

কর্মনির্হারমুদ্দিশ্য পরস্মিন্ বা তদর্পণম্।
যজেদ্ যষ্টব্যমিতি বা পৃথগ্ ভাবঃ স সাত্ত্বিকঃ ॥ ১০
মদ্ গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্বগুহাশয়ে।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ ॥ ১১
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে ॥ ১২

শ্রীমদ্ভাগবতম্, ৩।২৯

ভেদদর্শন থাকিলেও সেই
ধন-জন আদি নাহি চায়,
ভক্ত যে জন, যজ্ঞাদি করে
শুধু পাপক্ষয়-বাসনায়
ঈশ্বর-প্রীতি লাভ বা কেবল
কর্তব্যের প্রেরণায়—
সাত্ত্বিক সেই ভক্ত জানিবে।

এসব বোধেরও লেশ নাই
ভক্তিতে যার, দেখে যে বিশ্বে
ভগবানকেই সব ঠাঁই—
অভেদদর্শী, ত্রিগুণাতীত সে—
ভালবাসে সে যে অকারণে
শ্রীভগবানেরে ; গঙ্গা যেমন
ছুটে চলে পারাবার পানে
অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ আকারে,
তেমনি তাহার সারা মন
ঈশ-গুণ শোনামাত্রই ছোটে
ছুঁইবারে তাঁর শ্রীচরণ !
যে ভক্তিযোগ নির্গুণ খ্যাত
এই-ই লক্ষণ তার,
অহেতুকী নাম এই ভক্তিরই—
শুদ্ধ-প্রেম-পাথার।

কথাপ্রসঙ্গে

ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

এক ফাল্গুনী পূর্ণিমায় নিখিলের মাধুরী মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া নদীয়ার চাঁদরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন মানুষকে হরিভক্তি শিখাইতে, ভগবৎ-প্রেম দ্বারে দ্বারে বিতরণ করিতে, ঈশ্বরলাভের অপরূপ অমৃতময় মাধুর্যের কথা মানুষকে শুনাইতে, মানুষকে তাহা উপভোগ করিবার পথ দেখাইতে। সর্বোপরি শ্রেষ্ঠভক্তের, জ্ঞানীভক্তের রূপ মানুষের চোখের সামনে তুলিয়া ধরিতে। আনুষ্ঠানিকভাবে সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়াও, জ্ঞানী হইয়াও তিনি ভক্তি-ভক্ত ভাব লইয়া কাটাইয়াছেন লোকশিক্ষার জন্য। ভক্তি তাঁহার বাহিরের প্রকাশ—তাঁহার দেহমনবুদ্ধিতে লোকশিক্ষার জন্য যখনি আমিত্বের প্রকাশ থাকিত, সেই বাহ্যদশার আমিত্ব ভক্তরূপেই আত্মপ্রকাশ করিত। কৃপাবিতরণের সময় অবশ্য সে আমি জগদীশ্বরের আমিত্বের সঙ্গে এক হইত। আর যখন বাহ্যজ্ঞান-শূন্য হইতেন—তখন তাঁহার সেই অন্তর্দশায় সে আমিত্ব মিশিয়া একাকার হইয়া যাইত ঈশ্বরেরও স্বরূপের সঙ্গে - নামরূপের অতীত নির্গুণ নিরাকার সত্তার সঙ্গে—সেখানে ঈশ্বর নাই, জগৎ নাই, ভক্ত নাই, যেখানে সবই একীভূত এক পরমানন্দময় চৈতন্যসত্তায়।

জ্ঞান বা ভক্তি শিখাইবার জন্য লোকশিক্ষার জন্য অবতীর্ণ ঈশ্বরের যে রূপটিই আমরা দেখি না কেন, উভয়ক্ষেত্রেই তাঁহার মধ্যে পৌরুষ, ত্যাগ, বৈরাগ্য প্রভৃতি জাজ্বল্যমান থাকে। এগুলি ছাড়া কোন পথেই ভগবানলাভ হয় না। দুঃখের বিষয়, এই পুরুষসিংহের প্রদর্শিত ভক্তিপথে চলিতে গিয়া অনেক সময় আমরা শরণাগতির নামে, ভক্তির নামে দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দিই—প্রচণ্ড শক্তিমানের প্রশান্তির সঙ্গে শক্তিহীনের জড়ত্বকে এক বলিয়া ভাবি।

আজ তাঁহার আবির্ভাবতিথিতে তাঁহার নিকট প্রার্থনা করি, এই দুর্বলতা কাটাইয়া দিয়া যথার্থ ভক্তিলাভের পথে তিনি যেন আমাদের চালিত করিয়া শ্রীভগবানের চরণতলে পৌঁছাইয়া দেন।

ভক্তি ও ভক্ত

ঈশ্বরকে ভালবাসার নাম ভক্তি। যিনি মনপ্রাণ দিয়া ঈশ্বরকে ভালবাসেন, শ্রীরামকৃষ্ণের কথায় 'ঈশ্বরে যার মন-প্রাণ গত হয়েছে', অর্থাৎ যাঁহার সব চিন্তা, সব কর্ম ঈশ্বরকে কেন্দ্র করিয়া, তিনি-ই যথার্থ ভক্ত। ঈশ্বরের নামজপ, নামগুণগান, রূপের ধ্যান, পূজা, সেবা ইত্যাদি লইয়াই যাঁহার সর্বসময় অতিবাহিত হয়, সাংসারিক কর্তব্যকে যিনি ঈশ্বরের পূজা জ্ঞান করেন, বা তাঁহার তৃপ্তির জন্য, বা তাঁহার দ্বারা চালিত হইয়া করিতেছেন—এইরূপ কোন না কোন ভাবাশ্রয়ে ঈশ্বরের সহিত জড়িত রাখিয়া করেন, ঈশ্বরকে বাদ দিয়া যাঁহার কোন চিন্তা, কোন কর্ম থাকে না, তিনিই যথার্থ ভক্ত। এরূপ ভক্তের সঙ্গ করিলে অপরের মনেও ভক্তির উদয় হয়। দিনরাতের কিছুক্ষণ করিয়া মন-প্রাণ ঈশ্বরকে দিলাম- ঈশ্বর-চিন্তায় বা -সেবায়, জপ পূজা কীর্তনাদিতে কাটাইলাম, আর বাকী সময় ঈশ্বরকে ভুলিয়া মন-প্রাণ ছুটিল বিষয়ের সেবায়,—ইহা ঈশ্বরে মন-প্রাণ গত হওয়া নয়, যথার্থ ভক্তের লক্ষণ নয়।

তাহা হইলে ইঁহাদের কি ভক্ত বলা চলে না? আমাদের বলিবার উদ্দেশ্য তাহা নহে। বলিবার উদ্দেশ্য, ইহা যে আদর্শ হইতে বহুদূরে; যথার্থ ভক্ত হইবার জন্য প্রাথমিক চেষ্টামাত্র, পথে নামামাত্র, তাহা যেন আমরা বিস্মৃত না হই, আদর্শকে আমাদের মনের মতো ছোট করিয়া লইয়া তৃপ্ত না থাকি। কারণ এরূপ করিলে নিজেদের আধ্যাত্মিক অগ্রগতি রুদ্ধ হইবার সমূহ সম্ভাবনা, নিজেদের সংস্পর্শে অপরের ভিতর ভক্তিভাব সঞ্চার করিবার সম্ভাবনাও সুদূরপরাহত। বরং, জপধ্যানাদির সময় ছাড়া অন্য সময় আমাদের আচরণ বিপরীত হইলে ভক্তি ও ভক্ত সম্বন্ধে সাধারণের মনে অবজ্ঞার ভাব আসিবারও সম্ভাবনা। আচরণই মানুষের মনে দাগ কাটে, কথা নয়। তাই বলিবার উদ্দেশ্য, আদর্শ সম্বন্ধে আমরা সর্বদা যেন সজাগ থাকি, আদর্শকে যেন জীবনে ফুটাইয়া তুলিতে পারি। যাঁহাকে আমরা ভালবাসিতেছি তাঁহার যোগ্য সন্তান বা প্রিয়জন বলিয়া যেন পরিচয় দিতে পারি অপরের কাছে।

একথা অতি সত্য যে, ইচ্ছামাত্রই আদর্শকে জীবন-রূপায়িত করা যায় না, জন্মজন্মান্তরের সংস্কার পদে পদে আদর্শের পথ হইতে আমাদের ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করে। কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও অতি সত্য যে, প্রবল ইচ্ছাশক্তি পথের সব বাধা অপসারণ করিতে পারে, আর এই ইচ্ছাশক্তিকে অভ্যাসসহায়ে বিপুলভাবে বাড়ানোও যায়। অধ্যাত্মসাধনায় তাই এত জোর দেওয়া হইয়াছে নিয়মিত অভ্যাসের উপর—নিত্য নিয়মিতভাবে জপ-ধ্যানের মাধ্যমে মন-প্রাণ তাঁহাতে স্থির করিবার চেষ্টার উপর। আন্তরিকভাবে ইহা করিতে করিতেই অন্তরে প্রচ্ছন্ন শক্তি ও আনন্দের উৎস-মুখ খুলিয়া যায়। তখন সম্ভব হয় মনের সব বিপরীত ইচ্ছা দমিত করিয়া সারাদিন সব কাজের ভিতরই ঈশ্বরকে ধরিয়া থাকা, মন-প্রাণ তাঁহার দিকে ফিরাইয়া রাখা। মন আনন্দ চায়। ভগবচ্চিন্তা ছাড়িয়া সে যে এদিক-ওদিক ছুটিতে চায়, সে শুধু যতক্ষণ ভগবচ্চিন্তায় আনন্দের আস্বাদ তেমন পায় না, যতক্ষণ বিষয়ভোগ ও বিষয়-চিন্তাকেই অধিকতর আনন্দদায়ক বলিয়া তাহার মনে হয়; অথবা ঈশ্বরচিন্তায় আনন্দ কিছু পাইলেও তাহার জের মনে বেশীক্ষণ ধরিয়া রাখিতে পারে না। নিয়মিত ঈশ্বরচিন্তা ক্রমে যত গভীরভাবে আমরা করিতে পারি, মন আনন্দ-নিষিক্ত হইতে থাকে তত বেশী, তাহার রেশও মনে মাখানো থাকে তত বেশীক্ষণ ব্যাপিয়া, ক্রমে সর্বক্ষণই। যেমন একগামলা জলকে যদি প্রায় বরফের মতো (শূন্য ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড) ঠাণ্ডা করিয়া দিতে পারি, তাহা হইলে বাহিরের অল্প-স্বল্প উত্তাপ আসিয়া উহাতে লাগিলেও উহাকে তাহা ফুটন্ত অবস্থায় আনিতে পারে না। উহাকে ফুটন্ত অবস্থায় আনিবার জন্য উহার একশো ডিগ্রী তাপ বাড়াইবার মতো উত্তাপের প্রয়োজন হয়। কিন্তু যদি উহা অল্প ঠাণ্ডা বা একটু গরম থাকে, তাহা হইলে দু-দশ-বিশ ডিগ্রী তাপ উঠাইবার মতো উত্তাপ লাগিলেই উহা ফুটিতে থাকে। তেমনি দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাগুলির সংস্পর্শে আসিবার পূর্বেই ঈশ্বরচিন্তার মাধ্যমে আমরা মনকে যত শান্ত, স্থির করিয়া রাখিতে পারি, দৈনন্দিন জীবনে বিপরীত পরিবেশ—কামনা-বাসনা-লোভ-মোহাদি উদ্রেক করিয়া ঈশ্বর চিন্তা হইতে মনকে সরাইয়া লইবার ঘটনাগুলি—ততবেশী বিফল হয় মনকে যথেষ্ট চঞ্চল করিয়া স্ববশে আনিতে। অর্থাৎ যেরূপ হইতে চাই আমরা সেইরূপ হইবার মতো, যথার্থ ভক্ত হইবার মতো ক্ষমতা ততবেশী করিয়া লাভ করি।

শুধু ভক্তিপথেই নয়, সব পথেই ধর্মজীবনলাভের জন্য ইহাই একমাত্র উপায় যে ভাবেই হউক মনকে ভগবানে বা সত্যে স্থির করিবার, অন্তরের শান্ত স্নিগ্ধ নিস্তব্ধতার মধ্যে যত বেশীক্ষণ ও যতবেশী গভীরভাবে পারা যায় ডুবিয়া থাকিবার নিয়মিত অভ্যাস। কর্ম করিবার সময়ও—কর্মারম্ভের পূর্বে ও কর্মশেষে এবং সম্ভব হইলে মাঝেও কয়েকবার অন্তরের এই গভীরতা স্পর্শ করিয়া আসিবার চেষ্টা করিতে হয় প্রাথমিক অবস্থায়। চলার পথে ইহা দিগ্‌দর্শন-যন্ত্রের কাজ করে। এই নিয়মিত অভ্যাসের তারতম্যেই অধ্যাত্মজীবনের গভীরতার তারতম্য ঘটে। এই নিয়মিত অভ্যাস ছাড়া ধর্মজীবনলাভের দ্বিতীয় আর কোন পথ নাই। অবতারগণ, নিত্যসিদ্ধ পুরুষগণ যুগে যুগে আসিয়া নিজেদের জন্য প্রয়োজন না থাকিলেও আমাদের মনে এই কথা দৃঢ়াঙ্কিত করিয়া দিবার জন্যই কঠোর সাধনা (বা তার অভিনয়) করিয়া যান।

অবশ্য যতটুকুই হউক, যে ভাব লইয়াই হউক, ঈশ্বরচিন্তা যে করে, তাহাকেই সাধারণভাবে ভক্ত বলা হয়। ঈশ্বরকে চিন্তা করিতেছে বলিয়াই বলা হয়, কারণ, তাহাই কি সকলে করে? গীতায় ভক্তদের চারভাগে ভাগ করিয়া বলা হইয়াছে, ইহাদের মধ্যে 'জ্ঞানী' ভক্তই শ্রেষ্ঠ ভক্ত। কারণ জ্ঞানী ভক্ত যে ভগবানকে ভালবাসেন, মন-প্রাণ ভগবানে সমর্পণ করেন, তাহা প্রতিদানে কিছু চাহিয়া করেন না—এমনকি ভগবানলাভের আশায়ও না। জ্ঞানী যিনি, নিজেকে ভগবানের সঙ্গে অভেদ বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহার পাওয়ার আর কিছুই বাকী থাকে না, কাজেই চাওয়ারও না। তিনি শুধু ভালবাসিতে ভাল লাগে বলিয়াই ঈশ্বরকে ভালবাসেন। জ্ঞানী ভক্ত ছাড়া আরও তিনপ্রকার ভক্ত হইলেন আর্ত, অর্থার্থী ও জিজ্ঞাসু ভক্ত। আর্তি নিবারণের জন্য —অসুখ-বিসুখ দুঃখকষ্টাদির হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য যাঁহারা ঈশ্বরে ভক্তি করেন, তাঁহারা 'আর্ত' ভক্ত। ইহজগতে ধন-জন-মানাদি বা পরলোক স্বর্গাদি লাভের আশায় যাঁহাদের ঈশ্বর-ভক্তি, তাঁহারা 'অর্থার্থী' ভক্ত। অন্য কোন কিছুর আশায় নয়, কেবল সত্যান্বেষণের প্রেরণায় সত্যলাভের জন্যই যাঁহারা ঈশ্বরে ভক্তি করেন, তাঁহারা 'জিজ্ঞাসু' ভক্ত। জ্ঞানী যিনি তাঁহার এসবের তো কোন প্রয়োজন নাই-ই, সত্য সম্বন্ধে কোন জিজ্ঞাসা, ভগবানলাভের প্রয়োজনও তাঁহার নাই—কারণ তিনি ভগবানকে পাইয়াছেনই, তাঁহার 'সর্বসংশয়' ছিন্ন হইয়াছে। তাই তাঁহার ভক্তি কারণরহিত, প্রতিদান-প্রত্যাশার মালিন্য-বর্জিত—'অহেতুকী', 'শুদ্ধা' ভক্তি। জ্ঞানী ভক্তকে এইজন্যই গীতায় শ্রেষ্ঠ ভক্ত বলা হইয়াছে। ভাগবতে এরূপ ভক্তকে নির্গুণ বা ত্রিগুণাতীত ভক্ত বলা হইয়াছে।

কিন্তু এই জ্ঞানী ভক্তের সংখ্যা, জ্ঞানলাভের পরও লোকশিক্ষার জন্য যাঁহারা ঈশ্বরেচ্ছায় ভক্তি-ভক্ত ভাব লইয়া থাকেন তাঁহাদের সংখ্যা কয়টি?

তথাপি, প্রতি ভক্তকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া চলিতে হইবে এই ভক্তির, এই সর্বোচ্চ আদর্শের দিকে, কোন কিছু না চাহিয়া কেবল ভালবাসার জন্যই ঈশ্বরকে ভালবাসার দিকে; মন-প্রাণ অন্য কোন কিছুর দিকে না চাহিয়া যাহাতে তাঁহাতে গত হয়, তাহার দিকে। চেষ্টা আমাদের আন্তরিক হইলে প্রয়োজনীয় শক্তি তিনিই দিবেন। যিনি শ্রীরামকৃষ্ণরূপে নরেন্দ্রনাথকে বলিয়াছিলেন, 'তোর জন্য আমি যে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করতে পারি,' যিনি শ্রীচৈতন্যরূপে হরিদাসের দেহান্তে তাঁহার মহোৎসবের জন্য সত্য সত্যই পথে অর্থভিক্ষা করিতে নামিয়াছিলেন, সেই ভক্ত-

বৎসল, সেই ভক্তি-প্রিয় আমাদের ভিতর যথার্থ ভক্ত হইবার আন্তরিক চেষ্টা সামান্যও দেখিলে যে সাহায্য করিতে ছুটিয়া আসিবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি ?

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন ঈশ্বরের কাছে জ্ঞান ভক্তি চাওয়া, প্রার্থনা করা দোষের নয়। তাহাছাড়া অন্য কিছু চাহিবার মতো দুর্বলতা যদি বা যখন আমাদের আসে ? প্রথম প্রথম আসাই তো স্বাভাবিক—সিদ্ধ হইয়া তো আমরা সাধনপথে নামি না, সাধনপথে নামিবামাত্র সিদ্ধিলাভও হয় না। আসে আসুক না, হতাশ হইবার কিছুই নাই তাহাতে ; একান্তই যদি কিছু না চাহিয়া থাকিতে না পারি আমরা, তাঁহার কাছেই চাহিব। মা-বাপের কাছে ছেলে তো চায়ই। যারা চায়, তাদেরও তো গীতায় ভক্ত বলা হইয়াছে। তবে জীবনের পরম কল্যাণকে একেবারে ভুলিয়া গিয়া যেন কিছু না চাই, সে বিষয়ে যেন মন সজাগ থাকে। তাহা হইলে ক্রমে এই চাওয়া কমিয়া যাইবে, তাঁহার উপর নির্ভরতা আসিবে। একজনের নিকট অতি সুন্দর একটি কথা শুনিয়াছিলাম, কথাটি মনে গাঁথিয়া আছে : 'মনে যা ইচ্ছা জাগে, মাকে বলি। এমনকি, পায়েস খাবার ইচ্ছে হলেও মাকে (শ্রীশ্রীমাকে) তা জানাই। তিনি তো আপন মা, কেন জানাইব না ? তবে সবসময় তার পর বলি, "মা, আমার তো এরকম ইচ্ছে হচ্ছে কিন্তু এতে যদি আমার অকল্যাণ হয় তাহলে তুমি এ ইচ্ছে পূরণ কোরো না।" অবশ্য, আমরা বলি আর না বলি, তিনি আমাদের যাহাতে কল্যাণ হয়, তাহাই করিবেন। 'ঈশ্বর আমাদের আপনজন, অতি আপনার, জন্মজন্মান্তরের আপন জন ; তিনি যা করেন আমাদের কল্যাণের জন্যই করেন'—এ বোধ যদি স্থির থাকে আমাদের সুখের এবং দুঃখ-কষ্ট-বিপদের সময়ও, তাহা হইলে চাওয়ার ঝামেলা কতক্ষণ আর ভাল লাগিতে পারে ? তাঁহার প্রতি আপনার-বোধ যত আসিবে, এই চাওয়ার উৎপাত তত কমিয়া যাইবে, চরমে আসিবে শরণাগতি। 'তুমি যদি চাও আমার জীবন কষ্টের ভিতর দিয়ে চলুক, আর আমি যদি তার উল্টোটা চাই, তাহলে আর কী ভালবাসলাম তোমাকে ?'—এই হল যথার্থ ভক্তের কথা। শরণাগতিই ভক্তির শেষ কথা, জ্ঞানেরও তাই (অবশ্য ভাষা ভিন্ন)—আমি বা আমার বলিতে আমাদের যাহা কিছু আছে তাহার সব কিছু হইতে সরিয়া না আসিলে ওই শরণাগতি আসে না। শরণাগতের ঈশ্বরাতিরিক্ত অহংবোধও থাকে না—'নাহং নাহং, তুঁহু তুঁহু।' সেখানে কে চাহিবে, কি চাহিবে ?

ভক্তির এই চরম আদর্শকে স্মরণে রাখিয়া চলিলে যথার্থ ভক্তি তিনি দিবেনই একদিন।

ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব*

স্বামী সারদানন্দ

রাখাল মহারাজের—নিকট হইতে প্রাপ্ত :—শশধর-বাড়ীতে ঠাকুর আগে যান। স্বামীজীই তাঁকে শশধরের কাছে নিয়ে যান। শশধরের বক্তৃতাদি শুনে ও ভূধরের সহিত আলাপ থাকায়, স্বামীজী মধ্যে মধ্যে পণ্ডিতের সঙ্গে তর্ক করিতে যাইতেন। তারপর আলমবাজারে বক্তৃতা করতে এসে শশধর দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে দেখতে আসে।

শশী মহারাজের নিকট হতে :—গোপালের মাকে নিরঞ্জনের ভাল মশারি দেওয়া। সমস্ত রাত্রি গোপালের মার ঘুম নেই, পাছে মশারি ইঁদুরে কাটে। ভোরে উঠে মশারি নিয়ে মঠে (বরাহনগর) এসে ফিরিয়ে দেওয়া। গোপালের মা একদিন ভাত রেঁধে পাতে ঢালছেন, পাতা-খানা হাওয়াতে কেবল উড়চে, কাজেই ঢালা হচ্ছে না। এমন সময় একটি ছোট ছেলে এসে পাতাধরা ও গোপালের মার ভাত ঢালা। পরে গোপালের মার মনে হওয়া—ছেলেটি কে? দেখেন—কেউ কোথায় নাই।

যোগীনমার নিকট হইতে প্রাপ্ত : ভাবিনী ঠাকরুণকে

---

* স্বামী সারদানন্দের ডায়েরি হইতে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ষষ্ঠ ভাগ'-এর জন্য সংক্ষিপ্তাকারে লিখিত উপাদানগুলি সংকলন করিয়া 'ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব' নাম দিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহারই অংশবিশেষ এখানে পুনর্মুদ্রিত হইল।—সঃ

বলতেন—"স্বক্তোয় সিদ্ধ—বৈকুণ্ঠের রাঁধুনী"। যোগীনমা প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া একবার যত্ন মল্লিকের বাগানে বেড়াইতে যাওয়া। সেখানে কত গান ও উপদেশ দেওয়া। গোলাপ ঠাকরুণকে সঙ্গে লইয়া (কালীও সেদিন ছিল) বিডন গার্ডেনে তিলক (Masonic Signs) দেখিতে আসা—বেলা ৯টা হবে—সকলের ভারি পিপাসা ও ক্ষুধা পেয়েছে—২পয়সার রসমুণ্ডি কেনা—ঠাকুর সব খেয়ে জল খেতেই সকলের ক্ষুধাশান্তি। গোলাপ ঠাকরুণ মনে করেছিল—একটা দুটো রসমুণ্ডি যা প্রসাদ থাকবে তাই খাবে। তা আর খেতে হোলো না। ঠাকুরের খাওয়াতেই সকলের শান্তি; সকলে অবাক হয়ে মুখ চাওয়াচাওয়ি—শেষ ঠাকুরকে ঐ কথা বলা।

... ...

একবার যোগীনমার মনে বড় অশান্তি। মনে করা 'আজ ঠাকুর যেখানেই থাকুন, গিয়ে পায়ে মাথা খুঁড়বো ও সব বলবো।' ভোরে হেঁটে দক্ষিণেশ্বরে যাওয়া। ঠাকুরকে দেখে—সব ভুল। গোপালের মা সেখানে সেদিন। যোগীনমার বাগানে ফুল তুলা আঁচলে। ঠাকুরের জিজ্ঞাসা, উত্তরের বারান্দায় দেল ঠেস্ দিয়ে দাঁড়িয়ে—'কি নিয়ে যাচ্ছিস্ গো?' যোগীনমার ফুল দেখান ও কাছে এসে পায়ে ফুল দেওয়া। ঠাকুরের ভাব হয়ে (যোগীনমার প্রণাম) মাথায় পা দেওয়া। (গোপালের মা যোগীনমাকে) 'পা বুকে দে'—যোগীনমার 'তদ্রূপ' করা। গদাধরের পাদপদ্মের মত বুক চিহ্ন হয়ে গেছে যে জপ করতে করতে যোগীনমার শুনা ঠাকুরের শরীর যাবার অনেক দিন পরে।

পথে-প্রান্তরে শ্রীরামকৃষ্ণ

[পূর্বানুবৃত্তি]

স্বামী চেতনানন্দ

কলকাতার মানুষগুলোকে দেখলেন তিনি —কিলবিল করছে। সেইসব মানুষকে টেনে তোলবার কাজে তাঁকে ঘুরে বেড়াতে হত কলকাতার পথে, মাঠে, ঘাটে, থিয়েটারে, অলিতে-গলিতে সর্বত্র। পাহাড় যদি মহম্মদের কাছে না যায়, মহম্মদকেই পাহাড়ের কাছে যেতে হবে। এ দায় কার? নিজের দেহ ভুলে কয়জন লোক তিল তিল করে অপরের জন্য দেহপাত করতে পারেন? এ দায় মানুষের নয়। স্বয়ং ভগবানের। শ্রীরামকৃষ্ণের আত্মকথাঃ 'সরকারী লোক—তাঁকে জগদম্বার জমিদারির যেখানে যখনই কোন গোলমাল উপস্থিত হবে সেখানেই তখন গোল থামাতে ছুটতে হবে।' (লী. প্র. ৪।২০৭)

আমরা প্রবন্ধের প্রারম্ভেই ঠিক করে নিয়েছি শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে আমরা বিভিন্ন পথ ধরে বেড়াতে যাব; কিন্তু কোন বাড়ীতে ঢুকব না। কখনও ঘোড়ার গাড়ীর সঙ্গে, কখনও বা রাস্তায় দাঁড়িয়ে দ্রষ্টার মত লক্ষ্য করব দেবমানবের অপূর্ব গতিবিধি। অনিমন্ত্রিত হয়ে কারও বাড়ী যাওয়া দূষণীয় হতে পারে কিন্তু পথ ত সকলের। সেখানে সবাই স্বাধীন। তাই আমরা স্বাধীনভাবে তাঁর পথ-সান্নিধ্য ও পথ-কথাতেই তৃপ্ত থাকব।

এবার আমরা শ্রীম-কথিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতের শরণ নেব ঠাকুরের পথচিত্র ও অমৃতোপম কথা শুনবার জন্য।

৫ই আগস্ট, ১৮৮২

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কলকাতার রাজপথ দিয়ে বাদুড়বাগানের দিকে আসছেন। সঙ্গে ভবনাথ, হাজরা ও মাষ্টার। বিদ্যাসাগরের বাড়ী যাবেন।

গাড়ী দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ী হইতে ছাড়িয়াছে পোল পার হইয়া শ্যামবাজার হইয়া ক্রমে আমহার্স্ট স্ট্রীটে আসিয়াছে। ঠাকুর বালকের ন্যায় আনন্দে গল্প করিতে করিতে আসিতেছেন। আমহার্স্ট স্ট্রীটে আসিয়া হঠাৎ তাঁহার ভাবান্তর হইল; যেন ঈশ্বরাবেশ হইবার উপক্রম।

গাড়ী রামমোহন রায়ের বাগানবাটীর কাছ দিয়া আসিতেছে। মাষ্টার ঠাকুরের ভাবান্তর দেখেন নাই, তাড়াতাড়ি বলিতেছেন, 'এইটি রামমোহন রায়ের বাটী।' ঠাকুর বিরক্ত হইলেন। বলিলেন—'এখন ওসব কথা ভাল লাগছে না।' ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইতেছেন।

ঠাকুর গাড়ী হইতে অবতরণ করিলেন। মাষ্টার পথ দেখাইয়া বাটীর মধ্যে লইয়া যাইতেছেন। উঠানে ফুল গাছ, তাহার মধ্য দিয়া আসিতে আসিতে ঠাকুর বালকের ন্যায় বোতামে হাত দিয়া মাষ্টারকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, 'জামার বোতাম খোলা রয়েছে—এতে কিছু দোষ হবে না?' গায়ে একটি লংক্লথের জামা, পরনে লালপেড়ে কাপড়, তাহার আঁচলটি কাঁধে ফেলা। পায়ে বার্নিশ-করা চটী-জুতা। মাষ্টার বলিলেন, 'আপনি ওর জন্য ভাববেন না, আপনার কিছুতে দোষ হবে না। আপনার বোতাম দেবার দরকার নাই।' বালককে বুঝাইলে যেমন নিশ্চিন্ত হয়, ঠাকুরও তেমনি নিশ্চিন্ত হইলেন।

বাড়ীর ভিতর অনেক সব কথাবার্তা হয়েছিল। পথঘাটের কথাও হয়েছে। 'ব্রহ্ম কি মুখে বলা

যায় না'—একথা বোঝাতে ঠাকুর নুনের পুতুলের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। সমুদ্র মাপতে গিয়ে নিজেই গলে গেল। খবর দেওয়া আর হল না। সমাধিমান পুরুষের কথা বলতে গিয়ে ঘাটপাড়ে মেয়েদের কলসীতে জলভরার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। পুকুরে কলসীতে জল ভরবার সময় ভক্‌ভক্ শব্দ হয়। পূর্ণ হয়ে গেলে আর হয় না।

বিদ্যাসাগর হাতে বাতি নিয়ে ঠাকুরকে তমসাবৃত উদ্যানভূমির মধ্য দিয়ে পথ দেখাতে দেখাতে চলেছেন। ঠাকুর ফটকের কাছে এসে গাড়ীতে উঠলেন। বিদ্যাসাগর গাড়ী-ভাড়া দিতে চাইলেন। নেওয়া হল না। গাড়ী দক্ষিণেশ্বরের দিকে চলল। সকলে গাড়ীর অদর্শন পর্যন্ত রাস্তায় দাঁড়িয়ে। দর্শকের ভাবনা: কে এ মহাপুরুষ?—যিনি ঈশ্বরকে এত ভালবাসেন, আর যিনি জীবের ঘরে ঘরে ফিরছেন আর বলছেন—ঈশ্বরকে ভালবাসাই জীবনের উদ্দেশ্য।

২৭শে অক্টোবর, ১৮৮২

কথামৃতের প্রথম ভাগের প্রথমে শ্রীরামকৃষ্ণের কেশব ও বিজয়াদি ব্রাহ্মভক্তসঙ্গে জাহাজ-ভ্রমণের উল্লেখ আছে। কেশবের সঙ্গে ঠাকুর দুবার জাহাজে ভ্রমণ করেন। প্রথমবার ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ২৩শে ফেব্রুয়ারি। এদিন কেশবের সঙ্গে ছিলেন **Joseph Cook**, আমেরিকান পাদরী **Miss Pigot, Tribune**-সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, কুমার গজেন্দ্রনারায়ণ (কুচবিহারের রাজকুমার), প্রতাপ মজুমদার ও আরও অনেক ব্রাহ্মভক্ত। 'প্রতাপ, কুকসাহেব আমার অবস্থা দেখে বললে, "বাবা! যেন ভূতে পেয়ে রয়েছে।"'

দ্বিতীয়বারের (২৭।১০।৮২) বর্ণনা: জাহাজ কয়লাঘাটে এইবার ফিরিয়া আসিল। সকলে নামিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। ঘরের বাহিরে আসিয়া দেখেন কোজাগরের পূর্ণচন্দ্র হাসিতেছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জন্য গাড়ী আনিতে দেওয়া হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে মাষ্টার ও দু'একটি ভক্তের সহিত ঠাকুর গাড়ীতে উঠিলেন। কেশবের ভ্রাতুষ্পুত্র নন্দলালও গাড়ীতে উঠিলেন, ঠাকুরের সঙ্গে খানিকটা যাইবেন।

গাড়ীতে বসিলে পর ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কৈ তিনি কৈ অর্থাৎ কেশব কৈ?' দেখিতে দেখিতে কেশব একাকী আসিয়া উপস্থিত। মুখে হাসি। আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কে কে এঁর সঙ্গে যাবে?' সকলে বসিলে পর, কেশব ভূমিষ্ঠ হইয়া ঠাকুরের পদধূলি গ্রহণ করিলেন। ঠাকুরও সস্নেহে সম্ভাষণ করিয়া বিদায় দিলেন।

গাড়ী চলিতে লাগিল। ইংরেজ টোলা। সুন্দর রাজপথ। পথের দুইধারে সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা। পূর্ণচন্দ্র উঠিয়াছে। অট্টালিকাগুলি যেন বিমল শীতল চন্দ্রকিরণে বিশ্রাম করিতেছে। দ্বারদেশে বাষ্পীয় দীপ, কক্ষমধ্যে দীপমালা, স্থানে স্থানে হার্মোনিয়ম, পিয়ানো-সংযোগে ইংরেজ মহিলারা গান করিতেছে। ঠাকুর আনন্দে হাস্য করিতে করিতে যাইতেছেন। হঠাৎ বলিলেন, 'আমার জলতৃষ্ণা পাচ্ছে, কি হবে?' কি করা যায়! নন্দলাল ইণ্ডিয়া ক্লাবের নিকটে গাড়ী থামাইয়া উপরে জল আনিতে গেলেন। কাঁচের গ্লাসে জল আনিলেন। ঠাকুর সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'গ্লাসটা ধোয়া তো?' নন্দলাল বলিলেন, 'হাঁ'। ঠাকুর সেই গ্লাসে জলপান করিলেন।

বালকের স্বভাব! গাড়ী চালাইয়া দিলে ঠাকুর মুখ বাড়াইয়া লোকজন, গাড়ীঘোড়া, চাঁদের আলো দেখিতেছেন। সকল তাতেই আনন্দ।

ঠাকুরের উপরোক্ত চিত্রখানিতে কোন মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। কেউ যদি এখন স্ট্র্যাণ্ড রোড, ইডেন গার্ডেন ও আকাশবাণীর সামনে দিয়ে

গড়ের মাঠের পাশ দিয়ে যান, নিশ্চয়ই তিনি মানস চক্ষে দেখবেন যে ৮২ বছর আগে ঠাকুর এ পথ দিয়ে কী ভাবে গিছলেন। তাঁর পথে চলা অনেক মুস্কিল ছিল। তখন ত আর মথুর নেই। ঠাকুরের গাড়ীভাড়া ভক্তেরাই যোগাতেন। সেদিনকার গাড়ীভাড়ার জন্য সিমলের সুরেন্দ্রের বাড়ীতে হাজির হন। কিন্তু তিনি বাড়ীতে না থাকায় জনৈক ভক্তকে বললেন, 'ভাড়াটা মেয়েদের কাছ থেকে চেয়ে নেনা। ওরা কি জানে না, ওদের ভাতাররা যায় আসে।' সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সরল স্বচ্ছ উক্তি আনন্দ ও হাসির ফোয়ারা বইয়ে দিল। তাঁর সরস গল্পগুজব পথে চলার ক্লান্তি দূর করে দিত।

১৫ই নভেম্বর, ১৮৮২

শ্রীরামকৃষ্ণকে এবার আমরা এখন এক জায়গায় দেখব যে সবার বিস্ময় লাগবে। কোন ভক্ত হয়ত একটু মজা করে বলবেন: বাপ রে বাপ! কী শখটাই না ছিল ঠাকুরের! আমরা যেমন দল বেঁধে কোন থিয়েটার বা প্রদর্শনী দেখতে গেলে বন্ধুদের সঙ্গে একটা নির্দিষ্ট জায়গায়, নির্দিষ্ট সময়ে দেখা করি, ঠাকুরও ঐরূপ করছেন। সম্পূর্ণ ছবিটা আমরা 'কথামৃত' থেকে তুলে ধরছি:

শ্রীরামকৃষ্ণ শ্যামপুকুর বিদ্যাসাগর স্কুলের দ্বারে গাড়ী করিয়া আসিয়া উপস্থিত। বেলা তিনটা হইবে। গাড়ীতে মাষ্টারকে তুলিয়া লইলেন। গাড়ী ক্রমে চিৎপুর রাস্তা দিয়া গড়ের মাঠের দিকে যাইতেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ আনন্দময়—মাতালের ন্যায়—গাড়ীর একবার এধার একবার ওধার মুখ বাড়াইয়া বালকের ন্যায় দেখিতেছেন। মাষ্টারকে বলিতেছেন, 'দেখ, সব লোক দেখছি নিম্নদৃষ্টি, পেটের জন্য সব যাচ্ছে, ঈশ্বরের দিকে দৃষ্টি নাই!'

শ্রীরামকৃষ্ণ আজ গড়ের মাঠে উইলসনের সার্কাস দেখিতে যাইতেছেন। মাঠে পৌছিয়া টিকিট কেনা হইল। আট আনার অর্থাৎ শেষ শ্রেণীর টিকিট। ভক্তেরা ঠাকুরকে লইয়া উচ্চ স্থানে উঠিয়া এক বেঞ্চির উপরে বসিলেন। ঠাকুর আনন্দে বলিতেছেন, 'বাঃ, এখান থেকে বেশ দেখা যায়।'

রঙ্গস্থলে নানারূপ খেলা অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখা হইল। গোলাকার রাস্তায় ঘোড়া দৌড়িতেছে। ঘোড়ার পৃষ্ঠে এক পায়ে বিবি দাঁড়াইয়া। আবার মাঝে মাঝে সামনে বড় বড় লোহার ring চক্র)। রিং-এর কাছে আসিয়া ঘোড়া যখন রিংএর নীচে দৌড়িতেছে, বিবি ঘোড়ার পৃষ্ঠ হইতে লম্ফ দিয়া রিংএর মধ্য দিয়া পুনরায় ঘোড়ার পৃষ্ঠে আবার এক পায়ে দাঁড়াইয়া। ঘোড়া পুনঃ পুনঃ বন্ বন্ করিয়া ঐ গোলাকার পথে দৌড়াইতে লাগিল বিবিও আবার ঐরূপ পৃষ্ঠে দাঁড়াইয়া।

সার্কাস সমাপ্ত হইল। ঠাকুর ভক্তসঙ্গে নামিয়া আসিয়া ময়দানে গাড়ীর কাছে আসিলেন। শীত পড়িয়াছে। গায়ে সবুজ বনাত দিয়ে মাঠে দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছেন। একজন ভক্তের হাতে বেটুয়াটি (মশলার ছোট থলেটি রহিয়াছে। তাহাতে মশলা বিশেষতঃ কাবাবচিনি আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ মাষ্টারকে বলিতেছেন, 'দেখলে, বিবি কেমন এক পায়ে ঘোড়ার উপর দাঁড়িয়ে আছে, আর ঘোড়া বন্ বন্ করে দৌড়চ্ছে! কত কঠিন, অনেক দিন ধরে অভ্যাস করেছে, তবে ত হয়েছে! একটু অসাবধান হলেই হাত পা ভেঙ্গে যাবে, আবার মৃত্যুও হতে পারে। সংসার করা ঐরূপ কঠিন। অনেক সাধন ভজন করলে ঈশ্বরের কৃপায় কেউ কেউ পেরেছে।'

এখন গড়ের মাঠে কত প্যাভেলিয়ন হয়েছে। কত প্রদর্শনী ও সার্কাস হয়! গ্যালারীর জন্য টিকিটের লাইন। সেকাল আর একালের ট্রাডিশান সমানেই চলেছে। ঠাকুরের সার্কাস

দেখাও হল আর উপদেশ দেওয়াও হল।

১৮ই জুন, ১৮৮৩

শ্রীরামকৃষ্ণ চলেছেন পেনেটিতে চিঁড়ার মহোৎসবে। চৈতন্য-শিষ্য দাস রঘুনাথ এই উৎসব শুরু করেন নিত্যানন্দের মধুর তিরস্কার শুনে: 'ওরে চোরা, তুই বাড়ী থেকে কেবল পালিয়ে আসিস, আর চুরি করে প্রেম আস্বাদ করিস। আমরা কেউ জানতে পারি না। আজ তোকে দণ্ড দিব—তুই চিঁড়ার মহোৎসব করে ভক্তদের সেবা কর।'

গাড়ী ম্যাগাজিন রোড ধরে চানকের বড় রাস্তায় (ট্রাঙ্ক রোড) গিয়ে পড়ল। ঠাকুর পথে যেতে যেতে ছোকরা ভক্তদের সঙ্গে ফস্টি-নস্টি করছেন।

মহোৎসবক্ষেত্রে পৌছানমাত্র দেখা গেল, ঠাকুর গাড়ী থেকে নেমে একা তীরের ন্যায় ছুটছেন। নবদ্বীপ গোস্বামীর সংকীর্তন দলের সঙ্গে মিশে কখনও উদ্দাম নৃত্য, কখনও বা বিভোর হয়ে কীর্তন করতে লাগলেন। সে এক অপূর্ব দৃশ্য।

দিনান্তে উৎসবশেষে ঠাকুর ফিরছেন। পথে মতিশীলের ঠাকুরবাড়ী। ঠাকুর মাষ্টারকে অনেকদিন হইল বলিতেছেন—একসঙ্গে আসিয়া এই ঠাকুরবাড়ীর ঝিল দর্শন করিবেন—নিরাকার ধ্যান কিরূপ আরোপ করিতে হয়, শিখাইবার

ঠাকুরের খুব সর্দি হইয়াছে। তথাপি ভক্ত-সঙ্গে ঠাকুরবাড়ী দেখিবার জন্য গাড়ী হইতে অবতরণ করিলেন।

এইবার ঠাকুরবাড়ীর পূর্বাংশে যে ঝিল আছে, তাহার ঘাটে আসিয়া ঝিল ও মৎস্য দর্শন করিতেছেন। কেহ মাছগুলির হিংসা করে না, মুড়ি ইত্যাদি খাবার জিনিস কিছু দিলেই বড় বড় মাছ দলে দলে সম্মুখে আসিয়া ভক্ষণ করে—তারপর নির্ভয়ে আনন্দে লীলা করিতে করিতে জলমধ্যে বিচরণ করে।

ঠাকুর মাষ্টারকে বলিতেছেন—"এই দ্যাখো কেমন মাছগুলি। এইরূপ চিদানন্দ-সাগরে এই মাছের ন্যায় বিচরণ করা।"

২১ জুলাই, ১৮৮৩

ঠাকুর কলকাতায় ভক্তদের মজলিশে চলেছেন। আজকের programme অধর সেন, যদু মল্লিক ও খেলাত ঘোষের বাড়ী। গাড়ী দক্ষিণেশ্বরের ফটক পার হয়ে চলেছে। ফটকের মুখে মণির সঙ্গে দেখা। মণির হাতে চারটা ফজলী আম। ঠাকুর মণিকে দেখে গাড়ী থামাতে বললেন। মণি গাড়ীর উপর মাথা রেখে প্রণাম করলেন। অন্তরঙ্গ মণিকে গাড়ীতে তুলে নিলেন। খোস মেজাজে কথাবার্তা বলতে বলতে যাচ্ছেন। অনেক কথাবার্তা হয়েছে চলতি পথে। আমরা দু'চারটে তার মধ্য থেকে বেছে নিচ্ছি।

মণি—আমার 'পূর্বজন্ম' ও 'সংস্কার' এ সব তাতে তেমন বিশ্বাস নাই। এতে কি আমার ভক্তির কিছু হানি হবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ—তাঁর সৃষ্টিতে সবই হতে পারে—এই বিশ্বাস থাকলেই হল। আমি যা ভাবছি—তাই সত্য, আর সকলের মত মিথ্যা, এরূপ ভাব আসতে দিও না। তারপর তিনিই বুঝিয়ে দেবেন। তাঁর কাণ্ড মানুষে কি বুঝবে?

একজনকে বোঝাতে বোঝাতে (ঈশ্বরের একটি আশ্চর্য ব্যাপার) দেখালেন। হঠাৎ সামনে দেখলাম, দেশের (কামারপুকুরের) একটি পুকুর, আর একজন লোক পানা সরিয়ে যেন জল পান করলে। জলটি স্ফটিকের মত। দেখালে যে সেই সচ্চিদানন্দ মায়ারূপ পানাতে ঢাকা যে সরিয়ে জল খায়, সেই পায়।

গাড়ী শোভাবাজারের চৌমাথায় দরমাহাটার নিকট উপস্থিত হল। ঠাকুর খানিকক্ষণ মৌন

থাকার পর একটা গুহ্য কথা—'ঐ দেখ, আমার মুখ কে যেন চেপে ধরছে'—গাড়ীর ভিতর থেকে বেরিয়ে এল।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তাঁর চৈতন্যে জগতের চৈতন্য। এক একবার দেখি ছোট ছোট মাছের ভিতর সেই চৈতন্য কিলবিল করছে। এক একবার দেখি বরষায় যেরূপ পৃথিবী জ'রে থাকে, সেইরূপ এই চৈতন্যতে জগৎ জ'রে রয়েছে। কিন্তু এত ত দেখা হচ্ছে, আমার কিন্তু অভিমান হয় না।

মণি (সহাস্যে)—আপনার আবার অভিমান!

শ্রীরামকৃষ্ণ–মাইরি বলছি, আমার যদি একটুও অভিমান হয়!

ঠাকুরের দিব্যিগুলি শুনতে বড্ড মিষ্টি লাগে। কারণ ঐ দিব্যিগুলি সরস, সুন্দর ও সাবলীল। কথাগুলি অলংকারে জড়ানো—ওতে গতি আছে, ছন্দ আছে, যতি আছে। শিশু খেলায় জয়-পরাজয় নিয়ে বাদানুবাদ হলে 'কালীর দিব্যি' 'চোখ ছুঁয়ে দিব্যি' করে। শিশুসম শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যিতে মিথ্যার প্রলেপ নেই। লাভ-লোকসানের টানা-পোড়েনে দোলায়িত মানুষ ত মিথ্যে-মিষ্টি কথার পসার সাজিয়ে নিয়ে চলেছে, তাই এই ধরনের দিব্যি দিতে ভয় পায়।

চলার পথে আবার কথা শুরু হল।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমার সঙ্গে কি কারু মিলে? কোনো পণ্ডিত, কি সাধুর সঙ্গে?

মণি—আপনাকে ঈশ্বর স্বয়ং হাতে গড়েছেন। অন্য লোকদের কলে ফেলে তয়ের করেছেন—যেমন আইন অনুসারে সব সৃষ্টি হচ্ছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে রামলালাদিকে)—ওরে বলে কিরে?

ঠাকুরের হাসি আর থামে না। অবশেষে বলিতেছেন—মাইরি বলছি, আমার যদি একটুও অভিমান হয়।

ঠাকুর খিল খিল করে হাসছেন। সদা হাস্যময় পুরুষ তিনি। জীবজগতের মজা যিনি জানেন তাঁর কাছে ত দুঃখ বা কান্না থাকে না।

'যতদিন বাঁচি ততদিন শিখি।' শ্রীরামকৃষ্ণ খোলা মন নিয়ে চলতেন। শুনে শিখতেন সব আধুনিক বিজ্ঞানের কথা।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আচ্ছা, তোমার ইংরাজী জ্যোতিষে বিশ্বাস আছে?

মণি—ওদের নিয়ম অনুসারে আবিষ্ক্রিয়া (discovery) হতে পারে। ইউরেনাস (Uranus) গ্রহের এলোমেলো চলন দেখে দূরবীণ দিয়ে সন্ধান করে দেখলে যে নূতন একটি গ্রহ (Neptune) জল জল করছে। আবার গ্রহণ গণনা হতে পারে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তা হয় বটে।

গাড়ী চলছে। ঘোড়ার পায়ের খটখট আওয়াজ আর চাকার ক্যাঁচকোঁচ শব্দ ভেসে আসছে। গাড়ী অধরের বাড়ীর কাছে এসে পড়েছে। ঠাকুর মণিকে বলছেন–সত্যতে থাকবে, তা হলেই ঈশ্বরলাভ হবে।

মণি–একটি কথা আপনি নবদ্বীপ গোস্বামীকে বলেছিলেন, 'হে ঈশ্বর! আমি তোমায় চাই। দেখো যেন তোমার ভুবনমোহিনী মায়ার ঐশ্বর্যে মুগ্ধ কোরো না। আমি তোমায় চাই।'

শ্রীরামকৃষ্ণ–হাঁ, ঐটি আন্তরিক বলতে হবে।

সার কথা কটি বলে ঠাকুর গাড়ী থেকে নেমে অধরের বৈঠকখানায় ঢুকলেন। তারপর যদু মল্লিকের বাড়ীতে সিংহবাহিনী দর্শন এবং খেলাত ঘোষের বাড়ীতে বৈষ্ণব ভক্তদের সঙ্গে দেখা করে অধিক রাতে দক্ষিণেশ্বর ফিরলেন।

৭ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮৩

শ্রীরামকৃষ্ণ কলকাতার পথে ঘুরতেন। চলার পথে তিনি ঘোড়ার গাড়ীর দরজা খুলে রাখতেন আর দেখতেন হাল ফ্যাশানের দুনিয়াদারি। তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থেকে কোন কিছু এড়িয়ে যাবার জো ছিল না। কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন ভক্তদের

কাছে ঃ সে দিন কলকাতায় গেলাম। গাড়ীতে যেতে যেতে দেখলাম জীব সব নিম্নদৃষ্টি, সবাইয়ের পেটের চিন্তা! সব পেটের জন্য দৌড়াচ্ছে। সকলেরই মন কামিনী-কাঞ্চনে। তবে দুই একটি দেখলাম ঊর্ধ্বদৃষ্টি—ঈশ্বরের দিকে মন আছে।

মণি--আজকাল আরও পেটের চিন্তা বাড়িয়ে দেছে। ইংরাজের অনুকরণ করতে গিয়ে লোকদের বিলাসের দিকে আরও মন হয়েছে। তাই অভাব বেড়েছে।

বিলাসের ফাঁস গলায় দিয়ে মানুষ হাটছে পথ ধরে। একজন মানুষ পথের ধারে দোকানের দাওয়ায় বসে মোজা পরছে। ঠাকুর দেখে বললেন—'এ লোকটি জীবনে প্রথম ভোগ করছে।' 'বাঃ বাঃ' বলে তারিফ করে তিনি এগিয়ে চললেন।

দক্ষিণেশ্বরে গঙ্গার ঘাটে স্নান করতে গিয়ে মেয়েদের কথা তাঁর কানে আসত। আর ওগুলি ছিল তাঁর চাটনী। ভোগী ঈশ্বরবিমুখ ভক্তদের ঠুকবার জন্য তিনি ভণিতা করে ঐ চাটনীগুলি ব্যবহার করতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—গঙ্গার ঘাটে নাইতে এসেছে দেখেছি। যত রাজ্যের কথা! বিধবা পিসি বলছে—মা, দুর্গাপূজা আমি না হলে হয় না—শ্রীটি গড়া পর্যন্ত! বাড়ীতে বিয়েথাওয়া হলে সব আমায় কর্তে হবে, মা—তবে হবে। ফুলশয্যের যোগাড়, খয়েরের বাগানটি পর্যন্ত।

মণি—আজ্ঞে, এদেরি বা দোষ কি, কি নিয়ে থাকে!

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—ছাদের উপর ঠাকুর-ঘর, নারায়ণপূজা হচ্ছে। পূজার নৈবেদ্য, চন্দন-ঘষা—এই সব হচ্ছে। কিন্তু ঈশ্বরের কথা একটিও নেই। কি রাঁধতে হবে—আজ বাজারে কিছু পেল না--কাল অমুক ব্যঞ্জনটি বেশ হয়েছিল।

ঠাকুর মানুষের ঈশ্বরবিমুখতা, প্রাণহীন পূজা প্রভৃতি দেখে ব্যথিত হয়ে বলছেন—দেখ দেখি ঠাকুরঘরে পূজার সময় এই সব রাজ্যের কথা!

২৬শে ডিসেম্বর, ১৮৮৩

সাধারণ মানুষ গৃহপ্রবেশ বা নূতন কিছুর উদ্বোধন করতে গেলে পয়মন্ত বা কোন সাধু মহাত্মাকে আমন্ত্রণ করে। ঠাকুর আজ তাই চলেছেন রামের কাঁকুড়গাছির নূতন বাগান-বাড়ীতে। সুরেন্দ্রের বাগান তারই নিকট।

ঠাকুর গাড়ী করে চলেছেন। সঙ্গে মাষ্টার ও মণি মল্লিক প্রভৃতি কয়েকটি ব্রাহ্ম ভক্ত। ঠাকুর ইদানীং কালের ব্রহ্মজ্ঞানীদের লক্ষ্য করেছেন। তারা মিষ্টরস পায়নি। তাদের চোখ মুখ শুকনো। নিরাকার ধ্যান কঠিন—সেই সব বোঝাতে বোঝাতে চলেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণিলালের প্রতি)—তাঁকে ধ্যান করতে হলে, প্রথমে উপাধিশূন্য তাঁকে ধ্যান করবার চেষ্টা করা উচিত। তিনি নিরুপাধি, বাক্য-মনের অতীত। কিন্তু এ ধ্যানে সিদ্ধ হওয়া বড় কঠিন। তিনি মানুষে অবতীর্ণ হন, তখন ধ্যানের খুব সুবিধা। মানুষের ভিতর নারায়ণ, দেহটি আবরণ, যেন লণ্ঠনের ভিতর আলো জ্বলছে। অথবা শার্সির ভিতর বহুমূল্য জিনিস দেখছি।

ঠাকুর আপনমনে গোটা বাগানপথ পরিক্রমা করলেন। তুলসীকানন দেখে বললেন বাঃ, বেশ জায়গা, এখানে বেশ ঈশ্বরচিন্তা হয়। সরোবরের দক্ষিণ ঘরে একটু বসলেন এবং কিছু মিষ্টান্ন ও ফলাদি খেলেন।

রামের বাগান থেকে সুরেন্দ্রের বাগানে যাবার কালে ঠাকুর খানিকটা হাঁটা পথে চললেন। তারপর গাড়ী। পদব্রজে যেতে যেতে পথিপার্শ্বে এক খাটিয়ায় উপবিষ্ট এক সাধুর সঙ্গে দেখা। গাঁজাখোর যেমন সঙ্গী দেখলে ভিড়ে যায়, ঠাকুরও

তেমনি আনন্দে তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে হিন্দিতে বার্তালাপ শুরু করলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সাধুর প্রতি)—আপনি কোন্ সম্প্রদায়ের—গিরি বা পুরী কোন উপাধি আছে?

সাধু—লোকে আমায় পরমহংস বলে।

শ্রীরামকৃষ্ণ বেশ, বেশ। শিবোঽহং—এ বেশ। তবে একটা কথা আছে। এই সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় রাতদিন হচ্ছে—তাঁর শক্তিতে। এই আদ্যাশক্তি আর ব্রহ্ম অভেদ। ব্রহ্মকে ছেড়ে শক্তি হয় না। যেমন জলকে ছেড়ে তরঙ্গ হয় না। বাদ্যকে ছেড়ে বাজনা হয় না।

একটু সদালাপ করে ঠাকুর গাড়ীর দিকে চললেন। দূর পথের যাত্রী-বন্ধুকে যেমন বন্ধু বিদায় দিতে আসে, তেমনি সাধুটি ঠাকুরকে গাড়ীতে তুলে দিতে এলেন। আর ঠাকুর? তিনি কম যান না। অনেক দিনের পরিচিত বন্ধুর ন্যায় সাধুর বাহুর ভিতর বাহু দিয়ে গাড়ীর দিকে চলেছেন। এ দৃশ্য অনুপম। শ্রীরামকৃষ্ণের মানুষভাব যে কতটা স্বাভাবিক তা বলে বোঝাবার প্রয়োজন হয় না। সুরেন্দ্রের বাগানে গিয়ে রামকে বলছেন—'সাধুটি বেশ। তুমি যখন যাবে সাধুটিকে দক্ষিণেশ্বরের বাগানে লয়ে যেও।' আতিথেয়তাও সারা হল।

২৭শে ডিসেম্বর, ১৮৮৩

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-প্রণেতা শ্রীম সম্বন্ধে ঠাকুর বলেছিলেন -'তোমায় চিনেছি তোমার চৈতন্যভাগবত পড়া শুনে।' এ উক্তি যে কত খাঁটি তার প্রমাণ 'কথামৃত'।

ঠাকুর কলকাতায় মেছুয়াবাজারে ভক্ত শ্রীঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাড়ী যাবেন। এই যাত্রার প্রাক্কালে শ্রীম যে ছবি ফুটিয়েছেন তা ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের জন্মের এবং মহাভারতে সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে হস্তিনাপুরে গমনের ছবিদ্বয়ের সঙ্গে খুব মিল আছে। আমরা শ্রীম-র ছবি তুলে ধরছি:

দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে মঙ্গলারতির মধুর শব্দ শোনা যাইতেছে। সেই সঙ্গে প্রভাতী রাগে রোশনচৌকী বাজিতেছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ গাত্রোত্থান করিয়া মধুরস্বরে নাম করিতেছেন। ঘরে যে সকল দেবদেবীর মূর্তি পটে চিত্রিত ছিল, এক এক করিয়া প্রণাম করিলেন। পশ্চিম ধারের গোল বারান্দায় গিয়া ভাগীরথী দর্শন করিলেন ও প্রণাম করিলেন।

শীতকাল। বেলা ৮টা। নহবতের কাছে গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। ঠাকুরকে লইয়া যাইবে। চতুর্দিকে ফুলগাছ। সম্মুখে ভাগীরথী। দিক-সকল প্রসন্ন। শ্রীরামকৃষ্ণ ঠাকুরদের পটের কাছে দাঁড়াইয়া প্রণাম করিলেন এবং মার নাম করিতে করিতে যাত্রা করিয়া গাড়ীতে উঠিলেন। সঙ্গে বাবুরাম ও মণি। তাঁহারা ঠাকুরের গায়ের বনাত, বনাতের কানঢাকা টুপি ও মসলার থলে সঙ্গে লইয়াছেন। কেন না শীতকাল সন্ধ্যার সময় ঠাকুর গায়ে গরম কাপড় দিবেন।

ঠাকুর সহাস্যবদন। সমস্ত পথ আনন্দ করিতে করিতে আসিতেছেন। বেলা ৯টা। গাড়ী কলিকাতায় প্রবেশ করিয়া শ্যামবাজার দিয়া ক্রমে মেছুয়াবাজারের চৌমাথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। ঈশান আত্মীয়দের সহিত সাদরে সহাস্য-বদনে ঠাকুরকে অভ্যর্থনা করিয়া নীচের বৈঠকখানা ঘরে লইয়া গেলেন।

২৫শে জুন, ১৮৮৪

আজ রথযাত্রা। শ্রীরামকৃষ্ণ ঈশানের বাড়ী নিমন্ত্রণে আসিয়াছেন। ঠনঠনিয়ায় ঈশানের ভদ্রাসন বাটী। সেখানে আসিয়া শুনিলেন যে, পণ্ডিত শশধর অনতিদূরে কলেজ স্ট্রীটে চাটুজ্যেদের বাড়ী রহিয়াছেন। পণ্ডিতকে দেখিবার তাঁর ভারী ইচ্ছা।

প্রায় বেলা ৪টার সময় ঠাকুর গাড়ীতে উঠিলেন। অতি কোমলাঙ্গ। অতি সন্তর্পণে তাঁহার দেহরক্ষা হয়। তাই পথে যাইতে কষ্ট হয়; প্রায় গাড়ী না হইলে অল্প দূরও যাইতে পারেন না। গাড়ীতে উঠিয়া ভাবসমাধিতে মগ্ন হইলেন। তখন টিপ টিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। বর্ষাকাল, আকাশে মেঘ, পথে কাদা। ভক্তেরা গাড়ীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ পদব্রজে যাইতেছেন। তাঁহারা দেখিলেন—রথযাত্রা উপলক্ষ্যে ছেলেরা তালপাতার ভেঁপু বাজাইতেছে।

পণ্ডিত শশধরের সঙ্গে ঠাকুরের সাক্ষাৎ হল। তারপর চলল পথ-প্রান্তরের কথা। তাঁর শক্তি আসত বাগ্বাদিনীর কাছ থেকে তুলনাহীন উপমার ফুলঝুরি ঝরতে লাগল: ফল হলেই ফুল পড়ে যায়। ভক্তি ফল—কর্ম ফুল।' চাপরাশ না পেলে লোকশিক্ষা দেওয়া যায় না, এ ব্যাপারে দুটি উদাহরণ দিলেন: 'প্রদীপ জ্বাললে বাদুলে পোকাগুলো ঝাঁকে ঝাঁকে আপনি আসে—ডাকতে হয় না।' 'ওদেশে ধান মাপবার সময়, একজন মাপে, আর একজন রাশ ঠেলে দেয়।'

আবার সন্ধ্যায় ঈশানের বাড়ীতে ফিরলেন। অনেক কথার পর ঠাকুর আবার গাড়ীতে উঠবেন। আসরে মানুষ নানা প্রসঙ্গ আলোচনা করে, কিন্তু বিদায়ের বেলায় সব চেয়ে কাজের এবং সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথাটি বলে থাকে। লোকে এরূপই দেখা যায়। তাই গাড়ী ছাড়বার মুখে পথের উপর ঠাকুর আবার কথাচ্ছলে ঈশানকে উপদেশ দিচ্ছেন: 'পিপড়ের মত সংসারে থাক। এ সংসারে নিত্য অনিত্য মিশিয়ে রয়েছে। বালিতে চিনিতে মেশান—পিপড়ে হয়ে চিনিটুকু নেবে। জলে দুধে এক সঙ্গে রয়েছে। চিদানন্দরস আর বিষয়রস। হংসের মত দুধটুকু নিয়ে জলটি ত্যাগ করবে। আর পানকৌটির মত। গায়ে জল লাগছে ঝেড়ে ফেলবে। আর পাকাল মাছের মত। পাঁকে থাকে কিন্তু গা দেখ পরিষ্কার, উজ্জ্বল। গোলমালে মাল আছে—গোল ছেড়ে মালটি নেবে।' বিবেক ও বস্তুবিচারের অপূর্ব পদ্ধতি সোজা কথায় ঠাকুর বললেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ভাঙ্গতে আসেননি, গড়তে এসেছিলেন। ভক্ত মনোমোহন কোন্নগর থেকে সপরিবারে ঠাকুরকে দক্ষিণেশ্বরে দেখতে এসেছেন। ঠাকুরকে প্রণাম করে বলছেন: 'এদের কলকাতায় নিয়ে যাচ্ছি।' ঠাকুর কুশলপ্রশ্ন করে বললেন, 'আজ ১লা—অগস্ত্য, কলকাতায় যাচ্ছ? কে জানে বাপু!' অপূর্ব নজর। মানুষের মঙ্গলের দিকে ছিল তাঁর সদা দৃষ্টি; চিরাচরিত প্রথা, তিথি নক্ষত্র সব মেনেই তিনি চলতেন। বৃহস্পতিবারের শেষ বেলায় তিনি কখনও বেরুতেন না।

গৃহস্থদের উপদেশ দিচ্ছেন: 'একটু কষ্ট করে সৎসঙ্গ করতে হয়। প্রার্থনা কর—সেই পরমাত্মার সঙ্গে সব জীবের যোগ হতে পারে। গ্যাসের নল সব বাড়ীতেই খাটানো আছে। গ্যাস কোম্পানীর কাছ থেকে গ্যাস পাওয়া যায়। আরজি কর করলেই গ্যাস বন্দোবস্ত করে দেবে। ঘরেতে আলো জ্বলবে। শিয়ালদহে আপিস আছে।' কোথায় আপিস তা পর্যন্ত ঠাকুর বলে দিলেন। আরও বললেন যে, দেহ-মন্দির অন্ধকারে রাখতে নেই, জ্ঞানদীপ জ্বেলে দিতে হয়।

কলকাতায় সুরেন্দ্রের বাড়ীতে অন্নপূর্ণাপূজা দেখতে গেছেন। দক্ষিণেশ্বরে বিদায়ের মুখে রাখালকে ডেকে বলছেন—'ও রা-জু-আ?' ঠাকুরের এ কোড language বোঝা দায়। কথাটা হল: ও রাখাল, জুতা সব আছে না হারিয়ে গেছে? ঈশ্বর সাকার না নিরাকার—সেই দুরন্ত তাত্ত্বিক আলোচনার পর মধুর হাস্যরস মনটাকে খুশিতে ভরিয়ে স্বাভাবিক করে দেয়।

। অনেক সময় আপন ভাবে বিভোর হয়ে তাঁর বিগত দিনের কথাগুলি বলতেন। প্রথম প্রেমোন্মত্ত হয়ে তাঁর সেই পথে ঘুরে বেড়ানর কথা তাঁর শ্রীমুখ থেকে কিছু শোনা যাক :

'কি অবস্থাই গিয়াছে ! এখানে (দক্ষিণেশ্বরে) খেতুম না। বরাহনগরে কি দক্ষিণেশ্বরে কি এঁড়েদয়ে, কোন বামুনের বাড়ী গিয়ে পড়তুম। আবার পড়তুম অবেলায়। বাড়ীর লোক কোন কথা জিজ্ঞাসা করলে কেবল বলতুম—আমি এখানে খাব। আর কোন কথা নেই

'একদিন ধরে বসলুম, দেবেন্দ্র ঠাকুরের বাড়ী যাব। সেজোবাবুকে বললুম, দেবেন্দ্র ঈশ্বরের নাম করে, তাকে দেখবো, আমায় লয়ে যাবে ? সেজোবাবু—তার আবার ভারী অভিমান, সে সেধে লোকের বাড়ী যাবে ? এগুপেছু করতে লাগল। তারপর বললে, 'হাঁ, দেবেন্দ্র আর আর আমি একসঙ্গে পড়েছিলুম, তা চল বাবা, নিয়ে যাব।

'একদিন শুনলুম বাগবাজারের পোলের কাছে দীনু মুখুয্যে বলে একটি ভাল লোক আছে —ভক্ত। সেজোবাবুকে ধরলুম—দীনু মুখুয্যের বাড়ী যাব। সেজোবাবু কি করে, গাড়ী করে নিয়ে গেল। বাড়ীটি ছোট, আবার মস্ত গাড়ী করে এক বড় মানুষ এসেছে। তারাও অপ্রস্তুত, আমরাও অপ্রস্তুত। তার আবার ছেলের পৈতে। কোথায় বসায় ? আমরা পাশের ঘরে যাচ্ছিলুম; তা বলে উঠলো, ও ঘরে মেয়েরা, যাবেন না। মহা অপ্রস্তুত। সেজোবাবু ফেরবার সময় বললে, "বাবা ! তোমার কথা আর শুনবো না।" আমি হাসতে লাগলুম।'

যে ভগবানের চিন্তা করে, তাকে দেখতে বা আধ্যাত্মিক পথে কাউকে সাহায্য করতে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রস্তুত, অপমান এমনকি মার খেতেও রাজী। হরিনাম বিলাতে নিত্যানন্দের মাথা ফাটেনি ? শ্রীরামকৃষ্ণ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে অপমানিত হননি ? তাঁকে দেখে তো আলো নিবিয়ে দেওয়া হল ! যে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দেখবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ লালায়িত, তিনি প্রথমে নিমন্ত্রণ করে, পরে কাপুড়ে সভ্যতায় শ্রীরামকৃষ্ণ সভ্য নন বলে তাঁকে পত্র লিখে নিমন্ত্রণ ফিরিয়ে নেননি ? বাগবাজারের বিখ্যাত গুণ্ডা মন্মথ শ্রীরামকৃষ্ণকে ভয় দেখানর জন্য রাস্তার পাশে দাঁড়ায়নি ? তবুও শ্রীরামকৃষ্ণ পথে চলবেন। কেউ তাঁর চলা বন্ধ করতে পারবে না। 'একজন আগুন করলে দশজন পোহায়।' ঠাকুর আগুন তৈরী করে কাতর নিরুৎসাহী মানুষগুলোকে তাতাবার জন্য ঘুরে বেড়াতেন।

(ক্রমশঃ)

প্রত্যয়

শ্রীবাজীরাও সেন

যখন আকাশ দেখি ছেয়ে গেছে মেঘে,
দিনের হয়েছে মৃত্যু ভরন্ত দুপুরে,
দুরন্ত উদ্দাম বায়ু দিগ্বিদিকে পথ খুঁজে ফিরে ;
উন্মত্ত ঝঞ্ঝায়—
অসহায় শাখাগুলি কাণ্ড হতে ছিন্ন হতে চায় ;
ভেবেছি, সূর্যের দেশে আর ফিরিব না ; দুর্যোগের হবে না বিরাম ;
ভেবেছি, এই তো শেষ ; মৃত্যু এর নাম।
জানিনা কখন তুমি মৃত্যুর অংকুরে
টেনেছ জীবনরস ; মেঘের প্রাচীরে
ভেঙেছ আপন হাতে, হে আনন্দময় !
আবার তুলেছ ভরি আকাশেরে আলোয় আলোয়,
জীবনেরে নির্ভয় আশ্বাসে ;
মেঘ গেছে, ঝড় গেছে, মৃত্যুভয় গেছে।
যখন বৈশাখ তৃষ্ণা কেঁদে ফিরে দাহদীর্ণ মাঠে—
তামাটে বিবর্ণ দিন মৌন নিরুত্তর ;
চাতক কেঁদেছে নিরন্তর ;
জানিনা কখন তুমি তৃষ্ণার নির্যাসে—
জমাও মৌসুমী মেঘ। সমুদ্রের দেশ থেকে এসে
সে মেঘ মেটায় তৃষ্ণা ; আতপ্ত আবেগে
ধূ ধূ শুষ্ক প্রান্তরের দগ্ধ অনুরাগে
ঝরে অনুক্ষণ ;
তারি মাঝে দেখি তব কল্যাণের রূপ—
দুঃখের দুর্যোগে দেখি জীবনের দীপ্ত উজ্জীবন।

বসন্তরোগ সম্বন্ধে কয়েকটি নূতন আবিষ্কৃত তথ্য

ডক্টর জলধিকুমার সরকার

বসন্ত (smallpox) অতিপুরাতন রোগ। প্রাচীন চীনা, আরবীয় ও সংস্কৃত গ্রন্থে ইহার উল্লেখ আছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে যদিও অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে বসন্তরোগের টিকা আবিষ্কৃত হয়েছে এবং এই টিকার সাফল্য সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত সন্দেহের অবকাশ হয় নাই, তথাপি আজও কয়েকটি দেশে এই রোগের প্রভাব অপ্রতিহত রয়েছে। এই বিস্ময়কর পরিস্থিতি একটু ভাববার বিষয়।

বহু পূর্বে পৃথিবীর অনেক দেশেই এই এই রোগের প্রাদুর্ভাব ছিল। ইহার প্রতিরোধের জন্য নানা দেশে নানা পন্থা আবিষ্কৃত হয়েছিল। বসন্তের গুটিকাগুলি শুকালে উপরে যে চামড়ি (scab) হয়, চীনারা সেগুলিকে গুঁড়া করিয়া বসন্ত-প্রতিরোধের জন্য নস্য হিসাবে লইত! ভারতবর্ষ, আফগানিস্থান, এবং মধ্য-প্রাচ্যের অনেক দেশে, পূর্ববৎসরের সঞ্চিত চামড়িগুলি গুঁড়া করিয়া সুস্থ লোকের চামড়ায় ক্ষত করিয়া তাহার উপর ঘষিয়া দিত। বংশগত পেশা হিসাবে একশ্রেণীর লোক এই কার্যে দক্ষতালাভ করেছিল। চামড়িতে বসন্তরোগের জীবাণু থাকে, এবং তাহার ফলে যে-সব ব্যক্তি এই ভাবে টিকা লইত তাদের কেহ কেহ বসন্ত-রোগে আক্রান্ত হয়ে রোগপ্রসারে সাহায্য কোরত।

এই স্থানে রোগের জীবাণু সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। কিছুদিন আগে একবার বলেছি যে, ইহা একটা ভাইরাস (virus)-জনিত রোগ। অর্থাৎ এর জীবাণু (বা জীবপরমাণু) টাইফয়েড কলেরা প্রভৃতির ব্যাকটিরিয়া (Bacteria) জীবাণু হতে অনেক ছোট। মানুষের যে কেবল বসন্তরোগ হয় তা নয়, অনেক জন্তু-জানোয়ার পশুপক্ষীরও বসন্ত হয়। তবে তাদের ভাইরাসগুলি সমগোত্রীয় হলেও মানুষের ভাইরাস হতে বিভিন্ন। গরুর বসন্ত সেইরূপ সমগোত্রীয় ভাইরাস দ্বারা হয় এবং সেই ভাইরাস দ্বারা মানুষের বসন্ত হয় না। গরুর বসন্ত-গুটিকাগুলি বিশেষতঃ তাহাদের স্তনদেশে ওঠে। ইংলণ্ড যখন বসন্তরোগে জর্জরিত এবং ও-দেশের মহিলাসমাজ যখন ওই রোগজনিত সৌন্দর্যনাশের ভয়ে বিভীষিকাগ্রস্ত সেই সময় এডওয়ার্ড জেনার নামক একজন ইংরেজ চিকিৎসক লক্ষ্য করলেন, যে-সব গোপরমণী দুগ্ধ দোহন করেন তাঁদের সকলেরই মুখশ্রী সুন্দর ও বসন্তের কোন ছাপ নাই। অনুসন্ধানে জানলেন যে, তাঁদের হাতের আঙুলে সামান্য একটি গরু-হ'তে-পাওয়া বসন্ত-গুটিকা উঠার জন্যই তাঁরা ভবিষ্যতে ভয়াবহ বসন্তরোগ হ'তে নিষ্কৃতি পান। তারপর চলল জেনার সাহেবের গবেষণা যার ফলে জন্ম নিল বসন্তরোগের বর্তমান টিকা।

স্বভবতঃই প্রশ্ন জাগে যে, যে-রোগের প্রতিকার এত সহজসাধ্য, সেই রোগ এখনও পৃথিবীতে বর্তমান রয়েছে কেন? বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (World Health Organisation)-র কাছেও কয়েক বৎসর আগে ঐ প্রশ্ন জেগেছিল। তাঁরা অনেক বিচার বিবেচনা করে স্থির করলেন যে, পৃথিবী হতে এই রোগের দূরীকরণ সম্ভব ও সহজসাধ্য। সেইজন্য তাঁরা গত সাত-আট বৎসর ধরে পরিকল্পনা অনুযায়ী ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছেন এই পথে এবং বহুলাংশে সাফল্য

লাভ করেছেন। তাঁদের প্রচেষ্টায় আফ্রিকা-মহাদেশের বহু দেশ, ইন্দোনেশিয়া, ব্রহ্মদেশ, মালয়েশিয়া, দক্ষিণ আমেরিকা প্রভৃতি অনেক স্থান—যেখানে বসন্তরোগ যুগ যুগ ধরে বাসা বেঁধে ছিল, আজ বসন্তমুক্ত। ১৯৪৫ সালে ৯১টি দেশে বসন্তের রোগী ছিল, কিন্তু ১৯৭১ সালে মাত্র ১৭টি দেশে এই রোগ দেখা গিয়াছে। বর্তমানে ইহা মাত্র সাতটি দেশে সীমাবদ্ধ। দুঃখের বিষয়, ভারত- পাকিস্থান এই বিষয়ে অনেক পিছিয়ে আছে এবং আরও দুঃখের বিষয়, পশ্চিম-বাংলার বর্তমান পরিস্থিতি খুবই অস্বস্তিকর। যাই হোক, এ সত্ত্বেও ভারত সরকার ও পশ্চিম-বঙ্গ সরকার শীঘ্রই দেশকে বসন্তরোগমুক্ত করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এরূপ অবস্থায় এই রোগ সম্বন্ধে যে-সব নূতন তথ্য জানা গেছে, সেগুলি আমাদের সকলের অবহিত হওয়া প্রয়োজন। সকলেই জানেন, এই রোগ এবং অন্যান্য অনেক রোগের নিবারণের সবচেয়ে বড় বাধা হচ্ছে জনসাধারণের অজ্ঞতা। দেশকে মহামারী-মুক্ত করতে হলে জনসাধারণকেও সাধারণ জ্ঞাতব্য বিষয় জানতে হবে। এক একটি বিষয় ধরে এ বিষয় আলোচনা করব।

(১) মানুষ কি অন্য জীবজন্তু হতে বসন্তরোগ পেতে পারে?

আগেই বলেছি যে, অন্যান্য অনেক জীবজন্তু পশুপক্ষীর বসন্তরোগ হয়, কিন্তু তাদের রোগের জীবাণু হতে মানুষের বসন্ত হয় না। যাঁরা সারা পৃথিবী হতে বসন্তরোগের উচ্ছেদের কথা ভাবছেন, তাঁদের কাছে এ প্রশ্নটা খুবই প্রয়োজনীয়, কারণ মানুষ যদি অন্যান্য জীবজন্তু হতে এই অসুখ পায়, তা হলে মানবসমাজকে বসন্ত-রোগমুক্ত করতে হলে, সেইসব জীবজন্তুকেও রোগমুক্ত করতে হবে, এবং সে ক্ষেত্রে সমস্যাটা যে শুধু খুবই জটিল হবে তা নয়, এর সমাধান প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। অনেকেই কই মাগুর প্রভৃতি মাছ হতে মানুষের বসন্ত হওয়ার কথা শুনেছেন। এ সম্বন্ধে আমরা ল্যাবরেটরিতে গবেষণা করে যা জেনেছি, তাতে এরকম বিশ্বাসের কোন ভিত্তি পাই নাই। বানরের বসন্তের সঙ্গে মানুষের বসন্তরোগের অনেকটা সাদৃশ্য থাকায় সম্প্রতি অনেক গবেষণা হয়েছে এই নিয়ে। আফ্রিকার কয়েকটি অঞ্চলে পাঁচ-সাতটি লোকের বানর হতে বসন্ত রোগক্রান্ত হওয়া প্রমাণিতও হয়েছে। ওই অঞ্চলের লোকেরা শুধু যে বানরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসে তাই নয়, বানরের মাংসও তারা খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করে। বহু অনুসন্ধানে প্রমাণিত হয়েছে যে এরূপ আক্রমণের সম্ভাবনা খুবই কম, দুইপ্রকার রোগের জীবাণুর পার্থক্য আছে, এবং ওইভাবে মানুষ কচিৎ আক্রান্ত হলেও, বানর-বসন্তরোগের ভাইরাস এক ব্যক্তি হতে অন্যের দেহে সঞ্চারিত হয় না। যাই হোক, বর্তমানে ইহাই ধারণা যে, একজনের বসন্তরোগ হতে হলে সে কেবল অন্য একজন রোগাক্রান্ত ব্যক্তি হতেই এই অসুখের জীবাণু পেতে পারে।

(২) বসন্তের টিকা সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে: (ক) তরল (liquid) ও শুষ্ক করা টিকা বীজ (freeze dried vaccine lymph): এখন সারা পৃথিবীতে শুষ্ক করা টিকার বীজ ব্যবহৃত হয়। তরল বীজ ব্যবহার করা বন্ধ করা হয়েছে, কারণ গ্রীষ্মপ্রধান দেশের উত্তাপে অনেক জীবাণু তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায় বলে এর কার্যকারিতা কমে যায়। তাছাড়া তরল বীজে যে-সংখ্যক জীবাণু ব্যবহৃত হোত, এখনকার শুষ্ক বীজে তার চেয়ে অনেক বেশী জীবাণু থাকে। শুষ্ক করা জীবাণু গরমে নষ্ট হত না। ছোট বড় সকলকেই এই বীজ দ্বারা টিকা দেওয়া যেতে পারে।

(খ) কত ছোট বয়সে টিকা লওয়া যায় ?

আমাদের দেশে যেখানে বসন্তরোগ প্রতি-বৎসর দেখা যায়, সেখানে শিশু ভূমিষ্ঠ হবার পরই টিকা হওয়া উচিত। তবে শিশু জন্মিবার সময় যদি সেই শহরে বসন্তরোগের প্রাদুর্ভাব না থাকে অর্থাৎ বসন্তরোগের ঋতু না হয়, এবং মায়ের যদি নিয়মিতভাবে টিকা লওয়া থাকে তবে চার-পাঁচ মাস পরে টিকা দেওয়া যেতে পারে।

আমেরিকা প্রভৃতি যে-সব দেশে বহু বৎসর একজনেরও বসন্ত হয় নাই, সেখানে সম্প্রতি নিয়ম মাফিক জন্মটিকা লওয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

(গ) কতদিন অন্তর টিকা লওয়া উচিত ?

সাধারণভাবে, একবার টিকা ঠিকমত উঠলে বৎসরতিনেক টিকা না নিলেও চলে। তবে যে সব দেশে প্রতিবৎসর বসন্তরোগ দেখা দেয় সেখানে প্রতিবৎসর টিকা লওয়া নিরাপদ।

(ঘ) কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে টিকা লওয়া উচিত নয় ?

যখন আশেপাশে বসন্তরোগ দেখা দেয়, তখন কোন অবস্থাতেই টিকা লওয়া বারণ নয়। তবে অন্য সময় কয়েকটি ক্ষেত্রে টিকা না নিতে পারে অথবা বিশেষ সাবধানতার সঙ্গে টিকা নিতে হয় যেমন লিউকিমিয়া (leukaemia) প্রভৃতি কঠিন অসুখে ভুগছে, অথবা খুব জ্বর, একজিমা বা এ্যালার্জির রোগী ইত্যাদি। সন্তান-সম্ভাবনা-অবস্থার পূর্বে জন্মটিকা লওয়া থাকলে নির্ভয়ে টিকা নিতে পারে।

(ঙ) কতদিন পরে আবার টিকা নিলে টিকা উঠবে আশা করা যায় ?

টিকার বীজ যদি ভাল হয় তবে একবৎসর পরেই শতকরা আশিজনের টিকা উঠবে আশা করা যায়। তবে মনে রাখবেন পুনঃ পুনঃ টিকা নিলে, জন্মটিকা বা প্রথম বারের টিকা উঠার মত বড় হয় না। পাঁচ ছয় দিন পরে যদি সামান্য ফুস্কুরি বা ফুলার সহিত ছোট চামড়ি বর্তমান থাকে, তাকেই টিকা "উঠা" বলা হয়।

(৩) জলবসন্তের (chickenpox) জীবাণু কি বসন্ত বা আসলবসন্তের (smallpox) জীবাণু হতে আলাদা ?

হাঁ, সম্পূর্ণ আলাদা। বসন্তের টিকা নিলে জলবসন্তকে প্রতিরোধ করা যায় না। জলবসন্ত হয়েছে এরূপ অবস্থাতেও দরকার হলে বসন্তের টিকা নিতে পারে।

(৪) বসন্তের ভাইরাস কিভাবে শরীরে প্রবেশ করে ?

রোগের জীবাণু রোগীর হাঁচি কাশি বা কথা-বার্তার সময় যে সামান্য থুতুর টুকরা ভাসে, সেগুলির মধ্য দিয়া ভাইরাস আমাদের নিঃশ্বাসের সঙ্গে শরীরে ঢুকে। বিছানায় লাগা বসন্তের স্ফোটকের রস, বা শুষ্ক চামড়ির (scab) গুঁড়া নিঃশ্বাসের সঙ্গে ঢুকেও অসুখের সৃষ্টি করতে পারে, এমন কি রোগীর প্রস্রাব এবং চোখের জলেও রোগের জীবাণু পাওয়া যায়।

ইউরোপ আমেরিকা প্রভৃতি দেশে যেখানে বসন্তরোগ হয় না সেখানকার লোকেরাও পৃথিবী হতে এই রোগের উচ্ছেদ চান। সেটা যে কেবল পরোপকার করবার জন্য তা নয়। তাঁরা জানেন যে, বর্তমান যুগে যানবাহন বা যাতায়াতের সুবিধার জন্য পৃথিবীর যে-কোন অংশে বসন্তরোগ থাকলে তারাও নিরাপদ নন। সম্পূর্ণ সজাগ না থাকলে লেলিহান অগ্নিশিখার মত তাদের দেশেও মহামারীর আগুন ছড়িয়ে যেতে পারে। তা ছাড়া হিসাবের অঙ্কে দেখা গিয়াছে যে, বসন্ত-প্রতিরোধ-খাতে বিভিন্ন দেশ বৎসরে যে পরিমাণ অর্থব্যয় করে, সমগ্র পৃথিবী হ'তে বসন্তরোগ নির্মূল করতে তার চেয়ে অনেক কম খরচ লাগবে, যদি অবশ্য আমাদের মত কয়েকটি দেশ এ বিষয়ে সকলরকম ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

শিক্ষার অন্তরায়

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মণ্ডল

শিক্ষাকে জাতির মেরুদণ্ড বলা হয়। আমাদের জাতির মেরুদণ্ড কতটা সবল তা বুঝতে দেরী হয় না যখন আমরা মনে রাখি যে, আমাদের দেশের শতকরা ৬৭ জন মানুষ আজও নিরক্ষর।

তাই আমরা এখনো এ বিষয়ে নিম্ন পর্যায়ে। শিক্ষা-প্রসারের জন্য ব্যাপকতর উদ্যোগ-আয়োজন তাই একান্ত প্রয়োজন।

বর্তমানের অপ্রতুল আয়োজনের মধ্যেও যে-সমস্ত ছেলেমেয়ে স্কুল কলেজে যায় তাদের একটা বিরাট অংশ শিক্ষা-জীবন শেষ হওয়ার পূর্বেই বিনষ্ট হয়। প্রাথমিক শিক্ষা যত ছেলেমেয়ে পায়, তার এক ক্ষুদ্র অংশই হায়ার-সেকেণ্ডারী স্তর পর্যন্ত আসে। উপরের স্তরগুলিতে এই সংখ্যা ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়। তাই শিক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের সাফল্যকে পিরামিডের সঙ্গে তুলনা করা যায়। অপেক্ষাকৃত বৃহৎ পরিধি নিয়ে আমাদের শিক্ষা শুরু; উচ্চতা যতই বাড়ে, পরিধি ততই কমে। বহু ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, বিজ্ঞানী বা অন্য কলা-কুশলী যে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় তৈরী হচ্ছে না তা নয়, কিন্তু সেই স্বল্প-সাফল্যের স্বর্ণচূড়া যে লক্ষ লক্ষ অকালমৃত বিদ্যার্থীর কঙ্কালে ধূসর! আমাদের শিক্ষা-পিরামিডের অভ্যন্তর রুদ্ধশ্বাস তরুণ-প্রাণের মৃত্যু-যন্ত্রণায় মুখর! এই অপমৃত্যুর সংখ্যা যেন দিন দিন বেড়েই চলেছে। গুণী জন এই অবস্থার নানা কারণ দেখিয়েছেন। দারিদ্র্য, হীন স্বাস্থ্য, স্থানাভাব, অনুপযুক্ত পরিবেশ, অবৈজ্ঞানিক পাঠক্রম, অমনোযোগ, শ্রদ্ধাহীনতা, অযত্ন-পাঠন ইত্যাদি নানা কারণে এই শোচনীয় পরিস্থিতি। যে তরুণ-সমাজের উপর আমরা একান্তভাবেই নির্ভরশীল, যারা আমাদের জাতীয় জীবনে বিশুদ্ধ-শোণিত-সদৃশ, তাদেরই সর্বাপেক্ষা সচেতন অংশ আজ ক্লিষ্ট, নিষ্পিষ্ট এবং মৃতকল্প!

অবস্থার পরিবর্তন একদিনে সম্ভব নয়। তবু সমস্যার গুরুত্ব উপলব্ধি করে প্রয়োজনমত ব্যবস্থা অবলম্বন করতেই হবে। সুষ্ঠু প্রতিকার স্বভাবতই বিলম্বিত হবে। বিশেষতঃ পরিবেশগত কারণগুলি দূর করতে সময় লাগবে, কারণ সেগুলি কেবলমাত্র অর্থ-নির্ভর নয়।

তবে শিক্ষালাভের পথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত যে দারিদ্র্য-জনিত বাধা তাকে বোধ হয় আমরা অপসারণ করতে পারি। পড়াশুনা চালিয়ে যাওয়ার জন্য দরকার ক্লাশের বেতন, বইপত্র, পরীক্ষার ফি, হোস্টেলের খরচ এবং চিকিৎসার জন্য ব্যয়। ন্যূনতম এই খরচগুলি নির্বাহ করার অক্ষমতায় কত প্রতিভাবান ছাত্রের জীবনে অকালে যবনিকা নেমে আসে, তা অভিজ্ঞ ব্যক্তি-মাত্রই জানেন। বিশেষতঃ গ্রামাঞ্চলে, শিক্ষার সুযোগ যেখানে অপেক্ষাকৃত কম এবং যেখানে শিক্ষা পারিবারিক ঐতিহ্যের অঙ্গীভূত নয়, সেখানে বাধার সম্মুখীন হ'লেই অভিভাবক ছাত্রকে বিদ্যালয় ছাড়িয়ে পারিবারিক আয়ের কাজে লাগিয়ে থাকেন। শিক্ষাগত মেধা বা যোগ্যতা থাকলেও গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র ছাত্রের ভাগ্য বড়ই বিড়ম্বিত।

শিক্ষাকে তাই ব্যয়-নিরপেক্ষ করা একান্ত প্রয়োজন। প্রাথমিক স্তর থেকে সুরু ক'রে উচ্চতম স্তর পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা-ব্যবস্থা চাই-ই। অবশ্য অবৈতনিক হ'লেই শিক্ষার

সুযোগ যে সর্বত্র গ্রহণীয় হবে তা নয় ; অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষাও সর্বজনীন হয়নি। তবু এতে শিক্ষাক্ষেত্রের একটি প্রধান বাধা অপসৃত হবে, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

অবৈতনিক শিক্ষাব্যবস্থা চালু না হ'লেও সরকার ইতিমধ্যেই কতকগুলি ব্যবস্থা নিয়েছেন যাতে দরিদ্র মেধাবী ছাত্রগণ কিছুটা উপকৃত হয়। সরকার-প্রদত্ত স্টাইপেণ্ড এবং স্কলারশিপের সংখ্যা পূর্বের তুলনায় এখন অনেক বেড়েছে। মেধা-বৃত্তি প্রবর্তিত হয়েছে। ঋণ হিসাবে অনেকগুলি স্কলারশিপ্ দেওয়া হ'চ্ছে। মুসলমান ছাত্রগণ কতকগুলি পৃথক স্টাইপেণ্ড পাচ্ছে। তপশিলী জাতি-উপজাতির ছাত্ররা নানাভাবে অর্থসাহায্য পাচ্ছে। এছাড়া স্কুল-কলেজের কিছু-সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী বিনা-বেতনে কিংবা অল্প বেতনে পড়ার সুযোগ পেয়ে থাকে।

এ-সমস্ত ব্যবস্থার মধ্যে একমাত্র তপশিলী জাতি-উপজাতির জন্য সাহায্যের পরিমাণই প্রয়োজন-ভিত্তিক। অন্য সমস্ত ব্যবস্থাই প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্য। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, সমস্ত স্কলারশিপ এবং স্টাইপেণ্ডের ব্যাপারে নির্বাচনের প্রধান নিরিখ হ'ল মেধা। অবশ্যই তা' হওয়া উচিত। কিন্তু আমাদের দেশের স্বতন্ত্র পরিস্থিতিতে এই পদ্ধতি সুযোগকে কেন্দ্রীভূত করেছে—তাকে পরিব্যাপ্ত করেনি। কারণ, মেধা বস্তুটি অনেকাংশেই পারিবারিক কৃষ্টির সঙ্গে জড়িত। যে পরিবারে বিদ্যাচর্চা বেশী, সেখানকার ছেলেমেয়েরা স্বভাবতঃই শিক্ষার দিকে এগিয়ে যায়। তাই স্বীকার করতে বাধা নেই যে, আমাদের সমাজের সর্বাপেক্ষা প্রগতিশীল অংশ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, বৈদ্য এবং কায়স্থ পরিবারের ছেলেমেয়েরা শিক্ষার দিকে যতটা স্বাভাবিকভাবে অনুপ্রাণিত, মাহিষ্য বা পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় পরিবারে তা' নয়। মোটামুটি হিসাবে দেখা যায় যে, বাঙালী মেধাবী ছাত্রসমাজের তিন-চতুর্থাংশই ঐ তিন শ্রেণীর অন্তর্গত এবং তারাই প্রায় সমস্ত স্কলারশিপ্ ও স্টাইপেণ্ড্ পেয়ে থাকে। তার ফল হ'য়েছে এই, শিক্ষায় যারা অধিকতর অনগ্রসর, আর্থিক দিক দিয়ে যারা অধিকতর দুর্বল, তাদের জন্য সরকারী সাহায্য নেই বললেই চলে। একথা ভুললে চলবে না যে, তপশিলী জাতিগুলি ছাড়াও তথাকথিত বর্ণহিন্দুদের মধ্যে লক্ষ লক্ষ অনগ্রসর শ্রেণীর মানুষ রয়েছে, যারা কোন দিক দিয়েই ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-বৈদ্যর সঙ্গে একাসনে বসার উপযুক্ত নয়। তেমনি মুসলমান এবং খৃষ্টান সম্প্রদায়ের মধ্যেও লক্ষ লক্ষ মানুষ রয়েছে, যারা বিদ্যা ও বিত্তে একান্তই নিম্নশ্রেণীর। সংখ্যাগরিষ্ঠ এই অনুন্নত সম্প্রদায়গুলির শিক্ষা-সমস্যার কিছুটা প্রতিকার করতে হ'লে প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে শিক্ষাকে অবৈতনিক করতেই হবে। সমাজের অগ্রসর অংশগুলি মেধা-ভিত্তিক যে সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছেন, তা' থেকে তাঁদের বঞ্চিত ক'রে নয়, সামগ্রিকভাবে অধিকতর সুযোগ সৃষ্টি করেই এই সমস্যার সমাধান করতে হবে।

কিন্তু তরুণ-সমাজকে সঞ্জীবিত করতে গেলে এবং শিক্ষার সুযোগ দেশময় প্রসারিত করতে হ'লে অবৈতনিক শিক্ষাব্যবস্থা ছাড়া ছাত্রদের খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা, পুস্তক ইত্যাদির জন্য ব্যয়-নির্বাহেরও সুব্যবস্থা চাই। এ-ব্যাপারে সরকারকেই অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে - শুধু মুষ্টি-ভিক্ষায় চলবে না। তবে সরকারী ব্যবস্থা যতদিন না গড়ে ওঠে, ততদিন বেসরকারী উদ্যোগে এই সমস্যার প্রতিবিধানের চেষ্টা হওয়া উচিত। কিছু কিছু হচ্ছেও। রামকৃষ্ণ মিশন এবং অন্য কয়েকটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান দীর্ঘদিন যাবৎ দরিদ্র-মেধাবী ছাত্রদের জন্য কাজ ক'রে যাচ্ছেন। কিন্তু সমস্যা এতই বিপুল যে, সার্বিক প্রচেষ্টা ছাড়া এর সমাধান নেই। দেশের প্রতিটি

অঞ্চলে শিক্ষা-সত্র বা ছাত্রসাহায্য-ভাণ্ডার গ'ড়ে তোলা প্রয়োজন। এই সংস্থাগুলির জন্য এলাকা নির্দিষ্ট থাকবে এবং সেই নির্দিষ্ট এলাকায় এঁরা দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীদের সবরকমে সাহায্য করবেন। জনসাধারণের দানই হবে এঁদের আর্থিক সঙ্গতির মূল। সরকারী অনুদানও তাঁদের উৎসাহ-বৃদ্ধির সহায়ক হবে। যদিও পূর্বের মত দানশীলতা দেশে এখন বিরল, তবু এই কাজে দেশবাসীর সাড়া পাওয়া যাবে নিঃসন্দেহে। প্রয়োজন সৎ, উৎসাহী এবং চরিত্রবান কর্মী—যাঁরা জনসাধারণ এবং ছাত্র-ছাত্রীদের মনে আস্থার ভাব সঞ্চার করতে পারবেন।

সরকারী এবং বেসরকারী উদ্যোগ সংযুক্ত হ'লে এমন ব্যবস্থা অচিরেই করা সম্ভব যাতে দারিদ্র্যের জন্য কাউকে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হ'তে হবে না। আর যে অবস্থায় শিক্ষালয়ের দ্বার দেশের দরিদ্রতম মানুষটির জন্যও উন্মুক্ত থাকে, তা' যে-কোন দেশ ও সমাজের পক্ষেই অত্যন্ত গর্ব ও গৌরবের। কারণ, জ্ঞানই শক্তি। জ্ঞান যেখানে অবাধ, শক্তি সেখানে অসীম। তরুণ-সমাজে ব্যর্থপ্রাণের যে আবর্জনা পুঞ্জীভূত হচ্ছে, তাকে পুড়িয়ে ফেলতে কর্মোদ্যমের আগুন কি জ্বলবে না?

অন্তর্যামী

শ্রীমতী বিভা সরকার

যবে দহিবে আমার দেহ-কারাগার
তখনো রহিব আমি
তোমাতে আমাতে মধুর মিলনে
ওগো অন্তর্যামী।
তুমি আমি আছি সদা কাছাকাছি
সে কথা ভুলিনি প্রভু!
হারাই হারাই সদা দুঃখ তাই
ভুল হয়ে যায় তবু।
বিশ্ব নিরখি তব রূপ দেখি
মেটে না আঁখির তৃষা

ত্রিভুবন-স্বামী চাহিব কি আমি?
দেখাও পথের দিশা।
বসে আছি এসে পথিকের বেশে
হৃদয়-যমুনা-পার
এস মহানেয়ে খেয়াখানি বেয়ে
নিয়ে যাও পরপার।
তুমি যে বিরাজ ওগো হৃদিরাজ
এ কথা জেনেছি আমি,
সুখ দুঃখ লাজ কিছু নাহি আজ
এস অন্তর্যামী!

বাংলা সাহিত্যে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি

শ্রীজয়দেব চট্টোপাধ্যায়

শ্রীচৈতন্যের জীবন যেমন বাংলা সাহিত্যকে এক নবীনতার আস্বাদ দিয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনও তাই। শ্রীচৈতন্যের জীবনকে কেন্দ্র করে যে সাহিত্য রচিত হয়েছিল তা এখনও বহু বাঙালীর নিত্যপাঠ্য। অবশ্য একথা অনস্বীকার্য যে, ধর্মের সঙ্গে জড়িত বলেই বাঙালীর বৈষ্ণব সাহিত্য এখনও এত প্রাণবন্ত আর একথাও ঠিক যে বাঙালীর জীবন যদি দেখাতেই হয় তবে তার ধর্মপ্রাণতা বা পথে-প্রান্তরে ছড়ানো উদাস বৈষ্ণব-বাউলের সুর বাদ দিয়ে দেখানো যাবে না। বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগে আবার একজন যুগপুরুষ উদিত হয়েছেন তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ। আধুনিক যুগে ভৌগোলিক সীমা যেমন জ্ঞান ও রসবোধকে সীমিত করতে পারছে না, ঠিক তেমনি আধুনিক যুগের যুগপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণকে আর কেবল বাঙালীর বা কেবল ভারতের বলা যাবে না, শ্রীরামকৃষ্ণ আজ বিশ্বের, বিশ্বমানবতা তাঁর মধ্যে উদ্ভাসিত হয়েছে। লাভ এই—বাংলা সাহিত্য তাঁর জীবন দ্বারা অন্যান্য সাহিত্যের তুলনায় সবচেয়ে বেশী প্রভাবিত এবং বাঙালীমাত্রেই তাঁর সাহিত্যের প্রথম ভাললাগা ও ভালবাসার আস্বাদ গ্রহণ করতে পারে। সে যাই হোক, শ্রীচৈতন্যের জীবন যেমন বাংলা সাহিত্যকে নতুন দিকে মোড় ঘুরিয়েছে, শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনও তেমনি বাংলা সাহিত্যকে অদ্ভুত নতুন রসে সমৃদ্ধ করে তুলেছে। তাঁর কথামৃতের আস্বাদ যিনি পেয়েছেন তিনিই এযুগের মূলসূত্রটি ধরে ফেলেছেন। একদিকে তাঁর জীবন অবলম্বন করে যেমন অসংখ্য পত্র-পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করেছে ও করছে, অপরদিকে তাঁর জীবনীগ্রন্থ রচনা করেও বিভিন্ন লেখক আপনার শ্রদ্ধার্ঘ্য রেখেছেন। শ্রীচৈতন্যজীবনী হিসেবে যেমন চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্যচরিতামৃত রচিত হয়েছে, শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনী নিয়েও তেমনি দুখানি প্রামাণ্য জীবনী রচিত হয়েছে—একখানি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি, অপরখানি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথিই আমাদের এখনকার আলোচ্য গ্রন্থ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গকে যদি আমরা চৈতন্যচরিতামৃতের সঙ্গে তুলনা করি, তবে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথিকে চৈতন্যভাগবতের সঙ্গে তুলনা করতে হয়। শ্রদ্ধেয় সুকুমার সেন মহাশয় চৈতন্যভাগবতকে inspired অথবা আত্মন্ত উদ্দীপ্ত রচনা বলেছেন। পুরানো বাংলা-সাহিত্যে inspired বলতে যদি চৈতন্যভাগবতকে মানা হয়, তবে আধুনিক যুগে inspired রচনা এই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি। শ্রদ্ধেয় মহেন্দ্রনাথ দত্ত-প্রণীত স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলীতে এই পুঁথি-রচনার আসল সূত্রটি আমরা পাই। সেখানে গ্রন্থকার স্বীকার করেছেন, কে যেন তাঁকে লেখবার অনুপ্রেরণা জুগিয়ে গেছে; লেখক পুঁথি না লিখে পারেননি। শুধু পুঁথির কথাই বা কেন, শ্রীরামকৃষ্ণজীবন-প্রভাবিত হয়ে অনেক কিছুই আজ এযুগে inspired-রূপে পেয়েছি, শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দের বিশ্বভ্রমণ ও বেদান্ত-প্রচার এর সাক্ষ্য দেবে।

চৈতন্যভাগবতের মতো শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথিও বই। চৈতন্যভাগবত তিন খণ্ডে বিভক্ত, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথির পাঁচটি খণ্ড। চৈতন্যভাগবতে বৃন্দাবনদাস যেমন সমসাময়িক মানুষকে অবতারের

আসনে বসিয়ে নিজের সবখানি ভালবাসা উজাড় করে দিয়েছেন—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথির রচয়িতা অক্ষয়কুমার সেনও শ্রীরামকৃষ্ণকে অবতার বলে মেনে নিয়ে সাধারণ মানুষরূপেই তাঁকে এঁকেছেন। এই পুঁথির মধ্যে কোথাও অস্পষ্টতা নেই এবং শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি লেখকের একান্ত নির্ভরতা ও ভালবাসা যেন প্রতি ছত্রে ফুটে বেরিয়েছে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথিটি 'সহজ সরল' বলেই যেন 'সহজ প্রবল'—তার আবেদন ও প্রামাণিকতা অস্বীকার করার সাধ্য হয় না কারোর।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথির এই সহজ ভাবের অনেক উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। লেখকের অন্নকষ্ট প্রচুর। তাই ঠাকুরকে মনোমত সাজাতে না পেরে দুঃখ করছেন—

পেটের জ্বালায় ঘুরি সাহেবের দ্বারে।
জনমের মত দুঃখ রহিল অন্তরে॥

কোথাও বা মায়ের মনের দুঃখ বর্ণনা করছেন—

শিন্নি মানসিক মাতা করে সত্যপীরে।
দিব পূজা সত্যপীর ছেলে এলে ঘরে॥

শ্রীরামকৃষ্ণ-নামের মহিমা বর্ণনা করছেন কবি—

গুরুদত্ত নাম রামকৃষ্ণ নাম খ্যাত।
রামকৃষ্ণ পরমহংস ভুবনে বিদিত॥
জোড়ানামে গড়া নাম নামের মহিমা।
বেদবিধি নাহি পারে করিবারে সীমা॥
জীবের পরম ধন পরিণামে গতি।
ভাগ্যবান নামে যার জনমে পিরীতি॥
রতি-মতি রামকৃষ্ণ-নামে এই চাই।
কৃপা করি দেহ দীনে ঠাকুর গদাই॥
আর এক কৃপা ভিক্ষা ওহে লীলাপতি।
উরহ হৃদয়ে কণ্ঠে লিখাইতে পুঁথি॥

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথির এই সহজ সারল্যের প্রমাণ প্রতি ছত্রে ছত্রে। কাজেই বেশী উদাহরণ দেওয়ার কোন প্রয়োজনই হয় না। তবে অতি আধুনিক যে বাংলা সাহিত্য, তার বহিরঙ্গে ইংরেজীর এত বেশী প্রভাব এসে পড়েছে বা আমরা বর্তমানে এত বেশী international (আন্তর্জাতিক) হয়ে পড়ছি যে আমাদের এখন বাংলার কীর্তন, যাত্রা, লোকসঙ্গীত, মন্দিরের কাঁসর ঘণ্টা বাজা, অনেক কিছুই সেকেলে বলে মনে হতে পারে—কিন্তু একথা ঠিক, বাংলা-সাহিত্যের নাড়ীর যোগ যিনি রাখার চেষ্টা করেন তিনি অবশ্যই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথির মধ্যে বাঙালীর সহজ গ্রামীণ মন ও ভাষাকে খুঁজে পাবেন।

এদিক থেকে বিচার করলে পুঁথির বাইরের দিক পুরানো মনে হবে, কিন্তু তা হলেও পুঁথির বিষয়বস্তু নতুন, শুধু নতুনই নয়, তা একেবারে অভিনব। শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে যাঁদের সম্মিলন হয়েছিল, তাঁরা এ যুগে অতি আধুনিক। কেশব সেন, রাম দত্ত আর নরেন্দ্রর মতো আধুনিক প্রতিভা আজও দুর্লভ। কেশব সেন সেকালের শিক্ষিত-শ্রেষ্ঠ। তাঁকে শ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশ করছেন—

ধর্ম ধর্ম করিলে না ধর্ম হয় মন।
ধর্ম অনুরাগে কর্মে ধর্ম-উপার্জন॥
ধর্মের লক্ষণ বাহ্যে ধর্মজ্ঞান স্থূল।
ধর্ম উপলব্ধি হেতু অনুরাগ মূল॥
অনুরাগ তীক্ষ্ণ ইচ্ছা শ্রীহরিচরণে।
মায়াবদ্ধ তবু মন কাঁদে রেতে দিনে॥

রাম দত্ত তৎকালীন সমাজে লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তি। সহজে ধর্মের কথা মানবেন কেন? পুঁথিকার বলছেন—

রামের নাস্তিকভাব চিতে গাঢ়তর।
কিছুতে স্বীকার নহে আছেন ঈশ্বর॥
রসায়নবিদ্যাবিৎ তর্কেতে আগুন।
বিশেষ বুঝেন জড় দ্রব্যাদির গুণ॥

প্রভু উত্তর করছেন—

নানা কথা শুনি প্রভু করিলা উত্তর।
আছেন কি কহ কথা প্রত্যক্ষ ঈশ্বর॥

তথাপিহ নাহি পাও তাঁহারে দেখিতে।
নাই তিনি বল তুমি কোন্ যুক্তিমতে॥
নক্ষত্র না হয় দৃষ্ট দিনের বেলায়।
আকাশে নক্ষত্র নাই কহা মহাদায়॥
নবনীত আছে কত দুধের ভিতরে।
সবে জানে যদি কথা নাহি ঢুকে শিরে॥

অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ কথা শুনে রামের 'চিরনাস্তিকতা-ব্যাধি' উড়ে যায়। নানাশাস্ত্রবিৎ ব্যক্তি শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে আসেন; তাঁদের কথোপকথন এবং শ্রীরামকৃষ্ণের অকাট্য যুক্তি পুঁথিতে বর্ণিত হয়েছে। শেষের দিকেও মহেন্দ্র সরকারের মতো বিজ্ঞানী তাঁর সংস্পর্শে আসেন, এসে নিজের ব্যক্তিত্ব ভুলে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের পায়ের ধুলো নেন এবং নিজেকে ভক্তগোষ্ঠীর একজন বলে মনে করেন।

শ্রীযুক্ত গিরিশ আধুনিক যুগের স্বেচ্ছাচারিতার প্রতীক। বাংলা সাহিত্যে যে প্যাগানিজম্ এসেছে গিরিশের মধ্যে তা বিশেষভাবে প্রকাশিত। আজকের যুগে সিনেমা ইত্যাদির মাধ্যমে অভিনেতারা সমাজে আসর জাঁকিয়ে বসেছেন। গিরিশ যেন তাঁদেরই সবার প্রতিনিধি হয়ে আগেই ঠাকুরের কৃপা চেয়ে রেখেছেন। পুঁথিকার বলছেন, অভিনেতারা—

স্বভাব ছাড়িতে নারে গাঁজা মদ খায়।
গুরুর মতন কিন্তু ভক্তি করে রায়॥
অদ্যাবধি সেই ধারা দিনে দিনে বাড়ে।
প্রভুর মূরতি রাখে মঞ্চের ভিতরে॥
বিশেষতঃ সাজঘরে সাজে যেইখানে।
সাজঘর অতিশয় গোপনীয় স্থানে॥
রঙ্গদিনে পরিপাটি ফুলের মালায়।
শ্রীপ্রভুর প্রতিমূর্তি সুন্দর সাজায়॥

অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মধ্যে প্রভুর যে পূজা তা এখনও প্রচলিত। পুঁথিকার বলেছেন—

গিরিশে রাখিয়া মঞ্চে প্রভুর মহিমা।
বেশ্যা লম্পটের মধ্যে ভক্তির সূচনা॥

আবার—

করুণাবতার প্রভু সকলে করুণা।
বিষয়ী লম্পট বেশ্যা করে নাই ঘৃণা॥

যদি এই সমস্ত কথোপকথন আধুনিক ধারায় প্রবন্ধ ইত্যাদির মাধ্যমে পরিবেশিত হোত তাহলে তা শিক্ষিত মার্জিতভাষাসম্পন্ন লোকের মধ্যে প্রচারিত হলেও সাধারণ গ্রাম্য সমাজে বিশেষ প্রবেশাধিকার পেত না। সাধারণ গ্রামীণ সমাজের মধ্যে পুঁথিকার এই নবজীবনের বাণী সার্থকভাবে পৌছে দিয়েছেন। পুঁথিকারের বিশিষ্ট বিনীত ভঙ্গীটিও জনসমাজে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে।

বাংলা সাহিত্যে জীবনীগ্রন্থ খুব বেশী নেই, বিশেষ করে চৈতন্য-জীবনীর পরে তার সমকক্ষ জীবনীগ্রন্থ বোধ হয় এই প্রথম। কবি অত্যন্ত সার্থকভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের ঘটনাবলী বিন্যস্ত করেছেন। একটা সুন্দর গাঁথুনি পুঁথিতে পাওয়া যায়, শুধু তাই নয় শ্রীরামকৃষ্ণের অদ্ভুত উপদেশ এবং ভাব ও সমাধি পুঁথির মধ্যে বেশ একটা নাটকীয়তা ও চিত্রধর্মিতা এনে দিয়েছে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথির আর একটি বিশেষত্ব হল এর প্রামানিকতা। সমসাময়িক যুগে লেখা বলে লেখক নিজ চক্ষে অনেক কিছু দেখেছিলেন আর যা দেখেননি তা অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে জেনেছেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি লিখে কবি আর কিছু চাননি— না সাহিত্য-সম্মান, না পাণ্ডিত্যের অভিমান, না টাকাকড়ি। রচয়িতার প্রাণের জিনিস এই পুঁথি, জীবনের সবখানি মাধুর্য এতে ঢেলে দেওয়ায় পুঁথি একটি অদ্ভুত ভক্তিগ্রন্থ হয়ে বাংলা সাহিত্যে স্থান পেয়েছে। লেখকের এই ভাব থাকার জন্যই পুঁথি শ্রীরামকৃষ্ণজীবন-কেন্দ্রিক বহু রচনাকে প্রভাবিত করেছে। অথবা একথা বলা যায়—

যিনি শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন নিষ্ঠার সঙ্গে অধ্যয়ন করতে চাইবেন, তাঁর পক্ষে পুঁথিপাঠ একান্ত প্রয়োজন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথিতে আর এক উল্লেখযোগ্য জিনিস হোল এর মাঝে মাঝে সঙ্গীত। শ্রীরামকৃষ্ণ যে সমস্ত সঙ্গীত গাইতেন বা ভক্তবৃন্দ যে-সমস্ত গান তাঁকে শোনাতেন, তা পুঁথিতে সন্নিবিষ্ট আছে। ফলে হয়েছে এই—যদি পুঁথি ব্যাখ্যা-সমেত পাঠ করা যায় তবে দেখা যাবে তা অত্যন্ত মনোহর হয়ে উঠেছে শ্রোতাদের মনে। কেবল পাঠের জন্যই নয়, শ্রীরামকৃষ্ণ-অনুরাগী ব্যক্তিদের কাছে একটা গীতি-সংকলনও পুঁথিতে আমরা পাই—সঙ্গীতগুলি পুঁথিতে দেওয়ার জন্যে। পুঁথি ব্যাখ্যা করার জন্যে উপকরণ পাওয়া যাবে সমগ্র শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্যে, এর সঙ্গে থাকবে নানা গল্প, নানা উদাহরণ, মাঝে মাঝে ঐ ভাবানুসারী গান পরিবেশন করা যেতে পারে অনায়াসে। এই দিক থেকে ভাবলে দেখা যায়, একদিকে চৈতন্যচরিতামৃতের পরে যেমন এই পুঁথি শ্রীরামকৃষ্ণ-অনুরাগিবৃন্দের পঠনীয় গ্রন্থ, অপরদিকে বিভিন্ন গান ইত্যাদি থাকার জন্য পুঁথি অনেকটা গেয়ও (গাইবার জন্যও) বটে।

বৈষ্ণব সমাজে গুরুবাদ একটি বিশেষ ভূমিকা নিয়ে আছে। শ্রীরামকৃষ্ণপুঁথিতে গুরু ও ইষ্ট যেন মিশে রয়েছেন। বর্তমান শিক্ষিত সমাজে গুরুবাদ নিষ্ঠাসহকারে গৃহীত হচ্ছে না—শ্রীরামকৃষ্ণ এটা আগেই বুঝেছিলেন, তাই তিনি জগদ্‌গুরু হয়েও নিজের শিষ্য বলে কাউকে বিশেষ চিহ্নিত করতে চাননি। এমনকি তাঁর অনুগামীদের মধ্যেও 'গুরু' 'কর্তা' 'বাবা' এই কথাগুলির বিশেষ চলন নেই, যদিও ধর্মজীবনে গুরুবাদ অনস্বীকার্য। পুঁথিতে এই গুরু যেন সকল মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে গেছেন। কবি বলেছেন—

ভক্তমধ্যে ছোট বড় জ্ঞান হয় ভ্রম।
সকলে আমার পূজ্য বুঝিবে এমন॥
ছোট বড় বিচারিতে নাহি অধিকার।
সকলে বুঝিবে রামকৃষ্ণ-পরিবার॥
রামকৃষ্ণভক্তে বুঝি জীবন-জীবন।
ভাব মন দিবানিশি তাঁদের চরণ॥
গৃহস্থ সন্ন্যাসী ভক্ত এই দুই শ্রেণী।
সকলের পদরজে লুটাও অবনী॥

খুব সত্য কথা। শ্রীরামকৃষ্ণ এই যে জনে জনে ছড়িয়ে আছেন, তাঁর ভক্তমণ্ডলীই যে তাঁর হৃদয়, বাংলা ভক্তিগ্রন্থে বোধ হয় পুঁথিকারই প্রথম, যিনি শ্রীরামকৃষ্ণের অদ্ভুত ভাবটিকে প্রতিষ্ঠিত করলেন।

চৈতন্যচরিতামৃতে দার্শনিক ভাগ বেশী। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গেও তাই। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ যেন অনেক তত্ত্বমণ্ডিত ও অনেক যুক্তিজালসমন্বিত। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি তাই সকলের হৃদয়ে স্থান নিয়েছে। বাংলাসাহিত্য-সমালোচকদের মধ্যেও যেন অদ্ভুত গোঁড়ামি এসেছে। ধর্মের নামগন্ধ যেখানে আছে সেখানে তাঁদের যেতে বড় দ্বিধা। বক্তব্য এই, ধর্ম-বিশ্বাস থাকুক বা না থাকুক, অন্ততঃ সাহিত্যের ইতিহাস পাঠ বা রচনা করতে গেলেও এরকম একখানা বইকে বাদ দিয়ে যাওয়া যায় না। একদিন আসবেই যেদিন চৈতন্যসাহিত্যের মতো শ্রীরামকৃষ্ণসাহিত্য নিয়ে সাহিত্যের ইতিহাসে একটা বিশেষ অধ্যায় লেখা হবে। জীবন নিয়ে যাঁদের কাজকারবার, সেই সাহিত্যিকরা নিশ্চয়ই শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন-সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করবেন। কথামৃত-লীলাপ্রসঙ্গ-পুঁথির নূতন করে আলোচনা হবে। নিরপেক্ষ দৃষ্টি নিয়ে এ আলোচনা করতেই হবে, তা নইলে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকবে। চৈতন্য-চরিতামৃত ও চৈতন্যভাগবত শিক্ষিত বাঙালী বিশেষ পড়েন না, তাঁদের বাঁচিয়ে রেখেছে অগণিত গ্রামীণ বাংলার জনগণ। এই মরমী

সাহিত্য তাঁদের মরমে স্থানাধিকার করে আছে। কাজেই যতদিন পর্যন্ত পুঁথি যথাযথ গাম্ভীর্যের সঙ্গে সাহিত্যালোচনার বিষয়বস্তু না হয় ততদিন পর্যন্ত এবং তার অনেক অনেক পরেও পুঁথি শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত-সমাজে হৃদয়ের বস্তু হয়ে পঠিত হতে থাকবে। বাংলার সমস্ত নিজস্ব সম্পদকে ধর্মপ্রাণ বাঙালী যেমন আজও বাঁচিয়ে রেখেছে, আগামী কালেও সেই ধর্মপ্রাণ বাঙালীই তার সাহিত্যকে নিঃসন্দেহে বাঁচিয়ে রাখবে।

'তত্র কো মোহঃ কঃ শোকঃ'

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

নামেরে প্রণাম করো। রামকৃষ্ণ নাম
অবিচ্ছিন্ন তৈলধারাসম অবিরাম
জপ করো, জপ করো সর্ব অবস্থায়!
ঘুমঘোরে, জাগরণে, পথে বা শয্যায়
অনুরাগ-অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে নাম নিও!
নাম ও নামীরে নিত্য অভিন্ন জানিও।
ঘুমে শান্তি শরীরের! নামে শান্ত মন!
নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে তাই নাম সর্বক্ষণ!
কণ্ঠ যার সিক্ত স্বাতিনক্ষত্রের জলে—
রামকৃষ্ণ-নাম-সুধা-সিন্ধুর অতলে
ডুবুক সে! নামেরে যে করেছে আশ্রয়—
কোথা মোহ? কোথা শোক? কোথা তার ভয়?
নামের আশ্রয়ে কত পাপী দুরাচার
মুক্ত, শুদ্ধ হয়ে গেল!—সংখ্যা আছে তার?

ভারতীয় রাষ্ট্রদর্শন-পরিচয়

[পূর্বানুবৃত্তি]

ডক্টর শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়

৩। রাজনৈতিক আনুগত্য :

মহাভারতের রাজনীতি জনপ্রিয় সার্বভৌমিকতার ইংগিত সুস্পষ্টভাবে বহন করে বলে এবং প্রজাপীড়ক নৃপতির ক্ষেত্রে প্রজাবিদ্রোহ সমর্থন করা হয়েছে বলে উপযোগিতার উপলব্ধিকেই রাজনৈতিক আনুগত্যের ভিত্তি বলে ধরতে হয়। অন্যভাবে বলতে গেলে, সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার একটা প্রয়োজনীয়তা, একটা উপযোগিতা আছে —মানুষকে অরাজকতা থেকে রক্ষা করাই হ'ল সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার উদ্দেশ্য। প্রজারা এই উপযোগিতা সম্বন্ধে সচেতন বলেই রাজাকে আনুগত্য প্রদান করে থাকে। কিন্তু রাজা যদি অত্যাচারী হন, তবে অরাজক অবস্থার আর নৃপতি-শাসিত ব্যবস্থার দুর্দশার মধ্যে পার্থক্য কোথায়? দণ্ডনীতিই বা তখন কাযকর হয় কি করে? অতএব রাজনৈতিক আনুগত্য তুলমূল্যভিত্তিক : রাজা রাজধর্মানুসারে প্রজাপালন করবেন আর প্রজারা তাঁকে আনুগত্য প্রদান করবে। প্রজাপালন রাজার কর্তব্য আর আনুগত্য তাঁর অধিকার, তিনি প্রজাপালন করে তবেই আনুগত্যের অধিকারী হতে পারেন—নচেৎ নয়। এইজন্যই শান্তিপর্বে ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ দিয়েছেন : ধর্মরাজ, তুমি যদি সম্যক প্রজাপালনে অসমর্থ হও তবে প্রজারা তোমাকে মানবে না।

মহাভারতের এই ধারণাই বিশেষভাবে পরিস্ফুটিত হয়েছে স্বামী বিবেকানন্দের 'বর্তমান ভারত' নামক রাজনৈতিক নিবন্ধে। প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে, স্বামীজীর এই নিবন্ধ ভারতের ঊনবিংশ পর্ব বলে অভিহিত হরিবংশ দ্বারা বেশ কিছুটা প্রভাবান্বিত বলেই মনে হয়।

৪। রাজ্যরক্ষায় বলপ্রয়োগ :

রাজনৈতিক আনুগত্যের ভিত্তি উপযোগিতার উপলব্ধি হলেও রাজ্যরক্ষায় যে বলপ্রয়োগের ক্ষেত্র আছে, তা মহাভারতকার ভালভাবেই জানতেন। তাই তিনি বলেছেন : "রাজার ভয়েই প্রজারা পরস্পরকে সংহার করে না।" লোকে রাজাকে ভয় করবে কেন? কারণ, রাজার দণ্ডপ্রদানের ক্ষমতা আছে—অর্থাৎ রাজার আদেশ অমান্য করলে বলপ্রয়োগের সম্ভাবনা রয়েছে। রাজ্যরক্ষার এই দিকটিকে সমাজে ন্যায়বিচার-প্রতিষ্ঠা (just ordering of society) বলে অভিহিত করা যায়।

রাজ্যরক্ষার দিকটি হ'ল বহিরাক্রমণ থেকে দেশরক্ষা। প্রথম দিকের চেয়ে এই দিকটি কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। বস্তুতঃ বহিরাক্রমণ থেকে রাজ্যরক্ষায় অসমর্থ রাজা সমাজে কখনই ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে পারেন না। তাই মহাভারতে সৈন্যসম্ভার, দুর্গনির্মাণ, যুদ্ধপদ্ধতি প্রভৃতি বল বা শক্তির আনুষঙ্গিক উপাদানের ওপরও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। আরও বলা হয়েছে ক্ষত্রিয়ের কাছে ধর্মযুদ্ধ অপেক্ষা কাম্য কিছুই নেই। অবশ্য এখানে গীতার অনুশাসনই মহাভারতে প্রতিফলিত হয়েছে (গীতা, ২।৩১) তবে গীতা তো মহাভারতের অঙ্গীভূত।

১ এই প্রবন্ধের লেখকের The Philosophy of Man-making-এর ৬ষ্ঠ এবং ৭ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৫। 'গণ:'

মহাভারতে যাকে 'গণ' বলা হয়েছে তাকে ঠিক 'সাধারণতন্ত্র' বলা যায় কিনা তা নিয়ে বিশেষ মতবিরোধ আছে। অধিকাংশের মত হ'ল, রাজ্যমধ্যে স্বায়ত্তশাসনমূলক গোষ্ঠী বা সংস্থাই 'গণ'। এই সংস্থা ধর্মীয় সংস্থাও হতে পারে আবার রাজকুল বা রাজপরিবারও হতে পারে।[২] তবে এই গোষ্ঠী বা সংস্থা যে অনেকাংশে স্বায়ত্ত-শাসনমূলক ছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই দিক দিয়ে - অর্থাৎ রাজশক্তির আওতার অনেকটা বাইরে বলে গণের অস্তিত্ব 'আইনের সমক্ষে সমতা'র নীতির বিরোধী।

তবে গণের স্বাস্থ্যরক্ষা রাজধর্মভুক্ত এবং এই প্রশাসনিক ব্যাপ্তির উদ্দেশ্য বৃহত্তর কল্যাণ।

৬। কর-ব্যবস্থা:

মহাভারতে কর-ব্যবস্থা সম্বন্ধে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তার মূলনীতিকে এইভাবে বিবৃত করা যায়: প্রজাদের করবহনের সামর্থ্যের (taxable capacity) প্রতি দৃষ্টি রেখে প্রয়োজনীয় কর সংগ্রহ করা। সংগ্রহের পদ্ধতিও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ইঁদুর যেমন তার তীক্ষ্ণ দন্ত দিয়ে ঘুমন্ত লোকের মাংস কুরে কুরে খায়, রাজাও তেমনি প্রজাদের কাছ থেকে ধীরে ধীরে কর আদায় করবেন। অর্থাৎ প্রজারা যাতে করভার-জনিত বেদনাবোধ না করে, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। মনুসংহিতাতে এ নির্দেশই দেওয়া হয়েছে: জোঁকের রক্তপাতের মত, বাছুরের দুগ্ধপানের মত, ভ্রমরের মধুপানের মত রাজা প্রজাদের কাছ থেকে কর সংগ্রহ করবেন (মনু ৭।১২৯)।

আপৎকালে অবশ্য রাজা প্রজাদের কর বৃদ্ধি করবেন, কিন্তু প্রজাদের সম্মতি নিয়ে। আর আপৎকালীন অবস্থা কেটে গেলেই সমস্ত অপ্রয়োজনীয় সংগৃহীত কর ফেরত দেবেন। বর্তমান সময়ে অতিরিক্ত 'মুনাফা' কর (excess profit tax), মূলধনের ওপর এককালীন ধার্য কর (capital levy) প্রভৃতির সন্ধান মহাভারতের এই নির্দেশের মধ্যে পাওয়া যায় না কি? তবে রাজকোষ যাতে পূর্ণ থাকে সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে, রাজকোষ পূর্ণ থাকলে রাজা সকল বিপদ থেকে উত্তীর্ণ হন। "বস্ত্র যেমন নারীর লজ্জা নিবারণ করে, ধনও তেমনি রাজার সকল দোষ আবরণ করে।"

বর্তমান দিনে রাজকোষ পূর্ণ রাখার তাৎপর্য হ'ল স্বর্ণসঞ্চয় ও বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয়। সকল রাষ্ট্রই এ দিকে দৃষ্টি রাখে। অতএব, রাজকোষ পূর্ণ রাখা হ'ল অন্যতম শাশ্বত নীতি, যা বহুপূর্বে মহাভারতকার সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করে-ছিলেন।

খ। আপৎকালীন অবস্থায় রাজধর্ম:

আপদ্‌গ্রস্ত রাজার রাজধর্ম সম্পূর্ণ সময়োপ-যোগী হবে। সর্বক্ষেত্রে তিনি দীর্ঘসূত্রতা পরিহার করবেন এবং বাইরে মৃদুভাব দেখালেও ভেতরে ভেতরে বুদ্ধি ও যুক্তিকে মান দিতে থাকবেন। প্রয়োজন হলে তিনি শত্রুর সঙ্গে সখ্য স্থাপন করবেন কিন্তু ঐ নতুন মিত্রকে কখনও পুরোপুরি বিশ্বাস করবেন না। ঐ বন্ধুত্বের প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে গেলে আবার রাজা পূর্বাবস্থায় ফিরে আসবেন। বন্ধুর ভাব দেখিয়ে শত্রুকে যখন বশে আনবার চেষ্টা করবেন তখন রাজাকে স্মরণ রাখতে হবে যে, ঐ শত্রুর মধ্যে একটি সর্প লুক্কায়িত আছে যা যে-কোন সময় দংশন করতে পারে। করবে কি না-করবে, তা ঐ শত্রুর অতীত আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করতে হবে।

২ Ghoshal: Hindu Political Theories, of. cit, pp 160ff.

আপদ্‌গ্রস্ত রাজার আচরণ এমন হবে যে, শত্রু যেন তাঁর ছিদ্র খুঁজে না পায়। অপর দিকে রাজা কিন্তু সব সময় শত্রুর ছিদ্রান্বেষণ করে চলবেন। সিংহের মত শক্তিপ্রকাশের সামর্থ্য এবং প্রয়োজনমত নেকড়ে বাঘের মত অতর্কিতে শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার ক্ষমতা—উভয়ই আপদ্‌গ্রস্ত রাজাকে অর্জন করতে হবে।

বিপদে ঝাঁপ না দিয়ে কোনপ্রকার কল্যাণ-সাধনই সম্ভব নয়। তাই সকল প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রেই বিপদের সম্মুখীন হতে হবে। অতএব পূর্বাহ্ণে যথাযথ পরীক্ষা করে তবেই বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। শত্রু বা মিত্র বলে কোন স্বতন্ত্র গোষ্ঠী নেই। অবস্থানুসারে একই ব্যক্তি শত্রু ও মিত্র হতে পারে। তীব্র অনুতাপ করলেও রাজার পক্ষে শত্রুকে ছেড়ে দেওয়া উচিত হবে না। ঋণের মত শত্রুরও শেষ রাখতে নেই।

রাজাকে শকুনির মত সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিশক্তি-সম্পন্ন হতে হবে, আর হতে হবে বকের মত ধৈর্যশীল, সিংহের মত সাহসী। কিন্তু বায়সের মত সর্বদা শঙ্কিত। এইভাবে গুণসমন্বিত হয়ে তিনি শত্রুর ভূখণ্ডে সর্পের মত সাবলীল গতিতে যাত্রা করবেন।

যাঁরা রাজার বিরোধী তাঁদের মধ্যে দলাদলি-সৃষ্টির চেষ্টা আপৎকালীন রাজধর্মের অঙ্গীভূত। কিন্তু নিজের সচিবদের মধ্যে যাতে ঐক্য বজায় থাকে সেদিকেও রাজাকে বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে। এই উদ্দেশ্যে নম্রতা হবে তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

প্রত্যেক পদে আপদ্‌গ্রস্ত রাজাকে বিচার করে দেখতে হবে, প্রচেষ্টা ফলবতী হবার সম্ভাবনা কতদূর। খনন করে যদি মূলে পৌছান না যায় তবে খনন না করাই ভাল; তেমনি যার শিরশ্ছেদন সম্ভব নয় তাকে আঘাত না করাই উচিত

উপসংহার :

এই হ'ল আপৎকালীন অবস্থায় রাজধর্ম। এই রাজধর্ম বিশেষ করে মেকিয়াভেলিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু পার্থক্য হ'ল দু'দিক দিয়ে: মেকিয়াভেলি স্বাভাবিক অবস্থায় রাজ-নীতির ব্যাখ্যা ঠিক করেননি (অবশ্য তাঁর পক্ষে তা করা সম্ভব ছিল না, কারণ আপন্ন ইতালীর নিরাময়ই ছিল তাঁর লক্ষ্য), এবং মেকিয়াভেলি কোথাও বলেননি যে, শেষ পর্যন্ত নৃপতিকে ধর্ম বা চরম বিধির কাছে দায়ী থাকতে হবে। শেষের দিকটিকে মহাভারতকার সুস্পষ্টভাবেই পরিস্ফুটিত করেছেন—সময়োচিত রাজধর্মে সকল সাময়িক ব্যবস্থার পশ্চাতে আছে ধর্মের নিকট দায়িত্বশীলতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ। তাই আপৎকালীন অবস্থায় রাজধর্মের ব্যাখ্যা শেষ করে ভীষ্মদেব বলেছেন: এই আচরণ হ'ল শুধু আপৎকালীন অবস্থার জন্যে—ধর্মরাজ একথা সর্বদাই স্মরণ রাখবেন। (ক্রমশঃ)

স্বামী অখণ্ডানন্দের স্মৃতিসঞ্চয়

[পূর্বানুবৃত্তি]

['ভক্তে'র ডায়েরি হইতে

১২ই জানুআরি ১৯৩৭—আজ পৌষালী বনভোজন। সকাল হইতে ছেলেদের পড়াশুনা নাই। পুকুরে মাছ ধরা হইতেছে, বড় মাছ নয় - ছোট ও মাঝারি মাত্র। খিচুড়ি, গাঁদাফুলের বড়া, কপির তরকারী—বকুলতলায় সকলে আনন্দে বনভোজন করিল। বিকালে ছোট বড় সকলকে বাবার সামনে কাবাডি খেলিতে হইল সারাদিন আনন্দে কাটিয়া গেল।

১৪ই—"কাশীপুরে একদিন কার কি কথায় একজন বলেছেন, 'জানি জানি'। ঠাকুরের তখন কথা বলতে গেলে গলা চিরে রক্ত বেরোয়, তবু হাত দিয়ে বালিস থেকে মাথা তুলে বললেন, 'কি বললি—জানিস? আর বলিসনি। কি জানিস? সখি, যাবৎ বাঁচি তাবৎ শিখি। যে বলে—জানি, সে জানে না; যে বলে—জানি না, সে বরং জানে। অনন্তজ্ঞান কতটুকু জানিস?' এই ব'লে সেই অসুস্থ শরীরে কত কথা!—গলা দিয়ে রক্ত বেরিয়ে গেল। আর কখনও কেউ ঐ কথা উচ্চারণ করেনি।

"পরে উপনিষদে দেখলাম ঠিক কথা—'যস্য মতং তস্যামতম্ অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতম-বিজানতাম্' আছে—যে বলে জানি, সে জানে না, যে বলে জানি না, সে বরং জানে।

"ঠাকুর বলেছিলেন, 'কিছু করতে হবে না, দাঁড়িয়ে জল খাসনি, আর গালে হাত দিয়ে ভাবিসনি'। মহারাজ জল খেতে হ'লে তালতলার জুতোটি খুলে, বসে, তবে জল খেতেন। তাঁরা তো দেখিয়ে যান। লোকে কতটুকু নেয়? মহারাজ নিজের এঁটো প্রসাদ দিতে চাইতেন না; নিতে গেলে বলতেন, 'তোকে দিতে পারব না।' তা আমি খেয়ে নিতুম।"

১৫ই—পৌষসংক্রান্তি। গঙ্গাস্নানে মেলায় আশ্রমের কুকুরটি হারাইয়া গিয়াছে। সন্ধ্যাবেলা বাবা বলিতেছেন, "মনে ভারি কষ্ট হচ্ছে—যেন **bereavement** (একটা বিয়োগব্যথা)।" একটু পরে খবর আসিল, কুকুরটি একজনরা বাঁধিয়া রাখিয়াছিল। পরদিন কেহ গিয়া লইয়া আসিবে।

সন্ধ্যায় শাস্ত্রব্যাখ্যার কত রকমের কথা হইল: দ্যোতনা, মূর্ছনা, লক্ষণা। "বেদান্তে সব আছে। গঙ্গায়াং ঘোষঃ—এ হ'ল লক্ষণা; গঙ্গার ওপর তো গয়লাপাড়া হয় না, অতএব গঙ্গার তীরে। ঠারে ঠোরে বুঝে নিতে হবে, বুঝলে? স্পষ্ট ক'রে সব বলা যায় না।"

১৬ই—সন্ধ্যা। আগেই গল্প আরম্ভ হইয়া গিয়াছে: ব্রাহ্মণ, বোঁচকা ও একটি বাহকের গল্প। "খানিক দূরে গিয়ে ব্রাহ্মণ কি কারণে লোকটাকে বলেছে, 'তুই চামার'। বলতেই সে বোঁচকা ফেলে পালিয়ে গেল, সে সত্যি চামার ছিল কিনা।

"মায়ার স্বরূপ বোঝাবার সময় ঠাকুর এই গল্পটি বলতেন, মায়াকে চিনতে পারলেই মায়া পালিয়ে যায়। 'আমি বোকা বুদ্ধিহীন', এটি ঠিক ঠিক ধারণা হলেই তো সে ঠিক ঠিক বুদ্ধিমান্। সরল প্রাণে তাঁর কাছে কেঁদে কেঁদে একরাত্তির বলো দেখি—'প্রভু, আমি বোকা বুদ্ধিহীন; কিছু জানি না, কিছু বুঝি না। তুমি বুঝিয়ে দাও, দেখা দাও।' দেখবে রাতারাতি সব উল্টে গেছে। যে বুঝতে পেরেছে—'আমি বোকা', সে কি আর বোকা থাকে? 'The fool who knows that he is a fool is

wise so far. But the fool who thinks himself wise is a fool indeed.'—যে বোকা জানে যে, সে বোকা, সে ততটুকু জ্ঞানী। কিন্তু যে নিজেকে জ্ঞানী বলে মনে করে, সে সত্যি বোকা। ভারি সুন্দর কথা।

"জ্ঞানী গুরুর কাছে থেকে যদি ঐটুকু হুঁশও না হয় তো কি হ'ল? আধ্যাত্মিক জগতে যতটা ভালবাসা—এ আর কোথাও নয়। পিতার দশগুণ ভালবাসা মাতার, মাতার চেয়ে বেশী জ্ঞানদাতা গুরুর। গুরু যতটা ভাবেন, ততটা কি আর কেউ ভাবেন? মা দেখেন শুধু এই শরীর—এই জন্ম।

"বোকার ধর্ম হয় না। যে এখানে ঠকে, সে সেখানে ঠকে। যার এখানে নেই, তার সেখানে নেই। 'বোকার ধর্ম হয় না'—এসব ঠাকুরের axiomatic truth (স্বতঃসিদ্ধ সত্য)। সব জানবার একটা ইচ্ছে হোক, চেষ্টা হোক। আমরা সারাটি জীবন শিখেছি—কত বই পড়েছি, তা কি একবার—কতবার! কি জানি যদি ভুলে গিয়ে থাকি। সে রকম স্মৃতিশক্তিশালী নই তো।

"তারপর এখনও শিখছি। মোড়ল এসে ব'লে গেল, 'ছেলেদের নিয়ে এই গাছগুলো নির্মূল ক'রে কাটিয়ে দিন। বীজ ছড়াচ্ছে—আগাছায় সব রক্তবীজের ঝাড়ের মতো ছেয়ে যাবে।' ঠিক কথা, এ-সব ওর কাছে শিখব না তো কি য়ুনিভার্সিটির এম্‌-এ, বি. এ-র কাছে শিখব? যার কাছে যা। 'অন্ত্যাদপি পরো ধর্মঃ......। যুক্তিযুক্তমুপাদেয়ং বচনং বালকাদপি॥' অযৌক্তিক হ'লে সাক্ষাৎ ব্রহ্মের কথাও তৃণ ব'লে উড়িয়ে দেবে। প্রলাপ থেকেও সত্যটুকু নিতে হবে।

"আমরা ছেলেদের নিয়ে বনে বনে যেতুম গাছ-গাছড়া চিনতে। আজকালকার ছেলেরা ঝিঙে-গাছকে বলে তেলাকুচা। লাউ-কুমড়ো গাছের তফাত জানে না। 'ধানগাছের তক্তা' যে বলে—তা ঠিকই। ঠাকুর যখন আমাকে এসব garden agriculture (বাগান চাসাবাদ) করাচ্ছেন, পাড়াগাঁয়ে রেখেছেন, তখন এসবই ভাল ক'রে দেখতে শুনতে হবে। নইলে কতই তো ঘুরলাম, ঠাকুরই তো প্রথম এইখানে আশ্রম করালেন। এখন তো ৫৫ বিঘা জমি। কত কি করবে কর না। তখন আরম্ভ দু-বিঘা নিয়ে। তাতেই বেলা ২টা।৩টা পর্যন্ত—মাটি কোপাতুম, ভুট্টা-টুট্টার বীজ ছড়িয়ে দিতুম। একটা হাফ্‌প্যাণ্ট পরে বেল্ট না এঁটে লেগে যেতুম, ঘাম ছুটে যেত। বেলা দুটো, কোন কোন দিন, তিনটার পর জল-দেওয়া পান্তাভাত লেবুর রস দিয়ে খেতুম।"

১৭ই—আমেরিকা যাত্রার পূর্বে শ্রীমতী ভক্তি ও শ্রীমতী অন্নপূর্ণা* একলা একবার বাবাকে দেখিয়া যাইবেন বলিয়া লিখিয়াছেন। বাবা বহরমপুরে একটি ভক্ত-মহিলাকে চিঠি লিখিতে বলিলেন—'আগামী কাল আমাদের আশ্রমে দুইজন দেবী আসিবেন। তুমি অতি অবশ্য তাঁহাদের দর্শন করিতে আসিবে।' পরে বলিলেন, "সত্যি এরা সব দেবদেবী, ঠাকুরের লীলার সহায় হয়ে এসেছে।"

১৮ই—স্বামী সারদানন্দজীর জন্মতিথি। ভোরবেলাই ভক্তি, অন্নপূর্ণা ও কন্যা ফ্রান্সেস আসিয়াছেন। বাবার জন্য এবারও কত কি আনিয়াছেন। বাবাও তাঁহাদের দিবার জন্য সুন্দর বালাপোষ তৈয়ার করাইয়াছেন। অস্ফুট ভাঙা ভাঙা ভাষায় কত কি আলাপ হইল। ভক্তকে বলিয়া রাখিয়াছিলেন 'স্মৃতিকথা'র 'শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্গে' অংশটুকুর খানিকটা অনুবাদ করিয়া রাখিতে। সেটুকু শোনানো হইলে

* বেলুড়ে শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির নির্মাণের জন্য সাহায্য করেন—Miss Rubel ও Mrs. Worcester.

তাঁহারা খুব আনন্দিত হইলেন। পরে বেলুড়ের মন্দির সম্বন্ধে কিছু কথা হইল। তাঁহারা বারবার বলিতে লাগিলেন, 'মন্দির-প্রতিষ্ঠার সময় আপনাকে যেতেই হবে।' বাবাও বলিলেন, "নিশ্চয়। সে সময় থাকব, দেখব। স্বামীজী বলেছেন—তিনিও দেখবেন।" সকলে একবার মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিলেন। ৫টার ট্রেনে ভক্তি ও অন্নপূর্ণা চলিয়া গেলে বাবা সারা সন্ধ্যা শুধু তাহাদের স্নেহ ভালবাসা ও ভক্তির কথা বলিতে লাগিলেন।

১৯শে—সন্ধ্যাবেলা Hugo, Tolstoy, Correlli-র নভেলের কথা বলিলেন। পরে গ্যারিবল্ডির রোমজয়ের পর কাপ্রেরায় চাষ করিতে যাওয়া এবং দেশের দুঃখে ম্যাটসিনির আজীবন কালো পোশাক পরা—তাঁহাকে কিভাবে প্রভাবিত করে সেই কথা বলিলেন

"জর্জ মুলার বলেছেন, তাঁর Orphanage-এর (অনাথাশ্রম) 'Every brick from prayer' (প্রতিটি ইট প্রার্থনা ক'রে) তিনি পেয়েছেন। বুকার ওয়াশিংটন-এর 'Up From Slavery' বইখানি শরৎ মহারাজ (স্বামী সারদানন্দজী) আমায় পড়তে দেন, বলেন, 'ভাই, তোমার আশ্রমের মতো বুকার কি কষ্ট করেছেন,—কত চেষ্টা করেছেন কতবার বিফল, শেষে সাফল্যমণ্ডিত! এঁরা সব men with mission, born to be immortal (মহাব্রত উদ্‌যাপন ক'রে অমর হ'তে জন্মেছেন), অমর হতেই যেন জন্মেছেন

"জেনারেল বুথ (General Booth)-এর বই 'In Darkest England and The Way out, এখানে রয়েছে—পড় না। দেখবে, দেশের জন্য, সমাজের জন্য feel (বেদনাবোধ) করেছেন, উপায় ভেবেছেন, তারপর প্রাণপণ কাজে লেগেছেন। 'Salvation Army (মুক্তিফৌজ)—We march along you' (তোমাদের সাথে চলেছি)। স্বামীজী বলতেন, 'আমরাও তো একরকম Salvation Army (মুক্তিফৌজ)। আমাদেরও বলতে হবে 'We march along you' (তোমাদের সাথে চলেছি), কাজেও দেখাতে হবে।"

২০শে—কয়দিন হইল কলিকাতা হইতে একটি যুবক আসিয়াছে, যুবকটি দীক্ষিত, ল পড়ে। বাবা তাহাকে উদ্দেশ করিয়া অনেক বৈরাগ্যের কথা বলিতেছেন: "স্বামীজী বলতেন, Bar and religion cannot go together. (ওকালতি ও ধর্ম একসঙ্গে চলতে পারে না।) আর মরণের কি বয়স আছে? দিনক্ষণ আছে? মায়ের পেটেও ছেলে মরছে। মরণের যদি দিন ঠিক নেই তো তাঁকে ডাকার দিনক্ষণ কেন? আর তোমার তো line clear (রাস্তা পরিষ্কার)—মা নেই, তুই দাদা। এখন নিজের ওপর।"

২১শে—দিনের বেলা আশ্রমে (অতিথি-ভবন-নির্মাণ বিষয়ে) এঞ্জিনিয়ার ও কণ্ট্রাক্টর-এর সঙ্গে কথা হয়। সন্ধ্যায় বলছেন, "University common sense (বিশ্ববিদ্যালয় সাধারণ বুদ্ধি) নষ্ট ক'রে দেয়। এ আমার কথা নয়, P. C. Roy (স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায়) বলেছেন নিজেই। নতুন কিছু কর না নিজের চেষ্টায়। (হিউ-এন সাঙ-এর life (জীবনী)-এর বাংলা করলে কত কাজ হয়। এ-সব বই পুরাণের চেয়ে সত্য, ইতিহাস বলতে পারো।"

২২শে—মানিকগঞ্জের ছয়টি ছেলের আজ দীক্ষা হয়। পরে এক প্রসঙ্গের পর বাবা বলিতেছেন, "আমাদের অমন মাথা নয় যে সবটা ভরতি; আর এতটুকুতে যা একটু আছে, তার জোরেই ঝগড়া রাগ মান অভিমান। আমরা কত আগে থেকে দেখে কত ভেবে কাজ করি।"

* ৪।৫ বছর পরেই যুবকটি হঠাৎ কলেরায় মারা যায়।

কয়েকদিন ধরিয়া বাবা নতুন গোলাপ-চারা লইয়া সারাদিন খুব ব্যস্ত। চারাগুলি মধুপুর (সাঁওতাল পরগনা) হইতে আসিয়াছে। গোলাপ গাছের প্রসঙ্গে বাধ্যতা-প্রসঙ্গ আসিয়া গেল। বাবা বলিতেছেন, "ফুলগাছও কথা শোনে; হৃদয়ের ভাষা বোঝে। মানুষই শোনে না, কয়েক বছর আগে নতুন গোলাপগাছ হয়েছে, মায়ের তিথিপূজা সামনে। মনে মনে বললাম, 'মা, যদি ফুল হয় তো তোমায় সাজাব।' ব'লব কি, তিথিপূজার ক-দিন আগে কুঁড়ি দেখা দিল, ধীরে ধীরে ঠিক তিথিপূজার দিন ভোরে দেখি, পাঁচটি ফুল গাছ আলো ক'রে রয়েছে। মনের আনন্দে মাকে দিলাম। মাসখানেক পরে স্বামীজীর তিথিপূজা—আবার ঐরকম ভাবলাম। এবার ৭টি ফুল। খুব আনন্দ। তারপর ভাবলাম—'ঠাকুরের তিথিপূজায় আবার হবে কি?' কি আশ্চর্য? বড় বড় ১২টি ফুল। সেই বছরের সেই শেষ।"—

সাধনার ধন

শ্রীপ্রণবকুমার ঘোষ

তোমার শ্রীরূপ-ধ্যান অমিয়-পাথার!
ও সাগরে একবার ডুব দে রে মন!
খুলে দে যতনে হৃদে বিশ্বাসের দ্বার
বুকে তোর পাবি খুঁজে অরূপ রতন।
পবিত্র করিয়া প্রাণ ভক্তিরসধারে
সিক্ত চোখে বসে ভাব, ও মুরতিখানি
গোপনে জাগিবে ধীরে হৃদয়দুয়ারে
জ্যোতির্ময় প্রেমসুধা রসঘন বাণী।
ও চরণ, সে যে তোর পরম পাথার
সে যে ভবসিন্ধুনীরে পারের তরণী।
মহাধন সে যে তোর সাধ্য সাধনার
অপার আনন্দনিধি, অমৃতের খনি॥

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ও বাংলার রঙ্গমঞ্চ

[পূর্বানুবৃত্তি]

অধ্যাপক প্রণবরঞ্জন ঘোষ

গয়াধাম থেকে অধ্যাপক বিশ্বম্ভর মিশ্র ফিরে এলেন পরম ভক্ত নিমাইরূপে। সাধারণভাবে অধ্যয়ন-অধ্যাপনার জীবনযাপন তাঁর পক্ষে আর সম্ভব হলো না। ঘরে মা শচীরাণী ও স্ত্রী বিষ্ণুপ্রিয়া, টোলের অধ্যাপকের অনুরাগী ছাত্রবৃন্দ সকলেই উদ্বিগ্ন। কিন্তু কৃষ্ণভক্তিবন্যায় তখন নিমাইয়ের কাছে সর্ব জগৎ কৃষ্ণময়।

'কথামৃত'-লেখক 'চৈতন্যলীলা'-দর্শনরত শ্রীরামকৃষ্ণের চোখের সামনে এই ঘটনা কেমন করে রঙ্গমঞ্চে ফুটে উঠেছে তার বর্ণনায় লিখেছেন—"এদিকে নিমাই পড়ুয়াদের আর পড়াইতে পারিতেছেন না। গঙ্গাদাসের কাছে নিমাই পড়িয়াছিলেন। তিনি নিমাইকে বুঝাইতে আসিয়াছেন। শ্রীবাসকে বলিলেন—'শ্রীবাস ঠাকুর, আমরাও ব্রাহ্মণ, বিষ্ণুপূজা করে থাকি, আপনারা মিলে দেখছি সংসারটা ছারখার করলেন।' "

'চৈতন্যলীলা'র তৃতীয় অঙ্কের চতুর্থ গর্ভাঙ্কে গিরিশচন্দ্র শ্রীবাস ও গঙ্গাদাস পণ্ডিতের সঙ্গে শচীমাতা ও নিমাই পণ্ডিতের কথোপকথনের মাধ্যমে নিমাইচরিত্রের ভাবান্তরপর্ব সার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। নিমাইচরিত্রের মূলভাবটির পরিস্ফুটনে গিরিশচন্দ্রের কৃতিত্ব 'চৈতন্যলীলা' নাটকটিকে জীবনী-নাট্যরূপে মনোগ্রাহী করেছে। তবে কিছু পরিমাণে অলৌকিকতার আভাস এ নাটকে লক্ষণীয়। বৃন্দাবনদাসের ভক্তিবিহ্বলতার তুলনায় অনেকটা সংযত হলেও গিরিশচন্দ্রের চৈতন্যচরিত্র-কল্পনায়ও অলৌকিকতা স্বাভাবিকভাবে দেখা দিয়েছে। তবে চৈতন্যচরিত্রের ত্যাগ, ব্যাকুলতা ও শুদ্ধসত্ত্ব আদর্শটিই প্রাধান্য পাওয়ায় এই অলৌকিকতা আতিশয্যের পর্যায়ে পৌঁছায় নি।

গঙ্গাদাস পণ্ডিতের তিরস্কারের উত্তরে শ্রীবাস বললেন, "পণ্ডিত মহাশয়! আমার অপরাধ কি?" সংসাররসের রসিক গঙ্গাদাস উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওকথা আপনি অর্বাচীনকে বোঝাবেন। ...... ওহে নিমাই! তোমার ত শাস্ত্রজ্ঞান হয়েছে,—তুমি আমার সঙ্গে তর্ক কর, সংসারধর্ম অপেক্ষা কোন্ ধর্ম প্রধান বোঝাও, তুমি গৃহী, গৃহীর মত আচার না করে অন্য আচার কেন কর?"—এ সংলাপ শুনে প্রেক্ষাগারে উপবিষ্ট শ্রীরামকৃষ্ণের মন্তব্য—"এ সংসারীর শিক্ষা—এও কর, ওও কর। সংসারী যখন শিক্ষা দেয়, তখন দুদিক রাখতে বলে।"

গঙ্গাদাসের প্রশ্নের উত্তরে নিমাই পণ্ডিতের বক্তব্য গিরিশচন্দ্রের ভাষায়—

'প্রভু কোন্ হেতু কিছু নাহি জানি,
প্রাণ টানে কি করি কি করি,
ভাবি কূলে রই, কূলে আর রহিতে না পারি,
প্রাণ ধায় বুঝালে না ফেরে,
সদা চায় ঝাঁপ দিতে অকূল পাথারে।'

দর্শক শ্রীরামকৃষ্ণদেব শুনে বলছেন, 'আহা!'

গিরিশচন্দ্রের রচিত ও পরিচালিত 'চৈতন্যলীলা'র চৈতন্য-ভূমিকাভিনেত্রী বিনোদিনী তাঁর অভিনয়ে চৈতন্যচরিত্রকে কী পরিমাণে জীবন্ত করে তুলতেন সেকথা আমরা তাঁর আত্মজীবনীপাঠে কিছুটা উপলব্ধি করতে পারি। সমকালীন সমালোচকদের প্রশংসাবাণীতেও কিছুটা কল্পনা করা যায়, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাবতন্ময়তাতেও

বিনোদিনীর অভিনয়-সার্থকতায় এবং গিরিশচন্দ্রের গভীরসঞ্চারী নাট্যদৃষ্টির পরোক্ষ প্রমাণ। পরোক্ষ হলেও এক্ষেত্রে স্মরণীয়, তখন অবধি শ্রীরামকৃষ্ণসান্নিধ্যে গিরিশচন্দ্রের আমূল রূপান্তর ঘটেনি। 'বকলমা' দেবার আগে চৈতন্যচরিত্র-অনুধ্যানে সেই সম্পূর্ণ শরণাগতির প্রস্তুতি।

'কথামৃত'-অনুলেখক মহেন্দ্রনাথ প্রাসঙ্গিক বোধে নিমাইয়ের উক্তির সামান্য অংশ উদ্ধৃত করেছেন। আমরা গিরিশচন্দ্রের নাটক থেকে আরও কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি। গঙ্গাদাস পণ্ডিত—"শ্রীবাস ঠাকুর! যদি অনুগ্রহ করে আপনি একটু অন্তর হন, আমি আমার শিষ্যের সহিত দুটো কথা কই।

শ্রীবাস। যে আজ্ঞে। (নিমাইয়ের প্রতি) সন্ধ্যার সময় দেখা হবে, তুমি তোমার অধ্যাপকের সহিত কথা কও।...

গঙ্গা। ভাল নিমাই! যার প্রতি প্রাণ ধায়, তার পূজা কর, কিন্তু জীবিকাও তো চাই। সামান্য পুণ্যে অধ্যাপকের কার্যপ্রাপ্তি হয় না; তুমি সরস্বতীর কৃপায় সে পদ পেয়ে কেন অনাদর কর?

নিমাই। দেব! যথাশক্তি শিষ্যদিগের নিকট শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করি, তাদের মন তৃপ্ত হয় না, এই নিমিত্ত তাদের বলেছি—স্থানান্তরে অধ্যয়ন কর গে।

গঙ্গা। কিরূপ যথাশক্তি ব্যাখ্যা কর? ন্যায়, ব্যাকরণ, অলঙ্কার সকলই তোমার 'কৃষ্ণ'। ধাতু জিজ্ঞাসা করলে বল—'কৃষ্ণের ধাতু,' সকল কথাতেই কৃষ্ণ! এতে শিষ্যদিগের মন কিরূপে তৃপ্ত হবে?

নিমাই। প্রভু!

শাস্ত্রমর্ম এইমাত্র বুঝিয়াছি সার।
কৃষ্ণের সংসার,
কৃষ্ণ ন্যায়, কৃষ্ণ অলঙ্কার।
কৃষ্ণ বিনা ধাতু আর কার,—
কৃষ্ণের কৃপায় কর জীবের চেতন,
কৃষ্ণ বিনা সব অচেতন;
সারমর্ম শাস্ত্রের এ জানি।

... ...

ক্ষমা কর দেব!
একমাত্র নিমিত্ত জগতে
দেখিয়াছি গয়াধামে।
বিষ্ণুপদ করি প্রদক্ষিণ,
বুঝিয়াছি আমি অতি দীন,
কার্য কিবা সে তো সেই হরি।

গয়াধামে হেরিলাম বিদ্যমান,
বিষ্ণুপদপঙ্কজে করিতে মধুপান
ভ্রমে কত অশরীরী প্রাণী।
কত ব্রহ্মা শিব নাহি জানি,
সবে হরিময়, হরিগুণ কয়;
আমি ভাগ্যহীন নাহি চিনিলাম হরি।

চৈতন্যলীলা: ৩য় অঙ্ক: ৪র্থ গর্ভাঙ্ক:

গিরিশচন্দ্রের কল্পনায় শিষ্যের কৃষ্ণভক্তি গুরুতেও সঞ্চারিত হলো। গঙ্গাদাস নিমাইয়ের হরিনামে বিভোর হয়ে বললেন, "হে নিমাই!

শাস্ত্রধর্ম তুমিই বুঝেছ সার"...

গিরিশচন্দ্রের মূল অবলম্বন এখানে "চৈতন্য-ভাগবত" গ্রন্থের মধ্যখণ্ড। গঙ্গাদাসের এ-জাতীয় ভাবান্তর কিছু ঘটেছিল বলে আমরা চৈতন্যজীবনী-গ্রন্থে দেখিনি। কিন্তু এই ভাবান্তর একান্ত মনস্তত্ত্বসম্মত। অধ্যাপক বিশ্বম্ভরের এই ভাব-বিপ্লবের কথা চৈতন্যভাগবতে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, আমরা ইতিহাসের অনুরোধে তার কিছু উদাহরণ পাঠকের সামনে উপস্থাপিত করি।

সেদিন সকালবেলা সমাগত ছাত্রদের অধ্যাপনায় রত নিমাইপণ্ডিত—

পড়ুয়ার বর্গ সব অতি উষঃকালে।

পড়িবার নিমিত্তে আসিয়া সভে মিলে ॥
পড়াইতে বৈসে গিয়া ত্রিজগত রায়।
কৃষ্ণ বিনু আর কিছু না আইসে জিহ্বায় ॥
"সিদ্ধবর্ণ সমাম্নায়" বোলে শিষ্যগণ।
প্রভু বোলে "সর্ব বর্ণে সিদ্ধ নারায়ণ ॥"
শিষ্য বোলে "বর্ণ সিদ্ধ হইল কেমনে।"
প্রভু বোলে "কৃষ্ণদৃষ্টিপাতের কারণে ॥"
শিষ্য বোলে "পণ্ডিত ! উচিত ব্যাখ্যা কর "
প্রভু বোলে "সর্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণ স্মঙর ॥
কৃষ্ণের ভজন কহি—সম্যক আম্নায়।
আদি মধ্য অন্তে কৃষ্ণভজন বুঝায় ॥"

[চৈতন্যভাগবত : মধ্যখণ্ড : ১ম অধ্যায়]

এ ধরনের ব্যাখ্যায় পড়াশুনো অগ্রসর হয় না দেখে পড়ুয়ার দল গিয়ে গঙ্গাদাস পণ্ডিতকে ধরলেন, যাতে তিনি স্বাভাবিকভাবে অধ্যাপনা করতে নিমাইকে বুঝিয়ে বলেন। গঙ্গাদাস তাদের নিমাইকে সঙ্গে করে বিকেলে তাঁর কাছে নিয়ে আসতে বললেন। নিমাই এলে পর—

গুরু বোলে "বাপ বিশ্বম্ভর ! শুন বাক্য
ব্রাহ্মণের অধ্যয়ন নহে অল্প ভাগ্য।
মাতামহ – যার চক্রবর্তী নীলাম্বর।
বাপ যার – জগন্নাথ মিশ্র পুরন্দর ॥
উভয় কুলেতে মূর্খ নাহিক তোমার।
তুমিই পরম যোগ্য ব্যাখ্যাতে টিকার ॥
অধ্যয়ন ছাড়িলে সে যদি ভক্তি হয়।
বাপ মাতামহ কি তোমার ভক্ত নয় ॥

ভালমতে গিয়া শাস্ত্র বসিয়া পড়াও।
ব্যতিরিক্ত অর্থ কর মোর মাথা খাও ॥"
প্রভু বোলে, "তোর দুই চরণপ্রসাদে।
নবদ্বীপে কেহ মোরে না পারে বিবাদে ॥
আমি যে বাখানি সূত্র করিয়া খণ্ডন।
নবদ্বীপে ইহা স্থাপিবেক কোন জন ॥"

—বিশ্বম্ভরের এ-হেন আত্মশ্লাঘায় গুরু আশ্বস্ত হলেন বটে, কিন্তু পরদিন অধ্যাপনায় একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটলো।

"পড়ুয়াসকল বোলে, "ধাতু-সংজ্ঞা কার ?"
প্রভু বোলে "শ্রীকৃষ্ণের শক্তি নাম যার।"

ছাত্রেরা সেই অপূর্ব ব্যাখ্যা মেনে নিয়েও বললেন কৃষ্ণই সর্বজগতের কারণ সন্দেহ নেই, কিন্তু সে ভাবগ্রহণের শক্তি তাদের নেই। বিশ্বম্ভরও বুঝলেন, আর তাঁর পক্ষে অধ্যাপনা সম্ভব নয়।

"প্রভু বোলে, 'ভাই সব ! কহিলা সুসত্য।
আমার এসব কথা অন্যত্র অকথ্য ॥
কৃষ্ণবর্ণ এক শিশু মুরলী বাজায়।
সভে দেখো তাই ভাই বোলো সর্বথায় ॥
যত শুনি শ্রবণে—সকল কৃষ্ণ নাম।
সকল ভুবন দেখো—গোবিন্দের ধাম।
তোমা সভা স্থানে মোর এই পরিহার।
আজি হৈতে আর পাঠ নাহিক আমার ॥"

মূলগ্রন্থের বিষয়বস্তুকে নাট্যপ্রয়োজনে গিরিশচন্দ্র সংক্ষেপিত ও সংহত করে একই দৃশ্যে শ্রীবাসের সঙ্গে কথোপকথন ও গঙ্গাদাস পণ্ডিতের সঙ্গে অধ্যাপনা বিষয়ে আলোচনার বিষয় উপস্থাপিত করেছেন। বহিরঙ্গ পাণ্ডিত্যের গণ্ডী অতিক্রম করে নিমাই যখন কৃষ্ণচিন্তায় লীন হতে চলেছেন সেই শুভমুহূর্তটির নাট্যরূপ দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ স্বাভাবিকভাবেই বলেছেন, 'আহা !' তিনি তো জানতেন, ঈশ্বরলাভই মানবজীবনের উদ্দেশ্য। পরীক্ষার পাশে আবদ্ধ না হয়ে ঈশ্বরের জন্য সর্বস্বত্যাগী হওয়াই তাঁর আদর্শ। চৈতন্যজীবনের এই পর্বের ভাবব্যাকুলতা তিনি আপন জীবনে উপলব্ধি করেছেন। শুধু একটু পার্থক্য—ওই বহিরঙ্গ শিক্ষার জন্য তিনি এতটুকু সময়ক্ষেপ করেননি। বেদবেদান্তের সারসত্যকে তিনি মায়ের ইচ্ছায় সাধনার দ্বারাই উপলব্ধি করেছেন। শ্রীচৈতন্যের মধুরভাবের সাধনা তাঁর বহুমুখী জীবন-সাধনায় অন্যতম।

"চৈতন্যলীলা"র তৃতীয় অঙ্কের পঞ্চম গর্ভাঙ্কে নিত্যানন্দের দেখা মেলে। নিত্যানন্দ ও নিমাই পণ্ডিত দু'জনে দু'জনকে দেখামাত্র গভীর প্রীতিতে আবদ্ধ হয়েছিলেন। শচীমাতাও নিত্যানন্দকে আপন পুত্রের মতোই স্নেহ করতে থাকেন। নিত্যানন্দের আধ্যাত্মিক মহিমা সম্বন্ধে উচ্চধারণা-সম্পন্ন নিমাই নিত্যানন্দকে অগ্রজতুল্য সম্মান দিয়ে নামপ্রেমপ্রচারের কাজে নিয়োজিত করেছিলেন।

গিরিশচন্দ্র নিতাইয়ের দুটি গানের মাধ্যমে তাঁর উন্মাদনাময় ব্যক্তিত্ব ও নামপ্রেমপ্রচারের আদর্শ ফুটিয়ে তুলে নিমাইয়ের সঙ্গে দেখা করিয়েছেন। এ পদ্ধতি কিছু পরিমাণে যাত্রাপালার। তবে গিরিশচন্দ্রের নাট্যসাহিত্যে যাত্রার প্রভাব প্রায় সর্বত্র। পৌরাণিক ও ভক্তিরসাত্মক নাটকে এ পদ্ধতির সার্থকতা অবশ্য স্বীকার্য। দৃশ্যটি 'কথামৃত' অনুসারী মহেন্দ্রনাথের ভাষায়—"নবদ্বীপে নিত্যানন্দ আসিয়াছেন, তিনি নিমাইকে খুঁজিতেছেন এমন সময় নিমাই-এর সহিত দেখা হইল। নিমাইও তাঁকে খুঁজিতেছিলেন। মিলনের পর নিমাই বলিতেছেন—

সার্থক জীবন ; সত্য মম ফলেছে স্বপন ;
লুকাইলে স্বপ্নে দেখা দিয়ে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারকে গদগদস্বরে)—নিমাই বলছে, স্বপ্নে দেখেছি !" (ক্রমশঃ)

সমালোচনা

যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ—শ্রীমানদাশঙ্কর দাশগুপ্ত। ব্লক এ, ফ্ল্যাট নং ২, গভর্ণমেণ্ট হাউজিং-এস্টেট, কলিকাতা—১৪ থেকে লেখক কর্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা : ৫৩২ ; মূল্য বারো টাকা।

সঙ্ঘজননী শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর কৃপাধন্য শ্রীমানদাশঙ্কর দাশগুপ্ত প্রথমে "শ্রীশ্রীমা সারদামণিদেবী" ও পরে "স্বামী বিবেকানন্দ" নামে দুটি মূল্যবান জীবনীগ্রন্থরচনার দ্বারা পাঠকদের কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। আলোচ্য গ্রন্থখানি পূর্ববর্তী গ্রন্থদ্বয়ের স্বাভাবিক পরিণতি। বস্তুতঃ শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদাদেবী-স্বামী-বিবেকানন্দ—এই ত্রিধাপ্রকাশিত অদ্বয়সত্তার অনুধ্যানে অভিনিবিষ্ট লেখকের কাছে শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনীগ্রন্থটি একান্ত প্রত্যাশিতই ছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণজীবনীর তথ্যসমাবেশে নূতনত্ব তেমন কিছু না থাকলেও লব্ধ তথ্যের সুনিপুণ সমাবেশে ভক্তিকুসুমমাল্যখানি সুগ্রথিত। শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনের গঠন ও সাধনপর্ব সমাপনান্তে কলকাতা শহরের মাধ্যমে তাঁর মানবকল্যাণব্রত উদ্যাপনের কাহিনীর সূত্রপাত (১৮৭২—১৮৭৫) সম্বন্ধে আলোচনার পরিচ্ছেদটির নাম "নব দিবার উষালোকে"। শ্রীরামকৃষ্ণযুগের শুভসূচনারূপে নামকরণটি যথাযথ। এর পর শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহী ও ত্যাগী ভক্তমণ্ডলীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও শ্রীরামকৃষ্ণ-সান্নিধ্যের কাহিনীর দ্বারা রামকৃষ্ণ-জীবনের শেষ পর্বটি রূপায়িত। সুলিখিত হলেও এই অংশে ছোট ছোট জীবনীর রূপরেখা না দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনের আধারে শিষ্যমণ্ডলীর কথা উত্থাপিত হলে এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাবধারা সম্বন্ধে বিশ্লেষণমূলক আলোচনা থাকলেই গ্রন্থটি আরো তাৎপর্যমণ্ডিত হ'ত বলে আমাদের ধারণা। অপরপক্ষে সাধারণভাবে যাঁরা জীবনকাহিনীর রূপরেখা সম্বন্ধে আগ্রহী তাঁদের পক্ষে একটি মনোজ্ঞ গ্রন্থরূপেই আলোচ্য বইখানি সমাদৃত হবে।

গ্রন্থশেষে একটি নির্ঘণ্টের মধ্যে এ জীবনীর উৎস সম্বন্ধে নির্দেশিকা থাকলে এ বিষয়ে পরবর্তী আলোচকদের সুবিধা হতো। শ্রীরামকৃষ্ণজীবনীর উপকরণ নানা গ্রন্থে, পত্র-পত্রিকায় এখনও ছড়িয়ে আছে বলেই মনে হয়। ভাবীকালে বিস্তৃত আকারে শ্রীরামকৃষ্ণজীবনের ঐতিহাসিক রূপায়ণে যাঁরা ব্রতী হবেন, তাঁরা শ্রদ্ধেয় লেখকের গ্রন্থে সংহতভাবে শ্রীরামকৃষ্ণজীবনচিত্রখানির কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করবেন।

সুদীর্ঘ অনুশীলনের দ্বারা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবধারায় নিষ্ণাত লেখক এ গ্রন্থে যেভাবে শ্রীরামকৃষ্ণজীবনকাহিনী উপস্থাপিত করেছেন, তা শ্রীরামকৃষ্ণসাহিত্যে অন্যতম সার্থক সংযোজন। আমরা গ্রন্থখানির বহুল প্রচার প্রার্থনা করি।

—প্রণবরঞ্জন ঘোষ

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ—জীবন ঔর সন্দেশ —স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। প্রকাশক স্বামী ব্যোমানন্দ, রামকৃষ্ণ মঠ, বিজ্ঞানানন্দ মার্গ, মুঠীগঞ্জ, এলাহাবাদ ২১১-০০৩। পৃঃ ৭৬+১২; মূল্য দুই টাকা।

পুস্তকখানি মূল বাংলা গ্রন্থের হিন্দী অনুবাদ; অনুবাদ করেছেন ব্রহ্মচারী দেবেন্দ্র। বাংলা ভাষায় লিখিত মূল গ্রন্থখানি স্বামী বিজ্ঞানানন্দের ১০১তম জন্মতিথিপূজার অর্ঘ্যরূপে কলিকাতার জেনারেল প্রিণ্টার্স কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল। এলাহাবাদ আশ্রম গ্রন্থটির হিন্দী অনুবাদ প্রকাশ করায় হিন্দীভাষী ব্যক্তিদের, বিশেষ করিয়া স্বামী বিজ্ঞানানন্দ তাঁহার সন্ন্যাসজীবনের অধিকাংশ কাল যেখানে কাটাইয়াছেন সেই এলাহাবাদবাসীদের পক্ষে তাঁহার ভাবাদর্শের সংস্পর্শে আসা খুবই সহজ হইল। অনুবাদে সর্বত্র মূল গ্রন্থের ভাব অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে, ভাষাও সুন্দর।

গ্রন্থটিতে লেখক শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসিশিষ্যগণের অন্যতম স্বামী বিজ্ঞানানন্দের জীবনের সব প্রধান ঘটনাই সংক্ষিপ্তাকারে সন্নিবিষ্ট করিয়া বিশেষ মনোযোগ দিয়াছেন বিভিন্ন জিজ্ঞাসুর প্রশ্নের উত্তরে বা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তিনি ঈশ্বর, মন, জপধ্যান, কর্ম ও অন্যান্য সাধন সম্বন্ধে, শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীশ্রীমা স্বামীজী প্রভৃতি সম্বন্ধে এবং নিজ অনুভূতি সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, সেই কথাগুলির উপর। বিভিন্ন গ্রন্থ হইতে এবং প্রত্যক্ষদর্শী কয়েকজন সন্ন্যাসীর নিকট হইতে সেগুলি সংগ্রহ করিয়া বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট উক্ত সেই কথাগুলিকে লেখক গ্রন্থটিতে প্রসঙ্গানুসারে একত্র সাজাইয়া দিয়াছেন। লেখক তাঁহার 'নিবেদন'-এ বলিয়াছেন যে, এরূপ ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষদের কথাগুলিই সর্বাধিক মূল্যবান যাহা 'সংশয়ান্ধকার অপসারণ করিয়া সকল পরমধামযাত্রীর পথই আলোকিত করিতে সমর্থ।'

গ্রন্থটির বহুল প্রচার কামনা করি। আশা করি এলাহাবাদ আশ্রম হইতে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ-সম্পর্কিত ও তাঁহার রচিত পুস্তকগুলিরও হিন্দী অনুবাদ ক্রমে প্রকাশিত হইবে। স্বামী বিজ্ঞানানন্দ নিজেই শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁহার বাণী সম্বন্ধে একখানি পুস্তিকা, 'পরমহংস-চরিত', হিন্দীতে লিখিয়া ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

কে আমি—অধ্যাপিকা রমা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক: ব্রহ্মচারী শিশিরকুমার, বাগানিয়া পাড়া, পোঃ নবদ্বীপ, জেলা নদীয়া। পৃষ্ঠা ২৭৬, মূল্য চার টাকা।

'আমি কে' ?—বিচার করা সহজ নয়, অদ্বৈত বেদান্তে 'নেতি, নেতি' অর্থাৎ 'ইহা নয়, ইহা নয়' ইত্যাদি দ্বারা সেই 'আমি'র স্বরূপ নির্ণীত, যে 'আমি' নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বরূপ।

আলোচ্য গ্রন্থে বিদুষী গ্রন্থকর্ত্রী সহজবোধ্য অথচ মনোজ্ঞ আলোচনার মাধ্যমে 'আমি কে'—এই দুরূহ বিষয়টির বিচার করিয়াছেন। এতদ্-ব্যতীত আরও দুইটি প্রবন্ধ—'ভাগবতী ভক্তি'

ও 'যুগাবতার প্রেমাবতার গৌরহরি' গ্রন্থখানির বিষয়ীভূত। প্রবন্ধত্রয় ধারাবাহিক ; দ্বিতীয়টিকে প্রথমটির এবং তৃতীয়টিকে দ্বিতীয়টির পরিপূরক বলা যাইতে পারে।

শ্রীহরিদাসের প্রসঙ্গে শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তি—

'ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি সর্বতীর্থে স্নান।
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি যজ্ঞ তপ দান॥'

নামের মহিমা-কীর্তনে উপযুক্ত স্থলে সন্নিবেশিত। 'ভাগবত', 'চৈতন্যচরিতামৃত' প্রভৃতি গ্রন্থের উদ্ধৃতিগুলি সুপ্রযুক্ত ও সুষ্ঠুভাবে আলোচিত। পুস্তকখানি ভক্তবৃন্দের মনোরঞ্জনে সমর্থ হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

Vivek Jivan—Akhil Bharat Vivekananda Yuva Mahamandal, Annual Number, 1972. Pp 50.

ইংরেজী ও বাংলা রচনায় সমলঙ্কৃত পত্রিকাখানি পূর্ব পূর্ব বৎসরের মতো পত্রিকার মান অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ : **India on the March, Vivekanada and Aurobindo as Nation-builders,** এসো দিশারী, পথ দেখাও।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব

বেলুড় মঠে গত ২২শে ফাল্গুন, ১৩৭৯ (৬. ৩. ৭৩) মঙ্গলবার, শুভ শুক্লা দ্বিতীয়ায় ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৩৮তম পুণ্য জন্মতিথি-উৎসব মহানন্দে ও ভাবগম্ভীর পরিবেশে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে ব্রাহ্মমুহূর্তে মঙ্গলারতি, উষাকীর্তন, পূর্বাহ্নে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা, হোম প্রভৃতি ও শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ হয়। সকাল ৮টা হইতে ৯টা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত পাঠ করেন স্বামী স্বানন্দ এবং ৯টা হইতে ১০টা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ পাঠ করেন স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। সালিখা কালীকীর্তন সম্প্রদায় কর্তৃক কালীকীর্তন অনুষ্ঠিত হয় বেলা ১০টা হইতে ১টা পর্যন্ত। সারাদিন প্রায় ৩০,০০০ ভক্ত নরনারী মঠে সমাগত হইয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের পাদপদ্মে ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদন করেন। প্রায় ১৫,০০০ ভক্ত হাতে হাতে প্রসাদ গ্রহণ করেন।

অপরাহ্ণ ৩ টা ৩০ মিনিটে মঠপ্রাঙ্গণে ধর্মসভা আরম্ভ হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী ভূতেশানন্দ মহারাজ। বক্তাদের মধ্যে শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার বাংলায় ভাষণ দেন। স্বামী রঙ্গনাথানন্দ ও স্বামী নিঃশ্রেয়সানন্দ ইংরেজীতে বক্তৃতা করেন। সভাপতি মহারাজ ও অন্যান্য বক্তাদের ভাষণে বর্তমান জগতের প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্য জীবন ও বাণীর আলোচনা সমবেত জনগণ মুগ্ধ হইয়া শ্রবণ করেন। স্বামী নিঃশ্রেয়সানন্দ আফ্রিকায় শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারা কি-ভাবে প্রসার লাভ করিতেছে, তাহার বিষয় বলেন।

রাত্রে শ্রীশ্রীদশমহাবিদ্যার পূজা, শ্রীশ্রীকালী-মাতার বিশেষ পূজা ও হোম হয়। রাত্রিশেষে পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দ মহারাজ ১৯ জনকে সন্ন্যাসব্রতে ও ১৫ জনকে ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষিত করেন।

গত ১১ই মার্চ লক্ষাধিক লোকের উপস্থিতিতে সাধারণ উৎসব যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

বৃন্দাবনে শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির-প্রতিষ্ঠা

গত ১৫ই ফেব্রুআরি রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী বীরেশ্বরানন্দ মহারাজ বৃন্দাবন আশ্রমে নবনির্মিত মন্দিরে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের মর্মর-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই উপলক্ষে অনুষ্ঠিত দশদিনব্যাপী উৎসব আশ্রমকে আনন্দ-মুখর করিয়া রাখিয়াছিল।

৭ই ফেব্রুআরি, ১৯৭৩ ভাগবতকথার মাধ্যমে উৎসবের সূচনা। ৮ই হইতে ১৪ই পর্যন্ত প্রত্যহ সকাল ও বিকালে মন্দির-প্রাঙ্গণে প্রবেশপথের উত্তরদিকে অবস্থিত প্রকাণ্ড প্যাণ্ডেলে ভাগবত পাঠ ও আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। ১৪ই বিকালে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতিকৃতি লইয়া ভজন, কীর্তন, ব্যাণ্ড বাদ্য প্রভৃতি সহ তিন-চারিশত জনের এক শোভাযাত্রা বৃন্দাবনের প্রধান মন্দিরগুলির সম্মুখ দিয়া পরিক্রমা করিয়া আসে। শোভাযাত্রার পুরোভাগে সন্ন্যাসিগণ গেরুয়া পতাকা হস্তে লইয়া যাইতেছিলেন—আশ্রম হইতে বাহির হইবার সময় পূজ্যপাদ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজীও পতাকাহস্তে পুরোভাগে থাকিয়া বাহিরের রাস্তা পর্যন্ত আসেন। পরদিন ১৫ই ফেব্রুআরি সকাল ৭টায় সেবাশ্রমের ঠাকুরঘর হইতে নিত্যপূজিত শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা, স্বামীজী প্রভৃতির প্রতিকৃতি শোভাযাত্রা করিয়া আনিয়া সাড়ে সাতটার সময় শ্রীশ্রীঠাকুরকে মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। পরে বিশেষ পূজা, ভজন, শ্রীশ্রীচণ্ডী ও গীতাপাঠ প্রভৃতি চলিতে থাকে। রাত্রে প্যাণ্ডেলে মহারাসলীলাভিনয় ও মন্দিরে শ্রীশ্রীকালীপূজা, এবং ভোরে বিরজাহোম অনুষ্ঠিত হয়। পরদিন ১৬ই ফেব্রুআরি সাধু-বৈষ্ণবাদি ও নারায়ণসেবা হয়—স্থানীয় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রায় ১২৫ জন সাধু ও ৫৫০ জন বৈষ্ণবাদি এবং ২,০০০ দরিদ্রনারায়ণ প্রভৃতি লইয়া সর্বমোট প্রায় ৪,৫০০ জন প্রসাদ গ্রহণ করেন। এই দিন বিকালে মন্দিরপ্রাঙ্গণস্থ প্যাণ্ডেলে স্বামী বীরেশ্বরানন্দ মহারাজের সভাপতিত্বে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ স্বাগতভাষণ দিবার পর স্বামী রঙ্গনাথানন্দ রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের কর্মধারা ও আদর্শ সম্বন্ধে, শ্রীনৃসিংহবল্লভ গোস্বামী 'হিন্দুধর্মে অর্চাবতারতত্ত্ব' সম্বন্ধে, স্বামী চিদাত্মানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। শেষে সভাপতি মহারাজের ভাষণের পর বিদায়সঙ্গীতের মাধ্যমে সভা ও উৎসব সমাপ্ত হয়।

সভার ভাষণগুলি সবই খুব হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল—বিশেষ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ যে বৃন্দাবনে আসিয়া থাকিয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন, দেববিগ্রহে ভগবান সাক্ষাৎ প্রকাশিত থাকেন—এ সত্যটি বহু সাধক, এযুগেও এই কিছুদিন পূর্বে শ্রীরামকৃষ্ণদেবও তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি নিরন্তর আমাদের অন্তরে ধ্বনিত হইয়া তাঁহার দিকে আমাদের টানিতেছে—বিভিন্ন বক্তা কর্তৃক উক্ত ও পুনরালোচিত এই কথাগুলি বৃন্দাবনের পরিবেশে নবনির্মিত শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরপ্রাঙ্গণে সকলের হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করে। সভাপতি মহারাজ তাঁহার ভাষণে পূর্ববর্তী বক্তাদের বক্তব্যগুলি সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া বলেন যে, আধুনিক যুগের সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য মানবজাতিকে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব ও আদর্শ গ্রহণ করিতেই হইবে; অনেক ক্ষেত্রে আমাদের অজ্ঞাতসারে ধীরে ধীরে তাহা সমগ্র পৃথিবীতে প্রসারিত হইতেছে। আর বলেন, বৃন্দাবনে থাকিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ এতদিন আমাদের পূজা গ্রহণ করিতেছিলেন আর্ত-নারায়ণ-মূর্তিতে রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে (হাসপাতালে), এখন হইতে তিনি সেখানে সেভাবে এবং এই মন্দিরে আনুষ্ঠানিক পূজার মাধ্যমে—উভয় ভাবেই আমাদের পূজা

গ্রহণ করিবেন, বহুজনের আধ্যাত্মিক কল্যাণ সাধন করিবেন এই মন্দিরে বসিয়া।

বৃন্দাবন সেবাশ্রমের আরম্ভ ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে, কালাবাবুর কুঞ্জে, পথের কয়েকটি নিরাশ্রয় রোগীকে কুড়াইয়া আনিয়া তাহাদের সেবার মাধ্যমে। ১৯০৮-এ আনুষ্ঠানিকভাবে ইহা রামকৃষ্ণ মিশনের অঙ্গীভূত হয়। কালাবাবুর কুঞ্জ হইতে সেবাশ্রম যমুনাতীরে বিস্তৃত এলাকায় (৮.৩২ একর জমি) স্থানান্তরিত হয় ১৯১৫-তে। এবং সেখান হইতে মথুরা রোডের উপর বর্তমান বিস্তৃততর এলাকায় আসে ১৯৬১ খৃষ্টাব্দে। এই সুদীর্ঘকাল যমুনা-তীরের আশ্রমে ছোট একটি ঠাকুরঘরে এবং পরে বর্তমান সেবাশ্রমে সাধুদের আবাসভবনের একটি কক্ষে শ্রীশ্রীঠাকুর প্রতিকৃতিতে পূজিত হইয়া আসিতেছিলেন। ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দে সেবাশ্রমসংলগ্ন প্রায় চারবিঘা জমি শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের জন্য কেনা হয়। ইহার ভিতর ১১. ৩. ১৯৬৮তে বর্তমান মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন স্বামী বীরেশ্বরানন্দ মহারাজ; গত ১৫ই ফেব্রুআরি মন্দির-প্রতিষ্ঠার পর এই জমির উপর সাধুদের একটি আবাসভবনের ভিত্তিও তিনি স্থাপন করিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম ও শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম —মন্দির এলাকা ও হাসপাতাল এলাকা পরস্পর সংলগ্ন হইলেও যাওয়া-আসার পথ রাখিয়া মাঝ-খানে প্রাচীর দিয়া ভাগ করা হইয়াছে; মথুরা রোড হইতে প্রবেশপথও বিভিন্ন। মথুরা রোডের উপরই প্রধান প্রবেশপথ, তাহার শ-দুই ফুট দূরে মন্দির। মন্দিরটি নয়নাভিরাম—বেলুড়মঠের মন্দিরেরই হুবহু অনুকৃতি, আকারে অনেক ছোট। মূল মন্দিরের মাপ ১১১ × ৪৩ ফুট; তাহার চারি-দিক ঘিরিয়া ৫´ চওড়া রেলিং-ঘেরা বারান্দা—প্রদক্ষিণপথ। বারান্দারও চারিদিকে, ফুটকয়েক নীচে ২০ ফুট চওড়া চাতাল। চাতাল ও বারান্দাসহ মন্দিরের মাপ ১৬০´ × ৯৮´।" জমি হইতে উচ্চতা চাতালের ফুট তিনেক, বারান্দার ফুট দশেক, এবং গম্বুজশীর্ষের ৬৫ ফুট। নাট-মন্দিরের ভিতরের মাপ ৩৯ × ২৪ ফুট, গর্ভমন্দিরের ১৫ × ১৫ ফুট।

প্রতিষ্ঠার দিন প্রায় হাজার চারেক লোক অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন। কয়েক দিন ধরিয়া ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে আগত শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘের শতাধিক সাধু এবং প্রায় সাড়ে তিনশত (মন্দির-প্রতিষ্ঠার দিন প্রায় ছয়শত) ভক্ত আশ্রমে সমবেত হইয়াছিলেন। সাধুদের থাকার ব্যবস্থা আশ্রমের ভিতরই করা হইয়া-ছিল, ভক্তদের আশ্রমের সন্নিকটস্থ দুটি ধর্মশালায়; খাওয়াদাওয়া সকলেই আশ্রমে করিতেন—সংখ্যা প্রতিদিন প্রায় ৫৫০ হইতে ৮০০ জন পর্যন্ত হইত।

বৃন্দাবনের পরিবেশের জন্য এবং পরিচালক-মণ্ডলীর সুব্যবস্থার ফলে প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানই, বিশেষ করিয়া শোভাযাত্রা, প্রতিষ্ঠা-অনুষ্ঠান ও জনসভা সমবেত সকলেরই মনে গভীর আনন্দের ছাপ দিয়া গিয়াছে। মহারাস-অভিনয়টিও অতি উচ্চ-ভাবাশ্রিত ও পরিচ্ছন্ন হইয়াছিল

ভিত্তিস্থাপন

গত ৩।২।৭৩ ঢাকা শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে বক্তৃতাগৃহসমন্বিত গ্রন্থাগারভবনের ভিত্তিস্থাপন করিয়াছেন বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের মাননীয় প্রধান বিচারপতি এ. এস্. এম্. সায়েম। এই উপলক্ষে আয়োজিত সভায় বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রী জনাব তাজুদ্দীন আহ্‌মেদ সভাপতিত্ব করেন। অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তি যাঁহারা সভায় ভাষণ দেন, বাংলাদেশে ভারতের হাই কমিশনার শ্রীসুবিমল দত্ত তাঁহাদের অন্যতম।

পুরস্কার-বিতরণী সভা

কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ে বিগত ১১ই ফেব্রুআরি রবিবার ও ১২ই ফেব্রুআরি সোমবার বিকাল ৪ ঘটিকায় কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়সমূহের বার্ষিক পুরস্কার-বিতরণী সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই অনুষ্ঠানে প্রথম দিন পৌরোহিত্য করেন আরামবাগের লব্ধপ্রতিষ্ঠ আইনজীবী শ্রীসুশীল পাল। দ্বিতীয় দিন পৌরোহিত্য করেন পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা বিভাগের উপ-অধিকর্তা শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার এবং প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন প্রখ্যাত ফুটবল-প্রশিক্ষক শ্রীঅমল দত্ত। অনুষ্ঠানের শেষে দুই দিনই বিচিত্রানুষ্ঠান ও নাটকাভিনয় হইয়াছিল। সম্পাদক স্বামী নির্জরানন্দ দুই দিনই বিদ্যালয়-বিবরণী পাঠ করেন।

সেবাকার্য

বাংলাদেশে সেবাকার্য: ফেব্রুআরি, ১৯৭৩ পর্যন্ত বাংলাদেশে ৮টি সেবাকেন্দ্রের মাধ্যমে দুঃস্থ-সেবাকার্যে ২৫,৪৩,৫১৯.৭৮ টাকা ব্যয়িত হইয়াছে; প্রাপ্ত দানসামগ্রীর মূল্য এই টাকার অন্তর্ভুক্ত নয়।

গত জানুআরি মাসে অনুষ্ঠিত সেবাকার্যের বিবরণ:

ঢাকা কেন্দ্র কর্তৃক ৩,০২৪ জন রোগী চিকিৎসিত হন এবং বিতরিত হয়: মিল্ক পাউডার ৭,৭৭৫ পাউণ্ড, টিন্‌ড ফুড ৩·১৫ কেজি, 'পদ্মবক' শিশুখাদ্য ১০৪ পাউণ্ড, কম্বল ২২৮ খানি, ধুতি ৮২ খানি, শাড়ী ৬৯২ খানি, লুঙ্গি ৩১টি, সোয়েটার ৪,৭৩৪টি, পুরাতন পোশাক ৫,৭৩৭, সাবান ৮৪ খণ্ড ও ৫ কেজি, জুতা ১৮০ জোড়া, গামছা ৫টি এবং মশারি ১৩টি।

বাগেরহাট কেন্দ্র কর্তৃক ৩৩টি নলকূপ বসানো হইয়াছে এবং ৩,৬৩৩ জন রোগী চিকিৎসিত হইয়াছেন। মিল্ক পাউডার ৩০০ পাউণ্ড, বিস্কুট ২৯ কেজি, টিন্‌ডফুড ১৩৯৫ কেজি, মিল্ক ফুড ৬৪০ পাউণ্ড, 'সান্‌শাইন' মিল্ক ৬·৭৫ পাউণ্ড, কম্বল ৮৯৭ খানি, ধুতি ৩২২ খানি, শাড়ী ৬০৩ খানি, সার্ট (নূতন) ৭৫টি, সোয়েটার ৪৪১টি, পুরাতন বস্ত্রাদি ৩২৩ খানি, জামার ছিট্ ১০ গজ, কোট ১০৪টি, এবং পাঠ্যপুস্তক ১৮৪ খানি, স্লেট ৩১৭টি ও ৫০টি স্কেল বিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য বিতরিত হয়।

দিনাজপুর কেন্দ্র কর্তৃক বাসোপযোগী ৩৭টি কুটির নির্মিত হইয়াছে এবং ১,৬৫৮ জন রোগী চিকিৎসিত হইয়াছেন। বিতরিত দ্রব্যাদি: কম্বল ৪৮৬ খানি, ধুতি ৪৯ খানি, শাড়ী ৮৫, সোয়েটার ১,০৫৯টি, পুরাতন জামাকাপড় ১,০৪৪, কোট ৭২টি, সাবান ৭৭ খণ্ড, জুতা ১৯০ জোড়া এবং ভিটামিন ট্যাবলেট ৪,২৮১টি।

কোয়েম্বাতুর বন্যার্তসেবা: ১৯৭৩ খৃষ্টাব্দের জানুআরির শেষ পর্যন্ত চিন্নাপুলিউর ও সীতাপালয়ম্ গ্রামে বন্যাপীড়িতদের সেবাকল্পে ৬৬টি বাসগৃহ ও ২টি প্রার্থনাভবন-সমন্বিত ২টি কলোনী নির্মিত হইয়াছে। এতদ্‌ব্যতীত কোয়েম্বাতুর জেলার ভবানীগ্রামে বন্যার্তদের মধ্যে শাড়ী ১,৩৫০ খানি, ধুতি ১,১০০ খানি, টাওয়েল ১৫০টি, শিশুদের পোশাক ২০০টি, ১,৬০০ সেট অ্যালুমিনিয়ম পাত্র, ২টি ট্রাক-বোঝাই পুরাতন জামাকাপড় ও গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বিতরণ করা হয়। করাই এল্লাপালয়মে ৩৩টি পরিবারকে ঘড় ছাইবার পাতা cadjan leaves সরবরাহ করা হয়।

কার্যবিবরণী

রাঁচি রামকৃষ্ণ মিশন টি, বি. স্যানাটোরিয়াম ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত; ইহার ১৯৭১-৭২

খৃষ্টাব্দের কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। এই সেবাকেন্দ্রটি একটি পূর্ণাঙ্গ বৃহৎ টি. বি. স্যানাটোরিয়াম। প্রতিষ্ঠাকাল হইতেই যোগ্যতার সহিত এখানে আর্তনারায়ণের সেবাকার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতেছে। আধুনিক পদ্ধতিতে রোগনির্ণয় ও চিকিৎসা এখানকার বৈশিষ্ট্য। অভিজ্ঞ সুচিকিৎসকগণ চিকিৎসাকার্যে নিরত আছেন। বর্তমানে শয্যাসংখ্যা ২৮০।

আলোচ্য বর্ষে স্যানাটোরিয়ামে মোট চিকিৎসিতের সংখ্যা ৬১৭, তন্মধ্যে ৩৫৬ জনকে এই বৎসর ভরতি করা হয়, ২৬১ জন পূর্বে ভরতি হইয়াছিলেন; ৪০৩ জন হাসপাতাল হইতে ছাড়া পান এবং বর্ষশেষে ১৮৫ জন রোগী চিকিৎসাধীন থাকেন। ৫৭ জন রোগীর অস্ত্রোপচার করা হইয়াছিল। এক্স-রে বিভাগে ৪,২২১টি এক্স-রে করা হয়। ল্যাবরেটরি-পরীক্ষার সংখ্যা ১৬,৮২৪। বহির্বিভাগে ৯১৬ জন টি. বি. রোগীকে ও অন্যান্য রোগে আক্রান্ত ২,৮২৭ জনকে চিকিৎসা-বিষয়ে উপদেশ ও ব্যবস্থা দেওয়া হয়। ফ্রি-হোমিওপ্যাথিক বিভাগে চিকিৎসিতের সংখ্যা ১৪,৬৩০, তন্মধ্যে নূতন রোগী—৫,৯২৫

আলোচ্য বর্ষে স্যানাটোরিয়ামে ৮৪ জন দরিদ্র রোগী সম্পূর্ণ বিনা-ব্যয়ে এবং ৮ জন অপেক্ষাকৃত কম খরচে চিকিৎসা লাভ করেন। বহির্বিভাগে আগত অধিকাংশ রোগীই এবং ইমারজেন্সি ওয়ার্ডের সমস্ত রোগীই বিনা খরচে চিকিৎসিত।

স্যানাটোরিয়ামটিকে খাদ্যবিষয়ে স্বয়ম্ভর করিবার উদ্দেশ্যে গত কয়েক বৎসর যাবৎ প্রচেষ্টা করা হইতেছে; এইজন্য কৃষি, গোপালন ও উদ্যান-পরিচালনার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে ৩০ জন রোগী আরোগ্যলাভের পর আরোগ্যোত্তর উপনিবেশে স্থান পাইয়াছেন, ইঁহাদের অধিকাংশই স্যানাটোরিয়ামে বৃত্তিমূলক শিক্ষা লাভ করিয়া বিভিন্ন বিভাগে কর্মে নিযুক্ত হইয়াছেন।

কার্যবিবরণী

কনখল রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের ১৯৭১-৭২ খৃষ্টাব্দের কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। যুগ-নায়ক স্বামী বিবেকানন্দের স্থূল শরীরে থাকা-কালেই তাঁহারই একজন শিষ্য স্বামী কল্যাণানন্দ 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' ভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া ১৯০১ খৃষ্টাব্দে এই সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠা-সময় হইতে সুদীর্ঘকাল হরি-দ্বারের সন্নিকট পুণ্যতীর্থ কনখলে এই সেবাশ্রমের মাধ্যমে আর্তনারায়ণের সেবাকার্য অনুষ্ঠিত হইতেছে। এখানে ঈশ্বরে শরণাগত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধুসন্তগণ অসুস্থ অবস্থায় চিকিৎসা-পরিচর্যাদি লাভ করিয়া নিরাময় হন। এতদ্ব্যতীত দূরবর্তী গ্রামসমূহ হইতে দরিদ্র গ্রামবাসীরা আসিয়া চিকিৎসা লাভ করেন। স্বল্প আয়োজন সম্বল করিয়া যে প্রতিষ্ঠানের সূচনা হইয়াছিল, কর্মনিষ্ঠার গুণে তাহাই এখন একটি পূর্ণাঙ্গ হাস-পাতালে পরিণত। এখানে আধুনিক চিকিৎসা-বিদ্যামতে পর্যবেক্ষণ, রোগনির্ণয় ও চিকিৎসা করা হয়।

ইনডোর হাসপাতালে শয্যা-সংখ্যা ৫২। আলোচ্য বর্ষে এই অন্তর্বিভাগে চিকিৎসিতের সংখ্যা ১,৪১০; তন্মধ্যে সার্জিক্যাল কেস ৫৮১টি। দৈনিক গড়ে ৪৬·১টি শয্যা রোগীদের দ্বারা অধিকৃত ছিল।

আউটডোর ডিস্পেন্সারীতে চিকিৎসিতের সংখ্যা ১,০৯,৩২৯, তন্মধ্যে নূতন রোগী—২৭,৩৬৩। আউটডোরে ৩,৪৩৭টি অস্ত্রোপচার করা হয়।

প্যাথলজিক্যাল ডিপার্টমেণ্টে ল্যাবরেটরি-পরীক্ষা—১৬,২৬৫। এক্স-রে বিভাগে এক্স-রে

ছবি তোলা হয়—৩,৪৪৮টি।

আলোচ্য বর্ষে অন্যান্য বিভাগগুলির কার্যও সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

সেবাশ্রম লাইব্রেরীর গ্রন্থসংখ্যা ৪,৫০৩; পাঠাগারে ৩০টি সাময়িক ও ৬টি দৈনিক পত্রিকা লওয়া হয়।

মন্দিরে নিয়মিত পূজা উপাসনা আরতি, একাদশীতে রামনাম-সংকীর্তন অনুষ্ঠিত হয়। আলোচ্য বর্ষে শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হইয়াছে।

পাটনা রামকৃষ্ণ মিশন (রামকৃষ্ণ এভিনিউ, পাটনা ৮০০-০০৪) আশ্রমের ১৯৭১-৭২ খৃষ্টাব্দের কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯২২ খৃঃ প্রতিষ্ঠিত এবং ১৯২৬ খৃঃ রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম শাখারূপে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত এই কেন্দ্রটির কার্যধারা প্রধানতঃ ত্রিমুখী—শিক্ষাসংস্কৃতিমূলক, চিকিৎসাবিষয়ক, ধর্মসম্বন্ধীয়।

মহাবিদ্যালয়ের বিদ্যার্থীদের জন্য পরিচালিত আশ্রম-ছাত্রাবাসে আলোচ্য বর্ষে ১৮ জন ছাত্র থাকিবার সুযোগ লাভ করে, তন্মধ্যে ৬ জন ফ্রি ও ৩ জন হাফ-ফ্রি।

স্বামী তুরীয়ানন্দ গ্রন্থাগার ও নিঃশুল্ক পাঠাগার সুপরিচালিত। গ্রন্থাগারের পুস্তকসংখ্যা ৮,৭১০; নূতন সংযোজিত পুস্তকসংখ্যা ১৯৩; গ্রাহকগণ কর্তৃক পঠিত পুস্তকসংখ্যা ৮,৭৯৫। পাঠাগারে ১০টি দৈনিক সংবাদপত্র এবং ১০১টি সাময়িক পত্রিকা রাখা হয়। দৈনিক গড়ে পাঠক-সংখ্যা ৫৭। গ্রন্থাগারে বিক্রয় বিভাগে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন কর্তৃক প্রকাশিত সংস্কৃত, বাংলা, হিন্দী ও ইংরেজী পুস্তকাবলী বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে।

আশ্রমে ও আশ্রমের বাহিরে আশ্রমাধ্যক্ষ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ কর্তৃক বিভিন্ন বিষয় অবলম্বনে বক্তৃতা প্রদত্ত হইয়াছিল। সর্বসমেত ৩৭৩টি ধর্ম-সভা অনুষ্ঠিত হয়।

দাতব্য চিকিৎসালয়ে অ্যালোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক মতে আলোচ্য বর্ষে চিকিৎসিতের সংখ্যা যথাক্রমে ৭৫,৬১৯ (নূতন রোগী ৮,৪২৮) ও ৫৪,৩৩৩ (নূতন ৪,৮৫১)। এই ডিস্পেন্সারীর মাধ্যমে বিনা-ব্যয়ে চিকিৎসা লাভ করিয়া দরিদ্র জনসাধারণ বিশেষভাবে উপকৃত হইতেছেন।

নিয়মিত পূজাভজনাদি, একাদশীতে রামনাম-সঙ্কীর্তন, শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা, কালীপূজা, সরস্বতীপূজা, শিবরাত্রি, শ্রীরামকৃষ্ণদেব শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব, অন্যান্য পুণ্যতিথিকৃত্য-উদ্‌যাপন প্রভৃতি এই কেন্দ্রের বিশেষ কর্মধারার অঙ্গীভূত।

গত বৎসর বিহার বন্যার্তসেবায় পাটনা আশ্রম কর্তৃক মেডিক্যাল রিলিফ করা হয়। বাংলা-দেশে আর্তত্রাণকার্যের জন্য ২৬,৯০১ টাকা প্রেরিত হইয়াছিল।

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-সংবাদ

বিবেকানন্দ সোসাইটিতে (কলিকাতা) গত ৩রা ফেব্রুআরি স্বামী বিবেকানন্দের ১১১তম জন্মোৎসবপালন উপলক্ষে কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি শ্রীশঙ্করপ্রসাদ মিত্রের সভাপতিত্বে একটি সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সোসাইটির সভাপতি স্বামী নিরাময়ানন্দ সকলকে স্বাগত-সম্ভাষণ জানাইবার পর প্রধান অতিথি স্বামী ভূতেশানন্দ (রামকৃষ্ণ মিশনের সহ-সম্পাদক) স্বামীজীর আদর্শ ও ভাবধারা সম্বন্ধে ভাষণ দেন। সোসাইটির কর্মসচিব শ্রীপ্রকাশ-চন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের কার্যবিবরণী-পাঠ ও সভাপতির ভাষণান্তে শ্রীহেরম্বচন্দ্র ভট্টাচার্য সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

বিষ্ণুপুর নিরাঞ্জনানন্দধামে গত ১১ই ফেব্রুআরি শ্রীমৎ স্বামী নিরঞ্জনানন্দ মহারাজের ১১০তম জন্ম-জয়ন্তী উৎসব সাড়ম্বরে পালিত হইয়াছে। তীর্থপরিক্রমা, পূজা হোম, কথামৃত-ও ভাগবতপাঠ, রামায়ণগান, নারায়ণসেবা, কালী-কীর্তন ও ধর্মসভা সারাদিনব্যাপী উৎসবের অঙ্গ ছিল। ন্যূনাধিক দুই সহস্র ব্যক্তিকে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হইয়াছে।

ধর্মসভায় বিশ্বাশ্রয়ানন্দ (সভাপতি), স্বামী নিবৃত্ত্যানন্দ (প্রধান অতিথি), শ্রীযশোদাকান্ত রায় এবং শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার সংক্ষিপ্ত ভাষণে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবাদর্শ ও স্বামী নিরঞ্জনানন্দের অলৌকিক চরিত্র আলোচনা করেন।

সংঘের স্থায়ী সভাপতি শ্রীকিরচণন্দ্র ঘোষাল স্বামী নিরঞ্জনানন্দ মহারাজের পুণ্য জন্মস্থানে উপযুক্ত মন্দিরনির্মাণের কাজে তাঁর আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন।

এই উপলক্ষে একটি মনোজ্ঞ ও পরিচ্ছন্ন স্মরণিকা প্রকাশিত হইয়াছে।

সারদা সমিতির কল্যাণী) উদ্যোগে গত ১৭ই ফেব্রুআরি শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর জন্মোৎসব পালিত হয়।

উৎসবে প্রভাতফেরী, পূজা, কথামৃতপাঠ, সমিতির সভ্যাগণ কর্তৃক ভজন প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। অপরাহ্নে প্রব্রাজিকা অসিতাপ্রাণা শ্রীশ্রীমার জীবনী অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ভাষায় আলোচনা করেন। পরে শ্রীনারায়ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রামায়ণগান হয়। সন্ধ্যায় আরাত্রিক ভজনের পর উৎসব শেষ হয়। প্রায় চারশত নরনারীকে প্রসাদ বিতরণ করা হয় এবং উৎসবের উদ্বৃত্ত অর্থ হইতে সারদামঠ-পরিচালিত দুঃস্থ শিশুবিদ্যা-লয়ের জন্য কিছু অর্থ দেওয়া হয়।

পরলোকে

দুঃখের সহিত জানাইতেছি, স্বামী শিবানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিষ্য উমাপদ মুখোপাধ্যায় গত ২৬শে ফেব্রুআরি ৭৮ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। আজীবন তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবপ্রচারে উৎসাহী ছিলেন। 'উদ্বোধন' এবং অন্যান্য পত্রিকায় তাঁহার বহু লেখা প্রকাশিত হইয়াছে; 'শ্রীরামকৃষ্ণায়ন', 'অমিয়বাণী' প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থও তিনি লিখিয়াছেন।

শ্রীশ্রীমা ও স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণসন্তানগণের সঙ্গলাভের সৌভাগ্য তাঁহার হইয়াছিল।

তাঁহার বিদেহী আত্মা শ্রীভগবচ্চরণে চিরশান্তি লাভ করুক, এই প্রার্থনা।

উদ্বোধন, ১ম বর্ষ

[পুনর্মুদ্রণ]

(পূর্বানুবৃত্তি—৫ম সংখ্যা, ১লা চৈত্র, ১৩০৫)

[সংবাদ ও মন্তব্যের শেষাংশ]

স্বামী অভয়ানন্দ সম্প্রতি আমেরিকা হইতে আসিয়া বোম্বাই নগরে উপনীত হইয়াছেন। গত ১৬ই ফাল্গুনে বোম্বাই সহরে তাঁহার একটী সুবৃহৎ বক্তৃতা হইয়া গিয়াছে—প্রসিদ্ধ রাণাডে মহাশয় সভাপতি হইয়াছিলেন। অভয়ানন্দকে মান্দ্রাজে আনাইয়া কতিপয় বক্তৃতা দেওয়াইবার জন্য দু-একজন শিক্ষিত মান্দ্রাজী বোম্বাই নগরে গিয়াছেন। বেদান্তদর্শন সম্বন্ধে ইঁহার বক্তৃতা শুনিলে চমৎকৃত হইতে হয়। মান্দ্রাজে কিছুদিন বক্তৃতা দিয়া কলিকাতায় আসিবেন। আশা করি, এখানেও আসিয়া কিছুদিন বক্তৃতা দিবেন। ইঁহার নিজের ও ইঁহার বক্তৃতার কিছু পরিচয় অন্যত্রে দিলাম।

রামকৃষ্ণ মিশন

বিলাত বিভাগ—বিলাতের লণ্ডন নগর হইতে এক সংবাদ-দাতা গত ১৫ই ফেব্রুয়ারীর ইণ্ডিয়ান মিরারে লিখিতেছেন—"ইণ্ডিয়াতে কাহারও কাহারও এরূপ ধারণা আছে যে, বিবেকানন্দ ইংল্যাণ্ডে যেসকল বক্তৃতা দিয়া গেছেন, বস্তুতঃ, তাহার কোনও ফল এখানে হয় নাই; বিবেকানন্দের বন্ধুবর্গই তাঁহার কার্য্যকলাপ অতিরঞ্জিত করিয়া বলিয়া থাকেন মাত্র। কিন্তু, আমি এখানে আসিয়া দেখিতেছি, তিনি অনেকের ভিতরে বিশেষ কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। ইংল্যাণ্ডের অনেকস্থলে এরূপ অনেক লোক দেখিয়াছি, যাঁহারা বিবেকানন্দকে সাতিশয় সম্মান ও ভক্তি শ্রদ্ধা করেন। আমি যদিচ বিবেকানন্দের সম্প্রদায়ভুক্ত নহি এবং তাঁহার মতের সঙ্গে আমার নিজের মতের অনেক গরমিলও আছে বটে সত্য, কিন্তু সত্যকথা বলতে কি—বিবেকানন্দ এখানে অনেকেরই চক্ষু খুলিয়া দিয়া গিয়াছেন এবং অনেকের হৃদয় প্রশস্ত করিয়া দিয়াছেন, এখানকার অনেকেই এখন খুব বিশ্বাস করিতেছেন যে, ভারতবর্ষের প্রাচীন আর্য্যশাস্ত্রসমূহে অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব আধ্যাত্মিক সত্য নিহিত আছে। শুধু যে ইহাই করিয়া গিয়াছেন, তাহা নহে—ইংল্যাণ্ড ও ইণ্ডিয়ার সহিত একপ্রকার সোনার সম্বন্ধ পাতাইয়া দিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে আপনার কাগজে মিষ্টার হাউয়ের "ডেড্ পুল্পিট্" ("The Dead Pulpit by Mr. Howie") নামক গ্রন্থ হইতে যাহা —বিবেকানন্দ-মত ("Vivekanandism") সম্বন্ধে উদ্ধৃত করিয়া পাঠাইয়াছিলাম, তাহাতে বেশ স্পষ্টই বুঝিয়াছেন, বোধ হয় যে, এখানে বিবেকানন্দের মত প্রচার হওয়াতে কত শত লোক খৃষ্টান সম্প্রদায় হইতে চলিয়া গিয়াছে এবং ঐদেশে বিবেকানন্দের কার্য্যকলাপ কতদূর ফলদায়ক হইয়াছে, ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণস্বরূপ একটি সামান্য ঘটনা বর্ণনা করিতেছি। গতকল্য সন্ধ্যার সময় আমি এই লণ্ডন সহরের দক্ষিণাংশে আমার একটী বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছিলাম। যাইতে যাইতে পথে রাস্তা ভুলিয়া যাই; বড় রাস্তার এককোণে দাঁড়াইয়া এদিক ওদিক দেখিতে-

ছিলাম—কোন্ দিকে যাইব ; এমন সময়ে একটি মহিলা এক বালককে সঙ্গে করিয়া লইয়া—আমাকে পথ বলিয়া দিয়া সাহায্য করিবেন, এই অভিপ্রায়ে—আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

***আমাকে বলিলেন, "মহাশয়! আপনি বোধ হয়, রাস্তা খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন—আপনাকে কি আমি সাহায্য করিতে পারি ?" **তিনি আমাকে রাস্তা দেখাইয়া দিলেন এবং বলিলেন, "আমি কতিপয় কাগজে পড়িয়াছিলাম যে, আপনি লণ্ডনে আসিতেছেন। আমি আপনাকে দেখিয়াই আমার ছেলেকে বলিতেছিলাম যে, এই দেখ, ইনিই সেই বিবেকানন্দ। আমাকে তাড়াতাড়ি যাইয়া ট্রেন ধরিতে হইবে বলিয়া আর তাঁহাকে 'আমি যে বিবেকানন্দ নহি,' এ পরিচয় দিতে সাবকাশ পাইলাম না ; অগত্যা তাড়াতাড়ি চলিয়া যাইতে হইল। যাহা হউক, বিবেকানন্দের সহিত প্রত্যক্ষ পরিচয় না থাকাতেই তাঁহার প্রতি মহিলাটীর এতাদৃশ প্রগাঢ় শ্রদ্ধা দেখিয়া আমি অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলাম। এমন প্রীতিজনক ঘটনা সন্দর্শনে নিজেকে কৃতার্থ মনে করিলাম ;—আমার গেরুয়া পাকড়ীকেও ধন্যবাদ দিলাম—গেরুয়া পাকড়ীর দরুনই আজ এত সম্মান পাইলাম। এইরূপ ঘটনা ছাড়া আমি স্বয়ং এখানে এমন অনেক শিক্ষিত ভদ্র ইংরেজ দেখিয়াছি, যাঁহাদিগের ইণ্ডিয়ার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা হইয়াছে—যাঁহারা, যদি কোন ধর্ম্ম বা আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ভারতবর্ষীয় হয়, তবে তাহা অতিশয় আগ্রহের সহিত শ্রবণ করেন।"

আমেরিকা বিভাগ - চিকাগোর অদ্বৈতসভায় স্বামী অভয়ানন্দের বক্তৃতা—বিগত ১৪ই নবেম্বরের ইণ্টার ওশান নামক আমেরিকান পত্রিকায় আমেরিকায় স্বামী অভয়ানন্দের চিকাগো নগরে বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা তাহার মর্ম্মানুবাদ দিলাম। এই স্বামী অভয়ানন্দ স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যা। ইনি একজন অসাধারণ মহিলা। স্বামী বিবেকানন্দের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া পাশ্চাত্য দেশে বেদান্ত প্রচার করিতেছেন। ইঁহার বক্তৃতা কি গভীর চিন্তাপূর্ণ অথচ সরস, তাহা আমরা ইঁহার বক্তৃতার সারাংশ-পাঠেই বুঝিতে পারিয়াছি।

অভয়ানন্দের বক্তৃতা

"জীবনের উদ্দেশ্য"।—পার্ব্বত্য পথে স্ফিংস (Sphinx)* ভ্রমণকারীকে ভ্রমণে নিবৃত্ত করাইয়া প্রশ্ন করিল, ও এই সমস্যার পূরণ করিতে বলিল, 'মানুষ কি ? কোথা হইতে আইসে ? কোথায়ই বা যায় ?' মানুষ প্রকৃতির মধ্যে সুন্দর বিচিত্র যন্ত্রে আবদ্ধ—চৈতন্য। তাহার বাহ্য সৌন্দর্য্য তাহার অন্তরাত্মার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ও বিচিত্রতার প্রতিবিম্ব মাত্র। শক্তি—অপরিমেয় ও অনির্ব্বচনীয় শক্তি, তাঁহার ভিতরে রহিয়াছে। শুভ, অশুভ সকলের বীজ তাঁহার ভিতরে আর যে শক্তিতে স্ফিংসের সমুদয় সমস্যার মীমাংসা করিবে, সেই শক্তির অনন্ত প্রস্রবণও তাঁহার ভিতরে রহিয়াছে। মানুষ কোথা হইতে আসিল ? মানুষ সকল বস্তুর অনন্ত ও সর্ব্বব্যাপী মূল হইতে আসিয়া সুখদুঃখানুভূতির রাজ্যে (Land of Experience) ভ্রমণ করিতেছে, প্রকৃতির গভীরতম রহস্যসমূহের অনুসন্ধান করিতেছে—পথে জ্ঞানের কুসুম চয়ন করিতে করিতে চলিয়াছে। প্রাণ

হইতে প্রাণ ব্যতীত আর কি জন্মাইবে? চৈতন্য-চৈতন্য-ব্যতীত আর কি প্রসব করিবে? দেবতাদের নিবাসভূমিই মানুষের গৃহ—মানুষ সেখান হইতেই আসিয়াছে।**মানুষ যায় কোথায়?—মানুষ যায় নিজের গৃহে—সমুদয় ব্যক্ত ও অব্যক্ত পদার্থের অনন্ত মূল প্রস্রবণে। কখন জীবন-মরুতে পথভ্রান্ত পথিকরূপে, কখন জীবনের উর্ব্বর ভূমির শস্যগ্রাহক ও কখন বা মনুষ্যের অগম্য ভূভাগে বিচরণশীল হইয়া ধীরে ধীরে অথচ নিশ্চিতরূপে চরম লক্ষ্যের দিকে চলিয়াছেন—পথে সংগৃহীত ধনরাশি হস্তে; অপদার্থগুলি ফেলিয়া দিতেছেন। প্রকৃতির বিস্তীর্ণ পুস্তক পাঠ করিতেছেন, পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা উল্টাইতেছেন। পারশেষে জীবন-রহস্য তাঁহার নিকট প্রকাশিত হইয়া পড়িল—সে রহস্য কি? সে রহস্য এই যে, তিনি এতদিন আপনাকেই খুঁজিতেছিলেন—যে ধনরাশি সংগ্রহ করিয়াছেন, সে সকল তাঁহারই গুণরাশি। যে গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন, তাহা তিনি নিজেই, প্রকৃতি তাঁহার প্রতিবিম্বমাত্র। তখন প্রকৃতি-সতীর অবগুণ্ঠন-মোচন হয়, তিনি আপনাকে জানিতে পারিয়া মুক্তিদ্বারে দণ্ডায়মান হন।

কলিকাতা বিভাগ—রামকৃষ্ণ মিশনের সাপ্তাহিক সভা। (১) বিগত ৮ই ফাল্গুন রবিবারে বাগবাজারে সভার অধিবেশন হয়; বাবু শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বি.এ, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন এবং উদ্বোধনের সহকারী সম্পাদক স্বামী শুদ্ধানন্দ "ত্যাগ" সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। (২) গত ১৫ই ফাল্গুন রবিবারে উক্ত সভা মিনার্ভা থিয়াটারে আহূত হয়; সিস্টার নিবেদিতা (Miss Margaret Noble) "Young India Movement" সম্বন্ধে এক সুন্দর বক্তৃতা দেন।

কলিকাতা বাগবাজারে সিস্টার নিবেদিতা যে রামকৃষ্ণ-মিশন বালিকা-স্কুল স্থাপনা করিয়াছেন, তাহাতে ব্রুকলিন, নিউ ইয়র্ক ও মণ্ট ক্লেয়ার হইতে কতিপয় সহৃদয় বন্ধু, একশত সাড়ে বিরাশি টাকা দিয়া সাহায্য করিয়াছেন। সিস্টার নিবেদিতা তাঁহাদিগকে কৃতজ্ঞতা-সহকারে ধন্যবাদ দিয়াছেন এবং সময়ানুসারে সদ্ব্যয়ের সংবাদ দিবেন, বলিয়াছেন।

পূর্ব্ব বাঙ্গালা বিভাগ—গত ২৮শে মাঘ শুক্রবার ঢাকা সহরে বাবু শ্রীযুক্ত জীবনকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয়ের নাট্যমন্দিরে স্বামী প্রকাশানন্দ "হিন্দুধর্ম্ম" বিষয়ে বক্তৃতা দিয়াছেন। শ্রীযুক্তবাবু কুঞ্জবিহারী নাগ এম্ এ, সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রোতৃ-সংখ্যা সহস্রাধিক হইয়াছিল। এই বক্তৃতার পরে, আরও দুইটী স্থলে বক্তৃতা দেন; একটি বীরভদ্রাশ্রমের সন্নিকটে ধুলোট উপলক্ষে—"মানবজীবনের উদ্দেশ্য" সম্বন্ধে; অপরটি আমনিগোলার হিন্দুসমাজে—"ভগবৎ-প্রেম" সম্বন্ধে।

*সিংহ-শরীর ও মনুষ্য-মুখ-সম্পন্ন কাল্পনিক জীব-বিশেষ।

১লা বৈশাখ হইতে উদ্বোধনে নিয়মিতরূপে পাণিনির মহাভাষ্য, ব্রহ্মসূত্রের (বেদান্ত দর্শন) রামানুজ-ভাষ্য, ভগবদ্গীতার শাঙ্কর ভাষ্য প্রভৃতির অতি সরল বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইবে। বৌদ্ধশাস্ত্র "ধর্ম্মপাদের"ও মূল ও বঙ্গানুবাদ দেওয়া যাইবে।

উদ্বোধন।

[১ম বর্ষ।] ১৫ই চৈত্র। [৬ষ্ঠ সংখ্যা।]

বর্ত্তমান ভারত।

(স্বামী বিবেকানন্দ লিখিত)

বৈদেক পুরোহিত মন্ত্রবলে বলীয়ান, দেবগণ তাঁহার মন্ত্রবলে আহূত হইয়া পান ভোজন গ্রহণ করেন ও যজমানকে অভীপ্সিত ফল প্রদান করেন। ইহলৌকিক মঙ্গলের কামনায় প্রজাবর্গ, রাজন্যবর্গও তাঁহার দ্বারস্থ। রাজা সোম * পুরোহিতের উপাস্য, বরদ ও মন্ত্রপুষ্ট; আহুতিগ্রহণেপ্সু দেবগণ কাজেই পুরোহিতের উপর সদয়; দৈববলের উপর মানব-বল কি করিতে পারে? মানব-বলের কেন্দ্রীভূত রাজাও পুরোহিতবর্গের অনুগ্রহপ্রার্থী। তাঁহাদের কৃপাদৃষ্টিই যথেষ্ট সাহায্য; তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর; কখন বিভীষিকাসংকুল আদেশ, কখন সহৃদয় মন্ত্রণা, কখনও কৌশলময় নীতিজাল-বিস্তার, রাজশক্তিকে অনেক সময়েই পুরোহিত-কুলের নিদেশবর্ত্তী করিয়াছে। সকলের উপর ভয়, পিতৃ-পুরুষদিগের নাম, নিজের যশোলিপি পুরোহিতের লেখনীর অধীন। মহা তেজস্বী জীবদ্দশায় অতি কীর্ত্তিমান, প্রজাবর্গের পিতৃমাতৃস্থানীয় হউন না কেন, মহাসমুদ্রে শিশির-বিন্দু-পাতের ন্যায় কালসমুদ্রে তাঁহার যশঃসূর্য্য চিরদিন অস্তমিত, কেবল মহাসত্রানুষ্ঠায়ী, অশ্বমেধযাজী, বর্ষার বারিদের ন্যায় পুরোহিতগণের উপর অজস্র-ধন-বর্ষণ-কারী রাজগণের নামই পুরোহিতপ্রসাদে জাজ্বল্যমান। দেবগণের প্রিয়, প্রিয়দর্শী ধর্ম্মাশোক (১) ব্রাহ্মণ্য-জগতে নাম-মাত্র শেষ; পারীক্ষিত জনমেজয় আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার চির-পরিচিত।

রাজ্য-রক্ষা, নিজের বিলাস, বন্ধুবর্গের পুষ্টি ও সর্ব্বাপেক্ষা পুরোহিতকুলের তুষ্টির নিমিত্ত রাজরবি প্রজাবর্গকে শোষণ করিতেন। বৈশ্যেরা রাজার খাদ্য, তাঁহার দুগ্ধবতী গাভী।

করগ্রহণে, রাজ্য-রক্ষায়, প্রজাবর্গের মতামতের বিশেষ অপেক্ষা নাই, হিন্দুজগতেও নাই, বৌদ্ধ জগতেও তদ্রূপ। যদিও যুধিষ্ঠির বারণাবতে বৈশ্য শূদ্রদেরও গৃহে পদার্পণ করিতেছেন, প্রজারা রামচন্দ্রের যৌবরাজ্যে অভিষেক প্রার্থনা করিতেছে, সীতার বনবাসের জন্য গোপনে মন্ত্রণা করিতেছে কিন্তু সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ-সম্বন্ধে রাজ্যের প্রথা-স্বরূপ, প্রজাদের কোন বিষয়ে উচ্চবাচ্য নাই। প্রজাশক্তি আপনার ক্ষমতা অপ্রত্যক্ষভাবে বিশৃঙ্খলরূপে প্রকাশ করিতেছে। সে শক্তির অস্তিত্বে প্রজাবর্গের এখনও জ্ঞান হয় নাই। তাহাদের সমবায়ের উদ্যোগ বা ইচ্ছাও নাই, সে কৌশলেরও সম্পূর্ণ অভাব, যাহা দ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তিপুঞ্জ একীভূত হইয়া প্রচণ্ড বল সংগ্রহ করে।

নিয়মের অভাব, তাহাও নহে; নিয়ম আছে, প্রণালী আছে, নির্দ্ধারিত অংশ আছে, কর-সংগ্রহ ও সৈন্যচালনা বা বিচার-সম্পাদন বা দণ্ড পুরস্কার সকল বিষয়েরই পুঙ্খানুপুঙ্খ নিয়ম আছে,

---

* সোমলতা—বেদে উহা 'রাজা সোম' এই অভিধানে উক্ত।

(১) ধর্ম্মাশোক—বিখ্যাত রাজা অশোক বৌদ্ধধর্ম্মগ্রহণের পর ধর্ম্মাশোক নাম প্রাপ্ত হন।

কিন্তু তাহার মূলে ঋষির আদেশ—দৈবশক্তি, ঈশ্বরাবেশ। তাহার স্থিতিস্থাপকত্ব একেবারেই নাই বলিলেই হয় এবং তাহাতে প্রজাবর্গের সাধারণ মঙ্গলকর কার্য্য সাধনোদ্দেশে সহমতি হইবার বা সমবেত বুদ্ধিযোগে রাজগৃহীত প্রজার ধনে সাধারণ স্বত্ববুদ্ধি ও তাহার আয় ব্যয় নিয়মনের শক্তি-লাভেচ্ছার কোনও শিক্ষার সম্ভাবনা নাই।

আবার ঐ সকল নিদেশ পুস্তকে। পুস্তকাবদ্ধ নিয়ম ও তাহার কার্য্য-পরিণতি এ দুয়ের মধ্যে দূর—অনেক। একজন রামচন্দ্র শত শত অগ্নিবর্ণের (১) পরে জন্মগ্রহণ করেন! চণ্ডাশোকত্ব (২) অনেক রাজাই আজন্ম দেখাইয়া যান। ধর্ম্মাশোকত্ব অতি অল্পসংখ্যক; আকবরের ন্যায় প্রজারক্ষকের সংখ্যা আরঙ্গজীবের ন্যায় প্রজাভক্ষকের অপেক্ষা অনেক অল্প।

হউন যুধিষ্ঠির বা রামচন্দ্র বা ধর্ম্মাশোক বা আকবর, পরে যাহার মুখে সর্ব্বদা অন্ন তুলিয়া দেয়, তাহার ক্রমে নিজের অন্ন উঠাইয়া খাইবার শক্তি লোপ হয়। সর্ব্ব বিষয়ে অপরে যাহাকে রক্ষা করে, তাহার আত্মরক্ষা-শক্তির স্ফূর্ত্তি কখনও হয় না। সর্ব্বদাই শিশুর ন্যায় পালিত হইলে অতি বলিষ্ঠ যুবাও দীর্ঘকায় শিশু হইয়া যায়। দেবতুল্য রাজা দ্বারা সর্ব্বতোভাবে পালিত প্রজাও কখনও স্বায়ত্তশাসন শিখে না। রাজমুখাপেক্ষী হইয়া ক্রমে নির্ব্বীর্য্য ও নিঃশক্তি হইয়া যায়। ঐ "পালিত" "রক্ষিত"ই দীর্ঘস্থায়ী হইলে সর্ব্বনাশের মূল।

মহাপুরুষদিগের অলৌকিক প্রাতিভজ্ঞানোৎপন্ন শাস্ত্র-শাসিত সমাজের শাসন রাজা, প্রজা, ধনী, নির্দ্ধন, মূর্খ, বিদ্বান সকলের উপর অব্যাহত হওয়া অন্ততঃ বিচারসিদ্ধ, কিন্তু কার্য্যে কতদূর হইয়াছে বা হয়, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। শাসিতগণের শাসনকার্য্যে অনুমতি,—যাহা আধুনিক পাশ্চাত্য জগতের মূল মন্ত্র এবং যাহার শেষ বাণী আমেরিকার শাসন-পদ্ধতিপত্রে অতি উচ্চরবে ঘোষিত হইয়াছে, "এদেশে প্রজাদিগের শাসন প্রজাদিগের দ্বারা এবং প্রজাদিগের কল্যাণের নিমিত্ত হইবে" যে একেবারেই ভারতবর্ষে ছিল না, তাহাও নহে। যবন পরিব্রাজকেরা অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীনতন্ত্র এদেশে দেখিয়াছিলেন। বৌদ্ধদিগের গ্রন্থেও স্থলে স্থলে নিদর্শন পাওয়া যায়, এবং প্রকৃতি দ্বারা অনুমোদিত শাসন-পদ্ধতির বীজ যে নিশ্চিত গ্রাম্য পঞ্চায়তে বর্ত্তমান ছিল এবং এখনও স্থানে স্থানে আছে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই, কিন্তু সে বীজ যে স্থানে বপিত হইয়াছিল, অঙ্কুর সেথায় উদ্গত হইল না; এভাব ঐ গ্রাম্য পঞ্চায়ৎ ভিন্ন সমাজমধ্যে কখনও সম্প্রসারিত হয় নাই।

ধর্ম্মসমাজে ত্যাগীদের মধ্যে বৌদ্ধ যতিগণের মঠে, ঐ স্বায়ত্ত শাসন-প্রণালী বিশেষরূপে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল, তাহার নিদর্শন যথেষ্ট আছে এবং অদ্যাপিও নাগা সন্ন্যাসীদের মধ্যে পঞ্চের ক্ষমতা ও সম্মান, প্রত্যেক নাগার সম্প্রদায় মধ্যে অধিকার ও উক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে সমবায়-শক্তির কার্য্য দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়।

বৌদ্ধোপপ্লাবনের সঙ্গে সঙ্গে পুরোহিতের শক্তির ক্ষয় ও রাজন্যবর্গের শক্তির বিকাশ।

বৌদ্ধযুগের পুরোহিত সর্ব্বত্যাগী, মঠাশ্রয় উদাসীন। "শাপেন চাপেন বা" রাজকুলকে

(১) অগ্নিবর্ণ—সূর্য্যবংশীয় রাজবিশেষ। ইনি প্রজাগণের সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া দিবারাত্রি অন্তঃপুরে কাটাইতেন। অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়পরতাদোষে যক্ষ্মারোগে ইহার মৃত্যু হয়।

(২) চণ্ডাশোক—বৌদ্ধপ্রতিপালক রাজ-বিশেষ।

পদানত করিয়া রাখিতে তাঁহাদের উৎসাহ বা ইচ্ছা নাই। থাকিলেও আহুতিভোজী দেবকুলের অবনতির সহিত তাঁহাদের প্রতিষ্ঠাও নিম্নাভিমুখী; কতশত ব্রহ্মা ইন্দ্রাদি বুদ্ধত্ব-প্রাপ্ত নরদেবের চরণে প্রণত এবং এই বুদ্ধত্বে মনুষ্যমাত্রেরই অধিকার।

কাজেই রাজশক্তি-রূপ মহাবল যজ্ঞাশ্ব আর পুরোহিত-হস্ত-ধৃত-দৃঢ়-সংযত-রশ্মি নহে; সে এবার আপন বলে স্বচ্ছন্দচারী। এ যুগের শক্তিকেন্দ্র সামগায়ী, যজুর্যাজী পুরোহিতে নাই, রাজশক্তিও ভারতের বিকীর্ণ ক্ষত্রিয়-বংশ-সম্ভূত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মণ্ডলীপতিতে সমাহিত নহে, এ যুগের দিগ্‌দিগন্তব্যাপী, অপ্রতিহতশাসন আসমুদ্র-ক্ষিতীশগণই মানবশক্তিকেন্দ্র। এ যুগের নেতা আর বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ নহেন, কিন্তু সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত, ধর্ম্মাশোক প্রভৃতি। বৌদ্ধযুগের একছত্রা পৃথিবীপতি সম্রাটগণের ন্যায় ভারতের গৌরববৃদ্ধিকারী রাজগণ আর কখনও ভারত-সিংহাসনে আরূঢ় হন নাই,—এ যুগের শেষে আধুনিক হিন্দুধর্ম্ম ও রাজপুতাদি জাতির অভ্যুত্থান। ইঁহাদের হস্তে ভারতের রাজদণ্ড পুনর্ব্বার অখণ্ড প্রতাপ হইতে বিচ্যুত হইয়া শত খণ্ড হইয়া যায়। এই সময়ে ব্রাহ্মণ্য শক্তির পুনরভ্যুত্থান রাজশক্তির সহিত সহকারি-ভাবে উদ্যুক্ত হইয়াছিল।

এ বিপ্লবে—বৈদিক কাল হইতে আরব্ধ হইয়া জৈন ও বৌদ্ধ-বিপ্লবে বিরাটরূপে স্ফুটীকৃত পুরোহিতশক্তি ও রাজশক্তির যে চিরন্তন বিবাদ—তাহা মিটিয়া গিয়াছে, এখন এ দুই মহাবল পরস্পর সহায়ক, কিন্তু সে মহিমান্বিত ক্ষাত্রবীর্য্যও নাই, ব্রহ্মবীর্য্যও লুপ্ত। পরস্পরের স্বার্থের সহায়, বিপক্ষ পক্ষের সমূল উৎকাষণ, বৌদ্ধবংশের সমূলে নিধন ইত্যাদি কার্য্যে ক্ষয়িতবীর্য্য এ নূতন শক্তি-সংগম, নানাভাগে বিভক্ত হইয়া, প্রায় গতপ্রাণ হইয়া পড়িল, শোণিত-শোষণ, বৈরনির্য্যাতন, ধনহরণাদি ব্যাপারে নিয়ত নিযুক্ত হইয়া পূর্ব্ব রাজন্যবর্গের রাজসূয়াদি যজ্ঞের হাস্যোদ্দীপক অভিনয়ের অঙ্কপাত মাত্র করিয়া ভাটচারণাদি-চাটুকার-শৃঙ্খলিত-পদ ও মন্ত্রতন্ত্রের মহাবাগ্‌জালজড়িত হইয়া, পশ্চিমদেশাগত মুসলমান ব্যাধ-নিচয়ের সুলভ মৃগয়ায় পরিণত হইল। [ক্রমশঃ]

শ্রীরামানুজ-চরিত

(স্বামী-রামকৃষ্ণানন্দ-লিখিত।)

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

অনাদি অনন্ত সৃষ্টিপ্রক্রিয়া যে জ্ঞানশক্তির প্রভাবে সুশৃঙ্খলে ও অবাধে চলিতেছে, সেই জ্ঞানসমষ্টির নাম বেদ।......ইঁহার ভক্ত্যাতিশয্যে সকলেই মুগ্ধ হইয়া যাইতেন। * [ক্রমশঃ]

---

* স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ রচিত 'শ্রীরামানুজচরিত' গ্রন্থের (৩য় সংস্করণ) দ্বিতীয় অধ্যায় (পৃঃ ৮ হইতে ১১)।—বর্তমান সম্পাদক

অন্ন-চিন্তা

(২)

ধর্ম্ম যেমন চিরকাল উন্নতি-শীল, সমাজও সেইরূপ স্থিতিশীল না হইয়া দিন দিন ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া থাকে। ভারত মহাদেশ ভিন্ন ভিন্ন জাতি ও ধর্ম্ম লইয়া সংগঠিত হইয়া থাকিলেও কিন্তু উক্ত স্বাভাবিক নিয়মের অধীন। ভারতবর্ষ রক্ষণশীলতার আকর-ভূমি হইলেও ইহার ধর্ম্ম ও সমাজ যে দিন দিন অতি ধীরে ধীরে ও অজ্ঞাতসারে পরিবর্ত্তনের দিকে অগ্রসর হইতেছে, ঈষৎ স্থিরভাবে বিবেচনা করিলেই তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। দেশ, কাল ও পাত্র বিশেষে সেই পরিবর্তন দ্রুত বা বিলম্বে ঘটিয়া থাকে। ইউরোপে যে দ্রুতপাদ-বিক্ষেপে উন্নতি ও সভ্যতার বেগ চলিয়াছে, ভারতবর্ষের পক্ষে তাহা সম্পূর্ণই অসম্ভব। আবার ইউরোপ অপেক্ষা আমেরিকায় সে গতি আরও প্রবল। সেইজন্য দেখা যায়, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশের সকল নীতিই পরস্পর স্বতন্ত্র। যতই দিন যায় এবং লোক যতই শিক্ষিত হয়, ততই সকলে আপন আপন অভাব উপলব্ধি করে, এবং সেই উপলব্ধির সঙ্গে অনুভূত অভাব মোচন করিবার উপায় অন্বেষণ করিয়া থাকে। ভারতবর্ষে সামাজিক সকল ব্যাপারই ধর্ম্মের সহিত এতই নিগূঢ়রূপে সম্বদ্ধ যে, সাময়িক অভাবসকল উপলব্ধি হইলেও, ধর্ম্মভয়ে তাহাতে হস্তক্ষেপণ করিতে সহজে কেহ অগ্রসর হইতে পারে না। এই একমাত্র কারণে ভারতবাসী সহজে সমাজের উন্নতিকল্পে হস্তক্ষেপ করে না। আবার দেশাচার এদেশে এত প্রবল যে, নবোদ্ভূত নানাবিধ আচার, ক্রমে দেশাচারের অঙ্গপুষ্টি করিতেছে, তন্নিবন্ধন সমাজসংস্কারের পথ আরও দুর্গম হইয়া পড়িতেছে। এদেশে বিবাহপ্রথা বড়ই জটিল। যে সময়ে বাল্য-বিবাহ এদেশে প্রচলিত হইয়াছিল, সে সময়ে দেশের লোক-সংখ্যা নিতান্তই অল্প ছিল, এবং এই জন্যই বোধ হয়, তখন বাল্যবিবাহের প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল। সে সময়ে বাল্যবিবাহপ্রথা প্রচলন না করিলে সমাজের ঘোর অনিষ্ট হইত, সন্দেহ নাই। বর্ব্বরতার দিনে বিবাহের কারণ পুরুষ বা স্ত্রী পক্ষে কোন একটা নির্দিষ্ট নিয়ম থাকে না, এবং তাহার প্রমাণ-স্বরূপ এখনও ভারতের নানা আদিম জাতির মধ্যে তাহা দেখা গিয়া থাকে। এই সকল জাতির মধ্যে ইহাও আবার দেখা গিয়া থাকে যে, অনেক নরনারীর আদৌ বিবাহ হয় না। বিবাহ না হইলেও স্ত্রী ও পুরুষ একত্র ঘরকন্না করে, তবে কোন স্থলে সম্মিলন আজীবনের জন্য আবার কোন স্থলে তাহা উভয়ের ইচ্ছাধীন। এই সকল জাতির মধ্যে বিবাহের কাল এবং প্রথা নির্দিষ্ট না থাকায়, তাহাদিগের সমাজ অতিশয় ক্ষীণ। এই সকল জাতি যখন আবার শিক্ষিত হইতে থাকিবে এবং আপন সমাজের ক্ষীণতা ও দুর্নীতি উপলব্ধি করিতে থাকিবে, তখন হয় তাহারা স্বীয় সমাজে নানাবিধ বন্ধন স্থাপন করিবে, না হয় অপর সমাজ বা সম্প্রদায়ের রীতি-নীতি আপন সমাজে প্রচলন করিবে। এই নিয়মে সকল দেশ সকল জাতি, সকল সম্প্রদায়ই ধীরে ধীরে, জ্ঞাতসারেই হউক, বা অজ্ঞাতসারেই হউক, ক্রমোন্নতির পথে আবহমানকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে।

বিনা কারণে কোন কার্য্য হইতে পারে না, এইজন্য কার্য্য দেখিয়া কারণের অনুসন্ধান করিতে হয়। পুরাকালে যে বাল্যবিবাহের প্রথা প্রবর্তিত হইয়াছিল, তাহার কারণ পূর্ব্বেই

উল্লেখ করা গিয়াছে। এক্ষণে সে কাল নাই, সুতরাং তাৎকালিক প্রথাও এক্ষণে আর সমাজের উপযোগী হইতে পারে না। যে বাল্যবিবাহ একসময়ে সমাজের অঙ্গপুষ্টিকরণাভিপ্রায়ে বিশেষ আবশ্যক হইয়াছিল, এক্ষণে আবার তাহাই বিষময় ফল উৎপাদন করিতেছে। উপস্থিত প্রবন্ধে বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে আমরা কোন মতামত প্রকাশ করিতে চাহি না, কেন না ইহা অনেককাল হইতে বিচারিত হইয়া আসিতেছে, এবং তাঁহার সহিত প্রবন্ধের বিশেষ সম্বন্ধ নাই, তবে প্রসঙ্গক্রমে কথাটা যখন স্বতঃই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তখন সে বিষয়ে একটা কথা না বলিয়া ক্ষান্ত হওয়া উচিত নহে বলিয়াই বলিতে হইল। সচরাচর বাল্যবিবাহ বলিলে লোকে কন্যাপক্ষের দিকে দৃষ্টি করেন এবং বয়সের বিষয়ে মন-গড়া একটা সময় নির্দ্দেশ করিয়া লয়েন। স্ত্রীলোকের বয়ঃক্রম যেমন দেখা উচিত, পুরুষের পক্ষেও সেইরূপ বয়সের বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। আমরা বালিকার বিবাহ দিয়া তাহার শরীর-পুষ্টি ও মানসিক বৃত্তিবিকাশের পথ রুদ্ধ করিয়া দিই। বিবাহের অল্পদিন মধ্যেই কন্যাকে প্রায় শ্বশুরালয়ে বাস করিতে হয় সুতরাং তাহাকে বাল্য-প্রকৃতি সম্পূর্ণ-রূপে পরিবর্ত্তন করিতে হয়। আরও দেখা যায়, অল্প বয়সে বালিকাগণের উদ্বাহকার্য্য সম্পন্ন হইলে, তাহাদিগের সাংসারিক বা গৃহস্থালী শিক্ষা হয় না, অথবা আবশ্যকমত হয় না। বালিকা-বয়সে পিত্রালয়ে থাকিবার কালে যে শিক্ষা হইয়া থাকে, তাহা ভবিষ্যতে সংসারকার্য্যের বিশেষ উপকারে আইসে না, কারণ, দুইখানা পুস্তক পাঠ করিতে বা চিঠি-পত্র লিখিতে পারা, পশমের টুপি বা মোজা বুনিতে পারা বঙ্গীয় গৃহিণীর উপযোগী ও যথেষ্ট গুণ নহে। অতিথিসৎকার, গুরু-জনের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি, রন্ধন-কার্য্য, ক্ষীর সর প্রভৃতি মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিতে পারা, ছেলেপুলের পরিধেয় জামা, মোজা তৈয়ার এবং চাদর, বালিশ শেলাই করিতে পারা প্রভৃতি কার্য্যকরী শিক্ষা না হইলে বঙ্গমহিলা সুগৃহিণী হইতে পারে না।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দে [ক্রমশঃ]

স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী

সন্ন্যাসীর গীতি—১৪শ সংস্করণ। স্বামীজী-রচিত 'Song of the Sannyasin'-নামক ইংরেজী কবিতা ও উহার পদ্যে বঙ্গানুবাদ। মূল্য ২০ পয়সা।

ঈশদূত যীশুখৃষ্ট—৫ম সংস্করণ, ভগবান ঈশার জীবনালোচনা—মূল্য ০'৪০, উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে মূল্য ০'৩৫।

সরল রাজযোগ—৫ম সংস্করণ। স্বামীজী আমেরিকায় তাঁহার শিষ্যা সারা সি. বুলের বাড়িতে কয়েকজন অন্তরঙ্গকে 'যোগ' সম্বন্ধে যে বিশেষ উপদেশ দান করেন, বর্তমান পুস্তক তাহারই ভাষান্তর। মূল্য ০'৫০।

পত্রাবলী—১ম ও ২য় ভাগ। অভিনব পরিবর্ধিত সংস্করণ। প্রায় ১০৫০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। স্বামীজীর বহু অপ্রকাশিত পত্র ইহাতে সংযোজিত হইয়াছে। তারিখ অনুযায়ী পত্রগুলি সাজানো হইয়াছে। পরিচয়- এবং নির্ঘণ্ট-সংযুক্ত। মনোরম বাঁধাই। স্বামীজীর সুন্দর ছবি-সংবলিত। প্রতি ভাগ মূল্য ৫'৫০; উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে মূল্য ৫৲।

ভারতে বিবেকানন্দ—১৪শ সংস্করণ। আমেরিকা হইতে প্রত্যাবর্তনের পর স্বামীজীর ভারতীয় বক্তৃতাবলীর উৎকৃষ্ট অনুবাদ। ৫১৭ পৃষ্ঠা; মূল্য ৫'০০। উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে মূল্য ৪'৫০।

দেববাণী—৯ম সংস্করণ। আমেরিকায় 'সহস্র-দ্বীপোত্তান'-নামক স্থানে কয়েকজন অন্তরঙ্গ শিষ্যকে স্বামীজী যে-সকল অমূল্য উপদেশ প্রদান করেন, ঐগুলির একত্র সমাবেশ। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি, ২১৪ পৃষ্ঠা; মূল্য—২৲ উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে মূল্য ১'৮০।

শিক্ষাপ্রসঙ্গ—৪র্থ সংস্করণ। শিক্ষা-সম্বন্ধে স্বামীজীর বাণীসকল সংকলিত ও ধারাবাহিক-ভাবে সন্নিবেশিত। ১৮৮ পৃষ্ঠা; মূল্য ১'৭৫।

কথোপকথন—৭ম সংস্করণ। স্বামীজীর ছবিযুক্ত। ডবল ক্রাউন, ১৬ পেজি, ১৪২ পৃষ্ঠা। মূল্য ১'২৫। উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে মূল্য ১'১৫।

মদীয় আচার্যদেব—স্বামী বিবেকানন্দ-প্রণীত; ১১শ সংস্করণ, ৬৪ পৃষ্ঠা। স্বীয় গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনী ও শিক্ষা-সম্বন্ধে আমেরিকাবাসীদের নিকট স্বামীজীর বিবৃতি। মূল্য ০'৭৫; উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে মূল্য ০'৬৫।

জ্ঞানযোগ-প্রসঙ্গে—বিভিন্ন বক্তৃতার সারসংক্ষেপ—ইংরেজীতে প্রকাশিত Discourses on Jnana Yoga পুস্তকের অনুবাদ। 'স্বামীজীর বাণী ও রচনা' হইতে পৃথক্ পুস্তকাকারে প্রকাশিত। আত্মতত্ত্ব ও বেদান্ত-বিষয়ক বহু কঠিন বিষয় সরলভাবে আলোচিত। 'জ্ঞানযোগ' গ্রন্থ পড়িবার পক্ষে সহায়ক। মূল্য দুই টাকা।

স্বামি-শিষ্য-সংবাদ—(পূর্বকাণ্ড — ১৩শ সংস্করণ; উত্তরকাণ্ড—১১শ সংস্করণ)। শ্রীশরৎ-চন্দ্র চক্রবর্তী প্রণীত। স্বামী বিবেকানন্দের মতামত অল্প কথায় জানিবার উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। স্বামীজীর জীবিতকালে তাঁহার সহিত প্রশ্নোত্তরচ্ছলে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য-দেশীয় আচার-নীতি, দর্শন-বিজ্ঞানাদি এবং ধর্ম ও সমাজগত সমস্যামূলক নানা বিষয়ের বিশদ আলোচনা। সরস ও হৃদয়গ্রাহী এই সব বর্ণনা সত্যই আনন্দদায়ক। বর্তমান যুগের বহু সমস্যার আদর্শানুগ সমাধানও ইহাতে পাওয়া যাইবে। জীবনতত্ত্ব বিষয়ে এই পুস্তকদ্বয় অমূল্য রত্নের সন্ধান দিবে। ২২০ ও ২১০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য প্রতি কাণ্ড ২'২৫।

মহাপুরুষ-প্রসঙ্গ—১৬শ সংস্করণ। ১৫৪ পৃষ্ঠা। ইহাতে রামায়ণ, মহাভারত, জড়-ভরতের উপাখ্যান, প্রহ্লাদচরিত্র, জগতের মহত্তম আচার্যগণ, ঈশদূত যীশুখ্রীষ্ট, ভগবান বুদ্ধ প্রভৃতি বিষয় আছে। কোমলমতি বালক-দিগের চরিত্রগঠনে ও ভারতীয় সংস্কৃতিতে তাহাদিগকে শ্রদ্ধাবান্ করিতে ইহা বিশেষ সহায়তা করিবে; মূল্য ৩'০০; উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে মূল্য ২'৭০।

প্রাপ্তিস্থান :—উদ্বোধন কার্যালয়, বাগবাজার, কলিকাতা ৩

শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা এবং স্বামী বিবেকানন্দ-সম্বন্ধীয় পুস্তকাবলী

উদ্বোধন-প্রকাশিত অন্যান্য পুস্তকাবলী

দশাবতারচরিত—৫ম সংস্করণ। শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য-প্রণীত। এই পুস্তক-পাঠে চরিত-কথার গল্পপ্রিয় পাঠক এবং ভক্তগণ ধর্ম ও ধর্মতত্ত্বের সন্ধান পাইবেন। মূল্য ২'০০।

শঙ্কর-চরিত—শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য-প্রণীত—৫ম সংস্করণ; আচার্য শঙ্করের অদ্ভুত জীবনী অতি সুললিত ভাষায় লিখিত। মূল্য ১৲।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বেদান্ত—স্বামী বিবেকানন্দ প্রণীত। ১৮৯৬ খৃঃ মার্চ মাসে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত বক্তৃতা এবং তৎপরবর্তী প্রশ্নোত্তর ও আলোচনা। বেদান্তের মূলতত্ত্ব অতি স্পষ্টভাবে ব্যক্ত। প্রশ্নোত্তর ও আলোচনায় ভারতীয় কৃষ্টি ও হিন্দুধর্মের মূল ভাব সাহসিকতার সহিত সরলভাবে উপস্থাপিত। পৃষ্ঠা ৫৫; মূল্য এক টাকা।

শিব ও বুদ্ধ—৭ম সংস্করণ। ভগিনী নিবেদিতা-প্রণীত। ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য রচিত সরল ও সুখপাঠ্য আখ্যান। মূল্য ০'৭৫।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ—শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সর্বপ্রথম অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের সবিস্তার ধারাবাহিক জীবনী। মূল্য—৩'০০।

ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ—৭ম সংস্করণ। স্বামী ব্রহ্মানন্দের কথোপকথন এবং পত্রাবলীর সংগ্রহ। প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু-লিখিত সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা। মূল্য ২'৫০।

মহাপুরুষ শিবানন্দ—স্বামী অপূর্বানন্দ-প্রণীত। ৩য় সংস্করণ। শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজীর বিস্তারিত জীবনী। মূল্য—৫'০০।

শিবানন্দ-বাণী—২য় ভাগ—৩য় সংস্করণ। স্বামী অপূর্বানন্দ-সঙ্কলিত। মূল্য—২'৫০।

শ্রীরামানুজ-চরিত—স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ-প্রণীত, ৩য় সংস্করণ, ২৫৮ পৃষ্ঠা। শ্রীসম্প্রদায়ে প্রচলিত আচার্য রামানুজের বিস্তৃত জীবনবৃত্তান্ত বাংলা ভাষায় প্রকাশিত। আচার্যের জীবদ্দশায় কোদিত প্রতিমূর্তির ছবি এই গ্রন্থে আছে। মূল্য ৩৲। উঃ প্রাঃ পক্ষে ২'৭৫

স্বামী অখণ্ডানন্দ—স্বামী অন্নদানন্দ-প্রণীত। এই পুস্তকে শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্নিধানে, তিব্বতে ও হিমালয়ে, স্বামীজীর সঙ্গে, দুর্ভিক্ষে সেবাকার্য, সেবাব্রতের প্রাণপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতি অধ্যায়ে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্যের পথিকৃৎ স্বামী অখণ্ডানন্দের ধারাবাহিক জীবনী। ডিমাই সাইজ, ৩১০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৪৲।

সাধু নাগমহাশয়—শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী-প্রণীত। ১১শ সংস্করণ। যাঁহার সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন, "পৃথিবীর বহু স্থান ভ্রমণ করিলাম, নাগমহাশয়ের ন্যায় মহাপুরুষ কোথাও দেখিলাম না।"—পাঠক! তাঁহার পুণ্য জীবন-বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া ধন্য হউন। মূল্য ২'০০।

গোপালের মা—স্বামী সারদানন্দ-প্রণীত (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ হইতে সঙ্কলিত)। অতুলনীয়-সাধননিষ্ঠ, পরমভক্ত গোপালের মা-র আদর্শ জীবনের সংক্ষিপ্ত কাহিনী। মূল্য ৫০ পয়সা।

লাটু মহারাজের স্মৃতিকথা—শ্রীচন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়-প্রণীত। ২য় সংস্করণ। শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও ঠাকুরের শিষ্যবর্গ সম্বন্ধে বহু অপ্রকাশিত ঘটনাবলীর সমাবেশ। নিজ জীবনের কঠোর ত্যাগ-তপস্যার কথায় অদ্ভুত প্রকাশভঙ্গীতে পাঠকগণ চমৎকৃত হইবেন। মূল্য—৪'০০।

স্বামী তুরীয়ানন্দ—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ-প্রণীত। বাল্যাবধি বেদান্তী এই মহারাজের জীবনের অদ্ভুত ঘটনাবলী-পাঠে চমৎকৃত হইবেন। ৩৪০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য—৩'৫০।

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিষ্যগণের সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত একত্র এই প্রথম প্রকাশিত হইল। দুই ভাগে সম্পূর্ণ। প্রতি ভাগের মূল্য—৫'৫০।

ভগিনী নিবেদিতা—স্বামী তেজসানন্দ-প্রণীত। ইহাতে তাঁহার জীবনের মুখ্য ঘটনাবলীর সম্যক্ আলোচনা রহিয়াছে। ইহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে "ভগিনী নিবেদিতা-স্মৃতি বক্তৃতামালা"র প্রথম বক্তৃতা। মূল্য—১'৫০

প্রাপ্তিস্থান :—উদ্বোধন কার্যালয়, বাগবাজার, কলিকাতা ৩

উদ্বোধন, বৈশাখ, ১৩৮০

বিষয়-সূচী

বিষয়-সূচী

ভালো চা বলতে
টসের
চা
AIR TIGHT
A. TOSH & SONS CALCUTTA
এ, টস এণ্ড সন্স
ফোন
২২-৪৭৮৫
কলিকাতা—১

দিব্য বাণী

পূর্ণস্যাবাহনং কুত্র সর্বাধারস্য চাসনম্। ..
প্রদক্ষিণা হ্যনন্তস্য হ্যদ্বয়স্য কুতো নতিঃ।
বেদবাক্যৈরবেদ্যস্য কুতঃ স্তোত্রং বিধীয়তে॥
স্বয়ম্প্রকাশমানস্য কুতো নিরাজনং বিভোঃ।
অন্তর্বহিশ্চ পূর্ণস্য কথমুদ্বাসনং ভবেৎ॥
এবমেব পরা পূজা সর্বাবস্থাসু সর্বদা।
একবুদ্ধ্যা তু দেবেশে বিধেয়া ব্রহ্মবিত্তমৈঃ॥

শঙ্করাচার্য—পরাপূজাস্তোত্রম্, ১, ৪-৬

সর্বত্র রাজিত যিনি কোথা তাঁরে করিবে আহ্বান?
যাঁহারে আশ্রয় করি অস্তিত্ব বিশ্বের –
কোথা তাঁর বিছাবে আসন?
অনন্ত যে বিভু তাঁরে প্রদক্ষিণ করিবে কেমনে?
অদ্বিতীয় যিনি তাঁরে প্রণাম করিবে কোন্ জন?
বেদের বাক্যও যাঁরে পারে নাকো করিতে প্রকাশ
কোন স্তোত্র দিয়া তাঁর করিবে পূজন?
আপন প্রভায় যিনি প্রকাশিত, যিনি স্বপ্রকাশ
প্রদীপ জ্বালিয়া তাঁর আরতি কি হয়?
বিসর্জন দিবে তাঁরে কিভাবে কোথায়—
অন্তর বাহির পূর্ণ করি রয়েছেন
যিনি সব ঠাঁই?
এই ভাবে— স্বরূপ চিন্তিয়া তাঁর সর্ব অবস্থায়—
সর্বদাই তাঁর সনে অভেদ ভাবে যে আপনারে
সেই ব্রহ্মবিদুত্তম, সেইজনই করে
দেবেশের শ্রেষ্ঠ পূজা একত্বভাবনা-উপচারে!

কথাপ্রসঙ্গে

গল্প কেন?

'যে সত্য আদিতে উত্তম, মধ্যে উত্তম এবং অন্তে উত্তম, ঐ সত্য আমি প্রচার করিয়াছি। ইহার বাহ্য ও অভ্যন্তর মহিমামণ্ডিত। কিন্তু সরল হইলেও জনসাধারণ ইহা বুঝিতে পারে না। আমি তাহাদের নিজেদের ভাষায় তাহাদের নিকট ব্যক্ত হইব, আমি আমার চিন্তাকে তাহাদের চিন্তার অনুরূপ করিব। তাহারাও শিশুর ন্যায় গল্প শুনিতে ভালবাসে। অতএব ধর্মের গৌরব ব্যাখ্যা করিবার জন্য আমি তাহাদের গল্প বলিব। ·· ··· আখ্যায়িকার সাহায্যে তাহারা উহা বুঝিতে সমর্থ হইতে পারে।'

ভগবান্ বুদ্ধ গল্পের মাধ্যমে উপদেশ দিবার, দুরূহ আধ্যাত্মিক তত্ত্ব বুঝাইবার এই কারণ দেখাইয়াছেন। এই একই কারণে কেবল বুদ্ধদেব নন, উপনিষদের ঋষিগণ গল্প বলিয়াছেন, ব্যাসদেব রাশি রাশি গল্প বলিয়াছেন, যীশুখৃষ্ট বলিয়াছেন, শ্রীরামকৃষ্ণদেব কথায় কথায় গল্প বলিতেন।

তবে, এরূপ করা অতি কঠিন কাজ—একমাত্র অবতার বা অবতারকল্প পুরুষগণের পক্ষেই দুরূহ উচ্চ তত্ত্বগুলিকে অতি সহজ সরল ভাষায় সর্বসাধারণের চিন্তার সহজগ্রাহ্য করিয়া বলা সম্ভব, গল্পের মাধ্যমে উপস্থাপিত করা সর্বসাধারণের চিন্তার স্তরে নিজেকে নামাইয়া আনা সম্ভব।

তাছাড়া, চরম সত্য সম্বন্ধে এই সব দুরূহ তত্ত্বগুলিও তো এক হিসাবে গল্প—মানুষের মনবুদ্ধির ধারণার উপযোগী করিয়া বাক্যমনাতীত সত্যকে উপস্থাপন—যাহা চরমসত্যের উপলব্ধিভূমি হইতে 'একশো হাত' নীচে নামিয়া মনবুদ্ধির স্তরে আসিয়া তাঁহাদের বলিতে হয়। চরম সত্যকে কোন ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, আমাদের জানা কোন কিছুর সহিত ইহার তুলনাও চলে না—যেখানে ইহার প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হয় সেখানে চিন্তা নাই, বিচার নাই, আমাদের পরিচিত দৃষ্ট বা কল্পিত কোন কিছুরই অস্তিত্ব নাই, এমন কি 'আমি' বলিতে সাধারণতঃ দেহজ্ঞান, চিন্তা, সুখদুঃখাদির অনুভূতি, বিচারশক্তি প্রভৃতি জড়াইয়া যে বোধ আমাদের উঠে, তাহাও নাই। কাজেই সে সত্যের উপলব্ধির জন্য চেষ্টা তো দূরের কথা, 'আমি'বোধও থাকে না এমন কিছুর কথা ভাবিতেই তো ভয় পায় সাধারণ মানুষ! সাধারণ মানুষ কেন, যাজ্ঞবল্ক্যের পত্নী মৈত্রেয়ীও, যিনি অমৃতত্ব ছাড়া আর কিছু চান নাই, তিনিও সে অবস্থায় 'সংজ্ঞা ন অস্তি'—আমরা যাহাকে অহংবোধ বলিয়া জ্ঞান বলিয়া জানি তাহাও থাকে না, যাজ্ঞবল্ক্যের মুখে একথা শুনিয়া ভীতা হইয়াছিলেন—তাহা হইলে থাকিবে কি? নরেন্দ্রনাথ, যিনি সত্যলাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট আসিয়াছিলেন তিনিও দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার সহিত দ্বিতীয় সাক্ষাতের দিন তাঁহার স্পর্শে এই সত্যউপলব্ধিতে উন্নীত হইবার পথে বিশ্বজগতের সব কিছুর সহিত তাঁহার নিজের আমিত্ব-বোধও ঘুরিতে ঘুরিতে এক মহাশূন্যে লীন হইতে চলিয়াছে দেখিয়া ইহাকে মৃত্যু ভাবিয়া চিৎকার করিয়া উঠিয়াছিলেন, 'তুমি আমার একি করলে, আমার যে মা-বাপ আছে!' পরবর্তীকালে এই সত্যোপলব্ধিতে প্রতিষ্ঠিত স্বামীজীর মুখে মনবুদ্ধি-অহং-হীন সত্যের কথা শুনিয়া জনৈক শ্রোতা সভয়ে বলিয়াছিলেন, 'ইহা তো ব্যক্তিত্বের বিনাশ! ব্যক্তিত্ব না থাকিলে থাকিল কি?'

কি থাকে তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, আজ পর্যন্ত কেহ তাহা বলিতে পারেন নাই। স্বামী সারদানন্দ-প্রমুখ কয়েকজন যুবকভক্তের একান্ত অনুরোধে শ্রীরামকৃষ্ণদেব একদিন বলিবার

চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু বিফল হইয়া শেষে বলিয়াছিলেন 'মা মুখ চেপে ধরেছে', বলতে দিচ্ছেন না। স্বামী সারদানন্দ লিখিয়াছেন, ইনি তো ভাল কথাই বলতে চাইছেন, তবু মা বলতে দিচ্ছেন না কেন! পরে বুঝিয়াছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহাদের প্রতি ভালবাসায় অসাধ্যসাধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব এই প্রসঙ্গে পরে বলিয়াছেন, এই সত্যোপলব্ধি থেকে একশো ধাপ নামিয়া আনিয়া তবে ওঁকার উচ্চারণ করিতে পারা যায়! আচার্য শঙ্কর এই জন্যই বেদ-বেদান্তকেও অবিদ্যার অন্তর্গত বলিয়াছেন, কারণ উহা কথা, মনবুদ্ধির এলাকার বিষয়। এই জন্যই বুদ্ধদেব বুদ্ধত্বলাভান্তে দীর্ঘ উনপঞ্চাশ দিন উহাতে মগ্ন থাকিয়া ব্যুত্থিত হইবার পর ভাবিয়াছিলেন, এ সত্য প্রচার করিয়া কোন লাভ নাই, কারণ সাধারণ মানুষ ইহা ধারণা করিতে পারিবে না, ইহা গ্রহণ করিবে না, 'কেবল মাত্র আমি ক্লান্ত ও ক্লিষ্ট হইব।' 'অহংকারের সংহার পরমানন্দজনক।' কিন্তু 'সংসারাসক্ত ব্যক্তি এই সত্য অনুধাবন করিবে না, কারণ তাহারা আত্মানুসরণে সুখান্বেষণ করে।··· ···বুদ্ধের নিকট যাহা অনন্ত জীবন, উহাদের নিকট তাহা মৃত্যু।' পরে, কথিত আছে, ব্রহ্মার কথায় তিনি প্রচারে ব্রতী হন। অবশ্য এই সত্যকে তিনি অধিকারী-ভেদে তাহাদের মনবুদ্ধির ধারণাশক্তির অনুরূপ আকার দিয়া, 'তাহাদের চিন্তার অনুরূপ করিয়া' প্রচার করিয়াছেন—চরম সত্য হইতে বহু ধাপ নীচে কথা বলিবার মতো স্তরে নামিয়াই নয়, তাহা হইতেও বহুনিম্নে সর্বসাধারণের স্তরে নামিয়া উপদেশ দিয়াছেন। ইহা অবতার বা অবতারকল্প পুরুষদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাঁহারা যখন উপদেশ দেন, তখন যাহাদের বলিতেছেন 'তাহাদের নিজেদের ভাষায় তাহাদের নিকট ব্যক্ত' হন। বাক্যমনের অতীতে সত্যকে তাহাদের ধারণার উপযোগী একটি আকার দেন। 'নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্ম', 'সচ্চিদানন্দ', 'সগুণ নিরাকার ঈশ্বর', 'কালী', 'কৃষ্ণ', 'আল্লা', 'গড্'—এ সবই মনবুদ্ধির সীমায় দেওয়া চরমসত্যের বিভিন্ন আকার মাত্র। রুচি ও সামর্থ্যভেদে এগুলির কোন একটিকে অবলম্বন করিয়া আমরা সত্যলাভের জন্য মন-বুদ্ধি-অহংকারের পারে যাইবার পথে, মনবুদ্ধির ভিতর দিয়া প্রকাশিত সর্ববিধ অনুভূতির শিখাকে নির্বাপিত করিবার পথে অগ্রসর হইতে পারি।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব স্বামীজীকে বলিয়াছিলেন, অবতারগণ মনবুদ্ধির অতীত সত্যকে মনবুদ্ধিগ্রাহ্য একটা আকারে উপস্থাপিত করিবার সময় প্রতি ক্ষেত্রেই সময়োপযোগী একটা নূতন আকার দিয়া যান। এই জন্যই তাঁহারা সকলেই—উপনিষদের ঋষিগণ, রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, শঙ্কর, রামানুজ, চৈতন্যদেব, যীশুখৃষ্ট, মহম্মদ প্রভৃতি সকলেই—একই সত্যের কথা প্রচার করিলেও তাঁহাদের প্রচারিত সত্যকে আপাতদৃষ্টিতে বিভিন্ন বলিয়া মনে হয়। একই পরম সত্যে পৌঁছাইবার পথ তাঁহারা সকলেই দেখাইয়া যান, তবে একই পথ নয়, দেশকালোপযোগী বিভিন্ন পথ, নূতন নূতন পথ। এই কারণেই ধর্মের মূল সত্য সম্বন্ধে সজাগ না থাকিলে গোঁড়ামি আসিয়া পড়ে; মনে হয় যে-ধর্মপ্রবর্তকের কথা আমার মনবুদ্ধির উপযোগী, যাঁহার প্রবর্তিত পথে আমি চলিতেছি, কেবল তাঁহার প্রবর্তিত পথই, তাঁহার কথাই সত্য, আর সব ভুল। সাধারণ মানুষই শুধু এ ভুল করেনা, আধুনিক যুগের কোন কোন গভীর চিন্তাশীল মনীষীও অধ্যাত্মজগতের এই মূল সত্যটি সম্বন্ধে অবহিত না থাকার দরুণ একই ভুল করিয়াছেন, এই ভ্রান্ত ধারণা পোষণ ও প্রচার করিয়াছেন যে, যাহা সত্য তাহা তো আর বিভিন্নরূপ হইতে পারে না, অথচ বিভিন্ন ধর্মপ্রচারকগণ বিভিন্নরূপে ঈশ্বরকে বর্ণিত করিয়াছেন—কাজেই সব ধর্মই

মিথ্যা। ঈশ্বরের অস্তিত্বের ও মানুষের দেহাতীত সত্তার অস্তিত্বের বিরুদ্ধে প্রচারের এই যুক্ত্যাভাস-টিকে ব্যবহার করিয়াছেন তাঁহারা।

বুদ্ধদেব কিন্তু এই বাক্যমনাতীত সত্যে উপনীত হইবার পথের সন্ধান দিলেও প্রত্যক্ষ-ভাবে উহার মনবুদ্ধিগ্রাহ্য কোন আকার দেন নাই, পরোক্ষভাবে অবশ্য আভাস রহিয়াছে—আমাদের পরিচিত সব জ্ঞানের সব অনুভূতির শিখা নির্বাপিত হইলেও উহা শূন্য নয় বরং পরম আনন্দ, অনন্ত অস্তিত্ব, শান্তি ও জ্ঞানের অবস্থা। যাহা চিন্তার অতীত, ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, সে বিষয়ে প্রশ্ন করিলে তিনি নীরব থাকিতেন। শূন্যবাদ, ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদ প্রভৃতি তত্ত্ব, 'আকার' লইয়া বৌদ্ধদর্শন গড়িয়া তুলিয়াছেন তাঁহার অনুগামিগণ তাঁহার তিরোধানের পরে। সত্যে পৌঁছাইবার পথই তিনি দেখাইয়াছেন, সে পথে চলিবার জন্য উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন; পথের শেষে যাহা আছে সেখানে পৌঁছিলেই তো তাহা প্রত্যক্ষ হইবে—এই ছিল তাঁহার ভাব।

অবশ্য, দেহাত্মবোধরূপ, বিশেষ করিয়া সূক্ষ্ম দেহকে আমি বলিয়া ভাবা-রূপ আমাদের জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া বাসকরা ঘর ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়া সত্যলাভের পথে অবলম্বনহীন ভাবে চলার লোকের সংখ্যা চিরদিনই বিরল। অধি-কাংশ লোকের জন্যই, প্রায় সকলের জন্যই চলার পথে একটা অবলম্বন, সত্যের একটা আকার একটা তত্ত্ব প্রয়োজন হয়ই; তার ভিতরও আবার অধিকাংশের জন্য চাই নামরূপবিশিষ্ট একটা স্থূল আকার। পরবর্তী কালে তাই বুদ্ধ-দেবকেই ঈশ্বরের আসনে বসাইয়া নির্বাণলাভের পথে অগ্রসর হইয়াছেন তাঁহার মতানুগ অধিকাংশ মানুষ—মহাযানপন্থীরা মহাযান অর্থাৎ বিরাট যান, যাহা বহুলোককে লইয়া যাইতে পারে।

যে পথ দিয়াই আমরা চলিনা কেন, চরম সত্য লাভ করিতে হইলে পরিণামে এই স্থূলদেহে আমিত্ববোধরূপ গৃহের (শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় 'খাঁচার'—হাড়-মাসের খাঁচার) বাহিরে তো বটেই, সূক্ষ্ম দেহেরও, মনবুদ্ধিতে আমিত্ববোধরূপ গৃহেরও বাহিরে আমাদের অস্তিত্ববোধকে সরাইয়া আনিতে হইবে। কিন্তু বাহিরে আসিতে বলিলেই তো আর কেহ বাহিরে আসিতে চাহিবে না—এ ঘরে বসিয়া কত মজার খেলনা লইয়া খেলিতেছি আমরা জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া, সে খেলায় দুঃখ থাকিলেও সুখও তো কিছু পাইতেছি! অনিশ্চিতের জন্য সে ঘর ছাড়িব কেন? বুদ্ধদেব তাই এরূপ ক্ষেত্রে আমাদের মনবুদ্ধির প্রিয় কোন কিছুর লোভ দেখাইয়াই আমাদের ঘরের বাহিরে আনিতে চাহিয়াছেন। কথাটি বলিয়াছেন একটি গল্পের মাধ্যমে:

'এক ধনী গৃহস্থের এক বিরাট পুরাতন সৌধ ছিল। একদিন উহাতে আগুন লাগিল। গৃহস্থ সৌধের বাহিরে ছিলেন। তিনি উহা দেখিতে পাইলেন, কিন্তু ভিতরে তাঁহার অনেকগুলি সন্তান তখন খেলায় মত্ত, তাহারা তখনও উহা টের পায় নাই। গৃহস্থ উদ্বিগ্ন হইলেন—কি করিয়া সন্তানদের রক্ষা করা যায়! ডাকিলে খেলা ছাড়িয়া কেহই আসিবে না, আমি বিপদের কথা বলিলেও তাহা বিশ্বাস করিবে না, বাহিরে আসিবার পথ রুদ্ধ হইবার আগে নিজেরা বিপদের কথা টেরও পাইবে না। তিনি অবশ্য ভিতরে গিয়া জোর করিয়া ধরিয়া আনিতে পারেন, কিন্তু এভাবে একজনকে মাত্র বাঁচাইতে পারিবেন, বাকীগুলিকে আনিবার সময় আর থাকিবে না, ততক্ষণে আগুন ছড়াইয়া পড়িবে। অকস্মাৎ তাঁহার মনে একটি কল্পনা জাগিল—"ছেলেরা তো খেলনা ভালবাসে, তাহার লোভ দেখাইলেই উহারা আমার কথা শুনিবে।" তৎক্ষণাৎ তিনি চিৎকার করিয়া বলিলেন, 'খুব ভাল ভাল খেলনা

এনেছি তোমাদের জন্য। নেবে এস।" শোনা মাত্র সকলে ছুটিয়া গৃহের বাহিরে আসিল।'

বুদ্ধদেব গল্পটি বলিয়া বলিয়াছেন, 'খেলনা কথাটি তাহাদের মনকে আকর্ষণ করিয়াছিল।' 'তথাগত জানেন যে সংসারিগণ জগতের অকিঞ্চিৎকর ভোগসুখে অনুরক্ত; তিনি ধর্মপথের পরমানন্দ বিবৃত করিয়া তাহাদের আত্মাকে বিনাশ হইতে রক্ষা করিবার প্রচেষ্টা করেন।'

মানুষ শুধু ইহলোকের ভোগেই সন্তুষ্ট নয়, তাহারা ধর্মকর্ম করিতে চায় পরলোকে, স্বর্গাদি লোকে গিয়া আরো ভালভাবে নিরুদ্বেগে ভোগ করিবার জন্য। একজন বুদ্ধদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'স্বর্গের আশা কি অর্থহীন? পশ্চিমদেশে এক পুণ্যভূমি আছে শোনা যায়, সেখানে কেবল সঙ্গীত আর আনন্দ, সেখানে গেলে আর নীচ জন্ম হয় না, সেখানে কোন দুঃখ নাই—উহাই স্বর্গ। ইহা কি সত্য?'

বুদ্ধদেব 'না' বলিলেন না, তাহার প্রিয় খেলনাটিকে তাহার মনের হাত হইতে কাড়িয়া লইলেন না—ঐ খেলনার ভিতর দিয়াই চরম সত্য সম্বন্ধে তাহাকে সজাগ করিয়া দিলেন: 'এইরূপ পুণ্যভূমি সত্যই আছে। কিন্তু উহা অরূপ। তুমি বলিতেছ উহা পশ্চিম দিকে, অর্থাৎ যেদিকে জগতের আলোক-বিতরণকারী সূর্য অস্ত যায়। ইহাও ঠিক—সূর্যাস্তে জগৎ অন্ধকার হয়, কিন্তু সূর্যাস্তকে (আলোকের) বিনাশ বলা চলে না, আলোকের উৎস সূর্য থাকিয়াই যায়। সূর্যাস্তকে (দেহমনবুদ্ধি হইতে আমিত্ববোধ—চৈতন্যালোক—সরাইয়া লওয়াকে) বিনাশ বলা যায় না, যেখানে আমরা বিনাশ কল্পনা করি সেখানে অপরিসীম আলোক, অনন্ত জীবন।'

এই ধরণের অজস্র উপমা, অজস্র গল্প রহিয়াছে বুদ্ধদেবের কথায়।

ভগবান বুদ্ধ ও আচার্য শঙ্কর

বেদান্তোক্ত ব্রহ্মজ্ঞানলাভের পথই বুদ্ধদেব দেখাইয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার 'নির্বাণ' মানে যে এই ব্রহ্মজ্ঞান, তাহা খুলিয়া বলেন নাই। তাঁহার বিশাল হৃদয় ব্রাহ্মণদের নিকট সীমাবদ্ধ বেদের চরম জ্ঞানকেই সর্বসাধারণের মধ্যে ছড়াইয়া দিয়াছিল, কিন্তু তিনি বেদ মানেন নাই স্বামীজী এইজন্য বৌদ্ধধর্মকে 'হিন্দুধর্মের বিদ্রোহী সন্তান' বলিয়াছেন। হিন্দুধর্মের মূল ভিত্তি বেদের জ্ঞানকাণ্ডের কথাই প্রচার করিলেও বেদ না মানার প্রধান কারণ বোধ হয় এইজন্য যে, ইহা না করিলে বেদ বলিতে যে বেদের কেবল কর্মকাণ্ডই বুঝায় এবং আত্মজ্ঞানলাভ বা ভগবানলাভ জীবনের চরমলক্ষ্য নয়, যজ্ঞাদি কর্মের মাধ্যমে স্বর্গলাভই জীবনের চরম লক্ষ্য—তৎকালে সর্বসাধারণের মনে বদ্ধমূল এই ধারণাকে সমূলে উৎপাটন করিয়া জীবনের পরম কল্যাণের পথ দেখানো সম্ভব হইত না। তৎকালে সনাতন ধর্মের রক্ষার জন্য ইহার একান্ত প্রয়োজন ছিল।

কিছুকাল পরে একই উদ্দেশ্যে প্রয়োজন ছিল শিবাবতার শঙ্করের আবির্ভাব ও যুগোপযোগী প্রচার। কারণ, বুদ্ধদেব প্রচারিত ধর্ম সর্বসাধারণ বেশীদিন অবিকৃত রাখিতে পারিল না, আচরণ হইতে তাঁহার মূল শিক্ষাই প্রায় লুপ্ত হইতে বসিল। সেই সময় আচার্য শঙ্কর আসিয়া অদ্বৈত বেদান্তকে পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত করিলেন বেদকে প্রামাণ্যরূপে গ্রহণ করিয়াই। এই উচ্চতত্ত্ব ধারণা ও প্রথম হইতেই ইহা অবলম্বনে সত্যাভিমুখে চলিতে যাহারা অসমর্থ, তাহাদের জন্য ঈশ্বর-আরাধনার প্রয়োজনীয়তাকেও স্বীকার করিলেন।

সনাতন ধর্মের রক্ষাকল্পে উভয়েরই সময়োপযোগী প্রয়োজন ছিল। এক বৈশাখী পূর্ণিমা ও এক বৈশাখী শুক্লা পঞ্চমী চিরন্তন আলোকের

এই দুটি প্রকাশপথের মুখ অপাবৃত করিয়াছিল। আজ সশ্রদ্ধ চিত্তে ইঁহাদের চরণে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করি এবং স্মরণ করি বুদ্ধদেবেরই কথা—ফুল বেলপাতা দিয়া পূজা করা নয়, ইঁহাদের কথা মতো জীবনগঠন করাই ইঁহাদের প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন।

ধম্মপদ

[যমকবগ্‌গো]

(অনুবাদক : শ্রীনির্মলচন্দ্র বড়ুয়া)

শত্রুতায় বৈরীভাব উপশান্ত হয় না কখন ;
'মিত্রতায় শান্তিলাভ' এই বাণী বহু পুরাতন ॥ ৫
'মৃত্যুপথযাত্রী মোরা' ভুলে যায় যাহারা অজ্ঞান ;
সুধী সবে এই ভেবে কলহের করে অবসান ॥ ৬

বীর্যহীন, অসংযমী, ইন্দ্রিয়ের সুখলালসায়
ভোজনবিলাসী যেবা আলস্যেতে সময় কাটায় ;
'মার'-প্রলোভনে তার পরাভব সুনিশ্চিত জেনো :
দুর্বল পাদপে যথা নিপাতিত করে প্রভঞ্জন ॥ ৭
বীর্যবান সুসংযত মিতাহারী যদি কোন জন
বিলাসে নাহিক মতি, সাধনায় রহে নিত্যক্ষণ।
শিলাময় গিরি যথা ঝটিকায় রহে চিরস্থির,
সে-প্রাজ্ঞ চরণে তথা 'মার' নত করে তার শির। ৮

অসার বস্তুকে যেবা অকারণ জ্ঞান করে সার
সারবান কোন বস্তু যার কাছে একান্ত অসার।
দৃষ্টি যার মিথ্যাশ্রয়ী, আলোরে যে ভাবে অন্ধকার
এ জীবনে কভু সে যে পাইবে না জীবনের সার ॥ ১১
অসার অসার বস্তু, সত্য জ্ঞান এই আছে যার
সারবান কোন বস্তু যার কাছে একান্তই সার।
দৃষ্টি যার সত্যাশ্রয়ী, জ্ঞাননেত্র উদ্ঘাটিত যার,
এ জীবনে লভিবে সে অচিরেই জীবনের সার ॥ ১২

বাংলাদেশে রামকৃষ্ণ মিশনের ভূমিকা

আবুসাদাত মোহাম্মদ সায়েম

রামকৃষ্ণ মিশনের সংস্কৃতি ভবনের ভিত্তি-প্রস্তরস্থাপনের ভিতর দিয়া এই নব প্রতিষ্ঠানের সূচনাকার্যে অংশ গ্রহণের জন্য ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশনের কর্মকর্তাগণ আমাকে যে আমন্ত্রণ জানাইয়াছেন তাহার জন্য আমি নিজেকে অত্যন্ত গৌরবান্বিত বোধ করিতেছি।

রামকৃষ্ণ মিশনের ইতিহাস জাতিধর্মনির্বিশেষে নিঃস্বার্থ জনসেবার ইতিহাস। সকল ধর্মাবলম্বিগণের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি এবং দুর্গত দুঃস্থ জনগণের সেবা রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম মূল লক্ষ্য। বিগত ইংরেজী ১৮৯৭ সালে ইহার প্রতিষ্ঠাকাল হইতে এই মিশন তাহার মূল লক্ষ্যকে বাস্তবে রূপায়িত করিবার উদ্দেশ্যে পৃথিবীর সর্বত্র তাহার কর্মধারাকে প্রসারিত করার নিরলস চেষ্টায় ব্রতী। তাই আজ বাংলাদেশ ছাড়া ইংল্যাণ্ড, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, সুইজারল্যাণ্ড, আর্জেনটিনা, ফিজি, সিঙ্গাপুর, মরিসাস, ভারত, শ্রীলংকা ও বার্মা প্রভৃতি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে শতাধিক স্থায়ী কেন্দ্রে মিশনের কর্মিগণ অবিরাম কাজ করিয়া যাইতেছেন। তাছাড়া, বহু দেশে পাঠচক্র ও আলোচনাসভার মাধ্যমে রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের ভাবধারাবিস্তারে এই মিশনের প্রয়াসও উল্লেখযোগ্য। এই ভাবধারার মূল কথা হইল সর্ব ধর্মের ঐক্যানুভূতি এবং মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ সেবা। মিশনের কর্মধারার ব্যাপকতার মূলে রহিয়াছে ইহার এই সার্বজনীনতা।

মিশনের সেবাকার্যের পশ্চাতে যে কর্মপ্রেরণা রহিয়াছে তাহার বৈশিষ্ট্য বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিবার বিষয়। মিশনের নীতি অনুসারে, সেবাব্রতী এবং সেবাগ্রহণকারীর মধ্যে যে সম্পর্ক তাহা দাতা ও গ্রহীতার সম্পর্ক নহে,—যে সম্পর্ক উচ্চ ও নীচের ব্যবধান রচনা করিয়া থাকে। মিশন-কর্মিগণ মনে করেন, বিবেকানন্দের কথায়, "জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর"। সেবাকার্যের এই মর্মবাণীর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া মিশন-কর্মিগণ নানা স্থানে বিবিধ সেবা-কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়া যাইতেছেন।

প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন যে, রামকৃষ্ণ যেমন শুরু করিয়াছেন হিন্দুমতের সাধনা দিয়া, সেইরূপ করিয়াছিলেন খৃষ্টানমতের সাধনা এবং সুফী সম্প্রদায়ের এক মুসলমান গুরুর সান্নিধ্যে আসায় সুফী মতের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছিল তাঁহার ভাবধারা। ফলে তাঁহার সত্যোপলব্ধি হইয়াছিল, "যত মত তত পথ"। রবীন্দ্রনাথ তাই রামকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছিলেন :

"বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা
ধেয়ানে তোমার মিলিত হয়েছে তারা"

আর নজরুল গাহিলেন :

মন্দিরে মসজিদে গীর্জায়, পূজিলে ব্রহ্মে সম শ্রদ্ধায়
তব নাম মাথা প্রেমনিকেতনে ভরিয়াছে তাই ত্রিসংসার***
পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ লহ প্রণাম নমস্কার।

রামকৃষ্ণের যে প্রতীতি তাঁহার বাণী বহন করে তাহা হইল "যত মত তত পথ" এবং "জীবশিববাদ"। ধর্মে ধর্মে দ্বন্দ্বের কোন কারণ নাই, সর্ব ধর্ম একই সত্যের সন্ধান দেয়। আর সর্ব জীবেই মহান স্রষ্টা বিদ্যমান, তাই দুঃস্থ ও দুর্গত জীবের সেবা সেই মহান স্রষ্টার সেবারই সমতুল্য। বিবেকানন্দ এই বাণী বিশ্বময় প্রচার করিয়াছিলেন এবং এই মূল নীতির উপর ভিত্তি

করিয়া ১৮৯৭ সালের মে মাসে বিবেকানন্দ এবং রামকৃষ্ণের অন্যান্য অনুবর্তিগণ রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

বিবেকানন্দ তাই রামকৃষ্ণ মিশন সম্পর্কে বলিতেন, "এখানকার ভাব কি জানিস? সম্প্রদায়বিহীনতা।" রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার প্রধানতম উদ্দেশ্যগুলি ছিল :

(১) সকল ধর্মকেই এক সনাতন ধর্মের বিকাশ মনে করিয়া বিভিন্ন ধর্মাবলম্বিগণের মধ্যে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করা।

(২) উন্নত চরিত্রের কর্মী তৈয়ার করা, যাহারা বিজ্ঞান ও অন্যান্য বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করিয়া জনসাধারণের জাগতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিবিধানকল্পে আত্মোৎসর্গ করিবে।

(৩) জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে আর্তের সেবায় আত্মনিয়োগ করা।

যে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের ভিতর দিয়া স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তাহার অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতি জনসাধারণের অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশা। এই দুঃখ-দুর্দশা-নিরসন বা প্রশমনের জন্য নানারূপ জনকল্যাণকর প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশের ভিতর ও বাহিরে বহু প্রশংসনীয় কাজ করিয়াছে। এই সব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রামকৃষ্ণ মিশনের কাজ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। স্বাধীনতা সংগ্রামকালে ভারতে আশ্রয়প্রার্থী বাংলাদেশের এক কোটি লাঞ্ছিত ও আর্ত নাগরিকগণের মধ্যে সেবাকার্যে বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে রামকৃষ্ণ মিশন এক অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করিয়াছে। দেশ স্বাধীন হইবার পরেও গত বৎসরাধিকাল যাবৎ বাংলাদেশের ভিতরে মিশনের বিভিন্ন রিলিফের কাজ অব্যাহত রহিয়াছে, যদিও আজ তাহা বিরতির পথে। এই সময়ের মধ্যে খাদ্যসামগ্রী, পোশাক পরিচ্ছদ, দৈনন্দিন জীবনের অন্যান্য উপাদান, ঘর-বাড়ী-নির্মাণের উপকরণাদি যথেষ্ট পরিমাণে বিতরণ করা হইয়াছে। এই বিপর্যয়কালে বাংলাদেশে রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষ হইতে যে পরিমাণ সাহায্য বিতরিত হইয়াছে তাহার পরিমাণ এককোটি টাকার ঊর্ধ্বে হইবে। তদুপরি একলক্ষেরও অধিকসংখ্যক রোগীকে ঔষধপত্রাদি দিয়া সাহায্য করা হইয়াছে। এই তথ্যাদি যাহা আমি মিশনের কর্মকর্তাগণের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছি তাহা চিরকাল কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ রাখিবার যোগ্য এবং আমি নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে, উহা আমার দেশবাসী চিরকাল স্মরণ রাখিবে।

আমার বিশ্বাস স্বাধীন বাংলাদেশে রামকৃষ্ণ মিশনের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রহিয়াছে। আমি যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাতে আমি মনে করি এই মিশনের মূল নীতি হইল—ধর্ম-সৌভ্রাত্র ও জনসেবা। ধর্ম-সৌভ্রাত্র হইল আমাদের সাংবিধানিক আদর্শ ধর্মনিরপেক্ষতার সমপর্যায়ভুক্ত। আর জনসেবার আদর্শ হইল সুখী ও সমৃদ্ধ সমাজ সংগঠনের আবশ্যিক শর্ত। তাই আমি কায়মনোবাক্যে মিশনের উপরোক্ত নীতির সুষ্ঠু রূপায়ণ কামনা করি এবং আশা করি ধর্মে ধর্মে সকল দ্বন্দ্বের অবসান হইয়া সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে ভ্রাতৃত্ববোধ দৃঢ়মূল হইবে এবং জনসেবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ জনগণ সুখী ও সমৃদ্ধ সমাজ সংগঠন সফল করিয়া তুলিবে।*

---

* গত ৩।৭।৭৩ তারিখ ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশন-এ 'রামকৃষ্ণ মিশন সংস্কৃতি ভবন'-এর ভিত্তিস্থাপন উপলক্ষ্যে আহূত সভায় প্রধান অতিথি বাংলাদেশের মাননীয় প্রধান বিচারপতি আবুসাদাত মোহাম্মদ সায়েম-এর ভাষণ।

পথে-প্রান্তরে শ্রীরামকৃষ্ণ

[পূর্বানুবৃত্তি]

স্বামী চেতনানন্দ

২১ সেপ্টেম্বর ১৮৮৪

শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র মুখুয্যের গাড়ী করিয়া দক্ষিণেশ্বর হইতে কলিকাতায় আসিতেছেন। গাড়ীর মধ্যে মহেন্দ্র মুখুয্যে, মাষ্টার ও আরও দু-একজন আছেন। একটু যাইতে যাইতে ঈশ্বরচিন্তা করিতে করিতে ঠাকুর ভাবসমাধিতে মগ্ন হইলেন।

অনেকক্ষণ পরে সমাধিভঙ্গ হইল। ঠাকুর বলিতেছেন, 'হাজরা আবার আমায় শেখায়!' কিয়ৎক্ষণ পরে বলিতেছেন, 'আমি জল খাব'। বাহ্যজগতে মন নামাইবার জন্য ঠাকুর ঐ কথা প্রায় সমাধির পর বলিতেন।

মহেন্দ্র মুখুয্যে (মাষ্টারের প্রতি)—তা হলে কিছু খাবার আনলে হয় না?

মাষ্টার—ইনি এখন খাবেন না।

মহেন্দ্র মুখুয্যের হাতীবাগানে ময়দার কল আছে সেই কলেতে ঠাকুরকে লইয়া যাইতেছেন। সেখানে একটু বিশ্রাম করিয়া স্টার থিয়েটারে চৈতন্যলীলা দেখিতে যাইবেন।

মহেন্দ্রের কলের তক্তাপোসের উপর সতরঞ্চি পাতা। তাহারই উপর ঠাকুর বসিয়া আছেন ও ঈশ্বরের কথা কহিতেছেন।

কলবাড়ীতে পান সাজা ছিল না। ঠাকুর বলিতেছেন—পানটা আনিয়ে লও। মুখ ধোয়ার পর ঠাকুরকে তামাক সাজিয়া দেওয়া হইল। ঠাকুর মাষ্টারকে বলিতেছেন—'সন্ধ্যা কি হয়েছে? তা হলে আর তামাকটি খাই না। সন্ধ্যা হলে সব কর্ম ছেড়ে হরি স্মরণ করবে।' এই বলিয়া ঠাকুর হাতের লোম দেখিতেছেন—গণা যায় কি না। লোম যদি গণা না যায়, তাহা হইলে সন্ধ্যা হইয়াছে।

ঠাকুরের গাড়ী বিডন স্ট্রীটে স্টার থিয়েটারের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত। রাত প্রায় সাড়ে আটটা। টিকিট কিনিবার বন্দোবস্ত হইতেছে। নাট্যালয়ের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত গিরিশ ঘোষ কয়েকজন কর্মচারী সঙ্গে ঠাকুরের গাড়ীর কাছে আসিয়াছেন, অভিবাদন করিয়া তাঁহাকে সাদরে লইয়া গেলেন। ঠাকুরকে দক্ষিণ-পশ্চিমের বক্সে বসান হইল। ঠাকুরের পার্শ্বে মাষ্টার বসিলেন। ঠাকুরকে হাওয়া করিতে গিরিশ বেহারা নিযুক্ত করিয়া গেলেন।

ঠাকুর নাট্যালয় দেখিয়া বালকের ন্যায় আনন্দিত হইয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি সহাস্যে) - বাঃ এখান বেশ! এসে বেশ হলো। অনেক লোক একসঙ্গে হলে উদ্দীপন হয়। তখন ঠিক দেখতে পাই, তিনিই সব হয়েছেন।

মাষ্টার—আজ্ঞা, হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ - এখানে কত নেবে?

মাষ্টার—আজ্ঞা, কিছু নেবে না। আপনি এসেছেন ওদের খুব আহ্লাদ।

শ্রীরামকৃষ্ণ—সব মার মাহাত্ম্য।

আমরা এবার বিদায় নেব। ঠাকুরের সঙ্গে আমরা পথ ছেড়ে থিয়েটার পর্যন্ত গেছি এবং ড্রপসিন উঠবার পূর্ব পর্যন্ত কথাবার্তাও শুনেছি। আমাদের সীমা ঐ পর্যন্ত। থিয়েটারে যাবার আগে কেউ কেউ আপত্তি করে ঠাকুরকে বলেছিল—'বেশ্যারা অভিনয় করে। চৈতন্যদেব, নিতাই এসব অভিনয় তারা করে।' ঠাকুর তাতে উত্তর দেন—'আমি তাদের মা আনন্দময়ী দেখবো।

তারা চৈতন্যদেব সেজেছে, তা হলেই বা। শোলার আতা দেখলে সত্যকার আতার উদ্দীপন হয়।'

থিয়েটার শেষ হল। ঠাকুর গাড়ীতে উঠছেন। একজন ভক্ত জিজ্ঞাসা করলেন—'কেমন দেখলেন?' ঠাকুর হাসতে হাসতে জবাব দিলেন—'আসল নকল এক দেখলাম।' আমরা ঠাকুরের গাড়ীর সঙ্গে আর দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত যাব না। রাত অধিক হল। আমরা পথে দাঁড়িয়ে শুনলাম: ঠাকুর গাড়ীর ভিতর বসে প্রেমভরে বিভোর হয়ে আপনা আপনি বলতে বলতে যাচ্ছেন—'হা কৃষ্ণ! হে কৃষ্ণ! জ্ঞান কৃষ্ণ! প্রাণ কৃষ্ণ! মন কৃষ্ণ! আত্মা কৃষ্ণ! দেহ কৃষ্ণ! প্রাণ হে গোবিন্দ, মম জীবন!'

২০শে অক্টোবর ১৮৮৪

আজ ঠাকুর ১২ নং মল্লিক স্ট্রীট বড়বাজারে শুভাগমন করিতেছেন। মারোয়াড়ী ভক্তেরা অন্নকূট করিয়াছেন—ঠাকুরের নিমন্ত্রণ। দুই দিন হইল শ্যামাপূজা হইয়া গিয়াছে। বড়বাজারে এখনও দেওয়ালির আমোদ চলিতেছে।

মাষ্টার ও ছোট গোপাল আন্দাজ বেলা ৩টার সময় মল্লিক স্ট্রীটে পৌছিয়া দেখেন, লোকে লোকারণ্য—গরুর গাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী জমা হইয়া রহিয়াছে। ১২ নম্বরের নিকটবর্তী হইয়া দেখিলেন, ঠাকুর গাড়ীতে বসিয়া, গাড়ী আসিতে পারিতেছে না। ভিতরে বাবুরাম, রাম চাটুয্যে। গোপাল ও মাষ্টারকে দেখিয়া ঠাকুর হাসিতেছেন।

ঠাকুর গাড়ী থেকে নামিলেন। সঙ্গে বাবুরাম, আগে আগে মাষ্টার পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতেছেন। মারোয়াড়ীদের বাড়ীতে পৌছিয়া দেখেন, নীচে কেবল কাপড়ের গাঁট উঠানে পড়িয়া আছে। মাঝে মাঝে গরুর গাড়ীতে মাল বোঝাই হইতেছে। ঠাকুর ভক্তদের সঙ্গে উপর তলায় উঠিলেন। মারোয়াড়ীরাও আসিয়া তাঁহাকে একটি তেতালার ঘরে বসাইল, সে ঘরে মা কালীর পট রহিয়াছে। ঠাকুর দেখিয়া নমস্কার করিলেন, ঠাকুর আসন গ্রহণ করিলেন ও সহাস্যে ভক্তদের সঙ্গে কথা কহিতেছেন।

বড়বাজারের যে উপরোক্ত ছবি মাষ্টার মহাশয় এঁকেছেন তা প্রায় ১০০ বছরের পুরানো। কিন্তু কোন দর্শক যদি এখনও বড়বাজারে যান সেই একই অপরিবর্তিত ছবি দেখতে পাবেন। সেই ঠেলাগাড়ী, গরুর গাড়ী, পথ জ্যাম। কেবল ঘোড়ার গাড়ীর সংখ্যা কম দেখবেন, তার বদলে দেখবেন মোটর ও লরী। আর একটা বিরাট পার্থক্য দেখবেন সেটা হচ্ছে জ্যামে পড়ে আরোহীদের বিরক্তিভরা মুখ ও কোঁচকান ভ্রূ। জ্যামে পড়েও শ্রীরামকৃষ্ণের মজার হাসি ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়েও কোন দর্শক দেখতে পাবেন না।

ঠাকুরের মারোয়াড়ী পট্টী থেকে রাস্তায় বেরুনো পর্যন্ত আমরা পথে অপেক্ষা করতে থাকি।

ঠাকুর বিদায় গ্রহণ করিলেন। সন্ধ্যা হইয়াছে। আবার রাস্তায় বড় ভিড়। ঠাকুর বলিলেন, 'আমরা না হয় গাড়ী থেকে নামি; গাড়ী পিছন দিয়ে ঘুরে যাক।' রাস্তা দিয়া একটু যাইতে যাইতে ঠাকুর দেখিলেন, পানওয়ালা গর্তের ন্যায় একটা ঘরের সামনে দোকান খুলিয়া বসিয়া আছে। সে ঘরে প্রবেশ করিতে হইলে মাথা নীচু করিয়া প্রবেশ করিতে হয়। ঠাকুর বলিলেন—'কি কষ্ট! এই টুকুর ভিতর বদ্ধ হয়ে থাকে! সংসারীদের কি স্বভাব! ঐতেই আবার আনন্দময়।'

গাড়ী ঘুরিয়া কাছে আসিল। ঠাকুর আবার গাড়ীতে উঠিলেন। একজন ভিখারিণী, ছেলে কোলে, গাড়ীর সম্মুখে আসিয়া ভিক্ষা চাহিল।

ঠাকুর দেখিয়া মাষ্টারকে বলিলেন, 'কি গো, পয়সা আছে ?' গোপাল পয়সা দিলেন।

বড়বাজার দিয়া গাড়ী চলিতেছে। দেওয়ালির ভারী ধুম। অন্ধকার রাত্রি কিন্তু আলোয় আলোময়। বড়বাজারের গলি হইতে গাড়ী চিৎপুর রোডে পড়িল। সে স্থানেও আলো-বৃষ্টি ও পিপীলিকার ন্যায় লোকে লোকাকীর্ণ। লোক হাঁ করিয়া দুপাশের সুসজ্জিত বিপণিশ্রেণী দর্শন করিতেছিল। কোথাও বা মিষ্টান্নের দোকান, পাত্রস্থিত নানাবিধ মিষ্টান্নে সুশোভিত। কোথাও বা আতর গোলাপের দোকান, নানাবিধ সুন্দর চিত্রে সুশোভিত। দোকানদারগণ মনোহর বেশ ধারণ করিয়া গোলাপপাশ হস্তে করিয়া দর্শকবৃন্দের গায়ে গোলাপজল বর্ষণ করিতেছিল। গাড়ী একটি আতরওয়ালার দোকানের সামনে আসিয়া পড়িল। ঠাকুর পঞ্চমবর্ষীয় বালকের ন্যায় ছবি ও রোশনাই দেখিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিতেছেন। চতুর্দিকে কোলাহল। ঠাকুর উচ্চৈঃস্বরে কহিতেছেন—'আরো এগিয়ে দেখ, আরো এগিয়ে।' ও বলিতে বলিতে হাসিতেছেন। বাবুরামকে উচ্চহাস্য করিয়া বলিতেছেন—'ওরে, এগিয়ে পড়না—কি করছিস ?'

এ ছবির তুলনা হয় না। শ্রীম-র লোহার শক্ত নিব সুদক্ষ শিল্পীর কোমল তুলিকে হার মানিয়ে দিয়েছে। কী মজা! কী মজা! আনন্দের হাটবাজারে এই সামান্য ঝলমলানি দেখে ভক্তদের বলছেন, যেন তারা এতেই তৃপ্ত না থাকে। সেই কাঠুরের গল্প স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলছেন—'ঈশ্বরের দিকে এগিয়ে পড়।' চিৎপুর দিয়ে গাড়ী চলেছে। গাড়ীর মধ্য থেকে আরও কিছু কথাবার্তা ভেসে আসছে—শোনা যাক।

মাষ্টার কাপড় কিনিয়াছেন—দুইখানি তেলধুতি ও দুইখানি ধোয়া। ঠাকুর কিন্তু কেবল তেলধুতি কিনিতে বলিয়াছিলেন। ঠাকুর বলিলেন—'তেল-ধুতি দুখানি সঙ্গে দাও, বরং ও কাপড়গুলি এখন নিয়ে যাও, তোমার কাছে রেখে দেবে। একখানা বরং দিও।'

মাষ্টার—আজ্ঞা, একখানা ফিরিয়ে নিয়ে যাব।

শ্রীরামকৃষ্ণ—না হয় এখন থাক, দুইখানাই নিয়ে যাও।

মাষ্টার—যে আজ্ঞা।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আবার যখন দরকার হবে, তখন এনে দেবে। দেখ না, কাল বেণী পাল রামলালের জন্য গাড়ীতে খাবার দিতে এসেছিল। আমি বললুম—আমার সঙ্গে কোন জিনিস দিও না। সঞ্চয় করবার যো নাই।

গাড়ী একটি দোকানের সামনে আসিয়া পড়িল। সেখানে কল্কে বিক্রী হইতেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ রাম চাটুয্যেকে বলিলেন—'রাম, এক পয়সার কল্কে কিনে লও না।

ঠাকুর একটি ভক্তের কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমি তাকে বললুম, কাল বড়-বাজারে যাব, তুই যাস। তা বলে কি জান! আবার ট্রামে ৪পয়সা ভাড়া লাগবে; কে যায়? (মাষ্টারের প্রতি)—হাঁগা, এ কি বল দেখি, এক আনা আবার খরচ লাগবে!

মারোয়াড়ী ভক্তদের অন্নকূটের কথা আবার পড়িল।

শ্রীরামকৃষ্ণ—খোট্টাদের কি ভক্তি দেখেছ? যথার্থই হিন্দুভাব। এই সনাতন ধর্ম। ঠাকুরকে (ময়ুরমুকুটধারী কৃষ্ণের বিগ্রহ) নিয়ে যাবার সময় কত আনন্দ দেখলে! আনন্দ এই ভেবে যে, ভগবানের সিংহাসন আমরা বয়ে নিয়ে চলেছি।

হিন্দুধর্মই সনাতন ধর্ম। ইদানীং যে সকল ধর্ম দেখছো এ সব তাঁরই ইচ্ছাতে হবে যাবে—থাকবে না। হিন্দুধর্ম বরাবর আছে আর বরাবর থাকবে।

আমরা চলার পথে ঠাকুরের অপূর্ব ত্যাগের কথা, হিন্দুধর্মের উপর তাঁর দৈববাণী প্রভৃতি শুনলাম। আর দুঃখ পেলাম সেই ভক্তটির জন্য যে চার পয়সার জন্য শ্রীভগবানের নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করল। তীর্থে বা দেবমন্দিরের উদ্দেশ্যে পয়সা ব্যয়টাকে আমরা অপব্যয় মনে করি; কিন্তু সিনেমা, থিয়েটার, বনভোজন বা কোন চিত্ত-বিনোদনের জন্য পয়সা ব্যয় আমাদের নিকট অতি আবশ্যক। অনেকে বলবেন—শরীর-মনকে একটু চাঙ্গা রাখবার জন্য recreation প্রয়োজন। উত্তম প্রস্তাব। আপনারা নিজেদের রুচিমত চলতে থাকুন—আমরা বিদায় নিচ্ছি।

১১ই মার্চ ১৮৮৫

তখন দক্ষিণেশ্বর ছিল একটা গ্রাম মাত্র। যাতায়াতেরও অসুবিধা ছিল। সেজন্য কলকাতার ভক্তগোষ্ঠীর সঙ্গে মিশবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের প্রয়োজন ছিল একটা বৈঠকখানার। 'বলরাম মন্দির' সেই প্রয়োজন মিটিয়েছিল। কথামৃতকার লিখেছেন: 'ধন্য বলরাম! তোমারই আলয় আজ ঠাকুরের প্রধান কর্মক্ষেত্র হইয়াছে। কত নূতন নূতন ভক্তকে আকর্ষণ করিয়া প্রেমডোরে বাঁধিলেন, ভক্তসঙ্গে কত নাচিলেন, গাইলেন। যেন শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীবাসমন্দিরে প্রেমের হাট বসাচ্ছেন।'

শ্রীরামকৃষ্ণের ঈশ্বরাবেশ লেগেই থাকত। রাজপথেও এর ব্যতিক্রম হত না।

গিরিশের নিমন্ত্রণ। রাত্রেই যেতে হবে। এখন রাত ৯টা। ঠাকুর খাবেন বলে রাত্রের খাবার বলরামও প্রস্তুত করেছেন। পাছে বলরাম মনে কষ্ট পান, ঠাকুর গিরিশের বাড়ী যাইবার সময় তাই বুঝি বলিতেছেন—'বলরাম, তুমিও খাবার পাঠিয়ে দিও।'

দোতলা হইতে নীচে নামিতে নামিতে ভগবদ্ভাবে বিভোর! যেন মাতাল! একজন ভক্ত বলিতেছেন—সঙ্গে কে যাবে? ঠাকুর বলিলেন—একজন হলেই হলো। নামিতে নামিতেই বিভোর। নারাণ হাত ধরিতে গেলেন, পাছে পড়িয়া যান। ঠাকুর বিরক্তি প্রকাশ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে নারাণকে সস্নেহে বলিতেছেন, 'হাত ধরলে লোকে মাতাল মনে করবে; আমি আপনি চলে যাবো।'

বোসপাড়ার তেমাথা পার হচ্ছেন। কিছু দূরেই শ্রীযুক্ত গিরিশের বাড়ী। এত শীঘ্র চলছেন কেন? ভক্তেরা পশ্চাৎ পড়ে থাকছে। না জানি হৃদয়মধ্যে কি অদ্ভুত দেবভাব হইয়াছে! কে এ ভাব বুঝিবে?

দ্বারদেশে গিরিশ। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে গৃহ মধ্যে লইয়া যাইতে আসিয়াছেন। ঠাকুর ভক্ত সঙ্গে যেই নিকটে এলেন, অমনি গিরিশ দণ্ডের ন্যায় সম্মুখে পড়িলেন। আজ্ঞা পাইয়া উঠিলেন। ঠাকুরের পদধূলি গ্রহণ করিলেন ও সঙ্গে করিয়া দোতলায় বৈঠকখানা ঘরে লইয়া বসাইলেন।

আসন গ্রহণ করিতে গিয়া ঠাকুর দেখিলেন, একখানা খবরের কাগজ রহিয়াছে। খবরের কাগজে বিষয়ীদের কথা, পরচর্চা, পরনিন্দা; তাই অপবিত্র তাঁহার চক্ষে। তিনি ইসারা করিলেন, ওখানা যাতে স্থানান্তরিত হয়। কাগজখানা সরানো হবার পর আসন গ্রহণ করিলেন।

শ্রীম-র জীবন্ত বর্ণনার পর মন্তব্য দাঁড়ায় না। আমরা পথের উপর দাঁড়িয়ে মন-ক্যামেরা দিয়ে ঠাকুরের অপরূপ ছবিগুলি দেখে যাচ্ছি। আর আমাদের কানে শব্দগ্রহণের যে যন্ত্র বসান আছে তাতে দুচারটে কথা ভেসে আসছে। বাগবাজারের কয়েকটা দুষ্টু ছেলে রাস্তায় দাঁড়িয়ে মজার সঙ্গে টিটকারি কেটে বলছে: 'হ্যারে, দ্যাখ দ্যাখ! পরমহংসের ফৌজ আসছে।'

বোসপাড়ার গলির মুখে ঠাকুর কথাটি শুনলেন। হাসতে হাসতে মাষ্টারকে বললেন, 'হ্যাঁগা, কি

বলে? পরমহংসের ফৌজ আসছে? শালারা বলে কি?' আমরা পরিষ্কার দেখছি টিটকারি শুনে দলপতি ও তাঁর ফৌজ একটুও ক্ষুণ্ণ না হয়ে হাসতে হাসতে এগিয়ে চলেছেন।

নির্বাক প্রাণীর জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের দরদের অন্ত ছিল না। তিনি কলকাতায় ঘোড়ার গাড়ীতে যেতেন ঠিকই কিন্তু ঐ ঘোড়ার জন্য ছিল তাঁর করুণা অনুকম্পা। হয়তো কলকাতায় চলেছেন এবং সঙ্গে তাঁর নির্দিষ্ট লোক রয়েছে। হঠাৎ যাত্রাপথে কলকাতাগত কোন বিশেষ ভক্তের সঙ্গে দেখা। আমরা হলে চক্ষুলজ্জার খাতিরে কষ্ট সত্ত্বেও তাকে তুলে নিতাম; কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ সেক্ষেত্রে বলতেন, 'না বাপু, জায়গা হবে না।' সেই ভক্তকে নৌকায় বা শেয়ারের গাড়ীতে ফিরে কলকাতায় দেখা করতে বলতেন। মূক প্রাণীর গাড়ী টানতে কষ্ট হবে—এ ছিল তাঁর কাছে অসহ্য।

একটি অপূর্ব কাহিনী স্বামী অখণ্ডানন্দ তাঁর স্মৃতিকথায় (২৪ পৃঃ) লিখেছেন: "ঠাকুর বরানগরের বেণীপালের ভাড়াটে দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ী ছাড়া কখনও কোথাও যেতেন না। তার ঘোড়া ভাল ছিল, দৃঢ় ও বলিষ্ঠ—এই তার কারণ। ঘোড়ার পিঠে চাবুক দিলেই ঠাকুর অস্থির হয়ে উঠতেন। বলতেন—'আমাকে মারছে'। তাই বেণীপাল যখন শুনতেন যে পরমহংসদেবকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তখন যা খুব ভাল ঘোড়া তাই দিতেন। যাকে মারতে হবে না, একটু পা নাড়লেই ছুটে চলবে।"

ভক্তদের মধ্যে কারো কৃপণতা বা নিষ্ঠুরতা দেখলে ঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে তাদের দোষ শোধরাতেন—'সে দিন জয়গোপাল এসেছিল। গাড়ী করে আসে। গাড়ীতে ভাঙ্গা লণ্ঠন—ভাগাড়ের ফেরৎ ঘোড়া—মেডিকেল কলেজের হাসপাতাল ফেরৎ দ্বারবান। আর এখানের জন্য নিয়ে এল দুই পচা ডালিম।'

সঙ্গে সঙ্গে হাসির রোল দশদিক মুখরিত করল সকলের শিক্ষা হয়ে গেল। শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষার একটি বৈশিষ্ট্য এই যে তা অজান্তে, অক্লেশে, বিনা চেষ্টায় ভিতরে ঢুকে যায়।

ঠাকুর গরীব ভক্তদের জন্য ভাবতেন। শ্রীম একদিনের (৬।৭।১৮৮৫) ঘটনা লিখেছেন:

'ঠাকুর দেবেন্দ্রের বাড়ী যাইতেছেন। দক্ষিণেশ্বরে দেবেন্দ্রকে একদিন বলিতেছিলেন, একদিন মনে করছি তোমার বাড়ীতে যাব। দেবেন্দ্রও বলিয়াছিলেন, আমিও তাই বলবার জন্য আজ এসেছি; এই রবিবারে যেতে হবে। ঠাকুর বলিলেন, কিন্তু তোমার আয় কম, বেশী লোক বোলো না। আর গাড়ীভাড়া বড় বেশী। দেবেন্দ্র হাসিয়া বলিয়াছিলেন, তা আয় কম হলেই বা, ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ (ধার করে ঘি খাবে)। ঠাকুর এই কথা শুনিয়া হাসিতে লাগিলেন। হাসি আর থামে না।'

কী অদ্ভুত ভালবাসা গরীব গৃহস্থ ভক্তের প্রতি! দেবেন্দ্রের বাড়ীতে নামামাত্র বলছেন, 'দেবেন্দ্র, আমার জন্য খাবার কিছু কোরো না, অমনি সামান্য। শরীর তত ভাল নয়।' অসুস্থ শরীরের কথা বলে ভক্তের অর্থ বাঁচাচ্ছেন।

২৮শে জুন ই ১৮৮৫

ঠাকুর বলরামের বৈঠকখানায় ভক্তদের মজলিশে বসে আছেন। নারাণ প্রভৃতি ভক্তেরা বলেছিলেন যে নন্দবসুর বাড়ীতে অনেক ঈশ্বরীয় ছবি আছে। আজ তাই ঠাকুর তাদের বাড়ীতে গিয়ে বিকালে ছবি দেখবেন। পথে আরও দুজন স্ত্রীভক্তের বাড়ীতে যাবেন ঠিক হল। এদের মধ্যে একজন কন্যাশোকে সন্তপ্তা বিধবা।

পাল্কী আসিয়াছে। ঠাকুর শ্রীযুক্ত নন্দবসুর বাড়ীতে যাইবেন।

ঈশ্বরের নাম করিতে করিতে ঠাকুর পাল্কীতে

উঠিতেছেন। পায়ে কালো বার্নিস করা চটী জুতা, পরণে লাল ফিতা পাড় ধুতি, উত্তরীয় নাই। জুতা জোড়াটি পাল্কীর এক পাশে মণি রাখিলেন। পাল্কীর সঙ্গে সঙ্গে মাষ্টার যাইতেছেন।

নন্দবসুর গেটের ভিতর পাল্কী প্রবেশ করিল। গৃহস্বামীর আত্মীয়গণ আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন। ঠাকুর মাষ্টারকে চটীজুতা জোড়াটি দিতে বলিলেন। পাল্কী হইতে অবতরণ করিয়া উপরে হলঘরে উপস্থিত হইলেন। অতি দীর্ঘ ও প্রশস্ত হলঘর। দেবদেবীর ছবি ঘরের চতুর্দিকে।

আমরা বাড়ীর মধ্যে ঢুকব না ঠিক করেছি, তাই গেটের কাছে দাঁড়িয়ে দেখছি, ঠাকুর ছবি দেখা শেষ করে মিষ্টিমুখ সেরে উঠবার উপক্রম করেছেন।

নন্দবসুর বাড়ী থেকে বেরিয়ে ঠাকুর চলেছেন বাগবাজারের শোকাতুরা ব্রাহ্মণীর বাড়ী। বাড়ীটি পুরাতন, ইষ্টকনির্মিত। প্রবেশ পথের বাঁ দিকে গোয়াল ঘর। ছাদের'পরে বসবার স্থান হয়েছে। ছাদে লোক কাতার দিয়ে কেহ দাঁড়িয়ে, কেহ বসে। সকলেই উৎসুক, ঠাকুরকে দেখবেন।

শ্রীম এখানে যে ছবি তুলেছেন—সে ছবি মার্থা-মেরী-পরিবৃত খ্রীষ্টের ছবি। সেই দুই বোন, ঈশ্বরের সান্নিধ্যে উপবিষ্টা বোনের প্রতি কর্মরতা বোনের আক্ষেপোক্তি, উপচে-পড়া ভক্তি, আনন্দের আতিশয্য, শ্রদ্ধার সঙ্গে ভোজ্যবস্তু নিবেদন। বাইবেলে আছে—মেরী কর্তৃক Pass-over-এর ছয় দিন পূর্বে নৈশভোজে আমন্ত্রিত যীশুর সুগন্ধি অঙ্গরাগ লেপন, আর এখানে ভাবোল্লাসে কাড়াকাড়ি করে পদধূলিগ্রহণ - এমন কি পিদ্দিম ধরা পর্যন্ত।

রাতে মণি আশ্চর্য হয়ে ঠাকুরকে মার্থা-মেরীর কাহিনী শুনিয়ে বললেন—'যীশুখৃষ্টের সময় ঠিক এই রকম হয়েছিল।'

এবার আমরা ঠাকুরের সঙ্গে কলকাতার দর্শনীয় স্থানগুলি দেখব। তাঁর বিজ্ঞান-দৃষ্টি ও দেব-দৃষ্টি যুগপৎ কাজ করত। আমাদের বহুমুখী মন বহু বৈচিত্র্যময় বস্তু না দেখে তৃপ্ত হয় না। আর ঠাকুরের একমুখী মন একাত্মানুভূতির মধ্যে ঢলে পড়ত। সুতরাং তাঁর অনেক কিছু দেখবার সুযোগ হত না। চিড়িয়াখানায় সব জীবজন্তু দেখতে গেছেন। কিন্তু পশুরাজ সিংহ দেখে সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন। ঈশ্বরীর বাহন দেখে ঈশ্বরের উদ্দীপন হলো—তখন আর অন্য জানোয়ার কে দেখে? 'সিংহ দেখেই ফিরে এলাম।' (ক. ৪।৭৭)

ঠাকুরের দেখা আর আমাদের দেখার কত তফাত তার কয়েকটা দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি:

আমি একবার মিউজিয়মে গিছলুম, তা দেখালে ইট পাথর হয়ে গেছে। জানোয়ার পাথর (fossil) হয়ে গিয়েছে। দেখলে, সঙ্গের গুণ কি! তেমনি সর্বদা সাধুসঙ্গ করলে তাই হয়ে যায়। (ক. ৫।১৫৫)

কেল্লায় যখন গাড়ী করে গিয়ে পৌছলাম, তখন বোধ হোলো যেন সাধারণ রাস্তা দিয়ে এলাম। তারপরে দেখি যে চারতলা নীচে এসেছি। ঢালবাড়া (sloping) রাস্তা। যাকে ভূতে পায়, সে জানতে পারে না যে আমায় ভূতে পেয়েছে। সে ভাবে আমি বেশ আছি। (ক ৪।২৬)

সংসারে হবে না কেন? তবে বড় কঠিন। আজ বাগবাজারের পুল হয়ে এলাম। কত বন্ধনেই বেঁধেছে। একটা বন্ধন ছিঁড়লে পুলের কিছু হবে না, আরও অনেক শিকল দিয়ে বাঁধা আছে—তারা টেনে রাখবে। তেমনি সংসারীদের অনেক বন্ধন। ভগবানের কৃপা ব্যতিরেকে সে বন্ধন যাবার উপায় নাই! (ক ৫।প. ১০০)

ঠাকুরের উৎসাহের অন্ত ছিল না। নূতন কিছু শুনলে তিনি দেখতে যাবেনই। তার

ভিতর কি শিক্ষণীয় আছে তা নিজে পরীক্ষা করে দেখবেন।

ফটো কী করে তোলা হয়—দেখবার জন্য গাড়ী করে চললেন রাধাবাজারে বেঙ্গল ফটোগ্রাফের স্টুডিওতে। ফটোগ্রাফার দেখালেন কী করে ছবি তোলা হয়। কাঁচের পিছনে কালি (Silver Nitrate) মাখান হয়, তারপর ছবি উঠে। দুনিয়ার মজাটা নিজে দেখে তিনি খুশী হতেন না। হাঁকডাক করে সকলকে শোনাতেন। কারণ তিনি ছিলেন জন্মাবধি লোকশিক্ষক; আর সেই লোকশিক্ষার জন্য তিনি প্রাণপাত করতে কসুর করতেন না। ছবি তোলা দেখে এসে কেশবকে বলছেন: 'আজ বেশ কলে ছবি তোলা দেখে এলুম। একটি দেখলুম যে শুধু কাঁচের উপর ছবি থাকে না। কাঁচের পিঠে একটা কালি মাখিয়ে দেয়, তবে ছবি থাকে। তেমনি ঈশ্বরীয় কথা শুধু শুনে যাচ্ছি, তাতে কিছু হয় না, আবার তৎক্ষণাৎ ভুলে যায়। যদি ভিতরে অনুরাগ-ভক্তিরূপ কালি মাখান থাকে তবে সে কথাগুলি ধারণা হয়।' (ক. ৫।প. ১০৪)

'বাঙ্গালকে হাইকোর্ট দেখান' বলে একটা প্রবাদ আছে। বৃটিশ ভারতের ঐশ্বর্যভরা বড় বড় থামওয়ালা জাঁদরেল লাটসাহেবের বাড়ী মামাকে দেখাতে হৃদু ব্যস্ত। আর মামা? 'মা দেখিয়ে দিলেন কতকগুলি মাটির ইট উঁচু করে সাজান। ভগবান ও তাঁর ঐশ্বর্য। ঐশ্বর্য দুদিনের জন্য, ভগবানই সত্য।' (ক. ৫।১৫৪) শোভনবুদ্ধি মামাকে বিমোহিত করতে পারল না।

'আর একদিন গড়ের মাঠে বেড়াতে গিছলুম। বেলুন উঠবে—অনেক লোকের ভিড়। হঠাৎ নজরে পড়ল, একটি সাহেবের ছেলে, গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ত্রিভঙ্গ হয়ে। যাই দেখা, অমনি শ্রীকৃষ্ণের উদ্দীপন। সমাধি হয়ে গেল।' (ক. ২।৬৪)

পথে চলতে চলতে ক্ষিদে পেলে তিনি বালকের মত এদিক ওদিক তাকাতেন। 'বড়-বাজারের রং-করা সন্দেশ দেখে খেতে ইচ্ছা হলো। এরা আনিয়ে দিলে। খুব খেলুম—তারপর অসুখ।' (ক. ৪ ১৬৯)

দিব্যভাবে পথে যেতে যেতে accident-ও হতো। ঠাকুরের দাঁত ভেঙ্গেছে, গাড়ীর চাকা খুলে কাৎ হয়ে গেছে, ঘোড়ার ছুটফটানিতে গাড়ী উল্টে যাবার উপক্রমও হয়েছে। তবুও শ্রীরামকৃষ্ণের চলার বিরাম নেই। মানুষের ব্যথা জুড়াবার দায় তো তাঁর। তাই মরি বাঁচি করে তাঁকে ছুটতে হবে।

রেলের ধারে পড়ে গিয়ে হাতভাঙ্গার কারণ বললেন ঠাকুর: 'জগন্নাথের সঙ্গে মধুরভাবে আলিঙ্গন করতে গিয়ে হাত ভেঙ্গে গেল।' (ক. ৪।২৩৭)

ঠাকুরের একখানি অভূতপূর্ব পথচিত্র আমরা উদ্বোধনের ৬৯তম বর্ষের ১০ম সংখ্যা থেকে তুলে ধরছি। ঘটনাটি স্বামী শান্তানন্দজী কর্তৃক সংগৃহীত।

'হরি মহারাজ একদিন শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা-প্রসঙ্গে আমাকে বলেছিলেন—"তাঁর ভাব কি সামান্য ছিল? কোন কোন সময় এমন কি বহির্জগৎও তাঁর ভাব অনুযায়ী বদলে যেত। একবার মথুর বাবু দক্ষিণেশ্বর থেকে ওঁর জুড়ি গাড়ি করে ঠাকুরকে ওঁদের জানবাজারের বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছেন। গাড়ী যখন চিৎপুর রোডে এসে পড়েছে, তখন হঠাৎ ওঁর এরূপ ভাব হল যে উনি যেন সীতা হয়েছেন আর রাবণ ওঁকে হরণ করে নিয়ে যাচ্ছে। উনি সমাধিস্থ হয়ে গেলেন। এমন সময় হঠাৎ গাড়ীর ঘোড়া রাশ ছিঁড়ে একেবারে ছিটকে গিয়ে পড়ল। মথুরবাবু ভাবলেন—এমন কেন হলো? ঠাকুরের সমাধি-

ভঙ্গের পরে ওঁকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি সমস্ত বিবরণ বললেন। ঐরূপ ভাবাবস্থায় তিনি দেখলেন যেন রাবণ তাঁকে হরণ করে নিয়ে যাওয়ার সময় জটায়ু রাবণের পথ আক্রমণ করেছে এবং সব ছিন্ন ভিন্ন করে দিচ্ছে। মথুরবাবু শুনে বললেন—"বাবা, এমন হলে তো তোমার সঙ্গে রাস্তা চলা মুস্কিল।"

মথুর যতদিন বেঁচেছিলেন ততদিন ঠাকুরের রক্ষণাবেক্ষণ আদর-আপ্যায়ন, সখ মেটানো—কোন কিছুর জন্য চিন্তা ছিল না। প্রায়ই সন্ধ্যার সময় মথুর তাঁর রাজকীয় ফিটনে করে ঠাকুরকে গড়ের মাঠে হাওয়া খাওয়াতে নিয়ে যেতেন। কিন্তু মথুরের দেহাবসানে ঠাকুরের যাতায়াতের গাড়ীভাড়া নিয়ে কখনও কখনও বিভ্রাট হত। যার বাড়ীতে যেতেন, সাধারণতঃ ভাড়াটা সেই দিত। ব্যতিক্রমও হত। ভাড়া নিয়ে বিভ্রাট ভদ্রসমাজে একটা লজ্জার বস্তু, আর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে ঐ লজ্জাটা রূপান্তরিত হত রঙ্গরসে।

নন্দনবাগানে ব্রাহ্মোৎসবে গেছেন। রাত হয়ে গেল। গৃহস্বামীরা আহূত সংসারী ভক্তদের নিয়ে খাতির করতে করতে এত ব্যস্ত হলেন যে, ঠাকুরের আর কোন সংবাদ লইলেন না।

শ্রীরামকৃষ্ণ (রাখাল প্রভৃতির প্রতি)—কিরে কেউ ডাকে না যে রে।

রাখাল (সক্রোধে)—মহাশয়, চলে আসুন। দক্ষিণেশ্বরে যাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—আরে রোস্—গাড়ীভাড়া তিন টাকা দু আনা কে দেবে? রোক করলেই হয় না। পয়সা নেই আবার ফাঁকা রোক! আর এত রাতে খাই কোথা?

গাড়ীভাড়া সম্বন্ধে পরে ভক্তদের কাছে হাসতে হাসতে বললেন: 'গাড়ীভাড়া চাইতে গেল। তা প্রথমে হাঁকিয়ে দিলে। তারপর অনেক কষ্টে তিন টাকা পাওয়া গেল, দু আনা আর দিলে না। বলে, ঐতেই হবে।' (ক. ৪।২০)

তারপর যদু মল্লিকের প্রসঙ্গে বললেন: 'একবার আমাদের পেনেটি নিয়ে যাবার কথা হয়েছিল। যদু আমাদের চলতি নৌকায় চড়তে বলেছিল।'

'ভারী হিসেবী—যেতে মাত্রই বলে কত ভাড়া। আমি বলি—তোমার আর শুনে কাজ নেই, তুমি আড়াই টাকা দিয়ো। তাইতে চুপ করে থাকে আর আড়াই টাকাই দেয়।' (ক. ৪।১৬৫)

সাধারণ মানুষ হয়ত মনে করবে যে, ঠাকুর এ ধরনের লোকের বাড়ীতে নির্লজ্জের মত কেনই যেতেন? তাঁর কি একটুও আত্মসম্মানবোধ ছিল না? আমরা এসব প্রশ্নের উত্তর বহুভাবে দিয়ে এসেছি। আর দুটি কথা বলে এ প্রসঙ্গ শেষ করছি। প্রথমতঃ শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন অষ্টপাশ (লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, শোক, নিন্দা, অভিমান, জাতি, বংশমর্যাদা) থেকে মুক্ত। অপমান অভিমান, লজ্জা-ঘৃণা প্রভৃতি মনোবৃত্তি আমাদের হৃদয়কে সহজেই দোলায়িত করে; তাই আমরা সদা আত্মসম্মান বাঁচাতে সচেষ্ট। আর দ্বিতীয়তঃ তিনি জীবনে কখনও স্বেচ্ছায় এক পা-ও পথে ফেলেননি। কোথাও যেতে যদি কোন বিভ্রাট দেখা দিত তবে তিনি তাঁর চির-আরাধিতা মায়ের সঙ্গে কথাবার্তা বলে আগে ঠিক করে নিতেন। তাঁর আত্মকথা: 'মা, এত হাঙ্গামা করিস কেন? মা, ওখানে কি যাব? আমায় নিয়ে যাস্ তো যাব।'

দীর্ঘকাল ধরে কোন পথচারীর সঙ্গে দীর্ঘপথ অতিক্রম করলে তাঁর স্বভাব মোটামুটি জানা যায়। এই প্রবন্ধে আমরাও শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে দীর্ঘপথ অতিক্রম করে এসেছি। ঘরে-বাহিরে,

খোলামাঠে, পথে-ঘাটে তাঁকে বিভিন্নভাবে দেখবারও আমাদের সুযোগ হয়েছে। কোথাও কোথাও তাঁর দিব্যভাব দেখে আমরা আমাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধি দিয়ে তাঁকে বড় বড় কত বিশেষণে বিশেষিতও করেছি। কিন্তু তাই কি সব? আমরা কি এই অদ্ভুত পথচারীর পরিচয় ঠিক ঠিক পেয়েছি?

বুদ্ধি যতসক্ষণ না বুদ্ধিহারা হয় ততক্ষণ আমরা এগুতে থাকি। দেখা যাক শেষ কোথায়? ক্রমাগত শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন অনুধ্যান করতে থাকি। আর এই অনুধ্যানের ফলে আমরা দেখব যে সমস্ত মত ও পথের সঙ্গমস্থল শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁর জীবন দ্বন্দ্বের উপর নহে, অভেদের উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি কেবল গৃহস্থও নন, কেবল সন্ন্যাসীও নন। 'দেহস্থোঽপি অদেহস্থঃ'—দেহ থেকেও দেহহীন। যেহেতু তিনি দেহহীন সেহেতু তিনি সর্বত্র। অপরিচ্ছিন্ন আকাশের মত। তিনি মঠে-মন্দিরে, অরণ্যে-গিরিগহ্বরে, ঘরে-বাহিরে, পথে-প্রান্তরে। তিনি ভূতে ভূতে বিরাজিত। শ্রীরামকৃষ্ণ শেষ তোরণ; নাম-রূপের শেষ সীমা। তারপর?

তারপর—সেই 'সেদিন আপনি এই অবতীর্ণ হওয়ার ব্যাপারটি বেশ বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন।'

শ্রীরামকৃষ্ণ—কি বল দেখি?

মণি—যেন দিগ্‌দিগন্তব্যাপী মাঠ পড়ে রয়েছে। ধূ ধূ করছে। সম্মুখে পাঁচীল রয়েছে বলে আমি দেখতে পাচ্ছি না। সেই পাঁচীলে কেবল একটি গোল ফাঁক। সেই ফাঁক দিয়ে অনন্ত মাঠের খানিকটা দেখা যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—বলো দেখি সেই ফাঁকটি কি?

মণি—সে ফাঁকটি **আপনি**। আপনার ভিতর দিয়ে সব দেখা যায়, সেই **দিগ্‌দিগন্ত-ব্যাপী মাঠ** দেখা যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ অতিশয় সন্তুষ্ট, মণির গা চাপড়াতে লাগলেন। আর বললেন, 'তুমি যে ঐটে বুঝে ফেলছ—বেশ হয়েছে।'

মণি—ঐটে বুঝা শক্ত কিনা; পূর্ণ ব্রহ্ম হয়ে ঐ টুকুর ভিতর কেমন করে থাকেন ঐটি বুঝা যায় না।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তারে কেউ চিনলি না রে। ও সে পাগলের বেশে (দীনহীন কাঙ্গালের বেশে) ফিরছে জীবের ঘরে ঘরে।

শ্রীরামকৃষ্ণের পথের পাঁচালী শেষ হল। কিন্তু যেহেতু তিনি ইতি-নেতির পার, তাই একটা কথা বলবার জন্য 'ইতি'র পরে 'পুনশ্চ'কে টানতে হল। কথাটি এই: যে সব পথিক শ্রীরামকৃষ্ণের যাত্রাপথ পরিক্রমা করে মায়ারূপ পাঁচীলভেদী পথ দিয়ে ব্রহ্মরূপ দিগন্তপ্রসারী প্রান্তরে এসে পড়বেন, পান্থজনের সখা শ্রীরামকৃষ্ণ খুশী হয়ে তাদের গা চাপড়ে বলবেন—'বেশ হয়েছে'।

'স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা'

স্বামী স্বপ্রকাশানন্দ

প্রস্তাবনা

'তোমার বিক্ষিপ্ত চিত্ত যখন পরমাত্মাতে অচলরূপে স্থিত হইবে, তখনই তুমি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবে'—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এই কথা শুনিয়া তাঁহার প্রিয় সখা ও শিষ্য অর্জুনের মনে জিজ্ঞাসার উদয় হইল ও তিনি প্রশ্ন করিলেন 'স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা···' (গীঃ ২।৫৪)—অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানীর লক্ষণ কি, তিনি কিভাবে অবস্থান করেন বা বিচরণ করিয়া থাকেন, লোকব্যবহারই বা তিনি কিরূপে সম্পাদন করিয়া থাকেন।

অর্জুন জানিতে চাহিলেন যে, জ্ঞানীকে চিনিবার কোন উপায় আছে কিনা, তাঁহার এমন কোন বিশিষ্ট আচরণ বা চিহ্ন আছে কিনা যাহা দেখিয়া অন্য সাধারণ লোক হইতে তাঁহাকে সহজেই পৃথক্ করা যাইতে পারে। উত্তরে শ্রীভগবান্ বলিলেন—বাহ্যলাভনিরপেক্ষ, সর্ববাসনা-ত্যাগী, আত্মারাম, দুঃখে উদ্বেগবিহীন, সুখে নিস্পৃহ, অনাসক্ত, ভয়ক্রোধাদি-রহিত, জিতেন্দ্রিয়, অহংকারমমতাশূন্য পুরুষই স্থিতপ্রজ্ঞরূপে কথিত হইয়া থাকেন।

সংসার দুঃখময়। দুঃখের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে সকলেই চায়। লৌকিক উপায়ে দুঃখ দূর করিবার চেষ্টায় ব্যর্থমনোরথ হইয়া লোকে তখন শাস্ত্রীয় উপায় অন্বেষণ করিয়া থাকে। শাস্ত্র বলেন—তত্ত্বজ্ঞানলাভে সর্ব দুঃখ যায়। 'জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্বপাশৈঃ' (শ্বেঃ ১।৮) 'জ্ঞাত্বা দেবং সর্বপাশাপহানিঃ' (শ্বেঃ ১।১১) ইত্যাদি। এই সকল বাক্যদ্বারা ইহাও প্রমাণিত হয় যে, দুঃখ বস্তুতঃ আত্মাতে কল্পিত। তাহা না হইলে উহা তত্ত্বের জ্ঞানদ্বারা নিবৃত্ত হইত না। কোন সত্য বস্তুরই জ্ঞানদ্বারা নিবৃত্তি বা বিনাশ হয় না। ভ্রান্তিবশতই লোকে নিজেতে নানা দুঃখ আরোপ করিয়া কষ্ট পাইয়া থাকে মাত্র। সাধনদ্বারা এবং গুরু ও ঈশ্বরকৃপায় তত্ত্বজ্ঞানোদয়ে সুখদুঃখ, সর্ব-কল্পনা স্বপ্নদৃষ্টপদার্থের ন্যায় নিঃশেষে বিলীন হইয়া যায়। তখন সাধক কৃতকৃত্য হইয়া সর্বদা স্বরূপানন্দে মগ্নাবস্থায় বিচরণ করিয়া থাকেন।

এখন তত্ত্বজ্ঞকে চিনিব কি করিয়া? দেহ থাকিতে নানা ঘাত-প্রতিঘাত, মান-অপমান, সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দ, রোগশোকাদি দ্বন্দ্ব অবশ্যম্ভাবী। এই সকল অবস্থাতে তাঁহার মানসিক প্রতিক্রিয়া কি প্রকার হয়? আমাদের মতই তিনিও কি সুখে উৎফুল্ল, দুঃখে বিষণ্ণ, রোগ-শোকাদিতে ব্যাকুল হইয়া, মানাপমানলাভে চিত্তস্থৈর্য হারাইয়া একান্ত অভিভূত হইয়া পড়েন?—এই প্রশ্ন কেবল একা অর্জুনের নহে, সকলের মনেই এই প্রশ্ন জাগে। দাবানলসদৃশ এই দারুণ সংসারের যাবতীয় দুঃখের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া পরমানন্দে বিরাজমান কোন কোন ভাগ্যবান্ পুরুষ এই লোকসমাজেই স্বচ্ছন্দ বিচরণ করেন,—তাঁহাকে দেখিতে, তাঁহার দিব্য সঙ্গলাভ করিতে, তাঁহার বিচিত্র অলৌকিক আচরণ প্রত্যক্ষ করিতে কাহার না ইচ্ছা হয়?—অতএব ইহা একটি সনাতন জিজ্ঞাসা।

কুষীতকের পুত্র কহোল ঋষির মনেও এই জিজ্ঞাসাই জাগিয়াছিল। রাজর্ষি জনকের বিচার-সভায় ব্রহ্মবিদ্বরিষ্ঠ মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যকে কহোল জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—'স ব্রাহ্মণঃ কেন স্যাৎ'—অর্থাৎ সেই ব্রহ্মবিৎ কিরূপ আচরণ করিয়া থাকেন (বৃঃ উঃ ৩।৫।১)? জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ যাজ্ঞবল্ক্য

উত্তর দিয়াছিলেন,—'যেন স্যাৎ তেনেদৃশ এব'—অর্থাৎ তিনি যেরূপ আচরণই করুন না কেন, তিনি ব্রহ্মবিদ্ই বটেন।

মহর্ষির উত্তরটি কিন্তু বড়ই বিচিত্র। উত্তরটি শুনিয়া শঙ্কা হইতে পারে যে তবে কি জ্ঞানী স্বেচ্ছাচারী হন? তাঁহার আচরণে কি কোনও অঙ্কুশ বা নিয়ন্ত্রণ নাই? তিনি কি সাধারণ পামর ব্যক্তির ন্যায় যথেচ্ছাচারও করিতে পারেন?—এই বিষয়েই আমরা কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য যথার্থই বলিয়াছেন। বস্তুতঃ জ্ঞানীর কোন নিয়মিত বাহ্য লক্ষণ নাই। কারণ জ্ঞান একান্তই স্বসংবেদ্য। পরসংবেদ্য কখনই নহে। ভোজনে তৃপ্তি হইল কিনা তাহা ভোজনকারী পুরুষই একমাত্র স্বীয় অন্তরে জানিয়া থাকেন। অপরে বাহ্য আচরণ দেখিয়া উহা কেবল অনুমান করিয়া থাকে মাত্র। তত্ত্বজ্ঞানীও তদ্রূপ জ্ঞানের অপূর্ব প্রভাব নিজে প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়া থাকেন। অপরে তাঁহার ভাষণ স্থিতি বা আচরণদৃষ্টে তাহা কথঞ্চিৎ অনুমান করিয়া থাকে মাত্র। অনুমান সর্বথা প্রমাণ হয় না। অনুমানে ভুলও হইতে পারে। তাই যোগবাশিষ্ঠ বলিয়াছেন,—

'অন্তর্বিকল্পশূন্যস্য বহিঃ স্বচ্ছন্দচারিণঃ।
ভ্রান্তস্যেব দশা স্তা স্তা স্তাদৃশা এব জানতে॥'

—অন্তরে বিকল্পনারহিত, কিন্তু সাধারণের ন্যায় বাহিরে স্বচ্ছন্দে সর্বব্যবহারে নিরত জ্ঞানীর অপূর্ব স্থিতি কেবল তাদৃশ অপর জ্ঞানীরাই জানিয়া থাকেন।—বাহ্য ব্যবহার উপাসকের উপাসনার বিরোধী হইলেও তাহা জ্ঞানীর জ্ঞানের বিরোধী নহে। 'তত্ত্ববিত্ত্ববিরোধিত্বাল্লৌকিকং সম্যগাচরেৎ' (পঃ ৭।৮৭),—লৌকিক কর্ম জ্ঞানের অবিরোধী বলিয়া জ্ঞানী তাহা সম্যক্ প্রকারেই আচরণ করিয়া থাকেন। তিনি সর্বসাধারণের ন্যায় আহার বিহার লোকব্যবহার সব কিছুই করেন কিন্তু তাহাতে তাঁহার জ্ঞান ব্যাহত হয় না। প্রসিদ্ধি আছে,—

'কৃষ্ণঃ ভোগী শুকস্ত্যাগী নৃপৌ জনকরাঘবৌ।
বশিষ্ঠঃ কর্মকর্তা চ ত এতে জ্ঞানিনঃ সমাঃ॥'—

শ্রীকৃষ্ণ অনুপম রাজৈশ্বর্য্য ভোগ করিয়াছেন, পরমহংসাগ্রণী শ্রীশুকদেব সর্ববিষয়ভোগত্যাগী, রাজর্ষি জনক ও রঘুকুলতিলক শ্রীরামচন্দ্র বিবিধ রাজকার্যে ব্যাপৃত, মহামুনি বশিষ্ঠ আবার মহাকর্মকাণ্ডপ্রিয়। বাহ্য আচরণে ইঁহারা বিভিন্ন হইলেও সকলেরই কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানের দিকে কোন ভেদ নাই। জ্ঞান সকলেরই এক। সকলেই তুল্য জ্ঞানী।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, জ্ঞানিগণের ব্যবহারে এত বৈষম্য হয় কেন? ইহার উত্তরে আচার্যগণ বলেন যে, প্রারব্ধভেদই ইহার কারণ। ফল প্রদান না করিয়া প্রারব্ধকর্ম ক্ষয় হয় না। পরমগুরু শ্রীব্যাসদেব বলিয়াছেন,—'তদধিগমে উত্তরপূর্বাঘয়োরশ্লেষ-বিনাশৌ ··' 'ভোগেন ত্বিতরে ক্ষপয়িত্বা সম্পদ্যতে'—(ব্রঃ সূঃ ৪।১।১৩,১৯)—জ্ঞানীর পূর্বসঞ্চিত পুণ্যপাপসমূহ সমস্তই জ্ঞানের প্রভাবে বিনষ্ট হইয়া যায়, জ্ঞানের পরে আমরণ কৃত শুভাশুভ (আগামী) কর্ম সহ তাঁহার কোন সম্বন্ধই থাকে না এবং ভোগের দ্বারা প্রারব্ধকর্ম ক্ষয়ানন্তর তিনি বিদেহ-কৈবল্য প্রাপ্ত হন।

প্রারব্ধকর্মই জ্ঞানীর ব্যবহারের নিয়ামক। সকলের প্রারব্ধ একই প্রকার নহে। অতএব সকলের ব্যবহার এবং সুখদুঃখাদিভোগও একপ্রকার নহে। এই জন্যই বেদান্তাচার্যগণ বলিয়া থাকেন,—

'আরব্ধকর্মনানাত্বাদ্ বুদ্ধানামন্যথান্যথা।
বর্তনং তেন শাস্ত্রার্থে ভ্রমিতব্যং ন পণ্ডিতৈঃ॥'

—(পঃ ৬।২৮৭)

—প্রারব্ধবৈচিত্র্যবশতঃই জ্ঞানিগণের ব্যবহারের

পার্থক্য দৃষ্ট হয়। কিন্তু জ্ঞানদ্বারাই কৈবল্যমুক্তি তাঁহারা সকলেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, এই বিষয়ে কোন মতদ্বৈধ নাই। পণ্ডিতগণ এই বিষয়ে ভ্রমে পতিত হইবেন না।—

'স্ব স্ব কর্মানুসারেণ বর্তন্তাং তে যথা তথা।
অবিশিষ্টঃ সর্ববোধঃ সমা মুক্তিরিতি স্থিতিঃ॥ '
(পঃ ৬।২৮৮)

—স্ব স্ব কর্মানুসারে তাঁহারা যেরূপ ব্যবহারই করুন না কেন, জ্ঞান তাঁহাদের সকলেরই তুল্য এবং মুক্তিও একই প্রকার।

তত্ত্বজ্ঞের আচরণ

লোকব্যবহার জীবন্মুক্তির বাধক নহে। অবশ্য স্বভাববশে তিনি শুভ আচরণই করিয়া থাকেন। মনের শুদ্ধি, প্রসন্নতা, অনাসক্তি আদি সাত্ত্বিক গুণ-সকল তাঁহার অন্তরে সূক্ষ্মাকারে সর্বদাই থাকে এবং উহা ব্যবহারকালে বাহিরে প্রকাশিত হয়। জ্ঞানী কর্মকাণ্ডী, অতি তপস্বী, অতি ত্যাগী, মৌনী, ঐশ্বর্যধারী, নিষ্কিঞ্চন—নানারূপে বিচরণ করিয়া থাকেন। কোন অবস্থাতেই তাঁহার বিশেষ আগ্রহ বা অভিনিবেশ থাকে না। অতএব তত্ত্বজ্ঞের ব্যবহাররূপ স্থিতি বড়ই বিচিত্র। উহার নিরূপণ করা একপ্রকার অসম্ভব ব্যাপার। আর উহার নিরূপণে কোন প্রয়োজনও সিদ্ধ হয় না। প্রারব্ধবশে রাগদ্বেষানুরূপ প্রতীয়মান ব্যবহার তাঁহারা করিলেও তাঁহাদের কতকগুলি স্বাভাবিক গুণ সর্ব ব্যবহারের মধ্যেই প্রকটিত হয় এবং ঐ গুণ-সকলের উজ্জ্বল মহিমায় তাঁহাদের জীবন অপূর্ব মাধুর্যমণ্ডিত হইয়া লোকসমাজে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীভগবান্ সেই দৈবী গুণসকলেরই উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহাদের অপূর্ব অনাসক্তি, অহংতামমতারাহিত্য, নিস্পৃহতা, অনুদ্বেগ, হর্ষবিষাদরাহিত্য ইত্যাদি প্রত্যক্ষ করিয়াই লোকে তাঁহাদের দিব্য জ্ঞানের অনুমান করিয়া থাকে।

ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ মায়ামোহের অতীত হইয়াও মায়িক জগতে নির্লিপ্তাবস্থায় অবস্থানপূর্বক লোকহিতকর কার্যেই নিযুক্ত থাকেন। লোককল্যাণ করাই তত্ত্বজ্ঞ পুরুষের স্বতঃসিদ্ধ স্বভাব। তিনি শুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব। সদ্গুণরাজি তত্ত্বজ্ঞ পুরুষকে চেষ্টা যত্ন করিয়া আনিতে হয় না; পূর্ব অভ্যাস-বশতঃ উহারা স্বতঃই স্ফুরিত হয় (নৈঃ সিঃ ৪।৬৯)। তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ নিজে উহা আচরণ করিয়া অপরকে শিক্ষা প্রদান করেন। তিনি নিজে যে পরমানন্দ লাভ করিয়া স্বকীয় জীবন সার্থক করিয়াছেন অপরকেও সেই আনন্দলাভের অধিকারী করিয়া তুলিতে সচেষ্ট থাকেন। তত্ত্বজ্ঞের আচরণ বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণের পরিচায়ক।

কেহ কেহ এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়া থাকেন যে, প্রারব্ধবশতঃ তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ অন্যথা আচরণ করিলেও তাঁহাকে কোন দোষ স্পর্শ করিতে পারে না, কারণ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ দোষগুণ, পুণ্য পাপের অতীত অবস্থায় অবস্থিত। তত্ত্বজ্ঞ পুরুষের অন্যথা আচরণ হইতে পারে, এইরূপ মতবাদ অত্যন্ত অসমীচীন, অনাদরণীয়, অশাস্ত্রীয় এবং অত্যন্ত অজ্ঞজনোচিত, কারণ তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ তত্ত্বজ্ঞানলাভের পূর্বে নিষিদ্ধকর্ম পরিত্যাগ এবং শাস্ত্রবিহিত শুভকর্মের অনুষ্ঠান তথা শম-দমাদি সাধনপূর্বক অত্যন্ত নির্মলান্তঃকরণ হওয়ার পর তত্ত্বানুশীলন করিয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন। এইরূপ তত্ত্বজ্ঞ পুরুষের দ্বারা কদাপি অশিষ্টাচরণ সম্ভব হইতে পারে না। পূর্বেই যিনি অশিষ্টাচরণ, অশুভ কর্মাদি বান্ত (উদ্গীর্ণ) পদার্থের ন্যায় পরিত্যাগ করিয়া সিদ্ধকাম হইয়াছেন, তদনন্তর তিনি কি করিয়া আবার ত্যক্ত বান্ত ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইবেন? যিনি বিষয়কে বিষবৎ অবগত হইয়াছেন তিনি কখনও বিষয়বিষগ্রহণে অগ্রসর হন না। অতএব ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের আচরণ সদৈব সৎ-শাস্ত্রানুমোদিত শুদ্ধ ও নির্মল অবশ্যই

হইবে।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, শাস্ত্রে তো জ্ঞানীর অন্যথা আচরণের বিষয়ও উক্ত হইয়াছে। যেমন শ্রুতি বলেন—

'ন মাতৃবধেন, ন পিতৃবধেন, ন স্তেয়েন ন ভ্রূণহত্যয়া নাস্য পাপং......' (কৌঃ উপঃ ৩।১) ইত্যাদি।—যিনি আনন্দস্বরূপ আত্মাকে অবগত হন, তিনি মাতৃহত্যা, পিতৃহত্যা, চৌর্যবৃত্তি অবলম্বন, ভ্রূণহত্যা প্রভৃতি করিলেও পাপে লিপ্ত হয় না।

স্মৃতিও বলেন—'হত্বাঽপি স ইমাঁল্লোকান্ন হন্তি ন নিবধ্যতে।' (গীঃ ১৮।১৭)—জ্ঞানী জগতের সমস্ত প্রাণী হত্যা করিলেও হত্যা করেন না এবং সেইজন্য তিনি কোন পাপেও আবদ্ধ হন না।

সিদ্ধ রামপ্রসাদ বলেন—'নাশি গো ব্রাহ্মণ, হত্যা করি ভ্রূণ, সুরাপানাদি বিনাশি নারী। এ সব পাতক না ডরি তিলেক ব্রহ্মপদ নিতে পারি॥'

এখন বাস্তবিকই কি শ্রীরামপ্রসাদ ভ্রূণহত্যা, স্ত্রীহত্যা, গোহত্যা, ব্রাহ্মণহত্যা করিতে অগ্রসর হইবেন? ইহা কখনও শ্রীরামপ্রসাদের দ্বারা সম্ভব হইতে পারে না। তবে তিনি ঐরূপ কথা কেন বলিলেন?—ঐরূপ কথা বলিবার তাৎপর্য এই যে, জ্ঞানের দিব্য প্রভাবে তিনি নিজে সর্বগুণের অতীত অবস্থায় সমারূঢ়, পাপপুণ্য ভালমন্দ শুভ অশুভ কোন কিছুই তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। ইহাই হইল শ্রীরামপ্রসাদের উক্ত বাক্যের তাৎপর্য। আর শ্রুতি-স্মৃতিতে অন্যথাচরণ-বিষয়ে যাহা উক্ত হইয়াছে তাহা দ্বারা জ্ঞানী আত্মজ্ঞ পুরুষের স্তুতি করা হইয়াছে মাত্র। ঐ সমস্ত বাক্য জ্ঞানের স্তুতিপর, উহাদের স্বার্থে কোন তাৎপর্য নাই। তত্ত্বজ্ঞানীর অন্তঃকরণে মলিন বাসনার অর্থাৎ ভোগবাসনার উদয় হইতেই পারে না। বার্তিককার আচার্য সুরেশ্বর বলেন, যাহার চিত্তে মলিনবাসনা বিদ্যমান তাহার পক্ষে তত্ত্ববিৎ হওয়া সুদূরপরাহত। বার্তিককার ইহাও বলিয়াছেন—'যে বৃক্ষের কোটরে প্রজ্বলিত অগ্নি বিদ্যমান, সে বৃক্ষের পত্র কখনও সবুজবর্ণ থাকিতে পারে না। তদ্রূপ অন্তরে জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত হইলে সেই ব্যক্তির বিষয়াসক্তি নির্মূল হইয়া যায়। বিষয়ে রাগ বা আসক্তি অজ্ঞানীর চিহ্ন।'—(নৈঃ সিঃ ৪।৬৭)। সহজ কথায় স্বীয় অনুপম ভঙ্গিতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবও এই কথাই বলিয়াছেন—'যে নাচতে জানে তার কখনও বেতালে পা পড়ে না'—অর্থাৎ যিনি জ্ঞানভক্তি লাভ করিয়াছেন তিনি কখনও বিষয়ভোগে লিপ্ত হইতে পারেন না। কারণ জ্ঞানলাভের পূর্বেই তিনি বিষয়-সমূহ বিষবৎ পরিত্যাগ করিয়াছেন।

অতএব পূর্বাভ্যাসবশতঃ জ্ঞানী সদা শুভ কর্মই করিয়া থাকেন এবং তাঁহার আচরণদৃষ্টে অপরেও তদ্রূপ শুভানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়। এইরূপে তাঁহার ভাষণ, উপদেশ, আচরণ, সর্ব চেষ্টাই অশেষ জগৎ-কল্যাণের হেতু হইয়া থাকে।

বস্তুতঃ জীবন্মুক্ত পুরুষের স্থিতি মানববুদ্ধির অগম্য। তিনি সাধারণ লোকের ন্যায় আহার বিহার ও সর্বব্যবহার করিয়াও অন্তরে দিব্য আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া থাকেন। তাঁহার মানসিক প্রশান্তি কিছুতেই ব্যাহত হয় না। এ বিষয়ে যোগবাশিষ্ঠ বলেন—

'অদ্বৈতে স্থৈর্যমায়াতে দ্বৈতে চ প্রশমং গতে।
যোগিনঃ কর্ম কুর্বন্তি পশ্যন্তঃ স্বপ্নবজ্জগৎ॥'

—অদ্বৈততত্ত্বে দৃঢ়স্থিতি লাভ করিয়া দ্বৈত সত্তা নিঃশেষে বিলুপ্ত হইলে জ্ঞানিগণ যাবতীয় পদার্থ স্বপ্নের ন্যায় দর্শনপূর্বক সর্ব কর্ম করিয়া থাকেন।

'ঈপ্সিতানীপ্সিতৌ ন স্তো যস্যান্তর্বস্তুদৃষ্টিষু।
সুপ্ত ইব প্রবর্তেত স মুক্ত ইতি কথ্যতে॥'

—কোনও বস্তুর প্রতিই যাঁহার অন্তরে ত্যাজ্য বা গ্রাহ্য ভাব নাই এবং যিনি সদা আত্মানন্দে নিমগ্ন

হইয়া যেন সুপ্ত পুরুষের স্তায় সর্ব ব্যবহারে প্রবৃত্ত হন, তিনিই জীবন্মুক্তরূপে অভিহিত হইয়া থাকেন।

'চিন্মাত্রত্বং প্রযাতস্য তীর্ণমৃত্যোঃ সচেতসঃ।
যো ভবেৎ পরমানন্দঃ কেনাসাবুপমীয়তে॥'

—ব্রহ্মভাবপ্রাপ্ত, জরামৃত্যুরহিত, স্বস্থচিত্ত জ্ঞানীর অন্তরে যে পরমানন্দ অনুভূত হইয়া থাকে, অপর কিছুর সহিত তাহা তুলনা হইতে পারে না।

তত্ত্বজ্ঞের মানসিক প্রশান্তি

তত্ত্বজ্ঞানীর এই দিব্য মহিমা ও অলৌকিক মানসিক প্রশান্তি অন্তরে সাক্ষাৎ অনুভব করিয়াই আচার্য স্বামী বিবেকানন্দ বাক্যমনের অতীত সেই অপূর্ব স্থিতির বিষয়ে যেন ইঙ্গিতে, আভাসে কোন অন্তরঙ্গের নিকট লিখিতেছেন,—

"তাঁর ইচ্ছাস্রোতে যখন আমি সম্পূর্ণরূপে গা ঢেলে দিয়ে থাকি সেই সময়টাই আমার জীবনের মধ্যে পরম মধুময় মুহূর্ত বলে মনে হয় আমি গা-ভাসান দিয়ে চলেছি। উপরে নির্মল কিরণ-বিস্তারকারী দিবাকর, নীচে শস্যসম্পদ-শালিনী পৃথিবী, দিনসের উত্তাপে সকল প্রাণী ও পদার্থ কত নিস্তব্ধ, কত স্থির শান্ত! আর আমিও সেই সঙ্গে ধীর স্থির ভাবে নিজের ইচ্ছা বিন্দুমাত্রও আর না রেখে, প্রভুর ইচ্ছারূপ প্রবাহিণীর সুশীতল বক্ষে ভেসে ভেসে চলেছি! এতটুকু হাত পা নেড়ে এ প্রবাহের গতি রোধ করিতে আমার প্রবৃত্তি ও সাহস হইতেছে না—পাছে প্রাণের এই অদ্ভুত নিস্তব্ধতা ও শান্তি ব্যাহত হইয়া পড়ে! প্রাণের এই শান্তি ও নিস্তব্ধতাই জগৎকে মায়া ব'লে স্পষ্ট বুঝাইয়া দেয়।

"ইতিপূর্বে আমার কাজকর্মের ভিতর নাম-যশের ভাব ছিল; ভালবাসার ভিতর ব্যক্তি-বিচার আসিত; পবিত্রতার সহিত ভয় জড়িত ছিল; কর্তৃত্বের ভিতর প্রভুত্বস্পৃহা বর্তমান ছিল—এ সব এখন উড়ে যাচ্ছে, আর আমি সকল বিষয়ে উদাসীন হইয়া তাঁর ইচ্ছায় ঠিক ঠিক গা-ভাসান দিয়ে চলেছি।

"আহা—কি স্থির প্রশান্তি! চিন্তাগুলো পর্যন্ত বোধ হচ্ছে যেন হৃদয়ের কোন এক দূর, অতিদূর অভ্যন্তর প্রদেশ থেকে মৃদু বাক্যালাপের মত ধীর অস্পষ্টভাবে আমার কাছে এসে পৌছুচ্ছে! আর শান্তি—মধুর মধুর শান্তি—যেন যা কিছু দেখছি, শুনছি, সকলকে ছেয়ে রয়েছে!

"মানুষ ঘুমিয়ে পড়বার আগে কয়েক মুহূর্তের জন্য যেমন বোধ করে—যখন সব জিনিস দেখা যায়, কিন্তু ছায়ার মত অবাস্তব মনে হয়—ভয় থাকে না, তাদের প্রতি এতটুকু অনুরাগ থাকে না, হৃদয়ে তাদের সম্বন্ধে এতটুকু ভালমন্দ ভাবও জাগে না আমার মনের অবস্থা এখন যেন ঠিক সেইরূপ—কেবল শান্তি শান্তি!—চারিপার্শ্বে কতকগুলি পুতুল আর ছবি সাজানো রয়েছে দেখে লোকের মনে যেমন শান্তিভঙ্গের কারণ উপস্থিত হয় না, এই অবস্থায় জগৎটাকে ঠিক ঐরূপ দেখাচ্ছে, আমার প্রাণের শান্তিরও বিরাম নাই। জগৎটা রয়েছে, কিন্তু সেটাকে সুন্দরও বোধ হচ্ছে না, কুৎসিতও বোধ হচ্ছে না। ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয়ানুভূতি হলেও এটা ত্যাজ্য, ওটা গ্রাহ্য—এরূপ ভাব কিছুমাত্র নাই।

"এ যে কি আনন্দের অবস্থা, কি বলব! যা কিছু দেখছি শুনছি সবই সমানভাবে ভাল ও সুন্দর বোধ হচ্ছে, কেননা নিজ শরীর থেকে আরম্ভ করে সকলের ভিতর বড় ছোট, ভাল মন্দ হেয় উপাদেয় বলে যে একটা সম্বন্ধ এতকাল ধরে অনুভব করেছি, সেই উচ্চ নীচ সম্বন্ধটাই এখন যেন কোথায় চলে যাচ্ছে! আর সর্বাধিক উপাদেয় বলে এই শরীরটার প্রতি ইতিপূর্বে যে বোধটা ছিল, সকলের আগে সেই বোধটাই যেন কোথায় লোপ পেয়েছে!"

ভারতের পূর্বাঞ্চল—আসাম

[পর্যটকের ডায়েরি (১৯৭২) হইতে]

ভারতের পূর্বাঞ্চল আসাম একটি বিরাট প্রদেশ। পাহাড়-পর্বত, নদনদী, বনজঙ্গল-পরিবেষ্টিত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি। গাছপালা, জীবজন্তু যেমন নানাবিধ, তেমনি এই প্রদেশের মানুষের ভাষা, পোশাকি পরিচ্ছদ, আচার ব্যবহারও ভিন্ন ভিন্ন।

পূর্বে এর নাম শোনা যেতো—প্রাগ্-জ্যোতিষপুর বলে। পরে কামরূপ-নামেও পরিচিত ছিল এবং দীর্ঘকাল এই নামেই চলে। সম্ভবতঃ পার্বত্য অসমতল দেশ বলে একে আসাম নামে খ্যাত করা হয়। আবার কাহারো মতে অহোম জাতি রাজত্ব করতেন বলে এর নাম হয়েছে আসাম।

আমাদের প্রাচীন রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণাদিতে আসামের অনেক কথা পাওয়া যায়। কিন্তু সেগুলিকে প্রামাণ্য ইতিহাস বলা চলে না, আবার উড়িয়েও দেওয়া যায় না। খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীতে আসামে বর্মন বংশের প্রতিষ্ঠা হয় এবং তৎপর শীলস্তম্ভবংশ ও পালবংশের রাজারাও রাজত্ব করেন। পরে চুটিয়া রাজ্য, কাছাড়ী রাজ্য, ভূঁঞাদের রাজ্য এবং কামতাপুর রাজ্য নামে চারটি রাজ্য আসামে ছিল বলে জানা যায়। কামতাপুর রাজ্যকে কেন্দ্র করেই তৎপর কোচ-রাজ্য গড়ে উঠে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ব্রহ্মদেশ থেকে শান্‌জাতীয় একদল লোক আসামে প্রবেশ করে রাজত্ব করতে থাকেন। এঁরাই পরে শান্ থেকে অহোমে পরিবর্তিত হ'ন। সেই সময়ে এই অহোমগণ অহোম বুরজী বলে ইতিহাস লিখে রাখেন। বুরজী শব্দের অর্থ ইতিহাস। এই ইতিহাস থেকে আসামের পরবর্তীকালের অনেক খবর পাওয়া যায়।

আসামে মঙ্গোলীয় জাতির প্রভাব বেশী। চীন, তিব্বত ও ব্রহ্মদেশ হতে এদের আগমন হয় আসামে। এদের মধ্যে বর্তমানে পাওয়া যায়—কাছাড়ী, কোচ, মেচ, মিকির, গারো, নাগা, কুকি, চুটিয়া, মণিপুরী, অহোম, খাসিয়া ও জয়ন্তীয়া জাতিদের। আসামের এই দুর্ভেদ্য পাহাড়-পর্বতে হয়তঃ পূর্বকালে এদের মধ্যে কেহ কেহ বাস করে আসছিল। কিন্তু তারা কারা তা এখন নির্ণয় করা খুব কঠিন।

আর্যদের আগমনের পূর্বে এদের মধ্যে বৃক্ষ, প্রস্তর, সর্প, ভূত ও প্রেতের পূজার প্রচলন ছিল। আর্যদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুধর্ম ও সভ্যতার প্রসারলাভ ঘটে। হিন্দুদের শক্তি-উপাসনা-পদ্ধতি অনেকে গ্রহণ করে দেবদেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন—যাহার নিদর্শন এখনও দেখতে পাওয়া যায়। তান্ত্রিক ধর্মের প্রাধান্য এরূপে প্রসার লাভ করে। ষোড়শ শতাব্দীতে আসামবাসী এক মহাপুরুষ শংকরদেব বা হংকরদেব বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করেন এবং কালক্রমে উহা আসামের প্রায় সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। ভারতে মুসলমান রাজত্বের সময় মুসলমানধর্মও প্রচারিত হয়, তারপর আসেন খৃষ্টান ধর্মযাজকগণ। ব্রিটিশ রাজত্বকালে পার্বত্য উপজাতিরা দলে দলে এই নব ধর্মে দীক্ষালাভ করে। তাহাদের উপাসনামন্দির চার্চ আসামের সর্বত্র দেখতে পাওয়া যায়।

বিভিন্ন জাতি-এবং উপজাতি-অধ্যুষিত আসাম প্রদেশকে এখন কয়েকটি পৃথক পৃথক প্রদেশে বিভক্ত করা হয়েছে—যথা—আসাম, মেঘালয়, অরুণাচল, নাগাপ্রদেশ, মিজোরাম।

মণিপুর একটি পৃথক রাজ্য পূর্বেই ছিল। তাকে এখন একটি প্রদেশরূপে গড়ে তোলা হচ্ছে।

গৌহাটি

আসামের রাজধানী, যা এতদিন শিলং শহরে ছিল, উহা মেঘালয় প্রদেশের মধ্যে পড়েছে বলে গৌহাটিতে স্থানান্তরিত হতে চলেছে। ইতিমধ্যে সরকারী অফিস অনেকগুলিই নূতন রাজধানীতে এসে গেছে। এই শহরটি ব্রহ্মপুত্র-নদের তীরে অবস্থিত। উঁচু নীচু পাহাড়ী জায়গা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর। উত্তরপূর্ব রেলের দ্বারা ভারতের সঙ্গে সংযোজিত। মোটর সহযোগেও ভারতের যে-কোন স্থান থেকে এই শহরটিতে আসা যায়। এতদ্ব্যতীত আকাশপথেও যোগ আছে। দেশবিভাগের পূর্বে জলপথেও এখানে আসা সুগম ছিল।

প্রাচীন সিদ্ধ শক্তিপীঠ মা কামাখ্যাদেবী একটি পর্বতশীর্ষে অবস্থান করে সারা ভারতের নরনারীর পূজা অর্চনা পেয়ে আসছেন বহুযুগ থেকে। এই কামাখ্যাপর্বতশীর্ষ থেকে ব্রহ্মপুত্র নদ ও গৌহাটি শহরের অপূর্ব সৌন্দর্য যাত্রীদের চিত্তাকর্ষণ ক'রে থাকে। অদূরে অপর একটি পর্বতগাত্রে ও শীর্ষে শোভা পাচ্ছে গৌহাটি বিশ্ব-বিদ্যালয়। ইহাই আসামের ইতিহাসে প্রথম এবং প্রধান শিক্ষাপীঠরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। ব্রহ্ম-পুত্র নদের মধ্যে বৃক্ষলতাশোভিত একটি ছোট্ট দ্বীপে উমানন্দ ভৈরবের স্থান—নৌকাযোগে সেখানে যাওয়া যায়। গৌহাটি থেকেই মোটরযোগে আসামের বিখ্যাত গ্রীষ্মাবাস শিলং শহরে লোকে গিয়ে থাকেন। গৌহাটিতে রামকৃষ্ণ মিশনের একটি শাখাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। একটি জুনিয়ার উচ্চ বিদ্যালয়, ছাত্রাবাস, ধর্মালোচনার জন্য উপাসনাগৃহ ও একটি লাইব্রেরীর মাধ্যমে জনসাধারণের সেবা চলে আসছে। এতদ্ব্যতীত কামাখ্যা পাহাড়ের গায়ে পাণ্ডুতে একটি বিবেকা-নন্দ পাঠচক্র চালাচ্ছেন ঐ স্থানের উৎসাহী নরনারীগণ।

তেজপুর

গৌহাটি থেকে মোটরে ৬।৭ ঘন্টার রাস্তা তেজপুর—ট্রেনেও যাওয়া যায়। শহরটি উঁচুনীচু পাহাড়ের উপর—ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে অবস্থিত। কয়েকটি সুদৃশ্য হ্রদও আছে! রাস্তাঘাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। প্রাকৃতিক পরিবেশ মনোরম, জলবায়ু স্বাস্থ্যকর।

বাণ নামক এক রাজার কাহিনী পুরাণে পাওয়া যায়। এই তেজপুরেই তিনি রাজত্ব করতেন। তেজপুরের অপর নাম ছিল—শোণিতপুর বা স্বর্ণপীঠ। বাণরাজা শিবভক্ত ছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত এক বিরাট শিব এখনও এই তেজপুর শহরে ভক্তদের পূজো পেয়ে আসছেন। শহর থেকে প্রায় দুই মাইল দূরে একটি পুরাতন দেবীমন্দির টিলার উপর দেখতে পাওয়া যায়। অষ্টধাতুনির্মিত একটি দুর্গামূর্তি সেইখানে পূজিতা হচ্ছেন। এর অনতিদূরে একটি টিলাকে বলে উষা পাহাড়। প্রবাদ আছে যে, বাণরাজার কন্যা উষাদেবীর প্রাসাদ ছিল এই ছোট্ট পর্বত-শীর্ষে। দ্বারকার রাজা শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধ গোপনে এসে এই সুন্দরী কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। বাণরাজা তা অবগত হয়ে অনিরুদ্ধকে বন্দী করে রাখেন। শ্রীকৃষ্ণ এই খবর পেয়ে সসৈন্যে শোণিতপুর আক্রমণ করেন। যুদ্ধে বাণরাজা পরাজিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হন। বর্তমানে এই উষা পাহাড়টির মস্তকোপরি উষাদবীর বাড়ীর ভগ্নাবশেষ প্রস্ত-রাদি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দেখতে পাওয়া যায়। এই ছোট্ট পর্বতশীর্ষে দাঁড়িয়ে ব্রহ্মপুত্র নদ এবং অপর তীরস্থ বিস্তীর্ণ এলাকা দৃষ্টিগোচর হয়। এই টিলাটিরই পাদদেশ ছুঁয়ে ব্রহ্মপুত্র নদটি তার রুদ্র জলধারাকে বুকে নিয়ে সুদূরে প্রবাহিতা। এর

অপূর্ব মনোরম দৃশ্য বিশেষকরে বর্ষাকালে উপভোগ্য।

তেজপুর শহরটি দারাং জেলার প্রধান শহর। এই স্থান থেকে রেলে এবং মোটরে আসামের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অধুনাতন অরুণাচল প্রদেশে যাওয়া যায়। এই শহরের প্রায় মধ্যস্থলে একটি হ্রদের তীরে শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতি নামে সুন্দর একটি জনহিতকর প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান। মানুষের আধ্যাত্মিক ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য কালীমন্দির, দুর্গামন্দির ও শ্রীরামকৃষ্ণমন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। ধর্মপুস্তকসমন্বিত একটি লাইব্রেরী ও সাধারণ-বিদ্যাশিক্ষোপযোগী গরীব ছাত্রছাত্রীদের নিমিত্ত অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত একটি বিদ্যালয় আর একটি দাতব্য চিকিৎসালয় সমিতি চালাচ্ছেন। এই শহরে উপযুক্ত স্কুল কলেজ ও হাসপাতালের ব্যবস্থাদি বর্তমান।

জোড়হাট

জোড়হাট ডিব্রুগড় জেলার একটি বিখ্যাত শহর। তেজপুর থেকে ছোট লঞ্চে ব্রহ্মপুত্র নদ পার হয়ে ওপারে পাকারাস্তা ধরে মোটরে গেলে ৭।৮ ঘণ্টা লাগে। আসামের অধিকাংশ জায়গায়ই মোটর রোডের দুধারে সুদৃশ্য চা-বাগান দেখতে পাওয়া যায়। সরকারী বা কোম্পানীর বাস্ রীতিমত রোজ চলাচল করে। এই শহরটির সঙ্গে উত্তরপূর্ব রেলেরও সংযোগ রয়েছে। এখানে সাধারণ স্কুল, কলেজ, এবং ইঞ্জিনিয়ারীং পড়বারও ব্যবস্থা আছে। ইহা একটি বড় ব্যবসা ও বাণিজ্যের জায়গা—তাই ভারতের বহু প্রদেশের লোকেরাই এখানে বাস করেন। চা-বাগান-গুলির প্রধান গবেষণাকেন্দ্র এই শহরে রহিয়াছে।

খৃষ্টীয়ান মিশনারীদের পরিচালিত একটি বড় হাসপাতাল এক প্রান্তে আছে। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবধারা এখানেও পৌছেছে। স্থানীয় উৎসাহী ভক্তগণ একটি শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা-সমিতি স্থাপন করে বর্তমানযুগোপযোগী উদার ধর্মপ্রচার ও জন-সেবার ব্যবস্থা করেছেন। লাইব্রেরী ও ছাত্রাবাস-স্থাপন আর বিভিন্ন উৎসবাদির মাধ্যমে ইঁহারা গণসংযোগ রক্ষা করে আসছেন; প্রতি রবিবার সমবেত হয়ে সকলে পাঠ, আলোচনা ও ভজনাদির ব্যবস্থা করেছেন।

ডিব্রুগড়

ডিব্রুগড় এখন একটি পৃথক জেলা হয়েছে। জোড়হাট থেকে বাসে, মোটরে ট্রেনেও যাওয়া যায়। ৫।৬ ঘণ্টা লাগে। রাস্তায় বহু চা-বাগান দেখা যায় আর শহরের মধ্যেও একটি চা-বাগান রয়েছে। গৌহাটি থেকে প্লেনেও আসা যায়।

শহরটি ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে অবস্থিত। বিস্তৃত এবং উচ্চ একটি বাঁধের সাহায্যে শহরটিকে ব্রহ্ম-পুত্রের কোপ থেকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাঁধের উপর থেকে নদের এবং ওপারের দৃশ্য উপভোগ্য। বর্ষায় মনে হয় যেন সমুদ্র!

এই শহরে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। ইহাই আসামের দ্বিতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। মেডিকেল কলেজও আছে। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকা-নন্দ এখানেও আসন গেড়ে বসেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতি এবং সারদা সঙ্ঘ নামে মহিলাদের পৃথক একটি প্রতিষ্ঠান আছে। সেবাসমিতি লাইব্রেরী, পাঠাগার, ছাত্রাবাস, প্রার্থনাগৃহ ও একটি দাতব্য চিকিৎসালয় চালিয়ে আসছেন। সারদা সঙ্ঘের পরিচালনাধীনে বালক-বালিকাদের জন্য নিবেদিতা স্কুল রয়েছে। দুটি প্রতিষ্ঠানেই সপ্তাহে অন্ততঃ একদিন করে পাঠ, আলোচনা ও সঙ্গীতাদির ব্যবস্থা আছে।

ডিগবয়

ইহা একটি পেট্রল কোম্পানীর টাউন। ডিব্রু-গড় থেকে মোটরে, বাসে বা রেলেও আসা যায়। ৪।৫ ঘণ্টা সময় লাগে আসতে। প্রায় ১০০ শত

বৎসর পূর্বে ব্রিটিশ কোম্পানী আসামের এই পার্বত্য অঞ্চলে তেলের সন্ধান পেয়ে উহা উত্তোলনের ব্যবস্থা করেন। এজন্য অনেক কল-কারখানা বসানো হয়েছে—জঙ্গলে পাহাড়ের মধ্যে অনেক কুয়ো বসিয়ে যন্ত্রের সাহায্যে তেল উত্তোলন এবং শোধন করা হয়। এই কাজে বহু কর্মীর প্রয়োজন হওয়ায় তাঁদের বাসোপযোগী এই শহরটি তৈরী করা হয়। ছোট ছোট পাহাড়ী টিলার উপর বাড়ীগুলি ছবির মত সুন্দর। রাস্তাঘাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। বর্তমানে এখানকার পাহাড়ের তেল প্রায় নিঃশেষিত হওয়ায় নূতন শহর ধূলিয়াযান থেকে তেল এনে এখানে শোধন-কার্য করা হচ্ছে। Indian oil বলে যে পেট্রল এখন ব্যবহার করা হয় উহা ঐ ধূলিয়াযান থেকেই আসে।

এই শহরেও একটি শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতি জনকল্যাণমূলক কাজ করে আসছেন অনেকদিন থেকে। সমিতি একটি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন করে আসামী, বাঙ্গালী, মাদ্রাজী ও পার্বত্য উপজাতীয় ছেলেদের বিদ্যালাভের সুযোগ করে দিয়েছেন। ভারত সরকারের সাহায্যে বহু মেধাবী ছেলে বিনাব্যয়ে এই বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। এই সমিতির কর্তৃপক্ষ দুটি ছাত্রাবাসও রেখেছেন দূরবর্তী ছেলেদের জন্য। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-প্রদর্শিত সর্বধর্মসমন্বয়ের ভাবপ্রচারের উদ্দেশ্যে উপাসনাগৃহ, ধর্মপুস্তকসমন্বিত লাইব্রেরী ও পাঠাগার আছে। ইহা ছাড়াও স্থানীয় উদ্যোগী মহিলাদের চেষ্টায় একটি সারদাসংঘ গঠিত হয়ে গরীব ছেলেমেয়েদের বিদ্যালাভের ব্যবস্থা হয়েছে। প্রাথমিক একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় মায়েরা চালাচ্ছেন এবং তৎসঙ্গে উহাদের পৃথক উপাসনা-মন্দিরও স্থাপিত হয়েছে।

মারগারিটা

ডিগবয় থেকে ১৫।১৬ মাইল দূরে পাহাড়ের পাদদেশে এই ছোট্ট শহরটি অবস্থিত। বাসে মোটরে ট্রেনে এখানে আসা যায়। এক ঘণ্টার পথ। ডিহিং নদীর উভয় তীরে শহরটি। একটি লোহার পুল উভয় তীরকে সংযোগ করে রেখেছে। এই পুলের উপর দিয়ে বাস, মোটর, রেল এবং মানুষও যাতায়াত করে থাকে। অসুবিধা হয় বলে একটু দূরেই অপর নূতন একটি পুল নির্মাণের কাজ চলছে। ডিহিং নদীর ওপারে শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যাপীঠ বলে একটি হাই স্কুল আছে। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবধারা নিয়ে সত্যনিষ্ঠ, চরিত্রবান মানুষ গড়ার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রেখে প্রতিষ্ঠানটি চালান হচ্ছে। নদীর পূর্বতীরে পাহাড়ের পাদদেশে শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতি নামে একটি আশ্রমও গড়ে উঠেছে। একটি পাকা প্রার্থনাগৃহ ও কর্মীদের বাসস্থান নির্মিত হয়েছে। প্রতি রবিবার পাঠ, আলোচনা ও ভজনাদি হয়। একটি লাইব্রেরী ও পাঠাগারও থাকবে। গরীব মেধাবী ছাত্রদেরও থাকার ব্যবস্থা হবে অদূর ভবিষ্যতে।

নামসাংমুখ বা নরোত্তমনগর

এই স্থানটি নেফা বা বর্তমান অরুণাচল প্রদেশের টিরাপ ডিভিসনে বুড়িডিহিং ও নামসাং নদীর মিলনক্ষেত্রে অরণ্য ও পর্বত-বেষ্টিত ; শ্রীরাম-কৃষ্ণ মিশনের দেওয়া নূতন নাম—নরোত্তমনগর। মারগারিটা থেকে বন্য হাতী ও অন্যান্য বন্য পশুর বিচরণক্ষেত্র দীর্ঘ জঙ্গলের মধ্য দিয়ে জিপে আসতে প্রায় ২০ মাইল রাস্তা অতিক্রম করতে হয়। অবশ্য অপর একটি রাস্তা আছে তিনসুকীয়া থেকে রেলে এবং মোটরে দেওমালী দিয়ে আসার। নরোত্তমনগর নামটির একটা ইতিহাস আছে। যদিও ইহা এখন—হলং, হলক, রুদ্রাক্ষ, নাগেশ্বর চাঁপার জঙ্গল আর বন্য হাতী,

হরিণ ও অজগর সাপের বিচরণস্থান। নরোত্তম নামে নক্‌টে উপজাতীয় এক রাজা এদিকে রাজত্ব করতেন। অসমীয়া ধর্মপ্রবর্তক শংকরদেবের নিকট তিনি বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করে সন্ন্যাসী হয়ে যান। তাঁরই নামানুসারে এই স্থানটির নামকরণ করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের কর্তৃপক্ষ এবং এই দুই নদীর মুখের উপর অরুণাচলে দ্বিতীয় শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হলো এই বৎসর। প্রাচীন গুরুকুল-পদ্ধতিতে শিক্ষকদের সহিত একসঙ্গে বাস করে আধুনিক বিজ্ঞান দর্শন সাহিত্য শিল্প বাণিজ্য প্রভৃতি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা এই স্কুলটিতে থাকবে। আপাততঃ স্থানীয় উপজাতীয় ১০০ শত বালককে নিয়ে এই উচ্চ-মাধ্যমিক বিদ্যামন্দিরটি শুরু হয়েছে। উপজাতীয়দের ভাষার বৈচিত্র্যের দরুন শিক্ষার মাধ্যম হয়েছে ইংরেজী। এ সঙ্গে রাষ্ট্রীয় ভাষা হিন্দিও শিক্ষা দেওয়া হবে। শিক্ষাদানকার্য হবে সম্পূর্ণ অবৈতনিক। অন্ন, বস্ত্র ও পুস্তকাদি সবই মিশন দিবেন। পানীয় জল এবং বৈদ্যুতিক আলোরও ব্যবস্থা হয়ে গেছে। কালে এই অরণ্য নগরে পরিণত হবে।

তিনসুকীয়া

তিনসুকীয়া আসামের একটি বড় রেলওয়ে জংসন। ডিব্রুগড় জেলায় ইহার অবস্থিতি। গৌহাটির সঙ্গে ইহার যোগাযোগ। এখান থেকে পাহাড়ের বিভিন্ন দিকে যাওয়ার দু'তিনটি শাখা-লাইন আছে। আসামের মধ্যে ইহা দ্বিতীয় ব্যবসা ও বাণিজ্যকেন্দ্র। জনৈক ধনাঢ্য ব্যবসায়ী এই শহরে একটি সুন্দর শিবমন্দির তৈরি করেছেন। মন্দিরগাত্রে রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, উপনিষদ্, ও পুরাণাদির উপদেশমূলক অনেক মন্ত্র লিখিত আছে। চিত্রেও অনেক উপাখ্যান ব্যাখ্যা করা রয়েছে।

এতদ্ব্যতীত স্থানীয় উৎসাহী ব্যক্তিগণ বিস্তীর্ণ এক ভূমিখণ্ডের উপর শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতি স্থাপন করে গরীব ছাত্রদের জন্ম ছাত্রাবাস, লাইব্রেরী ও পাঠাগার, একটি উপাসনামন্দির নির্মাণ করেছেন। প্রতি রবিবার ভক্ত নরনারীগণ সমবেতভাবে পাঠ আলোচনা ও ভজনাদি করে থাকেন। ইহা ছাড়াও স্থানীয় মহিলাগণ সারদা-সঙ্ঘ নামে একটি সংস্থা গঠন করে মহিলাদের মধ্যে সেবামূলক কাজের ব্যবস্থা করেছেন। এই স্থান থেকে বিখ্যাত পৌরাণিক তীর্থ পরশুরাম কুণ্ডে যাওয়া যায়।

ডিমাপুর

তিনসুকীয়া থেকে লামডিং পর্যন্ত রেলে আসতে নাগাল্যাণ্ডের উপরে এই ষ্টেশনটি বর্তমান। তিনসুকীয়া থেকে আসতে ৬।৭ ঘণ্টার পথ। ইহাকে মণিপুর রোডও বলে। এখান থেকে নাগাল্যাণ্ডের কোহিমা ও মণিপুরের রাজধানী ইম্ফলে বাসে যাওয়া যায় স্থানীয় শিক্ষিত উপজাতি এবং বাঙ্গালীদের চেষ্টায় এই স্থানেও সুন্দর একটি রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বর্তমানে সেবাশ্রম ছাত্রাবাস, দাতব্য চিকিৎসালয় লাইব্রেরী ও পাঠাগার চালাচ্ছেন।

লামডিং

ডিমাপুর রেলষ্টেশন থেকে লামডিং জংশনে আসতে দেড়-দু'ঘণ্টার রাস্তা। এইটি সম্পূর্ণ রেলের শহর। হাটবাজার সবই রেলের জায়গায়। রেলকর্মীদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্ম এখানে স্কুল ও কলেজ আছে।

লামডিং-এর মত ছোট্ট পাহাড়ী শহরেও ভক্তগণ একটি টিলার উপর শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতি স্থাপন করে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত একটি স্কুল, লাইব্রেরী ও উপাসনাগৃহ চালিয়ে আসছেন। প্রত্যহ পাঠ, ধর্মালোচনা ও ভজনাদির ব্যবস্থাও আছে। পৃথক একটি সারদা মহিলা সঙ্ঘও মহিলাদের মধ্যে সেবা ও শিক্ষামূলক কাজ করছেন।

লামডিং জংশনটি আসামের মধ্যে একটি বিশেষ স্থান। এখান থেকে যেমন রেল তিনসুকীয়া ও উচ্চ আসামের নানাস্থান গিয়েছে তেমনি এখান থেকেই বনজঙ্গল, নদনদী ও পাহাড়-পর্বত ভেদ করে রেল বদরপুর জংশনে পৌঁছেছে। এই রাস্তায় প্রায় ৩৭টি tunnel আছে। ইংরেজ ইঞ্জিনিয়াররা পাহাড় কেটে এই সুরঙ্গপথ প্রস্তুত করে গেছেন।

মাইবং

এই পথে যেতে কাছাড়ী রাজাদের পুরাণো রাজধানী মাইবং শহরটি দেখা যায়। ট্রেণও এইস্থানে থামে। এইটি একটি সাবডিভিশনের মত উত্তর কাছাড় জেলায়। এখনও এখানে প্রাচীন রাজবাড়ীর ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়। এদিকে সমতলভূমিতে কিছুটা ধানের চাষও হয়। রাস্তায় চারদিকে খালি জঙ্গল আর জঙ্গল। বাঁশবন প্রচুর।

হাফলং

উত্তর কাছাড়ের জেলা শহর হলো এই হাফলং। রেললাইন গিয়েছে Lower Halflong দিয়ে। ষ্টেশন থেকে প্রায় ৩।৪ মাইল দূরে উঁচু পাহাড়ের উপর শহরটি অবস্থিত। সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে প্রায় তিন হাজার ফুট উচ্চে। দেখতে শহরটি অনেকটা শিলংএর মত—তবে ছোট্ট শহর। লোকসংখ্যা মাত্র ৬।৭ হাজার। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন খুব। বড় একটি সুন্দর প্রাকৃতিক হ্রদ—শহরটিকে আরো আকর্ষণীয় করে তুলেছে। পর্বতশীর্ষে ও গায়ে গায়ে বাড়ীগুলি দেখতে খুবই সুন্দর।

কাছাড়ীদের একটি নির্বাচিত জেলাপরিষদ আছে। তাহারাই শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ব্যবসা, বাণিজ্য, রাস্তা-ঘাট সর্ব প্রকারের উন্নতিমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ ও উহা কার্যে পরিণত করেন। সরকারী ম্যাজিষ্ট্রেট, এসডিও, পুলিস—তাঁহারা আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করে থাকেন। উপযুক্ত স্কুল ও কলেজ স্থাপিত হয়েছে। আসামী ভাষায় শিক্ষাদান হয়ে থাকে। বাংলা ভাষাও শিক্ষা দেওয়া হয়। আসামী ভাষা কিন্তু বাংলা অক্ষরেই লেখা হয় আসামের সর্বত্র।

কাছাড়ীরা সকলেই হিন্দু এবং বেশীর ভাগই শক্তি-উপাসক। খৃষ্টান পাদ্রি সাহেবরা ইহাদিগকে ধর্মান্তরিত করতে পারেননি। এ জেলায় নাগা, খাসিয়া এবং শহর অঞ্চলে কিছু নেপালীও বাস করেন। শহরের কেন্দ্রস্থলে পুরাতন একটি মন্দিরে জগন্নাথদেব রয়েছেন। এখানে নিত্য ভোগরাগের ব্যবস্থা আছে আর এই স্থানেই ধর্মসভা, পাঠ ও কীর্তনাদি হয়ে থাকে। একটি কালীবাড়ীও স্থাপিত হয়েছে। এতদ্ব্যতীত এই সুন্দর পার্বত্য শহরে হ্রদের নিকট একটি টিলার উপর শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতি স্থাপিত হয়ে উপজাতীয় যুবকদের অল্পব্যয়ে বিদ্যাশিক্ষা-লাভের সুযোগ হয়েছে। সমিতির কর্তৃপক্ষরা একটি ছাত্রাবাস, ইংরেজী টাইপ স্কুল, লাইব্রেরী, পাঠাগার এবং মেয়েদের জন্য সেলাই-এর স্কুল চালাচ্ছেন। স্থানীয় এবং দূরবর্তী গ্রামের বহু ছেলে এখানে থেকে শিক্ষালাভ করে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে সক্ষম হয়েছে। বিশেষ করে সরকারী সাহায্যেই আদিবাসীদের উন্নতির জন্য এই প্রতিষ্ঠানটি কাজ করে আসছে। ইহা ছাড়াও মাইবং শহরে অনুরূপ একটি ছাত্রাবাস ইহারা স্থাপন করেছেন। প্রতি রবিবার জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে সমবেত প্রার্থনা, পাঠ, আলোচনা ও কীর্তনের ব্যবস্থাও আছে।

বদরপুর

হাফলং থেকে বদরপুর জংশন পর্যন্ত রেল লাইনটি বন-জঙ্গল, পাহাড়-পর্বত এবং নদনদী অতিক্রম করে একে বেঁকে এসেছে। বিচিত্র তার শোভা। কয়েকটি অন্ধকার ট্যানেলও পার হয়ে

আসতে হয়। বদরপুর থেকে রেলের একটি শাখা-লাইন শিলচর এবং অপরটি করিমগঞ্জে গিয়েছে।

শিলচর

বদরপুর থেকে শিলচর শহর এক-দেড় ঘণ্টার পথ। শহরটি প্রায় সমভূমিতেই প্রতিষ্ঠিত। কয়েকটি টিলা অবশ্য একদিকে আছে। কাছাড় জিলার ইহাই প্রধান শহর। অদূর ভবিষ্যতে এই শিলচরই একটি পৃথক জিলা হবে। পূর্বে জলপথে বারাক নদী দিয়ে কলকাতা থেকে জিনিষপত্রের আমদানী-রপ্তানী ছিল। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়াতে আবার তাহার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এখানকার অধিবাসীরা প্রায় সকলেই বাংলাভাষাভাষী। স্কুল, কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারীং ও মেডিকেল কলেজও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। স্থানটি গৌহাটি এবং শিলং থেকে বহু দূরে থাকায় রাজধানীর সঙ্গে যোগাযোগ এবং যাতায়াতের খুব অসুবিধা। শিলচর থেকে আকাশপথে আগরতলা, কলকাতা, গৌহাটি ও মণিপুরের রাজধানী ইম্ফলে যাতায়াত করা যায়।

ভারতের পূর্বাঞ্চলে এই শিলচর শহরেও ১৯২৫ সালে স্থানীয় স্বদেশপ্রেমিক ও উৎসাহী যুবকবৃন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জনসেবামূলক ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে একটি শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম স্থাপন ক'রে, রুগ্নদের সেবা, গরীব ও শ্রমজীবিগণের শিক্ষাদানের জন্য নৈশ বিদ্যালয় প্রভৃতি সেবাকার্য আরম্ভ করেন। পরে ১৯৩৯ সালে ইহা বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের শাখাশ্রেণীভুক্ত হয়। বর্তমানে বিভিন্ন উপজাতীয় প্রায় ৫০টি ছাত্র বিনাব্যয়ে আশ্রমে বাস করে ম্যাট্রিকুলেশন পর্যন্ত পড়বার সুযোগ পাচ্ছে। একটি ভাল লাইব্রেরী, পাঠাগার ও সুদৃশ্য উপাসনামন্দিরও আছে। প্রতি রবিবার গীতা, উপনিষদ্, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পুস্তকাবলীর পাঠ, আলোচনা এবং ভজনাদি নিয়মিত হয়ে থাকে। আসামের উপজাতীয়দের মধ্যে এই আশ্রমটি বিশেষভাবে শিক্ষাদানের কাজ করে আসছে।

হাইলাকান্দি

শিলচর থেকে ১৫।২০ মাইল দূরে এই হাইলাকান্দি সাবডিভিশনটি অবস্থিত। ইহা একটি ছোট্ট অথচ সুন্দর শহর। শিলচর থেকে বাসে বা ট্রেনে আসা যায়। ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য স্কুল কলেজ দুই-ই আছে। এখানকার অধিবাসীরা অধিকাংশ বাঙ্গালী। ছোট্ট জায়গা হলে কি হবে, এখানেও স্থানীয় ভক্তদের চেষ্টায় একটি রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম স্থাপিত হয়েছে। ছাত্রাবাস, লাইব্রেরী, পাঠাগার ও উপাসনামন্দির কর্তৃপক্ষ চালিয়ে যাচ্ছেন। প্রতি রবিবার পাঠ, আলোচনা ও ভজনাদি হয়ে থাকে। এতদ্ব্যতীত আশ্রম থেকে ছোট ছেলেমেয়েদের নৈতিক শিক্ষার জন্য একটি শিশুসঙ্ঘ মহিলা-কর্মীরা চালাচ্ছেন।

করিমগঞ্জ

বদরপুর জংশন থেকে এই স্থানটি নিকটেই। ইহাও কাছাড়ের একটি সাবডিভিশন। রেলে বাসে যাতায়াত করা যায়। এখান থেকে রেলের একটি শাখা ত্রিপুরার সাবডিভিশন ধর্মনগর পর্যন্ত গিয়েছে। এই শহরটি বাংলাদেশের সীমান্তে। একটি নদী দু'দেশকে পৃথক করে রেখেছে। নদীর পূর্ব তীরেই করিমগঞ্জ শহরটি। ভারত-পাকিস্তান হওয়ার পর থেকে এই শহরটির আয়তন এবং লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। আসামের মধ্যে ইহাও একটি বাংলাভাষাভাষী বড় শহর। বাংলাদেশের সিলেটে যেতে গেলে করিমগঞ্জ-সীমান্ত দিয়েই যেতে হয়।

বাংলা ও আসামের এই সীমান্ত শহরটিতেও শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-প্রদর্শিত সর্বধর্মসমন্বয় ও

শিবজ্ঞানে জীবসেবার আদর্শে একটি রামকৃষ্ণ সেবাসমিতি গড়ে ওঠে। কালক্রমে উহা বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের শাখাভুক্ত হয়। বর্তমানে গরীব মেধাবী ছেলেদের জন্য একটি ছাত্রাবাস, লাইব্রেরী ও পাঠাগার এবং ছোট ছেলেমেয়েদের চরিত্র গঠনের জন্য একটি শিশু সংঘও পরিচালিত হচ্ছে। ইহা ছাড়াও সাধারণ মানুষের মধ্যে সৎজীবন, সচ্চরিত্র আর সত্যধর্মবোধ জাগিয়ে দেবার নিমিত্ত প্রত্যহ উপাসনা, পাঠ, আলোচনা ও সঙ্গীতের নিয়মিত ব্যবস্থা আছে।

ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার জন্য উপযুক্ত স্কুল কলেজ এবং চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল রয়েছে।

নামমাহাত্ম্য

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

স্বাতি-নক্ষত্রের জল পড়েছে তো মুখে!
আর কেন ভেসে থাকা সমুদ্রের বুকে?
অতলে ডুবিয়া যাও সাধনা-সিন্ধুর!
'বিশ্বাসে মিলয়ে বস্তু, তর্কে বহুদূর!'
শাস্ত্র বহুবিধ, শাস্ত্রে নানা কথা কয়!
শাস্ত্র পড়ে কার কবে ঘুচেছে সংশয়?
ঘুরুক নামের চাকা সর্বকার্যমাঝে!
সাধন-মার্গের সেরা স্মৃতি-সাধনা যে!
নাম সে সাধনপথে পরম পাথেয়।
বৌদ্ধিক আভায় যিনি নিতান্ত দুর্জ্ঞেয়—
দেখা দেন ভাগ্যবানে কৃপা হ'লে তাঁর!
নাম-কুঞ্জিকায় তাঁর করুণার দ্বার
খুলে যায় আচম্বিতে! ঘুচে সর্বজ্বালা
নামে। কেন গোনা এই পাতা-ডাল-পালা?

স্বামী অখণ্ডানন্দের স্মৃতিসঞ্চয়

[পূর্বানুবৃত্তি]

['ভক্তে'র ডায়েরি হইতে]

২৩. ১. ৩৭—সন্ধ্যাবেলা। একটি ছড়া[১] লক্ষ্য করিয়া কলিকাতার সেই যুবক ভক্তটিকে[২] স্বামী অখণ্ডানন্দ বলিতেছেন, "হারাধনের ৭টি ছেলে—না ১০টি ছেলে? তোমার আর ছেলে-পিলের আকাঙ্ক্ষা থাকা উচিত নয়, কি বল? এত সব ছেলে গেল; কোথা থেকে এল, কোথা গেল? সব মায়া। এ (একটি ভক্তকে দেখাইয়া) আবার বলছে—আবার সব এল, তারপর আবার গেল—সেও মায়া।

"মায়া দুইপ্রকার—বিদ্যামায়া ও অবিদ্যামায়া—সত্ত্বপ্রধানা আর তমঃপ্রধানা। সর্বপ্রথম অখণ্ড ব্রহ্মচৈতন্য, তারপর মায়োপাধিক ঈশ্বরচৈতন্য—সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান্ স্বতন্ত্র, তারপর অবিদ্যোপাধিক জীবচৈতন্য—অল্পজ্ঞ অল্পশক্তিমান্ পরতন্ত্র। যেমন, মহাকাশ ও ঘটাকাশ। ঘটাকাশ কি-রকম? যেমন, এই যে বাড়িটার মধ্যে খানিকটা আকাশ, ঘটিতে বাটিতে আকাশ খণ্ড খণ্ড মনে হচ্ছে। আবার কূটস্থ চৈতন্য—কি রকম?—যেমন, কামারের 'নাই' (anvil), কত পিটছে—কিন্তু স্থির। জীবচৈতন্যকে ঈশ্বরচৈতন্যে ব্রহ্মচৈতন্যে যেতে হবে। স্বরূপ অনুভব করতে হবে। এই হ'ল উদ্দেশ্য। উপায়—আকুল আগ্রহ, বিবেক, বৈরাগ্য। বৈরাগ্য আবার কত রকম আছে—শ্মশান বৈরাগ্য, বিচারে বৈরাগ্য।

"স্বামীজী বলেছিলেন—দেখ, আমরা sincere (সরল অকপট) হবো। শ্মশানে গেলে তো সংসারী গৃহস্থ লোকেরও বৈরাগ্য হয়। দেখলে চোখের সামনে প্রিয় শরীরটা পুড়ে ছাই হয়ে গেল, দেখে ক্ষণিক বৈরাগ্য—ও তো সবারই হয়, কিন্তু তারা আবার সংসারে গিয়ে মায়ায় ভুলে যায়, ডুবে যায়। কিন্তু আমরা যখন জেনেছি সংসার কি—তখন আর ফিরব না, ভগবান লাভ হয় ভালই, না হয় নাই হ'ল, তবু ফিরছি না। ধীরে ধীরে চলে যাব—পাল উড়িয়ে। যখন অনুকূল বাতাস তখন এগিয়ে যাব, আর যখন প্রতিকূল বাতাস তখন থেমে থাকব, তবু ফিরব না।

"সংসার খানিকটা ঈশ্বর-সৃষ্টি—যথা পিতা-মাতা—এই জন্ম। বাকীটা জীবসৃষ্টি—যথা বিয়ে, সন্তান-উৎপাদন এই সব। কিসের সব, কিসের কি? এই মুহূর্তে যে চলে গেলে ধরে রাখতে পারি না, কি আমি চলে গেলে যে আমাকে ধরে রাখতে পারে না—সে আমার কে? আমিই বা তার কে? এই বিচার।

"একবার মাত্র আমার মায়ের জন্যে মন কেঁদেছিল। সেই ছোটবেলায় বেরিয়েছি—হিমালয়ের পথে টিহরি—সেইখানে তক্ষুনি বসে পড়লুম আর আপনা থেকে ঐসব ভাবনা আসতে লাগল। শেষে মনে হ'ল-মা বিশ্বজননীর শান্তিভরা কোলে আমি চিরকাল রয়েছি। আর কে আমার মা? যে মা আমার মরণ এলে এক সেকেণ্ডও ধরে রাখতে পারেন না, তাঁরই জন্যে আমি আমার এই মাকে হারাতে বসেছিলুম আর কি! দেখবে—প্রথমে যে ছেলেটি সংসার করবে, বিয়ে করবে, মায়েরা তাকেই ভালবাসেন, বলেন—

---

১ ছড়ার বইয়ে ১ম ভাগে আছে হারাধনের দশটি ছেলে সব একে একে হারাইয়া গেল, কেহ মরিয়া গেল। ২য় ভাগে আছে তাহারা আবার সব ফিরিয়া আসিল।

২ যুবকটির নাম হারাধন বসু; তখন আইন (Law) পড়িতেছিল।

আমার এই ছেলেটিই ভাল। কিন্তু বিয়ের পর ছেলে যখন বউ চিনে ফেলে, মাকে ভুলতে থাকে, তখন মা ঠিক উল্টো বলেন, বলেন আহা! যে ছেলেটি বিয়ে করেনি, কি (সাধু হয়ে) বেরিয়ে গেছে, সেটিই ভাল। মা বউ-এর নামে নালিশ করে, আবার বউ মায়ের নামে নালিশ করে। ছেলে বউকে নিয়ে ঘরে খিল দিয়ে পাশ-বালিশটাকে গুম গুম ক'রে কিল মারে আর খুব জোরে জোরে বকে, বউকে শিখিয়ে দেয় —'তুমি খুব কাঁদো, মা ভাববেন—আমি তোমায় শাসন করছি।' ছোটরা খুব হাসিতেছে, বড়রা গম্ভীর হইয়া শুনিতেছে। বাবা ধীরে ধীরে বলিলেন, 'বিয়ে করলে কি আর শান্তি থাকে?'

"ঠাকুর বলতেন 'বুড়ী ছুঁয়ে যত ইচ্ছে খেল না। আর চোর হবার ভয় থাকবে না।' কি রকম হবে? 'নির্গচ্ছতি জগজ্জালাৎ পিঞ্জরাদিব কেশরী'—সিংহ যেমন খাঁচা থেকে বের হয়, তেমনি সংসারের মায়াজাল ছিন্ন ক'রে বৈরাগ্যবান্ মানুষ মুক্ত হয়। 'বাচামতীতো বিষমো বিষয়াশা ...'—বিষয়সম্ভোগের আশা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর কথায় প্রকাশ করা যায় না। 'যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ।' যে মুহূর্তে বৈরাগ্য আসবে, সেই মুহূর্তে বেরিয়ে পড়বে—প্রব্রজ্যা গ্রহণ করবে। দিক্‌টিক্ ঠিক নেই - যে দিকে হোক্।

"ভগবান মানুষের রূপে আসেন মানুষকে শেখাতে। এই বুদ্ধদেব বুড়ো বয়সের ছেলে—কত ক'রে বদ্ধ করতে গেল, কিন্তু ঠিক বেরিয়ে প'ড়ল সেই বস্তুলাভ করতে প্রথমটা pessimist (দুঃখবাদী) হ'তে হয়—সবই যেন খারাপ - জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি এ জগতের সবই খারাপ; তবে বৈরাগ্য হবে। বস্তুলাভ হ'লে optimist (আশাবাদী)—তখন সব ভাল, তখনই সবাইকে ঠিক ঠিক ভালবাসতে পারবে।

"প্রবর্তক, সাধক, সিদ্ধ। প্রবর্তককে একটু কষ্ট ক'রে প্রথমটা জোর করতে হয়, শেষে সেইটাই স্বাভাবিক হয়ে যায়। ঠাকুরের কাছে ক-টি ছেলে এসেছিল সব ছেড়ে-ছুড়ে? তাদের ভেতর দিয়ে ঠাকুর দিলেন এক অদ্ভুত ধর্মচক্র ঘুরিয়ে -যা এখনও ঘুরছে।

"শঙ্কর বলেছেন 'বিবেকচূড়ামণি'তে সব জন্মের মধ্যে মনুষ্যজন্ম শ্রেষ্ঠ। মুক্তিলাভ—জ্ঞানলাভ করতে হ'লে দেবতাদেরও মনুষ্যশরীর ধারণ করতে হবে। তারপর সদ্‌গুরুর আশ্রয় যারা পেয়েছে, তাদের তো পোয়া বারো। সদ্‌গুরুর কাছ থেকেও যারা তাঁর কৃপা বুঝতে পারছে না, তাদের আর কি ব'লব? জ্ঞানযোগের পথ বড় কঠিন। রাজযোগের উপযুক্ত শরীর কোথা? ভক্তিযোগ সহজ এ যুগে। সঙ্গে সঙ্গে কর্মযোগ—তাঁর উপাসনা ভেবে, তাঁকে স্মরণ ক'রে, তাঁকে ফল সমর্পণ ক'রে সব কাজ করতে হবে।"

২৫. ১. ৩৭—কলিকাতার সেই ভক্ত যুবকটিকে লক্ষ্য করিয়াই আজও বলিতেছেন—"উকীলকে মিথ্যে কথা ব'লে পয়সা রোজগার করতে হয়, সত্যি কথায় ২৫৲ টাকাও হয় না। বহরমপুরের '—' বাবু একটু ব্রাহ্মভাবাপন্ন ছিলেন, মক্কেল আসলে জিজ্ঞেস করতেন, 'case (মোকদ্দমা) টা সত্যি না মিথ্যা?' মক্কেল ব'লত, 'আজ্ঞে, সত্যি-মিথ্যে মিশিয়ে।' তিনি বলতেন, 'তবে হবে না'। ছেঁড়া জামায় তাঁর জীবন কাটল। আর তাঁরই মামা টম্ টম্ হাঁকিয়ে court (আদালত)-এ যান।"

"বিদ্যা—যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে, যে বিদ্যাদ্বারা সেই অক্ষর ব্রহ্মকে জানা যায়, তাকে পরা বিদ্যা বলে। অবিদ্যা যার দ্বারা বিষয়-বাসনা বেড়ে চলে, তাকে অবিদ্যা বলে। তোমার এই ওকালতি-বিদ্যায় এর কোন্‌টা হয় বলো।

"হিউয়েন্থসাং কি অদ্ভুত ত্যাগী—জ্ঞানান্বেষী! তাঁর কি keen observation (তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ-শক্তি)! তিনি কি কষ্টসহিষ্ণু! Gobi desert (গোবি মরুভূমি) পেরিয়ে, হিন্দুকুশ পাহাড় ডিঙিয়ে ভারতে এলেন—বুদ্ধের দেশ! কি অনুরাগ! ভাগলপুরের কাছে এক বৌদ্ধসভায় হীনযান মহাযান ভাগ হয়ে গেল। হীনযানদের বুদ্ধমূর্তি সিংহলে, বার্মায়; মহাযানদের বুদ্ধ শিব নানা মূর্তি—ধ্যানের, নির্বাণের—চীনে ও তিব্বতে এর প্রভাব। এই বৌদ্ধসভার পর হিউয়েন্থসাং কামরূপে রাজার কাছে যান। আবার প্রয়াগে শিলাদিত্য হর্ষবর্ধনের মহাযজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন; এখানে 'সর্বদক্ষিণ' যজ্ঞে হর্ষবর্ধন দেড়মাস ধরে সব কিছু বিলিয়ে দিতেন, সঞ্চিত রাজকোষ শূন্য হয়ে যেত, অস্ত্রশস্ত্র ছাড়া সব কিছু বিলিয়ে দিতেন, এমন কি পরিধেয় বস্ত্র পর্যন্ত। শেষে রাজ্যশ্রীর বাড়ীতে গিয়ে উঠতেন—তার দেওয়া জামা কাপড় পরে রাজধানী ফিরতেন—অনেকটা ভাইফোঁটার মতো।

"Archaeological Survey (প্রত্নতাত্ত্বিক নিরীক্ষা)-তে অনেক কিছু জানা যায়। Princeps, William Jones, Alexander Cunningham (প্রিন্সেপ্স, উইলিয়ম জোন্স, আলেকজাণ্ডার ক্যানিংহাম)—এঁরাই তো আদি। তবে 'Asoke Pillar in Delhi built by Md. Tughlak.' (দিল্লীতে অশোক-স্তম্ভ মহম্মদ তোগলক কর্তৃক নির্মিত)—একথা শুনলে হাসি পায়। Edicts decipher (অনুশাসন লিপিগুলির পাঠোদ্ধার) করে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের দল, কিছু বোঝে না, সব sycophants (তোষামোদকারী)—সাহেবদের মনের মতো ব্যাখ্যা করে।

"হিউয়েন্থসাং—এর বই হাতে excavation (খননকার্য) হচ্ছিল। মথুরায় সংঘারাম সব মাপে মাপে মিলে যায়। ওতে Li (লী) হচ্ছে এক league (লীগ)। সারনাথে ধামেক স্তূপ কি ছিল! আর গভর্ণমেণ্ট কি করেছে!

"বঙ্কিমবাবু, রমেশ দত্ত—এঁরাও অনেক study (অধ্যয়ন), research (গবেষণা) করেছেন। বেশির ভাগ এ-সব ওঁরাই (সাহেবেরা) বার করেছেন, তাই আমরা জানছি। এ-সব বাংলায় translate (অনুবাদ) করলে তবে একটা কাজ হয়—পয়সাও হয়। তা না—সব ওকালতি আর চাকরী।" হিউয়েন্থসাং, ফাহিয়েন ও মার্কোপোলোর কথা উৎসাহের সহিত অনেক বলিলেন।"

কিছু পরে স্বামী অখণ্ডানন্দ জন্মতিথি-প্রসঙ্গে বলিলেন: "সন্ন্যাসীদের আবার জন্মতিথি কি? ক্রমে ৩৬৫ দিন ভরে যাক! এতেও কুলোবে না, এখনি কেউ কেউ আরম্ভ ক'রে দেবে (নিজের জন্মোৎসব)। বেদ-উপনিষদে কোথাও নেই—এসব Aryan (আর্য) নয়, Scythian (শিশোদীয়)। মহাভারতে কোথাও নেই রাম-নবমী বা জন্মাষ্টমীর কথা। ও বৈষ্ণবদের সৃষ্টি—বৌদ্ধদের দেখাদেখি—পরে। দাদার (মহাপুরুষ মহারাজের) সঙ্গে কথা হয়। তিনিও স্বীকার করেন—সন্ন্যাসীর আবার জন্মতিথি কি?

পরমহংসদেব শ্রীরামকৃষ্ণ ও বাংলার রঙ্গমঞ্চ

[পূর্বানুবৃত্তি]

অধ্যাপক প্রণবরঞ্জন ঘোষ

চৈতন্যলীলা-নাটকের তৃতীয় অঙ্কের ষষ্ঠ গর্ভাঙ্কে নিমাই পণ্ডিতের আত্মস্বরূপপ্রকাশে অভয়দানের সূচনাস্বরূপ গিরিশচন্দ্র শ্রীবাসপণ্ডিতের বাড়ীতে নিমাইয়ের অবতারসত্তার ঘোষণাটি সংক্ষিপ্ত আকারে উপস্থাপিত করে ঐ দৃশ্যেই (যবন) হরিদাস ও অদ্বৈত আচার্য প্রমুখ ভক্তদের সামনে নিমাইয়ের আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছেন। 'চৈতন্যভাগবতে'র মধ্যখণ্ড থেকে স্বভাবতঃই অনেকগুলি ঘটনার সারাংশ এ দৃশ্যে দেখা দিয়েছে। শ্রীচৈতন্যের বিশিষ্ট অনুগামীদের যে-কোনো একজনের জীবন-অবলম্বনেই একটি পূর্ণাঙ্গ নাটকরচনা সম্ভব। নিত্যানন্দ, হরিদাস বা অদ্বৈত আচার্য সম্বন্ধে একথা আরও প্রযোজ্য। চৈতন্যকেন্দ্রিক নাট্যরচনার এসব ঘটনাসংক্ষেপ অপরিহার্য। তবু শ্রীবাসের ঘরে নিমাইয়ের স্বমুখে আপন ভগবৎমহিমাঘোষণার কথায় আমরা 'চৈতন্যভাগবতে'র সেই বিশেষ দৃশ্যটি মনে রাখতে পারি।

শ্রীবাস পণ্ডিতের বাড়ীতে বৈষ্ণবভক্তদের মিলিত সংকীর্তনে তখন প্রতিবেশীরা কিছুটা বিরক্ত ও শঙ্কিত। মুসলমান শাসকেরা এই উচ্চস্বরে হরিনাম খুব সুনজরে দেখতো না। এই সময়ে আবার রটে গেল যে, শ্রীবাসের হরিসংকীর্তনে বিরক্ত হয়ে রাজা (হোসেন শাহ) নাকি তাঁকে বন্দী করবার জন্য দুটি নৌকায় সৈন্য পাঠাচ্ছেন। এ রটনা শ্রীবাসের কানেও গেল। যথার্থ ভক্ত শ্রীবাস ঈশ্বরেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করে অটল থাকলেন। এমনি সময়ে একদিন গঙ্গাতীরে বিচরমাণ গাভীদলের পাশ দিয়ে যেতে যেতে নিমাই পণ্ডিতের অন্তরে তাঁর ভগবৎসত্তার স্ফুরণ ঘটলো।

"মুঞি সেই মুঞি সেই" বোলে বারবার।
এইমত ধায়্যা গেলা শ্রীবাসের ঘরে॥
"ক করিস্ শ্রীবাসিয়া!" বোলে অহঙ্কারে॥
নৃসিংহ পূজয়ে শ্রীনিবাস যেই ঘরে।
পুনঃপুন লাথি মারে তাহার দুয়ারে॥
"কাহারে বা পূজিস্ করিস্ কার ধ্যান।
যাহারে পূজিস্ তারে দেখ বিদ্যমান॥
জ্বলন্ত অনল যেন শ্রীবাস পণ্ডিত।
হইল সমাধিভঙ্গ চাহে চারিভিত॥
দেখে বীরাসনে বসি আছে বিশ্বম্ভর।
চতুর্ভুজ-শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধর॥

ডাকিয়া বোলয়ে প্রভু, আরে শ্রীনিবাস।
এত দিন না জানিস্ আমার প্রকাশ॥
তোর উচ্চসঙ্কীর্তনে নাঢ়ার হুঙ্কারে।
ছাড়িয়া বৈকুণ্ঠ আইলুঁ সর্বপরিবারে॥
(চৈতন্যভাগবত : মধ্যখণ্ড : দ্বিতীয় অধ্যায়)

শ্রীবাসের এই ভক্তিসাধনায় সিদ্ধিলাভের ঘটনাটির সঙ্গে জড়িত রাজনৈতিক পটভূমিটুকু মুছে ফেলে গিরিশচন্দ্র শুধুমাত্র ভক্তিরসের দিক থেকেই দৃশ্যটি উপস্থাপিত করেছেন। মনে হয়, রাজসৈন্য এসে শ্রীবাসকে বন্দী করবে—এইরকম জনরবের কথা সংলাপের মধ্যে থাকলে শ্রীবাস ও শ্রীচৈতন্যদেবের নির্ভীক চরিত্রবৈশিষ্ট্য আরো সুস্পষ্ট হতো।

গিরিশচন্দ্রের সৃষ্টিতে দৃশ্যটি এইরকম—

শ্রীবাসের বাটী

নিমাই ও ধ্যানমগ্ন শ্রীবাস

নিমাই। কার ধ্যান করিস শ্রীবাস,
পূর্ণ তোর আশ—
দেখ মম বিকাশ ধরণীধামে।

গোলক ত্যজিয়ে
আসিয়াছি দেখা দিতে তোরে
কৃষ্ণ ব'লে যতই কেঁদেছ,
কৃষ্ণ নাম যতই গেয়েছ—
সে সকল পূর্ণ এত দিনে।
মত্ত মন যার অন্বেষণে,
চেয়ে দেখরে নয়নে—
ইষ্টদেবে কর দরশন।

শ্রীবাস। আরে আরে, কে তুই বর্বর,
পূজায় ব্যাঘাত কর ?
(চক্ষু উন্মীলন করিয়া)
প্রভু! অধমেরে এত বিড়ম্বনা!
জয় জয় ষড়ভুজধারী
রূপ অনুপম—দুই করে ধর ধনুর্বাণ,
দশস্কন্ধ দর্প চূর্ণ যায়!
আহা, মরি মরি গোপী-মনোহারী,
দুই করে ধরেছ বাঁশরী,
কি হেরি— কি হেরি—
দুই করে দণ্ড কমণ্ডলু
রূপ হেরি পরাণ জুড়ায়,
তুলনায় তুমিই তুলনা।
গৌরাঙ্গ-সুন্দর গোলোক-ঈশ্বর,
ভক্ত পূর্ণ-আশ-ভাবের প্রকাশ—
ধরামাঝে হলো এতদিনে,
কৃপা করি কর চিরদাস পদে।

[চৈতন্যলীলা : তৃতীয় অঙ্ক : ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক]

এ ক্ষেত্রে লক্ষণীয়, বৃন্দাবনদাসের বর্ণনায় শ্রীবাস চৈতন্যদেবের চতুর্ভুজ নারায়ণমূর্তি দেখেছিলেন। গিরিশচন্দ্রের ক্ষেত্রে চতুর্ভুজ ষড়ভুজে পরিণত। মনে হয়, পরবর্তীকালে পুরীধামে বাসুদেব সার্বভৌমের ষড়ভুজ-দর্শনের বর্ণনার দ্বারা গিরিশচন্দ্র এক্ষেত্রে প্রভাবিত। তবে পৌরাণিক বিশ্বাসের ক্ষেত্রে এ-জাতীয় অদল বদল খুব আপত্তিকর নয়। বিশেষতঃ চৈতন্যদেবের ক্ষেত্রে ষড়ভুজমূর্তির অনুষঙ্গই ভক্তহৃদয়ে বেশী জাগে।

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে' এই অংশের দ্রষ্টা শ্রীরামকৃষ্ণপ্রসঙ্গে—"শ্রীবাস ষড়ভুজ দর্শন করছেন, আর স্তব করছেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাবিষ্ট হইয়া ষড়ভুজ দর্শন করিতেছেন।"

শ্রীবাসের আত্মনিবেদনের পরেই নিতাই, হরিদাস, অদ্বৈত ও ভক্তগণের প্রবেশ। ঈশ্বর-স্বরূপের প্রকাশে কৃতসঙ্কল্প নিমাই আজ তাঁর পরমকরুণার কথা সকলের সামনেই ঘোষণা করলেন। অদ্বৈত, হরিদাস, নিতাই—এঁদের প্রত্যেকের সঙ্গেই বিভিন্ন অবস্থায় নিমাইয়ের ঈশ্বরসত্তার প্রকাশ ঘটেছে। নাটকীয় সংহতির জন্য একটি দৃশ্যেই সে-সব কাহিনীর সমাবেশ। আত্মপ্রকাশের আনন্দে বিভোর নিমাই নিজের মহিমার সঙ্গে নিতাইয়ের মহিমার কথাও ঘোষণা করলেন। চৈতন্যলীলাদর্শনে মুগ্ধ নিতাইয়ের সংলাপ—

ধন্য কলিকাল, ধন্য কলির মানব,
কোন্ যুগে কে দেখেছে হেন লীলা ?
কিশোরীর প্রেমে, ভ্রমে যবে ব্রজরাজ,
এলো গোরা হরিনামে মাতে ধরা!

সকলে। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল!

নিমাই। কেরে হরি বলে পরাণ জুড়ালে!
দেহ পদধূলি—
সকলে এ অভাগার শিরে।
ওহে, বৈষ্ণব-মণ্ডল,
ভক্তিতে বেঁধেছ হরি,
আমি দীন, হরিধন দেহ কৃপা করি।
আরে শঠ কপট কানাই,
ভুলাইতে চাও,
আর কেবা ভোলে তোর ছলে।

নিতাই। (গীত)
কই কৃষ্ণ এল কুঞ্জে প্রাণসই।
দেরে কৃষ্ণ দে, কৃষ্ণ এনে দে
রাধা জানে কিগো কৃষ্ণ বই ॥

নিতাইয়ের কলিকাল-মাহাত্ম্য-বর্ণনা বৈষ্ণব-সাধক কবির "কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্বোত্তম নরলীলা, নরবপু তাঁহার স্বরূপ" এবং "প্রণমহোঁ কলিযুগ সর্বযুগসার"—প্রভৃতি চরণ মনে পড়িয়ে দেয়। নিমাইয়ের সংলাপে ঈশ্বরসত্তার উদ্‌ঘাটনের পরেই আবার ভক্তিসাধক মানবে রূপান্তরিত হওয়ার ইঙ্গিতটি লক্ষণীয়। অবতার-চরিত্রে দেবভাব ও মানবভাবের পর্যায়ক্রমে প্রকাশের এ পরিকল্পনা একান্ত স্বাভাবিক।

গিরিশচন্দ্রের নাট্যদৃশ্যটির দ্রষ্টা শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গে 'কথামৃত'—"গৌরাঙ্গের ঈশ্বর আবেশ হইয়াছে। তিনি অদ্বৈত, শ্রীবাস, হরিদাস ইত্যাদির সহিত ভাবে কথা কহিতেছেন। গৌরাঙ্গের ভাব বুঝিতে পারিয়া নিতাই গান গাইতেছেন—কই কৃষ্ণ এল কুঞ্জে প্রাণ সই।...

শ্রীরামকৃষ্ণ গান শুনিতে শুনিতে সমাধিস্থ হইলেন। অনেকক্ষণ ঐ ভাবে রহিলেন। কনসার্ট চলিতে লাগিল। ঠাকুরের সমাধিভঙ্গ হইল।..."

শ্রীরামকৃষ্ণ প্রাণে প্রাণে অনুভব করলেন নিমাইয়ের আত্মপ্রকাশের মাধুর্য। আর এক বছরের মধ্যেই তিনিও ভবের হাটে তাঁর গুপ্ত-রহস্যের ভাণ্ডটি সর্বজনের সামনে ভেঙে ফেলবেন। কাশীপুরের অন্ত্যলীলায় তাঁর এবারে আগমনের সব রহস্যই উদ্‌ঘাটিত হবে! ভক্তদের কাছে তা আগেই প্রকাশিত হয়েছে।

*

শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ—একজন আজ দৃশ্য, অপরজন দ্রষ্টা। আর দুয়ের যোগসূত্ররূপে রঙ্গমঞ্চে চৈতন্যের ভূমিকায় রয়েছেন বিনোদিনী। শ্রীচৈতন্যের ঈশ্বরাবেশ, শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধি-তন্ময়তা এ যেমন পরমতত্ত্ব, তারই পাশে রয়েছে এক ক্ষুদ্র মানবপ্রাণের আর্ত ব্যাকুলতা। "চৈতন্য-লীলা"-অভিনয়ের প্রস্তুতিপর্বে বিনোদিনীর সাধনা-ময় জীবনকথা আমরা আগে কিছুটা উদ্ধৃত করেছি। শ্রীচৈতন্যের অভয়পদে স্মরণ নেওয়া বিনোদিনীর ক্ষেত্রে সত্যই ব্যর্থ হয়নি। বিনোদিনীর ভাষায়—"কেন না তাঁর যে দয়ার পাত্রী হইয়াছিলাম তাহা বহুসংখ্যক সুধীবৃন্দের মুখেই ব্যক্ত হইতে লাগিল। আমিও মনে মনে বুঝিতে পারিলাম যে, ভগবান আমায় কৃপা করিতেছেন। কেন না, সেই বাল্যলীলার সময় 'রাধা বই আর নাইক আমার, রাধা বলে বাজাই বাঁশী' বলিয়া গীত ধরিয়া যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম, ততই যেন একটা শক্তিময় আলোক আমার হৃদয়কে পূর্ণ করিয়া তুলিতে লাগিল। যখন মালিনীর নিকট হইতে মালা পরিয়া তাহাকে বলিতাম "কি দেখ মালিনী"[১] সেই সময় আমার চক্ষু বহির্দৃষ্টি হইতে অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করিত। আমি বাহিরের কিছুই দেখিতে পাইতাম না। আমি হৃদয়মধ্যে সেই অপরূপ গৌরপাদপদ্ম যেন দেখিতাম; আমার মনে হইত "ঐ যে গৌরহরি, ঐ যে গৌরাঙ্গ" উনিই তো বলিতেছেন, আমি সব মন দিয়া শুনিতেছি ও মুখ দিয়া তাঁহারই কথা প্রতিধ্বনি করিতেছি! আমার দেহ রোমাঞ্চিত হইত, সমস্ত শরীর পুলকে পূর্ণ হইয়া যাইত, চারিদিকে যেন ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হইয়া যাইত।

"আমি যখন অধ্যাপকের সহিত তর্ক করিয়া বলিতাম, 'প্রভু কেবা কার! সকলই সেই কৃষ্ণ' তখন সত্যই মনে হইত যে 'কেবা কার!' পরে যখনই উৎসাহে উৎফুল্ল হইয়া বলিতাম যে,—

'গয়াধামে হেরিলাম বিদ্যমান,
বিষ্ণুপদে পঙ্কজে করিতেছে মধু পান,
কত শত কোটি অশরীরী প্রাণী!'[২]

—তখন মনে হইত বুঝি আমার বুকের

১ চৈতন্যলীলা: তৃতীয় অঙ্ক: দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক
২ তদেব: চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

ভিতর হইতে এই সকল কথা আর কে বলিতেছে! আমি তো কেহুই নহি! আমাতে আমি-জ্ঞানই থাকিত না।" (আমার কথা : বিনোদিনী দাসী)

ভক্তিসাধনায় পঞ্চবিধ মুক্তির একটি সারূপ্য। অবতার-চরিত্রের অভিনয়কালে বিনোদিনীর বহিরঙ্গে সারূপ্য তো ঘটেছিল নিশ্চয়, অন্তরেও তিনি চৈতন্যভাবরূপে লীন হতে পেরেছিলেন। বাংলার রঙ্গমঞ্চ ওই একটি অভিনয়ের মাধ্যমেই সর্বস্তরের জনগণের অন্তরতম আকর্ষণের কেন্দ্র হয়ে উঠলো। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আশীর্বাদে সেদিন নট, নটী, নাট্যকার, রঙ্গমঞ্চ সকলেরই নবজীবনের অভিষেক। যুগান্তরের পার থেকে শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ— আপাতদৃষ্টিতে দুটি আবির্ভাব মনে হলেও মূলতঃ যে একই সত্তা। সেদিনের অভিনয়-তন্ময়তা ও অভিনয়দর্শনের তন্ময়তা—এ দুয়ের দ্বারাই তা সুপ্রমাণিত। [ক্রমশঃ]

'নিত্যোঽনিত্যানাম্'

শ্রীধনেশ মহলানবীশ

বৃথা কেন করিতেছ অপস্রিয়মাণ
জলের বুদ্বুদ মাঝে নিত্যের সন্ধান।
শৈশব কৈশোর যায় যৌবন ফুরায়,
দেহরথ পঙ্গু হয় দুর্দান্ত জড়ায়।
ধন যায় মান যায়, আপনার জন
রহে না রহে না কেহ। কে তবে আপন
অনিত্য সংসার মাঝে ? কাহারে চাহিয়া
শবরীর মতো র'ব নিত্য প্রতীক্ষিয়া !
কে সে ? কার ভালোবাসা ফুরায় না কভু ?
আমার ধ্যানের ধন হৃদয়ের প্রভু
কোথা তিনি—জ্যোতির্ময় অন্তর দেবতা ।
যাঁহার চরণতলে সর্ব ব্যাকুলতা
সমর্পিয়া মাগি' লব অনন্ত আশ্রয়
গাহিব উদাত্ত কণ্ঠে শাশ্বতের জয়।

যে তীর্থ আজও আছে পঞ্চনদের দেশে

[পূর্বানুবৃত্তি]

শ্রীনির্মলচন্দ্র ঘোষ

গুরু অর্জুনদেব সন্তোষসর খনন করান। কথিত আছে সরোবর খনন করার সময়ে ভূগর্ভে একটি ছোট মঠ (সাধুদের থাকবার স্থান) আবিষ্কৃত হয়। সেই মঠের মধ্যে একজন গভীর-সমাধিমগ্ন সাধু দেখা যায়। সাধুজীর কোন বাহ্য-জ্ঞান ছিল না। গুরু অর্জুনদেবের চেষ্টায় তাঁর সমাধিভঙ্গ হয়। সেই সাধুজীর নাম ছিল সন্তোষ, তাই দীঘির নাম রাখা হয় সন্তোষসর।

রামদাস

অমৃতসর হতে চুয়াল্লিশ কিলোমিটার দূরে, অমৃতসর-ভের্কে-ডেরা বাবা নানক লাইনে, রাম-দাস একটি রেলষ্টেসন। চতুর্থ শিখগুরু রামদাসের নামে সহরের নাম।

রামদাস প্রথম শিখ-গুরু নানকের শিষ্য সাহেব বুড্ডা-নির্মিত একটি গুরুদ্বারা আছে।

তরণ-তারণ

অমৃতসর হতে তরণ-তারণ রেলপথে মাত্র চব্বিশ কিলোমিটার।

তরণ-তারণে শিখদের একটি প্রসিদ্ধ গুরুদ্বারা আছে। আর আছে পঞ্চম গুরু অর্জুনদেবের নির্মিত একটি পুণ্যতোয়া-দীঘি।

বৈশাখী অমাবস্যায় তরণ-তারণে বড় মেলা হয়।

তরণ-তারণের প্রায় যোল কিলোমিটার পূর্ব দিকে খাডুর সাহেব গ্রামে দ্বিতীয় গুরু অঙ্গদের পুণ্যস্মৃতিরক্ষার্থে নির্মিত একটি গুরুদ্বারা ও দীঘি আছে। গুরু অঙ্গদ খাডুর সাহেবে বাস করতেন।

তরণ-তারণের বাইশ কিলোমিটার পূর্ব-দক্ষিণ-পূর্বে, পুণ্যতোয়া ব্যাস (উচ্চারণ 'বিয়াস্') নদীর উত্তর তীরে গোইন্দবাল। সেখানে 'বাওলি সাহেব' নামে একটি প্রাচীন গুরুদ্বারা আছে। গোইন্দ্‌বালে তৃতীয় গুরু অমরদাস বাস করতেন। চতুর্থ গুরু রামদাস গোইন্দ্‌বালে দেহরক্ষা করেন।

দেরা-বাবা-নানক

জিনৈ বেদ পড়িও
সো বেদী কহায়ে।
তিনৈ ধরম কে করম
নিজৈ চলায়ে॥
গীতগোবিন্দ (বিচিত্র নাটক)

[তিনি (গুরু নানক) বেদ পড়িয়াছিলেন, সে জন্য তাঁহাকে বেদী বলা হয়। এই কারণেই তিনি ধর্মসংস্কার করিতে পারিয়াছিলেন।]

গুরুদাসপুর সহরের প্রায় পঁয়ত্রিশ কিলো-মিটার দূরে 'দেরা-বাবা-নানক'। রেলপথে যাওয়া যায়। দেরা-বাবা-নানক পুণ্যতোয়া রাবি নদীর দক্ষিণ তীরে গুরুদাসপুর জেলায় অবস্থিত।

শিখধর্মের প্রবর্তক ও প্রথম গুরু বাবা নানক রাবি নদীর উত্তর তীরে পথোই নামক গ্রামে বাস করতেন। সেখানেই তিনি দেহরক্ষা করেন। ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে তাঁর পুণ্যস্মৃতি-বিজড়িত গৃহখানি রাবি নদীর জলে ভেসে যায়। তারপর সেই জন্মস্থানের স্মৃতিরক্ষার্থে শিখগণ রাবির দক্ষিণ তীরে দেরা-বাবা-নানক সহর স্থাপন করেন।

দেরা-বাবা-নানকে দরবার সাহেব নামে একটি বিখ্যাত গুরুদ্বারা এবং আরও কয়েকটি শিখদের মন্দির আছে।

শ্রীগোবিন্দপুর

গাবহি সিধ সমাধি অন্দর
গাবনি সাধু বিচারে।
গাবনি যত্তি সতি সন্তোষী
গাবহি বীর করারে।*

[সমাধিতে মগ্ন হইয়া সিদ্ধ তোমার গুণ গান করে। সাধু তোমার গানের অর্থ চিন্তা করে। যতি, সাত্ত্বিক ও সদানন্দ ব্যক্তিগণ তোমার গুণ গান করে। নির্মম যোদ্ধাগণও তোমার গুণ গান করে।]

গুরুদাসপুর জেলায় পুণ্যতোয়া ব্যাস নদীর উত্তর তীরে শ্রীগোবিন্দপুর সহর। গুরুদাসপুর সহর হতে শ্রীগোবিন্দপুর আট চল্লিশ কিলোমিটার দক্ষিণে।

শ্রীগোবিন্দপুরে শিখদের কয়েকটি প্রসিদ্ধ মন্দির আছে। পঞ্চম গুরু অর্জুনদেব এই সহর স্থাপন করেন। তাঁর পুত্র হরগোবিন্দের নাম অনুসারে সহরের নাম রাখা হয় শ্রীগোবিন্দপুর হরগোবিন্দ শিখদের ষষ্ঠ গুরু হয়েছিলেন।

---

* জপজী।

'সর্বভূতস্থমীশ্বরম্'

শ্রীমোহিনীমোহন বিশ্বাস

যা কিছু সব দেখি চোখে সবই যন্ত্র তাঁর,
যন্ত্রমাঝেই খুঁজলে পাবে যন্ত্রী—যন্ত্র যাঁর।
যা আছে এই বিশ্বমাঝে
তাতেই তাঁহার প্রকাশ আছে,
সে প্রকাশকে স্থূল এ চোখে যায় না ধরা,
খুললে মনের সূক্ষ্ম নয়ন তখন তাঁকে যায় যে ধরা।
ব্যাকুলতা জাগে যদি তাঁহার দেখা পেতে
তাঁহার কৃপায় খুলে যায় সে নয়ন নিমেষেতে।

অনিকেত

শ্রীলাবণ্যমোহন রায়

আমি অনিকেত নাহি মোর ঘর,
নিকেতন মম বিশ্ব চরাচর ;
আমি স্ব-অধীন আমি বিমুক্ত,
নিজ মায়া সাথে হইয়া যুক্ত
ধরেছি লক্ষ রূপ,
রূপ নাই মোর তবু লীলাভরে
হয়ে আছি অপরূপ।
মোর নাহি পরিবার পুত্র,
নাহি পিতামাতা মিত্র,
আমি একা, অনন্য ;
হরষ বিষাদ সুখ দুখ তাপ
নাহি করি আমি গণ্য।
আমি আলো, আমি কালো,
আমি মন্দ ও আমি ভালো,
আমি মিথ্যা ও আমি সত্য,
কালাকাল যাপি
আমি আছি ব্যাপি
স্বরগ পাতাল মর্ত্য।
ভরা রূপে রসে গন্ধে
আমারি সুরে ও ছন্দে
নাচে এ বিশ্ব নাচে চরাচর
আনন্দে বা নিরানন্দে।
যা কিছু রয়েছে, যা কিছু আসিবে,
যা কিছু হয়েছে গত,
একদা তাহারা সকলেই হবে
আমাতেই সমাগত,
আমি অনিকেত।

সমালোচনা

1. The Aryan Ecliptic Cycle : By H.S. Spencer ; H.P. Vaswani, Poona-2 : pp 442 : price Rs. 25.00

2. The Age of Zarathushtra : By the same author and also published by the same publisher : pp. 40 : Price Rs. 3.00

3. The Mysteries of God in the Universe : By the same : pp.184 : Price Rs. 20.00

গ্রন্থ তিনখানিই দীর্ঘ গবেষণা এবং অসাধারণ বৈদগ্ধ্যের পরিচয় বহন করে। প্রথম গ্রন্থখানিতে ভারত ও ইরানের প্রাচীন ধর্মীয় ইতিহাসের পর্যালোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থকারের মতে, এই ইতিহাস হ'ল খৃষ্টপূর্ব ২৫,৬২৮ সাল থেকে ২৯২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। এইভাবে উক্ত ধর্মীয় ইতিহাসকে নির্দিষ্ট কালের মধ্যে আবদ্ধ করা যায় কিনা, সে সম্বন্ধে মতবিরোধ থাকলেও গ্রন্থকার যে মূল সূত্র-গুলি বিশ্লেষণ করেছেন তা মোটামুটি মতদ্বৈধতার উর্ধ্বে। গ্রন্থকারের অন্যতম তত্ত্ব হ'ল, জারাথুষ্ট্র শ্রীকৃষ্ণ এবং যিশুখৃষ্ট—তিনজনেই হলেন বিভিন্ন দেশ এবং বিভিন্ন সময়ে আবির্ভূত অবতার। সুতরাং শুধু 'সম্ভবামি যুগে যুগে' নয়, সম্ভবামি দেশে দেশেও বটে। অবতারবাদের তত্ত্ব পরিস্ফুটিত করতে গিয়ে গ্রন্থকার পুনর্জন্মবাদ-তত্ত্বও আলোচনা করেছেন এবং আলোচনাও বিশেষ মনোগ্রাহী। গ্রন্থকারের সঙ্গে সব সময় একমত হতে না পারলেও অনেক চিন্তার খোরাক গ্রন্থখানির মধ্যে পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় গ্রন্থখানিতে জারাথুষ্ট্র-যুগ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। এই ইতিহাস নয় হাজার বছর আগেকার বলেই অধিকাংশ ঐতিহাসিক মনে করেন। শুধু আমাদের পার্শী ভাইদেরই নয়, অগ্নি-উপাসনামূলক এই ইতিহাস সকলেরই কিছু কিছু জানা উচিত। আর আমরাও মূলতঃ অগ্নি-উপাসক, সে-কথা ভুললেও চলবে না।

তৃতীয় গ্রন্থখানি মূলতঃ বিভিন্ন ধর্মসূত্রের তুলনামূলক আলোচনা। আলোচনায় স্থান পেয়েছে গাথা গীতা তালমুদ বাইবেল কোরান এবং অবশ্যই বেদ। সমালোচনায় গ্রন্থকার অধ্যাত্মবাদীয় ও বস্তুবাদীয়—উভয় দৃষ্টিভঙ্গিই অবলম্বন করেছেন। গ্রন্থখানি মনোযোগ সহকারে পাঠ করলে অধ্যাত্মতত্ত্ব ধারণায় অনেকখানি অগ্রসর হওয়া যায়। বলা যায়, ধর্মীয় দর্শন বা Philosophy of Religion-এর ক্ষেত্রে গ্রন্থ-খানি এক উল্লেখযোগ্য অবদান।

—ডক্টর শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়

শ্রীম-দর্শন (একাদশ ও দ্বাদশ ভাগ): স্বামী নিত্যাত্মানন্দ। পরিবেশক: জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১১৯ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা ১৩। পৃষ্ঠা যথাক্রমে ১৮০ ও ২০৪। মূল্য ৮+৮ টাকা।

ভারতীয় সংস্কৃতি ও অধ্যাত্মসাধনার ক্ষেত্রে 'শ্রীম-দর্শন'-এর আরও দুইটি ভাগ সংযোজিত হইয়াছে।

একাদশ ভাগের কয়েকটি আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য:

(১) ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 'যত মত তত পথ' ও 'ঈশ্বরের ইতি করা যায় না'—এই দুইটি মহাবাণী শ্রীম-র জীবনে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহার পরিচয়, (২) বহু জন্মের সুকৃতির ফলে যে যথার্থ সাধুসঙ্গ হয়, তাহা

জীবনকে অমৃতত্বের অধিকারী করে, (৩) স্বামীজীর আবির্ভাবে ভারতের মোহনিদ্রা ভাঙিয়া গিয়াছে, (৪) ধর্মজীবনে জলন্ত বিশ্বাসের কথা শ্রীম-মুখে কীর্তিত

দ্বাদশ ভাগে মাষ্টার মহাশয় গৃহে থাকিয়াও কিরূপে ভগবদ্‌ভাবে চিত্ত নিবিষ্ট রাখিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করিয়াছেন, তাহা বিবৃত।

'অভিনব শিক্ষক শ্রীম' পরিচ্ছেদে আদর্শ শিক্ষা সম্বন্ধে সংক্ষেপে শ্রীম-র অভিমত: ছেলেদের চরিত্রগঠন হয়, শরীর পুষ্ট হয়, সঙ্গে সঙ্গে মনটি বলিষ্ঠ হয় শিক্ষার পরিকল্পনার পিছনে এই ভাবটি চাই-ই। চরিত্রগঠনে ঈশ্বর-বিশ্বাস একান্ত আবশ্যক।...আবার চরিত্রগঠনে কেবল দৃষ্টি রাখলে হবে না। ছেলেকে ইউনিভার-সিটির পরীক্ষায় পাস করাতে হবে। তা নইলে কাজ পাবে না। (পৃঃ ১৩২-৩৪)

'শান্ত হও আগে, শান্তি দাও পরে' ভক্তদের প্রতি শ্রীম-র উক্তি অন্তর স্পর্শ করে: শান্তির আশ্রয় শ্রীভগবানের চরণকমল। আর অশান্তির আশ্রয় সংসার। ঈশ্বর শান্ত, জগৎ অশান্ত। এই অশান্ত জগতে বাস ক'রে কি ক'রে শান্তিলাভ করতে হয়, তা দেখাতেই ভগবান বারবার অবতার-শরীর নিয়ে আসেন। (পৃঃ ১৬৩)

Nivedita (Schooling under her Master)—Bhupendranath Roy, Retired Headmaster. Published from Golamara High School, P.O. Golamara, Dist. Purulia, W.B. Pp.—35-68: price 50 paise only.

ভগিনী নিবেদিতার অনবদ্য জীবনের মহোজ্জ্বল অধ্যায়গুলি সুকুমারমতি তরুণদের নিকট খণ্ডে খণ্ডে তুলিয়া ধরিবার প্রচেষ্টা অভিনন্দন-যোগ্য। এই খণ্ডে নিবেদিতার ব্রহ্মজ্ঞ আচার্য যুগনায়ক স্বামী বিবেকানন্দের পদপ্রান্তে শিক্ষা-লাভের বিষয় সুললিত ইংরেজীতে সুন্দরভাবে উপস্থাপিত। ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষালাভ, হিমালয়-ভ্রমণ, বিদ্যালয়প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি নিখুঁতভাবে বর্ণিত।

আলো—মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুল পত্রিকা, শ্রীঅরবিন্দ-শতবার্ষিকী সংখ্যা। প্রকাশক: শ্রীহরিপদ মণ্ডল, প্রধান শিক্ষক। পৃষ্ঠা ১৯৪।

মহাজীবনের ঘটনাবলীকে কেন্দ্র করিয়া যখন ছাত্রদের পত্রিকা-প্রকাশনের উদ্যোগ চলে তখন তাহারা অনেক অজানা তত্ত্ব ও তথ্যের সহিত পরিচয়লাভের সুযোগ পায়। শ্রীঅরবিন্দ-শত-বার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত 'আলো' পত্রিকায় ইহার নিদর্শন বিদ্যমান। শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে সুচিন্তিত লেখাগুলি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শ্রীঅরবিন্দের কয়েকটি ইংরেজী কবিতা ও বাণী প্রদত্ত হওয়ায় পত্রিকার মান বাড়িয়াছে। অন্যান্য রচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য: চাঁদে মানুষের প্রথম পদক্ষেপ, বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে ভারতের ভূমিকা।

নিবেদিতা বিদ্যালয় পত্রিকা (১৯৭২)—রামকৃষ্ণ সারদা মিশন সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুল, ৫ নিবেদিতা লেন, কলিকাতা ৩ হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ১৪৬।

প্রতিবৎসরের বার্ষিক পত্রিকার মতো এবারের পত্রিকাখানিও বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যে, সুষ্ঠুসম্পাদনায়, মুদ্রণ-সৌকর্যে ও উপযুক্ত চিত্রাবলীতে আকর্ষণীয় ছাত্রীদের কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধাবলী সুপাঠ্য। প্রারম্ভে 'এগিয়ে যাও' প্রবন্ধে আগে চলার আহ্বান অনুপ্রেরণাময়। অন্তে 'আমাদের কথা'-য় সারাটি বৎসরের ঘটনাবলী পারম্পর্যক্রমে সন্নিবেশিত।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

উৎসব-সংবাদ

তমলুক রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে গত ৬ই মার্চ, এবং ৯ই মার্চ হইতে ১১ই মার্চ পর্যন্ত নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৩৮তম শুভ জন্মমহোৎসব পালিত হইয়াছে। ৬ই বিশেষপূজা, পাঠ ও ভোগাদি হয়, দুপুরে প্রায় ৫০০ জন নরনারী প্রসাদ পান। সন্ধ্যারতির পর আশ্রমের অধ্যক্ষ শ্রীরামকৃষ্ণ-আবির্ভাব-কাহিনী বর্ণনা করেন। ৯ই মার্চ বিকাল ৪টায় মহকুমাশাসক শ্রীপ্রণবকুমার দাশগুপ্তের সভাপতিত্বে আশ্রম-বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ-সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন জেলা বিদ্যালয়-পরিদর্শক শ্রীরাখাল দাশগুপ্ত। সন্ধ্যা ৭-৩০ টায় রামায়ণগান করেন শ্রীরসময় বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৎপরে ভাগবত ব্যাখ্যা করেন স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। ১০ই মার্চ বিকাল ৫ টায় অনুষ্ঠিত সভায় আশ্রম-অধ্যক্ষের স্বাগত সম্ভাষণের পর স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ (সভাপতি) বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের আবৃত্তি ও প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করেন। পরে 'তরুণ ভারতের প্রতি স্বামীজীর বাণী' এই বিষয়ে মনোজ্ঞ ভাষণ প্রদান করেন অখিল ভারত বিবেকানন্দ যুব মহামণ্ডলের সম্পাদক শ্রীনবনীহরণ মুখোপাধ্যায় এবং স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। সন্ধ্যা ৭-৩০ টায় শ্রীরামকুমার চট্টোপাধ্যায় ও সম্প্রদায় সঙ্গীত পরিবেশন করেন। ১১ই মার্চ সকাল ৬টা হইতে ৯টা পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিকৃতি সহ নগরসংকীর্তন করা হয়। সকাল ৯-৩০টায় স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। মধ্যাহ্নে ৬-৭ হাজার নরনারী বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। ৪-৩০ টায় নন্দলাল দেবনাথের বাউল সঙ্গীতের পর আয়োজিত ধর্মসভায় স্বামী লোকেশ্বরানন্দ (সভাপতি), শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার, স্বামী প্রমথানন্দ ও স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর কথা আলোচনা করেন। পরে শ্রীরথীন ঘোষ ও সম্প্রদায় কীর্তন-গান পরিবেশন করেন। স্থানীয় প্রবীণ শিক্ষাবিদ্ শ্রীশ্রুতিনাথ চক্রবর্তী তিন দিনই সভান্তে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এই উৎসব উপলক্ষে স্থানীয় হাসপাতালে রোগীদের ফল ও মিষ্টি প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

কাটিহার রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে ৬ই হইতে ১০ই মার্চ পর্যন্ত পাঁচ দিনের উৎসবে ভজন, নগর-সঙ্কীর্তন বিশেষ পূজা ও হোম, শ্রীশ্রীচণ্ডী- ও গীতা-পাঠ হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমা ও স্বামীজীর জীবন ও বাণী অবলম্বনে বক্তৃতা করেন স্বামী ব্যোমানন্দ (হিন্দীতে), স্বামী মুমুক্ষানন্দ ও স্বামী রুদ্রাত্মানন্দ (বাংলায়)। সব কয়টি বক্তৃতাই মনোজ্ঞ হইয়াছিল। কলেজ-অধ্যক্ষের আহ্বানে কাটিহার ডি. এস. কলেজেও ব্যোমানন্দজী হিন্দীতে একটি হৃদয়গ্রাহী ভাষণ দেন।

শ্রীকৃষ্ণ ও গান্ধারীর সংলাপ অবলম্বনে লোক-কবি শ্রীনিশিকান্ত রায় ও শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের কবিগান এবং সুকণ্ঠ শ্রীঅতুলকৃষ্ণ চ্যাটার্জির 'প্রহ্লাদচরিত' ও 'মহিষাসুরবধ' বিষয়ক পালা-কীর্তন বিশেষ মর্মস্পর্শী হইয়াছিল।

পুণ্য আবির্ভাবতিথি দিবসে প্রায় চার হাজার নরনারী হাতে হাতে প্রসাদ গ্রহণ করেন।

করিমগঞ্জ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ৬ই মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি-উৎসব উদ্যাপনের পরে ৯ই হইতে ১৪ই মার্চ পর্যন্ত সাধারণ জন্ম-

মহোৎসব মহা আনন্দে অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিন স্কুল ও কলেজের ছাত্র-ছাত্রীগণের বক্তৃতা-প্রতিযোগিতা হয়। ১০ই মার্চ শিশুদের বিচিত্রানুষ্ঠানে যোগদান করেন হাফলং, হাইলাকান্দি ও করিমগঞ্জের 'বিবেকানন্দ শিশু সংঘ' নামে তিনটি প্রতিষ্ঠানের শিশুরা। ১১ই মার্চ দুপুরে প্রায় সাত হাজার ভক্ত বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছেন।

পরবর্তী তিন দিন আশ্রম-প্রাঙ্গণের জনসভায় শ্রীশ্রীমা, স্বামীজী এবং ঠাকুরের জীবনী ও উপদেশ আলোচনা করেন স্বামী নিরাময়ানন্দ, স্বামী প্রভানন্দ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ এবং অখিল ভারত বিবেকানন্দ যুব মহামণ্ডলের সেক্রেটারী শ্রীনবনীহরণ মুখোপাধ্যায়। তাঁহাদের সুচিন্তিত ভাষণ শত শত শ্রোতার মনে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীমা ও স্বামীজী সম্বন্ধে নব চেতনার সঞ্চার করিয়াছে। ইহা ছাড়া 'কথামৃত'-পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং নারীশক্তিসংঘ-আয়োজিত সভায় নবনীহরণবাবুর ভাষণ অন্যতম আকর্ষণ ছিল। উৎসবের শেষের তিন দিন বদরপুরের শ্রীঅনিলকৃষ্ণ বানার্জি কর্তৃক শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাগীতি শ্রোতাদের আনন্দ দান করে। দ্বিতীয় দিন পুরস্কারবিতরণী সভায় সভানেত্রীত্ব করেন স্থানীয় রবীন্দ্রসদন গার্লস কলেজের অধ্যক্ষা শ্রীমতী মুক্তিশ্রী ঘোষ।

কাঁথি শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৩৮তম জন্মতিথি-উৎসব ৬ই, ৮ই, ৯ই এবং ১০ই মার্চ নিম্নোক্ত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া উদ্‌যাপিত হইয়াছে।

প্রথম দিন ৬ই মার্চ সকাল ৫টায় প্রভাতফেরী হয়। পূজা, পাঠ, হোমাদির পর প্রায় চারি শত ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করেন। অপরাহ্ণে আয়োজিত সভায় শ্রীতারাপদ মাইতির সভাপতিত্বে অধ্যাপক শিশিরকুমার দাস ও শিক্ষক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বেরা 'কল্পতরু শ্রীরামকৃষ্ণ' বিষয়ে বক্তৃতা দেন। ৮ই প্রাতে কাঁথির অখিল ভারত বিবেকানন্দ যুবমহামণ্ডল, নিবেদিতা ব্রতী সংঘ এবং রাষ্ট্রীয় কল্যাণ আশ্রম কর্তৃক নগরপরিক্রমা, অপরাহ্ণে শ্রীরামকৃষ্ণলীলাগীতির অনুষ্ঠান এবং পরে শ্রীরামেশ্বর পণ্ডার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় 'শ্রীরামকৃষ্ণের মানবধর্ম' সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ এবং শ্রীজ্ঞানদাকান্ত মিশ্র। ৯ই মার্চ সকালে ভজন-কীর্তনের পর নরেন্দ্রপুর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের শ্রীঅখিল দাস কর্তৃক সঙ্গীতানুষ্ঠান এবং এবং অপরাহ্ণে মহকুমাশাসক শ্রীআদিত্যচন্দ্র কোলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় 'শ্রীশ্রীমার আবির্ভাবের বৈশিষ্ট্য' সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন স্বামী লোকেশ্বরানন্দ এবং শ্রীজ্যোতির্ময় নন্দ। গায়ক শ্রীনন্দলাল দেবনাথের একটি বাউল গানের পর মেদিনীপুর পশ্চিমবঙ্গ পাবলিসিটি ভ্যান কর্তৃক 'যুগদেবতা' সবাকৃচিত্রপ্রদর্শন ঐ দিবসের শেষ অনুষ্ঠান। ১০ই মার্চ বেলা ১২টা হইতে ৩টা পর্যন্ত প্রায় চারি সহস্র দরিদ্রনারায়ণসেবার পর বেলা ৩॥ টায় শ্রীজ্যোতির্ময় নন্দ বেদান্ততীর্থ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং স্বামী লোকেশ্বরানন্দ মহারাজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় 'তরুণদের প্রতি স্বামী বিবেকানন্দ' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন অধ্যাপক স্নেহাংশু সরকার, শ্রীবসন্তকুমার দাস। সভান্তে প্রবন্ধ ও বক্তৃতা-প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরিত হয়। পরে শ্রীনন্দলাল দেবনাথ কর্তৃক বাউল গান পরিবেশিত হয়।

কার্যবিবরণী

সেণ্ট লুই (St. Louis, Missouri 63105, U. S.) বেদান্ত সোসাইটির এপ্রিল ১৯৭১ হইতে মার্চ ১৯৭২ খৃষ্টাব্দের কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। কেন্দ্রাধ্যক্ষ স্বামী সৎপ্রকাশানন্দ রবিবার সকালে ও মঙ্গলবার সন্ধ্যায়

সোসাইটির উপাসনামন্দিরে উপাসনা-অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। রবিবারে তিনি বিভিন্ন ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে বলেন, মঙ্গলবারে ধ্যান শিক্ষা দেন ও গীতা ব্যাখ্যা করেন। বিশেষ দিনের অনুষ্ঠানে ভক্তিমূলক গান ও চলচ্চিত্র পরিবেশিত হয়। সভাগুলি সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত। সোসাইটির সভ্য ও বন্ধুবর্গ ছাড়া বিভিন্ন গীর্জা, বিশ্ববিদ্যালয়, ও স্কুলকলেজ হইতে শ্রোতৃবর্গ সমবেত হন। প্রত্যেক মাসের প্রথম বৃহস্পতিবারে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত (Gospel of Sri Ramakrishna) ব্যাখ্যাত হয়।

গ্রীষ্মাবকাশের সময় স্বামী সৎপ্রকাশানন্দের টেপ-রেকর্ড-করা বক্তৃতা শোনানো হইয়া থাকে। ক্যানসাস শহরেও বেদান্ত সোসাইটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতেছে।

পূজাদি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধদেব, শঙ্করাচার্য, শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী, স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী শিবানন্দের জন্মতিথি উদ্‌যাপিত হয়। গুড ফ্রাইডে, দুর্গাপূজা ও অন্যান্য পর্বদিনের সুষ্ঠু অনুষ্ঠানও উল্লেখযোগ্য।

স্বামী সৎপ্রকাশানন্দ চিকাগোয় অনুষ্ঠিত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। বিভিন্ন সময়ে সেণ্ট লুই বেদান্ত-কেন্দ্রে আসেন স্বামী প্রবুদ্ধানন্দ, স্বামী রঙ্গনাথানন্দ ও স্বামী ভাষ্যানন্দ এবং ভাষণ দেন; তাঁহাদের বক্তৃতার বিষয় ছিল যথাক্রমে: 'সর্বদা ঈশ্বরচিন্তা', 'আধ্যাত্মিক উন্নতির স্তর', বর্তমান যুগ ও যুবসমাজ'।

নভেম্বর ও ডিসেম্বরে বিভিন্ন স্কুল-কলেজে সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

স্বামী সৎপ্রকাশানন্দ প্রায় ৩০০ আগ্রহশীল ব্যক্তিকে ধর্মোপদেশ দেন। ভারত ও আমেরিকার বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি সোসাইটিতে আগমন করেন। সোসাইটির গ্রন্থাগারটির উপযুক্ত ব্যবহার হইতেছে। বেদান্ত-সম্বন্ধে সোসাইটি হইতে প্রকাশিত পুস্তিকাগুলি শ্রোতৃবর্গ ও দর্শকগণের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

কানপুর রামকৃষ্ণ মিশন (রামকৃষ্ণনগর, কানপুর-১২) আশ্রমের ১৯৭১-৭২ খৃষ্টাব্দের কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে।

১৯২০ খৃষ্টাব্দে কানপুরে রামকৃষ্ণ মিশনের যে কেন্দ্রটির সাধারণভাবে সূচনা, তাহাই সকলের সমবেত সহযোগিতায় বর্তমানে এই নগরের অন্যতম মুখ্য জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত।

অধ্যাত্মসংস্কৃতি শিক্ষা ও সেবা—ত্রিধারায় পরিচালিত এই কেন্দ্রের কর্ম।

নিয়মিত পূজা উপাসনা ভজনাদি, প্রতি রবিবার ধর্মালোচনা, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব শ্রীশ্রীমা-সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব এবং অন্যান্য পুণ্যতিথির সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপন, শ্রীশ্রীকালী-পূজা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী স্মৃতি গ্রন্থাগারের পুস্তকসংখ্যা ৩,৫৫০, পঠনার্থে প্রদত্ত পুস্তকসংখ্যা ২,৩৭০। পাঠাগারে ৮টি সংবাদপত্র ও ৫৯খানি সাময়িক পত্রিকা লওয়া হয়। গ্রন্থাগারের দৈনিক উপস্থিতি ৩৭।

সুপরিচালিত উচ্চ-মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ১৯৭১-৭২ খৃষ্টাব্দের ছাত্রসংখ্যা ৬৮৮; পরীক্ষোত্তীর্ণ শতকরা ৯৭.৩ জন, ২৪ জন মেধাবৃত্তিপ্রাপ্ত। খেলাধুলা, স্বাস্থ্যচর্চা, পড়াশুনা, নিয়মানুবর্তিতা প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়। বিজ্ঞান-ভবন, কলাভবন, গ্রন্থাগার প্রভৃতি বিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকমহাশয়গণ কর্তৃক যোগ্যতার সহিত পরিচালিত।

আউটডোর দাতব্য চিকিৎসালয়ে অ্যালোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক—উভয়মতেই চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। আলোচ্য বর্ষে মোট চিকিৎসিতের সংখ্যা ২,৪৫,০৫৩; সাধারণ অস্ত্রোপচার ও

ইঞ্জেক্‌শনের সংখ্যা যথাক্রমে ৪২২ ও ১৬,৬৬৮।

ল্যাবরেটরি ও এক্স-রে বিভাগের কার্য প্রয়োজনানুযায়ী যথাযথভাবে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। আলোচ্য বর্ষে এক্স-রে বিভাগে পরীক্ষিত রোগীর সংখ্যা ১৭৬।

রামকৃষ্ণ মিশন স্টুডেন্টস্ হোম (বেলঘরিয়া, কলিকাতা-৫৬): তরুণ বিদ্যার্থীদের শরীর-মনের সুষমবিকাশ-সাধনে প্রকৃত মানুষ করিয়া তোলার উদ্দেশ্যে বিদ্যার্থী আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে। তদবধি এই প্রতিষ্ঠান স্বীয় উদ্দেশ্য অব্যাহত রাখিয়া নিষ্ঠা ও যোগ্যতার সহিত কর্মরত রহিয়াছে। ১৯৭১-৭২ খৃষ্টাব্দের কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষের প্রারম্ভে স্টুডেন্টস্ হোমের ছাত্রসংখ্যা ৯২, তন্মধ্যে ৬৫ জন বিনা-খরচে, ৯ জন আংশিক ব্যয়ে এবং ১৮ জন বিদ্যার্থী ব্যয় বহন করিয়া অবস্থান করে। ২২ জন ছাত্র পরীক্ষার পর চলিয়া যায়; বর্ষশেষে ছাত্রসংখ্যা দাঁড়ায় ৮৪। প্রাক্-বিশ্ববিদ্যালয় ও ডিগ্রীকোর্স—উভয়ত্রই ছাত্রদের পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক। ৩৩ জন ছাত্রকে পরীক্ষার ফি-বাবদ আর্থিক সাহায্য দেওয়া হইয়াছিল। স্টুডেন্টস্ হোম গ্রন্থাগারের সুনির্বাচিত গ্রন্থসংখ্যা ৩,৪০০। ৪টি সংবাদপত্র রাখা হয়। টেক্সট বুক সেকশনে ২,৬১০ খানি পুস্তক আছে।

শ্রীশ্রীকালীপূজা, সরস্বতীপূজা, অন্নপূর্ণাপূজা প্রভৃতি মনোজ্ঞভাবে অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামীজীর জন্মতিথি এবং অন্যান্য পুণ্য দিনগুলি যথারীতি উদ্‌যাপন করা হইয়া থাকে। স্বামী ব্রহ্মানন্দ-স্মৃতি উৎসব এবং স্বাধীনতাদিবস, প্রজাতন্ত্রদিবস প্রভৃতি স্টুডেন্টস্ হোমের উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান।

রামকৃষ্ণ মিশন শিল্পপীঠের আলোচ্য বর্ষে ছাত্রসংখ্যা ২৫৩, তন্মধ্যে ৩০ জন সিভিল, ১৪৭ জন মেক্যানিক্যাল ও ৭৬ জন ইলেক্‌ট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়রিয়াং বিভাগের ছাত্র। শিল্পপীঠের একটি সুন্দর লাইব্রেরী আছে। এখানে শ্রীশ্রীবিশ্বকর্মা-পূজা আনন্দ ও উৎসাহ সহকারে অনুষ্ঠিত হয়।

স্বামী গুণাতীতানন্দের দেহত্যাগ

আমরা দুঃখের সহিত জানাইতেছি, বেলুড় মঠে গত ১১. ৩. ৭৩ তারিখে সকালবেলা স্বামী গুণাতীতানন্দ হৃদরোগে আক্রান্ত হইয়া দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার ৭৫ বৎসর বয়স হইয়াছিল। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘে যোগদান করিয়া বোম্বাই শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে সঙ্ঘের সেবায় ব্রতী হন। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দেই তিনি শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের নিকট মন্ত্রদীক্ষা এবং পরে এই বৎসরই তাঁহার নিকট হইতেই সন্ন্যাসদীক্ষা প্রাপ্ত হন। কয়েক বৎসর বোম্বাই আশ্রমে কাজ করার পর তিনি বেলুড় মঠে আসিয়া অবসর-জীবন যাপন করিতেছিলেন। সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ও শাস্ত্রপাঠে বিশেষ অনুরাগী ছিলেন তিনি। তাঁহার দেহনির্মুক্ত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণচরণে শাশ্বত শান্তি লাভ করিয়াছে।

বিবিধ সংবাদ

আলিপুরদুয়ার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ১৬ ১২. ৭২ তারিখ শ্রীশ্রীমায়ের, ২৫ ১. ৭৩ তারিখে স্বামীজীর ও ৬. ৩. ৭৩ তারিখে শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব পূজা, পাঠ, ভজন ও প্রসাদ-বিতরণাদির মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

৬ ৩. ৭৩ তারিখে সকলকে বসাইয়া প্রসাদ দেওয়া হয়। এইদিন সন্ধ্যার পর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতপাঠ ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাগীতি হইয়াছিল।

পাণ্ডু বিবেকানন্দ পাঠচক্রে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের ১৩৮তম শুভ জন্মোৎসব গত ৬ই মার্চ হইতে ১২ই মার্চ পর্যন্ত ৬ দিন ধরিয়া অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

৬ই মার্চ শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মতিথির দিন প্রত্যূষে মঙ্গলারাত্রিক দ্বারা উৎসবের সূচনা হয়। তারপর সকাল ৮ ঘটিকায় শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা, পাঠাদির পর মধ্যাহ্নে অসমিয়া লোকগীতি (বরগীত) ও সন্ধ্যারতির পর স্থানীয় শিল্পীরা কালীকীর্তন করেন। দ্বিপ্রহরে সমাগত প্রায় ৮,০০০ ভক্ত বসিয়া খিচুড়ি-প্রসাদ গ্রহণ করেন।

পরবর্তী তিনদিন স্থানীয় ভক্তদের দ্বারা শ্রীশ্রীঠাকুর ও মায়ের লীলাগীতি এবং কাছাড় হইতে আগত কীর্তনীয়াগণ দ্বারা কীর্তন পরিবেশিত হয়। স্বামী প্রণবাত্মানন্দ একদিন ছায়াচিত্রযোগে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিষয় আলোচনা করেন।

১০ই মার্চ শ্রীশ্রীমায়ের বিষয় আলোচনার জন্য একটি মহিলাসভার আয়োজন করা হয়। ঐ সভায় গৌহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা শ্রীযুক্তা নীলিমা দত্ত অসমিয়া ভাষায় ও নেতাজী বিদ্যাপীঠ (পাণ্ডু) স্কুলের শিক্ষয়িত্রী শ্রীযুক্তা অঞ্জলি চক্রবর্তী বাংলাতে বক্তৃতা করেন। ১২ই মার্চ স্বামী সৌম্যানন্দের সভাপতিত্বে এক ধর্মসভার আয়োজন করা হয়। স্বামী প্রণবাত্মানন্দ ও সভাপতি বাংলাতে এবং গৌহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর ডি. বি. মিশ্র, ডক্টর আর. সি. আওয়াস্তি ও পূর্বোত্তর সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রীএন. এন. টেণ্ডন ইংরাজীতে শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজীর বিষয় আলোচনা করেন।

আরারিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মোৎসব গত ১০ই হইতে ১৩ই মার্চ পর্যন্ত অষ্টপ্রহর নাম-সংকীর্তন, নারায়ণ-সেবা ও ধর্মসভাদির মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয়। সভায় স্বামী রুদ্রাত্মানন্দ ও স্বামী অমৃতত্বানন্দ শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী শ্রুতিমধুর ভাষায় আলোচনা করেন। এই উপলক্ষে বারাসতের শ্রীঅতুলকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের 'প্রহ্লাদচরিত্র' ও 'মহিষমর্দিনী' পালাকীর্তন চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। ১৯৭২ খৃষ্টাব্দে আশ্রম কর্তৃক চিকিৎসিত (হোমিও) রোগীর মোট সংখ্যা ছিল ৩৭,৯৪৩। এতদ্ব্যতীত একটি ছাত্রাবাস ও একটি পুস্তকালয় আশ্রম কর্তৃক পরিচালিত হইতেছে।

দিনহাটা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের উদ্যোগে গত ১৬ই ১৭ই ও ১৮ই মার্চ স্থানীয় চওড়াহাট কালী-বাড়ীতে বিশেষ পূজা, পাঠ, ভজন প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। মধ্যাহ্নে প্রায় এক হাজার ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতিকৃতিসহ এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। প্রধান অতিথিরূপে ভাষণ দেন স্বামী

রুদ্রাত্মানন্দ। ছায়াচিত্রে শ্রীশ্রীঠাকুর-স্বামীজীর চিত্র প্রদর্শন ও বক্তৃতা করেন শ্রীযোগেশচন্দ্র দাস। অখিল ভারত বিবেকানন্দ যুব মহামণ্ডল (ময়নাগুড়ি শাখা) 'বিবেকানন্দ লীলাগীতি' পরিবেশন করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবন ও বাণী সম্বলিত একটি প্রদর্শনী খোলা হইয়াছিল।

ডিহিবাগান (হুগলী) শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসঙ্ঘের উদ্যোগে ২৫শে মার্চ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৩৮তম জন্ম-উৎসব বিশেষ সমারোহের সহিত উদ্‌যাপিত হয় প্রাতে শ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা, ভক্তিমূলক গান এবং দরিদ্রনারায়ণ-সেবা হইয়াছিল। অপরাহ্নে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়, ইহাতে সভাপতিত্ব করেন স্বামী রমানন্দ। সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীজয়দেব চক্রবর্তী। এই জনসভা যুব ও তরুণদের মধ্যে বিশেষ প্রেরণা জাগায়।

মন্দির-প্রতিষ্ঠা

নিউ বঙ্গাইগাঁও শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে গত ৫.২.৭৩ তারিখে নবনির্মিত শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরের প্রতিষ্ঠাকার্য বিশেষ পূজাদি, ধর্মসভা প্রভৃতির মাধ্যমে সুসম্পন্ন হইয়াছে। মালদহ, জলপাইগুড়ি ও গৌহাটি হইতে বেলুড় মঠের সাধুরা এই শুভ অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীমা, স্বামীজী ও শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মতিথি-উৎসব যথারীতি পালিত হইয়াছে।

পরলোকে

কালীকান্ত মুখোপাধ্যায়

গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি, শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, কদমকুয়া (পাটনা)-নিবাসী শ্রীকালীকান্ত মুখোপাধ্যায় গত ৫ই মার্চ সকাল ১০-৩০ মিঃ-এ ৭৮ বৎসর বয়সে সজ্ঞানে পরলোকগমন করিয়াছেন। অতি অমায়িক ও সরল প্রকৃতির ছিলেন তিনি।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, তিনি শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজকে এলাহাবাদ হইতে তাঁহাদের পাটনার বাড়িতে লইয়া গিয়াছিলেন শুনিয়া স্বামী শিবানন্দ মহারাজ লিখিয়াছিলেন, 'কালীকান্তের বাহাদুরি আছে, সুমেরু নাবিয়ে এনেছে', কারণ ইহার পূর্বে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ কাহারও বাড়ি যাইতেন না।

শ্রীরামকৃষ্ণচরণে তাঁহার আত্মার শান্তি প্রার্থনা করি।

ডাক্তার মদনমোহন সাহা

গত ২৮শে ফাল্গুন, ১৩৭৯ (১২.৩.৭৩) ডাক্তার মদনমোহন সাহা ৭৪ বৎসর বয়সে সজ্ঞানে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। কর্মজীবনে কৃতী পুরুষ ডাক্তার মদনমোহনের চরিত্রে ভক্তি-শ্রদ্ধা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। কলিকাতা করপোরেশনে অ্যানালিস্ট হিসাবে ও স্বাধীনভাবে চিকিৎসার ক্ষেত্রে তিনি সুনাম অর্জন করিয়াছিলেন। বেলুড় মঠের পরিচালনাধীন চিকিৎসালয়ে, দেওঘর বিদ্যাপীঠে ও বৃন্দাবন সেবাশ্রমে তিনি কয়েক বৎসর চিকিৎসক ছিলেন। তাঁহার বিদেহী আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক।

উদ্বোধন, ১ম বর্ষ (৬ষ্ঠ সংখ্যা)

[পুনর্মুদ্রণ]

আচার্য্য শঙ্কর ও মায়াবাদ।

(পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ লিখিত।)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

আচার্য্য শঙ্করের জীবন-বৃত্ত অবলম্বন করিয়া বিরচিত দুইখানি গ্রন্থ অনেকদিন হইতে দেশে প্রচলিত আছে। এই দুইখানি গ্রন্থই শঙ্কর-দিগ্বিজয় নামে বিখ্যাত। সর্ব্ব-দর্শন-সংগ্রহ-প্রণেতা বেদভাষ্যকার মাধবাচার্য্য একখানি দিগ্বিজয়ের প্রণেতা আর একখানির প্রণেতা অনন্তানন্দ-গিরি। এই দুই গ্রন্থকারের মধ্যে কেহই আচার্য্যের সমসাময়িক ছিলেন না। ইহা ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তিগণের নিকট অবিদিত নহে। এ প্রকার অবস্থায় আচার্য্যের জীবন-বৃত্তান্ত-লেখক এই দুইজন গ্রন্থকারের মধ্যে যদি কোন প্রকার অসহনীয় মতবিরোধ না থাকিত, তাহা হইলে ইঁহাদের বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিতে কোন বাধা থাকিত না।

দুঃখের বিষয়, এই দুইখানি গ্রন্থের মধ্যে পরস্পর এতই বিরোধ দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহাতে কোন গ্রন্থের দ্বারা আচার্য্যজীবনের ঐতিহাসিক অথচ অনুশীলনের যোগ্য ঘটনাগুলি বুঝিবার আশা স্বতঃই ক্ষীণ হইয়া পড়ে।

প্রকৃত কথা এই যে, মাধবাচার্য্য ও অনন্তানন্দগিরি উভয়েই প্রগাঢ় দার্শনিক ও সুলেখক ছিলেন। উভয়েই আচার্য্য-প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিয়া সন্ন্যাস পর্য্যন্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন। এ ক্ষেত্রে ইহা স্থির যে, আচার্য্য শঙ্কর এই উভয় গ্রন্থকারের হৃদয়ে উপাস্য দেবতার স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। একান্তে আচার্য্য শঙ্করের ভাবগম্ভীর অথচ সুকোমল ভাষ্যের রসাস্বাদ করিবার জন্য এই দুই মহাপুরুষই সংসারসুখের মায়া কাটাইয়া পর্ব্বতে, অরণ্যে বা নির্জ্জন তীর্থক্ষেত্রে জ্ঞানময় জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। এরূপ স্থলে দিগ্বিজয় দেখিয়া আচার্য্য-জীবনের গূঢ়তত্ত্ব-সকলের উদ্ভেদ করিবার চেষ্টা অনেকে করিয়া থাকেন। দুঃখের বিষয়, তাঁহাদের চেষ্টা সফল হয় না।

এই কারণে অনেকেই এই দুইখানি গ্রন্থকেই ঐতিহাসিক চরিত্র অবলম্বনে লিখিত মুদ্রারাক্ষস, রত্নাবলী প্রভৃতি সাহিত্যশ্রেণীর মধ্যে নিবেশিত করেন। আমার বিবেচনায় দিগ্বিজয়দ্বয়কে একেবারে উপেক্ষা না করিয়া যে যে অংশে ঐ দুইখানি গ্রন্থের ঐকমত্য আছে, সেই অংশ হইতে বিশ্বাসযোগ্য বিষয়গুলি সংগ্রহ করিলে যতটুকু সাহায্য পাওয়া সম্ভবপর, তাহার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করাও ঠিক নহে। তাই বলি, শঙ্কর-দিগ্বিজয়ের উপর ঐকান্তিক নির্ভর না করিয়া অন্য কোন নির্ভরযোগ্য পথ অবলম্বন করিয়া আচার্য্য শঙ্করের জীবন-রহস্যের উদ্ভেদ করিবার জন্য প্রযত্নই এক্ষণে শ্রেয়স্কর বলিয়া বোধ হয়। সেই পথ কি ?

সকলেই জানেন, আচার্য্য শঙ্কর অনেকগুলি ভাষ্য প্রনয়ন করিয়াছেন। আনন্দ-লহরী বা মোহমুদ্গরশ্রেণীর যে কয়খানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থ আচার্য্যের নামে প্রচলিত আছে, তাহার দ্বারা

আচার্য্যজীবনের রহস্য-উদ্ঘাটন করিতে প্রযত্ন করাও নিষ্ফল। এইজন্য সেইদিকেও অগ্রসর না হইয়া শাঙ্করভাষ্য নামে প্রখ্যাত বার বা তেরখানি দার্শনিকতত্ত্বে পরিপূর্ণ গ্রন্থের দক্ষতাসহকারে পর্য্যবেক্ষণ করিলে আশা করা যায়, আচার্য্যজীবনের অনেক জ্ঞাতব্য তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইতে পারে।

দশখানি উপনিষদ্‌ভাষ্য, গীতাভাষ্য ও শারীরক সূত্রভাষ্য এই কয়খানি গ্রন্থই যে আচার্য্য-প্রণীত, এ বিষয়ে এক্ষণে কেহই সন্দেহ করেন না। আমি বলি, এই কয়খানি গ্রন্থের গভীর লক্ষ্যের দিকে মনোনিবেশ করিলে ধীর ও চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারিবেন যে, আচার্য্য শঙ্কর কি প্রকার অবস্থায় এই দেশে আবির্ভূত হইয়া সামাজিক শোচনীয় অবনতির চরম সীমায় অবস্থিত স্বজাতির পুনরুদ্ধারের পথ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

ম্যাট্‌সিনি, ওয়াশিংটন বা গ্যারিবল্ডির মত অগণ্য মানবের শোণিতস্রোতে ধরিত্রী প্লাবিত করিয়া রণভেরীর ভয়ঙ্কর নিনাদে দিগ্‌ দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে স্বজাতি-গৌরবের বিজয়পতাকা উড়াইবার জন্য আচার্য্য শঙ্কর এদেশে আবির্ভূত হন নাই। পরাজিত জাতির স্বাধীনতা ও আত্মাভিমানের শ্মশানক্ষেত্রে শোণিতপিপাসু পঙ্গপালের মত অগণিত সৈন্যের সাহায্যে জাতীয় গৌরবের জাজ্বল্যমান অভিনয় দেখাইবার জন্য আলেকজাণ্ডার, পম্‌পী সীজর বা নেপোলিয়নের ন্যায় দুরন্তবাসনা আচার্য্য শঙ্করের হৃদয়াকাশে কোন দিনও জাগিয়া উঠে নাই। নিরপরাধ প্রতিবেশীর বক্ষঃস্থলে শাণিত খড়্গ প্রবেশ করাইয়া ঈশ্বরের আজ্ঞাপালনের ফলে অনুগত ভক্তগণের জন্য স্বর্গের দ্বার উদ্ঘাটন করিবার জন্য আচার্য্য শঙ্কর একবারও প্রয়াস পান নাই।

অথচ আচার্য্য শঙ্কর যাহা করিয়া গিয়াছেন, মানবজাতির উপকার করিবার জন্য অবতীর্ণ কোন মহাপুরুষ যে তাহা অপেক্ষা অধিক কিছু করিয়াছেন বা কোনকালে করিবেন, আমি তাহা বিশ্বাস করি না। কেন যে বিশ্বাস করি না, তাহা বলি।

এই যে হিন্দুসমাজ, বিরাট, বিচিত্র—অনাদি অথচ অনন্ত—ভারতের ভাগ্যচক্রের এই ভীষণ পরিবর্তনের দিনে এই হিন্দুসমাজ এক্ষণেও যে সমাজনামে ব্যবহৃত হয়, সহস্র বৎসর হইতে বিদেশীর পাদুকা মস্তকে বহিতে বহিতে দুর্ব্বল, ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় অস্থির, অবিবেকে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়াও যে এই হিন্দুসমাজ এক্ষণেও হিন্দুয়ানি ভুলে নাই, জাতীয় স্বাধীনতা, উচ্চ শিক্ষা, বৈদেশিক বাণিজ্য হারাইয়া শাকান্নের উপর নির্ভর করিয়া দিনযাপন করিতে করিতে এক্ষণেও যে বেদের নামে মস্তক অবনত করে, প্রাচীন আত্মগৌরবের কথা ভাবিতে ভাবিতে বর্ত্তমান ভুলিয়া যায়, পরস্পরের মধ্যে রাগ, দ্বেষ, ঈর্ষ্যা, হিংসা প্রভৃতির অবিশ্রান্ত কার্য্যকারিতার প্রভাবে জ্বালাতন হইয়াও যে এই হিন্দুসমাজ এক্ষণেও হিন্দু নাম শ্রবণে স্বপ্নের ন্যায় ছায়াময় একতার ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হয়, এখনও যে এই হিন্দুসমাজ অতীত আত্মগৌরবের কথা ভাবিতে ভাবিতে বর্তমান বিস্মৃত হইয়া আশা মায়াবিনীর অপরিস্ফুট আশ্বাসবাক্যে যাহা হারাইয়াছে, আবার তাহা পাইবার জন্য মধ্যে মধ্যে বহুদিনের শিথিল একতাবন্ধনকে দৃঢ় করিবার উদ্যোগ করিয়া থাকে, ইহার কারণ অন্বেষণ করিবার জন্য যাঁহারা প্রয়াস করেন, আমি তাঁহাদের অনুরোধ করি, যেন তাঁহারা নিবিষ্টচিত্তে আচার্য্য শঙ্করের জীবন-বৃত্তান্তের অনুশীলন করেন।

আচার্য্যের নিজের লিপি হইতে যে সকল প্রমাণ আমরা পাইয়াছি, তাহারই দ্বারা আমরা প্রতিপন্ন করিব যে, বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের সহিত আচার্য্য শঙ্করের জীবন এত আবশ্যকীয়

সম্বন্ধে সম্বন্ধ যে, তাহা দেখিলে আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি যে, হিন্দুসমাজ বলিলে এক্ষণে যাহা বুঝায়, তাহার প্রকৃত নেতৃত্ব করিবার জন্য যদি কেহ উপযুক্ত পাত্র জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি আচার্য্য শঙ্কর ব্যতীত যে আর কেহই নহেন, তাহা স্থির। এই বিষয়টী বুঝিতে হইলে আচার্য্য শঙ্করের আবির্ভাব সময়ে এদেশের আদিবাসিগণের সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে জানা একান্ত আবশ্যক বিবেচনায় আমরা অগ্রে সেই বিষয়ে প্রবৃত্ত হইব। (ক্রমশঃ)

—০—

স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান।

ভূমিকা।

(ডাক্তার শশিভূষণ ঘোষ লিখিত)।

শাস্ত্র-মর্ম্ম অবধারণ-পূর্ব্বক কোন বিষয়ের সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া বড়ই কঠিন। কি সামাজিক আচার-পদ্ধতি, কি দার্শনিক তত্ত্ব, কি ধর্ম্ম-মীমাংসা কোন বিষয়ে সকল শাস্ত্রের একমত পাওয়া যায় না। যখনই কোন সমাজ-সংস্কারক বা ধর্ম্মপ্রচারক শাস্ত্রোক্তি উদ্ধার-পূর্ব্বক নিজ মত শাস্ত্রসঙ্গত বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, অমনি বিরুদ্ধমতাবলম্বিগণ স্বীয় মতানুরূপ উক্তিসকল প্রদর্শন করিয়া তাহা খণ্ডন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। কি করিলে শরীর সুস্থ থাকে, অকাল মৃত্যু নিবারিত হয়, দীর্ঘজীবন লাভ করা যায়, রোগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় মানবের প্রথম আবশ্যকীয় স্বাস্থ্যবিধি বিষয়েও বিভিন্ন ও বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার কারণ কি? এরূপ অনুমান হয় যে, সমাজ-জীবনের ও ধর্ম্ম-জীবনের বিভিন্ন অবস্থায় এই সকল বিভিন্ন সিদ্ধান্তের উপযোগিতা ছিল। সমাজ ও ধর্ম্মজ্ঞানের পরিবর্ত্তন ও উন্নতি বা অবনতি-বশতঃ এখন এই সকল সিদ্ধান্ত পরস্পর-বিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হয়। ইতিহাসপাঠে জানা যায়, পৃথিবীর কোন জাতি চিরকাল অপরিবর্ত্তনীয় থাকে নাই। উন্নতি বা অবনতির সঙ্গে তাহাদের আচার, জ্ঞানশিক্ষা ও ধর্ম্মনীতির পরিবর্ত্তন হইয়াছে। হিন্দুসমাজ এ প্রাকৃতিক নিয়মের বহির্ভূত নহে।

সকল অসভ্য জাতির সাধারণ বিশ্বাস—ক্রূর-স্বভাব প্রেতাত্মা, জীবিতদিগের দেহে প্রবেশ করিয়া নানাবিধ শারীরিক বিকার উৎপাদন করে। পৃথিবীর অন্যান্যদেশীয় অসভ্যজাতির ন্যায় ভারতবর্ষের গারো, খন্দ, সাঁওতাল, কোল প্রভৃতিরা পশুবলি ও তাণ্ডব নৃত্যাদি দ্বারা এইসকল রোগের প্রতিকার হয়, বিশ্বাস করে। হিন্দু-সমাজে অশিক্ষিত নিম্নশ্রেণীর মধ্যে ঠিক এইরূপ বিশ্বাস বদ্ধমূল। উন্মত্ততা, অজ্ঞানাবস্থায় আক্ষেপ, জ্বরকালীন প্রলাপ প্রভৃতি লক্ষণ প্রেতযোনিকৃত বলিয়া অবধারিত হয় এবং ওঝা ভিষকের স্থান গ্রহণ করে। অনেক স্নায়বীয় পীড়ার কারণ নির্দ্দেশে অসমর্থ হইয়া বৈদ্যকগ্রন্থকারগণ সে সকল ভূতযোনিকৃত বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। অল্পশক্তি প্রেতাত্মা ব্যক্তি-বিশেষেই রোগ সঞ্চার করিতে সমর্থ হয়, কিন্তু প্রভূতশক্তিশালী দেবদেবীর কোপে বহু লোক একরূপ পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া থাকে। পীড়ার যথার্থ কারণানভিজ্ঞ লোকের এরূপ সিদ্ধান্ত অতি স্বাভাবিক। পূজা, বলি, স্তবপাঠ, স্বস্ত্যয়নাদি ভিন্ন দেব-কোপ আর কিসে উপশম হইতে পারে? এই নিমিত্ত "ভীমস্ত্রিপাদস্ত্রিশিরঃ ষড়ভুজো নবলোচনঃ" জ্বরদেবতার কোপপ্রশমনার্থ পূজা

বলিদানাদির ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়, এবং যে মহাদেবীর ইচ্ছায় ভীষণ বসন্তরোগ দেশ ব্যাপিয়া রহিয়াছে, তিনি বিবিধ নামে, বিভিন্ন মূর্ত্তিতে সভ্য ও অসভ্য জাতির ভিতর নানাভাবে পূজিত হইতেছেন। কিন্তু যে মহামারী সমাগমে—

হাহাকারা তথোর্ব্বী মনুজভয়করী ফেরুরাবৈশ্চ ভীমৈঃ।

শূন্যগ্রামা ভবেয়ুর্নরপতিরহিতা ভূরিকঙ্কালমালা॥

সংঘটিত হয়, তাহা সৃষ্টি করিতে মহাপ্রভাববান্‌, পৃথিবীব্যাপী শক্তিসঞ্চারকারী, প্রত্যক্ষ অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষাদি বিপৎপাতের কারণ-স্বরূপ দেবশ্রেষ্ঠ সূর্য্য-চন্দ্রাদি গ্রহগণের শুভাশুভ দৃষ্টি ভিন্ন আর কাহারও সাধ্য নাই। পূর্ব্বের বিচারপ্রণালী অবলম্বন করিয়া এইরূপ কারণ-অবধারণও স্বাভাবিক বোধ হয়। ক্রমবিকাশের নিয়মাধীনে মানব, জ্ঞানবিস্তারের সহিত অবশেষে এই উচ্চতম সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয় যে, অল্পশক্তি অসংখ্য প্রেতযোনি, প্রভূতশক্তি দেবযোনি ও দেবশ্রেষ্ঠ সূর্য্যচন্দ্রাদিরও নিয়ন্তা এক অপরিমিতশক্তি বিধাতা আছেন। রোগ, মহামারী প্রভৃতি তাঁহারই ইচ্ছায় উপস্থিত হয়, তাঁহারই ইচ্ছায় নিবারিত হয়। প্রেতযোনি, দেবযোনি, গ্রহাদির শুভাশুভ তাঁহারই ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। অতএব রোগাদির হস্ত হইতে পরিত্রাণ মনুষ্যের আয়ত্তাধীন নহে। বিধাতার যাহা ইচ্ছা, তাহাই হয়। অদৃষ্টে যাহা লিখিত থাকে, তাহাই ঘটে। অদৃষ্টলিপি বিধাতৃকৃত। অস্মদ্দেশে সূতিকাগারে ষষ্ঠরাত্রে মসীলেখনী-সংস্থাপন এই বিশ্বাস-সম্ভূত। যাহা অদৃষ্টে লিখিত থাকে, যদি তাহাই সংঘটিত হয়, তাহা হইলে জরা, ব্যাধি, মড়কাদি নিবারণের চেষ্টা বৃথা; সুতরাং অদৃষ্টবাদীর শারীরিক ও মানসিক নিশ্চেষ্টতা অবশ্যম্ভাবী।

কিন্তু মনুষ্য সম্পূর্ণ অদৃষ্টবাদী ও নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারে না। মনুষ্যের অন্তরে ইচ্ছাশক্তি আছে। ইচ্ছাশক্তি-প্রেরিত হইয়া তাঁহাকে নানাবিধ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হয়, ক্রমশঃ কার্য্যদক্ষতা নিবন্ধন বহুদর্শিতা লাভ করেন। তিনি কার্য্যক্ষেত্রে দেখিতে পান, নির্ম্মল বায়ু-সেবন, পরিষ্কার জলপান, উপযুক্ত ও পরিমিত আহার দ্বারা শরীর সুস্থ থাকে। সুস্থ ও সবল শরীরে জরা সহজে প্রবেশ করিতে পারে না। তিনি বুঝিতে পারেন যে, আহার ও পানীয়দোষে অধিকাংশ রোগের উৎপত্তি হয়। সুতরাং, সিদ্ধান্ত করেন—সর্ব্বেষামেব রোগাণাং নিদানং কুপিতা মলাঃ। শরীরস্থ মল (বায়ু, পিত্ত, কফ) কুপিত হইয়া সমস্ত রোগের কারণ হয় এবং "বিবিধ অহিত সেবন" মলকোপের কারণ। এইরূপ যত্ন-সঞ্চিত বহুদর্শিতার ফলস্বরূপ স্বাস্থ্য-বিধির অমূল্য সত্যসকল ধর্ম্মশাস্ত্রাদিতে লিপিবদ্ধ আছে। শাস্ত্রবক্তা মহর্ষিগণ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন—

জরা চ ভ্রাতৃভিঃ সার্দ্ধং শশ্বদ্ ভ্রমতি ভূতলম্।

এতে চোপায়বেত্তারং ন গচ্ছন্তি চ সংযতম্।

পলায়ন্তে চ তং দৃষ্ট্বা বৈনতেয়মিবোরগাঃ॥

রোগসকল উপায়বেত্তার নিকট গমন করে না। গরুড়ের নিকট হইতে সর্পের ন্যায় তাহাকে দেখিয়া পলায়ন করে।

রোগের কারণ-নির্ণয় না হইলে তাহার নিবারণোপায় নির্ধারণ হইতে পারে না। এই নিমিত্ত রোগের যথার্থ তত্ত্ব যতই বোধগম্য হইতে থাকে, স্বাস্থ্য-বিধি ততই উৎকর্ষ লাভ করে। কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ পর্য্যালোচনা করিলে ইহা প্রতীয়মান হয় যে, কার্য্যের বাহিরে তাহার কারণ

অবস্থান করে না। কার্য্য কারণেরই রূপান্তর মাত্র। ইহা বিজ্ঞানসম্মত। * অনভিজ্ঞ লোকেই কার্য্যের বহির্দ্দেশে কারণের অনুসন্ধান করিতে যায়। অসভ্য জাতিরা প্রেতাত্মা প্রভৃতিতে রোগের কারণ নির্দ্দেশ করে। জ্ঞানের বিস্তারের সহিত দেহের ভিতর রোগের কারণ অনুসন্ধান আরম্ভ হয়। ক্রমে সূক্ষ্মদর্শী নিদানবেত্তার নিকট "কালান্তকযমোপমঃ" জ্বরদেবতার স্থান তজ্জনক দেহাভ্যন্তরীয় মন্দাগ্নি কর্তৃক অধিকৃত হয়।

জনকঃ সর্ব্বরোগাণাং দুর্ব্বারো দারুণো জ্বরঃ।
পিত্তশ্লেষ্মাসমীরাশ্চ প্রাণিনাং দুঃখদায়কাঃ॥

অস্মদ্দেশীয় সুশ্রুত, চরকাদি বৈদ্যক গ্রন্থাবলী এইরূপ সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি ও গভীর চিন্তাশীলতার ফল। এই সকল গ্রন্থে রোগের নিদান ও চিকিৎসা যেরূপ সবিস্তার আলোচিত হইয়াছে, স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে সেরূপ দেখা যায় না। অনেক বহুমূল্য স্বাস্থ্যবিধি এইসকল গ্রন্থের স্থানে স্থানে প্রসঙ্গক্রমে সন্নিবেশিত আছে বটে, কিন্তু ইহার সর্ব্বাঙ্গীণ আলোচনা নাই।

স্বাস্থ্যবিধির উপকারিতা সমাজের শিক্ষিত লোকেরাই অগ্রে উপলব্ধি করেন। ইহার তত্ত্বসকল প্রথমে ব্যক্তিবিশেষে আবদ্ধ থাকিয়া ক্রমে সমাজের উচ্চশ্রেণীর মধ্যে প্রচলিত হয়। মন্বাদি স্মৃতি-সংহিতা ও পুরাণসংহিতা শৌচ ও সদাচার-বর্ণনায় অনেক স্বাস্থ্যবিধি প্রচার করিয়া লোকদিগকে ধর্ম্মশাসনে বিধিপরায়ণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। মানব সংহিতায় উক্ত আছে;—অনারোগ্য-মনায়ুষ্যমস্বর্গ্যঞ্চাতিভোজনম্। অপুণ্যং লোকবিদ্বিষ্টং তস্মাৎ তৎ পরিবর্জ্জয়েৎ॥ অতিভোজন যেরূপ শরীর রোগাক্রান্ত করে, তদ্রূপ ইহা স্বর্গ ও ধর্ম্মেরও বিরোধী। কিন্তু শাস্ত্রকারগণ এইসকল নিয়ম ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণ ভিন্ন নিকৃষ্ট বর্ণের শিক্ষার জন্য কোন ব্যবস্থা করেন নাই। নিজেকে সুস্থ রাখিতে হইলে নির্ম্মল বায়ু, পরিশুদ্ধ জল, বিহিত আহার প্রভৃতি যেরূপ প্রয়োজনীয়, অধীনস্থ পরিজনবর্গ, পরিচারকগণ, পার্শ্বস্থ প্রতিবেশী, দেহরক্ষার্থ যাহাদের সহিত কোন সংস্রবে আসিতে হয়, সকলেই যাহাতে স্বাস্থ্যবিধি পালন করে, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখাও তদ্রূপ কর্ত্তব্য; কারণ, ইহারা অজ্ঞতা-নিবন্ধন স্বাস্থ্যবিধির বিপরীতাচরণ করিলে বায়ু, জল, আহারাদি বিকৃত হইয়া পীড়া উৎপাদন করিতে পারে। মনুষ্যদেহের ন্যায় সমাজ-শরীরের এক অঙ্গ ব্যাধিগ্রস্ত হইলে সমস্ত সমাজ পীড়িত হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত শাস্ত্রাদিতে স্বাস্থ্যবিষয়ক অনেক মহামূল্য সত্য নিবদ্ধ থাকিলেও এবং তাহা সমাজের একাঙ্গ কর্তৃক অনুষ্ঠিত হইলেও ভারতবর্ষ বসন্ত, বিসূচিকা প্রভৃতি পীড়ার নিবাসস্থান হইয়াছে।

শতবর্ষ অতীত হয় নাই, পাশ্চাত্য খণ্ডে স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের ব্যবস্থাসকল কার্য্যে পরিণত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু এই অল্পকালের মধ্যেই জরা, মৃত্যু সম্বন্ধে তথায় যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। শতবর্ষ পূর্ব্বে ইংলণ্ডে প্রতিসহস্র লোকের মধ্যে ৮০ জন প্রতিবৎসর মৃত্যুমুখে পতিত হইত।

* The explanation which is the outcome of the nature of the thing itself is a scientific explanation and any explanation which is entirely outside of the thing in question is unscientific.—Lectures on Practical Vedanta By Swami Vivekananda, London 1896

এক্ষণে মৃত্যুসংখ্যা ২০ জনেরও কম। ভারতবর্ষে ইংরাজ সৈন্তের নিম্নোদ্ধত মৃত্যু তালিকা এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছে—

১৮০০—১৮৩০ পর্য্যন্ত গড় মৃত্যুসংখ্যা প্রতি ১০০০ জীবিত মধ্যে ৮০.৬ ছিল।

১৮৩০ - ১৮৫৬ .... ৫৬৭ ...

১৮৯৭ সালে .... ১৫.০ হইয়াছে।

স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের এই মহামঙ্গলকর কার্য্য দেখিয়া কাহার মনে না আশার সঞ্চার হয়? বসন্ত, বিসূচিকা প্রভৃতি সকল প্রকার সংক্রামক ব্যাধি মনুষ্যসমাজ হইতে নির্ম্মূলিত হইতে পারে, স্বাস্থ্য-তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ বিশ্বাস করেন। বঙ্গদেশে প্রতিবৎসর প্রায় ১৮ লক্ষ লোক ম্যালেরিয়া, বিসূচিকা ও বসন্তরোগে কালগ্রাসে পতিত হয়। স্বাস্থ্যবিজ্ঞান এ সকলকে নিবার্য্য পীড়া আখ্যা প্রদান করিয়াছে, কারণ স্বাস্থ্যোন্নতির সহিত এসকল পীড়ায় মৃত্যুসংখ্যা সর্ব্বত্র হ্রাস হইয়াছে।

যদি স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের নিয়ম প্রতিপালন করিলে এই ভয়ানক অকাল-মৃত্যু কতকাংশেও নিবারিত হয় এবং নিবার্য্য পীড়াসকলের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক কষ্টের লাঘব হয়, তাহা হইলে এদেশীয় লোকের এবিষয়ে অমনোযোগিতা আত্মদ্রোহিতা ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? যদি অহিত ভোজন স্বর্গবিরোধী হয়, তাহা হইলে বিধি স্বাস্থ্যবিধির অহিতাচরণের নিমিত্ত লক্ষ লক্ষ অকাল মৃত্যু কি নামে অভিহিত হইবে? ঊনবিংশ শতাব্দীর অবসান সময়ে ভারতের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে ইউরোপখণ্ডের সেই মধ্যকালীন ঘোর অমানিশার কথা মানস-পথে উদিত হয়, যখন লোকধ্বংসকারী মহামারীর বিভীষিকাময়ী মূর্ত্তি তাহার সর্ব্বত্র বিচরণ করিত ও শতশত সমৃদ্ধ জনপদ লোকশূন্য করিয়া সেই মহাদেশ ভূরিকঙ্কালমালায় আবৃত করিয়াছিল। কোটি কোটি অর্থব্যয়ে কোটি কোটি জীবনের বিনিময়ে কর্ম্মপরায়ণ ইউরোপ যে শিক্ষালাভ করিয়াছে, সে তাহা কার্য্যে পরিণত করিয়া সুফল উপভোগ করিতেছে। অদৃষ্টপরতা নিবন্ধন শারীরিক ও মানসিক নিশ্চেষ্টতা এবং শিক্ষার অভাব এদেশে সকল প্রকার উন্নতি, বিশেষতঃ স্বাস্থ্য-উন্নতির বিষম অন্তরায় হইয়া রহিয়াছে। এক্ষণে শারীরিক ও মানসিক নিশ্চেষ্টতা পরিহার করিয়া বর্ণনির্ব্বিশেষে সৎশিক্ষার বিস্তার করা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। ইউরোপে স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের অনুশীলন আরম্ভ হইয়াছে মাত্র। এই অজানিত বিভাগের অল্পমাত্রই আবিষ্কৃত হইয়াছে, অনেক বিষয় এক্ষণে তমসাচ্ছন্ন। সর্ব্বদেশীয় প্রতিভাশালী সত্যান্বেষী পণ্ডিতগণের সমবেত অধ্যবসায় ও গবেষণার উপর ইহার অজ্ঞাত তত্ত্বসকলের মীমাংসা নির্ভর করিতেছে। কিন্তু যাহা জানা গিয়াছে, তাহাও উপেক্ষার বস্তু নহে। যাহাতে সেই সকল সত্য ধনী ও দরিদ্র, পণ্ডিত ও মূর্খ, উচ্চ ও নীচ সকলের হৃদয়ঙ্গম হয়, তাহার জন্য হৃদয়বান প্রত্যেকেরই মহতী চেষ্টা নিতান্ত আবশ্যক।

ধম্মপদ।

(বাবু চারুচন্দ্র বসু অনুবাদিত।)

ভূমিকা।

ভগবান শাক্যমুনি বুদ্ধ পঞ্চচত্বারিংশ বৎসর যাবৎ ভারতের নানা প্রদেশে যে অমৃতপ্রদ উপদেশ প্রদান করেন, তাহা পালি ভাষায় "ত্রিপিটক' নামে সুবৃহৎ ধম্মগ্রন্থে রক্ষিত আছে। ইহার ছত্রে ছত্রে বৌদ্ধ ভারতের অপূর্ব্ব কীর্ত্তি লক্ষিত হয়। একদিন যে ভারতভূমি জ্ঞানগরিমায় পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিল, ত্রিপিটক গ্রন্থ তাহার দৃষ্টান্তস্থল। ভিক্ষুপ্রবর শাক্যমুনি দুঃখজরাব্যাধিমরণসঙ্কুল জীবের মুক্তির জন্য যে প্রেমের ধম্ম জগতে প্রচার করেন, তাহা রত্নপ্রসূ ভারতভূমিরই উপযুক্ত। বৌদ্ধদর্শন, বৌদ্ধ মনোবিজ্ঞান ভারতের অপূর্ব্ব সামগ্রী। একদিকে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের দিগ্‌দিগন্ত বিভাসিত মহাজ্যোতি, আর একদিকে বুদ্ধদেবের অপূর্ব্ব প্রতিভা। এই দুই মহাশক্তির সম্মিলনে বৌদ্ধদর্শনের উৎপত্তি। ত্রিপিটক গ্রন্থ তিন ভাগে বিভক্ত। বিনয়, সূত্র এবং অভিধর্ম্ম। বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী, উপাসক ও উপাসিকামণ্ডলীর আচার ব্যবহার সম্বন্ধে সুবৃহৎ নিয়মাবলী বিনয়পিটকে, বৌদ্ধদর্শন—সূত্রপিটকে ও মনোবিজ্ঞান অভিধর্ম্মপিটকে বর্ণিত আছে। বিখ্যাত ধম্মপদগ্রন্থ সূত্রপিটকের অন্তর্গত ও ষড়্‌বিংশ অধ্যায়ে বিভক্ত। হিন্দুর নিকট শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা যেমন, খৃষ্টানদিগের নিকট বাইবেল গ্রন্থ যেমন, বৌদ্ধদিগের নিকট ধম্মপদও সেইরূপ। বুদ্ধদেবের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে রাজগৃহের বিশাল ধর্ম্মমঠে বুদ্ধশিষ্য মহাকাশ্যপের নেতৃত্বাধীনে যে মহাসমিতির অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতেই এই সুবৃহৎ ত্রিপিটক গ্রন্থ প্রথম সংগৃহীত হয়। বুদ্ধদেবের মৃত্যুর ঠিক একশত বৎসর পরে বৈশালির বিস্তীর্ণ সঙ্ঘারামে (মঠে) যে দ্বিতীয় বৌদ্ধ মহাসমিতি আহূত হয়, তাহাতে এই গ্রন্থ পরিবর্দ্ধিত হইয়া বর্ত্তমান আকারে পরিণত হয়। পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দের উৎসাহে ও অন্যান্য বন্ধুবর্গের সাহায্যে, এই সূত্রপিটকান্তর্গত ধম্মপদের বাঙ্গালা অনুবাদে প্রবৃত্ত হইলাম। গ্রন্থখানি পালিভাষায় লিখিত। অনুবাদে যদি কোন ত্রুটি হয়, আশা করি, পাঠকবর্গ মার্জ্জনা করিবেন।

ধম্মপদ।

যমকবগ্‌গ।

মনো পুব্বঙ্গমা ধম্মা মনোসেট্‌ঠা মনোমযা
মনসা চে পদুট্‌ঠেন ভাসতি বা করোতি বা।
ততো নং দুক্খমন্বেতি চক্কং ব বহতোপদং ॥ ১ ॥

অন্বয়—ধম্মা মনো পুব্বঙ্গমা মনোসেট্ঠা মনোময়া পদুট্‌ঠেন মনসা চে ভাসতি বা করোতি বা, ততো চক্কং বহতো পদং ব নং দুক্খমন্বেতি।

সংস্কৃত।—ধর্ম্মাঃ মনঃপূর্ব্বাঙ্গমাঃ মনঃশ্রেষ্ঠাঃ মনোময়াঃ। প্রদুষ্টেন মনসা চেৎ (কোঽপি) (কিঞ্চিৎ) ভাষতে (কিঞ্চিৎ) করোতি বা ততঃ চক্রং বহতো (বলীবর্দ্দস্য) পদমিব তম্ (পুরুষম্) দুঃখমন্বেতি (অনুসরতি)।

অনুবাদ।—মন ধর্ম্মের (স্বভাবের) পূর্ব্বগামী, মন ধর্ম্মের মধ্যে প্রধান পদার্থ এবং ধর্ম্ম মন হইতে উৎপত্তি লাভ করিয়াছে; যদি কেহ দূষিতান্তঃকরণে কথা কহেন বা কার্য্য করেন, তবে চক্র যেমন ভারবাহী বলীবর্দ্দের পদচিহ্ন অনুসরণ করে, দুঃখও তাহাকে সেইরূপ অনুসরণ করে।

(বৌদ্ধমতে ধর্ম্ম অর্থে স্বভাব। পঞ্চ স্কন্ধের মধ্যে বেদনা, সংজ্ঞা ও সংস্কারের নামান্তর ধর্ম্ম। আমাদের বর্ত্তমান মানসিক ও শারীরিক অবস্থা ও আমাদের চিন্তার ফলের নাম ধর্ম্ম)।

মনো পুব্বঙ্গমা ধম্মা মনোসেট্‌ঠা মনোময়া
মনসা চে পসন্নেন ভাসতি বা করোতি বা।
ততো নং সুখমন্বেতি ছায়া ব অনপায়িনী ॥ ২ ॥

অন্বয়।— ধম্মা মনো পুব্বঙ্গমা মনোসেট্‌ঠা মনোময়া
পসন্নেন মনসা চে ভাসতি বা করোতি বা ততো
অনপায়িনী ছায়া ব নং সুখমন্বেতি।

সংস্কৃত।—ধর্ম্মাঃ মনঃপূর্ব্বঙ্গমাঃ মনঃশ্রেষ্ঠা মনোময়া। প্রসন্নেন (নির্ম্মলেন) মনসা চেৎ (কোঽপি কিঞ্চিৎ) ভাষতে (কিঞ্চিৎ) করোতি বা ততঃ অনপায়িনী ছায়া ইব তং সুখমন্বেতি (অনুসরতি)।

অনুবাদ—মন ধর্ম্মের পূর্ব্বগামী, মন ধর্ম্মের মধ্যে প্রধান পদার্থ এবং ধর্ম্ম মন হইতেই উৎপত্তি লাভ করিয়াছে। যদি কেহ নির্ম্মলান্তঃকরণে কথা কহেন, কিম্বা কার্য্য করেন, তবে সুখ তাঁহাকে সর্ব্বদা ছায়ার ন্যায় অনুসরণ করে।

পরমহংসদেবের উপদেশ

(স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্রদত্ত।)

১) কোন ব্যক্তি পরমহংসদেবের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন;—সিদ্ধপুরুষ হ'লে কিরূপ অবস্থা হয়?

উত্তরে তিনি বলিলেন,—

যেমন আলু, বেগুন সিদ্ধ হ'লে নরম হয়, তেমনি সিদ্ধপুরুষের স্বভাব নরম হইয়া থাকে। তার সব অভিমান চলে চলে যায়।

২) সংসারে অনেক প্রকারে সিদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত হয়; যেমন,—স্বপ্ন সিদ্ধ, মন্ত্র-সিদ্ধ, হঠাৎ-সিদ্ধ ও নিত্য-সিদ্ধ।

স্বপ্নেতে কেহ কেহ ইষ্টমন্ত্র পেয়ে তাই জপ করে সিদ্ধ হয়। মন্ত্রসিদ্ধ;—সদ্‌গুরুর নিকট মন্ত্রগ্রহণ করে সাধনার দ্বারা সিদ্ধ হয়। হঠাৎ-সিদ্ধ;—দৈবযোগে কোন মহাপুরুষের কৃপা লাভ করে সিদ্ধ হয়, তাহাকে হঠাৎ-সিদ্ধ বলে। নিত্যসিদ্ধ;—তাদের বাল্যকাল থেকেই ধর্ম্মে মতি থাকে। যেমন লাউ, কুমড়া গাছে আগে ফল হয়, পরে ফুল ফোটে। [ক্রমশঃ]

স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী

সন্ন্যাসীর গীতি—১৪শ সংস্করণ। স্বামীজী-রচিত 'Song of the Sannyasin'-নামক ইংরেজী কবিতা ও উহার পদ্যে বঙ্গানুবাদ। মূল্য ২০ পয়সা।

ঈশদূত যীশুখৃষ্ট—৫ম সংস্করণ, ভগবান ঈশার জীবনালোচনা—মূল্য ০'৪০, উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে মূল্য ০'৩৫।

সরল রাজযোগ—৫ম সংস্করণ। স্বামীজী আমেরিকায় তাঁহার শিষ্যা সারা সি. বুলের বাড়িতে কয়েকজন অন্তরঙ্গকে 'যোগ' সম্বন্ধে যে বিশেষ উপদেশ দান করেন, বর্তমান পুস্তক তাহারই ভাষান্তর। মূল্য ০'৫০।

পত্রাবলী—১ম ও ২য় ভাগ। অভিনব পরিবর্ধিত সংস্করণ। প্রায় ১০৫০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। স্বামীজীর বহু অপ্রকাশিত পত্র ইহাতে সংযোজিত হইয়াছে। তারিখ অনুযায়ী পত্রগুলি সাজানো হইয়াছে। পরিচয়- এবং নির্ঘণ্ট-সংযুক্ত।·· মনোরম বাঁধাই। স্বামীজীর সুন্দর ছবি-সংবলিত। প্রতি ভাগ মূল্য ৫'৫০; উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে মূল্য ৫৲।

ভারতে বিবেকানন্দ—১৪শ সংস্করণ। আমেরিকা হইতে প্রত্যাবর্তনের পর স্বামীজীর ভারতীয় বক্তৃতাবলীর উৎকৃষ্ট অনুবাদ। ৫৯৯ পৃষ্ঠা; মূল্য ৫'০০। উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে মূল্য ৪'৫০।

দেববাণী—১ম সংস্করণ। আমেরিকার 'সহস্র-দ্বীপোদ্যান'-নামক স্থানে কয়েকজন অন্তরঙ্গ শিষ্যকে স্বামীজী যে-সকল অমূল্য উপদেশ প্রদান করেন, ঐগুলির একত্র সমাবেশ। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি, ২১৪ পৃষ্ঠা; মূল্য—২৲ উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে মূল্য ১'৮০।

শিক্ষাপ্রসঙ্গ—৪র্থ সংস্করণ। শিক্ষা-সম্বন্ধে স্বামীজার বাণীসকল সংকলিত ও ধারাবাহিক-ভাবে সন্নিবেশিত। ১৮৮ পৃষ্ঠা; মূল্য ১'৭৫।

কথোপকথন—৭ম সংস্করণ। স্বামীজীর ছবিযুক্ত। ডবল ক্রাউন, ১৬ পেজি, ১৪২ পৃষ্ঠা। মূল্য ১'২৫। উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে মূল্য ১'১৫।

মদীয় আচার্যদেব—স্বামী বিবেকানন্দ-প্রণীত; ১১শ সংস্করণ, ৬৪ পৃষ্ঠা। স্বীয় গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনী ও শিক্ষা-সম্বন্ধে আমেরিকাবাসীদের নিকট স্বামীজীর বিবৃতি। মূল্য ০'৭৫; উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে মূল্য ০'৬৫।

জ্ঞানযোগ-প্রসঙ্গে—বিভিন্ন বক্তৃতার সারসংক্ষেপ—ইংরেজীতে প্রকাশিত Discourses on Jnana Yoga পুস্তকের অনুবাদ। 'স্বামীজীর বাণী ও রচনা' হইতে পৃথক্ পুস্তকাকারে প্রকাশিত। আত্মতত্ত্ব ও বেদান্ত-বিষয়ক বহু কঠিন বিষয় সরলভাবে আলোচিত। 'জ্ঞানযোগ' গ্রন্থ পড়িবার পক্ষে সহায়ক। মূল্য দুই টাকা।

স্বামি-শিষ্য-সংবাদ—(পূর্বকাণ্ড — ১৩শ সংস্করণ; উত্তরকাণ্ড—১১শ সংস্করণ)। শ্রীশরৎ-চন্দ্র চক্রবর্তী প্রণীত। স্বামী বিবেকানন্দের মতামত অল্প কথায় জানিবার উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। স্বামীজীর জীবিতকালে তাঁহার সহিত প্রশ্নোত্তরচ্ছলে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য-দেশীয় আচার-নীতি, দর্শন-বিজ্ঞানাদি এবং ধর্ম ও সমাজগত সমস্যামূলক নানা বিষয়ের বিশদ আলোচনা। সরস ও হৃদয়গ্রাহী এই সব বর্ণনা সত্যই আনন্দদায়ক। বর্তমান যুগের বহু সমস্যার আদর্শানুগ সমাধানও ইহাতে পাওয়া যাইবে। জীবনতত্ত্ব বিষয়ে এই পুস্তকদ্বয় অমূল্য রত্নের সন্ধান দিবে। ২২০ ও ২১০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য প্রতি কাণ্ড ২'২৫।

মহাপুরুষ-প্রসঙ্গ—১৬শ সংস্করণ। ১৫৪ পৃষ্ঠা। ইহাতে রামায়ণ, মহাভারত, জড়-ভরতের উপাখ্যান, প্রহ্লাদচরিত্র, জগতের মহত্তম আচার্যগণ, ঈশদূত যীশুখ্রীষ্ট, ভগবান বুদ্ধ প্রভৃতি বিষয় আছে। কোমলমতি বালক-দিগের চরিত্রগঠনে ও ভারতীয় সংস্কৃতিতে তাহাদিগকে শ্রদ্ধাবান্ করিতে ইহা বিশেষ সহায়তা করিবে; মূল্য ৩'০০; উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে মূল্য ২'৭০।

প্রাপ্তিস্থান :—উদ্বোধন কার্যালয়, বাগবাজার, কলিকাতা ৩

শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা এবং স্বামী বিবেকানন্দ-সম্বন্ধীয় পুস্তকাবলী

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী ও শিক্ষা-সম্বন্ধে অপূর্ব পুস্তক। স্বামী সারদানন্দ-প্রণীত। দুই ভাগে রেক্সিন-বাঁধাই। মূল্য—১ম ভাগ ১০৲ ২য় ভাগ ১০
উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে " ৯৲ ৯'০০
সাধারণ বাঁধাই পাঁচ ভাগে:

মূল্য—		উঃ গ্রাঃ পক্ষে
১ম ভাগ	২'৫০	২'২৫
২য় "	৪'৭৫	৪'২৫
৩য় "	৩'৫০	৩'১৫
৪র্থ "	৩'০০	২'৭০
৫ম "	৩'৫০	৩'১৫

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি— ৭ম সংস্করণ। অক্ষয়কুমার সেন-প্রণীত। সুললিত কবিতায় শ্রীশ্রীঠাকুরের বিস্তারিত জীবনী ও অলৌকিক শিক্ষা-সম্বন্ধে এরূপ গ্রন্থ আর নাই। ৬৪০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য—বোর্ড-বাঁধাই ১৫৲, উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ১৪৲।

পরমহংসদেব—ষষ্ঠ সংস্করণ। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু-প্রণীত। সুললিত ভাষায় অল্প কথায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দিব্য জীবনবেদ। ১৪০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য—১'৭৫।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ—১২শ সংস্করণ শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য-প্রণীত। বালক-বালিকাদিগের জন্য সরল ভাষায় লিখিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনী। মূল্য—০'৭০।

শ্রীরামকৃষ্ণ-চরিত — ২য় সংস্করণ। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চৌধুরী-প্রণীত। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাবলীর অপূর্ব সমাবেশ। বোর্ড-বাঁধাই ডিমাই সাইজ। মূল্য—৪'০০।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ— ১৮শ সংস্করণ। সুরেশচন্দ্র দত্ত-সংগৃহীত। ২৬৫ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য—৩৲।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-উপদেশ—স্বামী ব্রহ্মানন্দ সঙ্কলিত। ২২শ সংস্করণ। মূল্য—৭৫ পয়সা। কাপড়ে বাঁধাই ১৲ টাকা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-মহিমা—শ্রীরামকৃষ্ণ-চরিত-মহাকাব্য শ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথির অমর লেখক অক্ষয়কুমার সেনের লেখনী-প্রসূত গ্রন্থ। মূল্য—২'০০।

রামকৃষ্ণের কথা ও গল্প—১৪শ সংস্করণ। স্বামী প্রেমঘনানন্দ-প্রণীত। এই সুচিত্রিত সুদৃশ্য সুলভ পুস্তকখানি ছেলেমেয়েদের ধর্মীয় ও নৈতিক জীবনগঠনের সহায়তা করিবে। মূল্য—২'০০

শ্রীমা সারদাদেবী—৪র্থ সংস্করণ। স্বামী গম্ভীরানন্দ-প্রণীত। শ্রীশ্রীমায়ের বিস্তারিত জীবনীগ্রন্থ। পৃষ্ঠা ৭১০; মূল্য—৮৲।

জননী সারদাদেবী—স্বামী নির্বেদানন্দ-প্রণীত। পৃষ্ঠা ১১০। মূল্য—২'০০।

শ্রীশ্রীমা সারদা—স্বামী নিরাময়ানন্দ-প্রণীত। পৃষ্ঠা ৯৮; মূল্য ১'৫০।

শ্রীশ্রীমায়ের কথা—শ্রীশ্রীমায়ের সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ সন্তানদের 'ডাইরী' হইতে সংগৃহীত সারগর্ভ উপদেশ। সংসারতাপে সান্ত্বনাদায়ক ও অধ্যাত্মরাজ্যে পথপ্রদর্শক। দুই ভাগে সম্পূর্ণ। প্রতি ভাগ—৫'৫০।

মাতৃসান্নিধ্যে—২য় সংস্করণ; স্বামী ঈশানানন্দ-প্রণীত। পৃষ্ঠা ২৫৬; মূল্য ৪৲ টাকা।

যুগনায়ক বিবেকানন্দ—স্বামী গম্ভীরানন্দ-প্রণীত। স্বামীজীর অধুনাতন মূল্যবান প্রামাণিক জীবনীগ্রন্থ। তিন খণ্ডে প্রকাশিত। প্রতি খণ্ড ৮৲ করিয়া। একত্র লইলে ২৩৲। উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ২২৲।

স্বামী বিবেকানন্দ—৩য় সংস্করণ, শ্রীপ্রমথনাথ বসু-রচিত। দুই খণ্ডে প্রকাশিত স্বামীজীর জীবনী। ৯৬৩ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য—প্রতি-খণ্ড ৪৲। উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ৩'৬০। দুই খণ্ড একত্র বাঁধান ৮'৫০।

স্বামী বিবেকানন্দ—১১শ সংস্করণ। দয়াল ভট্টাচার্য-প্রণীত। স্বামীজীর জীবনের প্রধান প্রধান সকল কথাই বলা হইয়াছে। মূল্য—০'৭০।

বিবেকানন্দ-চরিত—৯ম সংস্করণ। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার-প্রণীত। মূল্য—১০'০০

পাঞ্চজন্য—স্বামী চণ্ডিকানন্দ-রচিত পাঁচ শতের অধিক সঙ্গীতের সমাবেশ। মাতৃসঙ্গীত, শিবসঙ্গীত, গুরুসঙ্গীত, মহামানব-সঙ্গীত, রামকৃষ্ণ-লীলাগীতি, সারদা-লীলাগীতি ও দেশাত্মবোধক সঙ্গীত। মূল্য—ছয় টাকা।

প্রাপ্তিস্থান :—উদ্বোধন কার্যালয়, বাগবাজার, কলিকাতা ৩

উদ্বোধন-প্রকাশিত অন্যান্য পুস্তকাবলী

দশাবতারচরিত—৫ম সংস্করণ। শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য-প্রণীত। এই পুস্তক-পাঠে চরিত-কথার গল্পপ্রিয় পাঠক এবং ভক্তগণ ধর্ম ও ধর্মতত্ত্বের সন্ধান পাইবেন। মূল্য ২'০০।

শঙ্কর-চরিত—শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য-প্রণীত—৫ম সংস্করণ; আচার্য শঙ্করের অদ্ভুত জীবনী অতি সুললিত ভাষায় লিখিত। মূল্য ১৲।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বেদান্ত—স্বামী বিবেকানন্দ প্রণীত। ১৮৯৬ খৃঃ মার্চ মাসে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত বক্তৃতা এবং তৎপরবর্তী প্রশ্নোত্তর ও আলোচনা। বেদান্তের মূলতত্ত্ব অতি স্পষ্টভাবে ব্যক্ত। প্রশ্নোত্তর ও আলেচানায় ভারতীয় কৃষ্টি ও হিন্দুধর্মের মূল ভাব সাহসিকতার সহিত সরলভাবে উপস্থাপিত। পৃষ্ঠা ৫৫; মূল্য এক টাকা।

শিব ও বুদ্ধ—৭ম সংস্করণ। ভগিনী নিবেদিতা-প্রণীত। ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য রচিত সরল ও সুখপাঠ্য আখ্যান। মূল্য ০'৭৫।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ—শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সর্বপ্রথম অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের সবিস্তার ধারাবাহিক জীবনী। মূল্য—৩'০০।

ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ—৭ম সংস্করণ। স্বামী ব্রহ্মানন্দের কথোপকথন এবং পত্রাবলীর সংগ্রহ। প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু-লিখিত সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা। মূল্য ২'৫০।

মহাপুরুষ শিবানন্দ—স্বামী অপূর্বানন্দ-প্রণীত। ৩য় সংস্করণ। শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজীর বিস্তারিত জীবনী। মূল্য—৫'

শিবানন্দ-বাণী—২য় ভাগ—৩য় সংস্করণ স্বামী অপূর্বানন্দ-সঙ্কলিত। মূল্য—২'৫০।

শ্রীরামানুজ-চরিত—স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ-প্রণীত, ৩য় সংস্করণ, ২৫৮ পৃষ্ঠা। শ্রীসম্প্রদায়ে প্রচলিত আচার্য রামানুজের বিস্তৃত জীবনবৃত্তান্ত বাংলা ভাষায় প্রকাশিত। আচার্যের জীবদ্দশায় ক্ষোদিত প্রতিমূর্তির ছবি এই গ্রন্থে আছে। মূল্য ৩৲। উঃ গ্রাঃ পক্ষে ২'৭৫।

স্বামী অখণ্ডানন্দ—স্বামী অন্নদানন্দ-প্রণীত। এই পুস্তকে শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্নিধানে, তিব্বতে ও হিমালয়ে, স্বামীজীর সঙ্গে, দুর্ভিক্ষে সেবাকার্য, সেবাব্রতের প্রাণপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতি অধ্যায়ে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্যের পথিকৃৎ স্বামী অখণ্ডানন্দের ধারাবাহিক জীবনী। ডিমাই সাইজ, ৩১০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৪৲।

সাধু নাগমহাশয়—শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী-প্রণীত। ১১শ সংস্করণ। যাঁহার সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন, "পৃথিবীর বহু স্থান ভ্রমণ করিলাম, নাগমহাশয়ের ন্যায় মহাপুরুষ কোথাও দেখিলাম না।"—পাঠক! তাঁহার পুণ্য জীবন-বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া ধন্য হউন। মূল্য ২'০০।

গোপালের মা—স্বামী সারদানন্দ-প্রণীত (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ হইতে সঙ্কলিত)। অতুলনীয়-সাধননিষ্ঠ, পরমভক্ত গোপালের মা-র আদর্শ জীবনের সংক্ষিপ্ত কাহিনী। মূল্য ৫০ পয়সা।

লাটু মহারাজের স্মৃতিকথা—শ্রীচন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়-প্রণীত। ২য় সংস্করণ। শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও ঠাকুরের শিষ্যবর্গ সম্বন্ধে বহু অপ্রকাশিত ঘটনাবলীর সমাবেশ। নিজ জীবনের কঠোর ত্যাগ-তপস্যার কথায় অদ্ভুত প্রকাশভঙ্গীতে পাঠকগণ চমৎকৃত হইবেন। মূল্য—৪'০০।

স্বামী তুরীয়ানন্দ—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ-প্রণীত। বাল্যাবধি বেদান্তী এই মহারাজের জীবনের অদ্ভুত ঘটনাবলী-পাঠে চমৎকৃত হইবেন ৩৪০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য—৩'৫০।

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিষ্যগণের সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত একত্র এই প্রথম প্রকাশিত হইল। দুই ভাগে সম্পূর্ণ। প্রতি ভাগের মূল্য—৫'৫০।

ভগিনী নিবেদিতা—স্বামী তেজসানন্দ-প্রণীত। ইহাতে তাঁহার জীবনের মুখ্য ঘটনাবলীর সম্যক্ আলোচনা রহিয়াছে। ইহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে "ভগিনী নিবেদিতা-স্মৃতি বক্তৃতামালা"র প্রথম বক্তৃতা। মূল্য—১'৫০

প্রাপ্তিস্থান:—উদ্বোধন কার্যালয়, বাগবাজার, কলিকাতা ৩

উদ্বোধন, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮০

বিষয়-সূচী

বিষয়-সূচী

থিন এরারুট

প্রিয় গ্রাহকদের সুবিধার জন্য

- মূল্য সীমার মধ্যে
- গুণতিতেও অনেক বেশী
- আকারেও বড়
- গুণ অপরিবর্তিত
- স্বাদে অদ্বিতীয়
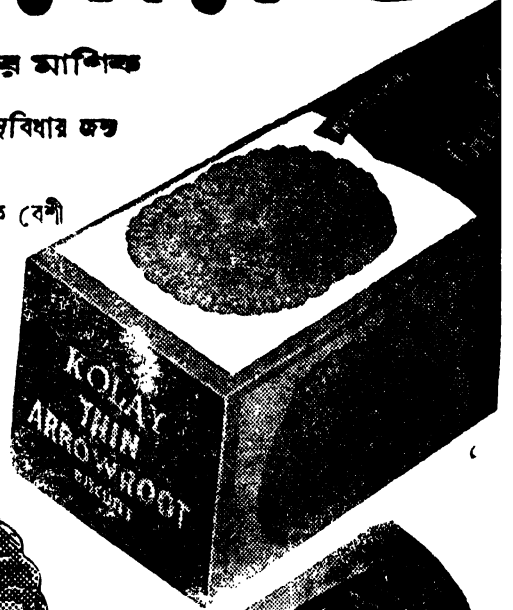
ঐক্যময় বৈচিত্র্য

নানা রং-এর ফুলের মতোই বিচিত্র ভারতের সংস্কৃতি ; ফুলের স্তবকের মতোই আবার সে সংস্কৃতি ঐক্যময়। পশ্চিম বঙ্গের কোনো অভিনেতৃ সংঘই হোক, বা দক্ষিণের কোনো সার্কাস দল হোক ; অথবা পশ্চিমের কো সাংস্কৃতিক সংস্থা বা উত্তরের কোনো নাচের দল—এই উপমহাদেশের সুবিস্তৃত রেলপথের সাহায্যে বৈচি মহা-সমুদ্রে মিশে এক ঐক্যবদ্ধ সম্পূর্ণতায় উজ্জ্বল। ফুল থেকে ফুলে মধু আহরণ করে যে মধুকর ঠিক ত মতো স্থান থেকে স্থানান্তরে মানুষ ও মালপত্র আহরণ করে নিয়ে যায় রেলপথ, এদেশের সংস্কৃতিকে ন জীবনে উদ্ভাসিত করে তোলে।

পূর্ব রেলওয়ে

ভাল চা বলতে
টসের চা
TOSH'S
এ, টস এণ্ড সন্স
ফোন
২২-৪৭৮৫
কলিকাতা—১৲০

শ্রীমৎ স্বামী ওঁকারানন্দজী মহারাজ

শ্রীমৎ স্বামী ওঁকারানন্দজীর মহাসমাধি

গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি, গত ৮ই মে বিকাল ৪-৫০ মিনিটের সময় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ স্বামী ওঁকারানন্দ মহারাজ কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানে মহাসমাধিতে লীন হইয়াছেন। এইদিন বিকালে সহসা তিনি হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হন।

পূর্বে হৃদ্‌রোগের প্রবল আক্রমণ তিনি একাধিকবার সহ্য করিয়াছেন। প্রায় মাস খানেক যাবৎ শরীর দুর্বল থাকিলেও এইদিন তিনি বেশ ভালই ছিলেন। বিকালে চা-পানের পর চেয়ারে বসিয়া গল্প করিতে করিতে অতর্কিতে তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন। তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে বিছানায় শোয়াইয়া দেওয়া হয়। ইহার কয়েক মিনিট পরেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৭৭ বৎসর।

৮ই রাত্রেই তাঁহার মরদেহ বেলুড় মঠে আনিয়া অতিথি-ভবনে রাখা হয়। সাধু-ব্রহ্মচারিগণ সারারাত্রি ভজনাদি করিতে থাকেন। পরদিন, ৯ই মে সকালে বহু সাধু ও ভক্ত বেলুড় মঠে সমবেত হইয়া তাঁহার প্রতি শেষ শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন। বেলা সাড়ে দশটার সময় পুষ্পমাল্যাদি শোভিত পালঙ্কে করিয়া তাঁহার মরদেহ শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির, স্বামী ব্রহ্মানন্দের মন্দির, শ্রীশ্রীমায়ের মন্দির ও স্বামীজীর মন্দিরের সম্মুখে আনিয়া পরে শেষকৃত্যের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে বাহিত হয় এবং সেখানে স্নান-আরাত্রিকাদি কৃত্যের পর বেলা ১১ টার সময় চিতাগ্নিতে আহুত হয়।

স্বামী ওঁকারানন্দের পূর্বাশ্রমের নাম অনঙ্গমোহন নিয়োগী। কলিকাতায়, ১৪ সুবল চন্দ্র লেনে তাঁহার বাল্য ও ছাত্রজীবন অতিবাহিত হয়। বাড়ীটি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-লেখক মাষ্টার মহাশয়ের বাসস্থানের সন্নিকটে হওয়ায় তাঁহার সহিত মিশিবার যথেষ্ট সুযোগ তিনি পাইয়াছিলেন। ছাত্রাবস্থা হইতেই বেলুড় মঠে যাতায়াত করিয়া স্বামী প্রেমানন্দ-প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানগণের সঙ্গ ও স্নেহলাভের সৌভাগ্যও তাঁহার হইয়াছিল। বিশেষ করিয়া স্বামী শিবানন্দ তাঁহাকে খুবই স্নেহ করিতেন।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে দর্শনশাস্ত্রে এম. এ. পরীক্ষায় পাশ করার পর স্বামী শিবানন্দ ও মাষ্টার মহাশয় উভয়কেই তিনি সাধু হওয়ার সংকল্প জানান। মাষ্টার মহাশয় তাড়াহুড়া না করিয়া অপেক্ষা করিতে বলেন, স্বামী শিবানন্দ কিন্তু উৎসাহিতই করেন। ইহাতে দ্বিধাগ্রস্ত হইয়া তিনি জয়রামবাটী যাইয়া শ্রীশ্রীমায়ের কাছে সব নিবেদন করিয়া তাঁহার নিকট পথের নির্দেশ চান। মা তাঁহাকে তখনই কিছু বলিলেন না, কিন্তু রাত্রে সেবকের কাছে তাঁহার কথা বিবৃত করিয়া বলিলেন, 'তারক ঠিকই বলেছে—সংসারে একবার পড়লে আর উঠতে পারে কজন? ছেলেটিরও মনে খুব জোর আছে, মঠে থাকবার প্রবল আগ্রহ।' পরদিন সকালে সেবকের মুখে ঐ কথা শুনিয়াই তিনি আনন্দিত হইয়া সংঘে যোগদানের স্থির সংকল্প শ্রীশ্রীমাকে জানাইলে তিনি খুব আশীর্বাদ করিয়া বলেন, 'উহা তো বহু ভাগ্যের কথা বাবা!' এই সময় শ্রীশ্রীমায়ের নিকট তিনি

মন্ত্রদীক্ষাও লাভ করেন। তখন তাঁহার বয়স ২৩ বৎসর। জয়রামবাটী হইতে ফিরিয়াই তিনি বেলুড় মঠে চলিয়া আসেন এবং সেখান হইতে ভুবনেশ্বরে গিয়া সংঘে যোগদান করেন।

ব্রহ্মচর্য-দীক্ষার পর তাঁহার নাম হয় অখণ্ডচৈতন্য। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে তিনি স্বামী শিবানন্দের নিকট সন্ন্যাসদীক্ষা লাভ করেন।

ভুবনেশ্বর হইতে ফিরিয়া তিনি দীর্ঘকাল বেলুড় মঠেই ছিলেন। তাঁহার দেহ খুব সবল ছিল, শক্তি এবং উৎসাহও ছিল প্রচুর। বেলুড় মঠে তখন বাঁকে করিয়া গঙ্গাজল তোলা হইতে শুরু করিয়া নিয়মিত শাস্ত্র ক্লাস নেওয়া পর্যন্ত সবই অনলসভাবে করিতেন। বিশেষ করিয়া শাস্ত্রপাঠ ও আলোচনায় এবং পূজা-হোমাদি অনুষ্ঠানে তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল। মঠের ব্যায়ামাগারে কুস্তিও অভ্যাস করিতেন। বহুশাস্ত্রে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। আজীবন তিনি শাস্ত্রালোচনায় বিশেষ উৎসাহী ছিলেন এবং অপরকেও উৎসাহিত করিতেন। আলস্য তাঁহার ধাতে একেবারেই ছিল না।

১৯৪৪ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে তিনি বারাণসী অদ্বৈত আশ্রমের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হন। সেখান হইতে পুনরায় মঠে ফিরিয়া ১৯৫১ খৃষ্টাব্দের জানুআরি হইতে শেষদিন পর্যন্ত কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানে অধ্যক্ষরূপে ছিলেন।

১৯২৯ খৃষ্টাব্দে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাষ্টী ও রামকৃষ্ণ মিশনের গভর্নিং বডির মেম্বার হন এবং ১৯৬৬ খৃষ্টাব্দের ২২শে ফেব্রুআরি শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষের পদে বৃত হন।

বাহিরে কখনো কখনো একটু কঠোর বলিয়া প্রতীত হইলেও তাঁহার অন্তরের স্নেহ বহু-জনের হৃদয় গভীরভাবে স্পর্শ করিয়াছে। বহুজন তাঁহার কৃপালাভে ধন্য হইয়াছেন। তাঁহার দেহত্যাগে শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘের অপূরণীয় ক্ষতি হইল।

শ্রীভগবচ্চরণে তাঁহার আত্মা চিরশান্তি লাভ করিয়াছে।

দিব্য বাণী

সং গচ্ছধ্বং সং বদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্ ।
দেবা ভাগং যথা পূর্বে সঞ্জানানা উপাসতে ॥২
সমানী বঃ আকূতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ ।
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি ॥৪

ঋগ্বেদ, ১০ম মণ্ডল, ১৯১ সূক্ত

একসাথে চল, (মিলে মিশে সবে কাজ কর এক মতে,)
একই বাক্য ঝঙ্কৃত হোক সবার কণ্ঠ হতে,
একই অর্থ-বোধের দীপ্তি জ্বলুক সবার চিতে ।
পূর্বে যেমন দেবগণ নিল এক হয়ে হবি যাগে,
(তোমরা তেমনি একমত হোয়ো ধনসম্পদভাগে ॥)
একই লক্ষ্য অভিমুখী, একই সংকল্পেতে থির,
এক-মন, এক-হৃদি হও সবে, (হও সংযত, ধীর)—
যাতে তোমাদের আসে এ একতা, সুমহান সংহতি ;
(তাই হোক, সেই একতা-যজ্ঞে পড়ুক পূর্ণাহুতি ॥)

কথাপ্রসঙ্গে

ভারতের জাতীয় সংহতি ও সংস্কৃতভাষা

স্বামী বিবেকানন্দ ভারতীয় জাতির সংহতি-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, 'ভাষাগত ঐক্য, শাসন-ব্যবস্থা এবং সর্বোপরি ধর্ম এই একীকরণের শক্তিরূপে কাজ করিয়াছে।' ভাষার দিক দিয়া সংস্কৃতভাষাকেই এই সংহতি-সূত্র বলিয়াছেন, যাহা সমগ্র ভারতকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। বর্তমান সময়ে যে সমস্যায় আমরা জর্জরিত, যে সমস্যা নিজেকে 'ভারতীয়' ভাবার পরিবর্তে যত দিন যাইতেছে ততই ভাষার ভিত্তিতে নিজেকে 'ওড়িয়া,' য়া' 'মাদ্রাজী' প্রভৃতিমাত্র ভাবাইয়া পরস্পরের মধ্যে পৃথক্‌ত্ব-বোধ জাগাইয়া ভারতের সংহতি-সূত্র ছিন্ন হওয়ার আশঙ্কাকে বাড়াইয়া দিতেছে, এবং ঘৃণ্য কুখ্যাত ধর্মীয় গোঁড়ামি-উদ্ভূত সর্বনাশা পরিস্থিতির মতোই জাতির পক্ষে অতি-লজ্জাকর পরিস্থিতিরও সৃষ্টি করিতেছে, সেই ভাষা-সমস্যারও সু-সমাধান স্বামীজীর কথায় পাওয়া যায়। স্বামীজী স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া গিয়াছেন :

'একটি সাধারণ ভাষার বিশেষ অভাব অনুভূত হইতে পারে, কিন্তু……একথাও বলা যায়, ইহা দ্বারা প্রচলিত ভাষাগুলির প্রাণশক্তি বিনষ্ট হইবে।

'এমন একটি মহৎ পবিত্র ভাষা (জাতীয় বা সাধারণ ভাষা হিসাবে) গ্রহণ করিতে হইবে, অন্য সমুদয় ভাষা যাহার সন্ততিস্বরূপ। সংস্কৃতই সেই ভাষা। ইহাই একমাত্র সমাধান।'

বাংলা, ওড়িয়া, অসমীয়া, হিন্দী প্রভৃতি ভাষাগুলি যে সংস্কৃতভাষার সন্ততি, তাহা তো আমরা জানিই। সংস্কৃতভাষাশিক্ষা এগুলির প্রাণশক্তি তো নষ্ট করিবেই না, বরং এগুলিকে উন্নততর করিয়া তুলিবে। বর্তমানে তো ইংরেজী শব্দের হিন্দী প্রতিশব্দ করিবার সময় যথেষ্ট-পরিমাণে এই সংস্কৃতভাষারই শরণ লইতে হইতেছে। একমাত্র দক্ষিণভারতীয় ভাষাগুলি সম্বন্ধে প্রশ্ন জাগিতে পারে; সে বিষয়েও স্বামীজী বলিয়াছেন :

'দ্রাবিড় ভাষাসকল সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত হইতেও পারে, নাও পারে। কিন্তু এক্ষণে বাস্তবক্ষেত্রে উহারা প্রায় সংস্কৃতই দাঁড়াইয়াছে। দিনের পর দিন নিজেদের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়াই এই আদর্শের দিকে অগ্রসর হইতেছে।'

আমাদের মনে হয়, সংস্কৃতকে যদি আমরা রাষ্ট্রভাষা করিতে পারিতাম, ভারতের প্রত্যেকটি প্রধান ভাষার বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়াই সেগুলিকে উন্নততর করার পথ সুগম হইত। আরো বড় কথা, ভাষার ভিত্তিতে আজ 'ভারতীয়' বোধ হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া সংকীর্ণ গণ্ডীতে আবদ্ধ করার যে প্রবণতা ক্রমশঃ প্রবল হইতেছে, যে পরিস্থিতি দেখিয়া শ্রীকামরাজ একবার অতি দুঃখে বলিয়াছিলেন, 'আজ ভারতে মুসলমান, শিখ, খৃষ্টান প্রভৃতিরা সংখ্যালঘু নন, সংখ্যালঘু হইলেন "ভারতীয়"— নিজেকে "ভারতবাসী" বলিয়া ভাবিবার লোক,'—সে পরিস্থিতির উদ্ভবই হইত না; এসব ভাষাভাষীই আপন জন, সবাই ভারত-বাসী—এই বোধ অটুট রাখিয়াই, পরস্পরকে ভালবাসিয়াই নিজ নিজ মাতৃভাষার বৈশিষ্ট্য বজায় রাখা ও তাহার উন্নতিবিধান করা সাবলীলভাবেই হইত।

এই-জাতীয় যে সমস্যাগুলি আজ প্রবল, সংস্কৃতশিক্ষার অবহেলাই তাহার অন্যতম প্রধান কারণ বলিয়া মনে হয়। স্বামীজী সংস্কৃতশিক্ষার

বহুল প্রচলন চাহিয়াছিলেন, সংস্কৃতভাষা যে কঠিন তাহা জানিয়াও। কারণ 'এই সংস্কৃতভাষা আমাদের গৌরবের বস্তু।' অতি প্রাচীনকাল হইতেই আমাদের 'জাতীয় চরিত্রের প্রধান সুর' 'বিশ্লেষণী শক্তি এবং নির্ভীক কবিকল্পনা,' এবং অতি প্রাচীন কাল হইতেই ইহার প্রকাশের মাধ্যম সংস্কৃতভাষা: 'এই জাতির ধর্ম, দর্শন, ইতিহাস, নীতিশাস্ত্র, পৌরবিজ্ঞান প্রভৃতি সব কিছুই যেন কবি-কল্পনার পুষ্পবেদীতে স্থাপিত ছিল এবং সেগুলিকে অন্য যে-কোন ভাষা অপেক্ষা সুন্দরতর-রূপে প্রকাশ করিয়াছিল এক বিচিত্র ভাষা—যাহার নাম "সংস্কৃত" বা "পূর্ণাঙ্গ" ভাষা। এমনকি গণিতের কঠিন সংখ্যাতত্ত্বসমূহ প্রকাশ করিতেও ছন্দোবদ্ধ শ্লোক ব্যবহৃত হইয়াছিল।' কারণ, ইহা আমাদের জাতীয় সংস্কারে পরিণত হইয়াছে, 'সংস্কৃত শব্দগুলির উচ্চারণমাত্রেই জাতির মধ্যে একটা গৌরব, একটা শক্তির ভাব জাগিবে।' কারণ, সংস্কৃতশিক্ষা ছাড়া সুপ্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির মর্ম স্পর্শ করা যায় না, আমাদের 'পৈতৃক সম্পত্তি'-র ভাণ্ডারে প্রবেশ করা যায় না। এই জন্যই, ভারতীয় জাতির উচ্চচিন্তাগুলিকে চলতি ভাষায় শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন অপরিহার্য হইলেও সেই সঙ্গেই সংস্কৃতশিক্ষাও বিশেষ প্রয়োজন, 'সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত শিক্ষাও চলিবে।'

অতীব দুঃখের বিষয়, পরাধীন ভারতে বিদেশী-কর্তৃক প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থাতেও সংস্কৃতশিক্ষার যেটুকু ব্যবস্থা ছিল, বর্তমানে স্বাধীন ভারতে আমরা নিজেই সেটুকু আরও কমাইয়া দিয়াছি! শিক্ষাকে সংস্কৃত হইতে সরাইয়া এমন অবস্থায় আনিয়া ফেলা হইয়াছে যে, কিছুমাত্র সংস্কৃত না জানিয়াও কোন উচ্চশিক্ষিত যুবক ভারতীয় সংস্কৃতির দূতরূপে বিদেশে প্রেরিত হইতে পারে। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির অনুকৃতি এবং ভারতের কেবল চিত্র-গীত-নৃত্য-বাদ্য-অভিনয়াদিই ভারতীয় সংস্কৃতির সবটুকু—এ বোধ যদি আমাদের হৃদয়ে ছায়াপাত করিয়া থাকে, তাহা অপেক্ষা লজ্জার কথা আর কি আছে?

গভীরতর দুঃখের বিষয়, কোন কোন বিদেশীর দৃষ্টিতে সংস্কৃতশিক্ষার সঙ্গে ভারতের সংহতি ও সংস্কৃতির অচ্ছেদ্য সম্পর্ক সুস্পষ্ট হইলেও আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাপকগণের চোখে এখনো ইহা স্পষ্ট নয়। সম্প্রতি ডঃ এল এ বাসাম (ডীন অব দ্য ফ্যাকালটি অব এশিয়ান সিভিলাইজেসনস, অষ্ট্রেলিয়ান ন্যাচার‍্যাল ইউনিভারসিটি, ক্যানবেরা) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ও শিক্ষকগণের এক সভায় ভারতের সংহতিরক্ষার জন্য সংস্কৃতশিক্ষার প্রসারের একান্ত প্রয়োজনীয়তার কথা বলিয়াছেন। স্বামীজীর চিন্তাগুলির যেন প্রতিধ্বনি করিয়াই তিনি বলিয়াছেন:

'সংস্কৃতভাষার প্রতি অবহেলা করলে তাতে ভারতের জাতীয় সংহতি নষ্ট হয়ে ভারত বহুভাগে বিভক্ত হয়ে যাবার ভয় আছে।'

'সংস্কৃতভাষাই ভারতীয় সভ্যতার প্রতিনিধি। আন্তর্জাতিক ভাববিনিময়ের সংযোগ-সূত্রও।'

'শিশু ও যুবসমাজকে ভারতের যুগযুগাগত গৌরবময় নিজস্ব সংস্কৃতি সম্বন্ধে সজাগ করার জন্য শিক্ষার সর্বক্ষেত্রে সংস্কৃতশিক্ষার ব্যবস্থা থাকা একান্ত প্রয়োজন।'

'প্রাথমিক স্তর থেকেই সংস্কৃতশিক্ষা শুরু করতে হবে—ছোটদের মতো করে আকর্ষণীয় সচিত্র পুস্তকাদি প্রকাশ করতে হবে এজন্য।'

'সভ্যতার উষাকাল থেকে এখানকার ধর্মানুষ্ঠানে ব্যবহৃত মন্ত্রগুলি সংস্কৃত সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। আমার মতে, সেগুলির সংরক্ষণ প্রয়োজন—এগুলি যুবমনে তাদের চিরন্তন সংস্কৃতিকে জাগিয়ে তুলবে।'

চলতি ভাষায় তত্ত্ব-পরিবেশনের সঙ্গে সঙ্গে

সংস্কৃতশিক্ষারও প্রসারের কথা এই জন্যই স্বামীজী বিশেষভাবে বলিয়াছেন, উহা আমাদের জাতীয় সংস্কার, উহাই সংস্কৃতিকে বিদ্যার্থীর মনে দৃঢ়বদ্ধ করিয়া দিতে—শিক্ষাকে সংস্কারে পরিণত করিতে সক্ষম। বলিয়াছেন:

'এমনকি মহান্ বুদ্ধও সর্বসাধারণের মধ্যে সংস্কৃতশিক্ষার বিস্তার বন্ধ করিয়া একটি ভুল পথ ধরিয়াছিলেন। *তিনি তাঁহার কার্যের আশু ফল* চাহিয়াছিলেন, সুতরাং সংস্কৃতভাষায় নিবদ্ধ ভাবসমূহ তখনকার প্রচলিত ভাষা পালিতে অনুবাদ করিয়া প্রচার করিয়াছিলেন—লোকে তাঁহার ভাব বুঝিল, কারণ তিনি সর্বসাধারণের ভাষায় উপদেশ দিয়াছেন।......কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতভাষার বিস্তার হওয়া উচিত ছিল। জ্ঞানের বিস্তার হইল বটে, কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে "গৌরববোধ" ও "সংস্কার" জন্মিল না। শিক্ষা মজ্জাগত হইয়া কৃষ্টিতে পরিণত হইলে ভাববিপ্লবের ধাক্কা সহ্য করিতে পারে, কেবল বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞানরাশি তাহা পারে না। জগতের লোককে বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান দিয়া যাইতে পার, কিন্তু তাহাতে বিশেষ কল্যাণ হইবে না; ঐ জ্ঞান মজ্জাগত হইয়া সংস্কারে পরিণত হওয়া চাই। আমরা সকলেই আধুনিক কালের এমন অনেক জাতির বিষয় জানি, যাহাদের এইরূপ অনেক জ্ঞান আছে। *কিন্তু তাহাতে কি? সে-সকল জাতি ব্যাঘ্রতুল্য* নৃশংস—অসভ্য, কারণ তাহার কৃষ্টির অভাব। সভ্যতার ন্যায় তাহাদের জ্ঞানও গভীর নয়, একটু নাড়া দিলেই ভিতরের আদিম অসভ্য প্রকৃতি জাগিয়া উঠে।

'এই বিপদ সম্বন্ধে সচেতন থাকিতে হইবে। সাধারণকে প্রচলিত ভাষায় শিক্ষা দাও, তাহারা অনেক বিষয় অবগত হউক; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আরো কিছু প্রয়োজন। তাহাদের কৃষ্টি দিতে চেষ্টা কর। যতদিন পর্যন্ত না তাহা করিতে পারিতেছ, ততদিন সাধারণের স্থায়ী উন্নতির আশা নাই।'

ডক্টর বাসাম এই সত্যটিরও আভাস দিয়াছেন—গত মহাযুদ্ধের পর ভারতে সংস্কৃতশিক্ষার এবং পাশ্চাত্যে ল্যাটিনশিক্ষার অবহেলাকে আধুনিক যুবমনের অবলম্বনহীনতা-জনিত উচ্ছৃঙ্খলতার অন্যতম কারণ বলিয়াছেন। স্বামীজীর ভাষায় জ্ঞান মজ্জাগত হইয়া সংস্কারে পরিণত হওয়ার অভাবই এই কারণ, যে সংস্কার না জন্মিলে 'একটু নাড়া দিলেই ভিতরের আদিম অসভ্য প্রকৃতি জাগিয়া উঠে।'

ভারতে শিক্ষার সর্বস্তরে সংস্কৃতশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বিদেশীর চোখেও যাহা ধরা পড়িয়াছে, এদেশের বহু মনীষীও যে কথা বহুভাবে বারে বারে বলিয়া আসিতেছেন, সম্প্রতি ছাত্র এবং শিক্ষকগণের একাংশে যে চিন্তা সোচ্চার, আমরা আশা রাখি—আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাপকগণের দৃষ্টিও অচিরে সেদিকে আকৃষ্ট হইয়া ভারতের সংহতির, ভারতের যুবমনে ভারতীয় সংস্কৃতির অনুপ্রবেশের সিংহদ্বার খুলিয়া দিবে।

আমরা যদি দেখিয়াও না দেখি, তাহা হইলে কে আর আমাদের বুঝাইতে পারে? হিমাচল হইতে *কন্যাকুমারী পর্যন্ত ভারতের সর্বত্র, ভাষা* লইয়া বিবাদরত এমনকি হিংস্রতায় উন্মত্ত প্রদেশগুলিতেও আজিও কোটি কোটি হৃদয় সকাল-সন্ধ্যায় একইভাবে চরম সত্যের কাছে প্রাণের সূক্ষ্মতম ভাব প্রকাশ করিতেছে একই সংস্কৃত ভাষায়, একই মন্ত্রে। সমগ্র জাতির প্রাণ যেখানে সংহত—সেই ভাবের ও ভাবের বাহক ভাষার মাধ্যমেই জাতির প্রাণকে স্পর্শ করিতে হইবে জাতীয় সংহতিরক্ষার এবং যথার্থ উন্নতির জন্য।

স্বামী শিবানন্দের অপ্রকাশিত পত্র

১

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্।

BELUR MATH P.O.
DT. HOWRAH (BENGAL)
3.8.28

শ্রীমান্ বিপিন,

তোমার পত্র পাইয়া সকল সংবাদ অবগত হইলাম। তুমি ঠাকুরের কৃপায় সুস্থ হইয়া উঠ—ইহাই প্রার্থনা।

ঠাকুরকে ডাকবে, তাঁর নিত্য নিয়মিতভাবে স্মরণ মনন করবে, যেখানেই থাকনা। তাঁকে ডাকলে তোমার যে উন্নতি হইবে অপর কোথাও সেইরূপ আশা করিও না। তাঁর কৃপায় মন শান্ত হইবে। দিন কতক অধ্যবসায় সহকারে তাঁর স্মরণ মনন করিলেই ফল বুঝিতে পারিবে।

আমার শরীর তাঁর কৃপায় একপ্রকার চলে যাচ্ছে। মঠের অন্যান্য সব কুশল। তুমি আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্ব্বাদ ও শুভেচ্ছাদি জানিবে। ঠাকুর তোমার ভক্তি বিশ্বাস উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করুন ইহাই প্রার্থনা। ইতি

সতত শুভানুধ্যায়ী
শিবানন্দ

২

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্।

SRI RAMAKRISHNA MATH
P.O. BELUR MATH
17.10.28

শ্রীমান্ বিপিনবিহারী,

তোমার পত্র পাইয়া সকল সংবাদ অবগত হইলাম। ঔষধপত্র ত সব খাইয়া দেখিলে, দিনকতক না খাইয়াই দেখ, আর ঐ সকল বিষয় চিন্তা করিবে না। উহা শরীরের ধর্ম্ম, হইয়াই থাকে। তুমি ধ্যান জপ সাধন ভজন করিয়া যাও।

বিবাহ করিবে কি না করিবে, কি করিয়া বলিব। উহা ভগবান-অধীন কার্য্য—তাঁর ইচ্ছায় যাহা হইবার হইবে। যদি বিবাহ হয়, ঠাকুরকে ভুলো না—তাঁর স্মরণ-মননে ভুল না হয়। তাহা হইলে আর কোনই বিপদের আশঙ্কা থাকিবে না। আমার শরীর তাঁর কৃপায় একপ্রকার চলিয়া যাইতেছে। আমার আন্তরিক আশীর্ব্বাদ ও শুভেচ্ছাদি জানিবে। ইতি

সতত শুভানুধ্যায়ী
শিবানন্দ

৩

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃশরণম্ ।

BELUR MATH P.O.
DT. HOWRAH (BENGAL)
13.1.29

শ্রীমান্ বিপিন,

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইয়াছি। তোমার প্রেরিত ৫টি টাকাও পাইয়াছি। তুমি আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্ব্বাদ ও শুভেচ্ছাদি জানিবে। তোমার কোন চিন্তা নাই, ঠাকুরের শরণাপন্ন হইয়া থাক—তাঁকে ডাকবে—তাঁর কাছে প্রার্থনা করিবে। তিনিই তোমায় দেখছেন, দেখবেন—তাঁর কৃপায় তুমি শান্তি এবং আনন্দ পাইবে। আমার শরীর তাঁর কৃপায় এক প্রকার চলিয়া যাইতেছে। ইতি

সতত শুভানুধ্যায়ী
শিবানন্দ

৪

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃশরণম্ ।

BELUR MATH P.O.
DT. HOWRAH (BENGAL)
11.11.29

শ্রীমান্ বিপিনবিহারী,

তোমার পত্র ও প্রেরিত টাকা ৫টা পাইয়া সকল সংবাদ অবগত ও সুখী হইলাম। তুমি আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্ব্বাদ ও শুভেচ্ছা জানিবে। প্রার্থনা করি ঠাকুর তোমার ভক্তি বিশ্বাস বৃদ্ধি করুন। ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করিও, তিনি তোমার ভক্তি বিশ্বাস বৃদ্ধি করিবেন। মনে বাজে চিন্তা আসুক তার জন্য চিন্তিত হইওনা—তিনি কৃপা করে এই সব দূর করে দেবেন নিশ্চয়। তুমি আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্ব্বাদ ও শুভেচ্ছা জানিবে। ইতি

সতত শুভানুধ্যায়ী
শিবানন্দ

৫

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্।

BELUR MATH P.O.
DT. HOWRAH (BENGAL)
9.1.31

শ্রীমান্ বিপিনবিহারী,

তোমার পত্র যথাসময়ে পাইয়া সুখী হইয়াছি। তোমার এখানে আসবার কোন প্রয়োজন নাই। তুমি গরীব তাহা ঠাকুর জানেন, তাঁকে তুমি বাড়ীতে বসেই পাবে।

আমার শরীর ভাল নয়। ঠাকুর তোমাকে কুশলে রাখুন এবং খুব প্রেম-ভক্তি বিশ্বাস দিন। তুমি আমার আন্তরিক আশীর্ব্বাদ ও শুভেচ্ছা জানিবে। ইতি

সতত শুভানুধ্যায়ী
শিবানন্দ

৬

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্।

BELUR MATH P.O.
DT. HOWRAH (BENGAL)
13.2.32

শ্রীমান্ বিপিনবিহারী,

তোমার পত্র পাইয়া সকল সংবাদ অবগত হইয়াছি। শরীর ত বাবা সকলের যাবেই, আগে আর পিছে। যখন যার কর্ম্ম শেষ হয়ে যায়, তখনই তাকে তিনি ডেকে নেন। কাল যে কখন পূর্ণ হয়, তিনিই জানেন। তিনি বাবা সকলের মঙ্গলই করেন, তোমার স্ত্রীরও করবেন। তবে তুমি তার প্রতি দুর্ব্যবহার করিয়াছ, তজ্জন্য তোমার যদি অনুতাপ এসে থাকে, তাহাতে তোমার দোষ খণ্ডে যাবে। আর ঐ বিবরণী স্মরণ রেখে সকলের প্রতি দুর্ব্যবহার ত্যাগ করিতে পার, তাহা হইলে তোমার মহৎ কল্যাণই হইবে। প্রার্থনা করি, তিনি তোমার সকল অপরাধ ক্ষমা করুন। খুব প্রার্থনা করিবে। তাঁর কৃপা তোমার উপর নিশ্চয়ই হইবে। আমার শরীর তাঁর কৃপায় একপ্রকার চলে যাচ্ছে। তুমি আমার আশীর্ব্বাদ ও শুভেচ্ছা জানিবে। ইতি

সতত শুভানুধ্যায়ী
শিবানন্দ

৭

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃশরণম্ ।

SRI RAMAKRISHNA MISSION
MYLAPORE (MADRAS)
23.5.1926
৯.২.৩৩

শ্রীমান বীরেশচন্দ্র—

তোমার ৫ই জ্যৈষ্ঠ তারিখের পত্র আজ পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। হতাশ হইও না—প্রভুর শরণাপন্ন হইয়াছ, ভয় নাই। কলেজের পরীক্ষা পাশ করার ন্যায় এ রাজ্যের পরীক্ষা পাশ করা নয়। এ রাজ্যে তাঁর কৃপা ছাড়া অন্য উপায় নাই। আন্তরিকতার সহিত তাঁর কৃপা চাইলেই পাওয়া যায়। ঠাকুর বড় দয়াল, অহেতুকীকৃপাপরবশ হইয়া মনুষ্যদেহ (ধারণ) করিয়াছেন ; আমি তাঁর ইচ্ছায় তোমায় তাঁর শ্রীপাদপদ্মে ফেলিয়া দিয়াছি, এখন তুমি তাঁকে ডাকলেই, সকাতরে প্রার্থনা করিলেই তাঁর কৃপা উপলব্ধি করিতে পারিবে নিশ্চয়ই। আমার আন্তরিক আশীর্ব্বাদ জানিবে, প্রার্থনা করি প্রভু তোমার মঙ্গল করুন। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

স্বামী প্রেমানন্দ

(গান : আশাবরী, একতালা)

স্বামী চণ্ডিকানন্দ

প্রেমের মূরতি কে তুমি হে যতি
জিনি রতিপতি কান্তি তোমার।
চিন্ময় তনু-প্রাণ-মন তব
মণ্ডিত সদা প্রেমে রাধার ॥
শ্রীরাধা-অংশে আসিয়া ভুবনে
বিতরিলে প্রেম অশরণ জনে
তরাইলে তুমি কত অভাজনে
সুজন দুর্জন না করি' বিচার ॥
"মঠের শক্তি ভক্তি যুক্তি" বাবুরামরূপে ধরিয়া কায়
সুরধুনীতীর আলো কর তুমি, শ্রীমায়ের মুখে শুনেছি হায়।
যুগে যুগে তুমি অবতার সনে
"দরদী" দেবতা আসিলে ভুবনে
ওগো "প্রেমানন্দ" প্রণমি চরণে
দাও প্রেমকণা প্রাণে আমার ॥

স্বামী অখণ্ডানন্দের স্মৃতিসঞ্চয়

[পূর্বানুবৃত্তি]

['ভক্তে'র ডায়েরি হইতে]

২৬.১.৩৭—মাস ৩।৪ পূর্বে স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজ **Thacker Spink** (থ্যাকার স্পিঙ্ক) হইতে **Beal** (বিল্)-এর লেখা হিউয়েন্থসাং-এর একটি জীবনী আনান এবং উহা খুব সাগ্রহে পড়েন, যদিও চোখের দৃষ্টি মোটেই পড়িবার মতো ছিল না। এ সম্পর্কে বলিতেছেন: "পড়াশুনা? কত পড়েছি! রাত্রে ভাবতাম—কখন দিন হবে। আহা, এখন তো আর দেখতে পাই না। নোট বই-এ কত কথা লিখেছি! কেই বা দেখে, আর কেই বা পড়ে! একজনও এল না, যে এগুলি পড়ে। উপনিষদ্—নিজে হাতে লিখে তার নোট নিয়েছি।" এইদিন বিকালেই বহরমপুরের ডাক্তার আসিয়া বাবার চক্ষু পরীক্ষা করেন।

২৭.১.৩৭—সকালে একটি ভক্ত প্রণাম করিয়া উঠিয়াছে। বাবা বলিতেছেন, "তোদের কি দিনরাত চশমা পরে থাকতে হয়?" ভক্তটি বলিল, 'আজ্ঞে হাঁ। **Constant wear** (সারাক্ষণ পরা)।' বাবা মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "হাঁ, **Constant wear** (সারাক্ষণ পরা)! কি রে, ঘুমোবার সময়েও চশমা পরে থাকিস? স্বপন দেখতে?" উপস্থিত সকলে এক চোট হাসিয়া উঠিল। তারপর বাবা আবার বলিলেন, "মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) বলতেন—চশমা চোখে দিয়ে দিয়েই চোখ খারাপ হয়ে যায়।"

বাবা ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে কথাবার্তা বলিতেছেন, "আমরা শিখতেই এসেছি। সেই ছেলেবেলা —১৩।১৪ বছর বয়সে পরমহংসদেবের কাছে—ঠাকুরের কাছে গেছি। সেই থেকে এই মোড়লরা পর্যন্ত আমাকে কত কি শিখিয়ে যায়—চাষ-আবাদ সম্বন্ধে, এখনও কত শিখছি।"

"পূর্বজন্মের অনেক সুকৃতি, সংস্কার না থাকলে যথার্থ বৈরাগ্য হয় না। শ্মশান-বৈরাগ্য, মর্কট-বৈরাগ্য—ও-সবে কিছু কাজ হয় না; ও দুদিনের জন্য। কেউ কিছু বললে বৈরাগ্য চলে গেল—যে-কে সেই! আমরা ঠাকুরের ঘর—খাঁটি, ভাবের ঘরে চুরি জানি না।

"দেখ না সব—যারা ভগবানের শক্তিতে দেশের কাজ করে, লোককল্যাণ করে, তারা তাদের নির্দিষ্ট কাজটা না হওয়া পর্যন্ত থামে না, অক্লান্ত-ভাবে খেটে যায়, কিন্তু কাজটি শেষ হয়ে গেলেই চলে যায়। দেখ না স্বামীজীর জ্বলন্ত জীবন! এইখানেই দেখ না একটানা চল্লিশটা বছর কেটে গেল, এ কার শক্তি বোঝ না?"

সন্ধ্যাবেলা বাবা আপন মনে বলিতেছেন, "অনন্তপারং কিল শব্দশাস্ত্রম্ / স্বল্পং তথায়ুর্বহবশ্চ বিঘ্নাঃ। / সারং ততো গ্রাহ্যমপাস্য ফল্গু / হংসৈর্যথা ক্ষীরমিবাম্বুমধ্যাৎ।"

"সেই ছেলেবেলা স্কুল-পালানো বন্ধুদের সঙ্গে গিছি—চাঁদা দিয়ে ভাড়াকরা ঘরে আড্ডা দেবার জন্যে। সেইখানে তারা কত কি সব খেত, তারপর চারটার সময় বই নিয়ে বাড়ি ফিরত। আমাকে কিন্তু একদিনও চুরুট পর্যন্ত খাওয়াতে পারেনি—কত বলত। আমি দেখতাম সব তাদের ভাব। তারপর একদিন ওরা ধান্যেশ্বরী খেয়ে প্রলাপ বকছে—রে দূত কিবা কহ? তারপর দু-জন বন্ধু অজ্ঞান হয়ে পড়ে, রাত্তির হয়ে যায়। দুহাতে দুজনকে নিয়ে ধরে ধরে বাড়ি পৌঁছে দিই। প্রায় দেড়মাইল রাস্তা। তারপর আর যাইনি। ছেলেবেলা বন্ধুদের সঙ্গে পড়ে অনেকে

খারাপ হয়ে যায়। কিন্তু পূর্বসংস্কার ভাল থাকলে বেঁচে যায়।

"তারপর রামায়ণ-মহাভারত শোনার ও পড়ার পর থেকেই ভাবতাম—তপোবন কি সুন্দর! আমি যেন সেখানে গেছি—চারদিকে গাছপালা, ফুলফল,—সবুজ মাঠের ওপর হরিণ বেড়াচ্ছে, পাখিরা গা গাচ্ছে, কত সাধু-মুনি ধ্যান করছেন।

"সেই থেকেই সাধু দেখলেই ছুটে যেতাম, জিগ্যেস করতাম—'কোথা থেকে আসছেন? কোথা কোথা গেছলেন?' তাঁরা বলতেন, 'হিমালয়, হরদোয়ার'। আমি ভাবতাম—'সে কেমন? কোথা?' হিমালয় গঙ্গা কৈলাস ভাবতে ভাবতে চুপ হয়ে যেতাম।

"এক একদিন সাধুদের পিছু পিছু চলে যেতুম। তাঁরা ভয়ে নিতেন না—ছেলেমানুষ ব'লে। কত দূরে দূরে সাধু দেখতে গেছি সেই বয়সে—যখনই শুনেছি কোথাও নতুন সাধু এসেছেন—কখন চিৎপুর সর্বমঙ্গলার কাছে, কখন নারকেলডাঙ্গার পুল পেরিয়ে কাঁকুড়গাছির কাছে, দুই বন্ধু মিলে সাধু দেখতে গেছি। বেশীদিন আর ঘুরতে হ'ল না। ঠাকুরই টেনে নিলেন, ঠাকুরকে পেলাম, ঠাকুর আর স্বামীজীকে পেয়েই সব পাওয়া হয়ে গেল।

"(সেই নবাগত যুবক ভক্তটিকে)—এবার আমার অন্তরে তোমার একটু স্থান হ'ল। নইলে সব আসে আর যায়, মনে থাকে না; ঠাকুর যাদের এখানে এনেছেন, তাদের সবার জন্যেই জানাতে হয়—যারা সামনে আছে—যারা দূরে আছে, তাদের জন্যে বিশেষ ক'রে। এই সব ছেলে—এদের সন্ন্যাসী অবধূত পরমহংস গুরুর কাছে থেকেও বৈরাগ্য হচ্ছে না। কি করা যাবে? আমাদের পূর্বজন্মের সুকৃতি ছিল—বেঁচে গেছি। কত রকমে বৈরাগ্য আসে! তুলসীদাসজী পালকির পেছনে পেছনে চলেছেন কাঁদতে কাঁদতে—বৌয়ের বাপের বাড়ির পথে। বৌয়ের লজ্জা ও তিরস্কার: 'তোমার লজ্জা হয় না? হায় হায়! তুমি আমার রক্ত-মাংসকে যে ভালবাসা দিয়েছ, তা যদি ঠাকুরকে-(ভগবানকে) রামচন্দ্রকে দিতে?' আহা! শেষে ফিরলেন, আসক্তি থেকে বৈরাগ্য।

"তারপর বিল্বমঙ্গল—চিন্তামণি-বেশ্যার ওপর কি টান! পিতৃশ্রাদ্ধ শেষ না ক'রে ঝড়-তুফানে মড়া আঁকড়ে নদী পেরিয়ে সাপ ধরে পাঁচিল টপকে দুর্যোগে রাত্তিরে এসে হাজির। চিন্তামণি প্রথমে খুব চটে গেছে, শেষে করুণা। বললে, হায়, এই টানের এক কণাও যদি তোমার কৃষ্ণের প্রতি হ'ত!' তার ঐ এক কথায় ও বেরিয়ে প'ড়ল। এরকম খুব কম।

"শেখ সাদী কুয়োর ধারে বসে বসে দেখছে—দড়ি ঘসে ঘসে সান কেটে যাচ্ছে; অমনি উদ্দীপনা: 'কি! সংসার-বন্ধন কাটবে না?'

"এক রাজা এক সন্ন্যাসীকে জিগ্যেস করেছে, 'সংসার ছুটবে কি ক'রে?' প্রাসাদের দালানে নিয়ে গিয়ে সন্ন্যাসী রাজাকে বললেন, 'থাম পাকড়ো'। রাজা থামকে জড়িয়ে ধ'রল। 'ছোড় দেও'। রাজা থাম ছেড়ে দিল। সন্ন্যাসী বললেন, ঐসী সংসার ছুট যায় গা।'

"ঠাকুর বলতেন, 'সাধু হবে কারা?—না তালগাছ থেকে হাত-পা ছেড়ে পড়তে পারবে যারা।' সাধু হওয়া কি সহজ কথা? কতখানি সাহস চাই। এতখানি বুকের পাটা চাই, ভগবানের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর, তাঁর জন্য সর্বস্বত্যাগ—এই সব চাই।"

স্বামী পরমানন্দের পরিচিত মিঃ ফিলিপস্ (ব্রঃ পরমচৈতন্য) ক্যালিফর্নিয়ার আনন্দ আশ্রম হইতে এখানে আসিয়াছেন, বেশ মনের আনন্দে আছেন, কাজকর্ম ও জপধ্যান লইয়া জীবনের পথে

আগাইয়া চলিয়াছেন। স্বামী পরমানন্দ তাঁহাকে আমেরিকা ফিরিবার কথা লিখিয়াছেন। বাবাও তাঁহার নিকট আমেরিকার অনেক কথা শুনিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে স্বামী পরমানন্দকে বাবা একটি চিঠি লেখাইলেন :

"প্রিয় পরমানন্দ,

তোমরা ৩০ বছর আমেরিকায় কাজ করিতেছ। বলিতে পারো—স্বামীজীর কাজের পর নতুন কিছু করিয়াছ? সমাজ-জীবনকে স্পর্শ করিতে পারিয়াছ? স্বামীজী চাহিয়াছিলেন exchange of ideas—exchange of men (ভাবের আদান-প্রদান—মানুষের লেনদেন)। তিনি নিজে ৩৪ জনকে এদেশে আনিয়াছিলেন, ৩৪ জনকে ওদেশে পাঠাইয়াছিলেন; কিন্তু তারপর? আমরা তো আমাদের প্রায় ২০টি বিদ্বান্ বুদ্ধিমান্ যুবককে ওদেশের সেবায় পাঠাইয়াছি; ওদেশ সেই অনুপাতে কয়জন সেবক পাঠাইয়াছে? অতএব পরমচৈতন্য যদি এখানে থাকিয়া কাজ করে, তাহাতে ক্ষতি কি? সে practical (করিৎকর্মা) এবং যন্ত্রবিদ্। এদেশে এরূপ লোকেরই প্রয়োজন।

আর এক কথা তাহার মুখে শুনিলাম—আমেরিকা মানেই বড়লোক নয়; সেখানেও গরীব মানুষ আছে, তাহাদের দুঃখ কষ্ট অভাবের অবধি নাই, চোখে জল আছে, কাজ না থাকিলে অনাহারে কাটাইতে হয়, শীতে ঘরের ফাঁকে ফাঁকে ঠাণ্ডা বাতাস জীবন বিপন্ন করে। তোমরা এ-সব সম্বন্ধে কিছু করিয়াছ? আমার তো মনে হয়—আমি ওদেশে গেলে তাহাদেরই মধ্যে কাজ করিতাম, ওখানেও এইরূপ সেবার মধ্যেই ঝাঁপাইয়া পড়িতাম। ইতি"

নববর্ষে : প্রণতি

শ্রীশান্তশীল দাশ

তোমাকে প্রণাম করি হে সুন্দর, চিরদীপ্তিময়,
তোমার আলোকে হোক জীবনের সর্বতমক্ষয়।
প্রসন্ন তোমার আলো, অনির্বাণ শিখা তার নিয়ে
জ্বলুক জীবনপথে, চলি আমি সেই পথ দিয়ে
নির্ভয়ে নিঃশঙ্ক চিত্তে সর্ব দ্বিধা দ্বন্দ্ব করি' জয়।
হে সুন্দর, হে প্রসন্ন, হে শাশ্বত, হে চির অক্ষয়
তোমাকে প্রণাম করি বারংবার নম্র নত শিরে,
তোমার আশিস্ স্নেহ এ জীবন নিত্য থাক ঘিরে।
অনেক আঘাত আছে, অনেক বঞ্চনা আছে জানি,
তবু আছে অচঞ্চল তোমার অমৃত দীপ্তিখানি;
সেই দীপ্তি মুছে দিক জীবনের সমস্ত আঁধার,
খণ্ড ক্ষুদ্র লাভক্ষতি দূর করে তোমার উদার
ব্যাপ্তিমাঝে ডুব দিয়ে এ জীবন হোক অভিরাম—
হে মহান, হে সুন্দর, তোমাকে প্রণমি বারংবার।

কর্মফল

স্বামী ধ্যানানন্দ

পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মতে বৈদিক সংহিতাগুলিতে জন্মান্তরবাদ নেই, সুতরাং পরিপূর্ণ কর্মবাদ, অর্থাৎ কর্মের ফলেই যে জীবের জন্মান্তর হয়, তা' তো একেবারেই নেই। ডক্টর রাধাকৃষ্ণনও ১৯২৩ সালে প্রথম প্রকাশিত তাঁর Indian Philosophy Vol. I-এ এই মত সমর্থন করেছেন (১৯৫৮'র সং, পৃঃ ১১৪ ও ১১৬)। তবে ৩০ বছর বাদে, ১৯৫৩ সালে প্রথম প্রকাশিত The Principal Upanisads গ্রন্থে ঋগ্বেদ সংহিতার দশম মণ্ডলের ষোড়শ সূক্তের তৃতীয় ঋকে জন্মান্তরবাদ আছে ব'লে উল্লেখ করেছেন (১৯৫৩'র সং, পাদটীকাসহ পৃঃ ১১৫)। ঋকৃটি এই :—

সূর্যং চক্ষুর্গচ্ছতু বাতমাত্মা
দ্যাং চ গচ্ছ পৃথিবীং চ ধর্মণা।
অপো বা গচ্ছ যদি তত্র তে
হিতমোষধীষু প্রতি তিষ্ঠা শরীরৈঃ ॥
(১০।১৬।৩)

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ :

হে মৃতব্যক্তি! তোমার চক্ষু-ইন্দ্রিয় সূর্যে গমন করুক। তোমার 'আত্মা' অর্থাৎ প্রাণ বাহ্য বায়ুতে গমন করুক। তুমিও 'ধর্মণা' অর্থাৎ শুভকর্মহেতু শুভকর্মের ফলভোগ করতে স্বর্গে যাও, অথবা এই পৃথিবীতেই এসো। এখানে 'চ'-শব্দটি বিকল্পার্থে। অথবা অন্তরিক্ষলোকেই যাও, যদি সেখানেই তোমার কর্মফল নিহিত থাকে। অথবা শরীরের অবয়বসমূহের সহিত ওষধিবর্গে অবস্থান করো।

এই মন্ত্রটি অথর্ববেদেও (১৮।২।৭) আছে, সামান্য একটু পরিবর্তিত আকারে—'ধর্মণা'-শব্দের স্থলে 'ধর্মভিঃ'-শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। তবে সায়ণ সেখানে যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, তা'তে জন্মান্তরবাদ স্বীকৃত হলেও, কর্মফলেই যে জন্মান্তর তা' মোটেই প্রমাণিত হয় না। 'ধর্মভিঃ'-শব্দের অর্থ করেছেন, 'শরীরধারকৈঃ ইতরৈঃ ইন্দ্রিয়ৈঃ' অর্থাৎ ধারক অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলির সহিত ঋগ্বেদের ভাষ্যে 'ধর্মণা'-শব্দটিকে 'সুকৃতেন' ব'লে ব্যাখ্যা করেছেন।

এই পরিস্থিতিতে এটা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, জন্মান্তরবাদ বৈদিক সংহিতায় নিশ্চয়ই পাওয়া যায় এবং কর্মবাদও সেখানে বীজাকারে বর্তমান। তবে, শুধু উপনিষদের যুগেই কর্মের ফলেই যে জীবের বারংবার শুভাশুভ জন্ম হয়, এই ধারণা সম্যক্ পরিপুষ্টিলাভ করেছিল।

হিন্দুদের এই কর্মবাদ পরবর্তীকালে বৌদ্ধ ও জৈনরা গ্রহণ করেন। যদিও জৈনদের মধ্যে এমন ধারণাও বর্তমান যে আমরা ভারতের আদিম অধিবাসী ও জৈনদের কাছ থেকেই কর্মবাদ গ্রহণ করেছিলেন। এই সব মত-মতান্তর নিয়ে আলোচনা করার স্থান এই প্রবন্ধে নেই তবে, একথা সত্য যে, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মে ঈশ্বর স্বীকৃত না হওয়ার ফলে কর্মবাদের উপর অত্যধিক জোর পড়ে গিয়েছিল। বিশেষতঃ জৈন দার্শনিকগণ এ নিয়ে বিস্তর আলোচনা করেছেন। পৃথিবীর আর কোনও ধর্মে কর্মফলানুযায়ী কর্মের এত শ্রেণীবিভাগ আছে কিনা সন্দেহ।

ভারতীয় দর্শনে হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন সব দর্শনেরই স্থান আছে। যাঁরা কর্মফল সম্বন্ধে বিভিন্ন চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হতে কৌতূহলী, তাঁরা তুলনামূলক অধ্যয়ন করলে অনেক কিছু

জানতে পারবেন, সন্দেহ নেই। কিন্তু এই প্রবন্ধে আমরা হিন্দুশাস্ত্রে কর্মফল সম্বন্ধে কি বলা হয়েছে, শুধু তারই আলোচনা করব। বৈদিক সংহিতা থেকে শুরু ক'রে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ অবধি সুদীর্ঘ পথ আমরা পরিক্রমা করব। সুতরাং অধিকাংশ স্থলেই মূল সংস্কৃত, বা তার টীকা-ভাষ্যের উদ্ধৃতি দেওয়া সম্ভব হবে না; শুধু বঙ্গানুবাদ, ব্যাখ্যা বা মন্তব্য দেওয়া হবে। দিগ্‌দর্শন হিসাবে প্রতি গ্রন্থের দু-একটি মন্ত্র, শ্লোক বা সূত্র আলোচিত হবে। তবে যাঁরা আরও জানতে চান, তাঁদের জন্য আংশিক নির্দেশিকা স্থানে স্থানে দেওয়া হবে।

বৈদিক যুগে আর্যগণ প্রকৃতির পরিবর্তনের মধ্যে যে একটি অপূর্ব নিয়ম শৃঙ্খলা রয়েছে তা' দেখে চমৎকৃত হয়েছিলেন। আদিত্যের প্রাত্যহিক উদয় ও অস্তগমনে, চন্দ্রের সুনিয়ন্ত্রিত হ্রাসবৃদ্ধিতে, গ্রহ-নক্ষত্রের নির্ধারিত গতিতে ও ঋতুসমূহের নিয়মিত আবর্তনে যে শৃঙ্খলা তাঁরা বাহ্য প্রকৃতিতে লক্ষ্য করলেন, মানবজীবনের ঘটনাবলীও যে এই একই সুপরিকল্পিত নিয়মের অধীন এটি তাঁরা ক্রমশঃ আবিষ্কার করলেন। এই নিয়ম-শৃঙ্খলার নাম তাঁরা দিলেন—'ঋত'। 'ঋত' ঋগ্বেদের একটি অতি প্রসিদ্ধ শব্দ। পরবর্তীকালে এই 'ঋত'ই কর্মফল অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে। আচার্য শঙ্কর লিখছেন—'ঋতং সত্যম্ অবশ্যম্ভাবিত্বাৎ কর্মফলম্' (কঠ উপ, ১।৩।১ ভাষ্য); 'ঋত'-শব্দের অর্থ সত্য অর্থাৎ কর্মফল, কারণ তা' অবশ্যম্ভাবী। যা অবশ্যম্ভাবী, তাই ঋত। কর্মফল অবশ্যম্ভাবী, তাই ঋত ও কর্মফলের সমীকরণ করা হয়েছে। ডক্টর রাধাকৃষ্ণনও তাঁর 'Indian Philosophy' গ্রন্থে ঐ কথাই বলেছেন।[১]

আমরা আগেই বলেছি, উপনিষদের যুগেই কর্মফলের ব্যাপকত্ব আর্য ঋষিগণ বহুল পরিমাণে উপলব্ধি করেছিলেন। সুতরাং প্রাচীনতম উপনিষদ্‌গুলি থেকে আমরা এ সম্পর্কে কিছু কিছু উদ্ধৃতি অনুবাদসহ দিচ্ছি:—

কৌষীতকী:

স ইহ কীটো বা, পতঙ্গো বা, মৎস্যো বা, শকুনির্বা, সিংহো বা, বরাহো বা, পরশ্বান্ বা, শার্দূলো বা, পুরুষো বা, অন্যো বা তেষু তেষু স্থানেষু প্রত্যাজায়তে যথাকর্ম যথাবিদ্যম্। (১।২)

এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে মানুষ চন্দ্রলোকে[২] যায়। সেখান থেকে সে তার কর্ম ও জ্ঞান অনুযায়ী কীট, পতঙ্গ, মাছ, পাখি, সিংহ, শূকর, সাপ, বাঘ, মানুষ বা অন্য প্রাণী হয়ে পুনরায় এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ ক'রে বিভিন্ন অবস্থায় পতিত হয়।

নির্দেশিকা: ১।৪

ছান্দোগ্য:

(১) পঞ্চাগ্নিবিদ্যাবিদ্ গৃহস্থরা, গৌণ-সন্ন্যাসীরা অর্থাৎ সন্ন্যাস গ্রহণ করা সত্ত্বেও যাঁদের পূর্ণজ্ঞান হয়নি তাঁরা, শ্রদ্ধাবান ও তপস্বী বানপ্রস্থীরা এবং নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীরা তাঁদের কর্মফলে দেহান্তে উত্তর-মার্গে ব্রহ্মলোকে যান। ব্রহ্মলোকে অবশ্য তাঁরা সোজাসুজি যেতে পারেন না। বিদ্যুৎ-লোক অবধি পৌঁছলে, ব্রহ্মলোক থেকে অমানব কোনও এক পুরুষ এসে তাঁদের ব্রহ্মলোকে নিয়ে যান। তাঁরা সেখানে এক কল্পকাল অশেষ সুখভোগ ক'রে

১ 'It (Rta) is the anticipation of the Law of Karma.,' Vol. I (1958), P. 109
'The great doctrine of Karma is yet in its infancy as Rta.', Ibid P. 116

২ "এ আমাদের এই চন্দ্র একেবারেই নয়, এ দেবগণের আবাসভূমি- অর্থাৎ এখানে প্রাণ মনঃশক্তিরূপে এবং আকাশ তন্মাত্র বা সূক্ষ্মভূতরূপে প্রকাশ পাচ্ছে।"—স্বামী বিবেকানন্দ (বাণী ও রচনা, ৭।২২২)। 'প্রাণ' শক্তি বা এনার্জির সূক্ষ্মতম অবস্থা, 'আকাশ' জড়পদার্থ বা ম্যাটারের সূক্ষ্মতম অবস্থা।

পুনরায় এই মর্ত্যধামে জন্মগ্রহণ করেন। আর, যে সব গৃহস্থেরা যাগযজ্ঞ, জলাশয়াদি খনন মন্দির-নির্মাণ ও দানাদি কর্ম করেন, তাঁরা তাঁদের ঐ সব কর্মফলে দক্ষিণমার্গে পিতৃলোক হয়ে চন্দ্রলোকে যান। যে কর্মগুলির ফলে তাঁদের চন্দ্রলোক-প্রাপ্তি ঘটে, সেগুলির ভোগ শেষ হলেই তাঁরা অবশিষ্ট অন্যান্য কর্মের ফলে এই পৃথিবীতে জন্ম নেন। তাঁদের সেই অবশিষ্ট কর্মগুলি যদি শুভ হয়ে থাকে, তাহলে তাঁরা শুভকর্মের ফলে পবিত্র ব্রাহ্মণ-যোনিতে, ক্ষত্রিয়যোনিতে বা বৈশ্যযোনিতে জন্মলাভ করেন। পক্ষান্তরে অবশিষ্ট কর্মগুলি যদি অশুভ হয়ে থাকে, তাহলে তাঁরা অশুভকর্মের ফলে নীচযোনিতে জন্মলাভ করেন।

আর যারা এই দুই শ্রেণীর মধ্যে পড়ে না অর্থাৎ যারা শাস্ত্রীয়কর্মরহিত, তারা না উত্তরমার্গ না দক্ষিণমার্গ কোন পথেই যায় না। এখানেই কীটপতঙ্গ হয়ে জন্মায় আর মরে। (৫।১০।১-৮)

(২) এই উপনিষদে নানা রকমের বিদ্যা অর্থাৎ উপাসনার কথা আছে। পঞ্চাগ্নি-বিদ্যা আছে পঞ্চম অধ্যায়ে। প্রায় প্রতি অধ্যায়েই এক বা একাধিক উপাসনা ও তাদের ফলের কথা উল্লিখিত হয়েছে। সাধারণতঃ কর্ম ও উপাসনাকে দু'টি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। কিন্তু উপাসনাও মানস কর্ম ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই 'কর্মফল' শীর্ষক প্রবন্ধে উপাসনার ফল সম্বন্ধে আলোচনা বা উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক নয়। ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ের উপাসনাগুলির ফল বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়।

(৩) ইহ আচার্যবান্ পুরুষো বেদ তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যে অথ সম্পৎস্যে ইতি। (৬।১৪।২)

এই সংসারে আচার্যকে লাভ করেই মানুষ জ্ঞান প্রাপ্ত হয়। জ্ঞানীর বিদেহমুক্তির ততক্ষণই দেরী, প্রারব্ধবশতঃ যতক্ষণ পর্যন্ত না তাঁর দেহত্যাগ ঘটে। আলোচ্য অংশের ব্যাখ্যায় শঙ্কর কর্মকে দু'টি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন—প্রবৃত্তফল ও অপ্রবৃত্তফল। প্রবৃত্তফল, অর্থাৎ যে কর্মসমূহের ফলভোগের জন্য বর্তমান দেহ হয়েছে। একেই প্রারব্ধ বলে। অপ্রবৃত্তফল, অর্থাৎ পূর্ব পূর্ব জন্মে কৃত কর্মসমূহের সঞ্চিতফল এবং এ জীবনে জ্ঞানের পূর্বে কৃত কর্মের ফল ও জ্ঞানের পরে কৃত বা ক্রিয়মাণ কর্মের ফল—যা এখনও ফল দিতে শুরু করেনি। অপ্রবৃত্তফল কর্ম জ্ঞানের দ্বারা বিনষ্ট* হয়। প্রারব্ধ কর্মের ফল, যতক্ষণ শরীর থাকে, ভোগ করতে হয়। যেমন একটি বাণ ছোড়া হলে সেটি লক্ষ্যভেদ করেছে বলেই থেমে যায় না, লক্ষ্যভেদ করেও খানিক দূর গিয়ে তবে থামে, সেই রকম জ্ঞান লাভ হয়েছে বলেই প্রারব্ধ কর্মের ফল শেষ হয়ে যায় না, জ্ঞানলাভের পরও যতক্ষণ শরীর থাকে ততক্ষণ সেই ফলের গতি চলতে থাকে। এখানে জ্ঞানলাভ লক্ষ্যভেদের সঙ্গে উপমিত হয়েছে।

নির্দেশিকা: ৪।১৪।৩, ৪।১৫।৫, ৫।২৪।৩, ৭।৪।২, ৭।৭।২, ৭।৯।২, ৭।১১।২, ৭।১২।২, ৮।২।১-২, ৮।৪।১, ৮।১৩।১

বৃহদারণ্যক:

(১) বিদেহরাজ জনকের এক বিরাট যজ্ঞে বহু বিদগ্ধ ব্রাহ্মণ উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিৎ তাঁকে স্বর্ণ-মণ্ডিত-শৃঙ্গ এক হাজার গাভী দান করবেন, এই স্থির ক'রে জনক বললেন—'হে পূজনীয় ব্রাহ্মণগণ, আপনাদের মধ্যে যিনি ব্রহ্মিষ্ঠ তিনি এই গাভীদের নিয়ে

* জ্ঞানের পরে কৃত বা ক্রিয়মাণ কর্মের ফল সম্পর্কে এখানে শংকর 'দগ্ধ' হয়ে যায় লিখেছেন। ব্রহ্মসূত্রে বলা হয়েছে ঐ কর্মের 'অশ্লেষ' হয়ে যায়। যথাস্থানে তা আলোচিত হবে।

যান।' সকলেই নীরব। তখন যাজ্ঞবল্ক্য উঠে তাঁর শিষ্যকে ঐ গাভীদের নিয়ে যেতে বললেন। ব্রাহ্মণরা ক্রুদ্ধ হলেন এই প্রগল্‌ভতায়। রাজাশ্রিত অশ্বল তো রেগেই বললেন—'আপনিই বুঝি আমাদের সকলের মধ্যে ব্রহ্মিষ্ঠ?' যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর দিলেন—'আমরা ব্রহ্মিষ্ঠকে নমস্কার করি, ইদানীং আমরা কেবল গোধনকামী।' তারপর তাঁর সঙ্গে প্রথমেই অশ্বলের তর্ক হ'ল। অশ্বল পরাস্ত হলেন। এবার উঠলেন আর্তভাগ। তিনি এক এক ক'রে পাঁচটি প্রশ্ন করলেন। শেষ প্রশ্নটি ছিল—মৃতব্যক্তির ইন্দ্রিয়গুলি যখন তাদের নিজ নিজ উৎপত্তিস্থলে চলে যায় তখন শেষ অবলম্বন কি থাকে? অর্থাৎ কি কারণকে অবলম্বন করে তাঁর পুনর্জন্ম হয়? যাজ্ঞবল্ক্য বললেন—এ প্রশ্নের মীমাংসা এই ভীড়ের মধ্যে হবে না। অনেকগুলি কারণ আছে—'এই কারণে হয়', 'না, এ কারণে হয়', এই ব'লে পণ্ডিতেরা হট্টগোল করবে। চলো নিরালাতে যাই। এই ব'লে তু'জনে পরমাত্মীয়ের মতো হাত ধরে একান্তে গিয়ে অনেক আলোচনা করলেন। কাল, কর্ম, দৈব ও ঈশ্বরের মধ্যে কর্মকেই তারা প্রধান কারণ ব'লে সিদ্ধান্ত করলেন। কাল, দৈব ও ঈশ্বর হলেন গৌণ কারণ। অর্থাৎ মুখ্যতঃ কর্মেরই ফলে জীবের পুনর্জন্ম হয়। মানুষ বিহিত কর্ম ক'রে পুণ্যাত্মা হয় ও দেবাদিযোনিতে জন্ম নেয়; নিষিদ্ধ কর্ম ক'রে পাপাত্মা হয় এবং পশুপক্ষী হয়ে জন্মায়। (৩।২।১৩—শাঙ্কর ভাষ্য, আনন্দগিরি ও রঙ্গরামানুজের টীকা অবলম্বনে)।

(২) 'ত্রয়ং বা ইদং নাম রূপং কর্ম' (১।৬।১)।

এই সমস্ত জগৎই, নাম, রূপ ও কর্ম এই তিন পদার্থস্বরূপ। কর্ম হচ্ছে নাম ও রূপ এই দুয়ের ব্যাপার। নাম ও রূপ মিথ্যা, সুতরাং নাম-রূপের ব্যাপার কর্মও মিথ্যা। কর্ম মিথ্যা হলে, কর্মের ফলও মিথ্যা। মনে রাখতে হবে 'মিথ্যা' অদ্বৈত-বেদান্তের একটি পারিভাষিক শব্দ। আমরা চলতি বাংলায় যে অর্থে 'মিথ্যা'-শব্দটি প্রয়োগ করি, নাম, রূপ, কর্ম, কর্মফল—এক কথায় এই জগৎ সেই অর্থে মিথ্যা নয়। মিথ্যা মানে আকাশ-কুসুম, বন্ধ্যাপুত্র, শশশৃঙ্গ অর্থাৎ খরগোসের -এর মতো অলীক নয়। 'মিথ্যা' একটি প্রতীতি মাত্র, যার বাস্তব সত্তা নেই—যেমন মরুভূমিতে মরীচিকা, রজ্জুতে সর্পভ্রম, শুক্তিতে রজতভ্রম, এক চন্দ্রকে নেত্ররোগহেতু দ্বিচন্দ্ররূপে দেখা, আকাশকে অধ-গোলাকার দেখা, ট্রেনে যেতে যেতে স্থির গাছ-গুলিকে বিপরীত দিকে ছুটতে দেখা, ইত্যাদি।

'যত্র সুপ্তো ন কঞ্চন কামং কাময়তে, ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি' (৪।৩।১৯)। সুষুপ্তি অবস্থার বর্ণনা-প্রসঙ্গে বলা হচ্ছে যে, সুষুপ্ত ব্যক্তি কোনই কামনা করেন না, কোনই স্বপ্ন দেখেন না। 'কঞ্চন'—কোনই স্বপ্ন দেখেন না, এই 'কঞ্চন'—শব্দের ব্যঞ্জনা হচ্ছে, জাগ্রৎ অবস্থায়ও জীব স্বপ্নই দেখে—'জাগরিতেঽপি যদ্ দর্শনং তদ্ অপি স্বপ্নং মন্যতে শ্রুতিঃ অত আহ ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি ইতি' (শাংকরভাষ্য)। অতএব জাগ্রৎ অবস্থাই যখন স্বপ্নবৎ মিথ্যা, তখন কর্মও মিথ্যা, কর্মফলও মিথ্যা—ব্যবহার-দশায়—অজ্ঞান-দশায় কর্ম ও কর্মফল সত্য হলেও, পরমার্থতঃ কর্ম ও কর্ম-ফল মিথ্যা। এই হ'ল অদ্বৈতবেদান্তের সিদ্ধান্ত।

নির্দেশিকা: ৪।৪।৩-৬, ৪।৩।১২, ৬।২।১৫-১৬

কঠোপনিষৎ:

(১) যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ।
স্থাণুমন্যেঽনুসংযন্তি যথাকর্ম যথাশ্রুতম্॥
(২।২।৭)

ইহজন্মে কৃত কর্মের ও অর্জিত জ্ঞানের ফলে কোন কোন জীব মৃত্যুর পরে পুনরায় শরীর-ধারণের জন্য মাতৃগর্ভে প্রবেশ করে, অপরে বৃক্ষাদিরূপে জাত হয়।

(২) 'একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্' ইত্যাদি (২।২।১৩)

এক অদ্বিতীয় সর্বেশ্বর যিনি বহু জীবের কর্মফল বিধান করেন, ইত্যাদির ভাষ্যে শংকর লিখেছেন—ঈশ্বর যে শুধু কর্মানুসারেই জীবকে ফল দেন, তা নয়, কর্ম-নিরপেক্ষ ফলও দিয়ে থাকেন, সেটি তাঁর অনুগ্রহ: 'সর্বজ্ঞঃ সর্বেশ্বরঃ কামিনাং সংসারিণাং কর্মানুরূপং কামান্ কর্মফলানি, স্বানুগ্রহনিমিত্তাংশ্চ কামান্ য একো বহূনাম্ অনেকেষাম্ অনায়াসেন বিদধাতি প্রযচ্ছতি ইতি এতৎ।' অর্থাৎ সর্বজ্ঞ, সর্বেশ্বর সংসারীদের কর্মানুরূপ ফল এবং তাঁর নিজের অনুগ্রহনিমিত্ত ফলও অনায়াসেই দিয়ে থাকেন।

নির্দেশিকা: ১।২।১০, ১।৩।১

ঐতরেয়: 'স ঈক্ষতেমে নু লোকাশ্চ লোকপালাশ্চ। অন্নমেভ্যঃ সৃজা ইতি' (১।৩।১)

ঈশ্বর পর্যালোচনা করলেন—'এই লোকসমূহ ও লোকপালসমূহ তো সৃষ্ট হ'ল, এখন এদের জন্য অন্ন সৃষ্টি করি'।

এরও ভাষ্যে শংকর লিখেছেন—'মহেশ্বরস্য অপি সর্বেশ্বরত্বাৎ সর্বান্ প্রতি নিগ্রহে অনুগ্রহে চ স্বাতন্ত্র্যমেব', অর্থাৎ মহেশ্বর সকলেরই প্রভু ব'লে সকলেরই নিগ্রহে ও অনুগ্রহে তাঁর স্বাধীনতা আছে। ফলতঃ কঠ ২।২।১৩র উপরে উদ্ধৃত ভাষ্যে যা বলেছেন, সেই কর্মনিরপেক্ষ ফল-দানের কথা এখানেও বলেছেন।

মুণ্ডক:

(১) ইষ্টাপূর্তং মন্যমানা বরিষ্ঠং
নান্যচ্ছ্রেয়ো বেদয়ন্তে প্রমূঢ়াঃ।
নাকস্য পৃষ্ঠে তে সুকৃতেঽনুভূত্বে-
মং লোকং হীনতরং বা বিশন্তি॥
(১।২।১০)

অতিশয় মূঢ় ব্যক্তিরা যাগযজ্ঞ ও জলাশয় খননাদি কর্মকেই শ্রেষ্ঠ মনে করে—তার চেয়ে শ্রেয়ঃ কিছু আছে তা জানে না। ভোগভূমি স্বর্গে তারা তাদের ঐ কর্মের ফল ভোগ ক'রে আবার এই পৃথিবীতে মানুষ হয়ে অথবা পশুপক্ষী হয়ে জন্মায়।

(২) ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥

পরাবর অর্থাৎ কারণরূপে শ্রেষ্ঠ ও কার্যরূপে নিকৃষ্ট, সেই পরমাত্মা দৃষ্ট হলে, দর্শনকারীর হৃদয়ের গ্রন্থি বিনষ্ট হয়, সব সংশয় চলে যায় এবং প্রারব্ধ ভিন্ন অন্য সমস্ত কর্মের ফল ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

নির্দেশিকা: ১।১।৮, ১।২।১, ১।২।৩, ১।২।৫-৭, ১।২।৯, ১।২।১১-১২, ৩।২।২

প্রশ্নোপনিষৎ: যাঁরা যাগযজ্ঞাদি 'ইষ্ট'কর্ম, জলাশয়-খনন, মন্দির-নির্মাণ ইত্যাদি 'পূর্ত'কর্ম এবং দানাদি 'দত্ত' কর্ম করেন, সেই সন্তানার্থী গৃহস্থগণ তাঁদের ঐ সব সকাম কর্মের ফলে দক্ষিণমার্গে চন্দ্রলোকে যান। তাঁদের এই পৃথিবীতে ফিরে আসতে হয়। আর যাঁরা তপস্যা, ব্রহ্মচর্য ও শ্রদ্ধা সহকারে উপাসনাদি করেন, তাঁরা তাঁদের ঐ নিষ্কাম উপাসনাদি কর্মের ফলে উত্তরমার্গে আদিত্যলোকে যান এবং এই পৃথিবীতে আর ফিরে আসেন না। (১।৯-১০)

নির্দেশিকা: ৩।৭, ৫।৩-৫

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ:

গুণান্বয়ো যঃ ফলকর্মকর্তা
কৃতস্য তস্যৈব স চোপভোক্তা।
স বিশ্বরূপস্ত্রিগুণস্ত্রিবর্ত্মা
প্রাণাধিপঃ সঞ্চরতি স্বকর্মভিঃ॥ (৫।৭)

সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনগুণযুক্ত হ'য়ে ফলকামনায় কর্ম ক'রে জীব সেই কৃতকর্মের ফল ভোগ করে। পঞ্চপ্রাণের অধীশ্বর, সে নিজ কর্মফলেই বিশ্বরূপ হয় অর্থাৎ অসংখ্য বিচিত্র দেহ ধারণ করে এবং সত্ত্বাদি ত্রিগুণমণ্ডিত হ'য়ে দেব-

যান, পিতৃযান বা কীটাদি-শরীর-প্রাপ্তিরূপ তৃতীয় মার্গে পরিভ্রমণ করে।

নির্দেশিকা: ১।৬, ৫।১১-১২, ৬।৩-৪

উপনিষদে কর্মফল-প্রসঙ্গ আমরা এইখানেই শেষ করছি।

গীতা: গীতায় সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস ভেদে তিন রকমের কর্মের কথা বলা হয়েছে (১৮।২৩-২৫)। এগুলি অতি প্রয়োজনীয় কথা। রাজস ও তামস কর্ম যাঁরা করেন, তাঁদের তো 'আমি কর্তা' এই বোধ থাকবেই, সুতরাং তাঁদের পুনর্জন্ম হবেই। আর সাত্ত্বিক কর্মেরও কর্তার যদি 'আমি কর্তা' বোধ থাকে, তাহলে তাঁরও মুক্তি হবে না। সাত্ত্বিক কর্ম করার ফলে সেই দেহান্তে তার ঊর্ধ্বে দেবাদিলোকে গতি হবে। রাজস ও তামস কর্ম করা হলে সেই ব্যক্তিদের পৃথিবীতে যথাক্রমে মানুষরূপে বা পশুপক্ষিরূপে জন্ম নিতে হবে (১৪।১৮)। শুভ কর্মের নির্মল, সাত্ত্বিক ফল; রাজস কর্মের ফল দুঃখ, তামস কর্মের ফল অজ্ঞান। (১৪।১৬)

কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি॥ (২।৪৭)

এর ভাষ্যে শংকর লিখছেন—"কর্মেই তোমার অধিকার, জ্ঞাননিষ্ঠায় নয়। কর্মফলে যেন তোমার কখনও আসক্তি না হয়। কর্মফলে আসক্ত হলে কর্মের ফলস্বরূপ পুনর্জন্ম হবে, তুমি সেই পুনর্জন্মের কারণ হয়ো না। 'কর্মের ফলই যদি না চাই, তাহলে কষ্টকর কর্ম ক'রে আমার লাভ কি?'—এ-বুদ্ধি ক'রে যেন নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থেকো না। অর্থাৎ অনাসক্ত হয়ে কর্মই ক'রে যাও। এই তোমার মুক্তি-পথ।"

কর্মফলেই ইষ্টানিষ্ট দেহ ধারণ করতে হয়। তাই সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে সমবুদ্ধি ব্যক্তিরা কর্মজ ফল ত্যাগ ক'রে, মনীষী অর্থাৎ জ্ঞানী হ'য়ে, পুনর্জন্মের বন্ধন থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে বিষ্ণুর পরম পদ লাভ করেন। (২।৫১)।

উপনিষদ্‌গুলিতে আমরা কর্মফলে দেবযান বা উত্তরমার্গে এবং পিতৃযান বা দক্ষিণমার্গে গতির কথা পেয়েছি। গীতাতেও ঐ কথা বলা হয়েছে (৮।২৪-২৬)। কর্মফলে যে ব্রহ্মলোক থেকেও অনেকে পৃথিবীতে ফিরে আসেন, সে কথার উল্লেখ আছে গীতার ৮।১৬ সংখ্যক শ্লোকে। শ্রীধরস্বামীর টীকায় আছে, যাঁরা 'কর্মের' দ্বারা ব্রহ্মলোকে যান, তাঁরাই ফিরে আসেন। আনন্দগিরির মতে পঞ্চাগ্নিবিদ্যা প্রভৃতি 'উপাসনার' ফলেও ব্রহ্মলোক থেকে কল্পান্তরে ফিরে আসতে হয়। সগুণ ঈশ্বরের উপাসনা ক'রে যাঁরা ব্রহ্মলোকে যান তাঁদের পুনরাবৃত্তি হয় না—এই সিদ্ধান্তে ভাষ্যকার শংকর ও শ্রীধর স্বামী, আনন্দগিরি, গোবিন্দানন্দ প্রভৃতি টীকাকাররা সকলেই একমত।

শ্রদ্ধাশীল হয়ে ধ্যানযোগে প্রবৃত্ত সাধক যদি পরে বিষয়প্রবণতাহেতু ধ্যানাভ্যাসে শিথিলপ্রযত্ন হয়ে জ্ঞানলাভে অসমর্থ হ'ন, তাহলেও ইহলোকে বা পরলোকে তাঁর দুর্গতি হয় না। তিনি তাঁর শুভকর্মফলে দেহান্তে পুণ্যলোকে বহু কাল সুখে অতিবাহিত ক'রে সদাচারী ধনীদের ঘরে জন্ম নেন, যদি তাঁর পূর্বজন্মকৃত যোগাভ্যাস অল্পকালের জন্য হয়ে থাকে। আর যদি দীর্ঘকাল তিনি যোগাভ্যাস ক'রে থাকেন, তাহলে ধীমান, দরিদ্র যোগীদের ঘরেই তাঁর জন্ম হয়, যা দুর্লভতর জন্ম, কারণ পূর্বজন্মে কৃত যোগাভ্যাসের ফলে তাঁর যে ব্রহ্মবিষয়িণী বুদ্ধি উৎপন্ন হয়েছিল, তা' তিনি সংস্কারবশে লাভ করেন এবং সম্যক্‌সিদ্ধির জন্য চেষ্টিত হন। পূর্বজন্মের অভ্যাসের ফলে তিনি যেন অবশ হয়েই বেদোক্ত সমস্ত কর্মফল অতিক্রম ক'রে মুক্তিলাভ করেন। পরাগতি এক জন্মেই লাভ করা যায় না। অনেক জন্মের প্রচেষ্টার ফলে কিছু কিছু পুণ্যসঞ্চয় ক'রে, নিষ্পাপ

হয়ে, তবেই তা লব্ধ হয়। (৬।৩৭-৪৫)

সকাম ব্যক্তিরা বেদোক্ত যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান ক'রে পুণ্যকর্মের ফলে স্বর্গে যান এবং সেখানে দেবগণের ভোগ্য সুখ ভোগ ক'রে পুণ্য ক্ষীণ হ'লে আবার এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন এইভাবে শুধু বৈদিক কর্মকাণ্ডেই আবদ্ধ থাকায় তাঁদের বারংবার জন্মমৃত্যু হতে থাকে। (৯।২০-২১)

যারা ব্রতাদি পালন ক'রে ইন্দ্রাদি দেবগণের পূজা করে, তারা তাদের কৃত কর্মের ফলে দেবগণকে প্রাপ্ত হয়। যারা শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াপরায়ণ হয়ে পিতৃগণেরই প্রতি ভক্তিমান, তারা পিতৃগণকে প্রাপ্ত হয়। যারা ভূতপ্রেতাদির সিদ্ধির জন্য অনুষ্ঠানাদি করে, তারা ভূতপ্রেতগণকে প্রাপ্ত হয়। আর যাঁরা শ্রীভগবানকেই ভজনা করেন, তাঁরা তাঁকেই পেয়ে মুক্ত হন। আহার যজ্ঞ, দান, তপস্যা, ইত্যাদি যা কিছু করা যায়, সবই শ্রীভগবানকে অর্পণ করলে কর্মের শুভাশুভ ফল ভক্তকে বাঁধতে পারে না, তিনি সহজেই ভগবানকে লাভ করেন। (৯।২৫-২৮)

'জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা' (৪।৩৭)। এর ব্যাখ্যায় আচার্য শংকর প্রারব্ধ, সঞ্চিত, ইহজন্মে জ্ঞানের পূর্বে কৃত ও জ্ঞানোৎপত্তির পরে কৃত কর্মের ফলের বিষয়ে বিচার করেছেন। ছান্দোগ্য উপনিষদের 'তস্য তাবদেব চিরম্'-এর ব্যাখ্যায় আমরা এই প্রসঙ্গের উল্লেখ করেছি। পুনরাবৃত্তি অনাবশ্যক। গীতার ৫।১৩র ভাষ্যে শংকর 'প্রারব্ধফলকর্ম'-শব্দের প্রয়োগ করেছেন। বস্তুতঃ সংক্ষেপে আমরা 'প্রারব্ধকর্ম' ব'লে উল্লেখ করলেও 'প্রারব্ধফলকর্ম' বলাই উচিত —অর্থাৎ যে সব কর্মের ফল 'প্রকৃষ্টরূপে আরব্ধ হয়েছে (বহুব্রীহি)। অবশ্য 'কর্ম'শব্দের একটি অর্থ 'কর্মফল'। সেই অর্থে নিলে, 'প্রারব্ধকর্ম'-কথাটি প্রকৃততাৎপর্যবোধক। এই রকম 'ক্রিয়মাণ কর্মকে আমরা 'আগামিকর্ম' বলি। কিন্তু 'আগামিফল-কর্ম' বললেই অর্থটি পরিষ্কার হয়। নতুবা 'কর্ম' বলতে 'কর্মফল' বুঝে নিতে হবে।

কর্মফলের উৎপত্তি অবিদ্যা থেকে। যে-ক্রমে এই উৎপত্তি সেটি এই : অবিদ্যা—সংকল্প—কাম —ক্রতু—কর্ম—কর্মফল। অবিদ্যা=দ্বৈতবুদ্ধি। সংকল্প=বিষয়ে মনোরমত্ববুদ্ধি ('সংকল্পঃ শোভনাধ্যাসঃ'—গীতা ৬।২৪, আনন্দগিরি-টীকা)। কাম=কামনা। ক্রতু=দৃঢ় নিশ্চয়। ক্রতুর পরেই কর্ম; কর্ম করলেই কর্মফল। (৬।৪ এবং ৬।২৪ শাংকর ভাষ্য ও আনন্দগিরির টীকা দ্রষ্টব্য)।

কর্মের তিন রকমের ফল—অনিষ্ট, ইষ্ট ও মিশ্র। অনিষ্ট–নরকপ্রাপ্তি বা পশুপক্ষী হয়ে জন্মগ্রহণ; ইষ্ট—দেবাদিলোকপ্রাপ্তি; মিশ্র —মনুষ্যজন্ম। যারা 'অত্যাগী', অর্থাৎ ত্যাগী নয়, মৃত্যুর পর তাদেরই এই তিন রকমের ফল-প্রাপ্তি ঘটে; 'সন্ন্যাসী'দের কখনও তা হয় না (১৮।১২)। শংকর 'অত্যাগী'র অর্থ করেছেন, অজ্ঞ, কর্মী ইত্যাদি, 'সন্ন্যাসী'র অর্থ করেছেন জ্ঞানী পরমহংস; 'ফল'-শব্দের সংজ্ঞা দিয়েছেন —'ফল্গুতয়া লয়ম্ অদর্শনম্ গচ্ছতীতি ফলম্,' অর্থাৎ যা তুচ্ছ ব'লে (শীঘ্রই) লয় পায় তাই হচ্ছে 'ফল'। শংকরের সিদ্ধান্ত এই যে, কর্মফল ঈশ্বরে সমর্পণ করলেই ফলাভাব ঘটেনা, বরং সর্বশ্রেষ্ঠ ফল লাভ হয়ে থাকে—চিত্ত সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ হয়ে যায় ও একমাত্র সদ্‌বস্তু তাতে প্রতিফলিত হওয়ায় মুক্তি হয়; কোনও প্রতিবন্ধক হেতু যাঁদের অতটা নাও হয়, তাঁরাও ব্রহ্মলোকে যান, এবং ক্রমমুক্তি লাভ করেন; সুতরাং এও খুব বড় রকমের ফলই হ'ল; ফলপ্রাপ্তি ঘটে না শুধু পূর্ণজ্ঞানীদেরই—তাঁদের কৃত কর্ম কোনই ফল প্রসব করে না। যাই হোক, অব্যবহিত পূর্ব শ্লোকে (১৮।১১) 'যস্তু কর্মফলত্যাগী স ত্যাগী-

ত্যভিধীয়তে' অর্থাৎ যিনি কর্মফলত্যাগী তাঁকেই ত্যাগী বলা হয়, 'যিনি কর্মফল ত্যাগ করেন, তিনিই যোগী, তিনিই সন্ন্যাসী' (৬।১)। শ্রীভগবানের এই সব কথার পরিপ্রেক্ষিতে শংকরের ব্যাখ্যা কতটা মূলানুগ তা তর্কের বিষয়। শ্রীধরস্বামী 'সন্ন্যাসী'র অর্থ করেছেন 'কর্মফলত্যাগী'। শংকরের ব্যাখ্যা তিনি গ্রহণ করেননি।

কর্মের ফলেই আমাদের বারংবার জন্মমৃত্যু হচ্ছে—কর্মবাদের এটাই বড় কথা নয়। অথবা পুণ্যের ফলে উর্ধ্বগতি এবং পাপের ফলে অধোগতি হয়, এটাও বড় কথা নয়। বড় কথা হচ্ছে, কি ক'রে এই জন্মমৃত্যুর চক্র থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়—কি কর্মের ফলে সকল কর্মফলের হাত থেকে চিরকালের মতো অব্যাহতি পাওয়া যায়। এইটিই হচ্ছে কর্মবাদের মর্মকথা। আমাদের শাস্ত্রে, বিশেষতঃ গীতায়, সেই কথাই পাওয়া যায়। গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ের পাঁচটি শ্লোকে (৭-১১) ২০টি সাধনের কথা ও ষোড়শ অধ্যায়ের প্রথম তিনটি শ্লোকে ২৬টি দৈবী সম্পদের কথা বলা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৫৫-৭১-সংখ্যক শ্লোকে স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণের কথা সাধকের সাধনার জন্য বলা হয়েছে। দ্বাদশ অধ্যায়ের শেষ ৮টি শ্লোকে সেই সব গুণের কথা বলা হয়েছে, যা অনুশীলন করলে ভগবান প্রীত হয়ে ভক্তকে মৃত্যুসংসারসাগর থেকে উদ্ধার করেন। অব্যভিচারী ভক্তির দ্বারাই যে ত্রিগুণাতীত হওয়া যায় তা বলা হয়েছে চতুর্দশ অধ্যায়ের ২৬-সংখ্যক শ্লোকে। এ ছাড়া বহু স্থলেই কায়িক, বাচিক ও মানসিক সব রকম কর্মের কথাই বলা হয়েছে যার ফলে মোক্ষের দ্বার উন্মোচিত হয়।

আর একটি মাত্র বিষয়ের আলোচনা ক'রে গীতায় কর্মফল-প্রসঙ্গের উপসংহার করব। সেটি হচ্ছে প্রায়শ্চিত্ত। পাপকর্মের ফলেই যত রকমের দুঃখভোগ, এবং প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা পাপের খণ্ডন হয়, এটি কর্মবাদে একটি বিশেষ স্থান অধিকার ক'রে রয়েছে। স্মৃতিশাস্ত্র ও পুরাণাদি আলোচনার সময়ে এই প্রায়শ্চিত্তের কথা বারংবার উঠবে। তাই গীতা থেকেই এই প্রসঙ্গ একটু উত্থাপন করা হচ্ছে। গীতায় সম্ভবতঃ সব চেয়ে প্রসিদ্ধ ও বহুল-উদ্ধৃত শ্লোক হচ্ছে—

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥
(১৮।৬৬)

এটিকে একভাবে গীতার অন্তিম শ্লোক বলা যেতে পারে, কারণ এর পর শ্রীভগবান যা বলেছেন তা' গীতাসম্প্রদায়-প্রবর্তনের কথা ও গীতার মাহাত্ম্যের কথা। সুতরাং এই অতি গুরুত্বপূর্ণ শ্লোকটির প্রকৃত মর্ম গ্রহণ করা বিশেষ প্রয়োজন। শ্রীকৃষ্ণের শেষ কথা হ'ল—হে অর্জুন, তুমি শোক কোরো না, তোমায় আমি সব পাপ থেকে মুক্ত করব। তুমি 'সর্বধর্মত্যাগ' ক'রে আমার শরণাগত হও। এই 'সর্বধর্মত্যাগ' কথাটি নিয়েই হয়েছে যত মুশকিল! অনেক টীকা-ভাষ্য হয়েছে। আচার্য রামানুজ ২টি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। দ্বিতীয় ব্যাখ্যায় বলেছেন—'কৃচ্ছ্র, চান্দ্রায়ণ, কুষ্মাণ্ড, বৈশ্বানর, প্রাজ্যপত্য-আদি ব্রত ও ব্রাতপতি, পবিত্রেষ্টি, ত্রিবৃৎ, অগ্নিষ্টোম আদি যজ্ঞ-রূপ সব ধর্ম পরিত্যাগ ক'রে আমার শরণ নাও, ইত্যাদি। অর্থাৎ রামানুজ প্রায়শ্চিত্ত-ধর্মের উল্লেখ করেছেন। বাস্তবিক, পাপের ভয় বড় ভয়। পাপ করলেই ভুগতে হবে। কেউই প্রতিজ্ঞা ক'রে বলতে পারে না যে আমরণ নিষ্পাপ থাকবো, কারণ, সুনিপুণ লোকদেরও সূক্ষ্ম অপরাধে অপরাধী হতে দেখা যায়—'ন···প্রতিষিদ্ধবর্জনং জন্মপ্রয়াণান্তরালে কেনচিৎ প্রতিজ্ঞাতুং শক্যম্। সুনিপুণাম্ অপি সূক্ষ্মাপরাধদর্শনাৎ' (ব্রঃ সূঃ ৪।৩।১৪, শংকরভাষ্য)।

প্রায়শ্চিত্তের তো শেষ নেই, আর তা'

ঐকান্তিকও নয়, অর্থাৎ চিরকালের মতো সব পাপ খণ্ডন করতে পারে না। তাই একমাত্র ঈশ্বরের শরণাগতিতেই জীব নিশ্চিন্ত হতে পারে। অন্য কোনও পন্থা নেই।

মহাভারত (গীতার অতিরিক্ত) :

মহাভারতের এক লক্ষ শ্লোকের মধ্যে কর্ম ও কর্মফল সম্বন্ধীয় হাজার হাজার শ্লোক পাওয়া যাবে। সেগুলি সংকলিত করলে একটি সংক্ষিপ্ত মহাভারত হয়ে দাঁড়াবে। শান্তি পর্বেরই ১৪ হাজার শ্লোকের মধ্যে কয়েক হাজার শ্লোক কোন না কোন ভাবে কর্ম ও কর্মফল-সংক্রান্ত। সুতরাং এ যাবৎ আমরা যা আলোচনা করিনি প্রথমতঃ সেই রকম একটি বিষয়ের উল্লেখ করছি :—

তত্রাপি লভতে দুঃখং তত্রাপি লভতে সুখম্।
ক্রোধলোভৌ তু তত্রাপি কৃত্বা ব্যসনমৃচ্ছতি॥
প্রীণিতশ্চাপি ভবতি মহতোঽর্থানবাপ্য হি।
করোতি পুণ্যং তত্রাপি জীবন্নিব চ পশ্যতি॥
(১২।২৫৩।৯-১০)

অর্থাৎ স্বপ্নাবস্থায় জীব দুঃখ ও সুখ অনুভব করে, ক্রোধ ও লোভ ক'রে সংকটগ্রস্তও হয়, বহু ঈপ্সিত বস্তু লাভ ক'রে প্রসন্ন হয় ও পুণ্য-কর্মের অনুষ্ঠান করে—জাগ্রৎ অবস্থার মতোই সব দেখে।

ফলতঃ জাগরণের ন্যায় স্বপ্নেও জীব প্রচুর কর্মফল ভোগ করে। ভয়, হর্ষ, শোক ইত্যাদি স্বপ্নে যথেষ্ট অনুভূত হয়। এটি সকলেরই প্রত্যক্ষ, কিন্তু জেগে উঠলেই আমরা স্বপ্ন বলেই সবটা উড়িয়ে দিতে চাই, অথবা ওদিকে খেয়াল রাখি না। জীবনটা শুধু জাগ্রৎ নিয়ে নয়—জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি, এই তিনটিরই বিচার করা উচিত, জীবনটা কি বুঝতে হলে।

শান্তিপর্বের ১৮১ অধ্যায়ে টীকায় নীলকণ্ঠ বলেছেন—'ঐহিকভোগে এব প্রাক্‌কর্মণঃ প্রাবল্যং ন তু আমুষ্মিকভোগার্থায়াং যজ্ঞাদিপ্রবৃত্তৌ। বিধি-প্রতিষেধশাস্ত্রানর্থক্যাপত্তেরিত্যর্থঃ'। অর্থাৎ, ইহ-লোকের সুখদুঃখাদি ভোগেই প্রারব্ধকর্মের প্রবলতা কিন্তু পারলৌকিক ভোগের কারণ যে যজ্ঞাদি কর্ম তা'তে নয়। কারণ, তা হলে শাস্ত্রে যে-সব বিধিনিষেধ রয়েছে তার কোন সার্থকতা থাকে না। নিষ্কর্ষ এই যে, এটা মনে করা ভুল যে, আমাদের জীবনটা শুধু প্রারব্ধেরই ভোগমাত্র এবং ভাল-মন্দ কোন কিছুই আমরা প্রারব্ধহেতু একেবারেই করতে পারি না। বলছেন, এমন কি প্রারব্ধের ভোগকেও পুরুষকারের দ্বারা প্রভা-বিত করতে পারা যায়—'অনাদৌ সংসারে অনন্তা-নাং সতাম্ অসতাং বা কর্মণাম্ অহং পূর্বম্ অহং পূর্বম্ ইতি স্পর্ধয়া স্বস্বফলদানায় যুগপদ্ উপস্থিতা-নাং যদেব কর্ম অবিকলঃ পুরুষকারোঽনুগৃহ্লাতি তদেব প্রভবতি'। অর্থাৎ, অনাদি সংসারে অনন্ত শুভাশুভ কর্ম 'আমি আগে', 'আমি আগে' এই ব'লে নিজ নিজ ফল দিতে একসঙ্গে এগিয়ে এলে, শুধু সেই কর্মটিই ফল দিতে সমর্থ হয়, যেটি নিখুঁত পুরুষকারের দ্বারা অনুগৃহীত হয়।

মহাভারতের ১২।২১০।২৭ শ্লোকে উল্লিখিত সৃষ্টিক্রমের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে নীলকণ্ঠ লিখছেন—'ঈশাদপি কর্মপ্রাবল্যং দৃশ্যতে, তস্য কর্মাপেক্ষয়া এব সদসৎফলদত্বাৎ··· ···সর্গাদৌ কর্মৈব প্রকৃতিং প্রবর্তয়তি ইত্যর্থঃ'। অর্থাৎ, সৃষ্টির প্রারম্ভে কর্মই প্রকৃতিকে সৃষ্টিকার্যে প্রবৃত্ত করায়—ঈশ্বর অপেক্ষাও কর্মের শক্তি বেশী, কারণ, জীবের কর্মানুসারেই তিনি শুভাশুভ ফল দান করেন

নির্দেশিকা : ১।৯০।২২, ৩।২৯।৪২-৪৩, ৩।২০৮।১৯, ৩।২৫৯।৩৩, ৩।২৬১।৩৫, ১২।১৭৫।১৬, ১২।১৭৫।৩৪, ১২।২১৫।৬, ১২।২২৯।২২,১২।২৯৮।-১০, ১৩।৬।৬, ১৩।৬।১০, ১৩।২৩।৮৫, ১৩।২৩।৮৮, ১৩।২৩।৯২-৯৪, ১৩।২৩।৯৬, ১৩।১৪৯।৫-৬, ১৩।১৬২।৫৮-৫৯, ১৪।৪৬।৪৬,১৪।৪৭।৩, ১৪।৫১।২২

(মহাভারতের বিভিন্ন সংস্করণে শ্লোক-সংখ্যার, এমন কি অধ্যায়-সংখ্যারও যথেষ্ট পার্থক্য আছে। নির্দেশিকাটিতে পুণা চিত্রশালা প্রেসের সংস্করণ অনুসৃত হয়েছে)।

মনুসংহিতার দ্বাদশ বা অন্তিম অধ্যায়ে মোট ১২৬টি শ্লোক আছে। তার মধ্যে প্রথম ৯০টি শ্লোকই কর্মফল সম্বন্ধে। ৯১-১২৬ শ্লোকের মধ্যেও কর্মফল-সম্পর্কিত কিছু কিছু শ্লোক দেখা যায়। ফলতঃ ছত্রিন্যায় অনুসারে সমগ্র অধ্যায়-টিকেই কর্মফলাধ্যায় বলা চলে। মেধাতিথির ভাষ্য ও কুল্লুক ভট্টের টীকা, এই দু'য়ের যথাসম্ভব সামঞ্জস্য ক'রে কয়েকটি শ্লোকের সারসংক্ষেপ দেওয়া হচ্ছে :

ঈর্ষ্যাবশতঃ অপরের ধন চুরি করতে ইচ্ছা করা ; কারুর মৃত্যুকামনা করা ; 'পরলোক নেই, দেহই আত্মা', এই রকম মনে করা—এই তিনটি হ'ল মানস অশুভ কর্ম। এর ফলে পরজন্মে নীচ মানুষ হতে হয়। কর্কশ-ভাষী হওয়া, মিথ্যা কথা বলা ; পরনিন্দা করা ও 'অসম্বদ্ধ প্রলাপ' অর্থাৎ রাজা, দেশ এবং নগরাদি সম্বন্ধে নিষ্প্রয়োজন অথচ ক্ষতিকর আলোচনা করা—এই হ'ল চার রকমের বাচিক অশুভ কর্ম। এর ফলে পরজন্মে পশুপক্ষী হতে হয়।

অদত্ত ধন গ্রহণ, অশাস্ত্রীয় হিংসা ও ব্যভিচার—এই তিনটি হ'ল শরীরসাধ্য অশুভ কর্ম। এর ফলে বৃক্ষলতাদি স্থাবর জন্ম হয়। সুতরাং অশুভ কর্ম হ'ল মোট দশ রকমের। মনই এই সমস্ত কর্মের মূল প্রবর্তক (১২।৪-৯)। কুল্লুক ভট্টের মতে এই সব অশুভ কর্ম যদি অতিমাত্রায় করা যায় তা'হলেই ঐ সব ফল ভুগতে হয়।

বেদাভ্যাস, তপস্যা, শাস্ত্রজ্ঞান, শৌচ, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, দানাদি-ধর্মানুষ্ঠান ও আত্মচিন্তা—এই সব সাত্ত্বিকগুণ বা কর্ম যাঁদের আছে, তাঁদের দেবত্ব-প্রাপ্তি ঘটে। সাধনার তারতম্য অনুসারে এই সাত্ত্বিকী গতি অধম, মধ্যম ও উত্তম। বানপ্রস্থী, সন্ন্যাসী, ব্রাহ্মণ, বিমানবিহারী দেবগণ, নক্ষত্রগণ, ও দৈত্যগণ—এঁদের জন্ম অধম সাত্ত্বিকী গতির ফল। মেধাতিথির ভাষ্যে আছে, বানপ্রস্থী ও সন্ন্যাসীর কথা থাকায় ধ'রে নিতে হবে, ইহজন্মে কৃত সাত্ত্বিক কর্মের ইহলৌকিক ফলের কথাও এখানে বলা হয়েছে। যাজ্ঞিক, ঋষি, দেবতা, বেদাভিমানী দেবতা, ধ্রুবাদি জ্যোতিষ্ক, বৎসরা-ভিমানী দেবতা, সোমপানকারী পিতৃগণ এবং সাধ্যগণ—এঁরা মধ্যম সাত্ত্বিকী গতির ফল। ব্রহ্মা,মরীচি প্রভৃতি প্রজাপতি, ধর্ম, মহান্ ও অব্যক্ত—এঁরা উত্তম সাত্ত্বিকী গতির ফল। ধর্ম, মহান্ ও অব্যক্ত বলতে এঁদের অধিষ্ঠাতা শরীরী পুরুষদেরই গ্রহণ করতে হবে।

কর্মানুষ্ঠানে আগ্রহ, অধৈর্য, নিষিদ্ধ কর্মাচরণ ও নিয়ত বিষয়সেবা—এই সব রাজস গুণ বা কর্ম যাঁদের আছে তাঁদের রাজসী গতি হয়। এই গতিও ত্রিবিধা। ঝল্ল (যারা লাঠি, মুগুর ইত্যাদি নিয়ে যুদ্ধ করে), নট, শস্ত্রজীবী পুরুষ, দ্যূতাসক্ত ও পানাসক্ত ব্যক্তি—এঁরা রজোগুণের অধমগতি-ভুক্ত। রাজা, ক্ষত্রিয় ও রাজপুরোহিত এবং শাস্ত্রার্থকলহপ্রিয় ব্যক্তিরা রজোগুণের মধ্যগতি-ভুক্ত। গন্ধর্ব, গুহ্যক (দেবযোনিবিশেষ), যক্ষ, অপরাপর দেবানুচর ও অপ্সরা—এঁরা রজোগুণ-জনিত গতির মধ্যে উত্তমগতিভুক্ত

লোভ, নিদ্রালুতা, অধীরতা, ক্রূরতা, নাস্তি-কতা, অযথাবৃত্তি অবলম্বন, যাচ্ঞা ও প্রমাদ—এই সব তমোগুণ বা কর্ম যাঁদের আছে, তাঁদের তামসী গতি হয়। এই গতিও ত্রিবিধা। হীন-চেতা মানুষ ও মনুষ্যেতর জন্ম এই ত্রিবিধাগতির অন্তর্ভুক্ত (১২।৩১—৫০)

সত্ত্বাদি গুণক্রমে এই গতিত্রয়ের কথা সাধারণ-

ভাবে ব'লে মহর্ষি মনু কোন্ কোন্ পাপের ফলে কি কি জন্ম হয়, তার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। (১২।৫৩-৮১)

মোক্ষের সাধন হিসাবে বেদাভ্যাস, তপস্যা, ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান, ইন্দ্রিয়-সংযম, অহিংসা ও গুরু-সেবা উল্লিখিত হয়েছে এবং সমস্ত শুভকর্মের মধ্যে আত্মজ্ঞানকেই শ্রেষ্ঠ মোক্ষসাধন বলা হয়েছে। (১২।৮৩-৮৫)

মনুসংহিতায় একাদশ অধ্যায়ে প্রায়শ্চিত্ত-বিধি বর্ণিত হয়েছে। যজ্ঞের জন্য ব্রাহ্মণ শূদ্রের কাছে ধন প্রার্থনা করার, যজ্ঞের জন্য ধন প্রার্থনা ক'রে তার সবটা যজ্ঞকর্মে খরচ না করে অন্যকাজে ব্যয় করার, ধনাপহরণ প্রভৃতি করার ফল ১১।২৪-২৬, ৪৮-৫২) ও প্রায়শ্চিত্তবিধি বর্ণিত হয়েছে।

স্বর্ণচোর, সুরাপায়ী প্রভৃতির কথা ছান্দোগ্য উপনিষদে 'স্তেনো হিরণ্যস্য সুরাং পিবংশ্চ' ইত্যাদি শ্লোকে (৫।১০।৯) আছে। সেখানে অবশ্য তাদের বিরূপতা আদি কর্মফলের কথা নেই। তারা যে 'পতিত' শুধু এই কথাই বলা হয়েছে। শ্লোকটি ছান্দোগ্যেরও পূর্বকালীন প্রচলিত একটি শ্লোক—ছান্দোগ্য উপনিষদ্ তার উদ্ধৃতি দিয়েছেন মাত্র।

দু'হাজার বছর ধরে এদেশে স্মৃতিশাস্ত্রের ক্রম-বিকাশ ঘটেছে। স্মৃতির বিধান যুগানুযায়ী ক্রমশঃ পরিবর্তিত হয়েছে। তবু মহর্ষি মনুর কাছে সব স্মৃতিকারই যুক্তকর। যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় মনু-স্মৃতির অনেক পুনরাবৃত্তি রয়েছে। শাতাতপ স্মৃতিটির বিষয়বস্তু প্রায়শ্চিত্ত। প্রসঙ্গক্রমে কোন্ কোন্ কর্মের ফলে পরজন্মে কি কি রোগ হয় তার বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। প্রায়-শ্চিত্তের দ্বারা পাপের খণ্ডন হয়, কৃত নিষিদ্ধ কর্ম তার ফল প্রসব করতে পারে না। তাই অসংখ্য প্রায়শ্চিত্তের বিধান দেওয়া হয়েছে।

স্মৃতিশাস্ত্রে উল্লিখিত ইহজন্মে কৃত কোন্ কোন্ পাপ-কর্মের ফলে পরজন্মে কি কি রোগ হয় তার দীর্ঘ তালিকা দেখে, প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, এগুলি কি আক্ষরিক সত্য না অর্থবাদ। অর্থ-বাদের স্বার্থে কোনও তাৎপর্য নেই—এমনিতে কোনই মানে নেই—তার উদ্দেশ্য হ'ল শাস্ত্রোক্ত অন্য কোনও বিষয়ের প্রশংসা বা নিন্দা করা। সুতরাং এ ক্ষেত্রে অর্থবাদই যদি সিদ্ধান্ত হয়, তাহলে বুঝতে হবে যে, প্রায়শ্চিত্তের প্রশংসা করবার জন্য অথবা পাপকার্যগুলির নিন্দা করবার জন্যই ঐ সব রোগের কথা বলা হয়েছে। উদ্দেশ্য শুধুমাত্র এই যে, মানুষ যেন পাপকর্ম না করে এবং যদিই বা ক'রে ফেলে তো অবশ্যই যেন প্রায়শ্চিত্ত করে। এ খুবই ভাল কথা। কিন্তু যদি আক্ষরিক ভাবে সত্য বলে ধরা হয়, তাহলে অনেক কিছুই বলবার থাকে।

স্মৃতিশাস্ত্রে কর্মফল-প্রসঙ্গ আমরা এইখানেই শেষ করছি (ক্রমশঃ)

ভারতের ঐতিহ্যে ধর্ম ও ধর্মনিরপেক্ষতা

শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র সরকার

(১)

[উদ্বোধন পত্রিকার আষাঢ় ১৩৭৯ সংখ্যায় প্রকাশিত 'ধর্মনিরপেক্ষতা অর্থে ধর্মহীনতা নয়'—শীর্ষক প্রবন্ধটিতে, ধর্মনিরপেক্ষতা বলিতে কি বোঝায়, কোন রাষ্ট্রের পক্ষে অবস্থাবিশেষে কেন এরূপ নীতি অপরিহার্য হইয়া দাঁড়ায়, ইত্যাদি বিষয়ে সাধারণভাবে কিছু কিছু আলোচনা করা হইয়াছিল। এক্ষণে ভারতের ঐতিহ্য অনুযায়ী, ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রনীতির দিক হইতে ধর্ম ও ধর্মনিরক্ষেতা সম্বন্ধে একটু সংক্ষিপ্ত আলোচনাই বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।]

দেখা যায়, 'ভারতের মহামানবের সাগরতীরে' যেমন বহু জাতি আসিয়া একত্র সম্মিলিত হইয়াছে, তেমনি এই মহাভারতের মহান ধর্ম-নদীবক্ষ হইতেও কত কত ধর্মসম্প্রদায়রূপ শাখা-নদীও বিনির্গত হইয়াছে! আবার কালক্রমে মুসলমান ও খৃষ্টান ধর্ম ও ধর্মসম্প্রদায়ের ন্যায় উপনদী-সকলও ইহাতে আসিয়া স্থিতিলাভ করিয়াছে। কি বিচিত্রই না এই প্রবাহ! কোথায়ও আকাশের মত বিস্তৃত, সমুদ্রের মত গভীর; আবার কোথাও বা 'যে নদী মরুপথে হারাল ধারা!' ধর্ম তত্ত্বতঃ এক হইলেও, ধর্মসম্প্রদায় বহু। এত বিভিন্ন ধর্মমত ও পথের মধ্যে আদর্শ বা নীতিগত দ্বন্দ্ব অথবা কোথাও কোন সাম্প্রদায়িক কলহ উপস্থিত হইলে উহা নিতান্তই দুঃখের কারণ বটে, কিন্তু একান্ত আশ্চর্যের বিষয় নহে। ভারতের ইতিহাসে, সম্রাট আকবরের গৌরবময় রাজত্বকালেও হিন্দুমুসলমানের মধ্যে এইরূপ ধর্মবিরোধ ঘটিতে দেখা যায়। কিন্তু, সে যুগে আবার এমন-সব উদারপন্থী সাধুরও অভাব ছিল না যাঁহাদের চক্ষে হিন্দু-মুসলমানে কোন ভেদ ছিল না, সম্প্রদায়-নির্বিশেষে যাঁহারা সকলকেই ভালবাসিতে পারিতেন। সে-যুগের এমনি একজন শ্রেষ্ঠ মরমিয়া সাধক ছিলেন দাদূ। এই উপলক্ষ্যে দাদূর অনেক উক্তিই আজিও স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। উহারই একটিতে দাদূ বলিতেছেন—

কিস সোঁ বেরী হ্বৈ রহ্যা দূজা কোঈ নাহিঁ।
জিসকে অংগতৈঁ উপজে সোঈ হৈ সব মাহিঁ॥
সবঘটি একৈ আতমা জানে সো নীকা।
আপা পরমেঁ চীনহিলে দরসন হৈ পী কা॥
কাহে কৌ দুঃখ দীজিয়ে ঘটঘট আতম রাম।
দাদূ সব সন্তোসিয়ে য়হ সাধুকা কাম। *

কার সাথে চলেছে শত্রুতা? পর যে কেউই নেই। যাঁর অঙ্গ থেকে উৎপত্তি, তিনিই যে রয়েছেন সবার মাঝে। সকল ঘটেই যে সেই একই আত্মা—এ যে জানে, সে-ই তো উত্তম। পরের মধ্যে চিনে নাও নিজেকে,—এই তো প্রিয়তমের দর্শন পাওয়া! কেন কাউকে দুঃখ দাও, ঘটে ঘটেই যে সেই আত্মারাম! হে দাদূ, সবাইকেই কর খুশী,—এই তো হ'ল সাধুর কাজ।

(২)

মানবসমাজ প্রাণবন্ত ও প্রগতিশীল। মানুষের ধর্মও প্রাণধর্মী হওয়া প্রয়োজন। সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে উঠিয়া গোষ্ঠী-নিরপেক্ষভাবে সত্যসূর্যের বিমল আলোকেই আমাদিগকে ধর্মের গুহাহিত-তত্ত্ব-নিরূপণে চেষ্টিত হইতে হইবে। 'স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ'—প্রকৃত ধর্মভাবের ক্ষীণ আভাসও

* দাদূ—ডঃ ক্ষিতিমোহন সেন—২৫০

ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনে মহাভয় হইতে পরিত্রাণে সমর্থ। ইহা ভিন্ন আমাদের একথাও ভুলিলে চলিবে না যে, ধর্মমত ঈশ্বর নয়,—ঈশ্বরলাভের উপায় মাত্র। ঈশ্বরলাভ, অথবা মতান্তরে 'পরিপূর্ণতালাভ'ই মানবজীবনের উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য অথবা লক্ষ্যের দিকে আমরা কতটা অগ্রসর হইতেছি উহাই সকল ধর্মাচরণের সার্থকতার একমাত্র মাপকাঠি। সে-দিক দিয়া দেখিলে ধর্মভাব একটি নৈতিক মনোবৃত্তি, যাহা লইয়া অপরের সহিত কলহের কোন কথাই উঠিতে পারে না। যে যেমন অধিকারী, সে কেবল সেইরূপ মতে বা পথেই চলিতে সমর্থ। কাজেই এরূপ ক্ষেত্রে, ধর্মপ্রাণতা বলিতে শুধুমাত্র নিরপেক্ষভাবে পরধর্ম অথবা পরমতসহিষ্ণুতা না বোঝাইয়া, অপরকে ধর্মপথে যথাসাধ্য সাহায্য করিবার প্রশ্নও আসিয়া পড়ে। যে নিজে ধার্মিক হইতে চায়, সে কখনই অপরের ধর্মপথের কণ্টক তো হইতেই পারে না, বরং অন্যকে ধর্মপথে অগ্রসর হইতে দেখিয়াই তাহার আনন্দ!

(৩)

এবারে ব্যক্তিগত কথা ছাড়িয়া, সমষ্টিগতভাবে রাষ্ট্রের সহিত ধর্মের সম্বন্ধ কি, সে-বিষয়ে একটু বুঝিতে চেষ্টা করা যাক। দেখা যায়, যখন ব্যষ্টি ও সমষ্টিগতভাবে লোককল্যাণসাধনই সকল রাষ্ট্রব্যবস্থারই চরম লক্ষ্য এবং ধর্মের উদ্দেশ্যও উহাই, তখন অন্ততঃ নীতিগতভাবে রাষ্ট্রের সহিত ধর্মের অথবা ধর্মের সহিত রাষ্ট্রের কোনও সংঘাত বা সংঘর্ষ উপস্থিত হওয়া উচিত নহে। বরং উভয় ক্ষেত্রেই, ন্যায় ও আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চলিতে পারিলে, পরস্পর পরস্পরের সাহায্যপুষ্ট হইয়া উভয়েই সমাজের অশেষ মঙ্গলেরই কারণ হইতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপে, ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, একদিকে যেমন সর্বত্যাগী সাক্ষাৎ ধর্মস্বরূপ ব্যক্তিগণই রাজধর্ম ও রাজনীতির নির্ধারক, অপরদিকে তেমনি ধর্ম ও নীতিপরায়ণ রাজশক্তিই লোককল্যাণ ও ধর্মের রক্ষণাবেক্ষণে অতন্দ্র প্রহরী! কখনও কখনও আবার এই উভয় শক্তিই যেন একত্র সম্মিলিত হইয়া অধর্মের অভ্যুত্থাননিবারণ ও ধর্মসংস্থাপনের নিমিত্ত মহাশক্তিধর-ব্যক্তিরূপে আবির্ভূত! শুধু পৌরাণিক যুগের শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় অবতারগণের কথাই কেন? পরবর্তী ঐতিহাসিক যুগেও মহারাজ অশোক প্রভৃতি ত্যাগব্রতী রাজগণও একাধারে রাজা ও ধর্মনেতা ছিলেন। আরও পরে, দিল্লীর মসনদেও মহাত্মা নাসিরুদ্দিনের মত রাজর্ষিকেও দেখিতে পাওয়া যায়, যিনি আপনাকে রাজকোষের অধীশ্বর মনে না করিয়া, স্বহস্তে কোরানের অনুলিপি করিয়া যাহা কিছু উপার্জন হইত তদ্দ্বারাই নিজ ব্যয় নির্বাহ করিতেন এবং নিজ মহিষীকে দিয়াই পাচিকার কাজ করাইয়া লইতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। কাজেই দেখা যায়, রাষ্ট্র ও ধর্ম, রাজনীতি ও ধর্মনীতির মধ্যে এমন কোন প্রকৃতিগত বিরোধ নাই যাহাতে উভয়ের সহাবস্থান অথবা সহযোগিতা একেবারেই অসম্ভব। বিশেষতঃ ভারতবর্ষের ন্যায় দেশে যেখানে হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খৃষ্টান ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বিনির্বিশেষে সমাজের সকল স্তরের সহিতই যুগ যুগ ধরিয়া ধর্মভাব ওতপ্রোতভাবে জড়িত রহিয়াছে, সেখানে ধর্মকে বাদ দিয়া কোনরূপ রাষ্ট্র কিংবা সমাজ-ব্যবস্থাই কার্যকর অথবা কল্যাণপ্রদ হইতে পারে না। একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিলেই দেখা যাইবে, সেই অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভারতে রাষ্ট্রচেতনা অপেক্ষা ধর্মচেতনাই অধিক প্রবল। যতক্ষণ ধর্মবিষয়ে হস্তক্ষেপ না হয় এবং লোকে স্বাধীনভাবে স্বধর্মাচরণ করিতে পারে ততক্ষণ কে দেশের রাজা হইল না-হইল এবং কে কি করিল বা না-

করিল উহা লইয়া সাধারণ লোকে বড় একটা মাথা ঘামাইতে চাহে না। ধর্মবিকৃতি অবশ্যই আসে ধর্মকে স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে ব্যবহারও করা হয়—ধর্ম লইয়া যত অনর্থের সৃষ্টি, তাহা তখনই হয়।

এই নিমিত্তই ভারতের ক্ষেত্রে "Secular State" অথবা "ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র" কথাটির নিহিতার্থ বুঝিতে গিয়া ভারতের ধর্ম, কৃষ্টি ও ইতিহাসের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই অগ্রসর হইতে হইবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, ভারতীয় সংবিধানে রাষ্ট্রের রূপ ও গঠন সম্বন্ধে বলিতে গিয়া "Secular State" কথাটির উল্লেখ করা হয় নাই। দেখা যায়, পণ্ডিত নেহেরু ও ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রমুখ রাষ্ট্রপ্রধানগণের বিবৃতি ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অভিমতের ভিত্তিতেই কথাটির উদ্ভব হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন, Secular State কথাটিও নীতিগত এবং কার্যত: বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাবে গ্রহণ করা হইয়াছে। অনেক ক্ষেত্রেই ইহার সহিত আভিধানিক অর্থযুক্ত Secularism নামক ভাবধারার বিযুক্তিই ঘটিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইংলণ্ডে মিল প্রমুখ ইহসর্বস্ববাদী নাস্তিক দার্শনিকগণের মতবাদের ভিত্তিতেই Secularism কথাটির উৎপত্তি, এবং উহাতে ঐরূপ মতবাদই প্রতিফলিত হইয়াছে। Secularism বলিতে সুস্পষ্টভাবে ধর্মহীনতাই বোঝায়, কিন্তু সে-অর্থে Secular কথাটি অনেক ক্ষেত্রেই ব্যবহৃতও হয় নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপে বলা যায়, আমেরিকা-যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় প্রগতিশীল Secular রাষ্ট্রেও, রাষ্ট্রকে ধর্মীয়প্রভাব হইতে মুক্ত রাখিবার অনুকূলে সুস্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করিয়াও, অনেকে কিন্তু আমেরিকান জনসাধারণের মধ্যে Secularism-এর ক্রমবর্ধমান প্রভাব দেখিয়া চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। অবস্থা যখন এইরূপ তখন, বিশেষ করিয়া ভারতের ক্ষেত্রে, Secular State বলিতে বা বুঝিতে গিয়া কোনক্রমেই "ধর্মবর্জিত রাষ্ট্র" অথবা ঐরূপ কোনকিছু মনে করিলে চলিবে না। ভারতে আমাদের পক্ষে বরং "রাষ্ট্রনিরপেক্ষ ধর্ম" এরূপ ভাবনা করা সহজ, কেননা পূর্বে আমরা দেখিয়াছি, ভারতে যুগ যুগ ধরিয়া ধর্ম ও রাষ্ট্রের মধ্যে নৈকট্য ও প্রীতির সম্বন্ধ বিদ্যমান থাকিলেও ধর্ম প্রকৃতপক্ষে কোন কালেই রাষ্ট্রের উপর একান্ত নির্ভরশীল অথবা রাজানুগ্রহের প্রত্যাশী ছিল না। অপরপক্ষে, রাষ্ট্র সম্বন্ধে কোনরূপ ধর্মহীনতাসূচক ধারণা আমাদের ধর্মচেতনা ও সংস্কৃতির দিক হইতে কষ্টকল্পনার বিষয় হইয়া দাঁড়ায়। এই প্রসঙ্গে ডঃ রাধাকৃষ্ণনের নিম্নলিখিত উক্তিটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য—"It may appear somewhat strange that our Govt. should be a secular one while our culture is rooted in spiritual values. Secularism here does not mean irreligion or atheism or even stress on material comfort."

একথা সত্য যে ধর্ম এবং রাজ্যব্যবস্থার মধ্যে প্রীতি ও ঐক্যের নিদর্শনস্বরূপ পূর্বে যে-সকল দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা হইয়াছে, সে-সকল কেবলমাত্র ধর্মানুকূল রাজতন্ত্রের কথাই বলা হইয়াছে। এখন "সে-রামও নাই, সে-অযোধ্যাও নাই"। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায়, Secular State অথবা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রভাবনা ভারতের পক্ষে এখন অপরিহার্য এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের স্বার্থে যথোপযুক্তই বলিতে হইবে। তবে সে-ক্ষেত্রে যাহাতে এরূপ সংজ্ঞাদ্বারা ধর্মহীনতার কোনরূপ স্পর্শ সূচিত না হয় সেজন্য উপযুক্ত সাবধানতা অবলম্বন করিবার প্রয়োজন অবশ্যই আছে। দেখা যায়, ভারতীয় সংবিধানের মৌল অধিকার Fundamental Rights) অধ্যায়ে সম্প্রদায়-নির্বিশেষে কাহারও প্রতি কোনরূপ বৈষম্যমূলক আচরণ নিষিদ্ধকরণের এবং সকল নাগরিকের প্রতিই

সমব্যবহারের কথা বলা হইয়াছে এবং সেই সঙ্গে স্বাধীনভাবে ধর্মাচরণের অধিকারও স্বীকৃত হইয়াছে। ইহা ভিন্ন, সংবিধানের অন্যত্রও আরও যে-সকল বিধি-উপবিধি সংযোজিত হইয়াছে, তাহাতে ধর্মবিসয়ে রাষ্ট্রের নিরপেক্ষতাকে কোন-ক্রমেই ঔদাসীন্য বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে না। এ-সকল সত্ত্বেও, অনেকের মতে আমাদের রাষ্ট্রব্যবস্থাকে সাংবিধানিক অথবা প্রচলিত অর্থে, কেবলমাত্র Secular State অথবা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলিয়া অভিহিত না করিয়া, যাহাতে ভাব ভাষা ও নীতিগত সুসামঞ্জস্য রক্ষিত হয় এরূপ কোন উপযুক্ত সংজ্ঞা দ্বারা সংজ্ঞিত করিতে পারিলেই যথোপযুক্ত কার্য হয়। কেহ কেহ এই উদ্দেশ্যে Secular কথাটির পরিবর্তে "Religiously impartial" অথবা "Non-communal" এইরূপ বিশেষণও ব্যবহারের পক্ষপাতী দেখা গিয়াছে। মনে হয়, প্রথমোক্ত "Religiously impartial" কথাটিরই বাংলা অনুবাদরূপে "ধর্মনিরপেক্ষ" অথবা "ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র" কথার প্রচলন ঘটিয়াছে।

সে যাহাই হোক, এই প্রসঙ্গে আমরা যতটুকু আলোচনা করিলাম তাহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, ভারতীয় সংবিধানোক্ত কথা দ্বারা অথবা অন্যকোনভাবে ভারতরাষ্ট্রকে Secular State, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বা অন্য যে-কোন নামে অভিহিত করিলেও, উহাকে কখনও ধর্মবিবর্জিত রাষ্ট্ররূপে চিহ্নিত বা গণ্য করা চলিতে পারিবে না, এবং ভারতের রাষ্ট্রনীতিতে ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থও কখনই ধর্মহীনতা হইতে পারে না।

বরং মনে হয়, ধর্মমতনির্বিশেষে সকলকেই সবধর্মেরই মূল লক্ষ্য ঈশ্বরানুভূতির পথে, যথার্থ ধর্মপথে অগ্রসর হইবার সহায়তা করিলেই রাষ্ট্রে উদার, মানবপ্রেমিক, মানবসেবাপরায়ণ লোকের সংখ্যা ক্রমবর্ধিত হইয়া ধর্মবিকৃতি-উদ্ভূত সর্ববিধ অনর্থের অবসান ঘটাইবার পথকে সুগম করিয়া তুলিবে।

সুন্দর

শ্রীনরেশচন্দ্র চক্রবর্তী

সুন্দর তুমি অন্তরে মম রয়েছো অনুক্ষণ
তবু কেন বলো কেঁদে মরে মোর মন।
তবু কেন এই হিয়া বারে বার
আঘাতে আঘাতে করে হাহাকার
সহিতে পারে না ক্ষণিক দুখের
ব্যর্থ আলিঙ্গন।
রূপহীন যত বেদনার বাণী
আসে টলাইতে এই তনুখানি
ছদ্মবেশের আবরণতলে
বহি অমূল্য ধন।
বুঝিতে পারিনা তাই বুঝি মোর
কাঁদিছে অবোধ মন।
জীবনের শত বেদনার মাঝে
সারা দিবসের কাজে ও অকাজে
তুমি যে চলেছো চালায়ে আমারে
দিতেছো নবজীবন।
আঘাতের পর আঘাতের সাথে
দিতেছো যে জাগরণ।

করুণাসিন্ধু শ্রীরামকৃষ্ণ

স্বামী জীবানন্দ

আকাশে কত তারা গোনা যায় না, সমুদ্রে কত জল পরিমাপ করা যায় না। শ্রীরামকৃষ্ণের করুণা সম্বন্ধেও একই কথা। একটি আধারে কত কৃপা ধরে কারও সাধ্য নেই যে বলে! বিশাল বারিধির মতোই তাঁর করুণা। করুণার পারাবার। অনন্ত করুণা! করুণাসিন্ধু শ্রীরামকৃষ্ণ। স্বামীজী তাই বলেছেন, 'LOVE personified', মূর্তিমান প্রেম—প্রেমের ঘনীভূত বিগ্রহ। 'চির-উন্মদ প্রেম-পাথার।' স্বামী তুরীয়ানন্দজী শ্রীরামকৃষ্ণের মহিমা-প্রসঙ্গে শিবমহিম্নঃস্তোত্রের প্রসিদ্ধ শ্লোকটি স্মরণ করেছেন:

'অসিতগিরিসমং স্যাৎ কজ্জলং সিন্ধুপাত্রে
সুরতরুবরশাখা লেখনী পত্রমুর্বী
লিখতি যদি গৃহীত্বা সারদা সর্বকালং
তদপি তব গুণানামীশ পারং ন যাতি ॥'

অর্থাৎ নীল পর্বতের মতো যদি কালি হয়, সাগর যদি হয় দোয়াত, শ্রেষ্ঠ পারিজাত-বৃক্ষের শাখা কলম, পৃথিবী লেখার কাগজ, আর স্বয়ং সরস্বতী এসব নিয়ে অনন্তকাল ধ'রে যদি লিখতে থাকেন, তবু হে ঈশ্বর, তোমার গুণসমূহের সীমা পান না।

শ্রীরামকৃষ্ণজীবনের প্রতিটি ক্ষণ কৃপায় সম্পৃক্ত। লীলাবতরণ থেকে লীলাসংবরণ সবই কৃপামণ্ডিত। বাল্যলীলা, গুরুভাব, দিব্যভাব সর্বত্রই কৃপা অনুস্যূত। তবে কখনো কখনো কৃপার প্রকাশ অধিক। গুরুভাবে ও দিব্যভাবে করুণাধারা বিশেষভাবে লোকলোচনের গোচরীভূত, অন্য সময় লোকচক্ষের অন্তরালে বিদ্যমান। ভাগবতী লীলায় যাঁরা তাঁর গুরুজনরূপে সম্পর্কিত, শৈশবে তাঁদের বাৎসল্যরসাস্বাদনের মাধ্যমে দিব্য কৃপাভাব অভিব্যঞ্জিত। ধনীমাতা, প্রসন্নময়ী, চিনু শাঁখারী প্রভৃতির প্রতি দুর্লভ ঐশ্বরিক কৃপা! তাঁর করুণা বিভিন্ন পাত্রে বিভিন্নভাবে প্রকাশিত।

মর্মন্তুদ একটি ঘটনা—তাঁর অত্যাশ্চর্য কৃপার নিদর্শন। হালদার পুরোহিত শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্য খ্যাতিতে অসহিষ্ণু হয়ে সমাধি-অবস্থায় তাঁর শুদ্ধসত্ত্ব শরীরে অমানুষিক নির্যাতন করেছিল, একথা মথুরবাবুর কর্ণগোচর হ'লে তিনি তার উপযুক্ত প্রতিবিধান করতে কৃতসঙ্কল্প হন, করুণাঘন শ্রীরামকৃষ্ণ তখন তাঁকে ঐ কাজ থেকে প্রতিনিবৃত্ত করেন।

রাণী রাসমণি ও মথুরবাবুর উপর শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ কৃপা বর্ষিত হয়েছে। মথুরবাবুকে তিনি শিব ও কালীরূপে দর্শন দেন এবং নানাভাবে করুণায় ঘিরে রাখেন।

নরলীলায় যাঁরা তাঁর বিশেষ গুরুরূপে চিহ্নিত, সেই পরমসিদ্ধা মহাতপস্বিনী ভৈরবী ব্রাহ্মণী এবং নির্বিকল্পসমাধিমান ব্রহ্মজ্ঞ তোতাপুরীজীর মধ্যে সার্বভৌম ভাব ও দৃষ্টির যেটুকু অসম্পূর্ণতা ছিল, তা তাঁর সান্নিধ্যে নিঃশেষে বিলুপ্ত হয়েছিল, তাঁরা বুঝেছিলেন কে শ্রীরামকৃষ্ণ এবং কি তাঁর আবির্ভাবের উদ্দেশ্য—এও ভগবৎকৃপার দিব্য মহিমা!

জীবকোটি থেকে ঈশ্বরকোটি, সাধারণ অসাধারণ সকলের উপর তাঁর কৃপার স্নিগ্ধ পরশ। সে কৃপার পরিমণ্ডলে স্থান পেয়েছেন জ্ঞানী গুণী ধনী মানী আবার রিক্ত অসহায় অনাথ নিরক্ষর—জাতিধর্মনির্বিশেষে সর্বশ্রেণীর দেশ-বিদেশের নরনারী। কিন্তু যেখানে শুদ্ধসাত্ত্বিক ভাবের জমাটবাঁধা পবিত্রতা ও সরলতা বিদ্যমান, যেখানে নেই ধনজনমানের জন্য চিত্তের বিক্ষিপ্ততা, সেখানে তাঁর কৃপার প্রকাশ ও অনুভূতি অনেক বেশী।

স্পর্শমাত্রে বা দৃষ্টিপাতেই কারও ভক্তির উৎস-মুখ খুলে দিয়ে অবিরলধারে ভক্তির প্লাবন বইয়ে দিয়েছেন, কারও মধ্যে প্রজ্বালিত করেছেন চিরসমুজ্জ্বল অনির্বাণ জ্ঞানের দীপ।

পূর্ব পূর্ব নরলীলায় যাঁরা তাঁর পরিকররূপে এসেছিলেন, যাঁদের তিনি ভাবাবস্থায় দর্শন করেছিলেন, যাঁদের সম্বন্ধে ভাবমুখে ও সাধারণ সহজ অবস্থায় দিব্য উক্তি করেছিলেন, তাঁদের উপর তাঁর অসাধারণ কৃপা!

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর ঈশ্বরে সমর্পিতপ্রাণ ত্যাগী সন্তানগণের মধ্যে বিবেক বৈরাগ্য জ্ঞান ভক্তি প্রেম সঞ্চারিত ক'রে তাঁর আবির্ভাব-রহস্য ও তাঁর সঙ্গে তাঁদের চিরন্তন সম্বন্ধ অন্তরে দৃঢ়াঙ্কিত ক'রে দিয়ে তাঁদের তাঁর মহদুদার ভাবের ধারক বাহক সঞ্চারক ক'রে বিশ্বকল্যাণের জন্য গ'ড়ে তুলেছিলেন —তাতে তাঁর কৃপার সর্বোত্তম নিদর্শন বিদ্যমান।

শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাপার্ষদগণের প্রত্যেকেরই জীবনে আছে অজস্র কৃপার নিদর্শন। শ্রীশ্রীঠাকুর নরলীলা সমাপ্ত ক'রে নিত্যলীলায় প্রবেশ করলে তাঁর নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্ত ত্যাগী সন্তানগণ তাঁর অদর্শনে বিরহব্যাকুল হয়ে অনশনে অর্ধাশনে কাটিয়েছেন, কঠোর তপস্যায় নিরত হয়েছেন, তখন তাঁরা তাঁর শাশ্বত জ্যোতির্ময় মূর্তির দর্শন লাভ ক'রে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন, জগতে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্বন্ধে নির্দেশ পেয়েছেন। কি পরিব্রাজক অবস্থায়, কি অন্য সময় তাঁদের সমগ্র জীবন শ্রীরামকৃষ্ণকৃপায় সুস্নিগ্ধ। তীর্থে তীর্থে নিঃসম্বল অবস্থায় উপস্থিত হয়ে উদগ্র সাধনায় যখন তাঁরা তীর্থগুলি জাগিয়েছেন, তীর্থমাহাত্ম্য উপলব্ধি করেছেন, তখন তাঁরা তাঁর দর্শন পেয়ে করুণায় অভিসিঞ্চিত হয়েছেন। কিভাবে তাঁর কৃপা তাঁদের রক্ষা করেছে ত্যাগপূত জীবনের ক্ষুরধার দুর্গম পথে তা অচিন্তনীয়। শিবজ্ঞানে জীবসেবাকালে—মানুষকে নারায়ণজ্ঞানে সেবার সময় তাঁরা প্রত্যক্ষ করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণই শিবরূপে নারায়ণরূপে আর্ত রিক্ত উপেক্ষিত অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে বিদ্যমান। করুণাময় শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁদের ব্যষ্টি-সত্তায় এবং ভূমায় নিরন্তর স্ব-স্বরূপের উপলব্ধি করিয়েছেন, তার স্বাক্ষর তাঁদের জীবনের পরতে পরতে। তাঁর কৃপায় তাঁদের জীবন শ্রীরামকৃষ্ণময়, প্রত্যেকেই তাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণ-গতপ্রাণ।

স্বামীজীর উপর শ্রীরামকৃষ্ণ-কৃপার অত্যাশ্চর্য প্রকাশ! নররূপী নারায়ণের সঙ্গে নরঋষির পুণ্যমিলনের পরমক্ষণ থেকেই দিব্য করুণার অবিশ্রান্ত প্রবাহ! কৃপার আলোকে তাঁর জীবনপদ্ম সহস্রদলে বিকশিত। স্বামীজীর জীবনে শ্রীশ্রীঠাকুরের অনুপম কৃপার কয়েকটি দৃষ্টান্ত:

স্বামীজী যখন আমেরিকায় চিকাগো ধর্ম-মহাসভায় যোগদানের সঙ্কল্প করেছেন এবং ঠাকুরের নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করছেন তখন এক রাত্রে স্বপ্নে দেখলেন, শ্রীরামকৃষ্ণদেব জ্যোতির্ময় মূর্তিতে সমুদ্রতীর থেকে বরাবর জলের উপর দিয়ে এগিয়ে চলেছেন অপর কূলের দিকে এবং তাঁকে পশ্চাদনুসরণের ইঙ্গিত করছেন।

স্বামীজী যখন বক্তৃতা দিতেন তখন অনর্গল ব'লে যেতেন, সাঙ্কেতিক লিপিকারের পক্ষেও তার অনুসরণ করা সহজ ছিল না, কিন্তু তার জন্য তাঁকে বক্তৃতা তৈরি করতে হ'ত না; কোন প্রস্তুতি নেই অথচ বিষয়বস্তুর সঙ্গে ভাব ও ভাষার অপূর্ব সামঞ্জস্যে এমন ঐকতান সৃষ্ট হ'ত, যাতে সেই পরিবেশে শ্রোতৃবৃন্দের মন কোন্ এক অতীন্দ্রিয় রাজ্যে উঠে যেত। বক্তৃতার সময়, কথোপকথন-কালে বাণীরূপে শ্রীরামকৃষ্ণই স্বামীজীর কণ্ঠে অধিষ্ঠিত থেকে ভাষা জোগাতেন, তাই তিনি বলেছেন, 'বাণী তুমি বীণাপাণি কণ্ঠে মোর।'

শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপায় আমেরিকায় স্বামীজীর অসাধারণ প্রতিষ্ঠা হয়েছে, জগদ্ব্যাপী তাঁর নাম। কিন্তু অনেকে আবার তাঁর অসামান্য খ্যাতি সহ্য করতে না পেরে তাঁর প্রাণনাশ করতেও উদ্যত! ডেট্রয়েটে এক ভোজে স্বামীজী আমন্ত্রিত হয়েছেন। সেখানে তাঁর কফির পেয়ালায় বিষ মিশিয়ে দিয়েছে। তিনি পান করতে যাচ্ছেন এমন সময় দেখেন শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে কফি খেতে নিষেধ করছেন! কফির কাপেও শ্রীরামকৃষ্ণের বরাভয়মূর্তি প্রতিবিম্বিত!

শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপায় তাঁর অন্যতম লীলা-পার্ষদ স্বামী সুবোধানন্দজীরও জীবন মৃত্যুমুখ থেকে রক্ষিত হয়েছিল। তীর্থভ্রমণকালে গয়াধামে নদী পার হবার সময় যখন তিনি ডুবে যাচ্ছিলেন, তখন ঠাকুরকে শেষ প্রণাম জানালেন; বললেন, 'ঠাকুর, আমার এই শেষ প্রণাম।' নিমজ্জিত শরণাগত সন্তানকে শ্রীরামকৃষ্ণ স্রোতের টান থেকে উপরে তুলে আনলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকায় প্রত্যেক ভক্তেরই জীবন কৃপানিষ্ণাত। সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার ও অভিনেতা গিরিশচন্দ্র ঘোষ যৌবনে অসংযতচরিত্র থাকলেও শ্রীরামকৃষ্ণদেব দিব্যদৃষ্টি সহায়ে জেনে-ছিলেন তাঁর অন্তর ভক্তি-বিশ্বাসের আকর; তাঁর মত্ততা, কটূক্তি, উচ্ছৃঙ্খল ভাব সমস্তই উপেক্ষা ক'রে তাঁকে অপার্থিব কৃপাবারিতে সিঞ্চিত করে-ছিলেন; পরশমণির স্পর্শে তাঁর লৌহময় তনু হয়েছিল কাঞ্চনময় এবং ভক্তসমাজে তাঁর স্থান উচ্চ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত।

শ্রীরামকৃষ্ণ-কৃপা জাগতিক আধ্যাত্মিক সর্ব-ক্ষেত্রেই কল্যাণনিলয়। দারিদ্র্য-প্রপীড়িত উপেন্দ্র-নাথ মুখোপাধ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট অর্থসাচ্ছল্য প্রার্থনা করেছিলেন। তাঁর কৃপায় বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের মাধ্যমে তাঁর দারিদ্র্যমুক্তি ঘটে-ছিল এবং তিনি স্বোপার্জিত অর্থের সদ্ব্যয়ও করেছিলেন।

যারা নীচস্তরের মানুষ ব'লে সমাজে উপেক্ষিত তাদের উপর শ্রীরামকৃষ্ণের কী কৃপা! দক্ষিণেশ্বরের রসিক মেথর পথঘাট ঝাঁট দেয়, সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে। তার অনুক্ষণ চিন্তা সে অচ্ছুত, তাই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্য সান্নিধ্যলাভে, তাঁর কৃপালাভে বঞ্চিত। এই চিন্তাই তার মনের সকল মালিন্য মুছে দিয়েছে! একদিন প্রত্যূষে ঠাকুর ঝাউতলার দিকে যাচ্ছেন, রসিক তাঁর শ্রীচরণে নিপতিত হয়ে আত্মনিবেদন করলে তিনি তাকে দুর্লভ কৃপার স্পর্শ দেন।

তীর্থযাত্রাকালে দেওঘরের সন্নিকটে অন্নহীন বস্ত্রহীন সর্বহারা মানুষদের দেখে করুণায় বিগলিত হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ মথুরবাবুকে বলেছিলেন, তাদের রুক্ষ মাথায় তেল দিতে, পরনে কাপড় দিতে আর পেটভরে খাওয়াতে, নইলে তাঁর তীর্থে যাওয়া সম্ভব হবে না। উপায়ান্তর না দেখে মথুরবাবু তীর্থযাত্রার অর্থ দিয়ে ঠাকুরের ইচ্ছামত কাজ করেছিলেন। অন্য একটি ঘটনায়ও শ্রীরামকৃষ্ণদেব মথুরবাবুকে দিয়ে তাঁর জমিদারির দরিদ্র প্রজাদের খাজনা মকুব করিয়ে দিয়েছিলেন।

এমনও অনেকের উপর শ্রীশ্রীঠাকুরের অহেতুকী কৃপার অজস্র নিদর্শন আছে, যাঁরা প্রথমে বিরুদ্ধ ভাব পোষণ করতেন, পরে তাঁর দিব্য সান্নিধ্যলাভে বিশিষ্ট ভক্তে পরিণত হয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমণ্ডলীতে যাঁদের স্থান উচ্চ কোটিতে, তাঁদের মধ্যেও রয়েছেন এমন অনেকে, যাঁদের একবার বা দুবার তাঁর পুণ্য দর্শনলাভের পরই জীবনে ঘটেছে অভাবনীয় আধ্যাত্মিক রূপান্তর।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব পরমকৃপার নিত্য কল্পতরু হলেও ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুআরি লোকনয়নে প্রকাশিত কল্পতরু। সর্বজনসমক্ষে তিনি সেদিন আপামর সকলের অন্তরে জ্ঞানদীপ জেলে

দিয়েছেন। তাঁর শ্রীমুখ-নিঃসৃত 'তোমাদের চৈতন্য হোক' এই অমর মহাবাণী এখনও মানুষের অন্তর স্পর্শ ক'রে চৈতন্য সম্পাদন ক'রে চলেছে!

শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাবাতাস ব'য়েই চলেছে, যেন বসন্তকালের মলয়ানিল সকলের শরীর-মন স্নিগ্ধ করবার জন্যই সতত সঞ্চরমাণ! যে পাল তুলে দেবে সেই অনুভব করবে সেই কৃপা-সমীরণের সুমধুর স্পর্শ, তার তরণী ভবসাগরপারে গিয়ে ভিড়বে সুনিশ্চিত। কেউ যদি তাঁর দিকে এক পা এগিয়ে যেতে চায় তিনি এগিয়ে আসেন তার সামনে একশ' পা। শত দোষ ক'রেও কেউ যদি একবার তাঁর শরণাগত হয়, আর ক'রব না ব'লে প্রতিজ্ঞা করে তবে করুণাময় শ্রীরামকৃষ্ণ তার শত অপরাধ ক্ষমা ক'রে তাকে কাছে টেনে নেন, পরশমণির স্পর্শে তার জীবন পরিবর্তন ক'রে দেন। তাই কবিকণ্ঠে উদ্গীত হয়েছে:

'এমনি হরির অহেতু করুণা, এমনি প্রেমের যাদু,
কয়লাহৃদয় গলি' হীরা হয়, তস্করও হয় সাধু!'

এখনও নানা দেশে নানাভাষাভাষী মানুষ, কত সাধুসন্ত, অগণিত ভক্ত নরনারী, বালকবৃদ্ধ কিভাবে কতভাবে জাগতিক সুখ-দুঃখের মধ্য দিয়ে চলতে চলতে শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্য কৃপা ও অপার মহিমা উপলব্ধি ক'রে ধন্য হচ্ছেন, তা কে বলতে পারে?

মানুষের মনকে অনিত্য বস্তু থেকে উঠিয়ে নিয়ে তাকে নিত্য সত্য পারমার্থিক বস্তুর উপলব্ধি সর্বভাবে করিয়ে দেওয়াই হচ্ছে শ্রীরামকৃষ্ণ-কৃপা, এই কৃপার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন আছে সাধকগণের জীবনে।

কোন দূর দেশে কেউ বিতৃষ্ণায় ভ'রে-ওঠা জীবন সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে শেষ করতে চাইছেন, শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁর সম্মুখে বরাভয়মূর্তি ধ'রে উদ্ভাসিত হয়ে নিষেধ করছেন, কোন শিল্পীকে দর্শন দিয়ে শিল্পীর তুলি দিয়ে তাঁর দিব্যমূর্তি-অঙ্কনে উদ্বুদ্ধ করছেন, সুদূরের কোন সাহিত্যিক বা কবিকে করুণার স্পর্শ দিয়ে তাঁর দেবমানব-চরিত্র-চিত্রণে শক্তি প্রদান করছেন, বৈরাগ্যবান কোন ব্যক্তিকে সংসারত্যাগে প্রেরণা দিচ্ছেন, কাউকে শিবজ্ঞানে জীবসেবায় আত্মোৎসর্গ করতে শেখাচ্ছেন! যাঁরা তাঁর কৃপাবাতাসের অনুকূলে পাল তুলে দিতে পারছেন না, যাঁরা তাঁর শরণাগত হননি তাঁদের উপরও শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপা বর্ষিত হচ্ছে অঝোর ধারে। মানুষের মনের কামক্রোধাদি রিপুর মোড় ফিরিয়ে, তাকে অভিমান-অহংকার থেকে মুক্ত রেখে খাঁটি মানুষ তৈরি করবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ সূক্ষ্মশরীরেও কৃপাধারা বর্ষণ ক'রে অলক্ষিতে কাজ ক'রে চলেছেন!

বলেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণদেব যেদিন আবির্ভূত হয়েছেন, সেদিন থেকেই সত্যযুগ আরম্ভ হয়েছে। সত্যই তাঁর কৃপাপ্রবাহে জাতি-ভেদ ও বৈষম্য উঠে যাচ্ছে। সকল মানুষ শূদ্রত্ব পরিহার ক'রে ব্রাহ্মণত্বে উন্নীত হবে। দেখা যাচ্ছে যুগ যুগ ধ'রে অবহেলিত অনুন্নত তথা-কথিত নীচুস্তরের মানুষের মধ্যে জেগেছে জ্ঞানার্জনের ও বিদ্যালাভের দুর্বার আকাঙ্ক্ষা। তাঁরা ঐকান্তিক নিষ্ঠা সহকারে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলন ক'রে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছেন। নারী-জাতির মধ্যেও সর্বাঙ্গীণ উন্নতির প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে। কোথাও কোথাও বিলাসব্যসনের প্রতি যে ভাবালুতা দৃষ্ট হয়, তাও তাঁর কৃপায় নিশ্চয়ই বিদূরিত হবে। শ্রীরামকৃষ্ণকৃপা যুগজয়ী, কালগ্রাসী। সে কৃপার উপর দেশকালের প্রভাব নেই, সর্বদেশে সর্বকালে তা লোককল্যাণকর। সর্বভাবময় শ্রীরাম-কৃষ্ণের করুণাধারায় নিষ্নাত বিশ্বমানবসমাজ সব দ্বন্দ্ব হিংসা দ্বেষ ভুলে একদিন প্রেমপ্রীতিতে আবদ্ধ হবেই এবং উপলব্ধি করবে সত্যযুগের ও তাঁর শাশ্বত দিব্য মহিমা।

এস, এস জগতের সমস্ত আর্ত রিক্ত ব্যথিত বঞ্চিত মানুষ শ্রীরামকৃষ্ণমহাতীর্থে করুণাসিন্ধু শ্রীরামকৃষ্ণের পাদপীঠে—

অনন্ত কৃপার এক বিন্দু কর পান,
ত্রিতাপজ্বালার সব হবে অবসান।

শ্রীবুদ্ধস্মরণে

শ্রীমতী আশা রায়

নমো তস্‌স ভগবতো অরহতো সম্মা সম্বুদ্ধস্‌স

বৈশাখী পূর্ণিমা তিথি বৌদ্ধদের নিকট পবিত্র ও স্মরণীয় তিথি। এইদিনে ভগবান বুদ্ধ জন্ম গ্রহণ, বুদ্ধত্ব ও মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন। ঐতিহাসিক পণ্ডিতগণ এবিষয়ে সকলে একমত না হলেও বৌদ্ধগণের এইদিনে তাঁর প্রতি ভক্তিনম্র চিত্তে শ্রদ্ধানিবেদনে কোনও ব্যতিক্রম হয় না। আজ আমরাও সেই পুণ্য তিথিতে তাঁকে স্মরণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

ধর্মের লক্ষ্য মানুষের অন্তর্নিহিত পূর্ণতাকে বিকশিত করা। ইহা উপলব্ধির বিষয়। এই পূর্ণতাকে বিকশিত করবার জন্য সংসারে নানাবিধ বাধাবিঘ্নের মধ্যে নিজেকে নিরন্তর সংযত সুসংহত সুদৃঢ়ভাবে রূপান্তরিত করতে হয়।

ভারতে যখন ব্রাহ্মণ পুরোহিতগণের দ্বারা যাগ-যজ্ঞাদিতে পশুরক্তপাত প্রভৃতি বাহ্যিক অনুষ্ঠানের বিপুলতায় জনমানস বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল সেই সময় এক নতুন জীবন-বেদের আহ্বান এল ভগবান বুদ্ধের কণ্ঠ থেকে "অত্তাহি অত্তনো নাথো কোহি নাথো পরোসিয়া? অত্তনা হি সুদন্তেন নাথং লভতি দুল্লভং।" তুমি নিজেই নিজের নাথ। অন্য কে নাথ হতে পারে? আত্ম-দমনে দুর্লভ নাথ লাভ হয়। "অত্তদীপা অত্তসরণা বিহরথ।" নিজের মধ্যে দীপ জ্বালো, সেই আলোকে পথ অতিক্রম করো, অন্যের উপর নির্ভরের প্রয়োজন নেই। মানবের অন্তর্নিহিত শক্তির এই সর্বশ্রেষ্ঠ প্রশস্তি বিশ্বমানবের কর্ণে এনে দিল এক নতুন আশার বাণী—ভগবান নয়, দেবতারা নয়, ব্রাহ্মণ পুরোহিতগণকে সন্তুষ্ট ক'রে তাদের মাধ্যমে নয়, তোমার পূর্ণতালাভ, সত্যের আলোকলাভ তোমার নিজেরই সাধ্যায়ত্ত।

বুদ্ধ জরা-ব্যাধি-মৃত্যু-ক্লিষ্ট জীবের প্রতি করুণায় বিগলিত হ'য়ে দর্শনচর্চার চেয়ে দুঃখত্রাণের জীবনচর্যার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন অধিক। দুঃখনিরোধের মন্ত্র দর্শন এবং উচ্চ নীচ পণ্ডিত মূর্খ স্ত্রীপুরুষনির্বিশেষে গণমানসে গণভাষায় প্রচারই ছিল বুদ্ধজীবনের মুখ্য কীর্তি। কতিপয় উচ্চবর্ণ পণ্ডিত-সমাজ অপেক্ষা অগণিত জনসাধারণই ছিল তাঁর চিন্তার বিষয়। বিরাট বৌদ্ধদর্শন তাঁর সৃষ্টি নয়; পরবর্তী কালে তাঁরই বাণী ও উপদেশনির্ভর উত্তর-সূরীদের রচনা। বিতর্কের চেয়ে আচরণ, বুদ্ধির চেয়ে হৃদয়, চিন্তার চেয়ে আচরণ বুদ্ধের অধিক আগ্রহের বিষয় ছিল। শাস্ত্রের ঔপপত্তিক বিচারের চেয়ে তার ব্যবহারিক প্রয়োগের ওপর তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন বেশী।

প্রজ্ঞাঘন করুণাঘন প্রেমঘন বুদ্ধ সেইজন্যই জ্ঞানশীর্ষ তপঃশীর্ষ হয়েও হৃদয়-সম্পদ ও ব্যবহারিক জীবনে শুচিশুদ্ধ জীবনচর্যার মহান আদর্শ হিসাবে ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে চিরস্মরণীয় এক উজ্জ্বল ভাস্কর।

তাঁর শিক্ষা সম্পূর্ণভাবে জাগতিক ও নৈতিক, দৈবী রহস্য বা গুহ্যতত্ত্ববর্জিত। তাঁর শিক্ষা জ্ঞান ও ধ্যান-ভিত্তিক। উপনিষদ্‌ভিত্তিক ভারতীয় সাধনার একটি দিক নৈতিক আর একটি তাত্ত্বিক। দুঃখোৎপত্তির মূলোৎপাটন কিরূপে করা যায়, অহংকারকে কিভাবে নাশ করা যায়, সেই শিক্ষা বুদ্ধের মুখ্য অবদান।

নিজেকে তিনি ঈশ্বর, ঈশ্বরপ্রেরিত বা অলৌকিক শক্তির অধিকারী বলে কখনও ব্যক্ত করেননি। "সাধারণ মানুষ হয়ে যদি নিজ চেষ্টায় আমি

সর্বপ্রকার বন্ধন উত্তীর্ণ হবার পথ খুঁজে পেয়ে থাকি তবে তোমরা সকলেই চেষ্টা করলে পাবে। এস, এই সেই পথ। যে-কোন বাসনা দুঃখের হেতু, সর্বপ্রকার বাসনাচ্ছেদনই নির্বাণ।" ইতিহাস তাঁকে লোকশিক্ষক মহামানব বলে অভিহিত করেছে এবং মানুষ তাঁকে মহাকারুণিক মহান বন্ধু বলে গ্রহণ করেছে। তিনি জীবনের দীর্ঘ ৪৫ বৎসর পদ-যাত্রায় 'বহুজনসুখায় বহুজনহিতায়' ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে গমন করে মানুষকে দুঃখমুক্তির বাণী শুনিয়েছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ তাই তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন, "কিন্তু মহাপুরুষগণের মধ্যে বুদ্ধই একমাত্র বলিয়াছিলেন আমি ঈশ্বর সম্বন্ধে তোমাদের ভিন্ন ভিন্ন মত শুনতে চাই না। আত্মা সম্বন্ধে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম মতাম [illegible] করবার আবশ্যক কী? সৎ হও এবং সৎকার্য কর ইহাই তোমাকে, সত্য যাহাই হউক না, তাহাতে লইয়া যাইবে। তিনি সর্বপ্রকার অভিসন্ধিবর্জিত ছিলেন; আর কোন্ মানুষ তাঁহা অপেক্ষা অধিক কার্য করিয়াছিলেন? ইতিহাসে এমন একটি চরিত্র দেখাও, যিনি সকলের উপরে এতদূর গিয়াছেন। সমুদয় মনুষ্যজাতি কেবল এইরূপ একটিমাত্র চরিত্র প্রসব করিয়াছে—এতদূর উন্নত দর্শন! এমন অদ্ভুত সহানুভূতি! এই শ্রেষ্ঠ দার্শনিক সর্বশ্রেষ্ঠ দর্শন প্রচার করিয়াছেন, আবার অতি নিম্নতম প্রাণীর উপর পর্যন্ত সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন, অথচ লোকের নিকট কোন দাবী-দাওয়া নাই। বাস্তবিক তিনিই আদর্শ কর্মযোগী—তিনি সম্পূর্ণ অভিসন্ধিশূন্য হইয়া কার্য করিয়াছিলেন; আর মনুষ্যজাতির ইতিহাস দেখাইতেছে—যতলোক জগতে জন্মিয়াছেন, তিনি তাহাদের সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাঁহার সহিত আর সকলের তুলনা হয় না, তিনি হৃদয় ও মস্তিষ্কের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য-ভাবের উদাহরণ—আত্মশক্তির সর্বশ্রেষ্ঠ বিকাশ। জগতে যত সংস্কারক জন্মিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ।"

বুদ্ধের সম্বন্ধে একটি প্রচলিত ধারণা যে, তিনি নাস্তিক ছিলেন। একথা অবশ্য সত্য যে, তিনি ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে নিরুত্তর থাকতেন, কারণ তিনি জানতেন, যিনি 'অবাঙ্‌মনসোগোচরম্' সেই ঈশ্বর সম্বন্ধে সাধারণ মানুষ সারাজীবন বিচার বিতর্ক করেও সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছতে পারবে না, তাঁর স্বরূপ ভাষায় প্রকাশ করতে পারবে না। চরমসত্য উপলব্ধির বিষয়, তার যথাযথ বর্ণনা দেওয়া মানুষের অসাধ্য। তাই সকল মানুষের উদ্দেশ্যে তিনি বললেন—এই সংসারে জন্মে আমরা নানা দুঃখভোগের নিমিত্ত হয়েছি. যাতে এ দুঃখে আর পতিত না হ'তে হয়, জন্মপরম্পরা পুনঃ পুনঃ না ঘটে তাই আমাদের কাম্য। যদি কোনও বুদ্ধিমান মানুষ বিষাক্ততীরবিদ্ধ হয়, সে তখন কে তাকে তীরবিদ্ধ করলো, সে লোক লম্বা না বেঁটে, ফর্সা না কালো, দুর্বল না সবল ইত্যাদির অনুসন্ধানে সময় নষ্ট না করে দ্রুত শরীর থেকে তীর মুক্ত করে জীবন রক্ষা করে। সেরকম আমরাও সংসার-ক্লেশ-তীর-বিদ্ধ হয়েছি। বৃথা সময় নষ্ট না করে এ থেকে কিভাবে নিজেকে মুক্ত করা যায়, সেই চেষ্টাই আমাদের প্রথম কর্তব্য।

যুগে যুগে মহামানবগণ এসে সেই কালের সমাজ ও ধর্মের সংস্কার করেন। বুদ্ধ যে কালে অবতীর্ণ হয়েছিলেন তখন আমরা দেখতে পাই—নানা আবর্জনায় ধর্ম আচ্ছন্ন। ঈশ্বর বা পরমাত্মা সম্বন্ধে লক্ষ্যবিহীন নানাবিধ কূটতর্কের প্রাবল্য, গুরু পুরোহিতগণ দ্বারা স্বর্গকামনায় ব্যয়বহুল আনুষ্ঠানিক ধর্মাচার যার অধিকারী ছিলেন কেবল উচ্চবর্ণের ধনিগণই; অপরদিকে অরণ্য-পরিবেশে কঠোর তপস্যার দিকেই দৃষ্টিনিবদ্ধ, বস্তুলাভের দিকে নয়। ধর্ম যখন এক শ্রেণীর জীবিকা হয়ে দাঁড়ায় তখনই দেখা যায় তার গ্লানি। সেই মোহাচ্ছন্নতার যুগে বুদ্ধ; আপামর সাধারণের

উদ্দেশ্যে বললেন—"সর্বপ্রথম মনকে জয় কর, সংগ্রামে সহস্র সহস্র শত্রুজয় অপেক্ষা মনকে জয় করা কঠিন। বহির্মুখী মনকে অন্তর্মুখী করো, সকল সত্যের সন্ধান পাবে।" বুদ্ধের মতবাদ অনেক বিষয়েই ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরোধী হলেও তিনি উত্তম ব্রাহ্মণের যোগ্য সম্মান ও সকল সম্প্রদায়ের সঙ্গে প্রতিকূলতা-বর্জনেরই শিক্ষা দিয়েছেন; তাই আমরা ইতিহাসে দেখতে পাই অশোক হর্ষবর্ধন কণিষ্ক প্রভৃতি বৌদ্ধ সম্রাটগণ সর্ব ধর্মের শুশ্রূষা করে গেছেন।

বুদ্ধের শিক্ষা নীতিমূলক, চিত্তকে জয় করা বা চৈতসিক প্রবৃত্তিগুলিকে আয়ত্ত করা তাঁর প্রধান শিক্ষা, সে শিক্ষা জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সকলেই গ্রহণ করতে পারে, কোনও ধর্মের সঙ্গে তার বিরোধের সম্ভাবনাই নেই। তাই আমরা দেখতে পাই, তাঁর শিক্ষার অভূতপূর্ব প্রাণশক্তির বিকাশ। জাতি, শ্রেণী, বর্ণ, সমাজ, দেশ, ভাষা, সবরকম গণ্ডী অতিক্রম করে তার ব্যাপ্তি ঘটেছিল দূর দেশ-দেশান্তরে। অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তির প্রাবল্যে হিন্দুধর্মজাত বৌদ্ধমতবাদ একদা পৃথক ধর্মের রূপ পরিগ্রহ করলো; এ যেন পুত্র বিশেষ খ্যাতিমান হয়ে পরিচিতি লাভ করল নিজের পরিচয়ে, পিতার পরিচয়ে নয়।

কালক্রমে বুদ্ধের জন্মভূমি থেকে তাঁর ধর্ম প্রায় নির্বাসিত মনে হলেও একটু তলিয়ে দেখলে দেখবো তাঁকে ও তাঁর যুগান্তকারী অবদানকে মহৎ উদার হিন্দুধর্ম শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ক্রমে ক্রমে অঙ্গীভূত করে নিয়েছে; তাই তার পৃথক সত্তা প্রায় হারিয়ে গেছে। একদা পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ লোক বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিল।

ঈশ্বরের উল্লেখ না করায় তিনি যে নাস্তিক ছিলেন তা বলা যায় না। এ সম্বন্ধে আমরা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উক্তি শ্রীম-কথিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে ও শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ-লিখিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গে যা পাই, তাই উদ্ধৃত করছি :

শ্রীরামকৃষ্ণ—নাস্তিক কেন? নাস্তিক নয়, মুখে বলতে পারে নাই। বুদ্ধ কি জান? বোধস্বরূপকে চিন্তা ক'রে ক'রে -তাই হওয়া—বোধস্বরূপ হওয়া।

শ্রীরামকৃষ্ণ—এ তাঁরই খেলা—নূতন একটা লীলা। নাস্তিক কেন হতে যাবে! যেখানে স্বরূপকে বোধ হয়, সেখানে অস্তি-নাস্তির মধ্যের অবস্থা।

শ্রীরামকৃষ্ণ—বুদ্ধদেবের কথা অনেক শুনেছি, তিনি দশাবতারের ভিতর একজন অবতার। ব্রহ্ম অচল, অটল, নিষ্ক্রিয় বোধস্বরূপ বুদ্ধি যখন এই বোধস্বরূপে লয় হয় তখন ব্রহ্মজ্ঞান হয়; তখন মানুষ বুদ্ধ হয়। ন্যাঙ্‌টা বলতো মনের লয় বুদ্ধিতে, বুদ্ধির লয় বোধস্বরূপে।

"যতক্ষণ অহং থাকে ততক্ষণ ব্রহ্ম-জ্ঞান হয় না। ব্রহ্মজ্ঞান হলে, ঈশ্বরদর্শন হলে, তবে অহং নিজের বশে আসে, তা না হলে অহংকে বশ করা যায় না। নিজের ছায়াকে ধরা শক্ত; তবে সূর্য মাথার উপর এলে ছায়া আধ হাতের মধ্যে থাকে।"

লীলাপ্রসঙ্গে পাই শ্রীশ্রীঠাকুর তাই বলছেন—"শ্রীশ্রীবুদ্ধদেব ঈশ্বরাবতার ছিলেন ইহা নিশ্চয়, তৎপ্রবর্তিত মতে ও বৈদিক জ্ঞানমার্গে কোনও প্রভেদ নাই।" এই পুস্তকে অন্যত্র গ্রন্থকার লিখেছেন—"ভগবান বুদ্ধদেব সম্বন্ধে ঠাকুর হিন্দু সাধারণে যেমন বিশ্বাস করিয়া থাকে সেইরূপ বিশ্বাস করিতেন; অর্থাৎ শ্রীবুদ্ধদেবকে তিনি ঈশ্বরাবতার বলিয়া শ্রদ্ধা ও পূজা অর্পণ করিতেন, এবং পুরীধামস্থ শ্রীশ্রীজগন্নাথ-সুভদ্রা-বলভদ্ররূপ ত্রিরত্নমূর্তিতে শ্রীভগবান বুদ্ধাবতারের প্রকাশ অদ্যাপি বর্তমান বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের প্রসাদে ভেদবুদ্ধির লোপ হইয়া মানবসাধারণের জাতিবুদ্ধিবিরহিত হওয়া-রূপ

উক্ত ধামের মাহাত্ম্যের কথা শুনিয়া তিনি তথায় যাইবার জন্ম সমুৎসুক হইয়াছিলেন।"

অতি সংক্ষেপে বলতে গেলে বৌদ্ধধর্ম অহং হতে অহং-বোধহীনতায়, দেহাত্মবুদ্ধি হতে দেহ-বুদ্ধিহীনতায়, জগৎপ্রপঞ্চের ক্ষয়িষ্ণুতা ও অনিত্য-তাবোধে পৌঁছতে এবং সর্বজীবের প্রতি মৈত্রী-করুণার নিবিড়তায় নিমগ্ন হতে কায়িক মানসিক ও বাচনিক কতগুলি অনুশীলনের প্রচেষ্টা ; পরি-শেষে ধ্যান ও তার চরম অবস্থা সমাধি—যার দ্বারা পরিপূর্ণ জ্ঞান ও সত্যকে লাভ করা যায়। বৌদ্ধ ধ্যান-প্রণালী বহুবিধ, যদিও ঈশ্বরীয় রূপ-ভিত্তিক নয়। মনকে সূচ্যগ্রবৎ একমুখী (one-pointedness of mind) করে কতগুলি অভ্যন্তরীণ ক্রিয়া বা ভাবনায় নিবদ্ধ করা বৌদ্ধ-ধ্যানের মুখ্য প্রণালী। এর বিস্তারিত বিশ্লেষণের অধিকারী আমি নই।

এই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী স্মরণ করি—যত মত তত পথ।

"অযত্ন-আচ্ছাদিত গৃহে যেমন বর্ষণধারা প্রবেশ করে, তেমনি অসংযতচিত্তে ভোগবাসনা প্রবেশ করে।"

"অপরের ত্রুটি, অপরের কৃত বা অকৃত কর্মে মন দিও না, নিজের কৃতকর্মে মন দিও নিজের কৃত ও অকৃত কর্মের প্রতি দৃষ্টি রাখ।"

"সংগ্রামে সহস্র লোক জয় অপেক্ষা আত্মজয় শ্রেয়তর।"

"অপরকে যেরূপ শিক্ষাদান করিবে, নিজেকে সেরূপ গঠন কর।"

—বুদ্ধদেব

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ও বাংলার রঙ্গমঞ্চ

[পূর্বানুবৃত্তি]

ডক্টর প্রণবরঞ্জন ঘোষ

গিরিশচন্দ্রের ভক্তিরসাত্মক নাটকে হাস্যরসের একটি সহজ ভঙ্গিমা লক্ষণীয়। পৌরাণিক, আধ্যাত্মিক বা অলৌকিক পরিমণ্ডলের সঙ্গে বাস্তবজগতের গ্রন্থিবন্ধনে এই হাস্যরসাত্মক দৃশ্যগুলি এমন স্বাভাবিকভাবে মিশে যায় যে, এই দৃশ্যগুলি যে গিরিশচন্দ্রের প্রতিভারই বিশেষ লক্ষণ, সে কথা আমরা সব সময় মনে রাখি না। পরবর্তী কালে লেখা তাঁর 'বিল্বমঙ্গল' বা 'জনা'-জাতীয় নাটকে এ বৈশিষ্ট্যের আরো স্ফুরণ হয়েছে। কিন্তু 'চৈতন্যলীলা'-নাটকের 'জগাই-মাধাই' চরিত্রদুটিতেও গিরিশচন্দ্রের রঙ্গরসনৈপুণ্যের সহজপটুতা লক্ষণীয়।

নবদ্বীপের অবৈষ্ণব প্রতিবেশীরা বৈষ্ণব-ভক্তদের যে বিশেষ সুনজরে দেখতেন না, তার বহু উদাহরণ 'চৈতন্যভাগবতে' চৈতন্যজীবনীবর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে বৃন্দাবনদাস দিয়েছেন। আবার এদের মধ্যে জগাই-মাধাইয়ের দৌরাত্ম্য যে আর সবাইকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল, সেকথাও বৃন্দাবন-দাসের গ্রন্থে সুপরিস্ফুট। গিরিশচন্দ্র মূলতঃ সেখান থেকেই উপকরণ সংগ্রহ করেছেন।

নিমাই পণ্ডিতের অনুপ্রেরণায় নিত্যানন্দ ও হরিদাস—এ দুই সন্ন্যাসী তখন নবদ্বীপের ঘরে ঘরে হরিনামবিতরণে রত।

"নিত্যানন্দ হরিদাস বোলে, 'এই ভিক্ষা।
কৃষ্ণ বোল, কৃষ্ণ ভজ, কর কৃষ্ণ শিক্ষা॥'
এই বোল বলি দুইজন চলি যায়।
যে হয় সুজন, সেই বড় সুখ পায়॥···
এইমত ঘরে ঘরে বুলিয়া বুলিয়া।
প্রতিদিন বিশ্বম্ভর-স্থানে কহে গিয়া॥
একদিন পথে দেখে দুই মাতোয়াল।
মহাদস্যু প্রায় দুই মদ্যপ বিশাল॥
সেই জনের কথা কহিতে অপার।
তারা নাহি করে, হেন পাপ নাহি আর॥"

(চৈতন্যভাগবত : মধ্যখণ্ড : ত্রয়োদশ অধ্যায়)

মত্ত অবস্থায় নিজেদের মধ্যে মারামারিতে রত এদের দূর থেকে দেখে নিত্যানন্দ পাড়ার লোকদের কাছে জিজ্ঞাসা করে জানলেন যে, অতি উচ্চ ব্রাহ্মণবংশে জন্মেও এরা দুই ভাই এমন অধঃপতনের পথ বেছে নিয়েছে।

"শুনি নিত্যানন্দ বড় করুণহৃদয়।
দুইর উদ্ধার চিন্তে হইয়া সদয়॥
'পাপী উদ্ধারিতে প্রভু কৈলা অবতার।
এমত পাতকী কোথা পাইবেন আর॥'"

প্রথম দিনে এ দুই ভাইকে হরিনাম বিতরণ করতে গিয়ে অবশ্য নিত্যানন্দ হরিদাসকেই প্রাণ নিয়ে পালাতে হলো। উদ্ধারের কাজ তখনো বাকি।

'চৈতন্যভাগবতে'র জগাই-মাধাই-কাহিনী গিরিশচন্দ্রের নাটকে আর একটু পরিব্যাপ্ত আকারে দেখা দিয়েছে। 'চৈতন্যলীলা'র তৃতীয় অঙ্ক থেকে জগাই-মাধাই মাঝে মাঝে এসে এক-দিকে বৈষ্ণবভক্তদের বিরুদ্ধে সাধারণের সমালোচনা এবং অন্যদিকে নিমাই পণ্ডিতের ক্রমবর্ধমান প্রসারের কথা যথাসম্ভব মদমাতালদের ভাষায়ই জানিয়ে গেছে। এতে শুধু যে হাস্য-রসের অবসর ঘটেছে তা নয়, এ চরিত্রদুটির সমস্ত উচ্ছৃঙ্খলতার আড়ালেও যে এক শিশুসুলভ কৌতুকপরায়ণতা রয়েছে সেকথাও ফুটিয়ে তোলা

'বিবেকানন্দ ও বাংলা সাহিত্য' (২য় সংস্করণ) গ্রন্থখানির জন্য অধ্যাপক প্রণবরঞ্জন ঘোষ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডি. লিট্. উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।—সঃ

হয়েছে। মদ্যপের চরিত্রগত দুর্বলতা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান গিরিশচন্দ্রের ছিল বলেই কৌতুকে বা করুণরসে গিরিশচন্দ্রের নাটকে মদ্যপচরিত্র খুব স্বাভাবিক হয়ে উঠতে পেরেছে। সেইসঙ্গে দুই ভাইয়ের চরিত্রে একটু সূক্ষ্ম পার্থক্যও গিরিশ-চন্দ্র প্রতিটি দৃশ্যে রক্ষা করেছেন। বৈষ্ণবদের সম্বন্ধে যতই লঘু পরিহাস করুক, তারই মধ্যে 'জগাই' বৈষ্ণবদের প্রতি একধরনের অনুরক্তি লাভ করেছে। সবসময় বিদ্রূপ করতে করতে মানুষ অনেক সময় আপন অগোচরেই ভক্ত হয়ে যায়। অপরপক্ষে মাধাইয়ের বিদ্রূপ প্রায় সর্বত্রই নির্মম, ফলে নিত্যানন্দকে প্রত্যক্ষ আঘাত করার নিষ্ঠুরতাও তার দ্বারাই সম্ভব।

চতুর্থ অঙ্কে গিরিশচন্দ্র নিমাইয়ের কাছে নিতাইয়ের জগাই-মাধাই-উদ্ধারের জন্য প্রার্থনা ও জগাই-মাধাই-উদ্ধার দৃশ্যটি প্রথম গর্ভাঙ্কে রাজ-পথে উপস্থাপিত করেছেন। বাস্তবে অবশ্য উদ্ধারের সঙ্কল্প ও তার পরিণতি একই দিনে একই স্থানে ঘটেনি। রঙ্গমঞ্চের প্রয়োজনে সমগ্র ঘটনাটি অনেক দ্রুতগতিতে সম্পন্ন।

*

"নিতাই। প্রভু, করুণাময়! তোমার মাহাত্ম্য বুঝবো, যদি সেই মাতাল দু'জনকে উদ্ধার কর, তবেই তোমার মাহাত্ম্য। প্রভু, তারা অতি দীন, অন্ধকূপে পতিত। আহা! তারা হরিনাম শুনে মারতে আসে, তাদের দশা কি হবে?

নিমাই। নিতাই! তুমি যারে উদ্ধার করবে ভাবছ, তা অপেক্ষা ভাগ্যবান কে আছে? তোমার প্রেমে কীট-পতঙ্গ উদ্ধার হবে।

নিতাই। না ঠাকুর! ভাঁড়ালে হবে না, জগাই-মাধাইয়ের মত পাপী নেই; তাদের উদ্ধার করতে হবে; যে হরি বলে, সে তো আপনার গুণে তরবে; প্রভু! এই দীন মাতাল-দের নিজ গুণে তরাও।

নিমাই। নিতাই! তোমাদের মনস্কামনা হরি অবশ্যই সিদ্ধ করবেন। জগাই-মাধাই ধন্য!—যাকে তুমি প্রেমদান করেছ। কে কোন্ দিকে যাবে, চল—ঘরে ঘরে নাম বিলুই। —কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ ধনপ্রাণ!

সকলে। কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ ধনপ্রাণ [নিতাই ও নিমাই ব্যতীত সকলের প্রস্থান]

নিমাই। নিতাই যাবে না?

নিতাই। আমি আজ মাতাল নিয়ে মদ খাব।

নিমাই। তোমার মাতালদের খাইয়ে যদি থাকে, আমাদেরও একটু দিও। [নিমাইয়ের প্রস্থান]"

জগাই-মাধাইয়ের সঙ্গে নিত্যানন্দের দেখা হওয়ার আগে এই ভূমিকাটুকু উচ্চাঙ্গের নাট্য-কৌশলের নিদর্শন। নিমাই-নিতাইয়ের যুগল আশীর্বাদ যে দুষ্কৃতকারী দু'ভাইয়ের জন্য আগে থেকেই সঞ্চিত হয়ে আছে সেকথা এই ভক্তি-রসাত্মক নাটকের পরিবেশরচনায় একান্ত সহায়ক। সেইসঙ্গে নিমাইয়ের ওই রহস্যপূর্ণ সংলাপ—'—যদি থাকে, আমাদেরও একটু দিও।' আজ নামসুধাবিতরণের মহোৎসব যে সকলকে নিয়েই ঘটবে, তারও ইঙ্গিত ওই কথাটির মধ্যে।

জগাই-মাধাই-উদ্ধারের দৃশ্যটির সূচনা বৃন্দা-বনদাসের বর্ণনা থেকে একটু উদ্ধৃত করি। প্রতি দিনের মতো নামপ্রেমপ্রচারের কাজ শেষ করে নগরভ্রমণান্তে নিত্যানন্দ ফিরে আসছেন, এমন সময় জগাই-মাধাই তাঁকে দেখতে পেয়ে দৌড়ে এলো।

"'কে রে কে রে' বলি ডাকে জগাই-মাধাই।
নিত্যানন্দ বোলেন, "প্রভুর বাড়ী যাই।
মদ্যের বিক্ষেপে বোলে 'কিবা নাম তোর?'
নিত্যানন্দ বোলে, "অবধূত নাম মোর।"

... ...

অবধূত নাম শুনি মাধাই কুপিয়া।
মারিল প্রভুর শিরে মুটকী তুলিয়া॥
ফুটিল মুটুকী শিরে রক্ত পরে ধারে।
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু গোবিন্দ স্মঙরে॥
দয়া হৈল জগাইর রক্ত দেখি মাথে।
আরবার মারিতে ধরিল দুই হাথে॥
"কেনে হেন করিলে নির্দয় তুমি দড়।
দেশান্তরী মারিয়া কি হৈব তুমি বড়॥
এড় এড় অবধূত না মারিহ আর।
সন্ন্যাসী মারিয়া কোন লাভ বা তোমার॥"

এদিকে ঘটনার বিবরণ নিমাইয়ের কাছে পৌছবামাত্র তিনি সদলবলে এসে উপস্থিত হয়ে অত্যন্ত রুষ্ট হলেন। সেই ক্রোধের অভিব্যক্তিকে গিরিশচন্দ্র অনেক নম্রভাবে তাঁর নাটকে ফুটিয়ে চৈতন্যচরিত্রের কোমলমাধুর্যটি তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিমায় সার্থকভাবেই দেখিয়েছেন। কিন্তু কোমলে কঠোরে যে অপূর্ব রসসমন্বয় বৃন্দাবনদাসের জীবনীতে ঘটেছে, তা এ নাটকে কোথাও সম্ভব হয়নি।

'চৈতন্যলীলা'য় এ দৃশ্যটি—

নিতাই। (গীত) কিশোরীর প্রেম নিবি আয়, প্রেমের জোয়ার বয়ে যায়······

(জগাই ও মাধাইয়ের প্রবেশ)

জগাই। কে রে—কে রে—কে রে ব্যাটা রাইকিশোরী?

নিতাই। বাবা! আমি অবধূত।

মাধাই। এই দিকে আয় শালা; আমি তোর যমের দূত; হুঁ! আজ আর যাও কোথা শালা? সে দিন বড় পালিয়েছিলে, বল্ শালা, তুই সখী—না বৃন্দে?

নিতাই। তুমি যে হও, একবার হরি ব'

মাধাই। শালা, আবার আজ! (কলসীর কাণা ছুঁড়িয়া প্রহার)

নিতাই। প্রভু! অপরাধ কর হে মার্জনা,
জানে না, জানে না—জ্ঞানহীন সন্তান তোমার,
দয়াময়, নিজগুণে পতিতে নিস্তার কর।

মাধাই। আবার শালা,—

জগাই। কেন বল্ দেখি, তুই ওকে মারবি?

মাধাই। মারবো, তুই কি রাখবি?

জগাই। কখনই মারতে দেব না।

(চৈতন্যলীলা: চতুর্থ অঙ্ক: ১ম গর্ভাঙ্ক)

'কথামৃতে' মহেন্দ্রনাথের সাক্ষ্য অনুযায়ী দৃশ্যটি -

"যবনিকা উঠিয়া গেল। রাজপথে নিত্যানন্দ মাথায় হাত দিয়া রক্তস্রোত বন্ধ করিতেছেন। মাধাই কলসীর কাণা ছুঁড়িয়া মারিয়াছেন। নিতাইয়ের ভ্রূক্ষেপ নাই। গৌরপ্রেমে গরগর মাতোয়ারা! ঠাকুর ভাবাবিষ্ট। দেখিতেছেন, নিতাই জগাই-মাধাইকে কোল দিবেন। নিতাই বলিতেছেন—

প্রাণ ভরে আয় হরি বলি, নেচে আয় জগাই
মাধাই।
মেরেছ বেশ করেছ, হরি বলে নাচ ভাই॥
বলরে হরিবোল; প্রেমিক হরি প্রেমে দিব
কোল।
তোল রে তোল হরিনামের রোল॥ ··"—

নিতাইয়ের এই গানটি সেদিনের বিশিষ্ট দ্রষ্টাদের যে বিচলিত করেছিল, সেকথা স্বাভাবিকভাবেই মনে হয়। তবে এতকাল পরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 'চৈতন্যলীলা' অভিনয়-দর্শনের অনুধ্যানে একথাও মনে জাগে যে জগাই-মাধাই-চরিত্রচিত্রণে গিরিশ-চন্দ্রের নৈপুণ্য ও 'জগাই-মাধাই'-উদ্ধারের দৃশ্যটি দেখার সময় শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবতন্ময়তা—এই সব কিছুর মধ্য দিয়েই অলক্ষ্যে আর এক মহানাটকের প্রস্তুতি চলেছিল। জগাই-মাধাই এক হয়ে এ যুগে গিরিশচন্দ্র স্বয়ং আর 'নিত্যানন্দের খোলে চৈতন্যের আবির্ভাব' শ্রীরামকৃষ্ণসত্তায়।

জগাই-মাধাইয়ের চরিত্রগত পরিবর্তন নবদ্বীপ-বাসীদের অন্তরে নিমাইপণ্ডিতের সম্বন্ধে উচ্চ-ধারণায় বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। গয়াধাম থেকে প্রত্যাবর্তনের এক বৎসরের মধ্যেই নিমাই আপন ঈশ্বরস্বরূপপ্রকাশের দ্বারা নবদ্বীপের বৈষ্ণবমণ্ডলীর নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন এবং ধীরে ধীরে একথাও উপলব্ধি করলেন যে মানব-অন্তরে ঈশ্বরলাভের ব্যাকুলতাজাগানোর জন্যই প্রয়োজন তাঁর সন্ন্যাস। সাধারণভাবে ভগবানলাভের জন্য যে সন্ন্যাস সেই ঈশ্বরানুভব তাঁর গয়াধাম থেকে প্রত্যাবর্তনের পথেই প্রথম হয়েছে। কিন্তু সেই ঈশ্বরানন্দের আস্বাদ মুমুক্ষু ও বদ্ধ জীবদের অন্তরে সঞ্চার করার জন্যই তাঁর সন্ন্যাস। 'চৈতন্য-ভাগবত'কার নবদ্বীপের বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে চৈতন্যদেবের পরিচয় ও ভাববিনিময়ের মধ্য দিয়ে তাঁর সন্ন্যাসগ্রহণের সঙ্কল্প সম্বন্ধে পাঠককে ধীরে ধীরে প্রস্তুত করেছেন।

গিরিশচন্দ্রের 'চৈতন্যলীলা'য় চৈতন্যদেবের সংসারত্যাগের ঘটনা উপস্থাপিত হয়েছে 'জগাই-মাধাই'-উদ্ধার-দৃশ্যের পরেই। এক হিসাবে গিরিশচন্দ্র এই 'সন্ন্যাসী' নিমাইকে তাঁর নাটকের প্রথম থেকেই দর্শকের সামনে উপস্থাপিত করার চেষ্টা করেছেন। বৃন্দাবনদাসের জীবনীকাব্যে যেমন আদি খণ্ডের নিমাইপণ্ডিতের সঙ্গে মধ্য-খণ্ডের নিমাইয়ের মৌলিক পার্থক্য আছে বলে মনে হয়, গিরিশচন্দ্রের নাটকে তা না হয়ে শৈশব থেকেই রাধাভাবদ্যুতিসুবলিততনু কৃষ্ণস্বরূপ নিমাই দর্শকমণ্ডলীর পরমারাধ্য হৃদয়দেবতারূপে দেখা দিয়েছেন। নিমাইসন্ন্যাস চৈতন্যেরই প্রকাশলীলা। আর এ যুগে সে লীলার অন্যতম দর্শক সেদিন পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণদেব। (ক্রমশঃ)

নন্দলালা

শ্রীসুব্রহ্মণ্য ভারতী

[অনুবাদিকা : শ্রীমতী বিভা সরকার]

বায়সের কৃষ্ণ পক্ষে
হেরি তব রূপ চিরন্তন
ওগো নন্দলালা !

বনানীর শ্যামলিমা
তোমারই ও শ্যামকান্তি
ওগো কৃষ্ণ কালা !

ধ্বনির তরঙ্গবুকে
শুনি তব ধুন
ওগো নন্দলালা !

অগ্নির স্পর্শেও
তব স্পর্শসুখ
ওগো নন্দলালা !

তুমি তো বিস্ময়

অধ্যাপক শিবশম্ভু সরকার

বিস্ময় কি চারিভিতে
আকাশের দশে দিশে
তারার ঝিলিমিলিতে ?
বাতাসের স্নিগ্ধ আশাবরীতে
অথবা ঝঞ্ঝার মন্থনে
মেঘের গর্জনে
বন্যার হাহাধ্বনিতে ?
পাতার মর্মরে
পাখীর কুহুস্বরে
দিক-জোড়া মাঠের হিরণে হরিতে ?
মরুর ইঙ্গিতে
নদীর কলগীতে
বিস্ময়ের আলোড়ন কি খুঁজে পাও
অরণ্যের পর্ণশ্রীতে ?
তুমি নিজেই বিস্ময়
ভূমি তুমি, ভূমা হোয়ে
হোলে বিশ্বময়
ক্ষুদ্র এক বীজ
হোলো মনসিজ
সৃষ্ট হোয়ে, স্রষ্টা হোলে
হোলে প্রাণময়
চেতনাবিহারী
সঙ্গীতের ঝারি
গায়ত্রীর ছন্দে নামে
অমর অভয়
মহাকবি ব্রহ্মজ্ঞানে
বাক্য মন হার মানে
আনন্দেতে হিল্লোলিত
অদ্বয় অক্ষয়
সীমার প্রচ্ছদে আসে
অনন্ত বিস্ময় !

সমালোচনা

বেদান্ত-দর্শন (প্রথম খণ্ড)—ব্রহ্মচারী শিশিরকুমার। ৫২, ঠাকুরবাড়ী স্ট্রীট, শ্রীরামপুর, হুগলী হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ২২৪ + ৪৮; মূল্য দুই টাকা।

প্রস্থানত্রয়ের মধ্যে ন্যায়প্রস্থান ব্রহ্মসূত্রের প্রচলিত নাম বেদান্তদর্শন। আচার্যগণ স্বীয় মত প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। আলোচ্য পকেট-সাইজ গ্রন্থখানি শ্রীনিম্বার্কাচার্যের মতানুসারী ব্যাখ্যা-সংবলিত। এই গ্রন্থে ব্রহ্মসূত্রের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় ও চতুর্থ পাদ উপস্থাপিত; সংস্কৃত মূল সূত্র, তাহার নীচে সূত্রার্থ ও 'অনুধ্যান' অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা পরিবেশিত। গ্রন্থের প্রারম্ভে কয়েকটি প্রবন্ধের মাধ্যমে বক্তব্য বিষয় সুপরিস্ফুট। বইখানি ক্ষুদ্র হইলেও ইহা পাঠে নিম্বার্কমতে বেদান্তদর্শন সম্বন্ধে ধারণা হইবে।

গীতার বাণী (১ম হইতে ৬ষ্ঠ অধ্যায়): সঙ্কলয়িত্রী—শ্রীসাধনা পুরী। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবায়তন, ২ শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ সাহা লেন, বরানগর, কলিকাতা ৩৬। পৃষ্ঠা ৭১১ + ভূমিকা ৩৫; মূল্য দশ টাকা।

গ্রন্থের ভূমিকায় গীতা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে: 'কোন ধর্মবিশেষের বা সম্প্রদায়বিশেষের শিক্ষার জন্য ইহা প্রণীত হয় নাই—সমগ্র মানবজাতির জন্যই ইহা প্রস্তুত হইয়াছে।'

'গীতার বাণী'তে যে ব্যাখ্যার প্রতি পাঠকবর্গের দৃষ্টি নিবদ্ধ হইবে, তাহা হইল উল্লিখিত উক্তিকে সমর্থন করিবার জন্য আন্তরিক প্রচেষ্টা। পুরাতন ও নূতন বহু ব্যাখ্যা ও টীকা যাহা বর্তমানে প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত, সেগুলির এবং মহাপুরুষগণের বাণীর প্রাসঙ্গিক উল্লেখ থাকায় গ্রন্থখানির উপাদেয়তা ক্ষুণ্ন হয় নাই। সহজবোধ্য ভাষা গৃহীত হওয়ায় কঠিন শ্লোকগুলিও সাধারণ পাঠকের বুঝিবার সুবিধা হইবে। ভূমিকাটি সুলিখিত।

যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ—শ্রীপরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ১২, সর্ব খাঁ রোড, কলিকাতা-৩৭ হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ২৩২; মূল্য দশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

অনন্তভাবময় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব জগতের ইতিহাসে বিশেষ তাৎপর্যময়, তাই তাঁহার অনবদ্য জীবনকে ত্রিতাপদগ্ধ মানুষের সামনে তুলিয়া ধরিবার প্রচেষ্টা বহু ভাবে বহু ভাষায় বহু সুধী বিজ্ঞ জন করিয়া থাকেন। তবে এই প্রচেষ্টা তত্ত্ব ও তথ্যের দিক হইতে যতদূর সম্ভব ত্রুটিহীন ও নির্ভুল হওয়া প্রয়োজন। আলোচ্য গ্রন্থখানিতে যে আন্তরিক প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়, তাহা অভিনন্দনযোগ্য; তবে কতকগুলি ভুল পাঠকমাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে, গ্রন্থখানিকে মর্যাদাসম্পন্ন করিবার উদ্দেশ্যে আমরা মাত্র কয়েকটি ক্ষেত্রে ভক্ত লেখকের দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে প্রয়াসী হইলাম; যেমন বইটির নামকরণে ও বহু স্থলে 'যুগবতার' লিপিবদ্ধ হইয়াছে, যুগ + অবতার = যুগাবতার হওয়াই বাঞ্ছনীয়, এইটি হয়তো মুদ্রণ-প্রমাদও হইতে পারে, কিন্তু শতাধিকবার এইরূপ ছাপা হইয়াছে।

চমৎকার রচনাশৈলী বইখানির বৈশিষ্ট্য বলিয়া পাঠককে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত একটানা পড়িয়া যাইতে উদ্বুদ্ধ করিলেও তথ্যগত ভুলগুলি পীড়াদায়ক নিঃসন্দেহ। ভাষার সামঞ্জস্যও সর্বত্র রক্ষিত হয় নাই, যেমন 'সামান্য পূজারী গদাধর নয়, সে মায়ের ছেলে। তাই মাকে ফুল দিয়া সাজান।' (পৃষ্ঠা ২০)

'যতনে হৃদয়ে রেখো আদরিণী শ্যামা মাকে'—গানটি সাধক রামপ্রসাদের নয়, এটি সাধক কমলাকান্তের। 'বাসনারে সঙ্গে রাখি' নয়, গানের পদে আছে 'রসনারে সঙ্গে রাখি, সে যেন মা ব'লে ডাকে।' উদ্ধৃত আরও কয়েকটি গানে এই ধরনের ভুল চোখে পড়িল।

গ্রন্থের শেষাংশে ১৮১ হইতে কয়েক পৃষ্ঠা-ব্যাপী অধ্যাত্ম-অনুভূতির যে বিচিত্র ঘটনাগুলি সন্নিবেশিত, তৎসম্বন্ধে লেখকের মন্তব্য: 'কিন্তু কিছু কিছু লোক এই সমস্ত কথা একেবারে বিশ্বাস করেন না' (পৃঃ ১৮৪)। এই ব্যক্তিগত অনুভূতিগুলি এ গ্রন্থে সামঞ্জস্য-বিহীন বলিয়া স্বতন্ত্র পুস্তিকায় প্রকাশিত হইলে ভাল হইবে।

পরবর্তী সংস্করণে সব দিক দিয়া গ্রন্থখানিকে নির্ভুল করিয়া প্রকাশ করিতে গ্রন্থকারকে অনুরোধ জানাইতেছি।

Re-union Souvenir (1972): Ramakrishna Mission Calcutta Students' Home, Belgharia, Calcutta56. pp. 58.

এই স্মরণিকায় 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' হইতে অংশবিশেষ প্রাঞ্জল সংস্কৃতে অনুবাদ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে পত্রিকাটির মর্যাদা বাড়িয়াছে। স্বামী নির্বেদানন্দজীর '**The Spiritual Element in our Educational Objective**' নামক সুচিন্তিত প্রবন্ধটি শিক্ষাব্রতী মাত্রেরই অবশ্য পঠনীয়। নিবন্ধে ও কবিতায় প্রদত্ত স্মৃতিতর্পণগুলি সুন্দর। 'শ্রদ্ধাঞ্জলি' কবিতায় শ্রদ্ধাবিমিশ্র ভাব সুপরিস্ফুট। স্বামী বিশোকানন্দের 'নভেল্‌টি' শীর্ষক লেখাটিতে সত্যই অভিনবত্ব বিদ্যমান।

কল্যাণ—শ্রীবিষ্ণু-অঙ্ক: সম্পাদক শ্রীচিম্মনলাল গোস্বামী, শাস্ত্রী। গীতা প্রেস, গোরখপুর হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৫৪০; মূল্য দশ টাকা।

ভগবান শ্রীবিষ্ণু সর্বব্যাপী। সাধক মহাপুরুষগণ তাঁহার অচিন্ত্য মহিমার সর্বব্যাপিত্ব সম্বন্ধে বহু কথা বলিয়াছেন, যাহা সনাতন ধর্মশাস্ত্রে প্রকীর্ণ রহিয়াছে। এই সব মহিমার বিষয় একত্র পাওয়া ভক্তগণের পক্ষে কঠিন নিঃসন্দেহ; 'কল্যাণ'-কর্তৃপক্ষ এই দুরূহ কাজটি করিয়া ভক্তসমক্ষে 'শ্রীবিষ্ণু-অঙ্ক' উপস্থাপিত করিয়াছেন। 'সর্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ', শ্রীবিষ্ণুতত্ত্ব, শ্রীবিষ্ণুস্তুতি, শ্রীবিষ্ণুর ধ্যান, উপাসনা, স্বরূপ, অবতারলীলারহস্য প্রভৃতি অবলম্বনে রচিত প্রবন্ধাবলীর মান উচ্চকোটির। বহু সুধী লেখক এই সকল প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন এবং রচনায় শ্রীবিষ্ণুর অনুধ্যানের ছাপ দিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। বিশেষাঙ্কখানি সংরক্ষণযোগ্য।

বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউশন পত্রিকা— বিদ্যালয়ের সুবর্ণ-জয়ন্তী সংখ্যা, ১৩৭৯। বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউশন, ১৫ ও ১৭ স্বামী বিবেকানন্দ রোড, হাওড়া-৪ হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ১৩৪।

হাওড়া বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউশনের ইতিহাস শিক্ষার ক্ষেত্রে গৌরবোজ্জ্বল। সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসরের অনলস সমবেত প্রচেষ্টা ইহার পিছনে রহিয়াছে। সুবর্ণ-জয়ন্তী ও বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধানশিক্ষক মহাশয়ের সংবর্ধনা উপলক্ষে এই মনোজ্ঞ স্মরণিকা-সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। বিদ্যালয়ের পঞ্চাশ বৎসরের ক্রমোন্নতির পরিচিতি ও প্রাক্তন প্রধানশিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধা অনেকগুলি স্মৃতিচারণে সুপরিস্ফুট। স্মরণিকাখানি বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ও বর্তমান কর্মিবৃন্দ, ছাত্রবৃন্দ এবং অনুরাগিগণের আদরণীয় বলিয়া গৃহীত হইবার উপযুক্ত।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

সেবাকার্য

বাংলাদেশে সেবাকার্য: মার্চ ১৯৭৩ পর্যন্ত বাংলাদেশে ৮টি সেবাকেন্দ্রের মাধ্যমে দুঃস্থ জনগণের সেবাকার্যে ২৫,৭৮,১৩৫.০৮ টাকা ব্যয়িত হইয়াছে; প্রাপ্ত দানসামগ্রীর মূল্য এই টাকার অন্তর্ভূক্ত নয়।

গত ফেব্রুআরি মাসে অনুষ্ঠিত সেবাকার্যের বিবরণ:

ঢাকা কেন্দ্র কর্তৃক নিম্নলিখিত দ্রব্যসমূহ বিতরিত হয়:

মিল্ক-পাউডার ৭,৫০০ পাউণ্ড, বেবি-ফুড ৫.৮৫ কেজি, সোয়েটার ৯,৭৪৪, কম্বল ১,৮৯৮, ধুতি ৫১খানি, শাড়ী ৫৭১খানি, লুঙ্গি ২৯টি, মশারি ১৮টি, গামছা ৬টি, পুরাতন বস্ত্রাদি ২,১৭৯, লিকুইড সোপ ৩০ কেজি, গায়ে-মাখা সাবান ২০১টি।

বাগেরহাট কেন্দ্র কর্তৃক ২টি নলকূপ বসানো হয় এবং ১,৮৫৯ জন রোগী চিকিৎসিত হন। বিতরিত দ্রব্যসমূহ: বিস্কুট ১০ কেজি, মিল্ক-পাউডার ১,২২৪ পাউণ্ড, জেলি ১২ পাউণ্ড, বেবি-ফুড ২০২ পাউণ্ড, প্রোটিনেক্স্ ১২.৩৭ কেজি, সোয়েটার ১১৫ টি, কম্বল ৮৮৭টি, ধুতি ১৯৫খানি, শাড়ী ১৭৯খানি, পুরাতন বস্ত্রাদি ১,৮০০, শার্ট ৫টি, কোট ২৫টি, পুস্তক ৩৫৮, স্কেল ২৫টি, শ্লেট ৭৩খানি ও পেন্সিল ৫০টি।

দিনাজপুর কেন্দ্র কর্তৃক বাসোপযোগী ২৯টি কুটির নির্মিত হইয়াছে, ৩টি নলকূপ বসানো হইয়াছে এবং ১,৬৬২ জন রোগী চিকিৎসিত হইয়াছেন। বিতরিত জিনিসপত্র: বিস্কুট ১৮ কেজি, সোয়েটার ২,৬১৮, কম্বল ৮০১ খানি, ধুতি ১২৫টি, লুঙ্গি ৩০১টি, মশারি ৪৬৬টি, পুরাতন বস্ত্রাদি ৭৪৬, গায়ে-মাখা সাবান ৪৯৬টি, ভিটামিন ট্যাবলেট ৪,৩১৮ এবং বাসন ১,৭৯০।

ফরিদপুর কেন্দ্র কর্তৃক বিতরিত দ্রব্যাদি: মিল্ক-পাউডার ৫০ কেজি, বিস্কুট ৬০ কেজি ও ১০ টিন, জেলি ২৪ বোতল, সোয়েটার ৬০টি, কম্বল ১০০খানি, ধুতি ৩৫খানি, শাড়ী ৬০৫ খানি, মশারি ৬০০, বাসনপত্র ১,৪৮০ এবং পুরাতন পোশাক ২,১২৮।

কর্ণাটকে খরাত্রাণকার্য: গুলবর্গা জেলায় ঘনগপুর (Ghanagapur) নামক স্থানে সেবাকেন্দ্র খুলিয়া **বাঙ্গালোর** রামকৃষ্ণ আশ্রম কর্তৃক খরাত্রাণকার্য চালানো হইতেছে। গত ১৯.৩.৭৩ হইতে দুই সপ্তাহে ৬টি গ্রামের ২৩১জনকে ৬৯৩ কেজি গমের আটা ও সুজি দেওয়া হইয়াছে। এই দুঃস্থসেবাকার্য শীঘ্রই আরও ১৬টি গ্রামে আরম্ভ করা হইবে।

গুজরাতে অনাবৃষ্টি ও খাদ্যাভাবের জন্য সেবাকার্য: গত ১১ই মার্চ রাজকোট জেলায় ভাদলা নামক স্থানে **রাজকোট** আশ্রম কর্তৃক রান্নাকরা খাদ্য বিতরণের জন্য পাকশালা (Free-kitchen) খোলা হইয়াছে এবং প্রতিদিন ৬০০ ব্যক্তিকে খাওয়ানো হইতেছে।

সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব

পাটনা আশ্রমের সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠিত হইয়াছে গত ৯ই হইতে ১২ই মার্চ, ১৯৭৩। ৯ই মার্চ এই উপলক্ষে আয়োজিত সাধারণ সভায় ভারতের প্রতিরক্ষা-মন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম সভাপতিত্ব করেন। সভায় বহু জনসমাগম হইয়াছিল।

দেওঘর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের সুবর্ণ-জয়ন্তী উৎসব গত ১১ই হইতে ১৪ই মে চারিদিন বিভিন্ন মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালিত হইয়াছে।

১১ই মে সকালে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ বহু সাধু, শিক্ষক, ছাত্র ও ভক্তবৃন্দের উপস্থিতিতে বিদ্যাপীঠের পতাকা উত্তোলন করিয়া ও ৫০টি প্রদীপ জ্বালিয়া উৎসবের উদ্বোধন করেন। বিকালে স্বামী অভয়ানন্দ মহারাজ আশ্রমের ছাত্রগণ কর্তৃক আয়োজিত প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। পরে স্বামী বীরেশ্বরানন্দ মহারাজ আয়োজিত সভায় উদ্বোধনী ভাষণ দেন এবং আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী চন্দ্রানন্দ বিবৃতি পাঠ করিয়া সকলকে স্বাগত জানান। এই দিন এবং অন্যান্য দিনে অনুষ্ঠিত সভায় ভাষণ দেন স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ, স্বামী কাশীশ্বরানন্দ, স্বামী নিরাময়ানন্দ, স্বামী গৌরীশ্বরানন্দ প্রমুখ সন্ন্যাসি-বৃন্দ এবং পশ্চিমবঙ্গের ডেপুটি ডি. পি. আই. শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার। তাঁহারা বলেন, শিক্ষার ক্ষেত্রে স্বামীজীর আদর্শকে রূপ দিবার একটি সার্থক প্রতিষ্ঠান এই বিদ্যাপীঠ, ইহার আদর্শ সারা ভারতে পরিব্যাপ্ত হইবে, ইহার ভাবধারা দেশের সৌভাগ্যকে সুবর্ণময় করিবে। শ্রীমজুমদার তাঁহার ভাষণে দেশব্যাপী শিক্ষার নৈরাজ্যে বিদ্যাপীঠের আদর্শ গ্রহণের জন্য আহ্বান জানান।

উৎসবেব বিভিন্ন দিনের অন্যান্য আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান ছিল পুরুলিয়ার ছৌনৃত্য, বিদ্যাপীঠের ছাত্রগণ কর্তৃক একটি বাংলা ও একটি ইংরেজী নাটক-অভিনয়, দরিদ্রনারায়ণসেবা, আতসবাজি প্রভৃতি। সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে একখানি স্মারক পত্রিকাও প্রকাশিত হইয়াছে।

১৪ই মে বিদ্যাপীঠের বাৎসরিক পুরস্কারবিতরণী সভায় পুরস্কার বিতরণ করেন বিদ্যাপীঠের কৃতী প্রাক্তন ছাত্র শ্রীবিদ্যাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়। বিদ্যা-পীঠে সংযত ও সুশৃঙ্খল জীবনগঠনের আদর্শ চির উজ্জ্বল থাকুক, তিনি তাঁহার ভাষণে এই প্রার্থনা করেন।

১১ই তারিখে স্বামী বীরেশ্বরানন্দ মহারাজ আশ্রমের বিদ্যালয়ভবনের পরিকল্পিত সংযোজিত অংশের ভিত্তিস্থাপন করিয়াছেন।

রামকৃষ্ণ মিশনের আদি আবাসিক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির অন্যতম রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ বৈদ্যনাথধাম দেওঘরের উইলিয়মস্ টাউন পল্লীর উত্তরপ্রান্তে সুরম্য প্রাকৃতিক পরিবেশে প্রতিষ্ঠিত। প্রতিষ্ঠানটি স্বামী বিবেকানন্দের ইচ্ছানুরূপ প্রাচীন গুরুকুলপ্রথার সহিত আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার সমন্বয়ের আদর্শে পরিচালিত। ১৯২২ খৃষ্টাব্দের মে মাসে মিহিজামে বিদ্যাপীঠের সূচনা; দেওঘরে স্থানান্তরিত হয় ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে।

স্বামী ব্রহ্মানন্দের জন্মোৎসব

ভুবনেশ্বরে গত ৫ই ফেব্রুআরি, ১৯৭৩ শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের জন্মতিথি-উদ্-যাপনকে কেন্দ্র করিয়া একটি সাধারণ সভার আয়োজন করা হয়। এই সভায় ওড়িশার রাজ্যপাল শ্রী বি.ডি. জাট্টি (Sri B.D. Jatti) সভাপতিত্ব করেন।

অন্যান্য সংবাদ

দিনাজপুর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ৬ই মার্চ একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ১৩৮তম পুণ্য জন্ম-তিথি উদ্‌যাপিত হয়। ভোরে মঙ্গলারতি ও বৈদিক স্তবপাঠ দ্বারা অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। তৎপর ভজন-কীর্তনান্তে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রী-সারদাদেবী ও শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের বিশেষ পূজা হোমাদি হয়। শ্রীশ্রীগীতা ও শ্রীশ্রীচণ্ডী পাঠ

করেন যথাক্রমে শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ ভট্টাচার্য ও শ্রীব্রহ্মানন্দ ভট্টাচার্য। আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী কালিকাত্মানন্দ 'লীলাপ্রসঙ্গ' অবলম্বনে শ্রীশ্রীঠাকুরের পুণ্য জীবন-কথা আলোচনা করেন। অধ্যাপক আনন্দকুমার পাল, পণ্ডিত গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, শ্রীঅরুণকৃষ্ণ নন্দী প্রমুখ সুধীজন আনন্দানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন। শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্র ঘোষ ও সহ-শিল্পিবৃন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাগীতি পরিবেশন করেন। বিশিষ্ট গায়ক শ্রীচাঁদমোহন রায় তদীয় দলবলসহ মাইক-যোগে পদাবলী-কীর্তন গাহিয়া সকলকে প্রভূত আনন্দ দান করেন। পরমহংসদেবের প্রতি ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদন করিতে বহু দূর-দূরান্ত হইতে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে শত শত ভক্ত নরনারী আশ্রমে সমবেত হইয়াছিলেন। সমাগত ভক্তদের মধ্যে সাধ্যমত প্রসাদ বিতরণ করা হয়। সারাদিনই আশ্রমপ্রাঙ্গণ আনন্দমুখর থাকে।

কালিম্পং শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ৬ই মার্চ সর্বসম্প্রদায়ের অধিবাসীদের সহায়তায় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ জন্মতিথি পালিত হয়। মধ্যাহ্নে ঠাকুরের বিশেষ পূজা ও স্তোত্র-পাঠ হয়। সকল সম্প্রদায়ের নর-নারীই ইহাতে অংশ গ্রহণ করেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের ভোগারতির পর স্বামী জিনানন্দের পরিচালনায় কয়েকখানি ভজনগান হয়। তারপর প্রায় সহস্র নর-নারী ও দরিদ্রনারায়ণকে বসাইয়া খিচুড়ি, তরকারি ও পরমান্ন প্রসাদ বিতরণ করা হয়। সারাদিন ধরিয়া আশ্রম উৎসব-মুখর থাকে। সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুরের আরতির পর কয়েকখানি ভজন-গানের সঙ্গে সঙ্গে ঐদিনের উৎসবের পরিসমাপ্তি হয়।

এই উপলক্ষে গত ১১ই মার্চ রবিবার স্থানীয় টাউন হলে কালিম্পং-এর অবসরপ্রাপ্ত মহাকুমাশাসক এবং সিকিমের ভূতপূর্ব চীফ্ ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীমতিচাঁদ প্রধান মহাশয়ের পৌরোহিত্যে একটি ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। ইহাতে বিভিন্ন বক্তা নেপালী ও বাংলাভাষায় শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজী সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। স্থানীয় উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক শ্রীকমলকুমার-শর্মা ও স্বামী জিনানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমায়ের বিষয় আলোচনা করেন। স্থানীয় ডিগ্রী কলেজের অধ্যাপিকা শ্রীমতী বাসন্তী গুহ তাঁর বক্তৃতায় শ্রীশ্রীমায়ের জীবনের একটি নিখুঁত ছবি শ্রোতাদের সম্মুখে তুলিয়া ধরেন। সভাপতি তাঁহার ভাষণে 'কায়মনোবাক্যে পবিত্রতা রক্ষা করাই' ঈশ্বর-লাভের পথ বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন। স্থানীয় চিত্রভানু সাংস্কৃতিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ সভায় ভজনগান গাহিয়া উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দের আনন্দবর্ধন করেন। এই সভায় কালিম্পং-এর সকল সম্প্রদায়ের নরনারীই সানন্দে অংশ গ্রহণ করেন।

বলরাম-মন্দির : স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ১লা মে কলিকাতায় বাগবাজার অঞ্চলে অবস্থিত বলরাম বসুর বাসভবনে (বলরাম-মন্দির বলিয়া যাহা সুপরিচিত) শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ ভক্তদের এক সভা করিয়া রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেন—আধ্যাত্মিক ও জাগতিক বিষয়ে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে মানুষের সেবাই যে মিশনের উদ্দেশ্য।

নবযুগের মহামন্ত্রের, সর্ববিধ ভেদজ্ঞান পরিহার করিয়া 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'-র ব্যাপক বাস্তব রূপায়ণের সূচনার এই ঐতিহাসিক দিনটির স্মরণে গত ১লা মে বলরাম-মন্দিরে আহূত এক সভায় 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ'-এ লিপিবদ্ধ এই ঘটনার বিবরণ পাঠ করেন স্বামী নিরাময়ানন্দ। বলরাম-মন্দিরের দোতলার যে হল-ঘরটি শতাধিকবার শ্রীরামকৃষ্ণের পদধূলিপূত, সেই হলঘরেই স্বামীজী রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার জন্য সভা ডাকিয়াছিলেন; সেখানেই এই স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

কার্যবিবরণী

পুরী রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের (পুরী ৭৫২-০০১) এপ্রিল ১৯৭১ হইতে মার্চ ১৯৭২ খৃষ্টাব্দের কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। এই কেন্দ্রের ২৮ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। বর্তমানে এখানে অনুসৃত কার্যধারার মধ্যে গ্রন্থাগার ও ছাত্রাবাস-পরিচালনার স্থান সর্বাগ্রে। ১৯৭১-৭২ খৃষ্টাব্দে গ্রন্থাগারের পুস্তকসংখ্যা ৩৬,০০০; ৯,৫৮৯খানি পুস্তক পাঠকগণ পড়িবার জন্য গ্রহণ করেন। ছাত্রাবাস-লাইব্রেরীতে ৭০৭খানি বই আছে। নিঃশুল্ক সাধারণ পাঠাগারে ৮টি দৈনিক ও ৪৮খানি সাময়িক পত্রপত্রিকা রাখা হয়।

ছাত্রাবাসটি শুরু করা হয় ১৯৫৩তে; বর্তমানে ৬১ জন ছাত্র রাখিবার ব্যবস্থা আছে। অনুন্নত সম্প্রদায়ের ছাত্রগণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে ৬১ জন ছাত্রের মধ্যে অনুন্নত শ্রেণীর ৪৪ জন। এই ছাত্রদের থাওয়া-থাকা, পাঠ্যপুস্তক ও ব্যবহার্য জিনিসপত্রের জন্য টাকা দিতে হয় না। প্রতি বৎসর ২১ জন ছাত্র খরচ দিয়াও অবস্থান করে। ছাত্রদের নৈতিক ও শারীরিক উভয় দিকের উন্নতিবিধানের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী, স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীকৃষ্ণ, আচার্য শঙ্কর, বুদ্ধদেব প্রভৃতির জন্মতিথি সুন্দরভাবে উদ্‌যাপিত হয়। আশ্রমে ও বিভিন্ন স্থানে শাস্ত্রপাঠাদির মাধ্যমে সাধারণের মধ্যে ধর্মপ্রচার হইতেছে।

কালাডি (এর্নাকুলম) শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রম শিবাবতার শ্রীশঙ্করাচার্যের জন্মভূমিতে ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই আশ্রমের ১৯৬৯-১৯৭২ খৃষ্টাব্দের কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। দৈনন্দিন পূজা-উপাসনাদি ব্যতীত আশ্রমে ও আশ্রমের বাহিরে নিয়মিত ধর্মালোচনা অনুষ্ঠিত হয়। আশ্রম কর্তৃক জুনিয়র বেসিক, প্রাইমারী ও হাই-স্কুল পরিচালিত হইতেছে, ১৯৭১-৭২ খৃষ্টাব্দে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা যথাক্রমে ২৯৬ (ছাত্র ১৪৯), ৪৮৬ (ছাত্র ২৯৮) এবং ৫৪৬ (ছাত্র ৩০৮)। ছাত্রাবাসে ১৯৭১-৭২তে ১২৬ জন ছাত্র ছিল, তন্মধ্যে আদিবাসী ছাত্র ৬০ জন, অনুন্নত সম্প্রদায়ের সকলেরই জন্য বিনা-ব্যয়ে থাকা-থাওয়া ও পড়াশুনার ব্যবস্থা আছে। শ্রীসারদা আয়ুর্বেদিক বৈদ্যমন্দিরে বর্ষত্রয়ে চিকিৎসিত রোগীর সংখ্যা যথাক্রমে ৩,১২৪, ৩,৩১৫ এবং ৩,৩১৮। স্বামী বিবেকানন্দ লাইব্রেরীর পুস্তকসংখ্যা ২,০০০-এর উপর; এতদ্ব্যতীত সোশ্যাল এজুকেশন স্কীমের গ্রন্থাগারে ৬,৬৫৭খানি বই রহিয়াছে। সমাজশিক্ষা-বিভাগের ভবনটিতে ৮০০ শ্রোতার স্থান সঙ্কুলান হয়। একটি ইণ্ডাস্ট্রীয়াল স্কুল ১৯৭১ খৃষ্টাব্দ হইতে ছোটভাবে আরম্ভ করা হইয়াছে, এখানে বয়নশিল্প শিক্ষা দেওয়া হয়। প্রকাশনবিভাগ কর্তৃক কয়েকটি বেদান্তের ও অন্যান্য বিষয়ের পুস্তক প্রকাশ করা হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী ও আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি পূজা ও আলোচনাদির মাধ্যমে সুন্দরভাবে উদ্‌যাপিত হয়।

বিবিধ সংবাদ

'বরাহনগর মঠ' সংরক্ষণ সমিতি

কাশীপুরে থাকাকালীন শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহার লোককল্যাণসাধন-কর্মের প্রধান সহায়ক যুবক-ভক্তদের সংঘবদ্ধ করিয়া স্বামী বিবেকানন্দকে (তখন নরেন্দ্রনাথ) তাঁহাদের নেতা করিয়া দিয়া যান। ১৮৮৬খৃষ্টাব্দের ১৬ই আগষ্ট তাঁহার তিরোভাবের পর বরাহনগর বাজারের অদূরে প্রামাণিক ঘাটের সন্নিকটে টাকীর মুন্সীবাবুদের পরিত্যক্ত একটি ভাঙা বাড়ী মাসিক এগারো টাকা ভাড়ায় পাইয়া স্বামীজী সেখানে একে একে যুবকভক্তদের একত্র করেন এবং ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভেই সেখানে সকলে আনুষ্ঠানিকভাবে বাহ্যসন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া কঠোর সাধনায় ব্রতী হন। একটি কৌটায় রক্ষিত শ্রীরামকৃষ্ণের দেহাবশেষ এখানে নিত্যপূজিতও হইতে থাকে। এভাবে এই বরাহনগর মঠেই বেলুড় মঠের অঙ্কুরোদ্গম হয়, যাহার বীজ বপন করিয়া গিয়াছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব নিজেই কাশীপুর উদ্যানবাটীতে।

সেই অতীত কাহিনীর নীরব সাক্ষিরূপে প্রবেশদ্বারের ভগ্নপ্রায় দুটি থাম এখনো দাঁড়াইয়া আছে। সম্প্রতি স্থানীয় জনগণের পক্ষ হইতে বরাহনগরের এই ঐতিহাসিক-গুরুত্বপূর্ণ বহু-পুণ্যস্মৃতিবিজড়িত স্থানটি সংরক্ষণের কাজ শুরু হইয়াছে—বরাহনগরের শ্রীজিতেন্দ্রনাথ রাহার বাটীতে "বরাহনগর মঠ সংরক্ষণ সমিতি" গঠিত হইয়াছে। (সম্পাদক: শ্রীফণীন্দ্রনাথ চৌধুরী, বরাহনগর রামকৃষ্ণ মিশন উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৩৭ গোপাললাল ঠাকুর রোড, কলিকাতা ৭০০-০৩৬)। জমির কিয়দংশ ক্রয় করিয়া সেটিকে প্রাচীরবেষ্টিত করার কাজও আরম্ভ হইয়াছে। এখানে একটি স্মৃতিফলক-স্থাপন এবং একটি হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয়-প্রতিষ্ঠাও আশু লক্ষ্য। পরে অর্থানুকূল্য হইলে অন্যান্য পরিকল্পনাও রহিয়াছে। সমিতি আশা রাখেন, সহৃদয় জনগণের অকুণ্ঠ সাহায্যে অচিরেই এই পরিকল্পনা রূপ পরিগ্রহ করিবে।

উৎসব-সংবাদ

সিঁথি (কলিকাতা ৫০) রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ কর্তৃক শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের পাঁচদিনব্যাপী জন্মোৎসব গত ২৮শে মার্চ হইতে ১লা এপ্রিল পর্যন্ত সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। এই উৎসব উপলক্ষে প্রতিদিন প্রায় ৫,০০০ শ্রোতা উপস্থিত হইয়া স্বামী নিরাময়ানন্দ, স্বামী জীবানন্দ স্বামী রমানন্দ প্রভৃতি শ্রীরামকৃষ্ণ-মঠের সন্ন্যাসীদের নিকট হইতে ধর্মপ্রসঙ্গ ও অন্যান্য অনুষ্ঠান যথা নিশি-কান্ত সরকারের কবিগান, শিবপুর শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরের 'রামপ্রসাদ' যাত্রাভিনয়, ক্ষান্তিলতা দেবীর ভাগবতপাঠ, কানাই ব্যানার্জির কীর্তন ও রসরঙ্গ কর্তৃক 'শ্রীমা সারদামণি লীলাগীতি' শ্রবণ করিয়া পরম তৃপ্তিলাভ করেন। এই উপলক্ষে প্রতি বৎসরের মতো এবারও একটি মনোজ্ঞ স্মরণিকা (Souvenir) প্রকাশিত হইয়াছে। উৎসবটি খুবই মনোরম ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। প্রায় পাঁচ হাজার নরনারীকে বসাইয়া প্রসাদ দেওয়া হয়।

খাতড়া শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ২০শে ও ২১শে মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে ২০শে মার্চ আশ্রমে আয়োজিত সভায় স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ ভাষণ দেন এবং স্থানীয় বালিকাগণ উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত ও আবৃত্তি করেন। ২১শে মার্চ কংসাবতী প্রকল্প কলোনীতে প্রকল্পের সুপারিনটেনডিং ইঞ্জিনিয়ার শ্রীমদনমোহন মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে আয়োজিত সভায়

স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ ও শ্রীমুখোপাধ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী আলোচনা করেন। শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ পূজা, প্রসাদবিতরণ প্রভৃতি উৎসবের অঙ্গ ছিল।

নাচক (হাওড়া জেলা) বিবেকানন্দ গ্রন্থাগার-এ গত ১৭ই মার্চ ভজন, পাঠ, আলোচনা প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব পালিত হইয়াছে।

দিল্লী: সরোজিনীনগর ও দক্ষিণ দিল্লী সংলগ্ন অঞ্চলে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এতদুপলক্ষে ৪ঠা মার্চ রবিবার সকাল ৯টা হইতে বেলা ২টা পর্যন্ত ইংরেজী, হিন্দী, বাংলা ও তামিল ভাষায় আবৃত্তি-প্রতিযোগিতা হয়। ১৮টি স্কুল হইতে ৪৪৮ জন ছাত্রছাত্রী প্রতিযোগিতায় যোগদান করে। ৭২টি পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

১০ই মার্চ শনিবার সন্ধ্যায় ভারতসেবক সমাজ প্রাঙ্গণে স্বামী বন্দনানন্দের সভাপতিত্বে এক সভা হয়।

এই সভায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রণালয়ের ইনডাসট্রিয়াল ডেভেলপমেন্টের উপমন্ত্রী শ্রীপ্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়, দৌলতরাম মহিলা কলেজের অধ্যক্ষা ডঃ সিতকৃষ্ণ নাম্বিয়ার, স্বামী তদ্রূপানন্দ এবং সভাপতি মহারাজ শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামীজী ও শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও বাণী আলোচনা করেন। সভায় প্রায় আটশত ভক্তসমাগম হইয়াছিল

ধুম: গত ৭ই এবং ৮ই চৈত্র দুইদিনব্যাপী ধুম সারদাদেবী সঙ্ঘের এবং ধুম বিবেকানন্দ সমিতির (মিরেশ্বরী, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ) ৪৯তম বাৎসরিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ভোর হইতে মঙ্গলারতি, ভজন, শ্রীশ্রীঠাকুর, মা ও স্বামীজীর প্রতিকৃতি এবং কীর্তনবাদ্যভাণ্ডসহ নগরপরিক্রমা, পূজা, পাঠ, ভোগ, আরতি, হোম, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি পাঠ, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত পাঠ, শ্রীশ্রীমায়ের কথা পাঠ, ধর্মসভা ইত্যাদি উৎসবের অনুষ্ঠানসূচী ছিল। স্বামী মুকুন্দানন্দ গিরি মহারাজ (অধ্যক্ষ, সীতাকুণ্ড ভোলানন্দ সেবাশ্রম) এবং পণ্ডিত শ্রীরাসমোহন চক্রবর্তী (অধ্যক্ষ, কুমিল্লা রামমালা ছাত্রাবাস) যথাক্রমে ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন। সন্ধ্যারতির পর শ্রীরাসমোহন চক্রবর্তী ভাগবত পাঠ করেন। প্রায় দুই হাজারের বেশী লোককে বসাইয়া খিচুড়ি প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

কসবা: গত ২৫শে মার্চ দক্ষিণ কলিকাতা শ্রীশ্রীসারদা-রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের উদ্যোগে কসবা চিত্তরঞ্জন বিদ্যালয়ে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৩৮তম শুভ জন্মোৎসব পালিত হয়; প্রভাতে মঙ্গলারতিতে শুরু হইয়া ভজন, পূজা, পাঠ, লীলাকীর্তন ও ধর্মসভায় সারাদিন অতিবাহিত হইয়া সন্ধ্যারতিতে উৎসবটি সমাপ্ত হয়। আনুমানিক ছয়শত ভক্ত ও দুইশত দরিদ্রনারায়ণ বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। অপরাহ্নে ধর্মসভায় সভাপতি স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ তাঁহার ভাষণে সকলকে অনুপ্রাণিত করেন। সভায় অধ্যাপক তারকনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীহরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় বক্তৃতা করেন।

দুর্গাপুরে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ জন্মোৎসব গত ২৫-৩-৭৩ হইতে ২৭-৩-৭৩ পর্যন্ত তিনদিনব্যাপী এক কর্মসূচীর রূপদান করিয়া দুর্গাপুর শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রমের সভ্যবৃন্দ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী বিশেষ মর্যাদাসহকারে পালন করেন।

২৫শে মার্চ সকাল ৫-৩০টায় মঙ্গলারতির পর ঠাকুরের প্রতিকৃতিসহ নামকীর্তন করিতে করিতে নগরপরিক্রমা করা হয়। নগরপরিক্রমার পর শ্রীঅর্ধেন্দুকুমার দাস ভক্তিমূলক গান ও কীর্তন গাহিয়া সমবেত নরনারীদের পরিতৃপ্ত করেন। তৎপর পূজা হোমাদি অনুষ্ঠিত হয়। ১২টায় পূজার ফলপ্রসাদ বিতরিত হয়। প্রায় ১,০০০ ব্যক্তিকে বসাইয়া অন্নপ্রসাদ পরিবেশন করা

হয়। ইহার পর ১০০টি দরিদ্র ছেলেমেয়েকে জামা ও কাপড় বিতরণ করা হয়। এই দিনের সভায় বক্তাদের মধ্যে ছিলেন স্বামী মিত্রানন্দ, পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা বিভাগের সহাধ্যক্ষ শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার এবং স্বামী নিরাময়ানন্দ।

২৬শে মার্চ সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা সঙ্ঘের সভ্যারা ঠাকুরের পবিত্র জীবনের ঘটনাগুলি কথা ও গানের মাধ্যমে নিবেদন করিয়া সমবেত শ্রোতাদের পরিতৃপ্ত করেন। শ্রীঅর্ধেন্দু দাস এই গীতি-আলেখ্যটি পরিচালনা করেন। ইহার পর ডঃ বাসন্তী চৌধুরীর শ্রীমদ্‌ভাগবতপাঠ ও কীর্তন বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছিল।

রামকৃষ্ণনগর (পোঃ কোনাবন, পশ্চিম ত্রিপুরা): গত ৬ই মার্চ ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শুভ ১৩৮তম জন্মতিথিতে স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে বিশেষ পূজানুষ্ঠানাদির মাধ্যমে উক্ত মঠের রজতজয়ন্তী উৎসবের উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধন করেন ত্রিপুরার জয়েণ্ট সেক্রেটারী শ্রীকুলেশপ্রসাদ চক্রবর্তী। অপরাহ্নে মঠপ্রাঙ্গণে আয়োজিত সভায় বিশিষ্ট বক্তাগণ সুচিন্তিত ভাষণ দেন। মঠের বিবেকানন্দ বালনিকেতনের আবাসিক ছাত্রগণ ও স্থানীয় কোনাবন উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীগণ স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমার সম্পর্কে প্রবন্ধ পাঠ ও কবিতা আবৃত্তি করে। ১১ই মার্চ এক সাধারণ উৎসবে সারাদিনব্যাপী নামকীর্তনাদি হয়। সন্ধ্যারতির পর এক আলোচনাসভায় বিভিন্ন বক্তা ভাষণ দেন। উক্ত সাধারণ উৎসবে সহস্রাধিক ব্যক্তিকে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়।

ভাগলপুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র-এর উদ্যোগে গত ৬ই মার্চ শুক্লাদ্বিতীয়া দিবসে শ্রীক্ষীরোদেন্দু চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের আবাসগৃহে ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ১৩৮তম শুভ জন্মতিথি-উৎসব সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। পূজাদির পর আয়োজিত সভায় গীতা কথামৃত ও পুঁথি পাঠ হয়; বিভিন্ন ব্যক্তি ভাষণ ও সঙ্গীতের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণচরণে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। ১১ই মার্চ রবিবার সহস্রাধিক দরিদ্রনারায়ণের সেবা হয়।

কল্যাণী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সঙ্ঘের উদ্যোগে গত ২৩শে, ২৪শে ও ২৫শে মার্চ ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ১৩৮তম শুভ আবির্ভাব-উৎসব আনন্দময় পরিবেশে উদ্‌যাপিত হইয়াছে।

২৩শে মার্চ মঙ্গলারতি ও পরে শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা হয়। বৈকালে সঙ্ঘপরিচালিত 'সবুজের আসর' কর্তৃক বালকবালিকাদের ক্রীড়ানুষ্ঠানের পর পুরস্কার বিতরণ করা হয় এবং সন্ধ্যারতির পরে বেতারশিল্পী শ্রীলক্ষ্মীকান্ত রায়ের পরিচালনায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কীর্তন পরিষদ কর্তৃক 'গদাধরের মাতৃপূজা' গীত হয়।

২৪শে মার্চ মঙ্গলারতি, ভজন ও পূজা হয় এবং কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি বিভাগের অধিকর্তা ডঃ সুধাংশুভূষণ চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জনসভায় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। সন্ধ্যায় বেলুড় মঠের আনুকূল্যে 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' ছায়াচিত্র প্রদর্শিত হয়।

২৫শে মার্চ মঙ্গলারতির পর শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী ও স্বামীজীর প্রতিকৃতি সহ শোভাযাত্রা ও কীর্তন সহকারে সহরপরিক্রমান্তে বিশেষ পূজা ও হোম অনুষ্ঠিত হয়। স্বামী ক্ষমানন্দ 'কথামৃত' পাঠ করেন এবং পরে সভায় তিনি ও স্বামী প্রত্যয়ানন্দ ভাষণ দেন। সন্ধ্যারতির পর বেতারশিল্পী শ্রীদ্বিজরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় রামায়ণগান করেন।

উদ্বোধন, ১ম বর্ষ (৬ষ্ঠ সংখ্যা)

[পুনর্মুদ্রণ]

(পূর্বানুবৃত্তি : পরমহংসদেবের উপদেশ—স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্রদত্ত)

(৩) বাসনা-হীন মন কেমন জান? যেন শুকনো দেশলাই। উহা একবার ঘস্‌লে ফস করে জ্বলে উঠে। আর ভিজে হলে ঘস্‌তে ঘস্‌তে কাটি ভেঙ্গে গেলেও জ্বলে না। সেইমত সরল, সত্যনিষ্ঠ, নির্ম্মলস্বভাব লোককে একবার উপদেশ দিলেই ঈশ্বরানুরাগ উদয় হয়। বিষয়াসক্ত ব্যক্তিকে শত শত বার উপদেশ করিলেও কিছু হয় না।

(৪) মায়ার স্বভাব কেমন জান? যেমন জলের পানা। ঠেইয়ে দিলে সব পানা সরে গেল। আবার একটু পরেই আপনা আপনি পুরে এল। তেমনি যতক্ষণ বিচার কর, সাধুসঙ্গ কর, যেন কিছুই নাই। একটু পরেই বিষয়বাসনা আবরণ করে।

(৫) ঠাকুর বলিতেন,—

গ্রন্থ নয় গ্রন্থি—গাঁট। বিবেক, বৈরাগ্যের সহিত বই না পড়িলে, পুস্তকপাঠে দাম্ভিকতা, অহঙ্কারের গাঁট বাড়িয়া যায় মাত্র।

হৃদয়

(কবিবর গিরিশচন্দ্র ঘোষ লিখিত)

কেহ কি বিশ্বাস কভু করেছ হৃদয়ে,
সত্য কহে হৃদয় তোমায়?
হৃদে অবিশ্বাস জেনো বাসনায় ভয়ে,
হৃদয় তোমার সত্যময়।
সতত বিলাস চাহে বাসনা অসার,
প্রতিবাদী হৃদয় কেবল।
ভাব সত্য—যাহা তব বিলাস আধার,
দম হৃদি করি যুক্তি বল।
শয়তান, অবিদ্যা, ভ্রম, অদৃষ্ট (যে নাম)
দুঃখমূল করিয়াছ স্থির,
জানিহ কেবল তব বিলাসের কাম
মন সদা করেছে অধীর।
বশ নয় বাসনা উপায় কিবা তার?
কেননা করিব সুখ আশ?
কি হেতু এ দেহ মম বাসনা আগার?
মম স্রষ্টা দেখে কি নিরাশ?

বাসনার তৃপ্তি—সুখ—বুদ্ধির ধারণা।
কখন কি পুরেনি বাসনা?
তৃপ্ত বাসনার হেতু অতৃপ্ত বাসনা।
মন কি বুঝনা প্রতারণা?
কল্পনায় তৃপ্তি দান কর বাসনার,
রক্তবীজ উঠে কোটি কোটি,
তৃপ্ত কর বাসনা তথাপি বার বার
বাসনার হেরিবে ভ্রূকুটি।
বাসনার মত ধন হলে উপার্জন
মিটে কভু ধনের কামনা।
যত ধন উপার্জ্জন তত উত্তেজন,
শতগুণে ধন উপাসনা।
নরনারী পৃথিবীর সবে বশীভূত
কল্পনায় হের মুগ্ধচিত,
কাম-তৃপ্তি মান-তৃপ্তি বাসনা সম্ভূত
পিয়াসায় কি হেতু পীড়িত?

বারেক সুধাও মন, হৃদয় তোমার—
জান কিহে হৃদয় কি তব ?
স্বার্থহীন বৃত্তি (নহে কিঙ্কর আশার)
যে বৃত্তি আশ্রিত এই ভব।
যে বৃত্তি মিলিত ক্ষুদ্র কীটাণুর সনে
স্রষ্টার প্রধান বিশেষণ

যে বৃত্তি আশ্রয়ে এই পাশব জীবনে
দেবাধিক তোমার গণন।
সেই বৃত্তিময় সদা হও কায়মনে
স্বার্থহীন বাসনা বর্জ্জনে,
নির্ভীক নিরহঙ্কার মিলি বিশ্ব সনে
মৃত্যুঞ্জয় ভঙ্গুর জীবনে।

প্রেরিত পত্র।

আমরা স্বামী বিরজানন্দের নিকট হইতে নিম্নলিখিত পত্রখানি পাইলাম—

ঢাকা, ২০ এ মার্চ্চ,৯৯।

মহাশয়,

"প্রবেশিকা পরীক্ষা প্রদানে ছাত্রগণ ব্যস্ত থাকায় আমরা কিছুদিন কার্য্য বন্ধ করিয়া ৬ই মার্চ্চ শিবরাত্রি উপলক্ষে চন্দ্রনাথ দর্শনে যাত্রা করি। এ দিককার মধ্যে চন্দ্রনাথ ও কামাখ্যাই প্রধান তীর্থ। শিবরাত্রি উপলক্ষে প্রতি বৎসর চন্দ্রনাথে বহুযাত্রীর সমাগম হয়, এ বৎসর অন্য বৎসর অপেক্ষা লোকসংখ্যা অধিক হইয়াছিল—প্রায় ৪০।৫০ হাজার। চন্দ্রনাথ, বিরূপাক্ষ ও শম্ভুনাথ তিনটী বিভিন্ন পর্ব্বতের চূড়ায় অবস্থিত। এখানে বড়বাকুণ্ড, লবণাক্ষ ও সূর্য্যকুণ্ডে স্নান করিতে হয়। এই সকল কুণ্ড পর্ব্বতের মধ্যে অবস্থিত, ইহাদের জল উষ্ণ ও লবণাক্ত। কুণ্ডগুলি খুব গভীর। ইহাদের পার্শ্বে পর্ব্বতের মধ্য হইতে নীলাভাযুক্ত অগ্নিশিখা লক্ লক্ করিয়া জ্বলিতেছে। গুরুর ধুনি ও নেত্রানল দেখিলাম—প্রস্তর হইতে স্বভাবতই অগ্নি জ্বলিতেছে। অনেকে ইহাতে সঘৃত বিল্বপত্র দ্বারা হোম করিতেছেন। এখানে চারিদিন ছিলাম। প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় অনেক ভদ্রলোকের সহিত ধর্ম্মালাপ হইত।

ঢাকায় রামকৃষ্ণ মিশন সভার শাখা স্থাপন হইবার কথা কিছুদিন হইতে হইতেছিল। এক্ষণে ইহা কার্যে পরিণত হইয়াছে। রামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথির দিবস বাবু নৃত্যগোপাল গোস্বামী মহাশয়ের গৃহে ইহার প্রথম অধিবেশন হয়। সভাস্থলে সকলেই এরূপ একটি সভার আবশ্যকতা স্বীকার করেন। নৃত্যগোপাল বাবু "অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বেঁধে যা ইচ্ছা তাই কর" সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। পরে রামকৃষ্ণদেবের জীবন সম্বন্ধে কিছুক্ষণ আলোচনার পর সভা ভঙ্গ হয়। স্বর্গীয় মোহিনীমোহন দাস মহাশয়ের বৈঠকখানা বাটীতে এই সভার কার্য্য নির্ব্বাহ হইবে, স্থিরীকৃত হয়। গত কল্য ইহার দ্বিতীয় অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। স্বামী প্রকাশানন্দ একটী স্তোত্র পাঠ করিয়া এই সভার উদ্দেশ্য ও কার্য্যপ্রণালী পাঠ করেন, তৎপরে কেন উপনিষদ্ হইতে কিয়দংশ পাঠ ও তাহার বাঙ্গালা ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। আমি "ধর্ম্ম" সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ পাঠ করি। ইতি

বিরজানন্দ।

সংবাদ ও মন্তব্য

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ফরের সম্প্রতি পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে। ইঁহার জীবনকাহিনী অত্যাশ্চর্য্য ও শিক্ষাপ্রদ। প্রথমে ইনি একজন সামান্য বিনামা বিক্রেতার দোকানে শিক্ষানবীশ ছিলেন। পরে দোকানদার, ক্রমে এক ধনাঢ্য বণিক-রূপে পরিণত হন। ইহার পর তিনি একখানি জাহাজের মালিক হন। শেষে প্রেসিডেন্ট পর্য্যন্ত হইয়াছিলেন।

আমাদের সহরের একটী প্রধান অভাব—বিশুদ্ধ খাবারের দোকান। অনেকে বিশুদ্ধ খাবারের অভাবে কদর্য্য জিনিষ খাইয়া পীড়াগ্রস্ত হইয়া পড়েন। সম্প্রতি বাবু প্রিয়নাথ সিংহ নামক জনৈক ভদ্রসন্তান সিমলার বাজারে একটী বিশুদ্ধ ঘৃতে প্রস্তুত খাবারের দোকান খুলিয়া সাধারণের এই অভাব কিয়ৎ পরিমাণে মোচন করিয়াছেন। অন্যান্য ভদ্রসন্তান ইঁহার অনুকরণ করিলে সহরের স্বাস্থ্যবিষয়ক উন্নতির যথেষ্ট সাহায্য করা হয়। সিংহ মহাশয়কে সাধারণের উৎসাহ দান করা উচিত।

গত ৩০ শে ফাল্গুন বেলুড়ের গঙ্গাতীরস্থ মঠে রামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি উপলক্ষে অহোরাত্র-ব্যাপী পূজাহোমাদি হইয়াছিল। এই তিথি উপলক্ষে হিন্দুধর্ম্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের যাবতীয় দেবদেবী, অবতারাদি ও অন্যান্য ধর্ম্মাচার্য্যগণেরও পূজা হইয়া থাকে। পরমহংসদেবের শিক্ষা— সকল ধর্ম্মই সত্য। তদীয় ভক্তগণ তাঁহার জন্মতিথি উপলক্ষে এইরূপ বিরাট পূজা দ্বারা তাঁহার মহান্ সার্ব্বজনীন ভাব কিঞ্চিৎ পরিমাণে উপলব্ধির চেষ্টা করিয়া থাকেন।

স্বামী অভয়ানন্দ গত ৪ঠা চৈত্র কলিকাতায় পৌঁছিয়াছেন।

গত ৫ই চৈত্র অপরাহ্নে রামকৃষ্ণমিশনের সভাগৃহে উক্ত মিশনের সভ্যগণ ও ইণ্ডিয়ান মিররের সম্পাদক বাবু নরেন্দ্রনাথ সেন প্রভৃতি মহোদয়গণ স্বামী অভয়ানন্দের সহিত সদালাপার্থ সমবেত হন। বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বিনী ভিক্ষুণী কানাভারো এবং একটি সিংহলদেশীয়া বৌদ্ধমহিলাও উপস্থিত ছিলেন। অভয়ানন্দ স্বামীর সতেজ অথচ মধুর ভাব এবং সারগর্ভ অথচ উদার কথাবার্ত্তায় সকলেই প্রীতিলাভ করেন।

কথাবার্ত্তার মধ্যে বলেন, আমি বৈদান্তিক, হিন্দু নহি। বেদান্ত বলিলে একটি সার্ব্বভৌমিক ভাব বুঝায়। বৈদান্তিক হিন্দু হইতে পারে, জার্ম্মান হইতে পারে, ফ্রেঞ্চ হইতেও পারে। খ্রীষ্টকে কি আপনি বৈদান্তিক বলিয়া মনে করেন, এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, খ্রীষ্ট যে শুধু বৈদান্তিক, তাহা নহেন, তিনি একজন অদ্বৈতবাদী ছিলেন।

কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় একটি চমৎকার ঘটনা হয়। যখন সন্ধ্যা সমাগমে চতুর্দ্দিক হইতে শঙ্খ বাজিয়া উঠিল, তখন ইনি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এ কি বাজিতেছে? তাঁহাকে একটি শঙ্খ আনিয়া দেখান হইল ও বাজাইয়া শুনান হইল। বুঝাইয়া দেওয়া হইল, সান্ধ্য পূজা ধ্যানাদির ইহা সূচনাস্বরূপ। তখন ইনি সেই সভাস্থলে কিয়ৎক্ষণ ধ্যান করিয়া পরে পুনরায় কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিলেন।

গত ৬ই চৈত্র বেলুড় মঠে রামকৃষ্ণজন্মোৎসব কার্য অতি সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া

গিয়াছে। অসংখ্য লোকের সমাগম হইয়াছিল—ভদ্রলোকই অধিকাংশ। বিভিন্ন সম্প্রদায় একত্র সমবেত হইয়াছিলেন। কালীকীর্ত্তন, হরিসঙ্কীর্ত্তনাদি হয়। উৎসবস্থলে স্বামী বিবেকানন্দ উপস্থিত ছিলেন।

অভয়ানন্দ স্বামী ও বসুমতী-সম্পাদক বাবু পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় সময়োপযোগী বক্তৃতা প্রদান করেন।

তারযোগে সংবাদ পাইলাম ;—

মাদ্রাজ মঠে রামকৃষ্ণজন্মোৎসব উপলক্ষে ২০০০ কাঙ্গালী ভোজন হইয়া গিয়াছে।

মুর্শিদাবাদের অনাথাশ্রমেও রামকৃষ্ণজন্মোৎসব হইয়াছিল। অনেক জমিদার ও ভদ্র-সন্তানের সমাগম হয়। ভগবন্নামানুকীর্ত্তনাদিতে উৎসব সকলেরেই প্রীতিদায়ক হইয়াছিল।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা

মুষ্টিযোগ ও চিকিৎসা প্রবেশ।—দ্বিতীয়খণ্ড কলিকাতা পাথুরিয়াঘাটা নং ১২২ দর্মাহাটা ষ্ট্রীট নিবাসী কবিরাজ শ্রীযুক্ত বাবু যশোদানন্দন সরকার কর্তৃক বাঙ্গালা ভাষায় প্রণীত। পাঁচ অধ্যায়ে ডিঃ ১২ পেজী ২৭০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য ১৷০ মাত্র। পুস্তকখানি সর্ব্বাংশেই সুন্দর। ইহা সম্পূর্ণ নূতন ধরনের বহি হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় বলিয়া বোধ হয় না। ডাক্তারী চিকিৎসা এবং কবিরাজী চিকিৎসায় যে কতদূর পর্যন্ত সুমিল আছে, তাহা এই পুস্তকপাঠে বিশেষ অবগত হওয়া যায়। ইহার ভাষা অতীব সরল। গৃহস্থমাত্রেই, এমন কি, অনেক অনেক ডাক্তার কবিরাজ পর্য্যন্তও—এই 'মুষ্টিযোগ' পাঠে বিশেষ উপকার পাইবেন বলিয়া বোধ হইতেছে। কৃতজ্ঞতার সহিত আমরা ইহার প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি। আশা করি সকলেই এই পুস্তকের সমাদর করিয়া কবিরাজ মহাশয়কে সফলশ্রম করিবেন।

আর্য্যধর্ম্মতত্ত্ব।-ময়মনসিংহ, হর্ডিঞ্জ স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্তবাবু ঈশান চন্দ্র রায়চৌধুরী প্রণীত—মূল্য ২ টাকা। উপক্রমণিকা ও পরিশিষ্ট সমেত ১৯ অধ্যায়ে ১৬ পেজী ডবল ক্রাউন ২৯১ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ছাপাই প্রভৃতি সুন্দর। এমন ধর্ম্মতত্ত্বই নাই যাহার চর্চ্চা গ্রন্থকর্ত্তা ইহাতে সংক্ষেপে কথঞ্চিৎ পরিমাণে না করিয়াছেন। গ্রন্থখানি ধর্ম্ম-পথের প্রবেশকদিগের পক্ষে বিশেষ উপযোগী হইয়াছে। ধর্ম্মজীবনের প্রথম সোপানে যে সকল প্রশ্নের উদয় হয়, সে সমস্ত প্রশ্নেরই মীমাংসা ইহাতে করিতে প্রণেতা যথাসাধ্য চেষ্টা পাইয়াছেন। সমালোচনার্থ আমাদিগকে ইহা একখানি প্রদান করার জন্য গ্রন্থকর্ত্তাকে আমরা ধন্যবাদ দিতেছি।

প্রবাসের অস্ফুট স্মৃতি।—জনৈক "আসাম প্রবাসী" প্রণীত এবং সাহিত্য-সভা হইতে প্রকাশিত। মূল্য ৷৷০। ডিমাই ১২ পেজী ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। গুটিকতক স্থলে প্রাকৃতিক এবং সামাজিক দৃশ্যের চিত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে। ভ্রমণবৃত্তান্ত সাহিত্যের পুষ্টিসাধন বিশেষরূপে করিয়া থাকে। ভ্রমণবৃত্তান্তখানি প্রকাশ করার জন্য আমরা শিলিং সাহিত্যসভাকে সাদরে ধন্যবাদ দিতেছি। গ্রন্থখানিতে পূর্ববাঙ্গালার কথা—বিশেষ, আসাম অঞ্চলের কথাই বেশী।

ইহা সাধারণের বেশ পাঠোপযোগী হইয়াছে। উক্ত সভার নিকট ইহার প্রাপ্তিস্বীকার আমরা ধন্যবাদের সহিত করিলাম।

প্রয়াস।—মাসিকপত্র ও সমালোচক—কলিকাতা, ৩৬।৭ নং বিডন ষ্ট্রীট, সাহিত্য-সেবক-সমিতি হইতে প্রকাশিত। উদ্দেশ্য—নবীন লেখকগণকে উৎসাহ প্রদান দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্য সমাজের উন্নতি বিধান করা। উদ্দেশ্য অতিশয় সৎ—সন্দেহ কি? "সাহিত্য পরিষদ" যে দু একটি অভাবকে অভাব বলিয়া স্বীকার করেন না অথবা স্বীকার করিলেও যে অভাব মোচন করিতে ইচ্ছুক নহেন, "সাহিত্য-সেবক-সমিতির" সেই অভাব দূর করিবার প্রয়াস। "সাহিত্য পরিষদ" হইতে বর্ত্তমান বঙ্গীয় সাহিত্য যথেষ্ট সাহায্য পাইতেছে। আশা করি "সাহিত্য-সেবক-সমিতি"ও সাহিত্য ক্ষেত্রে অনেকের উপকার করিবেন। ১ম সংখ্যা 'প্রয়াসে' মৌখিক আলাপের অনেক স্থল খুব সুন্দর ও স্বাভাবিক হইয়াছে।

কোকিল—ছাত্রপরিচালিত মাসিকপত্র—শ্রীযুক্ত বাবু নিশিকান্ত ঘোষ কর্তৃক সম্পাদিত এবং ঢাকা হইতে শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্র নাথ সেন কর্ত্তৃক প্রকাশিত। উল্লিখিত 'প্রয়াসের' ন্যায় 'কোকিলের'ও অতি সৎ উদ্দেশ্য। বিদ্যার্থিগণ একেবারেই ফার্সট ক্লাসে উঠিতে পারেন না। নবীন লেখক লেখিকাবর্গের—বিশেষ ছাত্রগণের—প্রবন্ধ প্রকাশের জন্যই সাহিত্য কাননে কোকিলের অবির্ভাব। প্রার্থনা করি, ইহাঁদিগের সৎ-ইচ্ছা পূর্ণ হউক—বঙ্গীয় সাহিত্যকানন-চারিগণের সংখ্যা যতই বৃদ্ধি হয়, ততই দেশের মঙ্গল।

বিনিময়ে প্রাপ্তি স্বীকার

কৃতজ্ঞতার সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, আমরা নিম্নলিখিত কাগজগুলি নিয়মিতরূপে পাইয়া থাকি, **Dawn, Brahmavadin, Prabuddha Bharata, Mahabodhi Journal, Eastern Herald, Indian Standard,** ব্রহ্মতত্ত্ব, হিন্দুপত্রিকা, নব্যভারত, সাহিত্য, ভারতী, প্রদীপ, মুকুল, তত্ত্ববোধনী, বামাবোধিনী, পন্থা, হিতবাদী, সময়, বসুমতী, প্রতিবাসী, কোকিল, প্রয়াস ও আর্য্যসমাচার।

৫ম সংখ্যায় স্বামী বিবেকানন্দ লিখিত "রামকৃষ্ণ ও তাঁহার উক্তি"র মধ্যে কতকগুলি গুরুতর ভ্রম রহিয়া গিয়াছে। পাঠকবর্গ অনুগ্রহপূর্ব্বক সংশোধন করিয়া লইবেন—*

* পুনর্মুদ্রণে প্রবন্ধটি এই অনুসারে সংশোধিত হইয়াছে বলিয়া সেগুলি এখানে দেওয়া হইল না—বর্তমান সম্পাদক

উদ্বোধন।

[১ম বর্ষ।] ১লা বৈশাখ। (১৩০৬ সাল) [৭ম সংখ্যা।]

বর্ত্তমান ভারত।

(স্বামী বিবেকানন্দ লিখিত।)

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

যে পুরোহিতশক্তির সহিত রাজশক্তির সংগ্রাম বৈদিক কাল হইতেই চলিতেছিল, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অমানব প্রতিভা স্বীয় জীবদ্দশায় যাহার ক্ষত্রপ্রতিবাদিতা প্রায় ভঞ্জন করিয়া দিতে সক্ষম হইয়াছিল, যে ব্রাহ্মণ্যশক্তি জৈন ও বৌদ্ধ উপপ্লাবনে ভারতের কর্ম্মক্ষেত্র হইতে প্রায় অপসৃত হইয়াছিল অথবা প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ধর্ম্মের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া কথঞ্চিৎ জীবন ধারণ করিতেছিল, যাহা মিহিরকুলাদির * ভারতাধিকার হইতে কিছুকাল প্রাণপণে পূর্ব্ব প্রাধান্য স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, এবং ঐ প্রাধান্য স্থাপনের জন্য মধ্য এসিয়া হইতে সমাগত ক্রূরকর্ম্মা বর্ব্বরবাহিনীর পদানত হইয়া, তাহাদের বীভৎস রীতি নীতি স্বদেশে স্থাপন করিয়া বিদ্যাবিহীন বর্ব্বর ভুলাইবার সোজা পথ মন্ত্রতন্ত্রমাত্র-আশ্রয় হইয়া, এবং তজ্জন্য নিজে সর্ব্বতোভাবে হতবিদ্য, হতবীর্য্য, হতাচার হইয়া, আর্য্যাবর্ত্তকে একটী প্রকাণ্ড বাম বীভৎস ও বর্ব্বরাচারের আবর্ত্তে পরিণত করিয়াছিল, এবং যাহা কুসংস্কার ও অনাচারের অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ সারহীন ও অতি দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল, পশ্চিম হইতে সমুত্থিত মুসলমানাক্রমণরূপ প্রবল বায়ুর স্পর্শমাত্রেই তাহা শতধা ভগ্ন হইয়া মৃত্তিকায় পতিত হইল।—পুনর্ব্বার কখনও উঠিবে কি কে জানে?

মুসলমান রাজত্বে অপরদিকে পৌরোহিত্য-শক্তির প্রাদুর্ভাব অসম্ভব। হজরত মহম্মদ সর্ব্বতোভাবে ঐ শক্তির বিপক্ষ ছিলেন, এবং যথাসম্ভব ঐ শক্তির একান্ত বিনাশের জন্য নিয়মাদি করিয়া গিয়াছেন। মুসলমান রাজত্বে রাজাই স্বয়ং প্রধান পুরোহিত; তিনিই ধর্ম্মগুরু; এবং সম্রাট্ হইলে প্রায়ই সমস্ত মুসলমান জগতের নেতা হইবার আশা রাখেন। য়াহুদি * বা ইসাহী † মুসলমানের নিকট সম্যক্ ঘৃণ্য নহে, তাহারা অল্পবিশ্বাসী মাত্র; কিন্তু কাফের, মূর্ত্তিপূজাকারী হিন্দু এ জীবনে বলিদান ও অন্তে অনন্ত নরকের ভাগী। সেই কাফেরের ধর্ম্মগুরুদিগকে—পুরোহিতবর্গকে—দয়া করিয়া কোনও প্রকারে জীবন ধারণ করিতে আজ্ঞামাত্র মুসলমান রাজা দিতে পারেন, তাহাও কখনও কখনও; নতুবা রাজার ধর্ম্মানুরাগ একটু বৃদ্ধি হইলেই কাফের-হত্যারূপ মহাযজ্ঞের আয়োজন!

একদিকে রাজশক্তি ভিন্নধর্ম্মী, ভিন্নাচারী প্রবল রাজগণে সঞ্চারিত; অপর দিকে পৌরো-

* মিহিরকুল—রাজপুত জাতির পূর্ব্বপুরুষ।

* সচরাচর যাহাকে ইহুদী বলে—Jew.

† খৃশ্চিয়ান।

হিত্যশক্তি সমাজশাসনাধিকার হইতে সর্ব্বতোভাবে বিচ্যুত। মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্রের স্থানে কোরাণোক্ত দণ্ডনীতি, সংস্কৃত ভাষার স্থানে পারসী আরবী। সংস্কৃত ভাষা বিজিত, ঘৃণিত হিন্দুদের ধর্ম্মমাত্র-প্রয়োজন রহিল, অতএব পুরোহিতের হস্তে যথাকথঞ্চিৎ প্রাণ ধারণ করিতে লাগিল আর ব্রাহ্মণ্যশক্তি বিবাহাদি রীতিনীতি পরিচালনেই আপনার দুরাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিতে রহিল—তাহাও যতক্ষণ মুসলমান রাজার দয়া।

বৈদিক ও তাহার সন্নিহিত উত্তরকালে পৌরোহিত্যশক্তির পেষণে রাজশক্তির স্ফূর্তি হয় নাই। বৌদ্ধবিপ্লবের পর ব্রাহ্মণ্যশক্তির বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের রাজশক্তির সম্পূর্ণ বিকাশ আমরা দেখিয়াছি। বৌদ্ধ সাম্রাজ্যের বিনাশ ও মুসলমান সাম্রাজ্য স্থাপন, এই দুই কালের মধ্যে রাজপুত জাতির দ্বারা রাজশক্তির পুনরুদ্ভাবনের চেষ্টা যে বিফল হইয়াছিল, তাহারও কারণ পৌরোহিত্যশক্তির নব জীবনের চেষ্টা।

পদদলিতপৌরোহিত্যশক্তি মুসলমান রাজা বহু পরিমাণে মৌর্য্য, গুপ্ত, আন্ধ্র, ক্ষাত্রপাদি * সম্রাড় বর্গের গৌরবশ্রী পুনরুদ্ভাসিত করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

এই প্রকারে কুমারিল্ল হইতে শ্রীশঙ্কর ও শ্রীরামানুজাদি পরিচালিত, রাজপুতাদিবাহু, জৈনবৌদ্ধরুধিরাক্তকলেবর, পুনরভ্যুত্থানেচ্ছু ভারতের পৌরোহিত্যশক্তি মুসলমানাধিকারযুগে চিরদিনের মত প্রসুপ্ত রহিল। যুদ্ধবিগ্রহ, প্রতিদ্বন্দ্বিতা এ যুগে কেবল রাজায় রাজায়। এ যুগের শেষে যখন হিন্দুশক্তি মহারাষ্ট্র বা শিখবীর্য্যের মধ্যগত হইয়া হিন্দুধর্ম্মের কথঞ্চিৎ পুনঃস্থাপনে সমর্থ হইয়াছিল, তখনও তাহার সঙ্গে পৌরোহিত্যশক্তির বিশেষ কার্য্য ছিল না; এমন কি, শিখেরা প্রকাশ্যভাবে ব্রাহ্মণচিহ্নাদি পরিত্যাগ করাইয়া স্বধর্ম্মলিঙ্গে ভূষিত করিয়া ব্রাহ্মণসন্তানকে স্বসম্প্রদায়ে গ্রহণ করে।

এই প্রকারে বহু ঘাতপ্রতিঘাতের পর রাজশক্তির শেষ জয় ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী রাজন্যবর্গের নামে কয়েক শতাব্দী ধরিয়া ভারত আকাশে প্রতিধ্বনিত হইল। কিন্তু এই যুগের শেষভাগে ধীরে ধীরে একটি অভিনব শক্তি ভারত-সংসারে আপনার প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল।

এ শক্তি এত নূতন, ইহার জন্ম কর্ম্ম ভারতবাসীর পক্ষে এমন অভাবনীয়, ইহার প্রভাব এমনই দুর্দ্ধর্ষ যে, এখনও অপ্রতিহতদণ্ডধারী হইলেও মুষ্টিমেয় মাত্র ভারতবাসী বুঝিতেছে, এ শক্তিটি কি—

আমরা ইংলণ্ডের ভারতাধিকারের কথা বলিতেছি।

অতি প্রাচীনকাল হইতেই ধনধান্যপূর্ণ ভারতের বিশাল ক্ষেত্র প্রবল বিদেশীর অধিকারস্পৃহা উদ্দীপিত করিয়াছে। বারম্বার ভারতবাসী বিজাতির পদদলিত হইয়াছে। তবে ইংলণ্ডের ভারতাধিকার-রূপ বিজয়ব্যাপারকে এত অভিনব বলি কেন?

অধ্যাত্মবলে মন্ত্রবলে শাস্ত্রবলে বলীয়ান, শাপাস্ত্র, সংসারস্পৃহাশূন্য তপস্বীর ভ্রূকুটি সম্মুখে দুর্দ্ধর্ষ রাজশক্তিকে কম্পান্বিত হইতে ভারতবাসী চিরকালই দেখিয়া আসিতেছে। সৈন্যসহায়, মহাবীর, শস্ত্রবল রাজগণের অপ্রতিহত বীর্য ও একাধিপত্যের সম্মুখে প্রজাকুল, সিংহের সম্মুখে

* ক্ষত্র ও গুজরাটের পারস্যদেশীয় সম্রাড়্গণ।

গরমে চলুন
হালকা পায়ে
আর চপ্পলগুলির নকশা এমন, যাতে
সহজে হাওয়া খেলতে পারে। সুশ্রী
গড়ন দেখেই বুঝবেন পায়ের স্বাচ্ছন্দ্যের
কথা মনে রেখেই তৈরি। প্রত্যেকটিই
গড়নে ও উপাদানে অভিনব। বাটার
দোকানে এ রকম স্যান্ডাল ও চপ্পলের
যেন মেলা বসে গেছে। এখানে তার
মাত্র কয়েকটি নকশা। আসুন না,
একবার পরে দেখুন।
সানরে
১০.৫০
জুবিলি
২০.৯৫
সানওয়ে
১৯.৯৫
Bata
Bata
Bata
Bata

স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী

সন্ন্যাসীর গীতি — ১০ম সংস্করণ। স্বামীজী-রচিত 'Song of the Sannyasin'-নামক ইংরেজী কবিতা ও উহার পদ্যে অনুবাদ। মূল্য ২০ পয়সা।

ঈশদূত যীশুখৃষ্ট — ৭ম সংস্করণ। ভগবান ঈশার জীবনালোচনা—মূল্য ০·৫০ উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে মূল্য ০·৩৫।

সরল রাজযোগ — [illegible] সংস্করণ। স্বামীজী আমেরিকায় তাঁহার শিষ্যা মিস্ সারা সি. বুলের বাড়িতে কয়েকজন অন্তরঙ্গকে 'যোগ' সম্বন্ধে যে বিশেষ উপদেশ দান করেন, বর্তমান পুস্তক তাহারই অনুবাদ। মূল্য [illegible]

পত্রাবলী—১ম ও ২য় ভাগ। অভিনব পরিবর্ধিত সংস্করণ। প্রায় ১০৫০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। স্বামীজীর বহু অপ্রকাশিত পত্র ইহাতে সংযোজিত হইয়াছে। তারিখ অনুযায়ী পত্রগুলি সাজানো হইয়াছে। পরিচয়- এবং নির্ঘণ্ট-সংযুক্ত। মনোরম বাঁধাই। স্বামীজীর সুন্দর ছবি-সংবলিত প্রতি ভাগ মূল্য ৫·৫০; উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে মূল্য ৫৲।

ভারতে বিবেকানন্দ—১৪শ সংস্করণ। আমেরিকা হইতে প্রত্যাবর্তনের পর স্বামীজীর ভারতীয় বক্তৃতাবলীর উৎকৃষ্ট অনুবাদ। ৫১৯ পৃষ্ঠা; মূল্য ৫·০০। উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে মূল্য ৪·[illegible]।

দেববাণী—৮ম সংস্করণ। আমেরিকার 'সহস্র-দ্বীপোদ্যান'-নামক স্থানে কয়েকজন অন্তরঙ্গ শিষ্যকে স্বামীজী যে-সকল অমূল্য উপদেশ প্রদান করেন, ঐগুলির একত্র সমাবেশ। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি, ২১৪ পৃষ্ঠা; মূল্য—২৲ উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে মূল্য ১·৮০।

শিক্ষাপ্রসঙ্গ—৪র্থ সংস্করণ। শিক্ষা-সম্বন্ধে স্বামীজীর বাণীসকল সংকলিত ও ধারাবাহিক-ভাবে সন্নিবেশিত। ১৮৮ পৃষ্ঠা; মূল্য ১·৭৫।

কথোপকথন—৭ম সংস্করণ। স্বামীজীর ছবিযুক্ত। ডবল ক্রাউন, ১৬ পেজি, ১৪২ পৃষ্ঠা; মূল্য ১·২৫। উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে মূল্য ১·১৫

মদীয় আচার্যদেব—স্বামী বিবেকানন্দ-প্রণীত, ১১শ সংস্করণ, ৬৪ পৃষ্ঠা। স্বীয় গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনী ও শিক্ষা সম্বন্ধে আমেরিকাবাসীদের নিকট স্বামীজীর [illegible]। মূল্য ০·৭৫ উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে মূল্য ০·৬৫।

জ্ঞানযোগ-প্রসঙ্গে—বিভিন্ন বক্তৃতার সারসংক্ষেপ—ইংরেজীতে প্রকাশিত Discourses on Jnana Yoga পুস্তকের অনুবাদ। 'স্বামীজীর বাণী ও রচনা' হইতে পৃথক্ পুস্তকাকারে প্রকাশিত। আত্মতত্ত্ব ও বেদান্ত-বিষয়ক বহু কঠিন বিষয় সরলভাবে আলোচিত। 'জ্ঞানযোগ' গ্রন্থ পড়িবার পক্ষে সহায়ক। মূল্য দুই টাকা।

স্বামি-শিষ্য-সংবাদ—(পূর্বকাণ্ড — ১৩শ সংস্করণ; উত্তরকাণ্ড—১১শ সংস্করণ)। শ্রীশরৎ-চন্দ্র চক্রবর্তী প্রণীত। স্বামী বিবেকানন্দের মতামত অল্প কথায় জানিবার উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। স্বামী-জীর জীবিতকালে তাঁহার সহিত প্রশ্নোত্তরচ্ছলে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য-দেশীয় আচার-নীতি, দর্শন-বিজ্ঞানাদি এবং ধর্ম ও সমাজগত সমস্যামূলক নানা বিষয়ের বিশদ আলোচনা। সরস ও হৃদয়গ্রাহী এই সব বর্ণনা সত্যই আনন্দদায়ক। বর্তমান যুগের বহু সমস্যার আদর্শানুগ সমাধানও ইহাতে পাওয়া যাইবে। জীবনতত্ত্ব বিষয়ে এই পুস্তকদ্বয় অমূল্য রত্নের সন্ধান দিবে। ২২০ ও ২১০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য প্রতি কাণ্ড ২·২৫।

মহাপুরুষ-প্রসঙ্গ—১৬শ সংস্করণ। ১৫৪ পৃষ্ঠা। ইহাতে রামায়ণ, মহাভারত, জড়-ভরতের উপাখ্যান, প্রহ্লাদচরিত্র, জগতের মহত্তম আচার্যগণ, ঈশদূত যীশুখ্রীষ্ট, ভগবান বুদ্ধ প্রভৃতি বিষয় আছে। কোমলমতি বালক-দিগের চরিত্রগঠনে ও ভারতীয় সংস্কৃতিতে তাহাদিগকে শ্রদ্ধাবান্ করিতে ইহা বিশেষ সহায়তা করিবে; মূল্য ৩·০০; উদ্বোধন গ্রাহক-পক্ষে মূল্য ২·৭০।

শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা এবং স্বামী বিবেকানন্দ-সম্বন্ধীয় পুস্তকাবলী

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী ও শিক্ষা-সম্বন্ধে অপূর্ব পুস্তক। স্বামী সারদানন্দ-প্রণীত। দুই ভাগে রেক্সিন-বাঁধাই মূল্য—১ম ভাগ ১০, ২য় ভাগ ১০৲
উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ৯'০০
সাধারণ বাঁধাই পাঁচ ভাগে

মূল্য—		উঃ গ্রাঃ পক্ষে
১ম ভাগ	২'৫০	২'২৫
২য় "	৪'৭৫	৪'২৫
৩য় "	৩'৫০	৩'১৫
৪র্থ "	৩'০০	২'৭০
৫ম "	৩'৫০	৩'১৫

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি—৭ম সংস্করণ। অক্ষয়কুমার সেন-প্রণীত। সুললিত কবিতায় শ্রীশ্রীঠাকুরের বিস্তারিত জীবনী ও অলৌকিক শিক্ষা সম্বন্ধে এরূপ গ্রন্থ আর নাই। ৬৪০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য—বোর্ড-বাঁধাই ১৫৲, উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ১৪৲।

পরমহংসদেব—ষষ্ঠ সংস্করণ। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু-প্রণীত। সুললিত ভাষায় অল্প কথায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দিব্য জীবনবেদ। ১৪০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য—১'৭৫।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ—১২শ সংস্করণ শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য-প্রণীত। বালক-বালিকাদিগের জন্য সরল ভাষায় লিখিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনী। মূল্য—০'৭০।

শ্রীরামকৃষ্ণ-চরিত—২য় সংস্করণ। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চৌধুরী-প্রণীত। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাবলীর অপূর্ব সমাবেশ। বোর্ড-বাঁধাই ডিমাই সাইজ। মূল্য—৪'০০।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ—১৮শ সংস্করণ। সুরেশচন্দ্র দত্ত-সংগৃহীত। ২৬৫ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য—৩৲।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-উপদেশ—স্বামী ব্রহ্মানন্দ সঙ্কলিত। ১২শ সংস্করণ। মূল্য—৭৫ পয়সা। কাপড়ে বাঁধাই ১৲ টাকা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-মহিমা—শ্রীরামকৃষ্ণ-চরিত-মহাকাব্য শ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথির অমর লেখক অক্ষয়কুমার সেনের লেখনী-প্রসূত গ্রন্থ। মূল্য—২'০০।

রামকৃষ্ণের কথা ও গল্প—১৪শ সংস্করণ। স্বামী প্রেমঘনানন্দ-প্রণীত। এই সুচিত্রিত সুদৃশ্য সুলভ পুস্তকখানি ছেলেমেয়েদের ধর্মীয় ও নৈতিক জীবনগঠনের সহায়তা করিবে। মূল্য ২'০০

শ্রীমা সারদাদেবী—৪র্থ সংস্করণ। স্বামী গম্ভীরানন্দ-প্রণীত। শ্রীশ্রীমায়ের বিস্তারিত জীবনীগ্রন্থ। পৃষ্ঠা ৭১০; মূল্য ৮৲।

জননী সারদাদেবী—স্বামী নির্বেদানন্দ-প্রণীত। পৃষ্ঠা ১১০। মূল্য—১'০০।

সারদা—স্বামী নিরাময়ানন্দ-প্রণীত। পৃষ্ঠা ৯৮; মূল্য ১'৫০।

শ্রীশ্রীমায়ের কথা—শ্রীশ্রীমায়ের সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ সন্তানদের 'ডাইরী' হইতে সংগৃহীত সারগর্ভ উপদেশ। সংসারতাপে সান্ত্বনাদায়ক ও অধ্যাত্মরাজ্যে পথপ্রদর্শক। দুই ভাগে সম্পূর্ণ। প্রতি ভাগ—৫'৫০।

মাতৃসান্নিধ্যে—২য় সংস্করণ; স্বামী ঈশানানন্দ-প্রণীত। পৃষ্ঠা ২৫৬; মূল্য ৪৲ টাকা।

যুগনায়ক বিবেকানন্দ স্বামী গম্ভীরানন্দ-প্রণীত। স্বামীজীর অধুনাতন মূল্যবান প্রামাণিক জীবনীগ্রন্থ। তিন খণ্ডে প্রকাশিত। প্রতি খণ্ড ৮৲ করিয়া। একত্র লইলে ২৩৲। উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ২২৲।

স্বামী বিবেকানন্দ—৩য় সংস্করণ, শ্রীপ্রমথনাথ বসু-রচিত। দুই খণ্ডে প্রকাশিত স্বামীজীর জীবনী। ৯৬৩ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য—প্রতি-খণ্ড ৪৲। উদ্বোধন-গ্রাহক পক্ষে ৩'৬০। দুই খণ্ড একত্র বাঁধাই ৮'৫০।

স্বামী বিবেকানন্দ—১১শ সংস্করণ। শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য-প্রণীত। স্বামীজীর জীবনের প্রধান প্রধান সকল কথাই বলা হইয়াছে। মূল্য—০'৭০

বিবেকানন্দ-চরিত—৯ম সংস্করণ। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার-প্রণীত। মূল্য ১০'০০

পাঞ্চজন্য—স্বামী চণ্ডিকানন্দ-রচিত পাঁচ শতের অধিক সঙ্গীতের সমাবেশ। মাতৃসঙ্গীত, শিবসঙ্গীত, গুরুসঙ্গীত, মহামানব-সঙ্গীত, রামকৃষ্ণ-লীলাগীতি, সারদা-লীলাগীতি ও দেশাত্মবোধক সঙ্গীত। মূল্য—ছয় টাকা।

প্রাপ্তিস্থান :—উদ্বোধন কার্যালয়, বাগবাজার, কলিকাতা ৩

উদ্বোধন-প্রকাশিত অন্যান্য পুস্তকাবলী

[illegible]-চরিত—৫ম সংস্করণ; শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য-প্রণীত। এই পুস্তক-পাঠে চরিত-কথার [illegible] পাঠক এবং ভক্তগণ ধর্ম ও [illegible] সন্ধান পাইবেন। মূল্য ২'০০।

শঙ্কর-চরিত—শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য-প্রণীত—৫ম সংস্করণ; আচার্য শঙ্করের অদ্ভুত জীবনী অতি স্বললিত ভাষায় লিখিত। মূল্য ১৲।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বেদান্ত—স্বামী বিবেকানন্দ প্রণীত। ১৮৯৬ খৃঃ মার্চ মাসে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত বক্তৃতা এবং তৎপরবর্তী প্রশ্নোত্তর ও আলোচনা। বেদান্তের মূলতত্ত্ব অতি স্পষ্টভাবে ব্যক্ত। প্রশ্নোত্তর ও আলোচনায় ভারতীয় কৃষ্টি ও হিন্দুধর্মের মূল ভাব সাহসিকতার সহিত সরলভাবে উপস্থাপিত। পৃষ্ঠা ৫৫; মূল্য এক টাকা।

শিব ও বুদ্ধ—[illegible] সংস্করণ; ভগিনী নিবেদিতা-প্রণীত; [illegible] মূল্য ০'৬২।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ—[illegible] সর্বপ্রধান [illegible] স্বামী ব্রহ্মানন্দ [illegible] জীবনী। মূল্য—৩'[illegible]

ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ—[illegible] সংস্করণ। স্বামী ব্রহ্মানন্দের কথোপকথন এবং পত্রাবলীর সংগ্রহ; [illegible] লিখিত [illegible] কথা। মূল্য [illegible]

মহাপুরুষ শিবানন্দ—স্বামী অপূর্বানন্দ-প্রণীত; ৩য় সংস্করণ। মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দজীর বিস্তারিত জীবনী। মূল্য—৫'০০।

[illegible]—[illegible] ৩য় সংস্করণ। স্বামী [illegible]। মূল্য [illegible]।

শ্রীরামকৃষ্ণ-চরিত—স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ-প্রণীত, [illegible] সংস্করণ, [illegible] শ্রীরামকৃষ্ণের [illegible] [illegible] জীবন [illegible] এই গ্রন্থে [illegible] মূল্য [illegible]। [illegible]

স্বামী অখণ্ডানন্দ—স্বামী অন্নদানন্দ-প্রণীত। এই পুস্তকে শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্নিধানে, তিব্বতে ও হিমালয়ে, স্বামীজীর সঙ্গে, দুর্ভিক্ষে সেবাকার্য, সেবাব্রতের প্রাণপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতি অধ্যায়ে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্যের পথিকৃৎ স্বামী অখণ্ডানন্দের ধারাবাহিক জীবনী। ডিমাই সাইজ, [illegible] পৃষ্ঠা। মূল্য ৪৲।

সাধু নাগমহাশয়—শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী-প্রণীত। ১১শ সংস্করণ। যাঁহার সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন, "পৃথিবীর বহু স্থান ভ্রমণ করিলাম, নাগমহাশয়ের ন্যায় মহাপুরুষ কোথাও দেখিলাম না!"—পাঠক। তাঁহার পুণ্য জীবন-বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া ধন্য হউন। মূল্য ২'০০।

গোপালের মা—স্বামী সারদানন্দ-প্রণীত (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ হইতে সঙ্কলিত)। অতুলনীয় সাধননিষ্ঠ, পরমভক্ত গোপালের মা-র আদর্শ জীবনের সংক্ষিপ্ত কাহিনী। মূল্য ৫০ পয়সা।

লাটু মহারাজের স্মৃতিকথা—শ্রীচন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়-প্রণীত। ২য় সংস্করণ। শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও ঠাকুরের শিষ্যগণ সম্বন্ধে বহু অপ্রকাশিত ঘটনাবলীর সমাবেশ। নিজ জীবনের কঠোর ত্যাগ-তপস্যার কথার অদ্ভুত প্রকাশভঙ্গীতে পাঠকগণ চমৎকৃত হইবেন। মূল্য—৪'০০।

স্বামী তুরীয়ানন্দ—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ প্রণীত। বাল্যাবধি বেদান্তী এই মহাত্মার জীবনের অদ্ভুত ঘটনাবলী-পাঠে চমৎকৃত হইবেন। ৩৯০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য—৩'৫০।

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিষ্যগণের সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত একত্র এই প্রথম প্রকাশিত হইল। দুই ভাগে সম্পূর্ণ। প্রতি ভাগের মূল্য—৫'৫০।

ভগিনী নিবেদিতা—স্বামী তেজসানন্দ প্রণীত। ইহাতে তাঁহার জীবনের মুখ্য ঘটনাবলীর সম্যক্ আলোচনা রহিয়াছে। ইহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে "ভগিনী নিবেদিতা স্মৃতি বক্তৃতামালার" প্রথম বক্তৃতা। মূল্য—১'[illegible]

প্রাপ্তিস্থান :—উদ্বোধন কার্যালয়, বাগবাজার, কলিকাতা ৩

উদ্বোধন, আষাঢ়, ১৩৮০

বিষয়-সূচী

বিষয়-সূচী

জনপ্রিয়তার ঊর্ধ্বে!
কোলে
থিনএরারুট
প্রিয় গ্রাহকদের সুবিধার জন্য
মূল্য সীমার মধ্যে
গুণ অপরিবর্তিত
KOLA THIN ARROWROOT
THIN ARROWROOT BISCUIT

ভাল চা বলতে
টসের
চা
TOSH'S
এ, টস এণ্ড সন্স
ফোন
২২-৪৭৮৫
কলিকাতা—১

দিব্য বাণী

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥ ৮

—মুণ্ডকোপনিষদ্, ২।২

যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্। ন বিভেতি কুতশ্চন॥

—তৈত্তিরীয়োপনিষদ্, ২।৯

মন-বুদ্ধি-অগোচর পরব্রহ্ম যিনি
নিখিল জগৎ-রূপ ধরেছেন তিনি।
শুভক্ষণে হলে তাঁর স্বরূপ দর্শন
টুটে যায় হৃদয়ের সকল বন্ধন,
কর্মফল ক্ষীণ হয়ে লুপ্ত হয়ে যায়,
চিরতরে ছিন্ন হয় সকল সংশয়॥

পরব্রহ্ম যিনি, যাঁরে প্রকাশিতে গিয়া
বাক্য-মন ফিরে আসে অক্ষম হইয়া
আনন্দ স্বরূপ তাঁর প্রত্যক্ষ করিলে
নাহি ভয় কোন ঠাঁই এ বিশ্ব নিখিলে॥

কথাপ্রসঙ্গে

'এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ'—ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাব

মানুষের উন্নতি, সামাজিক উন্নতি, জাতীয় উন্নতি—এসব বলিতে কেহ কেহ ভাবেন তাহার খাওয়া-থাকা-পরা প্রভৃতির উন্নতিই মুখ্য। কাহারো মতে এগুলি গৌণ, মোটামুটিভাবে জীবনধারণের ব্যবস্থা থাকিলেই হইল, মুখ্য তাহার আধ্যাত্মিক উন্নতি। সাধারণতঃ পাশ্চাত্যে পূর্বোক্ত ভাবের, এবং প্রাচ্যে, বিশেষ করিয়া ভারতে শেষোক্ত ভাবের প্রাধান্য। প্রথমটিতে জীবনের চরম লক্ষ্য ঐহিক উন্নতি-লাভ, দ্বিতীয়টিতে আত্মিক উন্নতি। প্রথমটির পথ বহিঃপ্রকৃতিকে জয় করা, দ্বিতীয়টির অন্তঃ-প্রকৃতিকে।

দুটি ভাবেরই দোষগুণ আছে। বর্তমান ভারত ও বর্তমান পাশ্চাত্যের দিকে তাকাইলেই তাহা প্রতীয়মান হয়। আধ্যাত্মিকতা বা ধর্ম বলিতে সাধারণতঃ আমরা যাহা বুঝি, তাহাকে জীবনে গৌণ রাখিয়া বা একেবারে বাদ দিয়া চলিয়াও মানুষ জাগতিক উন্নতির চরম শিখরে উঠিয়াছে। কিন্তু ইহার অতিরিক্ত আরও যাহা কিছু মানুষ চায়, বরং বলা যায়, প্রাণধারণের প্রয়োজন মোটামুটিভাবে মিটাইবার অতিরিক্ত জাগতিক উন্নতিও যে জন্য মানুষ চায়, এই উন্নতি মানুষকে সেই সুখ-শান্তি দিতে পারিয়াছে কি? আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, নিশ্চয়ই পারিয়াছে, অন্ততঃ দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত জাতিগুলির চোখে তো তাহাই মনে হওয়া অতি স্বাভাবিক। কিন্তু পাশ্চাত্যের জনৈক আধুনিক ঐতিহাসিক, ডঃ বাসাম ইহাতে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন: 'আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যায় উন্নত চীন, জাপান ও অন্যান্য দেশগুলি বোধ হয় ভুল পথে চলেছে। তারা নিজ নিজ দেশবাসীদের সুখী করতে পেরেছে কি না সন্দেহ; আত্মহত্যার হার দেখেই এটা ধারণা করা যায়। সর্বাধিক ধনী দেশগুলিই সর্বাধিক সুখী দেশ নয়।' ইহা তো হইল তাহাদের নিজেদের ব্যাপার; পৃথিবীর অন্যান্য দেশগুলিকে আজ তাহারা কি দিতেছে? শিল্প, বিজ্ঞান, সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় নতুন আলোক প্রভৃতি মানবজাতির পক্ষে মূল্যবান অনেক কিছু অবদানই তাহাদের আছে নিঃসন্দেহ, কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে শিল্পবিজ্ঞানাদিতে অতি-উন্নত জাতিগুলির অবদান হইল বিভীষিকা—মানবজাতিরই, মানবসভ্যতারই ব্যাপক ধ্বংসের আশঙ্কা। যে কথাটি একাধিকবার স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন আর একজন আধুনিক ঐতিহাসিক, আর্নল্ড টয়েনবী—'বর্তমান যুগে পাশ্চাত্য প্রযুক্তি-বিদ্যা বস্তুতান্ত্রিক স্তরে পৃথিবীকে এক করেছে। কিন্তু এই পাশ্চাত্য নৈপুণ্য শুধু তো দূরত্বকে লুপ্ত করেনি; দূরত্ব কমিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষকে যখন পরস্পরের ওপর আঘাত হানার মতো অবস্থায় এনে ফেলা হয়েছে, অথচ যখন পর্যন্ত তারা পরস্পরকে বুঝতে ও ভালবাসতে শেখেনি, এমন এক সময়েই সে তাদের হাতে বিপুল-বিধ্বংসী অস্ত্রসমূহও তুলে দিয়েছে।' এবং তার ফলে, 'মানবজাতির চরম বিপজ্জনক মুহূর্তের', 'মানবজাতির আত্মধ্বংসের সম্ভাবনার' সৃষ্টি করিয়াছে। আমরা তো দেখিতেই পাইতেছি, ন্যায় মানবপ্রেম প্রভৃতি উচ্চাঙ্গের কথার চাকচিক্যময় বহিরাবরণ ভেদ করিয়া প্রবল শক্তিমান জাতিগুলির স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজনই

ব্যাদিত-দংষ্ট্রা শ্বাপদের ন্যায় আত্মপ্রকাশ করিয়া বারবার পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নভাবে মানবতার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে।

অপর দিকে, আধ্যাত্মিক উন্নতিকেই যেখানে জীবনের চরম লক্ষ্য বলিয়া ভাবা হইয়াছে, সেই ভারত দারিদ্র্যে অশিক্ষায় দুর্দশায় জর্জরিত, পরপদানত হইয়া প্রায় সহস্র বৎসর কাটাইয়াছে। এখন অবশ্য সে অবস্থা আর নাই, জাগতিক উন্নতির পথে স্বাধীন ভারত এখন অনেক অগ্রসর।

যখন ভারত স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত ছিল, যখন ধর্ম কেবল কথায় বা অনুষ্ঠানমাত্রে পর্যবসিত না হইয়া ভারতবাসীর জীবনে মূর্ত ছিল এবং তাহার সহিত ছিল প্রয়োজনীয় জাগতিক উন্নতির দিকেও পর্যাপ্ত সংযত দৃষ্টি, তখনও সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী থাকা সত্ত্বেও স্বার্থসিদ্ধির জন্য অপর জাতির বুকে বা মানবতার বুকে সে কখনো ঝাঁপাইয়া পড়ে নাই। সাম্প্রতিক কালে দীর্ঘকালের অবনতির চরম অবস্থা হইতে সে যখন অনেকখানি উন্নত হইয়াছে, তখনও ভারত জাতীয় স্বার্থসিদ্ধির জন্য ন্যায়বিরোধী, মানবতাবিরোধী কিছু করে নাই। বিশ্বজোড়া পারস্পরিক দ্বেষ ও অবিশ্বাসের অন্ধকারের মধ্যে আজ বোধ হয় একমাত্র ভারতই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিশ্বাসের, ন্যায়ের, প্রেমের, মানবিকতার দীপ জ্বালাইয়া রাখিয়াছে—অন্ততঃ সমধিক উজ্জ্বল রাখিয়াছে। আর এত দুঃখ-দারিদ্র্য-জর্জরিত, নিজ আধ্যাত্মিক আদর্শ হইতে বহু অবনত, এমন কি বহিরাগত জড়বাদভিত্তিক জীবনদর্শনের প্রতি কিঞ্চিৎ-প্রলুব্ধদৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও ভারতবাসীর মনের শান্তি এখনো রহিয়াছে, দারিদ্র্যজনিত নৈরাশ্যে কিছুটা বিক্ষুব্ধ হইলেও রহিয়াছে। ডঃ বাসাম বলিয়াছেন, 'ভারত এখনো সুখী দেশ। বাইরে থেকে লালসাময় আদর্শের অনুপ্রবেশের জন্যই তার স্বাভাবিক সুখ কমে যাচ্ছে।'

জাতির নিজস্বতা আঁকড়াইয়া থাকিয়া অন্ন-বস্ত্রের অভাব মোটামুটিভাবে মিটাইতে পারিলেই সব ঠিক হইয়া যাইবে, সুখের আশায় উন্নত পাশ্চাত্য জাতিগুলির ন্যায় নিত্য নূতন ভোগ্যবস্তুর পিছনে উন্মত্তের মতো ছুটিবার প্রয়োজন ভারতের নাই, জীবনে সুখশান্তিলাভের অন্য উৎস তাহার আছে। আধ্যাত্মিকতাই সেই উৎস।

'এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ'

আমরা জানি, স্বামীজী বলিয়া গিয়াছেন, জাগতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার, গ্রীক ও ভারতীয় সভ্যতার মিলনই মানবজাতির যথার্থ উন্নতির পথ, কেবল ইহাদের একটিকে অবলম্বন করিয়া চলা নহে। বলিয়াছেন, বিভিন্ন যুগে যতবারই এই মিলন ঘটিয়াছে, মানবসভ্যতা ততবারই সমধিক অগ্রসর হইয়াছে। আধুনিক যুগে সমগ্র মানবজাতির মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের পথ অতি সুগম হওয়ায় এ যুগে উহা ব্যাপকভাবে ঘটিবে। আর বলিয়াছেন, সে মিলনের আদর্শ এবার ভারতবর্ষ দেখাইবে, তাহাকে দেখিয়া অপরে সে আদর্শ গ্রহণ করিবে—'এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ'।

বলিয়াছেন, এই মিলনের আদর্শ দেখাইবার জন্য ভারতের কাজ দুইটি। প্রথম, ধর্মই ভারতীয় জাতির প্রাণ, বর্তমান অবনতির যুগেও প্রত্যেক ভারতবাসীর অন্তরে ধর্মভাব প্রচ্ছন্ন আছে, উহার প্রকাশ ঘটাইতে হইবে। দ্বিতীয়, জাগতিক উন্নতির জন্য চেষ্টা। তবে জাগতিক উন্নতির জন্য, পাশ্চাত্যভাব-গ্রহণকালেও এই প্রকাশ ঘটানোর কাজের, ভারতবাসীর স্বাভাবিক আধ্যাত্মিক ভাব যাহাতে জীবনে প্রকাশিত হয় তাহার সহায়তার দিকে নজর রাখিয়া আমাদের চলিতে হইবে। জাগতিক উন্নতির জন্য পাশ্চাত্যভাব গ্রহণ করিতে যাইয়া আমরা যেন নিজেদের আধ্যাত্মিকভাব হারাইয়া

না ফেলি, সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে হইবে। যেজন্য স্ত্রীশিক্ষার অবশ্যপ্রয়োজনীয়তার কথা বলিবার সময় একথাও বলিয়াছেন যে, তাহা করিতে গিয়া যদি ভারতের মাতৃজাতির পবিত্রতা ব্যাহত হয়, তবে সে শিক্ষার প্রয়োজন নাই। যেজন্য বলিয়াছেন, দেশে সামাজিক ও রাজনৈতিক ভাব ছড়াইবার পূর্বে সমগ্র ভারতকে উপনিষদের ভাবে ভাসাইয়া দিতে হইবে

পাশ্চাত্য জাগতিক উন্নতির শীর্ষদেশে উঠিয়াছে, তাহার প্রয়োজন শুধু নিজ সভ্যতাকে আধ্যাত্মিকতা-ভিত্তিক করা। যদি সে জড়বাদের ভিত্তি হইতে সরাইয়া আনিয়া সভ্যতাকে আধ্যাত্মিকতা-ভিত্তিক করিতে না পারে, তাহা হইলে তাহার ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। বলিয়াছেন, জড়বাদের ভিত্তি বালির ভিত্তি; তাহার পরমায়ু বড়জোর দু'শো বছর, এবং যখন তাহা ভাঙে, সংস্কার করিবার মতোও কিছু আর অবশিষ্ট থাকে না।

অপাতদৃষ্টিতে বর্তমান সময়ে সাধারণের চোখে এই মিলনের কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। ভারতের নবজাগরণ এই আধ্যাত্মিকতাকে ভিত্তি করিয়াই আসিলেও, এমনকি ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতাসংগ্রামের মূলে, অগ্নিযুগের পূজারীদের, নেতাজী, মহাত্মাজী প্রভৃতির জীবনের মূলে আধ্যাত্মিকতার ভিত্তি থাকা সত্ত্বেও স্বাধীনতালাভের পর হইতেই আমরা সে ভিত্তি হইতে ক্রমে যেন সরিয়া আসিতেছি, পাশ্চাত্যের অনুকরণে উহাকে যেন অপ্রয়োজনীয় বলিয়াই ভাবিতেছি বলিয়া মনে হয়। অপরদিকে, বহিরাগত জড়বাদ তাহার কর্মজীবন ও সমাজব্যবস্থার উপর ক্রমাগত আঘাত হানিয়াই চলিয়াছে। কাজেই ভারতে আধ্যাত্মিকতাভিত্তিক জীবনযাপনের ধারার পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য কোন ব্যাপক প্রচেষ্টার বা তাহার প্রয়োজনীয়তাবোধেরও কোন লক্ষণ তো সাম্প্রতিককালে দেখা যাইতেছে না।

অপর দিকে, পাশ্চাত্যজগতে সভ্যতাকে আধ্যাত্মিকতা-ভিত্তিক করারও কোন প্রচেষ্টা দেখা যাইতেছে না, বরং তাহার বিপরীতটাই চোখে পড়িতেছে।

কিন্তু উভয় ভাবের মিলনের প্রয়োজনীয়তার কথা এবং তাহা যে ধীরে ধীরে ঘটিতে শুরু করিয়াছে সে কথাও শোনা যাইতেছে পূর্বোক্ত দুইজন ঐতিহাসিকের মুখে। টয়েনবী স্পষ্টাক্ষরেই বলিয়াছেন যে, পাশ্চাত্যবিজ্ঞান ও শিল্পশিক্ষার সঙ্গে অশোক, মহাত্মা গান্ধী ও শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রদর্শিত ভারতীয় ধারায় জীবন যাপন করিতে না শিখিলে সমগ্র মানবজাতিরই ধ্বংস আসন্ন। বলিয়াছেন, শুধু বাঁচিবার তাগিদেই নয়, নিজস্ব মহিমাতেই ভারতীয় জীবনধারা গ্রহণযোগ্য—'সর্বাধিক শক্তিশালী ও সর্বাধিক সম্মানার্হ উপযোগবাদী প্রেরণা বলেই রামকৃষ্ণ গান্ধী ও অশোকের উপদেশে গভীরভাবে আকৃষ্ট হতে ও তদনুসারে চলতে হবে,—তাঁদের উপদেশগ্রহণের কারণরূপে এটা গৌণ। এর মুখ্য কারণ হল—এ উপদেশ সত্য। সত্য, কারণ তা আধ্যাত্মিক সত্যের যথার্থ-উপলব্ধি-প্রসূত।' এখানে স্পষ্টাক্ষরে স্বামীজীরই ভাব প্রকাশিত—আধ্যাত্মিকতার ভিত্তিহীন কেবল জাগতিক উন্নতির প্রতি নিবদ্ধ-দৃষ্টি সভ্যতার ধ্বংস অনিবার্য; আর, আধ্যাত্মিক ভাব অপরাপর দেশগুলিকে গ্রহণ করিতে হইবে ভারতের নিকট হইতেই।

সম্প্রতি ডঃ বাসামও 'এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ'—স্বামীজীর এই ভাবেরই ইঙ্গিত দিয়াছেন[১]—

১ গত ২৭শে জুন স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীমতী পদ্মালয়া দাশ-লিখিত—'A Friendly Mlechha' প্রবন্ধ হইতে ডঃ বাসামের কথাগুলি সংকলিত ও অনূদিত।

'আমি মনশ্চক্ষে দেখছি, ভবিষ্যতে একটা বিশ্ব-সংস্কৃতি গড়ে উঠবে এবং আমার মনে হয় তা গড়ে উঠবে দৃঢ় ভারতীয় ভিত্তির উপরই, বিশেষ করে ধর্মের ক্ষেত্রে।···বিশ্বের কাছে ভারতের প্রধান দান হবে ধর্ম ও অধ্যাত্মজীবন বিষয়েই।' সাম্প্রতিককালে ভারতীয় মনোভাব পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশী পরিমাণে ইউরোপীয় এবং আমেরিকানদের মতো, ইহা অনুধাবন করিয়াও একথা তিনি বলিতেছেন। বলিতেছেন, 'তথাপি, এই বাহ্য আবরণের ভিতর, ভারতবাসীর মর্মস্থলে ভারতীয়তা দৃঢ়বদ্ধ রহিয়াছে।' বলিতেছেন, 'এত সব মার্কসবাদী ও যুক্তিবাদী সত্ত্বেও ভারত থেকে বা অন্য কোথাও থেকে ধর্ম লুপ্ত হবার কোন লক্ষণই নেই এবং পাশ্চাত্যের বহু নরনারী ভারত ও জাপানের ধর্মবিশ্বাসের দিকে ঝুঁকছে।'

ভারতের করণীয়

বর্তমানে ভারতের করণীয় কি? শিক্ষার প্রসার, দারিদ্র্য-দূরীকরণ—অন্ন বস্ত্র বাসস্থান প্রভৃতির অবশ্যপ্রয়োজনীয় অভাব মেটানো—এসব তো সর্বাগ্রে করিতে হইবেই। কিন্তু ইহা করিবার প্রচেষ্টার সঙ্গে ভারতবাসীর সহজাত ধর্মবিশ্বাস, ঈশ্বরবিশ্বাস, অধ্যাত্মিকতাও যাহাতে অটুট থাকে তাহার দিকে নজর রাখিতে হইবে, উহার যথার্থ বিকাশের সহায়তাও করিতে হইবে। অধ্যাত্মিকতা যে জাগতিক উন্নতিপ্রচেষ্টার সঙ্গে সমন্বিত হইতে পারে, জাগতিক উন্নতি-প্রচেষ্টার বাধা না হইয়া অধ্যাত্মিকতা যে সে প্রচেষ্টার সহায়ক হইতে পারে—স্বামীজীর ভাষায় একজন ছাত্রকে আরো ভাল ছাত্র, একজন দেশসেবককে আরো ভাল দেশসেবক করিতে পারে—তাহা তো আমাদের যুগে স্বামী বিবেকানন্দ, মহাত্মাজী, নেতাজী প্রভৃতির জীবনেই প্রকট।

ডঃ বাসাম এদিকেও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন—ভারতে এখন মহাত্মাজীর মতো অধ্যাত্মজীবন-ভিত্তিক রাজনৈতিক নেতাদের প্রয়োজন। দেশনেতাদের জীবন আধ্যাত্মিকতা-ভিত্তিক হওয়া প্রয়োজন, ইহাই ভারতের চিরন্তন আদর্শ। কারণ, নেতাদের কথা নয়, তাঁহাদের জীবনই সমধিক প্রভাব বিস্তার করে সর্ব-সাধারণের জীবনাদর্শের উপর। আবার, আধ্যাত্মি-কতাই সর্ববিধ স্বার্থ পরিহার করিয়া দেশবাসীর কল্যাণকেই বড় করিয়া দেখিয়া জনগণের সেবায় দেশসেবকদের ব্রতী করাইতে পারে এবং জনগণের মধ্যে দেশসেবার ভাব সঞ্চারিত করাইতে পারে। আধুনিক ভারতে আদর্শনিষ্ঠ, যথার্থ দেশপ্রেমিক লোক খুব বেশী যে নাই, ইহা ড. বাসামেরও দৃষ্টি এড়ায় নাই—'ব্যক্তি-কেন্দ্রি-কতাই এখন বেড়ে যাচ্ছে, আদর্শবাদ খুব কম এখন স্বদেশকে বড় করতে চায়, দেশবাসীকে উন্নত করতে চায় এমন লোকের সংখ্যা খুবই কম।' 'ভারত যেভাবে এখন চলছে দেখে আমি খুবই উদ্বিগ্ন—যে কোন মূল্যে নিজের ও নিজ পরিবারের উন্নতিসাধনই জনসাধারণের ভাবকে যেভাবে প্রভাবিত করছে বলে প্রতীত, তাতে মনে হয় আমেরিকার চেয়েও সে বেশী ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে উঠতে পারে।' আধ্যাত্মিকতা-ভিত্তিক জীবনই নিজস্বতা বজায় রাখিয়া ভারতকে উন্নত করিবার একমাত্র পথ। এবং সে জীবন, পূর্বেই বলা হইয়াছে, আদর্শ ভারতীয় নেতাদের জীবন হইতেই জনমানসে সমধিক সঞ্চারিত হয়।

সেজন্য, কেবল রাজনীতিক ক্ষেত্রেই নয়, ছোট বড় সর্ববিধ দেশসেবার, জনসেবার প্রতিষ্ঠানের নেতাদেরও এ বিষয়ে দৃষ্টি সজাগ রাখা প্রয়োজন। আমরা 'ধর্মের' পরিবর্তে আধ্যাত্মিকতা কথাটি প্রয়োগ করিতেছি। কারণ, ধর্ম বলিতে জপ, পূজা, গির্জায় বা মসজিদে

প্রার্থনা প্রভৃতি ব্যক্তিগত ধর্মানুষ্ঠান, ইহজন্মে ব্যক্তিগত এবং রাষ্ট্র- ও সমাজ-গত কল্যাণ-সাধক নিয়ম, পরলোকে স্বর্গাদি লাভের জন্য কৃত কর্ম প্রভৃতি হইতে শুরু করিয়া আধ্যাত্মিকতা পর্যন্ত সবই বুঝায়। অতি বিস্তৃত ক্ষেত্রে শব্দটি প্রযুক্ত। তাছাড়া, আধুনিক কালে 'ধর্ম' বলিতে কতকগুলি ব্যক্তিগত বা সামাজিক আচারানুষ্ঠান ও নিয়মকানুনের কথাই সাধারণতঃ লোকে বুঝিয়া থাকে; কেহ কেহ আবার বোঝেন অন্য কোন ক্ষেত্রে প্রযুক্ত ইহার অর্থকে। আর সেই জন্যই সমাজ ও রাষ্ট্রের বহু কল্যাণকামী কল্যাণব্রতী লোকের নিকটও ধর্ম শব্দটিই যেন অসহ্য মনে হয়।

আধ্যাত্মিকতা-ভিত্তিক-জীবন, -রাষ্ট্র বা-সভ্যতা বলিলে ভাবটি যথাযথ বুঝা যাইবে। নিজসম্বন্ধীয় সত্য, মানুষ আসলে কি সেই সত্য-ভিত্তিক জীবনই আধ্যাত্মিকতা-ভিত্তিক জীবন। এই সত্যলাভের দিকে মানুষকে অগ্রসর করাইবার ব্যবস্থা যেখানে আছে, তাহাই আধ্যাত্মিকতা-ভিত্তিক সভ্যতা, সমাজ, রাষ্ট্র ইত্যাদি। এই আধ্যাত্মিকতালাভের উপায় হিসাবে যে কোন ধর্মই (হিন্দুধর্ম, মুসলমানধর্ম, খৃষ্টানধর্ম প্রভৃতি) অবলম্বিত হউক, তাহাতে কিছু আসে যায় না। সকল ধর্মেরই মূল কথা মানুষকে আধ্যাত্মিকতালাভের পথে, নিজ আনন্দময়,সর্ব-ভূতস্থ অমর স্বরূপ উপলব্ধির পথে অগ্রসর করানো। সকল ধর্মের আচরণেই নিয়মিত প্রার্থনা বা পূজা, জপ ধ্যান ইত্যাদির মাধ্যমে মনকে একাগ্র ও অন্তর্মুখী করার ব্যবস্থা আছে—যে অন্তর্মুখী মনই এই সত্যের সন্ধান পায়। ভারতীয় সমাজে স্বাভাবিকভাবে এই আচরণ ওতপ্রোত ছিল বলিয়াই, এখনো অনেকাংশে ব্যাহত হওয়া সত্ত্বেও উহা আছে বলিয়াই ভারতবাসীর 'স্বাভাবিক সুখ' এখনো আছে। একমাত্র ইহাই মানুষকে বাহিরের ভোগ্য বিষয় ছাড়াই অন্তর্নিহিত আনন্দের—নিজেরই আনন্দময় স্বরূপের সন্ধান দিতে পারে। সুখশান্তিলাভের ইহাই একমাত্র পথ—প্রয়োজনাতিরিক্ত ভোগ্যবস্তু, বিলাসসম্ভার ক্রমাগত অধিক পরিমাণে আহরণ করিবার জন্য ছোটা নয়, নিয়মিত আচরণের মাধ্যমে, অভ্যাসের মাধ্যমে মনকে সংযত ও একাগ্র করিতে শেখানো—আধ্যাত্মিকার পথে অগ্রসর হওয়া। 'ভারতীয় ধারায় জীবনযাপন' বলিতে এই সংযম ও একাগ্রতার নিয়মিত অভ্যাসই বোঝায়।

একমাত্র ভারতই জাগতিক উন্নতির সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার মিলন ঘটাইতে পারে, নিজে আদর্শ দেখাইয়া জগৎকে তাহাতে অনুপ্রাণিত করিতে পারে। করিবেও একদিন। বর্তমানে আমাদের করণীয় হইল, যত শীঘ্র সম্ভব সে আদর্শের রূপায়ণ। সমগ্র জগৎ যেদিন এই আদর্শের জন্য ভারতের কাছে আসিবে, সেদিন যেন তাহাদের রিক্ত হস্তে ফিরিতে না হয়। পূর্বেই বলিয়াছি, পুঁথিগত আদর্শ নয়, জীবনে রূপায়িত আদর্শ চাই।

জগন্মাতার বোধন

[গান : দরবারী কানাড়া, একতালা]

স্বামী চণ্ডিকানন্দ

মহাবিদ্যা শকতি রূপিণী
মা সারদামণি হলে কি এবার।
রামকৃষ্ণ তাই ষোড়শীরূপেতে
পূজিলা শ্রীপদযুগ তোমার ॥
দেবীর বেদীতে বসায়ে তোমায়
আপনা সঁপিলা তব রাঙ্গা পায়
জবাবিল্বদলে শ্রীপদ পূজিয়া
সমর্পিলা সব সাধনা তাঁর ॥
সর্বশক্তিময়ী "ত্রিপুরসুন্দরী"
মাকে আবাহন ক'রে
স্থাপিলা তোমার চিন্ময় দেহে
জীবকল্যাণ তরে।
বিশ্বজননী মুরতি তোমার
প্রকট করিলা যুগ অবতার
আমারো জীবনে প্রকাশ গো তুমি
দাও মা ভকতি প্রাণে আমার ॥

আবেদন

রামকৃষ্ণ মিশনের ত্রিপুরায় বন্যাসেবাকার্য

বন্যাকবলিত ত্রিপুরাবাসীদের অবর্ণনীয় দুর্দশার কথা জনসাধারণ অবগত আছেন। হাজার হাজার লোক গৃহহীন হইয়াছেন—কিছুসংখ্যক লোক মৃত্যুমুখেও পতিত হইয়াছেন। দুর্দশাগ্রস্ত নরনারীদের আশু প্রয়োজন—অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয় ও ঔষধপথ্যাদি।

রামকৃষ্ণ মিশন মহারাষ্ট্র ও গুজরাটে খরাত্রাণ এবং বাংলাদেশের আটটি কেন্দ্র মারফত ত্রাণকার্যে ব্যাপৃত থাকা সত্ত্বেও ত্রিপুরায় বন্যাত্রাণকার্য শুরু করার জন্য কর্মীদের প্রেরণ করিয়াছেন।

আমরা সহৃদয় দেশবাসীর নিকট বন্যাপীড়িত জনগণের দুঃখদুর্দশা লাঘবের নিমিত্ত মুক্তহস্তে অর্থ ও জিনিসপত্র দান করিবার জন্য আবেদন জানাইতেছি।

নিম্নলিখিত ঠিকানায় সকল প্রকার দান সাদরে গৃহীত হইবে এবং তাহার প্রাপ্তি-স্বীকার করা হইবে—

(১) রামকৃষ্ণ মিশন, বেলুড় মঠ ৭১১-২০২, জেলা—হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ

(২) অদ্বৈত আশ্রম, ৫, ডিহি ইন্টালী রোড, কলিকাতা ৭০০-০১৪

(৩) উদ্বোধন অফিস ১, উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৭০০- ০৩

(৪) রামকৃষ্ণ মিশন ইন্‌স্টিটিউট অব্ কালচার, গোলপার্ক, কলিকাতা ৭০০-০২৯

(৫) রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠান, ৯৯, শরৎ বসু রোড, কলিকাতা ৭০০-০২৬

স্বামী গম্ভীরানন্দ
সাধারণ সম্পাদক
রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন
পোঃ—বেলুড় মঠ ৭১১-২০২
হাওড়া

তারিখ, বেলুড় মঠ
২৬শে মে, ১৯৭৩

স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণীর মূলতত্ত্ব

স্বামী রঙ্গনাথানন্দ

যেমন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আলোচনা করতে গেলে স্বামী বিবেকানন্দের উল্লেখ ও আলোচনা অনিবার্য হয়ে পড়ে, তেমনই স্বামীজীর আলোচনাও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন-আলেখ্যের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। স্বামীজী এক আশ্চর্য শিষ্য ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ন্যায় গুরু ও স্বামীজীর ন্যায় শিষ্যের যখন মিলন হয় তখন এক অদ্ভুত ঘটনার সৃষ্টি হয় ইতিহাসে এই রকম ঘটনা যদিও একাধিকবার ঘটেছে, তথাপি শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের মিলন জগতে এক অভূতপূর্ব ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। তাঁদের মধ্যে পার্থক্য ছিল অনেক আকৃতিতে, শিক্ষায়, শক্তিতে ও মানসিকতায়। শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন প্রাচীনের প্রতিভূ, স্বামীজী ছিলেন নূতন যুগের প্রতিভূ, কিন্তু মূল বিষয়ে তাঁরা পরস্পরের বিরোধী তো ননই, বরং একজন আরেকজনের পরিপূরক। শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দকে গড়েছিলেন। স্বামীজী বলেছেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন এক অসাধারণ শিক্ষক। গুরুর কাছে সর্বোৎকৃষ্ট শিক্ষালাভ করে তিনি নিজেকে পূর্ণবিকশিত করেছিলেন। ব্যক্তিত্বের চরম বিকাশই শিক্ষার লক্ষ্য। শিক্ষা আমায় বিকশিত করুক, আলোকিত করুক, এই ছিল তাঁর শিক্ষা-জীবনের ধ্যান ধারণা। গুরু ও শিষ্যের মধ্যে এই যে মনের মিলন, এটি আমাদের প্রাচীন শিক্ষার আদর্শ।

স্বামীজী ছিলেন একদিকে প্রাচীন ও নব্য ভারতের সংযোগসেতু; আর একদিকে তিনি প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মাঝে সেতুবন্ধন করেছিলেন। নতুন ও পুরাতনের মধ্যে যে আদর্শের সংঘর্ষ, তা স্বামীজীর জীবনে অদ্ভুত সমন্বয় লাভ করেছিল। চিকাগো শহরে যখন তিনি উপস্থিত হন তখন তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ অপরিচিত, অবহেলিত ও উপেক্ষিত। কিন্তু সেখানকার ধর্মমহাসভায় তাঁর আবির্ভাব একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা যাকে বিস্ফোরণই বলা চলে। এর ঠিক আগের ভারতের ইতিহাস অবমাননার ইতিহাস, লাঞ্ছনার ইতিহাস। আমরা ইতিহাসের ক্রীড়নক হয়ে পড়েছিলাম। তাই ধর্মমহাসভায় স্বামীজীর আবির্ভাবের পর ভারতের ইতিহাসে এক নবযুগের সূচনা হলো। আমাদের সংস্কৃতি তখন এক বিদেশী এবং শক্তিশালী জাতির সংস্কৃতির চাপে পড়ে নিজের শক্তিকে হারিয়ে ফেলেছিল। কিন্তু স্বামীজীর আবির্ভাবের পর ভারতীয় সংস্কৃতি নতুন আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। সেই আলোকের দ্যুতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লো, সম্প্রসারিত হলো। এই সম্প্রসারণ এখনও সক্রিয়। তার স্রোত এখনও প্রবহমান। স্বামীজী আমাদের অবরুদ্ধ জীবনে নবচেতনার সৃষ্টি করেছেন। তাঁর জীবন ও ব্যক্তিত্বের গঠন ও বিকাশ আজকের ছাত্রছাত্রীরা যত ভালো করে বুঝতে পারবে ততই তাদের মঙ্গল হবে। স্বামীজীর জীবন ও বাণীর মধ্যে মানুষ ও জাতি-গঠনের এক সুদৃঢ় প্রত্যয় নিহিত আছে। তিনি যা আমাদের দিয়ে গেছেন তা এক অমূল্য সাংস্কৃতিক ঐশ্বর্য। আমাদের জাতীয় জীবনে তাঁর স্থান ও প্রভাবের ব্যাখ্যা একটি বক্তৃতায় সম্ভব নয়। তাঁর জীবনবেদের কেন্দ্রীভূত বিষয় হলো মানুষ। তিনি মানুষের সমস্যা নিয়েই আলোচনা করেছিলেন। মানুষই ছিল তাঁর বাণীর মূল বক্তব্য। কন্যাকুমারীতে তিনি দীর্ঘকাল ধ্যানে মগ্ন ছিলেন। ধ্যানে যে উপলব্ধি তিনি লাভ করেছিলেন ও দেশবাসীকে পরে জানিয়েছিলেন তার বিষয়বস্তু ছিল মানুষ। মানুষই ছিল তাঁর কর্মময় জীবন ও গভীর চিন্তনের মূল প্রতিপাদ্য। উপনিষদের মতে

মানুষ এক দৈবীশক্তিসম্পন্ন প্রাণী। অন্য কোন শাস্ত্রে বা সাহিত্যে এমন সুন্দর কথা পাওয়া যাবে না। মানুষের আত্মা ঐশ্বর্যময়—এই হলো স্বামীজীর বাণীর একটা দিক। দ্বিতীয় দিক হলো তাঁর ভারতকে জানার, অনুসন্ধান করার প্রয়াস। তাই তিনি পরিব্রাজকরূপে ভারত পরিভ্রমণ করেছিলেন। পরিভ্রমণের শেষে মানুষের অপরিসীম দুঃখ কষ্ট দেখে তিনি দুঃখে অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। তারপর নিজের আধ্যাত্মিক উপলব্ধির দ্বারা তিনি যে শিক্ষা আমাদের দিলেন তা আজকের দিনে অতি মূল্যবান।

চিকাগোতে তিনি ভারতের আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য ও অবিনশ্বর আত্মার কথা সকলের সমক্ষে উপস্থাপিত করেছিলেন। পাশ্চাত্য দেশ থেকে প্রত্যাবর্তনের পরে দেশের নানা প্রান্তে তিনি যে সব বক্তৃতা প্রদান করেন তা দেশের এক অমূল্য সম্পদ। ভারতের মুক্তি-আন্দোলন ও জাতিগঠন-কার্যকে কিভাবে তাঁর বাণী প্রভাবিত করেছিল তা এখন ঐতিহাসিক ঘটনা। তিনি বললেন যে, প্রতীচ্যের যা কিছু উৎকৃষ্ট ও প্রাচ্যের যা কিছু উৎকৃষ্ট তা সব নিয়ে সেগুলিকে সমন্বিত করে আমাদের দেশকে, জাতিকে নতুনভাবে গড়তে হবে। যুগ যুগ ধরে সাধারণ মানুষ যেভাবে অত্যাচারিত হয়েছে তা বন্ধ করতে হবে। স্বামীজী ছিলেন এক প্রকৃত দেশপ্রেমিক। বিখ্যাত ফরাসী মনীষী ও স্বামীজীর জীবনীকার স্বামীজীর বক্তৃতাগুলিকে জার্মানদেশের প্রখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী বেঠোফেন ও হাণ্ডেলের সিমফানি (Symphony)-র মতো মধুর সঙ্গীতময় বলেছেন, সঙ্গীতের মধুর সুরে তা ঝঙ্কৃত। আজকের দিনে দেশের শিক্ষাব্যবস্থার আমূল সংস্কার করা যাবে যদি এই শিক্ষাকে তাঁর বাণী ও আদর্শে নতুনভাবে আমরা রূপায়িত করি।

স্বামীজী প্রশ্ন করেছেন যে, বহু-শতাব্দী ধরে আমরা কি করেছি?—আমাদের সমাজ মানুষের ব্যক্তিত্বকে ধ্বংস করেছে। আমাদের দর্শনে, সংস্কৃতিতে যে শক্তি রয়েছে তাকে সমাজগঠনে প্রয়োগ করতে হবে। তাই স্বামীজী ছিলেন **practical Vedantist**—ব্যবহারিক বৈদান্তিক। মানুষের সুসমঞ্জস—সমন্বিত—ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলাই হলো তাঁর বাণীর মূল সুর। উপনিষদেরও এই ছিল শাশ্বত বাণী। স্বামীজী বললেন যে, আমরা দুর্বল হয়ে পড়েছি। কুসংস্কার ও লোকাচারকে ধর্ম বলে গ্রহণ করেছি। এই দৃষ্টির আশু পরিবর্তন প্রয়োজন। জনকল্যাণের মাধ্যমে নিজের মুক্তি লাভ করতে হবে। আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ—এই ছিল স্বামীজীর ধর্মজীবনের মূল মন্ত্র। আধুনিক কালে এই বাণীকে উজ্জীবিত করতে হবে। নিপীড়িত জনতাকে তুলে ধরতে হবে, তাদের ব্যক্তিত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তা করতে পারলে এই দেশের উন্নতির এক নতুন সোপান রচিত হবে। সবচেয়ে পরিতাপের বিষয় যে, ভারতের নানা প্রান্তের জনসমাজ এই প্রেরণাপূর্ণ বাণীর সম্বন্ধে অজ্ঞ। জাতিগঠনের কথা সারা দেশে প্রচার কর, দেশের সুপ্ত চেতনা জেগে উঠবে তাহলে। নতুন শক্তি উদ্বুদ্ধ হবে যা আমাদের দেশের সম্মান ও গৌরব সারা বিশ্বে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবে। এই অমূল্য ঐতিহ্য প্রাচীন হলেও নতুন। এই প্রাচীন ও নতুনের সমন্বয় ঘটিয়ে শুরু হোক মানবজীবনের জয়যাত্রা—এই ছিল স্বামীজীর শাশ্বত বাণী ও জীবনের মূলতত্ত্ব।*

---

* পাটনা রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সুবর্ণজয়ন্তী উৎসবে ইংরেজীতে প্রদত্ত ভাষণ হইতে ডক্টর বিমলেশ দে (পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়) কর্তৃক সংকলিত ও বাংলায় অনূদিত।

কর্মফল

[পূর্বানুবৃত্তি]

স্বামী ধ্যানানন্দ

পুরাণ : শ্রীমদ্ভাগবত ঃ

(১) প্রথমেই প্রায়শ্চিত্তের কথার উল্লেখ করছি। প্রবন্ধের কলেবরবৃদ্ধির ভয়ে ভাগবতের মূল শ্লোকগুলির অথবা শ্রীধর স্বামীর টীকার মূলের উদ্ধৃতি দিব না। আলোচ্য বিষয়টির বিশেষ প্রয়োজনীয় কথাগুলি এই :—

(ক) মন্বাদি স্মৃতিতে উক্ত প্রায়শ্চিত্তের ফলে পাপ কেটে যায়। কিন্তু তারপরেও মানুষ পাপ করে। সুতরাং ঐ সব প্রায়শ্চিত্ত ঐকান্তিক নয়। ওতে পাপ সমূলে বিনষ্ট হয় না—পাপের সংস্কার যায় না। তাছাড়া ওগুলি অত্যন্ত কষ্টসাধ্য (৬।২।১২, ৬।২।৯ টীকা)।

(খ) ভগবানের নাম একবার মাত্র করলেই পাপটি কেটে যায়। এর চেয়ে সহজসাধ্য উপায় আর কি থাকতে পারে? (৬।২।৭ টীকা)।

(গ) তবে ভগবানের নাম একবারমাত্র করলেই পাপের সংস্কার যায় না। পাপকে একেবারে নির্মূল করতে হলে, পাপের সংস্কার দূর করতে হলে, অনুক্ষণ নামজপ চালিয়ে যেতে হবে। যেমন, একটি অন্ধকার ঘরে প্রদীপ আনবামাত্রই ঘরটি আলোকিত হয়ে যায়, কিন্তু প্রদীপটি সরিয়ে নিলেই ঘরটি আবার অন্ধকার হয়ে যায়; তাই প্রদীপটি সরাতে নেই, সর্বক্ষণ রেখে দিতে হয় (৬।২।১৭)।

(ঘ) ভগবানের নামে কেবলমাত্র প্রায়শ্চিত্তই হয় না, মোক্ষেরও দ্বার উন্মোচিত হয় (৬।২।৭ টীকা)।

(ঙ) অনেকের সংশয় হয়, স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত প্রায়শ্চিত্ত ও ভগবানের নাম এই দুই-ই একসঙ্গে করতে হবে কিনা। ভাগবতের মত—না, ভগবানের নামজপের অতিরিক্ত আর কিছুরই দরকার নেই (৬।২।৮ ও ৬।৩।২৪টীকা)।

(চ) তবে যাদের ভগবানে ভক্তি নেই এবং সেই জন্য যারা সকাম, তারাই স্মৃতির বিধান অনুসারে প্রায়শ্চিত্তাদি কর্ম করে থাকে। তা কিন্তু হস্তি-স্নানেই* পর্যবসিত হয় (৬।৩।৩৩)।

এইভাবে শ্রীমদ্ভাগবত দেখিয়েছেন যে, স্মার্ত প্রায়শ্চিত্তরূপ কর্মের ফল ও শ্রীভগবানের নামজপরূপ কর্মের ফল—এ দু'য়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাত।

(২) নন্দের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি :—

প্রাণী কর্মবশেই জন্মগ্রহণ করে, কর্মবশেই লয় পায় এবং কর্মবশেই সুখ, দুঃখ, ভয় ও মঙ্গল লাভ করে থাকে। আর, যদি কর্মের ফলদাতা একজন ঈশ্বরই থাকেন, তা'হলে তিনিও কর্মকর্তা-কেই ভজনা করেন, কারণ, যে কর্ম না করে, তাকে তিনি ফল দিতে পারেন না। সুতরাং জীবগণকে যখন কর্মেরই অনুবর্তন করতে হচ্ছে, তখন তাদের ইন্দ্রে আবার প্রয়োজন কি? স্বভাব অনুসারে অর্থাৎ পূর্ব পূর্ব জন্মে কৃত কর্মের ফলে যে সংস্কার হয় সেই অনুসারে মানুষের ভাগ্যে যা বিহিত হয়েছে, ইন্দ্র কখনই তার অন্যথা করতে পারেন না। মানুষ স্বভাবেরই অধীন, স্বভাবেরই অনুসরণ করে থাকে। দেবতা, অসুর ও মানুষ সকলেই স্বভাবে অবস্থিত। জীব কর্মবশে উচ্চ-নীচ দেহলাভ করে এবং কর্মবশেই তা পরিত্যাগ করে থাকে। কর্মবশেই শত্রু, মিত্র বা উদাসীন

---

* স্নান করিয়ে দেবার পর হস্তীর দেহ পরিষ্কার হয়, কিন্তু কিছু পরেই সে আবার তা ধূলিমলিন করে ফেলে।

হতে দেখা যায়। সুতরাং কর্মই ঈশ্বর। অতএব স্বভাবতন্ত্র, স্বকর্মকারী জীবের কর্মেরই সম্যক্‌রূপে পূজা করা উচিত। যথার্থতঃ যার দ্বারা জীবিত থাকা যায়, সেই কর্মই জীবের দেবতা (১০।২৪ ১৩-১৮)।

নির্দেশিকা: ৩।২৪।২৮, ৩।২৭।৩, ৩।২৮।৩৮, ৩।৩০-৩২, ৪।২৯।৫৪, ৫।১২।১৪-১৫, ৬।১।১৫-১৬, ৬।২।১০-১১, ৬।১১।২৭, ৬।১৬।২৪, ৭।১।৩৫--৩৮, ১০।১।৩৯-৪০, ১০।৪।২১, ১০।৪৭।৬৭, ১১।১৪।১৯

দেবীভাগবত:

এই পুরাণের চতুর্থ স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ের নাম, 'কর্মফলপ্রাধান্যবর্ণন'। এতে মোট ৬০টি শ্লোক আছে। সঞ্চিত, ভবিষ্য ও প্রারব্ধ—এই তিন রকমের কর্ম প্রতি জীবদেহে বর্তমান থাকে —'সঞ্চিতানি ভবিষ্যাণি প্রারব্ধানি তথা পুনঃ। বর্তমানানি দেহেঽস্মিং স্ত্রৈবিধ্যং কর্মণাং কিল॥' (৪।২।৭) ভবিষ্য কর্মেরই অপর নাম আগামিকর্ম', 'ক্রিয়মাণ কর্ম বা বর্তমান কর্ম'। বলা হয়েছে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি সকলেই কর্মাধীন। তাঁদের জন্ম, মৃত্যু, সুখ-দুঃখাদির ভোগ সবই কর্মের ফলে। ব্যাসদেব বলছেন রাজা জনমেজয়কে—

ব্রহ্মাদীনাং চ সর্বেষাং তদ্বশত্বং নরাধিপ।
সুখদুঃখজরামৃত্যুহর্ষশোকাদয়স্তথা॥
কামক্রোধৌ চ লোভশ্চ সর্বে দেহগতা গুণাঃ।
দৈবাধীনাশ্চ সর্বেষাং প্রভবন্তি নরাধিপ॥
(৪।২।৮-৯)

নীলকণ্ঠের টীকায় আছে—'দৈবাধীনাঃ কর্মাধীনাঃ ইত্যর্থঃ'। 'যদ্যপি ব্রহ্মাদয়ঃ ঈশ্বরাঃ সন্তি, তথাপি তে কর্মণা এব ঈশ্বরা জাতাঃ ইতি কর্মবশ্যত্বং তেষাম্ অস্তি এব'। দৈবাধীন মানে কর্মাধীন। যদিও ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব—এঁরা ঈশ্বর, তবু কর্মের দ্বারাই তাঁরা ঈশ্বর হয়েছেন, সুতরাং তাঁদের কর্মাধীনত্ব অবশ্যই আছে।

সর্বথৈব নৃপশ্রেষ্ঠ! সর্বে ব্রহ্মাদয়ঃ সুরাঃ।
কৃতকর্মবিপাকেন প্রাপ্নুবন্তি সুখাসুখে॥
অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম শুভাশুভম্।
দেহবদ্ভি র্নৃভি র্দেবৈ স্তির্যগ্‌ভিশ্চ নৃপোত্তম॥
(৪।২।৩৩-৩৪)

হে মহারাজ, ব্রহ্মাদি দেবগণ সর্বপ্রকারেই কৃতকর্মের ফলে সুখ-দুঃখ ভোগ করেন। কি পশুপক্ষী, কি মানুষ, কি দেবতা—সকল দেহধারী প্রাণীকেই তাদের কৃত শুভাশুভ কর্মের ফল অবশ্যই ভোগ করতে হয়।

কশ্যপস্য মুনেরংশো বসুদেবঃ প্রতাপবান্।
গোবৃত্তিরভবদ্ রাজন্! পূর্বশাপানুভাবতঃ॥
(৪।২।৪১)

হে রাজন্! কশ্যপমুনির অংশোৎপন্ন, প্রভাব-সম্পন্ন বসুদেব পূর্ব শাপহেতু জন্মগ্রহণ ক'রে পশুপালন বৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করেন। এর টীকায় নীলকণ্ঠ লিখছেন—'যদা হিরণ্যগর্ভস্যাপি কর্ম-বদ্ধত্বং তদা তদবতারেষু হরিব্রহ্মাদিষু, তদবতারা-বতারেষু রামকৃষ্ণাদিষু কর্মবদ্ধত্বে কা কথা'। অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভই যখন কর্মাধীন, তখন তাঁর অবতার ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব এবং তাঁদের অবতার রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি যে কর্মাধীন হবেন, এতে আর কথা কি!

৪।২।৫৬-৬০ শ্লোকে বলা হয়েছে—রাম যে বনবাস, সীতাহরণ ও সংগ্রামাদি দুঃখভোগ করলেন এবং কৃষ্ণ যে কারাগারে জন্ম, অতিকষ্টে দ্বারকায় পলায়ন ইত্যাদি সংসারদুঃখ ভোগ করলেন, তা নিশ্চয়ই স্বেচ্ছায় নয়, কিন্তু কর্মাধীন হয়েই—'ন হি এতৎ স্বেচ্ছয়া কশ্চিৎ করোতি, কিন্তু অন্যাধীনতয়া এব ইতি' (নীলকণ্ঠ)।

ষষ্ঠ স্কন্ধের দশম অধ্যায়ের নাম, 'কর্ম-স্বরূপ-বর্ণন'। এতে ৪১টি শ্লোক আছে। সঞ্চিত, প্রারব্ধ ও ক্রিয়মাণ কর্মের কথা বিস্তারিত বলা

হয়েছে। পূর্ব পূর্ব অনেক জন্মে কৃত কর্মকে সঞ্চিত কর্ম বলে (৬।১০।১০)। সেই সঞ্চিত কর্মের মধ্য থেকে কিছু অংশ নিয়ে কাল দেহারম্ভের জন্য প্রেরণ করেন। ঐ অংশটিকেই প্রারব্ধ কর্ম বলা হয় যার ফলে বর্তমান দেহ হয় (৬।১০।১৩-১৪)। ক্রিয়মাণ কর্মকেই বর্তমান কর্ম বলা হয় (৬।১০।১২)। এই ত্রিবিধ কর্মের কথা দেবীভাগবতে বারংবার পাওয়া যায়—৩।২০।৩৬-৩৭ দ্রষ্টব্য। ৪।২-এরই পুনরাবৃত্তি করে ৬।১০-এ আবার বলা হয়েছে নর ও নারায়ণ, কৃষ্ণ ও অর্জুন প্রভৃতি সকলেই—কর্মাধীন হয়ে জন্ম, মৃত্যু, সুখদুঃখাদি ভোগ করেন।

এখানে এই মন্তব্য করা দরকার যে শ্রীমদ্‌ভাগবত বা গীতাতে আমরা অন্য রকমের কথা পাই। ভাগবতে কুন্তীস্তব (১।৮।৩০), ইন্দ্রস্তব (১০।২৭।৬) ইত্যাদি বহু স্থলেই বলা হয়েছে যে, অবতারের দেহধারণ স্বেচ্ছায়—কর্মবশে নয়। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ নিজমুখেই পরিষ্কার বলেছেন—'অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা···ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন' (৪।৬-৯)। এই ৪টি শ্লোক অতি প্রসিদ্ধ, তাই এর অনুবাদ দেওয়া হ'ল না। ভগবান মায়াধীশ, তিনি জীবের ন্যায় মায়াধীন ন'ন। তিনি মায়াকে বশে রেখেই স্বেচ্ছায় অবতীর্ণ হ'ন। তাঁর জন্ম, কর্ম দিব্য; কর্মবশে তাঁর জন্মাদি নয়। অদ্বৈতবাদী শংকরও গীতাভাষ্যের মুখবন্ধেই এ কথা স্বীকার করেছেন। যাই হোক্ কর্মবাদ নিয়ে একটু মাত্রাধিক্য করলেও এই পুরাণে কর্মফল সম্বন্ধে অনেক সুন্দর সুন্দর শ্লোক পাওয়া যায়—

স্বকর্মফলযোগেন প্রাপ্য দুঃখমচেতনঃ।
নিমিত্তকারণে বৈরং করোত্যল্পমতিঃ কিল ॥
(৩।২০।৪৪)

অর্থাৎ অল্পমতি, মূঢ় ব্যক্তি নিজ কর্মফলেই দুঃখ পেয়েও, দুঃখের নিমিত্তকারণের সঙ্গে শক্রতা করে।

৪।২১ অধ্যায়ে দেবকী ও বসুদেবের কথোপকথনে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে, যদিও এর মূল কথা হ'ল, জীবনে সত্যকে আঁকড়ে চলা। তার সার-সংক্ষেপ দেওয়া হচ্ছে :—

বসুদেব ও দেবকীর প্রথম সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে পূর্বপ্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বসুদেব দেবকীকে বললেন—'স্বকৃত শুভাশুভ কর্মের ফল ভোগ করতেই হবে। প্রারব্ধ বিধির বিধান। তাই প্রারব্ধকর্মাধীন হয়েই আমি তোমাকে বলছি এই শিশুকে কংসের হাতে সমর্পণ করো।' দেবকীর উত্তর 'মানুষকে অবশ্যই পূর্বকৃত কর্মের ফল ভোগ করতে হয়। কিন্তু তা' ব'লে কি তীর্থবাস, তপস্যা অথবা দান দ্বারা সে পাপ ধ্বংস হয় না? ধর্মশাস্ত্রে তো পূর্বার্জিত পাপের বিনাশের জন্য প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হয়েছে। ধর্মশাস্ত্র-প্রবর্তক মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি তত্ত্বদর্শী মুনিরা কি তাহলে মিথ্যা কথা বলেছেন? যা ভবিতব্য তা অবশ্যই হবে, এই যদি নিশ্চিত হয় তাহলে আয়ুর্বেদ ও মন্ত্রাদি সব মিথ্যা হয়ে যায়। যদি সমস্ত কার্যই প্রারব্ধাধীন হয়, তবে কোনও উদ্যমে কোন ফললাভ হয় না; অগ্নিষ্টোমাদি স্বর্গসাধক যজ্ঞসকল নিরর্থক হয়ে যায়; বেদেরও প্রামাণ্য থাকে না। যখন উদ্যম করলেই ফলসিদ্ধি প্রত্যক্ষ দেখা যায়, তখন বিচারপূর্বক কিছু করাই উচিত, যাতে এই সদ্যোজাত শিশুর মঙ্গল হয়। মনীষীরা বলে থাকেন, জীবের প্রাণরক্ষাদি শুভ কাজ করতে মিথ্যা বললেও কোন দোষ হয় না (৪।২১।৭-১৭)।

বসুদেবের উত্তর—'উদ্যম মানুষের কর্তব্য বটে, কিন্তু ফল দৈবের অধীন। প্রারব্ধ দৈবেরই নামান্তর। ফলসিদ্ধির প্রতি সেই প্রারব্ধই মুখ্য কারণ, উদ্যম তার সহায়ভূত। পুরাণ ও আগমশাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, সংসারে ত্রিবিধ কর্ম

আছে : সঞ্চিত, প্রারব্ধ ও বর্তমান। বহুজন্মকৃত যে শুভাশুভ কর্ম তা বীজস্বরূপ সকল সময়েই অবস্থিত থাকে; সেই কর্মের বশবর্তী হয়েই জীবেরা পূর্বদেহ ত্যাগ করে স্বর্গ বা নরক ভোগ করে এবং ভোগান্তে যখন পুনরায় দেহধারণের সময় উপস্থিত হয়, তখন পরমেশ্বর সঞ্চিত কর্মসমূহ থেকে প্রারব্ধ কর্মসমূহ পৃথক্ করে ঐ জীবে যোজিত করেন। অতএব প্রারব্ধ কর্মফল অবশ্যই ভোগ করতে হয়। প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা শুধু বর্তমান কর্মই বিনষ্ট হয়। অতএব কংসরাজাকে তোমার এই কুমারকে অবশ্যই অর্পণ করতে হবে। দেবকি! এই অসার সংসারে ধর্মই একমাত্র সার বস্তু; আমি তো কখনও মিথ্যা উক্তি করি না। সকলেরই জন্ম ও মরণ প্রারব্ধের অধীন, সুতরাং শোক করা বৃথা। যার সত্য চলে যায়, তার জীবনই বৃথা। অতএব শিশুটিকে দাও, আমি কংসকে দিয়ে আসি। সত্যরক্ষার ফলে আমাদের মঙ্গলই হবে (৪।২১।১৮-৩৩)।

নির্দেশিকা : ৩।২০।৩৫-৪৭, ৯।২৭।১৬-২৫

পুরাণ (প্রকীর্ণ) : বিষ্ণুপুরাণ :

প্রায়শ্চিত্তান্যশেষাণি তপঃকর্মাত্মকানি চ।
যানি তেষামশেষানাং কৃষ্ণানুস্মরণং পরম্॥
(২।৬।৩৫)[৫]

অর্থাৎ তপস্যাত্মক ও কর্মাত্মক যে অশেষপ্রকার প্রায়শ্চিত্ত আছে, তার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের অনুস্মরণই শ্রেষ্ঠ প্রায়প্রিত্ত।

শ্রীধর স্বামীর টীকায় আছে, যাদের ভগবানের নামে বিশ্বাস নেই তাদেরই জন্য স্মার্ত প্রায়শ্চিত্ত।

মৃতস্য চ পুনর্জন্ম ভবত্যেতচ্চ নান্যথা।
আগমোঽয়ং তথা যচ্চ নোপাদানং বিনোদ্ভবঃ॥
(১।১৭।৫৮)

অর্থাৎ মৃতের পুনর্জন্ম হয়, এর অন্যথা নেই। শ্রুতি ও স্মৃতিতে আছে যে, উপাদান বিনা উৎপত্তি হয় না। তাৎপর্য এই যে পূর্বজন্মে কৃত শুভাশুভ কর্মরূপ কারণ না থাকলে বর্তমান জন্ম সিদ্ধ হয় না, এবং বর্তমান জন্মে যখন শুভাশুভ কর্ম করা হচ্ছে, তখন তার ফলে অবশ্যই পুনর্জন্ম হবে।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ :

মা ভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম কল্পকোটিশতৈরপি।
অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম শুভাশুভম্॥
(৪।৮৫।৩৬)

অর্থাৎ কর্মের ফল ভোগ না করলে শতকোটি কল্পেও কর্মক্ষয় হয় না। শুভাশুভ কৃত কর্মের ফল অবশ্যই ভোগ করতে হয়।

এই ৮৫-তম অধ্যায়ে নিষিদ্ধ কর্মের ফলে নরকাদিতে দুঃখপ্রাপ্তি, বিবিধ অশুভ যোনিতে জন্ম ও এসবের প্রতিকারের জন্য বিভিন্ন প্রায়শ্চিত্তের কথা বলা হয়েছে।

গরুড়পুরাণ :

দানাদ্ ভোগমবাপ্নোতি সৌখ্যং তীর্থস্য সেবনাৎ।
সুভাষণাদ্ মৃতো যস্তু স বিদ্বান্ ধর্মবিত্তমঃ॥
(২।২৪।৪২)

অর্থাৎ ইহজন্মে দানী, তীর্থসেবী ও মিষ্টভাষী হলে, পরজন্মে যথাক্রমে ধনী, সুখী এবং বিদ্বান্ ও শ্রেষ্ঠ ধর্মজ্ঞ হওয়া যায়।

বিবিধ অশুভ কর্মের ফলাদি বর্ণিত হয়েছে ১।২২৯ অধ্যায়ে ও উত্তরখণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়ে।

বরাহপুরাণ :

পাপের ফল নিয়ে অনেক আলোচনা করা হয়েছে। এখন পুণ্যের ফল সম্বন্ধে কিছু আলোচনা প্রীতিকর হবে—

---

[৫] শ্লোকসংখ্যা পঞ্চানন তর্করত্ন-সম্পাদিত সংস্করণ অনুযায়ী। অন্যবিধ উল্লেখ না থাকলে এই প্রকীর্ণাংশে সর্বত্র শ্লোকসংখ্যা এই সংস্করণ অনুযায়ী বুঝে নিতে হবে।

'তপস্যার দ্বারাই স্বর্গ, যশঃ, দীর্ঘ আয়ু, জ্ঞান ও বিজ্ঞান, আরোগ্য, রূপ, সৌভাগ্য ও সম্পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। শুধু মনে মনে কল্পনা করলেই এ সব পাওয়া যায় না। পবিত্র মৌনব্রতের দ্বারাই প্রভুত্ব, দানের ফলে বিবিধ ভোগ, ব্রহ্মচর্যের ফলে দীর্ঘ জীবন, অহিংসার দ্বারা পরম রূপ, দীক্ষার দ্বারা পবিত্র বংশে জন্ম, ফলমূল-আহারে রাজ্য এবং পর্ণাহারে স্বর্গ প্রাপ্তি হয়' (২০৭।৩৬-৩৯)।

মার্কণ্ডেয় পুরাণ :

এই পুরাণের চতুর্দশ ও পঞ্চদশ অধ্যায়ে কর্ম ও কর্মফল সম্বন্ধে অনেক তথ্য আছে। অন্যান্য অধ্যায়েও ঐ বিষয়ে কিছু কিছু শ্লোক পাওয়া যায়।

'যেখানে সর্বভূতে দয়া, সংকথন, পারলৌকিক মঙ্গলকামনায় শুভ কর্মের অনুষ্ঠান, সত্য, ভূতগণের হিতার্থে বাক্যপ্রয়োগ, বেদের প্রামাণ্যের স্বীকৃতি, গুরু, দেবতা, ঋষি ও সিদ্ধগণের পূজা, সৎ কাজ, মৈত্রী এবং এই জাতীয় অন্যান্য ধার্মিক ও পুণ্যানুষ্ঠান দেখা যায়, সেইখানেই বুঝতে হবে যে, স্বর্গভোগান্তে এই পৃথিবীতে জন্ম হয়েছে' (১৫।৪৩-৪৫)।[৬]

তন্ত্রশাস্ত্র : কুলার্ণবতন্ত্র :

'দেহধারী ব্যক্তির পক্ষে সর্বকর্ম সম্যক্‌রূপে পরিত্যাগ করা সম্ভব নয়। সুতরাং যিনি কর্মফল ত্যাগ করেন, তাঁকেই ত্যাগী বলা হয়। ইন্দ্রিয়-নিজ নিজ কাজ করে চলেছে, এই রকম ভাবনা করবে। 'আমি কর্তা'—এই ভাব ত্যাগ করে যিনি কর্ম করেন, তিনি কর্মে লিপ্ত হন না। জ্ঞানপ্রাপ্তির পরে ক্রিয়মাণ কর্মসমূহের ফল তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিকে স্পর্শ করে না—ঠিক যেমন পদ্মপত্রে জল সংলগ্ন থাকে না। জ্ঞানীর জ্ঞানের পূর্বে কৃত পাপ-পুণ্য কর্মসমূহ সম্যক্‌রূপে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং ক্রিয়মাণ কর্ম তাঁকে লিপ্ত করতে পারে না। বিদ্বান্ ব্যক্তিই সর্বকর্ম পরিত্যাগ করতে সমর্থ। অতত্ত্বজ্ঞেরা যদি কর্মকাণ্ড বৃথা পরিত্যাগ করে, তাহলে তার ফলে তাদের নরকপ্রাপ্তি ঘটবে। বসন্ত ঋতুতে যেমন গাছ থেকে পাতা আপনি খসে পড়ে, যোগী ব্যক্তিরও সেইভাবেই কর্মত্যাগ হয়ে থাকে। যাঁরা হৃদয়স্থ ব্রহ্মকে লাভ করেছেন, তাঁদের অযুত অশ্বমেধ যজ্ঞের পুণ্য বা অযুত ব্রহ্মহত্যার পাপ স্পর্শ করতে পারে না।' (নবম উল্লাস)।

মহানির্বাণতন্ত্র :

'দেহধারী মানুষেরা কর্মব্যতিরেকে ক্ষণার্ধও থাকতে পারে না; অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিবশ হয়ে তারা কর্মরূপ বায়ুকর্তৃক আকৃষ্ট হয়। কর্মফলে তারা সুখভোগ করে, কর্মফলেই দুঃখভোগ করে এবং তাদের জন্ম ও মৃত্যু কর্মফলেই হয়ে থাকে। যেহেতু কর্ম শুভ ও অশুভ এই দু'রকমের এবং অশুভ কর্মের ফলে প্রাণীরা তীব্র যাতনা ভোগ করে থাকে, সেই হেতু সাধনসমন্বিত নানা রকমের কর্ম অল্পবুদ্ধি লোকদের জন্য তন্ত্রে বলা হয়েছে, যাতে নিষিদ্ধ কর্ম থেকে নিবৃত্ত হয়ে তারা সৎকর্মে প্রবৃত্ত হতে পারে। হে দেবি! যাদের চিত্ত কর্মফলে আসক্ত, তারা এমনকি শুভ কর্ম ক'রেও, কর্মশৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে পরলোক ও ইহলোকে গমনাগমন করে। যতদিন পর্যন্ত না শুভ ও অশুভ কর্মের ক্ষয় হয়, ততদিন শত কল্পেও মানুষের মুক্তি হয় না। অশুভ কর্ম লৌহময় পাশ, শুভকর্ম স্বর্ণময় পাশ—উভয়েরই দ্বারা জীব আবদ্ধ থাকে। সর্বদা কর্ম ক'রেও, শত কষ্ট স্বীকার ক'রেও, মানুষের মুক্তি হয় না, যত দিন না তার জ্ঞানলাভ

---

৬ মহেশচন্দ্র পাল-সম্পাদিত সংস্করণ অনুসারে মূল শ্লোক ও Pargiter-এর সংস্করণ অনুযায়ী শ্লোকসংখ্যা গৃহীত হয়েছে। মহেশচন্দ্রের সংস্করণে কোনও শ্লোকের সংখ্যা দেওয়া নাই।

হয়। যাঁরা নির্মলস্বভাব ও পরোক্ষজ্ঞানী তাঁরাই নিষ্কাম কর্ম ও তত্ত্ববিচারের ফলে অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ করেন। ব্রহ্মাদি তৃণ পর্যন্ত এই জগৎ মায়াদ্বারা কল্পিত, পরব্রহ্মই একমাত্র সত্য, এই জ্ঞান হলেই সুখী হওয়া যায়। নাম-রূপ মিথ্যা জেনে নিশ্চল, নিত্য ব্রহ্মতত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হলেই মানুষ কর্মফলের হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভ করে (১৪।১০৪-১১৪)।

আয়ুর্বেদ : চরকসংহিতা :

এযুগে আমরা ডাক্তারী বইতে দার্শনিক তত্ত্বের বিচার নিশ্চয়ই আশা করব না। কিন্তু আমাদের প্রাচীন আয়ুর্বেদশাস্ত্রে দার্শনিক তত্ত্বের প্রচুর আলোচনা দেখা যায়—জীব, ঈশ্বর, কাল, কর্ম, কিছুই বাদ যায়নি। চরকসংহিতার বিমান-স্থানের তৃতীয় অধ্যায়ের ৩৪-৪০ শ্লোকে এবং ৪১-সংখ্যক গদ্যাংশে, মানুষের আয়ু নির্ধারিত কিনা, এই প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি আত্রেয় বলছেন—'দৈব হচ্ছে জীবের পূর্বদেহে কৃত কর্ম ; পুরুষকার হচ্ছে তারই বর্তমান দেহে কৃত কর্ম। অর্থাৎ প্রথমটি 'প্রারব্ধ' এবং দ্বিতীয়টি 'ক্রিয়মাণ' কর্ম। প্রবল পুরুষকার দুর্বল দৈবকে অভিভূত করে ; প্রবল দৈব দুর্বল পুরুষকারকে অভিভূত করে। সুতরাং মানুষের আয়ু নির্দিষ্ট নয়। আয়ুর ন্যূনাধিক্য হয়। তা' যদি না হ'ত, তাহলে আয়ুষ্কাম ব্যক্তিদের প্রযুক্ত মন্ত্র, ঔষধ, মণি, বলি, উপহার, হোম, নিয়ম, প্রায়শ্চিত্ত, উপবাস, স্বস্ত্যয়ন, প্রণিপাতাদি ক্রিয়া ও বাগযজ্ঞাদি সব মিথ্যা হয়ে যেত ; আয়ুর্বেদের রসায়ন অধিকারে মহর্ষিদের কথা ব্যর্থ হয়ে যেত, ঋষিরা তপস্যা করে যথাভিলষিত আয়ু পেতেন না, রোগের চিকিৎসার কোনই অর্থ থাকতো না ; চিকিৎসা অচিকিৎসা দুই-ই সমান হয়ে যেত।' এই ধরনের বহু কথা মহর্ষি আত্রেয় বলেছেন, যার দ্বারা 'ক্রিয়মাণ' কর্মের ফলের মাহাত্ম্য কীর্তিত হয়েছে। বিস্তারভয়ে এখানেই শেষ করছি।

সুশ্রুতসংহিতা :

(১) 'আয়ুর্বেদশাস্ত্রেষু অসর্বগতাঃ ক্ষেত্রজ্ঞাঃ নিত্যাশ্চ, তির্যগ্‌যোনি-মানুষদেবেষু সঞ্চরন্তি ধর্মাধর্মনিমিত্তকম্।' (৩।১।১৬)

অর্থাৎ, আয়ুর্বেদশাস্ত্রমতে জীবাত্মারা নিত্য কিন্তু সর্বব্যাপী নয় ; তারা ধর্মাধর্মহেতু পশু, পক্ষী, মানুষ ও দেবযোনিতে জন্মগ্রহণ করে।

(২) ভাবিতাঃ পূর্বদেহেষু সততং শাস্ত্রবুদ্ধয়ঃ।
ভবন্তি সত্ত্বভূয়িষ্ঠাঃ পূর্বজাতিস্মরা নরাঃ ॥

অর্থাৎ পূর্বজন্মে যাঁরা নিরন্তর মননশীল হ'য়ে শাস্ত্রোজ্জ্বলা বুদ্ধির অধিকারী হ'ন, সেইসব মানুষেরাই পরজন্মে প্রচুর সত্ত্বগুণসম্পন্ন ও জাতিস্মর হ'ন।

(৩) কর্মণা চোদিতো যেন তদাপ্নোতি পুনর্ভবে।
অভ্যস্তাঃ পূর্বদেহে যে তানেব ভজতে গুণান্ ॥
(৩।২।৫৮)

অর্থাৎ মানুষ পূর্বজন্মে যেসব গুণের অনুশীলন করে, পরজন্মে সেই সেই গুণ পুনরায় প্রাপ্ত হয়—পূর্বজন্মে যে কর্মসমূহের অনুষ্ঠান করে, পরজন্মে সেই সেই কর্মের ফল প্রাপ্ত হয়।

নির্দেশিকা : ৩।৩।৩৬

চরকসংহিতা ও সুশ্রুতসংহিতা থেকে উদ্ধৃত শ্লোক ও গদ্যাংশের সংখ্যাগুলি নির্ণয়সাগর প্রেসের সংস্করণ অনুযায়ী। অন্যান্য সংস্করণে সংখ্যার তারতম্য আছে।

ষড়্‌দর্শন :

কর্মের ফলেই যে জন্মান্তর, সুখদুঃখাদি ভোগ এবং সৃষ্টিবৈচিত্র্য তা' ষড়্‌দর্শনে স্বীকৃত। আমরা প্রত্যেকটি দর্শন থেকে এ বিষয়ে সংক্ষেপে কিছু কিছু আলোচনা করছি :—

বৈশেষিক দর্শন :

এই দর্শনে জ্ঞাতব্য সাতটি পদার্থের মধ্যে 'কর্ম' তৃতীয় পদার্থ। উৎক্ষেপণাদি পঞ্চবিধ এই কর্মের মধ্যে অবশ্য দার্শনিক তত্ত্ব কিছু নেই।

(১) সুখদুঃখজ্ঞাননিষ্পত্ত্যবিশেষাদৈকাত্ম্যম্ (৩।২।১৯)

প্রত্যেক জীবের দেহ ও মনের দ্বারা সাধ্য যাবতীয় কর্মজনিত সুখদুঃখরূপ ফলের অনুভূতি-বিষয়ে অহংবুদ্ধির একত্ব থাকায় প্রতি দেহে একটিই আত্মা।

(২) ব্যবস্থাতো নানা (৩।২।২০)

একের কর্মফলে একের জন্ম, অপরের কর্মফলে অপরের মৃত্যু, ইত্যাদি ব্যবস্থা হেতু জীবাত্মা বহু।

(৩) শাস্ত্রসামর্থ্যাচ্চ (৩।২।২১)

শাস্ত্রও ভিন্ন ভিন্ন জীবের কর্মানুসারে স্বর্গ-নরকাদি ভিন্ন ভিন্ন গতি ও সুখদুঃখাদি কর্মফল বর্ণনা করায় আত্মার বহুত্ব প্রমাণিত হয়।

ন্যায়দর্শন :

(১) গৌতমের ন্যায়দর্শনের দ্বিতীয় সূত্রেই কর্মবাদ সুপরিস্ফুট। সূত্রটি এই—দুঃখ-জন্ম-প্রবৃত্তি-দোষ-মিথ্যাজ্ঞানানাম্ উত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাপায়াদ্ অপবর্গঃ (১।১।২)

অর্থাৎ, 'মিথ্যাজ্ঞান' চলে গেলে, 'দোষ' চলে যাবে, 'দোষ' গেলে 'প্রবৃত্তি' যাবে, 'প্রবৃত্তি' গেলে 'জন্ম' যাবে, 'জন্ম' গেলে 'দুঃখ' যাবে, 'দুঃখ' গেলেই মুক্তি। ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন বলছেন, প্রথম সূত্রে গৌতম যে বলেছেন প্রমাণ, প্রমেয় আদি ষোলটি পদার্থের 'তত্ত্বজ্ঞান' থেকে মুক্তি হয়, 'সেই তত্ত্বজ্ঞান'-শব্দটির অনুবৃত্তি রয়েছে এই দ্বিতীয় সূত্রে। অর্থাৎ 'তত্ত্বজ্ঞান' হলেই 'মিথ্যাজ্ঞান' নিবৃত্ত হবে, 'মিথ্যাজ্ঞান' নিবৃত্ত হলেই 'দোষ' নিবৃত্ত হবে, ইত্যাদি। 'মিথ্যোপলব্ধিবিনাশঃ তত্ত্বজ্ঞানাৎ' (৪।২।৩৫) ব'লে গৌতমের একটি সূত্রও রয়েছে। কর্ম আছে, কর্মফল আছে—'অস্তি কর্ম, অস্তি কর্মফলম্' (বাৎস্যায়নভাষ্য)—এটি তত্ত্বজ্ঞানের অন্তর্গত। কর্ম নেই, কর্মফল নেই—এটি মিথ্যাজ্ঞানের অন্তর্গত। মিথ্যাজ্ঞান হচ্ছে প্রথম সূত্রোক্ত প্রমেয় পদার্থ বিষয়ে নানা রকমের ভ্রমজ্ঞান। প্রমেয় পদার্থ ১২টি; তার মধ্যে শুভাশুভ কর্মরূপ 'প্রবৃত্তি' হচ্ছে ৭ম পদার্থ; রাগ, দ্বেষ ও মোহরূপ 'দোষ' হচ্ছে ৮ম পদার্থ; প্রেত্যভাব বা পুনর্জন্ম ৯ম পদার্থ; 'ফল' ১০ম পদার্থ; 'দুঃখ' ১১শ পদার্থ 'অপবর্গ' ১২শ পদার্থ। সুতরাং দ্বিতীয় সূত্রটির অর্থ দাঁড়াচ্ছে—তত্ত্বজ্ঞানহেতু মিথ্যাজ্ঞান দূরীভূত হলে রাগ দ্বেষ ও মোহ চলে যাবে, রাগ দ্বেষ ও মোহ চলে গেলে শুভাশুভ কর্মে প্রবৃত্তি চলে যাবে, কর্মপ্রবৃত্তি চলে গেলে জন্ম হবে না, জন্ম না হলে আর দুঃখ হবে না; দুঃখ না হওয়াই মুক্তি। নিষ্কর্ষ এই যে, প্রত্যক্ষাদি ৪টি প্রমাণের দ্বারা ১২টি প্রমেয় পদার্থের জ্ঞান চাই। আর আমরা দেখলাম যে, ১২টি প্রমেয়ের মধ্যে কর্ম ও কর্মফল এই দু'টি পদার্থও রয়েছে।

(২) প্রবৃত্তিদোষজনিতঃ অর্থঃ ফলম্ (১।১।২০)

এটি কর্মফলের সংজ্ঞাসূত্র। এর মর্মার্থ হচ্ছে, রাগ দ্বেষ ও মোহরূপ দোষ থেকে শরীর মন ও বাক্যের দ্বারা শুভাশুভ কর্মে যে প্রবৃত্তি হয়, তা থেকে উৎপন্ন অর্থ বা ভোগকেই 'ফল' বলা হয়। ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন এক জায়গায় লিখেছেন—'সসাধনঃ সুখদুঃখোপভোগঃ ফলম্' অর্থাৎ সুখ-দুঃখের উপভোগ ও তার সাধনস্বরূপ দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি হচ্ছে 'ফল'।

(৩) পূর্বকৃত-ফলানুবন্ধাৎ তদুৎপত্তিঃ (৩।২।৬৪)

অর্থাৎ, পূর্বজন্মকৃত কর্মের ফলের সম্বন্ধ-প্রযুক্ত হয়ে নূতন শরীর সৃষ্ট হয়। তাৎপর্য এই যে, আত্মা যে নূতন শরীর সৃষ্টি করেন তা কর্মফল-নিরপেক্ষ পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত দিয়ে নয়, পরন্তু আত্মার পূর্বদেহকৃত কর্মফলহেতু।

(৪) সদ্যঃ কালান্তরে চ ফলনিষ্পত্তেঃ সংশয়ঃ। (৪।১।৪৪)

বাৎস্যায়ন-ভাষ্য : 'পাক করছে', 'দোহন করছে'—এ সব ক্ষেত্রে অন্ন ও দুগ্ধরূপ ফল সদ্যই হয়।

'কর্ষণ করছে,' 'বপন করছে'—এসব ক্ষেত্রে ফল কালান্তরে হয়। 'স্বর্গকাম ব্যক্তি অগ্নিহোত্র করবে'—ইত্যাদি বৈদিক কর্মবিধির ক্ষেত্রে সংশয় হয়, এর ফল কি সদ্যই হয়, না কালান্তরে হয়। সিদ্ধান্ত—না, এ সবের ফল সদ্য নয়, কালান্তরেই উপভোগ্য।

৪।১।৪৪ থেকে ৪।১।৫৩ অবধি কর্মফলের বিচার চলেছে। বলা হয়েছে যজ্ঞাদি কর্মজন্য ধর্মবিশেষ (অদৃষ্ট) যে আত্মাতে জন্মায় সেই আত্মাতেই ঐ কর্মের ফল সুখবিশেষ জন্মায়। এই দুয়ের আশ্রয়-ভেদ নেই। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, ন্যায়মতে আত্মা কর্তা ও ভোক্তা। যে সব কর্মের ফল সদ্য নয়, সেগুলি কৃত হলে 'অদৃষ্ট' নামে একটি শক্তি আত্মাতে উৎপন্ন হয় এবং সেই শক্তিই কালান্তরে—পরজন্মে বা বহুজন্ম পরেও—ফল দিয়ে থাকে। নৈয়ায়িকরা যাকে 'অদৃষ্ট' বলছেন, মীমাংসকরা তাকেই 'অপূর্ব' বলেন। তবে পার্থক্য এই যে, মীমংসকরা ঈশ্বরকে স্বীকার করেন না—'অপূর্ব'ই কালান্তরে ফল দান করে, এই কথা বলেন; কিন্তু নৈয়ায়িকরা ঈশ্বরকে স্বীকার করেন, যদিও দ্বাদশ প্রমেয়ের মধ্যে ঈশ্বরের স্থান নেই। তাঁরা বলেন—ঈশ্বরই কর্মফলদাতা, 'অদৃষ্ট' কর্মফল প্রসব করে একথা বলা চলে না, কারণ কর্মবিষয়েও জীবের সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য নেই; জীব যা ইচ্ছে করে, তাই করতে পারে না, ঈশ্বরকর্তৃক প্রেরিত হয়েই জীব কর্ম করে এবং ঈশ্বরকর্তৃক দত্ত ফলই ভোগ করে (৪।১।১৯-২১ সূত্র দ্রষ্টব্য)। বেদান্তেও ঈশ্বরের এই কারয়িতৃত্ব ও ফলদাতৃত্ব স্বীকৃত হয়েছে।

নির্দেশিকা: ৩।১।২৫-২৬, ৩।২।৬৬, ৩।২।৭০, ৪।১।১০, ৪।১।১৯-২১

সাংখ্যদর্শন : সাংখ্যপ্রবচনসূত্র ঃ

(১) কর্মবৈচিত্র্যাৎ সৃষ্টিবৈচিত্র্যম্ (৬।৪১)—অর্থাৎ, শুভাশুভ বিচিত্র কর্মসমূহের ফলে সৃষ্টির বৈচিত্র্য হয়—পশু, পক্ষী, মানুষ, দেবতা প্রভৃতি এবং তাদের প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন সুখদুঃখাদি ভোগ সৃষ্ট হয়।

(২) বিরক্তস্য তৎসিদ্ধেঃ (২।২)

সৃষ্টি যদি পুরুষের মোক্ষের জন্যই হয়, তাহলে একটি সৃষ্টিতেই তো মোক্ষ হতে পারে, বারবার সৃষ্টির প্রয়োজন কি?—এর উত্তরে বলা হচ্ছে, একবার মাত্র সৃষ্টিতেই মোক্ষ হয় না, কারণ কর্মের ফলস্বরূপ জন্ম, মরণ, ব্যাধি আদি বিবিধ দুঃখে অত্যন্ত তাপগ্রস্ত হয়েই মানুষ প্রকৃতি-পুরুষের বিবেকের দ্বারা পরবৈরাগ্য লাভ করলেই মুক্তি পেতে পারে। (বিজ্ঞানভিক্ষুর ভাষ্যাবলম্বনে)।

(৩) ন শ্রবণমাত্রাৎ তৎসিদ্ধিঃ অনাদিবাসনায়াঃ বলবত্ত্বাৎ (।৩)

মোক্ষশাস্ত্র-শ্রবণ বহুজন্মকৃত শুভকর্মের ফলেই হয়। কিন্তু শুধু শ্রবণের দ্বারা বৈরাগ্যসিদ্ধি হয় না, কারণ অনাদি মিথ্যাবাসনা বলবতী; তাই যোগনিষ্ঠা চাই। যোগেও অনেক প্রতিবন্ধক। তাই বহু জন্মের যোগনিষ্ঠার ফলে বিরল কোন কোন ব্যক্তির বৈরাগ্য ও মোক্ষ হয়ে থাকে (বিজ্ঞানভিক্ষুর ভাষ্যাবলম্বনে)।

নির্দেশিকা :

সাংখ্যপ্রবচনসূত্র : ৩।৫১, ৫।২০-২১, ৫।১২০, ৫।১২৩-২৪

সাংখ্যকারিকা : ২, ১৮, ৪০, ৪২-৪৫

যোগদর্শন :

(১) ক্লেশমূলঃ কর্মাশয়ো দৃষ্টাদৃষ্টজন্মবেদনীয়ঃ (২।১২)

চিত্তস্থিত কর্মসংস্কারগুলি অবিদ্যাদি পঞ্চক্লেশ-মূলক। ঐ কর্মসংস্কারহেতু কৃতকর্মের ফল ইহজন্মে বা পরজন্মে ভোগ করতে হয়। বিশ্বামিত্র তপঃ-ফলে সেই জন্মেই ক্ষত্রিয় থেকে ব্রাহ্মণ হয়েছিলেন। মহর্ষির কাছে অপরাধী হওয়ায় রাজা

নহুষের সত্যসদ্যই সর্পত্বপ্রাপ্তি হয়েছিল। আশ্রিত, ব্যাধিগ্রস্ত, বিশ্বস্ত ও মহাপুরুষদের কাছে অপরাধী হলে, তার ফল দৃষ্ট। অন্যান্য কর্মের সুখদুঃখাদি ফল অদৃষ্ট অর্থাৎ পরলোকে বা এই পৃথিবীতেই জন্মান্তরে ভোগ্য।

(২) সতি মূলে তদ্‌বিপাকো জাত্যায়ুর্ভোগাঃ (২।১৩)

অবিদ্যাদি পঞ্চক্লেশ যদি থেকে যায়, তাহলে কর্মের বিপাকে অর্থাৎ ফলে জাতি, আয়ু ও ভোগ হয়ে থাকে। তাৎপর্য এই যে পুরুষ ও প্রকৃতির বিবেকহেতু অবিদ্যাদি ক্লেশ দগ্ধ হয়ে গেলে, কর্ম-বিপাকে আর জাতি (দেব, মনুষ্য, পশু আদি জন্ম), আয়ু (ঐ সব দেহে স্থিতিকাল) ও ভোগ (সুখ-দুঃখাদি) হয় না।

(৩) সোপক্রমং নিরুপক্রমং চ কর্ম, তৎ-সংযমাৎ অপরান্তজ্ঞানম্ অরিষ্টেভ্যো বা (৩।২২)

কর্ম দু'রকমের—সোপক্রম অর্থাৎ যা ফলদানে প্রবৃত্ত এবং নিরুপক্রম অর্থাৎ যার ফল পরে হবে। এই দ্বিবিধ কর্মে সংযম করলে যোগীরা মৃত্যুকাল জানতে পারেন। অযোগীরা নানারকমের অরিষ্ট লক্ষণ থেকেও মৃত্যুকাল জানতে পারেন।

(৪) কর্মাশুক্লাকৃষ্ণং যোগিনস্ত্রিবিধম্ ইতরেষাম্ (৪।৭)

ততস্তদ্‌-বিপাকানুগুণানেবাভিব্যক্তি র্বাসনানাম্ (৪।৮)

যোগীদের কর্ম অশুক্ল ও অকৃষ্ণ অর্থাৎ পুণ্য-পাপবর্জিত। অযোগীদের কর্ম শুক্ল, কৃষ্ণ অথবা শুক্লকৃষ্ণ অর্থাৎ পুণ্য পাপ ও মিশ্র। গীতাপ্রসঙ্গে (১৮।২২) ঠিক এই কথা আমরা আলোচনা করে এসেছি। অযোগীদের এই যে ত্রিবিধ কর্ম, তার ফলে অনুরূপ সংস্কারসমূহের অভিব্যক্তি হয়। অর্থাৎ ঐ তিন রকমের কর্মের ফলে যে জন্মে যে রকম জাতি, আয়ু ও ভোগের উৎপত্তি হয়, সেই জন্মে সেই জাতি, আয়ু ও ভোগের অনুকূল সংস্কারগুলিই অভিব্যক্ত হয়—অন্য সংস্কারগুলি সুপ্ত থাকে। পশুদেহের অনুকূল সংস্কারগুলিই প্রকাশ পায়, মনুষ্যদেহের অনুকূল সংস্কারগুলি তখন সুপ্তাবস্থায় থাকে।

এই সব দার্শনিক তত্ত্ব ছাড়াও যোগদর্শনে অনেক উপাদেয় কর্মফল-প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে। যেমন—অপরিগ্রহের ফলে অতীত, বর্তমান ও পরজন্মের সম্যক্ জ্ঞান হয় (২।৩৯), কায়মনো-বাক্যে সত্যপালনের ফলে যোগীর বাক্‌সিদ্ধি হয় (২।৩৬) ইত্যাদি। বিভূতিপাদে 'সংযম'রূপ কর্মের ফলে নানা রকমের আশ্চর্য শক্তিলাভের কথা সবিস্তার বলা হয়েছে।

নির্দেশিকা: ১।২৪, ২।১, ২।৯, ২।১৪-১৫, ২।২৮, ২।৩৪, ৩।১৬, ৩।১৮, ৪।১-৩, ৪।৭-১২, ৪।৩০

মীমাংসাদর্শন:

বেদের কর্মকাণ্ড মীমাংসাদর্শনের বিষয়। বিধিপূর্বক বৈদিক যাগযজ্ঞাদি কর্ম করলে তার ফলে কর্তার আত্মায় 'অপূর্ব' নামে একটি শক্তি উৎপন্ন হয়, যা যথাকালে কর্মের ফল দিয়ে থাকে —একথা আমরা পূর্বেই বলেছি। এই 'অপূর্ব'কে স্বীকার করতে হয় এই জন্য যে, কর্ম করা মাত্রই ফল পাওয়া যায় না। তা যদি পাওয়া যেত তা হলে অশ্বমেধ যজ্ঞ করার সঙ্গে সঙ্গেই যজ্ঞকর্তার মৃত্যু হ'ত ও তিনি স্বর্গে যেতেন।

মীমাংসাদর্শনে বৈদিক কর্মেরই ওপর সমস্ত জোর। কর্মফলসংক্রান্ত বা অন্যবিধ দার্শনিক তত্ত্ব যা বেদের জ্ঞানকাণ্ড ও উপাসনাকাণ্ডে পাওয়া যায়, সে সবের এই দর্শনে একান্ত অভাব, যদিও ষড়্‌দর্শনের মধ্যে আয়তনে এটিই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ।

কর্মণা জায়তে জন্তুঃ কর্মণৈব প্রবর্ধতে।
কর্মণা লীয়তে কালে কর্মমূলমিদং জগৎ॥

কর্মফলেই জীব জন্মগ্রহণ করে, কর্মফলেই

বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ও কর্মফলেই দেহত্যাগ করে। কর্মই এ জগতের মূল। যজ্ঞাদি কর্মের ফলে স্বর্গে যাওয়াই মীমাংসকদের একমাত্র কাম্য। বৈদিক শব্দ নিত্য। বেদমন্ত্রের এমনই শক্তি যে, বিধিমত উচ্চারণ করলে ঈপ্সিত ফল অবশ্যম্ভাবী। পক্ষান্তরে অবিধিপূর্বক উচ্চারিত হলে ক্ষতি অনিবার্য। দেহান্তে স্বর্গলাভই বৈদিক কর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ ফল ব'লে স্বীকৃত হলেও, পুত্রবিত্তকলত্রাদি ঐহিক ফলও বৈদিক কর্মলভ্য।

কর্ম সাধারণতঃ দু'রকমের—অর্থকর্ম ও গুণ-কর্ম। অর্থকর্ম, যেমন অগ্নিহোত্র, দর্শ-পূর্ণমাস যাগ ইত্যাদি। এর দ্বারা আত্মার অপূর্বের উৎপত্তি হয়। অর্থকর্মে কর্মেরই প্রাধান্য, দ্রব্যের অপ্রাধান্য, যেমন অগ্নিহোত্রে দধি আদি অপ্রধান, অগ্নিহোত্র যজ্ঞটিই প্রধান। গুণকর্ম চতুর্বিধ—'উৎপত্তি-আপ্তি-বিকৃতি-সংস্কৃতি-ভেদাৎ'; যেমন 'ব্রীহীন্ প্রোক্ষতি' অর্থাৎ চালে জলের ছিটে দিয়ে তার সংস্কার করা হচ্ছে। সুতরাং গুণকর্মে দ্রব্যই প্রধান, কর্মটি অপ্রধান। চালগুলি পরে অন্য কাজে ব্যবহৃত হবে, সেই পরবর্তী কাজটিই বড়—বর্তমান প্রোক্ষণরূপ কাজটি অপ্রধান, চালগুলি প্রধান। গুণকর্মের দ্বারা কোনও বস্তু উৎপন্ন করা যায়, পাওয়া যায়, পরিবর্তিত করা যায় বা সংস্কৃত করা যায়। আমরা শংকরভাষ্যে বারংবার পাই যে, আত্মাকে উৎপন্ন করা যায় না, পাওয়া যায় না (নিত্যপ্রাপ্ত ব'লে), পরিবর্তিত করা যায় না, সংস্কৃত করা যায় না—সুতরাং কর্মের দ্বারা আত্মা লভ্য ন'ন—জ্ঞানের দ্বারাই লভ্য।

অর্থকর্মকে আবার তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে—নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য। অগ্নিহোত্রাদি নিত্য কর্ম; কোনও কারণ উপস্থিত হ'লে যে-সব যাগাদি করণীয় তা হচ্ছে নৈমিত্তিক কর্ম, যেমন পথিকৃৎ নামে ইষ্টিযাগ—পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় বিহিত যাগ করা না হলে এই পথিকৃৎ যাগ করতে হয়; কাম্য কর্ম, যেমন কারীরী যাগ, যা বৃষ্টিকামনা ক'রে করা হয়, দর্শ-পূর্ণমাসাদি যাগ, যা স্বর্গকামনা ক'রে করা হয়, ইত্যাদি। প্রভাকরের মতে নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্মের কোনও ফল নেই, কিন্তু না করলে প্রত্যবায় হয়। কুমারিল ভট্টের মতে নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্মের ফল হচ্ছে পাপক্ষয়। এ ছাড়া নিষিদ্ধ কর্ম আছে, যা করলে পাপ হয়। সুতরাং নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য ও নিষিদ্ধ এই চার রকমের কর্ম। এই সব কর্মের ফল অমোঘ।

বেদান্তদর্শন :

(১) বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ তথাহি দর্শয়তি (২।১।৩৪)

যদি বলা যায় যে, ঈশ্বর দেবগণকে অত্যন্ত সুখী, পশুদের অত্যন্ত দুঃখী এবং মানুষদের সুখী ও দুঃখী উভয়বিধ ক'রে সৃষ্টি করেছেন ব'লে, তাঁর রাগদ্বেষ থাকায়, তিনি পক্ষপাতী ও নিষ্ঠুর এবং সেই কারণে তাঁকে জগৎকারণ বলা চলে না, তার উত্তরে বাদরায়ণ বলছেন যে, না, পক্ষপাতিত্ব ও নিষ্ঠুরতাদোষে ঈশ্বরকে দোষী করা চলে না, কারণ ঈশ্বর জীবের শুভাশুভ কর্মকে অপেক্ষা করেই দেব, পশু ও মনুষ্যাদি বিষম সৃষ্টি করেছেন, তাদের কৃত কর্মের ফল দিতেই তাদের সুখী, দুঃখী ইত্যাদি করেছেন। বৃষ্টি হলে যেমন ধান, যব, গম ইত্যাদি বিষম সৃষ্টি হয়, তার জন্যে বৃষ্টিকে দায়ী করা চলে না; ধান, যব ও গমের বীজই ঐ বিষমতার জন্য দায়ী—বৃষ্টি হ'ল শস্যসৃষ্টির সাধারণ কারণ, বীজগুলি অসাধারণ কারণ—ঈশ্বরও সেই রকম এই বৈচিত্র্যময় সৃষ্টির সাধারণ কারণ; অসাধারণ কারণ হচ্ছে জীবের কৃত কর্ম। ঈশ্বর কর্মফলদাতা ঠিকই; তবে খেয়াল-খুশিমত তিনি কর্মফল দেন না। যেমন কর্ম, তেমন ফল। সুতরাং 'ঈশ্বরই জগৎকারণ', বেদান্তের এই সিদ্ধান্ত দোষদুষ্ট নয়।

(২) পরাৎ তু তৎশ্রুতেঃ ২।৩।৪১)

যদি বলা যায় যে, জীব স্বাধীন, স্বতন্ত্র কর্তা, কারণ প্রত্যক্ষ দেখা যাচ্ছে যে, চাষা লাঙ্গল গরু নিয়েই চাষ করে, ঈশ্বরের জন্য অপেক্ষা ক'রে বসে থাকে না, তার উত্তরে বাদরায়ণ বলছেন যে, না, জীবের কর্তৃত্ব ঈশ্বরাধীন ; ঈশ্বর না করালে জীব কিছু করতে পারে না, ঈশ্বর না দিলে জীব কৃতকর্মের ফল ভোগ করতে পারে না, ঈশ্বরের অনুজ্ঞাতেই জীবের কর্তৃত্ব ও কর্মফলের ভোক্তৃত্ব ; ঈশ্বরের কৃপাতেই জীবের জ্ঞানোৎপত্তি ও মোক্ষ-সিদ্ধি ; কারণ বেদই এ বিষয়ে প্রমাণ ; বেদে বলা হয়েছে যাকে তিনি উর্ধ্বলোকে উন্নীত করতে চান, তাকে দিয়ে সৎ কাজ করান ; যাকে অধোগামী করতে চান তাকে দিয়ে অসৎ কাজ করান (কৌষীতকী উপঃ ৩।৮) ; কেনোপ-নিষদেও আছে, অগ্নি, বায়ু আদি দেবতা ঈশ্বরের শক্তিতেই শক্তিমান হয়ে বিজয়ী হয়েছিলেন, স্বাধীনভাবে তাঁরা একটি তৃণখণ্ডকেও দগ্ধ করতে বা উড়িয়ে দিতে পারেননি (৩।১-১০

(৩) কৃতপ্রযত্নাপেক্ষস্তু বিহিতপ্রতিসিদ্ধা-বৈয়র্থ্যাদিভ্যঃ (২।৩।৪২)

যদি ঈশ্বরই জীবকে দিয়ে শুভাশুভ কর্ম করিয়ে শুভাশুভ ফল দেন, তাহলে ঈশ্বরের পক্ষপাতিত্ব ও নিষ্ঠুরতা এই দুই দোষ এসে যাবে, তাছাড়া জীব স্বয়ং কিছু না করেই ভাল মন্দ ফল পাওয়ায় আর একটি দোষ, যাকে, 'অকৃতাভ্যাগম' বলে, তাই দেখা দেবে—এর উত্তরে বাদরায়ণ বলেছেন যে, না, ঈশ্বরের কারয়িতৃত্ব জীবের পূর্বকৃত কর্মকে অপেক্ষা করেই ; তা না হলে শাস্ত্রের বিধি-নিষেধের কোনই অর্থ হয় না। অর্থাৎ জীবের পূর্বকৃত কর্মের ফলানুযায়ী ঈশ্বর কিছুটা স্বাধীনতা দিয়ে-ছেনই, যার ফলে সে শাস্ত্রবিধি পালন করতে বা শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্ম থেকে নিবৃত্ত হতে পারে।

(৪) সর্বাপেক্ষা চ যজ্ঞাদিশ্রুতেরশ্ববৎ (৩।৪।২৬)

শমদমাদ্যুপেতঃ স্যাৎ তথাপি তু তদ্বিধেঃ তদঙ্গতয়া তেষাম্ অবশ্যানুষ্ঠেয়ত্বম্ (৩।৪।২৭)।

প্রথম সূত্রটির সারার্থ হচ্ছে, যজ্ঞ, দান, তপস্যাদি সমস্ত বিহিত কর্ম নিষ্কামভাবে করার ফলেই জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। কিন্তু উৎপন্ন জ্ঞানের ফল যে মোক্ষ, তাতে ঐ সব কর্মের ফল অপেক্ষিত নয়। যজ্ঞাদি কর্মের ফল জ্ঞানোৎপত্তিতেই পর্যবসিত—তার বেশী তাদের গতি নেই। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যায়, ঘোড়াকে একটাতেই অর্থাৎ কিনা রথেই লাগানো হয়, লাঙ্গলে নয়। ঘোড়াকে রথেও লাগাবো, লাঙ্গলেও লাগাবো, তা হয় না। যজ্ঞাদি কর্মের ফলকে জ্ঞানোৎপত্তিতেও লাগাবো আবার জ্ঞানের ফল মুক্তিতেও লাগাবো, তা হয় না।

দ্বিতীয় সূত্রটিতে বলা হয়েছে, যজ্ঞাদি কর্মের ন্যায় শম, দম, তিতিক্ষা, উপরতি, চিত্তের একাগ্রতা আদিও জ্ঞানোৎপত্তির জন্য অবশ্যকরণীয়। এই-গুলিই জ্ঞানের অন্তরঙ্গ সাধন, যজ্ঞাদি নিষ্কামকর্ম বহিরঙ্গ সাধন মাত্র। প্রথমতঃ যজ্ঞাদি কর্মের ফলে মন অনেকটা শুদ্ধ হলে, শমাদি সাধনের দিকে দৃষ্টি যায়। শমাদি সাধনের ফলে জ্ঞান উৎপন্ন হয়।

(৫) তদধিগমে উত্তরপূর্বাঘয়োঃ অশ্লেষবিনাশৌ তদ্ব্যপদেশাৎ (৪।১।১৩)

ইতরস্য অপি এবম্ অসংশ্লেষঃ পাতে তু (৪।১।১৪)

অনারব্ধকার্যে এব তু পূর্বে তদবধেঃ (৪।১।১৫)

ভোগেন তু ইতরে ক্ষপয়িত্বা সম্পদ্যতে (৪।১।১৯)

প্রথম সূত্রটিতে বলা হয়েছে, জ্ঞানের পরে কৃত পাপ জ্ঞানীকে স্পর্শ করে না—সেই পাপের

অশ্লেষ হয়ে যায়, অর্থাৎ তা 'অপূর্ব' উৎপন্ন করতে না পারায় ফলপ্রসূ হয় না। এখানে স্মরণীয় যে, পুণ্য কর্মের সঙ্গে অপুণ্য কর্ম, তা' যতই তুচ্ছ হোক্ না কেন, জড়িত থাকে। 'সর্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ' (গীতা ১৮।৪৮)। সুতরাং অপরের দৃষ্টিতে জ্ঞানীরও ক্রিয়মাণ কর্মে কিছু না কিছু অঘ অর্থাৎ পাপ থাকেই। আর, জ্ঞানের পূর্বে ইহজন্মে বা জন্মান্তরে কৃত সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়ে যায়। দ্বিতীয় সূত্রে ঐ একই কথা বলা হয়েছে—পুণ্য সম্পর্কে। এইভাবে জ্ঞানীর পাপ ও পুণ্য দুটিই ফল প্রসব না করতে পারায় দেহপাতেই জ্ঞানীর বিদেহমুক্তি অবধারিত। তৃতীয় সূত্রে বলা হয়েছে, প্রথম ও দ্বিতীয় সূত্রে যে পাপ ও পুণ্যের কথা উক্ত হয়েছে তা' শুধু অপ্রবৃত্ত-ফল পাপ-পুণ্য সম্পর্কে, প্রবৃত্ত-ফল পাপ-পুণ্য সম্পর্কে নয়, অর্থাৎ প্রারব্ধ সম্পর্কে নয়। চতুর্থ সূত্রে বলা হয়েছে, প্রারব্ধফল পাপপুণ্য-ভোগের দ্বারাই ক্ষয় ক'রে জ্ঞানী দেহান্তে বিদেহ-মুক্তি লাভ করেন।

(৬) যাবদ্ অধিকারম্ অবস্থিতিঃ আধিকারি-কাণাম্ (৩।৩।৩২)

জ্ঞানীর প্রারব্ধের প্রসঙ্গে এই সূত্রটির অবতারণা করা হচ্ছে। জ্ঞান হ'লে মানুষ মুক্ত হয় —দেহান্তে পুনর্জন্ম হয় না। এই হ'ল সাধারণ নিয়ম। যদি কোনও জ্ঞানীর পুনরায় জন্ম হয়, তাহলে বুঝতে হবে, তিনি 'আধিকারিক' পুরুষ, অর্থাৎ ঈশ্বর তাঁকে বিশেষ কোনও অধিকারে নিযুক্ত করেছেন—কোনও বিশেষ কর্তব্য (special duty) তাঁকে দিয়েছেন। আমরা আগেই পেয়েছি যে, জ্ঞানীর প্রারব্ধ ছাড়া আর কোনও কর্ম থাকে না। সুতরাং আধিকারিক পুরুষের যে জন্ম, তা' সঞ্চিত বা ক্রিয়মাণ কর্মের ফলে নয়, প্রারব্ধেরই ফলে। যে প্রারব্ধের ফলে তাঁর জ্ঞান হয়েছিল, সেই একই প্রারব্ধের ফলে তাঁর এক বা একাধিক জন্ম হতে থাকে। অর্থাৎ একে প্রারব্ধে অতিদেশ (extension) বা ব্যাপ্তি বলতে হবে। কর্মবাদের সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে হলে, এই রকম ব্যাখ্যা ছাড়া গত্যন্তর নেই। আচার্য শংকরের ভাষ্যের মধ্যে আছে যে, মহর্ষিরা ব্রহ্মজ্ঞানের অতিরিক্ত, ঐশ্বর্যফলাদিযুক্ত জ্ঞানে আসক্ত হওয়ায় আধিকারিক পুরুষ হয়েছিলেন এবং পরে ঐ সব ঐশ্বর্যে বীতরাগ হয়ে ব্রহ্মজ্ঞাননিষ্ঠ হ'য়ে কৈবল্যলাভ করেছিলেন। টীকাকার গোবিন্দানন্দ 'ভাষ্যরত্নপ্রভা'য় লিখেছেন, মহর্ষিরা জ্ঞানের পূর্বে ঐশ্বর্যফলাদিযুক্ত জ্ঞানান্তরে আসক্ত হয়েছিলেন। এই সব কথা খুব পরিষ্কার নয়; কারণ, শ্রুতি বলছেন, 'যদা সর্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ, অথ মর্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে' (কঠ উপ ২।৩।১৪)। অর্থাৎ যখন হৃদয়ের সমস্ত কামনা একেবারে চলে যায়, তখনই এই মরণধর্মা মানুষ অমর হয় এবং এই দেহেই ব্রহ্মস্বরূপ হয়ে যায়। সুতরাং জ্ঞানের পূর্বে ঐশ্বর্যাদিতে আসক্ত হলে জ্ঞান হবে কি করে? সবই কর্মবাদ দিয়ে ব্যাখ্যা করতে গেলে মুশকিলে পড়তে হয়। ঈশ্বরকেই যখন টেনে আনা হচ্ছে, যখন বলা হচ্ছে ঈশ্বরই তাঁদের অধিকার দিচ্ছেন, তখন ঈশ্বরেচ্ছাতেই তাঁরা আধি-কারিক পুরুষ হচ্ছেন, বললে হয় না? এতে প্রশ্ন উঠবে কোন কোন জ্ঞানীকে ঈশ্বর আধিকারিক পুরুষ করছেন, অন্যদের করছেন না এর কারণ কি? ঈশ্বর কি খামখেয়ালী? এই সব প্রশ্নের উত্তর 'কথামৃতে', স্বামী বিবেকানন্দের 'বাণী ও রচনায়' এবং 'লীলাপ্রসঙ্গে' উক্ত স্বামী সারদানন্দের কথায় পাওয়া যাবে। যথাস্থানে তা আলোচিত হবে।

[ক্রমশঃ]

স্বামী ওঁকারানন্দ-স্মরণে

ডক্টর অরুণা হালদার

জীবন-মরণ যেন আলোছায়া আনন্দ ব্যথায়,
অন্তরে জড়ায়ে আছে—অস্তিত্বের স্থির মোহানায়।
তরঙ্গের লীলা ভাঙ্গে—মানবীয় সর্ব আকাঙ্ক্ষার—
সকল প্রাপ্তির শেষে আরো কিছু আছে কিনা তার
অনন্ত জিজ্ঞাসা শুধু নিরুত্তর চুপ ক'রে থাকে—
অবাধ্য বেদনাহত চিত্ত তবু জানি পিছু ডাকে॥

তীক্ষ্ণ-অসি-জ্ঞানাশ্রয়ী-দীপ্তচক্ষে দেখেছি সতত
আপনারে শান্ত ধৈর্যে স্নিগ্ধ করি প্রেরণাসম্মত
বিলাবার ব্রত! কত প্রশ্নে কতবার পেয়েছি উত্তর—
ভ্রান্তির পেয়েছি শান্তি বৈরাগ্যের সস্নেহ সুন্দর
অভিষেকে ভরে গেছে মন—শত স্মৃতি তার
বিনম্র বেদনাভরা বারবার করে নমস্কার।
এজগৎ-পারাবার—উত্তরিয়া,—অজ্ঞাত অনাম—
হে তাপস! বিমৌন প্রণাম সঁপিলাম॥

স্বামী অখণ্ডানন্দের স্মৃতিসঞ্চয়

[পূর্বানুবৃত্তি]

['ভক্তে'র ডায়েরি হইতে]

২৮.১.৩৭—স্বামী অখণ্ডানন্দ স্মৃতিকথা লেখার সেবককে বলিতেছেন: "১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে রিলিফ (দুর্ভিক্ষমোচন-কার্য) এক বছর। রাস্তার ধারে আশ্রম—১৪ বছর। তারপর ১৯১২ সালে এখানে (সারগাছিতে) ৫০ বিঘা জমিতে এই আশ্রম।"

একটি ব্রহ্মচারী সেবক চলিতে গিয়া হোঁচট খাইয়া পা কাটিয়া ফেলিয়াছে। বাবা তাহার প্রতি সহানুভূতি না দেখাইয়া বলিলেন, "রাস্তা দেখে চলে না; নিজের দোষ আগে দেখবে।"

একটি ভক্ত-মহিলার পত্রোত্তরে বাবা লিখিতে বলিলেন: "বড় ভুগছ জেনে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। সর্বদা মনে করবে, আমি ভাল হবো—ভাল হয়েছি। ঠাকুর বলতেন—নেই নেই করলে সাপের বিষও নেমে যায়।"

সন্ধ্যাবেলা ভক্তেরা কেহ কেহ কাশীপুরের কথা শুনিতে চায়। বহুক্ষণ নীরবতার পর বাবা বলিলেন:

"কাশীপুরে ঠাকুরের Vision (দর্শন) ছোট-ছেলে মণিমুক্তা বিলোচ্ছে, প্রথমে কিছুতেই দিতে চায় না, শেষে ডেকে ডেকে দিয়ে যায়।" আর কিছু বলিলেন না। আবার অনেকক্ষণ পরে বলিলেন:

"তোমরা ঠাণ্ডা মেজেয় বসলে আমার গাটা ছ্যাক ক'রে ওঠে। কারো পায়ে কাঁটা ফুটলে আমার গায়ে লাগে। সত্যি বলছি এ-রকম হয়েছে ক-বছর হ'ল।"

কিছুক্ষণ পরে থমথমে ভাবটা কাটিয়া গেল; বাবা বলিতেছেন, "আমরা কত কষ্ট ক'রে 'মহারাজ' হলাম—আর আজকাল দুদিনের ছেলেও 'মহারাজ' আর ৫০ বছরের সাধুও 'মহারাজ'! কি বলো, কি বলা যেতে পারে?" একজন বলিলেন, 'যুবরাজ'। উপস্থিত সকলে হাসিয়া উঠিল।

বাবা বলিলেন, "না, পরস্পর 'দাদা' ব'লে ডাকবে, একটা ভ্রাতৃভাব ফুটে উঠবে। 'মহারাজ'—ও যেন বড় সম্ভ্রম। ওতে নিকট সম্বন্ধ হয় না।"

"সন্ন্যাসী মুণ্ডন করবে; যখনই কামাবে, চুল-দাড়ি সব কামাবে। ব্রহ্মচারীও যদি তাই করে, তবে তফাত? ব্রহ্মচারী চুলদাড়ি রাখবে, পশ্চিমে বড় নিন্দা করে এর অন্যথা দেখলে।

"এই কথা বললে অনেকে আমাকে বলে—'আপনার মাথায় চুল কেন?' এর একটা কারণ—কপালের ওপর থেকে প্রকাণ্ড একটা কাটা আছে, ছেলেবেলার দুষ্টুমির চিহ্ন, চৌকাঠে মাথা কেটে গিছল। একজনকে ভয় দেখাচ্ছিলাম আমরা দু-তিন জন। সে বুঝতে পেরে যেই তাড়া দিয়েছে, ছুটতে গিয়ে পড়ে যাই।

"তবু তিব্বতে লোহার পাত দিয়ে কামাতুম—ঝন্ ঝন্ করত মাথা। তা ছাড়া নিবেদিতা প্রথম নেড়া মাথা দেখে চীৎকার ক'রে ওঠে—'Horrible! Convict!' ওদের দেশে জেল-কয়েদীদের মাথা কামায়। সেই থেকে স্বামীজী নিয়ম ক'রে দেন—টুপি-বা পাগড়ী-মাথায় বেরুতে হবে।"

'বার্কেনহেড', একটি বৃটিশ সৈন্যজাহাজ, ১৮৫২ খৃঃ গুপ্ত শৈলের আঘাতে জলমগ্ন হইবার উপক্রম হইলে ক্যাপ্টেনের আদেশে সৈন্য ও নাবিকগণ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াইয়া জাতীয় সঙ্গীত গাহিতে

গাহিতে ডুবিয়া যায়। শুধু নারী ও শিশুগণকে নৌকায় উঠাইয়া দেওয়া হয়। জাহাজ-ডুবির গল্পটি বলিয়া বাবা বলিলেন, "কি ডিসিপ্লিন্" !

জার্মানির রাজা কাইজারের ছেলেবেলার গল্প করিলেন: "কাইজার ছেলেবেলায় জলকে ভয় ক'রত, চান করতে চাইত না। তাঁর বাবা দেখলেন কি করা যায়। 'গার্ড অব্ অনার' বন্ধ ক'রে দিলেন। তার পর থেকে রোজ জলে মাতামাতি।"

"আত্মসম্মানে ঘা দিলে ছোটছেলেরাও বুঝতে পারে। ঐটি জাগিয়ে দিয়ে তাদের কাজে লাগাতে হয়।"

বাবার শরীর কয়দিন যাবৎ ভাল যাইতেছে না। 'শরীর কেমন আছে?' প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন—"শরীর? শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনম্।" একটু পরেই বলিতেছেন, "ধর্মার্থকামমোক্ষাণাম্ আরোগ্যং মূলমুত্তমম্।• তবে কি জানো?—কাঁচা হাঁড়ি আর পাকা হাঁড়ি। গড়ন না হওয়া পর্যন্ত ছাঁচটা দরকার। কি বলো?"

২৯.১.৩৭—পরদিন সকালে বাবার শরীর খুব দুর্বল; গম্ভীরভাবে বসিয়া আছেন। কুশল-প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন, "চোখ ওলটালেই হয়, কি বলো?—আর বাকি কি? মা তারা শিবসুন্দরী!"

৩০.১.৩৭—সন্ধ্যায় দু-একটি ভক্ত সেবক কাছে রহিয়াছে। বাবা বলিতেছেন, "সর্বদা গুরুদত্ত মন্ত্র জপ করতে হয়। 'শয়নে প্রণাম জ্ঞান, নিদ্রায় কর মাকে ধ্যান'—ভাবটি বেশ।"

"হৃষীকেশ অঞ্চলে স্বামীজীকে জিগ্যেস করেছে—'আপনারা গিরি না পুরী?' স্বামীজীর উত্তর—'কচুরী'। দশনামীদের সব আছে—গিরি, বন, পর্বত, সাগর, আশ্রম।" চেয়ার হইতে উঠিবার সময় বলিলেন, "হাত কাঁপে, পা টলে।"

৩১.১.৩৭—'স্মৃতিকথা'-লেখার সেবকটিকে বাবা বলিতেছেন, "সন্ধ্যার সময় জপ-আহ্নিক যা করবার করেই চলে আসবে। আমার ভাব 'স্মৃতিকথা' তোমার হাত দিয়ে লেখা হচ্ছে—এ কি ধ্যান-জপের চেয়ে কম? এও তাঁরই কাজ।" একটু চুপ করিয়া কতকটা স্মৃতিচারণের ভাবে বলিতেছেন, "জামনগরে সেবাব্রতের সূচনা, খেতড়িতে তার বিকাশ, মুর্শিদাবাদে পরিসমাপ্তি।"

বাবা বলিতেছেন, "ঘুমিয়েও আমার শান্তি নেই, সোয়াস্তি নেই। সেদিন স্বপন দেখি কি—ময়না (আশ্রমের একটি অনাথ শিশু) যেন ঐ কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উঠে উঁকি মারছে কুয়োর ভেতর। তাই তো বেটাকে চৌকির তলায় শুইয়ে রেখেছি। কোন্ দিন ডুবে যাবে—কে দেখছে বলো? কারও হুঁশ আছে?"

* * *

বাবা বলিতেছেন, "বেলুড়ে স্বামীজী একদিন ভ্রমণকালের গল্প করছেন, মাঝে মাঝে আমি স্বামীজীর কথায় ভুলে-যাওয়া ঘটনাগুলো ধরিয়ে দিচ্ছি, তাই আমাকে বকছেন—'বড় বক্ বক্ করছিস্, চুপ ক'রে বসে ধ্যান কর্।' তাই করছি, তাও স্বামীজীর অসহ্য। তখন হিমালয়-প্রসঙ্গে মহাশোল মাছের কথা উঠেছে। আমায় জিগ্যেস করছেন, 'হ্যাঁরে, সেই মাছটা কত বড় ছিলরে?' আমি যেমন ধ্যানমগ্ন ছিলাম, সেই চোখবোজা অবস্থাতেই দুটো হাত দিয়ে দেখিয়ে দিলাম—'কত বড়'। আবার ধ্যানমগ্ন। তখন সকলে খুব হাসাহাসি।"

১.২.৩৭—সকালে প্রণাম করিতে গেলে বাবা বলিলেন, "শরীর বড় দুর্বল। যাই প্রভু যাই।" কিছু পরে ভক্তি ও অন্নপূর্ণাকে (আমেরিকান ভক্ত মহিলাদ্বয়) দুইখানি পত্র লিখিতে ও কলম্বোর ঠিকানায় পাঠাইতে বলিলেন, কারণ তাঁহারা ৮ই ফেব্রুআরি সেখান হইতে আমেরিকাগামী জাহাজ ধরিবেন।

২.২.৩৭—মঙ্গলবার, স্বামীজীর তিথিপূজা। সকালে প্রণাম করিলে বাবা বলিলেন, "জয় গুরু, জয় স্বামী বিবেকানন্দ"। ওদিকে পূজা-উৎসব খুব জমিয়া উঠিয়াছে। এদিকে বেলা প্রায় ১২টা/১টার সময় বহরমপুর হইতে এক ভক্ত-মহিলা অনেক ফুল আনিয়া বাবার পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দিতে উদ্যত। বাবা প্রথমে বাধা দিয়া বলিলেন, "আরে, আরে, ফুল ঠাকুরকে দাও।" ভক্ত মহিলাটি বেশ দৃঢ় অথচ কোমল কণ্ঠে বলিলেন, 'আপনিই আমাদের ঠাকুর।' বলিবামাত্র বাবার বেশ ভাবান্তর লক্ষিত হইল। সমস্ত পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করিলেন ও ঈষদাবিষ্ট কণ্ঠে বলিলেন, "থ্যাঙ্ক ইউ, থ্যাঙ্ক ইউ"। নিকটে উপস্থিত সেবক দুইজন বলাবলি করিতে লাগিল: লক্ষণ ভাল নয়। ইহা ঠাকুরের কথা—'কথামৃতে' আছে। ঠাকুরকে চিনিতে পারিয়া একজন বলিয়া উঠে, 'আপনিই সেই', তখন ঠাকুর বলেন—'থ্যাঙ্ক ইউ, থ্যাঙ্ক ইউ'।

সারাদিন ভাবাবস্থায় কাটিল, বাবার কিছুই খাওয়া হয় নাই। সন্ধ্যারতির পর আরতির গাছ-প্রদীপটি সেবক বাবার কাছে লইয়া আসিলে তিনি ভক্তিভরে তাহার তাপ মাথায় লইয়া ঘরে শুইতে গেলেন। জনৈক সেবক তাঁহার গা-হাত-পা টিপিতে লাগিল।

রান্নাঘরের সেবক আসিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কি খাবেন?' প্রথমে কোন আগ্রহ করিলেন না, শেষে সেবকের অনুরোধে অনেক কিছু খাবার কথা বলিলেন। অন্যদিন ৯টার সময় ডাক দেন, আজ ১০।১০॥টা বাজিয়া গেল। সেবক আসিয়া দুইবার ফিরিয়া গিয়াছে, শেষে ডাকিয়া বলিল, 'খাবেন না? সময় হয়ে গেছে।' বাবা বলিলেন, "কি খাওয়াবি তুই? আমার মন স্বর্গে চলে গিছল, খিদে-তেষ্টা নেই। স্বামীজীর সঙ্গে বেড়াচ্ছিলাম, সেখানে কত ভাল ভাল জিনিস খেলাম, স্বামীজী আমায় অমৃত খাইয়েছেন; তুই কি খাওয়াবি?"

বাবা শুইয়া শুইয়াই কথা বলিতেছেন—কথাগুলি একটু জড়ানো। এবার সেবক একটু ধমক দিয়াই বলিল, 'খাবেন কিনা বলুন, নইলে সব নিয়ে যাই।' বাবা উঠিয়া বসিলেন, বলিলেন, "তুই এত কষ্ট ক'রে করেছিস—নিয়ে আয়, খাব।" টেবিল পাতা হইল, থালা ও বাটিতে বিভিন্ন জিনিস সাজানো হইল, বাবা সবগুলিতে আঙুল ঠেকাইয়া একবার একবার জিবে ঠেকাইলেন এবং বলিলেন, "আমার খাওয়া হয়ে গেছে, নিয়ে যা।"

সারাদিনের পর এইপ্রকার খাওয়া দেখিয়া সেবকরা বিস্মিত স্তম্ভিত হইয়া নীরবে চলিয়া গেল। রাত্রি বারটা পর্যন্ত কাঠের চুল্লির উনুনের ধারে বসিয়া নানারকম জল্পনা কল্পনা করিতে লাগিল।

৩.২.৩৭—বুধবার সকালে—খুব হাসিখুশী। বাবা বলিলেন, "কি রে, ভয় পেয়ে গেছিস নাকি সব?" একটু পরে নিজেই বলিলেন, "না, না, ও কিছু না।" পরে অন্য এক সময় মেয়েদের লেখাপড়া, ভাবভক্তি ও সাধন-ভজনের কথা বলিলেন। শেষে মীরাবাঈ-এর কথা বলেন।

৪.২.৩৭—বৃহস্পতিবার, সকালে চায়ে ২।৩ চামচ স্যাকারিন নিজেই দিলেন কি-রকম ভুল করিয়া এবং সেই তেতো চা অম্লানবদনে পান করিলেন।

সেইদিন মনি-অর্ডারে সই করিতে গিয়া আড়ষ্টভাবে A, k, h, অক্ষরগুলি ওপর ওপর লিখিতেছেন দেখিয়া সেবক নিজেই সই করিয়া পিয়নকে বিদায় করিল। বেলা ২।৩টায় অতিথি-ভবন নির্মাণের জন্য ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে কিছু কথা হইল, কিন্তু যখন প্ল্যানটি দেখিতে লাগিলেন, তখন হাত খুব কাঁপিতে লাগিল বলিয়া তাঁহাদের বিদায় দিয়া শুইয়া পড়িলেন।

বিকাল ৪৷৫ টার সময় বাবা বাইরে বারান্দায় চেয়ারে বসিয়া আছেন, কাছে দু-একটি ভক্ত। বাবা বলিতেছেন, "যারা সব এখানে আছে—আমার শেষ সময়ে সেবা করছে, তারা আমার একান্ত আপনার, তারা কিছু চায় না,—শুধু আমাকে চায়। যারা কিছু চায় না, তারা সব পায়।"

৫. ২. ৩৭—শুক্রবার, কয়েকদিন হইতে তোড়-জোড় চলিতেছিল, আজ সকালে তিনজনকে ম্যাজিক লণ্ঠন লইয়া গ্রামে গ্রামে যাইতে বলিলেন। তাঁহারা ৮৷৮৷ টার সময় চলিয়া গেলে বাবা খুব তৃপ্তির সহিত তাঁহাদের যাওয়া দেখিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, "দেখ্, দেখ—কি-রকম যাচ্ছে দেখ।"

*　　*　　*

খানিক পরে 'স্মৃতিকথা'র লিপিগুলি আনিতে বলিলেন; আনিলে পর লিখিতে বলিলেন, "জামনগরে সেবাব্রতের সূচনা, খেতড়িতে উহার বিকাশ, মুর্শিদাবাদে উহার প্রসার ও পরিণতি।"

*　　*　　*

তারপর বাবা নিজেই পায়ের মোজা খুলিতে গেলেন, পারিলেন না। সেবক খুলিয়া দিলে পর বলিলেন, "শোব।" দুইজন সেবক তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া বিছানায় শোয়াইয়া দিল, তখন বাবা বলিলেন, "বাতাস কর।" তারপর বলিলেন, "সকলকে ডাকো।" বেলা ১০টা। সকলে ঘরে আসিলে বলিলেন, "কে কি ভাব নিয়ে আছে, সব দেখতে পাচ্ছি—কাঁচের আলমারির মতো। আমি সকলকে আশীর্বাদ ক'রে যাচ্ছি—আমি ঠ'কব কেন? যারা সেবা করেছে, যারা কষ্ট দিয়েছে, যারা কাছে আছে, যারা দূরে আছে—সকলকে আশীর্বাদ করছি, সকলের ভাল হোক।"

এই কথা বলিয়াই বাবা শুইয়া পড়িলেন। এই তাঁহার শেষশয্যা।

বুদ্ধ

ডক্টর সচ্চিদানন্দ ধর

ভূমার আনন্দ রাজে এ বিশ্বসংসারে।
অল্প সুখে মত্ত যেই বুঝিতে না পারে॥
বিত্ত হতে চাহে সুখ, চাহে লোক-মান।
পুত্র হতে সুখ চায়,—যে জন অজ্ঞান॥
বিত্তসুখ, লোকমান্য, পুত্রসুখ আর।
ভোগকরি' দেখে নর সকলি অসার॥
বুঝিয়াও নারে জীব ছাড়িতে সংসার।
কর্মপাশে বদ্ধ হয়ে ভ্রমে চক্রাকার॥

ভোগের প্রাচুর্যমাঝে হেরি দুঃখ-দোষ।
সর্বভোগরসে থাকি' না পেলে সন্তোষ॥
করিলে প্রব্রজ্যা ত্যজি' বিত্তদারাপত্য।
প্রজ্ঞার আলোকে পেলে চারি আর্যসত্য॥
করিয়া কঠোর তপঃ লভিয়া নির্বাণ,
দেখাইলে বিশ্বে বুদ্ধ! ভূমার সন্ধান॥

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ও বাংলার রঙ্গমঞ্চ

[পূর্বানুবৃত্তি]

ডক্টর প্রণবরঞ্জন ঘোষ

'চৈতন্যলীলা'র চতুর্থ অঙ্কের দ্বিতীয় ও তৃতীয় গর্ভাঙ্কে 'নিমাই সন্ন্যাসে'র মূল ঘটনা নাট্যাকারে রূপায়িত। বাঙালীহৃদয়ে এই ঘটনা সাধারণতঃ শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর মর্মবেদনার মাধ্যমেই ভাবাবেগের ব্যাকুল প্রকাশরূপে চিরবন্দিত। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, চৈতন্যজীবনের আদিগ্রন্থ বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতে এ ঘটনাটি সর্বস্বত্যাগের সংযত মহত্ত্বে সবরকম বাহুল্যবর্জিত রূপ পেয়েছে। গিরিশচন্দ্র ঠিক সেই কবিত্বশক্তির পরিচয় না দিলেও অনাবশ্যক অশ্রুপাতের সমারোহ না ঘটিয়ে সর্বজীবের কল্যাণে নিমাইয়ের আত্মত্যাগের কথাটিই প্রধান বিষয়রূপে উপস্থাপিত করেছেন। বিষ্ণুপ্রিয়ার স্থান এখানে আরও সঙ্কুচিত। শচীদেবী ও অদ্বৈত নিত্যানন্দ হরিদাস শ্রীবাস প্রভৃতির উপস্থিতিই প্রাধান্য লাভ করেছে। স্বভাবতই ক্ষুদ্র গৃহাঙ্গন থেকে অনন্ত ভাবলোকে উত্তীর্ণ হওয়ার পথে নিমাইয়ের এই পরমযাত্রায় করুণরস নয়, শান্তরসই ফলশ্রুতি।

চৈতন্যজীবনীকাব্যে দেখি জননী শচীদেবী ও দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া—দু'জনেই নিমাইয়ের সন্ন্যাস-সঙ্কল্পের কথা জানতেন এবং এ বিষয়ে আলোচনার দ্বারা দুই পক্ষের বোঝাপড়া হয়েছিল। গিরিশচন্দ্র এ নাটকে বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে নিমাইয়ের এ বিষয়ে আলোচনার অংশটুকু নাটকীয় গতিবেগের জন্যই পরিহার করেছেন। যদিও এর ফলে বিষ্ণুপ্রিয়ার মহিমা অস্পষ্টই থেকে গেছে। সন্ন্যাসগ্রহণের জন্য তাঁর গৃহত্যাগের রাতে অবশ্য বিষ্ণুপ্রিয়া নিদ্রামগ্ন ছিলেন, কিন্তু শচীমাতা জাগ্রত থেকে ঘরের দুয়ারে অপেক্ষা করছিলেন।

বৃন্দাবনদাসের বর্ণনায় নিমাইয়ের সংসারত্যাগের মুহূর্তটি—

সভারে বিদায় দিয়া প্রভু বিশ্বম্ভর।
ভোজনে বসিলা আসি ত্রিদশ-ঈশ্বর॥
ভোজন করিয়া প্রভু মুখ শুদ্ধ করি।
চলিলা শয়নগৃহে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥
যোগনিদ্রা প্রতি দৃষ্টি করিলা ঈশ্বর।
নিকটে শুইলা হরিদাস গদাধর॥
আই জানে—আজ প্রভু করিব গমন।
আইর নাহিক নিদ্রা কান্দে অনুক্ষণ॥
দণ্ড চারি রাত্রি আছে ঠাকুর জানিয়া।
উঠিলেন চলিবারে সামগ্রী লইয়া॥
গদাধর হরিদাস উঠিলেন জানি।
গদাধর বোলেন, "চলিব সঙ্গে আমি।"
প্রভু বলে "আমার নাহিক কারো সঙ্গ।
এক অদ্বিতীয় সে আমার সর্ব রঙ্গ॥"
আই জানিলেন মাত্র প্রভুর গমন।
দুয়ারে বসিয়া রহিলেন ততক্ষণ॥
জননীরে দেখি প্রভু ধরি তান কর।
বসিয়া কহেন তানে প্রবোধ উত্তর॥

মায়ের সঙ্গে সংসারত্যাগে উদ্যত নিমাইয়ের যে কথাগুলি বৃন্দাবনদাস তাঁর অনুপম ভাষায় উপস্থাপিত করেছেন, তাতে নিমাইয়ের মাতৃভক্তি ও ঈশ্বরানুরাগ দুয়েরই অপূর্ব সম্মেলন।

রোরুদ্যমানা শচীমাতার হাত দুটি ধরে নিমাই বললেন—

"বিস্তর করিলা তুমি আমার পালন।
পড়িলাঙ শুনিলাঙ তোমার কারণ॥
আপনার তিলার্দ্ধেকো না লইলা সুখ।
আজন্ম আমার তুমি বাঢ়াইলা ভোগ॥
দণ্ডে দণ্ডে যত তুমি করিলা আমার।
আমি কোটি জন্মেও নারিব শুধিবার॥
তোমার সদ্‌গুণ্য সে তাহার প্রতিকার।

আমি পুনঃ জন্ম জন্ম ঋণী সে তোমার ॥
শুন মাতা ঈশ্বরের অধীন সংসার।
স্বতন্ত্র হইতে শক্তি নাহিক কাহার ॥
সংযোগ বিয়োগ যত করে সেই নাথ।
তাঁর ইচ্ছা বুঝিবারে শক্তি আছে কাত ॥
দশ দিন অন্তরে কি এখনে বা আমি।
চলিলেও কোন চিন্তা না করিহ তুমি ॥
ব্যবহার পরমার্থ যতেক তোমার।
সকল আমাতে লাগে সব মোর ভার ॥
বুকে হাত দিয়া প্রভু বোলে বারে বার।
"তোমার সকল ভার আমার আমার ॥"
যত কিছু বোলে প্রভু শচী সব শুনে।
উত্তর না স্ফুরে কান্দে অঝোর নয়নে ॥

জননীর পদধূলি লই প্রভু শিরে।
প্রদক্ষিণ করি তানে চলিলা সত্বরে ॥
[চৈতন্যভাগবত : মধ্যখণ্ড : সড়বিংশ অধ্যায়]

বৃন্দাবনদাসের কবিত্ব সর্ববাহুল্য-বর্জিত এমন এক গভীরতা লাভ করেছে যে, চৈতন্যজীবনের বাস্তব অনুভূতিজগৎটির স্পর্শ চৈতন্যভাগবতপাঠের সময় আমাদের অন্তরে অন্তরে সঞ্চারিত হতে থাকে।

গিরিশচন্দ্রের শচীমাতা-কল্পনাও বাঙালীঘরের স্নেহবিহ্বলা জননীরই রূপায়ণ। কিন্তু নাটকের প্রথম থেকে শচীর মনে নিমাইয়ের ভবিষ্যৎ-সম্ভাবনার কথা মাঝে মাঝে উঁকি দিয়ে গেছে। মধুরভাবতন্ময় নিমাইকে আমরা গিরিশচন্দ্রের নাটকে তাঁর বাল্য ও কৈশোর থেকে এই পরিণতির পথেই অগ্রসর হতে দেখি। ফলে চতুর্থ অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে নিমাই যখন মায়ের কাছে সন্ন্যাসগ্রহণের সঙ্কল্প ঘোষণা করে বলেন—

মাতা! শুন মন দিয়া,
বিদরে গো হিয়া জীবের দুর্গতি হেরি,
ঘরে আর রহিতে না পারি……—

তখন দর্শকচিত্ত পূর্বপ্রস্তুতির জন্য এ দৃশ্যটিকে একান্ত স্বভাবিকভাবেই গ্রহণ করেন।

একান্ত সন্তানবৎসলা শচীমায়ের ব্যাকুলতা ধ্বনিত হয়—

বাছা! তোরে আমি ছেড়ে নাহি দিব,
যাস যদি, মাতৃঘাতী হবি।

মায়ের কাছে আপন আদর্শের কথা বলতে গিয়ে নিমাই বলেন—

'কৃষ্ণ' বলে কাঁদ মা জননি,
কেঁদ না 'নিমাই' বলে।
'কৃষ্ণ' বলে কাঁদিলে সকলি পাবে,
কাঁদিলে 'নিমাই' বলে নিমাই হারাবে,
কৃষ্ণ নাহি পাবে,
কেঁদ না মা, মায়া কর দূর—
জেন' মাতা কৃষ্ণ মাত্র সার,…
ধন্য তুমি জননী আমার,
পুত্র তব হরিনাম বিলাইবে,
ভবে কেবা হেন গৌরবিনী!

আসন্ন পুত্রবিচ্ছেদ-শোকাতুরা জননীর অশ্রু, মূর্ছা, মর্মবেদনা কোনো কিছুতেই নিমাই আপন সঙ্কল্প থেকে বিচ্যুত হলেন না। কিন্তু শচীমাতার চরিত্রে এর চেয়ে মহনীয় কিছু বৃন্দাবনদাস দেখিয়েছেন, গিরিশচন্দ্রের নাটকে সে মহত্ত্ব ফুটে ওঠার অবকাশ পায়নি। চৈতন্যভাগবতের অনুসরণে সেই অংশটি আমরা স্মরণ করতে পারি, যেখানে নিমাইয়ের সংসারত্যাগের পর অভিভূতা জননী দুয়ারপ্রান্তে নিঃশব্দে বসে আছেন দেখে উৎকণ্ঠিত ভক্তদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি কোনোমতে বললেন—

"শুন বাপ সব।
বিষ্ণুর দ্রব্যের ভাগী সকল বৈষ্ণব ॥"—

এক্ষেত্রে বিষ্ণুর দ্রব্য অর্থাৎ বিষ্ণুভক্ত বলতে তিনি নিমাইকে বুঝিয়েছেন। যে দ্রব্য বা ভক্ত বিষ্ণুর একান্ত আপনার সে দ্রব্য বা ব্যক্তি তো বিশেষ

কোনো একজন মানুষের সম্পদ হতে পারে না—সব বিষ্ণুভক্তেরই তাতে অধিকার। আজ থেকে নিমাই সর্বজগতের হয়ে গেলেন, একা শচীমাতার নিমাই রইলেন না। শচীমাতার চরিত্রচিত্রণে এই উদার সমর্পণের ভাবটি তাঁকে শ্রীচৈতন্যের জননীরূপে যে মহিমা এনে দিয়েছে, প্রচলিত ক্রন্দনপরায়ণা শচীমাতার কাহিনীতে তা ফুটে ওঠে না বলে শচীমাতার চরিত্র সম্বন্ধে পূর্ণ ধারণা আমাদের হয় না। এমন মা না হলে এমন ছেলে হয় না—এ কথা শচীমাতা ও শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধে বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

শ্রীচৈতন্যের মাতৃভক্তির প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মাতৃভক্তির কথাও মনে জাগে। আনুষ্ঠানিক সন্ন্যাস শ্রীরামকৃষ্ণও গ্রহণ করেছেন, কিন্তু পাছে মায়ের মনে ব্যথা লাগে, তাই বাইরে গেরুয়া পরে মার কাছে উপস্থিত হ'ননি। এমন নিঃশেষ ত্যাগের শক্তি তাঁর, তবু বাইরের আচার আচরণ, পোশাক পরিচ্ছদ—এসবের মধ্যে বহিরঙ্গ প্রকাশ সহজে ঘটতে দিতেন না। কিন্তু সহজাত ওই ত্যাগের শক্তিতেই শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরতম পরিচয়। আবার দু'জনেই মায়ের প্রতি মমতায় ও দায়িত্বপালনে আজীবন সতর্কদৃষ্টি।

শ্রীচৈতন্যের এই পরমত্যাগের আদর্শ যে অভিনেত্রী বিনোদিনীকে কী গভীরভাবে আচ্ছন্ন করেছিল, তাঁর 'আমার কথা"য় সে সম্বন্ধে অপরূপ সাক্ষ্য—"সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া মাতা শচীদেবীর নিকট বিদায় লইবার সময় যখন বলিতাম যে—

'কৃষ্ণ বলে কাঁদ মা জননী'···তখন স্ত্রীলোক দর্শকদিগের মধ্যে কেহ কেহ এমন উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতেন যে, আমার বুকের ভিতর গুরগুর করিত। আবার আমার শচীমাতার সেই হৃদয়ভেদী মর্মবিদারণ শোকধ্বনি, নিজের মনের উত্তেজনা, দর্শকবৃন্দের ব্যগ্রতা আমায় এত অধীর করিত যে, আমার নিজের দুই চক্ষের জলে নিজে আকুল হইয়া উঠিতাম। শেষে সন্ন্যাসী হইয়া সঙ্কীর্তনকালে "হরি মন মজায়ে লুকালে কোথাও। আমি ভবে একা দাও হে দেখা প্রাণসখা রাখ পায়।" এই গানটি গাহিবার সময়ের মনের ভাব আমি লিখিয়া জানাইতে পারিব না। আমার তখন সত্যই মনে হইত যে, আমি তো ভবে একা, কেহ তো আমার আপনার নাই। আমার প্রাণ যেন ছুটিয়া গিয়া হরিপাদপদ্মে আপনার আশ্রয়স্থান খুঁজিত। উন্মত্তভাবে সঙ্কীর্তনে নাচিতাম। এক একদিন এমন হইত যে, অভিনয়ের গুরুভার বহিতে না পারিয়া মূর্ছিত হইয়া পড়িতাম।"

সেদিনের অভিনয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেব যে মুগ্ধ হয়েছিলেন, তার সাক্ষ্য 'কথামৃতে' রয়েছে। কিন্তু গিরিশচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে অভিনয় দেখতে বসিয়ে দিয়ে কিছু পরে অসুস্থতার জন্য বাড়ী চলে গিয়েছিলেন।[১] অবশ্য তখন অবধি গিরিশচন্দ্রের জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর পরিপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করেননি। গিরিশচন্দ্রের প্রস্তুতির পরেই অভিনেতা-অভিনেত্রীদের পক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আশীর্বাদলাভ সম্ভব। 'কথামৃতে' এই 'চৈতন্যলীলা'-অভিনয়ের দিনে কোনো অভিনেতা-অভিনেত্রীর প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আশীর্বাদের ঘটনা নেই। মনে হয়, ওই ভূমিকাভিনেত্রী বিনোদিনীর এবং অন্যান্য অভিনেতা-অভিনেত্রীদের কারু কারু কথা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মনে ছিল। গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে পরিচয় গভীরতর হওয়ার পর গিরিশচন্দ্রই কোনো অভিনয়ের শেষে এঁদের রামকৃষ্ণদেবের কাছে উপস্থিত করেন। ১৮৮৪-র

---

১ গিরিশপ্রতিভা : হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত : ধর্মজীবন পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

সেপ্টেম্বরে 'চৈতন্যলীলা'-দর্শন, ঐ বৎসরেই ডিসেম্বরে 'প্রহ্লাদচরিত্র' দেখতেও শ্রীরামকৃষ্ণদেব গিয়েছিলেন। ঐদিনের অভিনয়ান্তে অভিনেতা-অভিনেত্রীরা এসে তাঁকে প্রণাম করছেন—এমন দৃশ্য 'কথামৃতে' রয়েছে। অর্থাৎ এরই মধ্যে গিরিশচন্দ্রের অনুরাগ তাঁর অভিনয়শিষ্য-শিষ্যাদের মধ্যেও সঞ্চারিত হতে শুরু করেছে।

'চৈতন্যলীলা'-দর্শনপ্রসঙ্গে নিমাইসন্ন্যাসের দৃশ্য দুটি দেখতে দেখতে দর্শক শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অবস্থার সাক্ষ্য—"···নিমাই শচীকে সন্ন্যাসের কথা বলিতেছেন। শচী মূর্ছিতা হইলেন। মূর্ছা দেখিয়া দর্শকবৃন্দ অনেকে হাহাকার করিতেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ অনুমাত্র বিচলিত না হইয়া একদৃষ্টে দেখিতেছেন; কেবল নয়নের কোণে এক বিন্দু জল দেখা দিয়াছে!" (কথামৃত : ২য় ভাগ)

এক্ষেত্রে লক্ষণীয়, লেখক গিরিশচন্দ্র, অভিনেত্রী বিনোদিনী এবং দর্শক শ্রীরামকৃষ্ণদেব—তিনজনেই নিমাইয়ের গৃহত্যাগের ঘটনার বেদনার্দ্র দিকটি বড়ো করে না দেখে সর্বজীবের কল্যাণে নিমাইয়ের সন্ন্যাসগ্রহণের ঘটনাকেই বিশেষ মূল্য দিয়েছেন। এই মূল সত্যে প্রতিষ্ঠিত বলেই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছে এ ঘটনার আধ্যাত্মিক সার্থকতাই প্রধান, বিচ্ছেদের করুণরস একান্ত গৌণ। তাই তাঁর নয়নকোণে কেবল 'এক বিন্দু জল'!

সেকালের অনেক বিশিষ্ট সুধী ও ভক্ত বিনোদিনীর 'চৈতন্যলীলা'-অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শী যদুলাল মল্লিকের কাছেই শ্রীরামকৃষ্ণদেব এ অভিনয়ের প্রশংসার কথা শুনেছিলেন। সেই সব অগণিত দর্শকদের মধ্যে বিনোদিনীর কাছে সবচেয়ে স্মরণীয় শ্রীরামকৃষ্ণদেব —"এই চৈতন্যলীলার অভিনয়ে—শুধু চৈতন্যলীলার অভিনয়ে নহে আমার জীবনের মধ্যে চৈতন্যলীলা-অভিনয় আমার সকল অপেক্ষা শ্লাঘার বিষয় এই যে আমি পতিতপাবন ৺পরমহংসদেব রামকৃষ্ণ মহাশয়ের দয়া পাইয়াছিলাম। কেন না সেই পরমপূজনীয় দেবতা চৈতন্যলীলা অভিনয় দর্শন করিয়া আমায় তাঁর শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় দিয়াছিলেন! অভিনয়কার্য শেষ হইলে আমি শ্রীচরণদর্শনজন্য যখন আপিসঘরে তাঁহার চরণসমীপে উপস্থিত হইতাম, তিনি প্রসন্নবদনে উঠিয়া নাচিতে নাচিতে বলিতেন, "হরি গুরু, গুরু হরি," বল মা "হরি গুরু, গুরু হরি," তাহার পর উভয় হস্ত আমার মাথার উপর দিয়া আমার পাপদেহকে পবিত্র করিয়া বলিতেন যে, "মা, তোমার চৈতন্য হউক।" তাঁর সেই সুন্দর প্রসন্ন ক্ষমাময় মূর্তি আমার ন্যায় অধম জনের প্রতি কি করুণাময় দৃষ্টি! পাতকীতারণ পতিত-পাবন যেন আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আমায় অভয় দিয়াছিলেন।"

অনেকদিনের ব্যবধানে লেখা এ স্মৃতিকথায় দিনক্ষণ খুব স্পষ্ট নয়। তবে বিনোদিনী যে বিশেষভাবে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কৃপালাভ করেছিলেন তার আরো প্রমাণ অন্যত্র মেলে। কিন্তু প্রথম দিনের ওই অভিনয়দেখার শেষে শ্রীরামকৃষ্ণদেব যখন রঙ্গালয় থেকে বেরিয়ে এসে গাড়ীতে উঠতে যাচ্ছেন, তখন একজন ভক্তের 'কেমন দেখলেন?' জিজ্ঞাসার উত্তরে হাসতে হাসতে বলেছিলেন, "আসল নকল এক দেখলাম।"—সেই একটি উত্তরেই কি বিনোদিনীর ও গিরিশচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ পুরস্কারলাভ ঘটে যায়নি?

আসল—শ্রীচৈতন্য, নকল—'চৈতন্যলীলা' নাটক, বিনোদিনীর ও অন্যান্যদের অভিনয়। আর এক 'আসল' জীবনসত্য আমাদের সামনেই রয়েছেন—তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁর চোখেও যে নকল আসলের রূপ ধরতে পারে, দুনিয়ার সেই তো সেরা অভিনয়। 'চৈতন্যলীলা'-অভিনয়-তন্ময় শ্রীরামকৃষ্ণ সেই পরমসত্যের প্রকাশকে বাংলার রঙ্গালয়ে প্রতিষ্ঠিত করে এলেন।

॥ চৈতন্যলীলাপর্ব-সমাপ্ত ॥

এ দেশের নারীপ্রগতি ও নিবেদিতা

শ্রীঅলকরঞ্জন বসুচৌধুরী

"তোমাকে অকপটভাবে বলছি, এখন আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে যে, ভারতের কার্যে তোমার অশেষ সাফল্যলাভ হবে। ভারতের জন্য, বিশেষতঃ ভারতের নারীসমাজের জন্য, পুরুষ অপেক্ষা নারীর—একজন প্রকৃত সিংহিনীর প্রয়োজন। ভারতবর্ষ এখনও মহীয়সী নারীর জন্মদান করতে পারছে না, তাই অন্যজাতি থেকে তাকে ধার করতে হবে। তোমার শিক্ষা, ঐকান্তিকতা, পবিত্রতা, অসীম প্রীতি, দৃঢ়তা এবং সর্বোপরি তোমার ধমনীতে প্রবাহিত কেল্‌টিক রক্তই তোমাকে সব দিক দিয়ে সেই উপযুক্ত নারীরূপে গঠন করেছে!"

চিঠিটি স্বামী বিবেকানন্দ লিখেছিলেন মিস্ মার্গারেট নোবলকে। তখনও তিনি ভারতাত্মার বেদীমূলে নিবেদিতা হননি। কিন্তু তখনই বিবেকানন্দ চিনতে পেরেছিলেন তাঁর ভেতরকার সিংহিনীকে। মহাসন্ন্যাসীর যুগদৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল এই সত্য যে, ভারতীয় নারীরা অন্তরের সম্পদে গরিমময়ী হলেও পার্থিব জগতের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে, বহির্বিশ্বের জ্ঞান-বৈভবে তারা অনগ্রসর তাই স্বামীজী চেয়েছিলেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের জীবনাদর্শের একটি যুগোপযোগী সমন্বয়সাধন করতে। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন—"এক পাখায় ভর করে পাখী কখনও উড়তে পারেনা।" তাই নারীজাগরণও চাই; আর এজন্য চাই এমন মানুষ যে ভারতকে দান করবে ব্যবহারিক শিক্ষা আর গ্রহণ করবে ভারতের অন্তরের শিক্ষা—তার ধর্মভাবনা। বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতার সুষম মিলনের জন্য বিবেকানন্দের ঐ স্বপ্নকল্পনা ভূমিলাভ করেছিল নিবেদিতার চরিত্র-ভিত্তিতে—যে চরিত্রে একাধারে ছিল অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও ক্ষুরধার মনীষা, সত্যের প্রতি সুতীব্র তৃষ্ণা এবং ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা। বিবেকানন্দ তাই বুঝেছিলেন নিবেদিতাই ভারতীয় নারীজাগরণে সবচেয়ে বেশী কাজ করতে পারবেন। আর কার্যতঃ পেরে-ছিলেনও তাই। সেই যে সত্যেন্দ্রনাথ লিখেছিলেন নিবেদিতার উদ্দেশে—

প্রসূতি না হয়ে কোলে পেয়েছিল পুত্র যশোমতী,
তেমনই তোমারে পেয়ে হৃষ্ট হয়েছিল বঙ্গ অতি;
তপস্যার পুণ্য তেজে করেছিলে অসাধ্য সাধন—
জেলেছিলে স্বর্ণদীপ অন্ধকারে, নব উদ্বোধন
করেছিলে জীর্ণ বিল্বমূলে মাতৃরূপা শকতির—···

এ অতি ঠিক কথা। ভারতীয় নারীর জাগরণে সর্বপ্রথম যিনি একসঙ্গে গভীর এবং ব্যাপক ভূমিকা নিয়েছিলেন, ভাবলে আশ্চর্য বোধ হয়, তিনি একজন নারী এবং বিদেশিনী। সত্যিই তিনি ভারতে মাতৃশক্তির নব উদ্বোধন করেছিলেন।

নিবেদিতার পূর্বে যাঁরাই এদেশে কোন সংস্কারকার্যে হাত দিয়েছেন, দেশীয় শাস্ত্রের সমর্থন নিয়েই নেমেছেন। ভারতের প্রাচীন আদর্শকে কেউই উপেক্ষা করেননি। নিবেদিতার আগে নারীপ্রগতির যাঁরা ভগীরথ ছিলেন, সেই রামমোহন কিংবা নারীশিক্ষার পথিকৃৎ বিদ্যাসাগর সবাই স্বীয় কাজের সপক্ষে শাস্ত্রবচন উদ্ধার করেছেন। নিবেদিতারও ছিলো ভারতীয় সভ্যতা ও কৃষ্টির ওপর অপরিসীম ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা। কিন্তু বিদ্যা-সাগর বা রামমোহনের প্রয়াসের সঙ্গে তাঁর প্রয়াসের একটি বৈপরীত্য আমরা লক্ষ্য করি শিক্ষাপদ্ধতি ও শিক্ষাদর্শের ক্ষেত্রে। ভারতীয়

হওয়া সত্ত্বেও রামমোহন কিংবা বিদ্যাসাগর যেখানে নির্দ্বিধায় পাশ্চাত্যজ্ঞানের পঠন-পাঠনের পক্ষে রায় দিয়েছিলেন, সেখানে বিদেশিনী নিবেদিতা নির্দ্বিধায় বলেছিলেন শিক্ষা হবে সম্পূর্ণ ভারতীয় আদর্শে এবং ভারতীয়দের জন্য আধুনিক বিজ্ঞান-শিক্ষা অত্যাবশ্যক একথা বলার পরও ভারতীয় শিক্ষার ওপর উল্লেখযোগ্য মমত্ববোধ করেছিলেন। অবশ্য এ আপাত-বৈপরীত্য।

বিদ্যাসাগর শুধু মেয়েদের বিদ্যাশিক্ষা দেবার জন্য স্কুল করেছিলেন। নিবেদিতা এ কাজকে আরও এগিয়ে নিয়ে গেলেন—তাঁর শিক্ষা সর্বাঙ্গীণ শিক্ষা। এদিক দিয়েও তিনি স্বামীজীর মানসকন্যা—"Man-making" অর্থাৎ শুধু পণ্ডিত তৈরি করাই নয়, চরিত্রগঠনও তাঁর লক্ষ্য। এবং তা গঠিত হবে সম্পূর্ণ ভারতীয় ধাঁচে। "জাতীয় শিক্ষা" বলতে নিবেদিতা এই বোঝেন।

নিবেদিতার সঙ্গে পরিচয়ের কিছুদিন পরেই স্বামীজী একদিন তাঁকে সোজাসুজি বলেছিলেন, "স্বদেশের নারীর কল্যাণকল্পে আমার কতগুলো সংকল্প আছে, আমার মনে হয় সেগুলোকে কাজে পরিণত করতে তুমি বিশেষভাবে সাহায্য করতে পারো।" স্বামীজীর সংকল্পকে কাজে রূপ দিতে এবং নিজের হৃদয়াকূতির তৃষ্ণানিবারণ করতেও বটে, নিবেদিতা ভারতে এসেছিলেন ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে। নিবেদিতা নিজেও ছিলেন শিক্ষাবিদ্। বহু বিদ্যালয়ে তিনি ইতিমধ্যেই শিক্ষকতা করেছেন এবং স্ত্রশিক্ষার বিষয়ে সংস্কারমূলক চিন্তা করতে শুরু করেছেন।[১] স্বামীজীর সঙ্গে পরিচয়ের পূর্বেই যে নিবেদিতা একজন "অসাধারণ পারদর্শী শিক্ষক" এবং বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্রূপে ইংলণ্ডের সুধীসমাজে সুপরিচিত ছিলেন, সেকথাও জানা যাচ্ছে।[২] এসব অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও এদেশে এসেই তিনি আরও অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য শ্রীমতী অবলা বসুর স্কুল, মাতাজীর পাঠশালা, বেথুন স্কুল ইত্যাদি বালিকাবিদ্যালয়গুলো পরিদর্শন করেন। তারপরই স্বামীজীর সংকল্প আর নিবেদিতার পরিকল্পনা মিলে জন্ম হয় শ্রীরামকৃষ্ণ বালিকাবিদ্যালয়ের বাগবাজারে বোসপাড়া লেনে। কলকাতার এক অখ্যাত গলিতে ভারতের এক মহাযজ্ঞের সূচনা। ছোট ছোট বালিকারা এই বিদ্যালয়ের ছাত্রী, যাদের নিবেদিতা স্বয়ং ভিক্ষা করে এনেছিলেন অভিভাবকদের কাছ থেকে। সমাজের কঠোর অনুশাসন, গৃহকোণের বন্দিদশা এবং অভিভাবকদের ঔদাসীন্যের ঊর্ধ্বে বালবিধবা, বিবাহিতা এবং কুমারী কয়েকটি বঙ্গললনার এই যে বৃহত্তর জীবনের আলোকাভিসার নিবেদিতা যুগপৎ তার ধাত্রী এবং নেত্রী। বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠার দিন শ্রীমা সারদামণি এসেছিলেন উদ্বোধন করতে। এ ঘটনা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ! শ্রীমা আশীর্বাদ করে বলেন, "আমি প্রার্থনা করছি, এই বিদ্যালয়ের ওপর যেন জগন্মাতার আশিস বর্ষিত হয়, এখানকার মেয়েরা যেন আদর্শ বালিকা হয়ে ওঠে।" ঠিক যেন নিবেদিতার মনের কথাগুলো! আর নিবেদিতা ভারতের যে আদর্শে শিক্ষা দেবার পক্ষপাতী, ভারতীয় রমণীর সেই উচ্চতম আদর্শ, সেই ত্যাগ, সেই করুণা, সর্বোপরি সেই পবিত্র ঈশ্বরানুরক্তি ও সহনশীলতা—নিবেদিতার চোখে সারদাদেবীই তো তার বিগ্রহমূর্তি! বাইরে বিদুষী এবং অন্তরে সারদা মা'র মতো গরীয়সী—এই তো নিবেদিতার আদর্শ ভারতনারী। এ জন্য নিবেদিতা চিরদিন সারদাদেবীকে তাঁর ছাত্রীদের

---

১ দ্রষ্টব্য—নিবেদিতার বোন মিসেস উইলসনের স্মৃতিকথা।

২ নিবেদিতার দেহত্যাগের পর 'টাইম্স পত্রিকা'র বিবরণ (২৬.১০.১৯১১) ও অন্যান্য পত্রিকার বিবরণ দ্রষ্টব্য।

কাছে আদর্শরূপে স্থাপন করে এসেছেন, নিজের ছাত্রীদের দিয়ে তাঁর চরণে পুষ্পাঞ্জলি পর্যন্ত দিয়েছেন।

নিবেদিতার মতে শিক্ষাই ভারতবর্ষের প্রধান সমস্যা, অন্নবস্ত্রের চেয়েও বড় সমস্যা। স্বীয় গুরু বিবেকানন্দের মতোই নিবেদিতার কাছেও চরিত্র-বর্জিত শিক্ষার কোনো মানে ছিল না। চরিত্র-গঠনের জন্য কতগুলো চরিত্রকে তিনি মেয়েদের চোখের সামনে খাড়া করতেন—অতি অবশ্য ভারতীয় চরিত্র। শিক্ষার্থীরা যাতে হীনম্মন্যতায় পীড়িত না হয়, উপরন্তু জাতীয় গৌরববোধে উজ্জীবিত হয় সেজন্য নিবেদিতা সব ব্যাপারে ভারতীয় ইতিহাস, পুরাণ থেকে দৃষ্টান্ত চয়ন করতেন। তিনি বোঝাতে চাইতেন জীবনের সর্বাঙ্গীণ ক্ষেত্রে কোন বিষয়েই ভারতের আদর্শের কোনো ন্যূনতা নেই, তাকে পাশ্চাত্যের দ্বারস্থ হবার কোনো প্রয়োজন নেই। তিনি সেজন্য চরিত্রের ক্ষেত্রেও বলতেন, নারীজীবনের সবরকম উৎকর্ষের উদাহরণ ভারতের ইতিহাসেই আছে—বীরাঙ্গনা, পতিব্রতা, সম্রাজ্ঞী, সাধিকা, কুমারী বা মাতা। গান্ধারী ছিল তাঁর প্রিয়তম চরিত্র।

নিবেদিতার শিক্ষাচিন্তার পরিচয় ছড়িয়ে আছে তাঁর শিক্ষাবিষয়ক অসংখ্য লেখায়। ভারতীয় নারীর আধুনিক ব্যবহারিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেও তিনি ভারতের চিরাচরিত কৃষ্টিগত নারীশিক্ষাকেই চিরন্তন নারী-আদর্শ বলে নির্দেশ করেছিলেন: "...নারীকে নিঃসন্দেহে সকল কার্যে নিপুণা হতে হবে। মহীয়সী নারী ছিলেন বলেই সীতা ও সাবিত্রীর পত্নীত্বে উচ্চাসন লাভ করা সম্ভব হয়েছিল। জীবনের প্রতিক্ষেত্রে প্রত্যেকটি কাজ তাঁরা পূর্ণ দায়িত্বের সঙ্গে সুচারুরূপে সম্পন্ন করেছিলেন। উভয়েই সমাজের প্রত্যেকটি দাবী পূরণ করে-ছিলেন।...পত্নীরূপে তাঁরা পূর্ণতা লাভ করেছিলেন, কিন্তু যদি তাঁরা পরিণীতা না হতেন—কন্যা, ভগিনী এবং শিষ্যারূপেও অনুরূপ পূর্ণতা লাভ করতেন। এইভাবে জীবনের সকল অবস্থায় সমান দক্ষতালাভ, পত্নীত্বের পূর্বে নারীত্বে এবং নারীত্বের পূর্বে মানবত্বে আরূঢ় হবার বৈশিষ্ট্য অর্জন—প্রত্যেক যুগে নারীশিক্ষার লক্ষ্য বলে গণ্য হওয়া উচিত।"—['ভারত-রমণীর ভবিষ্যৎ শিক্ষা' নামক প্রবন্ধ[৩] থেকে]। নিবেদিতা একথা যে শুধু প্রবন্ধেই লিখেছেন তাই নয়, তাঁর ছাত্রীদেরও সর্বদা বলতেন।

কিন্তু আধুনিক কালের শিক্ষার সঙ্গে সনাতনী ভারতীয় শিক্ষার কোনো কোনো ক্ষেত্রে যে বিরোধ বাধছে নিবেদিতা সে সম্পর্কে বেশ সচেতন ছিলেন। হিন্দুনারীর শিক্ষা নিবেদিতার চোখে বিন্দুমাত্রও হেয় নয়, শুধু বাস্তব অসুবিধা হচ্ছে যুগের সঙ্গে তাকে খাপ খাওয়ানো। নিবেদিতা লিখছেন: "স্বধর্মপরায়ণা হিন্দুনারীর পক্ষে আত্মোন্নতির চরমে উপনীত হবার যে অসংখ্য বিশিষ্ট মানসিক চিন্তাধারা রয়েছে, পাশ্চাত্য মনের নিকট তা' সত্যিই গোলকধাঁধার ন্যায় প্রতীয়মান হবে। সুতরাং সাধারণতঃ যেমন মনে করা হয়, প্রকৃতপক্ষে তেমন অশিক্ষিতা হওয়া দূরে থাক রক্ষণশীলা হিন্দুনারী এমন শিক্ষা-লাভ করেছে, যা তার নিজস্ব ভাবে অত্যন্ত বৈশিষ্ট্য-পূর্ণ, কেবল আধুনিক ব্যক্তি দ্বারা এইজাতীয় শিক্ষা মূল্যবান বলে স্বীকৃত নয়।"—[পূর্বোক্ত প্রবন্ধ]। আসল কথা, ভারতনারীর শিক্ষার জন্য দেশ ও জাতিগত আদর্শকে বিরাট মর্যাদা দিলেও নিবেদিতা যুগগত আদর্শের গুরুত্বকেও ছোট করার চেষ্টা করেননি, কারণ ইতিহাসের সন্ধানী ছাত্রী বুঝেছিলেন, "কোন একটি জাতিকে কেবল

---

৩ Hints on National Education in India—by Sister Nivedita

তার নিজস্ব অতীত ও স্থানের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলেই চলবে না, অন্যান্য জাতির সঙ্গেও তাকে তুলনা করতে হবে।" এজন্যই চাই শিক্ষাবিষয়ে সমন্বয়পূর্ণ সিদ্ধান্ত—নিবেদিতা সঙ্গতভাবেই সিদ্ধান্ত করেছেন। সমন্বয় অর্থে প্রাচীন অধ্যাত্মবাদী চিন্তাধারার সঙ্গে এ যুগের বিজ্ঞানমুখী দৃষ্টিভঙ্গীর সমন্বয়—এক কথায় ঐতিহ্য ও আধুনিকতার সমন্বয়। এই সমন্বয়ের জন্যই ভারতীয় সনাতন পদ্ধতির কিছু পরিবর্তন দরকার। "জাতীয় শিক্ষা" সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন, "ভারতের বিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই এই সঙ্কটকালে স্ত্রীশিক্ষার পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে একমত।...এই পরিবর্তন কেমন হবে সেটাই প্রশ্ন। আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রেখে, দেশের বর্তমান পরিস্থিতির উপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে, বিদেশী শিক্ষার অনুকরণ দ্বারা যথার্থ ফললাভ অসম্ভব।" অনুকরণ, নিবেদিতার মতে শুধু ক্ষতিকরই নয়, নিষ্প্রয়োজনও। তিনি বলেছেন, "অতীতের হিন্দুরমণীরা কি লজ্জার কারণ ছিলেন যে, তাঁদের প্রাচীন সৌন্দর্য, মাধুর্য, নম্রতা ও ধর্মশীলতা আর প্রেমকরুণার শিশুসুলভ গভীরতা বর্জন করে পাশ্চাত্য সভ্যতার ব্যর্থ অনুকরণ করতে যাবো! সেইসঙ্গে বলেছেন, "ভারতীয় নারীদের জন্য এমন একটা শিক্ষাব্যবস্থার প্রয়োজন, যার লক্ষ্য হবে মানসিক ও আধ্যাত্মিক বৃত্তিগুলোর পরস্পর সহায়ে বিকাশসাধন।" এখানেই নিবেদিতার আদর্শ এককথায় ব্যক্ত হয়েছে।

স্ত্রীশিক্ষাবিস্তার-প্রকল্পে নিবেদিতা বিদ্যাসাগর এবং তৎপরবর্তী অন্যান্য শিক্ষাব্রতীদের নানা দিক দিয়েই ছাড়িয়ে গেলেন। শিক্ষাদান শুরু করলেন তিনি কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতিতে। ছোট মেয়েদের শিক্ষা দেবার এ প্রণালীতে তাঁর নিজ দেশে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন। আর শুধু বিদ্যাশিক্ষাই নয়, শিল্পশিক্ষাও। কাউকে কিছু ঘাড়ে ধরে তিনি করাতেন না, যার যে দিকে স্বাভাবিক ঝোঁক আছে ছবি আঁকা, রং-এর কাজ, সেলাই বা বোনা। বিভিন্ন ধরনের আলপনা, ছাঁচ, মাটির পুতুল, কাশ্মীরী শাল, বা পুরানো কাঁথার নক্সা প্রভৃতি সংগ্রহ করতে মেয়েদের উৎসাহিত করতেন।[৪] তাদের উৎসাহ বাড়াবার জন্য তাদের তৈরী হস্তশিল্পের প্রদর্শনী করে সকলকে দেখাতেন। শিক্ষাকে প্রিয় করে তোলার এই পদ্ধতি নিবেদিতার কাছে বর্তমান ভারতের শিক্ষণীয়। শিক্ষার বিষয় ছাত্রীদের কাছে উপাদেয় করবার জন্য মাঝেমাঝেই নানা জায়গায় বেড়াতে নিয়ে যেতেন—সেটাই শিক্ষার একটা সুন্দর মাধ্যম।

কিন্তু সর্বোপরি পদ্ধতিটা জাতীয়! অর্থাৎ সব শিক্ষণীয় বিষয়েই দেশের ধর্ম, ইতিহাস, সংস্কৃতিকে উচ্চাসন দেওয়া। বিদেশী শিক্ষা জোর করে গিলিয়ে দিতে তিনি রাজী ছিলেন না। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায়, রবীন্দ্রনাথ একবার নিবেদিতাকে অনুরোধ করেছিলেন তাঁর কন্যার ইংরেজী শিক্ষার ভার নেবার জন্য, কিন্তু নিবেদিতা রাজী হননি ঐ কারণে। তিনি দেশের গৌরব সম্পর্কে দেশের মেয়েকে সচেতন করে তুলতে চাইতেন, তাই ইতিহাস ছিল তাঁর প্রিয় বিষয়। ছাত্রীদের হয়তো রাজপুতানার ইতিহাস পড়াতে পড়াতে প্রাণস্পর্শী ভাষায় নিজের রাজস্থান-ভ্রমণকাহিনী শোনাচ্ছেন। সেই বর্ণনা—রানী পদ্মিনী যেখানে প্রাণবিসর্জন দিয়েছিলেন সেখানে বসে চোখ বুজতেই মনে এলো পদ্মিনীদেবীর শেষমুহূর্তের কথা, সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন সেখানেই। এই বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ "শান্তি, শান্তি! কি সুন্দর!" উচ্চারণ এবং আবার ধ্যানমগ্ন!

---

৪ 'স্মৃতির পাতা থেকে'—নির্ঝরিণী সরকার, শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩৫৫

ছাত্রীদের যাদুঘরে নিয়ে গেছেন, ছাত্রীরা দেখতো সম্রাট অশোকের প্রস্তরস্তম্ভের টুকরো স্পর্শ করে তাঁর নীল চোখে এক আশ্চর্য দ্যুতি : "এই পাথর যখন স্পর্শ করি, তখন মনে হয় সম্রাট্ অশোকও হয়তো একদিন এই পাথরখণ্ডটা ছুঁয়েছিলেন।" বলতে বলতে ভাবাবেশে বুঁজে এলো তাঁর চোখ! —[নিবেদিতার ছাত্রী নির্ঝরিণী সরকারের স্মৃতি-কথা]। নিজের উইলে তিনি ভারতীয় নারীর শিক্ষার জন্য যে অর্থ রেখে যান, সেখানেও "জাতীয় পদ্ধতি" কথাটা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছিলেন।

স্বাভাবিকভাবেই এর থেকে ছাত্রীরা জাতীয়তাবোধে দীক্ষিত হয়েছিল। আর নিবেদিতার প্রচণ্ড ভারতপ্রেম তাদের সাক্ষাৎভাবেও স্বাদেশিকতায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। মেয়েদের অন্তরে তিনি জ্বলন্ত বর্ণে লিখে দিয়েছিলেন একটি পাঁচ অক্ষরের নাম, বলা উচিত মন্ত্র—"ভারতবর্ষ"! স্বামীজীর পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্রহ্মচারিণী স্বদেশ-ব্রতীর দলপত্তনের ইচ্ছে ছিল তাঁর। দেশ-নেতাদের ভাষণ শুনতে নিবেদিতা অনেকবার তাঁর ছাত্রীদের নিয়ে গেছেন। স্বদেশী আন্দোলনের প্রতি শ্রদ্ধা ও সমর্থনের চিহ্নস্বরূপ স্বদেশী মেলায় ছাত্রীদের হস্তশিল্পজাত নানা দ্রব্য দিয়েছিলেন। বিলাতী বর্জনের সময় হাতে তৈরী দেশী সাবান তাঁর বিদ্যালয়ে বিক্রি হতো। এই স্বাবলম্বনের জন্য তিনি চরকা এনে তাঁর ছাত্রীদের সুতোকাটা শিখিয়েছিলেন। গান্ধীজীর খাদি-আন্দোলনের সেটি বহু আগের কথা! বিদ্যালয়ের বিভিন্ন স্তবের সঙ্গে "বন্দেমাতরম্"ও গীত হতো। ভারতরমণীদের স্বদেশের মুক্তিযজ্ঞে উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছিলেন শিখাময়ী : "ভারত-রমণীর কণ্ঠস্বর আমাদের আহ্বান করছে। যতদিন না আমরা …তাঁকে সাদর…প্রতিষ্ঠা দান করবো ততদিন মাতৃভূমি বিশ্বসভায় দৃষ্টিহীনা, নিষ্ক্রিয়া, অবগুণ্ঠিতা থাকবেন।… যেদিন ভারতরমণীরা জাতীয়তার মহাব্রতি-সম্পাদনে সক্ষম হবেন, সেদিন আবার এই দেবমন্দির আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। আর অচিরেই দেখা দেবে প্রভাতের মধুর আলোক!" এই আলোক স্বাধীনতার আলোক। আর নিবেদিতা ছিলেন তার আলোক-দিশারী। জীবনের সর্বক্ষেত্রে জাতীয়তাবোধকে রূপায়িত করে তুলবার শিক্ষা এদেশে ভগিনী নিবেদিতার অক্ষয় অবদান। দেশ যাতে একটি অলীক কল্পনা না হয়ে জীবন্ত আরাধ্য হয়ে ওঠে সেজন্য তিনি, মেয়েদের শিখিয়েছিলেন দেশকে পুজো করতে। ভারতের চিন্তায় ধ্যানমগ্না হয়ে যেতেন তিনি, বলতেন, "ভারতের কন্যাগণ, তোমরা সকলে জপ করবে—'ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষ! মা, মা, মা'!" এই বলে নিজেই জপ করতেন, "ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষ! মা, মা, মা!"

নানা স্থানে বক্তৃতা করেও তিনি ভারত-নারীদের মধ্যে জাতীয়তার ভাব প্রচার করতেন। ১৯০২ সালে মাদ্রাজের নারীসমাজের কাছে একটি বক্তৃতায় বলেন, "আমি আপনাদের কাছে একটিমাত্র শব্দ উপস্থিত করতে চাই, যে শব্দ আপনাদের প্রতি নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে যেন উচ্চারিত হয় সেটি হলো জাতীয়তা!" মাদ্রাজেরই আর একটি নারীসভায় তিনি বলেন, "স্বামীজীর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, ভারতের ভবিষ্যৎ তার পুরুষের চেয়ে নারীর ওপরই বেশী নির্ভর করছে।…সীতা ভারতের নারী ছিলেন - সেই রকম সাবিত্রী ও উমা। কঠোর তপস্যা দ্বারা মহাদেবকে লাভ করা— এই হলো ভারতীয় নারীর চিত্র!" নিবেদিতা জানতেন, যে হাত দোলনা দোলায় সে হাতই ধরিত্রী শাসন করে। তাই সেই মাতৃজাতির কাছে তুলে ধরলেন মহত্ত্বের আদর্শ— "ভারতীয় মাতা ও বধূ, আপনাদের একথা স্মরণ করিয়ে দেবার প্রয়োজন নেই, শ্রীরাম শ্রীকৃষ্ণ

এবং শঙ্করাচার্য * তাঁদের মায়ের কাছে কতদূর প্রেরণা লাভ করেছিলেন। অসংখ্য নারী তপস্বিনীর মতো নীরব শান্ত জীবন অতিবাহিত করে গেছেন! বিশ্বস্ত থাকাই ছিল তাঁদের গৌরব, পূর্ণতা লাভ করাই ছিল তাঁদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ··। ভারতীয় মাতাদের কাছে নিবেদিতা সেই প্রাচীন ভারতের মহৎ বীর সন্তানদের দেখতে চাইতেন। জননীদের কাছে আবেদন করলেন প্রত্যেক মাতা যেন তাঁর পুত্রের মধ্যে ব্রহ্মচর্যের তৃষ্ণা জাগিয়ে তুলে ভারতের ছাত্রজীবনের মহত্তম আদর্শ রক্ষা করেন। বললেন, প্রত্যেক জননী যেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেন যে, তাঁর সন্তানেরা মহৎ হবে।

"দ্বিতীয়তঃ," নিবেদিতা বললেন, "আমরা কি নিজেদের এবং সন্তানসন্ততিদের মধ্যে পরদুঃখ-কাতরতা ফুটিয়ে তুলতে পারি না? এই কাতরতা সকল মানুষের দুঃখ, দেশের দুরবস্থা ও বর্তমান ধর্মের বিপদ বুঝতে শেখাবে। এই জ্ঞান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশে বহু শক্তিশালী কর্মী জন্মাবে, যারা কর্মের জন্যই কর্ম করবে এবং স্বদেশের জন্য মৃত্যুবরণেও প্রস্তুত থাকবে।"

এই নিষ্কাম স্বদেশব্রত ও মহাভারতের স্বপ্ন-দৃষ্টি থেকে নিবেদিতা সার্থকভাবে বুঝেছিলেন, "না জাগিলে ভারত-ললনা এ ভারত আর জাগে না।" সেজন্য তিনি আর একটি বৈপ্লবিক পদক্ষেপ নেন। বালিকাবিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা রচনা করেন। তাতে বলা হয়েছিল, মেয়েদের ইংরেজী, বাংলা, গণিত, বিজ্ঞান ইত্যাদি শেখাবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় শিল্পের পুনরুদ্ধারের দিকে দৃষ্টি রেখে হস্তশিল্প শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা থাকবে। এর সার্থকতা এই যে, বাড়ীতে বসে প্রত্যেক ছাত্রী একটি মর্যাদাজনক উপায়ে জীবিকা অর্জন করতে পারবে এবং স্বাবলম্বী হয়ে ইচ্ছে করলে পারিবারিক শৃঙ্খল ভেঙে ফেলে শুধু স্বদেশ-সেবায় নিজেদের সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ করতে পারবে। এতে আরেকটা লাভ হবে এই যে, এর দ্বারা য়ুরোপ-আমেরিকার বাজারে ভারতীয় হস্তজাত শিল্পদ্রব্যের (এবং নিবেদিতার পরিকল্পনা মতো আচার, কাসন্দ ও চাটনি প্রভৃতি খাদ্য-দ্রব্যেরও) ক্রমবর্ধমান চাহিদাও সৃষ্টি করা যেতে পারে।[৫] কি যে কার্যকরী এবং মৌলিক চিন্তার পথ দেখালেন। ভাবলে অবাক হতে হয় আজকের নারীপ্রগতির যুগে মেয়েদের স্বাধীনভাবে উপার্জন করার রেওয়াজ সবেমাত্র যখন দেখা যাচ্ছে, তখন আজ থেকে কতদিন আগে ভগিনী নিবেদিতা এই সামাজিক বিপ্লবের সূচনা করে গেছেন।

নিবেদিতার শিক্ষাপ্রচারক্ষেত্রে আর একটি কৃতিত্ব হলো তিনি বিদ্যালয়ের গণ্ডিকে অন্তঃপুর পর্যন্ত প্রসারিত করতে পেরেছিলেন। বিবাহিতা মেয়েদের স্কুলে আসার রীতি এর আগে ছিল না। এদেশে বালিকাবিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতা থেকে নিবেদিতা দেখেছিলেন বিদ্যালয়ের শিক্ষায় সামান্য উন্নতি হতে না হতেই মেয়েদের বিয়ে হয়ে যায়, সঙ্গে সঙ্গেই বিদ্যাশিক্ষায় ইতি। এদেশের মেয়ের বিয়ে মানেই যে ব্যক্তি-প্রতিভার বিকাশ-অবরোধ, অস্বীকার করবার উপায় নেই, আজকের যুগেও বিয়ের বয়স বাড়লেও একথা আমাদের মেয়েদের পক্ষে কমবেশী সত্যি। সেজন্যই নিবেদিতা তাঁর পূর্বোক্ত পরিকল্পনায় বলেছিলেন এমন সংস্থান রাখার চেষ্টা হবে যাতে কোন মেয়ে ইচ্ছে করলে অবিবাহিতা থেকে তার সমগ্র জীবনকে জাতীয় কাজে উৎসর্গ করতে পারবে। বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেও নিবেদিতা এক সাহসিক

---

* এ প্রসঙ্গে নিবেদিতা আধুনিক যুগের বিদ্যাসাগরের জননীর নামও করেছেন। দ্রষ্টব্য "ভারতরমণীর ভবিষ্যৎ শিক্ষা" প্রবন্ধ।

৫ 'রামকৃষ্ণ বালিকাবিদ্যালয় পরিকল্পনা'—Hints on National Education in India.

প্রচেষ্টায় ঝাঁপিয়ে পড়লেন। নিজে গিয়ে অভিভাবকদের হাতে পায়ে ধরে মেয়ে চেয়ে আনতে লাগলেন। এবং এই অচলায়তন ভাঙতে কিছু পরিমাণে সফলও হলেন।

নিবেদিতার শিক্ষাপ্রকল্পের দৈনন্দিন কার্যসূচী ছিল এই রকম—বেলা ন'টা থেকে ব্রাহ্ম-শিক্ষিকাদের কিণ্ডারগার্টেন প্রশিক্ষণ দান, তারপর বারোটা থেকে চারটা ছোট মেয়েদের স্কুল। আর বেলা একটা থেকে ঘণ্টা তিনেক নানা বাড়ীর বধূদের সেলাই শেখাতেন ভগিনী ক্রস্টিন। তা' ছাড়া সপ্তাহে দু'দিন একটা বড় সেলাই ক্লাস। নিবেদিতার কাছে যারা শিক্ষকতার পাঠ নিতেন, তাঁদের ব্যবহারিক শিক্ষা হতো হাতেনাতে নিবেদিতার বিদ্যালয়েই পড়িয়ে! নিবেদিতা মেয়েদের খেলবার জন্য বাগান তৈরী করিয়েছিলেন। মেয়েরা কোমরে আঁচল জড়িয়ে ব্যাটমিণ্টন খেলছে—এই দুর্লভ দৃশ্য তখনকার দিনে নিবেদিতার স্কুলেই দেখা যেত। এ ছাড়া স্তব, পূজাপাঠ ইত্যাদি তো আছেই। ভারতীয় নারীর মোহনিদ্রা ভাঙতে সবকটি বন্ধ দরজায় ঘা দিয়েছেন তিনি!

তিনি শুধু কুসুমকমনীয়া নারীই চাননি; বজ্রভীষণাও চেয়েছেন—তাঁর ধমনীতে প্রবাহিত কেল্‌টিক রক্তের ক্রিয়া এখানেই। তাঁর রাষ্ট্র-মতাদর্শের ক্ষেত্রে শুধু নয়, সর্বত্রই তিনি কাপুরুষতাকে ঘৃণা করতেন। নিবীর্য দেখলে জ্বলে উঠতেন। তিনি চেয়েছিলেন আধুনিক ভারতনারী বীরাঙ্গনা হয়। নয়তো বীরপুত্র আসবে কোথা থেকে! তিনি পড়াতে পড়াতে ছাত্রীদের বিবেকানন্দের বক্তৃতারত দৃপ্তমূর্তি দেখাতেন, বলতেন, "দেখেছো, কি বীরের মতো দাঁড়াবার ভঙ্গী, তিনি যে বীরেশ্বর!" "রাজপুত-রমণীদের শৌর্যকাহিনী শুনিয়ে ছাত্রীদের বলতেন তিনি জ্বলন্ত ভাষায়: "তোমরা সকলে বীর হও, ভারতবর্ষের কন্যাগণ ক্ষত্রিয়বীরব্রত গ্রহণ করো।"

নিবেদিতা যে উমাকে আদর্শ কল্পনা করেছিলেন সেই উমারই মতো ভারতের কল্যাণ-কামনায় নিজেকে তিল তিল করে উৎসর্গ করে গেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনকে বলেছেন "সতীর তপস্যা।" তাঁর মৃত্যুর পরেও তাঁর আদর্শ ভারতীয় নারীর জাগরণে অমূল্য অবদান জুগিয়েছে। নারী-আন্দোলনের পরবর্তী অনেক নেত্রী ও কর্মীই বেরিয়েছিলেন তাঁর ছাত্রী সহকর্মী ও পরিচিতমণ্ডলীর ভেতর থেকে, সার্থক করেছিলেন সারদাদেবীর আশীর্বাদকে। তাঁর নিজের ছাত্রী ছাড়াও অনেকে তাঁকে দেখেও প্রেরণা পেয়েছেন। এঁদের কয়েকজন—সরলা দেবী চৌধুরাণী (ঘোষাল), ভগিনী সুধীরা, সুনীতি দেবী, সুচারু দেবী, ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, লাবণ্যপ্রভা বসু, গিরিবালা দেবী, প্রফুল্লমুখী দেবী, সরলাবালা সরকার ও স্বনামধন্যা অবলা বসু।

কিন্তু নিবেদিতার এই সতীর তপস্যা আমরা কি বিস্মৃত হয়েছি! আজকের ভারতনারীরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পুরুষের সমাধিকারভোগী ও সমোন্নত, কিন্তু যে নিবেদিতার আদর্শ ছিল গার্গী মৈত্রেয়ী সীতা উমা এবং ঝাঁন্সির রানী লক্ষ্মীবাঈ, তাঁর মহাভারত এখনো জাগলো কই?

সমালোচনা

ফরাসী বিপ্লবে মুদ্রাস্ফীতি : দিলীপ-কুমার বিশ্বাস ও শেখরকুমার বসু : ডি. এম. লাইব্রেরী : ৯৬ পৃষ্ঠা : মূল্য ১০.০০টাকা।

গ্রন্থখানি Andrew Dickson-এর Fiat Money in French Revolution-এর অনুবাদ। তবে শুধু অনুবাদ বললে ভুল হবে, বেশ কিছু সম্পাদনাও করা হয়েছে। তার ওপর আছে কয়েকখানি চিত্র, রেখাচিত্র, পাদটীকার এক দীর্ঘ তালিকা এবং তিনটি পরিশিষ্ট। অবশ্য ব্যাপক দৃষ্টিতে এগুলোও সম্পাদনার অন্তর্ভুক্ত, কারণ সম্পাদনার লক্ষ্য হ'ল প্রয়োজনীয় রদবদলের মাধ্যমে রচনা ইত্যাদিকে পূর্ণাঙ্গ করে তোলা।

অনূদিত গ্রন্থখানি আলোক-সম্পাতক (light-bearing) এবং উদ্দেশ্যসাধক (fruit-bearing) উভয় পর্যায়ভুক্ত। উদ্দেশ্য সম্বন্ধে গ্রন্থখানির ভূমিকা থেকে এই অংশটুকু উদ্ধৃত করলেই বোধহয় যথেষ্ট হবে : "অবাধ কাগজীমুদ্রা ছাপিবার পরিণাম কি, বাংলা ভাষায় পাঠকগণকে জানাইবার জন্য এই বই বাহির করিলাম।" একরকম দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরু থেকেই আমাদের টাকার দাম ক্রমাগত হ্রাস পেয়ে আসছে। বর্তমানেও এই গতি কোন রকম হ্রাস পায়নি। অর্থমন্ত্রীর স্বীকৃতি অনুসারে ১৯৪৯ সালের তুলনায় আমাদের টাকার দাম দাঁড়িয়েছে ৪২ শতাংশ মাত্র। অতএব, এই-জাতীয় গ্রন্থের উপযোগিতা যে আছে তা অনস্বীকার্য। এই প্রসঙ্গে অনুবাদক-সম্পাদকদ্বয় বিগত তিন দশকের জার্মান মুদ্রাস্ফীতির একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিলে বোধহয় ভাল করতেন।

অবশ্য সব দিক দিয়ে গ্রন্থখানি একটি মূল্যবান এবং সার্থক প্রচেষ্টা। অনুবাদ ও সম্পাদনায় গ্রন্থকারদ্বয় যে যত্ন ও পরিশ্রমের পরিচয় দিয়েছেন তা সত্যই প্রশংসার যোগ্য। আর যেহেতু এই ধরনের বই বাংলায় আর নেই সেই হেতু গ্রন্থকারদ্বয়কে পথিকৃৎ বলে অভিহিত করতেও আপত্তি নেই। গ্রন্থখানির একটি সুলভ সংস্করণ প্রকাশিত হওয়া প্রয়োজন বলে মনে করি।

—ডঃ শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়

স্বাধীনতার পঁচিশ বছর : সম্পাদকের কলমে। বিজনকুমার লোধ সম্পাদিত। দীপ্তি প্রকাশনী, ৩৭ টালিগঞ্জ রোড, কলকাতা ২৬। মূল্য ছয় টাকা।

সম্পাদক শ্রীবিজনকুমার লোধ বয়সে তরুণ। 'স্বাধীনতার পঁচিশ বছর : সম্পাদকের কলমে' সংকলন-গ্রন্থটিতে তিনি তরুণোচিত অভিনবত্ব, উচ্চাশা এবং পরিশ্রমের পরিচয় দিয়েছেন এবং সেই সঙ্গে কিঞ্চিৎ অনভিজ্ঞতারও।

শ্রীলোধ ১৯৪৭ থেকে ১৯৭২—এই পঁচিশ বছরে পশ্চিম বাংলার প্রতিটি দৈনিক পত্রিকার প্রতি বর্ষের স্বাধীনতাদিবস-সংখ্যার সম্পাদকীয় সংকলন করবার পরিকল্পনা করেছেন। আলোচ্য বইটি তার প্রথম খণ্ড। ১৯৬০ পর্যন্ত তিনি এগিয়েছেন। প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন পরবর্তী খণ্ডের। স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র এবং প্রতি বছর রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর স্বাধীনতাদিবসের বাণীর মর্মও সংকলিত হয়েছে।

পরিকল্পনাটি অভিনন্দনযোগ্য এবং ইতিহাস-চেতনার পরিচায়ক। সেই সঙ্গে উল্লেখ্য সম্পা-

দকের বস্তুনিষ্ঠ বা অবজেকটিভ দৃষ্টিভঙ্গী কারণ তিনি সব মত ও পথের সংবাদপত্র থেকে সঞ্চয়ন করেছেন। এর ফলে একটি মূল্যবান রেফারেন্স বই পাওয়া গিয়েছে। এতে যে তথ্য আছে তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ যে-যার আপন ভাবে করতে পারবেন।

আমাদের দেশে ইতিহাসের উপাদান কত তাড়াতাড়ি লুপ্ত হয়ে যায় তার প্রমাণ—এমন পরিশ্রমী সম্পাদকও কয়েকটি পত্রিকার স্বাধীনতা-দিবস-সংখ্যা খুঁজে পাননি। জানি না, সেগুলি বিদেশে মিলতে পারে কিনা। সংবাদপত্র মাইক্রো-ফিল্মে সংরক্ষণ করা যে কত দরকার এ থেকে তা বোঝা যাবে।

বইটির প্রচ্ছদ চমৎকার এবং অঙ্গসজ্জার কিছু কিছু কাজ ভালো

এবার সম্পাদকের অনভিজ্ঞতাজনিত ত্রুটির দু-একটি দিক উল্লেখ করছি। এইজাতীয় সংকলন-গ্রন্থে ব্যক্তিগত এবং মূলপ্রসঙ্গ-বহির্ভূত বিষয় (স্বতন্ত্রভাবে এবং স্বক্ষেত্রে তা যতই আদরণীয় হোক না কেন) নির্মমভাবে বর্জিত হওয়া অত্যাবশ্যক। ভিতরে অঙ্গসজ্জার কাজে অনেক ছেলেমানুষী বইটিকে ভারাক্রান্ত করেছে। ভবিষ্যৎ খণ্ডে এবং সংস্করণে এই ত্রুটিগুলি সংশোধিত হলে বইটির মর্যাদা বাড়বে।

এই তরুণ, উৎসাহী ও পরিশ্রমী সম্পাদকের কাছে ভবিষ্যতে আমাদের কিছু প্রত্যাশা থাকল।

—অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

অতিমুক্ত—শ্রীগণেশ লালওয়ানী। জৈন ভবন, পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা ৭ হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা-১২৪; মূল্য-চার টাকা।

জৈন সাহিত্য হইতে ষোড়শটি কাহিনী আহরণ করিয়া ছোটদের উপযোগী অতি সহজ ভাষায় সেগুলি এ গ্রন্থে পরিবেশন করিয়াছেন শ্রীগণেশ লালওয়ানী। ভাষা শুধু সহজই নয়, সাবলীল, লালিত্যপূর্ণ। পড়িতে এত ভাল লাগে যে বারবার পড়িতে ইচ্ছা হয়।

অন্য দিক দিয়া, বাংলা ভাষায় সাহিত্য-ধর্মী জৈন অধ্যাত্ম-সম্পদ পরিবেশনের দিক দিয়া গ্রন্থটিকে এ পথের দিশারী বলা চলে। এ বিষয়ে, লেখককে লিখিত গ্রন্থটির কভারে মুদ্রিত ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের অভিমতই আমরা উদ্ধৃত করিতেছি: 'জৈন ধর্ম ইতিহাস ও দর্শন সম্বন্ধে কিছু কিছু বই বাংলা ভাষায় আমরা পাইতেছি। কিন্তু জৈন শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে এইরূপ উপাখ্যান-সংগ্রহ আমি আগে দেখি নাই। কি আর্য প্রাকৃতে, কি অন্য প্রাকৃতে, কি সংস্কৃতে, কি অপভ্রংশে, কি প্রাচীন গুজরাটী, রাজস্থানী ও হিন্দীতে জৈন উপাখ্যান-সম্পদ প্রসারে ও সৌন্দর্যে অতুলনীয়। তবে অধিকাংশ উপাখ্যান মুনি যতি ও সাধুদের কথিত বলিয়া ধর্মমূলক এবং প্রায় সর্বত্রই প্রব্রজ্যার মহিমা-প্রকাশক। সাধারণ পাঠক ইহা হইতে যে সাহিত্যরস পাইয়া থাকে, তাহা মুখ্য নহে, গৌণ। কিন্তু এমন বহু জৈন উপাখ্যান আছে, যেগুলি রস-সর্জনায় অতি মনোহর এবং বৈরাগ্যধর্মের অন্তরালে অন্তঃ-সলিলা ফল্গুনদীর মত তাহার অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য ও রসধারা সাহিত্য-কলা-প্রেমিক সমস্ত সহৃদয়কে প্রীত করিবে। আপনার এই ক্ষুদ্র, কিন্তু অতি সুন্দরভাবে প্রাঞ্জল চলিত বাংলায় লিখিত "অতিমুক্ত" বইখানি, বোধ হয়, রসোত্তীর্ণ জৈন উপাখ্যান-সাহিত্যকে বিদগ্ধ জনসমাজে পরিচিত করিয়া দিবার প্রথম প্রয়াস।'

প্রথম গল্পটির নামেই গ্রন্থটির নামকরণ। প্রত্যেক গল্পের সঙ্গেই একখানি করিয়া চিত্র রহিয়াছে। গ্রন্থটির বহুল প্রচলন, বিশেষ করিয়া ছেলেমেয়েদের কাছে, একান্ত কাম্য।

Vidyapith Golden Jubilee Souvenir (1922-72)—Published from the Ramakrishna Mission Vidyapith, P. O. Vidyapith, Deoghar, S.P. Bihar. Pp. 141 + 68.

রামকৃষ্ণ মিশনের যে-সব শিক্ষাকেন্দ্রে আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাদর্শ-রূপায়ণের কর্মযজ্ঞ 'ত হইতেছে, প্রাচীনতার দিক হইতে দেওঘর বিদ্যাপীঠের দাবি অগ্রগণ্য। পঞ্চাশ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে বিদ্যাপীঠের এই সুবর্ণজয়ন্তী স্মরণিকা প্রকাশিত হইয়াছে। ইংরেজী বাংলা ও হিন্দী ভাষায় সুচিন্তিত ও মনোজ্ঞ লেখাগুলির মধ্যে বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধাবলী। কি কঠোর কৃচ্ছ্রতা ও অদম্য অধ্যবসায় অবলম্বনে বিদ্যাপীঠ আরম্ভ হইয়াছিল, কিভাবে ক্ষুদ্র বৃক্ষশিশু মহীরুহে পরিণত হইতে থাকিল তাহার চিত্তাকর্ষক নিখুঁত বর্ণনা বিদ্যাপীঠের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী সদ্ভাবানন্দের 'বিদ্যাপীঠের গোড়ার ইতিহাস' শীর্ষক নিবন্ধে পাওয়া যায়। প্রাক্তন শিক্ষক কর্মী ও ছাত্রবৃন্দের স্মৃতিচারণগুলিতে তাঁহাদের প্রিয় বিদ্যাপীঠের প্রতি আন্তরিক ভালবাসা অভিব্যক্ত। বর্তমান ছাত্রের হিন্দী ভাষায় লেখা 'ধর্ম ও বিজ্ঞান' রচনাটি সুন্দর। শেষে 'শ্রীরামকৃষ্ণপঞ্চকম্' সংস্কৃত-স্তোত্র দেওয়া হইয়াছে। বিদ্যাপীঠের প্রাথমিক অবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত ছবিগুলি স্মরণিকাটিকে অলঙ্কৃত করিয়াছে।

অভীঃ—(১৯৭২-৭৩) রামকৃষ্ণ মিশন আবাসিক মহাবিদ্যালয়, নরেন্দ্রপুর (২৪ পরগনা) হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৬৭ + ৫২।

এবারের 'অভীঃ' পত্রিকাখানি স্বীয় বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। প্রত্যেকটি লেখাই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বাংলা বিভাগে শ্রদ্ধাঞ্জলি, অনুধ্যান, বিজ্ঞান-প্রসঙ্গ, ভ্রমণ-কথা, গল্প, কবিতা সবই পড়িবার মতো। ইংরেজী বিভাগে উল্লেখযোগ্য রচনা: 'Swami Vivekananda—A Confluence of the Oriental and the Occidental,' 'The Strategy for Integrated Education.' কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডক্টর সত্যেন্দ্রনাথ সেন নরেন্দ্রপুর মহাবিদ্যালয়ের পুরস্কার-বিতরণ-অনুষ্ঠানে যে ভাষণ দিয়াছিলেন, তাহার সারসংক্ষেপ 'ঋণশোধ' শিরোনামে প্রকাশিত—এইটি সকল শিক্ষাব্রতী ও বিদ্যার্থীরই পাঠ করা কর্তব্য, শুধু পাঠ করা নয়, শিক্ষিত ব্যক্তি কিভাবে শিক্ষার ঋণ পরিশোধ করিতে পারেন, তজ্জন্য তাঁহাকে বর্তমান অবস্থায় বিশেষভাবে চিন্তা করিতেও হইবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

শ্রীমৎ স্বামী ওঁকারানন্দ স্মরণে

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ওঁকারানন্দজী মহারাজের মহাপ্রয়াণের পর ত্রয়োদশ দিবসে, গত ২০শে মে, বেলুড় মঠে বিশেষ পূজা, কীর্তন, ভজন, হোম, ভোগরাগাদি ও প্রসাদবিতরণ অনুষ্ঠিত হয়। ৬০০০ ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করেন। মঠের বহু সাধু-ব্রহ্মচারী ও ভক্ত এই উপলক্ষে বেলুড় মঠে সমবেত হন। বিকালে আয়োজিত সভায় স্বামী গম্ভীরানন্দ (সভাপতি), স্বামী ভূতেশানন্দ ও অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু স্বামী ওঁকারানন্দজীর উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন।

সেবাকার্য

বাংলাদেশে সেবাকার্য: এপ্রিল, ১৯৭৩ পর্যন্ত বাংলাদেশে ৮টি সেবাকেন্দ্রের মাধ্যমে দুঃস্থ জনসাধারণের সেবাকল্পে ২৬,১৮,৩৩৮·০৩ টাকা ব্যয়িত হইয়াছে। প্রাপ্ত দানসামগ্রীর মূল্য এই টাকার অন্তর্ভুক্ত নয়।

১৯৭৩-মার্চে অনুষ্ঠিত সেবাকার্য:

ঢাকা কেন্দ্র কর্তৃক ১,৯০০ জন রোগীর চিকিৎসা করা হয় এবং নিম্নলিখিত দ্রব্যসমূহ বিতরিত হয়:

মিল্ক-পাউডার ৬,৫১৪ পাউণ্ড, বেবি-ফুড ১৭১ কেজি, কম্বল ২১০ খানি, ধুতি ৪৪ খানি, শাড়ী ২৩১ খানি, লুঙ্গি ১৯টি, মশারি ৩২টি, পুরাতন বস্ত্রাদি ১,০১৪, সোয়েটার ১,৫৫৯, গামছা ১৫টি, গায়ে-মাখা সাবান ৭০টি, লিকুইড সোপ ৩৫ কেজি এবং দুই সেট বাসনপত্র।

বাগেরহাট কেন্দ্র কর্তৃক ৬,৩২৫ জন রোগী চিকিৎসিত হন। বিতরিত দ্রব্যাদি: গুঁড়া দুধ ২২ পাউণ্ড, জেলি ১০ পাউণ্ড, প্রটিনেক্স ৯,২২৫ গ্রাম, শিশুদের মিল্কফুড ৫৭ পাউণ্ড, বিস্কুট ৫৩ কেজি, 'সান্‌সাইন' মিল্ক ১৪·২৫ পাউণ্ড, কম্বল ৭টি, ধুতি ১৪ খানি, শাড়ী ৫৫ খানি, জামার কাপড় ৩৮½ গজ, পুরাতন সোয়েটার ২টি, পোশাক ১২০, পাঠ্য পুস্তক ৯৬ খানি, শ্লেট ৪৯টি, কলম ১৬টি এবং পেন্সিল ২টি।

দিনাজপুর কেন্দ্র কর্তৃক ১৩টি গৃহ নির্মিত হয় এবং ১,৮১৩ জন রোগী চিকিৎসিত হন। বিতরিত জিনিসপত্র: বিস্কুট ৯ কেজি, কম্বল ২৩টি, ধুতি ৭৪ খানি, শাড়ী ৮৭১ খানি, লুঙ্গি ৩৩৯টি, মশারি ৪৫৫টি, পুরাতন পোশাক ৪৪৬, সাবান ৭৬টি এবং কোদাল ১২টি।

বরিশাল কেন্দ্র কর্তৃক ১০টি টিউব-ওয়েল তৈরী করাইয়া দেওয়া হয় এবং ৪৬৫ জন রোগী চিকিৎসিত হন।

আসাম রিফিউজি রিলিফ: ৭.১২.৭২ হইতে ২৪.২.৭৩ অবধি আসামে উদ্বাস্তু-সেবাকার্যে **শিলচর** আশ্রম কর্তৃক নিম্নলিখিত দ্রব্যসমূহ বিতরণ করা হইয়াছে:

চাল ২৬০ কেজি, ডাল ২০ কেজি, তেল ১৬ কেজি, কম্বল ৫৬০ খানি, ধুতি ৭১ খানি, শাড়ী ৬ খানি। এই সেবাকার্যে খরচ হইয়াছে মোট ৫,০০০·৮২ টাকা এবং উপকৃত হইয়াছেন ১৮৩টি পরিবারের ৬৩৭ ব্যক্তি।

মহারাষ্ট্রে খরাত্রাণকার্য: গত ৮.২.৭৩ থানা জেলায় জহর তালুকের অন্তঃপাতী তালওয়ালীতে **বোম্বাই** আশ্রম কর্তৃক মেডিকেল রিলিফ আরম্ভ করা হয়। মার্চ-১৯৭৩ পর্যন্ত এই সেবাকার্যে ২,৭০০ জন রোগী চিকিৎসিত হইয়াছেন, ইহাতে মোট খরচ পড়িয়াছে ১৩,১৪৯·৮১ টাকা।

গুজরাতে অনাবৃষ্টি ও খাদ্যাভাবের জন্য সেবাকার্য: রাজকোট আশ্রম কর্তৃক রান্না-করা খাদ্যবিতরণের জন্য যে পাকশালা (Free Kitchen) খোলা হইয়াছে, তাহাতে দৈনিক ১,৫০০ ব্যক্তিকে খাওয়ানো হইতেছে; গত এপ্রিল মাসে পানীয় জলের জন্য একটি টিউব-ওয়েল বসানো হইয়াছে।

উৎসব-সংবাদ

রাঁচী (মোরাবাদী) রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত ৫ই এপ্রিল, ১৯৭৩ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দ মহারাজ এক ভাবগম্ভীর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আশ্রম-পরিচালিত 'দিব্যায়নে'র নবনির্মিত ছাত্রাবাস-ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন করেন। এই শুভানুষ্ঠানে বেলুড় মঠ ও অন্যান্য শাখাকেন্দ্রের ১৯ জন সাধু যোগ দিয়াছিলেন। কানাডা-নিবাসী ডঃ গোটা হিস্‌মানোভা সহ বহু ভক্তেরও সমাগম হইয়াছিল। পরে বিশেষ পূজা, হোম, ভজন ইত্যাদি অনুষ্ঠানের শেষে মধ্যাহ্নে প্রায় এক হাজার ভক্ত প্রসাদ ধারণ করেন। অপরাহ্নে অনুষ্ঠিত জনসভায় স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ প্রমুখ অনেকে ভাষণ দেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বার্ষিক জন্মোৎসব এই বৎসর ৫ই হইতে ৮ই এপ্রিল একই সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় অনুষ্ঠানটি সর্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল। ৬ই ও ৭ই এপ্রিল এই উপলক্ষে কৃষক-সম্মেলন ও আলোচনা-চক্র কার্যসূচীকে অভিনবত্ব দান করে। প্রায় দুই শত কৃষক, কৃষি-অনুরাগী, সমাজসেবী এবং ভারত সরকার প্রেরিত উচ্চপদস্থ কৃষি-আধিকারিক মহাশয়ের যোগদান ইহাকে সাফল্যমণ্ডিত করে।

৮ই এপ্রিল ছাত্রসভা আয়োজিত হয়। স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব উৎসবের অঙ্গীভূত স্থানীয় বিদ্যালয়- ও মহাবিদ্যালয়সমূহের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে অনুষ্ঠিত বক্তৃতা, আবৃত্তি ও রচনাপ্রতি-যোগিতার পুরস্কারবিতরণ করা হয়। স্বামীজীর জীবন ও বাণীতে উদ্বুদ্ধ হইয়া নূতন ভারত গঠনের জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাইয়া স্বামী গহনানন্দ এক মনোজ্ঞ ভাষণ দেন।

প্রতি সন্ধ্যায় আদিবাসী ছৌই-নৃত্য প্রভৃতি অনুষ্ঠান সকলের চিত্ত আকর্ষণ করে।

বরাহনগর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত ৭ই এপ্রিল হইতে ১০ই এপ্রিল শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব মহাসমারোহে পালিত হইয়াছে। আশ্রম-বিদ্যালয়গুলির ছাত্র ও শিক্ষকবৃন্দ স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-অনুরাগিবৃন্দ এবং যুবকগণ অক্লান্ত পরিশ্রমে উৎসবটিকে সাফল্যমণ্ডিত করেন। উৎসবের চারদিনই হাজার হাজার দর্শকের সমাবেশে আশ্রমপ্রাঙ্গণ আনন্দমুখরিত থাকে।

৭ই এপ্রিল শ্রীপ্রবোধচন্দ্র ভট্টাচার্যের সভা-পতিত্বে আশ্রম-বিদ্যালয়সমূহের গত তিন বছরের পারিতোষিকবিতরণী উৎসবও অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সভায় আশ্রম-বিদ্যালয়গুলির কর্মসচিব স্বামী রমানন্দ তাঁহার প্রতিবেদনে বিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নতির ক্ষেত্রে নানা প্রয়োজনীয় দিকের কথা আলোচনা করেন। ৯ই এপ্রিল সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত সভায় স্বামী ধ্যানাত্মানন্দ (সভাপতি) শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্তানগণের দৃষ্টিতে শ্রীশ্রীমায়ের জগজ্জননীত্ব সম্বন্ধে, স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ বর্তমান জীবনে ধর্মভাবনার একান্ত প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে, এবং শিক্ষাবিভাগের ডি ডি. পি. আই. শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থা এবং শিক্ষাবিষয়ে স্বামীজীর চিন্তা সম্বন্ধে গভীরভাবদ্যোতক আলোচনা করিয়া সমবেত সুধীসমাজকে তৃপ্তিদান করেন।

স্বামীজীর জন্মোৎসব-অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করিয়া উৎসবের চারদিনই ভোর হইতে রাত্রি পর্যন্ত পূজা, হোম, আরাত্রিক, ভজন, কীর্তন, বাউলগান

শ্যামাসংগীত এবং বিদ্যালয়ছাত্রগণ কর্তৃক 'কর্ণার্জুন', 'ভরত' এবং 'সিরাজের স্বপ্ন' নাটকগুলি অতি মনোজ্ঞভাবে পরিবেশিত হয়। উৎসব-প্রাঙ্গণে ভক্তদের মধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রসাদও বিতরণ করা হয়।

বহরমপুর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে ২০, ২১ এবং ২২শে এপ্রিল শ্রীরামকৃষ্ণ জন্ম-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। তিন দিনই সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত সভায় আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন স্বামী ধ্যানাত্মানন্দ, স্বামী নিরাময়ানন্দ ও স্বামী শিবময়ানন্দ।

২০শে এপ্রিলের সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী ধ্যানাত্মানন্দ। বিষয় ছিল শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন ও বাণী। বক্তাগণ বলেন, ভারতের সম্পদ তাহার আধ্যাত্মিকতা। উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্যের ভোগসর্বস্ব সভ্যতা যখন তাহাকে গ্রাস করিবার উপক্রম করে, তখন পৃথিবীর সব অবতারের পুনঃসংস্কৃত প্রকাশ শ্রীরামকৃষ্ণ তাহার পুনরুদ্ধার করেন—তৎকালীন অন্যান্য মনীষীদের মতো কিছু ছাড়িয়া, কিছু রাখিয়া নয়—ভারতীয় সংস্কৃতির পূর্ণাবয়ব প্রতিকৃতি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই।

২১শে এপ্রিলের সভায় সভাপতি ছিলন স্বামী নিরাময়ানন্দ, বিষয় ছিল জগজ্জননী শ্রীশ্রীসারদা-দেবী। বক্তাগণ বলেন, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের আরব্ধ কার্যের পূর্ণ রূপ দেন শ্রীশ্রীমা। শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীসারদাদেবী দুই রূপে একই সত্তা। তবে সবকিছুকে ছাপাইয়া যায়—সারদাদেবীর মাতৃত্ব—তিনি সকলের মা, সাধু-অসাধু-নির্বিশেষে সব দেশের সকলেরই মা, তিনি ইতর প্রাণীদেরও মা।

২১শে এপ্রিল পূর্বাহ্ণে পূজা, হোম ইত্যাদি এবং সন্ধ্যায় আরতি ও ভজন হয়। বিকালের সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী ধ্যানাত্মানন্দ। আলোচ্য বিষয় ছিল 'যুবসম্প্রদায়ের প্রতি স্বামী বিবেকানন্দের বাণী'। বক্তাগণ বলেন, বর্তমান যুগ সন্দেহের যুগ। এ যুগের সব সন্দেহ লইয়া স্বামীজী উপস্থিত হন তাঁহার গুরুর নিকট এবং গুরুর অভিমতে নানা-ভাবে তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়া লন। কিন্তু কেবল সন্দেহ নয়, তাহার সহিত যে জিজ্ঞাসা ছিল, তাহাই নরেন্দ্রনাথকে পরিণত করে স্বামী বিবেকানন্দে। যুবসমাজের প্রতি স্বামীজীর নির্দেশ—'মা, আমায় মানুষ কর'—এই প্রার্থনা।

তিন দিনই সভার পর রামায়ণগান পরি-বেশিত হয়। শেষদিন হাতে হাতে প্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল।

মনসাদ্বীপ রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম কর্তৃক গত ১৬ই হইতে ২১শে এপ্রিল পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৩৮তম জন্মমহোৎসব বিভিন্ন স্থানে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। ১৬ই এপ্রিল সকালে মনসাদ্বীপ আশ্রম হইতে প্রভাতফেরী বাহির হয়। সন্ধ্যায় আশ্রমপ্রাঙ্গণে আশ্রম-বিদ্যালয়গুলির পারি-তোষিক-বিতরণী সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী জয়ানন্দ। সভার পূর্বে ছাত্রগণ ড্রিল, ব্রতচারী নৃত্য ও জিম্‌ন্যাস্‌টিক্‌স প্রদর্শন করে। বৈদিক মন্ত্র পাঠ ও ছাত্রগণ কর্তৃক আবৃত্তির পর প্রধান অতিথি স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ এবং স্বামী প্রত্যয়ানন্দ বক্তৃতা দেন। সভার শেষে পুরস্কার বিতরণ করেন স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। রাত্রে বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ কর্তৃক 'মহারাজ নন্দকুমার' নাটকটি মঞ্চস্থ হয়।

১৭ই এপ্রিল সকালে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা, হোম ও ভোগারতি হয়। বৈকালে আশ্রম হইতে একটি শোভাযাত্রা বাহির হইয়া গ্রাম পরিক্রমা করে। সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় সভা-পতিত্ব করেন স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী সিদ্ধিদানন্দ কর্তৃক আশ্রমের বার্ষিক কার্য-বিবরণী পাঠের পর প্রধান অতিথি স্বামী প্রত্যয়া-নন্দ এবং স্বামী জয়ানন্দ বক্তৃতা দেন। স্বামী প্রত্যয়ানন্দ ভক্তিরসাপ্লুত সংগীতও পরিবেশন

করেন। এই দিন সভার শেষে প্রায় তিন হাজার ভক্ত নরনারী বসিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের খিচুড়ি-প্রসাদ ধারণ করেন। রাত্রে আশ্রমস্থ এবং স্থানীয় বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষকগণ কর্তৃক 'দেবী অন্নপূর্ণা' নাটকটি অভিনীত হয়। অভিনয়টি খুবই উপভোগ্য হইয়াছিল।

১৯শে এপ্রিল কাকদ্বীপে স্থানীয় ভক্তগণের উদ্যোগে স্বামী জয়ানন্দের সভাপতিত্বে ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তৃতা দেন স্বামী প্রত্যয়ানন্দ এবং শ্রীনবনীহরণ মুখোপাধ্যায়। সভার শেষে সরিষা রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমস্থ জনশিক্ষা বিভাগের কর্মিগণ কর্তৃক পরিবেশিত হয় 'ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ' চলচ্চিত্র।

২১শে এপ্রিল উত্তর সুরেন্দ্রগঞ্জ বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দিরে শ্রীশ্রীঠাকুরের উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সকালে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা, হোম ও ভোগরাগাদি হয়। দুপুরে প্রায় আড়াই হাজার ভক্ত বসিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের খিচুড়ি-প্রসাদ ধারণ করেন। সন্ধ্যায় ধর্মসভা হয়। সভায় 'কথামৃত' পাঠ করেন স্বামী গৌরানন্দ। ধর্মালোচনায় অংশ গ্রহণ করেন স্বামী প্রত্যয়ানন্দ (সভাপতি), স্বামী জয়ানন্দ ও ব্রহ্মচারী অখণ্ডচৈতন্য।

কার্যবিবরণী

কাঁথি (মেদিনীপুর) রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের ১৯৬৯ হইতে ১৯৭২ খৃষ্টাব্দের কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে কাঁথিতে জনহিতকর কার্যের মাধ্যমে সেবাশ্রমের সূত্রপাত হয়। ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও অধ্যবসায়ের ফলে সেবাশ্রমের কয়েকটি বিভাগ গড়িয়া উঠিয়াছে। দরিদ্র ছাত্রদের জন্য একটি ছাত্রাবাস পরিচালিত হয়। আলোচ্য বর্ষত্রয়ে এখানে ৮টি ছাত্র ছিল। গ্রন্থাগারের পুস্তকসংখ্যা ৬,১০০; পাঠকবর্গ গ্রন্থাগারটির উপযুক্ত সদ্ব্যবহার করিতেছেন; তিন বৎসরে পঠনার্থে প্রদত্ত পুস্তকসংখ্যা ১৪,৭০২। দৈনিক ও সাময়িক পত্রপত্রিকার সংখ্যা ২৪। মফঃস্বলের কয়েকটি স্থানেও পুস্তকপাঠের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়টি ১৯২৮ খৃষ্টাব্দ হইতে পরিচালিত হইতেছে; ১৯৭১ খৃষ্টাব্দে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ১৬০ (ছাত্র-৮৯)। বর্ষত্রয়ে দাতব্য হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয়ে চিকিৎসিত রোগীর সংখ্যা যথাক্রমে ৪০,৭৫৪, ৩৫,৭৬০ ও ৩৩,৯.৮। ১৯৭০ খৃষ্টাব্দে ভীষণ বন্যায় বন্যার্তদিগের মধ্যে কাঁথি সেবাশ্রম কর্তৃক উল্লেখযোগ্য সেবাকার্য অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

মঠ-বিভাগে নিত্যপূজা, উপাসনা,, নিয়মিত ধর্মালোচনা, অবতার ও মহাপুরুষগণের জন্মতিথিতে পূজাদি, প্রতিমায় শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা ও শ্রীশ্রীকালীপূজা এবং বার্ষিক শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

লখ্‌নৌ রামকৃষ্ণ মিশন (বিবেকানন্দ পুরী, লখ্‌নৌ-৭) সেবাশ্রমের ১৯৭১-৭২ খৃষ্টাব্দের কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। এখানে বিরাট ভূখণ্ডের উপর বিবেকানন্দ পলিক্লিনিক—আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিবিধ আয়োজন-সমন্বিত সুবৃহৎ মেডিক্যাল সেণ্টার সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। জাতিধর্মনির্বিশেষে আর্তনারায়ণের সেবাকল্পে এই কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে রোগনির্ণয় করিয়া যথোপযুক্ত চিকিৎসা ও সেবা-পরিচর্যা দ্বারা রোগীকে নিরাময় করিয়া তোলা এখানকার বৈশিষ্ট্য। বিভিন্ন বিভাগে স্বদেশে ও বিদেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ চিকিৎসাকার্যে নিরত আছেন। সুষ্ঠু ও ফলপ্রসূ চিকিৎসার ফলে রোগীর সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। ১৯৭০ খৃষ্টাব্দে রোগীর সংখ্যা ছিল ৮,৩৪,৬৯৫, এই সংখ্যা বাড়িয়া ১৯৭১ খৃষ্টাব্দে হইয়াছে ১৩,৭৭,৮৬০। ১৯৭১ খৃষ্টাব্দে অ্যালোপ্যাথিক কেস ১০,৩৯,৪৩৩, প্যাথলজি কেস ৬৫,২০৪ এবং এক্স-রে কেস ১৬,৫৩৮; অস্ত্রচিকিৎসার সংখ্যা

৪,৩৫২। রুর‍্যাল হেল্‌থ সারভিস্ প্রোগ্রামে ১৯৭১ খৃষ্টাব্দে ৪৪ দিনে ১১,৩৩২ জন রোগী চিকিৎসিত হন; ৫১ জন রোগীর অস্ত্রোপচার করা হইয়াছিল।

মন্দিরে দৈনন্দিন পূজা-উপাসনা-ভজনাদি ও সাময়িক পর্ব তিথিকৃত্য, পাক্ষিক রামনাম ও শ্যামনাম অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মতিথি সুষ্ঠুভাবে পূর্ব পূর্ব বৎসরের ন্যায় উদ্‌যাপিত হইয়াছে। রবিবারের গীতা-আলোচনায় ভক্তবৃন্দ যোগদান করেন।

আলোচ্য বর্ষে গ্রন্থাগারের গ্রন্থসংখ্যা ১১,৬৭৯, তিন হাজারের অধিক পুস্তক নূতন সংযোজিত। পাঠাগারে ৯টি দৈনিক ও ৫৯টি সাময়িক পত্রিকা লওয়া হইতেছে।

স্বামী কেদারানন্দের দেহত্যাগ

আমরা গভীর দুঃখের জানাইতেছি, গত ২৫মে ১৯৭৩ রাত্রি ১টা ৪৫ মিনিটে স্বামী কেদারানন্দ (ফণী মহারাজ) বারাণসী সেবাশ্রমে দেহত্যাগ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণপাদপদ্মে মিলিত হইয়াছেন। করোনারী থ্রম্বসিসে আক্রান্ত হওয়ার ফলে তাঁহার হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বিকল হয়। প্রথমে ভালই ছিলেন, কিন্তু সহসা অন্তিম মুহূর্ত উপস্থিত হয়। তাঁহার ৬৪ বৎসর বয়স হইয়াছিল। তিনি শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের নিকট মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেন; ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে বেলুড় মঠে সঙ্ঘে যোগদান করিয়া ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহারই নিকট সন্ন্যাসদীক্ষা প্রাপ্ত হন। একজন উপাধিপ্রাপ্ত চিকিৎসক হিসাবে চিকিৎসাবিষয়ে তিনি বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন; বরিশাল আশ্রমে কিছুকাল এবং ১৯৪১ খৃষ্টাব্দ হইতে দেহত্যাগের পূর্ব পর্যন্ত বারাণসী সেবাশ্রমে আর্তনারায়ণের সেবায় নিরত থাকেন। অমায়িক সরল অকপট সন্ন্যাসী ছিলেন তিনি, তাঁহার কর্মনিষ্ঠা ও পারদর্শিতায় বারাণসী সেবাশ্রমের অনেক উন্নতি হইয়াছে।

বিবিধ সংবাদ

শ্যামপুকুর শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা সংসদ কর্তৃক গত ২৪শে মার্চ হইতে পাঁচদিনব্যাপী ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীমা সারদাদেবী ও যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব বিবিধ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালিত হইয়াছে। ২৪শে মার্চ সকালে পূজা, পাঠ, ভজনাদি হয়। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ও লীলা-প্রসঙ্গ পাঠ ও আলোচনা করেন স্বামী নিবৃত্ত্যানন্দ। দুপুরে ২,০০০ ভক্ত বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। সন্ধ্যায় স্বামী চিদাত্মানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে মনোজ্ঞ আলোচনা করেন। পরে লীলাকীর্তন হয়। ২৫শে হইতে ২৮শে মার্চ 'হরিবোলা' যাত্রানুষ্ঠান হয়, প্রব্রাজিকা মোক্ষপ্রাণা 'শ্রীমা ও ভাগবত' এবং স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ 'স্বামী বিবেকানন্দ' সম্বন্ধে আলোচনা করেন। রামায়ণগান ও কালীকীর্তনান্তে উৎসবের পরিসমাপ্তি হয়।

কুলটী শ্রীশ্রীসারদাসঙ্ঘের উদ্যোগে গত ২৫শে মার্চ সঙ্ঘের অষ্টম বাৎসরিক উৎসব পালিত হয়। প্রভাতফেরী, বিশেষ পূজা, অখণ্ড জপ, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথিপাঠ, ভজন প্রভৃতি উৎসবের অঙ্গ ছিল। সন্ধ্যায় আয়োজিত সভায় সম্পাদিকার বিবৃতি-পাঠান্তে প্রব্রাজিকা অসিতাপ্রাণা শ্রীশ্রী-মায়ের জীবন হৃদয়গ্রাহী ভাষায় আলোচনা করেন। পরে বেতারশিল্পী শ্রীতুলসী গোস্বামী ও সম্প্রদায় সুললিত সুরে ভজন ও কীর্তন পরিবেশন করেন,

প্রায় ছয়শত নরনারীকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

নূতনপুকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ৮ই এপ্রিল শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৩৮তম জন্মোৎসব বিশেষ পূজা, শ্রীশ্রীচণ্ডী ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতপাঠ, কালীকীর্তন প্রভৃতির মাধ্যমে পালিত হইয়াছে। মধ্যাহ্নে ছয়শতাধিক নরনারী বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন।

বিকালে অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় স্বামী জীবানন্দ (সভাপতি) ও শ্রীকিরণচন্দ্র ঘোষাল শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী আলোচনা করেন। আশ্রমসেবক শ্রীরজনীকান্ত মণ্ডল সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিবার পর উৎসবের সমাপ্তি হয়।

পাঁচগ্রাম শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাশ্রমে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব গত ১৫ই, ১৮ই ও ১৭ই এপ্রিল পালিত হয়। শ্রীকিরণচন্দ্র রায় মহাশয় দুইদিন ভাগবত পাঠ করেন, শ্রীপুলিনবিহারী চট্টোপাধ্যায়ের পালাকীর্তন তিন দিন হয়। ভারত সরকারের প্রচারবিভাগ কর্তৃক একদিন ছায়াচিত্র প্রদর্শিত হয়। প্রফেসর রেজাউল করিম সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় শ্রীশ্রীঠাকুরের সর্বধর্মসমন্বয়ের বাণী এবং শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী ও স্বামীজীর বিষয় আলোচিত হয়। প্রায় বারশত নরনারী বসিয়া খিচুড়ি-প্রসাদ গ্রহণ করেন।

ডিগবয় শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে গত ২০শে হইতে ২৩শে এপ্রিল চারিদিনব্যাপী শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

২০শে ও ২১ এপ্রিল অনুষ্ঠিত সভায় স্বামী সৌম্যানন্দ (সভাপতি), স্বামী কৈলাসানন্দ ও স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ প্রথম দিন স্বামী বিবেকানন্দ ও দ্বিতীয় দিন শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে ভাষণ দেন। ২২শে এপ্রিল পূজা, ভজন, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ও উপনিষদ্‌পাঠ, শ্রীলক্ষ্মীকান্ত চক্রবর্তীর পদকীর্তন প্রভৃতির মাধ্যমে সারাদিনব্যাপী উৎসব চলিতে থাকে। দুপুরে চার হাজারেরও অধিক লোক বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। সন্ধ্যায় স্বামী প্রণবাত্মানন্দ ছায়াচিত্রযোগে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী আলোচনা করেন। ২৩শে এপ্রিল সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত সভায় স্বামী কৈলাসানন্দ (সভাপতি), স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ ও কুমারী বীণাপাণি কর শ্রীশ্রীমায়ের সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। সভান্তে ছায়াচিত্রযোগে স্বামী প্রণবাত্মানন্দ কর্তৃক স্বামীজীর জীবন আলোচিত হয়। শ্রীরূপেশ ব্রহ্মচারী উৎসবের তিনদিন গানাগীতি পরিবেশন করিয়াছিলেন।

ভবানীপুর শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র ও সেবা-কেন্দ্রের উদ্যোগে গত ২১শে ও ২২শে এপ্রিল শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৩৮তম শুভ জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হইয়াছে। ২১শে এপ্রিল অপরাহ্ণে আয়োজিত সভায় শ্রীরবীন্দ্রনাথ সরকার (সভাপতি) ও শ্রীঅনিমেষ রায়চৌধুরী স্বামীজী সম্বন্ধে ভাষণ দেন। পরে 'মহা উদ্বোধন' নাট্যাভিনয় এবং রাত্রে শ্রীশ্রীশ্যামাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। ২২শে এপ্রিল পূর্বাহ্ণে শোভাযাত্রা, পূজা, পাঠ, ভজনাদি এবং বিকালে ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীশঙ্করপ্রসাদ মিত্র (সভাপতি) ও স্বামী মুমুক্ষানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে ভাষণ দেন। সভান্তে ভজন ও সেতার-বাদন ও ভক্তিমূলক সঙ্গীত পরিবেশিত হয়।

ঘাটশীলা শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রমে গত ২৭, ২৮ ও ২৯শে এপ্রিল শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব পালিত হইয়াছে। প্রথম দিনে ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী প্রমথানন্দ। স্থানীয় আশ্রম-সম্পাদক স্বামী প্রজ্ঞানন্দের সংক্ষিপ্ত ভাষণের পর শ্রী এস. এম. রায় সকলকে অভ্যর্থনা জানান। সভামঞ্চে পুরুলিয়া বিদ্যা-পীঠের সৌজন্যে 'ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ' ছায়াচিত্র দেখানো হয়। অপর দুইদিন বরুণা বালকাশ্রমের সৌজন্যে শ্রীশ্রীমা সারদা ও স্বামী বিবেকানন্দ

ছায়াচিত্র দুইটি যথাক্রমে প্রদর্শিত হইয়াছিল।

সম্প্রতি **হুগলী জেলা** বিবেকানন্দ সঙ্ঘের ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন কেন্দ্রে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথিকে কেন্দ্র করিয়া নিম্নলিখিত অনুষ্ঠানগুলি সম্পন্ন হইয়াছিল :

(ক) **বাঁশবেড়িয়া** কেন্দ্রে ৬ই মার্চ, ১৯৭৩ তারিখে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিশেষ পূজা ও হোম হয় এবং সন্ধ্যা ৬টায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত পাঠ হয়।

(খ) **সাহাগঞ্জ** কেন্দ্রেও ৬ই মার্চ সকাল ৮টায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিশেষ পূজা ও হোম অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যা ৬টায় কথামৃত পাঠ হয়।

(গ) **নিত্যানন্দপুর** কেন্দ্রে ৬ই মার্চ সকাল ৮টায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিশেষ পূজা ও হোম হয় ও সন্ধ্যা ৬টায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত পাঠ হয়।

(ঘ) **ত্রিবেণী** অবৈতনিক বিদ্যালয়ে ৮ই মার্চ শ্রীপবিত্রকুমার ঘোষের সভাপতিত্বে এক আলোচনা-সভা হয়। উক্ত সভায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনীকে উপজীব্য করিয়া ভাষণ দেন সর্বশ্রী শিবপদ শর্মা, কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়, সুব্রত রায়।

(ঙ) **গজঘণ্টা** কেন্দ্রে গত ১০ই মার্চ সকাল ৮টায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিশেষ পূজা ও হোম সম্পন্ন হয়। সন্ধ্যা ৬টায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত পাঠ করেন শ্রীজয়দেব চট্টোপাধ্যায়।

(চ) গত ১১ই মার্চ সমাপ্তি-অনুষ্ঠানে **মগড়া কাঁটাপুকুর** প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব পালিত হয়। সকাল ৮টায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিশেষ পূজা হোম অনুষ্ঠিত হয়। দুপুরে ভক্ত-নরনারীদের প্রসাদ বিতরণ করা হয়। তারপর ভক্তিসঙ্গীতের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। অনুষ্ঠিত সভায় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও অতুলনীয় সাধনা অবলম্বনে মনোজ্ঞ আলোচনা হইয়াছিল।

পরলোকে

উপেন্দ্রনাথ মজুমদার

গত ৭ই এপ্রিল বেলা পৌনে-এগারোটার সময় জলপাইগুড়িতে উপেন্দ্রনাথ মজুমদার শ্রীশ্রীমায়ের নাম করিতে করিতে পরিণত বয়সে সজ্ঞানে পরলোকগমন করিয়াছেন। শ্রীশ্রীমায়ের নিকট তিনি মন্ত্রদীক্ষা পাইয়াছিলেন। তাঁহার জন্মস্থান পূর্ববাংলার নোয়াখালি জেলার দক্ষিণ-মন্দিরা গ্রাম।

বিনোদেশ্বর দাশগুপ্ত

গত ৫ই মে রাত্রি ১২টা ১২ মিনিটের সময় শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য বিনোদেশ্বর দাশগুপ্ত তাঁহার কলিকাতার বাসভবনে ৮৯ বৎসর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন।

তাঁহার বাসভূমি ঢাকা জেলার কলমা গ্রাম। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ৩রা ডিসেম্বর তিনি জন্মগ্রহণ করেন। কলিকাতায় আসিয়া বি এ. পাশ করিবার পর কিছুদিন শিক্ষকতা করিয়া তিনি কলমায় ফিরিয়া যান এবং ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে স্বামী প্রেমানন্দ কর্তৃক কলমা শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতে প্রায় অর্ধ-শতাব্দীকাল সেখানে থাকিয়া সমগ্র বিক্রমপুর অঞ্চলের জনহিতকর কাজে নিজেকে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় আসিবার সময় পর্যন্ত তিনি কলমা শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতির সম্পাদক ও প্রধান শিক্ষকরূপে কাজ করিয়াছেন। কলমা উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে তিনি অন্যতম সংগঠক শিক্ষক। একটি প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়ও স্থাপন করিয়াছিলেন।

যৌবনে অশ্বিনীকুমার দত্ত, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, ভগিনী নিবেদিতা প্রভৃতির সংস্পর্শে তিনি আসিয়াছিলেন। পরে শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানগণের সঙ্গ ও স্নেহলাভের সৌভাগ্য তাঁহার হয়। কিছু কবিতা এবং গান তিনি রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠা দুই কন্যা রামকৃষ্ণ সারদামঠের সন্ন্যাসিনী।

ইঁহাদের বিদেহী আত্মা শ্রীশ্রীমায়ের চরণে চিরশান্তি লাভ করুক, এই প্রার্থনা।

উদ্বোধন, ১ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা

[পুনর্মুদ্রণ]

(পূর্বানুবৃত্তি : শ্রীরামানুজচরিত (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ-লিখিত ।)

করি·········ইনি রাজর্ষির ন্যায় দীপ্তিশালী ছিলেন বলিয়া বৈষ্ণবেরা ইঁহাকে নারায়ণের কৌস্তুভমণির অংশাবতার বলিয়া পূজা করেন।* (ক্রমশঃ)

ঝালোয়ার দুহিতা।

কবিবর গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত।

(৫ম সংখ্যায় প্রকাশিতের পর।)

এদিকে মীরাবাই নিজ মন্দিরে উপনীতা, গৃহদ্বারে একজন বৈষ্ণব, সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। বৈষ্ণব যুবাবয়সে ভেকধারী! বিষাদ-পূর্ণ সুন্দর বদন। সুন্দর নেত্রে, মীরার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, আমার একটী ভিক্ষা আছে। করযোড়ে মীরাবাই উত্তর করিলেন, আমার সাধ্যাতীত না হয়, যাহা চান, দিব। বৈষ্ণব-পদে প্রাণ রাখিতে কুণ্ঠিত নহি। যুবা ভেকধারী বলিলেন, তোমার সঙ্গে প্রহরী। প্রহরীর সম্মুখে কথা ব্যক্ত করিব না। মীরা প্রহরীর দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, আমি বৈষ্ণব-সেবা করিব; যদি তোমরা কৃষ্ণ-বিদ্বেষী না হও, দূরে অবস্থান কর। মধুর-ভাষিণী মীরার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে কেহ সাহস করিল না।

বৈষ্ণব বলিলেন, আমায় ভিক্ষা দিন।

মীরা। আজ্ঞা করুন।

বৈষ্ণব। তোমার মন্দিরের পূর্ব্বদ্বার দিয়া ঝালবনে প্রবেশ করা যায়। প্রবেশ করিতে পারিলে, ঝালোয়ার-সর্দ্দার-দুহিতা কিশোরী যে পুরে বন্দী আছেন, তথায় যাইতে পারিব। আমি মন্দার রাজকুমারের নিকট প্রতিশ্রুত, তাঁহাকে একটী পত্র দিব। যদি পত্র দিতে না পারি, আমি মিথ্যাবাদী হইব।

মীরা কহিলেন, "ভাল, যান।"

বৈষ্ণব। আমার অর্দ্ধভিক্ষা চাহিয়াছি, আর অর্দ্ধ ভিক্ষা এই, প্রত্যাগমনকালীন যাহাকে ইচ্ছা, সঙ্গে লইয়া আসিব, তাহাকে কেহ না রোধ করে।

মীরা। আমি রোধ করিব না। আমার আজ্ঞায় কেহ রোধ করিবে না। অপর কেহ রোধ করে, তন্নিমিত্ত আমাকে দোষী করিবেন না।

মীরা দ্বার খুলিয়া দিলেন, যুবা শ্বাপদ-সঙ্কুল ঝালবনে প্রবেশ করিলেন।

এদিকে কুম্ভরাণা কিশোরীর মন্দিরে উপস্থিত, কিশোরীকে কত অনুনয় বিনয় করিতেছেন। কিশোরী উল্লিখিত আলোর প্রতি লক্ষ্য করিয়া আছেন, ফিরিয়াও চান না। অবশেষে রাণা বলিতে লাগিলেন, "বুঝিলাম, এ জীবনে আমার জ্বালা নির্ব্বাণ হইবে না! বুঝিলাম, তোমার হৃদয়ে আমি কখনও স্থান পাইব না। তোমায় তোমার প্রণয়ীর নিকট যাইতে দিই নাই, বন্দী করিয়াছি,

* শ্রীরামানুজ-চরিত তৃতীয় অধ্যায় (পৃঃ ১২ হইতে ১৪)—বর্তমান সম্পাদক

পিতৃ-গৃহ হইতে অপহরণ করিয়াছি, স্বীকার করিতেছি, তোমার পিতাকে অর্থে বশীভূত করিয়া গৃহ প্রবেশ করিয়াছিলাম। এ সকল দোষের প্রতিশোধ গ্রহণ কর ; এই তরবারি লও। আমার বক্ষে আঘাত কর। শত্রুকে শাস্তি দাও, এই অঙ্গুরী লইয়া মন্দার অভিমুখে চলিয়া চাও, কেহ প্রতিরোধ করিবে না।"

বলিতে বলিতে রাণার চক্ষু হইতে ধারা পতিত হইতে লাগিল। কিশোরী কোন উত্তর করিল না।

রাণা বলিতে লাগিলেন, "তুমি কি আমাকে আত্মঘাতী দেখিলে সুখী হও ? আচ্ছা, আমার সঙ্গে আইস। চল, তোমাকে মন্দারে লইয়া যাইতেছি ; তোমার নিকট সহস্র দোষে অপরাধী।" কিশোরী কোন কথার উত্তর না দিয়া, গৃহদ্বার হইতে ফিরিলেন, শয্যাগৃহে প্রবেশ করিলেন। গৃহদ্বার রুদ্ধ করিয়া, যেন রাণা কুম্ভকে যাইতে বলিলেন। যথায় কিশোরী দাঁড়াইয়াছিলেন, রাণা তথায় দাঁড়াইলেন, দূর আলোকের প্রতি দৃষ্টি করিতে লাগিলেন, হঠাৎ দেখেন, গুড়ি মারিয়া পর্ব্বতশৃঙ্গে কে উঠিতেছে। প্রথম অনুভব হইল, কোন জন্তু। পরে মনুষ্য আকার অনুভব হইল। পরিচিত আকার বোধ হইল। মন্দার রাজকুমার নিশ্চিত জানিলেন।

মন্দার রাজকুমার গবাক্ষের সন্নিকটে। রাণা বজ্রনাদে বলিলেন, "রাজকুমার! ঝালবন ভেদ করিয়াছেন, কিন্তু ঝালানীর দর্শন পাইবেন না।" (ক্রমশঃ)

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শন

বিগত জানুয়ারি মাসের "মাইণ্ড" নামক আমেরিকা হইতে পরিচালিত পত্রিকায় 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শন' শীর্ষক একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা লিউইস্ জি. জেন্স্ (Lewis G. Janes) লিখিত। ইনি আমেরিকাস্থ তুলনায় ধর্ম্মালোচনার কেম্‌ব্রিজ সমিতি ও মন্‌সালভাট বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ। (Director of the Cambridge Conferences and of the Monsalvat School Comparative Religion.) ইনি একজন পরম পণ্ডিত। এই প্রবন্ধে পাশ্চাত্য জগতে প্রাচ্য দর্শনের প্রভাবের বিষয় প্রাচ্য দর্শনের প্রতি এতদূর সহানুভূতির সহিত আলোচনা করিয়াছেন যে, আমরা এই প্রবন্ধের অধিকাংশের মর্ম্মানুবাদ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না ;—

"১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে চিকাগো সহরে যে বিরাট ধর্ম্মসভা (Parliament of Religion) হয়, তাহাতে প্রাচ্য ধর্ম্ম, সাহিত্য ও দর্শনের প্রতি পাশ্চাত্যগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। বিগত ৫ বৎসর হইতে ভারতবর্ষ ও অন্যান্য প্রাচ্য প্রদেশ হইতে অনেক পণ্ডিত আসিয়া বেদান্তের গভীর দার্শনিক-তত্ত্ব, বৌদ্ধধর্ম্মের অনেক উচ্চ নীতি ও মনোবিজ্ঞান আর পার্শীদের অপেক্ষাকৃত সহজ-বোধগম্য ধর্ম্মনীতি শিক্ষা দিয়াছেন। এই প্রাচ্য চিন্তার সঙ্ঘর্ষের ফল এক্ষণে চিন্তা করিবার সময় আসিয়াছে।

ইনি বলেন, "অনেকেরই, হুজুগে পড়িয়া অবিচারিতচিত্তে, অনেক সময়ে প্রাচ্য গুরুগণের নিষেধসত্ত্বেও অনুপযুক্ত অবস্থায় যোগ অভ্যাস করিতে যাইয়া মানসিক ও শারীরিক বিশেষ অনিষ্ট

হইয়াছে বটে, কিন্তু আবার অনেকে নিয়ত কর্ম্মময় পাশ্চাত্য তরঙ্গের মধ্যে বাস করিয়াও ধ্যানাদি-জনিত বিমল শান্তি, অন্ততঃ কিয়ৎকালের জন্যও অনুভব করিয়াছেন।

"প্রাচ্যদেশ হইতে আগত আচার্য্যগণের ও তাঁহাদের শিক্ষাপ্রণালীর সহিত বিশেষ সংস্পর্শে আসিয়া আমার এই নিশ্চিত ধারণা হইয়াছে যে, তাঁহারা অতি ধীরভাবে ও বিবেচনার সহিত আমাদের দেশে তাঁহাদের ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। * * আমার নিশ্চিত ধারণা যে, এই প্রাচ্য আচার্য্যগণ পাশ্চাত্য জগতে যথার্থই কিছু সারবান জিনিষ আনয়ন করিয়াছেন।

"শব্দ-বিদ্যা ও ধর্ম্মে তুলনার প্রণালীর ব্যাখাতা প্রোফেসার ম্যাক্সমুলার তাঁহার ধর্ম্ম-বিজ্ঞান নামক (Science of Religion) পুস্তকে গেটে (Goethe)-উক্ত একটি প্রহেলিকা (যিনি একটি ভাষা জানেন, তিনি কোন ভাষাই জানেন না)—উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে, এ সত্য ধর্ম্ম বিষয়েও খাটে। যিনি একটি ধর্ম্ম জানেন, তিনি কোন ধর্ম্মই জানেন না। আমার বিশ্বাস, কি শব্দবিদ্যা, কি দর্শন, কি ধর্ম্ম সমুদয়েই তুলনার প্রণালী অবলম্বন করিলেই যথার্থ উপকার হইতে পারে। তাহা না করিয়া কেবল একটি দর্শন বা একটি ধর্ম্ম অন্ধভাবে আলোচনা করিলে নানারূপ ভ্রমে পড়িবার সম্ভাবনা।

"অবশ্য পাশ্চাত্য দর্শনসমূহ আমাদের বিশেষ আলোচনার সামগ্রী বটে, কিন্তু প্রাচ্য দর্শন সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকিলে জর্ম্মন দর্শনসমূহ কোনরূপে শিখা যায় না। অনেক পাশ্চাত্য দার্শনিকের সিদ্ধান্ত—গ্রীসই প্রকৃত দর্শনের জন্মভূমি। কিন্তু প্রাচ্য দর্শন সম্বন্ধে যাঁহারা কিঞ্চিৎ পরিমাণেও অবগত, তাঁহারাও এই সিদ্ধান্ত সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন না। রিটার (Ritter) ও জেলার (Zeller) প্রভৃতি দর্শনের ইতিহাস-লেখকগণ অতি প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকগণের প্রাচ্য দর্শন হইতে অনেক তত্ত্ব গ্রহণ করার কথা স্বীকার করিয়া থাকেন। তৎপরে ম্যাক্সমুলর ও ডিউসেন প্রভৃতির গবেষণাও তাঁহাদের উক্তির সত্যতা প্রমাণ করিতেছে।

তৎপরে ম্যাক্সমুলারের "ভারত ; উহা আমাদের কি শিখাইতে পারে ?" (India; What can it teach us ?) নামক গ্রন্থ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন, ম্যাক্সমূলার কিরূপে সকল দর্শনশিক্ষার্থীদিগকে বেদান্তাধ্যয়নে অনুরোধ করিতেছেন।

পুনরায় বলিতেছেন—"সোপেনহাওয়ারের আধুনিক দার্শনিক চিন্তার উপর বিশেষ প্রভাব লক্ষিত হয়। তিনিও তাঁহার নিজ দর্শনে বেদান্তের প্রভাব স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছেন। সোপেন-হাওয়ার বলিয়াছেন,—উপনিষদ্ তুল্য মনের উন্নতি-বিধায়ক ও উপকারক আর কিছু নাই ; জীবনে ইহা আমায় শান্তি দিয়াছে, মৃত্যুতেও সান্ত্বনা দিবে। বেদান্তের পাশ্চাত্য ব্যাখ্যাতা ডিউসেনও জীবনে বেদান্তের সৎ প্রভাবের বিষয় খুব জোরের সহিত বলিয়াছেন। লিবনিজ ও লোট্জেও যে অনেক অংশে প্রাচ্য দর্শনের নিকট ঋণী, তাহাও বিচক্ষণ ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারেন। আর ভন হার্টম্যান (Von Hartmann) যে বৌদ্ধ মনোবিজ্ঞান ও দর্শনের নিকট ঋণী, তাহাও সহজ-বোধগম্য। কান্ত (Kant) ফিক্তে (Fichte), হেগেল (Hegel) ও জর্ম্মন মনোবাদিগণ (Idealists) বিশেষ-রূপে প্রাচ্য দর্শনের দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিলেন। আমার বিশ্বাস, প্রাচ্য দর্শনের চর্চ্চা যত বাড়িবে, ততই ইহা আমাদের স্পষ্ট বোধগম্য হইবে। * *

"আমরা অনেক সময় ভুলিয়া যাই যে, খ্রীষ্টধর্ম্মও প্রাচ্য ধর্ম্ম ; যদিও উহাতে বিধিবদ্ধ কোন দার্শনিক ভাব অতি অল্পই পাওয়া যায়, তথাপি, প্রাচ্যচিন্তালোকে উহা না দেখিলে, উহার প্রাথমিক

সৌন্দর্য্য কিছুই বুঝিতে পারি না। ম্যাথিউ আরনল্ড (Matthew Arnold) বহুপূর্ব্বে স্পষ্ট-রূপে দেখাইয়াছেন যে, খ্রীষ্টধর্ম্মমত যীশু ও পলের প্রাচ্য রূপক শিক্ষা-সমূহের অগষ্টীন (Augustine) ও রোমক চর্চ্চের ফাদারগণ-কৃত আক্ষরিক-ভাব-গ্রহণজ বিকৃতি-স্বরূপ। প্রতাপ চন্দ্র মজুমদারের প্রাচ্য খ্রীষ্ট (Oriental Christ) অনেক পাশ্চাত্য মনে যীশুর প্রকৃতভাব উদ্দীপনা করিয়া দিয়াছে এবং ভারতাগত আচার্য্যগণের শিক্ষায় অনেক সন্দেহবাদীকে খ্রীষ্টধর্ম্মের উপর শ্রদ্ধাবান করিয়াছে। আমি অনেক উদাহরণ জানি, যাহাতে ইহা একেবারে চরিত্রকে ভালদিকে গঠিত করিয়া ফেলিয়াছে।

"বেদান্তাচার্য্যগণ, অন্ততঃ অপরকে নিজ ধর্ম্মে লইয়া যাইবার চেষ্টা করেন নাই। অবশ্য, তাঁহারা পাশ্চাত্য শিক্ষার্থীদিগের নিকট প্রাচ্য চিন্তার সৌন্দর্য্য ও গভীরতার কিয়দংশ প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু, তাঁহারা খ্রীষ্টানকে বলিয়াছেন, 'তুমি আরও ভাল খ্রীষ্টান হও, আমরা তোমাকে খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া হিন্দু হইতে বলিতেছি না।'

"আমাদের গুরু, র‍্যাল্‌ফ ওয়াল্ডো এমার্শনও (Ralph Waldo Emerson) বেদান্তের ভাবে অনুপ্রাণিত ছিলেন। তাঁহার লেখার যদি কিছু ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়, বেদান্তেই তাহা পাওয়া যায়। তাঁহার 'ব্রহ্ম' শীর্ষক ক্ষুদ্র কবিতা ক্ষুদ্রাকারে ভগবদ্গীতা। তাঁহার চিঠিপত্রে তিনি বলিয়াছেন, সাহিত্য-রঙ্গ-ভূমে অবতরণের প্রথম অবস্থায় কারলাইল (Carlyle) তাঁহাকে একখানি ভগবদ্গীতা উপহার দেন। ইহারই প্রভাব তাঁহার প্রতিভার উপর কার্য্য করিয়া পাশ্চাত্য জগতের নিকট প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাও সকলকে স্বীকার করিতে হইবে। চার্লস ম্যালয়, এমার্সনের একজন ভক্ত। তিনিও এমার্সনের উপর বেদান্তের প্রভাব ও এমার্সনের লেখা বুঝিবার পক্ষে প্রাচ্য দর্শনাদির আলোচনার উপকারিতা স্বীকার করেন।

"ভারতাগত আচার্য্যগণ আমাদের আর এক উপকার করিয়াছেন। আমরা এতদিন দর্শন হইতে ধর্ম্মকে পৃথক্ করিতাম—নীতির সহিত সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের কোন সংস্রব আছে, তাহা ভুলিয়া যাইতে বসিয়াছিলাম। ভারতাগত আচার্য্যেরা ধর্ম্ম, নীতি, দর্শন, সমাজাদির পরস্পর সাপেক্ষতার উপর জোর দিয়া আমাদের মহদুপকার সাধন করিতেছেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে অগণ্য ধন্যবাদ। যে ধর্ম্ম বিচারশক্তি ও হৃদয় উভয়কেই চরিতার্থ করে না, তাহা অসম্পূর্ণ।

"আমাদের পাশ্চাত্য দর্শন অনেক সময়ে প্রকৃত যুক্তির উপর নিজেদের সিদ্ধান্তসমূহ স্থাপন না করিয়া আন্দাজের উপর নির্ভর করিয়া থাকেন, ইহাতে অনেক ভুল ও গোঁড়ামি আসিয়া পড়ে।

"ভাবী দর্শন প্রাচীন মতসমূহের সত্যসমুদয় লইয়া বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক চিন্তার সহিত মিলাইবে। কান্তের ভাব অনেক গ্রহণ করিবে, কান্তের পরবর্ত্তী দার্শনিকগণের নিকটও কিছু লইবে, কিন্তু হারবার্ট স্পেন্সার ও তাঁহার ক্রমোন্নতি-বাদের নিকট ইহা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লইবে। প্রাচ্য দর্শনসমূহের আলোচনায় ইহা অধিকতর সহানুভূতিসম্পন্ন হইবে। এই প্রাচ্য দর্শনসমূহে আধ্যাত্মিক জীবনের সহায়ক অনেক জিনিষ আছে।

"অনেক আধুনিক বৈজ্ঞানিক জর্ম্মন দর্শন অপেক্ষা বেদান্তে অধিক বৈজ্ঞানিক ভাব দেখিতে পান। আন্দাজের উপর স্থাপিত অনেক পাশ্চাত্য দর্শন অপেক্ষা উহার সহিত বর্ত্তমান বিজ্ঞানের

অধিকতর ঐক্য দেখা যায়। বৈজ্ঞানিকপ্রণালীসহায় হইয়া জীবনের গভীর সমস্যাসমূহের দার্শনিক মীমাংসা অন্বেষণ করিতে করিতে, সর্ব্বপ্রকার সাহায্য গ্রহণ করিয়া আমরা আদর্শ সত্যের অনুসন্ধানে অগ্রসর হইতে পারি।"

আমার তিব্বত ভ্রমণের এক পরিচ্ছেদ।

(৫ম সংখ্যায় প্রকাশিতের পর।)

ইহাদের চরিত্র কিরূপ? পাঠককে দুই একটি উদাহরণ হইতে সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে সাবধান করিয়া ইহাদের চরিত্রের কথা কিছু বলিব। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অতিথিসৎকার বিষয়ে ইহারা আদর্শ, কিন্তু যাহাকে সচরাচর চরিত্র-বল বলে, তাহা ইহাদের বড় দেখিলাম না। ইহারা মিথ্যা বলিতে সঙ্কুচিত নহে। মঙ্গলপুরী বলিত, আমি নানাপ্রকার ঔষধ জানি। ইহারা লোককে এই ঔষধ প্রদান করিয়া ভিক্ষা ও নেশার বস্তু সংগ্রহে প্রাণপণে চেষ্টা পাইত। ইহাদের নিকট এক আধখানি সংস্কৃত পুস্তক ছিল—বোধ হয়, শঙ্করাচার্য্যের নির্ব্বাণাষ্টক প্রভৃতি স্তব। ইহাদের শিক্ষা অতি অল্প, বলাই বাহুল্য। অন্য কোন বিশেষ চরিত্রদোষ দেখি নাই। ইহারা বলিত, আমরা ৮ মাস ভ্রমণ ও চারমাস একস্থানে থাকি। এই চারমাস একস্থানে বাসকেই চাতুর্ম্মাস্য বলে—বর্ষাকালে সন্ন্যাসীরা এইরূপ করিয়া থাকেন। পাশ্চাত্যেরা আমাদের সন্ন্যাসি-জীবন খুব তীব্রদৃষ্টিতে সমালোচন করিয়া থাকেন; অনেক সময়েই তাঁহারা সন্ন্যাসি-জীবনের কিছুমাত্র না জানিয়াই সমালোচনায় প্রবৃত্ত হন। কিন্তু কখন কখন তাঁহাদের কথায় আমাদের অনেক শিখিবার বিষয় থাকে। যথার্থ বিদ্বান্, চরিত্রবান্, সংযমী ও সাধনসম্পন্ন হইলে যে ম্লেচ্ছগণেরও ভক্তি আকৃষ্ট হয়, তাহার অনেক প্রমাণ আছে। সন্ন্যাসিগণ যদি কেবল কঠোরতা ও কতকগুলি বাহ্যনিয়মের উপর নির্ভর করিয়া চলা পরিত্যাগ করিয়া আন্তরিক সাধনের দিকে বেশী দৃষ্টি করেন, বিদ্যাশিক্ষা কেবল সংস্কৃত অথবা নিজ নিজ দেশীয় ভাষা শিক্ষায় আবদ্ধ না রাখিয়া আধুনিক পাশ্চাত্য ভাষা-সকলও শিক্ষা করেন, আর শিক্ষা কেবল পুঁথিগত না হইয়া গভীরচিন্তাসহকৃত হয়, আর যদি তাঁহারা আপন আপন সাধনভজনের ন্যায়—সর্ব্বসাধারণে ধর্ম্মপ্রচার ও বিদ্যাবিস্তারকেও আপনাদের কর্ত্তব্য বলিয়া জ্ঞান করেন, তবে তাঁহারা আপনাদের ও সমাজের যে কত কল্যাণসাধন করিতে পারেন, তাহার সীমা নাই।

আমরা আরও কিছু দিন অপেক্ষা করিয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। পুনরায় খড়কসিংকে পত্র লিখিলাম, উত্তর আসিল—শীঘ্রই আসিতেছেন, এই দিক দিয়াই আসিবেন। ইতিমধ্যে গোবরিয়া আসিল, আমরা তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে লছমীদতের সহিত তাহার গৃহে গেলাম—নিকটেই তাহার গৃহ। গৃহ হইতে একটি কৃষ্ণকায় লোক বাহির হইল, গায়ে একটি বৃহৎ লোমযুক্ত চামড়ার জামা। আমাদের খুব অভ্যর্থনা করিয়া বসাইল। আমাদের সঙ্গিগণকে গাঁজা খাওয়াইল। আমাদের কি দিয়া অভ্যর্থনা করিবে?—সুপারি খাইতে দিল। ক্রমশঃ তিব্বতযাত্রাসম্বন্ধে প্রসঙ্গ পড়িল। আমাদের প্রথমে ইচ্ছা ছিল, মানস-সরোবর ও কৈলাস দর্শন করিয়া নিতিপাস দিয়া বদরিকাশ্রম ও কেদারনাথে যাইব। গোবরিয়া ঐ পথের অত্যন্ত দুর্গমতা বর্ণনা করিল; আমা-

দিগকে পরামর্শ দিল, আপনারা অতদূর না যাইয়া মানস-সরোবর পর্য্যন্ত যান। আমাদিগকে আশ্বাস দিল, আমাদের যাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দিবে। তাহার এখন অসুখ, নিজে যাইতে পারিবে না ; আরও, ইংরাজদিগের সহিত তিব্বতীয়দিগের গোলযোগ বশতঃ, তিব্বতীয় গবর্ণর ঝঙপঙ কোন ইংরাজ-রাজ্যস্থ ভুটিয়া ব্যবসায়ীকে তিব্বতের সহিত বাণিজ্য করিতে দিবে না, সুতরাং, গোবরিয়াও এখন যাইবে না, তবে কালীর অপর পারস্থ ছাংরু গ্রামের পাধান (প্রধান বা মণ্ডল) শীঘ্রই তিব্বত প্রবেশ করিবে, তৎসহ আমাদিগকেও পাঠাইয়া দিবে।

আমাদের নিকট অনেক প্রকার লোক আসিত, কতক আলেখিয়া-গণের নিকট গাঁজা খাইবার জন্য ও তাহাদের নিকট ঔষধ লইবার জন্য, কেহ কেহ বা সদুপদেশ শুনিবার ও কোন কোন ধর্ম্মপুস্তক বুঝাইয়া লইবার জন্য। পোষ্ট আফিসের মুন্সী অর্থাৎ পোষ্টমাষ্টার সংস্কৃত স্তব বুঝাইয়া লইয়া যাইত। যত লোক আসিত, তাহার মধ্যে জয়মল নামক একটী ভুটিয়া বণিকের নাম করা আমার উচিত বোধ হয়। এ লোকটি বড় সাধুভক্ত। এ লোকটি আমাদের নিকট মধ্যে মধ্যে আসিত ; হিন্দী ভক্তমাল, সুন্দরাদাস-প্রণীত সুন্দর-বিলাস নামক একখানি হিন্দী বেদান্ত গ্রন্থ প্রভৃতি লইয়া আসিত। আমি যদিও ভাল হিন্দী জানিতাম না, তথাপি যথাসাধ্য বুঝাইয়া দিতাম। জয়মল আমাদিগকে মধ্যে মধ্যে ভিক্ষা দিত। যাইবার উদ্যোগ দেখিয়া আমাদিগকে একটিন চা ও একভেলি গুড় দিল। যদি ইংরাজ-রাজ্যস্থ ভুটিয়া-গণকে বাণিজ্য করিতে দিত, তবে জয়মল আমাদিগকে তাহার তাঁবুতে স্থান দিত। সকলেই বলিতে লাগিল, যত সাধু এই দিক্ দিয়া মানস সরোবর বা কৈলাস-দর্শনে যায়, সকলেই জয়মলের তাঁবুতে থাকে। সে সাধুগণকে নিজ তাঁবুর মধ্যেই রন্ধন করিতে দেয়।

আমরা একরূপ প্রস্তুত—কেবল অপেক্ষা খড়ক সিং ও সাহেবের আগমন। দুই একদিনের মধ্যেই উভয়ে সদলবলে আসিয়া পড়িলেন। খড়ক সিং আসিয়াই একেবারে আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। যুবা পুরুষ—বেশ বলিষ্ঠশরীর—অবয়বে অনুমান হয়, বুদ্ধিমান ও বিনয়ী। আমাদের পণ্ডিত মহাশয়ের ক্ষুদ্র ঘরখানিতে যেন উৎসব পড়িয়া গেল। সাহেবের লোকজন সব আসিয়া পণ্ডিতের গৃহে ধূমপান করিতে লাগিল। খড়ক সিং, গোবরিয়াকে আরও ভাল করিয়া বলিয়া দিবেন, আশ্বাস দিয়া ও নানাপ্রকার শিষ্টালাপ করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। (ক্রমশঃ)

ভগবদ্গীতা-শাঙ্করভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।*

উপক্রমণিকা

(পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণানুবাদিত)

* পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত। এই সংখ্যায় শাঙ্করভাষ্যের উপক্রমণিকা অংশটি মূল ও বঙ্গানুবাদসহ সম্পূর্ণ রহিয়াছে।—বর্ত্তমান সম্পাদক।

মহাভাষ্যম্ ।

প্রথমাহ্নিকম্ ।

(পণ্ডিত রজনীকান্ত বিদ্যারত্ন কর্তৃক অনুবাদিত ।)

ওঁ নমঃ শ্রীমহর্ষিভ্যঃ পাণিনিকাত্যায়নপতঞ্জলিভ্যঃ ॥

॥ ওঁ ॥

—o—

ভাষ্য মূল ।

অথ শব্দানুশাসনম্। অথেত্যয়ং শব্দোঽধিকারার্থঃ প্রযুজ্যতে। শব্দানুশাসনং নাম শাস্ত্রমধিকৃতং বেদিতব্যম্। কেষাং শব্দানাম্? লৌকিকানাং বৈদিকানাঞ্চ। তত্র লৌকিকাস্তাবদ্ গৌরশ্বঃ পুরুষো হস্তী শকুনির্মৃগো ব্রাহ্মণ ইতি। বৈদিকাঃ খল্বপি। "শন্নো দেবীরভীষ্টয়ে।" "ইষেত্বোর্জ্জেত্বা।" "অগ্নিমীলে পুরোহিতম্।" "অগ্ন আয়াহি বীতয়ে।" ইতি।

বঙ্গানুবাদ ।

শব্দানুশাসন অর্থাৎ শব্দনিরূপণ শাস্ত্র। "অথ" এই শব্দটী অধিকারার্থ অর্থাৎ আরম্ভবোধক। শব্দানুশাসন নামক শাস্ত্র আরম্ভ করিলাম জানিবে। কোন্ শব্দের অনুশাসন? লৌকিক ও বৈদিক শব্দসমূহের। তন্মধ্যে লৌকিকশব্দসমূহ; যথা,—গো, অশ্ব, পুরুষ, হস্তী, শকুনি, মৃগ, ব্রাহ্মণ ইত্যাদি। বৈদিক-শব্দসমূহ; যথা,—"শন্নো দেবীরভীষ্টয়ে" "ইষেত্বোর্জ্জেত্বা" "অগ্নিমীলে পুরোহিতম্" "অগ্ন আয়াহি বীতয়ে" ইত্যাদি।

ভাষ্য মূল ।

অথ গৌরিত্যত্র কঃ শব্দঃ? কিং যৎ সাস্নালাঙ্গুলককুদখুরবিষাণরূপং স শব্দঃ? নেত্যাহ, দ্রব্যং নাম তৎ। যৎ তর্হি তদিঙ্গিতং চেষ্টিতং নিমিষিতমিতি স শব্দঃ? নেত্যাহ, ক্রিয়া নাম সা। যৎ তর্হি তচ্ছুক্লো নীলঃ কপিলঃ কপোত ইতি স শব্দঃ? নেত্যাহ, গুণো নাম সঃ। যৎ তর্হি তদ্ভিন্নেষ্বভিন্নং ছিন্নেষ্বচ্ছিন্নং সামান্যভূতং স শব্দঃ? নেত্যাহ, আকৃতির্নাম সা।

বঙ্গানুবাদ ।

"গৌঃ" (গো) এই স্থলে শব্দ কোন্‌টি? যাহা গলকম্বল-লাঙ্গুল-ককুদ-খুর ও শৃঙ্গবিশিষ্ট তাহাই কি শব্দ? না; তাহাকে দ্রব্য বলে। তবে, যাহা তাহার ইঙ্গিত, চেষ্টা ও নিমেষ প্রভৃতি, তাহাই কি শব্দ? না; তাহাকে ক্রিয়া বলে। তবে, যাহা শুক্ল, নীল, কপিল, কপোত প্রভৃতি বর্ণ, তাহাই কি শব্দ? না; তাহাকে গুণ কহে। তবে যাহা ভিন্ন বস্তুতেও অভিন্ন থাকে, বস্তু ছিন্ন হইলে অর্থাৎ নষ্ট হইলেও ছিন্ন হয় না এবং সামান্যভূত অর্থাৎ জাতির ন্যায়, তাহাই কি শব্দ? না; তাহাকে আকৃতি কহে। (১)

---

(১) একটী গরুতে যেমন আকৃতি থাকে, অপর গোসমূহেও তদ্রূপ আকৃতি আছে। গোত্বজাতি যেমন একই প্রকার, তদ্রূপ গবাকৃতিও একই প্রকার। যেমন, ঘটটি ভগ্ন হইলেও ঘটত্ব-জাতি একেবারে যায় না, উহা নিত্য, তদ্রূপ গবাকৃতিও নিত্য।

ভাষ্য মূল।

কস্তর্হি শব্দঃ? যেনোচ্চারিতেন সাম্নালাঙ্গুলককুদখুরবিষাণিনাং সম্প্রত্যয়ো ভবতি, স শব্দঃ। অথবা প্রতীতপদার্থকো লোকে ধ্বনিঃ শব্দ ইত্যুচ্যতে। তদ্ যথা শব্দং কুরু, মা শব্দং কার্ষীঃ, শব্দকার্য্যয়ং মাণবক ইতি, ধ্বনিং কুর্ব্বন্নেবমুচ্যতে। তস্মাদ্ধ্বনিঃ শব্দঃ।

বঙ্গানুবাদ।

তবে শব্দ কোন্‌টি? যাহা উচ্চারণ করিলে গলকম্বল-লাঙ্গুল-ককুদ-খুর-শৃঙ্গবিশিষ্টের জ্ঞান হয়, তাহাকে শব্দ কহে। অথবা যে ধ্বনির দ্বারা জগতে পদার্থের প্রতীতি জন্মে, সেই ধ্বনিকে শব্দ কহে। যেমন, "শব্দ কর," "শব্দ করিও না," "এই বালক শব্দকারী," এই সকল স্থলে যে শব্দ করে, তাহাকেই ঐরূপ বলা হয়। অতএব ধ্বনিই শব্দ।

ভাষ্য মূল।

কানি পুনঃ শব্দানুশাসনস্য প্রয়োজনানি? রক্ষোহাগলঘ্বসন্দেহাঃ প্রয়োজনম্। রক্ষার্থং বেদানামধ্যেয়ং ব্যাকরণম্। লোপাগমবর্ণবিকারজ্ঞো হি সম্যগ্‌বেদান্ পরিপালয়িষ্যতীতি। উহঃ খল্বপি। ন সর্ব্বৈর্লিঙ্গৈর্ন চ সর্ব্বাভির্বিভক্তিভির্বেদে মন্ত্রা নিগদিতাস্তে চাবশ্যং পুরুষেণ যজ্ঞগতেন যথাযথং বিপরিণময়িতব্যাস্তান্নাবৈয়াকরণঃ শক্নোতি যথাযথং বিপরিণময়িতুম্। তস্মাদধ্যেয়ং ব্যাকরণম্। আগমঃ খল্বপি। ব্রাহ্মণেন নিষ্কারণো ধর্ম্মঃ ষড়ঙ্গো বেদোহধ্যেয়ো জ্ঞেয়শ্চেতি। প্রধানঞ্চ ষড়ঙ্গেষু ব্যাকরণম্। প্রধানে চ কৃতো যত্নঃ ফলবান্ ভবতি। লঘ্বর্থঞ্চাধ্যেয়ং ব্যাকরণম্। ব্রাহ্মণেনাবশ্যং শব্দা জ্ঞেয়া ইতি। ন চান্তরেণ ব্যাকরণং লঘুনোপায়েন শব্দাঃ শক্যা বিজ্ঞাতুম্। অসন্দেহার্থঞ্চাধ্যেয়ং ব্যাকরণম্। যাজ্ঞিকাঃ পঠন্তি, স্থূলপৃষতীমাগ্নিবারুণীমনড্বাহীমালভেতেতি। তস্যাং সন্দেহঃ, স্থূলা চাসৌ পৃষতী চ স্থূলপৃষতী, স্থূলানি পৃষন্তি যস্যাঃ সেয়ং স্থূলপৃষতীতি। তাং নাবৈয়াকরণঃ স্বরতোঽধ্যবস্যতি। যদি পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং, ততো বহুব্রীহিঃ, অথ সমাসান্তোদাত্তত্বং ততস্তৎপুরুষঃ।

বঙ্গানুবাদ।

শব্দানুশাসনের প্রয়োজন কি? রক্ষা, উহ, আগম, লঘু ও অসন্দেহ, ইহারাই প্রয়োজন। বেদের রক্ষার নিমিত্ত ব্যাকরণ অধ্যয়ন করা উচিত। যিনি লোপ (১), আগম (২) ও বর্ণবিকার (৩) জানেন, তিনিই বেদসকলকে সম্যক্ প্রকারে রক্ষা করিবেন (৪)। বেদে মন্ত্রসমূহ সকল লিঙ্গানুসারে ও সকল বিভক্তি অনুসারে উক্ত হয় নাই, পুরুষকে যজ্ঞ করিতে বসিয়া অবশ্যই যে স্থলে যে মন্ত্র যেরূপ হইতে পারে, সেই স্থলে সেইরূপ পরিবর্ত্তিত করিয়া লইতে হয়। ইহাকেই উহ কহে।

(১) বর্ণের অদর্শন হওয়াকে লোপ কহে।

(২) যে বর্ণ নাই, তাহার উপস্থিতিকে আগম কহে।

(৩) এক বর্ণ অন্য বর্ণে পরিবর্ত্তিত হওয়াকে বর্ণবিকার কহে।

(৪) লোপ, আগম ও বর্ণবিকারের উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে। তন্মধ্যে লোপ ও আগমের উদাহরণ যথা,—"দেবা অদুহত"। "অদুহত" এই পদটি দুহ ধাতুর লঙ্ বিভক্তির প্রথমপুরুষের বহুবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। দুহ ধাতুর লঙের ঝস্থানে অৎ আদেশ ও "অট" আগম

স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী

সন্ন্যাসীর গীতি—১৪শ সংস্করণ। স্বামীজী-রচিত 'Song of the Sannyasin'-নামক ইংরেজী কবিতা ও উহার পত্তে বঙ্গানুবাদ। মূল্য ২০ পয়সা।

ঈশদূত যীশুখৃষ্ট—৫ম সংস্করণ, ভগবান ঈশার জীবনালোচনা—মূল্য ০'৪০, উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে মূল্য ০'৩৫।

সরল রাজযোগ—৫ম সংস্করণ। স্বামীজী আমেরিকায় তাঁহার শিষ্যা সারা সি. বুলের বাড়িতে কয়েকজন অন্তরঙ্গকে 'যোগ' সম্বন্ধে যে বিশেষ উপদেশ দান করেন, বর্তমান পুস্তক তাহারই ভাষান্তর মূল্য ০'৫০।

পত্রাবলী—১ম ও ২য় ভাগ। অভিনব পরিবর্ধিত সংস্করণ; প্রায় ১০৫০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। স্বামীজার বহু অপ্রকাশিত পত্র ইহাতে সংযোজিত হইয়াছে। তারিখ অনুযায়ী পত্রগুলি সাজানো হইয়াছে। পরিচয়- এবং নির্ঘণ্ট-সংযুক্ত। মনোরম বাঁধাই। স্বামীজীর সুন্দর ছবি-সংবলিত। প্রতি ভাগ মূল্য ৫'৫০; উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে মূল্য ৫৲।

ভারতে বিবেকানন্দ—১৪শ সংস্করণ। আমেরিকা হইতে প্রত্যাবর্তনের পর স্বামীজীর ভারতীয় বক্তৃতাবলীর উৎকৃষ্ট অনুবাদ। ৫৯৯ পৃষ্ঠা; মূল্য ৫'০০। উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে মূল্য ৪'৫০।

দেববাণী—৯ম সংস্করণ। আমেরিকায় 'সহস্র-দ্বীপোত্থান'-নামক স্থানে কয়েকজন অন্তরঙ্গ শিষ্যকে স্বামীজী যে-সকল অমূল্য উপদেশ প্রদান করেন, ঐগুলির একত্র সমাবেশ। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি, ২১৪ পৃষ্ঠা; মূল্য—২৲ উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে মূল্য ১'৮০।

শিক্ষাপ্রসঙ্গ—৪র্থ সংস্করণ। শিক্ষা-সম্বন্ধে স্বামীজীর বাণীসকল সংকলিত ও ধারাবাহিকভাবে সন্নিবেশিত। ১৮৮ পৃষ্ঠা; মূল্য ১'৭৫।

কথোপকথন—৭ম সংস্করণ। স্বামীজীর ছবিযুক্ত। ডবল ক্রাউন, ১৬ পেজি, ১৪২ পৃষ্ঠা। মূল্য ১'২৫। উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে মূল্য ১'১৫।

মদীয় আচার্যদেব—স্বামী বিবেকানন্দ-প্রণীত; ১১শ সংস্করণ, ৬৪ পৃষ্ঠা। স্বীয় গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনী ও শিক্ষা-সম্বন্ধে আমেরিকাবাসীদের নিকট স্বামীজীর বিবৃতি। মূল্য ০'৭৫; উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে মূল্য ০'৬৫।

জ্ঞানযোগ-প্রসঙ্গে—বিভিন্ন বক্তৃতার সারসংক্ষেপ—ইংরেজীতে প্রকাশিত Discourses on Jnana Yoga পুস্তকের অনুবাদ। 'স্বামীজীর বাণী ও রচনা' হইতে পৃথক্ পুস্তকাকারে প্রকাশিত। আত্মতত্ত্ব ও বেদান্ত-বিষয়ক বহু কঠিন বিষয় সরলভাবে আলোচিত। 'জ্ঞানযোগ' গ্রন্থ পড়িবার পক্ষে সহায়ক। মূল্য দুই টাকা।

স্বামি-শিষ্য-সংবাদ—(পূর্বকাণ্ড — ১৩শ সংস্করণ; উত্তরকাণ্ড—১১শ সংস্করণ)। শ্রীশরৎ-চন্দ্র চক্রবর্তী প্রণীত। স্বামী বিবেকানন্দের মতামত অল্প কথায় জানিবার উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। স্বামীজীর জীবিতকালে তাঁহার সহিত প্রশ্নোত্তরচ্ছলে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য-দেশীয় আচার-নীতি, দর্শন-বিজ্ঞানাদি এবং ধর্ম ও সমাজগত সমস্যামূলক নানা বিষয়ের বিশদ আলোচনা। সরস ও হৃদয়গ্রাহী এই সব বর্ণনা সত্যই আনন্দদায়ক। বর্তমান যুগের বহু সমস্যার আদর্শানুগ সমাধানও ইহাতে পাওয়া যাইবে। জীবনতত্ত্ব বিষয়ে এই পুস্তকদ্বয় অমূল্য রত্নের সন্ধান দিবে। ২২০ ও ২১০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য প্রতি কাণ্ড ২'২৫।

মহাপুরুষ-প্রসঙ্গ—১৬শ সংস্করণ। ১৫৪ পৃষ্ঠা। ইহাতে রামায়ণ, মহাভারত, জড়-ভরতের উপাখ্যান, প্রহ্লাদচরিত্র, জগতের মহত্তম আচার্যগণ, ঈশদূত যীশুখ্রীষ্ট, ভগবান বুদ্ধ প্রভৃতি বিষয় আছে। কোমলমতি বালক-দিগের চরিত্রগঠনে ও ভারতীয় সংস্কৃতিতে তাহাদিগকে শ্রদ্ধাবান্ করিতে ইহা বিশেষ সহায়তা করিবে; মূল্য ৩'০০; উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে মূল্য ২'৭০।

প্রাপ্তিস্থান :—উদ্বোধন কার্যালয়, বাগবাজার, কলিকাতা ৩

উদ্বোধন-প্রকাশিত অন্যান্য পুস্তকাবলী

দশাবতারচরিত—৫ম সংস্করণ। শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য-প্রণীত। এই পুস্তক-পাঠে চরিত্র-কথার গল্পপ্রিয় পাঠক এবং ভক্তগণ ধর্ম ও ধর্মতত্ত্বের সন্ধান পাইবেন। মূল্য ২'০০।

শঙ্কর-চরিত—শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য-প্রণীত—৫ম সংস্করণ; আচার্য শঙ্করের অদ্ভুত জীবনী অতি সুললিত ভাষায় লিখিত। মূল্য ১৲।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বেদান্ত—স্বামী বিবেকানন্দ প্রণীত। ১৮৯৬ খৃঃ মার্চ মাসে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত বক্তৃতা এবং তৎ-পরবর্তী প্রশ্নোত্তর ও আলোচনা। বেদান্তের মূলতত্ত্ব অতি স্পষ্টভাবে ব্যক্ত। প্রশ্নোত্তর ও আলোচনায় ভারতীয় কৃষ্টি ও হিন্দুধর্মের মূল ভাব সাহসিকতার সহিত সরলভাবে উপস্থাপিত। পৃষ্ঠা ৫৫; মূল্য এক টাকা।

শিব ও বুদ্ধ—৭ম সংস্করণ। ভগিনী নিবেদিতা-প্রণীত। ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য রচিত সরল ও সুখপাঠ্য আখ্যান। মূল্য ০'৬৫।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ—শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সর্বপ্রথম অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের সবিস্তার ধারাবাহিক জীবনী। মূল্য—৩'০০।

ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ—৭ম সংস্করণ। স্বামী ব্রহ্মানন্দের কথোপকথন এবং পত্রাবলীর সংগ্রহ। প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু-লিখিত সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা। মূল্য ২'৫০।

মহাপুরুষ শিবানন্দ—স্বামী অপূর্বানন্দ-প্রণীত। ৩য় সংস্করণ। শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজীর বিস্তারিত জীবনী। মূল্য—৫'০০।

শিবানন্দ-বাণী—২য় ভাগ—৩য় সংস্করণ। স্বামী অপূর্বানন্দ-সঙ্কলিত। মূল্য—১'৫০।

শ্রীরামানুজ-চরিত—স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ-প্রণীত, ৩য় সংস্করণ, ২৫৮ পৃষ্ঠা। শ্রীসম্প্রদায়ে প্রচলিত আচার্য রামানুজের বিস্তৃত জীবনবৃত্তান্ত বাংলা ভাষায় প্রকাশিত। আচার্যের জীবদ্দশায় কোদিত প্রতিমূর্তির ছবি এই গ্রন্থে আছে। মূল্য ৩৲। উঃ গ্রাঃ পক্ষে ২'৭৫।

স্বামী অখণ্ডানন্দ—স্বামী অন্নদানন্দ-প্রণীত। এই পুস্তকে শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্নিধানে, তিব্বতে ও হিমালয়ে, স্বামীজীর সঙ্গে, দুর্ভিক্ষে সেবাকার্য, সেবাব্রতের প্রাণপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতি অধ্যায়ে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্যের পথিকৃৎ স্বামী অখণ্ডানন্দের ধারাবাহিক জীবনী। ডিমাই সাইজ, ৩১০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৪৲।

সাধু নাগমহাশয়—শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী-প্রণীত। ১১শ সংস্করণ। যাঁহার সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন, "পৃথিবীর বহু স্থান ভ্রমণ করিলাম, নাগমহাশয়ের ন্যায় মহাপুরুষ কোথাও দেখিলাম না।"—পাঠক! তাঁহার পুণ্য জীবন-বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া ধন্য হউন। মূল্য ২'০০।

গোপালের মা—স্বামী সারদানন্দ-প্রণীত (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ হইতে সঙ্কলিত)। অতুলনীয়-সাধননিষ্ঠ, পরমভক্ত গোপালের মা-র আদর্শ জীবনের সংক্ষিপ্ত কাহিনী। মূল্য ৫০ পয়সা।

লাটু মহারাজের স্মৃতিকথা—শ্রীচন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়-প্রণীত। ২য় সংস্করণ। শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও ঠাকুরের শিষ্যবর্গ সম্বন্ধে বহু অপ্রকাশিত ঘটনাবলীর সমাবেশ। নিজ জীবনের কঠোর ত্যাগ-তপস্যার কথায় অদ্ভুত প্রকাশভঙ্গীতে পাঠকগণ চমৎকৃত হইবেন। মূল্য—৪'০০।

স্বামী তুরীয়ানন্দ—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ-প্রণীত। বাল্যাবধি বেদান্তী এই মহারাজের জীবনের অদ্ভুত ঘটনাবলী-পাঠে চমৎকৃত হইবেন। ৩৪০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য—৩'৫০।

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিষ্যগণের সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত একত্র এই প্রথম প্রকাশিত হইল। দুই ভাগে সম্পূর্ণ। প্রতি ভাগের মূল্য—৫'৫০।

ভগিনী নিবেদিতা—স্বামী তেজসানন্দ-প্রণীত। ইহাতে তাঁহার জীবনের মুখ্য ঘটনাবলীর সম্যক্ আলোচনা রহিয়াছে। ইহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে "ভগিনী নিবেদিতা-স্মৃতি বক্তৃতামালার" প্রথম বক্তৃতা। মূল্য—১'৫০

প্রাপ্তিস্থান:—উদ্বোধন কার্যালয়, বাগবাজার, কলিকাতা ৩

উদ্বোধন, শ্রাবণ, ১৩৮০

বিষয়-সূচী

বিষয়-সূচী

জনপ্রিয়তার ঊর্ধ্বে!

কোলে

থিন এরারুট

দিব্য বাণী

অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্
আত্মাঽস্য জন্তোর্নিহিতো গুহায়াম্।
তমক্রতুঃ পশ্যতি বীতশোকো
ধাতুপ্রসাদান্মহিমানমাত্মনঃ॥ ২০

—কঠোপনিষদ্, ১।২

(সচ্চিদ্-আনন্দরূপ পরমাত্মা যিনি
নিখিল জগৎ রূপে প্রকাশিত তিনি।
প্রকাশ-মাধ্যম ভেদে মনে হয় তাঁরে ছোট, বড়)—
অণু হতে অণুতর, মহান্ হতেও মহত্তর।
বিরাজিত তিনি নিত্য পরিপূর্ণ নিজ মহিমায়
সকল জীবের মাঝে—সবাকার হৃদয়-গুহায়।
নিষ্কাম হৃদয় যার, শুদ্ধ হলে মন
আপন অন্তর মাঝে করে সে দর্শন
মহিমা তাঁহার; হেরি স্বরূপে তাঁহায়
শোকের সীমার পারে চলিয়া সে যায়।

কথাপ্রসঙ্গে

অন্তরে পূর্ব হইতেই নিহিত

১

আমাদের সকলেরই অন্তরে পূর্ব হইতেই অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত শক্তি, দেবত্ব নিহিত রহিয়াছে। যাঁহাকে ভগবান বলি, ব্রহ্ম বলি, তিনিই আমাদের সকলের মধ্যে রহিয়াছেন—সর্বাবস্থায় রহিয়াছেন, সর্বক্ষণ রহিয়াছেন। যাহাদের অতি হীন, নীচ, দুষ্কৃতকারী বলি আমরা তাহাদের মধ্যেও এই জ্ঞান, শক্তি, দেবত্ব সমভাবে বিদ্যমান। একজন মহাপুরুষ এবং একজন অতি দুরাচারীর মধ্যে প্রভেদ মাত্র এইটুকু—মহাপুরুষের মধ্যে এই অন্তর্নিহিত দেবত্বের আবরণ অপসারিত হইয়া তাহা পূর্ণ প্রকাশিত, আর অপরের মধ্যে উহা ঘন আবরণে আবৃত। আবরণ যতই ঘন হউক, মানুষ যতই হীন কাজ, হীন চিন্তা করুক, তাহার অন্তর্নিহিত এই দেবস্বরূপতা কখনও তাহাতে লুপ্ত হয় না, অধিকতর আবৃত হয় মাত্র। এমন কোন হীন কাজ নাই, যাহা করিলে মানুষটি চিরদিনের মত নষ্ট হইয়া যায়। যে মুহূর্তে সে নিজের এই অন্তর্নিহিত দেবত্ব সম্বন্ধে সজাগ হইয়া—আমার অন্তরে ভগবান রহিয়াছেন, তিনিই আমার স্বরূপ, এই বোধে সজাগ হইয়া উহার উপরকার আবরণ সরাইতে, এই স্বরূপকে উপলব্ধি করিতে সচেষ্ট হইবে, সেই মুহূর্ত হইতেই উহার প্রকাশ ঘটিতে থাকিবে।

স্বামীজী বার বার বহু ভাবে এই কথাটি ঘোষণা করিয়া আমাদের পরম আশ্বাসবাণী শুনাইয়াছেন। বলা যায়, তাঁহার সমস্ত বাণীর মূল সুর ইহাই—নিজ অন্তর্নিহিত দেবস্বরূপ সম্বন্ধে সজাগ হও, উহার বিকাশের পথে এখন হইতেই লাগিয়া যাও—এবং উহাকে পূর্ণবিকশিত করিবার পূর্বে থামিও না। এই অন্তর্নিহিত দেবত্বের বিকাশের জন্য বিভিন্ন পরিবেশে, বিভিন্ন অবস্থায় অবস্থিত মানুষকে তাহার উপযোগী পথই তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন। সমাজসেবার রাষ্ট্রসেবার ক্ষেত্রে, পরিবার-প্রতিপালনে, বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে, শিক্ষার ক্ষেত্রে সর্বত্রই তাঁহার নির্দেশের মূল সুর ইহাই—নিজের এবং অপরের মধ্যে সমভাবে দেবত্ব অন্তর্নিহিত, অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত শক্তি অন্তর্নিহিত - আমাদের প্রতিটি চেষ্টা যেন উহার বিকাশসাধনের সহায়ক হয়, অপরের সহিত আচরণকালে আমরা যেন তাহাদেরও অন্তর্নিহিত দেবত্ব সম্বন্ধে সজাগ থাকি। 'কর্মকে পূজায় রূপায়িত কর', 'অন্তর্নিহিত পূর্ণতার বিকাশের নাম শিক্ষা', 'অন্তর্নিহিত দেবত্বের বিকাশের নাম ধর্ম', 'ঈশ্বরজ্ঞানে মানুষের সেবা কর', 'দেবতা হও এবং অপরকেও ঐরূপ হইতে সহায়তা কর'—স্বামীজীর এসব বাণীরই লক্ষ্য ইহাই।

মানুষ স্বরূপতঃ ভগবান—এই দৃষ্টিতে দেখিয়াই মানুষকে তিনি অমৃতের সন্তান বলিয়াছেন। প্রত্যেক মানুষের ভিতরই ভগবানকে প্রত্যক্ষ করিয়াই তিনি বলিয়াছেন যে, পাপ বলিয়া যদি কিছু থাকে তবে মানুষকে পাপী বলাই সেই পাপ; যাহা মানুষকে নিজের দেবস্বরূপতা অধিকতর ভুলাইয়া দেয়, আমি নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব, নিখিল বিশ্বে কোন কিছু হইতে আমার ভয় পাইবার কিছুই নাই—এই বোধ হইতে মানুষকে অধিকতর দূরে সরাইয়া দেয়, সেই দুর্বলতাই পাপ। অন্তর্নিহিত এই দেবত্বের, জ্ঞান ও শক্তির বিকাশ যত ঘটিতে থাকিবে, যতই

আমরা নিজের এই স্বরূপ সম্বন্ধে সজাগ হইব, ততই আমরা মানুষ হিসাবে উন্নততর হইতে থাকিব—একজন ছাত্র আরও ভাল ছাত্র হইবে, একজন শিক্ষক আরও ভাল শিক্ষক হইবেন, একজন সমাজসেবী আরও ভাল সমাজসেবী হইবেন, একজন জেলে আরও ভাল জেলে হইবে। এইজন্যই দেশে সামাজিক ও রাজনৈতিক ভাব ছড়াইবার আগে সারা দেশকে উপনিষদের ভাবের বন্যায় ভাসাইয়া দিতে বলিয়াছেন। উপনিষদের, বেদান্তের ভাবের মত আর কোন ভাবই মানুষকে নিজ অন্তর্নিহিত দেবত্ব সম্বন্ধে সরাসরি সজাগ করিয়া দিতে পারে না—এত স্পষ্ট করিয়া, এত জোর দিয়া বলিতে পারে না—'যাহাকে ভগবান বলিতেছ, ব্রহ্ম বলিতেছ, আমিই তিনি! আমা হইতেই বিশ্বের সব কিছুর উদ্ভব, আমাতেই সব স্থিত, আমাতেই লয়প্রাপ্ত হয়। সমস্ত বেদ, সমস্ত শাস্ত্র আমারই কথা বলিতেছে।'

কেবল মানুষের অন্তরেই নয়, সমস্ত প্রাণীর, এমনকি জড় অচেতন সবকিছুর মধ্যেই যে ভগবান বা ব্রহ্ম বা এক চরম পরম আনন্দময় অমর সত্তা অন্তর্নিহিত—সে কথাও স্বামীজী বলিয়া গিয়াছেন।

একথা ভারতে নূতন নয়। এক আনন্দময় চেতন চির-অবিনাশী অভয় সত্তাই যে বিশ্বের সব কিছুর ভিতর অন্তর্নিহিত, সবকিছুতে ওতপ্রোত—এ সত্য ভারতে হাজার হাজার বছর পূর্ব হইতেই ঘোষিত হইয়া আসিতেছে। ভারতে ইহা বুদ্ধির সিদ্ধান্ত মাত্র নয়, শাস্ত্র-বা গুরুমুখে শোনা কথা মাত্র নয়, যুগ-যুগ ধরিয়া অবিরাম ধারায় জীবনে উপলব্ধ সত্য। মানুষকে ভগবদ্দৃষ্টিতে দেখিয়া তাহার সহিত আচরণকালে সেরূপ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করার কথাও ভারতে নূতন নয়। ভাগবতে আছে, 'আমি ঈশ্বর, সর্বভূতের হৃদয়গুহায় রহিয়াছি। সেখানে আমাকে অবহেলা করিয়া—মানুষকে ভগবানজ্ঞানে সম্মান না দিয়া—যে কেবল প্রতিমায় আমার পূজা করে, তাহার সে পূজা বৃথা—ভস্মে ঘৃতাহুতিরই তুল্য'; 'আমি সকলেরই অন্তরে রহিয়াছি জানিয়া মানুষকে বহু সম্মান দেখাইয়া প্রণাম করিবে'—ইত্যাদি। ভগবানই সবার অন্তরে রহিয়াছেন, আচরণের সময় মানুষকে ঈশ্বরজ্ঞান করিবে, তত্ত্ব এবং জীবনে তাহার প্রয়োগবিধি হিসাবে ইহা ভারতে অতি প্রচীন হইলেও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ইহা আচরিত হইয়া আসিতেছিল স্বল্পসংখ্যক কয়েকজনের মাত্র জীবনে। স্বামীজী ইহাকে সর্বসাধারণের দৈনন্দিন জীবনে টানিয়া আনিবার জন্যই, 'বনের বেদান্তকে ঘরে' আনিবার জন্যই মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বের ঘোষণা করিয়াছেন বার বার বহু ভাবে, এবং ঈশ্বরজ্ঞানে মানুষের সেবারূপ নবযুগের সাধনার রাজপথ নির্মাণ করিয়া গিয়াছেন।

৩

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আবির্ভাবকালে ধর্মকে জীবনে মূর্ত দেখিতে না পাওয়ার জন্য, স্বার্থসিদ্ধির কাজে ধর্মের ব্যাপক অপব্যবহারের জন্য, এবং বিজ্ঞানের নব নব সত্যাবিষ্কারের ফলে যুক্তির দিক হইতে সেগুলির সহিত শাস্ত্রবাক্যগুলিকে মিলাইতে না পারার জন্য মানুষের মনে ধর্মের কথায় শাস্ত্রের কথায় অবিশ্বাস মাথা তুলিয়াছিল (যাহার দু-চারটি আজিও ঈশ্বরের ও মানুষের দেহাতীত সত্তার নাস্তিত্বের সপক্ষে যুক্তি হিসাবে জড়বাদিগণ ব্যবহার করেন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আবির্ভাব জীবনে ধর্মকে, শাস্ত্রবাক্যগুলিকে মূর্ত করিয়া সর্বসমক্ষে তুলিয়া ধরিয়া এবং আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুক্তিরই আলোকপাতে অধ্যাত্মতত্ত্বগুলির সত্যতাকে বুদ্ধির নিকট ভাস্বর করিয়া দেখাইয়া সে সন্দেহ দূরীভূত করিয়া দিয়াছে।

আমাদের আলোচ্য সত্যটিকে—মানুষের, সর্ব প্রাণীর, বিশ্বের চেতন-অচেতন সব কিছুরই ভিতর যে দেবত্ব, অনন্ত জ্ঞান ও শক্তি—যাহাকে ভগবান বলি, ব্রহ্ম বলি, চরম সত্য বলি তাহাই অন্তর্নিহিত, এই সত্যটিকে স্বামীজী আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকেই আমাদের বুদ্ধির নিকট স্পষ্টতর করিয়া দিয়াছেন। যে মূল যুক্তিটি তিনি এখানে দেখাইয়াছেন, তাহা হইল, কোন বস্তুর মধ্যে কোন কিছু পূর্ব হইতে অন্তর্নিহিত না থাকিলে সেই বস্তুর মধ্য হইতে কোন পরিবেশেই তাহার বিকাশ সম্ভব নয়।

এই বিশ্বের যাবতীয় বস্তুর কথা আমরা জানি, আধুনিক বিজ্ঞানের মতে তাহার মূল কারণ বা উপাদান ইলেকট্রন, প্রোটনাদি কয়েকটি মাত্র বস্তুকণা, বা তাহারও উপাদান শক্তি। এই শক্তি নিজের মধ্যে বা কণাগুলিকে লইয়া এক একটি পরিবেশে সর্বদা একই প্রকার পরিবর্তন ঘটায়, যে ঘটনাকে 'প্রকৃতির নিয়ম' আখ্যা দেওয়া হয়। এই নিয়ম মানিয়াই শক্তি ইলেকট্রন-প্রোটনাদি বিভিন্ন কণারূপে, বিভিন্ন পরমাণু ও অণুরূপে রূপায়িত হয়, বিভিন্ন মৌলিক ও যৌগিক পদার্থরূপে—আমাদের দেখা ও জানা বিশ্বের সব কিছু রূপে রূপায়িত হয়, বস্তুর মধ্যে সর্ববিধ পরিবর্তন আনে। এই শক্তি কিন্তু অচেতন—ইহার মধ্যে ইচ্ছা বা চেতনা বলিয়া কিছু নাই। পরিবেশ সৃষ্ট হইলেই নিয়মমত তদনুরূপ পরিবর্তন উহা দ্বারা ঘটে, ইচ্ছা করিয়া পরিবেশসৃষ্টি সে করিতে পারে না।

অথচ আমরা এই বিশ্বে ইচ্ছা ও চৈতন্যের বিকাশও দেখিতেছি। প্রাণিদেহে চৈতন্যের, মন-বুদ্ধির, প্রাণ-শক্তির বিকাশ দেখিতেছি—যাহা এই বিশ্ব সম্বন্ধে ও যে নিয়মে অচেতন বস্তুনিচয়ের রূপান্তর ঘটে সে সম্বন্ধে কম বেশী সচেতন, এবং যাহা ইচ্ছা করিয়া নিজের প্রয়োজন মত পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া এই নিয়মকে কাজে লাগাইতে পারে। একটি পিপীলিকা এক স্থান হইতে খাদ্যকণা তুলিয়া আনিয়া একটি বিশেষ স্থানে জমা করিতে পারে; বাবুই পাখী বাসা তৈয়ারী করিতে পারে, মানুষ তো প্রাকৃতিক নিয়মকে কাজে লাগাইয়া ঘর বাড়ী যন্ত্রপাতি কত কি করিতেছে। কিন্তু অচেতন শক্তি ইচ্ছা করিয়া কিছুই করিতে পারে না।

এই যে অভিনব শক্তির—প্রাণশক্তি ইচ্ছাশক্তি প্রভৃতির এবং চেতনার বিকাশ অচেতন শক্তি ও তাহার রূপান্তর জড়বস্তুর মধ্য হইতে বিকশিত হয়, ইহা আসে কোথা হইতে? আজ পর্যন্ত বিজ্ঞান যতদূর দেখিয়াছে, শূন্য হইতে কিছুই সৃষ্ট হয় না, কোন কিছুকে শূন্যে রূপায়িতও করা যায় না। সৃষ্টি বা বিনাশের অর্থ হইল, বিজ্ঞানেরই ভাষায়, বস্তুর রূপান্তর। শক্তি ইলেকট্রন-প্রোটন-নিউট্রনাদিতে রূপায়িত হইতেছে, সেগুলি অণু-পরমাণুতে, সেগুলি বহু বিচিত্র বস্তুতে; ইহাই সৃষ্টি। আবার, বিনাশ বলিতে বস্তুকে অণু-পরমাণুতে রূপায়িত করা, সেগুলিকে ইলেকট্রনাদিতে, সেগুলিকে শক্তিতে রূপায়িত করা বুঝায়; যাহা বস্তুর উপাদান, যাহা দিয়া বস্তুটি গঠিত, তাহাতেই রূপায়িত করা বুঝায়। জলের মধ্য হইতে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন পরমাণুর বিকাশ ঘটানো সম্ভব, কারণ জলের অণুর মধ্যে সেগুলি পূর্ব হইতেই নিহিত রহিয়াছে। হাইড্রোজেন বা অক্সিজেন পরমাণুর ভিতর হইতে ইলেকট্রন, প্রোটনের বিকাশ ঘটানো সম্ভব, কারণ পূর্ব হইতেই উহার মধ্যে সেগুলি প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। পরমাণু জুড়িয়া বা ভাঙিয়া তাহার মধ্য হইতেও শক্তির বিকাশ ঘটানো সম্ভব, কারণ তাহার মধ্যে পূর্ব হইতেই শক্তি নিহিত রহিয়াছে। শক্তিই এই বিশ্বের রূপ লইয়াছে; সব কিছুরই মূল উপাদান শক্তি বলিয়া, সব কিছুতেই শক্তি ওত-

প্রোত বলিয়া, সব কিছুর মধ্যেই শক্তি পূর্ব হইতে নিহিত বলিয়া প্রয়োজনীয় পরিবেশ সৃষ্টি করিতে পারিলে সব কিছু হইতেই শক্তির বিকাশ-সাধন সম্ভব। শক্তি যদি সেগুলির ভিতর পূর্ব হইতে নিহিত না থাকিত, তাহা হইলে কোন পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াই সেগুলির ভিতর হইতে শক্তির বিকাশসাধন সম্ভব হইত না।

ইহা বৈজ্ঞানিক সত্য। স্বামীজী প্রশ্ন করিয়াছেন, যদি প্রাণ, মন, বুদ্ধি, চেতনা প্রভৃতিও বস্তুর মধ্যে, তাহার মূল উপাদান অচেতন শক্তির মধ্যে পূর্ব হইতে নিহিত না থাকিত, তাহা হইলে কোন পরিবেশেই অচেতন শক্তি দিয়া গঠিত বস্তু-পুঞ্জে—প্রাণিদেহে সেগুলির বিকাশ সম্ভব হইত কি করিয়া?

যুক্তির দিক দিয়া, বৈজ্ঞানিক চিন্তার দিক দিয়া ইহার কি উত্তর আছে জানি না।

৪

ইহা তো গেল যুক্তির কথা। আমরা জানি, ভারতে অধ্যাত্মসত্যগুলি প্রত্যক্ষ করিয়াই তবে আচার্যগণ প্রচার করিয়াছেন; যুক্তি দিয়াছেন শুধু বুদ্ধির সীমা পর্যন্ত তাহাকে তৃপ্ত করিবার জন্য, কেবল যুক্তির দ্বারা সিদ্ধান্তে পৌছিবার জন্য নয়। পূর্বগ সত্যদ্রষ্টাগণের মতো স্বামীজীও সকলের ভিতর, সব কিছুর ভিতর মন চেতনা প্রভৃতি প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে প্রত্যক্ষ করিয়াই সেকথা প্রচার করিয়াছেন। যুক্তি যাহা দিয়াছেন তাহা আমাদের বুদ্ধিকে তৃপ্ত করিবার জন্যই।

যদি ধরিয়া লই, যে পথে বিজ্ঞান বিশ্ব ও জীবনের মূল সত্যাবিষ্কারের দিকে চলিয়াছে সে পথেই শেষে চরম সত্য পর্যন্ত পৌছানো সম্ভব, তাহা হইলে সে-ই একদিন আবিষ্কার করিবে যে, এখন পর্যন্ত যাবতীয় জড়বস্তুর মূল উপাদানরূপে আবিষ্কৃত অচেতন শক্তিও চরম সত্য নয়, উহাও চরম সত্যের, চৈতন্যের রূপান্তর মাত্র, যেমন অণু-পরমাণু প্রভৃতি অচেতন শক্তির রূপান্তর। যদি কোনদিন বিজ্ঞান এই চরম সত্য পর্যন্ত পৌছিতে পারে, তবে সেদিন এই অচেতন শক্তি আর বিশ্বের মূল উপাদান বলিয়া বিজ্ঞানে স্বীকৃত হইবে না, যেমন একদা অবিভাজ্য ও বিশ্বের বস্তুচয়ের মূল উপাদান বলিয়া স্বীকৃত বিরানব্বইটি এলিমেন্ট আজ আর সেভাবে বৈজ্ঞানিক সত্য নয়। এলিমেন্টগুলির যেমন উচ্চতর সত্য আবিষ্কারের পরও আপেক্ষিক সত্যতা আছে, বিশ্বের মূল উপাদানরূপে মন বা তাহারও উপাদান চেতনা—ইহা বিজ্ঞানের চলার পথে কখনো আবিষ্কৃত হইলেও অচেতন শক্তির সম্বন্ধে যে-সত্যগুলি আজ জানা গিয়াছে, সেগুলি আপেক্ষিক সত্যরূপে থাকিয়াই যাইবে।

তবে, স্বামীজী বলিয়াছেন, চরম সত্য আবিষ্কারের পথ ভিন্ন কারণ যে মন, যে চৈতন্য দিয়া বিজ্ঞান জড়বস্তুর বিশ্লেষণ করিয়া তাহার অন্তর্নিহিত সত্য আবিষ্কারের পথে চলিয়াছে, এখানে বিশ্লেষণের বস্তু সেই মনই, চরম সত্য সেই চেতনাই। এই মন লইয়াই আমাদের সত্য-প্রত্যক্ষের পথে যতদূর চলা যায় চলিতে হইবে ঠিকই, তবে মনকে শুদ্ধ করিতে হইবে। মন দিয়া মনকে দেখিতে হইবে। বলিয়াছেন, শুদ্ধ একাগ্র মনের নিজেই নিজেকে দেখার শক্তি আসে। মনই এখানে সত্য পরীক্ষার যন্ত্র, তাই যন্ত্রটিকে নিখুঁত করা চাই; মনকে শুদ্ধ, একাগ্র করাই সব কিছুর ভিতর পূর্ব হইতেই দেবত্ব বা ভগবান বা শুদ্ধ চেতনা নিহিত রহিয়াছে তিনিই ইচ্ছারূপে, মনবুদ্ধিরূপে, অচেতন শক্তিরূপে, বিশ্বের যাবতীয় বস্তুরূপে বিকশিত হইয়াছেন এই সত্য প্রত্যক্ষ করার একমাত্র উপায়। আমরা জানি, বিজ্ঞানের পরীক্ষায় যন্ত্রটি নিখুঁত হওয়া সর্বাগ্রে প্রয়োজন, যন্ত্রটিতে খুঁত থাকিলে উহা দ্বারা পরীক্ষা করিয়া লব্ধ সত্য নির্ভুল হয় না।

৫

ভারত যখনই এই সত্য ভুলিয়া গিয়াছে—'সর্বভূতস্থমীশ্বরম্' বা 'সর্বভূতস্থমাত্মানম্' প্রত্যক্ষ করিবার চেষ্টা হইতে বিরত হইয়াছে, তখনই ভগবান মানুষ হইয়া আসিয়া নিজে সাধনা করিয়া আমাদের উহা প্রত্যক্ষ করিবার নতুন পথ দেখাইয়া গিয়াছেন, একই সত্যকে যুগোপযোগী নূতন রূপ দিয়া গিয়াছেন, যুগোপযোগী ভাষায় ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। এবারে শ্রীরামকৃষ্ণরূপে আসিয়াছেন সারা জগতের জন্য, সমগ্র মানবজাতির মধ্যে আধুনিক যুগে প্রবল শক্তি লইয়া প্রকাশিত 'সংশয়-মহারাক্ষসকে' নাশ করিবার জন্য। তাঁহারই বাণী বিবেকানন্দের কণ্ঠে সবদেশের আধুনিক মনের গ্রহণোপযোগী ভাষায় উদ্ঘোষিত। সে বাণীর মূল কথা—দেবত্ব, অনন্তজ্ঞান, অনন্তশক্তি ভগবান—আমাদের সকলেরই অন্তরে পূর্ব হইতেই নিহিত—আমরা সকলেই নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব। নিজের এবং অপরের এই স্বরূপ সম্বন্ধে সজাগ থাকিয়া যাহার যেভাবে ভাল লাগে—হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান প্রভৃতি যে মত অবলম্বনে, জ্ঞান ভক্তি কর্ম যোগ প্রভৃতি যে পথ যাহার উপযোগী সে পথে চলিয়া এই সত্য উপলব্ধির জন্য সচেষ্ট হও। আর মানুষকে ভগবান জ্ঞান করিয়া, তাহার জন্য নিজ পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যাহা কিছু করিবে, সব কিছুকেই ভগবানের আরাধনায় রূপায়িত কর।

আজ জড়দেহেই সীমিত-অস্তিত্ব-বোধ, স্বার্থ-বিক্ষুব্ধ অশান্তহৃদয় মানুষের জীবনে শান্তিলাভের ইহাই রাজপথ। আজ বিজ্ঞান ও শিল্পের উন্নতিলব্ধ বিপুল বিধ্বংসী শক্তির অধিকারী, অথচ সব দেশের সব মানুষকে ভালবাসিতে, এমনকি নিজের মত একজন মানুষ বলিয়াই গণ্য করিতে এখনো অসমর্থ মানবজাতির পক্ষে আত্মবিলুপ্তি হইতে বাঁচিবার ইহাই একমাত্র পথ—সব মানুষকে কেবল ভালবাসাই নয়, হৃদয়ের সর্বোচ্চ শ্রদ্ধা—যাহা মন্দিরে মসজিদে গির্জায় ভগবানের উদ্দেশে আমাদের হৃদয় হইতে স্ফূর্ত হয়, তাহাই মানুষকে দেওয়া। কেবল নিজ ধর্মের, নিজ দেশের বা নিজ মতের মানুষদের নয়, সব দেশের সব ধর্মের সব মতের সব মানুষকে ভগবানজ্ঞানে পূজা করা।

"...আমাদের ভিতরে পূর্ব হইতেই শক্তি বিদ্যমান, মুক্তি পূর্ব হইতেই আমাদের ভিতরে রহিয়াছে।...তোমাদিগকে ইহা বিশ্বাস করিতে হইবে; প্রত্যেকের ভিতর অনন্ত শক্তি যে গূঢ়ভাবে রহিয়াছে, তাহা বিশ্বাস করিতে হইবে—বিশ্বাস করিতে হইবে যে, বুদ্ধের ভিতর যে-শক্তি আছে, অতি নিম্নতম মানুষের মধ্যেও তাহা রহিয়াছে।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

স্বামী শিবানন্দের অপ্রকাশিত পত্র

[কিরণচন্দ্র সেনগুপ্তকে লিখিত]

১

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ
শরণম্

RAMAKRISHNA ADVAITA ASHRAM
LAKSA, BENARES CITY
1st Feb., 1915

প্রিয় কিরণচন্দ্র,

তোমার পত্র অনেক দিন পর পাইয়া বড়ই আনন্দ অনুভব করিলাম।

মনুষ্যের যখন কোন প্রকার জাগতিক সুখের কামনা না থাকে তার মৃত্যুর কামনা থাকিবারও কোন প্রয়োজন নাই।...আত্মজ্ঞান যাহাতে হয় তার চেষ্টা প্রত্যেক মনুষ্যেরই কর্তব্য, এই আমার বক্তব্য, আর কিছুই নয়।

প্রকৃত ধর্ম ব্যবসায়ের জিনিস নয়—সে বিষয়ে প্রভুর কৃপায় আমরা নিশ্চিত এবং যে তাঁর প্রকৃত শরণাপন্ন হইবে তিনি তাকে ঠিক যথার্থ পথ দেখাইয়া দিবেন, এই আমার বিশ্বাস।...

ধীরভাবে প্রভুর চিন্তা করিয়া সমস্ত কায করিবে; তাহাতে মানুষই হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আমার আন্তরিক ভালবাসা ও আশীর্বাদ জানিবে। আমি আলমোড়া হইতে আসা অবধি শরীর ভাল নাই। বোধ হয় গ্রীষ্মে আবার যেতে পারি। ইতি

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ
শরণম্

CHILKAPITA, ALMORA, U. P.
29. 4. 1915

প্রিয় কিরণচন্দ্র,

তোমার পত্র এই মাত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। তীর্থদর্শনে যাইবে অতি উত্তম, ইহাতে মনের মলিনতা অনেক দূর হয় এবং খুব সম্ভব তোমারও প্রভুকৃপায় তাহাই হইবে।...

খরচ আন্দাজ যদি 3rd classএ যাতায়াত কর তাহলে কলিকাতা হইতে ৺হরিদ্বার যাতায়াতের ৫৲ টাকা প্রায়—Intermediateএ টাকা ৩৯।৪০ প্রায়। প্রায় ৬০।৭০৲ টাকা সঙ্গে রাখা ভাল। সামান্য কিছু বিছানা, এখন গ্রীষ্মকাল—একখান ছোট সতরঞ্চি, একটা ছোট বালিশ,

একখান চাদর রাখিলেই হইবে। একটা জলখাবার ঘটী, একটা জলখাবার কুঁজো সঙ্গে রাখা ভাল। জল ভরে বেঞ্চের নীচে রেখে দিবে। ষ্টেসনের খাবারগুলো যত না খাও তত ভাল। কলিকাতা থেকে ওঠবার সময় কিছু ভাল সন্দেশ, কিছু ফল লইয়া উঠিও। আবার যখন যেখান থেকে উঠবে সেখান থেকে ঐরূপ লইয়া উঠিবে। এইরূপ করলে ষ্টেসনের খাবার খাওয়ার দরকার হবে না। সঙ্গে ২।১টি বাতি (**candle**), একটা **match box** রেখে দিও। **Benares Cantt. Station** থেকে **Laksa Ramakrishna Advaita Ashram** বা সেবাশ্রম বা হাসপাতাল এই বলিলেই এক্কাওয়ালারা বুঝিতে পারিবে— ভাড়া জোর চার আনা। শ্রীবৃন্দাবনের খবর ৺কাশী আশ্রম থেকে পাবে। তুমি আমার আন্তরিক ভালবাসা ও আশীর্ব্বাদ জানিবে। ইতি

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

পুনঃ—খুব সাবধানে রেলে যাবে। অধিক ভিড় দেখিলে **Inter**-এ যাওয়া ভাল। চেনা-জানা লোক জোটে তো খুব ভাল। যা হোক প্রভুকৃপায় তুমি ভালই থাকিবে।

"যে আকারই ধারণ করুক না কেন, শক্তিসমষ্টি চিরকালই সমান। একপ্রান্তে যদি শক্তির বিকাশ দেখিতে চাও, তবে অপর প্রান্তে শক্তি প্রয়োগ করিতে হইবে; হইতে পারে—উহা অন্য আকারে প্রকাশিত হইবে, কিন্তু পরিমাণ এক হওয়া চাই-ই চাই; অতএব যদি একপ্রান্তে বুদ্ধ হন, তবে অপর প্রান্তের জীবাণুও অবশ্য বুদ্ধতুল্য হইবে। বুদ্ধ যদি ক্রমবিকশিত জীবাণু হন, তবে ঐ জীবাণুও নিশ্চয়ই ক্রমসংকুচিত বুদ্ধ।...আমাদের পদতলসঞ্চারী ক্ষুদ্রতম কীট হইতে মহত্তম সাধু পর্যন্ত সকলেরই ভিতর অনন্ত শক্তি, অনন্ত পবিত্রতা ও সমুদয় গুণই অনন্ত পরিমাণে রহিয়াছে। প্রভেদ কেবল প্রকাশের তারতম্যে। কীটে সেই মহাশক্তির অতি অল্প পরিমাণ বিকাশ হইয়াছে, তোমাতে তাহা অপেক্ষা অধিক, আবার অতঃপর একজন দেবতুল্য মানবে তাহা অপেক্ষা অধিকতর শক্তির বিকাশ হইয়াছে—এইমাত্র প্রভেদ। কিন্তু সকলের মধ্যেই সেই এক শক্তি রহিয়াছে।"

"আমাদের প্রত্যেকের পশ্চাতে অনন্ত শক্তি, অনন্ত পবিত্রতা, অনন্ত সত্তা, অনন্ত বীর্য, অনন্ত আনন্দের ভাণ্ডার রহিয়াছে।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

কর্মফল

[পূর্বানুবৃত্তি]

স্বামী ধ্যানানন্দ

যোগবাশিষ্ঠ :

যোগবাশিষ্ঠের মূল বক্তব্য হ'ল এই যে, জগৎটা স্বপ্নবৎ—কর্ম ও কর্মফল স্বপ্নবৎ মিথ্যা, একমাত্র ব্রহ্মই সত্য, শুধু তিনিই আছেন, আর কিছু নেই। আমরা কল্পনা করি যে, আমরা শুভ-কর্ম করেছি, অতএব স্বর্গাদি লোকে যাব, তাই কল্পিত ঐ সব লোকে যাই। যদি এই মুহূর্তে ধারণা করতে পারি যে, আমি অকর্তা, আমার কোনও কর্ম নেই, কর্মফল নেই, তাহলে স্বর্গ বা নরক কোথাও যেতে হবে না, জন্ম-জরা-ব্যাধি-তাপগ্রস্ত এই পৃথিবীতেও আর সুখদুঃখাদি কর্মফল ভোগ করতে ফিরে আসতে হবে না, সদ্যোমুক্তি হবে।

এরই নাম জ্ঞানযোগ। এটি অবশ্য ধারণা করা খুবই কঠিন। তবে গ্রন্থটিতে বারংবার পুরুষকারের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে—পুরুষকারবলে উদিত বিচারই আত্মসাক্ষাৎকারের মুখ্য উপায়, ঈশ্বরকৃপা গৌণ উপায়; পুরুষকার ছাড়াই যদি জনার্দনের সাক্ষাৎকার হ'ত তা হ'লে তিনি পশুপক্ষীদেরও উদ্ধার করে দিতেন; গুরু যদি পৌরুষহীন অজ্ঞ শিষ্যকেও উদ্ধার করেন, তাহলে তিনি উষ্ট্র ও বলীবর্দকেও উদ্ধার করতে পারতেন; সুতরাং জনার্দন, গুরু বা ধন থেকে মহৎ পদ লাভ করা যায় না; পুরুষকারবলে মনকে বশীভূত করতে পারলেই মহৎ পদ লাভ করা যায়। বৈরাগ্য আশ্রয় ক'রে অভ্যাসবলে ইন্দ্রিয়সমূহকে বশীভূত করলে, এমন কোন বস্তু ত্রিভুবনে নেই যা পাওয়া যায় না। পুরুষকার ভিন্ন আত্মদর্শন ঘটে না। বিশ্বামিত্র প্রভৃতির দৃষ্টান্ত যাঁরা জানেন, তাঁরা কি 'দৈবই আমাকে এই ধরনের কাজ করাচ্ছে'—এই কথা বলে সন্তুষ্ট থাকতে পারেন? হরিশচন্দ্র প্রভৃতি পুরুষেরা দুঃখ, শোক ও দারিদ্র্যে নিপীড়িত হয়েও পুরুষকারসহায়েই শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে-ছিলেন। অলস লোকেরাই সব কিছুই দৈবায়ত্ত মনে করে। যে মন সর্বক্ষণ পবিত্র বিষয়ের স্মরণ-মনন করে, অভিশাপ ও অভিচার প্রভৃতি ক্রিয়া-সকল পাষাণে নিক্ষিপ্ত বাণের মতই তা'তে নিষ্ফল হয়। দীর্ঘতপা ঋষি যজ্ঞীয় সামগ্রী সংগ্রহ করতে গিয়ে বনমধ্যস্থ কূপে পতিত হয়েও সেই কূপেই মানস যজ্ঞ ক'রে দেবলোক প্রাপ্ত হয়েছিলেন। পদাঘাত করে যেমন পাষাণ বিদীর্ণ করা যায় না, অভিশাপাদি দ্বারাও তেমনি চিত্তকে নিগৃহীত করা যায় না। তবে অভিশাপাদির দ্বারা যাদের চিত্ত নিগৃহীত হতে দেখা যায়, বুঝতে হবে যে, তাদের চিত্ত বিবেক- ও পৌরুষহীন। সুতরাং পৌরুষ অবলম্বন করে সকলেরই পবিত্র পথে বিচরণ করা উচিত। এই ধরনের বহু কথা গ্রন্থটিতে পুনঃ পুনঃ উক্ত হয়েছে। বস্তুতঃ প্রারব্ধ কর্ম থেকে আমাদের দৃষ্টিকে ফিরিয়ে নিয়ে ক্রিয়মাণ কর্ম ও তার ফলের প্রতি আকৃষ্ট করা গ্রন্থটির একটি অতি উপাদেয় বৈশিষ্ট্য। যদিও মোক্ষের উদ্দেশ্যেই এই ক্রিয়মাণ কর্মের কথা বলা হয়েছে, কারণ এটি মোক্ষশাস্ত্র, তবু যাঁরা ধর্ম অর্থ কাম এই ত্রিবর্গের অভিলাষী তাঁরাও পৌরুষসম্বন্ধীয় এই সব কথায় নিঃসন্দেহে প্রেরণা লাভ ক'রে উপকৃত হবেন।

নির্দেশিকা: ৩।২০।৩১, ৩।৯৫।২০, ৪।৪৩।১৬, ৫।২২।৩৭, ৫।২২।৪০, ৫।৭১।৬৫

অপরোক্ষানুভূতি :

'অপরোক্ষানুভূতি' আচার্য শংকরের রচিত একটি ক্ষুদ্র প্রকরণগ্রন্থ। এতে ১৪৪টি শ্লোক আছে। যোগশিখোপনিষদের ২৪টি, নাদবিন্দু উপনিষদের ৯টি এবং তেজবিন্দু উপনিষদের ৩৭টি —মোট ৭০টি শ্লোক ঐ ১৪৪টি শ্লোকের অন্তর্ভুক্ত দেখতে পাওয়া যায়। যাই হোক, ৯০-৯৯ এই দশটি শ্লোকে (তার মধ্যে ৮টি শ্লোকই নাদবিন্দু উপনিষদের) শংকর জ্ঞানীর প্রারব্ধের খণ্ডন করেছেন। আমরা ছান্দোগ্য ও মুণ্ডক উপনিষৎ এবং ব্রহ্মসূত্রে কর্মফলের আলোচনা-প্রসঙ্গে জ্ঞানীর প্রারব্ধের কথা বলেছি। শংকর এখন বলছেন, ও-সব কথা শ্রুতি অজ্ঞ লোকদের বোঝাবার জন্যই বলেছেন—'অজ্ঞানিজনবোধার্থং প্রারব্ধং বক্তি বৈ শ্রুতিঃ'। তাঁর মতে তত্ত্বজ্ঞানের পরে প্রারব্ধ থাকতে পারে না, কারণ তখন দেহাদিকে অসত্য বলে ধারণা হয়। প্রারব্ধ তো জন্মান্তরে কৃত কর্মের ফল। জন্মান্তরই নেই, তা আবার প্রারব্ধ! মাথা নেই, তার মাথাব্যথা! ভ্রান্তিতে দড়িটাকে সাপ মনে হচ্ছিল, যেই ভ্রান্তি চলে গেল, অমনি যা ছিল সেই দড়িটাই রইল। সেই রকম ভ্রান্তিতেই জগৎটাকে দেখা যাচ্ছিল, যেই ভ্রান্তি চলে গেল, অমনি ব্রহ্মই একমাত্র রইলেন ; প্রপঞ্চ শূন্যতায় পর্যবসিত হ'ল। দেহটা তো প্রপঞ্চেরই অন্তর্গত, সুতরাং দেহের ভোগ, প্রারব্ধ থাকে কোথায় ?—

'দেহস্যাপি প্রপঞ্চত্বাৎ প্রারব্ধাবস্থিতিঃ কুতঃ'।

(১) প্রারব্ধ-ভোগ তিন রকমের—স্বেচ্ছাকৃত, অনিচ্ছাকৃত ও পরেচ্ছাকৃত। স্বেচ্ছাকৃত, যেমন অপথ্যসেবন। অনিচ্ছাকৃত, যার উল্লেখ অর্জুন করেছেন—'অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপং চরতি পূরুষঃ, অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ' (গীতা, ৩।৩৬)—হে কৃষ্ণ! কিসের দ্বারা প্রেরিত হয়ে, যেন বলপূর্বক নিয়োজিত হয়ে, মানুষ অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিষিদ্ধ ভোগ করে? শ্রীকৃষ্ণের উত্তর: রজোগুণজাত কাম, যার রূপান্তর হ'ল ক্রোধ, সেই দুষ্পূরণীয় মহাশত্রুকেই এর কারণ জানবে। কৃষ্ণার্জুনের এই প্রশ্নোত্তরই অনিচ্ছাকৃত প্রারব্ধের প্রমাণ। পরেচ্ছাকৃত, অর্থাৎ ইচ্ছাও নেই, অনিচ্ছাও নেই, শুধু অপরের তৃপ্তির জন্য যে ভোগ ভুগতে হয়। কথায় বলে 'উপরোধে ঢেঁকি গেলে'! আমাদের নিজ নিজ জীবনের ভোগগুলি বিশ্লেষণ করলে, কোন্‌টি স্বেচ্ছাকৃত, কোন্‌টি অনিচ্ছাকৃত, কোন্‌টি বা পরেচ্ছাকৃত, তা' আমরা অনায়াসে বুঝতে পারি। (৭।১৫২, ১৫৮-১৬২)।

(২) প্রারব্ধ-ভোগের কোনও প্রতিকার নেই। তা যদি থাকতো তাহলে রাজা নল যুধিষ্ঠির ও শ্রীরামচন্দ্রকে দুঃখভোগ করতে হ'ত না। ঈশ্বরও প্রারব্ধ-ভোগকে খণ্ডন করতে পারেন না। অবশ্য সেজন্য তাঁর ঈশ্বরত্ব লোপ পায় না, কারণ প্রারব্ধ-ভোগের অবশ্যম্ভাবিত্ব ঈশ্বরেরই বিধান।

(৭।১৫৬-৫৭)

(৩) স্বপ্নে মানুষ দেখে যে, সে আকাশে উড়ছে, অথবা তার শিরশ্ছেদ করা হচ্ছে, মুহূর্তের মধ্যে কয়েকটি বছর কেটে যাচ্ছে, অথবা মৃত পুত্রাদির দর্শন হচ্ছে। নানা রকমের অসম্ভব ঘটনা স্বপ্নে ঘটলেও স্বপ্নচারী জীবের কোনটাই অযৌক্তিক বলে মনে হয় না, মনে হয় সবই ঠিক, সবই সত্য। জীবে অবস্থিত নিদ্রাশক্তির যেমন এই অদ্ভুত স্বপ্ন-সৃষ্টি, ব্রহ্মে আশ্রিত মায়াশক্তির ঠিক তেমনি এই জগৎসৃষ্টি। প্রকৃতপক্ষে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড স্বপ্ন-সৃষ্টিরই মতো—এতে অসম্ভবকে সম্ভব মনে হচ্ছে, অসঙ্গতকে সঙ্গত মনে হচ্ছে, অবাস্তবকে বাস্তব মনে হচ্ছে। কার্য-কারণ বলে কিছু নেই—তবু কার্য-কারণ ধ্রুব সত্য বলে মনে হচ্ছে ; কর্ম ও কর্মফলের যেন অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক

রয়েছে বলে মনে হচ্ছে, ঠিক যেমন স্বপ্নে হয়ে থাকে। (১৩।৮৫-৯১)

নির্দেশিকা: ১।২৯ ৩১, ৬।৫৩-৫৪, ৬।১৮৩-৮৪, ৬।২৬৩-৬৪, ৬।২৮৭-৮৮, ৭।১৩১-৩৩, ৭।১৪৩-৪৪, ৭।১৭৪-১৭৯, ৭।২২০, ৭।২৪৩-৫০, ৭।২৫৮-৫৯, ৭।২৬৩, ২৬৭, ২৬৯, ১৪।১৩-১৭, ১৪।৫৪

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত:

(১) মুসলমানের করোয়ার জল খেতে বাধ্য হওয়ায়, জাতিচ্যুত হয়ে এককালীন গৌড়ের রাজা সুবুদ্ধি রায় বিষয়সম্পত্তি ত্যাগ করে কাশী যান প্রায়শ্চিত্ত করতে। কাশীর পণ্ডিতদের কেউ কেউ বললেন—'তপ্তঘৃত খেয়ে প্রাণত্যাগ করো'। অন্য পণ্ডিতরা বললেন—'তুমি যখন স্বেচ্ছায় মুসলমানের জল খাওনি, তখন অত গুরু প্রায়শ্চিত্তের দরকার নেই'। পণ্ডিতদের এই মতভেদে সুবুদ্ধি রায়ের মন যখন সংশয়াকুল, তখন ভাগ্যক্রমে শ্রীচৈতন্যদেব কাশীতে এসে উপস্থিত। তিনি সব কথা শুনে বললেন—'তুমি সত্বর এ স্থান পরিত্যাগ করে বৃন্দাবনে গিয়ে সর্বদা কৃষ্ণনাম সংকীর্তন করো; যদি কিছু পাপ হয়ে থাকে তো কৃষ্ণনামে তা দূর হবেই, অধিকন্তু তোমার লাভ হবে সুদুর্লভ কৃষ্ণচরণারবিন্দ'।

(২।২৫।১৪০-১৫২)

(২) পুরীতে ভগবান আচার্য শ্রীচৈতন্যদেবকে নিমন্ত্রণ করেন এবং সেজন্য ছোট হরিদাস, যিনি শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্ত ও কীর্তনীয়া ছিলেন, তাঁকে দিয়ে পরম বৈষ্ণবী, বৃদ্ধা তপস্বিনী শিখি মাইতির কাছ থেকে কিছু ভাল চাল আনিয়ে রান্না করে মহাপ্রভুকে ভোজন করান। ঐ চাল কোথা থেকে কে এনেছে, খোঁজ করে জেনে মহাপ্রভু বৈরাগীর ধর্ম আক্ষরিকভাবে পরিপালিত হয়নি বলে হরিদাসকে ত্যাগ করেন। এক বছর মহাপ্রভুর সঙ্গ থেকে বঞ্চিত থাকার পর, হরিদাস মনের দুঃখে প্রয়াগে গিয়ে ত্রিবেণীসঙ্গমে দেহত্যাগ করেন। দেহান্তে তিনি দিব্যদেহে পুরীতে মহাপ্রভুর কাছে আসেন এবং সকলের অলক্ষ্যে রাত্রে তাঁকে গান শোনাতে থাকেন। একদিন মহাপ্রভু ভক্তদের বললেন, 'হরিদাস কোথায়? তাকে এখানে ডেকে আনো'। ভক্তরা বললেন—এক বছর পূর্ণ হলে তিনি কোথায় চলে গেছেন, তা তাঁরা জানেন না। মহাপ্রভু হাসলেন। একদিন জগদানন্দ, স্বরূপদামোদর প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ সমুদ্রস্নানে গিয়ে হরিদাসের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন—মধুর গীতধ্বনিতে। অনেকেই অনুমান করলেন যে, তিনি বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করে ব্রহ্মরাক্ষস হয়েছেন। কিন্তু স্বরূপ বললেন—'না, প্রভুর কৃপাপাত্রের এরকম দুর্গতি হতে পারে না'। ইতোমধ্যে প্রয়াগ থেকে এক বৈষ্ণব নবদ্বীপে এসে হরিদাসের সব বৃত্তান্ত জানালেন। পরে নবদ্বীপ থেকে শিবানন্দ, শ্রীবাসাদি ভক্তগণকে নিয়ে পুরী যান। শ্রীবাস যখন মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করেন, হরিদাস কোথায়? তখন মহাপ্রভু উত্তর দেন—'স্বকর্মফলভুক্ পুমান্'।

(৩।২।১০০-১৬৩)

ডক্টর রাধাগোবিন্দ নাথের মতে মহাপ্রভুর ঐ উক্তির দু'টি অভিপ্রায়:

(১) যথাশ্রুত অর্থ—যে-বৈরাগী প্রকৃতি-সম্ভাষণ করে, তার পক্ষে মরে ভূত হওয়াই স্বাভাবিক; (২) গূঢ়ার্থ—হরিদাস সকল সময়েই মহাপ্রভুর প্রিয়, কৃষ্ণকীর্তন শুনিয়ে মহাপ্রভুর প্রীতিবিধান করাই তাঁর নিত্য কর্ম ছিল; দেহান্তেও ঐ কর্মানুযায়ী ফল তিনি পেয়েছেন, দিব্যদেহে কীর্তন শুনিয়ে প্রভুর আনন্দবর্ধন করছেন।

(৩) একদিন মহাপ্রভু পুরীতে জগন্নাথ-দর্শন করতে গিয়ে, জগন্নাথদেবকে মুরলীবদন শ্রীকৃষ্ণরূপেই দর্শন করছিলেন। সেই সময়ে জগন্নাথদেবের ভোগ ও ভোগারতি হয়ে গেলে

জগন্নাথদেবের সেবকগণ প্রসাদ এনে দিলে, তিনি অল্পমাত্র গ্রহণ করে 'কোটি-অমৃতের' স্বাদ অনুভব করেন, তাঁর সর্বাঙ্গে অশ্রু-পুলকাদি সাত্ত্বিক-ভাবসমূহের উদয় হয় এবং প্রেমাবেশে তিনি বারবার 'সুকৃতি-লভ্য ফেলালব' এই কথা বলতে থাকেন। জগন্নাথদেবের সেবকেরা ঐ কথার অর্থ জিজ্ঞাসা করলে, তিনি বলেন—

"কৃষ্ণের যে ভুক্ত-শেষ তার 'ফেলা' নাম।
তার এক লব পায় সে-ই ভাগ্যবান ॥
সামান্য ভাগ্য হৈতে তার প্রাপ্তি নাহি হয়।
কৃষ্ণের যাতে পূর্ণ কৃপা সে-ই তাহা পায় ॥
'সুকৃতি'-শব্দে কহে—কৃষ্ণকৃপাহেতু পুণ্য।
সেই যার হয়, ফেলা পায় সেই ধন্য ॥"

'ফেলা'-শব্দের অর্থ প্রসাদ; 'লব'-শব্দের অর্থ কণিকা। 'সুকৃতি'র অর্থ এখানে সাধারণ শুভ কর্ম নয়—অসাধারণ শুভ কর্ম, যা ভগবানের বিশেষ অনুগ্রহেই সম্পন্ন হয়। তাৎপর্য এই যে, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ ভগবৎকৃপায় সম্পাদিত অসাধারণ শুভ কর্মের ফলেই লভ্য।

নির্দেশিকা: ১।১।৫২, ২।১৫।২৪২-২৭০, ৩।৩।৯৩-১৫৬, ৩।৩।১৭০-১৭৫, ৩।৪।৫৬-৭৮, ৩।৬।২৭৩-৭৪, ৩।২০।৭-১১

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্য :

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-উপদেশ :

(১) 'পাপ আর পারা কেউ হজম করতে পারে না। যদি কেউ লুকিয়ে পারা খায়, তা' হলে কোন দিন না কোন দিন গায়ে ফুটে বেরোবে। পাপ করলেও তেমনি তার ফল একদিন না একদিন নিশ্চয় ভোগ করতে হবে।'

(২২শ সং, পৃঃ ১৩৭-৩৮)

(২) 'গুটিপোকা যেমন আপনারই নালে ঘর ক'রে আপনি বদ্ধ হয়, তেমনি সংসারী জীব আপনার কর্মে আপনি বদ্ধ হয়। যখন প্রজাপতি হয় তখন কিন্তু ঘর কেটে বেরোয়, তেমনি বিবেক-বৈরাগ্য হলে বদ্ধজীব মুক্ত হয়ে যায়।'

(ঐ, পৃঃ ১৩৮)

(৩) "একদিন ঈশ্বরীয় কথাপ্রসঙ্গে মথুরবাবু ঠাকুরকে বলছিলেন, 'ভগবানকেও জগতের নিয়ম মেনে চলতে হয়; তিনি ইচ্ছা করলেই সব করতে পারেন না।' ঠাকুর বললেন, 'তা কেন হবে গো? তিনি ইচ্ছাময়, তিনি ইচ্ছা করলেই সব করতে পারেন।' মথুরবাবু বললেন, 'তিনি ইচ্ছা করলে এই লাল জবাফুলের গাছে কি সাদা জবা করতে পারেন?' ঠাকুর বললেন, 'তা পারেন বই কি! তাঁর ইচ্ছে হ'লে এই লাল জবার গাছেই সাদা ফুল ফুটতে পারে।' কিন্তু মথুরবাবু সে কথায় ততটা যেন বিশ্বাস স্থাপন করতে পারেননি। বাস্তবিকই কয়েক দিন পরে দেখা গেল, দক্ষিণেশ্বরের বাগানে একটা জবাফুলের গাছে এক ডালে সাদা ও অপর ডালে লাল জবা ফুটে আছে। ঠাকুর ডালের গোড়াসুদ্ধ ফুল দুটো এনে মথুরবাবুকে দেখালেন। মথুরবাবু মহা আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললেন, 'বাবা, আর তোমার সঙ্গে তর্ক করব না'।" (ঐ পৃঃ ৭-৯)

প্রথম ও দ্বিতীয় উপদেশে বলা হয়েছে—কর্মের ফল আছেই। এইটিই সাধারণ নিয়ম। তৃতীয় উপদেশের তাৎপর্য হচ্ছে, ভগবান কর্মের ফল খণ্ডন করে দিতে পারেন—কারণ তিনি ইচ্ছাময়, কোনও নিয়মের অধীন নন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত :

(১) 'তান্ত্রিক ভক্ত—তবে কর্মফল আছে?

শ্রীরামকৃষ্ণ—তাও আছে। ভাল কর্ম করলে সুফল, মন্দ কর্ম করলে কুফল; লঙ্কা খেলে ঝাল লাগবে না?' (৫।৭।১)

(২) 'ঈশ্বরের নামে মানুষ পবিত্র হ'ন। তাই নাম-কীর্তন অভ্যাস করতে হয়।'

(৫।১১।২)

(৩) 'আত্মহত্যা করা মহাপাপ, ফিরে ফিরে

সংসারে আসতে হবে, আর এই সংসার-যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে।' (১।৪।১)

(৪) 'পূর্বজন্মের সংস্কার মানতে হয়।' (১।৪।১)

(৫) 'কি জান, যার যা কর্মের ভোগ আছে, তা তার করতে হয়। সংস্কার, প্রারব্ধ, এ সব মানতে হয়।' (১।৭।২)

(৬) 'কি জান, প্রারব্ধ কর্মের ভোগ। যে ক'দিন ভোগ আছে, দেহধারণ করতে হয়। একজন কানা গঙ্গাস্নান করলে। সব পাপ ঘুচে গেল। কিন্তু কানা চোখ আর ঘুচলো না। পূর্বজন্মের কর্ম ছিল তাই ভোগ।' (১।৭।২)

(৭) 'শ্রীনাথ ডাক্তার—কর্মফল কেউ এড়াতে পারে না। প্রারব্ধ।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কেন, তাঁর নাম করলে, তাঁকে চিন্তা করলে, তাঁর শরণাগত হলে—

শ্রীনাথ—আজ্ঞে, প্রারব্ধ যাবে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ—খানিকটা কর্মভোগ হয়। তাঁর নামের গুণে অনেক কর্মপাশ কেটে যায়।' (৩।২৬।২)

(৮) 'নন্দ বসু তাঁর কৃপা কই হয় ? তাঁর কি কৃপা করবার শক্তি আছে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ—বুঝেছি, তোমার পণ্ডিতদের মত, যে যেমন কর্ম করবে সেরূপ ফল পাবে ; ওগুলো ছেড়ে দাও ! ঈশ্বরের শরণাগত হলে কর্মক্ষয় হয়।

নন্দ বসু—আইন তিনি ছাড়াতে পারেন ?

শ্রীরামকৃষ্ণ—সে কি ! তিনি ঈশ্বর, তিনি সব পারেন ; যিনি আইন করেছেন, তিনি আইন বদলাতে পারেন।' (৩।১৮।২)

(৯) 'তান্ত্রিক ভক্ত—আমাদের উপায় কি ? কর্মের ফল তো আছে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ—থাকলেই বা। তাঁর ভক্তের আলাদা কথা···যখন হরিনামে, কালীনামে, রাম-নামে চক্ষে জল আসে তখনই সন্ধ্যা কবচাদির কিছুই প্রয়োজন নাই। কর্মত্যাগ হয়ে যায়। কর্মের ফল তার কাছে যায় না।' (৫।৭।১)

(১০) 'ঈশ্বরের শরণাগত হলে কর্মক্ষয় হয়।' (৩।১৮।২)

(১১) 'ঈশ্বরের নাম করলে সব পাপ কেটে যায়।' (২।৩।৩)

(১২) 'প্রথমে একবার পাপ পাপ করতে হয়, কিসে পাপ থেকে মুক্তি হয়, কিন্তু তাঁর কৃপায় একবার ভালবাসা যদি আসে, একবার রাগভক্তি যদি আসে, তাহলে পাপপুণ্য সব ভুল হয়ে যায়। তখন আইনের সঙ্গে, শাস্ত্রের সঙ্গে তফাৎ হয়ে যায়। অনুতাপ করতে হবে, প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে, এ সব ভাবনা আর থাকে না।' (৫।১৪।১)

(১৩) 'আইনে (শাস্ত্রে) আছে, পূর্বজন্মে যারা দান টান করে তাদেরই ধন হয়। তবে কি জান ? এ সংসার তাঁর মায়া, মায়ার কার্যের ভিতর অনেক গোলমাল, কিছু বুঝা যায় না।··· তাঁর মায়ার কার্যে অনেক গোলমাল ; এটির পর ওটি, এটি থেকে ওটি হবে, ও-সব বলবার যো নাই।' (৩।৮।২)

(১৪) 'ঈশ্বরের কার্য কি বুঝা যায়, তিনি কি উদ্দেশ্যে কি করেন ? তিনি সৃষ্টি, পালন, সংহার, সবই করছেন। তিনি কেন সংহার করছেন, আমরা কি বুঝতে পারি ?' (৫।৩।২)। চেঙ্গিস খাঁ প্রায় এক লক্ষ লোককে বন্দী ক'রে তাদের কচুকাটা করলেন। ঈশ্বর এই হত্যাকাণ্ড দেখলেন—একটু নিবারণ তো করলেন না !—বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই অভিযোগ শ্রীম শ্রীরাম-কৃষ্ণদেবকে জানালে, তিনি এই উক্তি করেছিলেন। লক্ষণীয়—এক লক্ষ লোক তাদের কর্মফলেই নিহত হয়েছে—এ-কথা শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেননি।

(১৫) 'প্রতিবেশী—তবে পাপপুণ্য নাই ?··

শ্রীরামকৃষ্ণ—আছে, আবার নাই। তিনি যদি অহংতত্ত্ব রেখে দেন, তা হ'লে ভেদবুদ্ধিও

রেখে দেন, পাপপুণ্য-জ্ঞানও রেখে দেন। তিনি দু' একজনেতে অহংকার একেবারে পুঁছে ফেলেন —তারা পাপপুণ্য, ভালমন্দের পার হয়ে যায়।'

(১।৯।২)

(১৬) 'আত্মজ্ঞান হলে সুখদুঃখ, জন্মমৃত্যু সব স্বপ্নবৎ বোধ হয়।' (৫।৭।৩)

(১৭) 'চাষা জ্ঞানী, তাই দেখছিল স্বপ্ন-অবস্থাও যেমন মিথ্যা, জাগরণ-অবস্থাও তেমনি মিথ্যা; এক নিত্য বস্তু সেই আত্মা।' (১।১৩।৬) জ্ঞানী চাষার গল্প চাষার একমাত্র ছেলে হারু কলেরায় মারা যায়। কিন্তু চাষা কাঁদলেন না। তাঁর স্ত্রী অভিযোগ করলেন যে, তিনি নিষ্ঠুর। চাষার উত্তর: 'আমি কাল একটা ভারী স্বপ্ন দেখেছি, দেখলাম যে রাজা হয়েছি আর আট ছেলের বাপ হয়েছি—খুব সুখে আছি। তারপর ঘুম ভেঙ্গে গেল। এখন মহাভাবনায় পড়েছি—আমার সেই আট ছেলের জন্য শোক করবো, না তোমার এই এক ছেলে হারুর জন্য শোক করবো।' (১।১৩।৬)

(১৮) 'তাঁর কাণ্ড মানুষে কি বুঝবে? অনন্ত কাণ্ড! তাই আমি ও সব বুঝতে আদপে চেষ্টা করি না। শুনে রেখেছি তাঁর সৃষ্টিতে সবই হতে পারে।' (৩।৪।১)

(১৯) 'তিনি মনে করলে জ্ঞানীকে সংসারেও রাখতে পারেন। তাঁর ইচ্ছাতে জীব জগৎ হয়েছে। তিনি ইচ্ছাময়।' (৪।৭।২)

(২০) 'তাঁর গুণ কোটি বৎসর বিচার করলেও কিছু জানতে পারবে না।' (১।১১।১)

(২১) 'ঈশ্বরের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়।'

(২।১।২)

(২২) "তাঁর 'হাঁ'তে জগতের সব হচ্ছে; তাঁর 'না'তে হওয়া বন্ধ হচ্ছে।" (৩।১৭।১)

(২৩) 'ঈশ্বরের সম্বন্ধে কিছু হিসাব করবার জো নাই।' (৫।৯।২)

(২৪) 'ঈশ্বরের কৃপা হলে অসম্ভব সম্ভব হয়।'

(৫।৮।২)

বিষয়বস্তুর দিকে যথাসম্ভব লক্ষ্য রেখেই এই উদ্ধৃতিগুলি ক্রমিক-সংখ্যাবদ্ধ করা হয়েছে। বিষয়বস্তুগুলি মোটামুটি এই: (১)—(৬): কর্মফল আছেই; (৭)-(১০): ঈশ্বরের কৃপায় প্রারব্ধের ভোগ অনেক কমে যায়; (১১) (১২): ঈশ্বরের নাম করাই সর্বশ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত; (১৩)—(১৫): কর্মবাদ দিয়ে সব কিছু ব্যাখ্যা করা চলে না; (১৬)—(১৭): সুখ-দুঃখ, জন্ম-মৃত্যু এ-সব কর্মফল স্বপ্নবৎ মিথ্যা। ১৮—(২৪): ব্রহ্মসূত্রে আধিকারিক পুরুষদের প্রসঙ্গে আমরা যে মন্তব্য ও আলোচনা করেছি তার পরিপ্রেক্ষিতে এই উদ্ধৃতিগুলি চিন্তনীয়।

শ্রীশ্রীমায়ের কথা:

(১) 'ভারী সাবধানে চলতে হয়। প্রত্যেক কর্মেই ফল ফলে। কাউকে কষ্ট দেওয়া, কটু বলা ভাল নয়।' (২য় খণ্ড, ৪র্থ সং, পৃ: ৪৭)

(২) "একদিন নরেন এসে বললে, 'মা, এই ১০৮ বিল্বপত্র ঠাকুরকে আহুতি দিয়ে এলুম, যাতে মঠের জমি হয়। তা কর্ম কখনও বিফলে যাবে না। ও হবেই একদিন।'" (ঐ পৃ: ৪৯)

(৩) 'আমি—আচ্ছা, মা, কেউ চাচ্ছে কিন্তু পাচ্ছে না; আবার কেউ চাচ্ছে না, তাকে দিচ্ছেন—এ কথার মানে কি?

মা ঈশ্বর বালকস্বভাব কিনা। কেউ চাচ্ছে, তাকে দিচ্ছেন না; আবার কেউ চায় না, তাকে সেধে দিচ্ছেন। হয়ত তার পূর্বজন্মে অনেক এগুনো ছিল। তাই তার উপর কৃপা হয়ে গেল।

আমি—তাহলে কৃপাতেও বিচার আছে?

মা—তা আছে বই কি! যার যেমন কর্ম করা থাকে। কর্ম শেষ হলেই ভগবান-দর্শন হয়। সেটি শেষ জন্ম।' (ঐ পৃ: ৮১-৮২)

(৪) "তখনকার কত সব কেমন ভক্ত ছিল।

এখন যারা আছে, কেবল বলছে, 'ঠাকুর দেখিয়ে দাও।' সাধন নেই, ভজন নেই, জপ-তপ নেই, কত জন্মে কত কি করেছে—কত গোহত্যা, ব্রহ্মহত্যা, ভ্রূণহত্যা করেছে। সে-সব ক্রমে ক্রমে কাটবে তবে ত? আকাশে চাঁদটি মেঘে ঢেকেছে। ক্রমে ক্রমে হাওয়ায় মেঘটি সরে যাবে, তবে ত চাঁদটি দেখতে পাবে। ফস করে কি যায়? এও ত তেমনি। ধীরে ধীরে কর্মক্ষয় হয়। ভগবান লাভ হলে ভেতরে ভেতরে তিনি জ্ঞান-চৈতন্য দেন নিজে জানতে পারে।"

(ঐ পৃঃ ৮৬)

(৫) 'অনেক সাধন তপস্যা করলে, পূর্বজন্মের অনেক তপস্যা থাকলে তবে এ জন্মে মনটি শুদ্ধ হয়।' (ঐ পৃঃ ১২২)

(৬) 'কর্মফল ভুগতে হবেই। তবে ঈশ্বরের নাম করলে যেখানে ফাল সেঁধুত, সেখানে ছুঁচ ফুটবে। জপতপ করলে কর্ম অনেকটা খণ্ডন হয়।' (ঐ পৃঃ ১১৫)

(৭) "পাপগ্রহণ করে তাঁর শরীরে ব্যাধি। বলতেন, 'গিরিশের পাপ। ও কষ্ট ভোগ করতে পারবে না'।" (ঐ পৃঃ ৬৫)

(৮) ভ্রাতুষ্পুত্রী রাধারাণীর রোগ সম্বন্ধে মা বলছেন—'এমন রোগও আর দেখিনি। জন্মান্তরীণ রোগ নিয়ে মরেছিল, প্রায়শ্চিত্ত করেনি।'

(ঐ পৃঃ ১৬৮)

(৯) 'মানুষ যে রোগ নিয়ে মরে, যদি প্রায়শ্চিত্ত না করে মরে, তবে পরজন্মে সেই রোগ হয়। সাধুদের পক্ষে এ-সব কিছু নয়।'

(ঐ পৃঃ ১৬৯)

(১০) 'পাগলী মামী -এই আমার মাসী রোগ নিয়ে মরেছে। তা হলে তারও কি সে রোগ হয়েছে?

মা—তোর মাসী মরে জন্ম নেয়নি? সে মরে জন্মও নিয়েছে, সেই রোগও তার সঙ্গে এসেছে।' (ঐ পৃঃ ১৭০)

(১১) 'অনেক সময় কর্মের ফলে বংশের লোক সেই বংশেই পুনঃ পুনঃ জন্মায়, আর মরে। গয়ায় পিণ্ড দিলে তবে উদ্ধার হয়ে যায়।' (ঐ পৃঃ ১৭০)

(১২) 'গঙ্গাস্নানে রোজের পাপ রোজ ক্ষয় হয়।' (ঐ পৃঃ ১৯০)

(১৩) 'শান্তানন্দ—বুড়ীরা (কাশীতে) মরতে গিয়ে আবার দীর্ঘজীবী হয়।

মা—বিশ্বনাথ-দর্শন-স্পর্শনে পাপক্ষয় হয়, তাহাতেই দীর্ঘজীবী হয়। বৃন্দাবনে শাঁখের জল গায়ে দেয়, প্রসাদ খাওয়ায় বলে দীর্ঘজীবী হয়।'

(১ম খণ্ড, ৭ম সং, পৃঃ ২৯০)

(১৪) 'শান্তানন্দ স্বামী মায়ের নিকট দেশের দুঃখ-দুর্দশার কথা তুলিলেন।

শান্তানন্দ—ইনফ্লুয়েঞ্জাতে শুনছি ষাট লক্ষ লোক মরেছে। ধান চাল সব দুর্মূল্য—লোকের বড় কষ্ট।

মা—হ্যাঁ, বাবা...

শান্তানন্দ—লোকের কষ্ট তো দিন দিন বাড়ছে। এত কষ্ট দেশে! এ কি, মা, কর্মফল?

মা—এত লোকের কি কর্মফল? কি একটা হাওয়া এসেছে।' (ঐ পৃঃ ২৯২)

বিষয়বস্তুর বিভাজন :—(১)—(৫) : কর্মফল আছেই ; (৬) (৭) ঈশ্বরের কৃপায় প্রারব্ধের ভোগ অনেক কমে যায় ; (৮)—(১৩) : পাপ ও প্রায়শ্চিত্ত ; (১৪) : কর্মবাদ দিয়ে সব কিছু ব্যাখ্যা করা চলে না।

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা :

"কৃত কর্মফল ভুঞ্জিতে হইবে,
বলে লোকে 'হেতু কার্য প্রসবিবে' ;
শুভ কর্মে—শুভ, মন্দে—মন্দফল
এ নিয়ম রোধে নাহি কারো বল।"

(১ম সং, ৭।৪০৪)

এই ধরনের কথা 'বাণী ও রচনা'য় অনেক

পাওয়া যায়। বস্তুতঃ কর্মবাদের ওপর স্বামীজী বিশেষ জোর দিয়ে গেছেন। কর্মবাদ যে হিন্দু-ধর্মের মূল তত্ত্বগুলির অন্যতম, সে-কথা স্বামীজী চিকাগো ধর্মমহাসভার নবম দিনের অধিবেশনে 'হিন্দুধর্ম'-শীর্ষক তাঁর প্রবন্ধে উল্লেখ করেছিলেন। স্বামীজী বলেছিলেন—

'মনের এরূপ বিশেষ প্রবণতার কারণ পূর্বানুষ্ঠিত কর্ম। বিশেষ কোন প্রবণতা-সম্পন্ন জীব সদৃশ বস্তুর প্রতি আকর্ষণের নিয়মানুসারে এমন এক শরীরে জন্মগ্রহণ করিবে, যাহা তাহার ঐ প্রবণতা বিকশিত করিবার সর্বশ্রেষ্ঠ সহায় হয়।···নবজাত প্রাণীর স্বভাবও তাহার পুনঃ পুনঃ কৃত কর্মের ফল; এবং যেহেতু তাহার বর্তমান জীবনে ঐগুলি লাভ করা অসম্ভব, অতএব অবশ্যই পূর্ব জীবন হইতেই ঐগুলি আসিয়াছে।'

(১।১৬)

'চেষ্টা ও সাধনার দ্বারা আমরা পূর্বজন্মের কথা জানিতে পারি।' (১।১৬)

কর্মবাদের ওপর জোর দিলেও, কর্মবাদ নিয়ে মাত্রাধিক্য স্বামীজী পছন্দ করতেন না। ১৮৯৭ সালের ফেব্রুআরি মাসে গোরক্ষিণী সভার জনৈক উদ্যোগী প্রচারক ও অর্থসংগ্রাহককে স্বামীজী জিজ্ঞাসা করেছিলেন মধ্য-ভারতের সে-সময়ের যে দুর্ভিক্ষে নয় লক্ষ লোক অন্নাভাবে প্রাণ হারিয়েছে, সেই বিপর্যয়ে গোরক্ষিণী সভা কোনও সাহায্যের আয়োজন করেছে কি না। প্রচারক উত্তর দেন—'না। লোকের কর্মফলে—পাপে এই দুর্ভিক্ষ; যেমন কর্ম তেমনি ফল।' এই উত্তরে স্বামীজীর মুখমণ্ডল আরক্তিম হয়ে উঠল, 'বিশাল নয়নপ্রান্তে যেন অগ্নিকণা স্ফুরিত' হতে লাগল; তিনি প্রচারককে ওজস্বিনী ভাষায় অনেক কথাই বললেন; তার মধ্যে আছে—'কর্মফলে মানুষ মরছে—এরূপে কর্মের দোহাই দিলে জগতে কোন বিষয়ের জন্য চেষ্টাচরিত্র করাটাই একেবারে বিফল ব'লে সাব্যস্ত হয়।' পরে স্বামীজী শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীকে বলেছিলেন—'কি কথাই বললে! বলে কিনা—কর্মফলে মানুষ মরছে, তাদের দয়া ক'রে কি হবে? দেশটা যে অধঃপাতে গেছে, এই তার চূড়ান্ত প্রমাণ। তোদের হিন্দুধর্মের কর্মবাদ কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে দেখলি? মানুষ হয়ে মানুষের জন্যে যাদের প্রাণ না কাঁদে, তারা কি আবার মানুষ?'

(৯।৯—১০)

শিষ্য হরিপদ মিত্রকে স্বামীজী বলেছিলেন—'প্রত্যেক ব্যক্তির শত শত জন্মের কর্মফল পিঠে বাঁধা রয়েছে। একমুহূর্ত শ্মশানবৈরাগ্য হ'ল, আর বললে কিনা—'কই, আমি তো সব এক দেখছি না।' উত্তরে মিত্র মহাশয় বলেন—'স্বামীজী, আপনার ঐ কথা সত্য হলে যে fatalism (অদৃষ্টবাদ) এসে পড়ে। যদি বহু জন্মের কর্মফল একজন্মে যাবার নয়, তবে আর চেষ্টা আগ্রহ কেন? যখন সকলের মুক্তি হবে, তখন আমারও মুক্তি হবে।' উত্তরে স্বামীজী বলেছিলেন—'তা নয়। কর্মফল তো অবশ্যই ভোগ করতে হবে, কিন্তু অনেক কারণে ঐ-সব কর্মফল খুব অল্প সময়ের মধ্যেই নিঃশেষ হতে পারে। ম্যাজিক-লণ্ঠনের পঞ্চাশখানা ছবি দশ মিনিটেও দেখানো যায়, আবার দেখাতে দেখাতে সমস্ত রাতও কাটানো যায়। এটি নিজের আগ্রহের ওপর নির্ভর করে।' (৯।৩৮৭ দ্রষ্টব্য)

ঈশ্বরের উপাসনার দ্বারা আমাদের কর্মফল খণ্ডন হয় কিনা এ-প্রশ্ন যুবক নরেন্দ্রনাথের মনেও জেগেছিল। কাশীর প্রমদাদাস মিত্রকে তিনি লিখেছিলেন—

'ঈশ্বর সৃষ্টিকার্যে যদি শুভাশুভ কর্মকে অপেক্ষা করেন, তবে তাঁহার উপাসনায় আমার লাভ কি? নরেশচন্দ্রের একটি সুন্দর গীত আছে—

কপালে যা আছে কালী, তাই যদি হবে (মা)

জয় দুর্গা, শ্রীদুর্গা ব'লে কেন ডাকা তবে।'

(৬।২৯৩)

মিত্র মহাশয় উত্তরে কি লিখেছিলেন, জানা যায় না, তবে স্বামীজীর একটি প্রসিদ্ধ উক্তি হচ্ছে, 'অবতার কপালমোচন।'

ব্যবহারদশায় কর্ম ও কর্মফলের কার্য-কারণ-সম্বন্ধ স্বীকার করলেও পরমার্থদৃষ্টিতে যে কর্ম ও কর্মফল মিথ্যা তা স্বামীজী বহু স্থানেই বলেছেন—

'কার্য-কারণ সব মায়া, আর আমরা যত বড় হবো ততই বুঝব যে, ছোট ছেলেদের পরীর গল্প এখন যেমন আমাদের কাছে বোধ হয়, তেমনি যা কিছু আমরা দেখছি, সবই ঐরূপ অসংবদ্ধ। প্রকৃতপক্ষে কার্য-কারণ বলে কিছুই নেই, আর আমরা কালে তা জানতে পারব।' (৪।৩০৭)

'আপনি যখন স্বপ্নে দেখেন যে, বিশ-মুণ্ড একটা দৈত্য আপনাকে ধরিবার জন্য আসিতেছে, আর আপনি তাহার নিকট হইতে পলাইতেছেন, আপনি উহাকে অসংলগ্ন মনে করেন না। আপনি মনে করেন, এতো ঠিকই হইতেছে। যাহাকে আমরা নিয়ম বলি, তাহাও এইরূপ। যাহা কিছু আপনি নিয়ম বলিয়া নির্দিষ্ট করেন, তাহা আকস্মিক ঘটনামাত্র, উহার কোন অর্থ নাই।'

(৩।৬৪)

'এই জগতে নিয়ম বা সম্বন্ধ বলিয়া কিছুই নাই, কিন্তু আমরা ভাবিতেছি, পরস্পর যথেষ্ট সম্বন্ধ আছে। আপনারা সকলেই সম্ভবতঃ 'এলিসের অদ্ভুত দেশদর্শন' (Alice in Wonderland) নামক গ্রন্থ পড়িয়াছেন।...আমাদের জগৎও ঐরূপ অসম্বদ্ধ যেন ঐ এলিসের অদ্ভুত রাজ্য—কোনটির সহিত কোনটির কোনপ্রকার সম্বন্ধ নাই। আমরা যখন কয়েকবার ধরিয়া কতকগুলি ঘটনাকে একটি নির্দিষ্ট ক্রমানুসারে ঘটিতে দেখি, আমরা তাহাকেই কার্য-কারণ নামে অভিহিত করি, আর বলি উহা আবার ঘটিবে।' (৩।৭৪-৭৫)

'প্রাকৃতিক নিয়ম হইতেছে জগৎ-ব্যাপারের পারম্পর্য ব্যাখ্যা করিবার একটি মানসিক সংক্ষিপ্ত প্রক্রিয়া, কিন্তু বাস্তবিক সত্তারূপে ইহার কোন অস্তিত্ব নাই।' (২।৪১৭)

'To the Awakened India'-শীর্ষক কবিতার শেষ স্তবকে স্বামীজী যা লিখেছেন, তার অন্তর্নিহিত মর্ম এই :

এই সংসার স্বপ্নের খেলা। কর্ম এখানে ভাল-মন্দ কর্মফলরূপ ফুল দিয়ে মালা গাঁথে, কিন্তু সে-মালায় সুতো নেই—ফুলগুলি অসংশ্লিষ্ট, শুধু যেন ওপর ওপর সাজানো। তাই সত্যের কোমলতম স্পর্শও ঐ ফুলগুলিকে উড়িয়ে নিয়ে যায় সেই আদি মহাশূন্যতায়, যেখান থেকে তাদের উৎপত্তি। অতএব সাহসী হয়ে সত্যের সম্মুখীন হও; সত্যের সঙ্গে একীভূত হয়ে যাও। সব স্বপ্ন ঘুচে যাক্। আর তা যদি না পারো তো পরার্থে কৃত তোমার কর্মের ফলে জগতের উপকার হচ্ছে বা উপাসনার ফলে নিত্য ঠাকুরের নিত্য সেবক হয়ে নিত্য প্রেম লাভ করছো - এই সব সুখস্বপ্ন দেখো। স্বার্থকেন্দ্রিক জীবন নিয়ে চিরবিব্রত হয়ে যেন দুঃস্বপ্ন দেখো না। (কবিতাটির পদ্যানুবাদ আছে ৭।৪০৮-১১ পৃষ্ঠায়)

পরিশেষে জ্ঞানীর পুনর্জন্মের সমস্যা সম্পর্কে অর্থাৎ আধিকারিক পুরুষ প্রসঙ্গে, নিম্নলিখিত কথাটি স্মরণীয় :

"ভগবান প্রকৃতির সকল নিয়মের (natural law) বাইরে, কোন নিয়ম-নীতির বশীভূত ন'ন—ঠাকুর যেমন বলতেন, 'তাঁর বালকের স্বভাব।'"

(৯।৬৬)

স্বামী শিবানন্দ :

পূজ্যপাদ স্বামী শিবানন্দজীকে একদিন বেলুড় মঠে নানাবিধ প্রশ্নের মধ্যে প্রারব্ধ-সম্বন্ধীয় এই প্রশ্নটি করা হয়েছিল—

প্রশ্ন—'যদি মানুষ নিজের কর্মজনিত অদৃষ্টেরই

অধীন হয়, তাহা হইলে সৃষ্টিবিধানে সর্বশক্তিমান এবং করুণাময় শ্রীভগবানের সার্থকতা কোথায়?' উত্তরে তিনি বলেছিলেন—'সর্বশক্তিমান করুণাময় শ্রীভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাস এবং কর্মবাদকে যদি একই মতবাদের অঙ্গ বলিয়া ধরা হয়, তাহা হইলে উহারা পরস্পর সামঞ্জস্যবিহীন হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ যাঁহারা কর্মবাদে বিশ্বাসী তাঁহারা উপরি-উক্ত গুণসম্পন্ন শ্রীভগবানে বিশ্বাসী নহেন। আবার যাঁহাদের শ্রীভগবান সম্বন্ধে ঐরূপ ধারণা তাঁহারা কর্মবাদকে অতটা আমল দেন না; তাঁহারা বলেন, সুখ-দুঃখ কর্মের অপেক্ষা না রাখিয়া সম্পূর্ণ শ্রীভগবানের ইচ্ছায় আমাদের কল্যাণের জন্যই হইয়া থাকে।' (১৩৫৬ সালের সং, পৃঃ ১২৫-২৬)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ :

আধিকারিক পুরুষ সম্বন্ধে গ্রন্থকার স্বামী সারদানন্দজী যে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন তার সার-সংক্ষেপ এই :

বৈদিক যুগে যে-কোনও অসাধারণ মানুষ অতীন্দ্রিয় সত্যের সাক্ষাৎ পেলেই, 'ঋষি'—শুধু এই একটি নামেই অভিহিত হতেন। ঋষিতে ঋষিতে যে বিস্তর পার্থক্য থাকতে পারে, সে-যুগের মানুষ তা বুঝতে পারেনি। কালক্রমে বুদ্ধি ও তুলনা করবার শক্তির উত্তরোত্তর বৃদ্ধিতে মানুষ উপলব্ধি করল যে, ঋষিরা সকলেই সমশক্তিসম্পন্ন ন'ন; আধ্যাত্মিক জগতে কেউ সূর্যের মতো, কেউ চন্দ্রের মতো, কেউ উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো, কেউ বা জোনাকীর মতো। সুতরাং যে-সব ঋষি বিশেষ শক্তির অধিকারী, তাঁদের নামকরণ করা হ'ল 'আধিকারিক পুরুষ' এবং তাঁদের মধ্যেও 'ঈশ্বরাবতার' ও 'ঈশ্বরকোটি' এই দু'টি বিভাগ করা হ'ল। অনুরূপভাবে সাংখ্যাচার্যরাও বিশেষ অধিকারসম্পন্ন ঋষিদের 'প্রকৃতিলীন পুরুষ' ব'লে অভিহিত করলেন এবং তাঁদের মধ্যেও আবার 'কল্প-নিয়ামক ঈশ্বর' ও 'ঈশ্বরকোটি' এই দু'টি শ্রেণী নির্দেশ করলেন। দার্শনিক যুগেই 'আধিকারিক' ও 'প্রকৃতিলীন' এই দু'টি নামকরণ করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে অর্থাৎ পৌরাণিক যুগে অবতারবাদের বিশেষ বিকাশ ঘটে।

অবতার বা ঈশ্বরকোটি অর্থাৎ দার্শনিক যুগে বেদান্তমতে যাঁরা 'আধিকারিক পুরুষ' ব'লে অভিহিত, তাঁদের জীবন-রহস্যের মীমাংসা করতে কর্মবাদ অক্ষম। (দ্রষ্টব্য ১।৩-৮ ও ৪।১৩৯-৪৪ পৃঃ)

স্বামী সারদানন্দজীর এই মতের পরিপ্রেক্ষিতে স্বামী শিবানন্দজীর একটি উক্তি এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। তিনি একদিন বলেছিলেন—'ঠাকুর আমাকেও এবার ঈশ্বরকোটি ক'রে দিয়েছেন।' (শিবানন্দ স্মৃতি-সংগ্রহ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪৫৮) তিনি আরও বলতেন যে, তিনি যুগে যুগে শ্রীরাম-কৃষ্ণদেবের লীলাসহচর হয়ে আসবেন। স্বামী শিবানন্দজীর এই যে আধিকারিকত্ব-প্রাপ্তি এটি কি তাঁর প্রারব্ধের অতিদেশ? এ-রকম ব্যাখ্যা কষ্টকল্পনা মনে হয় নাকি? ঈশ্বরের ক্রিয়াকলাপ মানববুদ্ধির অগম্য। কর্মবাদ দিয়ে সব সমস্যার সমাধান হয় না।

শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতিকথা :

"একদিন ঠাকুর তাঁকে (গিরিশবাবুকে) বলেছিলেন—'দ্যাখ, যদি কেউ মা-গঙ্গার কাছে অকপটে নিজের দুর্বলতার কথা জানায়, তাহলে মা তার সব অপরাধ মার্জনা করেন।' গিরিশবাবুর মনে একথাটা কেমন বসে গিছিলো, সেই থেকে তিনি রোজ মা-গঙ্গার কাছে নিজের অপরাধ সব জানাতেন। যেদিন যেতে পারতেন না, সেদিন ঐ দিকে মুখ রেখে সব কথা বলতেন। তাতেই তিনি শুদ্ধ পবিত্র হয়ে গেলেন।"

(২য় সং, পৃ ৪৩৬)

প্রায়শ্চিত্ত-প্রসঙ্গ নিয়ে আমরা অনেক

আলোচনা করেছি। ঐ বিষয়ের এইটিই শেষ উদ্ধৃতি।

অদ্ভুতানন্দ-প্রসঙ্গ :

'কর্ম অনুযায়ী বুদ্ধি হয়। তুমি যেমন করবে তোমার বুদ্ধিও তেমনি হবে।···কর্মফল মানা উচিত। শুভকর্ম শুভফল দেবে, আর অশুভ কর্মের অশুভ ফল হবে। যেমন কর্ম তেমন ফল—এটি ঠিক কথা।···কারো মনে দুঃখ দেওয়া উচিত নয়। এখন না হলে একদিন তার ফল ভুগতে হবে। আত্মারূপী ভগবান প্রত্যেক জীবের অন্তরে সাক্ষিরূপে রয়েছেন। এইজন্য যে দুঃখ দেয় সে দুঃখ পায়, আর যে মানুষের মনে সুখ দেয় ভগবান তার প্রতি প্রসন্ন হন, তাতে সে সুখ পায়। একেই বলে কর্মফল। যেমন কর্ম করবে তেমন ফল পেতে হবে। লঙ্কা না জেনে খেলেও ঝাল লাগবে আর চিনি লবণ ভেবে খেলেও মিষ্টি লাগবে। কর্মফলে বিশ্বাস করা উচিত। কর্মের উপর সংসার চলছে। যে রকম মানুষ কাজ করছে সেই রকম ফল পাচ্ছে। সাধনরাজ্যেও ঠিক তেমনি। বুদ্ধদেব কর্মের উপর ধর্ম স্থাপন করে গিয়েছেন।' (১ম সং, পৃঃ ৩২-৩৩)

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্য থেকে কর্মফল সম্বন্ধে আরও অনেক উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু তাতে কিছুটা পুনরাবৃত্তি হবে এবং প্রবন্ধের কলেবরও বৃদ্ধি পাবে, এই জন্য এইখানেই নিরস্ত হচ্ছি।

শাস্ত্রবচন, অবতারপুরুষদের বাণী ও মহাপুরুষদের উক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে যথাসম্ভব নিরপেক্ষভাবে কর্মফল সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করতে প্রয়াস পেয়েছি। অন্ততঃ আপাতদৃষ্টিতে বিরোধী কিছু কিছু উক্তির আমরা সম্মুখীন হয়েছি। নিজ নিজ রুচি, সংস্কার ও অধিকার অনুযায়ী কোন্ উক্তিটি আমরা গ্রহণ করতে পারি তা' আমাদের নিজেদেরই ঠিক করতে হবে। নীলকণ্ঠের 'ঈশাদপি কর্মপ্রাবল্যং দৃশ্যতে' ও পঞ্চদশীকারের 'অবশ্যম্ভাবিভাবানাং প্রতীকারো ভবেদ্ যদি, তদা দুঃখৈ র্ন লিপ্যেরন্ নল-রাম-যুধিষ্ঠিরাঃ' অথবা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 'বুঝেছি, তোমার পণ্ডিতদের মত, যে যেমন কর্ম করবে সেরূপ ফল পাবে, ওগুলো ছেড়ে দাও! ঈশ্বরের শরণাগত হলে কর্মক্ষয় হয়'—এই দ্বিবিধ উক্তির মধ্যে যেটি ইচ্ছা গ্রহণ করতে আমাদের স্বাধীনতা আছেই। পাপ করেছি, অতএব স্মৃতিশাস্ত্রের বিধান নিতে স্মার্ত পণ্ডিতদের কাছে ছুটবো, না বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবত, শ্রীধর স্বামী ও শ্রীচৈতন্যদেবের নির্দেশ এবং গীতার 'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য'-শ্লোকের রামানুজের দ্বিতীয় ব্যাখ্যা অনুযায়ী ভগবানের নামজপ করবো, তাঁর শরণাগত হবো, সেটা আমাদের নিজেদেরই স্থির করতে হবে। কর্ম ও কর্মফলের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য—নির্মম, নিষ্ঠুর সত্য, অথবা সবই স্বপ্নবৎ—জাগরণ ও স্বপ্নেরই মতো; স্বপ্নে যখন কার্যকারণসম্পর্ক নেই, তখন কর্ম ও কর্মফল মিথ্যা—এই দু'টি দার্শনিক মতবাদের কোন্‌টির আমরা যোগ্য তা' আমাদের আত্মবিশ্লেষণ ক'রে বুঝে নিতে হবে, নইলে দুর্ভোগ অনিবার্য। সযত্নে মনে রাখতে হবে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাবধান-বাণী—

"যদি রোগ, শোক, সুখ, দুঃখ এসব বোধ থাকে, তুমি জ্ঞানী কেমন করে হবে? এদিকে কাঁটায় হাত কেটে যাচ্ছে, দরদর ক'রে রক্ত পড়ছে, খুব লাগছে—অথচ বলছে, কৈ হাত তো কাটে নাই! আমার কি হয়েছে?"

(কথামৃত, ১।১১।৪)

পাতাল রেল

অধ্যাপক অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

পাতাল রেলের ইতিকথা

গত ডিসেম্বরের শেষে (১৯৭২ খ্রীঃ) ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ক'লকাতায় পাতাল রেলের আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করে গেছেন। বেশ কিছুদিন ধরেই ক'লকাতা মহা-নগরীতে পাতাল রেল প্রতিষ্ঠার জল্পনা-কল্পনা চলছিল। বিভিন্ন বৈদেশিক বিশেষজ্ঞদল তার জন্য বারবার এদেশে যাতায়াত করছিলেন। রকমারি নক্সা ও ব্যয়বরাদ্দের কথাও মাঝেমাঝেই পত্র-পত্রিকাতে বেরুচ্ছিল। সুতরাং এ বিষয়ে জন-মানসে খানিকটা ছবি গড়ে উঠেছে নিশ্চয়ই; কিন্তু একথাও স্বীকার্য যে, সে ছবি মোটেই স্পষ্ট নয়। তাই পাতাল রেল সম্বন্ধে কিছু তথ্য-পরিবেশনই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

এ কথা ঠিক যে, পাতাল রেলের প্রযুক্তিবিদ্যা সাধারণ মানুষকে বোঝানো কঠিন। বর্তমান নিবন্ধের উদ্দেশ্য, এরূপ প্রাথমিক জ্ঞানের যৎ-সামান্য বিস্তারসাধন। ক'লকাতার পাতাল রেলের আলোচনাই মুখ্য উদ্দেশ্য। তার পট-ভূমিকা হিসেবে দুটি প্রসঙ্গ আলোচনা করে নিলে ভাল হয়। প্রথম, পাতাল রেলের ইতিকথা। দ্বিতীয়, দেশে দেশে পাতাল রেল। সুতরাং তৃতীয় পর্যায়ে গিয়ে পড়বে—ক'লকাতায় পাতাল-রেল। মনে হয়, এই তিন পর্বে আলোচনা করলে, শুধু যে বেশী তথ্যই দেওয়া যাবে তাই নয়, প্রবন্ধের বক্তব্যের আকর্ষণও বেশী হবে।

পৃথিবীর বড় শহরগুলিতে পরিবহন-সমস্যা কালক্রমে প্রায় একই ধরনের হয়ে দাঁড়ায়। অধিকাংশ অফিস, বাণিজ্যকর্ম ও অন্যান্য বৃত্তির কেন্দ্রীভবনের ফলে দৈনিক যাত্রীর (commuters বা daily pssengers) সংখ্যা এত বেড়ে যায় যে, বাস, মোটর বাস বা ট্রলি বাস বা ট্রামে তাদের পরিবহন দুরূহ হয়ে পড়ে। তাছাড়া, প্রাইভেট গাড়ী, ট্যাক্সি, লরি ইত্যাদি বাহনেরা মিলে প্রায়শই এত ভীড় জমায় যে, গাড়ী তখন চলছে বলা যায় না, বরং বলা যায় হাঁটছে। এত সময় ও শক্তির অপচয় দূর করতে হলে পাতাল রেল অত্যাবশ্যক। সুতরাং মহানগরের পরিবহন-সমস্যার সমাধান করতে হলে দৈনন্দিন যাত্রীদের অনেককেই রাস্তার ওপর থেকে নীচে নিয়ে যেতে হবে। ওপরে বাস অবশ্য রাখতেই হবে—পাতাল রেলের পরিপূরক (feeder) হিসেবে। পাতাল রেলকে মোটামুটিভাবে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—১। ভূতল (sub-surface) রেল, ২। ভূগর্ভ (tube) রেল। ভূতল রেল হল রাস্তার ঠিক নীচেই অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠের (surface) খুব কাছেই এবং সে কারণ খুব সহজেই রাস্তার ওপর থেকে এতে পৌছানো যায়। ভূগর্ভরেল গভীরতর—এতে পৌছতে হলে লিফট বা এস্ক্যালেটর (চলমান সিঁড়ি) অপরিহার্য। সুতরাং ভূতল রেল ভূগর্ভ রেল অপেক্ষা নিঃসন্দেহে বেশী সুবিধাজনক যাত্রীদের দিক্ থেকে; কিন্তু পাহাড়ী এলাকায় দ্বিতীয় প্রকারের (ভূগর্ভ) রেল তৈরি করা ছাড়া গতি নেই।

প্রথম পাতাল রেল তৈরী হয় গ্রেট ব্রিটেনের রাজধানী লণ্ডনে—আজ থেকে ঠিক ১১০ বছর আগে। তারপরে এর বিপুল সম্প্রসারণ হয়েছে বৃহত্তর লণ্ডনে। পরবর্তীকালে লণ্ডনের দেখাদেখি পৃথিবীর অন্যান্য দেশের জনাকীর্ণ নগরগুলির বেশ কয়েকটিতে পাতাল রেল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

ফলে ১৯৬৬ খ্রীঃ-এ আমরা দেখতে পাই, পৃথিবীর আঠাশটি (২৮) বৃহৎ নগরের এরূপ রেলব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। নগরগুলির নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য—লণ্ডন ও গ্ল্যাসগো (গ্রেট ব্রিটেন); লেনিনগ্রাদ, মস্কো ও কিয়েভ (সোভিয়েত রাশিয়া); বোষ্টন, শিকাগো, নিউইয়র্ক ও ফিলাডেলফিয়া (আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র); টোকিও, ওসাকা ও নাগোয়া (জাপান); রোম ও মিলান (ইতালী); বার্লিন ও হাম্বুর্গ (জার্মানী); বার্সেলোনা ও মাদ্রিদ (স্পেন); মনট্রিয়াল ও টরোণ্টো (ক্যানাডা); প্যারিস (ফ্রান্স); রটারড্যাম (হল্যাণ্ড); ষ্টক্‌হোম্ (সুইডেন); অসলো (নরওয়ে); ভিয়েনা (অস্ট্রিয়া); লিসবন (পর্তুগাল); বুদাপেস্ত (হাঙ্গেরী) এবং বুয়েনোস্ এয়ারিস্ (আর্জেন্টিনা)।

পাতাল রেল নির্মাণ ও নদীর তলা দিয়ে সুড়ঙ্গ তৈরীর ব্যাপারে লণ্ডনের অগ্রণী ভূমিকা স্বীকার করতেই হবে। এই শহরেই পৃথিবীর প্রথম ভূতল লাইন খোলা হয় ১৮৬৩ খ্রীঃ ১০ই জানুআরি এবং প্রথম ভূগর্ভ (tube) লাইন খোলা হয় ১৮৭০ খ্রীঃ ২রা আগষ্ট। ঐ ভূগর্ভ লাইনটি ছিল মাত্র সিকি মাইল লম্বা—টেম্‌স্ নদীর নীচে দিয়ে টাওয়ার হিল থেকে ভাইন ষ্ট্রীট পর্যন্ত। লণ্ডনের যাবতীয় পরবর্তী টিউব লাইনগুলি নির্মাণ-পদ্ধতিতে এটির সদৃশ। গ্রেটহেড (Greathead) নামক একজন ইঞ্জিনীয়ার একটি বৃত্তাকৃতি চক্র (circular shield) নির্মাণ করেন। এর সাহায্যে সুড়ঙ্গ তৈরীর (tunnelling) খুব সুবিধা হয়। এর নাম এখনো Greathead Shield। এখন যেটি লণ্ডনের 'নর্দার্ন' লাইন তারই অংশ হল 'দি সিটি এ্যাণ্ড সাউথ লণ্ডন লাইন'। সিটি এ্যাণ্ড সাউথ লণ্ডন লাইনই আর্থিক দিক্ থেকে প্রথম সফল টিউব রেল। এর নির্মাতা হলেন ঐ গ্রেটহেড। গ্রেটহেড শীল্ডের পরে আরো উন্নয়ন হয়েছে—এর মধ্যে একটি ঘূর্ণ্যমান কর্তক আধার (rotating digger drum) বসান হয়েছে। ঐটির সাহায্যে মাটি কেটে তাকে ভেঙ্গে ফেলে চলমান পাত্রের (conveyor belt) দ্বারা সুড়ঙ্গের বাইরে নিয়ে ফেলা হয়। শীল্ডটিকে নিখুঁতভাবে এক লাইনে ও সমতলে মাটির মধ্য দিয়ে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার সমস্যার এখনো পুরোপুরি সমাধান হয়নি। কারণ, অনেক সময় মাটির অনেক নীচে দিয়ে সুড়ঙ্গ কাটতে হয়, তদুপরি শক্ত প্রস্তরময় এলাকা ইত্যাদির মোকাবিলাও মাঝে মাঝে করতে হয়।

পাতাল রেলের সুড়ঙ্গ পথ তৈরি করা একটা ব্যয়সাধ্য ব্যাপার; সুড়ঙ্গপথের সামান্য ব্যাসবৃদ্ধি করতে গেলেই প্রায় তিনগুণ খরচ বেড়ে যায়। ব্যাসের বর্গক্ষেত্র যত বাড়বে, মাটি কেটে বার করে ফেলবার পরিমাণ ও ব্যয় ততই বাড়বে। রেল লাইন যাতে ঠিকমত পাতা যায় ও ইঞ্জিন এবং গাড়ী যাতে নিরাপদে চলতে পারে তার জন্য সুড়ঙ্গ খুব নিখুঁতভাবে তৈরি করতে হয়। গাড়ীর গতিপথ যাতে দৃঢ়সংবদ্ধ হয় তার জন্য সর্বদাই সুড়ঙ্গপথ কংক্রীট-নির্মিত হয়। মাটি কাটা ও তা' সরিয়ে ফেলার জন্য শক্তিশালী স্বয়ং-ক্রিয় যন্ত্রপাতি আবিষ্কার হওয়ায় শ্রমিকের মজুরী বাবদ ব্যয় অবশ্য পূর্বের তুলনায় অনেক কমেছে। বৃহত্তর সুড়ঙ্গে মৃত্তিকা-খনন ও অপসারণ এর ফলে অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হয়েছে এবং অল্পতর ব্যয়ে হচ্ছে। বৃহত্তর রেলপথ ও তার সরঞ্জাম নির্মাণ ও সংরক্ষণ করতে গিয়েও খানিকটা ব্যয়সংক্ষেপ হচ্ছে।

প্রথম যে পদ্ধতিতে পাতাল রেল তৈরী হয়, তার নাম হল 'cut and cover method' বা 'খননাবরণ পদ্ধতি'। নামেতেই বোঝা যাচ্ছে যে, এই পদ্ধতি অনুযায়ী প্রথমে একটি পরিখা (trench) খনন করা হয়, তারপর ঐ পরিখা বা গর্তের মধ্যে একটি টানেল তৈরি করে তাকে

মাটি দিয়ে বুঁজিয়ে দেওয়া হয়। টানেলগুলি সাধারণতঃ ইস্পাতের শিকের খাঁচায় বসান এবং কংক্রীটে তৈরী। অবশ্য বর্তমানে পূর্ব থেকেই তৈরী (ভূপৃষ্ঠে জমান) অংশসমূহ (pre-cast sections) জোড়া দিয়ে টানেল তৈরীর প্রথাই বেশী চালু হয়েছে। জার্মানীর হাম্বুর্গে এরূপ ৬ বা ৭ ফুট লম্বা কংক্রীট সেকশনসমূহ জোড়া দিয়ে বেশ লম্বা টানেল তৈরি করা হয়েছে। এ বিষয়ে সব চেয়ে আধুনিক ও কৃৎকৌশলসম্পন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে টোকিও এবং রটারড্যামে।

খননাবরণ বা cut and cover পদ্ধতির বিকল্প হল বেলজিয়ান পদ্ধতি। এতে ভূপৃষ্ঠকে অক্ষত রেখে খনন করা হয়। একটা জায়গায় খুব বড় ও গভীর গর্ত খুঁড়ে তার নীচে গিয়ে কাটতে কাটতে যেতে হয়। যাতে ওপরের মাটি ধসে না পড়ে, তার জন্য gallery support-এর ব্যবস্থা করা হয়। কখনো কখনো সাবধানতার জন্য সুড়ঙ্গপথের ছাদটা আগে তৈরি করে নিয়ে তার পরে সুড়ঙ্গের নিম্নতর ও গভীরতর অংশকে খনন করা ও বাঁধান হয় (যেমন শিকাগোতে হয়েছিল)। অথবা, সুড়ঙ্গের ছাদটা যাতে খননকালে ভেঙ্গে না পড়ে তার জন্য অর্ধ-চন্দ্রাকৃতি শীল্ড ব্যবহার করা যেতে পারে - যেমন টোকিওতে করা হয়েছিল। সর্বাধুনিক ও কৌতূহলোদ্দীপক উপায় অবলম্বিত হয়েছে ইতালীর মিলান শহরে (এর কথা পরে আলোচনা করা হবে মিলানের পাতাল রেল বর্ণনার সময় —হাল আমলে অন্য কয়েকটি দেশেও মিলান-পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে)। এই পদ্ধতিতে সুড়ঙ্গ-পথের ভিত্তিমূলের (foundations) ক্ষতি, গাড়ী চলার শব্দ ও কম্পন পূর্বের তুলনায় অনেক কমে গেছে।

বড় শহরের পরিবহন-সমস্যা সমাধান করতে হলে শুধু বিস্তৃত পাতাল রেল নির্মাণ করলেই হবে না; যাত্রীদের তা' ব্যবহারে প্রবুদ্ধ করতেও হবে। নিয়মিত যাত্রীরা ন্যূনতম ভাড়ার গাড়ীতেই চড়বেন, যদি অবশ্য তা' মোটামুটি দ্রুত এবং আরামপ্রদ হয়। সুতরাং পাতাল রেলের পরিচালনব্যয় (operational costs) খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, লণ্ডনের কথা বলা যেতে পারে। ওখানে ১৯৬২ খ্রীঃ-এ বাসে মাইল প্রতি ভাড়া ছিল ২'৬১ পেন্স; কিন্তু পাতাল রেলে মাইল প্রতি গড় ভাড়া ছিল ২'৩৫ পেন্স। ব্যবস্থাপনায় কর্মচারীর সংখ্যা কমাতে পারলে আরো ব্যয়সংক্ষেপ হতে পারে, ভাড়াও কমান যেতে পারে। যেমন, মিলান এবং হাম্বুর্গের পাতাল রেলে টেলিভিশনের সাহায্যে গার্ডের কাজ এবং যাত্রীদের নিরাপত্তা বিহিত হয়েছে। স্বয়ংক্রিয় গাড়ীচালনের (automatic driving) চেষ্টাও কোথাও কোথাও হচ্ছে। টিকেট বিক্রয় ও সিগন্যাল ব্যবস্থাও স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রে হচ্ছে, বৈদ্যুতিক inter-lock ব্যবস্থাও চালু হয়েছে।

প্রতি ঘণ্টায় কতজন যাত্রী পাতাল রেলে চলতে পারে, তা' প্রধানতঃ নির্ভর করে গাড়ীর সংখ্যা, দৈর্ঘ্য ও গতিবেগ এবং এস্‌ক্যালেটারের বহনক্ষমতার ওপর। এই রেলের সর্বপ্রধান উপযোগ হল, এর বহুসংখ্যক দৈনিক যাত্রীকে বহন করার ক্ষমতা—বিশেষ করে যখন ভীড়ের চাপ খুব বেশী (peak or rush hours), যেমন, অফিস শুরু হবার কিছু আগে থেকেই এবং শেষ হবার অব্যবহিত পরে। নিউইয়র্কে ১০-কামরাওয়ালা গাড়ী ঘণ্টায় ৩২ খানা করে চলে। প্রতি গাড়ীতে গড়ে ৩,০০০ যাত্রী অর্থাৎ ঘণ্টায় মোট ৯৬,০০০ যাত্রী চলে। এতসংখ্যক যাত্রী বাসে বহন করতে হলে লাগত প্রতি ২ সেকেণ্ডে ১ খানা করে বাস; আর প্রাইভেট

গাড়ীতে বহন করতে হলে লাগত প্রতি সেকেণ্ডে ১৬ খানা করে গাড়ী। সুতরাং তুলনামূলক বিচারে পাতাল রেলে পরিবহনই বেশী সুবিধা-জনক। প্যারিস মেট্রো এই সুবিধার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত—এর অজস্র শাখা, পরস্পর-সন্নিহিত ষ্টেশন, ওপরের রাস্তাগুলির সঙ্গে সহজ সংযোগ একে অপূর্ব সাফল্যমণ্ডিত করেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে (১৯৪৬ খ্রীঃ) যখন প্যারিসের রাস্তায় খুব অল্পসংখ্যক বাস ও প্রাইভেট গাড়ী চলত, তখন ঐ শহরের মেট্রো বা পাতাল রেলই ছিল প্রধান অবলম্বন। ঐ বছর ঐ রেলে মোট ১৬০ কোটি লোক যাতায়াত করেছিল।

গাড়ীর অভ্যন্তরে আরামপ্রদ পরিবেশ এবং গাড়ীর গতিবেগ উভয়ের ওপরেই নির্ভর করে যাত্রীদের আকর্ষণের মাত্রা। স্বাভাবিকভাবেই নতুন গাড়ী বেশী আরামদায়ক ও আনন্দদায়ক; কেননা তার বসবার ব্যবস্থা ভাল, আলোর সমারোহ বেশী, দেওয়াল-অলংকরণ চটকদার, আবার কখনো কখনো শব্দনিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থাও উন্নত। সবচেয়ে সাহসী পরিকল্পনা অবলম্বিত হয়েছে প্যারিসে—ওখানকার পাতাল রেলে লোহার চাকার বদলে বাসের চাকার মতো ফাঁপান রবার টায়ার (pneumatic tyres) ব্যবহার করা হয়েছে সাম্প্রতিককালে। ক্যানাডার মণ্ট্রিয়ালেও অনুরূপ ব্যবস্থা অনুসরণ করা হয়েছে। পাতাল রেলের ষ্টেশন-নির্মাণেও নতুন নতুন কৌশল অবলম্বন করা হচ্ছে। পূর্বের তুলনায় অনেক প্রশস্ত, সমধিক আলোকিত ও অলংকৃত করে তাদের তৈরি করা হচ্ছে। এতে যাত্রীদের মনে চলাফেরার স্বাচ্ছন্দ্য এবং পাশের দোকানপাট, বিজ্ঞাপন ইত্যাদি দেখে বেড়াবার সুযোগ হয়েছে। শহরের ওপরকার সুবিধাবলীর সঙ্গে এসব ষ্টেশনের ঘনিষ্ঠতর সংযোগ এখন সাধিত হয়েছে। যেমন, টোকিওর পাতাল রেলের হিবিয়া (Hibiya) ষ্টেশনে বড় রাস্তার নীচে ৬০ ফুট চওড়া একটি মোটরপথ করা হয়েছে; পদযাত্রীদের যাতায়াতের একটি প্রশস্ত পথ গিয়ে পড়েছে জমায়েত হবার একটি বিস্তৃত জায়গায় (wide concourse)। এই জমায়েত হবার জায়গা থেকেই প্ল্যাটফর্ম ও লাইন শুরু হয়েছে। সুতরাং মাটির তলায় ৫০ ফুট নীচেও কোন অস্বস্তি বোধ হয় না, মনে হয় না কোন সংকীর্ণ গর্তে যেন ঢুকে পড়েছি। বর্তমানে স্যানফ্র্যান্সিস্কো উপসাগরের নীচে দিয়ে ১২০ মাইল দীর্ঘ একটি পাতাল রেল (দ্রুতগামী গাড়ীর জন্য) নির্মাণের পরিকল্পনা চলছে

লণ্ডনেই পাতাল রেলের সূত্রপাত। তার সম্পর্কে বিভিন্ন পরীক্ষানিরীক্ষা এবং সফল পরি-চালনা এ নগরেই প্রথম সম্ভব হয়েছিল। তাকে অনুসরণ করেই দেশে দেশে পাতাল রেল আজ গড়ে উঠেছে এবং ভবিষ্যতে আরো উঠবে। তাই পাতাল রেলের ইতিকথার মধ্যেই লণ্ডনের পাতাল রেলের ১১০ বছরের অতিসংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরা হবে এই প্রবন্ধে। তারপরে হবে "দেশে দেশে পাতাল রেল" এবং সর্বশেষ পর্যায়ে "ক'লকাতায় পাতাল রেল"।

১৮৬৩ খ্রীঃ ১০ই জানুআরি লণ্ডন মেট্রোপলিটান রেলওয়ে প্রথম খোলা হয় একথা আগেই উল্লিখিত হয়েছে। বাষ্পীয় ইঞ্জিনের ধোঁয়ায় প্রথমে এ লাইনে খুব অসুবিধা দেখা দিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু এর সাফল্যও সূত্রপাতেই দেখা গিয়েছিল। স্থাপনের পর কিছুকাল লণ্ডনবাসীদের একমাত্র আলোচ্য বিষয় ছিল এই রেলপথ। তখন একথা মুখে মুখে ঘুরত, এ রেল হচ্ছে একটি অতিকায় ইঁদুর—গর্ত খুঁড়ে রাস্তার নীচে ঢুকে পড়েছে। সরকারীভাবে এর উদ্বোধনের দিন (পূর্বোক্ত ১০ই জানুআরি) ফ্যারিংডন ষ্ট্রীট

ষ্টেশনে খুব ঘটা করে খানাপিনা হয়েছিল। গোড়ার দিকে খুব ভোর থেকেই শুরু হ'তো এ রেলে বেড়ানোর ধুম। মাঝে মাঝে এত ভীড় হ'ত যে, কোন কোন ষ্টেশন বন্ধ করে দিতে হ'ত। বাস্তবিক পক্ষে, কোন বিখ্যাত পুস্তকের অভিনয়ের প্রথম সন্ধ্যায় কোন থিয়েটারের প্রবেশ-পথে যেরকম ভীড় হয়, তার সঙ্গেই এ ভীড় তুলনীয়।

প্রথমে মাত্র ৪ মাইল পথ খোলা হয় লণ্ডন নগরের প্রান্তে (প্যাডিংটন থেকে ফ্যারিংডন পর্যন্ত)। এটিই পৃথিবীর সর্বপ্রথম ভূতল লাইন। এর থেকেই কালক্রমে সৃষ্টি হয়েছে বিখ্যাত লণ্ডন টিউব বা ভূগর্ভ রেল (প্রথমে ভাড়া ছিল ১ পেনি, সেজন্য নাম ছিল এক-পেনি টিউব)। পাতাল রেলসমূহের মধ্যে লণ্ডন অনেক দিন থেকেই প্রথম স্থানের অধিকারী—এটি প্রাচীনতম এবং গভীরতম; এর দীর্ঘতম মাইলপথ, দীর্ঘতম সুড়ঙ্গ (tunnel), ইত্যাদি। গত শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে লণ্ডনে যেন পরিবহন-ব্যবস্থার থ্রম্বসিস্ (thrombosis) হয়েছিল। প্রায়ই ঘণ্টার পর ঘণ্টা আটক পড়ে যেত রাস্তার সব গাড়ী ঘোড়া (এদৃশ্য এখন ক'লকাতার রাস্তায় প্রায়ই দেখা যায়)। এই দুঃসহ অবস্থার থেকে মুক্তি পাবার জন্য চার্লস পিয়ার্সন নামক একব্যক্তি ঐ শতাব্দীর তৃতীয় দশকেই একটি পরিকল্পনা রচনা করেছিলেন; কিন্তু তখন তা' গ্রহণ করা উপযুক্ত বিবেচিত হয়নি। আরো প্রায় তিরিশ বছর কেটে গিয়েছিল অনুরূপ একটি পরিকল্পনা চালু করতে।

প্রকৃতপক্ষে লণ্ডন মেট্রোপলিটান রেল যখন প্রথম তৈরী হয়, তখন ওটি আধুনিক অর্থে যাকে পাতাল রেল বলি, তা' ঠিক ছিল না। কারণ এর অনেকটাই ছিল ওপর খোলা গর্তের মধ্য দিয়ে অথবা রাস্তার ঠিক তলা দিয়েই। পাশের দালান-কোঠার যাতে কোন ক্ষতি না হয় বা তার জন্য কোম্পানীকে কোন ক্ষতিপূরণ করতে না হয়, তার জন্যই এ ব্যবস্থা হয়েছিল। রাস্তার নীচের অংশগুলোও সুড়ঙ্গ বা টানেল তৈরি করে তখন করা হয়নি, হয়েছিল cut and cover method-এ অর্থাৎ বাংলায় যাকে বলা যেতে পারে খননাবরণ-পদ্ধতি—খুঁড়ে লাইন পেতে ওপরটা বুঁজিয়ে দেওয়া। একমাত্র টানেল তখন তৈরী হয়েছিল ক্লার্কেনওয়েল প্রান্তে। ওটি ছিল মাউণ্ট প্লেজ্যাণ্ট নামক পাহাড়ের মধ্য দিয়ে। ওই টানেলটি ৭২৮ গজ লম্বা—তৎকালীন ইঞ্জিনীয়ারদের ওটি নির্মাণ করতে নিশ্চয়ই বেগ পেতে হয়েছিল।

মেট্রোপলিটান রেলের উদ্ভাবনের কৃতিত্ব অবশ্যই চার্লস পিয়ার্সনের। কিন্তু প্রকৃত নির্মাতা ছিলেন ঐ কোম্পানীর ইঞ্জিনীয়ার স্যার জন ফাউলার। একাজে বিশেষ সহায়তা তাঁকে করে-ছিলেন ব্রুনেল ও আর কয়েকজন বিখ্যাত ইঞ্জিনীয়ার। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দেই ব্রুনেলের তৈরি টেম্‌স্ নদীর নীচের সুড়ঙ্গ পথ সম্পূর্ণ হয়ে গিয়ে-ছিল। এটি পাতাল রেল পরিকল্পনা ও নির্মাণে যথেষ্ট সযায়তা করেছে। লণ্ডনের সব ভূগর্ভ লাইনই Greathead Shield-এর সাহায্যে হয়েছে।

বর্তমানে যাত্রীদের সুবিধার জন্য লণ্ডন পাতাল রেলে অনেক ব্যবস্থা হয়েছে। প্রতি ১৫ মিনিট অন্তর সুড়ঙ্গপথের বায়ু বদল করা হয় অর্থাৎ প্রতি মিনিটে ৫০ লক্ষ কিউবিক ফুট বায়ু পাম্প করা হয়ে থাকে। সারাবছর এ পথে তাপমাত্রা ৬৯° থেকে ৭৩° ফরেনহিট রাখা হয়; এর ফলে শীত-কালে পাতাল রেলে গরম এবং গ্রীষ্মকালে ঠাণ্ডা বোধ হয়, যাত্রীদের আরাম হয়। রাস্তার ওপর দিয়ে গেলে যা' সময় লাগে টিউবে গেলে তার থেকে অনেকটাই কম সময় লাগে। পাতাল

রেলের শতবর্ষপূর্তির সময় (১৯৬৩ খ্রীঃ জানুআরি) লণ্ডনের নবীনতম পাতালপথ ভিক্টোরিয়া লাইনের কাজ শুরু হয়ে যায়। তখন ঐ নগরের দৈনিক যাত্রীর সংখ্যা ছিল প্রায় সাড়ে বারো লক্ষ।

বৃহত্তর লণ্ডন প্রায় ১ কোটি লোক-অধ্যুষিত। লণ্ডন পরিবহন সংস্থা ২,০০০ বর্গমাইল এলাকার ১ কোটি ২২ লক্ষ লোকের যাতায়াতের সুগম ব্যবস্থা করেছে। ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে এর কর্মি-সংখ্যা ছিল ৬৫,০০০ পুরুষ ও ১১,০০০ নারী। ঐ বছরে ঐ সংস্থা ৩১৫.৩ কোটি যাত্রীর মাথাপিছু ২.৭৫ মাইল ভ্রমণের ব্যবস্থা করেছিল। প্রথমতঃ কতগুলি প্রতিযোগী কোম্পানী লণ্ডনের পাতাল রেল নির্মাণ করেছিল। পরবর্তী কালে বিভিন্ন কোম্পানীর মালিকানা ও পরিচালনাধীন সাতটি প্রধান লাইনকে এক পরিচালনায় আনতে অনেক অর্থ, শক্তি ও প্রযুক্তিকৌশল প্রয়োগ করতে হয়েছে। ১৯৬২ খ্রীঃ সর্বসাকুল্যে লাইনের (route miles) মোট দৈর্ঘ্য ছিল ২৪৪ মাইল এবং গাড়ীর গড় গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ২০ মাইল।

লণ্ডন পাতাল রেলের দুটি পৃথক লাইনব্যবস্থা ও তদনুরূপ গাড়ীর ব্যবস্থা দেখা যায়— ১। ভূতল বা অগভীর লাইন (sub-surface or shallow type), যেমন, মেট্রোপলিটানের ৬০ মাইল, ডিষ্ট্রিক্ট-এর ৪৫ মাইল ও ইনার সার্কল্-এর ১৩ মাইল—এ লাইনগুলির গাড়ী, চাকা ইত্যাদি পরস্পর বদলা-বদলি করা যায়; ২। ভূগর্ভ বা গভীর লাইন (tube or deep level lines), যেমন, সেণ্ট্র্যাল-এর ৫১ মাইল, নর্দার্ন-এর ৪০ লাইল, পিকাডিলির ৩৮ মাইল এবং বেকারলু'র ৩২ মাইল—এদের গাড়ী ও চাকা ক্ষুদ্রতর এবং সব টিউব লাইনেই পরস্পর পরিবর্তন-যোগ্য। ওপরের সব রুটমাইল যোগ করলে দাঁড়ায় ২৭৯ মাইল, এর মধ্যে ৩৫ মাইলের ওপর দিয়ে একাধিক লাইনের গাড়ী চলে। গোটা পাতাল রেল ব্যবস্থায় ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে ভূগর্ভ (tube) সুড়ঙ্গ ছিল ৬৬ মাইল, ভূতল (sub-surface) সুড়ঙ্গ ছিল ২২ মাইল এবং ভূপৃষ্ঠ বা মুক্ত (surface or open) লাইন ছিল ১৫৬ মাইল।

এই মহানগরীর কেন্দ্রীয় এলাকাগুলিতে আট কামরার গাড়ী ভীড়ের সময় ১২ মিনিট অন্তর এবং অন্যান্য সময় ৩ মিনিট অন্তর ছাড়ে। পরি-বহন কর্তৃপক্ষ এই এলাকার ২৭৩টি ষ্টেশনের মধ্যে ২৪৪টির পরিচালনা করে। বিভিন্ন কোম্পানীর দ্বারা বিভিন্ন সময়ে তৈরী হওয়ায় ষ্টেশনগুলির নক্সা ও অলংকরণও বিভিন্নরূপ। আর্লস্ কোর্টে প্রথমে এস্ক্যালেটর বসানো হয় ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে। ১৯৬২ খ্রীঃ-এ মোট লিফ্‌টের সংখ্যা ছিল ৯৪টি এবং এস্ক্যালেটর ১৮৮টি। খুব ভীড়ের ষ্টেশনগুলিতে তিনটি করে সমান্তরাল এস্ক্যালেটর আছে একটি শুধু ওপরে ওঠবার জন্য, একটি শুধু নীচে নামবার জন্য এবং তৃতীয়টি ওপর-নীচ দুই-ই করবার জন্য। গভীরতর ষ্টেশনগুলিতে দুই ধাপ এস্ক্যালেটর আছে ও তার মাঝে থামবার জায়গা আছে। এই চলমান সিঁড়িগুলির সাধারণ গতিবেগ মিনিটে ১৪৭ ফুট, অবশ্য প্রয়োজন হলে এর থেকেও দ্রুত চালান যায়।

লণ্ডন পাতাল রেলের বৈচিত্র্যপূর্ণ ইতিহাস নিয়ে স্বতন্ত্র দীর্ঘ পুস্তক রচিত হয়েছে। তাতে বিভিন্ন কোম্পানী, যেমন মেট্রোপলিটান, ডিষ্ট্রিক্ট, সিটি এ্যাণ্ড সাউথ লণ্ডন, লণ্ডন এ্যাণ্ড সাউথ ওয়েষ্টার্ন রেলওয়েজ ইত্যাদির অবদান এবং প্রতিযোগিতার বহু কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী আছে এ প্রবন্ধের সীমিত পরিসরে তা' বর্ণনা করবার অবকাশ নেই। অবশ্য উৎসাহী পাঠকের গোচরার্থে প্রবন্ধের শেষে এরূপ দু-একটি বই-এর নাম উল্লেখ করা হবে।

ভূতল লাইনগুলি প্রায় সবই তৈরী হয়েছে প্রধান প্রধান রাস্তাগুলির নীচে—খননাবরণ-পদ্ধতি অনুযায়ী; আর ভূগর্ভ লাইনগুলি তৈরী হয়েছে shield driving পদ্ধতিতে। সর্বশেষ-নির্মিত লাইনটির নাম হল ভিক্টোরিয়া লাইন। এর অভ্যন্তরের ব্যাস হল ১২ ফুট ৮ ইঞ্চি। লাইনটির মোট দৈর্ঘ্য ১১ মাইল। পাতাল রেলের অন্য লাইনগুলির সঙ্গে যোগাযোগের এটি একটি প্রধান সূত্র। বরফ-ও তুষারমুক্ত রাখার জন্য পাতাল রেলের সর্বত্র ইলেকট্রিক্ হিটারের ব্যবস্থা আছে। এই পাতাল রেলে প্রথম বিদ্যুৎবাহিত গাড়ী চলে ১৮৯০ খ্রীঃ-এ এবং প্রথম স্বয়ংক্রিয় গাড়ী চলে ১৯৬৩ খ্রীঃ এপ্রিল মাসে। ভূগর্ভ রেলের গাড়ীগুলির কামরার গড়পড়তা দৈর্ঘ্য ৫২ ফুট ৩ ইঞ্চি, প্রস্থ ৮ফু. ৬ই. এবং উচ্চতা ৯ফু. ৫½ই.; আর ভূতল রেলের গাড়ীগুলির কামরার গড় দৈর্ঘ্য ৫৩ ফু. ½ ই. প্রস্থ ৯ফু ৮ই এবং বেধ ১২ ফু ১ই (লাইন থেকে গাড়ীর ছাদ পর্যন্ত)। প্রথমোক্ত কামরাগুলিতে সর্বোচ্চ যাত্রিসংখ্যা ১৭৮ এবং দ্বিতীয়োক্তগুলিতে ১৮৯ পর্যন্ত হতে পারে (প্রতি কামরায় বসে ও দাঁড়িয়ে)।

দেশে দেশে পাতাল রেল

প্রবন্ধের শিরোনামা অনুযায়ী পাতাল রেলের আলোচনা ঐতিহাসিক কালানুক্রমিক না করে দেশানুক্রমিক করা হবে। কারণ এতে কোন্ কোন্ দেশে এরকম রেলের প্রসার হয়েছে এবং কতটা হয়েছে তার চিত্র যেমন পাওয়া যাবে, তেমনই দরকার হলে আন্তর্জাতিক তুলনাও করা যাবে।

গ্রেটব্রিটেন :

লণ্ডন পাতাল রেলের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত আমরা আগেই দিয়েছি। কিন্তু গ্রেটব্রিটেন পৃথিবীর প্রাচীনতম ও দীর্ঘতম পাতাল রেলের গৌরবের (লণ্ডন) অধিকারী হয়েও বেশীসংখ্যক শহরে এর বিস্তার সাধন করেনি। ঐ দেশে মাত্র আর একটি শহরে এরূপ রেলপথ আছে। শহরটি হল গ্ল্যাসগো।

গ্ল্যাসগো: এই শহরের পাতাল রেল পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীনতম। এর ইতিহাসও বিচিত্র। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে শহরের অধিবাসীরা পরিবহনের অব্যবস্থা দূরীকরণের জন্য শহরের উত্তর-পশ্চিম কোণ থেকে মধ্যস্থল পর্যন্ত এরূপ একটি লাইন খোলার প্রস্তাব আনেন; কিন্তু স্থানীয় কর্তৃপক্ষ (করপোরেশন) এর বিরোধিতা করেন। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে এই লুপ লাইনের নতুন একটি পরিকল্পনা অনুমোদিত হয়। লাইনের উদ্বোধন হয় ১৮৯৬ খ্রীঃ ডিসেম্বর মাসে। একটি দুর্ঘটনার জন্য সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়, আবার কার্যকর হয় ১৮৯৭ খ্রীঃ জানুআরি থেকে।

গ্ল্যাসগো শহরের ভূ-নিম্ন মৃত্তিকা (sub-soil) অধিকাংশই কাদামাটি (clay); কিন্তু ক্লাইড (Clyde) নদীর নীচটা বালুকাময়। সুড়ঙ্গগুলো সবই স্বতন্ত্র, প্রত্যেকটি ১১ ফুট ব্যাসের; দুটি পাশাপাশি সুড়ঙ্গের ব্যবধান ২ ফু ৬ই থেকে ৬ফুট পর্যন্ত। মৃত্তিকার প্রকৃতি অনুযায়ী এদের নির্মাণপদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন হয়েছে। অবশ্য বেশীর ভাগ খননাবরণ-পদ্ধতিই অনুসৃত হয়েছে। এই পাতাল রেলের গভীরতম অংশ মাটির ১১৫ ফুট নীচে অবস্থিত। গোটা রেলপথটি একটি পূর্ণ-ডিম্বাকৃতি—পরিধি ৬'৬ মাইল এবং ষ্টেশনসংখ্যা ১৫টি। বৈশিষ্ট্য আগেই বলা হয়েছে তা হল দুটি লাইন দুটি স্বতন্ত্র টিউব বা সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়ে গেছে এবং কারুর সঙ্গে কারুর যোগ কোথাও নেই। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য, লণ্ডনের ওয়াটারলু এবং সিটি লাইনের মত এরা বরাবরই মাটির তলায়; গাড়ী কোথাও ভূপৃষ্ঠ ভেদ করে ওপরে ওঠে না। রাত্রিতে সব গাড়ীই মাটির নীচে লাইনের ওপর

দাঁড়িয়ে থেকে বিশ্রাম নেয়। শুধু মেরামতের প্রয়োজন হলে তাঁদের ক্রেনে (crane) করে মাটির ওপরে সংরক্ষণালয়ে (maintenanee depot) নিয়ে আসা হয়।

এই রেলে বছরে পৌনে ৩ কোটির মত লোক চলাচল করে। গাড়ীগুলো ২ কামরার। ভীড়ের সময় ৩ মিনিট অন্তর গাড়ী ছাড়ে। সাড়ে ছয় মাইল পথ অতিক্রম করতে ২৮ মিনিটের মত সময় লাগে। গতিবেগ মোটামুটি ঘণ্টায় ১৪ মাইলের মত। পরীক্ষামূলকভাবে তিন-কামরার গাড়ীও কিছু কিছু চালু আছে। গাড়ীগুলো লাল রঙের, এক একটিতে ৪২ জন বসে এবং ৪২ জন দাঁড়িয়ে যেতে পারে। পূর্বে বাষ্পীয় ইঞ্জিনচালিত গাড়ী ছিল; ব্রিটিশ রেলওয়েজ-এর দৌলতে এখন বিদ্যুৎবাহিত। প্রতিটি ষ্টেশন ১২০ ফুট লম্বা, ১৫ ফুট পাশে—সিঁড়ির সাহায্যে রাস্তার ওপরের টিকেট-ঘরের সঙ্গে যুক্ত।

নরওয়ে :

অসলো (Oslo) : নরওয়েতে একটি মাত্র নগরে পাতাল রেল আছে, তা' হল এর রাজধানী অসলোতে। সমুদ্র থেকে ৬০ মাইলেরও বেশী দূরে অবস্থিত এই শহর; কিন্তু একটি গভীর ফিয়র্ডের মুখে অবস্থিত হওয়ায় প্রবল শীতেও এখানে জাহাজ চলাচল করে। এর পাতাল রেল নির্মাণ সংস্থা গঠিত হয় ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে—অবশ্য রেলের পরিকল্পনা 'প্রথম অনুমোদিত হয় ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে। এই পরিকল্পনায় দুটি শাখা লাইনের ব্যবস্থা ছিল, পূর্বতন ছোট রেলের পথ (alignment) ধরেই এদের তৈরি করার কথা হয়। এছাড়া,একটি তৃতীয় লাইন নির্মাণেরও কথা হয়—এটিকে একেবারে শহরের মাঝ পর্যন্ত নিয়ে আসা হবে। পূর্বের ছোট লাইনগুলো ভূ-পৃষ্ঠে অবস্থিত। 'Grorud' নামক লাইনটির দৈর্ঘ্য ৯½ কিলোমিটার (৫½ মাইল—এর মধ্যে ১½ মাইল পাথরের সুড়ঙ্গপথ এবং মাত্র ½ মাইল কংক্রীট-নির্মিত সুড়ঙ্গ)। **Carl Berner Pass** নামে একটি ষ্টেশন সম্পূর্ণ প্রস্তরনির্মিত। এর টিকেটঘর ও প্ল্যাটফরম একই স্তরে (level) অবস্থিত। ১৯৬৫ খ্রীঃ-এর শেষে তিনটি লাইনের নির্মাণই সমাপ্ত হবার কথা ছিল। **Hellerud** থেকে **Tventen** পর্যন্ত আরো একটি শাখা ১৯৬৬ খ্রীঃ-এর মধ্যে শেষ করার কথা ছিল।

অসলোতে সুড়ঙ্গ তৈরি করতে বেশ বেগ পেতে হয়েছে। সুইডেনের রাজধানী ষ্টক-হোমের মত এখানেও শহরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ থেকে উত্তর-পূর্ব প্রান্ত পর্যন্ত মাটির তলায় পাথরের সারি চলে গেছে। পাথরের ফাঁকে ফাঁকে নরম কাদার অবস্থিতি লাইন তৈরীতে আরো অসুবিধা ঘটিয়েছে। তাছাড়া, পাথরের বিন্যাসও ভঙ্গুর। জলের চাপে লাইনের স্তর ওপরে উঠে যাবার ভয় থাকায় কোথাও কোথাও জলের রেখার নীচে দিয়ে কংক্রীট টানেল করতে হয়েছে।

ছয়-কামরা পর্যন্ত গাড়ী চলার ব্যবস্থা আছে। ষ্টেশন প্ল্যাটফরমগুলো ১১০ মিটার (৩৬১) ফুট লম্বা। ঘণ্টায় ৪০টি পর্যন্ত গাড়ী চলবার মত সিগন্যাল-ব্যবস্থা থাকলেও প্রথম প্রথম ভীড়ের সময় ঘণ্টায় ৩০ খানা করে গাড়ী চালাবার কথা হয়। প্রথমে সর্বসাকুল্যে ৬০টি পুরো ইস্পাত-নির্মিত গাড়ী ছিল। এরা জোড়ায় জোড়ায় চলবে—প্রথম কামরায় ৬৩ জন এবং দ্বিতীয়টিতে ৬০ জনের পাশাপাশি বসবার ব্যবস্থা আছে। উভয়েতেই ১০৭ জন করে দাঁড়িয়ে যাবার ব্যবস্থাও আছে। প্রতি কামরার দৈর্ঘ্য ১৭ মিঃ (৫৫ ফুঃ ৯ ইঃ) এবং উচ্চতা ৩·৬৫ মি (১২ ফুট)—দুই-ই অন্যান্য পাতাল রেলের মত; কিন্তু প্রস্থ তাদের অনেকের তুলনায়ই বেশী—৩·২ মিঃ (১০ ফুঃ ৬ ইঃ)। সর্বোচ্চ

গতিবেগ ঘণ্টায় ৮০ কিমি (৫৯ মাইল) পর্যন্ত হতে পারে। প্রবল শীতের জন্য শীতকালে গাড়ীগুলোকে ঢেকে রাখতে হয়। 'Ryen'-এর শেডগুলিতে ১২০টি গাড়ী এভাবে রাখার ব্যবস্থা আছে।

সুইডেন :

ষ্টকহোম : নরওয়ের মত সুইডেনেও একটি মাত্র শহরেই পাতাল রেল আছে এবং তা' রাজধানী ষ্টকহোমে। এই শহরে নিযুতাধিক লোকের বাস। পাথুরে জমির ওপর তৈরী গোটা শহরটাতেই ভূপৃষ্ঠ-পরিবহনের বেশ অসুবিধা দেখা যায়; কারণ বেশ কিছু গভীর পয়ঃপ্রণালী শহরের মাঝ বরাবর চলে গেছে। (কোন কোন ক্ষেত্রে এরা পাতালপথেও প্রতিবন্ধক)। শহরটির পুনর্গঠনের পরিকল্পনা শুরু হয় ১৯৩০ খ্রীঃ-এ; কিন্তু ১৯৫১ খ্রীঃ-এর পূর্বে ব্যাপকভাবে কার্য শুরু করা হয়নি—দ্বিতীয়োক্ত বৎসরেই একটি চতুর্বার্ষিকী পরিকল্পনা গৃহীত হয়। পাতাল রেল এই পরিকল্পনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। এই পাতাল রেলের দুটি অংশ—একটি পশ্চিমে Hasselby থেকে আরম্ভ হয়ে শহরের কেন্দ্র দিয়ে চলে গিয়ে দক্ষিণে তিনটি শাখায় **Hagastra, Farstra** এবং **Bagarmossen** পর্যন্ত বিস্তৃত; অপরটি পূর্বে **Ropsten** থেকে শুরু হয়ে শহরের প্রধান পয়ঃপ্রণালীর নীচে দিয়ে প্রথম লাইনের সমান্তরাল হয়ে গেছে এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে দুটি শাখায় **Varberg** এবং Fruargen পর্যন্ত বিস্তৃত। **Farstra** শাখাটিকে Strand পর্যন্ত বিস্তৃত করার পরিকল্পনাও এর অন্তর্ভুক্ত ছিল।

প্রথম লাইনের দৈর্ঘ্য ৪০ কিমি (২৫ মাইল) এবং দ্বিতীয় লাইনের ২০ কিমি (১২½ মাইল)। ভীড়ের সময় গাড়ীগুলি ২ মিনিট অন্তর যাতায়াত করে, আর অন্য সময় ৩ মিনিট থেকে ৬ মিনিট অন্তর। গড় গতিবেগ ঘণ্টায় ৩১ কিমি (১৯½ মাইল); প্রতি ষ্টেশনে থামবার সময় গড়ে ৩০ সেকেণ্ড। প্রতি লাইনে প্রতি ঘণ্টায় গড়ে ৩৬,০০০ যাত্রী চলাচল করতে পারে। প্রতিদিন পুরনো লাইনটিতে (১ নং লাইন) ৫ লক্ষেরও বেশী লোক যাতায়াত করে। মোট ৫৮টি ষ্টেশনের মধ্যে ১৩টি একদম মাটির তলায় এবং ২টি আংশিক মাটির নীচে। মাটির নীচের ষ্টেশন-গুলোতে ভূতল (sub-surface) টিকেটঘর ও প্রবেশপথ এবং নিকটবর্তী প্রাসাদসমূহ থেকে প্ল্যাটফরমে আসবার জন্য কোথাও কোথাও চলমান সিঁড়ি (এস্‌ক্যালেটরও) আছে।

ষ্টকহোমের ওপরের মাটির অনেকটাই পাথর বা মোরেনে (**moraine**) গঠিত; তার ফাঁকে ফাঁকে আবার কাদামাটিও আছে (বিশেষ করে শহরের পশ্চিম উপকণ্ঠে)। তাছাড়া বালিতে ঘেরা কাঁকরমাটিও আছে (বিশেষ করে শহরের মাঝ বরাবর এবং Gamla'য় উপকূল অঞ্চলে)। কোথাও কোথাও এই শহরের মাটি এমন যা' লোহা ও ইস্পাতের পরম শত্রু। মাটির নীচের পাথর কোথাও গ্র্যানাইট, কোথাও সবুজপাথর, কোথাও গ্রস্ত উপত্যকার মোরেনে ভরতি। যেখানে যেখানে সম্ভব, পাথরের সুড়ঙ্গ তৈরি করা হয়েছে—অবশ্য মাটির বেশ নীচে দিয়ে। কিন্তু মৃত্তিকার বিভিন্নতার জন্য বিভিন্ন অভিনব উপায়ে সুড়ঙ্গপথ নির্মিত হয়েছে।

গাড়ীগুলোর মোট ৬০০ কামরা—৪ শ্রেণীতে বিভক্ত। সবগুলির বড়ই সবুজ। পুরনো কামরাগুলিতে ৪৮ জন বসতে পারে এবং ৯০ থেকে ১০৮ জন পর্যন্ত দাঁড়িয়ে যেতে পারে। এদের ওজন প্রতিটির ২৮·২ থেকে ৩০·১ টন। নতুন কামরাগুলো (১৫০ খানা) অনেক হাল্কা—প্রতিটির ওজন মাত্র ২৩·৬ টন; কিন্তু বসতে পারে ঐ ৫৮ জন এবং দাঁড়াতে পারে ১০৮ জন। বসবার ব্যবস্থা পার্শ্বিক (**lateral**)। (ক্রমশঃ)

প্রার্থনা

'অবধূত চট্টোপাধ্যায়'

আমাকে আজ জাগাও তোমার
সেই সুরে
মূর্ছনা যার ছুটে বেড়ায়
এ দূর থেকে ঐ দূরে !
বাণীটা যার মর্ত ছেড়ে
ওঠে বিরাট আকাশ ফেঁড়ে
প্রতিধ্বনি বেড়ায় ফিরে
এই জগতের শেষ ঘুরে !
আমাকে আজ জাগাও তোমার
সেই সুরে ॥

ছন্দে আমার কাঁপাও শিথিল
পৃথ্বীকে
মাতন লাগুক আসা-যাওয়ার
দুই দিকে।
স্বর্গলোকের দুর্গদ্বারে
ঝঞ্ঝা জাগুক এ ঝঙ্কারে,
জরা, ব্যাধি, ধুলোর মতো
দিক্-বিদিকে যাক্ উড়ে !
আমাকে আজ জাগাও তোমার
সেই সুরে ॥

শুধাই তোমায়

শ্রীমতী প্রীতিময়ী কর, ভারতী

সংসার-তাপে দগ্ধ এ পথে
কোথা তব ছায়া-তরু ?
সুধা-সাগরের কোথা কলধ্বনি,
এ যে দুস্তর মরু !
দিনশেষে তব দিয়ে হাতছানি
নিভৃত করুণা-কুলায়েতে টানি
নেবে তুমি যদি তবু কেন হৃদি
সংশয়ে দুরু দুরু ?
জানি আমি জানি, সে পরশখানি
আসে কত ক্ষণে ক্ষণে,
ভ্রম আবরণে না হেরি' নয়নে,
অনুভূতিহীন মনে।

তোমারি রচিত এই ধরণীর
দেওয়া পাওয়া শেষ যবে,
বাঁশরীর সুরে সে যমুনাতীরে
পারের তরী কি রবে ?
আমি অনুক্ষণ দেখি এ স্বপন
যে বীজ জীবনে করেছো রোপণ,
হবে কি সফল, ধরি' ফুল ফল ?
সেদিন আসিবে কবে ?

শ্যামপুকুরে কালীপূজা

স্বামী প্রভানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন কালীময়, তাঁর সাধনকালে জগজ্জননী মাকালীর সঙ্গে নিত্য বোঝাপড়া, সাধনোত্তরকালে মাকালীর সঙ্গে নিত্য লীলা-বিলাস। শ্রীরামকৃষ্ণ মাকালীর অবতার।[১] শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবরূপে কালী, আগ্যাশক্তি, অনন্তরূপিণী। তিনিই 'আত্মারামের আত্মা কালী'। তিনিই ত্রিগুণধারিণী জগদ্ধাত্রী। "বিশ্বজননী লীলাময়ী কালীই শ্রীরামকৃষ্ণবিগ্রহ ধারণ করিয়া তাঁহার অসংখ্য পুত্রকন্যাগণকে জ্ঞানভক্তি দিবার জন্য অবতীর্ণ।"[২]

জগজ্জননী মাকালীই মানুষ হয়ে, অবতার হয়ে ভক্তদের নিয়ে ভক্তদের জন্য এসেছেন। মানুষের সাজে, মানুষের মাঝে এসেছেন, তাঁকে চেনা কঠিন। 'মানুষ হয়েছেন ত ঠিক মানুষ। সেই ক্ষুধা-তৃষ্ণা, রোগ-শোক, কখনও বা ভয়—ঠিক মানুষের মত।' অপর দশজনের মত তাঁর শরীর আধি-ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়, ব্যাধির প্রাবল্যে তাঁর সুঠাম শরীর শীর্ণ দীর্ণ হয়। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে শ্রীরামকৃষ্ণের কণ্ঠরোগের লক্ষণ দেখা যায়। রোগ ক্রমেই জটিল আকার ধারণ করে। চিকিৎসায় বিশেষ সুফল পাওয়া যায় না, উপরন্তু অগাস্ট মাসে তাঁর কণ্ঠতালু হতে প্রচুর রক্তক্ষরণ ভক্তগণকে ভাবিত করে। ভক্তগণ যুক্তিবিচার করে প্রস্তাব করেন, শ্রীরামকৃষ্ণের কণ্ঠরোগের সুচিকিৎসার জন্য তাঁকে কলকাতায় নেওয়া দরকার। বালকস্বভাব শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর ছেড়ে কলকাতায় বাস করতে রাজী হন।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কলকাতায় চলে আসেন ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ২৬শে সেপ্টেম্বর[৩] শনিবার সকাল বেলা। বাগবাজারের দুর্গাচরণ মুখার্জি স্ট্রীটের স্বল্প-পরিসর বাড়ী ঠাকুরের পছন্দ হয় না। তিনি নিকটবর্তী বলরাম বসুর বাড়ীতে ওঠেন। ঠাকুরের কলকাতায় অবস্থানের সংবাদ প্রচার হতেই বলরামভবনে ভক্তের মেলা যেন বসে যায় ইতিমধ্যে কয়েকজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসক গঙ্গাপ্রসাদ, গোপীমোহন. দ্বারকানাথ, নবগোপাল প্রভৃতি ঠাকুরকে পরীক্ষা করেন। তাঁরা ঘোষণা করেন ব্যাধি দুরারোগ্য। ইংরাজ ডাক্তারও রোগমুক্তি সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেন। নিরূপিত হয় ব্যাধি রোহিণী অর্থাৎ ক্যানসার।

ভক্তগণ নিকটবর্তী শ্যামপুকুর অঞ্চলে একটি পছন্দমত বাড়ীর সন্ধান করতে থাকেন। শ্যামপুকুর পল্লী শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ পরিচিত। এই পল্লীতে কাপ্তেন বা বিশ্বনাথ উপাধ্যায়, প্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, কালীপদ ঘোষ, মাষ্টার বা মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, ছোট নরেন প্রভৃতি ভক্তগণের বাস ছিল। ঠাকুর এই সব ভক্তের বাড়ীতে কয়েকবার গিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত গোকুলচন্দ্র ভট্টাচার্যের বৈঠকখানা বাড়ী ভাড়া নেওয়া হয়। শ্যামপুকুর স্ট্রীটের উত্তর দিকে এই বাড়ী।[৩] তখনকার ঠিকানা ছিল ৫৫ নং শ্যামপুকুর স্ট্রীট। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এই ভাড়াবাড়ীতে আসেন ২রা

১ Sister Nivedita's letter dated 16.3.1899 to Miss Mcleod: "The Mother says that Sri Ramakrishna told her that Swami was……a direct incarnation of the National God and He Himself of Kali."

২ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ: শ্রীরামকৃষ্ণতত্ত্বাভাস। উদ্বোধন, ৮ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা

অক্টোবর, সন্ধ্যার পর। সেদিন ছিল শুক্রবার, ১০ই আশ্বিন, ১২৯২ সন।[৪] গঙ্গা থেকে বেশ কিছুটা দূর হলেও, বাড়ীখানি ঠাকুরের পছন্দ হয়।

একখানি লম্বা ঘর সর্বসাধারণের জন্য নির্দিষ্ট হয়। সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠেই দক্ষিণ-ভাগে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত ঘরগুলিতে যাবার পথ। প্রথমেই 'বৈঠকখানা' নামে পরিচিত সুপ্রশস্ত ঘর-খানিতে ঢোকার দরজা। এই ঘরখানি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জন্য নির্দিষ্ট হয়। বৈঠকখানার পশ্চিমে ছোট ছোট দুখানি ঘর—একটি ভক্তদের জন্য, অপরটি শ্রীমাতাঠাকুরানীর রাত্রিবাসের জন্য। বৈঠকখানা ঘরে যাবার পথে পূর্বদিকে ছাদে উঠার সিঁড়ি। ছাদে যাবার দরজার পাশে চার বর্গহাত পরিমাণ একটি আচ্ছাদনযুক্ত চাতাল।

শ্যামপুকুরের এই বাড়ী অবতারপুরুষ শ্রীরাম-কৃষ্ণের প্রাগন্ত্যলীলাভূমি। এই লীলাক্ষেত্রে তাঁর অবস্থান দুই মাস নয় দিন মাত্র। তিনি কাশীপুর উদ্যানবাটীতে যান ১১ই ডিসেম্বর। এখানকার লীলাবাসর কত না আনন্দস্মৃতির সঙ্গে জড়িত। দিনগুলি ভক্তি-ভাব-রসে জারিত। এখানেই শ্রীরামকৃষ্ণ বিজ্ঞানাভিমানী ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারকে কৃপা করেন, বলেন, "(তুমি) শুষ্ক—তুমি রসবে।" তাঁর পুত্রকে ডেকে বলেন, "বাবা, আমি তোমার জন্য এখানে এসেছি।" এখানেই ভক্তপ্রবর বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ঘোষণা করেন—ঢাকাতে অলৌকিকভাবে তাঁর শ্রীরামকৃষ্ণ-দর্শন। এখানেই খৃষ্টান প্রভুদয়াল মিশ্র ঠাকুরের শরণাগতি নেন। এখানেই কৃপাকাতর বিনোদিনী সাহেব সেজে ঠাকুরের দর্শনলাভে সমর্থ হন। এখানে কত কত নূতন ভক্ত উপস্থিত হন। অবতারের লীলাবিলাসের অমিয় স্মৃতিতে পরিপূর্ণ এখানকার দিনগুলি।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শ্যামপুকুর বাড়ীতে এসে-ছিলেন কণ্ঠরোগের চিকিৎসার জন্য। তাঁর আগমনবার্তা লোকমুখে রাষ্ট্র হয়। পরিচিত-অপরিচিত লোক দলে দলে উপস্থিত হয়। তাঁর কাছে এলেই লোকের শান্তি ও আনন্দ। আনন্দ-পুরুষের সান্নিধ্য, তাঁর কৃপালাভের জন্য লোকের ভীড় লেগে যায়। অহেতুককৃপাসিন্ধু! তাঁর দয়ার ইয়ত্তা নাই—সর্বদাই তাঁর একমাত্র চেষ্টা কিসে লোকের মঙ্গল হয়। মনে হয় শহরের লোকদের বিশেষভাবে কৃপা করার জন্যই যেন তিনি কলকাতায় বাস করছেন। সুপ্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথ ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার চিকিৎসা শুরু করেন। ব্যাধির স্থায়ী প্রশমন হয় না। ঠাকুরের সুঠাম শরীর শীর্ণ দীর্ণ হয়ে যায়। গলার ক্ষত হতে পুঁজ রক্ত ঝড়তে থাকে। কিন্তু সে বিষয়ে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ভ্রূক্ষেপমাত্র নাই। তিনি অকাতরে কৃপা বিতরণ করতে থাকেন। তিনি যে

---

৩ এই তারিখ দুটি সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর লেখা "শ্যামপুকুর বাটীতে কালীপূজা" প্রবন্ধ (উদ্বোধন ৬১ বর্ষ, ৬৩৯ পৃঃ) হতে গৃহীত। এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য যে, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ (২য় খণ্ড, ১৭৮ পৃঃ) বলেন, ঠাকুর দুর্গামহাষ্টমীর প্রায় একমাস পূর্বে শ্যামপুকুরে আসেন। লাটু মহারাজের স্মৃতিকথা (পৃঃ ২৩৪) ও লীলাপ্রসঙ্গ (৫ম খণ্ড, ২৯৬ পৃঃ) অনুসারে ঠাকুর বলরামভবনে মাত্র সাত দিন বাস করেন। সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বলেন, তিনি কথামৃতকারের দিনলিপি থেকে তারিখ দুটি পেয়েছেন।

৪ পরবর্তীকালে এই বাড়ীর অনেক পরিবর্তন ঘটে। ৫৫।এ ও ৫৫বি, দুটি প্রাঙ্গণে বিভক্ত হয়। মাঝখানে দাঁড়িয়ে উঁচু টিনের প্রাচীর। বর্তমানের ৫ এ প্রাঙ্গণটিতে শ্রীরামকৃষ্ণ বাস করেছিলেন। তিনি দোতলায় যে হল ঘরটিতে বাস করতেন সেটা বর্তমানে একাধিক কক্ষে বিভক্ত। দোতলায় ওঠার একটি পৃথক সিঁড়িও তৈরী হয়েছে।

অবতার। অবতার ঈশ্বরের অনুগ্রহশক্তি, অবতার আসেন তারণ করতে। তারণ করাই তাঁর অনুগ্রহ, অনুগ্রহ-বিতরণ যেন তাঁর বিষম এক দায়। "যার দায় সেই জানে, পর কি জানে পরের দায়।"—অবতারের এই আকুতি চিকিৎসক বোঝে না, সেবকগণ মানতে চায় না। কৃপাদাতা দয়াল ঠাকুরের কৃপাবিতরণ দেখে সবাই মুগ্ধ হয়।

রোগীর সেবাশুশ্রূষার জন্য নরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে কয়েকজন যুবকভক্ত এগিয়ে আসেন। লাটু, গোপাল (ছোট), কালী, শশী, শরৎ প্রভৃতি কয়েকজন 'জীবনোৎসর্গ করিয়া সেবাব্রত' আরম্ভ করেন। রোগীর পথ্য প্রস্তুত করার জন্য শ্রীমাতাঠাকুরানী দক্ষিণেশ্বর থেকে আসেন, অসংখ্য অসুবিধা অগ্রাহ্য করে ঠাকুরকে রোগমুক্ত করার আশায় বুক বেঁধে কায়মনোবাক্যে তাঁর সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। সুচিকিৎসার ব্যবস্থা হয়, সুষ্ঠু সেবাযত্নের বিধিব্যবস্থা হয়, কিন্তু ব্যাধির প্রাবল্যের ঝাপটা-হাওয়াতে সেবক ও ভক্তদের আশাদীপ কেঁপে কেঁপে উঠে।

শারদীয়া দুর্গোৎসবে বাংলাদেশ মেতেছে। কলকাতার পল্লীতে পল্লীতে আনন্দের ছড়াছড়ি। ভক্ত 'সুরেন্দর' ঠাকুরের অনুমতি নিয়ে প্রতিমায় দুর্গাপূজার আয়োজন করেছেন। মহাষ্টমীর রাতে সন্ধিপূজার সময় ঠাকুর হঠাৎ ভাবাবেগে দাঁড়ান। নরেন্দ্র, কালীপ্রসাদ, লাটু, নিরঞ্জন ও অন্য ভক্তগণ ঠাকুরের শ্রীচরণে পুষ্পাঞ্জলি দেন। ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন।[৫] ঠিক সেই সময়ে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সূক্ষ্মশরীরে জ্যোতির্বর্ত্ম ধরে সুরেন্দ্রের দুর্গামণ্ডপে উপস্থিত হন, সুরেন্দ্র তাঁকে দুর্গাপ্রতিমার পাশে দেখতে পান। পূজামণ্ডপের পরিবেশ আনন্দঘন হয়ে উঠে। ভক্তগণ বিমোহিত হন।

ক্রমে আসে কোজাগর পূর্ণিমা। আনন্দময় ঠাকুর ভাবচক্ষে দেখেন, "চতুর্দিকে আনন্দের কোয়াসা।" ভাব গভীর হলে সমাধিস্থ হন, আবার ভাবচক্ষে দেখেন, ভয়ঙ্করা কালকামিনী মূর্তি, যেন বলছে, 'লাগ্! লাগ্! লাগ্ ভেলকী লাগ্!' সত্যিই যেন ভেলকী! শরীরে দুরারোগ্য ব্যাধি, অসহ্য যন্ত্রণা, রক্তক্ষরণে শরীর অতি দীর্ণ, কিন্তু দেহবিবিক্ত যোগী পুরুষ সদাসর্বদা ঈশ্বররসে ভাসছেন, ডুবছেন। তিনি নিজমুখে বলেন, "কিন্তু দেখছি যে এটা আলাদা।...নারকেলের জল সব শুকিয়ে গেলে মালা আলাদা, শাঁস আলাদা হয়ে যায়। তখন নারকেল টের পাওয়া যায়—ঢপর ঢপর করছে।"[৬] রসস্বরূপ আনন্দস্বরূপ সর্বদাই আনন্দে ভাসছেন, অনুগ্রহ করে অপরকে আনন্দ দান করে আনন্দলাভ করছেন।

এগিয়ে আসে আশ্বিন-অমাবস্যা। ৺শ্যামপূজার প্রস্তুতি চলতে থাকে ঘরে ঘরে, পল্লীতে পল্লীতে। ভক্ত দেবেন্দ্রনাথের অনেকদিনের বাসনা প্রতিমা গড়ে শ্যামাপূজা করেন। নানা কারণে বাসনা পূর্ণ হয়নি। আবার অপূর্ণ বাসনার উদয় হয়। ভাবেন জগজ্জননীর আদরের সন্তান ঠাকুরের উপস্থিতিতে প্রতিমায় শ্যামাপূজা করতে পারলে জীবন সার্থক হয়। বিশেষ দিনে বিশেষতঃ কালীপূজার দিনে ঠাকুর ভাবের ঘোরে ভাসতেন। ভাবের আধিক্যে ব্যাধির বৃদ্ধি আশঙ্কা করে ভক্তগণ দেবেন্দ্রের প্রস্তাব নাকচ করেন।

ভাবগ্রাহী ভগবান। ভক্তের আর্তিতে তিনি সহজেই সাড়া দেন। অচিন্ত্য উপায়ে ভক্তের শুদ্ধ বাসনা পূরণ করেন। শ্যামপুকুর বাটীতেও শ্যামাপূজার প্রস্তুতি চলতে থাকে। প্রস্তুতি চলে

৫ স্বামী অভেদানন্দ: আমার জীবনকথা, পৃঃ ৭৬

৬ কথামৃত ৪।২২।২

গোপনে। আদরিণী শ্যামা মাকে গোপনে ডাকতে হয়। গোপনে জানাতে হয় হৃদয়ের আকুতি। প্রতিমাতে কি আর জগজ্জননীকে ধরা যায়? মাতৃসাধক গেয়েছেন:

"মায়ের মূর্তি গড়তে চাই মনের ভ্রমে মাটি দিয়ে।
মা বেটি কি মাটির মেয়ে, মিছে খাটি মাটি নিয়ে॥"

আদরিণী শ্যামা মা ভাবেতে ধরা দেন। ভাবের মূর্তিতেই আত্মপ্রকাশ করেন।

শ্যামপুকুর বাটীতে শ্যামাপূজার প্রস্তুতি চলেছিল। শ্যামাপূজার দিন বিশেষভাবে পূজানুষ্ঠানের জন্য ভাবের প্রতিমা তৈরী হচ্ছিল। শ্যামাপূজার পূর্বদিন উপস্থিত কয়েকজন ভক্তকে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, "পূজার উপকরণ সকল সংক্ষেপে সংগ্রহ করে রাখিস—কাল কালীপূজা করিতে হইবে।"[৭] শ্যামাপূজা হবে, এই সংবাদ রাষ্ট্র হয়ে যায়। সংবাদে ভক্তগণ উৎফুল্ল হয়ে উঠেন। কিন্তু পূজার আয়োজন সম্বন্ধে বিস্তারিত নির্দেশ না থাকায় ব্যবস্থাপকগণ নানা জল্পনা করতে থাকেন। কোন স্থির সিদ্ধান্ত হয় না। শেষকালে মুরুব্বি ভক্তগণ স্থির করেন, গন্ধপুষ্প ধূপ-দীপ, ফলমূল ও মিষ্টান্ন জোগাড় করা যাক,[৮] পরে ঠাকুর যেমন নির্দেশ দিবেন তেমন করা যাবে। বীরভক্ত কালীপদ ঘোষ পূজোপকরণ সংগ্রহের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। নিকটে ২০ নং শ্যামপুকুর লেনে তাঁর বাড়ী। তাঁর কর্মতৎপরতা ভক্তমহলে সুবিদিত। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জনৈক জীবনীকার লিখেছেন যে, শ্যামপুকুরে ঠাকুরের অবস্থানকালে "তিনি পরমহংসদেবের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন।" ঠাকুর তাঁকে ডাকতেন ম্যানেজার। নরেন্দ্রনাথ তাঁর নাম দিয়েছিলেন দানাকালী। তিনি পরম উৎসাহে শ্যামাপূজার আয়োজন করতে তৎপর হন।

এদিকে ঠাকুরের দেহের ব্যাধির বাড়াবাড়ি চলেছিল। শ্যামাপূজার পূর্বদিন ডাক্তার প্রতাপ-চন্দ্র চিন্তিত হয়ে ঔষধের পরিবর্তন করেন। তিনি এক দাগ নক্সভমিকা ঔষধ দেন। মনে হয় এই ঔষধসেবনে কোন উপকার হয় না।[৯] কণ্ঠপীড়ার বাড়াবাড়ি চলেছে, সেদিকে ঠাকুরের যেন কোন খেয়ালই নেই। 'হাড়মাসের খাঁচা' শরীরের প্রতি তাঁর বরাবরই অবজ্ঞা। বিস্মিত ভক্তসেবক নিজস্ব প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেছেন। "ঠাকুরের মনের আনন্দ ও প্রফুল্লতা কিছুমাত্র হ্রাস না পাইয়া বরং অধিকতর বলিয়া ভক্তগণের নিকট প্রতিভাত হইল।"

উপস্থিত হয় শ্যামাপূজার দিনটি। সেদিন ৬ই নভেম্বর, ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ, শুক্রবার। প্রাতঃকাল থেকেই চিত্তহৃদসুধাতে মহানন্দে বিহার করতে থাকেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁকে ঘিরে থাকে ভাবঘন-দ্যুতি।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের আদেশে মহেন্দ্র মাষ্টার

৭ স্বামী সারদানন্দ: শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ৩৩১। স্বামী অভেদানন্দ তাঁর "আমার জীবনকথা গ্রন্থে (পৃঃ ৭৭) লিখেছেন, "কাল মা কালীর পূজা করতে হবে। সংক্ষেপে পূজার উপকরণগুলি আয়োজন করে রাখিস।" শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথিকার বলেন, কালীপূজা নিকটবর্তী হলে কোনও একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ মাষ্টারকে পূজার আয়োজন করতে বলেন।

৮ বৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যাল: শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলামৃত, পৃঃ ১৮৭, "প্রভু ভক্তগণকে কহিলেন,··· তোমরা সাত্ত্বিকভাবে তাঁহার পূজার আয়োজন কর।" এ ছাড়াও ঠাকুরের সুস্পষ্ট নির্দেশ না থাকায় এবং ঠাকুরের শরীরের অত্যধিক অসুস্থতা বিবেচনা করে ভক্তগণ সংক্ষেপে পূজোপচার সংগ্রহ করেন, এরূপ মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে।

৯ পরদিন ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার রোগীর সমস্ত বিবরণ শুনে প্রতাপচন্দ্রের ঐ ঔষধের সম্বন্ধে আপত্তি জানিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করেন।

সকালবেলাতে ঠনঠনের ৺সিদ্ধেশ্বরী কালীমাতাকে ফুল ডাব চিনি সন্দেশ দিয়ে পূজা দিয়েছেন। স্নান করে পূজা দিয়েছেন। নগ্নপদে ঠাকুরের কাছে মায়ের প্রসাদ এনে দিয়েছেন। ঠাকুর ভক্তিভরে দাঁড়িয়ে সামান্য প্রসাদ গ্রহণ করেন। ঠাকুরের পরিধানে শুদ্ধ বস্ত্র, কপালে চন্দনের ফোটা—মনোমোহন তাঁর মূর্তি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ঠাকুরের আদেশে মাষ্টার রাম-প্রসাদের ও কমলাকান্তের গানের বই কিনে এনেছেন, ঠাকুর ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারকে উপহার দিবেন।

চটিজুতা পায়ে ঠাকুর ঘরের মধ্যে পায়চারি করেন, সঙ্গে মাষ্টার। রামপ্রসাদের শ্যামাসঙ্গীত নিয়ে কথা হয়। তিনি রামপ্রসাদের চারটা গান বাছাই করেন। মাষ্টারকে বলেন যে ঐ ধরনের গানের ভাব ডাক্তার সরকারের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, "আর ও গানটাও বেশ!—'এ সংসার ধোঁকার টাটি।' আর 'এ সংসার মজার কুটি! ও ভাই আনন্দ বাজারে লুটি'।" বিজ্ঞানী শ্রীরামকৃষ্ণের মনোভাব সুস্পষ্ট এই গানের কলিতে। তাই এতে তাঁর আনন্দ।

হঠাৎ ঠাকুরের শরীরের মধ্যে চমক্ খেলে যায়। তিনি চটিজুতা ছেড়ে স্থিরভাবে দাঁড়ান। গভীর সমাধিতে স্থাণুবৎ অবস্থান করেন। বেশ কিছুক্ষণ পরে তিনি অতি কষ্টে ভাব সংবরণ করেন।

দোতলার 'বৈঠকখানা' ঘরের পশ্চিমভাগে দেয়ালের পাশে একটি বিছানা পাতা। বিছানার উত্তরাংশে তাকিয়ার মত উঁচু গোছের একটি বালিশ।[১০] অনেক সময় ঠাকুর তাতে হেলান দিয়ে উত্তরমুখী হয়ে অর্ধশায়িত অবস্থায় বিশ্রাম করতেন। সেদিন বেলা দশটা নাগাদ ঠাকুর বিছানার উপর বালিশে ঠেসান দিয়ে বসেছিলেন। রাম, রাখাল, নিরঞ্জন, কালীপদ, মাষ্টার প্রভৃতি কয়েকজন ভক্ত চতুর্দিকে বসে ঠাকুরের অমৃতবাণী আগ্রহভরে শোনেন। ঠাকুর এক সময়ে মাষ্টারকে লক্ষ্য করে বলেন, "আজ কালীপূজা, কিছু পূজার আয়োজন করা ভাল। ওদের একবার বলে এস। পাঁকাটি এনেছে কিনা জিজ্ঞাসা করো দেখি।"[১১] ইতিমধ্যে মাষ্টার ও রাখাল ভিন্ন অপর সকলে অন্য ঘরে চলে গিয়েছিলেন। মাষ্টার পাশের ঘরে গিয়ে ঠাকুরের আদেশ সকলকে জানান।

অন্যান্য দিনের মত অপরাহ্ণ প্রায় দুটার সময় ডাক্তার সরকার উপস্থিত হন। সঙ্গে বন্ধু নীল-মণি সরকার। সে সময় ঠাকুরের ঘরে উপস্থিত ছিলেন গিরিশচন্দ্র, কালীপদ, মাষ্টারমশাই, নিরঞ্জন, রাখাল, মণীন্দ্র, লাটু প্রভৃতি অনেকে। প্রারম্ভিক কথাবার্তার পর ঠাকুরের আদেশে মাষ্টার গানের বই দুটি ডাক্তার সরকারকে উপহার দেন। যদিও ডাক্তার সরকার মা কালীকে বলেছিলেন 'সাঁওতাল মাগী', শ্যামাসঙ্গীত তাঁর খুবই প্রিয়। তাঁর আকাঙ্ক্ষা ভজন-কীর্তন শোনেন। ঠাকুরের

১০ মণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্তের স্মৃতিকথা: উদ্বোধন, ৩৮ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা

১১ গিরিশচন্দ্র ঘোষ "রামদাদা" প্রবন্ধে (তত্ত্বমঞ্জরী, ৮ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা) লিখেছেন, "ঠাকুর শ্রীমান কালীপদ ঘোষ নামক একজন ভক্তকে বলিয়াছিলেন, 'আজ কালীপূজার উপযোগী আয়োজন করিও।' বৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যালের মতে ঠাকুর শ্যামাপূজার দিন ভক্তদের বলেছিলেন পূজার আয়োজন করতে। অনুমান হয় ঠাকুর পূজার পূর্বদিন ও পূজার দিন একাধিকবার একাধিক ব্যক্তিকে বলেছিলেন।

'পাকাটি'র রহস্য জানা যায় না। অনুমান করা যেতে পারে কি যে ঠাকুর হোমের জন্য প্রস্তুত হতে ইঙ্গিত করেছিলেন? হোমের বিষয় অবশ্য কেউই বলেননি।

আদেশে মাষ্টার ও একজন ভক্ত ঠাকুরের নির্বাচিত[১২] চারটি গান পর পর গান:

(১) 'মন কর কি তত্ত্ব তাঁরে, যেন উন্মত্ত আঁধার ঘরে।'

(২) কে জানে কালী কেমন ষড়দর্শনে না পায় দরশন।'

(৩) 'মন রে কৃষিকাজ জান না।'

(৪) 'আয় মন বেড়াতে যাবি, কালীকল্পতরুমূলে রে মন চারি ফল কুড়ায়ে পাবি।'

অতঃপর ডাক্তারের ইচ্ছা হয় 'বুদ্ধচরিতে'র গান শোনেন, ঠাকুরের ইঙ্গিতে গিরিশচন্দ্র ও কালীপদ যৌথকণ্ঠে গান ধরেন, "আমার সাধের বীণে, যত্নে গাঁথা তারের হার।" তারপর গান করেন, "জুড়াইতে চাই, কোথায় জুড়াই" ইত্যাদি। বুদ্ধ-গীতের পর হয় গৌরাঙ্গ-গীতি: "আমায় ধর নিতাই, আমার প্রাণ যেন আজ করে রে কেমন;" "প্রাণভরে আয় হরি বলি, নেচে আয় জগাই-মাধাই" এবং "কিশোরীর প্রেম নিবি আয়, প্রেমের জোয়ার বয়ে যায়।" যখন গায়কদ্বয় গাইতে থাকেন "প্রেমে প্রাণ মত্ত করে, প্রেম-তরঙ্গে প্রাণ নাচায়," সে সময় লাটু মণীন্দ্র এদের ভাবাবেশ হয়। তাঁরা বাহ্যজ্ঞান হারান। ক্রমে সকলে সহজ স্বাভাবিক হন। বেলা গড়িয়ে চলে। ডাক্তার ঔষধের বিধান করে বন্ধুসহ ঠাকুরের নিকট হতে বিদায় গ্রহণ করেন।

দিনমণি অস্ত যায়, অমাবস্যার সন্ধ্যা নেমে আসে। নিবিড় আঁধারের মধ্যে একাকী মহাকালী মহাকালের সঙ্গে রমণ করেন। জগদম্বার বরপুত্র ঠাকুর আজ ভাবে গর্গর মাতোয়ারা। তিনি অহর্নিশ মাকে দেখছেন, তিনি একদণ্ডও মা ছাড়া থাকতে পারেন না, তিনি যে বালক। তদুপরি আজ বিশেষ দিন, তিনি আর স্থির থাকতে পারেন না।

শ্যামা মায়ের আরাধনার ব্যাপক আয়োজন করেছেন বিশ্বপ্রকৃতি। এদিকে ঘরে ঘরে দীপান্বিতা। আলোয় আলোময় ঘরদোর রাস্তা ঘাট। জ্যোতির্ময়ী শ্যামা মায়ের অভ্যর্থনার জন্য বিপুল আলোকসজ্জা, চতুর্দিকে আলোর ঝরণাধারা, আনন্দের মৃদুমন্দ হাওয়া। ধরণী আজ উৎসব-চঞ্চল। আনন্দপিয়াসী সন্তান মায়ের বরাভয়-রূপটি দেখার জন্য ব্যাকুল। ঢাকঢোলের বাজনায় শহর পল্লী মুখরিত, দীপান্বিতার আলো ও আতসবাজির ঝলকে শহরবাসী সচকিত। ভক্ত কালীপদের উদ্যোগে শ্যামপুকুর বাটীও দীপমালায় ঝলমল করে। বাটীর ভিতরে পূজার প্রস্তুতি হতে থাকে।

রাত্রি প্রায় সাতটা। শীতের রাত। দোতলার বৈঠকখানা ঘরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বিছানায় উপবিষ্ট। কল্পনা করা যায় ঠাকুরের গায়ে সবুজ বনাতের কোট। পরনে লালপেড়ে ধুতি। পায়ে গরম মোজা। গলায় গরম গলাবন্ধ। পূর্বাস্য। পা মুড়িয়ে আসন করে বসে আছেন। শান্ত ধীর স্থির গম্ভীর। ভাব-প্রদীপ্ত প্রফুল্ল মুখমণ্ডল। অধরে হাসির রেশ। কপালে একটি চন্দনের ফোটা। উপস্থিত সকলেরই দৃষ্টি আনন্দ-পুরুষ ঠাকুরের দিকে। ঠাকুরের কাছ থেকে অন্য কোনরূপ নির্দেশ না পাওয়াতে পূজোপকরণগুলি ভূমি মার্জনা করে তাঁর সম্মুখে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। পূজার আয়োজন সম্বন্ধে পুঁথিকার লিখেছেন,

হেথা ভক্তিমতী ঘরে গৃহিণী তাঁহার।
ভোজ্যাদি নিজের হাতে করেন তৈয়ার॥

১২ সেদিন সকাল ৯টার সময় ঠাকুর নিজে এই চারটি গান বাছাই করেছিলেন এবং বলেছিলেন, 'এই গান সব ডাক্তারের ভিতর ঢুকিয়ে দেবে।' (কথামৃত, ৩।২২।১ ও ৩।২২।২ দ্রষ্টব্য)

ফুলুকা ফুলুকা লুচি সুজির পায়েস।
নূতন খেজুর-গুড়ে গোল্লা সন্দেশ॥
সাদা সন্দেশাদি আর মিষ্টান্ন বহুল।
বিল্বপত্র গঙ্গাজল ধূপদীপ ফুল॥
যাবতীয় দ্রব্যাদি জোগাড় করি ঘরে।
শুভক্ষণে দিলা আনি প্রভুর গোচরে॥
অপর দ্রব্যাদি কালী আনিলা আপনি।
সুজির পায়েস আনে তাঁহার গৃহিণী॥[১৩]

গিরিশচন্দ্র লিখেছেন, "একদিকে নানাবিধ ভোজ্য-সামগ্রী; প্রভু অন্য আহার করিতে পারিতেন না; তাঁহার জন্য বার্লিও আছে। অপরদিকে স্তূপাকার ফুল—রক্তকমল, রক্তজবাই অধিক।"[১৪] রামচন্দ্র বলেছেন, "তাঁহার (ঠাকুরের) দুই দিকে দুইটি বৃহৎ মোমের বাতি জালিয়া দেওয়া হইয়াছিল। দুই দিকে দুইটি সুবৃহৎ ধূপ হইতে সুগন্ধ ধূম উত্থিত হইতেছিল, সে সময়ে তিনি কি অপূর্বভাবে শোভা পাইতেছিলেন, তাহা প্রকাশ করিতে বাক্য পরাজয় হইয়া যায়। অপূর্বরূপ বলিলে যদ্যপি কোন ভাব লাভ করা যায় তদ্দ্বারা বুঝিয়া লউন।"[১৫] ঠাকুরের আদেশে সেবক লাটু ধূপ-ধুনা দিয়েছিলেন। এই ধরনের প্রস্তুতিতে ঠাকুর কোনরূপ অসম্মতি জানালেন না। যখন অনেকেরই ধারণা হল যে, "তিনি নিজ দেহমন-রূপ প্রতীকালম্বনে জগচ্চৈতন্য ও জগচ্ছক্তি-রূপিণীর পূজা করিবেন অথবা জগদম্বার সহিত অভেদজ্ঞানে শাস্ত্রোক্ত আত্মপূজা করিবেন।" (দিব্যভাব, ৩৩২)।

বৈঠকখানা ঘর আলোয় ঝলমল করছে। ঘরের হাওয়া ধূপ-ধুনার সৌরভে আমোদিত। পূর্বপশ্চিমে লম্বা ঘর ক্রমে ভক্তদের উপস্থিতিতে পরিপূর্ণ। ত্রিশ বা ততোধিক[১৬] ভক্ত সেখানে উপস্থিত। কেউ বসেছে ঠাকুরের কাছে, কেউ বা দূরে। মাষ্টার রাখাল প্রভৃতি কাছে বসেছেন। ঘরের পশ্চিমপ্রান্তে বসেছেন রামচন্দ্র, তাঁর নিকটে গিরিশচন্দ্র। তাছাড়া সেখানে উপস্থিত দেবেন্দ্র-নাথ, কালীপদ, শরৎ, শশী, নিরঞ্জন, ছোট নরেন, বিহারী, কালী (অভেদানন্দ), বৈকুণ্ঠ, অক্ষয় মাষ্টার, চুনীলাল। সম্ভবতঃ সেখানে উপস্থিত ছিলেন মণীন্দ্র (খোকা), মনোমোহন, বলরাম, প্রভৃতি। ঘরের বাইরে থেকে বোঝা যায় না যে এতগুলি লোক সেখানে। সবাই অনিমেষ নয়নে ঠাকুরের দিকে তাকিয়ে থাকেন, ঠাকুর কি করেন কি বলেন জানবার জন্য সবাই উন্মুখ। "কতক্ষণ ঐরূপে অতীত হইল, ঠাকুর কিন্তু তখনও স্বয়ং পূজা করিতে অগ্রসর হওয়া অথবা আমাদিগের কাহাকেও ঐ বিষয়ে আদেশ করা, কিছুই না করিয়া পূর্বের ন্যায় নিশ্চিন্তভাবে বসিয়া রহিলেন।" (দিব্যভাব, ৩৩৩,)। এক সময়ে মহেন্দ্র মাষ্টার দেখেন ঠাকুর ভক্তিভরে জগন্মাতাকে গন্ধপুষ্প নৈবেদ্য সবকিছু নিবেদন করলেন এবং মাষ্টারের দিকে তাকিয়ে ঠাকুর বলেন, "একটু সবাই ধ্যান করো।"[১৭] ভক্তগণ ধ্যান করতে

১৩ 'ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ' (পৃঃ ৪৮২) গ্রন্থে ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য লিখেছেন যে কালীপদ ঘোষের গৃহিণীর মাথা গরম ছিল, তাঁর পক্ষে এই কাজ সম্ভব ছিল না। কালীপদর কনিষ্ঠা ভগিনী মহামায়া সুজির পায়েস ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়া আনিয়াছিলেন।

১৪ তত্ত্বমঞ্জরী, ৮ম, বর্ষ ৯ম সংখ্যা, 'রামদাদা' প্রবন্ধ

১৫ রামদত্তের বক্তৃতাবলী, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৩৪০, বিষয়—শ্রীরামকৃষ্ণতত্ত্ব

১৬ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ৩০৩

১৭ স্বামী অভেদানন্দ: আমার জীবনকথা, (পৃঃ ৭৮): "ইতিমধ্যে তিনি দেবীকে পুষ্পাঞ্জলি দান করিয়া পূজার দ্রব্যাদি নিজের মধ্যে বিরাজমানা জগন্মাতাকে নিবেদন করিলেন এবং

চেষ্টা করেন। কেউ নীরদবরণী শ্যামা মাকে কেউ বা জগন্মাতার বরপুত্র শ্রীরামকৃষ্ণবিগ্রহ মানসপটে স্থাপন করেন। চতুর্দিক নীরব, নিথর। আনন্দের মৌতাতে সবাই যেন মজেছে।

পিছনে রামচন্দ্র প্রভৃতি ভক্তেরা বসেছিলেন সম্ভবতঃ রামচন্দ্রের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় যে ঠাকুর ইতিমধ্যে গন্ধ পুষ্পাদি সব জগন্মাতার উদ্দেশে নিবেদন করেছেন। তিনি বিস্ময়ে ভাবতে থাকেন, পরমহংসদেবের উদ্দেশ্য কি? পূজার আয়োজন করে এভাবে বসে আছেন কেন? একবার তাঁর মনে হয়, পরমহংসদেব কি পূজা করবেন? ভক্তদের কর্তব্য তাঁর পূজা করা। ভক্তগণ তাঁদের কর্তব্য বুঝতে পারছেন না। তিনি তাঁর ভাবনা নিম্নকণ্ঠে গিরিশচন্দ্রকে নিবেদন করেন। ভক্তশ্রেষ্ঠ গিরিশের 'পাঁচসিকে পাঁচ আনা বিশ্বাস'। রামচন্দ্রের কথা তাঁর অন্তর স্পর্শ করে। গিরিশ উৎসাহিত হয়ে বলেন, "বলেন কি? আমাদের পূজা গ্রহণ করবেন বলেই তিনি অপেক্ষা করছেন?"[১৮] ভাবের ইঙ্গিত ভাবুক গিরিশের মনে ভাবের তুফান তুলে। সেই সময়ে গিরিশচন্দ্র তাঁর মনের ভাব বর্ণনা করেছেন, "আমার অন্তর অতিশয় ব্যাকুল হইতেছে, ছটফট করিতেছে, প্রভুর সম্মুখে যাইবার জন্য আমি অস্থির। রামদাদা আমায় কি বলিলেন, আমার ঠিক স্মরণ নাই, আমার প্রকৃত অবস্থা তখন যেন নয়। কি একটা ভাবান্তর হইয়াছে, রামদাদা যেন আমায় উৎসাহ দিয়া বলিলেন, 'যাও, যাওনা।' রামদাদার কথায় আমার আর সঙ্কোচ রহিল না, ভক্তমণ্ডলী অতিক্রম করিয়া প্রভুর সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। প্রভু আমাকে দেখিয়া বলিলেন—কি, কি, এসব আজ করতে হয়। আমি অমনি 'তবে চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিই' বলিয়া দুহাতে ফুল লইয়া 'জয় মা' শব্দ করিয়া পাদপদ্মে দিলাম।"[১৯] গিরিশচন্দ্র তখন উল্লাসে অধীর, ভাবের উচ্ছ্বাসে প্রায় বেসামাল। প্রাণের আবেগে তিনি ঠাকুরের পাদপদ্মে বারংবার পুষ্পাঞ্জলি দেন। পুষ্পপাত্র থেকে একগাছি মালা দিয়ে ঠাকুরের পাদপদ্ম সাজান। এদিকে ঠাকুরের মধ্যে দেখা দেয় দ্রুত প্রতিক্রিয়া। ঠাকুরের সমস্ত শরীরে শিহরণ। তিনি গভীর সমাধিতে মগ্ন হন। "তাঁহার মুখমণ্ডল জ্যোতির্ময় এবং দিব্যহাস্যে বিকশিত হইয়া উঠিল এবং হস্তদ্বয় বরাভয়-মুদ্রা ধারণপূর্বক তাঁহাতে ৺জগদম্বার আবেশের পরিচয় প্রদান করিতে লাগিল।" ঠাকুর উত্তরাস্য হয়ে উপবিষ্ট, নিস্পন্দ বাহ্যজ্ঞানশূন্য তাঁর শরীর। ভক্তগণ দেখেন,

সমবেত ভক্তগণকে ধ্যান করিতে বলিলেন।" বৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যাল তাঁর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলামৃতে লিখেছেন, "ঠাকুর ভাবভরে নিজ শিরে পুষ্প দিয়া কহিলেন—তোমরা সব মা কালীর ধ্যান কর।"

১৮ রামচন্দ্রের লেখা পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত ও রামদত্তের বক্তৃতাবলী (প্রথম খণ্ড) দ্রষ্টব্য।

১৯ গিরিশচন্দ্রের 'রামদাদা' প্রবন্ধ : তত্ত্বমঞ্জরী, ৮ম বর্ষ, ১৩১১ সাল। গিরিশচন্দ্র আরও লিখেছেন, "সে দৃশ্য যখন আমার স্মরণ হয় রামদাদাকে মনে পড়ে, মনে হয় রামদাদা আমাকে সাক্ষাৎ কালীপূজা করাইলেন।" লীলাপ্রসঙ্গকারের মতে 'অসীম বিশ্বাসবান গিরিশচন্দ্রের'···আপনা হতে মনে এই ভাবের উদয় হয় যে, ঠাকুর তাঁর শরীররূপ জীবন্ত প্রতিমায় জগদম্বার পূজা গ্রহণ করবার জন্যই পূজার আয়োজন।

গিরিশচন্দ্র ২৪।১০।১৮৯৭ তারিখে রামকৃষ্ণ মিশনের সভায় বলেছিলেন, "(ঠাকুর) আমাকে বলিলেন, আজ মার দিন এমনি করিয়া বসিতে হয়, আমার কি মনে হইল, আমি জয় রামকৃষ্ণ বলিয়া সেই চন্দন ও ফুল তাঁহার চরণে দিলাম এবং উপস্থিত সকলেই সেইরূপ করিল।"

'ঠাকুরের শরীরাবলম্বনে জ্যোতির্ময়ী দেবীপ্রতিমা সহসা তাহাদিগের সম্মুখে আবির্ভূতা।' চৈতন্য-বান নরদেহে চৈতন্যময়ীর আবির্ভাব, অপরূপ তাঁর রূপসৌন্দর্য। অবর্ণনীয় তার দিব্যদ্যোতনা। 'সৌম্য হতে সৌম্যতরা'র আবির্ভাব দর্শন করে ভক্তহৃদয়ে উঠে ভাবের উত্তাল তরঙ্গ। জনৈক উপস্থিত ভক্ত লিখেছেন, "ফলতঃ প্রভুর এমন আনন্দঘনরূপ আমরা ইতিপূর্বে দর্শন করি নাই। এ রূপ বর্ণনার অতীত, কেবল ধ্যানেরই উপভোগ্য।"[২০]

ভক্তগণ দেখেন সম্মুখে জীবন্ত শ্যামাপ্রতিমা। কোন ভক্তের মানস-আর্শিতে ঝিলিক দেয় অতীতের ঘটনা। ভক্ত মথুর চর্মচক্ষে দেখে-ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ বিগ্রহে শিব ও কালীমূর্তির ক্রমসমুচ্চয়। মনে পড়ে ভাবস্থ ঠাকুর জগন্মাতার সঙ্গে কথা বলছেন, "তুমিই আমি, আমিই তুমি। তুমি খাও; তুমি আমি খাও!" মনে পড়ে কয়েকদিন পূর্বে তিনি দক্ষিণেশ্বরে বলেছিলেন, "এর ভিতরে তিনিই আছেন। এর ভিতর তিনি নিজে রয়েছেন।"[২১] ভক্তদের কেউ কেউ বিশ্বাস করতেন, "এক রূপে শ্যামারূপ, অপরে গোঁসাই" —একই কল্যাণীশক্তির দুটি ভিন্ন রূপ। প্রত্যক্ষে প্রতীত ব্যাপারটির (phenomenon) সংঘটন দেখে ভক্তগণ বিমূঢ় বিহ্বল হয়ে পড়েন। পুঁথিকার লিখেছেন,

কেবা কালী কেবা প্রভু না পারি বুঝিতে।
কালীতে কেবল তিনি মা-কালী তাহাতে॥

দুর্লভ ক্ষণ। ভক্তগণের প্রাণে উল্লাস। সম্মুখে জীবন্ত রামকৃষ্ণকালীবিগ্রহ। ভক্তগণ ইচ্ছামত মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক বিগ্রহের পাদপদ্মে ফুলচন্দন অঞ্জলি দেন। মাষ্টার গন্ধপুষ্প দেন। ভাববিহ্বল রাখাল পুষ্পবিল্ব দেন। রামচন্দ্র মুঠোভরে ফুল দেন, লাটু একটি ফুল দেন, অন্যান্য ভক্তেরা দেন। নিরঞ্জন পায়ে ফুল দিয়ে 'ব্রহ্মময়ী ব্রহ্মময়ী' বলে শ্রীপাদপদ্মে মাথা রেখে প্রণাম করেন। কালী-প্রসাদ, অক্ষয় মাষ্টার, চুনীলাল প্রভৃতি 'জয় মা কালী' উচ্চারণ করে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। চতুর্দিকে জয় মা! জয় মা! ধ্বনি।[২২]

ভক্তগণ কৃতকৃতার্থ। কেউ স্তব করেন, কেউ সুর করে স্তব করতে থাকেন। গিরিশচন্দ্র জলদগম্ভীর স্বরে স্তব করেন,

কে রে নিবিড়-নীল-কাদম্বিনী সুরসমাজে।
কে রে রক্তোৎপল-চরণযুগল হর-উরসে
বিরাজে॥ ইত্যাদি

গিরিশ গান ধরেন,

"দীনতারিণী দুরিতহারিণী, সত্ত্বরজস্তম-
ত্রিগুণধারিণী।
সৃজন-পালন-নিধনকারিণী, সগুণা নির্গুণা
সর্বস্বরূপিণী।"

সবাই আনন্দে বিহ্বল, ভাবে মাতোয়ারা। কয়েকজন ভাবোচ্ছ্বাসে নৃত্য করতে থাকেন ঊর্ধ্ববাহু হয়ে, কেউ বা করতালি দিয়ে নৃত্য করতে থাকেন।[২৩] মনে হয় 'বসেছে পাগলের মেলা'। অপরে কে কি বলে সেদিকে তাদের ভ্রূক্ষেপ

২০ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাকথা, পৃঃ ১৮৮। ঘটনা এত দ্রুত ঘটে যে, উপস্থিত ভক্তদের অনেকের ধারণা হয় যে, ঠাকুরের ঐরূপ ভাবাবেশ দেখেই গিরিশচন্দ্র ফুল ও মালা ঠাকুরের শ্রীপদে অঞ্জলি দেন।

২১ কথামৃত, ২।৩।৪ এবং কথামৃত, ৪।২৪।৩ দ্রষ্টব্য।

২২ ঘটনায় উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে যাঁরা স্মৃতিকথা রেখেছেন তাঁদের মধ্যে একমাত্র মহেন্দ্র গুপ্তের অভিমত যে, জয় মা ধ্বনির পর ঠাকুর বরাভয়করা মূর্তি ধারণ করে সমাধিস্থ হন। অপর অধিকাংশের মত—গিরিশের পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করেই ঠাকুর এইভাবে সমাধিস্থ হয়ে পড়েন।

২৩ রামচন্দ্রের বক্তৃতাবলী, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৩৪১

নাই। ভাবের সুরায় ভাবুকদল প্রায় বেসামাল।” ‘মন মাতালে মাতাল করে, মদ মাতালে মাতাল বলে।’ বিহারী[২৪] গানের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করেন তাঁর প্রাণের আকুতি—

মনেরি বাসনা শ্যামা শবাসনা শোন মা বলি,
হৃদয়মাঝে উদয় হইও মা যখন হব অন্তর্জলি।
তখন আমি মনে মনে তুলব জবা বনে বনে,
মিশাইয়ে ভক্তিচন্দন মা পদে দিব পুষ্পাঞ্জলি॥

মহেন্দ্র মাষ্টার অন্যদের সঙ্গে সমবেতকণ্ঠে গান ধরেন,

‘সকলি তোমারি ইচ্ছা মা ইচ্ছাময়ী তারা তুমি’
ইত্যাদি।

ভক্তগণ পর পর কয়েকটি গানের মধ্য দিয়া উন্মুক্ত করেন ভাবের আবেগ। সঙ্গীততরঙ্গে সবাই যেন ভাসতে থাকেন। গান চলতে থাকে—

“তোমারি করুণায় মা সকলি হইতে পারে”
ইত্যাদি।

“গো আনন্দময়ী হয়ে মা আমায় নিরানন্দ
করো না” ইত্যাদি

“নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে ও রূপরাশি”
ইত্যাদি

ইতিমধ্যে ঠাকুর ভাবসমাধি হতে ব্যুত্থিত হন, ক্রমে তাঁর বাহ্যস্ফূর্তি দেখা যায়। ঠাকুর একটি শ্যামাসঙ্গীতের ফরমাশ করেন, ভক্তগণ গান ধরেন, “কখন কি রঙ্গে থাক মা শ্যামা সুধা-তরঙ্গিণী।” তারপর ঠাকুরের আদেশে তাঁরা গান করেন,

শিবসঙ্গে সদা রঙ্গে আনন্দে মগনা।
সুধাপানে ঢল ঢল ঢলে কিন্তু পড়ে না (মা)॥

গানের লহরীতে ঠাকুর ভাবে গর্গর মাতোয়ারা। তিনি গভীরভাবস্থ হয়ে পড়েন।

আবার ধীরে ধীরে ঠাকুরের বাহ্যস্ফূর্তির লক্ষণ দেখা যায়। ভক্ত রামচন্দ্র বলেন, “প্রভুর ভাবাবসানপ্রায় বুঝিয়া আমি ভোজ্যপাত্রগুলি একে একে তাঁহার সম্মুখে ধরিতে লাগিলাম; দয়াময় দয়া করিয়া দুই হস্ত দ্বারা তাহা ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। কণ্ঠের পীড়ার জন্য প্রভু আমার অন্য কঠিন বস্তু ভক্ষণ করিতে পারিতেন না। অদ্য সে ব্যক্তি কোথায় গেল! যে গলদেশ দিয়া ক্লেশে দুগ্ধ প্রবেশ করিত, সেই গলদেশে লুচি প্রভৃতি চলিয়া গেল! পরে সুজির পাত্র[২৫] ধরিলাম। তিনি তাহাও প্রীতিপূর্ণভাবে গ্রহণ করিলেন। পরিশেষে তাম্বূলগুলি দুই হস্তে উত্তোলনপূর্বক বদনে প্রবিষ্ট করাইলেন।”[২৬] ভাবের ভোজ্যদ্রব্য গ্রহণ করে ঠাকুর পুনরায় “একেবারে ভাবে বিভোর বাহ্যশূন্য হইলেন!”[২৭]

পুরুষ ভক্তগণ যখন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে নিয়ে মহানন্দে প্রমত্ত, সে সময়ে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী কি করছিলেন, প্রশ্ন করা যেতে পারে। শ্রীমায়ের মুখে শোনা যায় শ্যামপুকুর বাড়ীতে তিনি একাকী

তত্ত্বমঞ্জরী, ত্রয়োদশ বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা: ‘সকলে জয় রামকৃষ্ণ রবে হাততালি দিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন।’

২৪ বীরভূম জেলার ‘বাহিরী’,‘গ্রাম-নিবাসী বিহারী নামক দরিদ্র ব্রাহ্মণ যুবক দেবেন্দ্রনাথের পরিবারে থেকে চাকরী করতেন। তিনি ঠাকুরের কৃপালাভ করেন। (ব্রহ্মচারী প্রাণেশকুমারের ‘মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ’ পৃঃ ৬৯ দ্রষ্টব্য।)

২৫ পুঁথিকারের মতে পাত্রে ছয়সের পরিমাণ পায়েস ছিল। ঠাকুর ভাবেতে প্রায় সবটুকুই গ্রহণ করেন।

২৬ রামচন্দ্র দত্তের বক্তৃতাবলী, ১ম ভাগ, পৃঃ ৩৪১

২৭ কথামৃত, ৩।২২।৩

থাকতেন। ভব মুখুজ্যেদের একটি মেয়ে মধ্যে মধ্যে অনেকক্ষণ তাঁর কাছে থাকত।[২৮] অনুমান করা যেতে পারে দক্ষিণেশ্বরের মত এখানেও শ্রীমা দরজার ফাঁক দিয়ে আনন্দবিলাস যৎসামান্য দেখেছিলেন। তাঁর নিকটে ছিল গোলাপ-মা, ভক্ত কালীপদের স্ত্রী বোন মহামায়া এবং সম্ভবতঃ ভব মুখুজ্যেদের মেয়েটি।

ঠাকুর ক্রমে ভাব সংবরণ করেন। ভক্তগণও ধীরে ধীরে সুস্থির হন। একে একে সবাই ঠাকুরকে প্রণাম করে পাশের হলঘরে (ভক্তদের জন্য নির্দিষ্ট বৈঠকখানাতে) সমবেত হন। রামকৃষ্ণ-কালীর মহাপ্রসাদ সকলে আনন্দে ভাগ বাটোয়ারা করে গ্রহণ করেন। "এই মহাপ্রসাদ লইয়া সেদিন যে কি আনন্দোৎসব হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা করা লেখনীর অধিকার বহির্ভূত।"[২৯] স্বভাবকবি অক্ষয়কুমার এঁকেছেন একটি মনোরম চিত্র। তিনি লিখেছেন,

আনন্দের স্রোতেতে আনন্দ বাড়াবাড়ি।
সকলে প্রসাদ লয়ে করে কাড়াকাড়ি ॥[২৯ক]
শ্রীপদে অঞ্জলি দেয়া কুসুমের হার।
কেহ উঠাইয়া গলে পরে আপনার ॥
কেহ বা সঞ্চয়হেতু বাঁধিল বসনে।
কেহ বা গরবভরে পরে দুই কানে ॥
কেহ বা ঢলিয়া পড়ে অপরের গায়।
হৃদয়ে আনন্দ এত ধরে না তাহার ॥
কি রঙ্গ হইল দৃশ্য কার সাধ্য কয়।
চক্ষে দেখা তবু তিল বর্ণিবার নয় ॥

রামকৃষ্ণ-কালী-পূজা ও উৎসব সমাপ্ত হয়। তখন রাত প্রায় নয়টা। ঠাকুরের আদেশে ভক্তগণ সিমলা ষ্ট্রীটে ভক্ত সুরেন্দ্রের বাড়ীর উদ্দেশে যাত্রা করেন। সুরেন্দ্র ঠাকুরের অনুমতি নিয়ে নিজের বাড়ীতে প্রতিমায় শ্যামাপূজার আয়োজন করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তদের সকলের সেখানে নিমন্ত্রণ। ভক্ত ও সেবক সকলকেই ঠাকুর পাঠিয়ে দেন, শুধু সেবক লাটু থাকেন ঠাকুরের শয্যাপার্শ্বে।

অশ্রুতপূর্ব সেই শ্যামাপূজা দুঘণ্টার মধ্যেই সমাপ্ত হয়। কিন্তু আনন্দোৎসবের রেশ চলতে থাকে। ভক্তগণ ঠাকুরের অলৌকিক কৃপার বিষয় আলোচনা করতে করতে সুরেন্দ্রের বাড়ীর দিকে যান। কেউ ভাবেন ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গ থেকে ব্যাধি দূর হয়েছে। "ভক্তেরা করিলা মনে ব্যথা গেছে সেরে। আজি অঙ্গে মা কালীর আবেশের ভরে ॥" কেউ মনে করেন অবতারপুরুষ বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই ব্যাধিরূপ ছলের আশ্রয় নিয়েছেন। কেউ ভাবেন অবতারদেহে জগন্মাতার দিব্য আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করার পর মাটির প্রতিমাতে আর জগন্মাতাকে দেখবার সার্থকতা কি? কেউ বা ভাবেন সেদিনকার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অতুলনীয় সম্পদ।[৩০] প্রাণে

২৮ শ্রীশ্রীমায়ের কথা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১১৭। "আমার জীবনকথা" (পৃঃ ৭১, ৭৬ । লেখক বলেন, গোলাপ-মা সেবকদের রান্নাবাড়া করতেন।

২৯ পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত, পৃঃ ১৭।

২৯ক দানা-কালীর কনিষ্ঠ পুত্র ধীরেন্দ্র ঘোষের কাছে শোনা যায় কাহিনীর এক টুকরো। তিনি তখন বালক। ঠাকুর তার হাতে একটি সন্দেশ দেন। উঠে যাবার সময় বালক হোচট্ খেয়ে পড়ে যায়, সন্দেশ হাত থেকে পড়ে গুঁড়ো হয়ে যায়। ভক্তেরা ছুটে এসে প্রসাদের টুকরো কুড়িয়ে নিয়ে নেন। বালক কেঁদে ফেলে। ঠাকুরের আদেশে তাকে আরেকটি সন্দেশ দেওয়া হয়। তখন সে শান্ত হয়।

৩০ আমার জীবনকথা, পৃঃ ৭৮ : "সেই ঘটনার কথা আজও আমার মনে জাগরূক আছে। সেই অপূর্ব দৃশ্য আমরা জীবনে কোনদিন ভুলিতে পারিব না।"

প্রাণে অনুভব করেন শুদ্ধ সাত্ত্বিক পূজাই আসল পূজা। শুদ্ধ ভাব আশ্রয় করে ভাবের পূজা করাই সাধকের কর্তব্য।

এদিকে শ্যামপুকুর বাটীতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবামৃত বিতরণ করতে থাকেন। নিকটে সেবক লাটু। তাঁর কাছে উদ্ঘাটিত করেন সাধনরাজ্যের গুহ্য তথ্য। লাটু স্মৃতিচারণ করে বলেছেন, "...তিনি সকলকে সুরেন্দর বাবুর বাড়ীতে যেতে বললেন। হামার আর সেদিন যাওয়া হোলো না।...সে রাতে উনি হামাকে কতো কথা বলেছিলেন! সাকার ধ্যানের কথা বলতে বলতে নিরাকার-ধ্যানের কথাও হামায় জানিয়ে দিলেন। সেদিন বলেছিলেন—"ধ্যেন কি এক রকম রে? এক রকম ধ্যেন আছে, যেখানে নিজেকে ভাবতে হয় একটা মাছ আর ব্রহ্ম যেন অগাধ সমুদ্দুর—তাতে খেলে বেড়াচ্ছি, আর একরকম আছে, যেখানে নিজের শরীরকে ভাবতে হয় শরা আর মনবুদ্ধি হচ্ছে জল, সেই জলে সচ্চিদানন্দ-সূর্যের ছায়া পড়েছে। ন্যাংটা এক রকম ধ্যেনের কথা বলতো—জলে-জল, উপর-নীচে জল, তার ভিতরে যেন একটা ঘট রয়েছে—বাহিরে ভিতরে জল, আর একরকম আছে সেখানে সচ্চিদানন্দ-আকাশে পাখী উড়ে বেড়াচ্ছে। এসব হচ্ছে জ্ঞানীর ধ্যেনের কথা। এসব ধ্যেনে সিদ্ধ হওয়া বড় কঠিন।[৩০ক]

আশ্বিনের অমানিশায় বাংলার গ্রাম শহর 'কালী করালবক্ত্রান্তর্দির্শদশনোজ্জ্বলা'র পূজা-আরাধনায় মেতে উঠেছিল, সে সময় শ্যামপুকুর বাড়ীতে রামকৃষ্ণভক্তগণ 'সদানন্দময়ী' 'মনোমোহিনী' রামকৃষ্ণকালী পূজা করে ধর্মজগতের ইতিহাসে একটি নূতন ভাবাদর্শ স্থাপন করলেন ঈশ্বর-অবতারের দক্ষিণেশ্বর-লীলাবিলাসে ভক্তগণ 'আপন হতে আপন' ভাবে পেয়েছেন রামকৃষ্ণ-বিগ্রহ, জেনেছেন কালশক্তি কালীর শ্রেষ্ঠ প্রকাশ রামকৃষ্ণ-অবতার, বুঝেছেন অবতার এসেছেন তারণ করতে। আবার ভাগ্যবান কোন কোন ভক্ত প্রাণে প্রাণে বুঝেছেন শ্রীরামকৃষ্ণই ভাবরূপে কালী,[৩১] মহাকালী, কালনিয়ন্ত্রণকর্ত্রী 'এই ভাবরূপ ও বাস্তবরূপের মাধুর্যমণ্ডিত সমন্বয় ঘটেছে রামকৃষ্ণকালী-বিগ্রহের মধ্যে। রামকৃষ্ণ-আধারে আঁধারবাসিনী কালীর আবির্ভাব অধ্যাত্মলীলা-বিলাসে এক অভিনব ব্যঞ্জনা। গভীর আনন্দে প্রেমে মাতোয়ারা ভক্তগণ জীবন্ত রামকৃষ্ণ-কালীকে ভক্তিসুধা খাইয়ে...তৃপ্ত করেন, আপন মনে।' ভক্তগণ নিজেরা কৃতকৃতার্থ হন, ভবিষ্যতের জন্য উপহার দিয়ে যান অতুলনীয় রামকৃষ্ণকালীমূর্তি—অবতারবরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণের একটি অন্তরঙ্গ ভাবমূর্তি। এই অপরূপ মূর্তি প্রত্যক্ষ করে কালীভক্ত গেয়েছেন—

দেখি মা তোর রূপের ছবি, (ওমা) এমন রূপ ত
আর দেখিনি।
ভয়ঙ্করা, রুধিরধারা, নয় অসিধরা ত্রিনয়নী॥
(আমার মা)
রণবেশে ডরে ছেলে, সে সাজ কি তাই
লুকাইলে,
সন্তানে অভয় দিলে, ওমা বরাভয়-প্রদায়িনি!
কি দোষে ভোলারে ভুলে, (ওমা) রাখনি আজ
পদতলে,
শিবকে ফেলে বুঝি শিবে, (আজ) দিলে
আমায় চরণ দুখানি॥[৩২]

৩০ক লাটু মহারাজের স্মৃতিকথা, পৃঃ ২৩৬-৩৭

৩১ এর সমর্থনে বহু ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। শ্রীমা ভাবচক্ষে দেখেন, মা কালী ঠাকুরের গলায় ঘা দেখিয়ে বলছেন, 'ওর ঐটের জন্য আমারও হয়েছে।' দেখেন মা কালী ঘাড় কাত করে রয়েছেন। (শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ২।১০৬)। ঠাকুরের মহাসমাধির পর শ্রীমা আর্তনাদ করে উঠেন 'মা কালী গো! তুমি কি দোষে আমায় ছেড়ে গেলে গো।' (লাটু মহারাজের স্মৃতিকথা, পৃঃ ২৬২)। 'ভক্ত সুরেন্দ্রনাথ বছর পয়লার দিন কাশীপুরে উপস্থিত হয়ে ঠাকুরকে বলেন, "আজ পয়লা বৈশাখ, আবার মঙ্গলবার। কালীঘাটে যাওয়া হ'ল না। ভাবলাম যিনি কালী—যিনি কালী ঠিক চিনেছেন—তাঁকে দর্শন করতেই হবে।'" (কথামৃত, ৩।২৬।২)

৩২ বিজয়নাথ মজুমদার: রামকৃষ্ণলীলা। (তত্ত্বমঞ্জরী, ত্রয়োদশ বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা)

সমালোচনা

উপনিষৎ নবক: অতুলচন্দ্র সেন-প্রণীত। অতুলচন্দ্র স্মারক সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা: ১১৬ + ৬০৮ + পরিশিষ্ট ৪৪। মূল্য: ষোল টাকা।

আলোচ্য পুস্তকখানি দুই খণ্ডে বিভক্ত, প্রথমাংশটি প্রধানতঃ লেখক অতুলবাবুর স্মারকগ্রন্থ এবং দ্বিতীয়াংশ ঈশ কেন কঠ প্রশ্ন মুণ্ডক মাণ্ডূক্য তৈত্তিরীয় ঐতরেয় ও শ্বেতাশ্বতর—এই নয়টি উপনিষদের সান্বয় অনুবাদ ও সরলার্থ, তৎসহ অবশ্য আছে মূল সংস্কৃত ও প্রয়োজনীয় শব্দার্থ। বড় দুইটি উপনিষদ্ যথা বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য এখানে নাই।

প্রথমাংশ স্মারকগ্রন্থ; প্রথমেই গ্রন্থকারের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, তৎপূর্বে অধ্যাপক রমেশচন্দ্র মজুমদারের ভূমিকায় গ্রন্থের মোটামুটি পরিচয় পাওয়া যায়। বিভিন্ন অধ্যাপক ও মনীষী-লিখিত কয়েকটি রচনায় ভারতের দার্শনিক ও সামাজিক চিন্তাধারা এবং তাহার উপর উপনিষদের প্রভাব আলোচিত হইয়াছে।

দ্বিতীয়াংশ উপনিষদ্গ্রন্থাবলী। প্রকাশকের নিবেদন হইতে জানা যায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে লেখক শুধু কঠ উপনিষদের সরলানুবাদ নিজেই একবার প্রকাশ করেন। পরে অন্য ছোট আটখানির সম্পাদনা করিয়া কঠ ও কেন প্রকাশ করেন। অন্যগুলি পাণ্ডুলিপি-অবস্থায় রাখিয়া যান, তন্মধ্যে তিনখানির ব্যাখ্যাও অসম্পূর্ণ। লেখকের পুত্র পিতৃস্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধানিবেদনার্থে নয়খানি ছোট উপনিষদ্ ব্যাখ্যানুবাদ সহ প্রকাশ করিলেন।

সাধারণ পাঠক যাঁহাদের নিকট সংস্কৃত ভাষ্যটীকা দুরূহ, এবং কোনদিন সেপথে যাইবেন না তাঁহাদের পক্ষে এরূপ গ্রন্থের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। তবে মাঝে মাঝে 'শংকরাচার্যধৃত পাঠ' ও 'উপাধ্যায়ধৃত পাঠ' লিখিয়া সম্পাদকগণ বিভ্রান্তির সৃষ্টি করিয়াছেন। লেখকের অভিপ্রেত অনুবাদ দিলেই সব দিক হইতে সুষ্ঠু হইত। শংকরাচার্যের মত যদি লেখক ও সম্পাদকগণের অনভিপ্রেত হয়, তবে তাঁহাকে টানিয়া আনার কোন প্রয়োজনই ছিল না। পরিশিষ্টে গ্রন্থপঞ্জী, শ্লোকসূচী ও বিষয়সূচী পাঠকগণকে উপনিষদ্সাহিত্যে প্রবেশ করিতে সাহায্য করিবে। পুস্তকের আয়তন কিছু কমাইয়া মূল্য কিছু কমাইতে পারিলে অনুবাদগ্রন্থখানি সাধারণ পাঠকের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে আসিতে পারে। **—স্বামী নিরাময়ানন্দ**

এক মৃত্যু: অনন্ত জীবন- শ্রীনচিকেতা ভরদ্বাজ। প্রকাশক: বঙ্গীয় খৃষ্টীয় সাহিত্য কেন্দ্রের পক্ষে শ্রীঅরিন্দম নাথ কর্তৃক ৬৫ এ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯ থেকে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা: ২০০। মূল্য ১০৲ টাকা।

প্রথম সারির কবি নচিকেতা ভরদ্বাজের সদ্যপ্রকাশিত 'এক মৃত্যু: অনন্ত জীবন' বাংলা সাহিত্যে একটি মূল্যবান সংযোজন। বিশ্ব-কাব্য-কানন হতে সুপ্রসিদ্ধ ৮০জন কবির ১৯টি সুনির্বাচিত গাথাগুলি চয়ন করে কবি শ্রদ্ধাবনতচিত্তে নিবেদন করেছেন ঈশদূত খৃষ্টকে, ঈশদূত এক মৃত্যুর মধ্য দিয়ে লাভ করেছেন মৃত্যুহীন অনন্ত জীবন। দেশকালের সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে তিনি চিরভাস্বর হয়ে আছেন কোটি কোটি মানুষের হৃদয়কন্দরে। দিগ্দিগন্তর হতে অগণিত কবি-সাহিত্যিক-শিল্পি-দার্শনিক মহাজীবনের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করেছেন। কবি ভরদ্বাজ কাব্যকাননের যে বিশাল অংশ অনুসন্ধান করেছেন তার মধ্যে আছে গ্রেটবিটেন, সুইডেন, স্পেন, ফ্রান্স, ইতালি, সোভিয়েত রাশিয়া, কানাডা, আমেরিকা প্রভৃতি। আর যে সব কাব্যকুঞ্জ থেকে তাঁর চয়ন, তার মধ্যে আছেন মিলটন, গ্যয়টে, পুশকিন, হুইটম্যান,

এমারসন প্রভৃতি। কাব্যাঞ্জলির শেষ পুষ্পটি স্বরচিত 'একটি নমস্কারে' তিনি আবাহন করেছেন আশাদীপ্ত আগতপ্রায় ভবিষ্যৎকে :

এবারে হয়তো হাজার লক্ষ কোটি খ্রীষ্ট নবজন্ম নেবে, নিচ্ছে, মানুষের শুভ্র শুদ্ধ বোধের ভিতরে, তার নিষ্পাপ কৌমার্যের পুণ্য উৎস থেকে : অজ্ঞাতে হয়তো তারা বেরিয়ে পড়েছে নবতম কোনো স্বর্ণ-সাম্রাজ্যে স্থায়িতম প্রতিষ্ঠায় :

অনূদিত কাব্যসঙ্কলন নিছক চয়ন নয়, বিশ্ব-মানবের উদ্বোধনের জন্য যুগ যুগ ধরে কৃষ্ণ, রাম, বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, মহম্মদ, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ জীবন দান করেছেন। কিন্তু বুঝতে হবে খ্রী বুদ্ধ এঁরা জেগে আছেন মহান-বিবেকে। গ্যায়টে অনুভব করছেন—

"জাগ্রত, তিনি আজ প্রবাহিত প্রাণে
প্রাণ থেকে লক্ষ কোটি প্রাণে
তিনি আজ শাশ্বত জীবন, ঈশ্বর।"

গীর্জা মন্দির মসজিদ, শাস্ত্র-শরিয়ৎ, কাব্য-সাহিত্য-দর্শন সবকিছুর মধ্য দিয়ে বিশ্বমানবকে আনন্দলোকে উত্তীর্ণ করবার বিপুল আয়োজন চলেছে এবং চলবে। সেই উদার সার্বভৌম ভাবস্রোতে নিষ্ণাত কবি নান্দীমুখ, আগমনী, জন্ম, শৈশব, যৌবন, জীবন, বন্দী এবং বিচার, ক্রুশবিদ্ধ, ক্রুশ, মৃত্যু, পুনরভ্যুত্থান, স্বর্গারোহণ, জিজ্ঞাসা, সুসমাচার, প্রার্থনা ও প্রণাম —অধ্যায়গুলির মধ্য দিয়ে খৃষ্টের দেবমানবজীবন ও তাঁর জীবানাদর্শের ভাবমূর্তি প্রোজ্জ্বল করে তুলে ধরেছেন। প্রতিটি অধ্যায়ের প্রাক্-বাণীতে উপনিষদ, গীতা, বাইবেল, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, জীবানানন্দ হতে সুষ্ঠু উদ্ধৃতি ভাববস্তুর পট সু-অলঙ্কৃত করেছে।

কাব্যবস্তুর ভাসান্তরে ভাবান্তরের আশঙ্কা, আবার একাধিকবার ভাসান্তরে মূল কাব্যের সৌন্দর্যহানির ততোধিক আশঙ্কা। কিন্তু ঈশদূত-স্মরণে জগৎজুড়ে যে বিশাল কাব্যসম্পদ সৃষ্ট হয়েছে, সামগ্রিকভাবে তার রসাস্বাদনের উপযোগী কাব্যাঞ্জলি তৈরি করতে হলে মধুকরকে ভাষান্তরের কঠিন দায়িত্ব গ্রহণ করতেই হবে, এখানে মধুকর মুন্সিয়ানার সঙ্গে বিভিন্ন ভাষার ভাণ্ডার হতে সুস্বাদু রস সংগ্রহ করেছেন এবং তার দুর্লভ সংগ্রহ তিনি সুনিপুণ হস্তে পরিবেশন করেছেন। বিশ্ব-প্রতিভাস্বর্ণে উদ্ভাসিত খৃষ্ট-জীবন-সংহিতার নির্যাস-আহরণ ও বাংলা ভাষায় সার্থকভাবে সর্বপ্রথম পরিবেশনের জন্য বাঙালী পাঠকমাত্রই কবিবরের নিকট কৃতজ্ঞ থাকবে এবং তাঁর প্রতিশ্রুত দ্বিতীয় খণ্ডের প্রকাশ সাগ্রহে প্রতীক্ষা করবে।

—স্বামী প্রভানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসব স্মরণিকা (১৩৭৯)—সিঁথি রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ, কলিকাতা ৫০ হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৬৪।

স্মরণিকাটিকে সব দিক দিয়া সুন্দর করিবার প্রচেষ্টা লক্ষণীয়। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীসারদা-দেবী ও স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে লেখাগুলিতে তাঁহাদের জীবন মনোজ্ঞভাবে আলোচিত, অন্যান্য প্রবন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর-স্বামীজীর ভাবধারা বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পরিস্ফুট। স্মরণিকাটি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের বার্ষিক জন্মোৎসবে সার্থক শ্রদ্ধাঞ্জলি।

পার্থসারথি (শ্রীঅরবিন্দ-জন্মশতবার্ষিকী সংখ্যা)-সম্পাদক : শ্রীপ্রীতিকুমার ঘোষ। ৫ এ, অক্ষয় বোস লেন, কলিকাতা-৪ হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ১১৫-২৭২। মূল্য দুই টাকা।

ধর্ম- ও জাতীয়তাবাদী মাসিক পত্রিকা 'পার্থ-সারথি'র ত্রয়োদশ বর্ষ চলিতেছে। ভাদ্র, ১৩৭৯ সনের তৃতীয় সংখ্যাখানি শ্রীঅরবিন্দ জন্মশতবার্ষিকী সংখ্যারূপে প্রকাশিত হইয়াছে। সংখ্যাখানিকে শ্রীঅরবিন্দের প্রতি যোগ্য শ্রদ্ধাঞ্জলি-রূপে প্রস্তুত করিবার জন্য সম্পাদক মহাশয় কোন ত্রুটি করেন নাই। বিভিন্ন সাহিত্যিক, কবি ও অরবিন্দ-দর্শনে অভিজ্ঞ ব্যক্তি এই বিশেষ সংখ্যা-খানির অলঙ্করণে সহায়তা করিয়াছেন।

আবেদন

রামকৃষ্ণ মিশনের ত্রিপুরায় বন্যার্তসেবাকার্য

বন্যাকবলিত ত্রিপুরায় বন্যার্তগণের সেবাকার্যে গত ২৬শে মে, ১৯৭৩ রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক আরম্ভ করা হইয়াছে। সোনামুরা ও কাঁকরাবন অঞ্চলে ১২.৬৭৩ পর্যন্ত ১৪টি গ্রামে ৩৫২টি পরিবারের ১,৫৮০ জনকে নিম্নলিখিত দ্রব্যাদি বিতরণ করা হইয়াছে :

চাল ১,৩৩১½ কেজি, ডাল ২৫৫ কেজি, গুঁড়া দুধ ১১৬ কেজি, বেবি-ফুড ১৫½ কেজি, আনারস ১৩৫টি, ধুতি ১২০ খানি, শাড়ী ৩১১ খানি, লুঙ্গি ১৩৪টি, শিশুদের পোশাক ৪৬৮, পুরাতন বস্ত্রাদি ৬৯, ব্লিচিং পাউডার ৯৩ কেজি এবং ফিনাইল ১৬ লিটার।

বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলে দুর্গত জনসাধারণের জন্য আরও খাদ্য, বস্ত্রাদি, ঔষধ, আশ্রয় প্রভৃতির আশু প্রয়োজন। প্রয়োজনের তুলনায় অর্থের স্বল্পতাবশতঃ সেবাকার্য কয়েকটি স্থানেই সীমাবদ্ধ রাখিতে হইয়াছে, ব্যাপকভাবে করা যাইতেছে না।

আমরা সহৃদয় দেশবাসীর নিকট বন্যাপীড়িত জনগণের দুঃখদুর্দশা লাঘবের নিমিত্ত মুক্তহস্তে অর্থ ও জিনিসপত্র দান করিবার জন্য আবেদন জানাইতেছি, যাহাতে এই দুঃস্থসেবাকার্য ভালভাবে চালাইতে পারা যায়।

নিম্নলিখিত ঠিকানায় অর্থ ও সকল প্রকার দান সাদরে গৃহীত হইবে এবং তাহার প্রাপ্তি-স্বীকার করা হইবে—

(১) রামকৃষ্ণ মিশন, বেলুড় মঠ ৭১১-২০২, জেলা—হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ
(২) অদ্বৈত আশ্রম, ৫, ডিহি ইন্টালী রোড, কলিকাতা ৭০০-০১৪
(৩) উদ্বোধন অফিস, ১, উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৭০০-০০৩
(৪) রামকৃষ্ণ মিশন ইন্স্টিটিউট অব্ কালচার, গোলপার্ক, কলিকাতা ৭০০-০২৯
(৫) রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠান, ৯৯, শরৎ বসু রোড, কলিকাতা ৭০০-০২৬

স্বামী গম্ভীরানন্দ
সাধারণ সম্পাদক
রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন
পোঃ— বেলুড় মঠ ৭১১-২০২
হাওড়া

তারিখ, বেলুড় মঠ
১৫ই জুন, ১৯৭৩

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

সেবাকার্য

বাংলাদেশে সেবাকার্য: মে,১৯৭৩ পর্যন্ত বাংলাদেশে ৮টি সেবাকেন্দ্রের মাধ্যমে দুঃস্থ জনগণের সেবাকার্যে ২৬,৫১,৫০৯.৬৭ টাকা ব্যয়িত হইয়াছে। প্রাপ্ত দানসামগ্রীর মূল্য এই টাকার অন্তর্ভুক্ত নয়।

১৯৭৩ খৃষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিত সেবাকার্য:

ঢাকা কেন্দ্র কর্তৃক নিম্নলিখিত দ্রব্যসমূহ বিতরিত হয়: বেবি-ফুড ২,৩০০ পাউণ্ড, বিস্কুট ৩৪½ কেজি, শিশুদের খাদ্য ৪.০৫ কেজি, মিল্ক-পাউডার ৪,৯৫০ পাউণ্ড, গ্ল্যাক্সো ২,৫৬০ পাউণ্ড, কম্বল ৬১১ খানি, ধুতি ৫৫ খানি, শাড়ী ২৫৩ খানি, লুঙ্গি ১৪টি, গামছা ১৫টি, মশারি ২৪টি, গায়ে-মাখা সাবান ৪২টি, লিকুইড সোপ ৩০ কেজি, পুরাতন বস্ত্রাদি ৩৮৩, সোয়েটার ৫টি। এই কেন্দ্রে চিকিৎসিত রোগীর সংখ্যা ১,৮৫৭।

বাগেরহাট কেন্দ্র কর্তৃক ২৬টি টিউবওয়েল তৈরী করাইয়া দেওয়া হয় এবং ৪,০১৪ জন রোগীর চিকিৎসা করা হয়। বিতরিত দ্রব্যসমূহ: কম্বল—২,৭২৮, ধুতি—১,০০২, শাড়ী—২,৫০৭, লুঙ্গি ৬৮ খানি, পোশাক ৩৯৭, গেঞ্জী ৪৮টি, জামার কাপড় ৯ গজ, জেলি ১০ পাউণ্ড, সান্‌সাইন-মিল্ক ১০ পাউণ্ড, মিল্ক-পাউডার ৬ পাউণ্ড, বিস্কুট ১৪ কেজি এবং ২৫ খানি পাঠ্যপুস্তক ও ৪৮টি শ্লেট।

মহারাষ্ট্রে খরাত্রাণকার্য: থানা জেলায় জহর তালুকের অন্তঃপাতী তালওয়ালীতে **বোম্বাই** আশ্রম কর্তৃক যে সেবাকার্য অনুষ্ঠিত হইতেছে, তাহাতে ১.৪.৭৩ হইতে ১৭.৫.৭৩ পর্যন্ত ৩,৩৪৪ জন রোগীকে ঔষধ, প্রোটিন-ফুড ইত্যাদি দিয়া চিকিৎসা করা হইয়াছে। এই সেবাকার্যে ১৯,৯০৫.৫৪ টাকা ব্যয়িত হইয়াছে।

গুজরাতে অনাবৃষ্টি ও খাদ্যাভাবের জন্য সেবাকার্য: রাজকোট আশ্রম কর্তৃক রান্না-করা খাদ্যবিতরণের জন্য ভাদ্‌লায় যে পাক-শালা (free kitchen) খোলা হইয়াছে, তাহার কায চালাইয়া যাওয়া হইতেছে।

কর্ণাটকে খরাত্রাণকার্য: বাঙ্গালোর আশ্রম কর্তৃক ৯৭৩-এপ্রিলে ৫৩০ জনকে ৭২৫ কেজি জোয়ার দেওয়া হইয়াছে এবং ২২জন কুষ্ঠরোগীকে দৈনিক একবেলা খাওয়ানো হয়।

ত্রিপুরায় বন্যাত্রাণকার্য: আগরতলা হইতে ৩২ মাইল দূরে ত্রিপুরার একটি বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চল সোনামুরা সাবডিভিসনে গত ২৬.৫.৭৩ রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক সেবাকায আরম্ভ করা হইয়াছে। ৩০.৫.৭৩ পর্যন্ত ৮টি গ্রামে ১৫০ পরিবারের ৮০০ ব্যক্তিকে ৫৫০কেজি চাল দেওয়া হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ২২৫টি শিশুকে জামা প্যাণ্ট ইত্যাদি দেওয়া হয়।

বোম্বাই খার-এ (12th Road, khar, Bombay-52 AS) অবস্থিত রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের এপ্রিল১৯৭১-মার্চ ১৯৭২ খৃষ্টাব্দের কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। ৯২৩ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই-এ ভাড়াটিয়া বাড়ীতে আশ্রমের কাজ আরম্ভ করা হয়। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে ভগবান শ্রীরাম-কৃষ্ণদেবের অন্যতম লীলাপার্ষদ মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজ এখানে নিজস্ব আশ্রম-ভবনের ভিত্তিস্থাপন করেন এবং ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে তিনিই এই আশ্রমের শুভ প্রতিষ্ঠা করেন।

আলোচ্য বর্ষের উল্লেখযোগ্য কার্যধারা—

আশ্রম-বিভাগ: (১) দৈনন্দিন পূজা-ভজনাদি, (২) প্রতিমায় শ্রীশ্রীদুর্গাদেবীর অর্চনা, শ্রীশ্রীকালীপূজা, শ্রীশ্রীসরস্বতীপূজা; সাময়িক তিথি-কৃত্য-উদ্‌যাপন; শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা সারদা-

দেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের বার্ষিক জন্মোৎসব; শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধদেব, যীশুখৃষ্ট, শঙ্করাচার্য প্রভৃতির জন্মতিথিতে অনুষ্ঠান, (৩) আশ্রমে ও আশ্রমের বাহিরে পাঠ, আলোচনা ও বক্তৃতার মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে ধর্মভাব-প্রচার।

আশ্রমে একাদশীতে রামনাম-সংকীর্তন এবং সাপ্তাহিক ধর্মসভায় শ্রীরামকৃষ্ণবচনামৃত ('কথামৃত' হিন্দী) ও ইংরেজীতে ভগবদ্গীতা আলোচিত হয়। আশ্রমের বাহিরে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কেন্দ্রে (৬৪, পর্তুগীজ চার্চ স্ট্রীট, দাদর) মরাঠী ভাষায় ধর্মালোচনা হয়।

যুগনায়ক স্বামী বিবেকানন্দের জাতিগঠন করিবার ও প্রকৃত মানুষ হইবার কতকগুলি বাণী নির্বাচন করিয়া ছোটদের মধ্যে আবৃত্তি-প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৭২-জানুআরিতে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতায় ৮৬টি স্কুলের ২,৬৯৫ জন প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করে এবং ৪৫টি সফল বিদ্যার্থীরা ১৩৩টি পুরস্কার লাভ করে।

মিশন-বিভাগ কর্তৃক পরিচালিত: (১) অ্যালোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক দাতব্যচিকিৎসালয় (মোট চিকিৎসিতের সংখ্যা ১,৬৮,৩৭৫); ইনডোরে ২০টি বেড আছে, এখানে ৬৬৩ জন রোগী চিকিৎসিত হন, তন্মধ্যে ৫৩৪ জনের অস্ত্র-চিকিৎসা করা হয়। (২) কলেজের ছাত্রদের জন্য ছাত্রাবাস; আলোচ্যবর্ষে ৭৬ ছাত্র থাকিবার সুযোগ লাভ করে। (৩) নিঃশুল্ক সাধারণ পাঠাগার ও শিবানন্দ গ্রন্থাগার, পুস্তকসংখ্যা ১৭,৬২৬, পঠনার্থে গৃহীত পুস্তক ৯,৪৩৮; ১৪৫টি পত্র-পত্রিকা রাখা হয়। পাঠাগারে রোজ বহু ব্যক্তি পড়িতে আসেন। (৪) সেবাকার্য: ১৯৭১-৭২তে পূর্ববঙ্গ উদ্বাস্তু-সেবা, পশ্চিমবঙ্গ বন্যার্তসেবা, সাইক্লোন রিলিফ, মালদহ বন্যার্তসেবা, পাটনা বন্যার্তসেবা ও জওয়ান রিলিফে বোম্বাই মিশন কেন্দ্র কর্তৃক উপযুক্ত পরিমাণে নগদ টাকা ও প্রচুর জিনিসপত্র প্রেরিত হয়।

বাগেরহাট (খুলনা, বাংলাদেশ) গত ২৬শে ডিসেম্বর, মঙ্গলবার শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম-মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমার বিশেষ পূজার দ্বারা আশ্রমের শুভ উদ্বোধন করা হয়। গত ৫ই জানুআরি, শুক্রবার আশ্রমের শুভ উদ্বোধন উপলক্ষে একটি বিশেষ উৎসবের আয়োজন করা হয়। উক্ত দিবস প্রাতে ৫-৪৫ মিঃ মঙ্গলারাত্রিক, বৈদিক শান্তিপাঠ ও ভজন অনুষ্ঠিত হয়। পূর্বাহ্নে ৯॥০ ঘটিকায় আশ্রমের পাঠ্যপুস্তক গ্রন্থাগার উদ্বোধন করা হয়। গ্রন্থাগারের শুভ উদ্বোধন করেন স্থানীয় মহকুমা প্রশাসক জনাব মহম্মদ নাসিম সাহেব। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্বামী চিদাত্মানন্দ, স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, স্বামী উমানন্দ, স্বামী শিবেশ্বরানন্দ এবং স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ। পূর্বাহ্ণ ১০ ঘটিকায় একটি বস্ত্রবিতরণী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী লোকেশ্বরানন্দ। মহাকুমা-প্রশাসক প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন। নাতিদীর্ঘ আলোচনার পর প্রধান অতিথি উপস্থিত এগার শত দুঃস্থ নরনারীর মধ্যে বস্ত্রাদি বিতরণ করেন। অপরাহ্ণ ১ ঘটিকা হইতে ৫ ঘটিকা পর্যন্ত প্রায় ৮,০০০ আট হাজার দুঃস্থ নরনারায়ণের মধ্যে খিচুড়ি ও মিষ্টান্ন প্রসাদ বিতরিত হয়। অপরাহ্ণ ৩॥০ ঘটিকায় সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। ভক্তিমূলক সঙ্গীতের মাধ্যমে সাধারণ সভার উদ্বোধন হয়। উক্ত সঙ্গীত পরিবেশন করেন জনাব রুহুল আমিন, খুলনা। সভায় পৌরোহিত্য করেন স্বামী চিদাত্মানন্দ এবং প্রধান বক্তারূপে সময়োপযোগী ভাষণ দান করেন স্বামী লোকেশ্বরানন্দ। প্রধান অতিথির ভাষণ দান করেন মহাকুমা প্রশাসক জনাব মহম্মদ নাসিম সাহেব। জনাব এ. এম, সবুর, এ্যাড্ভোকেট, জনাব আলী আহম্মদ,

প্রাক্তন এম. সি. এ, অধ্যাপিকা ছায়া রায়চৌধুরী এবং সাখোয়াত হোসেন সাহেব, ম্যাজিস্ট্রেট ১ম শ্রেণী, সভায় জ্ঞানগর্ভ ভাষণ দান করেন। স্থানীয় বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীগণ স্বামীজীর কবিতা—'জাগ্রত দেবতা', 'ধৈর্য ধর কিছুকাল হে বীরহৃদয়', চিকাগো ধর্ম-মহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দ-প্রদত্ত ভাষণসমূহের অংশ বিশেষ আবৃত্তি এবং প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন। প্রতিযোগিতায় যাঁহারা প্রথমস্থান অধিকার করেন তাঁহারা সভায় ভাষণ, আবৃত্তি ও প্রবন্ধপাঠ দ্বারা শ্রোতাদের মন আকৃষ্ট করেন। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, বাগেরহাট বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় ও দশানি যদুনাথ ইনস্টিটিউ-শনের স্কাউটবৃন্দ ইংরেজী বাদ্য সহকারে সভায় উপস্থিত হইয়া সভার পরিবেশকে ভাবগম্ভীর করিয়া তোলেন। প্রধান অতিথি ইঁহাদের সকলকে পুরস্কৃত করেন। সভাশেষে খুলনা রামকৃষ্ণ সংঘের শিল্পিবৃন্দ 'কল্পতরু শ্রীরামকৃষ্ণ' গীতিনক্সা পরিবেশন করিয়া শ্রোতৃবৃন্দকে প্রচুর আনন্দ দান করেন।

স্বামী মৃত্যুঞ্জয়ানন্দের দেহত্যাগ

আমরা গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি, গত ১২ই জুন মঙ্গলবার রাত্রি একটার সময় স্বামী মৃত্যুঞ্জয়ানন্দ (নগেন মহারাজ) বৃন্দাবন সেবাশ্রমে ৬১ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার ডায়াবিটিস্ ছিল, ইহার সহিত অন্যান্য উপসর্গও দেখা দিয়াছিল। সম্প্রতি তিনি প্রায় অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন।

তিনি শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন; ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা স্টুডেণ্টস্ হোমে সঙ্ঘে যোগদান করেন। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে তিনি শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের নিকট সন্ন্যাস-দীক্ষাপ্রাপ্ত হন। দেওঘর, উদ্বোধন, পাটনা, ঢাকা ও কলিকাতা স্টুডেণ্টস্ হোমের কর্মিরূপে এবং আসানসোল আশ্রমের অধ্যক্ষরূপে তিনি সঙ্ঘের সেবায় শ্রীশ্রীঠাকুর-স্বামীজীর কাজে মনঃপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলেন। ১৯৪৪-এপ্রিল হইতে ১৯৬৮-জুলাই পর্যন্ত তিনি আসানসোল আশ্রমের পরিচালক ছিলেন, স্বাস্থ্য ভাল যাইতেছিল না বলিয়াই তিনি অবসরগ্রহণে বাধ্য হন। তিনি অত্যন্ত মধুর, সরল, অমায়িক প্রকৃতির সন্ন্যাসী ছিলেন বলিয়া যিনিই তাঁহার সংস্পর্শে আসিতেন, তাঁহার মাধুর্যপূর্ণ ব্যবহার ও সরলতার আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারিতেন না। তাঁহার আত্মা শ্রীরামকৃষ্ণ-পাদপদ্মে শাশ্বত শান্তি লাভ করিয়াছে।

বিবিধ

স্বামী নিঃশ্রেয়সানন্দ ভারতে প্রায় চারমাস অবস্থান করিয়া গত মে মাসের তৃতীয় সপ্তাহে মরিশাস রওনা হইয়াছেন. পথে তিনি রোডেসিয়া হইয়া যাইবেন।

স্বামী ভাষ্যানন্দ গত ৯ই জুন বেলুড় মঠে পৌছিয়াছেন এবং ভারতে ৭ সপ্তাহ অবস্থান করিবেন।

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-সংবাদ

চন্দননগর শ্রীরামকৃষ্ণ সেবক সঙ্ঘের পরিচালনায় গত ২৮শে ও ২৯শে এপ্রিল ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মতিথি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। শনিবার উৎসবের উদ্বোধন করেন জয়রামবাটী শ্রীমাতৃমন্দিরের অধ্যক্ষ স্বামী গৌরীশ্বরানন্দ। শ্রীশ্রীমায়ের আদর্শ জীবন সম্বন্ধে ভাষণ দেন তিনি ও [illegible] নন্দিনী ভট্টাচার্য। রবিবার ভক্তগণের উপস্থিতিতে শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের ষোড়শোপচারে পূজা, হোম, বেদপাঠ ও

চণ্ডীপাঠ হয়। স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। দরিদ্রনারায়ণ-সেবা, ভক্তসেবা, বেতার-শিল্পীদের ভজনগান, ভারত সরকারের সৌজন্যে শ্রীকানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কীর্তনগান প্রভৃতি উৎসবের অঙ্গ ছিল। এইদিন ধর্মসভায় স্বামী নিরাময়ানন্দ ও অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও স্বামীজীর জীবন ও বাণী সম্বন্ধে ভাষণ দেন।

টালিগঞ্জ: গত ১৯শে, ২০শে ও ২১শে মে, ১৯৭৩ গান্ধী কলোনী শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম প্রাঙ্গণে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব-উৎসব পালিত হইয়াছে। প্রথম দিনের সভায় স্বামীজীর জীবনদর্শন আলোচনা করেন অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র শাস্ত্রী ও অখিল ভারত বিবেকানন্দ যুব মহামণ্ডলের সম্পাদক শ্রীনবনীহরণ মুখোপাধ্যায়; দ্বিতীয় দিনের ধর্মসভায় স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ (সভাপতি), অধ্যাপক পাঁচুগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও অধ্যাপক শিবশম্ভু সরকার শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে ভাষণ দেন। সেবাশ্রমের পক্ষে দুঃস্থদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করেন স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। শ্রীদ্বিজরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রামায়ণগান, ভারত সরকারের সৌজন্যে শ্রীকানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের লীলা-কীর্তন ও সেবাশ্রমের শিল্পিবৃন্দ কর্তৃক গীতি-আলেখ্য (বিবেকানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ ও রামপ্রসাদ) শ্রোতৃমণ্ডলীকে আকৃষ্ট করেন। মঙ্গলারতি, প্রভাতফেরী, শ্রীচণ্ডী- ও গীতাপাঠ, ষোড়শোপচারে পূজা ও হোম হয়। প্রথম দুই দিনের উৎসবে সমাগত দরিদ্রনারায়ণ, শিশু ও ভক্তদের খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়। প্রতিদিন উৎসবে সহস্রাধিক জনসমাগম হইয়াছিল।

বাগবাজার শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ যুব সঙ্ঘের উদ্যোগে গত ২৬ ও ২৭শে মে, ১৯৭৩ মহারাজা কাশিমবাজার পলিটেক্‌নিক ইনষ্টিটিউসন প্রাঙ্গণে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হয়। ২৬শে মে সকালে অধ্যাপক পাঁচুগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় পূজাদি করেন এবং ভক্তিমূলক গান পরিবেশিত হয়। পূজান্তে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। বৈকালিক জনসভায় সম্পাদক বৈদিকমন্ত্র ও কার্যবিবরণী পাঠ করেন, সভাপতিত্ব করেন স্বামী রমানন্দ, প্রধান অতিথি ছিলেন শ্রীনবনীহরণ মুখোপাধ্যায়। স্বামী বিবেকানন্দের জীবনদর্শন সম্পর্কে তথ্যপূর্ণ বক্তৃতা হয়। সভান্তে শ্রীকৃষ্ণধন ভট্টাচার্য ও সম্প্রদায় কর্তৃক 'আধ্যাত্মিক পাশ্চাত্য বিজয়' গীতি-আলেখ্য পরিবেশিত হয়। ২৭শে মে সন্ধ্যায় ধর্মসভায় পৌরোহিত্য করেন স্বামী নিরাময়ানন্দ ও প্রধান অতিথি ছিলেন ডঃ শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়। সভাপতি ও প্রধান অতিথির ভাষণে স্বামী বিবেকানন্দের সমাজসেবার দিকটিই বিশেষভাবে প্রাধান্য পায়। বেতারশিল্পী শ্রীভূপেন চক্রবর্তীর ভক্তিমূলক গান এবং ব্যায়াম-প্রদর্শনীর পর সভার সমাপ্তি হয়।

পরলোকে কনকপ্রভাদেবী

অতি দুঃখের সহিত জানাইতেছি স্বনামধন্য হোমিওপ্যাথিক ঔষধ-বিক্রেতা ও প্রচারক স্বর্গীয় মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের পুত্রবধূ, শ্রীহেরম্বচন্দ্র ভট্টাচার্যের পত্নী কনকপ্রভাদেবী গত ২৩শে মার্চ (১৯৭৩) ৫৯ বৎসর বয়সে কলিকাতায় স্বগৃহ 'মহেশ ভবন'-এ পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি পূজ্যপাদ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা ছিলেন।

তাঁহার আত্মা শ্রীরামকৃষ্ণচরণে চিরশান্তি লাভ করুক, এই প্রার্থনা।

উদ্বোধন, ১ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা

[পুনর্মুদ্রণ]

(পূর্বানুবৃত্তি : মহাভাষ্যম্)

ব্যাকরণ শাস্ত্রে জ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তি ভিন্ন অপর কেহ মন্ত্র সকলকে যথার্থরূপে বদ্‌লাইয়া লইতে পারে না ; অতএব ব্যাকরণ শাস্ত্র অধ্যয়ন করা উচিত (১)। বেদেও উক্ত আছে, "ব্রাহ্মণ কোন কারণের অপেক্ষা না করিয়া অর্থাৎ ধনোপার্জ্জন প্রভৃতি কোন প্রয়োজন না থাকিলেও ষড়ঙ্গের (২) সহিত বেদ অধ্যয়ন করিবেন ও তাহাতে জ্ঞান লাভ করিবেন ; তাহাই ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম।" ষড়ঙ্গের মধ্যে ব্যাকরণই প্রধান। প্রধান বিষয়ে যত্ন করিলেই তাহাতে ফল লাভ হয়। লঘু উপায়ে শব্দ শাস্ত্রে জ্ঞান লাভ হয় ; এই কারণ বশতঃও ব্যাকরণ শাস্ত্র অধ্যয়ন করা উচিত। শব্দ সকল ব্রাহ্মণের অবশ্যই জানা উচিত। কিন্তু, ব্যাকরণ শাস্ত্রে জ্ঞান ব্যতীত লঘু উপায়ে শব্দ সকল উত্তম রূপে জানিতে পারা যায় না। সন্দেহ নিরাসের নিমিত্তও ব্যাকরণ শাস্ত্র অধ্যয়ন করা উচিত। যাজ্ঞিকগণ পাঠ করেন, "স্থূলপৃষতীমাগ্নিবারুণীমনড্বাহীমালভেত।" স্থূল বিন্দুগাভীকে অগ্নিবরুণ দেবতার যজ্ঞে হিংসা করিবে। এই শ্রুতিতে এই সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে যে, "স্থূলপৃষতী" এই পদে স্থূল এইরূপ পৃষতী "স্থূলপৃষতী" এইরূপে কর্ম্মধারয় সমাস হইবে অথবা স্থূল এইরূপ পৃষৎ অর্থাৎ বিন্দু যাহার সে

করিলে "অদুহ +অত" এইরূপ হইল। (আধুনিক কলাপ, মুগ্ধবোধ প্রভৃতি ব্যাকরণানুসারে "ঝ্" স্থানে "অৎ" আদেশ না করিয়া একেবারে "অত" প্রত্যয় গৃহীত হইয়াছে।) তৎপরে "লোপস্ত আত্মনেপদেষু।" এই নিয়মানুসারে তকারের লোপ হইয়া "অদুহ্ + অ" এইরূপ হইল। তৎপরে, "বহুলং ছন্দসি" এই সূত্রানুসারে "রুট্" করিয়া "অদুহ্র" হইল। বেদে এই পদ ব্যবহৃত হয়। (লৌকিক প্রয়োগে দুহ ধাতুর লঙ বিভক্তির প্রথম পুরুষের বহুবচনে "অদুহত" এইরূপ হয়।) বর্ণবিকারের উদাহরণ ; যথা, "উৎ" পূর্ব্বক "গ্রহ" ধাতুর উত্তর "ঘঞ্" প্রত্যয় করিলে "হৃগ্রহোর্ভশ্ছন্দসিহস্যেতি বক্তব্যম্।" এই নিয়মানুসারে "হ" স্থানে "ভ" হইয়া "উদ্‌গ্রাভ" এইরূপ হয়। লৌকিক প্রয়োগে "উৎ" পূর্ব্বক "গ্রহ্" ধাতুর উত্তর "ঘঞ্" প্রত্যয় করিলে "উদ্‌গ্রাহ" এইরূপ হয়। অতএব, যিনি বৈদিক ব্যাকরণ না জানেন, তিনি কি প্রকারে বৈদিক প্রয়োগসমূহের শুদ্ধাশুদ্ধতা বিবেচনা করিয়া বেদপাঠ করিতে সক্ষম হইবেন ?

(১) বেদে অগ্নি দেবতার চরু নির্ব্বপণের মন্ত্র আছে,—"অগ্নয়ে ত্বা জুষ্টং নির্ব্বপামি" এবং স্থানান্তরে উক্ত আছে,—"সৌর্য্যং চরুং নির্বপেদ্‌ব্রহ্মবর্চ্চসকামঃ।" অর্থাৎ ব্রহ্মতেজ কামনা করিয়া সূর্য্যদেবতার চরু নির্ব্বপণ করিবে। এই স্থলে ঐরূপ মন্ত্র নিরূপণ করা হয় নাই ; কিন্তু এই স্থলেও ঐরূপ "সূর্য্যায় ত্বা জুষ্টং নির্ব্বপামি।" এইরূপ মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে। যিনি ব্যাকরণ শাস্ত্র না জানেন, তিনি কি প্রকারে ঐ উহ সকলকে অর্থাৎ মন্ত্রের পরিবর্ত্তন সকলকে জানিতে সমর্থ হইবেন ?

(২) বেদের অঙ্গ ছয়টি ; যথা,—শিক্ষা, অর্থাৎ উচ্চারণ করিবার শাস্ত্র, কল্প অর্থাৎ যজ্ঞাদি নিরূপণ শাস্ত্র, ব্যাকরণ শাস্ত্র, ছন্দঃ শাস্ত্র, এবং নিরুক্ত অর্থাৎ বৈদিক শব্দাভিধান।

"স্থূলপৃষতী" এইরূপে বহুব্রীহি সমাস হইবে ? সেই শ্রুতির অর্থ ব্যাকরণ শাস্ত্রে জ্ঞানবিহীন ব্যক্তি স্বরের দ্বারা বিনির্ণয় করিতে সমর্থ নহেন। যদি পূর্ব্বপদের প্রকৃতির স্বর হয়, তাহা হইলে বহুব্রীহি সমাস হইবে ; এবং যদি সমাসান্তস্বর উদাত্ত হয়, তাহা হইলে তৎপুরুষ সমাস হইবে (১)।

ভাষ্য মূল।

ইমানি চ ভূয়ঃ শব্দানুশাসনস্য প্রয়োজনানি। তেঽসুরাঃ। দুষ্টঃ শব্দঃ। যদধীতম্। যস্তু প্রযুঙ্‌ক্তে। অবিদ্বাংসঃ। বিভক্তিং কুর্ব্বন্তি। যো বা ইমাম্। চত্বারি। উতত্বঃ। সক্তুমিব। সারস্বতীম্। দশম্যাং পুত্রস্য। সুদেবো অসি বরুণ ইতি।

তেঽসুরাঃ। "তেঽসুরা হেলয়ো হেলয় ইতি কুর্ব্বন্তঃ পরাবভূবুস্তস্মাদ্ ব্রাহ্মণেন ন ম্লেচ্ছিত বৈ নাপভাষিত বৈ ম্লেচ্ছো হ বা এষ যদপশব্দঃ"। ম্লেচ্ছা মা ভূমেত্যধ্যেয়ং ব্যাকরণম্। তেঽসুরাঃ।

বঙ্গানুবাদ।

এবং এই বক্ষ্যমাণ প্রমাণ সকলও শব্দ শাস্ত্রের প্রয়োজন। "তেঽসুরাঃ"— সেই অসুরগণ। "দুষ্টঃ শব্দঃ"—দোষযুক্ত শব্দ। "যদধীতম্"—যাহা অধ্যয়ন করা হয়। "যস্তু প্রযুঙ্‌ক্তে"—যে প্রয়োগ করে। "অবিদ্বাংসঃ"—বিদ্যাবিহীন লোকেরা। "বিভক্তিং কুর্ব্বন্তি"—বিভক্তি প্রয়োগ করে। "যো বা ইমাম্"—যিনি এই। "চত্বারি" চারি। "উতত্বঃ"—অপর লোকও। "সক্তুমিব" সক্তুর ন্যায়। "সারস্বতীম্"—সরস্বতীসম্বন্ধীয়। "দশম্যাং পুত্রস্য"—দশম দিবসের পরে পুত্রের। "সুদেবো অসি বরুণঃ"—বরুণ! তুমি সুদেব (২)

তেঽসুরাঃ।—সেই অসুরগণ "হে অলয়ঃ! হে অলয়ঃ" (৩)! "হে অরিগণ! হে অরিগণ!" এই শব্দ প্রয়োগ করিয়া পরাভূত হইয়াছিল ; সেই জন্য, ব্রাহ্মণ ম্লেচ্ছাচারী হইবেন না ; অপশব্দ (অশুদ্ধ শব্দ) প্রয়োগ করিবেন না। এই যে অপশব্দ, ইহাই ম্লেচ্ছ অর্থাৎ ম্লেচ্ছাচার। ম্লেচ্ছ না হই, এই নিমিত্ত ব্যাকরণ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবে। "তেঽসুরাঃ" (সেই অসুরগণ) এই প্রমাণ ব্যাখ্যাত হইল।

(১) কর্ম্মধারয় সমাস তৎপুরুষ সমাসের অন্তর্গত। আমাদিগের বঙ্গদেশে স্বরানুসারে অধ্যয়নের রীতি এক্ষণে প্রচলিত নাই। কিন্তু এই রীতি প্রচলিত থাকিলে অর্থবোধের বিশেষ সৌকর্য্য হয়। ইহা আমরা যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিব।

(২) এই উদ্ধৃত অংশ সকল প্রমাণ বাক্যের অংশ। এই সকল প্রমাণ সম্পূর্ণ ব্যাখ্যাত হইতেছে।

(৩) "হে অরয়ঃ" এইরূপ প্রয়োগের পরিবর্ত্তে অজ্ঞতাবশতঃ "হে অলয়ঃ" এইরূপ প্রয়োগ করিয়াছিল এবং "হৈ হে প্রয়োগে হৈহয়োঃ।" এই সূত্রানুসারে এই স্থলে "হে" এই পদটীর স্বর প্লুত। "প্লুত প্রগৃহ্যা অচি নিত্যম্" এই সূত্রানুসারে প্লুতস্বরের সন্ধি হয় না। অজ্ঞতাবশতঃ "হেলয়ঃ" এইরূপ প্রয়োগ করিয়া সন্ধির নিয়মানুসারে অকারের লোপ করিয়া অশুদ্ধতা সম্পাদন করিয়াছিল।

ভাষ্য মূল।

দুষ্টঃ শব্দঃ। "দুষ্টঃ শব্দঃ স্বরতো বর্ণতো বা মিথ্যাপ্রযুক্তো ন তমর্থমাহ। স বাগ্‌বজ্রো যজমানং হিনস্তি যথেন্দ্রশত্রুঃ স্বরতোঽপরাধাৎ।" দুষ্টান্ শব্দান্ মা প্রযুক্ষ্মহীত্যধ্যেয়ং ব্যাকরণম্। দুষ্টঃ শব্দঃ।

বঙ্গানুবাদ।

দুষ্টঃ শব্দঃ।—স্বরদ্বারা অথবা বর্ণদ্বারা দোষযুক্ত শব্দ (অর্থাৎ যে শব্দ প্রয়োগে স্বরের অথবা বর্ণের দোষ থাকে, সেই শব্দ) মিথ্যা প্রযুক্ত হইয়া (অর্থাৎ যে প্রকার অর্থ প্রতিপাদনের নিমিত্ত প্রয়োগ করা হয়, স্বরের এবং বর্ণের দোষবশতঃ অপর অর্থ বুঝাইয়া) সেই অর্থ (অর্থাৎ প্রয়োগকর্ত্তার অভিপ্রেত অর্থ) প্রকাশ করে না। সেই বাক্যরূপ বজ্র যজমানকে বিনষ্ট করে; যেমন স্বর প্রয়োগের দোষে "ইন্দ্রশত্রু" এই শব্দ যজমানের অনিষ্ট সম্পাদন করিয়াছিল (১)। দোষযুক্ত শব্দ প্রয়োগ না করি, এই নিমিত্ত ব্যাকরণ অধ্যয়ন করা উচিত। "দুষ্টঃ শব্দ" 'দোষযুক্ত শব্দ' এই প্রমাণ ব্যাখ্যাত হইল।

ভাষ্য মূল।

যদধীতম্। "যদধীতমবিজ্ঞাতং নিগদেনৈব শব্দ্যতে। অনগ্নাবিব শুষ্কৈধো ন তজ্জ্বলতি কর্হিচিৎ।" তস্মাদনর্থকং মাধিগীষ্মহীত্যধ্যেয়ং ব্যাকরণম্। যদধীতম্।

বঙ্গানুবাদ

"যদধীতম্"—"যাহা অধ্যয়ন করা হয়"।—সম্পূর্ণরূপে জানা নাই (অর্থাৎ যাহার স্বরাদির বা অর্থের বোধ নাই) কেবল শব্দ দ্বারা উচ্চারণ করা হয় মাত্র; এইরূপ যাহা অধ্যয়ন করা হয়। তাহা অগ্নিবিহীন ভস্মে শুষ্ক কাষ্ঠের ন্যায় কখনই প্রজ্বলিত হয় না (অর্থাৎ তাদৃশ অধ্যয়ন নিষ্ফল)। অতএব অনর্থক অধ্যয়ন না করি, এই নিমিত্তও ব্যাকরণ শাস্ত্র অধ্যয়ন করা উচিত। "যদধীতম্" (যাহা অধ্যয়ন করা হয়) এই প্রমাণ ব্যাখ্যাত হইল।

ভাষ্য-মূল।

যস্তু প্রযুঙ্‌ক্তে। "যস্তু প্রযুঙ্‌ক্তে কুশলো বিশেষে শব্দান্ যথাবদ্ ব্যবহারকালে। সোঽনন্তমাপ্নোতি জয়ং পরত্র বাগ্‌যোগবিদ্ দুষ্যতি চাপশব্দৈঃ॥" কঃ, বাগ্‌যোগবিদেব। কুতএতৎ? যো হি শব্দান্ জানাতি অপশব্দানপ্যসৌ জানাতি।

বঙ্গানুবাদ।

"যস্তু প্রযুঙ্‌ক্তে" (যিনি প্রয়োগ করেন)—যে কুশল (অর্থাৎ শব্দ প্রয়োগে নিপুণ ব্যক্তি) ব্যবহার কালে শব্দ সকলকে যথাযথরূপে বিশেষ বিষয়ে প্রয়োগ করেন (অর্থাৎ যে স্থলে যে শব্দ

(১) এইরূপ আখ্যায়িকা আছে যে, বৃত্রাসুরের পিতা ইন্দ্রের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার বধসাধনের নিমিত্ত একটী যজ্ঞ করেন; তাহাতে পুরোহিত "ইন্দ্রশত্রু বর্দ্ধস্ব" এই স্থলে তৎপুরুষ সমাসের স্বরের পরিবর্ত্তে বহুব্রীহি সমাসের স্বর উচ্চারণ করিয়াছিলেন; তজ্জন্য বৃত্র ইন্দ্রের শত্রু না হইয়া ইন্দ্র বৃত্রের শত্রু হইয়াছিলেন।

যেরূপে প্রযুক্ত হওয়া উচিত, সে স্থলে সেই শব্দ সেই রূপেই প্রয়োগ করেন), তিনি অনন্ত জয়লাভ করেন ; বাগ্‌যোগবিদ্‌ ব্যক্তি (অর্থাৎ যিনি শব্দের যথার্থ ব্যবহার জানেন, তিনি) অপশব্দ প্রয়োগ দ্বারা দূষিত হয়েন। কে দূষিত হয়েন ? বাগযোগবিদ্‌ ব্যক্তিই দূষিত হয়েন। কেন ইহা হয় ? যিনি শব্দ জানেন, সেই ব্যক্তি অপশব্দও জানেন।

উদ্বোধনের অতিরিক্ত পৃষ্ঠা [১]

স্বামী যোগানন্দ।

গত ১৫ই চৈত্র অপরাহ্ণ ৩টা ১০ মিনিটের সময় আমরা একটী উজ্জ্বল রত্ন হারাইয়াছি! ত্যাগের জলন্ত মূর্ত্তি, বিশ্বাসের উজ্জ্বল আদর্শ, ভক্তি ও সরলতার অপূর্ব্ব ছবি, মহাতেজস্বী, নিষ্কিঞ্চন সন্ন্যাসী স্বামী যোগানন্দ ইহ জগতে আর নাই!! আর সেই সাহাস্য বদন, সেই অপূর্ব্ব উদাসব্যঞ্জক নয়ন কেহ দেখিতে পাইবেন না!!!

স্বামী যোগানন্দ পরমহংসদেবের একজন ভক্ত। পরমহংসদেব তাঁহাকে অতিশয় ভালবাসিতেন। যোগানন্দও কিরূপে গুরুসেবা করিতে হয়, তাহা জগৎকে দেখাইয়া গিয়াছেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার হৃদয়ের ধর্ম্মভাব প্রবল ছিল। সেই ধর্ম্মভাবরূপ অঙ্কুর ভগবান্ রামকৃষ্ণদেবের করুণাবারি-সিঞ্চনে প্রবৃদ্ধ হইয়া ক্রমশঃ একটী প্রকাণ্ড তরুরূপে পরিণত হয়। সেই মহান্ তরু অনেক সংসার-মার্ত্তণ্ড-তাপিত জীবকে ছায়াদানে শীতল করিয়াছিল।

যখন পরমহংসদেব কাশীপুর-উদ্যানে পীড়িত অবস্থায় ছিলেন, তখন ইনি অতিশয় যত্ন-সহকারে তাঁহার সেবা করিতেন। তাঁহার দেহরক্ষার পর কখন মঠে, কখন পশ্চিমে কাশী প্রভৃতি তীর্থস্থানে বাস করিতেন। বারাণসীধামে অতিশয় কঠোর তপস্যার ভারে তাঁহার শরীর ভগ্ন হইয়া যায়। ক্রমে তিনি গ্রহণীরোগে আক্রান্ত হন। এই রোগ তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে অতিশয় কষ্ট দিত, কিন্তু তাঁহার সেই অমানুষী তেজঃপূর্ণ মুখমণ্ডল কখনও ম্লান হইতে দেখা যায় নাই।

এই সময় তিনি কিছুদিন কলিকাতায় বাস করিয়া ভগবান্ রামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসবের যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছিলেন। ইঁহার উদ্যম ও যত্নে এই মহোৎসবের এতদূর উন্নতি হইয়াছিল।

গত অগ্রহায়ণ মাস হইতে জ্বর ও উদরাময় রোগে আক্রান্ত হইয়া শয্যাশায়ী হইলেন, আর উঠলেন না। ক্রমাগত চারিমাস ধরিয়া রোগের দুর্ব্বিষহ কষ্ট যেরূপ অকাতরে ও অদ্ভুত ধৈর্য্যের সহিত সহ্য করিয়াছেন, তাহা তাঁহার ন্যায় ত্যাগী পুরুষ ভিন্ন অন্যে সম্ভবে না।

অন্তিম সময়ের অবস্থা যে না দেখিয়াছে, সে তাঁহার সেই অপূর্ব্ব ভাবের কিছুই বুঝিবে না। ইহ প লাকের মধ্যবর্তী অপূর্ব্ব প্রহেলিকাময়ী যবনিকা অপসরণের কিছুপূর্ব্বে যোগানন্দ স্বামীর মুখমণ্ডল কি এক স্বর্গীয় জ্যোতি ও হাস্যে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল—যেন তিনি কোন অতীন্দ্রিয় জগতের কোন অতীন্দ্রিয় দেবতার দর্শন পাইলেন। সহসা রোমাঞ্চ হইল—প্রেমাশ্রু ঝরিল। যবনিকা নিপতিত হইল!!!

এ দুঃখের দিন—কি আনন্দের দিন, এ কাঁদিবার দিন—কি হাসিবার দিন, কে বলিতে পারে?

[অতিরিক্ত পৃষ্ঠা ২]

মহাপুরুষের নাম স্মরণেও মন পবিত্র হয়। যোগানন্দ স্বামী যথাযথই একজন আদর্শ মহাপুরুষ ছিলেন। অপূর্ব্ব পবিত্রতা, ত্যাগ ও চরিত্রগুণে তিনি অনেকের হৃদয়ে দেববৎ পূজিত। তাঁহাকে দেখিলেই বোধ হইত, তিনি শরীরে বাস করিয়াও যেন কোন অশরীর, অতীন্দ্রিয় রাজ্যে বিচরণশীল।

স্বামী অভয়ানন্দ কলিকাতায় নিম্নলিখিত বক্তৃতাগুলি দিয়াছেন। সকলে শুনিয়া সন্তোষ লাভ করিয়াছিলেন।—

১৮ই চৈত্র—"ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক ক্রমবিকাশ"—(**"The Material and Spiritual Evolution."**)

২১শে চৈত্র—"কর্ম্মফলবাদ"—(**"Law of Karma"**)

২২শে চৈত্র—'স্যাল্‌ভেশন্ ও লিবরেশন" (**"Salvation Versus Liberation"**)

শান্তি

কোথা' শান্তি এ সংসারে—বৃথা অন্বেষণ!
বিষাদ কালিমা মাখা এই বসুন্ধরা ;
শান্তি আশে কেন জীব করিছ ভ্রমণ ?
কোথা' পা'বে শান্তি-বারি, এ যে শুষ্ক ধরা!
ওই দেখ কত শত মানব-হৃদয়,
প্রতিদিন প্রতিক্ষণ শান্তির আশায়,
মগ্নপ্রায় জীব মত করিছে আশ্রয়
অতীব সামান্য তৃণ, সকলি বৃথায়!
ভ্রান্ত জীব! পা'বে শান্তি বিলাস-বৈভবে ?
শান্তি তরে ভালবাস রমণীর রূপ ?
কাল-অলি মধু পানে সব লীন হবে,
জান নাকি এ জগতে সকলি বিরূপ ?
দয়াময় নাম শুধু শান্তির আধার,
হরি সত্য সনাতন কর জীব সার।

শ্রীকিরণ চন্দ্র দত্ত।

উদ্বোধন।

[১ম বর্ষ।] ১৫ই বৈশাখ। (১৩০৬ সাল) [৮ম সংখ্যা।]

বর্ত্তমান ভারত।

স্বামী বিবেকানন্দ লিখিত।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

যদ্যপিও প্রাচীন টায়র, কার্থেজ এবং অপেক্ষাকৃত অর্ব্বাচীন কালে ভেনিসাদি বাণিজ্যপ্রাণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য বহুপ্রতাপশালী হইয়াছিল, কিন্তু তথায়ও যথার্থ বৈশ্যের অভ্যুদয় ঘটে নাই।

প্রাচীন রাজকুলের বংশধরেরাই সাধারণ ব্যক্তিগণ ও আপনাদিগের দাসবর্গের সহায়তায় ঐ বাণিজ্য করাইতেন এবং তাহার উদ্বৃত্ত ভোগ করিতেন। দেশশাসনাদি কার্য্যে সেই কতিপয় পুরুষ সওয়ায়, অন্য কাহারও কোন বাঙ্‌নিষ্পত্তির অধিকার ছিল না। মিসরাদি প্রাচীন দেশসমূহে ব্রাহ্মণ্যশক্তি অল্পদিন প্রাধান্য উপভোগ করিয়া রাজন্যশক্তির অধীন ও সহায় হইয়া, বাস করিয়াছিল চীনদেশে কংফুছের (Confucius) প্রতিভায় কেন্দ্রীভূত রাজশক্তি, সার্দ্ধ দ্বিসহস্র সংসরেরও অধিককাল পৌরোহিত্য শক্তিকে আপন স্বেচ্ছানুসারে পালন করিতেছে, এবং গত দুই শতাব্দী ধরিয়া সর্ব্বগ্রাসী তিব্বতীয় লামারা রাজগুরু হইয়াও সর্ব্ব প্রকারে সম্রাটের অধীন হইয়া কালযাপন করিতেছেন।

ভারতবর্ষে রাজশক্তির জয় ও বিকাশ অন্যান্য প্রাচীন সভ্য জাতিদের অপেক্ষা অনেক পরে হইয়াছিল, এবং তজ্জন্যই চীন মিসর বাবিলাদি জাতিদিগের অনেক পরে ভারতে সাম্রাজ্যের অভ্যুত্থান। এক য়াহুদী জাতির মধ্যে রাজশক্তি বহু চেষ্টা করিয়াও পৌরোহিত্য শক্তির উপর স্বীয় আধিপত্য বিস্তারে সম্পূর্ণ অক্ষম হইয়াছিল। বৈশ্যবর্গও সে দেশে কখনও ক্ষমতা লাভ করে নাই। সাধারণ প্রজা পৌরোহিত্য-বন্ধন-মুক্ত হইবার চেষ্টা করিয়া, অভ্যন্তরে ইশাহি ইত্যাদি ধর্ম্মসম্প্রদায়-সংঘর্ষে ও বাহিরে মহাবল রোমক রাজ্যের পেষণে উৎসন্ন হইয়া গেল।

যে প্রকার প্রাচীন যুগে রাজশক্তির পরাক্রমে ব্রাহ্মণ্যশক্তি বহু চেষ্টা করিয়াও পরাজিত হইয়াছিল। সেই প্রকার এই যুগে নবোদিত বৈশ্যশক্তির প্রবলাঘাতে, কত রাজমুকুট ধূল্যবলুণ্ঠিত হইল, কত রাজদণ্ড চিরদিনের মত ভগ্ন হইল। যে কয়েকটী সিংহাসন সুসভ্য দেশে কথঞ্চিৎ প্রতিষ্ঠিত রহিল, তাহাও তৈল লবণ শর্করা বা সুরা ব্যবসায়ীদের পণ্যলব্ধ প্রভূত ধনরাশির প্রভাবে আমীর ওমরাহ সাজিয়া নিজ নিজ গৌরব বিস্তারের আস্পদ বলিয়া।

যে নূতন মহাশক্তির প্রভাবে মুহূর্ত্ত মধ্যে তড়িৎপ্রবাহ এক মেরুপ্রান্ত হইতে প্রান্তান্তরে বার্ত্তা বহন করিতেছে, মহাচলের ন্যায় তুঙ্গ তরঙ্গায়িত মহোদধি যাহার রাজপথ, যাহার নির্দ্দেশে এক দেশের পণ্যচয় অবলীলাক্রমে অন্যদেশে সমানীত হইতেছে এবং আদেশে সম্রাট্‌কুলও কম্পমান, সংসারসমুদ্রের সর্ব্বজয়ী এই বৈশ্যশক্তির অভ্যুত্থানরূপ মহাতরঙ্গের শীর্ষস্থ শুভ্র ফেনরাশির মধ্যে ইংলণ্ডের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত।

অতএব ইংলণ্ডের ভারতাধিকার বাল্যে শ্রুত ঈষামসি বা বাইবেল পুস্তকের ভারতজয়ও নহে, পাঠান মোগলাদি সম্রাড্‌গণের ভারতবিজয়ের ন্যায়ও নহে। কিন্তু ঈষামসি, বাইবেল, রাজপ্রাসাদ, চতুরঙ্গিনিবলের ভূকম্পকারী পদক্ষেপ, তূরীভেরীর নিনাদ, রাজসিংহাসনের বহু আড়ম্বর, এ সকলের পশ্চাতে বাস্তব ইংলণ্ড বিদ্যমান। সে ইংলণ্ডের ধ্বজা—কলের চিম্‌নি, বাহিনী— পণ্যপোত, যুদ্ধক্ষেত্র—জগতের পণ্যবীথিকা এবং সম্রাজ্ঞী—স্বয়ং সুবর্ণাঙ্গী শ্রী।

এই জন্যই পূর্বে বলিয়াছি, এটি অতি অভিনব ব্যাপার ইংলণ্ডের ভারত-বিজয়। এ নূতন মহাশক্তির সজ্ঘর্ষে ভারতে কি নূতন বিপ্লব উপস্থিত হইবে, ও তাহার পরিণামে ভারতের কি পরিবর্তন প্রসাধিত হইবে, তাহা ভারতেতিহাসের গত কাল হইতে অনুমিত হইবার নহে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্র, বৈশ্য, শূদ্র চারি বর্ণ পর্য্যায়ক্রমে পৃথিবী ভোগ করে। প্রত্যেক বর্ণেরই রাজত্বকালে কতকগুলি লোকহিতকর এবং অপর কতকগুলি অহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান হয়।

পৌরোহিত্যশক্তির ভিত্তি বুদ্ধিবলের উপর, বাহুবলের উপর নহে, এজন্য পুরোহিতদিগের প্রাধান্যের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাচর্চ্চার আবির্ভাব। অতীন্দ্রিয় আধ্যাত্মিক জগতের বার্ত্তা ও সহায়তার জন্য সর্ব্বমানব-প্রাণ সদাই ব্যাকুল। সাধারণের সেথায় প্রবেশ অসম্ভব। জড়ব্যূহ ভেদ করিয়া ইন্দ্রিয়সংযমী অতীন্দ্রিয়দর্শী সত্ত্বগুণপ্রধান পুরুষেরাই সে রাজ্যে গতিবিধি রাখেন, সংবাদ আনেন এবং অন্যকে পথ প্রদর্শন করেন। ইহারাই পুরোহিত, মানবসমাজের প্রথম গুরু, নেতা ও পরিচালক।

দেববিৎ পুরোহিত দেববৎ পূজিত হয়েন। মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া আর তাঁহাকে অন্নের সংস্থান করিতে হয় না। সর্ব্ব ভোগের অগ্রভাগ দেবপ্রাপ্য, দেবতাদের মুখাদি পুরোহিত-কুল। সমাজ তাঁহাকে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে যথেষ্ট সময় দেয়, কাজেই পুরোহিত চিন্তাশীল হয়েন এবং তজ্জন্যই পুরোহিত-প্রাধান্যে প্রথম বিদ্যার উন্মেষ। দুদ্ধর্ষ ক্ষত্রিয়সিংহের এবং ভয়কম্পিত প্রজা-অজাযূথের মধ্যে পুরোহিত দণ্ডায়মান। সিংহের সর্ব্বনাশেচ্ছা পুরোহিত-হস্তধৃত অধ্যাত্মরূপ কশার তাড়নে নিয়মিত। ধনজন-মদোন্মত্ত ভূপালবৃন্দের যথেচ্ছাচাররূপ অগ্নিশিখা সকলকেই ভস্ম করিতে সক্ষম, কেবল ধনজনহীন দরিদ্র তপোবলসহায় পুরোহিতের বাণীরূপ জলে সে অগ্নি নির্ব্বাপিত। পুরোহিত-প্রাধান্যে সভ্যতার প্রথম আবির্ভাব, পশুত্বের উপর দেবত্বের প্রথম বিজয়, জড়ের উপর চেতনের প্রথম অধিকারবিস্তার, প্রকৃতির ক্রীতদাস জড়পিণ্ডবৎ মনুষ্যদেহের মধ্যে অস্ফুটভাবে যে অধীশ্বরত্ব লুক্কায়িত, তাহার প্রথম বিকাশ। পুরোহিত জড় চৈতন্যের প্রথম বিভাজক, ইহপর-লোকের সংযোগসহায়, দেবমনুষ্যের বার্ত্তাবহ, রাজা-প্রজার মধ্যবর্ত্তী সেতু। বহুকল্যাণের প্রথমাঙ্কুর, তাঁহারই তপোবলে, তাঁহারই বিদ্যানিষ্ঠায়, তাঁহারই ত্যাগমন্ত্রে, তাঁহারই প্রাণসিঞ্চনে সমুদ্ভূত; এ জন্যই সর্ব্বদেশে প্রথম পূজা তিনিই পাইয়াছিলেন, এ জন্যই তাঁহাদের স্মৃতিও আমাদের পক্ষে পবিত্র।

দোষও আছে, প্রাণ-স্ফূর্ত্তির সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যুবীজ উপ্ত। অন্ধকার আলোর সঙ্গে সঙ্গে চলে। প্রবল দোষও আছে, যাহা কালে সংযত না হইলে সমাজের বিনাশ সাধন করে। স্থূলের মধ্য দিয়া শক্তির বিকাশ সার্ব্বজনীন প্রত্যক্ষ, অস্ত্রশস্ত্রের ছেদভেদ, অগ্ন্যাদির দাহিকাদিশক্তি, স্থূল

প্রকৃতির প্রবল সংঘর্ষ সকলেই দেখে, সকলেই বুঝে। ইহাতে কাহারও সন্দেহ হয় না, মনের দ্বিধা থাকে না। কিন্তু যেখানে শক্তির আধার ও বিকাশকেন্দ্র কেবল মানসিক, যেখানে বল কেবল শব্দবিশেষে, উচ্চারণবিশেষে, জপবিশেষে, বা অন্যান্য মানসিক প্রয়োগবিশেষে, সেথায় আলোয় আঁধার মিশিয়া আছে; বিশ্বাসে সেথায় জোয়ার ভাটা স্বাভাবিক, প্রত্যক্ষেও সেথায় কখন কখন সন্দেহ হয়। যেথায় রোগ, শোক, ভয়, তাপ, ঈর্ষা, বৈরনির্য্যাতন সমস্তই উপস্থিত বাহুবল ছাড়িয়া, স্থূল উপায় ছাড়িয়া ইষ্টসিদ্ধির জন্য কেবল স্তম্ভন, উচ্চাটন, বশীকরণ, মারণাদির আশ্রয় গ্রহণ করে, স্থূল সূক্ষ্মের মধ্যবর্ত্তী এই কুজ্ঝটিকাময়, প্রহেলিকাময় জগতে যাঁহারা নিয়ত বাস করেন, তাঁহাদের মধ্যেও যেন একটা ঐপ্রকার ধূম্রময়ভাব আপনা আপনি প্রবিষ্ট হয়। সে মনের সম্মুখে সরল রেখা প্রায়ই পড়ে না, পড়িলেও মন তাহাকে বক্র করিয়া লয়। ইহার পরিণাম অসরলতা—হৃদয়ের অতি সঙ্কীর্ণ, অতি অনুদার ভাব; আর সর্ব্বাপেক্ষা মারাত্মক, নিদারুণ ঈর্ষাপ্রসূত অপরাসহিষ্ণুতা! যে বলে আমার দেবতা বশ, রোগাদির উপর আধিপত্য, ভূত-প্রেতাদির উপর বিজয়, যাহার বিনিময়ে আমার পার্থিব সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, ঐশ্বর্য্য, তাহা অন্যকে কেন দিব? আবার তাহা সম্পূর্ণ মানসিক। গোপন করিবার সুবিধা কত! এ ঘটনাচক্রমধ্যে মানব-প্রকৃতির যাহা হইবার তাহাই হয়; সর্ব্বদা আত্মগোপন অভ্যাস করিতে করিতে স্বার্থপরতা ও কপটতার আগমন, ও তাহার বিষময় ফল। কালে গোপনেচ্ছার প্রতিক্রিয়াও আপনার উপর আসিয়া পড়ে। বিনাভ্যাসে বিনা বিতরণে প্রায় সর্ব্ববিদ্যার নাশ, যাহা বাকী থাকে তাহাও অলৌকিক দৈব উপায়ে প্রাপ্ত বলিয়া, আর তাহাকে মার্জ্জিত করিবারও (নূতন বিদ্যার কথা ত দূরে থাকুক) চেষ্টা বৃথা বলিয়া ধারণা হয়। তাহার পর বিদ্যাহীন, পুরুষকারহীন, পূর্ব্বপুরুষদের নামমাত্রধারী পুরোহিতকুল, পৈতৃক অধিকার, পৈতৃক সম্মান, পৈতৃক আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য যেন তেন প্রকারেণ চেষ্টা করেন; অন্যান্য জাতির সহিত কাজেই বিষম সঙ্ঘর্ষ। [ক্রমশঃ]

ধম্মপদ।

৬ষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিতের পর।

বাবু চারুচন্দ্র বসু অনুবাদিত।

অক্কোচ্ছি মং অবধি মং অজিনি মং অহাসি মে।

যে চ তং উপনয়হন্তি বেরং তেসং ন সম্মতি॥ ৩

অন্বয়—মং অক্কোচ্ছি, মং অবধি, মং অজিনি, মে অহাসি, যে চ তং উপনয়হন্তি তেসং বেরং ন সম্মতি।

সংস্কৃত—মাং অক্রোশীৎ, মাং অবধীৎ, মাং অজৈষীৎ, মে অহার্ষীৎ যে চ তং উপনহ্যন্তি তেষাং বৈরং ন শাম্যতি।

অনুবাদ—আমায় তিরস্কার করিল, আমায় প্রহার করিল, আমাকে পরাস্ত করিল, আমার দ্রব্য অপহরণ করিল, এই চিন্তা যাহারা মনে সর্ব্বদা পোষণ করে, তাহাদের বৈরভাব কখনই শান্ত হয় না। (ক্রমশঃ)

স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী

সন্ন্যাসীর গীতি—১২শ সংস্করণ। স্বামীজী-রচিত 'Song of the Sannyasin'-নামক ইংরেজী কবিতা ও উহার পদ্যে বঙ্গানুবাদ মূল্য ২০ পয়সা।

ঈশদূত যীশুখৃষ্ট—৫ম সংস্করণ ভগবান ঈশার জীবনালোচনা—মূল্য ০'৫০ উদ্বোধন-গ্রাহক পক্ষে মূল্য ০'৩৫।

সরল রাজযোগ—৫ম সংস্করণ। স্বামীজী আমেরিকায় তাঁহার শিষ্যা সারা সি. বুলের বাড়িতে কয়েকজন অন্তরঙ্গকে 'যোগ' সম্বন্ধে যে বিশেষ উপদেশ দান করেন বর্তমান পুস্তক তাহারই ভাবানুবাদ মূল্য ০'৭০

পত্রাবলী—১ম ও ২য় ভাগ। সম্পূর্ণ পরিবর্ধিত সংস্করণ। [illegible] ১০৪০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। স্বামীজীর বহু অপ্রকাশিত পত্র ইহাতে সংযোজিত হইয়াছে। তারিখ অনুযায়ী পত্রগুলি সাজানো হইয়াছে পরিচয়- এবং নির্ঘণ্ট-সংযুক্ত। মনোরম বাঁধাই স্বামীজীর সুন্দর ছবি-সংবলিত প্রতি ভাগ মূল্য [illegible] উদ্বোধন গ্রাহক-পক্ষে মূল্য [illegible]

ভারতে বিবেকানন্দ—১৪শ সংস্করণ। আমেরিকা হইতে প্রত্যাবর্তনের পর স্বামীজীর ভারতীয় বক্তৃতাবলীর উৎকৃষ্ট অনুবাদ ৫৬৯ পৃষ্ঠা, মূল্য ৫'০০ উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে মূল্য ৪'৫০।

দেববাণী—৭ম সংস্করণ। আমেরিকার 'সহস্র দ্বীপোদ্যান'-নামক স্থানে কয়েকজন অন্তরঙ্গ শিষ্যকে স্বামীজী যে-সকল অমূল্য উপদেশ প্রদান করেন, ঐগুলির একত্র সমাবেশ। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি, ২১৪ পৃষ্ঠা, মূল্য—২৲ উদ্বোধন গ্রাহক-পক্ষে মূল্য ১'৮০।

শিক্ষাপ্রসঙ্গ—৪র্থ সংস্করণ। শিক্ষা-সম্বন্ধে স্বামীজীর বাণীসকল সংকলিত ও ধারাবাহিক-ভাবে সন্নিবেশিত। ১৮৮ পৃষ্ঠা; মূল্য ১'৭৫।

কথোপকথন—৭ম সংস্করণ। স্বামীজীর ছবিযুক্ত। ডবল ক্রাউন, ১৬ পেজি, ১৪২ পৃষ্ঠা। মূল্য ১'২৫ উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে মূল্য ১'১৫

মদীয় আচার্যদেব—স্বামী বিবেকানন্দ-প্রণীত, ১১শ সংস্করণ, ৬৭ পৃষ্ঠা। স্বীয় গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনী ও শিক্ষা সম্বন্ধে আমেরিকাবাসীদের নিকট স্বামীজীর বিবৃতি। মূল্য ০'৭৫; উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে মূল্য ০'৬৫।

জ্ঞানযোগ-প্রসঙ্গে—বিভিন্ন বক্তৃতার সারসংক্ষেপ—ইংরেজীতে প্রকাশিত Discourses on Jnana Yoga পুস্তকের অনুবাদ। 'স্বামীজীর বাণী ও রচনা' হইতে পৃথক্ পুস্তকাকারে প্রকাশিত। আত্মতত্ত্ব ও বেদান্ত-বিষয়ক বহু কঠিন বিষয় সরলভাবে আলোচিত। জ্ঞানযোগ' গ্রন্থ পড়িবার পক্ষে সহায়ক। মূল্য দুই টাকা।

স্বামি-শিষ্য-সংবাদ—(পূর্বকাণ্ড — ১৩শ সংস্করণ; উত্তরকাণ্ড—১১শ সংস্করণ)। শ্রীশরৎচন্দ্র চক্রবর্তী প্রণীত। স্বামী বিবেকানন্দের মতামত অল্প কথায় জানিবার উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। স্বামীজীর জীবিতকালে তাঁহার সহিত প্রশ্নোত্তরচ্ছলে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য-দেশীয় আচার-নীতি, দর্শন-বিজ্ঞানাদি এবং ধর্ম ও সমাজগত সমস্যামূলক নানা বিষয়ের বিশদ আলোচনা। সরস ও হৃদয়গ্রাহী এই সব বর্ণনা সত্যই আনন্দদায়ক। বর্তমান যুগের বহু সমস্যার আদর্শানুগ সমাধানও ইহাতে পাওয়া যাইবে। জীবনতত্ত্ব বিষয়ে এই পুস্তকদ্বয় অমূল্য রত্নের সন্ধান দিবে। ২২০ ও ২১০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য প্রতি কাণ্ড ২'২৫।

মহাপুরুষ-প্রসঙ্গ—১৬শ সংস্করণ। ১৫৪ পৃষ্ঠা। ইহাতে রামায়ণ, মহাভারত, জড়ভরতের উপাখ্যান, প্রহ্লাদচরিত্র, জগতের মহত্তম আচার্যগণ, ঈশদূত যীশুখ্রীষ্ট, ভগবান্ বুদ্ধ প্রভৃতি বিষয় আছে। কোমলমতি বালকদিগের চরিত্রগঠনে ও ভারতীয় সংস্কৃতিতে তাহাদিগকে শ্রদ্ধাবান্ করিতে ইহা বিশেষ সহায়তা করিবে, মূল্য ৩'০০; উদ্বোধন গ্রাহক-পক্ষে মূল্য ২'৭০।

প্রাপ্তিস্থান :—উদ্বোধন কার্যালয়, বাগবাজার, কলিকাতা ৩

শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা এবং স্বামী বিবেকানন্দ-সম্বন্ধীয় পুস্তকাবলী

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী ও শিক্ষা সম্বন্ধে অপূর্ব পুস্তক। স্বামী সারদানন্দ-প্রণীত। দুই ভাগে বেক্সিন-বাঁধাই। মূল্য—১ম ভাগ ১০ ২য় ভাগ ১০৲ উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে " ৯৲ " ৯.০০
সাধারণ বাঁধাই পাঁচ ভাগে

মূল্য—১ম ভাগ	২.৫০	উঃ গ্রাঃ পক্ষে	২.২৫
২য় "	৪.৭৫	"	৪.২৫
৩য় "	৩.৫০	"	৩.১৫
৪র্থ "	৩.০০	"	২.৭০
৫ম "	৩.৫০		

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি—৭ম সংস্করণ। অক্ষয়কুমার সেন-প্রণীত। সুললিত কবিতায় শ্রীশ্রীঠাকুরের বিস্তারিত জীবনী ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা সম্বন্ধে এরূপ গ্রন্থ আর নাই। ৬৪০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য—বোর্ড-বাঁধাই ১৫, উদ্বোধন-গ্রাহক পক্ষে ১৪৲।

পরমহংসদেব—ষষ্ঠ সংস্করণ। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু-প্রণীত। সুললিত ভাষায় অল্প কথায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দিব্য জীবনবেদ। ১৭০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য—১.৭৫।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ—১২শ সংস্করণ শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য-প্রণীত। বালক-বালিকাদিগের জন্য সরল ভাষায় লিখিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনী। মূল্য—০.৭০।

শ্রীরামকৃষ্ণ-চরিত—২য় সংস্করণ। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চৌধুরী-প্রণীত। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাবলীর অপূর্ব সমাবেশ। বোর্ড-বাঁধাই [illegible] মূল্য—[illegible]।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ—১৮শ সংস্করণ। সুরেশচন্দ্র দত্ত-সংগৃহীত ১৩৮ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য—৩৲।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-উপদেশ—স্বামী ব্রহ্মানন্দ সঙ্কলিত। ২২শ সংস্করণ। মূল্য ৭৫ পয়সা কাপড়ে বাঁধাই ১৲ টাকা

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-মহিমা—শ্রীরামকৃষ্ণ-চরিত-মহাকাব্য শ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথির অমর লেখক অক্ষয়কুমার সেনের লেখনী-প্রসূত [illegible] মূল্য [illegible]

রামকৃষ্ণের কথা ও গল্প—১৪শ সংস্করণ। স্বামী [illegible]-প্রণীত। এই সুচিত্রিত সুমুদ্রিত সুলভ পুস্তকখানি ছেলেমেয়েদের ধর্মীয় ও নৈতিক জীবনগঠনের সহায়তা করিবে। মূল্য—২.০০।

শ্রীমা সারদাদেবী—৪র্থ সংস্করণ। স্বামী গম্ভীরানন্দ-প্রণীত। শ্রীশ্রীমায়ের বিস্তারিত জীবনীগ্রন্থ। পৃষ্ঠা [illegible] মূল্য ৮৲।

জননী সারদাদেবী—স্বামী নির্বেদানন্দ প্রণীত। পৃষ্ঠা [illegible] মূল্য [illegible]

শ্রীশ্রীমা সারদা—স্বামী নিরাময়ানন্দ প্রণীত। পৃষ্ঠা ৯৮ মূল্য ১.৫০।

শ্রীশ্রীমায়ের কথা—শ্রীশ্রীমায়ের সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ সন্তানদের ডায়েরী হইতে সংগৃহীত সারগর্ভ উপদেশ। [illegible] সান্ত্বনাদায়ক ও অধ্যাত্মজীবনের পথপ্রদর্শক। দুই ভাগে সম্পূর্ণ। প্রতি ভাগ [illegible]।

মাতৃসান্নিধ্যে—২য় সংস্করণ; স্বামী ঈশানানন্দ-প্রণীত। পৃষ্ঠা ২৫৬; মূল্য ৪৲ টাকা।

যুগনায়ক বিবেকানন্দ—স্বামী গম্ভীরানন্দ-প্রণীত। স্বামীজীর অধুনাতন মূল্যবান প্রামাণিক জীবনীগ্রন্থ। তিন খণ্ডে প্রকাশিত। প্রতি খণ্ড ৮৲ করিয়া। একত্র লইলে ২৩৲। উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ২২৲।

স্বামী বিবেকানন্দ—৩য় সংস্করণ, শ্রীপ্রমথনাথ বসু-রচিত। দুই খণ্ডে প্রকাশিত স্বামীজীর জীবনী। ৯৬০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য—প্রতি খণ্ড ৪৲। উদ্বোধন গ্রাহক-পক্ষে [illegible] দুই খণ্ড একত্র বাঁধাই [illegible]

স্বামী বিবেকানন্দ—১১শ সংস্করণ। শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য-প্রণীত। স্বামীজীর জীবনের প্রধান প্রধান [illegible] কথায় [illegible] হইয়াছে। মূল্য [illegible]

বিবেকানন্দ-চরিত—৯ম সংস্করণ। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রণীত। মূল্য ১০.০০

পাঞ্চজন্য—স্বামী চণ্ডিকানন্দ-রচিত পাঁচ শতের অধিক সঙ্গীতের সমাবেশ। মাতৃসঙ্গীত, শিবসঙ্গীত, গুরুসঙ্গীত, মহামানব সঙ্গীত, রামকৃষ্ণ-লীলাগীতি, সারদা-লীলাগীতি ও দেশাত্মবোধক সঙ্গীত মূল্য—ছয় টাকা

উদ্বোধন-প্রকাশিত অন্যান্য পুস্তকাবলী

রামানুজ-চরিত—৫ম সংস্করণ। শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য-প্রণীত। এই পুস্তক-পাঠে চরিত-কথার গল্পপ্রিয় পাঠক এবং ভক্তগণ ধর্ম ও ধর্মতত্ত্বের সন্ধান পাইবেন। মূল্য ২'০০।

শঙ্কর-চরিত—শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য-প্রণীত—৫ম সংস্করণ। আচার্য শঙ্করের অদ্ভুত জীবনী অতি প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত। মূল্য ১৲।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বেদান্ত—স্বামী বিবেকানন্দ প্রণীত। ১৮৯৬ খৃঃ মার্চ মাসে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত বক্তৃতা এবং তৎ-পরবর্তী প্রশ্নোত্তর ও আলোচনা। বেদান্তের মূলতত্ত্ব অতি স্পষ্টভাবে ব্যক্ত। প্রশ্নোত্তর ও আলোচনায় ভারতীয় কৃষ্টি ও হিন্দুধর্মের মূল ভাব সাহসিকতার সহিত সরলভাবে উপ-স্থাপিত। পৃষ্ঠা ৫৫; মূল্য এক টাকা।

শিব ও বুদ্ধ—৭ম সংস্করণ। ভগিনী নিবেদিতা-প্রণীত। ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য রচিত সরল ও চিত্তাকর্ষক আখ্যান। মূল্য ০'৬৫।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ—শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সর্বপ্রথম অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের সুবিস্তৃত ধারাবাহিক জীবনী। মূল্য—[illegible]।

ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ—৭ম সংস্করণ। স্বামী ব্রহ্মানন্দের কথোপকথন এবং পত্রাবলীর সংগ্রহ। প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু-লিখিত সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা। মূল্য ২'৫০।

মহাপুরুষ শিবানন্দ—স্বামী অপূর্বানন্দ-প্রণীত। ৩য় সংস্করণ। শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজীর বিস্তারিত জীবনী। মূল্য—৫'০০।

শিবানন্দ-বাণী—২য় ভাগ—৩য় সংস্করণ। স্বামী অপূর্বানন্দ সংকলিত। মূল্য—[illegible]।

[illegible]-চরিত—স্বামী [illegible]-প্রণীত, ৩য় সংস্করণ, ২২৮ পৃষ্ঠা। [illegible] বিস্তৃত জীবনবৃত্তান্ত বাংলা [illegible] আচার্যের জীবন[illegible] এই গ্রন্থে [illegible] মূল্য [illegible]।

স্বামী অখণ্ডানন্দ—স্বামী অন্নদানন্দ-প্রণীত। এই পুস্তকে শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্নিধানে, তিব্বতে ও হিমালয়ে, স্বামীজীর সঙ্গে, দুর্ভিক্ষে সেবাকার্য, সেবাব্রতের প্রাণপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতি অধ্যায়ে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্যের পথিকৃৎ স্বামী অখণ্ডানন্দের ধারাবাহিক জীবনী। ডিমাই সাইজ, ৩১০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৪৲।

সাধু নাগমহাশয়—শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী-প্রণীত। ১১শ সংস্করণ। যাঁহার সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন, "পৃথিবীর বহু স্থান ভ্রমণ করিলাম, নাগমহাশয়ের ন্যায় মহাপুরুষ কোথাও দেখিলাম না।"—পাঠক! তাঁহার পুণ্য জীবন-বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া ধন্য হউন। মূল্য ২'০০।

গোপালের মা—স্বামী সারদানন্দ-প্রণীত (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ হইতে সঙ্কলিত)। অতুলনীয়-সাধননিষ্ঠ, পরমভক্ত গোপালের মা-র আদর্শ জীবনের সংক্ষিপ্ত কাহিনী। মূল্য ৫০ পয়সা।

লাটু মহারাজের স্মৃতিকথা—শ্রীচন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়-প্রণীত। ২য় সংস্করণ। শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও ঠাকুরের শিষ্যবর্গ সম্বন্ধে বহু অপ্রকাশিত ঘটনাবলীর সমাবেশ। নিজ জীবনের কঠোর ত্যাগ-তপস্যার কথার অদ্ভুত প্রকাশভঙ্গীতে পাঠকগণ চমৎকৃত হইবেন। মূল্য—৪'০০।

স্বামী তুরীয়ানন্দ—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ-প্রণীত। বাল্যাবধি বেদান্তী এই মহারাজের জীবনের অদ্ভুত ঘটনাবলী-পাঠে চমৎকৃত হইবেন। ৩৪০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য—৩'৫০।

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা—শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের শিষ্যগণের সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত একত্র এই প্রথম প্রকাশিত হইল। দুই ভাগে সম্পূর্ণ। প্রতি ভাগের মূল্য—৫'৫০।

ভগিনী নিবেদিতা—স্বামী তেজসানন্দ-প্রণীত। ইহাতে তাঁহার জীবনের মুখ্য ঘটনা-বলীর সম্যক্ আলোচনা রহিয়াছে। ইহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে "ভগিনী নিবেদিতা-স্মৃতি বক্তৃতামালার" প্রথম বক্তৃতা। মূল্য—১'৫০

উদ্বোধন, ভাদ্র, ১৩৮০

বিষয়-সূচী

বিষয়-সূচী

বর্ষার
পথে
ভরসা
বাটার ওয়াটারপ্রুফ জুতো। টেকসই রবারে তৈরি, তাই সহজে জীর্ণ-ছিন্ন হবে না। ভিতরে উৎকৃষ্ট কাপড়ের আস্তর, বৃষ্টির মধ্যে হাঁটবার সময়েও পায়ের স্বাচ্ছন্দ্য বজায় থাকবে। আর তলি গোড়ালির এমনই সংযোগ যে সহজে পা হড়কাবে না।
ভালকান
পয়েন্টেড ক্যাজুয়াল
সাইজ ১-২
৬.২৫
ভালকান ক্যাজুয়াল
সাইজ ৩-১০
৭.৯৫
ভালকান
সাইজ ৩-১০
৬.৮০
ভালকান
সাইজ ৩-১০
Bata
Bata
Bata
Bata

ভালো চা বলেই
টসের
চা
এ, টস এণ্ড সন্স
ফোন
২২-৪৭৮৫
কলিকাতা—১

দিব্য বাণী

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥ ৪।১১
যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্॥ ৭।২১
যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্বকম্ ॥ ৯।২৩

—শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা

(আরাধিত সর্ব দেব আমিই হয়েছি,
বিভিন্ন দেবতা-রূপ আমিই ধরেছি।)
স্বর্গ-মুক্তি-আদি ফল যেবা চাহি যাহা
যে-ভাবে যে পূজে মোরে, তারে দিই তাহা।
সকলেই করে মোর পথানুসরণ—
(যে-কোন দেবের পূজা আমারি পূজন—
পথ যা-ই হোক নাকো, আমাতেই এসে
সব আরাধনা-পথ মিশে যায় শেষে।)

যার যাহা ভাল লাগে, শ্রদ্ধাযুত চিতে
চায় যে যে-দেবতার মূর্তি আরাধিতে
তার সেই নিজ ইষ্ট দেবতার প্রতি
দিই আমি স্থির শ্রদ্ধা—অচলা ভকতি।
ভিন্ন ভিন্ন দেবতায় পূজিছে যাহারা
শ্রদ্ধাভরে, আমারি তো পূজা করে তারা
না জানিয়া; (না জানিয়া—যিনি ভগবান
বাসুদেব, সর্ব দেবে তাঁরই অধিষ্ঠান।)

কথাপ্রসঙ্গে

মথুরার কারাগার

দেবকী সম্পর্কে কংসের ভগিনী। তাঁহার বিবাহের পর দেবকী ও তাঁহার স্বামী বসুদেবকে রথে তুলিয়া কংস যখন আনন্দে নিজেই রথ চালাইয়া লইয়া চলিয়াছেন, তখন দৈববাণী শুনিলেন যে, এই দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তানই তাঁহাকে বিনাশ করিবেন।

কংস তখনই দেবকীকে হত্যা করিয়া এই সম্ভাবনা নির্মূল করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু বসুদেবের কথায় নিরস্ত হইলেন। বসুদেব তাঁহাকে কথা দিলেন যে, দেবকী হইতে তো কংসের কোন ভয় নাই, ভয় তাঁহার সন্তান হইতে—দেবকীর সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ামাত্র তিনি তাহাকে কংসের হস্তে সমর্পণ করিবেন। কংস জানিতেন বসুদেব সত্যনিষ্ঠ, তাই তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিয়া নিরস্ত হইলেন।

দেবকী-বসুদেব গৃহে ফিরিলেন। যথাকালে প্রথম পুত্র ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরই বসুদেব যখন তাহাকে কংসের কাছে লইয়া গেলেন, কংস বিস্ময়-বিমূঢ় হইলেন - ইহাও কি সম্ভব! সত্য-রক্ষার জন্য পিতা পুত্রকে হত্যার্থে স্বহস্তে অপরের হাতে তুলিয়া দিতেছেন! তিনি বসুদেবকে পুত্রসহ গৃহে ফিরিতে বলিলেন। বলিলেন, প্রথম সন্তানকে অকারণ হত্যা করিয়া লাভ কি, ভয় যখন অষ্টমগর্ভের সন্তান হইতে। বসুদেব আশ্বস্ত হৃদয়ে ফিরিয়া গেলেন।

কিন্তু গণ্ডগোল বাধাইলেন নারদ। তিনি আসিয়া কংসের মাথায় ঢুকাইয়া দিলেন যে, কাজটি ভাল হয় নাই; কারণ, দেবতারা সব দৈত্যবধের জন্য মানুষ হইয়া আসিয়াছেন, বসুদেব প্রভৃতি যদুকুলের, নন্দ প্রভৃতি গোপকুলের সবাই দেবতা। একথা শুনিয়াই কংস দেবকী-বসুদেবকে কারারুদ্ধ করেন, পুত্রটিকেও হত্যা করেন। এই সময়েই তিনি অনুমান করেন, স্বয়ং বিষ্ণুই তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য দেবকীর অষ্টম গর্ভে জন্মিবেন।

দেবকী-বসুদেবের কারাবাস শুরু হইল। শ্রীকৃষ্ণের জন্ম পর্যন্ত তাঁহারা সেখানেই রুদ্ধ ছিলেন। কংস তাঁহাদের মুক্ত করিয়া দেন শ্রীকৃষ্ণের জন্মের কিছু পরেই এতদিন ভুল বুঝিয়া তাঁহাদের কারারুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন বলিয়া অনুতপ্ত হৃদয়ে ক্ষমা প্রার্থনাও করেন।

কেন? কারণ দেবকীর অষ্টমগর্ভের সন্তান পুত্র না হইয়া কন্যা হইয়াছে দেখিয়া তিনি বিস্ময়ে হতবাক হইয়াছিলেন! দেবকী-বসুদেবের পুত্র-রূপে শ্রীহরিই জন্ম লইবেন ভাবিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা তো হইল না! তাহা হইলে দৈববাণী মিথ্যা হইল! এই দৈববাণীতে বিশ্বাস করিয়াই তিনি অকারণে বসুদেবকে এত কষ্ট দিলেন!

কংস বসুদেব-দেবকীর কন্যাজ্ঞানে যাহাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, সেই মহামায়াও তাঁহাকে খুলিয়া কিছু বলেন নাই; কেবল বলিয়াছিলেন, 'যে তোমাকে হত্যা করিবে, সে কোথায়ও না কোথাও জন্মিয়াছে।'

বসুদেবদের তিনি আবার কারারুদ্ধ করেন ইহার অনেক বছর পরে, শ্রীকৃষ্ণের হাতে নিহত হইবার কয়েকদিন পূর্বে। কারণ, তিনি তখনই মাত্র নারদের কথায় জানিতে পারেন যে, এতদিন শ্রীহরির অবতার বলিয়া সন্দেহ করিয়া তিনি নন্দঘোষের যে পুত্রটিকে নানাভাবে হত্যা করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, সেই অদ্ভুত ছেলেটি নন্দঘোষের পুত্র নয়, দেবকীর অষ্টম গর্ভজাত বসুদেবেরই পুত্র—দৈববাণী মিথ্যা হয়

নাই, বসুদেবই তাঁহাকে ঠকাইয়াছেন।

আমরা জানি বসুদেব-দেবকীর এই দ্বিতীয়বারের কারাজীবন স্বল্পস্থায়ী—কংসকে হত্যা করিবার পরই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের মুক্ত করিয়া দেন।

এ তো গেল মথুরার কারাগারের বাহ্য বিবরণ। এই কারাগারই বসুদেব দেবকীর এবং কংসেরও একজন্মের স্বল্পকালের মুক্তি নয়, জন্ম জন্মান্তরের আবর্তনে অসংখ্য জন্ম হইতেই মুক্তির ক্ষেত্র হইয়া উঠিয়াছিল, সর্বদেবতার আবির্ভাবে মহাতীর্থ হইয়া হইয়া উঠিয়াছিল; বসুদেব দেবকীকে তাঁহারা দর্শন দিয়াছিলেন। স্বয়ং ভগবানও তাঁহাদের প্রত্যক্ষ করাইয়াছিলেন যে তিনিই তাঁহাদের পুত্ররূপে জন্মিয়াছেন, তিনিই তাঁহাকে নন্দগৃহে রাখিয়া আসিতে আদেশ করেন। শ্রীভগবানের এই লীলা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন বলিয়াই সত্যনিষ্ঠ বসুদেবের পক্ষে সম্ভব হইয়াছিল তাঁহার আদেশে পুত্রকে নন্দগৃহে রাখিয়া আসা। শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণমূর্তিতে কারাগারেই তাঁহাদের বলিয়াছিলেন, 'আমাকে পুত্ররূপে বা ব্রহ্মরূপে—যেভাবেই চিন্তা কর, তোমরা মুক্ত হয়ে যাবে।'

কারাগার কংসের মুক্তিক্ষেত্র হইল কিভাবে? এই কারাগারই কংসকে মুক্তিসাধনায় নিযুক্ত করে। দেবকী অষ্টমবার সন্তানসম্ভবা হইয়াছেন শুনিয়া কংস যেদিন তাঁহাকে দেখিতে কারাগারে আসেন, এই মুক্তির সাধনার আরম্ভ সেইদিন হইতেই। তিনি কারাগারে আসিয়া দেখিলেন দেবকীর অভূতপূর্ব রূপান্তর হইয়াছে—মানবী নন আর, তিনি দেবীতে রূপায়িত হইয়াছেন, তাঁহার অঙ্গের ছটায় কারাকক্ষ ভরিয়া উঠিয়াছে! কংস সেই মুহূর্তেই নিঃসংশয় হইলেন, শ্রীহরি নিশ্চয়ই দেবকীর গর্ভে আসিয়াছেন, তাই দেবকীর এই পরিবর্তন। সেই সঙ্গে দৈববাণীর কথা স্মরণ করিয়া দারুণ ভয় পাইলেন তিনি। এই নিদারুণ ভীতিই তাঁহাকে অনুক্ষণ শ্রীহরির চিন্তায় নিযুক্ত রাখিল—কি করিয়া তিনি শ্রীহরির হাত হইতে নিজ জীবন রক্ষা করিবেন! খাওয়া বসা, চলাফেরা, শোয়া জাগা অনুক্ষণ এভাবে শ্রীহরির চিন্তা চলিতে লাগিল। তাঁহার মন ভক্তিতে নয়, ভয়ে তন্ময়—শ্রীহরিময়— হইল। এই তন্ময়তাই তাঁহার মুক্তির কারণ—যে তন্ময়তার সূত্রপাত মথুরায় তাঁহার নিজেরই কারাগারের একটি দৃঢ়-নিবদ্ধ-দ্বার কক্ষের সম্মুখে।

মথুরার কারাগার তাই যেমন দেবকী-বসুদেব ও কংসের জাগতিক জীবনের বহু হৃদয়বিদারক বেদনার অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র হইয়াছিল, তেমন হইয়াছিল অন্তর্জীবনের পরম আনন্দের, পরম প্রাপ্তির ক্ষেত্রও।

পথ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ

'চরম সত্তা একটিই, বিপ্রগণ তাঁহাকেই ইন্দ্র মিত্র বরুণ প্রভৃতি বহু নামে অভিহিত করেন'—ভারত যখন বেদের এই বাণী বিস্মৃত হওয়ায় ভগবানের আরাধনার, ভগবানলাভের বিভিন্ন পথ লইয়া বিরোধ বাধিতেছিল, ভগবান তখন শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়া ঘোষণা করেন যে, জ্ঞান ভক্তি কর্ম যোগ প্রভৃতি যে পথ ধরিয়াই চলুক না কেন, সব পথই চরমে মানুষকে সেই ভগবানের কাছে পৌঁছাইয়া দেয়। ভগবানলাভের জন্য প্রয়োজন তাঁহাতে অনন্যচিত্ত হওয়া—সমগ্র মন তাঁহাতে দেওয়া, অনুক্ষণ তাঁহাতে চিত্ত স্থির রাখা, তন্ময় হইয়া যাওয়া; জ্ঞানীর তাঁহাতে নিজেকে মিশাইয়া দেওয়ার—তাঁহার সহিত একত্ববোধের সাধনা, ভক্তের শরণাগতির সাধনা, কর্মীর তাঁহাকে যন্ত্রিরূপে ও নিজেকে নিজের যন্ত্ররূপে—তাঁহার

যন্ত্ররূপে দেখার সাধনা, যোগীর চিত্তবৃত্তি-নিরোধের সাধনা—সবই এই তন্ময়তালাভেরই সাধনা। সনাতন ধর্মের অদ্বৈতবাদী, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী এবং ভগবানের বিভিন্ন নামরূপের আরাধনা সম্বলিত বিবিধ দ্বৈতবাদী সম্প্রদায়ের সববিধ সাধনার লক্ষ্য এই তন্ময়তার মাধ্যমে একই ভগবানলাভ।

পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মপথ

যাঁহাকে ভগবান বলি, তিনিই আমাদের স্বরূপ। ভগবানলাভ আর আত্মজ্ঞানলাভ জ্ঞানলাভ তাই একই কথা। কেবল সনাতন ধর্মের নয়, পৃথিবীর সমস্ত ধর্মেরই একমাত্র লক্ষ্য, মানুষকে এই চরম সত্যের দিকে অগ্রসর করানো।

তবে দেশগত, সমাজগত পরিবেশভেদে এই সত্যলাভের দিকে আগাইয়া যাইবার পথ বিভিন্ন হয়। যে পরিবেশে শিশুকাল হইতে আমরা বাস করি, আমাদের চিন্তা, আচরণ প্রভৃতিও সেরূপ হইয়া উঠে। আমাদের রুচিও এই কারণে বিভিন্ন হয়—দৈহিক এবং মানসিক দুই-ই। যে শিশুটি শিশুকাল হইতে ভারতবর্ষে থাকিয়া বড় হইয়াছে, তাহারই জীবনযাত্রার রুচি, আচরণ সবই অন্য প্রকার হইত যদি জন্মের পরই তাহাকে ইউরোপের কোন দেশে লইয়া গিয়া মানুষ করা হইত। তাহার আহারের রুচি, পোশাকের রুচি প্রভৃতি অন্য প্রকার হইত, ভারতীয় থাকিত না। তেমনি হিন্দুসমাজে যে বাড়িয়া উঠিয়াছে তাহাকে কোন মুসলমান পরিবারে বা খৃষ্টান পরিবারে শিশুকাল হইতে রাখিয়া দিলে তাহার ঈশ্বর-বিষয়ক ধারণাও তদনুরূপ হইত। কোন পূজা-মণ্ডপ বা দেবমন্দিরে যাইলে তাহার মনে যে ভাব জাগিবার কথা, তখন সে-সব স্থানে যাইলে সে-ভাব তাহার মনে উঠিত না ; কিন্তু একই ভাবে মন নিষ্নাত হইত মসজিদ বা গির্জায় যাইলে। একই মানবমন, একই ব্যক্তির মন, একই প্রতিক্রিয়ায় একই রূপে পরিবর্তিত—কিন্তু প্রতিক্রিয়া-সৃষ্টির পরিবেশ বিভিন্ন, অনুষ্ঠান বিভিন্ন। মনকে একই ভগবন্মুখী করিবার জন্য বিভিন্ন ধর্মে ভগবান সম্বন্ধে ধারণাও বিভিন্ন। এভাবে বিভিন্ন পরিবেশে মনের উন্নতির জন্য, ভগবানলাভের দিকে অগ্রগতির জন্য তাই সেই সব মনের উপযোগী বিভিন্ন ভাব ও পদ্ধতির, বিভিন্ন পথের প্রয়োজন।

তাই সব দেশের সব সমাজের লোককে ভগবন্মুখী করার জন্য একই পথ দেখানো যায় না। একথাও বলা যায় না, একই পথে না চলিলে সত্যলাভ হইবে না। যেমন এক বিশেষ অঞ্চলের লোকে যেভাবে খাদ্য প্রস্তুত করিয়া খায়, বলা চলে না, পৃথিবীর সকলেই সেভাবে না খাইলে তাহাদের শরীরের পুষ্টি হইবে না। যেমন, শিশুকাল হইতে কোন পরিবেশে, কোন অঞ্চলে বাস করার দরুন কোন বিশেষ খাদ্যদ্রব্য খাইতে আমার সবচেয়ে বেশী ভাল লাগে বলিয়া বলা চলে না, সকলের পক্ষেই সেটি সর্বাধিক প্রিয় খাদ্য।

আবার, একই পরিবেশে সব মানুষের রুচি যে একইরূপ হইবে, এমন কোন কথা নাই। কাহারো মন অধিক বিচার-প্রবণ, কাহারও বা ভাবপ্রবণ, কাহারো বা ভাব বিচার প্রভৃতি অপেক্ষা কাজ করিবার দিকে ঝোঁক বেশী। যাহার ঝোঁক যে দিকে বেশী, সেদিক দিয়াই তাহার মনকে সত্যাভিমুখী করার ব্যবস্থা থাকিলে সানন্দে সে সে-পথে অগ্রসর হইতে পারে, সহজে পারে। আবার, ভাল লাগিলেও সব পথে সকলে চলিতে পারে না। সকলকে একই পথে চলিতে বলিলে অধিকাংশের পক্ষেই চলা আদৌ সম্ভব হইবে না।

পূর্বোক্ত ব্যবস্থা,—দেশগত সমাজগত পরিবেশ-ভেদে ভগবানের দিকে অগ্রসর হইবার বিভিন্ন ব্যবস্থা, হিন্দুমত মুসলমানমত খৃষ্টানমত প্রভৃতি ঈশ্বরের ইচ্ছায় হইয়াছে। কিন্তু দ্বিতীয় ব্যবস্থাটি, একই ধর্মে বিভিন্ন মানসিক গঠনসম্পন্ন ব্যক্তির জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা—একমাত্র হিন্দুধর্মে বা সনাতন

ধর্মে দেখা যায়।

সনাতন ধর্ম ছাড়া অন্যান্য প্রধান ধর্মগুলিতে একটি বাঁধা ছক, ব্যবস্থা নির্দিষ্ট রহিয়াছে। সেই ধর্মাবলম্বী বলিয়া পরিচয় দিতে হইলে সকলকেই সেই একই পথে চলিতে হইবে; না চলিলে সে সেই বিশেষধর্মাবলম্বী বলিয়া গণ্য হইবে না। এ যেন, স্বামীজীর কথায়, একটি বিশেষ মাপে কাপড় কাটিয়া জামা তৈয়ারী করিয়া বলা, সকলকেই সেই জামা পরিতে হইবে, শরীরের মাপ পরস্পরের যত বিভিন্নই হউক না কেন। নতুবা জামা পরাই চলিবে না।

আরো অযৌক্তিক কথা, যখন বলা হয়, কেবল নিজ ধর্মমতের লোকদের নয়, পৃথিবীর সব দেশের সব মানুষকেই ঐ বিশেষ মাপের জামাটি পরিতে হইবে, ঐ ছকা পথে চলিতে হইবে, নতুবা তাহাদের ভগবানলাভই হইবে না! আশ্চর্যের বিষয়, মানুষ আজ যুক্তিবাদী, বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি-সম্পন্ন বলিয়া গর্ব করিলেও এই সম্পূর্ণ যুক্তিহীন মনোভাবটি আজও বহু স্থানে আঁকড়াইয়া আছে।

সনাতন ধর্ম কিন্তু কখনও তাহা বলে না। তাহার কথা হইল—তোমার নিজের দেহের মাপে জামা করিয়া লও, তোমার রুচি মতো যে পথে খুশি ভগবানের দিকে অগ্রসর হও; কেবল মূল সত্যটি না ভুলিলেই হইল। বলে না যে, ক্ষমতা না থাকিলেও পূর্ণ সংযম ও পূর্ণ একাগ্রতার পথেই সকলকে প্রথম হইতে চলিতে হইবে, নতুবা ভগবানলাভ হইবে না। বলে না যে, পারুক আর না পারুক সকলকেই সংসার ত্যাগ করিয়া, সর্ববিধ ভোগ হইতে দূরে থাকিয়া সর্বক্ষণ পরম সত্যের ধ্যানে মগ্ন থাকিতে হইবে,—ভগবানলাভের দিকে অগ্রসর হওয়ার দ্বিতীয় পথ আর নাই। বলে না যে, কেবল নারায়ণ বা কেবল শিব বা কেবল শক্তির কোন রূপের মাধ্যমে সকলকেই ভগবানে মনোনিবেশ করিতে হইবে, নতুবা ভগবানলাভ হইবে না। সনাতন ধর্মের ঘোষণা, পূর্বেই দেখিয়াছি, একই ভগবানকে বিভিন্ন জন বিভিন্নরূপ ভাবে—যাহার যেমন ধারণাশক্তি, যাহার যেমন রুচি। ক্ষতি কি তাহাতে? যাহার যাহা ভাল লাগে সে সে-ভাবেই ভগবচ্চিন্তার মাধ্যমে মন একাগ্র করিয়া তাঁহার দিকে অগ্রসর হউক—তাঁহাকে হৃদয়মধ্যে, সর্বভূতে দেখিয়া অথবা তাহারও পরে তাঁহার সহিত নিজেকে অভেদ দেখিয়া জীবন সফল করুক। তিনি স্বরূপতঃ নির্গুণ নিরাকার হইলেও তাঁহাকে বহুবিধ নামে, বহুবিধ রূপে চিন্তা করিয়াও তাঁহার দিকে অগ্রসর হওয়া যায়। বস্তুতঃ অধিকাংশ লোকের পক্ষেই অগ্রসর হইবার অন্য উপায়ই নাই। তাঁহার দিকে অগ্রসর হইবার সময় আমাদের ধারণাশক্তি যত পরিবর্তিত, উন্নত হয়, ততই সেই একই ভগবান বিভিন্নরূপে স্বতই প্রতীত হন। স্বামীজী যেমন সহজ কথায় বলিয়াছেন, যখন স্থূল ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়া তাঁহাকে দেখি, তখন ভগবানকেই এই জগৎরূপে দেখি, জগতের নানা বস্তুরূপে দেখি যাহার ভিতর নিজেকেও একটি পৃথক সত্তা বলিয়া বোধ হয়। সে অবস্থায় ভগবানকে নিজ হইতে পৃথক কোন স্থূল রূপে ভাবা ছাড়া আমাদের অন্য উপায় নাই। ধারণাশক্তি আরো উন্নত হইলে, বহিরিন্দ্রিয়ের সহায়তা ব্যতীতই কেবল সূক্ষ্ম মন-বুদ্ধির ভিতর দিয়া দেখার শক্তি আসিলে সেই একই ভগবানকে ভাবময়-জগৎরূপী দেখা যায়, তাঁহার চিন্ময় সাকার রূপও (যে যেরূপে তাঁহার চিন্তা করে) প্রত্যক্ষ হয়। আবার মনবুদ্ধির সীমা ছাড়াইয়া গেলে সেই একই ভগবানকে অদ্বয় সত্তারূপে দেখা যায়, সেখানে স্থূল বা সূক্ষ্ম কোনও দ্বিতীয় সত্তা নাই, আমাদের আমিত্বও সেখানে ভগবৎ-সত্তার সহিত একীভূত।

ভগবানের এই চরম সত্তার সন্ধান সনাতন

ধর্ম বহু পূর্বে পাইয়াছে বলিয়া, মনবুদ্ধির সীমায় সর্ববিধ ঈশ্বরীয় রূপে এই একই চরম অদ্বয় সত্তা প্রকাশিত হন, ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছে বলিয়াই সনাতন ধর্ম সর্ববিধ ভাবে ঈশ্বরারাধনাকে ভগবান-লাভের দিকে মানুষকে স্থূল হইতে সূক্ষ্ম স্তরে, সেখান হইতেও মনবুদ্ধির পারে লইয়া যাইবার বিভিন্ন পথ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। অন্য ভাষায়, বেদান্তবিধৃত সত্যগুলি সনাতন ধর্মের প্রত্যক্ষ করা সত্য বলিয়াই এই উদার ভাব তাহার মধ্যে বিদ্যমান।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ

বিভিন্ন রুচি ও অধিকার-সম্পন্ন ধারণাশক্তির বিভিন্ন স্তরে অবস্থিত সব মানুষেরই জন্য ভগবান-লাভের পথ কখনো এক হইতে পারে না,— এই সত্যটি ভুলিয়া যাওয়ার বা না জানার জন্যই ধর্মের নামে জগতে মহা অকল্যাণের সৃষ্টি হয়। স্বামী-জীর কথায়, তখন এতদূর পর্যন্ত গড়ায় যে, কোন বিশেষ ধর্মের লোক যেন তখন একটি খাঁচা হাতে করিয়া বলে, সারা পৃথিবীর মানুষকে এই খাঁচার মধ্যে ঢুকিতে হইবে, নতুবা ভগবানলাভ হইবে না। যেন, ইঁদুরকেও ঢুকিতে হইবে, হাতিকেও। হাতি যদি না ঢোকে, তবে হাতির বাঁচিয়া থাকিবারই অধিকার নাই, মারিয়া ফেল উহাকে! আবার মানুষ যখন ততদূর পর্যন্ত যায় না, তখনো পরধর্মাবলম্বীরাও যে নিজেদেরই মতো ভগবানের দিকে আগাইয়া চলিয়াছে, ইহা সে ভাবিতে পারে না—আমি যে পথে চলিতেছি, সেই পথই ঠিক পথ, আর সবাই যে পথে চলিতেছে চলুক, তবে ওসব ভুল পথ—এই বিশ্বাস বজায় রাখিয়া অপরের মতকে বড় জোর সহ্য করে মাত্র।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, ভগবান শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়া সনাতন ধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়-গুলির মধ্যে বিবাদের নিরসন করিয়াছিলেন—সব পথই পরিণামে একই ভগবানের কাছে পৌঁছাইয়া দেয়, গীতায় ইহা ঘোষণা করিয়াছেন। কালক্রমে মানুষ তাহা ভুলিয়া আবার মত লইয়া পরস্পর বিবাদে রত হইয়াছিল। আধুনিক যুগে, যখন সমগ্র পৃথিবীর মানুষের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের পথ অতি প্রশস্ত হইয়াছে, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণরূপে আসিয়া এই সত্য পুনরায় ঘোষণা করিয়া গেলেন। এবার, শুধু সনাতন ধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়গুলিরই নয়, পৃথিবীর সব প্রধান ধর্মগুলিরই নির্দিষ্ট ভগবানলাভের পথগুলি যে একই লক্ষ্যে মানুষকে পৌঁছাইয়া দেয়, একই ভগবান-কেই যে কেহ নিরাকার নির্গুণ বা সগুণ, কেহ বা বিবিধ সাকার সগুণরূপে চিন্তা করিয়া থাকে, মুসলমান, খৃষ্টান, হিন্দুদের শাক্ত বৈষ্ণব অদ্বৈত-বাদী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের ভগবান যে আলাদা আলাদা নন, কালী, কৃষ্ণ, ব্রহ্ম, গড, আল্লা প্রভৃতি নামে যে একই ভগবানকেই লক্ষ্য করা হয়—একথা শুধু ঘোষণাই নয়, সব পথে নিজে চলিয়াই এই সত্য উপলব্ধি করিয়া প্রমাণ করিয়া গেলেন। ইহার ফলে ধর্মে ধর্মে বিদ্বেষ কিছুটা কমিলেও, এখনো বহুল পরিমাণেই রহিয়া গিয়াছে, ইহার অতি ঘৃণ্য কুফল এখনো শুধু এদেশেই নয়, বিদেশেও মাঝে মাঝে দেখা যাইতেছে।

বেদান্ত

এ যুগে এ ভাব আর বজায় রাখা চলে না। মানুষ যতই বিষয়টি বুঝিবে, ততই এই বিদ্বেষ চলিয়া যাইবে ঠিক কথা, কিন্তু আমাদের আজ কর্তব্য হইল যে যে-ভাবেই ডাকুক একই ভগবানকে ডাকে, এই সত্যটি অন্তর দিয়া বুঝিয়া সব ধর্মের সব মানুষকেই কেবল সহ্য করা নয়, ভালবাসিতে শেখা, একই পরমতীর্থের পানে বিভিন্ন পথযাত্রীকে যথাসাধ্য সহায়তাও করা। এই কথাটি স্বামীজী বহুভাবে আমাদের স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। আর বলিয়াছেন, বেদান্তের, যাহাকে তিনি সব দেশের

সব ধর্মের বিজ্ঞানস্বরূপ বলিয়াছেন সেই বেদান্তের চিন্তার সহিত মানুষ যত অধিক পরিচিত হইবে, ততই তাহার মধ্যে এই বোধ অধিকতর জাগ্রত হইবে যে একই অরূপ নির্গুণ ভগবানই বিভিন্ন নামে ও রূপে বিভিন্ন ধর্মে ও সম্প্রদায়ে উপাসিত হন—বিভিন্ন অবস্থার ও রুচির লোককে সেই চরম সত্যের দিকে লইয়া যাইবারই জন্য। এই জন্যই তিনি বলিয়াছেন, আধুনিক জগতে মানুষ যে ক্রমশঃ বেশী বৈজ্ঞানিক-মনোভাবাপন্ন হইতেছে, ইহাতে তিনি আনন্দিত, কারণ এই মনোভাবই তাহাকে বেদান্তের চিন্তার দিকে আকৃষ্ট করিবে—যে চিন্তা সর্ববিধ বিরোধী যুক্তির আঘাত সহিয়া অক্ষত থাকিতে সক্ষম, যাহা সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত, যাহা সম্পূর্ণ যুক্তিসম্মত। এইজন্যই তিনি বলিয়াছেন, পৃথিবীতে যদি কোন দিন চিন্তাশীল ব্যক্তিদের কোন সর্বজনীন ধর্ম হওয়া সম্ভব হয়, তবে তাহা হইবে বেদান্ত।

তবে, ইহাতে যেন না বুঝি, পৃথিবীর সকলেই সনাতন ধর্ম গ্রহণ করিয়া অদ্বৈত-বাদীদের পথ ধরিয়া ভগবানের দিকে চলুক, ইহা তিনি চাহিয়াছিলেন। তিনি বরং উল্টোটাই বলিয়াছেন। পৃথিবীর সব মানুষকে একটি মাত্র পথ ধরিয়া যদি ভগবানলাভের জন্য কোন দিন চলিতে হয়, তাহার মতো দুর্দিন আর মানবজাতির নাই। বলিয়াছেন, পৃথিবীতে যতগুলি মানুষ আছে, ততগুলি ভগবানলাভের পথ থাকিলেই তিনি বেশী খুশী হইতেন, কারণ তাহা হইলে সকলেই নিজের ঠিক পছন্দমতো পথে ভগবানলাভের জন্য অগ্রসর হইতে পারিত। বেদান্তের ভাবের প্রসার তিনি চাহিয়াছেন নিজ নিজ ধর্মমতে বিশ্বাস আরো দৃঢ় করিবার জন্য, সব ধর্মমতকেই ভগবানলাভের জন্য সমভাবে সত্য বলিয়া বুঝিবার জন্য। অদ্বয় সত্তাকেই বিভিন্ন ধর্মোক্ত ভগবানরূপে প্রত্যক্ষ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন তাঁহারা একই ভগবানের বিভিন্ন প্রকাশ, আলাদা নন;—এই সত্যটিকেই নিঃসংশয়ে মনে প্রাণে গ্রহণ করাইবার জন্যই স্বামীজী বেদান্তের ভাবের প্রসার চাহিয়াছিলেন।

একাগ্রতা

পথ যাহাই হউক, মত যাহাই হউক, সব পথেরই, সব মতেরই, সব অনুষ্ঠানেরই, সাধনারই—জপ, ধ্যান, যোগাভ্যাস, পূজা, কীর্তন, গির্জায় মসজিদে নিয়মিত প্রার্থনা প্রভৃতি সব কিছুরই সাধারণ লক্ষ্য হইল আমাদের বহির্মুখী মনকে অন্তর্মুখী করানো, ভগবচ্চিন্তায় একাগ্র করানো। মন পূর্ণ একাগ্র হইলেই ভগবানলাভ, সত্যলাভ হয়। যে কোন পথে যে কোন আকারে ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তির ভাব লইয়া একাগ্র করিতে পারিলে তো বটেই, ভগবানের প্রতি অশ্রদ্ধার ভাবেও—দ্বেষ ভয় প্রভৃতি ভাবেও—যদি তাঁহাতে মন পূর্ণ একাগ্র হয়, তাহা হইলেও তাঁহাকে লাভ করা যায়। কোনওরূপ ভগবানের চিন্তা পর্যন্ত না করিয়াও যদি কোন পদ্ধতি ধরিয়া (যেমন রাজযোগের পথে) মনকে একাগ্র করা যায়, তাহা হইলেও ভগবানলাভ হইবে। যে-ভাবেই হোক, মনকে একাগ্র করাই হইল কথা, তাহাই ভগবান-লাভের পথ। তবে, পূর্বেই বলিয়াছি, সব পথ সকলের উপযোগী নয়, রুচিসম্মতও নয়।

যে কোন উপায়ে মনকে ভগবানের চিন্তায় পূর্ণ একাগ্র করিতে পারিলে ভগবানলাভ হয়—এ সত্যটি অতি সুন্দর ভাবে ভাগবতে বিবৃত। রাজা যুধিষ্ঠির যখন রাজসূয় যজ্ঞ করিয়াছিলেন, তাহার বর্ণনাপ্রসঙ্গে কথাটি বলা হইয়াছে।

এই রাজসূয় যজ্ঞের সময় সভাস্থলে শিশুপালকে শ্রীকৃষ্ণ বধ করেন। যুধিষ্ঠির প্রভৃতি দেখিতে পান, দেহত্যাগের পর শিশুপাল সাযুজ্যমুক্তি লাভ করিলেন। দেখিয়া অতিমাত্রায় বিস্মিত হইলেন

যুধিষ্ঠির—ভগবানকে ভক্তিশ্রদ্ধা করিয়া বহু সাধনা আরাধনা করিয়াও যে মুক্তিপদ লাভ করা কঠিন, শিশুপাল—যে আজীবন কৃষ্ণনিন্দা করিয়া আসিয়াছে, সে কিনা শাস্তি না পাইয়া সেই দুর্লভ মুক্তিলাভ করিল! নারদও সভাস্থলে ছিলেন, যুধিষ্ঠির তাঁহাকে জিজ্ঞাসাই করিয়া বসিলেন, 'একি অদ্ভুত ব্যাপার! যে শিশুপাল ছেলেবেলা থেকেই —কথা বলতে শেখা থেকেই - আজীবন কৃষ্ণনিন্দা ছাড়া আর কিছুই করেনি, সে কিনা ভগবানে শ্রদ্ধাশীল হয়ে বহু তপস্যায়ও যে মুক্তিপদলাভ দুর্লভ, সেই মুক্তিপদ লাভ করল! এর চেয়ে অদ্ভুত ঘটনা আর কি হতে পারে?' নারদ হাসিয়া উত্তর করিলেন, অদ্ভুত কিছুই না—মুক্তি-লাভের জন্য যাহা করা প্রয়োজন সে তাহা করিয়াছে, শ্রীকৃষ্ণকে দ্বেষ করিয়া অনুক্ষণ তাঁহার চিন্তার মাধ্যমেই মন তাঁহাতে একাগ্র করিয়াছে শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা ছাড়া আর কোন চিন্তারই স্থান সেখানে ছিল না। নারদ বলিলেন, শুধু ভক্তিভাব লইয়াই নয়, দ্বেষের ভাব, ভয়ের ভাব প্রভৃতি—যে সব ভাব ভগবানলাভের পথে বিরোধী বলিয়াই প্রতীত—সে সব ভাবের কোনটি অবলম্বনেও যদি কাহারো মন অনুক্ষণ ভগবানের চিন্তা করিতে পারে, তাহার মন পূর্ণ একাগ্র হয়, তন্ময়, ভগবন্ময় হয়, তাহা হইলেই সে ভগবানলাভ করে। যেমন, বলিলেন, কংস ভয়ে অনুক্ষণ ভগবচ্চিন্তা করিয়াছিল বলিয়া তাহাতেই তাহার মন ভগবানে তন্ময় হয়, এবং সে মুক্তিলাভ করে।

যাহারা ভগবানে দ্বেষাদি করে, তাহাদের তো পাপ হইবার কথা; নারদ বলিলেন, ভগবানের চিন্তার জন্য সব পাপ ধুইয়া মুছিয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়।

তাঁহাকে দ্বেষাদি করে বলিয়া ভগবান্ শাস্তি দিবেন? নারদ বলিলেন, সে প্রশ্নই ওঠে না; আমাকে দ্বেষ করিয়াছে, উহাকে সেজন্য শাস্তি দিতে হইবে—এভাব ভগবানে সম্ভবই নয়। এ ভাব জাগে যাহাদের 'আমি' দেহমনাদিতে আবদ্ধ তাহাদের, ভগবানের 'আমি' কখনো কোন সীমায় আবদ্ধ হয় না। তিনি শুধু দেখেন কাহার মন তাঁহাতে একাগ্র হইয়াছে, তাঁহার চিন্তায় তন্ময় হইয়াছে। কোন্ পথে চলিয়া কিভাবে তাহা হইয়াছে, সেদিকে তিনি তাকানই না!

পথ যাহাই হউক, ভগবানে মন একাগ্র করাই সব ধর্মের মূল কথা। পথের বিচার নয়, কে কোন্ ধর্মপথে চলিতেছে, কে কোন্ ধর্মানুষ্ঠান কত নিখুঁতভাবে করিতেছে, তাহা নয়, মানুষ ভগবানের দিকে কতখানি অগ্রসর তাহার একমাত্র মাপকাঠি তাহার মন ভগবানে কতখানি একাগ্র হইয়াছে। কাজেই পথ লইয়া, মত লইয়া বিবাদের কোন প্রশ্নই আসে না, কোন্ মত বড়, তাহা লইয়া বিচারেরও না, গর্বেরও না—একমাত্র প্রশ্ন উহা আমাকে লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর করাই-তেছে কিনা, উহা আমাকে লক্ষ্যে পৌছাইয়া দিতে পারিবে কিনা। প্রসঙ্গতঃ কবির ছন্দোবদ্ধ ভাব মনে পড়ে, 'যদি কূল পাই, তরণী-গর্ব রাখিতে না চাহি কিছু!' কূলে পৌছানো লইয় কথা, এবং পারিলে অপরকেও কূলে পৌছাইতে সহায়তা করা - যে যে-তরণীতেই পাড়ি লাগাক যে যে-ধর্মমতেই চলুক—তাহা হইয়া বিবাদের কিছু নাই, গর্বেরও কিছু নাই, লক্ষ্য যথা সকলেরই একই কূলে পৌছানো।

প্রয়োজন শুধু মনে প্রাণে জানা যে কূ সকলেরই একটি।

'জল পড়ে, পাতা নড়ে'

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

শিশুকালে বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগে 'জল পড়ে' পাতা নড়ে' এই ছন্দোবদ্ধ শব্দগুলি মুখস্থ করিয়া আমরা যত না রস পাইতাম, ঘরের বাহিরে তাকাইয়া টপ টপ বৃষ্টি পড়িতে এবং গাছের পাতা বাতাসে নড়িতে দেখিয়া আমরা ততোধিক বিস্ময় ও আনন্দ লাভ করিতাম। চোখ দিয়া, কান দিয়া, নাক-জিব-ত্বক্ দিয়া আমরা যাহা যাহা দেখিতাম, শুনিতাম, আঘ্রাণ-আস্বাদ-স্পর্শ করিতাম উহাদের প্রত্যেকটি প্রকৃতি-গ্রন্থের এক একটি পাঠ। বইতে যাহা পড়ি তাহা ঐ পাঠেরই অস্ফুট প্রতিধ্বনি। যে শিশু বই পড়ে নাই সে কিন্তু প্রকৃতির খেলা পুঁথির জ্ঞান ও আনন্দ হইতে কখনো বঞ্চিত হয় না।

জল পড়ে, পাতা নড়ে
পাখী গায়, গাভী ধায়
রোদ ওঠে, ফুল ফোটে
সাঁঝ নামে, দিন যায়।

ইন্দ্রিয়ের দ্বার, মস্তিষ্ক, মন ও হৃদয়ের মাধ্যমে বিশ্বজগৎ জ্ঞানের আকারে, কল্পনা-স্মৃতির আকারে অনবরত আমাদের ভিতর প্রবেশ করিতেছে ও মনে ছাপের পর ছাপ রাখিয়া যাইতেছে। শিশুকালে, বাল্যকালে বিশ্বজগতের সহিত আমাদের এই সংস্পর্শ বড়ই আনন্দদায়ক। বয়স যত বাড়িতে থাকে এবং আমাদের আত্ম-সচেতনতা যত দানা বাঁধিতে থাকে বিশ্বপ্রকৃতিকে সহজভাবে গ্রহণ আমাদের পক্ষে ততই কঠিন হইয়া পড়ে। অনুভূতির সহিত 'আমি ও আমার' যখন পাশে আসিয়া দাঁড়ায় তখন ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ উহার সহিত জড়াইয়া যায়। অনুভূতি আর নৈর্ব্যক্তিক থাকে না। জল পড়িতে থাকে, পাতা নড়িতে থাকে, রোদ ওঠে, ফুলও ফোটে কিন্তু আমাদের হৃদয় যেন আর মাতিয়া ওঠে না; বিশ্বপ্রকৃতি আর আমাদের মধ্যে যেন একটি দেওয়াল দাঁড়াইয়া থাকে। পুঁথি পড়িয়া আমরা জ্ঞান ও আনন্দ যাহা পারি আহরণ করিয়া চলি কিন্তু প্রকৃতির মহাগ্রন্থ হইতে পাঠ আমাদের অনেকটা বন্ধ হইয়া যায়।

শিশুর সরল মন লইয়া আমরা যদি বিশ্বপ্রকৃতির সামনে দাঁড়াইতে পারি তাহা হইলে ধীরে ধীরে আমাদের চোখের সম্মুখ হইতে পর্দার পর পর্দা সরিয়া যায়—বিশ্বপ্রকৃতির মহৎ হইতে মহত্তর, সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর সত্য আমাদের হৃদয়ে প্রতিভাত হইতে থাকে। ইন্দ্রিয় হইতে অতীন্দ্রিয়, মানস হইতে অতি-মানস উপলব্ধি লাভ করিয়া আমরা ধন্য হই। এই উপলব্ধি আমাদিগকে সাংসারিক সম্পদ দিতে না পারে কিন্তু অনাবিল আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও আনন্দ আনিয়া হৃদয়কে নিশ্চিতই সমৃদ্ধ করে।

জল পড়ে, পাতা নড়ে। কেমন করিয়া পড়ে, কোথা হইতে পড়ে? কেন নড়ে, কে নাড়ায়? এই সকল প্রশ্ন যখন আমাদের মনে উঠিতে থাকে তখন উহাদের উত্তর আমরা দুইভাবে পাইতে পারি। এক—জড়বিজ্ঞানে, দুই—অতীন্দ্রিয় বা যোগ-বিজ্ঞানে। দুই বিজ্ঞান পরস্পর-বিরুদ্ধ নয়। জড়-বিজ্ঞানের শিক্ষা লাভ করিয়া আমরা যদি ভাবিয়া না বসি ইহাই শেষ, তাহা হইলে উহার পরবর্তী শিক্ষা আমরা দ্বিতীয় বিজ্ঞান বা যোগ-বিজ্ঞান দ্বারা লাভ করিতে পারি। উপনিষদের ঋষিরা দুই বিদ্যার কথা বলিতেন, অপরা বিদ্যা ও পরা বিদ্যা। অপরা বিদ্যা দ্বারা মনের প্রসার,

সাংসারিক অভিজ্ঞতা ও সমৃদ্ধি হয়; পরা বিদ্যা দ্বারা মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ সার্থকতা আত্মোপলব্ধি ঘটে।

জল আপনি পড়ে না—পড়ার পিছনে একটি শক্তি আছে; পাতা আপনি নড়ে না, পিছনে নাড়াইবার একজন কর্তা আছে। প্রকৃতির যাবতীয় ঘটনার কোনটাই আপনি ঘটে না, প্রত্যেক ঘটনা ঘটাইবার একজন ঘটক থাকা চাই। জড়-বিজ্ঞান বলেন ঐ চালক হইল মাধ্যাকর্ষণ, তাপ, বিদ্যুৎ, যন্ত্রশক্তি (mechanical energy), রাসায়নিক শক্তি (chemical energy) ইত্যাদি। এই সকল শক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া প্রকৃতির নানা নিয়ম ও হিসাব অনুসারে সংঘটিত হয়। বিজ্ঞান এই সকল নিয়ম আবিষ্কার করিয়াছে এবং করিতেছে। অতীন্দ্রিয় বিজ্ঞান বলেন, জড়-বিজ্ঞানের এ ঘোষণা অবিসংবাদিত সত্য, তবে চরম সত্য নয়।

যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্।
মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি॥

"এই বিশ্বজগতে যাহাকিছু দেখিতেছ তাহা চৈতন্যস্বরূপ পরব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত এবং তাঁহারই শক্তিতে স্পন্দিত। তিনি যেন উদ্যত বজ্রসহায়ে সকল জড়শক্তিকে শাসন করিতেছেন। এই সত্য যাঁহারা জানেন তাঁহারা অমৃতত্ব লাভ করেন।" (কঠ-উপনিষদ্, ২।৩।২)।

বিজ্ঞানের লেবরেটরীতে যেমন নানা যন্ত্রাদি সহায়ে আমরা জড়শক্তির ক্রিয়া অধ্যয়ন করি, সেইরূপ শম, দম, চিত্তনিরোধ, নিত্যানিত্য-বিচার প্রভৃতি মানসপ্রক্রিয়া দ্বারা আমরা চৈতন্যের উপলব্ধি করিতে পারি। হৃদয় যখন শিশুর মনের ন্যায় নির্মল হয় তখন বিশ্বপ্রকৃতির যাবতীয় স্পন্দনের পিছনে সেই নিস্পন্দ সর্বশক্তির মূল চৈতন্য সত্তাকে স্বতই দেখিতে পাওয়া যায়। চলিত কথায় আমরা ঐ সত্যকে ভগবান বলি। ভগবান একটি কথার কথা নয়, একটি কবিকল্পনা নয়। উহা একটি বাস্তব সত্য—আকাশের মতো, বায়ুর মতো, আগুনের মতো, পৃথিবীর মতো। তবে ঐ সত্য আকাশ-বায়ু-অগ্নি-পৃথিবীর চেয়ে সহস্রগুণে বলীয়ান, স্পষ্ট, উজ্জ্বল, আনন্দদায়ী।

আমাদের দেশে প্রাচীনকালে সত্যদ্রষ্টা ঋষিগণ বিশ্বপ্রকৃতিকে সর্বতোভাবে সম্মান দিতেন। স্থলে, জলে, অন্তরীক্ষে, অনন্ত আকাশে নানা জড়শক্তির এবং প্রাণশক্তির সীমাহীন অভিব্যক্তি ও ক্রিয়া দেখিয়া তাঁহারা বিস্ময়াপ্লুত হইতেন। কিন্তু তাঁহাদের বিস্ময় ওখানেই থামিয়া যাইত না। জড়, প্রাণ ও মনেরও পিছনে কে দাঁড়াইয়া প্রকৃতির সমস্ত ক্রিয়াকে চালিত করিতেছে, এই প্রশ্নের সমাধান না হওয়া পর্যন্ত তাঁহারা ক্ষান্ত হন নাই। রাজা জনকের সভায় বিদ্বৎসম্মেলনে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য তত্ত্বজিজ্ঞাসু গার্গীকে বলিতেছেন :

"শুন গার্গি, অক্ষর পুরুষের কথা বলি। তাঁহারই প্রশাসনে সূর্য চন্দ্র ঘুরিতেছে, স্বর্গ-মর্ত্য স্ব স্ব স্থানে রহিয়াছে, নিমেষ মুহূর্ত দিন রাত্রি মাস সংবৎসর রূপ কালের প্রবাহ বহিয়া যাইতেছে, তুষারমণ্ডিত গিরিমালা হইতে নদী বহিয়া সমুদ্রে পড়িতেছে, তাঁহারই শক্তিতে মনুষ্যগণ, পিতৃগণ, দেবগণ আপন আপন কাজে ব্যাপৃত রহিয়াছেন। তাঁহাকে না জানিয়া যে মহত্ত্ব খোঁজে সে বাতুল, তাঁহাকে জানিতে পারিলেই জীবনের চরম সার্থকতা।" (বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ৩।৮।৯-১০)

বেদে সূর্য, বায়ু, অগ্নি, বিদ্যুৎ, উষা, রাত্রি প্রভৃতির শক্তি ও মহিমার ব্যাপক নানা মন্ত্র ও স্তোত্র দেখিতে পাই। ঐ গুলি পড়িলে ঋষি-কবিদের হৃদয়ে বিশ্বপ্রকৃতির প্রতি কি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও একাত্মতাবোধ ছিল তাহা বুঝিতে পারা যায়। ক্রমশঃ বহু হইতে তাঁহারা একে মনঃ-সংযোগ করিয়াছিলেন।

যতশ্চোদেতি সূর্যোঽস্তং যত্র চ গচ্ছতি।
তং দেবাঃ সর্বে অর্পিতাস্তদু নাত্যেতি কশ্চন ॥

"সূর্য যাঁহা হইতে উদিত হইতেছে এবং যাঁহাতে অস্ত যাইতেছে তাঁহাতে সমস্ত দেবতারা অবস্থিত। কেহই তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না।" (কঠ উপনিষদ্, ২।১।৯)

সংসার যাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত তাঁহাকে না জানিয়া সংসারের উপলব্ধি এক বস্তু, আর সংসারের উৎস আবিষ্কার করিয়া সংসারের সম্মুখীন হওয়া সম্পূর্ণ আলাদা বিষয়। আমাদের দেশের সত্যদ্রষ্টারা দ্বিতীয়টি করিয়াছিলেন। যাবতীয় শক্তি যে সর্বাভিব্যক্তিমূল পরব্রহ্ম হইতে নিঃসৃত হইতেছে সেই পরব্রহ্মকে তাঁহারা স্পর্শ করিয়াছিলেন। ইহার ফলে সূর্য চন্দ্র বায়ু অগ্নি আকাশ পৃথিবী সমুদ্র পর্বত ইহাদের কোনটিই নস্যাৎ হইয়া যায় নাই। ইহাদের কোনটিই ব্রহ্মের সহিত বিরোধ আনে নাই। চরাচর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবকিছুই রহিয়াছে, একটি কণাও হারায় নাই, কিন্তু সত্যের আলোক সবকিছুর উপর পড়িয়া উহাদের প্রত্যেকটির চেহারা বদলাইয়া দিয়াছে। জল পড়ে, পাতা নড়ে—কিন্তু পড়িবার, নড়িবার ভঙ্গিমাই এখন আলাদা। জলের ধারার সঙ্গে, পাতার কম্পনের সঙ্গে এক নূতন খেলা চোখে ধরা দিয়াছে—চৈতন্যের খেলা। বিশ্বসংসারকে নিছক জড়প্রকৃতির ঘটনাপ্রবাহ বলিয়া মনে করা ও দেখা আর উহাকে চৈতন্যের নৃত্যস্পন্দন বলিয়া অনুভূতি—দুটি আলোক ও আঁধারের ন্যায় একান্তই পৃথক ব্যাপার।

'জল পড়ে, পাতা নড়ে'র ন্যায় অসংখ্য ছড়া প্রকৃতি-গ্রন্থে অনবরত লিখিত হইতেছে। যে কোনও ঘটনা এক একটি ছড়া। উহাদের সকলগুলি শব্দের সাহায্যে লিপিবদ্ধ করা চলে না এবং আমরা করিতে চাইও না। বাছিয়া বাছিয়া চিত্তাকর্ষক হৃদয়রঞ্জক ঘটনাগুলি শুধু আমরা ভাষায় প্রকাশ করি। উহা আমাদের সাহিত্য। কিন্তু অক্ষর, শব্দ, ব্যাকরণ, ছন্দের সাহায্য ব্যতীতও যে অসংখ্য কবিতা, গীত, সাহিত্য প্রকৃতির পাতায় রচিত হইতেছে উহাদিগকে আমরা আপন হৃদয়ে উপলব্ধি করিতে পারি। শৈশবে আমরা উহা কিছু কিছু করিতে পারিতাম। বড় হইয়া নানা বাসনা-কামনা এবং সংসারের বহুতর ব্যাপৃতিতে জড়াইয়া পড়িয়া ঐ শক্তি চাপা পড়িয়া যায়। আমরা পুঁথির পর পুঁথি পড়িয়া বিদ্যার বোঝা সঞ্চয় করি কিন্তু বিশ্বপ্রকৃতির সত্যকে হৃদয়ে উপলব্ধি করিয়া যথার্থ জ্ঞান ও আনন্দ আহরণ করিতে পারি না।

তবে কি আমরা বড় হইব না? চিরকাল শিশু থাকিয়া 'জল পড়ে, পাতা নড়ে' আবৃত্তি করিয়া হাততালি দিয়া নাচিয়া দিন কাটাইব? প্রগতির কি কোনও মূল্য নাই? যুগ যুগ ধরিয়া মানুষ কত চেষ্টায়, কত পরিশ্রমে জ্ঞান বিজ্ঞান শিল্প সাহিত্য সমাজ সমৃদ্ধি রাষ্ট্র প্রভৃতি যাহা গড়িয়া তুলিয়াছে ও তুলিতেছে তাহাদের কি কোনও সার্থকতা নাই? উহাদের সম্মুখীন না হইয়া পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইতে হইবে?

না, আধ্যাত্মিক উপলব্ধি জাগতিক উন্নতিকে প্রত্যাখ্যান করে না, বরং ঐ উন্নতিকে সুপ্রতিষ্ঠ, কল্যাণপ্রতিষ্ঠ করে। সংসারের যাবতীয় কর্ম ও জ্ঞান আমরা আহরণ করিব কিন্তু নিজের আত্মাকে বলি দিয়া নয়। আমরা জ্ঞানবৃদ্ধ হইবে, কর্মবীর হইব, কিন্তু আমাদের অহমিকাকে মাথা তুলিতে দিব না। আমাদের কর্তৃত্ববুদ্ধিকে সর্বদা ভগবৎ-শক্তির অধীন করিয়া রাখিব। এইরূপ করিতে পারিলে সংসারের ভার আমাদের প্রাণের চিরন্তন শিশুটিকে কখনো চাপিয়া রাখিতে পারিবে না। সংসারের সকল অভিব্যক্তির ভিতর ভগবানকে দেখিয়া আমরা সর্বদা অনাবিল আনন্দে সুর করিয়া গাহিতে পারিব—'জল পড়ে, পাতা নড়ে।'

উপনিষদ্ বলেন, যে চৈতন্য বিশ্বপ্রকৃতির যাবতীয় জড় শক্তিকে সক্রিয় করিতেছে, উহাই আবার আমাদের দেহের মধ্যে প্রাণের বিবিধ অভিব্যক্তিকে সঞ্চালিত করিতেছে—মনের চিন্তা, সঙ্কল্প, আবেগ, অনুভূতিসমূহকে ব্যঞ্জনা দিতেছে। পরমাত্মা প্রাণের প্রাণ, মনের মন। অতএব 'জল পড়ে, পাতা নড়ে' শুধু বাহিরের ঘটনার বর্ণনা নয়, উহা আমাদের জীবনের আন্তর সঙ্গীতও। শম দম বৈরাগ্য ধ্যান ধারণা প্রভৃতি সহায়ে আমরা যতই আত্মজিজ্ঞাসায় অগ্রসর হইতে থাকি ততই আমাদের মন বুদ্ধি অহংকার প্রাণবৃত্তির পশ্চাতে চৈতন্যের উপলব্ধি হইতে থাকে। তখন আমরা বুঝিতে পারি আমাদের প্রত্যেকটি চিন্তা, প্রত্যেকটি আবেগ, প্রত্যেকটি সঙ্কল্প চৈতন্য দ্বারা আলোকিত এই চৈতন্যের আদি নাই, অন্ত নাই, পরিবর্তন নাই। উহা স্বয়ংসিদ্ধ, স্বয়ংপ্রকাশ।

উহা কাল-প্রবাহের দ্যোতক অথচ নিজে কালাতীত। দেশ উহাতে অভিব্যক্ত অথচ উহা স্বয়ং দেশাতীত। বিশ্বসংসারের মধ্যে উহা অনুস্যূত অথচ বিশ্বসংসার উহাকে লিপ্ত করিতে পারে না।

'জল পড়ে, পাতা নড়ে' প্রকৃতির যাবতীয় ঘটনার ব্যঞ্জক মহামন্ত্র, বহিঃপ্রকৃতিতে যাহা কিছু ঘটিতেছে আত্মসত্তায় দাঁড়াইয়া অনাসক্ত দৃষ্টিতে দেখিয়া চল আর হাততালি দিয়া সুর করিয়া গাও—'জল পড়ে, পাতা নড়ে'। আবার ভিতরে তাকাইয়া হৃদয় মনের যতকিছু স্পন্দন, আলোড়ন, অভিব্যক্তি লক্ষ্য কর, উহারাও জল পড়া, পাতা নড়ারই হেরফের। উহাদেরও উপলব্ধির সঙ্গে গান ধর—'জল পড়ে, পাতা নড়ে'। পড়া ও নড়া বাহিরে ও ভিতরে একই নটরাজের নৃত্যভঙ্গিমা।

'তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্'

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

তৃষ্ণা-নদীর পারে যে তোর
নন্দন আনন্দময়!
যা নিয়ে তুই রইলি বিভোর—
স্বপ্ন সে তো! সত্য নয়।
চিন্‌লনে তুই আসল, মেকী!
যায় রে ক্ষুধা নকলে কী?
হায় রে, জল-বুদ্‌বুদে কি
পরিতৃপ্ত হয় হৃদয়?

শাশ্বত সুখ অসীমে যার—
সসীমে তার সুখ কোথায়?
কলধ্বনি জলধারার
নাই রে মৃগ-তৃষ্ণিকায়!
কূলের বাঁধন আর কেন রে?
দিগন্ত ঐ ডাকৃছে তোরে!
দুঃসাহসে বক্ষ ভ'রে
দে পাড়ি তুই। কিসের ভয়?

শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব

পণ্ডিত শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ভক্তিতীর্থ

অতীত দ্বাপর যুগের সন্ধ্যাংশ সময়ে দক্ষিণায়নে বর্ষাঋতুতে ভাদ্রমাসে কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে বুধবারে রোহিণী নক্ষত্রে নিশীথ সময়ে আয়ুষ্মানযোগে কৌলব করণে সিংহরাশিস্থ রবিগ্রহে বৃষলগ্নে এই ধরাধামে শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হন। আবির্ভাব-সময়ে ৯টি গ্রহ এইভাবে ছিল। "উচ্চস্থাঃ শশিভৌমচান্দ্রিশনয়ো লগ্নং বৃষো লাভগো জীবঃ সিংহতুলালিষু ক্রমবশাৎ পূষোশনা রাহবঃ। নৈশীথঃ সময়োঽষ্টমী বুধদিনং ব্রহ্মর্ক্ষমত্র ক্ষণে শ্রীকৃষ্ণাভিধমম্বুজেক্ষণমভূদাবিঃ পরং ব্রহ্ম তৎ॥" (খমাণিক্যনাম্নি জ্যোতিষগ্রন্থে)। অর্থাৎ তাঁহার আবির্ভাব-সময়ে চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ ও শনি নিজ নিজ উচ্চ গৃহে অর্থাৎ ক্রমান্বয়ে বৃষে, মকরে, কন্যায় ও তুলায় অবস্থিত হন, আর বৃহস্পতি মীনে এবং রবি, শুক্র ও রাহু যথাক্রমে সিংহে, তুলায় ও বৃশ্চিকে অবস্থান করেন। তৎকালে মথুরাপুরীর ও গোকুলপুরীর নরনারীসকল যোগনিদ্রায় অভিভূত হন। গ্রহ নক্ষত্র ও তারাসকল শান্তভাব ধারণ করে। দিক্‌সকল প্রসন্ন এবং গ্রাম নগর ব্রজাদি বিবিধ মঙ্গলে পৃথিবী মঙ্গলময়ী হয়। নদীসকল প্রসন্নসলিলা, হ্রদসকল জলশোভায় সুশোভিত হয়। বিবিধ পুষ্প ও বনরাজি বিহঙ্গকুলের ও ভ্রমরনিকরের কলরবে শব্দায়মান হয়। সমীরণ সুখস্পর্শ ও হুতাশন উদ্দীপ্ত হয়। সাধুগণের মন সুপ্রসন্ন ও স্বর্গীয় দুন্দুভিসকল ধ্বনিত হয়। কিন্নর ও গন্ধর্বসকল গান, চারণসকল স্তব, অপ্সরা ও বিদ্যাধরসকল নৃত্য এবং দেবতা- ও মুনিগণ পুষ্পবর্ষণ করিতে থাকেন। ঘোরতিমিরাবৃত নিশীথ সময়ে আবির্ভাবার্থ লোকসকল প্রার্থনা করিতে থাকিলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজ ঐশ্বরিক চতুর্ভুজরূপে দেবকী হইতে জন্মগ্রহণ করিলেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিলে বসুদেব দেখিলেন শাস্ত্রে যাঁহাকে পুরুষোত্তম বলিয়া নির্দেশ করেন সেই শ্রীহরি অত্যাশ্চর্য বালকরূপে তাঁহার গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

তমদ্ভুতং বালকমম্বুজেক্ষণং চতুর্ভুজং
শঙ্খগদার্যুদায়ুধম্।
শ্রীবৎসলক্ষ্মং গলশোভিকৌস্তুভং পীতাম্বরং
সান্দ্রপয়োদসৌভগম্॥
মহার্হবৈদূর্যকিরীটকুণ্ডলত্বিষা পরিষ্বক্ত-
সহস্রকুন্তলম্।
উদ্দামকাঞ্চ্যঙ্গদকঙ্কণাদিভিবিরোচমানং
বসুদেব ঐক্ষত॥
(ভাগবত, ১০।৩।৯-১০)

বসুদেব তদবস্থ শ্রীহরিকে পুত্রভাবে দর্শন করিয়া আনন্দরসে আপ্লুত হইয়া মনে মনে ব্রাহ্মণগণকে অযুত গাভীদানের সঙ্কল্প করিলেন। পরে তিনি দণ্ডবৎ প্রণামান্তর কৃতাঞ্জলিপুটে স্তব করিতে লাগিলেন। বসুদেব বলিলেন, আমি আপনাকে দর্শন করিয়া আপনি যে সকলের অন্তর্যামী পরমাত্মা নির্বিশেষ ব্রহ্ম ও সচ্চিদানন্দময় স্বয়ং ভগবান্ তাহা জানিয়াছি। আপনি দুর্লভদর্শন হইলেও আমি আপনার কৃপাতেই আপনার দর্শনলাভ করিয়াছি। আপনিই সর্বকারণকারণ। অনন্তর কংসভয়ে ভীতা দেবকী সেই পুত্রকে আপনার গর্ভ হইতে প্রাদুর্ভূত ও চতুর্ভুজত্বাদি বিষ্ণুলক্ষণে সুলক্ষিত দেখিয়া মহাপুরুষবোধে হাস্যবদনে তাঁহার স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। দেবকী বলিলেন: বেদসকল যে অতীন্দ্রিয় সর্বকারণকারণ চিৎস্বরূপ, নির্গুণ, নির্বিকার, সত্তামাত্র,

নির্বিশেষ, নিরীহ বস্তু প্রতিপাদন করেন, সাক্ষাৎ অধ্যাত্মদীপস্বরূপ বিষ্ণুই সেই বস্তু, এবং সেই বিষ্ণু আবার তুমিই। তুমি ভৃত্যের অভয়প্রদ। আমাদিগকে কংসভয় হইতে রক্ষা কর। পাপী কংস যেন আমাতে তোমার জন্ম জানিতে পারে না। আমি তোমার জন্য কংসভয়ে অতিশয় ভীত ও অধীরচিত্ত হইয়াছি। হে বিশ্বাত্মন্, তোমার এই অলৌকিক চতুর্ভুজরূপ গোপন কর অহো! এই বিশ্ব বিলয় পাইয়া যাঁহার কুক্ষিমধ্যে অসঙ্কোচে অবস্থান করে, তিনি আমার কুক্ষিমধ্যে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা অপেক্ষা বিস্ময়কর বিষয় আর কি আছে! তোমার এই জন্ম নিশ্চয়ই মনুষ্যলোকের অনুকরণমাত্র। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, 'মাতঃ, এই জন্মাপেক্ষায় তৃতীয় পূর্ব জন্মে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে তুমিই পৃশ্নি নামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে। তৎকালে এই পিতা বসুদেব সর্বদোষরহিত সুতপা নামে প্রজাপতি ছিলেন তোমরা দুই জনে পিতামহ ব্রহ্মা কর্তৃক প্রজাসৃষ্টির নিমিত্ত আদিষ্ট হইয়া ইন্দ্রিয়বর্গ নিয়মিত করিয়া উগ্রতর তপস্যা করিয়াছিলে। তোমরা বর্ষা বায়ু আতপ ও হিম প্রভৃতি কালধর্মসকল সহ্য করিয়া প্রাণায়াম দ্বারা কামাদি মনোমল বিদূরিত করিয়া গলিত পত্র ও বায়ু ভোজন দ্বারা দেহধারণপূর্বক আমার নিকট হইতে অভিলষিত বিষয়ের সিদ্ধির অভিলাষে শান্তচিত্তে আমার আরাধনা করিয়াছিলে। এই প্রকার অতি কঠিন তপস্যায় সিদ্ধ হইলে আমি প্রত্যক্ষ হইয়া তোমাদিগকে বর দিতে চাহিলে তোমরা আমার মত পুত্র প্রার্থনা করিলে আমি তোমাদিগকে তাহাই হোক বলিয়া বর দিয়া আমার সমান অপর কাহাকেও না দেখিয়া স্বয়ং তোমাদিগের পৃশ্নিগর্ভ নামে পুত্র হইয়াছিলাম। তৎপরবর্তী দ্বিতীয় জন্মে তোমরা অদিতি ও কশ্যপ নাম ধারণ করিলে আমি তোমার গর্ভে বামন নামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম। এই তৃতীয় জন্মেও সেই আমিই তোমাদিগের বিশ্বাসের নিমিত্ত এই চতুর্ভুজরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। তোমরা পুত্রভাবেই হউক আর ব্রহ্মভাবেই হউক পুনঃ পুনঃ আমাকে চিন্তা করিতে করিতে আমাতে বদ্ধস্নেহ হইয়া মদ্‌গতি লাভ করিবে।' শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিয়া তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ স্বেচ্ছানুসারে দ্বিভুজ নরবালকের রূপ ধারণ করিয়া জনক-জননীর আনন্দ বিধান করিলেন। এই দ্বিভুজ নরবালক-রূপের আবির্ভাবে পূর্বোক্ত চতুর্ভুজরূপ প্রচ্ছন্ন হইয়া গেল।

দ্বিভুজরূপ শ্রীভগবানের মাধুর্যাত্মকরূপ এবং চতুর্ভুজরূপ তাঁহার ঐশ্বর্যাত্মকরূপ। তাঁহার ইচ্ছানুসারে এই উভয় রূপই প্রকটিত বা অপ্রকটিত হইতে পারে। দ্বিভুজরূপের প্রকটকালে চতুর্ভুজরূপ আচ্ছাদিত থাকে। চতুর্ভুজরূপের প্রাকট্যে নন্দ-নন্দনত্ব আচ্ছাদিত এবং বসুদেব-নন্দনত্ব প্রকাশিত হয়। দ্বিভুজরূপের প্রাকট্যে বসুদেব-নন্দনত্ব আচ্ছাদিত এবং নন্দ-নন্দনত্ব প্রকাশিত হয়। অতঃপর নন্দ-নন্দনত্ব প্রকটিত করিবার জন্য শ্রীভগবান্ আপনাকে নন্দালয়ে লইয়া যাইবার এবং সেইস্থানে রাখিয়া যশোদাগর্ভজাত কন্যাকে এইস্থানে লইয়া আসিবার নিমিত্ত পিতা বসুদেবকে আদেশ করিলেন। এই সময়েই তিনি নন্দালয়ে যোগমায়ার সহিত স্বয়ংও আবির্ভূত হইলেন। আবির্ভূত হইলেও তাঁহার ইচ্ছা না হওয়া পর্যন্ত নন্দালয়ের কেহই যোগমায়ার প্রভাবে তাঁহার সেই আবির্ভাব জানিতে পারেন নাই। এদিকে তাঁহার আদেশানুসারে পিতা বসুদেব তাঁহাকে লইয়া গমনোদ্যত হইলে যোগমায়ার প্রভাবে দ্বাররক্ষক ও অপরাপর মথুরাবাসীসকল নিদ্রিত ও কারাগৃহের দ্বারসকল আপনা আপনি উন্মুক্ত হইয়া গেল। ইন্দ্র পুনঃ পুনঃ বারিবর্ষণ করায় যমুনা নদী গম্ভীর জলপ্রবাহের বেগ দ্বারা তরঙ্গায়িত ও ফেনাব্যাপ্ত এবং ভয়ানক শত শত আবর্ত দ্বারা

আকুলিত থাকিয়াও সমুদ্র যেমন শ্রীরামচন্দ্রকে পথ প্রদান করিয়াছিলেন, তদ্রূপ বসুদেবকে জানু-মাত্রজলা হইয়া পথ প্রদান করিলেন। মেঘসকল মন্দ মন্দ গর্জন সহকারে বারিবর্ষণ করিতে লাগিল। অনন্তদেব নিজ ফণা দ্বারা ঐ বারি নিবারণ করিবার নিমিত্ত বসুদেবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। বসুদেব যমুনা পার হইয়া নন্দব্রজে উপস্থিত হইলেন। তিনি নন্দালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, যোগমায়ার প্রভাবে সকলে নিদ্রিত রহিয়াছেন। তদ্দর্শনে ক্রোড়স্থ নিজ শিশুকে যশোদার শয্যায় স্থাপন এবং তাঁহার কন্যাটিকে গ্রহণপূর্বক পুনর্বার যমুনা পার হইয়া মথুরার কারাগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি গৃহে আসিয়া আনীতা কন্যাটিকে দেবকীর শয্যায় রাখিয়া দিলেন। তৎক্ষণাৎ তাঁহার চরণদ্বয় পূর্ববৎ নিগড়িত এবং কারাগৃহের কপাটসকল আবৃত হইয়া গেল।

তৎপরে কন্যাটি কাঁদিয়া উঠিলে প্রহরীসকল উত্থিত হইয়া সত্বর কংসের নিকটে যাইয়া দেবকীর সন্তানপ্রসব নিবেদন করিল, শ্রবণমাত্রে শয্যা হইতে উঠিয়া এই আমার কাল জন্মাইয়াছে বলিয়া অত্যন্ত ব্যাকুলিতচিত্তে স্খলিতপদে মুক্তকেশে শীঘ্র সূতিকাগৃহে যাইলে কংসকে দেখিয়া দীনা দেবকী বলিলেন, 'হে ভ্রাতঃ, এই কন্যাটি তোমার পুত্রবধূ হইবে, ইহাকে মারিয়া স্ত্রী-হত্যা করা উচিত নয়। তুমি আমাদের প্রারব্ধ-কর্তৃক প্রেরিত হইয়া পাবকতুল্য তেজস্বী ছয়টি পুত্রকে বধ করিয়াছ। এই কন্যাটি প্রদান কর। আমি অতি দীনা ও হতপুত্রা বলিয়া আমাকে এই শেষ কন্যাটি প্রদান করা তোমার উচিত হইতেছে।' এইরূপে দেবকী কর্তৃক যাচিত হইয়া তখন কংস তাঁহাকে বিশেষ তিরস্কার করিয়া দেবকীর হস্ত হইতে কন্যাটিকে কাড়িয়া লইল। স্বার্থপর কংস ক্রুদ্ধ হইয়া ঐ সদ্যোজাতা কন্যাটির চরণদ্বয় ধারণপূর্বক সবলে সম্মুখস্থ শিলাপৃষ্ঠে নিক্ষেপ করিল। কিন্তু কন্যাটি তৎক্ষণাৎ তাহার হস্ত হইতে উৎপতিত হইয়া দিব্যরূপ ধারণপূর্বক আকাশতল আশ্রয় করিলেন। তিনি আকাশে প্রকাণ্ড অষ্টভুজে ধনু, শূল, বাণ, চর্ম, খড়্গ, শঙ্খ, চক্র ও গদা—এই অষ্ট আয়ুধ ধারণপূর্বক দিব্যমাল্য, বস্ত্র, চন্দন ও রত্নাভরণ দ্বারা ভূষিত হইয়া প্রকাশ পাইতে লাগিলেন। সিদ্ধ, গন্ধর্ব, অপ্সর, কিন্নর ও উরগসকল প্রভৃত উপহার লইয়া তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। তখন তিনি দুরাত্মা কংসকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'রে দুর্বুদ্ধি কংস, আমাকে মারিতে পারিলেই তোর কোন্ প্রয়োজন সিদ্ধ হইত! তোর নিধনকারী পূর্বশত্রু কোন না কোন স্থানে জন্মিয়াছেন, ইহা নিশ্চত জানবি। তুই আর বৃথা অন্য নির্দোষ দীন শিশুসকলকে হত্যা করিস্ না।' কংস সেই আকাশস্থা দেবীর কথা শুনিয়া পূর্বশ্রুতা আকাশবাণী মিথ্যা হইল ভাবিয়া অত্যাশ্চর্যান্বিত হইয়া দেবকী ও বসুদেবের বন্ধন মোচন করিয়াছিল এবং সবিনয়ে বলিতে লাগিল, 'অহো ভগিনি, অহো ভগিনীপতে, হায় আমি কি পাপিষ্ঠ! রাক্ষস যেমন নিজ সন্তানকে হিংসা করে, আমিও তদ্রূপ তোমাদিগের সন্তান-গুলিকে হিংসা করিয়াছি। আমি তোমাদিগের সন্তানগুলিকে মারিয়া ব্রহ্মহত্যাকারীর ন্যায় নির্দয়, জ্ঞাতিবন্ধুত্যাগী খল ও নির্দয় হইয়াছি। আমাকে মৃত্যুর পর কোন্ লোকে গমন করিতে হইবে জানি না। কি আশ্চর্য! কেবল মানুষেরাই মিথ্যা কথা বলে না। দৈববাক্যও মিথ্যা হয়! আমি কি মূর্খ? ঐ মিথ্যা দৈববাণীর উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া ভগিনীর সন্তানগুলি মারিয়া ফেলিলাম। যাহা হউক, তোমরা মহাত্মা; নিজ নিজ প্রারব্ধভোগকারী সন্তানসকলের জন্য শোক করিও না। জীবমাত্রেই নিজ নিজ প্রারব্ধ কর্মের অধীন বলিয়া তাহাদিগের সঙ্গে একত্র অবস্থান

সম্ভব হয় না। যখন সকল প্রাণীই অবশভাবে নিজ কৃত কর্মের ফল ভোগ করে তখন তোমরা মৎকর্তৃক নিহত ঐ পুত্রগুলির নিমিত্ত শোক করিও না। আত্মদর্শী ব্যক্তি যাবৎ 'আমি হন্তা বা আমি হত' এই প্রকার বিবেচনা করে তাবৎ হননাদি-জনিত পাপ ও উহার ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তোমরা বন্ধুবৎসল সাধু, অতএব আমার দৌরাত্ম্য ক্ষমা কর।" এই কথা বলিয়াই কংস ভগিনী ও ভগিনীপতির পদদ্বয় গ্রহণ করিল। দেবকী ও বসুদেব কংসের দৌরাত্ম্য ক্ষমা করিয়া তাহার প্রতি রোষও ত্যাগ করিলেন। তারপর বসুদেব বলিলেন "মহারাজ, তুমি যাহা বলিলে তাহা সত্য। মনুষ্যের আত্মবিষয়ক অজ্ঞান হইতেই দেহাদিতে অহংবুদ্ধি জন্মিয়া থাকে আবার ঐ অহং-বুদ্ধি হইতেই আত্মপরভেদদৃষ্টি ঘটে। ভেদদর্শী পুরুষসকল শোক, হর্ষ, ভয়, দ্বেষ, লোভ, মোহ, গর্ব সমন্বিত হইয়া পরস্পর সংহারকারী কালরূপী ঈশ্বরকে দেখে না। তাহারা মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী জানিয়াও পাপাচরণ হইতে নিবৃত্ত হয় না।" কংস বসুদেব কর্তৃক এইরূপ বিশ্বস্তভাবে প্রদত্ত প্রত্যুত্তর পাইয়া এবং বসুদেব-দেবকীর অনুমতি লইয়া স্বগৃহে গমন করিল। ইহাই শ্রীভগবান কৃষ্ণচন্দ্রের জন্ম বা আবির্ভাব-কথা।

রথস্থ বামন

ডক্টর সচ্চিদানন্দ ধর

জগন্নাথ! রথস্থ বামন! বিশ্ব তব
চলে অবিরাম। তব লীলা অভিনব
বুঝিতে নারিনু মোরা মূঢ় অজ্ঞ জনে।
'অচল' হইয়া বিশ্ব চালাও কেমনে?
টানিলে রথের রজ্জু লক্ষ হস্ত টানে,—
তবেই চলিতে পার গন্তব্যের পানে!
'অচল' 'অটল' নিজে চালাও সকলে।
চিন্ময় হইয়া দারু! কোন্ মায়াবলে?

'জগতের নাথ' তুমি হইলে 'বামন'।
বড় হয়ে ছোট হলে এ খেলা কেমন?
হেরিলে তোমারে রথে জন্ম নাহি হয়।
সত্য এই শাস্ত্রবাক্য সর্বাগমে কয়॥
এ দেহের রথে তুমি অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ।
দেখা দাও জগন্নাথ! যেন পাই ত্রাণ॥

বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেক-সূর্য

স্বামী জীবানন্দ

সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি দশদিক আলোয় আলোময় হয়ে গেছে, রাতের অন্ধকার একটুও নেই। এত আলো কার? সবাই জানে এ আলো স্বয়ংপ্রভ সূর্যের। সূর্যকে কোন কিছুর উপমা দিয়ে বোঝাতে হয় না, সূর্যের কোন পরিচয়ের আবশ্যক নেই। স্বামী বিবেকানন্দও সূর্যেরই মতো স্বয়ংজ্যোতি। তাঁর উপমা তিনি নিজে। স্বামীজী হচ্ছেন বিবেক-সূর্য। মানুষের বিবেক-বুদ্ধিকে জাগাতেই তাঁর আবির্ভাব। বিভিন্ন দিক থেকে বিভিন্ন সময়ে যদি সূর্যের ফটো তোলা যায় তবে প্রত্যেকটি ফটোর মধ্যে পার্থক্য দেখা যাবে, কিন্তু সব ফটো সূর্যেরই। তেমনি বিবেক-সূর্যকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে মনে হয় তিনি মহাজ্ঞানী, মহাভক্ত, মহাযোগী, মহাকর্মী, মহাবৈদান্তিক, চরম অদ্বৈতবাদী।

সূর্যের আলোতেই সূর্যকে দেখা হয়। বিবেক-সূর্যের প্রজ্ঞালোকেই তাঁকে অনুভব করা যায়। বিভিন্ন মানুষের প্রজ্ঞোজ্জ্বল শ্রদ্ধাপ্লুত চিত্তে স্বামীজীর রূপ যেভাবে উদ্ভাসিত হয়েছে, সেইভাবেই হয়েছে মহাপুরুষের মহিমা কীর্তিত। তাই যখন কেউ বলেন, স্বামীজী অনন্যসাধারণ দেশপ্রেমিক তখন স্বামীজীর দেশ-প্রেমের দিকটি তাঁর কাছে পরিস্ফুট হয়েছে ব'লে আনন্দ হয়। আবার কেউ যখন স্বামীজীকে পরম অদ্বৈতবাদী সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী ব'লে অভিহিত করেন, তখনও তাঁর শ্রদ্ধানিবেদনে মুগ্ধ হ'তে হয়। কারণ, উভয় দৃষ্টিকোণ থেকে দুই ব্যক্তির শ্রদ্ধাপ্লুত অন্তঃকরণে বিবেক-সূর্যের দুটি ফটো উঠেছে; দুটিই যে স্বামীজীর নিখুঁত ছবি, তা আর প্রশ্নের অপেক্ষা রাখে না। তবে যে-সব ব্যক্তির ভাবসমৃদ্ধ চিত্তে বিবেক-সূর্যের বিভিন্ন দিকের প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত তাঁরা স্বামীজীকে অনেক দিক থেকে অনুধ্যান ক'রে তাঁর গুণের পরিমাপ করবার প্রচেষ্টা করেছেন, তা সশ্রদ্ধচিত্তে গ্রহণযোগ্য। কিন্তু তা হলেও বিবেক-সূর্যের সর্বদিকের প্রতিভার মান-নির্ণয় অসম্ভব। বিবেকানন্দকে বুঝতে গেলে আর একজন বিবেকানন্দ দরকার!

স্বামীজীর কোন একটি প্রাণসঞ্চারিণী বাণী নিয়ে উদাত্তকণ্ঠে ভাষণ দেবার সময় কেউ যখন বলেন—স্বামীজী বলেছেন, গীতাপাঠের দরকার নেই, ফুটবল খেলে শরীর তৈরি কর—তখন কিন্তু তাঁর উপদেশের তাৎপর্য যথাযথভাবে অনুধ্যান করা হ'ল না। এ হ'ল সমগ্র বাণীটির একাংশের উপর অভিমত প্রকাশ। স্বামীজী বলতে চেয়েছেন শরীরকে সুগঠিত, দ্রঢ়িষ্ঠ, বলিষ্ঠ করা দরকার। গীতার প্রতি অশ্রদ্ধার ভাব পোষণ করতে বলেননি তিনি। যে ভাবটি স্বামীজী দিতে চেয়েছেন, তা হচ্ছে—সর্ব উপনিষদের সার গীতাকে বুঝতে হ'লে যে ধৃতি প্রয়োজন, তা দুর্বল শরীর দ্বারা হবে না। সুস্থ শরীরে সুস্থ সবল মন বাস করে। সেই শরীর-মন অবলম্বন করেই স্থিরা বুদ্ধি, সাত্ত্বিকী ধৃতি, ধ্রুবা স্মৃতি—যার দ্বারা গীতা-তত্ত্বের উপলব্ধি হবে, নইলে যে স্বামীজী বেদান্ত সম্বন্ধে ভাষণ দিতে গিয়ে বহু স্থানে গীতা থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন, চিকাগো ধর্মমহাসভায় গীতার বাণী উদ্ধৃত করেছেন, তিনি কি গীতাকে পরিত্যাজ্য বলতে পারেন? আবার যখন বলা হয়, স্বামীজীর অভিমত—পূজা, মন্দির, প্রতিমা, উৎসব প্রভৃতি নিষ্প্রয়োজন, শুধু দেশমাতৃকার সেবা করলেই হ'ল, তখনও স্বামীজীর ভাবাদর্শের উপর মননশীলতার

অভাবই সুপ্রকট হয়ে ওঠে। যে স্বামীজীর কণ্ঠে দেশজননীর সেবার জন্য সর্ববিধ স্বার্থত্যাগের আহ্বান, তিনিই মঠ করেছেন, মঠে দুর্গাপূজা করিয়েছেন। এতএব স্বামীজীর ভাবধারার উপর মতপ্রকাশের পূর্বে বিশেষভাবে অনুধ্যান প্রয়োজন।

স্বামীজীর বাণীতে আপাতবিরোধী ভাবের সমাবেশ ঘটেছে ব'লে মনে হবে তাঁদেরই, যাঁরা উপরে উপরে বিহঙ্গাবলোকন করেন, গভীরে প্রবেশ ক'রে অনুধ্যান করেন না। এখানে ভগবদ্গীতার কথা উল্লেখ করলে বিষয়টি হবে পরিস্ফুট। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্মের উপর যখন জোর দিয়েছেন তখন বলেছেন, 'নিয়তং কুরু কর্ম ত্বম্'—নিয়ত কর্ম কর; যখন জ্ঞানের মহিমা উপলব্ধি করতে বলেছেন তখন তাঁর প্রসিদ্ধ উক্তি 'ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে'—জ্ঞানের তুল্য পবিত্র এ জগতে আর কিছু নেই; যোগপ্রসঙ্গে যোগের উৎকর্ষ দেখিয়ে বলেছেন, 'তস্মাদ্ যোগী ভবার্জুন'—হে অর্জুন, অতএব তুমি যোগী হও; ভক্তির কথায় ভক্তির মহিমা উচ্ছ্বসিতভাবে কীর্তিত। গীতায় এমনি সব উক্তি রয়েছে, যাতে একটি পথ অন্য পথ থেকে উৎকৃষ্টতর ব'লে ধারণা হ'তে পারে। কিন্তু বিচার ক'রে অনুধ্যান করলে বোঝা যায়, আধ্যাত্মিকতার পথে প্রত্যেকটির স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য দেখানোই উদ্দেশ্য। স্বামীজীও যখন নিষ্কাম কর্মের বিষয় বলেছেন তখন কর্মের উপর খুবই জোর দিয়েছেন, মানুষকে আলস্য পরিহার করিয়ে পরহিতসাধনে নিযুক্ত করাই তাঁর উদ্দেশ্য, তাঁর জ্ঞানযোগ পড়লে মনে হয় তিনি জ্ঞানের পথ অবলম্বন করতে আহ্বান জানাচ্ছেন, রাজযোগে রাজযোগের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন, ভক্তিযোগে ভক্তিপথের মাধুর্য সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন।

স্বামী বিবেকানন্দের দশখণ্ড বাণী ও রচনার মধ্যে কি সার—এ সম্বন্ধে যদি প্রশ্ন করা হয়, তা হলে বলা যাবে, এতে অসার কিছুই নেই, সবই সার। তবে স্বামীজীর বাণীর মর্ম সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হয়ে রয়েছে এই কথা কয়টির মধ্যে: আত্মা মাত্রেই অব্যক্ত ব্রহ্ম। বাহ্য ও অন্তঃপ্রকৃতি বশীভূত ক'রে আত্মার এই ব্রহ্মভাব ব্যক্ত করাই জীবনের চরম লক্ষ্য। কর্ম, উপাসনা, মনঃসংযম অথবা জ্ঞান—ইহাদের এক, একাধিক বা সকল উপায়ের দ্বারা নিজের ব্রহ্মভাব ব্যক্ত কর ও মুক্ত হও। এই-ই ধর্মের পূর্ণাঙ্গ। মতবাদ, অনুষ্ঠান-পদ্ধতি, শাস্ত্র, মন্দির বা অন্য বাহ্য ক্রিয়াকলাপ এর গৌণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মাত্র।

যুগনায়ক স্বামীজী দেশসেবা জনসেবা ও অন্যান্য বিষয়ে যে-সব নির্দেশ দিয়েছেন, শিবজ্ঞানে জীবসেবার—নরনারায়ণজ্ঞানে রিক্ত বঞ্চিত সর্বহারা মানুষের সর্ববিধ দুঃখমোচনে আত্মনিয়োগ করতে বলেছেন, তা ব্রহ্মভাব উপলব্ধির বিশেষ সহায়ক। নিজের জীবভাব ঘুচিয়ে ব্রহ্মভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া, সঙ্গে সঙ্গে সর্বসাধারণের কল্যাণ—এই উদ্দেশ্য। তাঁর যুগোপযোগী অনুশাসনের—বিশ্বের সব মানুষকে জাগাবার জন্য তাঁর সমস্ত বাণীর তাৎপর্য ও লক্ষ্য, মহিমা ও অপূর্বত্ব এখানেই। তাঁর বাণী কোন দিন পুরানো হবে না—চিরনূতন। যতদিন সকল মানুষের বিবেক না জাগছে, ততদিন তাঁর বাণীর প্রয়োজন থাকবে, থাকবে তার সজীবত্ব, নিত্যনবীনত্ব। আমরা তাঁর ভাবাদর্শ জীবনে ফুটিয়ে তুলতে পারি বা না পারি, কিন্তু তাঁর ভাব জগতে কার্যকর হবেই। স্বামীজীর ভাবাদর্শ নিলে এগিয়ে যাব আমরা, নিশ্চয় জাতীয় জীবনে সর্বক্ষেত্রেই এগিয়ে যাব, না নিলে অগ্রগতি হবে ব্যাহত। যাঁরা তাঁর মহান্ আদর্শ নিয়ে চলতে সচেষ্ট হবেন, তাঁদের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ সুনিশ্চিত।

অনেক স্থলে বলতে শোনা যায়—ধর্ম হচ্ছে আফিম, ধর্ম আমাদের উন্নতিতে বাধা সৃষ্টি করেছে,

আমাদের ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে। স্বামীজী তো ধর্মের কথাই বলেছেন, তাই স্বামীজীর ভাব নিয়ে কি হবে! তার উত্তরে বলা যায়, স্বামীজী যে ধর্মের কথা বলেছেন, যে ধর্মের ভাবে জগৎকে প্লাবিত করতে নির্দেশ দিয়েছেন, সে ধর্ম সকল প্রকার গোঁড়ামিমুক্ত, সকল সঙ্কীর্ণতার ঊর্ধ্বে, তাকে আফিমের পর্যায়ভুক্ত করা যায় না, কারণ সে ধর্ম মানুষকে জাগায়, তার মনুষ্যত্বের উদ্বোধন ঘটায়, দেবভাব বিকশিত ক'রে দেশপ্রেম মানব-প্রেম ও বিশ্বপ্রেমে তাকে উদ্বুদ্ধ করে। তথাকথিত ধর্মের যে অংশে গোঁড়ামি সঙ্কীর্ণতা ধর্মধ্বজিতা অনুদারতা, সকলকে সমভাবে দেখার থেকে দূরে রাখার প্রচেষ্টা, শুধু কতকগুলি বিধি নিষেধ আর আচার আচরণের মধ্যেই গণ্ডিবদ্ধ, যাতে বিরোধ দ্বন্দ্ব হানাহানি আনে, তা মানুষের প্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি করে ব'লে তাকে আফিমের পর্যায়ে ফেলা যেতে পারে—এরূপ সঙ্কীর্ণতাপুষ্ট অনুদার যে ধর্মান্ধতা তাকে স্বামীজী কঠোর ভাষায় নিন্দা করেছেন। স্বামীজী যে ধর্মের কথা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন, তার মূর্তবিগ্রহ তিনি স্বয়ং। তিনি ঘুমন্ত মানুষ নন। তাঁর আলেখ্যও যেন জীবন্ত, বাণী প্রাণপ্রদ। জগতে যে-সব মানুষকে বলা হয় সদাজাগ্রত, তাঁদের মধ্যে তাঁকে প্রথম বললেও অত্যুক্তি হয় না।

সর্বকল্যাণকর ভাবের ঘনীভূত মূর্তি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ; তাঁর অতুলনীয় দেবমানবচরিত্রের প্রাঞ্জল ভাষ্য—অখণ্ডের ঋষি বিবেকানন্দ। স্বামীজীর মধ্যে শ্রীশঙ্করের জ্ঞান, শ্রীবুদ্ধদেবের হৃদয়বত্তা, শ্রীখৃষ্টের ত্যাগ ও শ্রীচৈতন্যের প্রেম বিদ্যমান; তাঁর ভাব হাজার হাজার বছর চলবে; এখন যেটুকু কর্মে পরিণত হয়েছে তাকে ঊষার আলোর সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। যখন মধ্যাহ্ন-বিবেকসূর্যের মহাভাবে হবে সমগ্র জগৎ সংশয়াতীতরূপে উদ্ভাসিত, তখনকার বিশ্ব-রূপটি কল্পনা করেও আনন্দ।

শেষ নিবেদন

শ্রীমতী শান্তিসুধা দাস

তোমার চরণতলে ঝরিয়া পড়িব যবে
ফুলেরি মতন—
আমার নির্মাল্য সাথে নিও তুমি জীবনের
শেষ নিবেদন।

যখন ধূলির পরে—
প্রতি দল যাবে ঝরে
মধুটুকু রেখে শুধু
কোরকে গোপন;

সুরভিত চিরদিন
রহিবে না অমলিন,
ঝরা ম্লান দলগুলি
জানাবে বেদন;
নিও তুমি ঝরা ফুলে
শেষ নিবেদন।

পাতাল রেল

[পূর্বানুবৃত্তি]

অধ্যাপক অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

হল্যাণ্ড :

রটারডাম—এখন এটি ইউরোপের বৃহত্তম বন্দর, সারা পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম বন্দরও বটে। কিন্তু খুবই বিস্ময়ের কথা, ১৫৭২ খ্রীঃ-এর পূর্বে এটি এমনকি কোন নদীর পারেও অবস্থিত ছিল না। ঐ বৎসর দেশরক্ষার খাতিরে শহরটিকে মাস্ (Mass) নদী পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হয়।

১৯৬৫ খ্রীঃ এই শহরের নির্মীয়মাণ পাতাল রেলের দৈর্ঘ্য ছিল ৫৪ কিমি (৩½ মাইল)। এর সাহায্যে ঘণ্টায় ২০,০০০ পর্যন্ত যাত্রী চলতে পারবে এরূপ ব্যবস্থা করার পরিকল্পনা ছিল। প্রথমে প্রতি ২½ মিনিটে একটি করে গাড়ী ; পরে বাড়িয়ে প্রতি ১½ মিনিটে একটি করে গাড়ী চালাবার কথা। তিন-কামরার গাড়ীতে ৮০ জনের বসবার এবং ভীড়ের সময় মোট ৩২৫ জন যাবার ব্যবস্থা আছে। নদীর উত্তর দিকের অংশেই পাতাল রেল এবং দক্ষিণ দিকে cantilevered viaduct।

এ শহরের মাটির নীচে ৬০ ফুট পর্যন্ত কাদা ও বালি মেশানো ; কোথাও কোথাও রাস্তার মাত্র ৫ ফুট নীচেই জল পাওয়া যায়। ডাচ ইঞ্জিনীয়াররা তাঁদের পুরনো শত্রু জলকে পরাভূত করতে বিভিন্ন অভিনব উপায় অবলম্বন করেছেন। ১৯৪০ খ্রীঃ-এ (দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়) রটারডামের ওপর যে ভয়াবহ বোমাবর্ষণ হয় তাকে পাতাল রেল নির্মাণের ক্ষেত্রে কাজে লাগান হয়েছে। সহজে সুড়ঙ্গ-নির্মাণের ক্ষেত্র হিসাবে বাছাই করে নেওয়া হয়েছে দুটি ব্যাপক বোমা-বিধ্বস্ত অঞ্চলকে। ১৯৬৫ খ্রীঃ নদীর নীচের অংশের কাজ শেষ হয়। ঐ সময়ে Leuvehaven Station-এর কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল এবং আরো তিনটি পাতাল ষ্টেশনের কাজ অনেকটা এগিয়েছিল।

ফ্রান্স :

প্যারিস—ফ্রান্সের একমাত্র এই শহরেই পাতাল রেল আছে। ১৮৫৫ খ্রীঃ নাগাদ প্রথম পাতাল রেলের প্রয়োজনীয়তার কথা ওঠে পরিবহনসমস্যা-নিরাকরণের জন্য ; কিন্তু আরো প্রায় ষোল বছর কেটে যায় জল্পনাকল্পনাতেই। ১৮৭১ খ্রীঃ-এ জার্মানরা যখন প্যারিস নগরী অবরোধ করে, তখন এরূপ রেলের প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হয়। কিন্তু সত্যিকারের কাজ শুরু হতে আরো অনেক দিন লেগে যায়। ১৮৯৮ খ্রীঃ ৩০শে মার্চ একটি আইন পাস হয়। এই আইনে মোট ৬৫ কিলোমিটার (৪০ মাইল) দৈর্ঘ্যের পাঁচটি বৈদ্যুতিক শক্তিচালিত ভূতল রেললাইন খোলার অনুমোদন মেলে। ১ নং লাইন খোলা হয় ১৯০০ খ্রীঃ ১৯শে জুলাই—Porte thaillot থেকে Porte de Vincennes পর্যন্ত। ঐ বছরেরই শেষাশেষি ১৩·৩৫ কিমি (৮¼ মাইল) লাইন সম্পূর্ণ হয়, ২৩টি ষ্টেশনের উদ্বোধন হয় এবং বছরে ৪·২ কোটি যাত্রীর পরিবহনের ব্যবস্থা হয়। ১৯০৫ খ্রীঃ নাগাদ ৩০ কিমি (১৮½ মাইল) লাইন শেষ হয়—২ নং এবং ৩ নং লাইনের পুরোটাই এবং ৬ নং লাইনের খানিকটা সম্পূর্ণ হয়। ২নং লাইনের কিছু অংশ (Anvers থেকে Colonel Fabien পর্যন্ত) ছাড়া এদের সবটাই মাটির তলায়। ১৯০৫ খ্রীঃ থেকে ১৯১১ খ্রীঃ-এর মধ্যে ৮২ কিমি (৫১মাইল)-

এর কাজ শেষ হয়— এর মধ্যে ছিল—৪, ৫, ৭, ১২ ও ১৩ নম্বর লাইন। এছাড়া, ৩ নং ও ৬ নং লাইনেরও সম্প্রসারণ করা হয়। ১৯১১ থেকে ১৯২০ খ্রীঃ পর্যন্ত দশ বৎসর কাজ অনেকটা ব্যাহত হয়—বিশেষ করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য। ঐ সময়ের মধ্যে আর মাত্র ১৬ কিমি (১০ মাইল) লাইন বর্ধিত হয়। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে ৯ নং লাইন খোলা হয় এবং বাড়ানো হয় ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে। ১৯২৮ খ্রীঃ এবং ১৯৩১ খ্রীঃ-এ ৮ নং লাইন বাড়ানো হয়। শেষোক্ত বৎসরে ৭নং লাইনেরও সম্প্রসারণ হয় এবং ১০ নং লাইন তৈরী হয়। তখন প্যারিসের পাতাল রেলের মোট দৈর্ঘ্য দাঁড়ায় একুনে ১২৮ কিমি অর্থাৎ প্রায় ৮০ মাইল। অবশ্য এর পুরোটাই শহরের সীমানার মধ্যে অবস্থিত ছিল। ১৯৩৮ খ্রীঃ থেকে এই মেট্রো কর্তৃপক্ষ আরো ২০ কিমি (১২½ মাইল) দীর্ঘ Secaux লাইনটি পরিচালনা করে আসছে।

১৯৬৬ খ্রীঃ-এ প্যারিসের RATP (The Regie Antonome des Transports Parisions) নামক সংস্থা বছরে ২০ কোটি যাত্রীর পরিবহনের ব্যবস্থা করেছিল। তার মধ্যে অর্ধেকের বেশীই ছিল পাতাল রেলের যাত্রী। এই মেট্রো বা পাতাল রেলে ১৪টি লাইনের সমারোহ এখন। তার মধ্যে ১০টি পুরোপুরিই পাতালে অবস্থিত, আর বাকী ৪টির কিছু কিছু অংশ জলপথের ওপর viaduct হিসাবে তৈরী। মোট ১৬৯ কিমি বা ১০৫ মাইল লাইনের মধ্যে ১৫৯½ কিমি অর্থাৎ ৯৯ মাইলই মাটির তলায়; মাত্র ৯½ কিমি বা ৬ মাইল পথ হল viaduct। সর্বসাকুল্যে ২৭০টি ষ্টেশন আছে—তার মধ্যে ৫১টি একাধিক লাইনের সঙ্গে যুক্ত। প্রতি লাইনের প্রতিটি ষ্টেশনকে স্বতন্ত্রভাবে গোনা হলে মোট ষ্টেশনের সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৪৪টি; তার মধ্যে ৮টি আপাততঃ বন্ধ আছে। লণ্ডন পাতাল রেলের মোট ২৪৪ মাইলে বছরে যতবার যাত্রিযাতায়াতে (journey-number), প্যারিস মেট্রোর ১০৫ মাইলে তার প্রায় দ্বিগুণ যাতায়াত হয়। কিন্তু গাড়ীর দৈর্ঘ্য হিসাবে যাতায়াত (car miles) লণ্ডনে বছরে ২২'৪ কোটি মাইল, আর প্যারিসে মাত্র ১০ কোটি মাইলের কিছু বেশী। এর কারণ হল, প্যারিসে যাত্রীদের গড় ভ্রমণ-দৈর্ঘ্য (average length of journey) অনেক হ্রস্বতর—মাত্র ½ কিমি বা ⅓ মাইল। তাছাড়া, আরো কারণ আছে—প্যারিসে রাস্তা পারাপার করা অনেকবেশী বিপজ্জনক এবং অপেক্ষাকৃত অগভীর পাতাল রেলের থেকে আগমন-নির্গমনও অনেকবেশী সহজসাধ্য। ষ্টেশনগুলি খুব কাছাকাছি হওয়ায় গাড়ীর গতিবেগ খুব বাড়ান যায় না। ঘণ্টায় গড়ে ২৫½ কিমি বা ১৬ মাইল গতিতে চলে। সকাল ৫টা ৩০ মিনিটের থেকে রাত্রি ১টা ১৫ মিঃ পর্যন্ত গাড়ী চলে।

এই লাইনের একটি অসাধারণত্ব হল, এতে নিউম্যাটিক (neumatic) টায়ারের গাড়ী প্রথমে প্রবর্তিত হয়। ১৯৫১ খ্রীঃ-এ ১১ নং লাইনে পরীক্ষামূলকভাবে এর প্রবর্তন হয়; পরে ১৯৫৪-৫৬ খ্রীঃ-এ পাকাপাকিভাবে গৃহীত হয়। ১১ নং লাইনে এর সাফল্য লক্ষ্য করে ১নং লাইনেও ১৯৬৩-৬৪ খ্রীঃ-এ এ ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়। ৪নং লাইনেও পরে এটিকে গ্রহণ করা হয়েছে। অগ্নিনিবারক উপায় হিসাবে রবারের টায়ারগুলি নাইট্রোজেন গ্যাস দিয়ে ভরা থাকে। প্রথম পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, এরকম টায়ারের অসুবিধা থেকে সুবিধাই বেশী—প্রথমতঃ শব্দ কম, দ্বিতীয়তঃ ঝাঁকুনি কম, তৃতীয়তঃ গতির স্বাচ্ছন্দ্য। ঐ কয় বছরে মাত্র ৮টি টায়ারে ছিদ্র হয়েছিল। ২ লক্ষ মাইল যাতায়াতের পরেও টায়ারের বিশেষ কিছু ক্ষয়ক্ষতি

দেখা যায়নি। আশা করা যায়, এই শতাব্দীর শেষাশেষি প্যারিস মেট্রোর সব লাইনের গাড়ীই পুরোপুরি রবার টায়ার-ওয়ালা হয়ে যাবে। প্রতি চার বছরে এক একটা লাইনে এই ব্যবস্থা শেষ করার পরিকল্পনা আছে। নতুন গাড়ীগুলি সব তিন-কামরার—প্রত্যেক কামরায় ৬৪ জন করে বসতে পারে এবং ভীড়ের সময় মোট ৩৫৫ জন পর্যন্ত যাত্রী বহন করতে পারে।

স্পেন: এই দেশে দুটি শহরে (মাদ্রিদ ও বার্সেলোনা) পাতাল রেল আছে।

মাদ্রিদ—১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে ইঞ্জিনীয়ারদের একটি গোষ্ঠী স্পেন সরকারের থেকে কিছু সুবিধা লাভ করেন। তার বলে তাঁরা একটি কোম্পানী (Compania Metrepolitano de Madrid) গঠন করেন এবং ৩'৬ কিমি (২¼ মাইল) দীর্ঘ একটি লাইন তৈরীর কাজ শুরু করে দেন। ১৯১৯ খ্রীঃ ১৭ অক্টোবর লাইনটির উদ্বোধন হয়। ১৯২৫ খ্রীঃ নাগাদ ১নং ও ২নং লাইনের সম্প্রসারণ হয়—মোট দৈর্ঘ্য দাঁড়ায় ১১'২ কিমি বা ৭ মাইল। ১৯২৯ ও ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে আরো বিস্তার সাধন করা হয়। ১৯৩৬ খ্রীঃ ১৮ই জুলাই গৃহযুদ্ধ শুরু হবার আগেই ৩নং লাইনের কাজও আরম্ভ হয় এবং এর প্রথম অংশের কাজ সমাপ্ত হয়ে ঐ বছর ৮ই আগষ্ট তারিখে উদ্বোধনও হয়। তখন শহরের পাতাল রেলের মোট দৈর্ঘ্য দাঁড়ায় ২০'৬ কিমি বা ১৩ মাইল।

গৃহযুদ্ধ শেষ হলে ৩নং লাইনের সম্প্রসারণ হয় এবং ৪নং লাইন খোলা হয়। ১৯৪৯ ও ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে ৩ নং লাইনের আরো বিস্তার করা হয়। ১, ২ ও ৩ নং লাইনের দৈর্ঘ্য ১৯৬১ থেকে ১৯৬৪ খ্রীঃ-এর মধ্যে আরও বাড়ান হয়। পাতাল রেলের মোট দৈর্ঘ্য তখন দাঁড়ায় ৩৩½ কিমি বা ২১ মাইল, ষ্টেশনসংখ্যা ৫৮ এবং যাত্রিসংখ্যা বৎসরে ৪৫'৬ কোটি। এই মেট্রোর দৈর্ঘ্য অনুপাতে যাত্রিসংখ্যা অত্যধিক—প্রতি কিলোমিটারে প্রায় ১'৫ কোটি। ষ্টেশনগুলি মাটির খুব নীচে নয়; সহজেই অবতরণ করা যায় বলে এবং বেশ কাছাকাছি বলে (দুটি ষ্টেশনের গড় দূরত্ব ৫৫০ থেকে ৬০০ গজ) যাত্রীর এত ভীড়। সকাল সাড়ে সাতটা থেকে রাত সাড়ে নয়টা পর্যন্ত প্রায় একই হারে যাত্রী চলাচল করে। ভীড়ের সময় অর্থাৎ peak hours বা rush hours বলে কিছু নেই। চার-কামরার গাড়ী প্ল্যাটফরমের দৈর্ঘ্য অনুযায়ী নির্মিত। হাল আমলে অবশ্য ১নং লাইনে কিছু কিছু ছয়-কামরার গাড়ী (৬০ মিটার থেকে বাড়িয়ে ৯০ মিটার) চালু করা হয়েছে।

মাদ্রিদের মাটি কাদা ও বালি-মিশ্রিত হওয়ায় পাতাল রেল তৈরীর কাজ অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হয়েছে, Manzanares নদীর উত্তর-পূর্বে শহরের ২০ লক্ষ লোক বাস করে; তাই পাতাল রেল এখনো নদীর অপর পারে যায়নি। 'খননাবরণ' পদ্ধতিই অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়েছে। অধিকাংশ সুড়ঙ্গই অশ্বক্ষুরাকৃতি। গাড়ীগুলি পুরোপুরি ইস্পাত-নির্মিত। এক একটি কামরার দৈর্ঘ্য ১৪'৩ মি (৪৬ ফু ১১ই) এবং প্রস্থ ২'৪ মি (৭ফু ১০½ ই)—প্রতি পার্শ্বে চারটি করে দরজা গার্ড সাহেব নিয়ন্ত্রণ করেন। এক একটি কামরায় ৩৬ জন যাত্রী বসতে পারেন—দুই পাশে পিঠোপিঠি বসবার আসন, মাঝে প্রশস্ত গ্যাংওয়ে। গাড়ী ও অন্যান্য সব সাজসরঞ্জাম স্পেনেই তৈরী।

বার্সেলোনা: এই শহরটিকে স্পেনের ম্যাঞ্চেষ্টার বলা যায়। বস্ত্রশিল্প ও অন্যান্য অনেক শিল্পের জন্য এটি বিখ্যাত। মদ, জলপাই ও কর্ক রপ্তানীর জন্যও এর সুনাম আছে। .৫ লক্ষ অধিবাসি-অধ্যুষিত শহর। পাতাল রেলের দ্রুত সম্প্রসারণ প্রয়োজন; কিন্তু মাত্র তিনটি লাইন (১, ২ ও ৩ নং) মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষের দ্বারা পরিচালিত। এছাড়া, বর্তমানে আরো একটি

লাইন (Sarria Line) একটি বেসরকারী কোম্পানীর দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। ১নং লাইন-ই (The Transversal) সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। বছরে এ লাইনে প্রায় ১৩ কোটি যাত্রী গমনাগমন করেন। এটি পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত এবং ১০·১ কিমি (৬১/৪ মাইল) দীর্ঘ। ৮·৯ কিমি (৫১/২ মাইল) লম্বা—এতে মাত্র ৫টি ষ্টেশন আছে। এ লাইনে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিসমূহের পরীক্ষামূলক কাজ চলছে, যাতে ভবিষ্যতে সব লাইনেই তা' গৃহীত হতে পারে (বিশেষ করে ১নং লাইনে)। ৩ নং লাইন (The Gran Metropolitano) শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত লেসেপ্‌স্ (Lesseps) থেকে আরগঁ (Aragon) পর্যন্ত দক্ষিণাভিসারী, তারপর দুটি শাখায় বিভক্ত। মোট দৈর্ঘ্য ৫·২ কিমি (৩১/৪ মাইল) এবং ষ্টেশনের সংখ্যা ১০।

সারিয়া লাইন শহর কেন্দ্রের কাতালুনা (Cataluna) থেকে ৩ নং লাইনের সমান্তরাল, তারপর পশ্চিমাভিমুখী। মোট দৈর্ঘ্য ৬১/২ কিমি (৪ মাইল); ষ্টেশনসংখ্যা ১২। বহুদিন পূর্বে (১৯২৬ খ্রীঃ জুন মাসে) বোরদেতা (Bordeta) থেকে কাতালুনা পর্যন্ত প্রথম অংশের উদ্বোধন হয়। ১৯৩২ খ্রীঃ জুলাই মাসে এ লাইন দুইপ্রান্তে ত্রিয়ুনফিনো (Triunfino) ও সান্তা ইউলালিয়া (Santa Eulalia) পর্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে Marinas পর্যন্ত। তারপর গৃহযুদ্ধের জন্য কাজ বহুদিন বন্ধ থাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়ে যাবার (১৯৪৫ খ্রীঃ) ও বেশ পরে আবার কাজ শুরু হয়। লাইন সম্প্রসারিত হয় Clot পর্যন্ত ১৯৫১ জুন মাসে, Nanvas পর্যন্ত ১৯৫৩ মে মাসে এবং Fabra-y-puig পর্যন্ত ১৯৫৪ মে মাসে।

২নং লাইন খোলা হয় ১৯৫৯ খ্রীঃ ২১শে জুলাই। এই লাইনে ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ১কোটি ৩০ লক্ষেরও বেশী লোক চলাচল করেছিল। এটি পুরোপুরিই পাতাল রেল। ৩ নং লাইনও পুরোপুরি মাটির নীচে—বছরে ৫ কোটি ৭০ লক্ষেরও বেশী লোক এতে যাতায়াত করে। ১, ২ ও ৩ নং লাইনের কর্তৃপক্ষ F.C.Metropolitano-এর হাতে অদূর ভবিষ্যতে চালু করবার মত সাতটি সম্প্রসারণ-পরিকল্পনা আছে—২ নং লাইনে Vilapiscina থেকে উত্তরে ১/৪ কিমি, ১নং লাইনে Fabra-y-puig থেকে ২১/২ কিমি এবং Sanes থেকে পশ্চিমে প্রায় ২ কিমি, ৩ নং লাইনে Fernando থেকে ১নং লাইনের Plaza de Espana পর্যন্ত ৩১/২ কিমি দীর্ঘ একটি সংযোগকারী লাইন। এছাড়া, কোথাও কোথাও ডবল সুড়ঙ্গপথ নির্মাণ এবং সারিয়া লাইনের সম্প্রসারণ-পরিকল্পনাও আছে। সব মিলিয়ে পরিকল্পিত সম্প্রসারণের দৈর্ঘ্য হবে ১৬ কিমি বা ১০ মাইল। আরো বহু নূতন লাইনের নক্সাও তৈরি করা আছে।

পর্তুগাল:

লিসবন—পর্তুগালের একমাত্র শহর, যেখানে পাতাল রেল আছে। পাতাল রেল কর্তৃপক্ষের নাম Metropolitano de Lisbon—১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে গঠিত হয়; কিন্তু কাজ শুরু করে ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে। পাতাল রেলের প্রথম লাইন উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত, এর উত্তর-পশ্চিম কোণে একটি শাখাও আছে। দ্বিতীয় লাইন শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত Rossio থেকে 'u'-র মত বেঁকে উত্তরে প্রথম লাইনের সমান্তরাল হয়ে গেছে। ভবিষ্যতে তৃতীয় একটি লাইনও করবার কথা আছে। প্রথম ও দ্বিতীয় লাইনের সম্প্রসারণ এবং সমস্ত লাইনের সংযোগকারী একটি অর্ধচন্দ্রাকৃতি লাইন (শহরের বাইরে দিয়ে) তৈরি করার পরিকল্পনাও আছে।

১৯৫৯ খ্রীঃ ৩০শে ডিসেম্বর প্রথম লাইন

খোলা হয় Entre Campos থেকে Restauradores পর্যন্ত। এ সময়ে Rotanda থেকে Sete Rios পর্যন্ত একটি শাখা লাইনও চালু হয়। ১৯৬৩ খ্রীঃ ২৭শে জানুআরি প্রথম লাইন Rossio পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়। প্রথম লাইনের দৈর্ঘ্য ৭ কিমি (৪½ মাইল); ষ্টেশনসংখ্যা ১২। লাইনগুলির কাজ শেষ হলে লিসবনের পাতাল রেলের দৈর্ঘ্য হবে ৪০ কিমি (২৫ মাইল)—ষ্টেশনসংখ্যা হবে ৩১ অথবা তারও বেশী।

সমস্ত লাইনই পুরোপুরি মাটির তলায়; কিন্তু একটি মাত্র ষ্টেশনই যথার্থ গভীর—এর নাম Parque ষ্টেশন, এতে একজোড়া এসক্যালেটর বসাতে হয়েছে। দুই-কামরার গাড়ী প্রতি ২½ মিনিট অন্তর চলে। প্রতি গাড়ীতে ৪০০ পর্যন্ত যাত্রী যেতে পারে। ঘণ্টায় প্রায় ১০,০০০ যাত্রী চলতে পারে। কালক্রমে ১½ মিনিট অন্তর গাড়ী চালানো যাবে আশা করা হচ্ছে; তাহলে চার-কামরার গাড়ী যদি চালান হয়, তবে ঘণ্টায় গড়ে ৩০,০০০ যাত্রী চলতে পারবে।

Parque ষ্টেশনের কাছে ৯০০ মি (½ মাইল) এবং কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত অষ্টাদশ শতাব্দীর কতিপয় প্রাসাদের নিম্ন অংশ ছাড়া বাকী পুরো লাইনই খননাবরণ (cut and cover) পদ্ধতিতে নির্মিত। গাড়ীগুলির কতক জার্মানীতে তৈরী, কতক স্বদেশেই। দুই-কামরার গাড়ীই অধিকাংশ ক্ষেত্রে চলে—প্রয়োজন হলে অবশ্য জুড়ে দিয়ে চার-কামরার ব্যবস্থাও আছে।

ইতালী: এই দেশের দুটি শহরে (রোম ও মিলান) পাতাল রেল আছে।

রোম: ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে রোমে বিশ্বমেলা (World Fair) হওয়ার কথা ছিল। ইতালীর সরকার এজন্য ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে একটি পরিকল্পনা করেন। প্রদর্শনীর স্থানের (aite) সঙ্গে শহরের বিভিন্ন অঞ্চলের যাতে উত্তম যোগাযোগের ব্যবস্থা হয়, তার জন্য কাজ শুরু হয়ে যায়। কিন্তু ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয় যুদ্ধের জন্য, তখন সুড়ঙ্গগুলির কাজ মোটে অর্ধসমাপ্ত। যুদ্ধ-শেষে বেকার-সমস্যা লাঘব করার জন্য বিধ্বস্ত সুড়ঙ্গপথগুলির সংস্কারকার্য আরম্ভ করা হয়। ১৯৫৫ খ্রীঃ ৯ই ফেব্রুআরি 'STEFER' নামক বেসরকারী সংস্থা গাড়ী-চালানও শুরু করে দেয়।

শহরের উপকণ্ঠে রোমের সঙ্গে লিদো ডি অস্তিয়ার সংযোগকারী লাইন শুরু হয়েছে San Pavlo থেকে। মাটির নীচে দিয়ে গিয়ে এ লাইন আবার মাটির ওপরে উঠেছে। Magliana পর্যন্ত লিদো লাইনের সমান্তরাল হয়ে গেছে এবং সেখান থেকে লাইনের আবার পাতাল-প্রবেশ এবং তা' বিশ্বমেলার জন্য নির্দিষ্ট স্থান পর্যন্ত চলে গেছে। ঐ স্থানটির পুরোপুরি উন্নয়ন এখনো পর্যন্ত হয়নি। ফলে পাতাল রেল এখনো শহরের জনসংখ্যাবহুল অঞ্চলগুলির সঙ্গে যুক্ত হয়নি এবং লোকচলাচলও যথেষ্ট নয়। মোট সুড়ঙ্গপথের দৈর্ঘ্য মাত্র ৬ কিমি বা ৩¾ মাইল। গোটা পথটার আকৃতি উপবৃত্তের ন্যায়—ডবল লাইন। মোট ১০টি ষ্টেশনের মধ্যে ৫টি মাটির তলায়। ভূতল ষ্টেশনগুলিতে সুড়ঙ্গপথের বিস্তার বেশী; টিকেট-ঘরও সেখানেই। গাড়ীগুলি সবই মিলানে তৈরী—প্রত্যেকটির দৈর্ঘ্য ১৪'১ মিটার (৪৬ ফুট ৩ ইঞ্চি)।

মিলান: এ শহরের ট্রাম লাইন দীর্ঘায়ত এবং খুব সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত; কিন্তু ভূপৃষ্ঠ পরিবহনের বিকল্প ব্যবস্থার পরিপন্থী। সুতরাং দৈনিক যাত্রীর বিপুল তরঙ্গকে শান্ত করতে হলে অপরিসর রাস্তাগুলির থেকে ট্রামের অপসারণ প্রয়োজন, নতুবা পাতাল রেল নির্মাণ আবশ্যক। দ্বিতীয় পন্থাই অবলম্বিত হয়েছে। মিলান পাতাল রেল পরিকল্পনা কারুর কারুর মতে

সর্বাধুনিক, সর্বোত্তম, সংহত পরিকল্পনা।

বহুকাল পূর্বে (১৯০৫ খ্রীঃ) পাতাল রেলের প্রস্তাব করা হয় এই শহরে। কিন্তু ১৯৫৫ খ্রীঃ-এর পূর্বে পরিবহন মন্ত্রক এরূপ রেলের নির্মাণ অনুমোদন করেননি। প্রথম লাইনের সুড়ঙ্গপথ নির্মিত হয়েছে মাত্র বারো বছর আগে (১৯৬১ খ্রীঃ)। এটি তৈরি করেন মিউনিসিপ্যালিটি-নিয়ন্ত্রিত একটি কোম্পানী। পরিকল্পিত ব্যবস্থায় মোট চারটি লাইন শহরের তলা দিয়ে যাবে, তারা পরস্পর সংযুক্ত থাকবে বিভিন্ন কেন্দ্রে। সব লাইনের সম্মিলিত দৈর্ঘ্য হবে ৩৬½ কিমি (২২¾ মাইল)। প্রতি লাইনের উভয় প্রান্তে সম্প্রসারণের সুযোগ ও তদনুরূপ ব্যবস্থা অবশ্যই রাখা হবে। প্রতি লাইনের নাম রং-এর নামে রাখা হবে, যেমন, Red No. 1, Green No. 2, Yellow No. 3 এবং Blue No 4। ষ্টেশনসমূহের অলংকরণও যথাক্রমে ঐ রং অনুযায়ীই হবে।

১৯৫৮ খ্রীঃ সেপ্টেম্বর মাসে ১নং লাইন অর্থাৎ Red line নির্মাণের পরিকল্পনা অনুমোদিত হয়। লাইনটি খোলা হয় ১৯৬৪ খ্রীঃ ১লা নভেম্বর। এর দৈর্ঘ্য ১২½ কিমি (৭¾ মাইল)—মারেলি থেকে ক্যাথিড্র্যাল পর্যন্ত এবং সেখান থেকে পশ্চিমে বেঁকে গিয়ে লোতো পর্যন্ত। পাগানো থেকে ২ কিমি (১¼ মাইল) দীর্ঘ একটি শাখাও এর আছে। ভীড়ের সময় ছয়-কামরার গাড়ী ১½ মিনিট অন্তর এই লাইনে চলে—ঘণ্টায় গড়ে ৫০,০০০ যাত্রী পর্যন্ত চলতে পারে। ঘণ্টায় গতিবেগ ৩০ কিমি বা ১৯ মাইল। ২১টি ষ্টেশনের মধ্যে চারটি চিহ্নিত রয়েছে ভবিষ্যৎ লাইনসমূহের গাড়ীবদলের ষ্টেশন হিসেবে। 'Banda Nere' শাখারও এরূপ চারটি জংশন ষ্টেশন থাকবে।

সব অল্প ব্যবধানে অবস্থিত—প্রতি দুটি ষ্টেশনের গড়পরতা দূরত্ব মাত্র ½ মাইল, ন্যূনতম দূরত্ব সিকি মাইলও (¼ মাইল) আছে। ষ্টেশনসমূহের অলংকরণ সংক্ষেপিত ব্যয়ের হলেও সুষ্ঠু – চোখধাঁধানো না করে নয়নসুখকর করারই চেষ্টা হয়েছে। যাতে চোখে না লাগে, তার জন্য প্ল্যাষ্টিকে shade দেওয়া নীল টিউব লাইটের ব্যাপক ও সুন্দর ব্যবস্থা করা হয়েছে। গাড়ী-চলাচল-ব্যবস্থা শ্রমসংক্ষেপ নীতিতে পরিচালিত। প্রতি গাড়ীতে একজন মাত্র চালক এবং প্রতি ষ্টেশনের প্রবেশপথে একজন মাত্র নিয়ন্ত্রক। ষ্টেশনে যাত্রিচলাচল closed-circuit টেলিভিশনের দ্বারা পুরোপুরি নিয়ন্ত্রিত। এই টেলিভিশন ব্যবস্থার ৬২৫টি লাইন আছে।

San Basilaতে একটি কেন্দ্রীয় ট্রাফিক-নিয়ন্ত্রণ অফিস আছে; তার সঙ্গে প্রতিটি টিকেট-বিক্রয়কেন্দ্রের টেলিফোন-যোগাযোগ আছে। টেলিপ্রিণ্টার-বার্তাপ্রেরণের ব্যবস্থাও প্রতি ষ্টেশনেই আছে। ষ্টেশনগুলির ঘড়ি San Babila' মাষ্টার ক্লকের সঙ্গে স্বয়ংক্রিয়ভাবে যুক্ত এবং এ্যাষ্ট্রনমিক্যাল অবজারভেটরি থেকে রেডিওর সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত। ঘণ্টায় যাতে চল্লিশটি করে ট্রেন চলতে পারে, সেইমত সিগন্যালব্যবস্থা তৈরী আছে এবং ভবিষ্যতে যাতে পূর্ণস্বয়ংক্রিয় চালন-ব্যবস্থা (automatic driving) প্রবর্তিত হতে পারে তারও বন্দোবস্ত আছে। এই শহরের পাতাল রেল কোথাও রাস্তার নীচে ৮¾ মিটার বা ২৮ ফুট ৮ ইঞ্চির বেশী গভীর নয়। বালি-ও কাঁকর-মিশ্রিত জমির ওপর শহরটি অবস্থিত, কোথাও কোথাও বড় পাথরও আছে এবং জলের স্তরও (level) বেশ উঁচুতে। সুতরাং খননের সময় ধ্বসে পড়ার সম্ভাবনা কম বলে কাঠের ব্যবহারও কম করতে হয়েছে। মিলানের অভিনব খননপদ্ধতিও এসব কারণেই অবলম্বন করা সম্ভব হয়েছে। এই পদ্ধতির নাম Bentonite বা I. C. O. S. পদ্ধতি। খনিজ তৈলের

সন্ধানী খনন (drilling)-এর সময়ও আধুনিক কালে এই পদ্ধতিই ব্যাপকভাবে অবলম্বিত হয়েছে। ১নং লাইন তৈরীর সময় মিলানে এটি পরীক্ষা-মূলকভাবে গ্রহণ করা হয়। পদ্ধতিটি সংক্ষেপে নিম্নলিখিতরূপ :—

সুড়ঙ্গপথের দুই দেওয়াল ধরে প্রথমে সরু পরিখা (trench) খনন করতে হবে। এই পরিখা হবে কয়েক ফুট গভীর—সঠিক অবস্থানের জন্য দুই পাশে পাতলা কংক্রীট দিয়ে তৈরী দেওয়াল এবং মাঝটা বেনটোনাইট দিয়ে ভরতি করা হয়। বেনটোনাইট আগ্নেয়গিরিনিঃসৃত এক-প্রকার মৃত্তিকা দিয়ে তৈরী, অনেকটা Fuller's Earth-এর মত। বেনটোনাইট-এর যে মিশ্রণ (mixture) তৈরি করা হয় তা স্থির থাকলে jelly-র মত, কিন্তু মথিত হলে তরল হয়ে যায়। বেনটোনাইট-ভরতি পরিখা খানিকটা তৈরী হয়ে গেলে একটা ইস্পাতখণ্ড (steel section) তার ওপর নামিয়ে দেওয়া হয় এবং পরিখার তলদেশ দিয়ে কংক্রীট পাম্প করে বেনটোনাইটের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়। এতে পরিখার যে পরবর্তী অংশ খনন করা হতে থাকে, তা' ঐ বেনটোনাইটে ভরতি হয়ে যায় এইভাবে সুড়ঙ্গ-নির্মাণ এগিয়ে চলে।

গাড়ীগুলি সব মোটর-চালিত। মোটরগুলি সব জোড়া জোড়া। গাড়ীর দুই প্রান্তেই চালকের একটি করে ক্যাবিন (driver's cabin) আছে। প্রথম ৬০টি গাড়ীতে দ্রাঘিম আসন (longitudinal seats) ছিল—প্রতি কামরায় ২৬ জন করে বসতে পারত এবং ১৮৭ জন দাঁড়িয়ে যেতে পারত। কিন্তু দ্বিতীয় দফায় যে ২৪টি গাড়ীর ফরমায়েস দেওয়া হয়, তার বসবার আসন পাশাপাশি (lateral)— প্রতি কামরায় ৩২ জন করে বসতে এবং ১৭৪ জন দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে। মোটরযুক্ত কামরাগুলি ১৭.৫৪ মিঃ (৫৭ ফুট ৬ ই) লম্বা, ২.৮৫ মিঃ (৯ ফু ৩ ই) চওড়া এবং লাইন থেকে ২.৮৫ মিঃ (৯ফু ৩ই) উঁচু। সর্বোচ্চ গতিবেগ ঘণ্টায় ৮০ কিমি (৫০ মাইল) পর্যন্ত হতে পারে। কিন্তু গড় গতিবেগ ঘণ্টায় মাত্র ৩০ কিমি (১৯ মাইল); কারণ ষ্টেশনগুলির গড় দূরত্ব হল মাত্র ৬০০ মিটার বা ৬৫৩ গজ (দীর্ঘতম দূরত্ব যা' আছে দুটি ষ্টেশনের মধ্যে, তাও হ'ল মাত্র ৭৫০ মিটার বা ৮২০ গজ)।

অষ্ট্রিয়া : রাজধানী ভিয়েনাতে মাত্র পাতাল রেল আছে, যদিও কারুর কারুর মতে তাকে পূর্ণাঙ্গ পাতাল রেল বলা চলে না।

ভিয়েনা—ট্রামপ্রচলনের ব্যাপারে ভিয়েনা এককালে পৃথিবীর অন্যতম পুরোধা শহর ছিল। পরবর্তীকালে এই ট্রামই মাটির নীচে নিয়ে যাওয়া হয় এবং কালক্রমে তা' পাতাল রেলের অনুরূপ হয়ে ওঠে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে (১৯৪৫ খ্রীঃ) শহরের ৪০ ভাগ ট্রাম মাত্র অবশিষ্ট ছিল, বাকী ৬০ ভাগ যুদ্ধে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। পুনর্গঠনের কাজ শুরু করতেও দেরী হয়, কারণ অষ্ট্রিয়ান শিল্পের অধিকাংশই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। পুন-নির্মাণ শেষ হয় ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে।

ভিয়েনার পাতাল রেলের নাম Stadtbahn। এর মোট দৈর্ঘ্য ২৬½ কিলোমিটার বা ১৬½ মাইল। সুড়ঙ্গপথের ৬½ কিমি (৪ মাইল) ডবল ট্র্যাক্। অধিকাংশ সুড়ঙ্গই খননাবরণ পদ্ধতিতে তৈরী। গাড়ীগুলি সচরাচর ছয় বা সাত কামরার, কখনো কখনো অবশ্য নয়-কামরার গাড়ীও দেখা যায়। মোট ২৫টি ষ্টেশন—পাশে নীচু প্ল্যাটফর্ম, রাস্তার ওপরের ট্রামের সঙ্গে খুব সহজেই যোগাযোগ করা যায়। Stadtbahnকে ভিয়েনা ট্রামওয়ে ব্যবস্থারই একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ বলা যায় ; কারণ এতে ১,১৪৬টি ট্রাম (চালকসহ) এবং ১,২৭২টি trailing tramকে কাজে লাগানো

হয়েছে অর্থাৎ উপরিউক্ত সংখ্যার দুই-কামরার ট্রামকে মাটির নীচে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ক্রমাগত ট্রামগাড়ীগুলি জুড়ে দিয়ে তাদের উপযুক্ত ষ্টেশন ও সাবওয়ের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ফলে ভিয়েনার পাতাল রেল এক নূতন বিতর্কের সূচনা করেছে—তা'হল পাতাল রেল আর ভূতল ট্রাম কি তাহলে সমার্থবোধক ?

হাঙ্গেরী :

বুদাপেস্ত—এই রাজধানী শহরেই এদেশের একমাত্র পাতাল রেল। ইউরোপের মহাদেশীয় ভূখণ্ডে এটিই প্রাচীনতম পাতাল রেল। দানিউব নদীর পশ্চিম তীরে বুদা এবং পূর্বতীরে পেস্ত দুইয়ে মিলিয়ে এই প্রাচীন যমজ শহর। এদের একটি প্রধান যোগসূত্র হল এই পাতাল রেল। ভিয়েনায় প্রথম বৈদ্যুতিক ট্রাম খোলার কয়েক মাস পূর্বেই ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে বুদাপেস্তে ফ্রানৎস্ যোসেফ বৈদ্যুতিক পাতাল রেলের উদ্বোধন হয়। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে বুদাপেস্ত ট্রামওয়ে সংস্থা এই লাইনটির কাজ নিজের হাতে তুলে নেয়।

মোট ৩'৭৫ কিমি (২'৩ মাইল) লাইনের মধ্যে ৩'২৫ কিমি (২ মাইল)-ই খননাবরণ পদ্ধতিতে তৈরী। রাস্তার অল্প নীচেই ডবল লাইন। টানেলের বিস্তার ৬ মিটার (১৯ ফুট ৮ই) এবং রেল লাইনের থেকে উচ্চতা ২ ৭৫ মি (৯ফুট)। ১১টি ষ্টেশনের মধ্যে ৯টিই মাটির তলায় এবং ২টি (Zoo Station ও Lido Station) রাস্তার ওপরে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে শহরের দ্রুত সম্প্রসারণ হয়েছে। ২০ লক্ষেরও বেশী লোক এই পথে বারবার যাতায়াত করেন। যুদ্ধের অল্প কিছু দিন পরেই একটি নতুন পতাল রেল নির্মাণের কথা ঘোষিত হয়। তদনুযায়ী ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে ১০কিমি (৬'২৫ মাইল) দীর্ঘ পূর্ব-পশ্চিম লাইনের কাজ শুরু হয়! কিন্তু ১৯৫৩ খ্রীঃ মত বদলে যায়—গৃহনির্মাণ ও শিল্পসংগঠনে শ্রম ও অন্যান্য সম্পদ নিয়োগ করার অগ্রাধিকার দেওয়া হয় এবং পাতাল রেলের কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়। প্রকৃতপক্ষে পাতাল রেলের জন্য সংগৃহীত সামগ্রীসমূহ কারখানা ও বাড়ীঘর তৈরীর কাজে লাগান হয়। টানেলগুলি তৈরীর শীল্ডগুলি (১২টি) সংরক্ষণের জন্য এবং ঐ তিন বছরে সুড়ঙ্গপথ যতটা তৈরী হয়েছিল তাতে খাদ্যশস্য মজুত রাখার জন্য কিছু লোক অবশ্য রাখা হয়েছে। যখন টানেল তৈরীর কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়, তখন প্রায় ৩ কিমি (২ মাইল) সুড়ঙ্গপথ তৈরী হয়ে গিয়েছিল। মস্কো এবং লেনিনগ্রাদ পাতাল রেলের অনুকরণে এই কাজ চলছিল। ১৯৬৩ খ্রীঃ ১৪ই নভেম্বর থেকে আবার কাজ শুরু হয়েছে—কিন্তু অনেক ব্যয়সংক্ষেপের লক্ষ্য নিয়ে। বুদাপেস্তে সুড়ঙ্গনির্মাণে কোথাও কোথাও বেশ সমস্যায় পড়তে হয়েছে, যেমন Bhaha Lejza Square-এর কাছে চোরাবালির সমস্যা। কিন্তু Deak Square Station যথেষ্ট গভীর (৪০ মিটার বা ১৩১ ফুট) হলেও কোন অসুবিধা হয়নি খনন ও নির্মাণে, কারণ এখানকার মাটি শক্ত কাদামাটি।

হাঙ্গেরিয়ানরা যে ভাল গাড়ী তৈরি করতে পারে তার প্রমাণ হল, ১৯০৬ খ্রীঃ লণ্ডনের পিকাডিলি লাইনের ২১৬ খানা গাড়ীর অর্ধেক দিয়েছিল ফরাসীরা, বাকী অর্ধেক দিয়েছিল হাঙ্গেরিয়ানরা। তবে খুব সম্ভবতঃ জাতীয় শ্রম-সংরক্ষণের জন্য বুদাপেস্তের এই নতুন পাতাল রেলের অনেক সাজসরঞ্জামই (গাড়ী, এসক্যালেটার ইত্যাদি) রাশিয়া থেকে এসেছে। পরিকল্পিত পাতাল রেলটি পুরোপুরিই পূর্ব-পশ্চিম লাইন একটি, একটি উত্তর-দক্ষিণ লাইন (৮ কিমি বা ৫ মাইল লম্বা) এবং একটি বৃত্তাকার লাইন (যা' আড়াআড়ি লাইনগুলির চার প্রান্ত বা

টারমিনাসকে যুক্ত করবে) নিয়ে গঠিত হবে।

জার্মানী :

বার্লিন—বার্লিনের প্রাচীনতম লাইনটি তৈরী হয়েছিল ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে এটি বর্তমানে "Line B"-এর অন্তর্ভুক্ত। একটি দিক থেকে এ শহরের পাতাল রেল অসাধারণত্বের দাবী রাখে। তা' হল, দুটি স্বতন্ত্র মাপের সুড়ঙ্গ (tunnel gauges) এবং গাড়ী (rolling stock) নিয়ে এটি গঠিত। গোটা পাতাল রেলের দৈর্ঘ্য ৮৯ কিমি (৫৫½ মাইল)। এই মোট দৈর্ঘ্য প্রায় সমান দুইভাগে বিভক্ত—১। পূর্ব-পশ্চিম-প্রসারা ছোট লাইন A এবং B, ২। উত্তর-দক্ষিণ-বিস্তারী বড় লাইন C, D এবং G। এছাড়া, একটি E লাইনও আছে; সেটি পূর্ব-পশ্চিম-প্রসারী, কিন্তু একান্তভাবেই পাতাল রেলের পূর্বাংশে (eastern sector) অবস্থিত।

ছোট লাইন 'A'র মোট দৈর্ঘ্য ১৯½ মাইল। তার মধ্যে ৫ মাইল পূর্বাংশে। ছোট লাইল 'B'-এর দৈর্ঘ্য ৭ মাইল, তার মধ্যে ½ মাইল মাত্র পূর্বাংশে, ১½ মাইল সুড়ঙ্গপথে, বাদবাকী ইস্পাত নির্মিত viaduct-এ। বড় লাইন C-র মোট দৈর্ঘ্য ১২½ মাইল—এর মধ্যে ৫½ মাইল উত্তরাংশে এবং ২ মাইল পূর্বাংশে অবস্থিত। বড় লাইন Dএর প্রথম ¾ মাইল পশ্চিমাংশে, তার পরের ২¾ মাইল পূর্বাংশে, সীমান্ত অতিক্রম করে আর ৩ মাইল দক্ষিণাংশে। বড় লাইন E-এর পুরো ৪½ মাইলই পূর্বাংশে অবস্থিত।

বড় লাইন 'G' ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের ২রা সেপ্টেম্বর খোলা হয়। এই লাইনটি আরো কয়েকটি লাইনের সঙ্গে যোগাযোগের সূত্র হিসাবে তৈরী হয়েছে—A, B ও C লাইনের কোন কোন ষ্টেশনের সঙ্গে এটি মিলিত হয়েছে। প্রথমে এই লাইনের ৪½ মাইল পথ খননাবরণ সুড়ঙ্গ নির্মিত হয়েছিল, পারে আরো ৩½ মাইল সম্প্রসারণ হয়েছে। বড় লাইন 'H'-এর দৈর্ঘ্যও ৮ মাইল। A, B, C ও G লাইনের সঙ্গে এর সংযোগ আছে; একে দীর্ঘতর করার বিভিন্ন পরিকল্পনাও আছে।

মোট ৫৫½ (route miles) পাতাল রেলপথের মধ্যে ৪০½ মাইলই পশ্চিম বার্লিনে অবস্থিত। বড় লাইনগুলি প্রায় পুরোই সুড়ঙ্গপথে, তার ছোট লাইনগুলির মধ্যে ১৭ মাইল মাত্র মাটির তলায়। সুড়ঙ্গপথ মোট ৪৪ মাইল এবং উন্মুক্ত পথ ২১½ মাইল।

পশ্চিমাংশের ৮৮টি ষ্টেশনে বছরে গড়ে ২০ কোটি যাত্রী চলে; পূর্বাংশের ৩৪টি ষ্টেশনে এর চাইতে অনেক কম যাত্রী যাতায়াত করে। অনেক বড় শহরের তুলনায় এ শহরের পাতাল রেলের বৈশিষ্ট্য হল, এতে ভীড়ের সময় দীর্ঘতর (যেমন সকাল ৬টা থেকে ৮½টা পর্যন্ত এবং বিকাল ৪½টা থেকে ৬½ টা), আর দুপুরে কোন ভীড় বাড়ে না। অবশ্য সপ্তাহের শেষের দিকে কোন কোন লাইনে কিছু বেশী ভীড় হয়, বিশেষতঃ উত্তরাংশে ও দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে।

আট-কামরা পর্যন্ত গাড়ী ভীড়ের সময়ে ১½ মিনিট অন্তর চলে। ঘণ্টায় গতিবেগ ৩৩ কিমি (২১.২৫ মাইল)। এ হল পুরনো লাইনগুলিতে, যেখানে ষ্টেশনগুলি বেশ দূরে দূরে। আরো ঘনসন্নিবিষ্ট ষ্টেশনযুক্ত নতুন লাইনগুলিতে গাড়ীর গতিবেগ আরো কম—ঘণ্টায় ৩০ কিমি বা ১৮.৫ মাইল।

ষ্টেশনগুলির সংরক্ষণব্যবস্থা উত্তম খুবই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। Vacuum cleaning-এর ব্যবস্থা যথোপযুক্ত। স্প্রী নদীর তীরে জলাভূমিতে এই শহর তৈরী হয়েছে বটে, কিন্তু মাটির কিছু নীচেই (subsoil) বেশ বালি ও কাঁকর থাকায় বিরাট বিরাট প্রাসাদ বহন করার ক্ষমতা রাখে। পুরনো সুড়ঙ্গগুলি সবই খননাবরণ পদ্ধতিতে রাস্তার তলায় তৈরী হয়েছিল। তখন ওপরের পরিবহন-

ব্যবস্থায় যথেষ্ট অসুবিধা হয়েছিল। এছাড়া, মাটির নীচে জলের স্তর (level) বেশ উঁচুতে থাকায় (২ থেকে ৫ মিটারের মধ্যে) লাইন তৈরীর সময় জল পাম্প করে বের করে দেওয়ার ব্যাপক ব্যবস্থা করা হয়েছিল এবং হাম্বুর্গের মত waterproof lining-এর দরকার হয়েছিল।

গাড়ীগুলি পাতলা ইস্পাতে তৈরী এবং এলুমিনিয়ম-নির্মিত গাড়ীর মতই হালকা। দ্রাঘিম আসন (longitudinal seats) ব্যবস্থা—প্রতি কামরায় ৩৬ জন করে বসতে পারে। ড্রাইভারের কামরার পিছনে একটি অংশ আছে। ভীড়ের সময় এটি খুলে দিয়ে যাতে সবশুদ্ধ ১১০ থেকে ১১৮ পর্যন্ত যাত্রী দাঁড়িয়ে যেতে পারে তার ব্যবস্থা করা হয়।

হাম্বুর্গ—জার্মানীর দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর এবং বৃহত্তম বন্দর। এর লোকসংখ্যা ২০ লক্ষের মত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে শহরটির তিন-চতুর্থাংশই বোমা-বিধ্বস্ত হয়েছিল। তাই এর অনেকটাই পুনর্নির্মাণ করতে হয়েছে। ১৯৫৫ খ্রীঃএ এই পুনর্নির্মাণ সমাপ্ত হয়েছে। অনেক বেশী চওড়া আধুনিক রাস্তাসমূহ তৈরী হয়েছে; কিন্তু তৎসত্ত্বেও ক্রমবর্ধমান যাত্রী বহন করা দুরূহ ব্যাপার। তদুপরি শহরের প্রায় হৃৎকেন্দ্রে অবস্থিত আলষ্টার হ্রদ প্রমোদভ্রমণের উৎকৃষ্ট স্থান হলেও ভূপৃষ্ঠ পরিবহনের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এই হ্রদটি উত্তর-দক্ষিণে দুই মাইল লম্বা এবং আধ মাইল পর্যন্ত চওড়া। একেবারে দক্ষিণপ্রান্তে এটি পারাপারের জন্য একটিমাত্র সেতু বিদ্যমান।

পাতাল রেলের নাম হল U-Bahn। এটি প্রধানতঃ আলষ্টার হ্রদের চারদিকে একটি বৃত্তাকার লাইন নিয়ে গঠিত। এছাড়া উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত একটি U-আকৃতির লাইনও আছে; এটি বৃত্তাকার লাইনটিকে চার জায়গায় ছেদ করেছে এবং উত্তর-পূর্ব কোণে এর সঙ্গে মিশেও গেছে। সমগ্র পাতাল রেলটির দৈর্ঘ্য হল ৭৪½ কিমি বা ৪৬ মাইল। এর মধ্যে ২০ কিমি (১২ মাইল) 'কাট এ্যাণ্ড কভার' সুড়ঙ্গপথে—৭ কিমি (৪½ মাইল) পথ ছাড়া বাকী সবটাই ডবল লাইন। পূর্বদিকে আরো ১৪ কিমি (৯ মাইল) লাইনের কাজ অনেকটা এগিয়ে গেছে।

মোট ৬৬টি ষ্টেশন—বছরে ১৭ কোটিরও বেশী লোক যাতায়াত করে। মাথাপিছু যাত্রার (journey) গড় দৈর্ঘ্য ৬½ কিমি বা ৪ মাইল। সকাল ৪½ টা থেকে রাত ১টা পর্যন্ত প্রতিদিন (ছুটির দিন ছাড়া) ছয় বা আট-কামরার গাড়ী চলে। ঘণ্টায় গতিবেগ ২৭½ কিমি (১৭¼ মাইল)। ভিড়ের সময় প্রতি ২½ মিনিট অন্তর এবং অন্য সময় ৫ মিনিট অন্তর গাড়ী চলে। আংশিক পাতাল রেলে এবং আংশিক বাসে ভ্রমণের জন্য 'থ্রু' টিকেট পাওয়া যায়। উ-বান্ ও বাসের যাত্রার পারম্পর্যবিধানের জন্য এবং জনপ্রিয় করে তুলবার জন্য বিভিন্ন প্রয়াস করা হচ্ছে। বৃত্তাকার লাইনটি প্রাচীনতম—এটি তৈরী হয় ১৯০৬ থেকে ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। হাম্বুর্গের অধিকাংশ মাটিই হল নদীর পলিমাটি, কালোবালি-মিশ্রিত; জলের লেভেলও ভূপৃষ্ঠের বেশ কাছাকাছি। সুড়ঙ্গ তৈরীর সাধারণ পদ্ধতি যা' অনুসৃত হয়েছে তা' হল pile বসিয়ে পাশের দুই দেওয়াল প্রথমে তৈরি করা, তারপর পাম্প করে মাঝের জলের স্তর নামিয়ে দেওয়া এবং মাটি খুঁড়ে ফেলা। শেষে রি-ইন্‌ফোর্সড্ কংক্রীটের তৈরী box tunnel তৈরি করে ঐ গর্তে বসিয়ে বুজিয়ে দেওয়া হয়। সুড়ঙ্গের ছাদ ও দেওয়ালের ওয়াটারপ্রুফ ব্যবস্থা উত্তম। কোন কোন পুরনো সুড়ঙ্গপথের ছাদ অর্ধচন্দ্রাকৃতি; কিন্তু আধুনিক সুড়ঙ্গগুলি ঐরকম নয়—এদের প্রস্থ ৬¾ মি (২২ফু ২ ই) এবং উচ্চতা ৩½ মি (১১ ফু ৬ ই)। দুই লাইনের মাঝে ছাদের অবলম্বন (support) হিসাবে সব

স্তম্ভ (pillors) নির্মিত হয়েছে। মাত্র ২৭০ মি (৮৮৬ ফু) ছোট একটি সুরঙ্গপথের ব্যাসও কিন্তু ৬½ মি (২১ ফু ৪ই)।

সবশুদ্ধ ৬২৪ খানা গাড়ী আছে। এদের মধ্যে প্রাচীনতমগুলির বয়স ৩০ বছরের মত, তবে এদেরও আধুনিকীকরণ হয়েছে। কাঠের আসন, টাংষ্টেনের আলো এবং কাঠের বডি পাল্টে আধুনিক আসন, আলো এবং এলুমিনিয়ম বহিরঙ্গ সজ্জা রচিত হয়েছে। ঘণ্টায় সর্বোচ্চ গতিবেগ ৭০ কিমি (৪৪ মাইল) হলেও চালকের হাতের কাছে সারিসারি বা সমান্তরাল সুইচ্ বসান আছে যা' টিপে ঘণ্টায় ১০, ৩০, ৪৫ অথবা ৭০ কিমি করা যায়। শহরের কেন্দ্রস্থল ও বাণ্ডস্বেকের (Wandsbeck) মধ্যে নবীনতম লাইনে আট-কামরার D.T. 2 গাড়ী চলে। এদের প্রত্যেকটিতে ১,০০০ এর উপর যাত্রী চলে। ফলে এই লাইনের ঘণ্টায় বহনসামর্থ্য হল ২৪,০০০ জন যাত্রী। প্রত্যেক কামরায় ৮২টি করে বসবার আসন আছে এবং উভয়পার্শ্বে ৪ফুট চওড়া ৪টি করে দুই-পাল্লার দরজা আছে। (ক্রমশঃ)

"সকল ধর্ম বিশ্লেষণ করলেই দেখা যায়, প্রথমাবস্থায় লোকে ক্ষুদ্রতর সত্যকে আশ্রয় ক'রে থাকে, পরে তা থেকে বৃহত্তর সত্যে উপনীত হয় ; সুতরাং অসত্য ছেড়ে সত্য লাভ হ'ল, এটি বলা ঠিক নয়। সৃষ্টির অন্তরালে এক বস্তু বিরাজমান, কিন্তু লোকের মন নিতান্ত ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের। 'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি'—সত্য বস্তু একটি, জ্ঞানিগণ তাকে নানারূপে বর্ণনা ক'রে থাকেন। আমার বলবার উদ্দেশ্য এই যে, লোকে সঙ্কীর্ণতর সত্য থেকে ব্যাপকতর সত্যে অগ্রসর হয়ে থাকে ; সুতরাং অপরিণত বা নিম্নতর ধর্মসমূহও মিথ্যা নয়, সত্য ; তবে তাদের মধ্যে সত্যের ধারণা বা অনুভূতি অপেক্ষাকৃত অস্পষ্ট বা অপকৃষ্ট—এই মাত্র। লোকের জ্ঞানবিকাশ ধীরে ধীরে হয়ে থাকে।"

* * *

"যেমন সঙ্গীতে একটা ক'রে প্রধান সুর থাকে, সেইরূপ প্রত্যেক জাতেরই এক একটা মুখ্য ভাব থাকে, অন্য অন্য ভাবগুলি তার অনুগত। ভারতের মুখ্য ভাব হচ্ছে ধর্ম। সমাজ-সংস্কার এবং অন্য সবই গৌণ। লোকে বলে হৃদয় উন্মুক্ত হ'লে চিন্তার প্রবাহ আসে। ভারতের হৃদয়ও এক সময়ে উন্মুক্ত হবে, তখন ধর্মতরঙ্গ খেলতে থাকবে! ভারত ভারতই।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

আমার এ বনহংস-মন

শ্রীকরুণাময় বসু

আমার এ বনহংস-মন নিত্যকাল নিরুদ্দেশে
কোথা যায় ভেসে,
অনেক অরণ্য পথ, অনেক সমুদ্র দ্বীপ পারে
আলো অন্ধকারে।
ছায়া রৌদ্র ঝলমল মায়াময় বসন্ত আকাশে
বেড়ায় বাতাসে,—
সে কি পাঠায়েছে চিরকাল সৌন্দর্যের স্বপ্ন-দূতী,
চোখে তার দ্যুতি:
সে কি কৃষ্ণপক্ষ রাতে আমারে দেখাবে সন্ধ্যাতারা—
অলক্ষ্য ইসারা।
সে কি দোললাগা অরণ্যের ডালে মর্মরিত গানে
কতো কথা আনে;
মনে হয় চম্পাবনে পুষ্পগন্ধ রাতে আমি একা,
পাই যদি দেখা
মনের মানুষে মোর, খুঁজে পাব স্মৃতির কিঙ্কিণী,
হারানো কাহিনী
হঠাৎ উঠিবে বেজে, মনে হয় বহু জন্ম আগে
বিশীর্ণ পরাগে
বায়ুতে ছিলাম ভেসে আলো ছায়া নীহারিকা কোলে:
বিন্দু হয়ে দোলে
প্রাণকণা জীব-আত্মা মোর; লক্ষ কোটি বর্ষ আগে
তীব্র অনুরাগে
আমি ছিনু মায়াময়, তার পর বহুকাল পরে
মাটির উপরে
মাতৃক্রোড়ে জন্ম মোর, তবু আজো ভুলিতে পারিনি
শূন্য বিহারিণী
মায়াহীন মুক্ত সত্তা টানে মোরে আদিম প্রকৃতি,
এই তার রীতি।

টানে মোরে চিরকাল গ্রহে গ্রহে নক্ষত্র-আকাশে,
প্রতিটি নিঃশ্বাসে,
প্রতিটি ক্রন্দনে মোর, মর্মে মর্মে সমুদ্র-কল্লোল
দিয়ে গেল দোল।
ছায়ামৌন সুগম্ভীর বনস্পতি-অরণ্যের ডাক
শুনেছি নির্বাক।
আমার স্মৃতিতে আছে অস্পষ্ট অক্ষর শিলালিপি,
অসংখ্য পৃথিবী,
রোমাঞ্চিত অতীতের লিপিহীন কতো ইতিহাস,
কতো না নিঃশ্বাস,
কতো অশ্রুজলে, কতো পুষ্পগন্ধভরা দিনগুলি,
চম্পক-অঙ্গুলি
বাজায়েছে বীণাতন্ত্রী কতোকাল আগে, সেই সুর
আজো নহে দূর।
মনে হয় পূর্ব তারা আলোকিত হাজার বছরে
আসি মাতৃক্রোড়ে
কতো বার; মিশরের, গ্রীস আর রোমক সভ্যতা
সেদিনের কথা।
আমি আছি তাই যেন চিরকাল বিশ্ব চরাচর
ব্যাকুল অন্তর
আমারে বেড়ায় খুঁজে, আমি মিথ্যা ক্ষুদ্র তুচ্ছ নহি,
এ বিশ্ব বিরহী
আমারে বেসেছে ভালো, অতন্দ্র আকাশে অর্ধরাতে
আলোছায়া সাথে
ডাকে মোরে, হাসিমুখে বলে যায়, জীবন মরণ
দুটি ভাই বোন।
তবু ভাবি বনহংস-মন উড়ে যাবে কতো কাল,
সমুদ্র উত্তাল:
কোথা শেষ, কোথা নীড়, আসা যাওয়া আর কতো বার
পথিক-আত্মার।

যে তীর্থ আজও আছে পঞ্চনদের দেশে

[পূর্বানুবৃত্তি]

শ্রীনির্মলচন্দ্র ঘোষ

চিন্তাপূর্ণী

সংসারে সারভূতাং ত্রিভুবনজননীম্ ॥

ছিন্নমস্তাং প্রশস্তামিষ্টামভীষ্টদাত্রীম্ ॥

কলিকলুষহরাং চেতসা চিন্তয়ামি ॥

[ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর প্রভৃতি আত্মজ শ্রেষ্ঠ যোগিবৃন্দ প্রত্যহ এই ছিন্নমস্তা দেবীর সুন্দর চরণ-কমল মস্তকে ধারণপূর্বক নিয়ত তাঁহার অচিন্তনীয় রূপ চিন্তা করিয়া থাকেন। তিনি সংসারের সারভূতা, ত্রিলোকের জননী, সকলের প্রশংসিতা ও বাঞ্ছিতা দেবতা। তিনি ভক্তকে তাঁহার অভীষ্ট দান করেন, কলিকলুষ হরণ করেন। আমি ছিন্নমস্তা দেবীকে হৃদয়ে চিন্তা করি]

হোশিয়ারপুর শহরের প্রায় পঞ্চাশ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত একটি গিরিমালার উপরে চিন্তাপূর্ণী তীর্থ। হোশিয়ারপুর কিংবা পাঠানকোট হ'তে মোটরে বা বাসে চিন্তাপূর্ণী যাওয়া যায়।

চিন্তাপূর্ণী তীর্থ অতি প্রাচীন। পাহাড়ের উপরে চিন্তাপূর্ণী দেবীর মন্দির। মন্দির যদিও ছোট, কিন্তু বিখ্যাত। দেবী ছিন্নমস্তা। ভগবতী যখন দশমহাবিদ্যারূপে প্রকট হয়েছিলেন তখন তাঁর একটি রূপ হয় ছিন্নমস্তা। দেবী নিজহস্তে খড়্গাঘাতে নিজের মস্তক ছিন্ন ক'রে নিজেই নিজের রক্ত পান করছেন। ভক্তের আশা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেন ব'লে এই ছিন্নমস্তাদেবীর নাম চিন্তাপূর্ণী। আর দেবীর নামে তীর্থের নাম। মন্দিরে যেতে হলে সিঁড়ি বেয়ে পাহাড়ের উপরে উঠতে হয়, সিঁড়ির ১৬০টি ধাপ।

জলন্ধর

জালন্ধরমিতি স্থানমন্ধকারে ত্বয়া শ্রুতম্।

লেভে গাণপত্যং তত্র তপস্যাভির্জলন্ধরঃ ॥*

[তুমি শুনিয়াছ অন্ধকারের মধ্যে জালন্ধর নামক একটি স্থান আছে। সেখানে জলন্ধর তপস্যা করিয়া গাণপত্য-অবস্থা লাভ করিয়াছিলেন।]

জলন্ধর পাঞ্জাবের একটি প্রসিদ্ধ শহর ও প্রাচীন তীর্থ। রেলপথে অম্বালা হ'তে জলন্ধর একশত তেষট্টি কিলোমিটার।

জলন্ধর দেবীর একান্ন পীঠের একটি পীঠস্থান। এই তীর্থে দেবীর স্তন পড়েছিল। স্থানীয় বিশ্বমুখী দেবীর মন্দিরে পীঠস্থান। তন্ত্রচূড়ামণির মতে এই পীঠস্থানে দেবীর নাম ত্রিপুরমালিনী ও ভৈরবের (শিব) নাম ভীষণ।

জলন্ধরে বিশ্বমুখীর মন্দির ব্যতীত কালভৈরব, কৃষ্ণ ও হনুমানের মন্দিরও আছে।

পুরাণে আছে, অতি প্রাচীনকালে এই অঞ্চলে জলন্ধর নামে এক ভীষণ দানবের বাস ছিল। কিন্তু সে ভক্ত থাকায় তার গাণপত্য-অবস্থা লাভ হয়। স্থানের নামও তার নামে জলন্ধর হয়।

জলন্ধর বৌদ্ধগণেরও একটি তীর্থ। এখানে কুবের মঠ নামে একটি বৌদ্ধমঠ আছে। মহারাজ কনিষ্ক (১২০-১৪৪ খৃষ্টাব্দ) জলন্ধরে চতুর্থ বৌদ্ধ ধর্মমহাসভা আহ্বান করেছিলেন।

কর্তারপুর

এক ওঁ সৎ নাম কর্তা পুরুষ নির্ভয় নির্বৈর।

অকাল মূরতি অযোনি স্বৈভং গুরু প্রসাদি জপ ॥

---

* স্কন্দ মহাপুরাণ, মহেশ্বর খণ্ড, অরুণাচল মাহাত্ম্য, উত্তরার্ধ, দ্বিতীয় অধ্যায়, ৬৩ শ্লোক

আদি সচু যুগাদি সচু।
হৈ ভি সচু নানক হোসি ভি সচু ॥*

[তিনি এক, ওঁকারই তাঁহার সত্য নাম। তিনি কর্তা, পুরুষ; তিনি নির্ভয়, তাঁহার কোন শত্রু নাই। তিনি নিরাকার, কালাতীত সত্তাই তাঁহার মূর্তি। তিনি অযোনিসম্ভব, স্বয়ম্ভু। গুরুর কৃপায় তাঁহার নাম জপ করা যায়। অনাদি কাল হইতেই তিনি আছেন। যুগে যুগে তাঁহার সত্যতা প্রকাশ পায় হে নানক! তিনি বর্তমানে আছেন, ভবিষ্যতেও থাকিবেন।]

কর্তারপুর জলন্ধর শহর হ'তে রেলপথে মাত্র ১৫ কিলোমিটার দূরে। কর্তারপুরের উপর দিয়ে বিখ্যাত রাজপথ (National Highway) গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড (Grand Trunk Road) চলে গেছে।

পঞ্চম গুরু অর্জুনদেব ১৫৯৮ খৃষ্টাব্দে কর্তারপুর শহর স্থাপন করেন।

কর্তারপুরে শিখদের একটি বিখ্যাত মন্দির আছে; তার মধ্যে একটি ঘরে গুরু অর্জুনদেবের সঙ্কলিত আদি গ্রন্থসাহেব রক্ষিত। গুরু হর-গোবিন্দের তরবারি 'তেঘ সাহেব' এবং গুরু নানকের টুপি 'সেলি'ও এই গুরুদ্বারায় রক্ষিত। কর্তারপুরে গুরু অর্জুনদেবের খনিত একটি কূপও আছে।

দসুয়া

জলন্ধর হ'তে পাঠানকোট যাওয়ার রেলপথে দসুয়া একটি ছোট স্টেশন। দসুয়া জলন্ধরের সাতান্ন কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত।

দসুয়াতে পাণ্ডু তলাও নামে একটি পুণ্যতোয়া দীঘি আছে। কিংবদন্তী—পাণ্ডবেরা তাঁদের বনবাসের সময় এখানে এসেছিলেন এবং এক রাত্রের মধ্যে এই পুকুর খনন করেন। পুকুরপারে কয়েকটি প্রাচীন মন্দির আছে।

বৈজনাথ

বেদবেদ্য কৃপাধার জগন্মূর্তে শুভপ্রদ।
অনাদিবৈদ্য সর্বজ্ঞ বৈদ্যনাথ নমোঽস্তু তে ॥*

[হে বৈদ্যনাথ! আপনি বেদবেদ্য, কৃপালু, এই বিশ্বজগৎ আপনার মূর্তি, আপনি মঙ্গলময়। আপনি অনাদি কাল হইতেই সকল অসুখ দূর করিতেছেন। আপনি সর্বজ্ঞ। আপনাকে নমস্কার।]

কাঙ্গরা হ'তে যোগীন্দ্রনগরের পথে বৈজনাথ একটি প্রসিদ্ধ তীর্থ। যোগীন্দ্রনগর রেল স্টেশন হ'তে বৈজনাথ মন্দির রেল স্টেশন মাত্র একত্রিশ কিলোমিটার। পাঠানকোট রেল স্টেশন হ'তে বৈজনাথ মন্দির রেল স্টেশন দুই শত পনর কিলো-মিটার। আর কাঙ্গরা হ'তে রেলপথে বৈজনাথ তেয়াত্তর কিলোমিটার। তীর্থের আসল নাম ছিল বৈদ্যনাথ, উচ্চারণের দোষে বৈজনাথ হয়েছে।

বৈজনাথে বৈদ্যনাথ শিবের মন্দির অতি প্রাচীন ও বিখ্যাত। বৈদ্যনাথজীর মন্দির ভিন্ন এখানে কেদারনাথের মন্দির ও ক্ষীরগঙ্গা নামে একটি পুণ্যতোয়া ঝরণা আছে।

বৈদ্যনাথের প্রাচীন নাম ছিল ক্ষীরগ্রাম। বৈদ্যনাথের আর এক নাম আদি-বৈদ্যনাথ।

কাঙ্গরা

পাঠানকোট—যোগীন্দ্রনগর রেলপথে কাঙ্গরা একটি প্রসিদ্ধ শহর। পাঠানকোট হ'তে কাঙ্গরার দূরত্ব একশত পঁচাশি কিলোমিটার। সড়ক-পথেও যাওয়া যায়।

---

* জপজী

* কূর্মপুরাণ, উপরিভাগ, ৩৬ অধ্যায়, ৯৯ শ্লোক

কাঙ্গরা অতি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ তীর্থ। এখানে ইন্দ্রেশ্বর শিব ও বজ্রেশ্বরী দেবীর মন্দির সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। কথিত আছে, পুরাকালে মহাভারতে বর্ণিত ত্রিগর্ত রাজ্যের রাজধানী ছিল এই কাঙ্গরা।

প্রাচীনকাল হতেই বজ্রেশ্বরীদেবীর অনেক সোনা দানা হীরা জহরত ছিল। ১০০৯ খৃষ্টাব্দে গজনীর মাহমুদ বজ্রেশ্বরীদেবীর মন্দির লুণ্ঠন করে। ১৩৬০ খৃষ্টাব্দে আবার ফিরোজ খাঁ তুঘলোক দেবীর মন্দির লুণ্ঠন করে। লুণ্ঠনকারিগণ মন্দির হ'তে মণে মণে সোনা রূপা হীরা মণি মুক্তা ও অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্য লয়ে যায়। আকবরের সমসাময়িক মহম্মদ কাসিম এই সব লুণ্ঠন-সামগ্রীর একটি বিবরণ লিখে গেছেন।

কাঙ্গরার প্রায় ষোল কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে, বনগঙ্গা নদীর তীরে, হরিপুর গ্রামে একটি প্রাচীন শিবমন্দির আছে। শিবের নাম অম্বিকেশ্বর।

কাঙ্গরার প্রায় আটত্রিশ কিলোমিটার পশ্চিমে, ফতেহপুরে একটি প্রাচীন বিষ্ণুমন্দির আছে। মন্দিরের দেয়ালে শ্রীকৃষ্ণের জীবনের অনেক ঘটনা অঙ্কিত।

নমো বিজ্ঞানরূপায় পরমানন্দরূপিণে।
কৃষ্ণায় গোপীনাথায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥

[যিনি বিজ্ঞানস্বরূপ, পরমানন্দময়, গোপীদের হৃদয়নাথ এবং পৃথিবীর পালক আমি সেই কৃষ্ণকে বারংবার প্রণাম করি।]

জ্বালামুখী

কাঙ্গরা হ'তে আঠার কিলোমিটার দূরে, যোগীন্দ্রনগর-পাঠানকোট রেলপথে জ্বালামুখী রোড রেল স্টেশন। জ্বালামুখী তীর্থ জ্বালামুখী রোড রেল স্টেশন হ'তে কুড়ি কিলোমিটার দূরে। মোটর গাড়ী কিংবা বাসে যেতে হয়।

জ্বালামুখী একান্ন পীঠস্থানের মধ্যে একটি প্রসিদ্ধ পীঠস্থান। নারায়ণ যখন সতীর মৃতদেহ সুদর্শন চক্র দিয়ে খণ্ড খণ্ড ক'রে কেটে ফেলেছিলেন তখন দেবীর জিহ্বা এই জ্বালামুখীতে পড়ে। এই তীর্থে দেবীর নাম অম্বিকা। আর ভৈরবের নাম উন্মত্ত।

জ্বালামুখ্যাং মহাজিহ্বা দেব উন্মত্তভৈরবঃ।
অম্বিকা সিদ্ধিদা নাম্নী স্তনো জলন্ধরে মম॥*

জ্বালামুখীমন্দিরে দেবীর কোন মূর্তি নাই। মন্দিরের গাত্রে যে ফাটল আছে তা দিয়ে অগ্নির লেলিহান জিহ্বা বের হয়, তারই একটিতে দেবীর পূজা হয়। দেবীর মন্দিরের একটু উপরে শিবের মন্দির, তার নিকটেই মহাযোগী গোরক্ষনাথের একটি মন্দির আছে।

জ্বালামুখীতে কয়েকটি উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। নবরাত্রিতে পীঠস্থানে বড় উৎসব ও মেলা হয়।

ভাক্‌সু

ধর্মশালা শহর হ'তে ভাক্‌সু মাত্র এগার কিলোমিটার দূরে। ধর্মশালা হিমালয়ে ধৌলাধর পাহাড়ের উপরে একটি সুন্দর শহর, উচ্চতা প্রায় ৪,০০০ ফুট। কাঙ্গরা হ'তে ধর্মশালা প্রায় পঁচিশ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে এবং পাঠানকোট হ'তে প্রায় নব্বই কিলোমিটার দূরে। উভয় স্থান হতেই মোটরযোগে কিংবা বাসে যাওয়া যায়।

ভাক্‌সুতে ভাক্‌সুনাথ শিবের মন্দির প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ। মন্দিরের কাছেই একটি ফোয়ারা ও জলপ্রপাত আছে। প্রতিবৎসর শিবরাত্রির সময়ে ভাক্‌সুতে মেলা হয়।

ধর্মশালা হ'তে পাঁচ কিলোমিটার দূরে খনিয়র গ্রামেও একটি প্রাচীন শিবমন্দির আছে। ঠাকুরের নাম কঞ্জর মহাদেব।

যে বৈ প্রদোষসময়ে পরমেশ্বরস্য
কুর্বন্ত্যনন্যমনসোঽঙ্ঘ্রিসরোজপূজাম্।
নিত্যং প্রবৃদ্ধধনধান্যকলত্রপুত্র-
সৌভাগ্যসম্পদধিকাস্ত ইহৈব লোকে ॥[1]

[যাঁহারা প্রত্যহ সন্ধ্যায় অনন্যমনে পরমেশ্বর শিবের পাদপদ্ম পূজা করেন, তাঁহাদের ইহলোকেই প্রচুর ধন ধান্য কলত্র পুত্র সৌভাগ্য সম্পদ্ বর্ধিত হয়।]

নগ্রোটা

ওঁ জয় ত্বং দেবি চামুণ্ডে জয় ভূতাপহারিণি।
জয় সর্বগতে দেবি কালরাত্রি নমোঽস্তু তে ॥[2]

[হে চামুণ্ডে, হে দেবি, আপনার জয়। হে জগতের দুঃখহারিণি, আপনার জয়। হে সর্বব্যাপিনি, আপনার জয়। হে কালরাত্রি, আপনাকে প্রণাম করি।]

পাঠানকোট—যোগীন্দ্রনগর রেলপথে নগ্রোটা একটি রেল স্টেশন। কাঙ্গরা স্টেশন হতে যোগীন্দ্রনগরের পথে নগ্রোটা প্রায় একুশ কিলোমিটার দূরে।

নগ্রোটা রেল স্টেশনের প্রায় ছয় কিলোমিটার দূরে, পাহাড়ের উপরে চামুণ্ডা দেবীর প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ মন্দির। পাহাড়ের উল্টা দিকে বনগঙ্গা নদীর তীরে একটি পুরাতন শিবমন্দিরও আছে।

মস্‌রুর

নমোঽস্তু রামায় সলক্ষ্মণায়
দেব্যৈ চ তস্যৈ জনকাত্মজায়ৈ।
নমোঽস্তু রুদ্রেন্দ্রযমানলেভ্যো
নমোঽস্তু চন্দ্রার্কমরুদ্গণেভ্যঃ ॥

[রামের সহিত লক্ষ্মণকে ও রামের পত্নী জনকদুহিতা সীতাকে প্রণাম করি। রুদ্র, ইন্দ্র, যম, অনল ও অন্যান্য দেবতাকে প্রণাম করি। চন্দ্র, সূর্য ও উনপঞ্চাশ বায়ুকে প্রণাম করি।]

মস্‌রুর গ্রাম হরিপুর হ'তে প্রায় পনর কিলোমিটার দূরে, আর নগরকোট (কাঙ্গরা) হ'তে প্রায় ত্রিশ কিলোমিটার দূরে একটি গিরিমালার চূড়ায় অবস্থিত। স্থানটি সমতলভূমি হ'তে প্রায় ২,৫০০ ফুট উচ্চে।

মস্‌রুরে কয়েকটি গুহামন্দির আছে। তাদের পাথর কেটে তৈরি করা হয়েছিল। মুখ্য মন্দিরটির নাম ঠাকুরদ্বারা। এখানে শ্রীরাম সীতা ও লক্ষ্মণজীর বিগ্রহ পূজিত হন।

---

১ শিবপ্রদোষস্তোত্রাষ্টকম্, তৃতীয় শ্লোক—স্তবকুসুমাঞ্জলি

২ শ্রীশ্রীচণ্ডী, অর্গলাস্তোত্র

মানব ও ঈশ্বরানুভূতি

শ্রীশঙ্কর রুদ্র

মানুষের কল্পনা বহু কিছুকে অতিক্রম করে বলেই অপরিসীমের মধ্যে তার অবাধ বিস্তার। মানুষের কল্পনা বিজ্ঞান-দর্শন-সাহিত্য-শিল্পকলা—কোথায় না বিস্তৃতির, বিচরণের সুযোগ নিয়েছে। আর সেই সুযোগে মানুষও ক্রমেই মননশীল চিন্তাশীল হয়ে উঠেছে। শুধু কালের বিবর্তনের ভেতর দিয়েই নয়—বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আপন বিকাশের ভেতর দিয়েও মানুষ ধীরে ধীরে প্রাজ্ঞ বিজ্ঞ হতে পেরেছে। এতে মানুষ নিজেকেও যেমন জানতে প্রয়াস পায়—তেমনই নিজের পরিপার্শ্বকে জানবার চেষ্টা করে। এই জানার আগ্রহের সঙ্গে কল্পনার প্রবণতা যোগ দেয়। প্রবণতা বা প্রাবল্য না থাকলে শক্তির প্রকাশ ঘটে না। সেই শক্তি ধীশক্তি বা চিন্তাশক্তিরও কারণ। মানুষের মধ্যে এই প্রবণতা আছে বলেই মানুষ এমন ভাবপ্রবণ বুদ্ধিপ্রবণ চিন্তাসমৃদ্ধ। আর সব জীবের মধ্যে যদিও অল্পবিস্তর কায়িক শক্তি আছে, কিন্তু কল্পনাশক্তি কিছুমাত্র নেই। তাই জীব চিন্তার দৈন্যে মানুষেরও অনেক নীচে পড়ে। যদি বা জীবের মধ্যে চিন্তা কিছু থাকে, তাও নিজেকে ঘিরে নিজের চিন্তা। মানুষও নিজের চিন্তা থেকে মুক্ত নয়। কিন্তু মানুষের কাছে নিজের চিন্তাই সব নয়। নিজের চিন্তার বাইরেও তার চিন্তাধারা প্রবাহিত। সেই প্রবহমান চিন্তা থেকেই মানুষের কাছে জগচ্চিন্তা বিশ্বচিন্তা দেখা দেয়। এই জগচ্চিন্তা থেকেই মানুষ জড় ও জীব-রহস্যে এবং বিশ্বচিন্তা থেকে অনন্ত-রহস্যে অনুসন্ধিৎসু হয়। রহস্য সমাধানেই চিন্তার তাৎপর্য। রহস্য না থাকলে চিন্তার প্রসারতা কী নিয়ে! শিশুকাল থেকেই মানুষ এই রহস্যে লিপ্ত হয়। রহস্য-উদ্ঘাটনে মানুষ ভেতরে-বাইরে যত উৎসুক উদ্‌গ্রীব হয়, ততই তার মেধারও উৎকর্ষ ঘটতে থাকে। এ যেন শত সহস্র অন্ধকার রহস্য-জালে যে জীবন বন্দী বিজড়িত, পদে পদে গ্রন্থি-চ্ছেদেই তার আলোকিত মুক্তির একমাত্র উপায়। ধৈর্যে-স্থৈর্যে কেবল মেধাই সে মুক্তির অস্ত্র। আর মেধা ছাড়া অজ্ঞতার এ গ্রন্থিবন্ধন ঘুচোবে কে? অজ্ঞতাই জীবের জৈব দুর্দশার কারণ; অজ্ঞতা দূর হলে জীবন অনন্তের শুধু স্বাদই পায় না—অনন্তের সঙ্গে সম্পৃক্তও হয়।

অনন্তের মধ্যে যে ব্যাপ্তি, যে বিরাটত্ব লুকিয়ে রয়েছে, মানুষের কাছে তা শুধু বিস্ময়ই নয়—বিষয়বস্তুও বটে। বিষয়বস্তু এই কারণে যে, তাকে জীবনের থেকে পৃথক করে ভাবা যায় না। জীবনের সঙ্গে তার সম্বন্ধ অঙ্গাঙ্গি-ভাবে ওতপ্রোত। এই যে মহাবিশ্ব তার বিপুল বিভব নিয়ে অসীম হয়ে রয়েছে, সে শুধু বিরাজই করে না—সীমার মধ্যে তার মহিমা সম্পদ বিতরণও করে। সে আলো দেয়—অন্ন দেয়—জল দেয়—বায়ু দেয়। এই অসীমের কারুণ্যেই সীমার মধ্যে—ভূমার মধ্যে জীবনের সঞ্চার, চেতনার অভ্যুদয়। মানুষ এই জীবনধারণের মধ্য দিয়ে—চেতনার মধ্য দিয়েই অসীমের উপলব্ধি পায়। এই উপলব্ধি থেকেই মানুষ অসীমকে পরম বলে মর্যাদা দিয়ে থাকে। তার কাছে সীমার বাইরে—সাধ্যের বাইরে—প্রত্যাশার বাইরে বস্তুমাত্রই পরম। আর এই পরম তার দৃষ্টিতে—তার ধ্যানে প্রিয় এবং আরাধ্য হয়ে ওঠে।

আদিকালে মানুষ সভ্য ছিল না—সংস্কৃতিমান

ছিল না—এমন কি শক্তিমানও নয়। তার চারপাশে তখন প্রকৃতির ভয়াল করাল রূপ সদা জাগ্রত ছিল। তার মাঝে মানুষ নিজেকে বড় অসহায় বোধ করতো। এই বোধ থেকেই মানুষের বোধি বা চেতনার উন্মেষ। তখন প্রকৃতির থেকেই সে শক্তি এবং সাহস আহরণে প্রবৃত্ত হলো। চেতনায় সে বুঝতে শিখলো, যে অগ্নি দাবানল, সেই আবার মানুষকে শুধু উষ্ণতাই দেয় না—দেয় আরো উপকার; যে জল বন্যা-প্লাবন, সেও আবার শুধু তৃষ্ণাই ঘুচোয় না, ঘুচোয় আরো দৈন্য। এই চেতনা মানুষকে যেমন আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ করলো—অপরদিকে তেমনি অনুপ্রেরিত করলো প্রাকৃতিক শক্তির প্রতি বিশ্বাস। সে তখন বুঝতে পারলো দুর্যোগের অন্তরালেও রয়েছে প্রকৃতির প্রসন্নতা—অকৃপণ বদান্যতা। মানুষ তাই প্রকৃতির প্রতি শ্রদ্ধাবনত হলো। প্রকৃতির সেই প্রসন্নতা—সে বদান্যতা থেকে মানুষ অপর্যাপ্ত সৌভাগ্য সঞ্চয় করতে লাগলো। এই সৌভাগ্য থেকেই মানুষ সভ্যতা-সংস্কৃতিতেও ক্রমে উন্নত হয়ে উঠতে লাগলো। মানুষ যদি সেদিন প্রকৃতির ক্ষমতাকে অবজ্ঞা করতো—যদি তার কল্যাণধর্মকে অস্বীকার করতো, আজ তাহলে মানুষেরই অস্তিত্ব থাকতো কিনা সন্দেহ। প্রকৃতি অথবা পরমের প্রতি আস্থাস্থাপনই তার অস্তিত্বকে সকল প্রতিকূলতা থেকে রক্ষা করেছে। যে-প্রকৃতি এত শক্তির উৎস—এমন সমৃদ্ধির আকর, সে প্রকৃতিও তো পরম নিশ্চয়। এক-মাত্র পরমের মধ্যেই তো নিহিত এত রকম কারণ। কারণ ছাড়া পরমও পরীক্ষিত সত্য নয়। পরীক্ষিত সত্য বলেই পরম বিরাট এবং মহৎ—সু-উদার এবং সুন্দর। মানুষের জীবনে এই সত্য পরীক্ষিত সত্য—মানুষের মনে এই পরীক্ষিত সত্যই পরম সত্য। আর এই সত্যানুভূতিতেই ঈশ্বরানুভূতি জাগে। ঈশ্বরানুভূতিতে মানুষ বিরাট এবং মহৎকে পূজা করে ঈশ্বরজ্ঞানে। এই অনুভূতিতে পরমই তার কাছে ঈশ্বরস্বরূপ, যা কিনা সর্বগুণসম্পন্ন এবং সর্বশ্রেষ্ঠও। পরম এই ঈশ্বর মানুষের অনুভূতিতে কখনো প্রতীক—কখনো বা প্রতিচ্ছবির মতো প্রতিভাত হয়ে উঠেছে। যেমন সূর্য কারোর মনে জ্যোতিস্বরূপ আরাধ্য—আবার কারোর কাছে জ্যোতির্ময়ের মতো পূজ্য। এই ভাবে পরম নানারূপে নানা বিশেষণে মানুষের কাছে প্রতীয়মান হয়েছে। মানুষ তাতেও বোধ হয় তুষ্ট নয়। আরো গভীর তত্ত্বানুসন্ধানে নিত্য লিপ্ত। হয়ত তত্ত্বজ্ঞ মানুষের কাছে ঈশ্বরীয় ভাবের শেষ নেই। কিন্তু সাধারণ মানুষ শুধু ঈশ্বরানু-ভূতিতেই তুষ্ট। ঈশ্বর তার কাছে সাকার হোক, নিরাকার হোক, ব্যক্ত হোক, অব্যক্ত হোক, ভেদ হোক—অভেদ হোক, ব্রহ্ম হোক, অব্রহ্ম হোক, কিছু আসে যায় না—ঈশ্বর আছেন এইটাই এক-মাত্র সত্য। তার কাছে কোনো প্রশ্নই নেই যে, ধূপ অগুরু বা চন্দন—মহীশূরী অথবা মালাবারী—তার কাছে ধূপের সৌরভটাই বড়, তার আমেজটাই ভালো। এই বিশ্বাসের সত্যটাই সাধারণ মানুষের অধ্যাত্ম অনুভূতির একমাত্র সম্বল—এই নিয়েই দুঃখকষ্টময় জীবনও অনায়াসে অতিবাহিত করে থাকে। আর ঈশ্বরানুভূতিকে মানুষ তার জীবনের পাথেয়ই করেনি—তাকে পথপ্রদর্শকও বলে মনে করে।

কিন্তু এই অনুভূতির উৎপত্তি কোথা থেকে? এ অনুভূতির উৎস মানব-হৃদয়। প্রাত্যহিক জীবনে মানুষ যা প্রত্যক্ষ করে, তা তার হৃদয়কে গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করে। প্রত্যূষে যে তিমিরনাশক হয়ে আলোর-ভুবন গড়ে তোলে, প্রদোষে সে-ই আবার অস্ত যায় তমিস্র সুপ্তিতলে, ঊষা-ভোরে যার ডাকে জগৎ জাগে—প্রহরে প্রহরে চঞ্চল হয়ে মাতে, গোধূলি-ধূসরে সে

নীরব হয়—যেন জগৎও তারই সাথে মৌন নিমেষহারা। নিত্য এই যে নিয়মের নিগড়, যাতে সকল সৃষ্টিই বিজড়িত—যাতে সকল ক্রিয়াই নিয়ন্ত্রিত, মানুষের অনুভূতি একেই প্রত্যক্ষ করে—একেই অনুভব করে। আর এরই প্রভাবে নিজেও বশীভূত হয়ে পড়ে। কারণ, মানুষ বোঝে যে, সেও এই নিয়মেরই অঙ্গ বটে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যে নিয়মের অঙ্গ, সাধ্য কী তার মতো সামান্য মানুষের এই নিয়মের বাইরে থাকার!

প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে প্রাণও যেমন আলোকিত কর্মধারায় ছড়িয়ে পড়ে, অনুভূতির মধ্যেও তেমনই প্রাণোচ্ছল বর্ণোজ্জ্বল প্রকাশ ঘটতে থাকে। আবার রাত্রিকালে প্রাণ যেমন অন্ধকারাচ্ছন্ন নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে, অনুভূতিও তেমন তমোঘন নিষ্প্রাণ হয়ে থাকে। দিন ও রাত্রির মতোই অনুভূতিও আলোকময় আবেগময় এবং অন্ধকারময় নির্বেগময় হয়। যখন সে অন্ধকারময় নির্বেগময় থাকে, তখন সে তন্দ্রাঘোরে নিশ্চেতন যেন—তখন তার কাছে নিয়মও পরিজ্ঞাত নয়। কিন্তু যখন সে আলোকময় তখন সে জাগরূক সচেতন যেন—তখন তার কাছে নিয়ম আর অপরিজ্ঞাত নয়—বরং এই নিয়মের ঊর্ধ্বও তার কাছে পরিদৃশ্যমান হয়ে ওঠে।

শৈশবে মানুষের অনুভূতিও অন্ধকারাচ্ছন্ন তখন সেই সুপ্তিঘোরের মধ্যে ঈশ্বরের কোনো সংজ্ঞা স্পষ্টতঃ অনুভূত হয় না। সে সময়ে তার কাছে কেবল তার মাতা পিতা এবং কিছু আপনজনই প্রিয়জন, ভক্তিভাজন হয়ে থাকে। কিন্তু যখনই তার অনুভূতির গণ্ডী বাড়তে থাকে, তখনই স্বপ্নের মতো আর কেউ দেখা দেয় শিশুহৃদয়ে, যে কিনা তার চেনা জানা প্রিয় পরিজনের চেয়েও পরমসুন্দর পরমরমণীয়। স্বপ্নের এই সুন্দর ধীরে ধীরে আপন মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা লাভ করতে থাকে। শিশু কৈশোরে পদার্পণ করার পর থেকে বুঝতে শেখে যে, চোখের-সামনের জগতের চেয়েও চোখের-আড়ালের জগৎও কম নয়—সামনে-দেখা জনের চেয়েও না-দেখা জন আরো প্রিয় হতে পারে। এই প্রত্যয় আসে তার অনুভূতিতে নানা গল্প-গাথা-কাহিনীর আদর্শ জীবনের মাধ্যমে। বাস্তবের অসুন্দরের মধ্যে স্বপ্নের সুন্দরই সৎ এবং মহৎ, আর তাই ভগবানের প্রতিভূ। ভগবানই জগতে যথার্থ নায়ক, যিনি শান্তি শৃঙ্খলা ন্যায়ের রক্ষাকর্তা—যিনি শক্তি-সামর্থ্যে শৌর্যে অদ্বিতীয় এবং যিনি মনুষ্যদেহধারী দেবতা। সে অনুভূতিতে ভগবান বিরাট না হলেও ক্ষুদ্র নন—অসীম না হলেও সামান্য নন।

কিন্তু তারুণ্যে এই অনুভূতি ক্রমেই আলোক-প্রাপ্ত হতে থাকে। তখন শুধু জাগরণই ঘটে না—কৌতূহলের সীমা পার হয়ে অবলোকনও চলে। তখন স্বপ্নের সুন্দর জাগতিক সত্য অথবা তত্ত্বে উপস্থাপিত হয়, তখন তরুণ মন ঈশ্বরকে শুধু উপলব্ধি করতেই চায় না—তাকে যুক্তি-বিচারের আতস-কাচের ভেতর দিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষাও করতে চায়। তখন সে শুধু গল্প-গাথা-কাহিনীর জীবনাদর্শেই খুশী থাকে না—কিংবা তৃপ্তি পায় না বিশ্বাস বা বোধের সীমা মেনে চলতে। তাই তার অনুভূতিও অসীম অনন্তের মধ্যে সত্য-শিব-সুন্দরের সন্ধান করে—তাই তার প্রত্যয়ের মধ্যেও প্রশ্ন থেকে যায়। সে অনুভূতিতে ভগবান কোনো বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করেন না—বা নির্দিষ্ট কোনো ভাব সঞ্চার করেন না। তিনি কখনো ব্যাপক—কখনো বদ্ধ—কখনো মায়া—কখনো বা ব্রহ্ম। ভগবান সেখানে আলো-ছায়ায় বিশ্বাসে অবিশ্বাসে দোদুল্যমান।

বার্ধক্যে অনুভূতির যেন গোধূলিকাল, তখন অনুভূতির এই তীব্রতা, এই চাঞ্চল্য স্থির শান্ত হয়। তখন জীবন-সায়াহ্নে সকল আপনজনের চেয়েও ঈশ্বরই একমাত্র একান্ত জন হয়ে ওঠেন,

যিনি ঘোর তিমিরের মধ্যে চন্দ্রমার মতো স্নিগ্ধ করুণাঘন। তখন চোখের সামনের জগৎ ধূসর হয়ে গিয়ে চোখের আড়ালের জগৎটাই স্পষ্ট হয়ে পড়ে—তখন না-দেখা জনই পরমভাজন হয়ে ওঠে। তখনই পরম সত্যের মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়, যেখানে ভগবান সত্য-শিবসুন্দর মূর্তিতে মূর্ত। তখন আর গল্প-গাথা- কাহিনী কিংবা যুক্তি তর্ক বিচার দ্বারা নয়—অনুভূতির স্বচ্ছতায়-সরলতায় ভগবান সব কিছুর ঊর্ধ্বে আনন্দময় কল্যাণময় চিন্ময় রূপে প্রতীয়মান হন।

মানব-জীবনে এই ঈশ্বরানুভূতির অবশ্যই প্রয়োজন আছে। আর সব অনুভূতি মানুষকে শুধু পার্থিব সুখই দিতে পারে, কিন্তু ঈশ্বরানুভূতি মানুষকে এমন এক অপার্থিব আনন্দ দেয়, যার কোনো তুলনা নেই। অন্য অনুভূতি মানুষকে স্পর্ধার স্পৃহার ধৃষ্টতার চূড়ান্তে তোলে, কিন্তু ঈশ্বরানুভূতি মানুষকে বিনত বিরক্ত বিনম্র রাখে। জাগতিক অনুভূতির তাড়নায় মানুষ যখন অস্থির অশান্ত হয়ে ওঠে, তখন একমাত্র ঈশ্বরানুভূতিই মানুষকে স্থির শান্ত সংযত করে। ঈশ্বরানুভূতিই মানুষকে সত্য শিব সুন্দরের ধারণা দেয়—সন্ধান দেয়। অনুভূতিতে প্রকৃতিকে জানা যায়, কিন্তু ঈশ্বরানুভূতিতে প্রকৃতিরও ঊর্ধ্বে পরম পুরুষকে জানা যায়, অনুভূতির সীমা আছে কিন্তু ঈশ্বরানুভূতির কোনো সীমারেখা নেই। ঈশ্বরানুভূতিতেই অসীমের মধ্যে সীমা—সীমার মধ্যে অসীম ধরা দেয়। ঈশ্বরানুভূতির থেকেই মানুষ অধ্যাত্মভাবসাধনায় লিপ্ত হতে পারে। ঈশ্বরানুভূতি থাকলে মানুষ দিব্যমানস লাভ করে, আশ্চর্য নৈতিক শক্তি লাভ করে যা মনুষ্যজীবনকে ধর্মে কর্মে জ্ঞানে প্রকৃষ্ট মানে উন্নীত করে।

অনুভূতির স্থূলতায় জীবের যে অবস্থা, অনুভূতির সূক্ষ্মতায় মানুষের সে অবস্থা থাকে না। এই সূক্ষ্ম অনুভূতির গুণেই ক্রমপর্যায়ে ঈশ্বরানুভূতি আসে, যার অবলম্বনে মানুষ আরো উচ্চ স্তরে পৌছুতে পারে। কেবল ঈশ্বরানুভূতিই মানুষকে এই স্তর বা মার্গের সন্ধান দেয়। এই ধরনের মার্গই হচ্ছে—কর্মমার্গ, জ্ঞানমার্গ, ভক্তিমার্গ, যা অনুসরণ করে মানুষের মহৎ উত্তরণ ঘটে। মহৎ উত্তরণই জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কাম্য। মহৎ উত্তরণেই জীব শিব হয়—সত্য হয়—সুন্দর হয়।

সাধারণ অনুভূতির ঘোর অন্ধকারে মানুষ শুধু আচ্ছন্নই নয়—অন্ধও নিশ্চয়, কিন্তু ঈশ্বরানুভূতির নির্মল আলোকে মানুষ জীবনের সোপান খুঁজে পায়, যে সোপান সৎ-চিৎ-আনন্দময়। মুক্তির এই পথ ছাড়া আর কোনো গতিও বুঝি নেই। মানুষের মনে এই ঈশ্বরানুভূতিও অপরিহার্য। কামনা-বাসনা-দুঃখ-যন্ত্রণা-বঞ্চনার নিদারুণ অহরহ নিষ্পেষণে অন্তরাত্মা যতই নিপীড়িত হতে থাকে, ততই ঈশ্বরানুভূতি সেখানে সান্ত্বনার বাণী শোনাতে থাকে। ভগবান যেখানে, মুক্তিও সেখানে - সেখানেই সৎ—সেখানেই আলোক—সেখানেই অমৃত, সেখানেই আনন্দলোক। অসত্য থেকে সেইখানেই সত্য—অন্ধকার থেকে সেইখানেই আলোক—মৃত্যু থেকে সেইখানেই মুক্তি।

'অসতো মা সদ্গময়
তমসো মা জ্যোতির্গময়
মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়।'

সমালোচনা

Philosophical Foundation of Bengal Vaisnavism (বঙ্গীয় বৈষ্ণবধর্মের দার্শনিক ভিত্তি): শ্রীসুধীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী, এম. এ. ডি. লিট, রীডার, দর্শনবিভাগ, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন। অ্যাকাডেমিক পাব্লিশার্স, ১১ পঞ্চানন ঘোষ লেন, কলিকাতা-৯; পৃষ্ঠা ৪৩৭ + ১২; মূল্য: ত্রিশ টাকা।

ধর্ম, দর্শন ও সাহিত্যের পরস্পর অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ। তবু কোনো কোনো ধর্মীয় দর্শন সম্বন্ধে একথাটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের মূলে কাব্যপ্রেরণা ও ধর্মীয় প্রেরণা দুই-ই সমানভাবে ক্রিয়াশীল। শ্রীমদ্ভাগবতের কৃষ্ণ-কাহিনী একদিকে জয়দেব, চণ্ডীদাস, মালাধর বসুর কাব্যে গীতিকবিতায় এবং অন্যদিকে শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী, শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রমুখ সাধকবৃন্দের সাধন-ধারায় বাঙালীহৃদয়ে যে প্রেমসিন্ধু মন্থন করে চলেছিল, সেই হৃদয়ধর্মেরই কনকগৌর প্রতিমূর্তি মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য। শ্রীচৈতন্যজীবন ও সাধনার দ্বারাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের প্রতিষ্ঠা। মূলতঃ বেদান্তের প্রতিপাদ্যকে অবলম্বন করেই ভারতের শ্রেষ্ঠ দার্শনিকদের মধ্যে বিচার বিতর্ক দেখা দিয়েছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন সেই বিচার বিতর্ককে কেবলমাত্র বুদ্ধিগ্রাহ্য স্তরে না রেখে অনুভববেদ্য জীবনদর্শনে পরিণত করে বুদ্ধি ও হৃদয়ের সামঞ্জস্যসাধন করতে চেয়েছিল।

সাম্প্রতিককালে ৺রাধাগোবিন্দ নাথ মহোদয়ের জীবনব্যাপী সাধনার ফলে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের সামগ্রিক পরিচয় বাঙালীপাঠকের কাছে পরিস্ফুট। অবশ্য বিভিন্ন দার্শনিক মতের নিকষে বিচার করে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা এখনও বাংলা সাহিত্যে অপেক্ষিত। সেদিক থেকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের দার্শনিক ভিত্তি সম্বন্ধে সুদীর্ঘ মনন গবেষণার আশ্চর্য সার্থক পরিণতি ডক্টর সুধীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তীর আলোচ্য গ্রন্থখানি ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত হলেও এ বিষয়ে কৌতূহলী পাঠকমাত্রেরই সশ্রদ্ধ প্রণিধানযোগ্য।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন যদি কেবল উপনিষদ্ বা বেদান্তকেই মূল প্রামাণ্য হিসাবে গ্রহণ করতো, তাহলে দার্শনিক আলোচনার ক্ষেত্রে বিতর্কের অবকাশ কম থাকতো। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত বা পরবর্তী অন্যান্য পুরাণকেও যখন দার্শনিক আলোচনায় প্রামাণ্যরূপে গ্রহণ করা হয়, তখনই দার্শনিক সিদ্ধান্তের যুক্তিযুক্ততা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে, পরমসত্যের প্রকাশ নানা দেশে নানা যুগে নানা ভাবে হয়ে থাকে। বাইবেল যদি খ্রীষ্টীয় দর্শনের ভিত্তি হতে পারে, তাহলে শ্রীমদ্ভাগবতের পক্ষে দার্শনিক সিদ্ধান্তের ভিত্তি হওয়া কিছুমাত্র আশ্চর্য নয়। তবে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের ক্ষেত্রে পৌরাণিক প্রামাণ্য যে এর দার্শনিক ভূমিকাকে কিছুটা নিষ্প্রভ করেছে, সে কথা স্বীকার্য।

সচ্চিদানন্দের আনন্দস্বরূপকে অবলম্বন করে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন যখন হ্লাদিনীর সার প্রেম-তত্ত্বকেই বিশ্বসত্যের কেন্দ্রস্বরূপ করে তুললো, তখন মানব-ইতিহাসে পরাবিদ্যার আর একটি বিপুল সম্ভাবনার দ্বার খুলে গেল। বাস্তবিক ভক্তির দর্শনকে প্রণালীবদ্ধ করে রূপগোস্বামী ও তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র জীবগোস্বামী যেভাবে সিদ্ধান্তস্থাপন করেছেন তা ভারতীয় মনীষার সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে বিভক্ত এই দার্শনিক

আলোচনার গ্রন্থে লেখক প্রধানতঃ গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তেরই অনুগামী। একদিক থেকে এভাবে আলোচনার দ্বারাই কোনো মতবাদের মূলভাবটি ধরতে সহায়তা হয়। কিন্তু বিভিন্ন চিন্তাধারার নিকষে যাচাই করে দার্শনিক মতবাদের অপূর্ণতা ও অসঙ্গতি সম্বন্ধে সচেতন করে দেওয়াও সমান কর্তব্য। দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, শুদ্ধাদ্বৈত, অদ্বৈত প্রভৃতি বিভিন্ন মতবাদের সঙ্গে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শনের পার্থক্য-বিচারে লেখকের সূক্ষ্ম বিচার-শীলতা বিশেষভাবে প্রশংসনীয়। কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই এ জাতীয় বিচার গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের সপক্ষেই প্রযুক্ত।

সামগ্রিক আলোচনার অতি উন্নত মানের কথা মনে রেখে দু'চারটি বিষয়ের প্রতি আমরা পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারি। সপ্তম পরিচ্ছেদে 'Krishna and His Incarnations' (কৃষ্ণ ও তাঁর অবতারগণ)-অধ্যায়ে লেখক প্রতি-পন্ন করতে চেয়েছেন যে, জীবগোস্বামী আসলে স্বকীয়া মতবাদেরই পোষক। পরবর্তীকালে কৃষ্ণ-দাস কবিরাজই পরকীয়া মতবাদের প্রাধান্য দেখিয়েছেন (পৃঃ ১৩৫-১৩৭)। এক্ষেত্রে স্মরণীয়, মহাপ্রভুর নিজ পার্ষদদের মধ্যেও এ-জাতীয় ভাবের প্রবক্তাহিসাবে নরহরি সরকারের কথা বলা যায়, যাঁর গৌরনাগরিয়াভাব নিয়ে সেকালের বৈষ্ণবদের মনেও সংশয় ছিল। বস্তুতঃ শ্রীমদ্ভাগবতেই এই পরকীয়া মতবাদের বীজ নিহিত এবং পরবর্তীকালে বিভিন্ন সাধকদের প্রয়োজন অনুযায়ী এই পরকীয়া-তত্ত্বের বিকাশ ঘটেছে। বাংলার বৈষ্ণবপদাবলী-সাহিত্যে এই পরকীয়াভাবই মূল আশ্রয়। তবে সর্বক্ষেত্রেই এ তত্ত্ব সাংকেতিক অর্থে গ্রহণীয়। তার বেশী কিছু নয়।

অবতারবাদ-প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ ও ডঃ রাধা-কৃষ্ণনের নাম উল্লেখিত। অথচ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কোনো উক্তিই স্থান পায়নি। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শনের ব্যাখ্যা ও অবতারতত্ত্ব—এ দুই প্রসঙ্গেই শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তিসংগ্রহ (বিশেষভাবে 'কথামৃত') অপরিহার্য।

দশম ও চতুর্দশ পরিচ্ছেদে 'Bengal Vaisnavism and Kierkegaard's Existentialism' (বাংলার বৈষ্ণবধর্ম ও কিয়ের্কেগার্ডের অস্তিত্ববাদ) এবং Christianity and Bengal Vaisnavism (খ্রীষ্টধর্ম ও বাংলার বৈষ্ণবধর্ম) তুলনামূলক ধর্মীয় দর্শনের আলোচনা হিসাবে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বস্তুতঃ এ-জাতীয় আলোচনায় লেখক পথিকৃতের কাজ করেছেন।

একাদশ পরিচ্ছেদটি গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের নীতিগত ভিত্তি সম্বন্ধে সারগ্রাহী আলোচনা। The Place of Ethics in Bengal Vaisnavism' নামে এই অধ্যায়ে লেখক সার্থকভাবে প্রতিপন্ন করেছেন যে, পরিপূর্ণ ভগবৎতন্ময়তার এ ধর্ম মূলতঃ উচ্চতম নীতিবাদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। শ্রীচৈতন্যের সর্বত্যাগী জীবনাদর্শও তার প্রমাণ। অপরপক্ষে আমাদের একথাও মনে হয় যে, পরকীয়াবাদের সঙ্গে নীতিজ্ঞানের দ্বন্দ্ব স্বাভাবিক। আর এই সূত্রেই বৈষ্ণবধর্মের পরবর্তী ইতিহাসে নানা অসঙ্গতির প্রবেশ। নিষ্কাম প্রেমের উচ্চতম সীমা গোপীপ্রেম। ভক্তি-সাধনার শুদ্ধতম পর্যায়ে না পৌছালে এ সাধনা সাধারণ জীবের অসাধ্য। অপরপক্ষে জাতি-বর্ণ-সম্প্রদায়-বিচারের ক্ষেত্রে যে উদারতার আদর্শ এ ধর্মে ছিল, তা সম্প্রদায়ের গণ্ডীতে নিবদ্ধ থেকে গেছে। সমগ্র সমাজে ব্যাপ্ত হয়ে ব্যাপক আন্দোলনে পরিণত হতে পারেনি।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের মূল সিদ্ধান্ত 'অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ' এবং ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে রসতত্ত্বের ক্ষেত্রে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের ভক্তিরসের প্রতিষ্ঠায় মৌলিকতা—এ দুটি আলোচনাই মনোজ্ঞ।

অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ-প্রসঙ্গে লেখকের মন্তব্য তাঁর নিজের ভাষায়—"His (জীবগোস্বামীর) doctrine of inexplicable difference in non-difference (অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ) is an improvement upon earlier forms of Vedanta teaching absolute non-dualism, qualified non-dualism, dualism, pure non-dualism, and dualistic non-dualism. It is at once a criticism of all that is illogical and anti-scriptural in each of them and a synthesis of all that is true in them. It is not an eclectic work based on elements collected from other schools of Vedantic thought, but an original system in which the best thoughts of such great thinkers as Sankara, Ramanuja, Madhva, Vallabha and Nimbarka, have found their reconciliation and fulfilment." (পৃঃ ৩৩৯)। বলা বাহুল্য, এ জাতীয় দাবীর ক্ষেত্রে যুক্তিপ্রমাণও লেখক প্রভূত পরিমাণে সংগ্রহ করেছেন। তবু গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন বেদান্তভিত্তিক বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদের মধ্যে সর্বক্ষেত্রেই সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য সাধন করতে পেরেছে—এ দাবী বোধ হয় একটু অতিকথনই থেকে যায়। প্রসঙ্গতঃ মনে হয়, দ্বৈত-বিশিষ্টাদ্বৈত-অদ্বৈতের অন্তর্নিহিত স্তরপরম্পরায় পরমসত্যে উপনীত হতে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের দার্শনিক চিন্তাধারার বিশেষভাবে আলোচনা হওয়া আজ একান্ত প্রয়োজন।

ভক্তিদর্শনের আলোচনায় যুক্তিনিষ্ঠ লেখকের অন্তরে যে তন্ময় নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়, এ গ্রন্থকে তা মাধুর্যরসে অভিষিক্ত করেছে। বাংলাসাহিত্যে এ-জাতীয় একটি গ্রন্থ রচনা করে লেখক আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হবেন—এ আশা স্বাভাবিক। এ গ্রন্থের অঙ্গসজ্জা ও মুদ্রণ-পারিপাট্য উন্নত রুচির পরিচায়ক।

—ডক্টর প্রণবরঞ্জন ঘোষ

The Vedas—What And Why ?— By K. S. Srinivasacharya, Published by : K. S. Srinivasachary, Flat B-1, 'Ayodhya,' 3/5 South Bank Road, Madras- 600·028, India. Pp. 84+4 ; Price Rs. 2.

অনাদি অনন্ত বেদে যে চিরন্তন সত্য উদ্‌ঘাটিত, তাহা সুপ্রাচীন ঋষিগণের অনুভূত। আলোচ্য ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি বৈদিক সাহিত্যের ইতিহাস আখ্যা না পাইলেও তত্ত্ব ও তথ্যের দিক হইতে অতি মূল্যবান নিঃসন্দেহ। প্রাচীন ও আধুনিক, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, বৈজ্ঞানিক ও আধ্যাত্মিক বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে সুচিন্তিত আলোচনা সুধী লেখক স্বল্পপরিসরেই করিয়াছেন। পাশ্চাত্যের যে-সব মনীষী বেদের উপর গবেষণা করিয়া তাঁহাদের চিন্তাধারা জগৎসমক্ষে তুলিয়া ধরিয়াছেন, ভারতের বর্তমান বিজ্ঞ ব্যক্তিগণের বেদানুশীলন, এবং বেদ সম্বন্ধে কতগুলি গবেষণা-গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, সব তথ্যই সুন্দরভাবে পরিবেশিত। স্থলবিশেষে উপযুক্তভাবে চতুর্বেদের প্রসিদ্ধ উদ্ধৃতিগুলির ইংরেজী অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে ; তবে এই সঙ্গে মূল সংস্কৃত থাকিলে গ্রন্থখানির অবয়ব কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পাইলেও সৌষ্ঠব আরও বাড়িত। পরবর্তী সংস্করণে এ বিষয়ে আমরা গ্রন্থকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

মানবজীবনের দিক্‌যন্ত্র জ্যোতিষ— শ্রীদাশরথি সোম। প্রকাশক : এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২। পৃষ্ঠা ১৮৩+ভূমিকাদি। মূল্য আট টাকা।

জ্যোতিষশাস্ত্র দুরূহ। ইহা বেদের অঙ্গ। প্রসিদ্ধ ছয়টি বেদাঙ্গের অন্যতম জ্যোতিষ। গ্রন্থকার 'নিবেদনে' লিখিয়াছেন: "আমি নিজে জ্যোতিষী নই। এই শাস্ত্র মনোযোগ দিয়ে অধ্যয়ন ও কিছু গবেষণা করেছি। এই শাস্ত্র সম্বন্ধে কিছু লেখা আমার পক্ষে বামন হয়ে চাঁদে হাত দেওয়ার সমান। যেটুকু শিক্ষালাভে সমর্থ হয়েছি তার ফলে বহু বন্ধু ও আত্মীয়স্বজনের জন্মপত্রিকা বিচার করে যেটুকু রহস্য-উদ্‌ঘাটনে সমর্থ হয়েছি তাতে বুঝেছি এই শাস্ত্র মিথ্যা নয়, সূক্ষ্মভাবে মনোযোগ দিয়ে অধ্যয়ন করলে অনেকটা ফলাফল নির্ণয় করা যায়।" গ্রন্থকার বিনয় প্রকাশ করিয়াছেন ঠিকই, কিন্তু তাঁহার গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া সকলেই জ্যোতিষশাস্ত্রে তাঁহার ব্যুৎপত্তির পরিচয় পাইবেন নিঃসন্দেহ। নূতন দৃষ্টিভঙ্গীতে সহজ সরল ভাষায় সকলের বোধগম্য করিয়া কঠিন বিষয়বস্তুকে উপস্থাপন করিবার কৃতিত্ব তিনি দেখাইয়াছেন। গ্রন্থে জাতক, গ্রহ, ক্ষেত্র, গণ, রাশি, লগ্ন, স্থিতি, যোগ, চক্র প্রভৃতি বিষয় সুষ্ঠুভাবে আলোচিত হইয়াছে। শেষাংশে প্রদত্ত কয়েকটি প্রসিদ্ধ জাতচক্র গ্রন্থখানির অলঙ্কারস্বরূপ। আমরা আশা করি এই গ্রন্থ বহুল প্রচারিত হইবে।

উদ্বোধন কার্যালয়ের নবপ্রকাশিত পুস্তক

গুরুতত্ত্ব ও গুরুগীতা—স্বামী রঘুবরানন্দ সংকলিত। উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৭০০-০০৩ হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৮৪; মূল্য এক টাকা।

'শ্রীশ্রীগুরুগীতা' নামে যে গ্রন্থখানি ইতঃপূর্বে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা নিঃশেষিত হওয়ায় বর্তমানে একটু পরিবর্ধিত আকারে উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের গুরুতত্ত্ব-বিষয়ক বাণী, শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীগুরু সম্বন্ধে অমৃতময়ী কথা এবং স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনায় গুরুতত্ত্ব বিষয়ে যে বাণী আছে তাহা সংক্ষিপ্তভাবে এই পুস্তকে একত্র সন্নিবেশিত। 'উদ্বোধন' ১৩০৯ পঞ্চম বর্ষ—৫ম সংখ্যায় স্বামী ব্রহ্মানন্দ-লিখিত 'গুরু' শীর্ষক প্রবন্ধটিও সংকলিত। শ্রীশ্রীগুরুগীতায় ১১৩টি অপূর্ব শ্লোক আছে; এগুলি কণ্ঠস্থ করিবার জিনিস। সমগ্র গুরুগীতার সুন্দর বঙ্গানুবাদ, দুরূহ শব্দের সরলীকরণ এবং উপযুক্ত স্থানে টীকা দেওয়া হইয়াছে। গ্রন্থের শেষের দিকে গুরু-স্তব, গুরু-কবচ ও গুরু-প্রণাম সন্নিবেশিত।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

সেবাকার্য

বাংলাদেশে সেবাকার্য: জুন, ১৯৭৩ পর্যন্ত বাংলাদেশে ৮টি সেবাকেন্দ্রের মাধ্যমে দুঃস্থ জনগণের সেবাকার্যে ২৭,৫৭,৫৮০'৮৬ টাকা ব্যয়িত হইয়াছে, প্রাপ্ত দানসামগ্রীর মূল্য এই টাকার অন্তর্ভুক্ত নয়।

গত মে মাসে অনুষ্ঠিত সেবাকার্য:

ঢাকা কেন্দ্র কর্তৃক ১,৪৭৮জন রোগী চিকিৎসিত হন। বিতরিত দ্রব্যাদি: সি. এস. এম. বেবি-ফুড ৪,৭৫০ পাউণ্ড, গ্ল্যাক্সো ১,৫৯৬ পাউণ্ড, শিশুখাদ্য ৯০০ গ্রাম, মিল্ক-পাউডার ৯০০ পাউণ্ড, বিস্কুট ২৩ কেজি, কম্বল ৭৭১খানি, ধুতি ৪২১খানি, শাড়ী ১,৪৮০খানি, লুঙ্গি ৬৪৫টি, শার্ট ৩০৬টি, গামছা ১২টি, মশারি ৯টি, সোয়েটার ১টি, পুরাতন বস্ত্রাদি ১,৭৫১ এবং গায়ে-মাখা সাবান ৪৬১টি।

বাগেরহাট কেন্দ্র কর্তৃক দুর্গতদের জন্য ১০টি গৃহ নির্মিত হয় এবং ৫,৪৫৬ জন রোগী চিকিৎসিত হন। বিতরিত দ্রব্যসমূহ: ভেজিটেবল পাউডার ৫০০ প্যাকেট, জেলি ১৯ পাউণ্ড, 'আস্ত্রা' ও অন্য শিশু খাদ্য ১৫'১২ কেজি, মিল্ক-পাউডার ৭ পাউণ্ড, বিস্কুট ৩২ কেজি, কম্বল ১,১৩১খানি, ধুতি ১,১০১খানি, শাড়ী ২,৪৪০খানি, লুঙ্গি ২২০খানি, শার্ট ২৪২টি, ভেস্ট ১০২টি, সোয়েটার ১,৮৪৯, পুরাতন জামা-কাপড় ৮২, সাবান ১৪টি, পাঠ্যপুস্তক ১৪২খানি, শ্লেট ১৬৬টি, ছাত্রদের নোটবুক ৩০টি, রুলার ৭৩টি এবং কলম ৯টি।

দিনাজপুর কেন্দ্র কর্তৃক নিম্নলিখিত দ্রব্যসমূহ বিতরিত হয়:

কম্বল—১,২২৪, শাড়ী—১,৫১৮, পুরাতন বস্ত্রাদি—১,৯৪৬, মিল্ক-পাউডার ১২৫ কিলোগ্রাম, ভিটামিন ট্যাবলেট—২,৮৬৮। চিকিৎসিত রোগীর সংখ্যা—১,৯৬০।

ত্রিপুরায় বন্যার্তসেবা: ত্রিপুরায় বন্যা-পীড়িতদের জন্য সেবাকার্য চালানো হইতেছে। গত জুন মাসে রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক বিতরিত দ্রব্যাদি: চাল ২,৭৫০কেজি, ডাল ৬২২কেজি, মিল্ক-পাউডার ৫৯০কেজি, বেবি-ফুড ৩৫কেজি, আনারস ১৩৫টি, ধুতি ৩৩০খানি, শাড়ী ৫০২ খানি, লুঙ্গি ১৬০টি, শিশুদের পোশাক ২৮৪, কম্বল ২৬টি, পুরাতন বস্ত্রাদি ৭০, লণ্ঠন ৯৪টি, ব্লিচিংপাউডার ১০কেজি এবং ২৪ লিটার ফিনাইল। এই সকল দ্রব্য ২২টি গ্রামে ৭৩০টি পরিবারের ৩,১৩৭ জনকে দেওয়া হইয়াছে।

কর্ণাটকে খরাত্রাণকার্য: ১৯৭৩-মে মাসে **ব্যাঙ্গালোর** আশ্রম কর্তৃক ২৮জন কুষ্ঠ-রোগীকে ধুতি, শার্ট ও শাড়ী দেওয়া হইয়াছে এবং ৪৮টি খরাক্লিষ্ট পল্লীর ১,১৫০ জনকে খাদ্য প্রদত্ত হইয়াছে।

মহারাষ্ট্রে খরাত্রাণকার্য: বোম্বাই আশ্রম কর্তৃক ১৪.৬.৭৩ তারিখ পর্যন্ত ৭,০৩৭ জনকে ঔষধপত্র ও পুষ্টিজনক ভিটামিন খাদ্য ইত্যাদি বিতরণ করা হইয়াছে। এই মেডিক্যাল রিলিফে ৪৭,৩৫১'০০ টাকা ব্যয়িত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ২,৮৯০'০০ টাকা মূল্যের নূতন শাড়ী এবং ৩০০সেট পুরাতন পোশাক দুর্গতদিগকে দেওয়া হইয়াছে।

কার্যবিবরণী

তমলুক (মেদিনীপুর) শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের ১৯৭১-৭২ খৃষ্টাব্দের কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে তমলুকে আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়, সুদীর্ঘ ৫৭ বৎসর ধরিয়া আশ্রমটি নানাভাবে সাধ্যমত নরনারায়ণের সেবা করিয়া চলিয়াছে। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের

দুইজন লীলাপার্ষদ শ্রীমৎ স্বামী প্রেমানন্দজী মহারাজ ও শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজ এখানে শুভাগমন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের আশীর্বাদ-ধন্য এই আশ্রম। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে তমলুক সেবাশ্রম রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম শাখা-রূপে গৃহীত হয়।

১৯৭১-৭২ খৃষ্টাব্দের কার্যধারা:

আশ্রমে নিত্য পূজা, ধর্মালোচনার ক্লাস, একাদশীতে রামনাম-সংকীর্তন, মহাপুরুষগণের জন্মতিথি-উদ্‌যাপন, বার্ষিক উৎসব প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। এখানে শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির জনসাধারণের আকর্ষণের বস্তু। আলোচ্য বর্ষে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

মিশন সেবাশ্রম কর্তৃক পরিচালিত প্রতিষ্ঠান-সমূহ:

(১) দুইটি হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয়—একটি আশ্রমে, অন্যটি ৬ মাইল দূরে মহিষদা গ্রামে। ১৯৭১-৭২ খৃষ্টাব্দে চিকিৎসিত নূতন ও পুরাতন রোগীর সংখ্যা যথাক্রমে ৫,৬৯৮ ও ২১,৭০৪।

(২) অবৈতনিক দারুশিল্প (Mechanised Carpentry)—শিক্ষাকাল ৩ বৎসর। আলোচ্য বর্ষে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২০।

(৩) নিম্ন-বুনিয়াদী বিদ্যালয় (ছাত্র—১০৯, ছাত্রী—৮৯), প্রাথমিক বিদ্যালয় (ছাত্রছাত্রী—১৬৫)প্রাক্-প্রাথমিক বিদ্যালয় (শিশু-শিক্ষার্থী—৪০), নৈশবিদ্যালয় (বয়স্ক-বিদ্যার্থী—২৬)

(৪) ছাত্রাবাস—বিনা-খরচে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা আছে, পড়াশুনার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদের শারীরিক ও মানসিক উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখা হয়। ১৯৭১-৭২তে ৬জন দুঃস্থ বিদ্যার্থী ছাত্রাবাসে থাকার সুযোগ লাভ করিয়াছিল।

(৫) গ্রন্থাগার ও পাঠাগার—আলোচ্য সময়ে গ্রন্থাগারের পুস্তকসংখ্যা ৭,৩৬৫, পঠিত পুস্তকের সংখ্যা ৪,৬৩৪। ২২টি মাসিক ও সাময়িক পত্রিকা এবং ৪টি দৈনিক সংবাদপত্র রাখা হয়। পাঠাগারে পাঠকসংখ্যা ১৪,৫৫৭, গ্রন্থাগারের অন্তর্গত শিক্ষা-সংস্কৃতি-মূলক চলচ্চিত্র-প্রদর্শনীতে দর্শকের সংখ্যা প্রায় ৫,০০০।

সেবাশ্রমের বিভিন্ন বিভাগগুলি অধিকতর সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য বদান্য ব্যক্তিগণের অকুণ্ঠ সহযোগিতা প্রয়োজন।

উৎসব-সংবাদ

মালদহ রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের বার্ষিক উৎসব গত ৮ই, ৯ই ও ১০ই জুন এক ভাবগম্ভীর পরিবেশের মধ্যে উদ্‌যাপিত হয়। মালদহ, পশ্চিম দিনাজপুর, মুর্শিদাবাদ ও পূর্ণিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে প্রায় ৫০০ শত ভক্ত নরনারী এই উৎসবে যোগদান করেন। ৮ই জুন শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্ধ্যারতির পর স্বামী ভাস্করানন্দ উপনিষদের উপর একটি সুচিন্তিত ভাষণ দেন। ভাষণান্তে শ্রীঅতুলকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় সুললিত ছন্দে 'প্রহ্লাদচরিত্র' কথকতা করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীকে পরিতৃপ্ত করেন। ৯ই জুন সকাল ১০ টায় স্বামী পরশিবানন্দ সমবেত ভক্তবৃন্দের সহিত এক প্রশ্নোত্তর-সভায় মিলিত হন। প্রশ্নোত্তর-প্রসঙ্গে তিনি ভক্তবৃন্দকে সমবেতভাবে শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাবধারা প্রচারে সক্রিয় অংশ গ্রহণের জন্য আহ্বান জানান। অপরাহ্নে ভজন ও সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুরের আরাত্রিকের পর স্বামী ভাস্করানন্দ বর্তমান যুগের পরিপ্রেক্ষিতে স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী আলোচনা করেন। তিনি বিশেষ করিয়া তরুণ-সমাজকে স্বামীজীর "অভীঃ"মন্ত্রে অনুপ্রাণিত হওয়ার আবেদন জানান। ভাষণশেষে শ্রীঅতুলকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় 'মহিষমর্দিনী' কথকতা করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীকে আপ্যায়িত করেন। ১০ই জুন প্রত্যূষে শ্রীশ্রীঠাকুরের মঙ্গলারতির পর এক নগরসংকীর্তন শহর পরিক্রমা করে। এই দিন শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা ও হোম অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ১০ টায় স্বামী

জিনানন্দ 'কথামৃত' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। মধ্যাহ্নে সহস্রাধিক ভক্ত ও দরিদ্রনারায়ণ আশ্রমে বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুরের আরতির পর আশ্রম-প্রাঙ্গণে ধর্মসভা আয়োজিত হয়। সভায় স্বামী পরশিবানন্দ ও স্বামী ভাস্করানন্দ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও বাণী সম্বন্ধে সুচিন্তিত ভাষণ দেন।

বলরাম-মন্দিরে রথোৎসব

গত ১৭ই আষাঢ় সোমবার (২রা জুলাই, ১৯৭৩) শুভ শুক্লা দ্বিতীয়ায় বলরাম-মন্দিরে শ্রীশ্রীরথযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে পূর্বাহ্নে ষোড়শোপচারে পূজা, ভোগরাগ ও হোমাদি হইয়াছিল। বৈকালে পুষ্পমাল্যাদিতে সুসজ্জিত রথে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব ও ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতিকৃতি স্থাপন করিয়া ভোগনিবেদন ও আরতি করা হয়। বহু ভক্ত ও সাধুসমাগমে কীর্তন ভজন ও নৃত্যাদির মাধ্যমে রথ টানা হয়। উপস্থিত ভক্ত ও সাধুগণ প্রসাদ গ্রহণ করেন।

ভক্তবর বলরাম বসুর ভবনে আয়োজিত রথোৎসবে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ভক্তগণসহ যোগদান করিয়া আনন্দে বিভোর হইয়াছিলেন, তাহারই পুণ্য স্মৃতিতে এই রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব ভক্তবৃন্দসহ যে-সব গান গাহিয়াছিলেন সেই-সব গানের কয়েকটি গাহিতে গাহিতে বারান্দায় রথ টানা হইয়াছিল। ২৪শে আষাঢ় পুনর্যাত্রার দিনটিও প্রতিপালিত হয়।

স্বামী নিখিলানন্দের দেহত্যাগ

গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি, আমেরিকার সহস্রদ্বীপোদ্যানে গত ২১শে জুলাই সন্ধ্যা ৭টার সময় (স্থানীয় সময়) নিউ ইয়র্ক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা-অধ্যক্ষ স্বামী নিখিলানন্দ ৭৮ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। কয়েক মাস যাবৎ তিনি অসুস্থ ছিলেন। পরদিন, ২২শে জুলাই তাঁহার শেষকৃত্য সম্পন্ন হইয়াছে। তিনি শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন এবং ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজী মহারাজের নিকট হইতে সন্ন্যাসদীক্ষা লাভ করিয়াছিলেন।

স্বামী নিখিলানন্দের পূর্বনাম দীনেশচন্দ্র, জন্মস্থান নোয়াখালি (বাংলাদেশ)। ঢাকা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তিনি উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন। ১৯১৫-১৬ খৃষ্টাব্দে স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী প্রেমানন্দ যখন ঢাকা গিয়াছিলেন সেই সময়, কলেজ-জীবনেই তিনি তাঁহাদের সঙ্গলাভের সৌভাগ্য পান। ছাত্রজীবনে তৎকালীন বিপ্লবী দলের সহিত সংযুক্ত থাকার সন্দেহে ইংরেজ সরকার তাঁহাকে দুই বৎসর অন্তরীণ রাখে (১৯১৬-১৮)। ইহার পর কিছুদিন অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করিয়া তিনি মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমে ১৯২২ খৃষ্টাব্দে সংঘে যোগদান করেন। পরে ১৯২৯ খৃষ্টাব্দ হইতে দুই বৎসর মহীশূর স্টাডি সার্কেল-এ থাকিয়া ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে সংঘের নির্দেশে প্রচারের জন্য আমেরিকা যান এবং ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে নিউ ইয়র্কে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। শেষদিন পর্যন্ত তিনিই ইহার অধ্যক্ষ ছিলেন।

সুপণ্ডিত, সুবক্তা, সুলেখক স্বামী নিখিলানন্দ সফলভাবে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবপ্রচারে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। আমেরিকান ফিলজফিক্যাল এ্যাসোসিয়েশন-এর সভ্য ছিলেন তিনি। তাঁহার ইংরেজীতে অনূদিত, সম্পাদিত ও রচিত 'গস্‌পেল অব শ্রীরামকৃষ্ণ', মাণ্ডূক্য উপনিষদ্ (কারিকাসহ), গীতা, স্বামী বিবেকানন্দের 'যোগস্ অ্যাণ্ড আদার ওয়ার্কস্', শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জীবনী প্রভৃতি পুস্তকগুলির কয়েকখানি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন।

তাঁহার আত্মা শ্রীরামকৃষ্ণচরণে চিরশান্তি লাভ করিয়াছে।

বিবিধ সংবাদ

কার্যবিবরণী

শ্রীসারদা মঠ ও রামকৃষ্ণ সারদা মিশনের (দক্ষিণেশ্বর, কলিকাতা-৫৭) এপ্রিল-১৯৭০ হইতে মার্চ ১৯৭২ কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে।

মঠকেন্দ্রে দৈনন্দিন পূজা উপাসনা, আরাত্রিক ভজনাদি অনুষ্ঠিত হয়। মহিলা ভক্তবৃন্দের জন্য সাপ্তাহিক ধর্মালোচনার ব্যবস্থা আছে। ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী ও আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের পুণ্য জন্মতিথি বিবিধ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হইয়া থাকে। শ্রীসারদা মঠের মাদ্রাজে (২২, রাঘবীয়া রোড, মাদ্রাজ-১৭) এবং ত্রিচুড়ে (শ্রীসারদামন্দির, ত্রিচুড়, পো:—পুরানাত্তুকারা, কেরালা) কেন্দ্র আছে। মাদ্রাজ কেন্দ্রে দক্ষিণেশ্বর শ্রীসারদা মঠের অনুরূপ দৈনিক পূজাদি, সাময়িক উৎসবাদি ও ধর্মালোচনা হয়। ত্রিচুড় শ্রীসারদা মন্দির কর্তৃক 'বালিকা গুরুকুলম্' ছাত্রীনিবাস, কলেজ-ছাত্রীদের জন্য হস্টেল, বালিকা বিদ্যালয় (১৯৭১-৭২ ছাত্রীসংখ্যা ৭৮৫), নার্সারী স্কুল পরিচালিত হইতেছে।

দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সারদা মিশনের বর্তমানে ছয়টি শাখা: মাতৃভবন (৭এ, শ্রীমোহন লেন, কলিকাতা-২৬), সিস্টার নিবেদিতা গার্লস্ স্কুল (৫, নিবেদিতা লেন, কলিকাতা-৩), রামকৃষ্ণ সারদা মিশন আশ্রম (পি. ২২ সি. আই. টি. রোড, এণ্টালি, কলিকাতা-১৪), বিবেকানন্দ বিদ্যাভবন, মহিলা কলেজ (৩৩, নয়াপট্টি রোড, কলিকাতা-৫৫), রামকৃষ্ণ সারদা মিশন শিক্ষা-মন্দির (১৩৪, বারুইপাড়া লেন, কলিকাতা-৩৫), [রামকৃষ্ণ সারদা মিশন, নিউ] দিল্লী (নিবেদিতা বিদ্যামন্দির হাউজ খাস, নিউ দিল্লী-১৬)—এই কেন্দ্রগুলি আর্তসেবা, শিক্ষাবিস্তার, ধর্মপ্রচার প্রভৃতি ক্ষেত্রে সুন্দরভাবে কর্মরত।

উৎসব-সংবাদ

পাঁচগ্রাম—(মুর্শিদাবাদ) শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রমে গত ১৫ই হইতে ১৭ই এপ্রিল শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বার্ষিক জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে পূজা, হোম, ভাগবতপাঠ, ধর্মসভা, ভজন-কীর্তনাদি হইয়াছিল। চলচ্চিত্রে স্বামীজীর জীবন প্রদর্শিত হয়। ১,২০০ জন নরনারায়ণ প্রসাদ পাইয়াছিলেন।

কল্যাচক শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতির শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরের শুভারম্ভ হয় গত ৭ই মার্চ এবং ১৫ই জুন প্রতিষ্ঠাকার্য বিশেষ পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ ও ভোগরাগাদি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সুসম্পন্ন হয়। সন্ধ্যায় আরাত্রিকান্তে বেলুড় মঠের অধ্যক্ষ মহারাজের শুভেচ্ছাবাণী-পাঠের পর স্বামী সুতীর্থানন্দ 'কথামৃত' ও 'পরমার্থপ্রসঙ্গ' পাঠ করেন এবং শ্রীলক্ষ্মীকান্ত দাস শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জীবনাদর্শ আলোচনা করেন।

ত্রিপুরার বন্যাত্রাণে দান

ত্রিপুরার বন্যাত্রাণে আগত এবং কর্মরত রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী স্বামী দেবদেবানন্দের হস্তে শ্রীসারদা সঙ্ঘ আগরতলা শাখা গত ৩০শে মে প্রায় দেড় হাজার টাকা মূল্যের জিনিস যথা, বেবি-ফুড, বার্লি, বিস্কুট, শাড়ী, ধুতি, জামা, মসুর ডাল, হ্যারিকেন ইত্যাদি অর্পণ করিয়াছেন।

উদ্বোধন, ১ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা

[পুনর্মুদ্রণ]

(পূর্ব্বানুবৃত্তি : ধম্মপদ)

অক্কোচ্ছি মং অবধি মং অজিনি মং অহাসি মে।
যে তং ন উপনয়হন্তি বেরং তেসূপসম্মতি ॥ ৪

অন্বয়—মং অক্কোচ্ছি, মং অবধি, মং অজিনি, মে অহাসি, যে তং ন উপনয়হন্তি তেসু বেরং উপসম্মতি।

সংস্কৃত—মাং অক্রোশীৎ, মাং অবধীৎ, মাং অজৈষীৎ, মে অহার্ষীৎ; যে তং ন উপনহ্যন্তি তেষু বৈরং উপশাম্যতি।

অনুবাদ—আমায় তিরস্কার করিল, আমাকে প্রহার করিল, আমাকে পরাস্ত করিল, আমার দ্রব্য অপহরণ করিল, এইরূপ চিন্তা যাহারা মনে পোষণ করে না, তাহাদের বৈরভাব নষ্ট হইয়া যায়।

নহি বেরেন বেরানি সম্মন্তীধ কুদাচনং।
অবেরেণ চ সম্মন্তি এস ধম্মো সনন্তনো ॥ ৫

অন্বয়—নহি কুদাচনং ইধ বেরানি বেরেন সম্মন্তি, অবেরেন চ সম্মন্তি, এস সনন্তনো ধম্মো।

সংস্কৃত—নহি কদাচন ইহ বৈরাণি বৈরেণ শাম্যন্তি, অবৈরেণ চ শাম্যন্তি, এষ সনাতনো ধর্ম্মঃ।

অনুবাদ—ক্রোধ দ্বারা কখনই ক্রোধকে শান্ত করা যায় না, পরন্তু অক্রোধ দ্বারা ক্রোধকে শান্ত করা যায়, ইহাই সনাতন ধর্ম্ম।

লীলা।

(বাবু শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী লিখিত।)

প্রশান্ত সলিল অনন্ত বারিধি,
নিবাত নিষ্কম্প নীরবে রাজে।
দিক্ দেশ কাল উপাধি বর্জ্জিত।
উদ্ভাসিত সদা স্বকীয় তেজে ॥

সর্ব্ব নিষেধের সীমান্ত প্রদেশ,
কোন বিশেষণে বিশিষ্ট নয়।
নাহি রবি, শশী, গ্রহ, তারা যথা
নাহিক সৃজন, পালন, লয় ॥

কোথা হ'তে মায়া ঝটিকা ছুটিয়া,
জলধি করিল তরঙ্গময়।
দেখিতে দেখিতে নামরূপাত্মক
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড প্রসূত হয় ॥

মায়াতে ব্যোমের প্রথম অধ্যাস,
ব্যোমেতে অনিল ধাইল ছুটি।
বায়ুমাঝে তেজ, তেজেতে সলিল,
সলিলে পৃথিবী উঠিল ফুটি ॥

দেখিতে দেখিতে কোটি রবিশশী
গ্রহতারাগণে ছাইল 'কাশ।
দশদিশি হ'ল জ্যোতিনিমগন,
প্রকৃতির মুখে ফুটিল হাস॥

ক্রমে ক্রমে কাল বিভক্ত হইল,
দিনরাত্রি পক্ষ বৎসর মাসে।
ক্রম ক্রম রূপে পূর্ব্বকল্প মত
ভূলোকাদি সপ্ত ভুবন ভাসে॥

সপ্তদ্বীপযুতা ভাসিল মেদিনী
অন্ন ফলফুলে শোভিল ধরা।
আকীট মানব জনমি ছুটিল
পূর্ব্ব সংস্কারের পূরণে ত্বরা॥

সুখদুখ জরা জনম মরণে
ধরাতল হ'ল দুর্গম অতি।
স্বস্বরূপ ভুলি মহামোহে গলি
হইল সকলে ভরম মতি॥

আঁখির পলকে বারিধি উছলে
পৃথিবী হইল সলিলময়।
তেজে বিশোষিত হইল সলিল
তেজ হ'ল ক্রমে মরুতে লয়॥

বায়ু মহাব্যোমে গ্রাসিল পলকে
ব্যোম হ'ল মহামায়াতে লয়।
মায়াঝড় শান্তে প্রশান্ত সাগর
আবার যেমন তেমন হয়॥

আর নাহি দেখি শশাঙ্ক সুন্দর
আর নাহি সেই দিনেশ তারা।
স্তিমিত সলিল স্তবধ বারিধি
পুন দেখা দিল অনাদি ধারা!

তাই বুঝিলাম অলীক এ লীলা
অলীক সৃজন পালন লয়।
এক ব্রহ্ম আছে অনন্ত জুড়িয়া,
ভ্রমে যাহে লীলা আরোপ হয়॥

ঝালোয়ার দুহিতা।

কবিবর গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

কিশোরী গবাক্ষে দণ্ডায়মানা; স্থিরনেত্রে, দূর মন্দার পর্ব্বতের পানে চাহিয়া আছেন। শিখরে আলো নাই, পরিচিত আলো জ্বলিতেছে না। সম্মুখে নিবিড় অন্ধকার, অন্তরে নিবিড় অন্ধকার, জীবন-সঙ্গিনী আশা-অন্ধকারে আচ্ছন্ন; জগৎ অন্ধকারময়। সহসা মেঘমাঝে তড়িদ্গমনের ন্যায়, আঁধার হৃদয়ে চমকিল, "রাজকুমার নাই!" আবার আঁধার, হাহাকার! নাই নাই শব্দ অনিবার উঠিতে লাগিল। শৃঙ্গে শৃঙ্গে নাই নাই শব্দ প্রতিধ্বনিত; গগনে, পবনস্বনে, ঝালবনে নাই নাই শব্দ, নাই নাই রাজকুমার নাই! দূরে পেচক ঘুৎকার কাঁদিল, "নাই!" ঘোর অন্ধকার, অন্তরে বাহিরে অন্ধকার, ঘোর অন্ধকারে "নাই" "নাই" তরঙ্গ বহিতে লাগিল। দৃশ্যমান "নাই" "নাই" তরঙ্গ বহিতেছে। আঁধার হৃদয়ে প্রেতদেহের ন্যায়, স্মৃতিপথে কত ছায়াছবি চলিতে লাগিল।

অন্ধকারাচ্ছন্ন ছায়াদেহী বালিকা কিশোরী, ছায়াদেহী মাতার অঞ্চল ধরিয়া, ছায়াময়ী উপবনে ভ্রমণ করিতেছে। ছায়ার আকাশ, ছায়ার চাঁদ, ছায়ার তারা, ছায়ার গাছ, ছায়ার সরোবর, ছায়ার ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। ছায়ার পাখী নীরবে গাহিতেছে। ধীরে ধীরে দৃশ্য চলিয়া গেল। ছায়ার উন্নতশির দেবীমন্দির, ছায়ালোক নীরবে কলরব করিতেছে। স্বর্ণছায়ার স্বর্ণকান্তি সম্মুখে আসিল। ছায়াময়ী কিশোরী পলকহীন নেত্রে দেখিতেছে। ধীরে ধীরে ছায়াছবি চলিয়া গেল।

কলিকা যৌবনে, আবার ছায়াময়ী কিশোরী, আবার লিপি পাঠ করিতেছে। সত্য লিপি, স্বর্ণাক্ষরে লিপি জ্বলিতেছে, কিন্তু মলিন। ছায়া চলিয়া গেল, ছায়া বাহু বেষ্টন করিল। নীরবে ছায়া স্বর ঝনৎকার কর্ণে পশিল। ছায়াকুঞ্জ, ভীষণ ছায়ামূর্ত্তি সম্মুখে, হৃদয়ে বিষাদ অভিনয়ে পট পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। নীরবে অভিনয় হইতেছে, হৃদয়ালোক মন্দার পর্ব্বতে দীপালোক জ্বলিতেছে না; আমার জীবনালোক কেন নিভিল না? কুক্ষণে রাজকুমার দেবমন্দিরে আসিয়াছিল, কুহকিনী কুক্ষণে রূপে, কুহকিনী হাবভাবে, সরলপ্রাণ যুবককে আবদ্ধ করিলাম। কুক্ষণে প্রেমলিপি লইলাম, কুক্ষণে প্রেমলিপি লিখিলাম, কুক্ষণে বিবাহে সম্মত হইলাম। কুক্ষণে রাজকুমার ঝালোয়ার প্রবেশ করিল, কুক্ষণে রাজকুমার অপমানে অবনত, শত্রুহস্তে জর্জ্জরীভূত, মুমূর্ষু শয্যায় ছয়মাস রহিল। কুক্ষণে রাজ্যত্যাগী, সংসারত্যাগী, সর্ব্বত্যাগী হইয়া বিজন পর্ব্বতে কারাগারে বন্দীর ন্যায় আলোক জ্বালিয়া বসিল। কৈ? সে আলোক নাই, নিভিয়া গিয়াছে। দেখিতে দেখিতে উর্দ্ধদৃষ্টি হইল, দেহ শিথিল, ইন্দ্রিয় শিথিল, জীবনক্রিয়া স্তম্ভিত—শ্বাস স্তম্ভিত, মন স্তম্ভিত—টলে না, হেলে না, নিষ্কম্প দীপশিখার ন্যায় মন স্থির হইয়া রহিল। ক্রমে যেন কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল, "আহা অভাগিনী!" কর্ণে পশিল, ধীরে ধীরে মনের গোচর হইল। কিশোরী শুনিল, "তুমি কি কোনও অভাগিনী? কথা কও, যদি দুঃখিনী হও, তোমার দুঃখে আমিও দুঃখিনী।"

"দুঃখিনী?" কিশোরী উত্তর করিল, "আমি দুঃখিনী নই। আমি দুঃখিনী শুনিলে, আমার হাসি আসে। আমার দুঃখ কি? দুঃখ পাইয়াছে সে—মন্দার রাজকুমার। আমার নিমিত্ত, সে উন্মত্ত। আমার কথায় স্বর্গ পাইত, আমার পত্রপাঠে আত্মহারা হইত, আমায় পাইবার আশায় আসিয়াছিল, অপমানে শত্রুহস্তে মুমূর্ষু হইয়া ফিরিয়া গেল। আমার আশায় জীবনভার বহিয়াছিল, ঐ দেখ দীপ নির্ব্বাণ, আমার আশা ছাড়িয়া যুবরাজ চলিয়া গিয়াছে। দেখ! দেখ! আমি কথা কহিতেছি, শ্বাস পড়িতেছে। জীবিত রহিয়াছি, যাও—যাও। তুমিও ফিরিয়া যাও,—আমি দুঃখিনী নহি।

এখানে কি করিতেছ? আহা! তোমার কথা অতি মধুর। না—না, আমি দুঃখিনী নই। তুমি কে? আমার নিমিত্ত কাতরা, তুমি কে? এ শত্রুপুরে আমার ব্যথার ব্যথী কে হইতে চাহে? না, যাও, আমি দুঃখিনী নহি। তোমার দেবীমূর্ত্তি, তুমি দেবী! যাও, তাহার সংবাদ আনিয়া দাও। অবশ্যই সে দেবমণ্ডলে, নন্দনকাননে, বিহার করিতেছে। যাও দেবী, তাহার সংবাদ আমায় আনিয়া দাও। যাও দেবী, আসিয়া বলিও, সে নন্দনকাননে আছে, প্রেমিকা প্রণয়িনী পাইয়াছে, আমাকে ভুলিয়া গিয়াছে। আর দীপ জ্বালিয়া একাকী পর্ব্বতশৃঙ্গে বসিয়া থাকে না। তাহার নিরানন্দ হৃদয়ে চিরানন্দ বসিয়াছে। আসিয়া আমায় সংবাদ দিও, দেবীর কার্য্য করিও।" কিশোরী বামাকণ্ঠে উত্তর শুনিলেন, "আমি দেবী নই। আমি তোমার ন্যায়

মানবী, আমার নাম মীরা, আমি তোমার সে প্রেমিক বৈরাগীকে ঝালবনে পাঠাইয়া দিয়াছি। বৈরাগী আসিবে বলিয়া গেল, আর ফিরিল না। ঝালবনে প্রবেশ করিলাম—শ্বাপদসঙ্কুল বন দেখিলাম—কণ্ঠকপরিপূর্ণ বন দেখিলাম—সূর্য্যরশ্মি ঢাকা দেখিলাম—বৃক্ষে বৃক্ষে, লতায় লতায় ভীষণ বেষ্টন দেখিলাম—বনমাঝে তমোময়ী যামিনী দেখিলাম, বৈরাগীকে দেখিলাম না; সে তিলকধারী, কণ্ঠীধারী বনমধ্যে নাই। কোথায় গেল খুঁজিতেছি। বন খুঁজিয়াছি, পৃথিবী খুঁজিব, দিগন্ত খুঁজিব। বৈরাগীর দর্শন না পাইলে, এ জীবনে জীবনব্রত নিষ্ফল হইল। জন্ম-জন্মান্তর তপস্যা করিলে বৈষ্ণবদর্শন হয়। বৈষ্ণব দেখিলাম, সেবা করিতে পারিলাম না। ঝালবনে পাঠাইলাম, ঝালবনে বৈষ্ণবকে দেখিলাম না।”

কিশোরী শুনিল, কথার অর্থ বুঝিল, উত্তর করিল না। আবার নাই, নাই শব্দ শুনিতে লাগিল। মীরার মনে মনে উঠিতে লাগিল, না—না, আর অনুতাপ করিব না। এ অদ্ভুত প্রেমের যদি এই পরিণাম হয়,—তাহা হইলে প্রেমের আদর কেন? দীপালোক জালিয়া, যে প্রেমের আশায়, দিবানিশি কাটাইয়াছে, সে আশা কি মিথ্যা? আশাময় আলোক চাহিয়া, যার দিন বহিয়াছে, আশা কত বলিয়াছে, তাহাও কি মিথ্যা? আমার আশা কি মিথ্যা? প্রেমিকের আশা মিথ্যা হইলে, সকলই মিথ্যা। এ জগতে বিশ্বাসের আর কি আছে? প্রেম? না—না, বিশ্বাসহারা হইব না। বৈষ্ণবকে খুঁজিব, বৈষ্ণবের দেখা পাইব। অশ্রুজলে পাদপদ্ম ধৌত করিয়া মার্জ্জনা চাহিব। “ঝালোয়ার কুমারী!” মীরা বলিতে লাগিলেন,—“ঝালোয়ার কুমারী! দীপ নির্ব্বাণ হউক, চন্দ্র, সূর্য্য, তারালোক নির্ব্বাণ হউক, বিশ্বাস-হারা হইও না,—প্রেম হারাইবে। তোমার প্রেমিককে আমি খুঁজিয়া দিব।”

উন্মাদিনীর ন্যায়, কিশোরী উত্তর করিলেন, “না—না, নাই। অনেক প্রবোধ কথা একা বসিয়া হৃদয়ে শুনিয়াছি, অনেক শুনিয়াছি, অনেক বিশ্বাস করিয়াছি, আর শুনিতে চাহি না, আর বিশ্বাস করিতে চাহি না,—কেবল এই বিশ্বাস আমার হৃদয়ে আসুক, সে আমায় ভুলিয়া গিয়াছে। সে আনন্দে আছে। না—না, সে নাই!” আবার নাই নাই শব্দে পর্বতশৃঙ্গ পরিপূর্ণ। শৃঙ্গে শৃঙ্গে, পবনে, ঝালবনে, গগনে নাই, নাই ধ্বনি। উন্মাদিনী “নাই, নাই” বলিয়া চলিয়া গেল।

মীরা স্তম্ভিতা, স্থিরনেত্রে গবাক্ষ অভিমুখে চাহিয়া রহিলেন। পাশে দেখেন, অঙ্কা বঙ্কা। অঙ্কা বলিতেছে—“মাগী, তোর কি মরবার ভয় নাই? তুই কদিন আমাদের তাড়িখানায় যাস্‌নি, মনটা কেমন করুতে লাগ্‌লো। তাড়ি ভাল লাগ্‌লো না, আর যেখানেই যাই, তাকে ভাল লাগ্‌লো না। তোকে দেখতে বড় ইচ্ছা হল। তোর ঘরের দোরে পাহারা, আমাদের আটক করুবে। ফাঁকি দিয়া এলেম, জানিস্‌ ত, সব ঘরেই পাহারা থাকে; মাল লুট করে আনি। তোর দাসী বল্‌লে, ঝালবনে গিয়াছিস্‌, ভাবলুম,—ও মাগী! ঝালবনে কি করুতে গেলি? বাঘকে হরিনাম বল্‌বি নাকি? তা তুই পারিস্‌, এই খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে তোর কাছে এলেম।”

মীরা। বাবা! তোমরা আমায় খোঁজ কেন? হরিকে খোঁজ। তোমাদের দুষ্প্রবৃত্তি দূর হইবে, মন নির্ম্মল হইবে, গোলকে হরিলীলা দেখিতে পাইবে।

বঙ্কা। আর রাখ্‌, মাগী, তোর গোলক; আমরা তাড়িখানা ছেড়ে কোথাও যেতে চাই না। কোনও হরিকে চাই না। তোকে দেখ্‌তে চাই, তোর মুখে হরিনাম শুন্‌তে চাই, তুই

হরি বল্ শুনি। তোর মুখে হরিনাম যেমন মিষ্টি, আমাদের গান তেমন মিষ্টি নয়, বল্ বল্ হরি বল্।

নীরব পর্ব্বতে হরিধ্বনি উঠিল। গগনভেদী ধ্বনি, দিগ্ দিগন্ত ব্যাপিল। অঙ্কা, বঙ্কা বাহু তুলিয়া নাচিতেছে। মীরা নাচিতেছেন, করতালি দিতেছেন। আলুলায়িত কেশপাশ পবনে উড়িতেছে, পবনে অঞ্চল উড়িতেছে, অশ্রুধারা বহিতেছে। হরিপ্রেমে উন্মত্তা, মত্ত দস্যুদলের সহিত হরিধ্বনি করিতে করিতে নাচিতেছেন! কাননে, গগনে, বিহঙ্গশ্রবণে হরিধ্বনি পশিতে লাগিল। হরি-ধ্বনিতে ধ্বনি মিশাইয়া, আনন্দে কোকিল কুহুরিল। আনন্দলহরী পবনে দুলিয়া চলিল। বীণাস্বরে ঋঙ্কারে ঝঙ্কারে হরিধ্বনি হইতেছে। ধীরে ধীরে প্রহরী আসিয়া, বেড়িতে লাগিল। সর্দ্দার মহা উদ্বিগ্ন, রাজ-আজ্ঞায় ঝালবন অতি সাবধানে রক্ষিত, কে পুরুষ আসিয়া প্রবেশ করিয়াছিল, আর কেহ না প্রবেশ করে। এই তিনজন কিরূপে প্রবেশ করিল? উচ্চরবে সর্দ্দার আজ্ঞা দিল, "ধর বন্দী কর;" প্রহরীর পা চলে না, হরিনামে স্তম্ভিত। বজ্রনাদে সর্দ্দারের আজ্ঞা আসিতে লাগিল। প্রহরীরা পুত্তলিকার ন্যায় চলিতে লাগিল। অস্ত্রের ঝনৎকার বঙ্কা শুনিল। অস্ত্রধারী বেড়িতেছে দেখিল। বঙ্কা বলিল,—"ওরে অঙ্কা, আমাদের ধ'রতে আস্ছে রে।"

অঙ্কা। আসুক না, হরিনাম কর না, দূরে আছে। আসুক, আসুক, ফস্ করে মাগীকে নিয়ে সরে যাব।

শৃঙ্গ হইতে একবার নিম্নদৃষ্টি করিল। তুঙ্গ শৃঙ্গ, পাষাণময়ী মেদিনী তিন ক্রোশ নিম্নে, মধ্যে লতাবন হইয়াছে। প্রহরীরা নিকটে আসিল, ধরে, ধরে, অঙ্কা বঙ্কা মীরাকে ধরিয়া, পর্ব্বতগায় পৃষ্ঠ দিয়া উপদেবতার ন্যায় নামিয়া গেল। তখনও হরিধ্বনি, উঁকি মারিয়া প্রহরীরা দেখে, লতাবন সহিত নামিয়া গিয়াছে। সোজাপথে যাইলে তিন দিনে তথায় যাওয়া যায়। আর ধরিবার উপায় নাই। "ভূত! ভূত! পেত্নী! নামিয়া গেল, পর্ব্বত বাহিয়া নামিয়া গেল!" দূর হরিধ্বনি তখনও উঠিতেছে। [ক্রমশঃ]

পরমহংসদেবের উপদেশ।

(স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্রদত্ত)

(১) পাপ আর পারা কেহ হজম কর্‌তে পারে না। যদি কেহ লুকিয়ে পারা খায়, তাহা হইলে কোন দিন না কোন দিন গায়ে ফুটে বেরোবে। পাপ কল্লেও তেমনি তার ফল এক দিন না একদিন নিশ্চয় ভোগ কর্ত্তে হবে।

(২) বিষয় লাভ হ'লো না, ছেলে হ'লো না ব'লে লোকে কেঁদে ভাসিয়ে দেয়, কিন্তু ভগবান লাভ হ'লো না, ভগবানের পাদপদ্মে ভক্তি হ'লো না ব'লে এক ফোঁটা চোখের জল কজন লোকে ফেলে?

(৩) বাসনার লেশমাত্র থাক্‌তে ভগবান লাভ হয় না। যেমন সুতোতে একটু ফেঁশো বেরিয়ে থাক্‌তে ছুঁচের ভেতর যায় না। মন যখন বাসনা-রহিত হয়ে শুদ্ধ হয়, তখনই সচ্চিদানন্দ লাভ হয়।
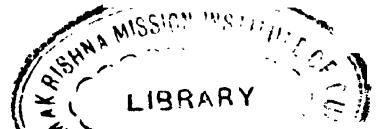
(৪) পরমহংসদেব সর্ব্বদা বলিতেন "হাত তালি দিয়ে সকালে ও সন্ধ্যাকালে হরিনাম কোরো।" তা হলে সব পাপ তাপ চলে যাবে। যেমন গাছের তলায় দাঁড়িয়ে হাত তালি দিলে গাছের সব পাখি উড়ে যায়, তেমনি হাত তালি দিয়ে হরিনাম কল্লে দেহগাছ থেকে সব অবিদ্যা-রূপ পাখি উড়ে পালায়।

(৫) সাঁকোর নীচে দিয়ে জল সহজেই বেরিয়ে যায়, জমে না, তেমনি মুক্ত পুরুষদিগের হাতে যে টাকা পয়সা আসে, তাহা থাকে না, অমনি খরচ হইয়া যায়। তাদের সঞ্চয়বুদ্ধি একে-বারেই নাই।

(৬) পাড়াগাঁয়ে মাছ ধরবার জন্য বিলের ধারে এবং মাঠে ঘুনি পাতে। ঘুনির ভিতর চিক্ চিক্ করে জল যায় দেখে ছোট ছোট মাছগুলি আনন্দে তার ভিতর চলে যায়, তারা আর বার হতে পারে না, সেইখানে আট্‌কে যায়, পরে একেবারে প্রাণে মরে। দুটো একটা মাছ ঘুনির নিকটে গিয়ে ঐ দেখে একেবারে লাফাইয়া অন্য দিকে চলে যায়। সংসারেরও বাহ্য চাকচিক্য দেখে লোকে সাধ কোরে প্রবেশ করে, পরে মায়ামোহে জড়িয়ে দুঃখ কষ্ট পেয়ে নাশ পায়, আর যাঁরা এই সব দেখে কামিনী কাঞ্চনে আসক্ত না হয়ে ভগবানের পাদপদ্ম আশ্রয় করেন, তাঁহারাই যথার্থ সুখ ও আনন্দ পান।

রামকৃষ্ণ জন্মোৎসব

(নিউ ইয়র্ক)

আমরা আমেরিকাস্থ স্বামী অভেদানন্দের নিকট হইতে নিম্নলিখিত পত্রখানি পাইলাম।

নিউ ইয়র্ক, ১লা চৈত্র।

সম্পাদক মহাশয়েষু,

গত রবিবার ২৯শে ফাল্গুনের রাত্রিতে আমেরিকার নিউ ইয়র্ক সহরে ভগবান্ রামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব হইয়া গিয়াছে। কলিকাতায় যখন ৩০শে ফাল্গুনের প্রাতঃকাল, নিউ ইয়র্কে তখন ২৯শে ফাল্গুনের সায়ংকাল। সেই নিমিত্ত এখানে জন্মতিথি পূজা সোমবারে না হইয়া রবিবার রাত্রিতে হইয়াছে।

গত রবিবার সায়ংকালে ৬টার পর কতিপয় নরনারী—যাঁহারা স্বামী বিবেকানন্দের উপদেশানুসারে ব্রহ্মচর্য্য ব্রতে ব্রতী হইয়াছেন এবং যাঁহারা ভবিষ্যতে ঐ ব্রত অবলম্বন করিবার জন্য তীব্র ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন, (তাঁহারা) ভক্তিভরে পত্র পুষ্প ফলাদি আহরণ করিয়া এক ব্রহ্ম চারিণীর গৃহে সমবেত হইয়াছিলেন। প্রায় ৬॥০টার সময় আমি তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, ভগবান্ রামকৃষ্ণের প্রতিমূর্ত্তি নানাবিধ পত্র ও সুগন্ধি পুষ্পের মধ্যে বিরাজ করিতেছেন। ধূপ, ধুনা, দীপ, পত্র, পুষ্প ও ফল ইহাই পূজার উপকরণ মাত্র। ভক্তিমতী ব্রহ্মচারিণী এরূপ নিপুণতার সহিত সমস্ত আয়োজন করিয়াছিলেন যে, আমি দেখিয়া তাঁহাকে শত শত ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না; এবং তাঁহার নিষ্কাম ভক্তি দেখিয়া চমৎকৃত হইলাম। আমার মনে হইতে লাগিল, যেন আমি কলিকাতার নিকটস্থ রামকৃষ্ণ মঠে উপস্থিত হইয়া মহাপূজা দর্শন করিতেছি।

আনন্দোচ্ছ্বাসে সকলেই মাতোয়ারা হইয়া বলিতে লাগিলেন, "আমরা ধন্য, যেহেতু আমাদের মধ্যে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের সন্তান বিদ্যমান।"

সাতটার সময় আমি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের একটী স্তোত্র পাঠ করিলাম এবং ইংরাজীতে ঐ স্তোত্রের অর্থ বুঝাইয়া দিলাম। তৎপর প্রোফেসর ম্যাক্সমূলার-প্রণীত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের জীবনচরিত এবং কয়েকটী উপদেশ পাঠ করিলাম। যথাসময়ে ধূপ, ধুনা, পুষ্প, ফলাদি নিবেদিত হইবার পর সকলে মিলিয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের দিব্যভাব (Divine spirit) চিন্তা করিতে করিতে ধ্যানমগ্ন হইলেন। ধ্যানকালে সকলেই যেন অপার আনন্দসাগরে পুনঃ পুনঃ নিমগ্ন হইতে লাগিলেন এবং ভগবান রামকৃষ্ণের পবিত্র শক্তির (Holy spirit) আবির্ভাব অনুভব করিতে লাগিলেন। অবশেষে সকলেই পরমানন্দের সহিত প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। এইরূপে জন্মতিথিপূজা সমাপ্ত হইল।

অলমতিবিস্তরেণ—
ইতি অভেদানন্দ।

(মান্দ্রাজ)

মান্দ্রাজ মঠ হইতে কোন পত্রপ্রেরক লিখিতেছেন ;—

এখানে ৬ই চৈত্র রামকৃষ্ণ মহোৎসব অতি সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। প্রাতঃকাল ৬টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত পূজা, তৎপরে সঙ্কীর্ত্তন। ৪টী সম্প্রদায় যথাক্রমে অতি সুন্দর স্বরে ভগবন্নামাবলি কীর্ত্তন করিয়া শত শত শ্রোতৃবর্গের অন্তঃকরণে স্বর্গীয় আনন্দ বিস্তার করিয়াছিলেন। সঙ্কীর্ত্তন চলিতে লাগিল, ইত্যবসরে ১০টা হইতে ৪॥০টা পর্য্যন্ত দরিদ্রভোজন কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে লাগিল। আমরা পূর্ব্ব দিবস ২ সহস্র দরিদ্রকে টিকিট বিতরণ করিয়াছিলাম। কিন্তু টিকিটধারী ছাড়া সহস্রাধিক দরিদ্রের সমাগম হইয়াছিল। সকলেই সুন্দররূপে প্রসাদ ভোজন করিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছিল। এদিকে পাঁচ শতেরও অধিক ভদ্রলোক শ্রীমৎ বিলগিরি আয়েঙ্গারের রামানুজ কুটমে শ্রীশ্রীভগবদ্দৃষ্টিপরিশুদ্ধ অন্ন ভোজন করিয়া আপনাদিগকে চরিতার্থ মনে করিয়াছিলেন। সমারোহের সীমা ছিল না। সকলেই দরিদ্রগণের সুখভোজনের জন্য ব্যস্ত।

সায়াহ্নে সার্দ্ধ চারি ঘণ্টার পর ভোজন ব্যাপার এক প্রকার শেষ হইয়া গেল। এমন সময় স্বীয় দল বল লইয়া শকটারোহণে হরিকথৈকপরায়ণ কোনও ভক্তবর শকট হইতে অবরোহণ করিয়া সমবেত জনগণের হৃদয়কে পুলকিত করিয়াছিলেন। কারণ, তাঁহাকে দেখিয়া সকলেরই ভগবৎ-কথাপিপাসা বলবতী হইয়া উঠিল। অনতিবিলম্বে কথা আরম্ভ হইল। নীচকুলোদ্ভব নন্দ-নামা কোনও সাত্বতপ্রধানের ভক্তিরসপরিপ্লুত জীবনাখ্যায়িকা কথকমহাশয়ের কথার বিষয় হইয়াছিল। তিনি স্বীয় সুমধুর তান-লয়-মান-সম্বলিত সঙ্গীত সহযোগে যে কথামৃতের অবতারণা করিয়াছিলেন, তাহা সকলেরই সাতিশয় হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। কথান্তে আরাত্রিক সমনুষ্ঠিত হইল। সন্ধ্যা ৭টা বাজিল। প্রেসিডেন্সি বিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রঙ্গাচারী "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ও বর্ত্তমান সময়" সম্বন্ধে দেড় ঘণ্টাকালব্যাপী একটি সুদীর্ঘ ভাবপূর্ণ, গভীরচিন্তাপ্রসূত, মনোহর বক্তৃতা করিয়া সকলেরই চিত্তাকর্ষণ করিয়াছিলেন। সকলের সুবিধার জন্য বক্তৃতাটি ইংরাজি ভাষায়

দেওয়া হইয়াছিল। সার্দ্ধ অষ্ট ঘটিকার পর—বক্তৃতা শেষ হইলে পুনরায় আরাত্রিক হইল। আরাত্রিকক্রিয়া স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। তৎপরে শ্রীশ্রীগুরুরাজস্তোত্র গভীরতানে পাঠ করিয়া শ্রীশ্রীমহোৎসব কর্ম্ম সুসম্পন্ন করা হইল। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের শতাধিক ছাত্রগণ অতি উৎসাহের সহিত সমস্ত দিবস ধরিয়া সর্ব্ববিধ পরিশ্রম করতঃ আপনাদের কৃতার্থ মনে করিয়াছিলেন। ইতি

ভগবদ্‌গীতা শাঙ্করভাষ্যের বঙ্গানুবাদ

(পণ্ডিতবর প্রমথনাথ তর্কভূষণানুবাদিত।)

পূর্ব-প্রকাশিতের পর

[গীতার প্রথম অধ্যায়ের ১ম হইতে ২১শ শ্লোকের অন্বয় ও বঙ্গানুবাদ এই প্রবন্ধে রহিয়াছে।—বর্তমান সম্পাদক]

শারীরক সূত্র রামানুজভাষ্যম্

(পণ্ডিতবর প্রমথনাথ তর্কভূষণানুবাদিত।)

[প্রথম সূত্রের মূল ভাষ্যের কিয়দংশ, বঙ্গানুবাদ সহ।—বর্তমান সম্পাদক]

উদ্বোধন, আশ্বিন, ১৩৮০

বিষয়-সূচী

বিষয়-সূচী

বিষয়-সূচী

বিষয়-সূচী

বিষয়-সূচী

চিত্রসূচী

Silpa Sree Works
MANUFACTURERS & EXPORTERS
7, SHAMA CHARAN DE STREET,
CALCUTTA-12
Telegrams:
"JADRISHI" Calcutta.
Telephone :
34-3734

কন্যাকুমারী

দিব্য বাণী

সর্বস্য বুদ্ধিরূপেণ জনস্য হৃদি সংস্থিতে।
স্বর্গাপবর্গদে দেবি নারায়ণি নমোহস্তু তে॥ ৮
সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোহস্তু তে॥ ১০
সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি।
গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমোহস্তু তে॥ ১১
শরণাগতদীনার্তপরিত্রাণপরায়ণে।
সর্বস্যার্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোহস্তু তে॥ ১২

—শ্রীশ্রীচণ্ডী, ১১

বুদ্ধিরূপে সবাকার হৃদয়ে, অম্বিকে,
বিরাজিতা তুমি, স্বর্গ-মুক্তি-প্রদায়িনি!
প্রণমি তোমারে দেবি, নমি নারায়ণি!

সকল-মঙ্গল-রূপা, কল্যাণ-সাধিকে,
ত্রিনয়নে, গৌরি, সব-অভীষ্ট-দায়িনি!
শরণের যোগ্যা তুমি! নমি নারায়ণি!

নির্গুণা, সগুণা তুমি, জগৎ-পালিকে,
সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশের শক্তি, সনাতনি!
প্রণমি তোমারে মাতা, নমি নারায়ণি!

শরণ-আগত দীন আর্তেরে, অম্বিকে,
পরিত্রাণ কর তুমি! দুঃখ-বিনাশিনি
সবাকার তুমি, দেবি! নমি নারায়ণি!

কথাপ্রসঙ্গে

দুর্গোৎসব

শ্রীশ্রীদুর্গা-মায়ের পূজা, শারদীয় দুর্গোৎসব আবার আসিয়া পড়িল। এই উৎসব আমাদের মনকে, জীবনকে নাড়া দিয়া যায় প্রতি বছর একবার করিয়া। নিরানন্দময় দুঃখকষ্টময় জীবনে একটু আনন্দময় বৈচিত্র্য আনিয়া দেয় পূজার এই কয়টি দিন।

সব আনন্দেরই উৎস একই আনন্দ-পারাবার—আমাদের নিজেদেরই স্বরূপ ব্রহ্মময়ী সচ্চিদানন্দময়ী মা, বা 'কারণানন্দবিগ্রহা' জগজ্জননী হইলেও প্রকাশের অবলম্বন বিভিন্ন হওয়ায় ব্যক্তিবিশেষে উহার প্রকাশও বিভিন্ন হয়। বহির্বিষয় অবলম্বন হইলে বহির্মুখী মনে ঐ আনন্দ ক্ষণস্থায়ী হয়, তাহার প্রতিক্রিয়াও দেখা দেয় পরে; মনকে উহা আরো অশান্ত, আরও বহির্মুখী করে। আর রূপে বা অরূপে আমাদের স্বরূপই যখন অবলম্বন হয়—আমরা যখন বাহিরের কোন নাম-রূপ অবলম্বনেই, ভগবানের কোন বিশেষ মূর্তির ও নামের চিন্তার মাধ্যমেই হউক, অথবা সরাসরিই হউক আমাদের স্বরূপকেই অবলম্বন করিয়া আনন্দ লাভের চেষ্টা করি, তখন তাহা আমাদের মনকে অন্তর্মুখী করিয়া আমাদের অন্তরস্থ আনন্দ-পারাবারকে সোজাসুজি স্পর্শ করিবার দিকে অগ্রসর হয়; সে জন্য সে আনন্দ হয় দীর্ঘস্থায়ী ও প্রতিক্রিয়াহীন আনন্দ, বহির্বিষয়-নিরপেক্ষ আনন্দ। বহির্বিষয়-নিরপেক্ষ বলিয়াই এ-আনন্দ লাভের চেষ্টা মানুষকে নির্ভয় করে, পরার্থপর করে।

পূর্বে এই দুর্গোৎসব অবলম্বনে সাধারণভাবে আমাদের সকলেরই মন এই আনন্দের কিছু না কিছু আস্বাদ পাইত। কেবল শারদীয় দুর্গোৎসব নয়, আমাদের পূজা-পার্বণ-কথকতাদি সর্ববিধ উৎসবানুষ্ঠানের লক্ষ্যই ছিল এ-সবের মাধ্যমে মনকে সাবলীলভাবে একটুখানি অন্তর্মুখী, সত্যাভিমুখী করানো। যাঁহারা নিত্যনিয়মিত অভ্যাসের মাধ্যমে মনকে অন্তর্মুখী করিতে পারিয়াছেন, প্রতিদিনই অন্তরের গভীর হইতে গভীরতর প্রদেশে অগ্রসর হইয়া ক্রমশই সত্যের অধিকতর নিকটবর্তী হইতেছেন, তাঁহাদের জন্য এসবের অবশ্য-প্রয়োজনীয়তা নাই, সত্য কথা; কিন্তু সর্বসাধারণের জন্য, বিশেষ করিয়া যাঁহারা অন্তরস্থ বিষয়-নিরপেক্ষ আনন্দের—অকারণ-আনন্দের—আস্বাদ কখনও পান নাই বা পাইবার চেষ্টাও করেন না, তাঁহাদের জন্য এইরূপ বাৎসরিক অনুষ্ঠানগুলির বিশেষ প্রয়োজন রহিয়াছে। বছরের পর বছর অন্ততঃ একবার করিয়াও একটানা কয়েক-দিন ধরিয়া মনে সত্যের ছাপ পড়ার ফলে কখনো কোন শুভক্ষণে অন্তরের দ্বার যদি সামান্যও উন্মুক্ত হয়, ক্ষণিকের জন্যও হয়, তাহা হইলে তাহাই একটি জীবনকে পরিবর্তিত করিয়া সত্যাভিমুখী করাইবার পক্ষে যথেষ্ট। সেই আনন্দস্মৃতির ছাপ গভীর হয় বলিয়া আজীবনই উহা রহিয়া যায়, উহার স্মরণমাত্র মন আনন্দাপ্লুত হয়, পুনরায় উহা লাভ করিবার চেষ্টা স্বাভাবিক নিয়মেই করে। ভয়ে হউক, আনন্দে হউক, দুঃখে হউক, বিস্ময়ে হউক—যে কোন কারণেই হউক খুব একাগ্র হইলেই মনে সেই অনুভূতির ছাপ যে গভীরভাবে পড়ে, এবং তাহার স্মৃতি যে আজীবন স্থায়ী হয়, ইহা তো আমাদের সকলের জীবনেই উপলব্ধ সত্য।

পূর্বে আমরা সকলেই যে এই আনন্দের আস্বাদ শারদীয় উৎসবকে উপলক্ষ্য করিয়া কিছু না কিছু পাইতাম, তাহার কারণ তখন এই উৎসবের সব কিছুরই কেন্দ্রে থাকিত মায়ের বা মায়ের পূজার চিন্তা। দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে যাত্রা, কথকতা প্রভৃতি সাধারণের মনোরঞ্জনের সব

ব্যবস্থাই থাকিত, কিন্তু এ-সবকিছু মায়ের চিন্তাকে, মায়ের পূজার চিন্তাকে কখনো অপ্রধান করিতে পারিত না, সব কিছুরই কেন্দ্রে থাকিতেন মা। গৃহে একজন অতি শ্রদ্ধার্হ, অথচ অতি আপন-জনের—একজন পরমাত্মীয়ের আগমন ও তাঁহার সেবার জন্যই সব কিছু করা হইতেছে, মনে এই ভাবেরই প্রাধান্য থাকিত বেশী। আবার তাহার সহিত এ ভাবও সংযুক্ত থাকিত, আমাদের সেই অতি আপনজনটিই হইলেন সর্ববিধ মঙ্গলদায়িনী, সর্বসিদ্ধি-প্রদায়িনী জগদীশ্বরী—তাঁহার ইচ্ছাই জগতের সর্ববিধ ঘটনারূপে, বাস্তবরূপে পরিণত হয়।

এই শারদীয় দুর্গোৎসব আজও আমরা করিতেছি—আগের চেয়ে অনেক বেশী করিয়াই করিতেছি—শহরের পাড়ায় পাড়ায়, পল্লীতে পল্লীতে দুর্গোৎসবের সংখ্যা এখন আগের চেয়ে অনেক বেশী। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও মানুষের মন অধিকতর উন্নত, সত্যাভিমুখী না হইয়া বরং তাহার বিপরীতটাই হইতেছে কেন?

ইহার কারণ দুর্গোৎসব আমরা করিতেছি, কিন্তু সে উৎসবে মা এখন আর আমাদের চিন্তার কেন্দ্রে নাই। দুর্গোৎসবে আমাদের মন হইতে, আমাদের উৎসবের আনন্দের কেন্দ্র হইতে মাকে, মায়ের পূজাকে, মায়ের চিন্তাকে আমরা ক্রমশঃ গৌণ করিয়া ফেলিতেছি, মাকে মন হইতে ক্রমশঃ সরাইয়া ফেলিতেছি। প্রতিমা একটি রাখিতেছি, কিন্তু প্রতিমা-গঠনে জগজ্জননীর ভাব কতখানি ফুটাইয়া তুলিতে পারি লক্ষ্য সেদিকে নাই,—লক্ষ্য হইল এই প্রতিমা-অবলম্বনে 'আর্ট' কতখানি ফুটাইতে পারিলাম! ধ্যানে বা সাক্ষাৎ ভাবে মাকে যাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহাদের বর্ণনা মতোই মায়ের মূর্তি গড়িয়া পূজা করার বিধি; মৃত্তিকা, ধাতু, প্রস্তর, কাষ্ঠ প্রভৃতি দিয়া মূর্তি-গড়াই শাস্ত্রানুমোদিত। আজকাল সেই মূর্তি গঠনে নির্দেশ দিতেছেন কোন ক্লাবের বা পাড়ার নব্য যুবক-ঋষিরা, যাঁহারা অতীন্দ্রিয় রাজ্যে জগজ্জননীর দর্শনলাভের চেষ্টাও কখনো করিয়াছেন কিনা সন্দেহ! মনে হয় যেন তাঁহাদের কাছে উৎসবমণ্ডপে মায়ের প্রয়োজন - প্রতিমা দেখিয়া লোকে আর্টের তারিফ কতটা করিল, নূতনত্ব কিছু দেখানো গেল কিনা শুধু এইটুকু; মায়ের মূর্তি দেখিয়া লোকের মনে জগজ্জননীর ভাব কতটা আসিল, তাহা নয়। তাই ধ্যানানুগ মূর্তির পরিবর্তনই শুধু নয়, প্রতিমাও নির্মিত হইতেছে মসুর ডাল, বাঁশের চাঁচ ইত্যাদি দিয়া।

জগজ্জননীর চিন্তা যে কেবল প্রতিমা-গঠনের ভিতরই নাই, তাহা নয় উৎসবের অন্যান্য অনুষ্ঠানেও প্রায় নাই। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত মাইকে বাজিয়া চলিয়াছে হয়ত সিনেমার গান, যাহা মনকে মায়ের নিকট হইতে দূরেই লইয়া যায়। মায়ের নাম, ভজন দু-একখানিও হয় কিনা সন্দেহ। অবশ্য ব্যতিক্রম বহু আছে পারি-বারিক পূজায় তো কথাই নাই, বহু সার্বজনীন পূজাতে প্রতিমা শাস্ত্রানুমোদিত ভাবেই নির্মিত হয়, পূজাও যথারীতি নিখুঁতভাবে করার জন্য কর্মকর্তারা সশ্রদ্ধ সজাগতা রাখেন। তবে অধিকাংশ সার্বজনীন পূজাতেই ইহার একান্ত অভাব।

মানুষের মন যে রঙে রাঙানো যায়, সেই রঙেই রঞ্জিত হয়। মন একটা কিছু অবলম্বন চায় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভাল অবলম্বন পায় না বলিয়াই অন্য কিছুকে অবলম্বন করে। আমাদের মনে হয়, প্রতিটি পূজামণ্ডপে যদি অন্ততঃ সকাল ও সন্ধ্যায় কিছুক্ষণ করিয়া এবং পূজার সময় অন্য গান বন্ধ রাখিয়া মায়ের নাম, ভজন গান করা যায়, তাহা হইলে তাহারই মাধ্যমে সর্বসাধারণের মনকে সহজেই মায়ের চিন্তার দিকে লইয়া যাওয়া যায় অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্য। এই প্রাথমিক পদক্ষেপটি

এমন কিছু কঠিন কাজ নয়, কেবল রুচির প্রশ্ন। প্রতিমাগঠনেও স্বেচ্ছাচারিতা না করাই বাঞ্ছনীয়। আমরা আশা রাখিব, শক্তির উপাসক আমাদের দেশের তরুণদলের দৃষ্টি এদিকে একটু আকৃষ্ট হইবে, এবং তাহারা ইচ্ছা ও চেষ্টা করিলে সহজেই ইহা করা সম্ভব।

মহাশক্তির আরাধনার দিনগুলি যদি সকলের অন্তর হইতে উত্থিত 'মা, মা' ডাকে ভরিয়া উঠে, তাহা হইলে মা প্রসন্না হইয়া শুভবুদ্ধিরূপে, শক্তিরূপে আমাদের সকলেরই অন্তরে জাগিয়া উঠিবেন এবং নিজেদের কল্যাণের জন্য সমাজের, দেশের, সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের জন্য আত্মবলিদানে—স্বার্থবিসর্জনে—আমাদের উদ্বুদ্ধ করিবেন। সেইদিনই হইবে আমাদের মায়ের যথার্থ পূজা।

উদ্বোধনের ৭৫তম শারদীয় অর্ঘ্য

উদ্বোধন পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩০৫ সালের ১লা মাঘ (১৪ই জানুআরি, ১৮৯৯ খৃঃ)। শ্রীভগবানের কৃপায় এবারে সে শারদীয়া মায়ের চরণে তার ৭৫তম অর্ঘ্য নিবেদন করিল।

আমরা জানি, স্বামী বিবেকানন্দের ইচ্ছায় এবং স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের অক্লান্ত পরিশ্রমে পত্রিকাটি আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। ভারতকে জাগাইয়া স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করাইবার জন্য, জগতের অশেষ কল্যাণসাধনের জন্য যে ভাবধারা দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে বিকশিত হয়, তাহারই অন্যতম পরিবেশক এই উদ্বোধন পত্রিকা। স্বামী বিবেকানন্দ সেই ভাব নিজ হৃদয়ে ধারণ করিয়া সারা জগতে ছড়াইয়া গিয়াছেন, নিদ্রিত ভারতকেও জাগাইয়া উন্নতির পথে তাহার চলা শুরু করাইয়া গিয়াছেন। ডক্টর প্রধানের ভাষায় তিনি ছিলেন আধুনিক ভারতের জাতীয়তার জনক—যাঁহার জীবনই জাতীয় ভাবগুলির মূর্ত রূপ। তবে তিনি জানিতেন, তাঁহার অবর্তমানে এই ভাবরাশিকে ক্রিয়াশীল রাখিতে হইলে কতকগুলি জীবনে তাহার বাস্তব রূপায়ণ প্রয়োজন জীবন ছাড়া অপর জীবনে কোন ভাবই যথাযথরূপে সংক্রমিত হইতে পারে না। একথা আমেরিকায় থাকাকালীন তিনি বলিয়াছিলেন, এবং সেজন্য সেখানে থাকাকালীনই বিশেষভাবে কিছুদিন মনোনিবেশ করিয়াছিলেন স্বল্পসংখ্যক কয়েকটি ভক্তের জীবনগঠনের কাজে। সহস্রদ্বীপোদ্যান নামক স্থানে এই কাজটি তিনি করিয়াছিলেন। আর ভারতে একই উদ্দেশ্যে গড়িয়া গিয়াছেন শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘ তাঁহার দিক্‌পাল তুল্য গুরুভ্রাতাগণকে একত্র করিয়া। এ কাজটির সূত্রপাত অবশ্য বরাহনগরের একটি ভাঙা বাড়ীতে, বা বলা যায় কাশীপুর উদ্যানবাটীতেই, স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ কর্তৃক। এই কাশীপুরেই শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার ত্যাগী যুবকভক্তদের স্নেহ-বন্ধনে বাঁধিয়া স্বামীজীকে (তখন নরেন্দ্রনাথ) তাঁহাদের নেতা করিয়া দিয়া যান। ভগিনী-নিবেদিতা লিখিয়াছেন, ভাগ্যবশায় একপ্রাণ এরূপ গুরুভ্রাতাদের পাইয়াছিলেন বলিয়াই স্বামীজীর ভাবরাশির বাস্তবরূপায়ণ সম্ভব হইয়াছিল।

জীবনে ভাবকে মূর্ত করা ছাড়াও ভাবের সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের জন্য স্বামীজী আমেরিকায় থাকিতেই আরো একটি বিষয় অবশ্য-প্রয়োজনীয় মনে করেন, তাহা হইল তাঁহার কথাগুলির পুস্তকাকারে প্রকাশ এবং কয়েকটি পত্রিকা প্রকাশ। আমেরিকায় থাকাকালেই ইংরেজীতে তাঁহার তিনখানি পুস্তক প্রকাশিত হয়—১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুআরি মাসে নিউইয়র্ক হইতে 'কর্মযোগ' এবং জুলাই মাসে ইংলণ্ড হইতে 'রাজযোগ' প্রকাশিত হয় এবং এই বৎসরই মাদ্রাজ হইতে 'ভক্তিযোগ' প্রকাশিত হয়। পাশ্চাত্যে দু-একটি পত্রিকাও প্রকাশিত হইয়াছিল। আমেরিকা হইতেই প্রেরণা দিয়া তিনি মাদ্রাজে ইংরেজীতে 'ব্রহ্মবাদিন্' পত্রিকা প্রকাশিত করান (১৮৯৫, সেপ্টে-

স্বর), তারপর 'প্রবুদ্ধভারত' প্রকাশিত হয়। বাংলা ভাষায় একখানি পত্রিকা প্রকাশের জন্যও বার বার তিনি পত্র লিখিতেছিলেন। পরে, স্বামী ত্রিগুণাতীতের ঐকান্তিক আগ্রহ ও অতন্দ্র পরিশ্রমের ফলে বাংলায় 'উদ্বোধন' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। উদ্বোধন পত্রিকাকে অর্ধেক বাংলা ও অর্ধেক হিন্দী করিবার ইচ্ছা স্বামীজীর ছিল, কিন্তু তাহা সম্ভব নয় বলিয়া সে ইচ্ছা ত্যাগ করেন। একখানি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশেরই ইচ্ছা তাঁহার ছিল, তাহাও সম্ভব হয় নাই।

বত্রিশ পৃষ্ঠার (ডিমাই ⅛ সাইজ) পাক্ষিক পত্রিকারূপে উদ্বোধনের প্রকাশ শুরু হয়। প্রথম বর্ষে চব্বিশটি সংখ্যাই প্রকাশিত হইয়াছিল; দ্বিতীয় বর্ষ হইতে নবম বর্ষ পর্যন্ত বছরে বাইশটি করিয়া সংখ্যা প্রকাশিত হয় চৈত্রমাসের দ্বিতীয়ার্ধের এবং কার্তিক মাসের প্রথমার্ধের সংখ্যা প্রকাশিত হইত না। দশম বর্ষ হইতে উদ্বোধন চৌষট্টি পৃষ্ঠার (পূর্বের সাইজ) মাসিক পত্রিকারূপে প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। ত্রয়স্ত্রিংশত্তম বর্ষ হইতে ইহার সাইজ একটু বড় হয় (রয়্যাল ⅛) এবং পৃষ্ঠাসংখ্যা হয় ছাপ্পান্ন; এখনও তাহাই চলিতেছে।

স্বামী বিবেকানন্দের রচনা বুকে ধরিয়াই উদ্বোধনের যাত্রা শুরু হয়। স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ, স্বামী সারদানন্দ, মাষ্টার মহাশয়, গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতির রচনাও উদ্বোধনকে সমৃদ্ধ করিতে থাকে। স্বামীজীর মূল বাংলা রচনা এবং ইংরেজী রচনা ও বাণীর বঙ্গানুবাদ উদ্বোধনে ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত হইতে থাকে। স্বামী শুদ্ধানন্দ প্রথম হইতেই সহকারী সম্পাদকরূপে উদ্বোধনের কাজে স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দকে বিশেষভাবে সহায়তা করিয়াছেন; সেই সঙ্গে উদ্বোধনে প্রবন্ধাদিও লিখিয়াছেন এবং সর্বোপরি এই সব কাজের মধ্যে থাকিয়াই স্বামীজীর ইংরেজী গ্রন্থগুলির বাংলা অনুবাদ করিয়া কিছু কিছু উদ্বোধন পত্রিকায় ও পরে উদ্বোধন পত্রিকার জন্য স্থাপিত উদ্বোধন কার্যালয় হইতে পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। স্বামীজীর স্থূলদেহে থাকাকালীনই, ১৩০৯ সালের মধ্যেই স্বামীজীর পাঁচখানি ইংরেজী পুস্তকের বঙ্গানুবাদ করিয়া তিনি উদ্বোধন কার্যালয় হইতে পুস্তকাকারে প্রকাশিত করেন। স্বামীজীর যে 'বাণী ও রচনাবলী' আমরা পাইয়াছি, তাহার অধিকাংশই অনুবাদ করিয়াছেন স্বামী শুদ্ধানন্দ। উদ্বোধন পত্রিকার প্রকাশনে স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের মতো স্বামী শুদ্ধানন্দের অবদানও অপরিমেয়।

এই প্রসঙ্গে স্বামী সারদানন্দকেও বিশেষভাবে স্মরণ করিতে হয়। ১৩০৯ সালে (১৯০৩ খৃঃ) স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ আমেরিকা গমন করিবার পর উদ্বোধন পত্রিকার প্রকাশন লইয়া গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। এমনকি পত্রিকাটির প্রকাশন বন্ধ হইবার আশঙ্কাও দেখা যায়। স্বামী ব্রহ্মানন্দের একান্ত ইচ্ছা ও স্বামী সারদানন্দের আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলে এই সঙ্কট কাটিয়া যায়। পূর্বেই দেখিয়াছি, স্বামী শুদ্ধানন্দ পত্রিকাটির সহিত প্রথম হইতেই বিশেষভাবে জড়িত ছিলেন; তাঁহাকেই পত্রিকা-সম্পাদনার ভার দেওয়া হয় এবং তাঁহার সুযোগ্য পরিচালনায় পত্রিকার প্রকাশন সুষ্ঠুভাবে চলিতে থাকে। এই সময় হইতেই স্বামী সারদানন্দ উদ্বোধনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট হইয়া পড়েন এবং তাঁহারই প্রচেষ্টায় নির্মিত নূতন নিজস্ব ভবনে উদ্বোধন-কার্যালয় উঠিয়া আসিবার সময় হইতে পত্রিকা পরিচালনার ভার তিনি পূর্ণভাবে গ্রহণ করেন।

প্রথমে উদ্বোধন পত্রিকার একটি নিজস্ব প্রেস ছিল, 'উদ্বোধন প্রেস'। তাহাতেই পত্রিকা

ছাপা হইত। স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দই প্রেসটি পরিচালনা করিতেন। 'উদ্বোধন প্রেস' হইতে ১৩০৫ সালেই স্বামীজীর রাজযোগের বাংলা অনুবাদ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। চার বছর পর প্রেসটি বিক্রয় করিয়া দেওয়া হয়। এই চার বছরের মধ্যে (১৮৯৮-১৯০২ খৃঃ) এখান হইতে স্বামীজীর ৭ খানি ইংরেজী এবং ঐগুলির মধ্যে ৬ খানির বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়।*

উদ্বোধন কার্যালয় প্রথমে ছিল ১৪ রামচন্দ্র মৈত্র লেন-এ গিরীন্দ্রলাল বসাকের বাটীতে; তাঁহার মৃত্যুর পর ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে ৩০ বোসপাড়া লেন-এ স্থানান্তরিত হয়। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে সেখান হইতে ১২,১৩ গোপালচন্দ্র নিয়োগী লেন-এ নিজস্ব ভবনে (বর্তমান ১ উদ্বোধন লেন) উঠিয়া আসে। সেই সময় হইতে ১৯৭১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এখানেই ছিল। ১৯৭১ খৃষ্টাব্দের ৮ই জুলাই ইহার সন্নিকটস্থ নয়ন কৃষ্ণ সাহা লেন-এ নবনির্মিত ভবনে উদ্বোধন কার্যালয়ের বিক্রয়-বিভাগ, উদ্বোধন পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগ ও পুস্তকাদির ষ্টোর স্থানান্তরিত হইয়াছে; প্রকাশন-বিভাগ পুরাতন বাটীতেই রহিয়া গিয়াছে। উদ্বোধন কার্যালয়ের ঠিকানা অবশ্য এখনো ১নং উদ্বোধন লেনই আছে; কোন পরিবর্তন করা হয় নাই।

উদ্বোধন কার্যালয়ের জন্য এবং শ্রীমায়ের কলিকাতায় থাকার জন্যও একটি নিজস্ব বাড়ীর প্রয়োজন যখন অনিবার্য হইয়া পড়ে, সেই সময় স্বামী সারদানন্দ ১২,১৩ গোপালচন্দ্র নিয়োগী লেনের এই বাটীটি নির্মাণ করেন। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে এখানে উদ্বোধন কার্যালয় উঠিয়া আসে এবং শ্রীশ্রীমায়ের শুভ পদার্পণ ঘটে ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ২৩শে মে। এটি তাই "শ্রীশ্রীমায়ের বাটি" নামেও পরিচিত। স্বামী সারদানন্দ এই বাটীতে শেষ পর্যন্ত থাকিয়া শ্রীশ্রীমায়ের সেবা এবং উদ্বোধন পত্রিকা ও উদ্বোধন কার্যালয় পরিচালনার গুরুভার বহন করিয়া গিয়াছেন।

১৯০৯ খৃষ্টাব্দ হইতেই শ্রীশ্রীমায়ের সহিত এইরূপ নানাভাবে জড়িত হওয়ার মহাসৌভাগ্য উদ্বোধন পত্রিকা লাভ করিয়াছে। শ্রীশ্রীমা যাঁহাকে শ্রীরামকৃষ্ণ সরস্বতী বলিয়া গিয়াছেন, স্থূল-দেহে থাকাকালীন এই পত্রিকাটিকে আশীর্বাদপূত করিয়াছেন এবং এখনো সমভাবে করিতেছেন, ইহাই আমাদের স্থির বিশ্বাস। তাঁহার আশীর্বাদই 'উদ্বোধন'কে সুদীর্ঘ ৭৫ বৎসরের পথ নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়াই অতিক্রম করিতে. এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে দেশে বহু ভাববিপর্যয়ের মধ্যেও রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবরাশি সমভাবে প্রচার করিয়া আসিতে শক্তি দিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও দিবে। তিনিই বুদ্ধিরূপে শক্তিরূপে সকলের হৃদয়ে সংস্থিতা। তিনিই জগন্ময়ী, তিনিই সর্বদেবদেবী-স্বরূপিণী। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহাকে 'জ্যান্ত মা-দুর্গা' বলিয়াছেন। স্বামী সারদানন্দ বলিয়াছেন তাঁহারই পূজা করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ ভারতের কুণ্ডলিনী-শক্তিকে (সকলের অন্তরস্থ শক্তিরূপিণী তাঁহাকেই) জাগ্রতা করিয়াছেন। আজ তাঁহার আশীর্বাদ-প্রসূত উদ্বোধনের ৭৫ তম শারদীয়া সংখ্যাখানি দুর্গা রূপিণী তাঁহারই চরণে নিবেদন করিতে পারিয়া —গঙ্গাজলেই গঙ্গাপূজা করিয়া—আমরা ধন্য হইলাম। আমাদের অহং-বোধ-জনিত বহু দোষত্রুটি ইহার মধ্যে হয়তো রহিয়া গেল, কিন্তু তাহার জন্য ভয় করি না—তিনি নিজমুখেই বলিয়া গিয়াছেন, "মায়ের কাছে ছেলের কোন অপরাধ হয় না।" আমরা বুঝি আর না বুঝি, তাঁহার এই কাজটির জন্য তিনি যে আমাদের তাঁহার যন্ত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছেন, ইহাতেই আমরা ধন্য, কৃতকৃত্য।

---

* রাজযোগ (১৮৯৯ খৃঃ); ভক্তিযোগ কর্মযোগ (১৯০০); Chicago Addresses, Karma Yoga, Bhakti Yoga, Raja Yoga (১৯০১); জ্ঞানযোগ, চিকাগো বক্তৃতা (১৯০১-১৯০২); Letters & Other Lectures, Valuable Conversations with Swami Vivekananda, Jnana Yoga, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য (১৯০২)।

(স্বামী বিবেকানন্দের অপ্রকাশিত মূল পত্র ;
ফটো এবং বঙ্গানুবাদ পরের পৃষ্ঠায়)

[Addressed to Mr. Giridharidas Mangaldas Viharidas Desai
Mukut Nivas, Desai Buildings, Desai Vago
Nadiad, Dt. Kaira.]

228 West 39th Street,
New York, the 2nd March 1896.

Dear friend,

Excuse my delay in replying to your beautiful note.

Your uncle was a great soul, and his whole life was given to do good to his country. Hope you will all follow in his footsteps.

I am coming to India this winter, and connot express my sorrow that I will not see Haridasbhai once more.

He was a strong noble friend, and India has lost a good deal in losing him.

I am going to England very soon where I intend to pass the summer, and in winter next I come to India.

Recommend me to your uncles and friends.

Ever always the wellwisher of your family,

Vivekananda

P. S. My English address is
C/O E. T. Sturdy Esq.,
High View, Caversham,
Reading, England.

Copy got from Sri Manmohandas Bhagavandas Giridharidas Desai, the addresse's grandson.

স্বামী বিবেকানন্দের একখানি অপ্রকাশিত পত্র*

২২৮ ওয়েস্ট ৩৯ স্ট্রীট
নিউইয়র্ক
২রা মার্চ, ১৮৯৬

প্রিয় বন্ধু,

আপনার সুন্দর পত্রখানির উত্তর দিতে দেরী হওয়ার জন্য ক্ষমা করবেন।

আপনার পিতৃব্য মহাত্মা ছিলেন; তাঁর সমগ্র জীবন দেশের কল্যাণে উৎসর্গীকৃত। আশা করি আপনারা সবাই তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করবেন।

এই শীতে ভারতে ফিরছি—হরিদাস ভাইকে আর দেখতে পাব না ভেবে কী যে দুঃখ হচ্ছে, তা প্রকাশ করতে আমি অপরাগ।

তিনি একজন দৃঢ়নিষ্ঠ উন্নতচরিত্র বন্ধু ছিলেন, তাঁকে হারিয়ে ভারতের খুবই ক্ষতি হল।

শিগ্‌গির ইংলণ্ডে যাচ্ছি—গ্রীষ্মকালটা সেখানে কাটাবার ইচ্ছা, আর পরের শীতকালে ভারতে যাবো।

আপনার পিতৃব্য ও বন্ধুদের আমার কথা জানাবেন।

আপনার পরিবারবর্গের চির শুভানুধ্যায়ী,
বিবেকানন্দ

পুনঃ— আমার ইংলণ্ডের ঠিকানাঃ
কেয়ার অব ই. টি. স্টার্ডী এস্কোয়ার,
হাই ভিউ, ক্যাভারশাম,
রীডিং, ইংলণ্ড

---

* গিরিধারীদাস মঙ্গলদাস বিহারীদাস দেশাইকে 'মুক্তিনিবাস, দেশাই বিল্ডিংস্, দেশাই ভাগো, নাড়িয়াদ, জেলা কাইরা'—এই ঠিকানায় ইংরেজীতে লিখিত পত্রের অনুবাদ। বিহারীদাসের পৌত্র মনমোহনদাস ভগবানদাস গিরিধারীদাস দেশাই-এর সৌজন্যে মূল পত্রের ফটোস্টাট প্রাপ্ত।—সঃ

হরিদাস বিহারীদাস দেশাই

শ্রীমৎ স্বামী অখণ্ডানন্দজীর স্মৃতিকথা

স্বামী বীরেশ্বরানন্দ

গঙ্গাধর মহারাজের ছিল বালকস্বভাব। আমরা তাঁর সঙ্গে খেলার সাথীর মতো মিশতাম। মহাপুরুষরা লোকের সঙ্গে ব্যবহারের সময় তাঁদের নিজের ভাবটা অন্যের ভিতর জাগিয়ে তুলতে পারেন। শুকদেব আর ব্যাসদেবের কাহিনীতে এটি বেশ বোঝা যায়।

এক জায়গায় কতকগুলি মেয়ে স্নান করছে। এমন সময় শুকদেব —যিনি পূর্ণ যুবা—একেবারে উলঙ্গ অবস্থায় তাদের সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছেন। তখন মেয়েরা জল থেকে উঠে ওপরে এসে শুকদেবকে দেখার জন্য রাস্তার ধারে দাঁড়াল, কোন সঙ্কোচ বোধ করল না। কিছুক্ষণ পরেই শুকদেবের পিতা ব্যাসদেব সেদিকে আসছেন। দূর থেকে তাঁকে দেখে মেয়েরা খুব লজ্জিত হয়ে কাপড় চোপড় পড়ল। ব্যাসদেব যখন তাদের কাছে এলেন তখন জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা, আমার ছেলে যুবক; তাকে দেখে তোমরা লজ্জিত হলে না, আর আমার মতো এই বৃদ্ধকে দেখে তোমরা এত লজ্জিত হলে কেন?" মেয়েরা বলল, "আপনার পুত্রের দেহ-জ্ঞান নেই, তাই আমাদের মন থেকেও দেহ-জ্ঞান চলে গিয়েছিল। কিন্তু আপনার দেহ-জ্ঞান আছে বলে আমরা এত সঙ্কুচিত হয়েছি।"

শ্রীশ্রীমা যখন জয়রামবাটী থেকে আসছেন তখন একবার ডাকাতের হাতে পড়েন। মা তাকে এমনভাবে 'বাবা' বলে ডাকলেন যে, সেই ডাকাতের মধ্যে পিতৃস্নেহ জাগিয়ে তুললেন। মহাপুরুষরা এইভাবে নিজেদের ভাব অন্যের মধ্যে জাগিয়ে দেন।

গঙ্গাধর মহারাজ একদিন উদ্বোধনে এসেছেন। সবাই তাঁকে ধরে বসল, "মহারাজ, আমাদের রসগোল্লা খাওয়ান।" উনি বললেন, "আমার কাছে টাকা পয়সা কোথায়? তোমাদের কি করে রসগোল্লা খাওয়াব?" তখন একজন তাঁর ট্যাঁকে টাকা আছে দেখে সেখানে হাত দিয়েছে। তাতে উনি সেই ছেলেটিকে টেনে নিয়ে পাশের ঘরে শরৎ মহারাজের সামনে গিয়ে বললেন, "দেখ দেখি, কি রকম ছেলে তৈরি করেছ—ওরা জোর-জবরদস্তি করে আমার কাছে রসগোল্লা খেতে চায়!" শরৎ মহারাজ উত্তরে বললেন, "ওরা যখন খেতে চাচ্ছে, বেশ তো, ওদের খাওয়াও না!" তখন গঙ্গাধর মহারাজ বললেন, "বাঃ! তুমিও দেখছি ওদের কথায় সায় দিলে!" আসলে তিনি খাওয়াবার জন্যই টাকা নিয়ে এসেছিলেন। শুধু আমাদের সঙ্গে একটু রগড় করার জন্য ওরকম করছিলেন। আমরা তাঁর সঙ্গে এভাবে আচরণ করায় তিনি বেশ আনন্দ পেয়েছিলেন।

স্বামীজীর প্রতি তাঁর কি রকম শ্রদ্ধাভক্তি ছিল তার উদাহরণস্বরূপ দু-একটি ঘটনা বলছি। আমি তখন অদ্বৈত আশ্রমে থাকি। গঙ্গাধর মহারাজ কলকাতার পুঁটিয়ার রানীর বাড়ীতে ছিলেন; তাঁর নাতিরা শরৎ মহারাজের শিষ্য। সেই সময় একদিন জনৈক ভক্ত, যিনি অদ্বৈত আশ্রমে দু-এক দিন ছিলেন, খাবার সময় সাধুদের মিষ্টি (রসগোল্লা) ও ডাব খাইয়েছিলেন—সামান্য খরচ করে। আমাদের খাওয়ার পরেই উদ্বোধন থেকে একজন সাধু অদ্বৈত আশ্রমে গিয়ে হাজির। তিনিও মিষ্টি এবং ডাব খেলেন। পরে তিনি গঙ্গাধর মহারাজকে

বলেছেন, "মহারাজ! আজ অদ্বৈত আশ্রমে প্রকাণ্ড ভাণ্ডারা হয়ে গেল। রসগোল্লার গড়াগড়ি, আর ভাবের তো কথাই নেই।" এইটি বলে বললেন, "মহারাজ! আপনি এখানে থাকতে অদ্বৈত আশ্রমে এত বড় ভাণ্ডারা হ'ল, আর আপনাকে নিমন্ত্রণ করল না?" শুনে বালকের মতো উনিও বললেন, "তাই তো, আমি এখানে আছি, প্রভু আমাকে নেমন্তন্ন করল না? দাঁড়াও, ও আসুক!" সাধুটি ফিরে এসে আমাকে বললেন, "তোমার বিরুদ্ধে মহারাজের কাছে খুব লাগিয়েছি। এবার গেলে দেখবে মজা।"

কিছুদিন বাদে আমি গঙ্গাধর মহারাজের কাছে গেছি। আমি প্রণাম করে বসতেই পুঁটিয়ার রানীর নাতিরা এবং দু-একজন সাধু যাঁরা সেখানে ছিলেন (তার মধ্যে যিনি আমার বিরুদ্ধে লাগিয়েছিলেন, তিনিও ছিলেন), সবাই সেখানে বসলেন, কি হয় দেখবার জন্য।

গঙ্গাধর মহারাজ গম্ভীর হয়ে বসে রইলেন, কোন কথাই বললেন না। আমিও চুপ করে বসে রইলাম।

কিছুক্ষণ পর উনি গম্ভীরভাবে তর্জনী নেড়ে আমাকে বললেন, "তোমার বিরুদ্ধে আমার কিছু বলবার আছে!"

আমি। আমারও আপনার বিরুদ্ধে কিছু বলবার আছে।

গঙ্গাধর মহারাজ। তোমার কি বলবার আছে আমার বিরুদ্ধে?

আমি। আপনার কি বলবার আছে, আগে বলুন। আপনার চার্জ-শীট দেখে তারপর আমার যা বলবার আছে বলব।

তখন উনি ছেলেমানুষের মতো বললেন, "জজ ঠিক কর তাহলে।"

আমি। আপনিই জজ হবেন।

গঙ্গাধর মহারাজ। আমি তোমায় accuse (আসামী) করে নিজেই জজ হব?

আমি। আপনার ওপরই আমার বিশ্বাস আছে, এদের কারো ওপর নেই।

গঙ্গাধর মহারাজ। আচ্ছা, তাই হবে।

তারপর বললেন, "তোমার ওখানে অতবড় ভাণ্ডারা হয়ে গেল, আর আমি এখানে আছি—আমাকে বললে না তুমি!" তখন আমি বললাম, "সেরকম ভাণ্ডারা কিছু হয়নি, মহারাজ!" তারপর আসল ব্যাপারটা সব খুলে বললাম। শেষে বললাম, "এই সাধুটি আপনার কাছে এসে শুধু শুধু এটা লাগিয়েছে; আর আপনিও কি হয়েছে আমাকে তা না জিজ্ঞেস করে আমার বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। স্বামীজী বলেছেন, 'যদি কেউ দোষ করে থাকে, তাকে ডেকে বলবে; অপরের কাছে কিছু বলবে না।' আপনি কিন্তু এর অন্যরকম করলেন।" যেই স্বামীজীর কথা বলা, তক্ষুণি উনি বললেন, "তুমি ঠিক বলেছ। আমার ভুল হয়েছে।"

এই কথা বলেই, যে সাধুটি লাগিয়েছিলেন তাকে দেখিয়ে বললেন, "এই ব্যাটাই যত গোলমাল করেছে।" তখন সবাই হাসতে আরম্ভ করল।

এর ভেতর দুটো জিনিস দেখবার আছে। একটি হ'ল, স্বামীজীর প্রতি কি রকম শ্রদ্ধা-ভক্তি! অন্যটি হ'ল, তাঁর মহাপুরুষের লক্ষণ—আমার মতো লোকের কাছে তাঁর ভুল স্বীকার করা। আমরা হলে তো এভাবে স্বীকার করতাম না।

আমি তখন বললাম, "মহারাজ, আমি মোকদ্দমায় জিতেছি। এর পর এখন আপনার কাছে damages (ক্ষতিপূরণ) আদায় করব।"

গঙ্গাধর মহারাজ। বেশ, কি চাও বল।

আমি। আপনাকে একদিন অদ্বৈত আশ্রমে যেতে হবে। ওখানে দুপুর বেলা খাবেন, বিশ্রাম করবেন, বিকেল চারটেয় চা খেয়ে সন্ধ্যার আগে

ফিরে আসবেন।

গঙ্গাধর মহারাজ। বেশ তাই হবে।

পরে একদিন সকালে গিয়ে থাকলেন। কিন্তু দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পরই বললেন, "এবার যাব।" তখন গরমের দিন। এখনকার মতো তখন ট্যাক্সি ছিল না। ঘোড়ার গাড়ীতে তাঁকে যেতে হতো—ওয়েলিংটন লেন থেকে শ্যামবাজার পর্যন্ত। সেই রোদে এভাবে যেতে ওঁর কষ্ট হবে দেখে আমি বললাম, "কথা ছিল, বিকেল চারটের সময় চা খেয়ে সন্ধ্যার দিকে আপনি যাবেন। এখন তো যাওয়া হবে না!" গঙ্গাধর মহারাজ বললেন, "না, না, এক্ষুণি যাব।" তখন ওঁকে আটকাবার জন্য আমি অগত্যা বললাম, "আপনি থাকুন, তাহলে আপনাকে একটা নতুন জিনিস খাওয়াব, যা আপনি কোনদিন খাননি।"

গঙ্গাধর মহারাজ। তুমি আর আমাকে নতুন জিনিস কি খাওয়াবে? আমি কত রাজাদের বাড়ীতে, ধনীদের বাড়ীতে ছিলাম, আমি কত দেশ ঘুরেছি, কত রকমের জিনিস খেয়েছি। তুমি আমাকে নতুন জিনিস কি খাওয়াবে?

আমি। আপনি যাই বলুন, আমি যে জিনিস আপনাকে খাওয়াব বললাম, সে জিনিস আপনি কোনদিন খাননি।

গঙ্গাধর মহারাজ। আচ্ছা, দেখি তুমি কি খাওয়াও। তাহলে রইলাম।

আমি আশ্বস্ত হলাম—যে ভাবেই হোক, এই গরমের মধ্যে তাঁর যাওয়াটা তো বন্ধ করা গেল।

চারটে বাজতেই আমাকে ডেকে বললেন, "কই কি নতুন জিনিস খাওয়াবে বলেছিলে, নিয়ে এস।"

উনি শোবার পরই আমি কফি তৈরি করে বরফে রেখে দিয়েছিলাম, ঠাণ্ডা করবার জন্য। সে সময় কলকাতায় কফি-হাউসও ছিল না, আর রেফ্রিজারেটারও ছিল না। আমি সেই ঠাণ্ডা কফি গ্লাস ভরতি করে ওঁকে দিলাম। উনি খেয়ে খুব খুশী হলেন। বললেন, "সত্যিই, এমন জিনিস কখনো খাইনি।"

আর একটি ঘটনা। সারগাছি থেকে কলকাতায় এসে গঙ্গাধর মহারাজ একবার এক ভক্তের বাড়ীতে রয়েছেন। তাঁরা খুব ভাল ভাল আসবাবপত্র দিয়ে সাজানো একটি ঘরে খুব যত্নের সঙ্গে ওঁর থাকবার ব্যবস্থা করেছিলেন। আমরা সেখানে ওঁর কাছে গেছি। উনি ছেলেমানুষের মতো বললেন, "দেখ, এরা আমাকে কত যত্নে রেখেছে! তোমরা মঠে আমাকে এরকম রাখতে পারবে?"

আমি বললাম, "এই বাড়ীর সঙ্গে মঠের তুলনা হয়? এটা একটা বড়লোকের বাড়ী, আর মঠ হল ফকিরের জায়গা। ওখানে আমরা আপনাকে এরকম রাখব কি করে? তবে এর মধ্যে একটা কথা আছে—মঠ হ'ল স্বামীজীর বাড়ী, স্বামীজী সেখানে থাকতেন।"

এই কথা বলতেই উনি বলে উঠলেন, "ঠিক বলেছ তুমি! কাল সকালেই মঠে যাব।" এবং সেই ভক্তকে ডেকে বললেন, "কাল সকালে মঠে যাবার ব্যবস্থা কর।"

ভক্তটি ও আমরা সবাই অবাক! ভক্ত খুব অনুরোধ করতে লাগল আরও দু-একদিন থেকে যেতে; আমরাও তাতে যোগ দিলাম; কিন্তু তিনি কোন কথা শুনলেন না, পরদিন সকালে মঠে চলে গেলেন।

বাংলা ও সংস্কৃত ভাষার ওপর গঙ্গাধর মহারাজের খুব টান ছিল। বাংলার মাঝে মাঝে ইংরেজী বলা পছন্দ করতেন না। অদ্বৈত আশ্রম (প্রকাশন বিভাগ) তখন কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের উপর তলায় একটি ঘরে ছিল। উনি সেখানে এসে বললেন, "চল, খাদিভাণ্ডার দেখতে যাব।" খাদিভাণ্ডার তখন অ্যালবার্ট হল-এর নীচের তলায়

একটি ঘরে ছিল। গেলাম তাঁর সঙ্গে। সব ঘুরে ঘুরে দেখলেন। স্যর পি. সি. রায়-ও তখন সেখানে এসে হাজির। তিনি তখন কংগ্রেসের তরফ থেকে খাদির প্রচার করছিলেন। ডঃ পি. সি. রায় খাদি-প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের সঙ্গে কথা বলবার সময় মাঝে মাঝে ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করছিলেন। গঙ্গাধর মহারাজ খাদিপ্রতিষ্ঠানের জিনিসগুলি দেখার সময় ডঃ রায়ের কথাও শুনছিলেন। কিছুক্ষণ এভাবে শোনার পর ডঃ রায়কে খুব বিনীতভাবে বললেন, "রায় মশায়, আপনার ভাষাটাকেও একটু খদ্দর করে ফেলুন!" ডঃ রায় একথা শুনে বিরক্ত না হয়ে খুব বিনয়ের সঙ্গে বললেন, "স্বামীজী, আপনি যা বলছেন তা ঠিকই। আমাদের কিন্তু ছেলেদের ইংরেজীতে পড়িয়ে পড়িয়ে মাঝে মাঝে ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করার এই অভ্যাসটি হয়ে গেছে।"

গঙ্গাধর মহারাজ আমাদের সঙ্গে বালকের মতো মিশতেন বলেই আমরা তাঁর সঙ্গে খেলার সাথীর মতো ব্যবহার করতে পারতাম। জলে চাঁদের প্রতিবিম্ব যখন পড়ে, তখন মাছেরা সেই চাঁদের প্রতিবিম্বের সঙ্গে খেলা করে, আর মনে করে, চাঁদও ওদের মধ্যে একজন। তারা জানে না চাঁদের বাস্তবিক স্থান কোথায়।*

---

* মার্চ, ১৯৭২-তে সারগাছি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে প্রদত্ত ভাষণের অনুলিখন।—সঃ

সৎ-চিৎ-আনন্দঘন

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

সৎ-চিৎ-আনন্দঘন হে ভুবনেশ্বর,
আছো তুমি, তুমি ছিলে। ব্রহ্মাণ্ড নশ্বর
প্রলয়-পয়োধি-জলে ডুবিবে যখন—
তখন তুমিই জেগে রবে চিরন্তন
অনাদি, অনন্ত ব্রহ্ম। সমস্ত-কিছুরে
আবৃত করিয়া তুমি নিকটে ও দূরে
বিরাজিছ সর্বব্যাপী। বস্তু-প্রবাহের
চলোর্মি-চূড়ায় তব চরণ-চিহ্নের
স্বাক্ষর, হে ক্ষর ব্রহ্ম। হয়েছো সকলই!
সূর্য হ'তে ক্ষুদ্র বন-মল্লিকার কলি—
চিদ্‌ঘন, সমস্ত তব নখের দর্পণে!
উথলে আনন্দাম্বুধি চিত্তে ক্ষণে ক্ষণে
স'পিলে তোমারে প্রাণ! আমি ভগ্ননীড়
তোমাতে আশ্রয় খুঁজি চিরপ্রশান্তির।

একাকিনী মা

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

দৈত্যরাজ শুম্ভ-নিশুম্ভের দূত সুগ্রীব রাজ-ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রস্তাব দেবী অম্বিকার নিকট অতি বিনয়ের সহিত পেশ করিয়াও যে উত্তর শুনিল তাহাতে তাহার বিস্ময়ের অবধি নাই। দেবীর রূপের ছটায় দিগ্-দিগন্ত আলোকিত। পর্বতের চূড়ায় সাজিয়া গুজিয়া বসিয়া আছেন; বাহিরে ভীষণ গম্ভীর, কিন্তু মনে মনে হাসির লহর বহিয়া যাইতেছে। "তুমি তো খুব উত্তম প্রস্তাবই লইয়া আসিয়াছ। তোমার প্রভুদের মতো পতি পাওয়া তো সকল যুবতীরই একান্ত কাম্য। তবে আমি মূর্খ নারী—বোকামি করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়াছি আমাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া যদি কেহ আমার দর্প হরণ করিতে পারেন তবে তিনিই আমার স্বামী হইবেন। তোমার প্রভুদের এই কথাটি গিয়া বল।"

নারী যত নির্বোধই হোন নিজের ভবিষ্যৎ সুখসমৃদ্ধি স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তা সম্বন্ধে যে এতটা খেয়ালহীন হইতে পারেন তাহা দূত সুগ্রীবের বুদ্ধির অগম্য। যাহা হউক, ভাঙ্গা গলায় সে আর একবার শেষ যুক্তি উপস্থাপিত করিল। "দেবি, ইন্দ্রাদি সমস্ত দেবতা যাঁহাদের বলে অবনমিত এবং ভয়ে সর্বদা কম্পিত, সেই মহাবল দৈত্য ভ্রাতৃদ্বয়ের সহিত আপনি যুদ্ধ করিবেন, এ কি অসম্ভব কথা আপনি বলিতেছেন? একে আপনি স্ত্রীলোক—তাহার পর নিঃসহায়া—একাকিনী।"

একাকিনী! শুনিয়া দেবী অম্বিকা মনে মনে যে কত হাসিয়াছিলেন তাহা দেবীর চরিত্র যুগে যুগে যাঁহারা অনুশীলন করিয়া পারমার্থিক জ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন তাঁহাদের অবিদিত নয়। কিন্তু তিনি এখন রঙ্গমঞ্চে নামিয়াছেন, ভূমিকাটি নিখুঁতভাবে অভিনয় তো করা চাই। অতএব বাহিরে হাসিতে পারিলেন না। গম্ভীর মুখেই জানাইলেন—"তা কি করিব বাপু। প্রতিজ্ঞার খেলাপ করিতে পারি না। তুমি ভাল মানুষ। ভাল কথাই বলিতে আসিয়াছিলে। যাহোক যাহা বলিলাম ফিরিয়া গিয়া দৈত্যরাজ শুম্ভকে জানাও। তিনি যাহা ভাল বুঝেন করুন। আমার কপালে যাহা ঘটিবার ঘটুক।"

এইখানে অভিনেত্রী হাতের কঙ্কণগুলি একটু নাড়িয়া, কেশপাশ একটু সুবিন্যস্ত করিয়া দূতের দিকে একবার প্রসন্ন দৃষ্টিতে তাকাইয়াছিলেন কি? দূত বেচারীর কি দোষ? যাঁহার কলাকৌশলের একটি সামান্য ঝটকায় ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর নাকানি-চোবানি খাইতে পারেন তাঁহার বাক্য এবং ক্রিয়াকলাপের মর্মোদ্ঘাটন করা কি সুগ্রীব গোঁসাই-এর কর্ম? সে সরল মনে আসিয়াছিল, সরল মনেই দেবীর বার্তা বহন করিয়া প্রভুর নিকট পৌছাইয়া দিয়াছিল। দেবীর সংহারমূর্তি তাহাকে দেখিতে হয় নাই। চণ্ডীগ্রন্থে পাই যে, দেবীর শস্ত্রাঘাতে মৃত্যু হইলে স্বর্গে গতি হয়। যে-সকল অসুর দেবীর হাতে নিহত হইয়াছিল তাহারা নিশ্চিতই পরম ভাগ্যবান। শত্রুরূপে দেবীর সহিত যুদ্ধ করিলে যদি স্বর্গফল লাভ হয় তাহা হইলে দেবীর স্মিতগম্ভীর মূর্তির সম্মুখীন হইয়া সশ্রদ্ধ এবং বিনীত ভাবে তাঁহার সহিত কিছুক্ষণ কথাবার্তা যে করিতে পারিয়াছে তাহার স্বর্গাপেক্ষাও উত্তম গতি যে লাভ হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। সুগ্রীবের দৈত্য-গিরি জাগতিক দিক দিয়া নিষ্ফল হইলেও পর-

মার্থের দিক দিয়া অত্যন্ত সফল, ইহা আমরা অনুমান করিতে পারি।

সুগ্রীব কি করিয়া জানিবে হিমালয়ের গহন অরণ্যানী ও পর্বতশৃঙ্গ আলো করিয়া যে লাবণ্যময়ীকে সে দেখিয়াছিল তিনি সর্বকারণময়ী, আবার সর্বকারণাতীতা মহামোহা মহামায়া। সৃষ্টিতে তিনি সৃষ্টিরূপা, সৃষ্টির পরিপালনে স্থিতিরূপা এবং প্রলয়ে সর্বসংহাররূপা। একাকিনীত্বই তাঁহার গৌরব

যদা নৈব ধাতা ন বিষ্ণুর্ন রুদ্রো
ন কালো ন বা পঞ্চভূতানিলাশাঃ
তদা কারণীভূতসত্ত্বৈকমূর্তি-
স্ত্বমেকা পরব্রহ্মরূপেণ সিদ্ধা॥

"যখন ব্রহ্মা নাই, বিষ্ণু নাই, রুদ্রও নাই দেশ কাল পঞ্চভূত নাই, তখন সর্বকারণীভূত সত্ত্বমাত্র মূর্তিতে একাকিনী তুমি কিন্তু মা পরব্রহ্মরূপে সিদ্ধা রহিয়াছ।" (মহাকালীস্তোত্র)

চণ্ডীর প্রথম চরিত্রে আমরা পড়ি, কল্পশেষে বিষ্ণু অনন্তশয্যা আশ্রয় করিয়া নিদ্রিত। যোগনিদ্রারূপিণী মা কিন্তু বিষ্ণুকে ঘুম পাড়াইয়া জাগিয়া রহিয়াছেন। বিপদে পড়িয়া ব্রহ্মা তাঁহাকে স্তব করিতেছেন, মা, তুমি নারায়ণের ঘুম না ভাঙ্গাইলে, তাঁহার বুদ্ধিকে সক্রিয় না করিলে মধুকৈটভ সর্বনাশ উপস্থিত করিবে। ভক্ত বিপত্তারিণী কি সাড়া না দিয়া পারেন ?

নেত্রাস্যনাসিকাবাহু-হৃদয়েভ্যস্তথোরসঃ।
নির্গম্য দর্শনে তস্থৌ ব্রহ্মণোঽব্যক্তজন্মনঃ॥

"বিষ্ণুর চোখ, মুখ, নাক, বাহু, হৃদয় এবং বক্ষোদেশ হইতে বাহির হইয়া অব্যক্তজন্মা ব্রহ্মার দর্শনগোচর হইলেন।" (চণ্ডী-১।৯০)

সকলে সব বোঝা নামাইয়া বিশ্রাম লইতে পারে, কিন্তু মহামায়ার বোঝা বহিবার অপর কেহ নাই। তিনি একান্তই একাকিনী। তিনি পিছনে না থাকিলে বিষ্ণুর সুদর্শন চক্র ঘুরে না। ইন্দ্রের বজ্র শক্তিহীন হইয়া যায়। শিবের কালকূট বিষ পান করিবার সামর্থ্যও থাকে না।

করালং যৎ ক্ষ্বেড়ং কবলিতবতঃ কালকলনা
ন শম্ভোস্তন্মূলং জননি তব তাড়ঙ্কমহিমা॥
(শঙ্করাচার্য—আনন্দলহরী)

"জননি, শম্ভু যে করাল বিষ পান করিয়া গৌরব লাভ করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার বাহাদুরী কিছু নাই উহা তোমারই হাতের বালার মহিমা।" মা যদি শিবকে ছাড়িয়া যান তাহা হইলে তাঁহাকে জ্ঞানবুদ্ধিহারা হইয়া পাগলের ন্যায় পাহাড়ে পর্বতে খানাখন্দে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে অনন্তকাল।

একাকিনী বলিয়াই মহামায়া অনন্তশক্তিমতী। নির্গুণা বলিয়াই তিনি অশেষ গুণময়ী। নিরাকারা বলিয়া তাঁহার অসংখ্য মূর্তি, বাক্যমনাতীতা বলিয়াই তাঁহার শতসহস্র নাম ও কল্পনা। উপনিষদের ঋষিরা ধ্যানযোগ দ্বারা মায়ের পরিচয় পাইয়াছিলেন :

তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্
দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্।
যঃ কারণানি নিখিলানি তানি
কালাত্মযুক্তান্যধিতিষ্ঠত্যেকঃ॥

"সৃষ্টিপ্রবাহের নানা কারণপরম্পরা আছে, যথা কাল, আত্মা প্রভৃতি। কিন্তু সকল কারণপরম্পরা যে এক সত্যে অধিষ্ঠিত সেই সত্যের সহিত অভিন্ন মহাশক্তিকে ধ্যানযোগের অনুশীলন দ্বারা ঋষিগণ দেখিতে পাইয়াছিলেন। ত্রিগুণের অভিব্যক্তিদ্বারা দৃষ্টি যখন আচ্ছন্ন তখন তাঁহাকে দেখা যায় না।" (শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ ১।৩)

সুগ্রীবের দৃষ্টি লৌকিক জ্ঞান দ্বারা আচ্ছন্ন ছিল, সে কি করিয়া মায়ের পরিচয় পাইবে ? আমরাও সকলে সুগ্রীবের দলের লোক। আমরা মায়ের বেশভূষা অস্ত্রশস্ত্র দেখিয়া মুগ্ধ, তাঁহার দৈত্যদলন, সঙ্কটমোচন প্রভৃতি শুনিয়া স্তম্ভিত. কিন্তু মাকে চিনিতে পারা আমাদের পক্ষে সুকঠিন। আমরা

মায়ের পূজা করি, তাঁহার উৎসবে মাতিয়া যাই, তাঁহার নানা মূর্তি গড়ি, তাঁহার উদ্দেশে কত স্তবস্তুতি পাঠ করি, কিন্তু মা "স্বগুণৈর্নিগূঢ়া" রহিয়া যান।

মাকে জানবার উপায় সরলতা পবিত্রতা ব্যাকুলতা অন্তর্মুখীনতা। পুতুলখেলা লইয়া ভুলিয়া থাকিলে মা ভাবেন খেলছে খেলুক,এখনই কোলে নিবার প্রয়োজন নাই। সুরথ রাজা ও বৈশ্য সমাধি একত্রে জিজ্ঞাসা ও তপস্যা আরম্ভ করিলেন। মা উভয়কেই দেখা দিলেন কিন্তু সুরথ রাজার পুতুলখেলার ইচ্ছা সম্পূর্ণ মিটে নাই বলিয়া তাঁহাকে নূতন পুতুল দিলেন; বৈশ্যবরের ভোগবাসনা নিঃশেষ হইয়াছিল বলিয়া তাঁকে বর দিলেন—"তব জ্ঞানং ভবিষ্যতি" তোমার তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইবে- আমার অলঙ্কার অস্ত্র শস্ত্র নানা মূর্তি নানা অদ্ভুত বিভূতির ঊর্ধ্বে যে সর্বভেদরহিত সর্বসম্বন্ধস্খলিত একাকিত্ব রহিয়াছে তাহা জানিয়া তুমি ধন্য হইবে

বেদের ঋষিরা জানিয়াছিলেন, যুগে যুগে পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে আরও কত সাধু সন্ত যোগী তপস্বী ভক্ত নরনারী সেই একাকিনীকে জানিয়াছেন, জানিতেছেন যদিও তিনি স্বগুণৈর্নিগূঢ়া তথাপি ভক্তের ব্যাকুল আগ্রহকে তিনি উপেক্ষা করিতে পারেন না।

কমলাকান্তের মনে আশা পূর্ণ এতদিনে।
সুখ দুঃখ সমান হল, আনন্দসাগর উথলে॥

শ্যামাপদনীলকমলে মন মজিয়াছিল; ধীরে ধীরে বিষয়সুখ তুচ্ছ হইল, যে দেওয়াল মাকে ঢাকিয়া রাখিয়াছিল তাহা ভাঙ্গিয়া পড়িল, অবশেষে সংসারের যাবতীয় দ্বন্দ্বজ্ঞান দূর হইয়া মায়ের অদ্বিতীয় স্বরূপের উপলব্ধি। সর্বপ্রসারী আনন্দসাগরের উদ্বেল বন্যা।

কমলাকান্ত মায়ের স্বরূপকে 'আনন্দ' বলিয়া আভাস দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তৈত্তিরীয় উপনিষদের সত্যদ্রষ্টা ঋষি ভাষা খুঁজিয়া পান নাই। অন্তরের অন্তরে সত্যময়ীর সর্বাবগাহী একাকিত্বের উপলব্ধিতে হৃদয় যখন পূর্ণ তখন মুখ দিয়া অস্ফুট শব্দ শুধু বাহির হইয়া আসিয়াছিল হা-বু হা বু। রামপ্রসাদ গাহিয়াছিলেন,

প্রসাদ বলে মাতৃভাবে আমি তত্ত্ব করি যাঁরে।
সেটা চাতরে কি ভাঙবো হাঁড়ি, বোঝ নারে
মন ঠারে ঠোরে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব জগদম্বার প্রথম দর্শন এইরূপে বর্ণনা করিয়াছিলেন:

"ঘর দ্বার, মন্দির সব যেন কোথায় লুপ্ত হইল—কোথাও যেন আর কিছুই নাই!—আর দেখিতেছি কি এক অসীম অনন্ত চেতন জ্যোতিঃ-সমুদ্র!—যেদিকে যতদূর দেখি, চারিদিক হইতে তার উজ্জ্বল ঊর্মিমালা তর্জন-গর্জন করিয়া গ্রাস করিবার জন্য মহাবেগে অগ্রসর হইতেছে! দেখিতে দেখিতে উহারা আমার উপর নিপতিত হইল এবং আমাকে এককালে কোথায় তলাইয়া দিল! হাঁপাইয়া হাবুডুবু খাইয়া সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়া গেলাম।" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ,— সাধকভাব পৃঃ ১১৪) একাকিনী মা "অসীম অনন্ত চেতন জ্যোতিঃ-সমুদ্র।

অসুররাজ শুম্ভ যখন যুদ্ধক্ষেত্রে ব্রহ্মাণী, ইন্দ্রাণী প্রভৃতি নানা দেবশক্তি দ্বারা বিপর্যস্ত তখন সে সংগ্রাম-নায়িকা জগন্মাতার সহিত বাক্যযুদ্ধ আরম্ভ করিয়া বলিল, '"হে বলগর্বিতা দুর্গে. তুমি অপরের বলের সাহায্য লইয়া যুদ্ধ করিতেছ, ইহাতে তোমার কৃতিত্ব কি?" মায়ের উত্তর:

একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা।
পশ্যৈতা দুষ্ট ময্যেব বিশন্ত্যো মদ্বিভূতয়ঃ॥

"রে দুষ্ট! এই জগতে একা আমিই বিদ্যমান। আমা ছাড়া দ্বিতীয় আর কে আছে? বাহিরে এই যে নানা শক্তি দেখিতেছিস্, সে সব আমারই বিভূতি। এই দেখ্, উহাদিগকে ভিতরে টানিয়া লইতেছি।" (চণ্ডী—১০।৩-৫)

ঋষি বলিতেছেন, তখন ব্রহ্মাণী প্রমুখ দেবীরা জগদম্বিকার শরীরের মধ্যে বিলীন হইলেন। একৈবাসীত্তদাম্বিকা—"মা অম্বিকা তখন হইলেন একাকিনী।"

মা কিন্তু জানেন তিনি সর্বকালেই একাকিনী। মায়ের তত্ত্বদর্শী ভক্তেরাও জানেন, মা ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান—সর্বকালে, সৃষ্টি-স্থিতি-লয়—সর্বাবস্থায় একাকিনী।

"অনন্ত রাধার মায়া কহনে না যায়।
কোটী কৃষ্ণ, কোটী রাম হয় রয় যায়॥"

রাম ও কৃষ্ণ শৌর্য বীর্য দেখাইয়া রাক্ষসদমন-রাজ্যপালন করিয়া, বাঁশী বাজাইয়া গোবর্ধনগিরি তুলিয়া ধরিয়া, রথ চালাইয়া ধর্ম সংস্থাপন করিয়া অবতারমহিমা খ্যাপন করিতেছেন। জননী সীতা একাকিনী অশোকবনে 'হা রাম হা রাম' বলিয়া কাঁদিতেছেন। আদ্যাশক্তি রাধারাণী যমুনার তীরে তমাল গাছের তলায় দাঁড়াইয়া 'হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ' বলিয়া চোখের জল ফেলিতেছেন। আমরা যদি জননীর ব্যথায় দুঃখ প্রকাশ করি তো তাঁহারা হাসিয়া উঠিবেন। বলিবেন, বাবা-বাছারা, আমাদের এই চোখের জলের শক্তিতেই তো অবতার-লীলা সংঘটিত হয়। একাকিত্বের তপস্যা ব্যতীত তো বহুর সার্থকতা সম্ভবপর নয়।

আমরা বলি, "মা, একা একা এই ছোট কুঠরিটির মধ্যে বসে আপনি এত কাজ করছেন, একটু সাহায্য কোরব কি? ময়দা মেখে দেব কি? আনাজ কেটে দেব কি? মা, সময়ে অসময়ে এত ভক্তের এত আত্মীয়ের এত ঝক্কি আপনি বহন করছেন, আমরা আপনার ঘর উঠান ঝাঁট দিয়ে দেব, এত লোকের এঁটো বাসন মেজে দেব, তাতে আপনার একটু সহায়তা হবে।"

মা হাসিয়া উত্তর দেন, "না, বাবা, থাক্। আমি তো রসগোল্লা খেতে আসিনি। একা সব কাজ করাই আমার অনন্ত কালের রীতি। আমি যে চির-একাকিনী।"

"যিনিই সগুণ ব্রহ্ম, তিনিই নির্গুণ ব্রহ্ম, যিনিই শক্তি, তিনিই ব্রহ্ম। পূর্ণ জ্ঞানের পর অভেদ।"
"যিনিই ব্রহ্ম, তিনিই শক্তি, তিনিই মা।"

—শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীশ্রীমা

স্বামী গম্ভীরানন্দ

শ্রীশ্রীমায়ের সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করি সাধারণতঃ তিনটি দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে—তিনি দেবী, তিনি মাতা, তিনি জ্ঞানময়ী, জ্ঞানদায়িনী। ভারতবর্ষ অতি প্রাচীনকাল থেকেই মায়েদের সম্মান দেখিয়ে আসছে; শুধু মানুষের মধ্যে নয় সর্বজীবের ভেতর সে মাতৃদর্শন করেছে, সম্মান জানিয়েছে সকলকেই। মন্দিরে মন্দিরে আমরা ভক্তিভরে কত দেবীর উপাসনা করি, পূজা করি। কত নারী জ্ঞান-মহিমা প্রকাশ করেছেন; তাঁদেরও সম্মান দেখাই। বৈদিক যুগে অম্ভৃণ ঋষির কন্যা বাক্ দেবীসূক্ত উচ্চারণ করেছেন—যা এখনো বহু কণ্ঠে সশ্রদ্ধ হৃদয়ে নিত্য ধ্বনিত হচ্ছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে মৈত্রেয়ী বলেছেন:

'যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম্।'

—যার দ্বারা আমি অমৃতত্ব লাভ করতে পারব না, তা নিয়ে আমার কি হবে? এসব নারীর দৃষ্টি সদা-নিবদ্ধ ভগবানের প্রতি—যাঁকে অবলম্বন করলে জীবন সার্থক হয়, বাদ দিলে জীবন বৃথা যায়। মধ্যযুগেও আমরা এরূপ বহু নারীকে দেখতে পাই—অহল্যা, মীরাবাই প্রভৃতিকে।

এই ধারাই আবার দেখি পরিপূর্তি লাভ করেছে দক্ষিণেশ্বরে—সেখানে মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন রাণী রাসমণি। সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণের গুরুরূপে এসেছেন ভৈরবী ব্রাহ্মণী। সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণ নিজ সহধর্মিণীকে, আমাদের শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীকে ষোড়শীজ্ঞানে ফলহারিণী কালীপূজার রাত্রে আনুষ্ঠানিকভাবে পূজা করেছেন—জগন্মাতারূপে তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, উদ্বোধিত করেছেন তাঁর অন্তরস্থ শক্তিকে, স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন শ্রীশ্রীমাকে। শ্রীশ্রীমা যে দেবী, ঠাকুর তার পরিচয় দিয়ে গেছেন। শ্রীশ্রীমা নিজমুখেও বহুবার বলেছেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তিনি অভিন্ন। স্বামীজী, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী সারদানন্দ প্রভৃতিও একবাক্যে বলে গেছেন যে, মা শ্রীরামকৃষ্ণেরই শক্তি, তাঁর কার্য পরিপূরণের জন্য, তাঁর বার্তা প্রচারের জন্য এসেছিলেন।

তেলোভেলোর মাঠে ডাকাত দস্যু একজন মাকে কালীরূপে দেখেছিল। শিবরামদা মায়ের মুখেই শুনেছিলেন, 'হ্যা, আমি মা-কালী।' মায়ের বাড়ীতে একটি বিড়াল ছিল। ব্রহ্মচারী জ্ঞান তখন মায়ের সেবক; তিনি বিড়ালটিকে আদর যত্ন তো করতেনই না, বরং মাঝে মাঝে একটু আধটু প্রহারাদিও করতেন। মা তা জানতেন। তাই কলকাতা আসার সময় ব্রহ্মচারী জ্ঞানকে ডেকে বললেন, 'দেখ জ্ঞান, বিড়ালটিকে একটু খেতে দেবে। তা নাহলে পরের বাড়ী চুরি করে খাবে। লোকে গালাগাল করবে।' তারপর ভাবলেন, শুধু একটু বলায় বিড়ালের ভাগ্য ফিরবে না; তাই আবার বললেন, 'আমিই তো এই বিড়ালের ভেতরও মা-রূপে রয়েছি!' 'যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা', তিনিই যে আমাদের শ্রীশ্রীমা হয়ে এসেছেন, নিজের এই পরিচয় নিজেই দিয়ে গেলেন—'আমি মাতৃ-রূপে সর্বভূতে, এমনকি এই বিড়ালটির ভেতরও রয়েছি।'

নিজ মাতৃভাবকে অবলম্বন করে তিনি আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। আমজদের কথা আপনারা জানেন, মা বলেছিলেন, 'শরৎও যেমন আমার ছেলে, তেমনি আমজদও আমার ছেলে।' শরৎ—স্বামী সারদানন্দ হলেন রামকৃষ্ণ মিশনের কর্ণধার, সেক্রেটারী, আর আমজদ একজন

ডাকাত; মায়ের দৃষ্টিতে দু'জনই সমান। মা বলেছেন, 'আমি সতেরও মা, অসতেরও মা।'

একজন ভক্তের নামে খুব দুর্নাম রটেছে। মায়ের কাছে অভিযোগ এল, 'এর নামে নানা রকম কথা শুনছি মা, একে আপনার কাছে আসতে না দেওয়াই ভাল।' মা বললেন, 'সে আমার ছেলে, আমি কি তাকে আসতে নিষেধ করতে পারি? আমি সতেরও মা, অসতেরও মা।' এ তো কথার কথা নয়, জীবনে আচরণে সর্বদা তিনি এটা দেখিয়ে গেছেন।

স্বদেশী যুগের কথা মনে পড়ছে, যখন আন্দোলন উঠেছিল বিদেশী সব কিছু বর্জন করতে হবে, বিলিতি কাপড় বা অন্য কিছু কেনা হবে না, দেশে যা হয় তাই ব্যবহার করে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। সে সময় মা একজন ব্রহ্মচারীকে বাজার করতে পাঠালেন—দুর্গাপূজার আগে মেয়েদের জন্য কাপড় কিনতে হবে। ব্রহ্মচারীটি মোটা স্বদেশী কাপড় কিনে ফিরলেন। মেয়েরা বললেন, 'এ কাপড় পরব কি করে, বড্ড মোটা যে!' ব্রহ্মচারী বললেন, 'এটা স্বদেশী যুগ, এই-ই পরতে হবে।' শেষে মায়ের কাছে গেলেন সবাই। মা সব শুনে ব্রহ্মচারীকে বললেন, 'ওরাও তো আমার ছেলে—বিলেতের ওরাও তো আমার সন্তান। কাজেই মেয়েরা যেমন চাচ্ছে সেই রকম সরু সুতোর কাপড়ই তুমি নিয়ে এস।'

এতে যেন মনে করবেন না, মা বিলিতি ভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন, যেমন আমরা হয়ে থাকি। কারণ প্রথম মহাযুদ্ধের পর পৃথিবীর সব বড় জাতি মিলে যখন ঠিক করলেন, যুদ্ধ আর হতে দেওয়া হবে না, সংঘর্ষের কারণ কিছু ঘটলে তা সবাই মিলে আপসে মিটিয়ে নেওয়া হবে, এবং একজন মায়ের কাছে সেই সুসংবাদ জানালে মা বলেছিলেন, 'এ কথা ওদের অন্তঃস্থ না মুখস্থ?'—কথাগুলি পৃথিবীর দেশনেতাদের প্রাণের কথা, না শুধু মুখের কথা মাত্র? তাঁর অন্তর্দৃষ্টি ছিল, সেই অন্তর্দৃষ্টিতে দেখে সব কিছু করতেন। ব্রহ্মচারীকে তিনি যেমন বললেন, বিলিতি কাপড় কিনে আনতে, তেমনি আবার ইংরেজের পুলিশ কর্মচারী একজন অন্তঃসত্ত্বা নারীর ওপর ভুলবশতঃ একটু অত্যাচার করেছেন—তাঁকে থানায় ধরে নিয়ে যাচ্ছেন এবং হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, গাড়ীর কোন ব্যবস্থা করেননি শুনে মা সখেদে বলেছিলেন, 'এরা কবে যাবে গো? ইংরেজ রাজত্ব কবে শেষ হবে?' কাজেই মায়ের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল অন্যরকম—মানুষের দৃষ্টি দিয়ে আমরা যদি তা বুঝতে যাই, তাহলে সর্বক্ষেত্রে ভুল করব। মা অনেক আছেন। জগতের অনেক প্রকার উপকারে তাঁরা ব্যাপৃত থাকেন। কিন্তু তার সঙ্গে দেবী শব্দটি যুক্ত হয়ে মাতৃত্বকে যে নতুন রূপ দেয়, নতুন ভাবধারা জগতে নিয়ে আসে, তা অনুপ্রেরণা জাগায় শুধু জগতের উপকার করার জন্য নয়, ভগবানের দিকে এগিয়ে যাবার জন্যও। এটা শ্রীশ্রীমায়ের দ্বারাই সম্ভবপর হয়েছিল—দেবীশক্তি যেখানে মাতৃশক্তির সঙ্গে সম্মিলিত হয় সেখানেই তা সম্ভবপর হয়।

শুধু তাই নয়, আগেই বলেছি আমাদের মা জ্ঞানময়ী এবং জ্ঞানদাত্রী। ঠাকুর বলেছেন, 'ও সরস্বতী, জ্ঞান দিতে এসেছে।' 'সমন্বয় ভাল বটে, তবে ঠাকুর এসেছিলেন ত্যাগের ভাব দেখাতে'—মায়ের এই কথাটাই ধরুন না—এতেই দেখতে পাবেন কতখানি তাঁর সূক্ষ্ম দৃষ্টি, কেমন করে সব বুঝতে পারতেন। স্বামীজী বার বার বলে গেছেন, 'সমন্বয়াবতার শ্রীরামকৃষ্ণ।' হঠাৎ মা কেন বলতে গেলেন, 'তিনি যে মতলব করে সমন্বয় প্রচার করেছেন, তা কিন্তু আমার মনে হয় না। তিনি ত্যাগের ভাবই দেখিয়েছেন, প্রচার করেছেন।' ঠাকুর স্বয়ং বলে গেছেন, 'আমি নিজে থেকে কিছু করিনি। মা আমাকে যেমন করিয়েছেন, বলিয়েছেন, তেমনি করেছি, বলেছি।'

সমন্বয় যদি তাঁর জীবনের ভেতর দিয়ে প্রচারিত হয়ে থাকে, সে সমন্বয় তিনি করেননি, সে সমন্বয় করিয়েছেন মা-কালী, জগদম্বা। মতলব করে তিনি কিছু করেননি। মতলব করে, বুদ্ধি খাটিয়ে আমরা দর্শন লিখতে পারি, বই লিখতে পারি। ঠাকুর যে-সব ভাব প্রচার করেছেন তা বুদ্ধি দিয়ে সৃষ্ট হয়নি, সে-সব এসেছে, উৎসারিত হয়েছে তাঁর হৃদয় থেকে, মায়েরই শক্তিতে। মা-ই তাঁকে সে-সব ভাব যুগিয়ে দিয়েছেন। শ্রীশ্রীমা এই দিকেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন, 'ঠাকুর মতলব করে কিছু করেননি।' এ অন্তর্দৃষ্টি। আসল কথা বুঝে নেবার ক্ষমতা মায়েরই ছিল সে যুগে। মা ঠাকুরের ভাব ভাল করে প্রচার করেছিলেন বলেই আজ আমরা তাঁকে ভাল করে বুঝতে পারছি—একথা সত্য।

ঠাকুরের পূজা মা-ই প্রথম করেছিলেন, যেমন শ্রীচৈতন্যের পূজা প্রথম করেছিলেন বিষ্ণুপ্রিয়া। পূজার ভেতর দিয়ে তিনি ভগবানের ভগবত্তা জগতে প্রচার করে গেছেন। শুধু কি তাই? স্বামীজী যখন জানালেন, 'আমি বিদেশে যেতে চাই, মা!' মা তখন তাঁকে প্রাণখুলে আশীর্বাদ করেছিলেন; কেননা ভবিষ্যদ্‌দ্রষ্টা তিনি, তিনি দেখেছিলেন যে স্বামীজীর ভেতর দিয়ে ঠাকুরের ভাব প্রচারিত হবে। আরো গোড়ার দিকে যাই,—এর অনেক আগের কথা' ঠাকুরের দেহত্যাগের পর তাঁর সন্ন্যাসী সন্তানরা এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কে কোথায় থাকবেন, কি হবে, সংঘ বলে কোন জিনিস দাঁড়াবে কি না, ঠাকুরের কোন নতুন ভাব আছে কি না, সেটা প্রচার করা আবশ্যক কি না—এ সমস্ত কথা নিয়ে তখনও খুব বেশী আলোড়ন হয়নি। সেই সময় মায়ের ভেতর চিন্তা এল, 'ঠাকুর, এই যে তোমার ছেলেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে, ভিক্ষা করছে,—এমন তো আমি অনেক দেখেছি, উত্তর ভারতে অনেক আছে, যারা গাছতলায় থাকে, কাপড়-চোপড় হয়তো তেমন নেই, ছায়া যেমন ঘুরে যায়, তেমনি এ-গাছতলা থেকে ও-গাছতলায় যায়। তোমার ছেলেরাও যদি তেমনি ভাবে ঘুরে বেড়াবার জন্য এসে থাকে, তাহলে এই কষ্ট স্বীকার করে অবতার হয়ে নেমে আসার প্রয়োজন কি? তুমি এসেছিলে একটা নতুন ভাব নিয়ে। সেই ভাব লোকে গ্রহণ করবে এবং লোকের কাছে সে ভাব দেবার জন্য তোমার ছেলেরা সংঘবদ্ধ হবে। এক জায়গায় থাকবে, তোমার কথা আলোচনা করবে,—বাইরের দশজন সেখানে এসে জুটবে। তবে না তোমার ভাব প্রচার হবে!' মা বলেছেন, 'আমি ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করেছিলাম, তারই ফলে এই সব মঠ প্রভৃতি গড়ে উঠেছে।'

মায়ের ছিল, প্রার্থনা ছিল, করবার ক্ষমতা ছিল, সকলকে তিনি আশীর্বাদ করেছিলেন, কোলে টেনে নিয়েছিলেন। তারই ফলে আজ মঠ মিশন প্রভৃতি গড়ে উঠেছে। মূলে রয়েছেন ঠাকুর। মা ঠাকুরের ভাব গ্রহণ করে, তা সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করে, তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীতে বিশ্বাস করে, সব দিকে চোখ খুলে রেখে ঠাকুরের প্রতিনিধিত্ব করেছেন তাঁর সন্তানদের কাছে, দুর্দিনে আশা জাগিয়েছেন তাঁদের ভেতর। তারই ফলে আজ রামকৃষ্ণ মঠ মিশন গড়ে উঠেছে। যত দিন যাবে, মায়ের মহিমা আরও প্রকাশিত হবে – আজও আমরা যা জানতে পারছি না, ভবিষ্যতে অনেকের কাছে তা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। আমরা হয়তো তখন থাকবো না; কিন্তু তাঁরা তো দু-চার দিনের বা দু-দশ বছরের জন্য আসেননি, তাঁদের সাধনার ফল, তাঁদের ভাবধারা হাজার বছর ধরে প্রবাহিত হবে,—মানুষের মনে জাগাবে অনুপ্রেরণা, জগতে আসবে নতুন শান্তি, সমৃদ্ধি, সাফল্য।*

* গত ২৬।১২।৭২ শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি-উৎসবে বেলুড় মঠে প্রদত্ত ভাষণের অনুলিখন।—সঃ

কিছুই জানি না

বনফুল

কোন দূরের স্রোতে
ভাসছিল যে খড়ের মতো
সে কি এই ?
কোন দূরের আকাশে টুকরো মেঘের মতো
ভাসছিল কি এই মেঘ ?
জানি না।

সেই ছোট্ট খড়টিই কি
খোড়ো ঘরে রূপান্তরিত হল ?
সেই ছোট্ট মেঘটিই কি
ঘন-ঘটার মহিমায় শুরু করেছিল
ধারা-বর্ষণ ?
তা-ও তো অজানা।

প্রান্তর-পথিক আমি
কবে যে ছুটতে ছুটতে এসে
ওই খোড়ো ঘরটিতে আশ্রয় নিলাম
মনে নেই।

শুধু জানি, এখন মেঘ নেই
রোদ উঠেছে।
আর জানি
সেই খোড়ো ঘরের চালে উঠেছে
চমৎকার ফন্‌ফনে একটি লাউ-লতা
আর আমি সেই লাউ-লতার গোড়ায়
রোজ জল দিচ্ছি।

এসব যাঁর লীলা
তিনি কে, কোথায় ?
তা-ও তো জানি না।

শ্রীশ্রীতারা মহাবিদ্যা

শ্রীরাসমোহন চক্রবর্তী

দশমহাবিদ্যার অন্তর্গত দ্বিতীয়া মহাবিদ্যা 'তারা' নামে অভিহিতা। 'তারয়তীতি তারা' (তারোপনিষৎ)। জীবকে ভবসাগর উত্তীর্ণ করাইয়া দেন বলিয়া ইহার নাম 'তারা'। ইনি একজটা, নীলসরস্বতী, উগ্রতারা, মহাতারা, বিদ্যারাজ্ঞী প্রভৃতি নামেও পরিচিতা।

লীলয়া বাক্‌প্রদা চেয়ং তেন নীলসরস্বতী।
তারকত্বাৎ সদা তারা সুখ-মোক্ষপ্রদায়িনী।
উগ্রাপত্তারিণী যস্মাদ্ উগ্রতারা প্রকীর্তিতা॥
(তারাভক্তিসুধার্ণব, ১ম তরঙ্গ)

ইনি অবলীলাক্রমে বাক্‌শক্তি প্রদান করেন বলিয়া 'নীলসরস্বতী,' জীবকে সর্বদা পরিত্রাণ করতঃ সুখ ও মোক্ষ প্রদান করেন বলিয়া 'তারা' এবং ভীষণ আপদ্ হইতে উদ্ধার করেন বলিয়া 'উগ্রতারা' নামে অভিহিতা হন।

তারার মূর্তিভেদ—নীলতন্ত্রে তারার অষ্টবিধমূর্তিভেদ কথিত হইয়াছে যথা,—

তারা চোগ্রা মহোগ্রা চ বজ্রা নীলা সরস্বতী।
কামেশ্বরী ভদ্রকালী ইত্যষ্টৌ তারিণী স্মৃতা॥
(নীলতন্ত্র, দ্বাদশ পটল)

কোন কোন তন্ত্রে আম্নায়ভেদে তারা দেবীর বহুবিধ মূর্তিভেদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় যথা, পূর্বাম্নায়ের অন্তর্গত স্পর্শতারা, চন্দ্রবর্ণা, চণ্ডঘণ্টা, ঘন্টিকা এবং ত্রৈলোক্যবিজয়া। দক্ষিণ আম্নায়ের অন্তর্গত—চিন্তামণি, সিদ্ধজটা, ত্রিজটা, ক্রূরমালিকা, ক্রূরচণ্ডা, মহাচণ্ডা, বজ্রতারা, ব্রহ্মতারা, মণিতারা, নারসিংহী এবং চতুর্বেদোদরী। পশ্চিম আম্নায়ের অন্তর্গত উগ্রতারা এবং ৮৪ রকমের হংসতারা। উত্তর আম্নায়ে অষ্টতারা। ঊর্ধ্বাম্নায়ে মহোগ্রতারা, মহানীলা, শাম্ভব তারা, মহানীলা-সরস্বতী, চীনসুন্দরী, নীলসুন্দরী এবং মহানীলা

তারাসম্প্রদায় সাহিত্য—ব্রহ্মানন্দগিরি তাঁহার 'তারারহস্য' গ্রন্থের প্রথম পটলে তারা মহাবিদ্যাবিষয়ক শাস্ত্রের এক তালিকা দিয়াছেন যথা,—তারাসার, তারানিগম, মহানীল, মহাচীন, নীলতন্ত্র, তারাকল্প, শক্তিসার, শক্তিকল্প, রুদ্রযামল, নীলসারস্বত, তারাকুলসর্বস্ব ইত্যাদি। এতদ্ব্যতীত তারাবিদ্যা সম্বন্ধে নিম্নোক্ত গ্রন্থসমূহও বিশেষ উল্লেখযোগ্য যথা, তোড়লতন্ত্র, ব্রহ্মযামল—ইহারই একাংশ মহাচীনাচারক্রম নামে অভিহিত, একজটাকল্প, একবীরাকল্প, তারা-ভক্তি-সুধার্ণব (নরসিংহ ঠক্কুর-কৃত) এবং তারা-রহস্যবৃত্তিকা (গৌড়ীয় শঙ্কর-বিরচিত)।

মহাযানী বৌদ্ধসম্প্রদায়ে তারাদেবীর উপাসনা সুপ্রচলিত ছিল এবং তান্ত্রিক বৌদ্ধসাহিত্যে তারা দেবী এবং তাঁহার সাধন সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ আছে।

উপাসক সম্প্রদায়—তারাতন্ত্রের প্রথম পটলে উক্ত হইয়াছে, উগ্রতারার মহামন্ত্র জপ করিয়া বুদ্ধরূপী জনার্দন অজরামরতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং সৃষ্টি আদি কর্মের কর্তৃত্ব লাভ করিয়াছিলেন। বশিষ্ঠ তারাদেবীর আরাধনা করিয়া নক্ষত্রলোক প্রাপ্ত হন। দুর্বাসা, ব্যাস, বাল্মীকি এবং ভরদ্বাজাদি ঋষিগণ এবং ভীমার্জুনাদি ক্ষত্রিয়গণ ইহারই উপাসনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন।

রুদ্রযামলতন্ত্র (পটল, ১৭) হইতে অবগত হওয়া যায়, মহর্ষি বশিষ্ঠ মহাবিদ্যার দৈববাণী শ্রবণ করিয়া মহাচীনে (তিব্বতে) গমন করেন এবং বুদ্ধদেবের নিকট দীক্ষিত হইয়া

'চীনাচারক্রমে' তারা মহাবিদ্যার সাধন শিক্ষা করেন। তৎপর তাঁহার নির্দেশক্রমে তারাপুরে আসিয়া সাধনা করিয়া বশিষ্ঠ সিদ্ধিলাভ করেন, তদবধি ঐস্থান 'সিদ্ধপীঠ' বলিয়া খ্যাত হয়।

তারাপীঠ – বীরভূম জেলার চণ্ডীপুর গ্রামের সন্নিকটে উক্ত সিদ্ধপীঠ অবস্থিত। তারাপুর সম্বন্ধে 'যোগিনীতন্ত্রে' এইরূপ উল্লেখ দৃষ্ট হয়,—

ঈশানে বক্রনাথস্য বৈদ্যনাথস্য পূর্বতঃ।
তারাপুরমিদং খ্যাতং নগরং ভুবি দুর্লভম্।
তত্র যত্নেন গন্তব্যং যত্র তারা শিলাময়ী॥
তারাপুরমিদং পীঠং গন্তব্যং যত্নতঃ সদা।
লক্ষত্রয়জপাদ্দেবী সর্বসিদ্ধিপ্রদা ভবেৎ॥

বক্রনাথের ঈশান কোণে এবং বৈদ্যনাথের পূর্বদিকে তারাপুর নামে খ্যাত ভুবনে দুর্লভ এক নগর আছে। সেখানে শিলাময়ী তারা প্রতিষ্ঠিতা আছেন, ঐ তীর্থে যত্নপূর্বক গমন করিবে। ঐ তারাপুর পীঠে সর্বদা যত্ন করিয়া গমন করিবে যেহেতু এখানে তিন লক্ষবার জপের দ্বারা দেবী সর্বসিদ্ধি প্রদান করিয়া থাকেন।

এখানে উত্তরবাহিনী দ্বারকানদীর তীরে মহাশ্মশানে বিখ্যাত তারাপীঠ অবস্থিত। পীঠাধিষ্ঠাত্রী দেবী বশিষ্ঠ-আরাধিতা তারা, ভৈরব — চন্দ্রচূড়। এই তারাপুরে বশিষ্ঠদেবের প্রতিষ্ঠিত তারামূর্তির জীর্ণাংশ এবং পঞ্চমুণ্ডী আসন অদ্যাপি ভক্তগণের পূজা ও সমাদর লাভ করিয়া আসিতেছে। আধুনিক কালে বামাক্ষেপা নামক বিখ্যাত তান্ত্রিক সাধক এই সিদ্ধপীঠে তারা মহাবিদ্যার সাধনা করিয়া সিদ্ধি লাভ করেন। নাটোরের সাধকপ্রবর রাজা রামকৃষ্ণ, আনন্দনাথ, মোক্ষদানন্দ, কৈলাসপতি, নিগমানন্দ প্রভৃতি অনেক তান্ত্রিক সাধক এই স্থানে সাধনা করিয়াছেন।

তারামহাবিদ্যাসিদ্ধ ব্রহ্মানন্দগিরি— বাঙ্গালার ইতিহাসের মধ্যযুগে তারা মহাবিদ্যার সাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন সুপ্রসিদ্ধ তন্ত্রাচার্য ব্রহ্মানন্দগিরি। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম বা মধ্যভাগে তিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তাঁহার রচিত তান্ত্রিকনিবন্ধ গ্রন্থে তাঁহার পূর্ণ নাম 'শ্রীপরমহংস পরিব্রাজকাচার্য ব্রহ্মানন্দগিরি তীর্থাবধূত' এইরূপ দৃষ্ট হয়। ব্রহ্মানন্দগিরি তদীয় শিষ্য পূর্ণানন্দের সহযোগিতায় লুপ্তপ্রায় কামাখ্যা মহাপীঠের উদ্ধার সাধন করেন এবং পূর্ণানন্দের উত্তরসাধকতায় কামাখ্যা মহাপীঠে কঠোর সাধনা করিয়া শ্রীশ্রীতারা-মহাবিদ্যার কৃপালাভে সমর্থ হন। ব্রহ্মানন্দগিরি-রচিত দুইখানি তান্ত্রিক নিবন্ধ সুপ্রসিদ্ধ,— (১) তারারহস্যম্—ইহা চারিপটলে বিভক্ত, ইহাতে তারা-উপাসনার আনুষঙ্গিক আচার ও অনুষ্ঠানাদি আলোচিত হইয়াছে। (২) শাক্তানন্দতরঙ্গিণী —এই তান্ত্রিক নিবন্ধে অষ্টাদশ পটলে শাক্তদিগের আচার অনুষ্ঠানাদি সুনিপুণভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীতারাধ্যান—নীলতন্ত্রের দ্বিতীয় পটলে তারা মহাবিদ্যার নিম্নোক্ত ধ্যানমন্ত্র দৃষ্ট হয় এবং মহামহোপাধ্যায় কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ মহাশয় তাঁহার 'তন্ত্রসারে' তারা-প্রকরণে এই ধ্যানমন্ত্রই গ্রহণ করিয়াছেন,—

প্রত্যালীঢ়পদাং ঘোরাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাম্।
খর্বাং লম্বোদরাং ভীমাং ব্যাঘ্রচর্মাবৃতাং কটৌ॥১
নবযৌবনসম্পন্নাং পঞ্চমুদ্রাবিভূষিতাম্।
চতুর্ভুজাং ললজ্জিহ্বাং মহাভীমাং বরপ্রদাম্॥২

ভগবতী তারাদেবী 'প্রত্যালীঢ়পদা' অর্থাৎ বামপদ অগ্রবর্তী করিয়া এবং দক্ষিণপদ সঙ্কুচিত করিয়া অবস্থিতা, ইনি ভয়ঙ্করী, মুণ্ডমালা দ্বারা শোভিতা, খর্বাকৃতি, লম্বোদরী, ভীষণা এবং ইঁহার কটিদেশ ব্যাঘ্রচর্মদ্বারা আবৃত। ইনি নবযৌবন-সম্পন্না, 'পঞ্চমুদ্রা' দ্বারা অলঙ্কৃতা, চতুর্ভুজা। লোলজিহ্বাধারিণী, মহাভয়ঙ্করী কিন্তু বরপ্রদায়িনী।

তারা দেবীর ধ্যানমন্ত্রে উল্লিখিত 'পঞ্চমুদ্রা-বিভূষিতাম্'—ইহার তাৎপর্য কি? তন্ত্রসার-

প্রণেতা আগমবাগীশ মহাশয়ের টীকা হইতে জানা যায়, তারাদেবীর ললাটদেশ 'পঞ্চমুদ্রা' দ্বারা অর্থাৎ শ্বেত অস্থিমালায় গ্রথিত পাঁচটি নরকপাল দ্বারা শোভিত।

খড়্গ-কর্তৃ-সমাযুক্ত-সব্যেতরভুজদ্বয়াম্।
কপালোৎপলসংযুক্ত-সব্যপাণিযুগান্বিতাম্॥ ৩
পিঙ্গোগ্রৈকজটাং ধ্যায়েন্মৌলাবক্ষোভ্যভূষিতাম্।
বালার্কমণ্ডলাকার-লোচনত্রয়-ভূষিতাম্॥ ৪
জ্বলচ্চিতা-মধ্যগতাং ঘোরদংষ্ট্রাং করালিনীম্।
স্বাবেশ-স্মের-বদনাং স্ত্র্যলঙ্কার-বিভূষিতাম্।
বিশ্বব্যাপক-তোয়ান্তঃশ্বেতপদ্মোপরিস্থিতাম্॥ ৫
(তন্ত্রসার-ধৃত)

তারাদেবী দক্ষিণহস্তদ্বয়ে খড়্গ ও কর্তরিকা (কাটারি) এবং বামহস্তদ্বয়ে নর-কপাল ও নীল-পদ্ম ধারণ করিতেছেন। ইঁহার শিরোদেশে উগ্র পিঙ্গলবর্ণের একটি জটা শোভা পাইতেছে এবং তদুপরি 'অক্ষোভ্য' বিরাজিত আছেন, নবোদিত সূর্যমণ্ডলসদৃশ নয়নত্রয়ে দেবী শোভিতা। দেবী প্রজ্বলিত চিতামধ্যে বিরাজমানা, ভীষণদন্তপঙ্‌ক্তি-যুক্তা করালমূর্তিতে অবস্থিতা, কিন্তু তিনি আপনার আবেশে আপনি সহাস্যবদনা, স্ত্রীজন-সুলভ বিবিধ অলঙ্কারে তাঁহার অঙ্গ বিভূষিত। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডব্যাপক সলিলরাশিমধ্যে দেবী এক শ্বেত পদ্মোপরি অবস্থিতা, এই ভাবে তারাদেবীকে ধ্যান করিবে।

ধ্যানমন্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে "পিঙ্গোগ্রৈক-জটাং ধ্যায়েৎ মৌলৌ অক্ষোভ্য-ভূষিতাম্", তারাদেবীর শিরোদেশে উগ্রপিঙ্গলবর্ণের একটি জটা শোভা পাইতেছে এবং তদুপরি অক্ষোভ্য বিরাজিত আছেন। এই 'অক্ষোভ্য' অর্থ কি ?

(১) তোড়ল তন্ত্র হইতে (প্রথম পটল) জানা যায়, অক্ষোভ্য শিবেরই নামান্তর। সমুদ্র-মন্থন হইতে উদ্ভূত কালকূট বিষ পান করিয়াও মহাদেব বিন্দুমাত্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন নাই, এইজন্য তিনি 'অক্ষোভ্য' নামে অভিহিত হন। মহামায়া তারিণী তাঁহার সহিত সদা রমিত হন।

সমুদ্রমন্থনে দেবি কালকূটং সমুত্থিতম্।
সর্বে দেবাশ্চ দেব্যশ্চ মহাক্ষোভমবাপ্নুয়ুঃ॥
ক্ষোভাদিরহিতং যস্মাৎ পীতং হালাহলং বিষম্।
অতএব মহেশানি অক্ষোভ্যঃ পরিকীর্তিতঃ।
তেন সার্ধং মহামায়া তারিণী রমতে সদা॥
(তোড়লতন্ত্র, ১ম পটল)

(২) তারা-রহস্যে উক্ত হইয়াছে, দেবী তারামূর্তি ধারণ করিলে অক্ষোভ্য মহাকাল তাঁহার মস্তকে সর্পরূপে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

এতেন তারা সা জাতা শীর্ষেঽক্ষোভ্যো ভুজঙ্গমঃ।
মহাকালঃ স এব স্যাৎ তারারূপং জগৎত্রয়ে॥
(তারারহস্য, ১৫)

(৩) মতান্তরে অক্ষোভ্যকে ঋষিরূপেও বর্ণিত হইতে দেখা যায়। তিনিই তারামন্ত্র প্রথম সাক্ষাৎকার করেন।

অক্ষোভ্যশ্চ ঋষিঃ প্রোক্তো বৃহতীচ্ছন্দ ঈরিতম্।
(তারাতন্ত্র, পটল ২)

(৪) মহাযানী বৌদ্ধমতে অক্ষোভ্য পঞ্চধ্যানী বুদ্ধের অন্যতম। তারাদেবী তাঁহার শক্তি। তারাদেবী মস্তকোপরি একটি ক্ষুদ্র অক্ষোভ্য মূর্তি ধারণ করেন।

শ্রীশ্রীতারাস্তোত্র—নীলতন্ত্রে শ্রীশ্রীতারা-স্তোত্র হইতে জানা যায়, তারার মূর্তি স্থূলা, সূক্ষ্মা এবং পরাভেদে ত্রিধা বিভক্ত—

মূর্তিস্তে জননি ত্রিধা সুঘটিতা স্থূলাতিসূক্ষ্মা পরা।
বেদানাং নহি গোচরা কথমপি
প্রাপ্তাং নু তামাশ্রয়ে॥

হে জননি, তোমার মূর্তি স্থূলা, অতিসূক্ষ্মা এবং পরা ভেদে ত্রিধা বিভক্ত ; শ্রুতিও তোমার আকৃতি নির্ধারণ করিতে অসমর্থ ; অতএব আমি কেমন করিয়া তোমাকে প্রাপ্ত হইব, আর কেমন করিয়াই বা সেবা করিব ?

তারা মহাবিদ্যা সর্বজ্ঞানময়ী। তাঁহার কৃপা-লাভ করিলে সাধক সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় গদ্য পদ্য রচনা করিতে সমর্থ হয় এবং সর্বজ্ঞতারূপ সিদ্ধিলাভ করিয়া কৃতার্থ হয়।

বাচামীশ্বরি ভক্তকল্পলতিকে সর্বার্থসিদ্ধীশ্বরি,
গদ্য-প্রাকৃত-পদ্যজাত-রচনা-সার্বজ্ঞ্য-সিদ্ধিপ্রদে।
নীলেন্দীবর-লোচনত্রয়যুতে কারুণ্যবারাং নিধে,
সৌভাগ্যামৃত-বর্ষণেন কৃপয়া সিঞ্চ ত্বমস্মাদৃশম্॥

হে বাগীশ্বরি, তুমি ভক্তগণ সম্বন্ধে কল্পলতার ন্যায় ফলপ্রদান করিয়া থাক। হে সর্বার্থ-সিদ্ধিপ্রদে, তুমি গদ্য, প্রাকৃত ও পদ্যরচনার শক্তি এবং সর্বজ্ঞতা রূপ সিদ্ধিপ্রদানে সমর্থ। তোমার নয়নত্রয় নীলপদ্মের ন্যায় শোভমান, তুমি করুণা-সাগর অতএব কৃপাপূর্বক সৌভাগ্যামৃত সেচন করত আমাদিগকে অভিষিক্ত কর।

এই বিখ্যাত তারাস্তোত্রে তারা মহাবিদ্যার স্বরূপ ও তত্ত্ব, তাঁহার কৃপাশক্তি, নামস্মরণমাহাত্ম্য এবং চরণসেবামাহাত্ম্য অতীব মনোজ্ঞভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

ত্বন্নামস্মরণাৎ পলায়নপরা দ্রষ্টুঞ্চ শক্তা ন তে
ভূত-প্রেত-পিশাচ-রাক্ষসগণা যক্ষাশ্চ নাগাধিপাঃ।
দৈত্যা দানবপুঙ্গবাশ্চ খচরা ব্যাঘ্রাদিকা জন্তবো
ডাকিন্যঃ কুপিতান্তকশ্চ মনুজং মাতঃ ক্ষণং ভূতলে॥

হে মাতঃ, তোমার নাম স্মরণ করিলে ভূত, প্রেত, পিশাচ, রাক্ষস, যক্ষ, নাগাধিপতি, দৈত্য, দানব, খেচর, ব্যাঘ্রাদি জন্তুগণ, ডাকিনী এবং কুপিত যম পর্যন্ত পলায়ন করিয়া থাকে; ইহারা ক্ষণকালের জন্যও তোমার নাম-স্মরণকারী মানবকে দর্শন করিতে সমর্থ হয় না।

শ্রীশ্রীতারা মহাবিদ্যার চরণসেবামাহাত্ম্য বর্ণিত হইতেছে,

লক্ষ্মীঃ সিদ্ধগণাশ্চ পাদুকমুখাঃ সিদ্ধাস্তথা বৈরিণাম্
স্তম্ভশ্চাপি রণাঙ্গনে গজঘটাস্তম্ভস্তথা মোহনম্।
মাতস্ত্বৎপদসেবয়া খলু নৃণাং সিধ্যন্তি তে তে গুণাঃ
ক্লান্তিঃ কান্তমনোভবস্য ভবতি
ক্ষুদ্রোঽপি বাচস্পতিঃ॥

হে মাতঃ, যাহারা তোমার চরণসেবা করে, তাহাদিগের সম্পদ বৃদ্ধি হয় এবং সিদ্ধগণ ও অধোমুখ রুদ্রানুচরগণ তাহাদের বশীভূত হয়। তাহারা বৈরীস্তম্ভ, যুদ্ধস্থলে গজস্তম্ভন এবং মোহন করিতে পারে। অধিক কি, তাহারা কামজয়ী হয় এবং ক্ষুদ্র হইয়াও বৃহস্পতির ন্যায় জ্ঞানী হইয়া থাকে।

ভক্ত সর্ববিধ ভয় নাশের জন্য অভয়া তারার শ্রীচরণে প্রার্থনা জানাইতেছেন,—

খর্বে গর্বসমূহ-পূরিততনো সর্পাদি-বেশোজ্জ্বলে
ব্যাঘ্রত্বক্-পরিবীত-সুন্দরকটিব্যাধূত-ঘণ্টাঙ্কিতে।
সদ্যঃকৃত্তগলদ্রজঃপরিলসন্মুণ্ডদ্বয়ীমূর্ধজ-
গ্রন্থি-শ্রেণি-নৃমুণ্ড-দাম-ললিতে ভীমে ভয়ং নাশয়॥

হে মাতঃ, তুমি খর্বাকৃতি, তথাপি মনে হয়, যেন সমস্ত গর্বরাশি তোমার শরীরটিকে সম্পূরিত করিয়া রাখিয়াছে, তুমি সর্পাদি বেশ-ভূষায় উজ্জ্বলতা ধারণ করিয়াছ, তোমার ব্যাঘ্র-চর্মাবৃত সুন্দর কটিদেশে ক্ষুদ্র ঘণ্টা দোলিত হইতেছে, সদ্য ছিন্ন রুধিরবিগলিত মুণ্ডদ্বয়ের কেশ দ্বারা পরস্পর গ্রথিত নরমুণ্ডমালা তোমার শোভা বর্ধন করিতেছে। হে ভীমে, তুমি আমাদের ভয় বিনাশ কর।

মূর্তিপূজা

ডক্টর রমা চৌধুরী

আজ অশেষ শুভ ৺শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা সমাগত, যখন চিন্ময়ী জগজ্জননী মৃন্ময়ীরূপে তিন দিন আমাদের দীন কুটীরে বিরাজ করবেন একাধারে আমাদের মাতা ও কন্যারূপে। ভারতবর্ষের এই প্রতিমাপূজা এরূপ একটি নিগূঢ় তত্ত্ব যে, কেবল বিদেশিগণ কেন, হিন্দু ব্যতীত ভারতবর্ষের অন্যান্য সম্প্রদায়ভুক্ত অনেকেই এর মর্মার্থ উপলব্ধি করতে অসমর্থ হয়ে হিন্দুধর্মের এই মূলীভূত মতবাদকে বহু নিন্দাবাদ করেছেন। ফলে হিন্দু এবং অহিন্দুগণের মধ্যে এটি একটি বিবাদ-বিসংবাদের অন্যতম প্রধান কারণরূপে অদ্যাপি বিদ্যমান। সেজন্য, ইতিহাসের পৃষ্ঠা উল্টালেই দেখা যাবে যে, মুসলমানগণ বারংবার হিন্দুগণের মন্দির ভেঙ্গেছেন ও দেবমূর্তিসমূহ ধ্বংস করেছেন; খ্রীশ্চীয়ান ও ব্রাহ্মগণ বারংবার হিন্দুধর্মের দেবদেবীর মূর্তিসমূহকে মাটির পুতুল বলে উপহাস করেছেন, তাঁদের মিথ্যা বলে নিন্দাবাদ করেছেন, তাঁদের পূজার অযোগ্য বলে ঘৃণা করেছেন, ইত্যাদি। এরূপে এই মূর্তিপূজার মাধ্যমে ভারতীয়গণের নিজেদের মধ্যেই যেন এক বিরাট অথচ শূন্যগর্ভ ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছে। এর প্রতিকার তো অত্যাবশ্যক এবং বিদেশিগণের মনের ভ্রান্ত ধারণার অপসারণও সমভাবে অবশ্য কর্তব্য। সেজন্য, আজ ভারতের এই সর্বশ্রেষ্ঠ মূর্তিপূজার প্রাক্কালে, এই গুরুতর বিষয়ে আমরা একটু চিন্তা করে দেখতে পারি।

যাঁরা মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে, তাঁদের দিক্ থেকে অবশ্য দর্শনশাস্ত্রসম্মত এবং ন্যায়সঙ্গত যুক্তির অভাব নেই। তাঁরা বলেন—প্রথমতঃ, পরমেশ্বর অনন্ত অসীম সর্বব্যাপী সেজন্য একটিমাত্র ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ, সান্ত, সসীম আকারে অর্থাৎ একটি বিশেষ দেবমূর্তিতে তাঁর পরিপূর্ণ প্রকাশ সম্ভবপর কিরূপে? দ্বিতীয়তঃ, পরমেশ্বর নীরূপ বা অরূপ; সেজন্য, তিনি একটি বিশেষ আধারের মাধ্যমে কিরূপে একটি বিশেষ দেবতার রূপ পরিগ্রহ করতে পারেন? তৃতীয়তঃ, তিনি নির্বিকার, অথচ তিনি একটি বিশেষ দেবতার রূপ ধারণ করছেন, অর্থাৎ এইভাবে পরিণত পরিবর্তিত হচ্ছেন। তাও বা কি করে সম্ভবপর? চতুর্থতঃ, তিনি নিরঞ্জন, বা সর্বপাপতাপ-দোষ-কলঙ্করহিত। সেক্ষেত্রে তিনি যদি একটি জাগতিক অশুদ্ধ অপূর্ণ বস্তু, অথবা মৃত্তিকা-কাষ্ঠ-ধাতু প্রভৃতি নির্মিত মূর্তিতে এসে অধিষ্ঠিত হন, তাহলে তাঁর সত্তাগত পবিত্রতা-পূর্ণতার আর অবশিষ্ট থাকে কতটুকু? পঞ্চমতঃ, তিনি সম্পূর্ণরূপেই অজড়; তাহলে সম্পূর্ণ বিপরীত জড় মূর্তির মাধ্যমে তাঁর প্রকাশ এক অযৌক্তিক, অকল্পনীয় ব্যাপার নয় কি? এই সব কারণে মূর্তিপূজা-বিরোধিগণ সকলেই একবাক্যে বলেছেন যে, মূর্তিপূজা স্বীকার করলে শ্রীভগবানকেই অপমানিত করা হয়-সেই "ভূমা-মহান্"কেই ক্ষুদ্র করে ফেলা হয়; সেই "শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্"-কেই (ঈশ. উ.-৮) অপবিত্র করে ফেলা হয়; সেই "আনন্দো ব্রহ্ম"কেই (তৈত্তি. উ. ৩।৬) দুঃখক্লেশতাপিত করে ফেলা হয়; সেই সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ শিবকেই দীনহীন জীব করে ফেলা হয়; সেই অনন্ত-অসীম অজড় ব্রহ্মকেই জড়স্বরূপ ব্রহ্মাণ্ড করে ফেলা হয়। এত বড় স্পর্ধা, এত বড় দুঃসাহস, এত বড় নির্বুদ্ধিতা আমাদের হবে কেন যে আমরা এই ভাবে সেই সর্বব্যাপী, সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ, সর্বগুণমণ্ডিত, সর্বস্রষ্টা, সর্বধারক,

সর্ববাহক, সর্বশাসক পরব্রহ্ম, পরমেশ্বর, পরম-দেবতা পরমাত্মাকে এক করে ফেলব মর-জড়-অশুদ্ধ-অপূর্ণ-পাপী-তাপী জীব-জগতের সঙ্গে? তা যদি না হয়, তাহলে কি করে স্বয়ং শ্রীভগবান্ পূজার সময়ে মৃন্ময় মূর্তিতে, এবং সঙ্কটের সময়ে অবতারে প্রকটিত হতে পারেন?

এই সব আপত্তির খণ্ডন কিন্তু অতি সহজ দর্শনশাস্ত্রের দিক্ থেকেই। কারণ, সৃষ্টির কথাই যদি বলা হয়, তাহলে যে একমাত্র মতবাদ আমাদের গ্রহণ করতেই হয় এস্থলে, তা হল "পরিণামবাদ"—যে মতানুসারে, কারণ কার্যে পরিণত বা রূপান্তরিত হলে, তবেই কারণ থেকে কার্যোৎপত্তি হয়—যথা মৃৎপিণ্ড মৃন্ময় ঘটে পরিণত বা রূপান্তরিত হয়, এবং স্বভাবতঃই এস্থলে কারণ ও কার্য সমস্বভাব হতে বাধ্য, যেহেতু কারণ মৃৎপিণ্ড ও কার্য মৃন্ময় ঘট উভয়ই সমভাবে মৃৎস্বরূপ। একই ভাবে, পরমকারণ ব্রহ্ম থেকে যখন জীব-জগতের উৎপত্তি হয়, তখন জীবজগৎকে আর মর-জড়-দুঃখক্লেশতাপিত, অনিত্য-অশুদ্ধ-প্রভৃতি বলা যাবে কি করে? কারণ, কারণ ও কার্য যেহেতু সমস্বভাব, যেহেতু কারণ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের ন্যায় কার্য জীবজগৎও নিশ্চয় সচ্চিদানন্দস্বরূপ—এই মহাতত্ত্বটিই তো প্রকাশিত করা হয়েছে উপ-নিষদে দুটি মহামন্ত্রের মাধ্যমে:—

"সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।" (ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ৩।১৪।১)
"ব্রহ্মেদং সর্বম্।" (বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ২।৫।১)
"বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই ব্রহ্ম।"
"ব্রহ্মই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড।"

সেক্ষেত্রে—মৃন্ময়ী মূর্তি সত্যই মৃন্ময়ী নন—চিন্ময়ী। সেক্ষেত্রে—অবতার সত্যই জীব নন—শিব। সেক্ষেত্রে—প্রতিমাপূজা ও অবতার-বাদের বিরুদ্ধে কোন দর্শনশাস্ত্রসম্মত ও ন্যায়শাস্ত্র-সঙ্গত যুক্তি নেই। কিন্তু তাহলেও সকল সমস্যার সমাধান সাধিত হয় না পরিপূর্ণভাবে। কারণ, সেক্ষেত্রে নূতন করে পুনরায় প্রশ্ন উঠে যে—বৃহদারণ্যকোপনিষদে এইভাবে "ব্রহ্মই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড" (২।৫।১) বলার পূর্বেই আরেকটি সুবিখ্যাত মন্ত্র "নেতি নেতি" (২।৩।৬) "তিনি এ নন, এ নন" দ্বারা ব্রহ্মের ব্রহ্মাণ্ডরূপের নিষেধ করা হয়েছে। তারপরে এই একই উপনিষদে (৩।৮।৮) বিশদভাবে বলা হয়েছে যে, সেই "অক্ষর" ব্রহ্ম পৃথিবীর কিছুই নন—স্থূল নন, কৃশও নন, দীর্ঘ নন, হ্রস্ব নন, ইত্যাদি; পুনরায়, আকাশ নন, বায়ু নন, ছায়া নন, তমঃ নন, ইত্যাদি; পুনরায়, চক্ষু নন, কর্ণ নন, বাগেন্দ্রিয় নন, মন নন, প্রাণ নন, ইত্যাদি। তাহলে ব্রহ্ম আর ব্রহ্মাণ্ড রইলেন কিরূপে? বস্তুতঃ, উপনিষদে একদিকে বলা হয়েছে ব্রহ্ম অরূপ, ব্রহ্মাণ্ড তাঁর রূপ বা প্রকাশ নয় (যথা, ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ৮।১।৫; কঠোপ-নিষদ্ ৩।১৫; মুণ্ডকোপনিষদ্ ·।:।৬; মাণ্ডূক্যোপ-নিষদ্ ইত্যাদি)। অন্যদিকে তিনি বিশ্বরূপ (শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ ৩।৩, ৩।১১, ৩।১৪, ৩।১৬, ৪।২-৪ ইত্যাদি)—অর্থাৎ, সর্বত্র তাঁর চক্ষু, মুখ বাহু, পাদ, কর্ণ, মস্তক, গ্রীবা ইত্যাদি; তিনি অগ্নি, আদিত্য, জল, বায়ু, চন্দ্রমা নক্ষত্র, ব্রহ্মা প্রজাপতি, স্ত্রী, পুরুষ, কুমার, কুমারী, বৃদ্ধ, নীলপতঙ্গ, লোহিতচক্ষু, শুকাদি, মেঘ, ঋতু, সাগরসমূহ ইত্যাদি।

অর্থাৎ, এক কথায়, তিনি সাকার ও নিরাকার উভয়ই।

প্রশ্ন এই—কোন্‌টি পূর্বে, কোন্‌টি পরে; কোন্‌টি উচ্চতর, কোন্‌টি নিম্নতর; কোন্‌টি কল্যাণমূলক, কোন্‌টি অকল্যাণমূলক; কোন্‌টি মোক্ষপ্রাপক, কোন্‌টি মোক্ষপ্রতিবন্ধক। একটি সাধারণ ধারণা আছে যে, সাকার উপাসনা, বা মূর্তিপূজা মোক্ষের প্রথম সোপানই মাত্র; যেক্ষেত্রে নিরাকার উপাসনা বা ব্রহ্মপূজা সর্ব-সাধনার, সর্বারাধনার, সর্বতপস্যার শেষ সোপান।

কিন্তু ইহা ভারতবর্ষের মর্মোত্থ বাণী নয়—যেহেতু ভারতবর্ষ শাশ্বতকাল "যত মত, তত পথ"—এই অনুপম-অভিনব-উদার-উন্নত নীতিবাদী। সেজন্য, আকার-নিরাকার উভয় প্রকারের পূজাই এই পুণ্যদেশে চিরকালই সমান সম্মান-সমাদর লাভ করেছে। অর্থাৎ স্ব স্ব রুচি-শক্তি-ভেদে, যে যেদিকে চান, যে যেদিকে পারেন, ব্রহ্মাণ্ডে অথবা ব্রহ্মাণ্ডাতীতভাবে, সেই একই পরব্রহ্মের আরাধনা করে চলেছেন—আপত্তি কি, বাধা কোথায়, দ্বিধা কেন? ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মকে দেখুন, ভালবাসুন, সেবা করুন; অথবা, ব্রহ্মাণ্ডাতীত ভাবে ব্রহ্মকে উপলব্ধি করুন প্রভেদ কোথায়? সবই তো কেবল অধিকারিভেদ—যার যাতে অধিকার আছে, শক্তি আছে, তৃপ্তি আছে, পুর্তি আছে—কেবল তাই করুন—বাধা কোথায়?

কি অনুপমভাবেই না "যত মত, তত পথ" এই মহাতত্ত্বের মহাসাধক শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলছেন:—

"হাঁ দু-ই সত্য। সাকার নিরাকার দু-ই সত্য। শুধু নিরাকার বলা কিরূপ জান? যেমন রসুনচৌকির একজন পোঁ ধরে থাকে—তার বাঁশীর সাত ফোকর সত্ত্বেও। কিন্তু আরেকজন দেখ কত রাগ রাগিণী বাজায়। সেরূপ সাকারবাদীরা দেখ ঈশ্বরকে কত ভাবে সম্ভোগ করে। শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর - নানাভাবে।"

(কথামৃত, পঞ্চম ভাগ, পৃঃ ৫৪)

যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দও এই একই সুরে বলছেন—

"We may worship anything by seeing God in it, if we can forget the idol and see God there. We must not project any image upon God. But we may fill any image with that Life which is God. Only forget the image, and you are right enough—for 'Out of Him comes everything.' He is everything. We may worship a picture as God, but not God as the picture. God in the picture is right, but the picture as God is wrong. God in the image is perfectly right. There is no danger there. This is the real worship of God." (IV, 47.)

"যে কোনো বস্তুকেই আমরা পূজা করতে পারি যদি তাতে আমরা ঈশ্বরকেই দর্শন করি এবং যদি আমরা সেই মূর্তিকে বিস্মৃত হয়ে কেবল ঈশ্বরকেই সে-স্থলে দর্শন করি। আমরা যেন ঈশ্বরের উপরে কোনো মূর্তি না আরোপ করি। কিন্তু আমরা তো অনায়াসেই যে কোন মূর্তিকে ঈশ্বরের সত্তা দিয়ে ভরে তুলতে পারি। কেবল মূর্তিকে বিস্মৃত হও; তাহলে তুমি ঠিকই করবে যেহেতু 'তাঁর থেকেই সর্ববস্তু নিঃসৃত হয়।' তিনিই তো সব। আমরা একটি চিত্রকে ঈশ্বররূপে পূজা করতে পারি নিশ্চয়ই; কিন্তু ঈশ্বরকে চিত্ররূপে নয়। 'চিত্রের মধ্যে ঈশ্বর'—এ-কথা সত্য; কিন্তু 'চিত্রই ঈশ্বর'—এ-কথা ভুল। সেজন্য মূর্তির মধ্যে ঈশ্বর এই উপলব্ধি সম্পূর্ণ সত্য। এতে বিপদের কিছুই নেই—কারণ, এই তো হল পরমেশ্বরের প্রকৃত পূজা।"

মূর্তিপূজার সাকারারাধনার এই তো হল প্রাণের কথা, যা পূর্বেই বলা হয়েছে। সকল মূর্তিই স্বয়ং ঈশ্বরের মূর্তি; সেজন্য সকল মূর্তিই, সকল বস্তুই, সকল মানবই সমভাবে পূজ্য। এই দিক থেকে মূর্তিপূজা, সাকার উপাসনা একটি অতি অভিনব, অথচ, অত্যুৎকৃষ্ট পূজা-প্রণালী। কারণ এর দ্বারা ব্রহ্ম ও ব্রহ্মাণ্ড, শিব ও জীব, পরমাত্মা ও আত্মা, ব্রহ্মধাম ও মর্ত্যলোককে আমরা একই সঙ্গে পাই

—কোনো কিছুকেই ত্যাগ করতে হয় না, কোনো কিছুকেই ঘৃণা করতে হয় না, কোনো কিছুকেই অশ্রদ্ধা করতে হয় না কোনো কিছুকেই অবিশ্বাস করতে হয় না। —উপরন্তু এই পৃথিবীর সর্বত্রই, এই ধরণীরই ধূলিতে ধূলিতে, এই মর্ত্যেরই মাটিতে মাটিতে, ভুবনেরই ভবনে ভবনে, এই সংসারেরই সরণিতে সরণিতে, এই জগতেরই জনে জনে আমরা সাক্ষাৎভাবে উপলব্ধি করি, প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করি, পরিপূর্ণভাবে বরণ করি, দৃঢ়ভাবে ধারণ করি সেই "এককেই," সেই সত্য-সনাতন "এককেই," সেই নিত্য-নিরঞ্জন "এককেই," সেই চিত্ত-বিনোদন "এককেই," সেই বিত্ত-বিরোচন "এককেই।" এরূপ পরিপূর্ণ পূজা-পদ্ধতি পৃথিবীতে আর কোথায় আছে? মনে হয় সাকার-দৃষ্টি নিরাকার-দৃষ্টি অপেক্ষা উচ্চতর, পূর্ণতর, পুণ্যতর, সত্যতর, ধন্যতর, সুন্দরতর। কারণ, নিরাকার-বাদিগণ* দেবমূর্তিতেও দেখেন কেবল মৃত্তিকা-কাষ্ঠ-ধাতু প্রভৃতি; এবং সেজন্য তাকে ঘৃণা-বিদ্বেষ করেন, চূর্ণ-বিচূর্ণ করেন এই বলে যে, এরূপ জড়-মর-অশুদ্ধ বস্তুসমূহকে দেবতা মনে করাই মহাপাপ। কিন্তু সাকারবাদিগণ দেবমূর্তিতে মৃত্তিকাও দেখেন না, কাষ্ঠ-ধাতু প্রভৃতিও দেখেন না, অন্য কিছু রূপও দেখেন না—দেখেন সব কিছুই ভেদ করে, সব কিছুই অবজ্ঞা করে, সব কিছুই সরিয়ে রেখে, সেই সব কিছুর মধ্যেই, সেই মৃত্তিকা-কাষ্ঠ প্রভৃতির ন্যায় অতি সাধারণ, অতি সাংসারিক অতি ক্ষুদ্র-বদ্ধ-বস্তুতেও স্বয়ং ব্রহ্মকে, স্বয়ং পর-মেশ্বরকে, স্বয়ং পরমাত্মাকে—এক কথায় সেই সচ্চিদানন্দ-মহাসত্যকে, সেই রসঘন, আনন্দোজ্জ্বল অমৃতনির্ঝর পরমতত্ত্বকেই সগৌরবে। সেজন্য স্বামী বিবেকানন্দ অতি সুন্দরভাবে বলেছেন যে, সকল বস্তুকেই, সকল জীবকেই পরব্রহ্মরূপে, পরমেশ্বররূপে, পরমাত্মারূপে পূজা করা যায় নিশ্চয়ই, যদি তাদের মধ্যেও পরব্রহ্মের পরমেশ্বরের পর-মাত্মার পরিপূর্ণ আভাস আমরা পাই। পরমেশ্বরের বিশ্বাতীত স্থিতি আছে নিশ্চয়ই, তাঁর অরূপত্বও আছে নিশ্চয়ই, তাঁর নিরাকারত্বও আছে নিশ্চয়ই—অনেকেই যা উপলব্ধি করেছেন, পণ্ডিত-গণের মধ্যে যা অনেকেই বলে থাকেন। কিন্তু তাঁর বিশ্বলীন স্থিতি, তাঁর বিশ্বরূপত্ব, তাঁর সাকারত্ব অর্থাৎ এই বিশ্বেই তাঁর সানন্দ-সাগ্রহ-সানুগ্রহ-প্রকাশ কি আরও মধুরমোহন আরও শান্তিকারণ আরও তৃপ্তিপ্রাপণ নয় শতগুণে?

শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা সাধকের মনের এই ভাবটিরই, এই অনুভূতিরই, এই বিশ্বাসেরই প্রতীক। মা আছেন, আমাদের মধ্যেই আছেন, সর্বত্রই আছেন, সর্বদাই আছেন, সর্বথাই আছেন—একবার তাঁর প্রতি গভীরতম শ্রদ্ধা-প্রীতি-আদর-ভালবাসার উদ্রেক যদি আমাদের মনে হয় এইভাবে, তাহলেই তো সাকার-নিরাকার, বিশ্বরূপ-অরূপ, বিশ্বলীন-বিশ্বাতীত, স্বপ্রকাশ-অপ্রকাশ প্রমুখ সকল অসংখ্য দর্শন ও ন্যায়শাস্ত্র-সম্মত সমস্যার সমাধান হয়ে যায় এক নিমেষেই। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সাকার-নিরাকার দু-ই মানতে বলতেন। সাকারবাদীদের টানটুকু নিতে বলতেন—যে প্রণালীই আমরা গ্রহণ করিনা কেন।

"আবাহনং ন জানামি, ন জানামি বিসর্জনম্।
ন জানামি পূজাং চৈব, গতিস্ত্বং পরমেশ্বরি॥"

"না জানি আবাহন, না জানি বিসর্জন, না
জানি পূজা মন্ত্রচয়।
জানি শুধু, মাতঃ, তুমিই গতি, পরমেশ্বরী
ভববন্ধনক্ষয়॥"

* বলা বাহুল্য, ইহা সনাতন ধর্মেতর সগুণ নিরাকারবাদীদের দৃষ্টি; সনাতন ধর্মের নির্গুণ নিরাকারবাদী বা অদ্বৈতবাদিগণ জগৎবোধ থাকাকালে তাহার সবকিছুর ভিতর নিজেকে বা ব্রহ্মকে দেখিতে শেখান।—সঃ

বর্তমান শিক্ষাসঙ্কট

ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার

শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিয়াছিলেন যে, যখনই ধর্মের গ্লানি হইবে তখনই আমি জগতে আবির্ভূত হইব। বর্তমান কালে ব্যাপক অর্থে ধর্মের গ্লানি যে চরমে পৌঁছিয়াছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আমার মতে গীতার উল্লিখিত শ্লোক আমাদিগকে এই নির্দেশ দেয় যে, যখনই সমাজে বা রাষ্ট্রে গুরুতর সঙ্কট দেখা দেয়, তখনই আমরা যুগপ্রবর্তক মহাপুরুষদের আদর্শ ও নির্দেশ স্মরণ করিলে হয়ত উদ্ধারের পথ দেখিতে পাইব, অথবা তাহার ইঙ্গিত পাইব। সম্প্রতি আমাদের দেশে যে সমুদয় সঙ্কট দেখা দিয়াছে তাহার মধ্যে শিক্ষার সঙ্কটই আমার নিকট সর্বাপেক্ষা গুরুতর বলিয়া মনে হয়। এবং এ বিষয়ে আধুনিক যুগের একজন মহাপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দ যাহা বলিয়াছেন তাহাই এই সঙ্কট হইতে মুক্তিলাভের একমাত্র পথ বলিয়া মনে করি। যদিও বর্তমানকালে সকলেই মোটামুটি ভাবে শিক্ষার চরম দুরবস্থার বিষয় অবগত আছেন—তথাপি এ সম্বন্ধে সংক্ষেপে কয়েকটি সর্ববাদিসম্মত তথ্যের উল্লেখ করিতেছি।

স্বাধীনতালাভের পরে সকলেই ভাবিয়াছিলেন যে, বিজাতীয় পদ্ধতিতে শিক্ষার ফলে আমাদের জাতীয় জীবনে বহু অনিষ্ট হইয়াছে অতঃপর জাতীয়ভাবে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিয়া জাতিকে খুব উন্নত করিতে পারিবেন। স্বাধীনতালাভের পর ২৬ বৎসর অতীত হইয়াছে। যে বাংলাদেশ ইংরেজ আমলে উচ্চ শিক্ষায় ভারতে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইত, পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনা করিলেই তাহার উন্নতি কতদূর হইয়াছে তাহা সহজেই বোঝা যাইবে।

পশ্চিমবঙ্গে যে কয়টি বিশ্ববিদ্যালয় আছে সব কয়টিতেই ছাত্রদের সহিংস আন্দোলনের ফলে কোন প্রকার শিক্ষাদান প্রায় অসম্ভব হইয়াছে। ধর্মঘট ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও অন্য কর্মচারীদের ঘেরাও প্রায় দৈনন্দিন ঘটনায় পৌঁছিয়াছে। পরীক্ষা ব্যাপারে খোলাখুলি এমন ব্যাপকভাবে টোকাটুকি অর্থাৎ বই দেখিয়া প্রশ্নোত্তর লেখা প্রচলিত হইয়াছে যে, পরীক্ষা একটি প্রহসনে পরিণত হইয়াছে। ধর্মঘট ও ব্যাপকভাবে বিভিন্ন রাজনৈতিক মতানুযায়ী দলবদ্ধ সংগঠন কেবল বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে—ছাত্রদের মধ্যেও ব্যাপকভাবে প্রচলিত হইয়াছে। এ কথা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না যে, শিক্ষায়তনে শিক্ষক, ছাত্র ও কর্মচারিগণ শিক্ষা অপেক্ষা রাজনীতিক কলাকৌশলকেই প্রাধান্য দিয়াছেন এবং দিতেছেন। ইংরেজ আমলে, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরে ৯০ বৎসর পর্যন্ত শিক্ষার যে অগ্রগতি হইতেছিল তাহা সম্পূর্ণরূপে ব্যাহত হইয়াছে এবং এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে বর্তমান যুগের ন্যায় বিশৃঙ্খলা, চরম বিপর্যয় ও দুরবস্থা কখনও হয় নাই। ইংরেজ শাসনে দেশের গুরুতর রাজনৈতিক আন্দোলনের সময়েও বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমানার মধ্যে ছাত্রদের হস্তে উপাচার্যের অপঘাত মৃত্যু—অথবা উপাচার্যের উপস্থিতিতেই ছাত্রদলের সংঘর্ষ ও তাহার ফলে একজনের মৃত্যু—যাহা পশ্চিমবঙ্গে ঘটিয়াছে—এবং ছাত্রদল কর্তৃক বিশ্ববিদ্যালয়ের বাড়ীতে আগুন লাগানো—যাহা লখ্‌নৌ-এ ঘটিয়াছে—কেহ

কল্পনাও করিতে পারে নাই। অন্য সব উপদ্রবের কথা বিস্তারিত বর্ণনার প্রয়োজন নাই।

স্বভাবতই মনে এই প্রশ্ন জাগে যে, স্বাধীন ভারতের গর্বর্নমেণ্ট গত ২৬ বৎসর শিক্ষার উন্নতি বিধানের জন্য কি করিয়াছেন অথবা কি করেন নাই যাহার জন্য আজ আমাদের এই দুরবস্থা ও চরম সঙ্কট।

স্বাধীনতা-লাভের অব্যবহিত পরেই স্যর সর্বেপল্লী রাধাকৃষ্ণনের নেতৃত্বে একটি কমিশন গঠিত হয়। যথারীতি শিক্ষার সর্বাঙ্গীণ উন্নতির পরিকল্পনা বিশালকায় রিপোর্টের মাধ্যমে লোক-চক্ষুর গোচর হয় ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে। এবং যথারীতি সে সম্বন্ধে আর কিছু শোনা গেল না।

পনেরো বৎসর পরে আবার গর্ভর্নমেণ্ট শিক্ষার উন্নতি সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠিলেন। ১৯৬৪ খ্রীঃ অধ্যাপক ডি. এস. কোঠারীর নেতৃত্বে আবার একটি কমিশন গঠিত হইল। এবারে গবর্নমেণ্ট আর কেবল ভারতীয়দের উপর নির্ভর করিলেন না। ইংলণ্ড, রাশিয়া, ফ্রান্স, জাপান, এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র হইতে বড় বড় শিক্ষা-বিদ্ কমিশনের সদস্যপদে নিযুক্ত হইলেন। কেবল সদস্যদের দিক দিয়া নহে, এই কমিশনের সব কিছুই বিশালাকারে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শিক্ষার সমস্ত বিভাগে—আগামী বিশ বছরের এক বিস্তৃত পরিকল্পনা অনুযায়ী শিক্ষার উন্নতির সম্বন্ধে উপদেশ ও নির্দেশ বহন করিয়া এবং শিক্ষার খাতে তৎকালে বার্ষিক ছয় শত কোটি টাকা ব্যয়ের পরিবর্তে চারি সহস্র কোটি ব্যয়ের বরাদ্দ করিয়া এই বিশাল রিপোর্ট প্রকাশিত হইল। কিন্তু আজ পর্যন্তও রাধাকৃষ্ণন কমিশনের মতো এ কমি-শনের রিপোর্টও গুদামজাত হইয়া আছে।

কয়েক মাস পূর্বে ভারত গভর্নমেণ্ট কলি-কাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চরম দুরবস্থা ও বিশৃঙ্খলার সংবাদে উদ্বিগ্ন হইয়া শিক্ষা-প্রণালীর নিয়ম পরি-বর্তনের জন্য একটি কমিটি গঠন করেন। এই কমিটির সেক্রেটারি এ সম্বন্ধে আমার অভিমত লিপিবদ্ধ করিয়া পাঠাইতে অনুরোধ করেন—ইহার উত্তরে আমি লিখিয়াছিলাম যে, সাধারণ ব্যবস্থা বা নিয়ম কানুনের কিছু অদল বদল করিয়া বর্তমান সমস্যার সমাধান বা সঙ্কট হইতে মুক্তি-লাভ করা যাইবে না। প্রমাণস্বরূপ পূর্বোক্ত দুইটি কমিশনের উল্লেখ করিয়াছিলাম। আমি সংক্ষেপে এইটুকু বলিয়াছিলাম যে, কেবল নিয়ম কানুন বদলাইলেই শিক্ষা-সমস্যায় সমাধান হইবে না। ইহার জন্য চাই খাঁটি মানুষ এবং আমাদের শিক্ষার আদর্শ হওয়া উচিত—প্রধানতঃ মনুষ্যত্ব ও চরিত্রগঠন এবং সর্ববিধ জ্ঞানের অর্জন।

আমার এই মতটি স্বামী বিবেকানন্দের বহুরূপে উচ্চারিত মতের প্রতিধ্বনি মাত্র। এইবার এই প্রবন্ধের গোড়াতে যাহা বলিয়াছি তাহার অর্থ বোঝা যাইবে। ধর্মের গ্লানি অর্থাৎ দেশের বা জাতির চরম দুরবস্থার সময় মহাপুরুষদের বাণী স্মরণ করিলে অনেক সময় উদ্ধারের যথার্থ পথ খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে। স্বামী বিবেকানন্দ প্রধানতঃ ধর্ম বা আধ্যাত্মিক বিষয়ের আলোচনা করিলেও শিক্ষা ও হিন্দুসমাজের সংস্কার বিষয়ে অনেক উপদেশ দিয়াছেন। আজ এই শিক্ষা সঙ্কটের দিনে তাঁহার উপদেশগুলি আমার কাছে খুব মূল্যবান মনে হয়। সুতরাং আমি তাঁহার বাণী যতটকু হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছি—তাহাই সংক্ষেপে ব্যক্ত করিব।

শিক্ষার আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে স্বামীজী বলিয়াছেন যে, প্রকৃত শিক্ষার উদ্দেশ্য মানুষের চরিত্র গঠন (man-making, character-building), শারীরিক ও মানসিক শক্তির উৎকর্ষ-সাধন (developments of physical as well as moral strength)। শিক্ষাবিষয়ে তাঁহার অন্যান্য অনেক উক্তির মধ্যে এইটিই সর্বপ্রধান।

মুখে সকলেই ইহার যাথার্থ্য স্বীকার করিবেন—কিন্তু কার্যতঃ যে সমুদয় শিক্ষাসংস্কার হইয়াছে তাহার সহিত পূর্বোক্ত আদর্শ বা উদ্দেশ্যের কোন সম্বন্ধ নাই।

গভর্নমেণ্টের শিক্ষাসংক্রান্ত কার্যপ্রণালী দেখিলে মনে সন্দেহ জাগে—যে, পূর্বোক্ত আদর্শ ও উদ্দেশ্য তো দূরের কথা সুনির্দিষ্ট কোন প্রকার আদর্শ বা উদ্দেশ্য দ্বারাই শিক্ষাবিভাগ পরিচালিত হইতেছে কি? এবং মনে হয়, ইহার ধারণা যে, যত অধিক পরিমাণে অর্থ ব্যয় করা যাইবে ততই শিক্ষার উন্নতি হইবে

বড় বড় কমিশনের রিপোর্ট বাহির হইয়াছে, শিক্ষার খাতে অর্থব্যয়ের পরিমাণও বাড়িয়াছে কিন্তু শিক্ষার উন্নতি দূরে থাকুক ক্রমশই অবনতি বৃদ্ধি পাইতে পাইতে চূড়ান্তে পৌঁছিয়াছে। ইহার কারণ কি? অতঃপর এই প্রশ্নটিই আলোচনা করিব। শিক্ষার কোন প্রকার উন্নতি সাধন করিতে হইলে এবং স্বামী বিবেকানন্দ-কথিত আদর্শ ও উদ্দেশ্য কার্যে পরিণত করিতে হইলে প্রথম প্রয়োজন উপযুক্ত শিক্ষকের। আমরা এই কথাটি ভুলিয়া যাই যে, পাঠ্য-সূচী ও পাঠ্য প্রণালীর যতই পরিবর্তন করা হউক না কেন—যতদিন না উপযুক্ত শিক্ষকের হস্তে শিক্ষার ভার ন্যস্ত হয়, এবং শিক্ষায়তনের এবং শিক্ষাসংক্রান্ত শাসনের সর্বপ্রকার দায়িত্ব ও কর্তব্য উপযুক্ত পরিচালকের উপর অর্পিত না হয় ততদিন শিক্ষার কোন প্রকৃত উন্নতি সম্ভব নহে। অথচ এই দুইটিরই যে সম্পূর্ণ অভাব—তাহার প্রমাণ আমরা বিগত ২৫ বৎসর ধরিয়া পদে পদে পাইতেছি। উভয় ক্ষেত্রেই প্রকৃত মানুষের একান্ত অভাব। পূর্বোক্ত কোঠারি কমিশন এ বিষয়ে যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি:

"Today the nation is facing, as never before, the challenge of hunger, unemployment, ill health and poverty. A vital element which would help the country to meet this challenge is a revitalized education, which in its turn can only be created if a leaven of idealistic teachers and administrators exists."

ইহার ভাবার্থ এই যে, আজ দেশে যে প্রকার অন্নাভাব, বেকারসমস্যা, স্বাস্থ্যের অভাব এবং দারিদ্র্য বিরাজ করিতেছে, পূর্বে তাহা কখনও হয় নাই। ইহার প্রতীকারের জন্য প্রধানতঃ আবশ্যক—পুনরুজ্জীবিত প্রাণশক্তিদায়িনী শিক্ষা। এবং আদর্শ শিক্ষক ও শিক্ষা-কর্তৃপক্ষ সৃষ্টি করিতে না পারিলে এরূপ শিক্ষার প্রবর্তন অসম্ভব।

যাহারা দেশের শিক্ষা ও সর্ববিধ সুখদুঃখের নিয়ন্তা তাহাদের মনে এই কথা কয়টি স্বর্ণাক্ষরে খোদিত করিয়া রাখা প্রয়োজন।

স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন যে, খালি পেটে ধর্ম হয় না। কোঠারি কমিশনও শিক্ষা প্রসঙ্গে ঠিক সেই কথাই আরও স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন যে, খাদ্য-সমস্যা আজ যেমন গুরুতর-ভাবে দেখা দিয়াছে পূর্বে তাহা কখনও হয় নাই (we are faced with the problem of hunger as never before). এবং তাহার পরই বলিয়াছেন যে, জাতীয় জীবনের অন্যান্য বড় বড় সমস্যা দূর না করিলে শিক্ষাসমস্যার সমাধান অসম্ভব।

"Educational and national reconstructions are intimately interrelated and that it will not be possible to make much headway in education unless the basic problems of life are also squarely faced and resolutely tackled."

এই কথাগুলি আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি

এবং প্রকাশ্যে বহুবার এই মত ব্যক্ত করিয়াছি যে, আমাদের জাতীয় জীবনে যে পঙ্কিলতা ও কলুষ সর্বত্র এবং উচ্চনীচ সকল শ্রেণী ও সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যাপকভাবে দেখা দিয়াছে শিক্ষার কলুষ তাহার একটি অঙ্গ মাত্র; সুতরাং জাতীয় কলুষ নিবারণের চেষ্টা না করিয়া কেবল শিক্ষা বা অন্য বিভাগে সংস্কারের চেষ্টা পণ্ডশ্রম মাত্র। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "এ কেবল ফুটা পাত্রে জল ঢেলে দিবারাত্রে…।" স্বাধীনতার পরবর্তী ২৫ বছরে আমাদের গভর্নমেণ্ট অনেক কলকারখানা, ব্যাঙ্ক, জীবনবীমা কোম্পানি প্রভৃতির ক্ষেত্রে জাতীয়-করণ (nationalisation) নীতি অবলম্বন করিয়াছেন—ইহাতে যে বিশেষ কোনও সুফল হয় নাই তাহার কারণ ইহার সঙ্গে সঙ্গে অন্য কয়েকটি জিনিসেরও জাতীয়-করণ আরও সম্পূর্ণভাবে আপনা আপনিই ঘটিয়াছে—যথা দুর্নীতি, উচ্ছৃঙ্খলতা এবং কর্মশক্তি ও কর্তব্যজ্ঞানের অভাব। আজ জাতীয় জীবনের এমন ক্ষেত্র কমই আছে যেখানে অসৎ উপায়ে ধনোপার্জন ব্যাপকভাবে দেখা দেয় নাই। উচ্ছৃঙ্খলতার প্রত্যক্ষ নিদর্শন প্রতিদিন খবরের কাগজ খুলিলেই দেখা যাইবে। এ সকল আমাদের জাতীয় জীবনে আজ এমনভাবে শিকড় গাড়িয়াছে যে তাহার উৎপাটন অতি দুরূহ ব্যাপার। সমগ্র দেশব্যাপী এই অসাধুতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা যে শিক্ষক ছাত্র ও শিক্ষাপরিচালকদের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িবে ইহাতে আশ্চর্য বোধ করিবার কোন কারণ নাই। বরং শিক্ষকদের বেলা একটা কৈফিয়ৎ দেওয়া যায় যে অভাবে স্বভাব নষ্ট হয়। অনেকটা এই কারণে এবং কতকটা চতুর্দিকের কলুষের প্রভাব যে শিক্ষকশ্রেণীকেও আদর্শচ্যুত করিয়া তুলিবে ইহাতে আশ্চর্যবোধ করিবার কারণ নাই। যে যুগে রাজনীতিক ক্ষমতাই মানুষের সম্মান ও সামাজিক মর্যাদার একমাত্র মাপকাঠি, সে যুগে শিক্ষকেরাও যে শিক্ষাকার্যে অবহেলা করিয়া রাজনীতির চর্চায় অধিকতর মনোযোগী হইয়া উঠিবে ইহাও খুব অস্বাভাবিক নয়। এবং শিক্ষকশ্রেণীর এই পরিবর্তনের ফলে একদিকে ছাত্রদল ও অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয় ও স্কুল-কলেজের কর্তৃপক্ষ (যাহাদের মধ্যে অনেকেই শিক্ষক) এই উভয় শ্রেণীর মধ্যেও অনুরূপ পরিবর্তন দেখা দিল। ছাত্রদল পড়াশুনার অপেক্ষা নূতন নূতন রাজনৈতিক মতবাদ গ্রহণ ও প্রচারেই মনোযোগ দিল বেশী এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দল সাগ্রহে শিক্ষক ও ছাত্র এই উভয় সম্প্রদায়কে দলের প্রচলিত রাজনীতিক বুলিতে আকৃষ্ট করিয়া দলবৃদ্ধির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

আজ দেশের শিক্ষায়তনগুলিতে যে তাণ্ডব নৃত্য চলিতেছে এবং শিক্ষক ও ছাত্রের সহিংস ও অহিংস আন্দোলনের যে সমুদয় প্রমাণ প্রত্যহ প্রত্যক্ষ করিতেছি এই ভাবেই ধীরে ধীরে তাহার উদ্ভব হইয়াছে এই মূল কারণটি অগ্রাহ্য ও অস্বীকার করিয়া শিক্ষাপ্রণালীর ঈষৎ পরিবর্তন বা শিক্ষাবিষয়ের পরিবর্তনের চেষ্টায় কোন ফললাভ হইবে না। গোড়ায় জল না ঢালিয়া মাথায় জল ঢালিলে যেমন গাছ বাঁচে না তেমনি কমিটি, কমিশন, পাঠ্য সূচী ও পাঠ্য প্রণালীর পরিবর্তন, এবং মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের দশ হইতে এগারো ক্লাস, পরে আবার এগারো হইতে দশ, এবং পাঠ্য বিষয়ের গুরুতর মৌলিক পরিবর্তনে ; যাহার ফলে ষষ্ঠ শ্রেণী—Class VI অর্থাৎ ২ বছরের ছেলেদের এমন বিষয় পাঠ্য-সূচীভুক্ত করা হইয়াছে যাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরাও অনেকেই জানেন না স্কুলের শিক্ষক তো দূরের কথা এবং যাহা আমিও কোনদিন শুনি নাই, যেমন পাল যুগের বাংলা বৈষ্ণব পদাবলী)—বাঙালী ছেলেমেয়েদের শিক্ষার কোন উন্নতির সম্ভাবনা নাই।

এখন প্রশ্ন এই যে, গোড়ায় যে গলদ তাহা দূর করিবার উপায় কি? রামায়ণে একটি কাহিনী আছে যে, এক ব্রাহ্মণের একমাত্র পুত্রের অকাল মৃত্যু হইলে তিনি শ্রীরামচন্দ্রকে বলিলেন যে, এই মৃত্যুর জন্য তিনিই দায়ী কারণ রাজার অধর্মই এই সকল অস্বাভাবিক বিপত্তির কারণ। বর্তমান যুগে আমরা অবশ্য এ কথা বিশ্বাস করিনা—কিন্তু ইহার ভিতরে যে কিছু সত্য নিহিত আছে—অর্থাৎ রাজ্যের দুর্দশা দুর্গতির জন্য রাজার দায়িত্ব খুব বেশী—সে কথা আমাদের শাস্ত্রে আরও স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে।

শিক্ষাসমস্যা, দারিদ্র্যসমস্যা, বেকারসমস্যা প্রভৃতি সমস্যা বিচ্ছিন্নভাবে দেখিলে তাহার সমাধান হইবে না। গবর্নমেন্টের পরিচালিত বড় বড় কারখানায় যে বেশীর ভাগই লোকসান হইতেছে, বড় বড় বিভাগের বড় বড় কর্মচারীদেরও বহু অন্যায়ের কথা যে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইতেছে—ঘুষ না দিলে যে জীবনযাত্রা নির্বাহ করা যায় না (যাহা একজন অবসরপ্রাপ্ত প্রাদেশিক গভর্নর শ্রীপ্রকাশ তাঁহার বাল্যবন্ধু পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকে বলিয়াছিলেন, এবং পরে একথা সংবাদপত্রে লিখিয়াছিলেন)—এ সমস্তই অবিসংবাদিত সত্য। সুতরাং যতদিন এই অবস্থা দূর না হইবে, ততদিন শিক্ষা, অর্থনীতি, শিল্প, ব্যবসায় প্রভৃতির প্রকৃত সংস্কার কোন মতেই সম্ভব নহে। একটি প্রবাদবাক্য আছে—

"শিরে কৈল সর্পাঘাত তাগা বান্ধিব কোথা।"

—এ সম্বন্ধে আর বেশী কিছু বলা সঙ্গত নয় কারণ আমি রাজনীতিক আলোচনা করিতে চাহি না।

উপসংহারে আবার গোড়ার কথায় ফিরিয়া যাই। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন, শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য মানুষ গঠন করা—সেই লক্ষ্য আমাদের সম্মুখে রাখিতে হইবে। ইহা হইতে যদি কেহ মনে করেন যে, স্বামীজী কেবল ধর্ম বা আধ্যাত্মিক শিক্ষার উপর জোর দিয়াছেন তাহা হইলে খুব ভুল করা হইবে। স্বামীজী প্রাচ্যের অতীত জ্ঞানভাণ্ডার ও পাশ্চাত্যের বর্তমান শিল্প-বিজ্ঞানের শিক্ষার উপর সমান জোর দিয়াছেন। স্ত্রীশিক্ষা ও সাধারণ জনগণের শিক্ষার সম্বন্ধে তিনি খুব সচেতন ছিলেন। আজকাল যে Job-oriented education (অর্থাৎ জীবিকানির্বাহের উপযোগী শিক্ষার) সম্বন্ধে খুব আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে, সে বিষয়েও স্বামীজী পরিষ্কার নির্দেশ দিয়াছেন। স্বামীজী বলিয়াছেন যে, শিক্ষার প্রণালী এমন হইবে যে ভারতের অতীত গৌরব ও পাশ্চাত্য জাতির টেকনিক্যাল বিজ্ঞান উভয়েরই ব্যবস্থা থাকিবে এবং সাধারণ লোকের শিক্ষা (mass education) এমন হইবে যাহাতে তাহারা জীবিকা অর্জন করিতে সক্ষম হয়। কিন্তু এসকলই শিক্ষার বাহ্য অঙ্গ মূল উদ্দেশ্য হইল চরিত্র-গঠন—মানুষের সৃষ্টি।

স্বামীজী যাহা বলিয়াছেন বর্তমান যুগে সেই আদর্শই আমাদের দেশকে ধ্বংসের পথ হইতে বাঁচাইতে পারে। কিন্তু এ বিষয়ে কোঠারী কমিশন যাহা বলিয়াছেন তিনটি সূত্রের আকারে তাহা বলিয়াই এ প্রবন্ধ শেষ করিব।

১। শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য মনুষ্যত্ব বা চরিত্র গঠন। এরূপ শিক্ষার জন্য চাই উপযুক্ত শিক্ষক ও উপযুক্ত শিক্ষা-কর্তৃপক্ষ; ইহার জন্য চাই—

২। জাতীয় জীবনের কয়েকটি মৌলিক সমস্যা -দারিদ্র্য—বিশেষতঃ অন্নাভাব, বেকার-সমস্যা প্রভৃতি যথাসম্ভব দূর করা। তার জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন—

৩। শাসনযন্ত্রে ও জীবনের সর্ববিভাগে যে দুর্নীতি, উচ্ছৃঙ্খলতা ও কর্তব্যকর্মে অবহেলা ব্যাপকভাবে সর্বগ্রাসী আকারে ছড়াইয়া পড়িয়াছে তাহা সমূলে ধ্বংস করা সম্ভব না হইলেও যথাসাধ্য দূরীকরণের প্রকৃত চেষ্টা করা। ইহা ছাড়া আর কোন উপায় নাই। 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়'।

নাম ও নামী

স্বামী মহানন্দ

নাম আর নামী। কে জানে বাপু তোমার "নামী"টিকে ? কিন্তু নিজের নামটা যে প্রাণস্পর্শী ভাবের মমতাময় মাধুরীতে ঘিরে অতি আপনার—সেটুকু তো আমরা সকলেই বুঝি।

সেই ছোট্ট বয়স থেকে আজও—এই জীবনের সায়াহ্নে এসেও—নামের সঙ্গে আমার সত্তা যে একীভূত—অঙ্গাঙ্গিভাবে বিধৃত একথা ছেড়ে অন্য কথা ভাববার প্রয়াসটুকুও যে আমার কাছে অসহনীয়! শুধু কি তাই ? আমাকে নাম ধরে ডাকবার সুরে যখনি কারো দরদ বা প্রীতি ফুটে উঠেছে তখনি আমার হৃদয় উঠেছে নেচে। আবার, যখনি ঐ ডাকে কোন-রূপ বিরক্তির ফুট ওঠে তখনই তা আমার মনকে জর্জরিত করে হাজার ব্যথার ছুঁচ ফুটিয়ে। অথচ, বড় হয়ে—ভারতীয় সনাতন শাস্ত্রের নিবিড়তার মাঝে ডুবে বুঝেছি—নাম ধরে ডাকা মানে, একটা শুধু ফুৎকার সৃষ্টি করা—অর্থাৎ মানবের কণ্ঠনালীর ভেতর দিয়ে বাতাসের এটি একপ্রকার উৎসরণ মাত্র ; তখন যুক্তিতে ওটার মূল্যায়ন শূন্য বলে ধরে নিলেও, মায়ার মোহময় মমত্বে, তা মানতে রাজী হই না। যতই বোঝাও ওটা ঝড় নয়, ঝঞ্ঝা নয়—নিদেনপক্ষে, একটা প্রবল বাতাসের আলোড়নও নয়,—ওটা কেবল একটা সামান্য প্রশ্বাস মাত্র—ওর কোন **intrinsic value** (স্বগত মূল্য) নেই ; তবুও ঐটুকু হাওয়ারই কী জোর, কী দাপট, কী মোহ !! আমরা সব ছাড়তে পারি, কিন্তু অপরের গলার হাওয়ায়-তৈরী ঐ নিজের নামটাকে ছাড়তে একেবারেই নারাজ !!! তখন যতই বোঝাও—"তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ" —(ঈশোপানিষদ্) সেই অনিবার্য ত্যাগের দ্বারাই জীবনের আনন্দ-রস-ধারা ভোগ করতে হবে, তবুও ত্যাগের সেই আত্যন্তিক ইচ্ছা থাকে কোথায়, যখনি কেউ 'নাম' ছেড়ে 'নামী'কে 'আমি-আমি'-কে ছেড়ে, আমির কর্তাকে ধরতে বলে ?

আমার নাম, তোমার নাম, এটার নাম, ওটার নাম, সবার নাম—শাস্ত্র বুঝিয়েছে, ব্রহ্মজ্ঞেরা অভিজ্ঞতার সায় দিয়ে বলেছেন—ওর সবটাই ঝুটা ; তবুও মন মানে না। যখনি কেউ ডেকেছে নাম ধরে, যখনই সাড়া দিয়েছি ঐ নামে, তখনি 'নাম' ও 'আমি' ওতপ্রোতভাবে এক কল্পনা-মনীষার স্বপ্নলোকে জড়িয়ে গেছি। সেই ছোট্ট-বেলা থেকে আজও আমার নামের পেছনে তাই আকুল আকুতি। এ একটা নিছক আলেয়ার পেছনে ছোটা জেনেও, চিরকাল, তারই পেছনে ছুটেই চলেছি। এটা একটা অবাস্তব আকাশ-কুসুম জেনেও, তার রঙ ও গন্ধ পাবার অলীক আশায় আজও আমি তাই উতলা।

আমরা হলাম জ্ঞানপাপী। জানি ওটা জানার বস্তু নয়—সার্থক সংগ্রহের সম্যক্ সামগ্রীও নয়—তবুও না-জানার পথেই চলি। অধঃপতনের সম্মোহনী পথের পথিক হয়েছি আমরা তাই, সবকিছু জেনেশুনেই। নামকে উপভোগ করার প্রসঙ্গে 'বৈরাগ্য-শতকম্'-এর সেই অমোঘ পঙ্‌ক্তি দুটি মনে পড়ছে—

> ভোগা ন ভুক্তা বয়মেব ভুক্তাঃ
> তপো ন তপ্তং বয়মেব তপ্তাঃ।
> কালো ন যাতো বয়মেব যাতাঃ
> তৃষ্ণা ন জীর্ণা বয়মেব জীর্ণাঃ ॥ ৭

বিদগ্ধ কবি নৈরাশ্যের চোরাবালিতে ডুবে, হাহাকারের আর্তনাদ তুলে, বলছেন—কত

আশা নিয়ে সংসারের সুখভোগ করতে এসেছিলাম, কিন্তু, এখন দেখছি, সংসারকে ভোগ করতে পারিনি ; বরং সংসারই আমাদের উপভোগ করে ছেড়েছে। আমাদের শাশ্বত শান্তির জন্য তপ করবার কথা, কিন্তু উল্টে আমরা নিজেরাই সন্তপ্ত হচ্ছি। আমরা মহাকালকে অতিক্রম করে, অমৃতাস্বাদ পেতে গিয়ে দেখছি, মহাকালই কখন আমাদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে। বিষয়-তৃষ্ণা জীর্ণ করতে গিয়ে দেখছি, বিষয়-তৃষ্ণাই আমাদের জীর্ণ করে ছেড়েছে।

তা ছাড়বেই বা না কেন? সেই জ্ঞানোন্মেষের শুরু থেকেই তো আমাদের চারদিকে, সৌভাগ্যের স্বর্ণমৃগসন্ধানীদের সকলেই—মাতাপিতা সমেত প্রায় সবাই-- আমাদের নামের পেছনে ছোটার লালসা-লাঞ্ছিত দীক্ষা দিয়ে এসেছেন। সকলেই বলেছেন, নাম ক'রে যাও, তাহলেই মান পাবে। যো-সো ক'রে, টুকে-ফুকে বিদ্যার্জন কর—নাম পাবে; চুরি-বাটপারি ক'রে অর্থ উপার্জন কর, নাম পাবে। আর একবার নাম ক'রে ফেলতে পারলেই—অঙ্কশাস্ত্রের সহজ সমীকরণ প্রথায় মানও এসে জুটবে। কারণ, 'নাম'টাকে উল্টে দেখলে—আক্ষরিক ভাবেই দেখবো 'মান' পেয়ে গেছি। নাম আর মান তো একই মুদ্রার এ-পিঠ, ও-পিঠ। ঐ মোহ-মুদ্রার আকর্ষণ-ত্যাগ কি সোজা কথা!

ছোট বয়সে আমাদের এই বিকৃত শিক্ষা-পরিবেশের মধ্যে, নাম-কে ছাড়বার অর্থাৎ 'আমি-আমি-'কে ত্যাগ করবার সাধনা বা শিক্ষাই তো আজকাল নেই - তা আমরা নাম ছাড়ব কী ক'রে? কোথায় আজকাল সেই সব মদালসার মতো মা, যিনি শিশুর দোলনা দোলাতে দোলাতে শিশুকে এক গভীর-সঞ্চারী দৃষ্টি মেলে, শোনাবেন, প্রথম থেকেই, পূর্বের ঐ বিরাট ও উদার ব্যাপ্তির সাধনায় দীক্ষিত করবার জন্য—

শুদ্ধোঽসি রে তাত ন তেঽস্তি নাম
কৃতং হি তে কল্পনয়াধুনৈব।
পঞ্চাত্মকং দেহমিদং ন তেঽস্তি
নৈবাস্য ত্বং রোদিসি কস্য হেতোঃ॥

বলছেন খোকন, বাবা আমার, তুই তো শুদ্ধ আত্মা; তোর তো কোন নাম নেই। আদৌ এটা যথার্থ বা বাস্তব নয়, কেবল নিছক কল্পনার সাহায্যে তোর এই দেহের সঙ্গে, তোর এক নাম আমরা যোগ ক'রে দিয়েছি মাত্র। কিন্তু, খোকন-মণি, তুই জেনে রাখ—এই যে তোর পঞ্চভূতের দেহ, এটা তোর নিজস্ব নয়; আর তোর যা নিজস্ব তা তোর এই দেহের সঙ্গে জড়িত নয়। তবে কাঁদছিস্ কেন রে খোকন?

প্রাচীন-কালের ঐ মদালসা-মাতা এ-কালে থাকলে আমরাও, চিরন্তনের প্রতি অচ্ছুৎ অবহেলা না রেখে, আমাদের নামটা যে ঝুটা, আর আত্মা বা নামী যে সাচ্চা তা বুঝতে পারতাম। আর তাহলে আর শ্রীকৃষ্ণকে দুঃখ ক'রে বলতে হতো না—মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্ (গীঃ ৭।১৩) অর্থাৎ নামের পেছনে মোহগ্রস্ত হয়ে ছুটতে ছুটতে মানব নানান বিপর্যয়ে ভ্রান্ত; তাই মানব, ভাবের অতীত আমার ঐ অব্যয় নিরুপাধি স্বরূপ অর্থাৎ নামীর স্বরূপত্বের স্বরূপ জানতে পারে না। আর কি ক'রেই বা পারবে -- এখনকার অস্থির-মতি মানুষের আত্মান্বেষণের নিগূঢ় পরিবেশ বড্ড করুণ, এবং তা ব্যক্ত করতে হ'লে কবির ভাষায় বলতে হয়,

সুন্দরী ছায়ার পানে তরু চেয়ে থাকে
সে তার আপন তবু পায় না তাহাকে। (রবীন্দ্র)

নামীকে ভুলে কেবল নামের কাঙাল হওয়া আজকের দুনিয়ার যেন সার কথা। হীরা ফেলে কাচকে আঁচলে বাঁধার প্রয়াসে আজ আমরা তাই সবাই অটল। অথচ নামী আছে ব'লেই এই জীবন-তীর্থের গুরুত্ব আছে। এ-সব কথা আর

বুঝছে কে! জীবন-তীর্থের কোন দামই হয় না যদি তীর্থকে শুধু এক জড় তীর্থরূপে দেখি। ভাগবতে (১০।৪৮।৩১) আছে—

ন হ্যম্ময়ানি তীর্থানি ন দেবা মৃচ্ছিলাময়াঃ।
তে পুনন্ত্যরুকালেন দর্শনাদেব সাধবঃ॥

'জলময় স্থানই কিছু তীর্থ নয়, অথবা মাটি-পাথরে তৈরী মূর্তিই দেবতা নয়, এমন নয়। দীর্ঘকাল সেবিত হ'য়ে তাঁরা পুরুষকে পবিত্র ক'রে থাকেন আর সাধুগণ দর্শনমাত্রেই পবিত্র করেন।' তাই তত্ত্বদর্শীরাই তীর্থ এবং দেবতা। তাই তো এক বিখ্যাত সংস্কৃত-কবি বলেছেন, অযোধ্যায় রাম না থাকলে অযোধ্যার পেছনে ঘোরার দাম আর কতটুকু! অর্থাৎ, নামের পেছনে আত্মা-রামের খোঁজই যদি না করলে তো সবটাই ভুয়ো—

নাযোধ্যা তং বিনাযোধ্যা সাযোধ্যা যত্র রাঘবঃ—

রাম বিনা অযোধ্যা, অযোধ্যাই নয়; রাম যেখানে আছেন সেখানেই অযোধ্যা। এই সঙ্গে ভুললে চলবে না, যে নামী আছে বলেই পার্থিব সকল বস্তুকে আমরা আস্বাদন করবার ও জীয়ন-কাঠি ছুঁইয়ে প্রাণ দেবার নূন খুঁজে পাচ্ছি। এবিষয়ে বেদের বাণী দ্ব্যর্থহীনভাবে সোচ্চার—তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি—তাঁর জন্যই সব কিছু প্রকাশমান ও আস্বাদনময় হচ্ছে।

তাই আবার বলি, নামের গণ্ডী ছাড়িয়ে যেদিন অনাসক্তির গভীর নির্বেদে ওতপ্রোত হ'য়ে নামীর কথা ভাবব, মান ভুলে সত্যকার রত্ন আহরণের অভিযানে বেরিয়ে, মানীর কথা অতন্দ্র স্মরণ করব, সেই দিন থেকেই তো আমাদের এই জীবনের বহুধা ক্ষেত্রে চলা হবে সার্থক। যেদিন 'প্রেয়ে'র পথ ছেড়ে 'শ্রেয়ে'র তুরীয়-লোকের পথ ধরব, সেই দিনই তো হবে আমাদের মুক্তি—আমাদের এক অবারিত আনন্দে ভরপুর হওয়ার সার্থকতা। তখনই তো সোচ্চার হবে আমাদের কণ্ঠে নাম ছাড়, মুক্তি পাবে; মান ছাড়, মোক্ষলাভ করবে। তখনই তো প্রাণের কেন্দ্রে যথার্থ অনুরণিত হবে—

যদা নাহং তদা মোক্ষো যদাহং বন্ধনং তদা।
মত্বেতি হেলয়া কিঞ্চিৎ মা গৃহাণ বিমুঞ্চ মা॥
(অষ্টাবক্রসংহিতা, ৮।৪)

অর্থাৎ যখন ঐ 'আমি-আমি' স্ফুট ওঠা বন্ধ তখনই তো মোক্ষ। যতক্ষণ 'আমি-আমি' ততক্ষণ বন্ধন। এই নিগূঢ় রহস্যটি অন্তরঙ্গভাবে জেনে, সহজভাবে, নামের পারে, কিনা—আসক্তি ও বিরাগ- এই দুয়েরই পারে চলে যাও।

কিন্তু শুধু কথায় কি চিঁড়ে ভিজবে? জলে না নেমে তো আজকাল সহজ-পন্থায় সকলেই বিছানায় শুয়ে সাঁতার শিখতে চায়;—সকলেই তো কেবল মুখে তেরে-কেটে-তাক্-বোল্ আওড়ে তবলা শিখতে চায়, সত্যকার তবলার উপরে হাত না ঠেকিয়েই।

তাই, এ-সব কথা কেই বা শোনে আর কাকেই বা শোনাই! অন্ধ, জাগরে?—অন্ধের রাত আর দিনে তফাত কোথায়!!

সনাতন হিন্দুধর্মে অর্চাবতার

শ্রীনৃসিংহবল্লভ গোস্বামী, বেদান্তাচার্য

হিন্দু চিরদিনই ধর্মপ্রাণ। ধর্মই হিন্দুর সর্বস্ব। ধর্মই হিন্দুজীবনের মূল লক্ষ্য ও তাহার জীবন-সমস্যার একমাত্র সমাধান। তাই নির্মলাত্মা, ত্রিকালদর্শী ঋষিগণ হিন্দু-সন্তানের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত যে সকল ছোট-বড় কার্যের বিধান প্রদান করিয়াছেন, তাহার সহিত ধর্ম ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

অনাদি অনন্ত 'বেদ'ই হিন্দুধর্মের মূল। মহর্ষি বেদব্যাস শ্রীমদ্ভাগবতে—'বেদপ্রণিহিতো ধর্ম' (৬।১।৩৬) অর্থাৎ বেদের দ্বারা যাহা আচরণীয় বলিয়া নির্ধারিত হইয়াছে, তাহাকেই 'ধর্ম' আখ্যা প্রদান করিয়াছেন।—'বেদো নারায়ণঃ সাক্ষাৎ' (ঐ) বেদ সাক্ষাৎ নারায়ণস্বরূপ। অতএব নারায়ণস্বরূপ সনাতন বেদ এবং বেদমূলক স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাসাদি প্রতিপাদিত সদাচার সনাতন হিন্দুধর্মরূপে স্বীকৃত।

ঈশ্বর-সাক্ষাৎকারই সনাতন হিন্দুধর্মের চরম-লক্ষ্য। শ্রীউদ্ধব মহাশয়কে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলিয়াছেন—

'এষা বুদ্ধিমতাং বুদ্ধির্মনীষা চ মনীষিণাম্।
যৎসত্যমনৃতেনেহ মর্ত্যেনাপ্নোতি মামমৃতম্॥'

(শ্রীমদ্ভা: ১১।২৯।২২)

অর্থাৎ অসত্য ও নশ্বর মানবদেহদ্বারা এই জন্মেই সত্য এবং অবিনাশী আমাকে প্রাপ্ত হওয়াই বুদ্ধিমানগণের বুদ্ধি ও মনীষিগণের মনীষার সার্থকতা। শ্রীরামকৃষ্ণদেবও এই কথাই বলিয়াছেন —'এই দুর্লভ মনুষ্যদেহ ধারণ করে যে সচ্চিদানন্দকে লাভ করতে না পারে, তার জন্মধারণই বৃথা।' পরমহংসদেবের দিব্য-আশ্রয়লাভের পূর্বে শ্রীস্বামী বিবেকানন্দজী যে সকল ধর্মাচরণপরায়ণ জনের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা ঈশ্বরসাক্ষাৎকার করিয়াছেন কিনা, এই কথাই তাঁহাদিগকে তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। নিজের মনের এই প্রশ্নের সমাধানের জন্য পরিশেষে তিনি শ্রীপরমহংসদেবকেও জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—'আপনি কি ঈশ্বরকে দেখিয়াছেন?' তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন 'হ্যাঁ দেখেছি, তোমাকে যেমন দেখছি, তার চেয়েও স্পষ্টভাবে তাঁকে দেখেছি।' পরেও তিনি প্রসঙ্গক্রমে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন: 'মানবের সকরুণ প্রার্থনা ঈশ্বর সর্বদা শ্রবণ করিয়া থাকেন এবং তোমাতে আমাতে বসিয়া যেভাবে কথোপকথন করিতেছি, ইহা অপেক্ষাও স্পষ্টতরভাবে তাঁহাকে দেখিতে, তাঁহার বাণী শ্রবণ করিতে ও তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারা যায়, এ কথা আমি শপথ করিয়া বলিতে প্রস্তুত আছি।—এই সত্যকেই উপলব্ধি করিয়া স্বামী বিবেকানন্দজী বলিয়াছেন: ধর্ম এবং ঈশ্বরের বিদ্যমানতাতেই জীবন সার্থক, সহনীয় ও সুখপ্রদ, অন্যথায় তাহা নিরর্থক ভারমাত্র।

জীবনিস্তারক ঈশ্বর জীবের প্রতি করুণা করিয়া পাঁচ প্রকারে বিরাজিত। পর, ব্যূহ, বিভব, অন্তর্যামী ও অর্চা—এই পাঁচ প্রকার তাঁহার অভিব্যক্তি। স্বয়ং তিনি বলিয়াছেন—

'এবং পঞ্চপ্রকারোঽহমাত্মনাং পততামধঃ।'

(শ্রীনারদপঞ্চরাত্র)

অর্থাৎ অধঃপতিত বহির্মুখ জীবের কল্যাণার্থে আমি উক্ত পাঁচ প্রকারে প্রকটিত। (১) 'পর' অর্থাৎ সাক্ষাৎ মূলস্বরূপ, (২) ব্যূহ' অর্থাৎ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারার্থে তত্তদ্রূপ, (৩) 'বিভব'-অর্থাৎ সৃষ্ট-ব্রহ্মাণ্ডে সাধুগণের পরিত্রাণ ও

ধর্মসংস্থাপনের জন্য দেব, মনুষ্যাদি অবতাররূপ, (৪) 'অন্তর্যামী' অর্থাৎ সমস্ত প্রাণীর হৃদয়ে অবস্থিত অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ নিয়ামকরূপ এবং (৫) 'অর্চা' অর্থাৎ সদা সকলের সেব্য শ্রীবিগ্রহরূপ।

এই 'অর্চা' অর্থাৎ শ্রীমূর্তি সাধকগণের সেব্য-রূপে সাক্ষাৎ ভগবদবতার। বেদবিধি অনুসারে প্রতিষ্ঠার দ্বারা অপ্রাকৃত স্বরূপ শ্রীভগবান অর্চা-বিগ্রহে আবির্ভূত হইয়া তাদাত্ম্যভাবে সর্বদা তথায় অবস্থিত থাকেন, সেইজন্য 'অর্চাবিগ্রহকে' 'অর্চাবতার' বলা হইয়া থাকে। অগ্নির সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত লৌহ যেরূপ অগ্নিরূপতা প্রাপ্ত হয় এবং উহাতে অগ্নির দাহকত্বাদিগুণের বিকাশ হয়, সেইরূপ প্রতিষ্ঠা বিধির দ্বারা ভগবৎস্বরূপের সহিত সদাতাদাত্ম্যপ্রাপ্ত অর্চাবিগ্রহ সাক্ষাৎ ভগবৎ-স্বরূপতা প্রাপ্ত হইয়া সাধকগণের সেবা গ্রহণ করিয়া থাকেন। 'প্রতিষ্ঠা' শব্দের ব্যুৎপত্তি-গত অর্থের দ্বারাও ইহাই প্রতিপাদিত।—'প্রকর্ষেণ তিষ্ঠতি অস্যামিতি প্রতিষ্ঠা'—অর্থাৎ শ্রীভগবান অর্চামূর্তিতে প্রকৃষ্টরূপে অবস্থান করেন, এই অর্থেই 'প্রতিষ্ঠা' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। সুতরাং সেবকগণের সেবাগ্রহণের জন্য সাক্ষাৎ শ্রীভগবানই অর্চাবিগ্রহরূপে স্বয়ং বিরাজিত। অতএব অর্চাবতারের উপাসনা শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ উপাসনা। 'বিষ্ণুধর্মোত্তরে' স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে -

'তামর্চয়েৎ তাং প্রণমেৎ তাং যজেৎ
তাং বিচিন্তয়েৎ।
বিশত্যপাস্তপাপস্ত তামেব ব্রহ্মরূপিণীম্॥'

অর্থাৎ অর্চামূর্তির অর্চন, প্রণাম, যজন এবং স্মরণ করিবে। এইভাবে তাঁহার আরাধনের দ্বারা পাপমুক্ত হইয়া জীব ব্রহ্মরূপিণী তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

অর্চাবতারের উপাসনা 'প্রতীক-উপাসনা' নহে। কারণ প্রতীক-উপাসনায় শ্রীভগবান উপাস্য নহেন। 'মনো ব্রহ্ম ইত্যুপাসীত'—এই প্রতীক-উপাসনা বাক্যে মনেরই উপাস্যত্ব বিহিত হইয়াছে, ব্রহ্মের নহে। কিন্তু অর্চাবতারের উপাসনা সাক্ষাৎ ভগবৎস্বরূপেরই উপাসনা, শ্রীভগবানই স্বয়ং অর্চাবতাররূপে উপাস্য।

অর্চার উপাদানদ্রব্য শ্রীমদ্‌ভাগবতে আট প্রকার বর্ণিত হইয়াছে—

'শৈলী দারুময়ী লৌহী লেপ্যা লেখ্যা চ সৈকতী।
মনোময়ী মণিময়ী প্রতিমাঽষ্টবিধা স্মৃতা॥'
(১১।২৭।১২)

অর্থাৎ শিলাময়ী, দারুময়ী স্বর্ণাদিধাতুময়ী, মৃত্তিকা-চন্দনাদির লেপ্যা, লেখ্যা অর্থাৎ চিত্রপটময়ী, বালুকানির্মিতা, হৃদয়ে উপাসনার জন্য ধ্যেয়রূপে মনোময়ী এবং মণিময়ী, উক্ত আট প্রকারের প্রতিমা হইয়া থাকে। কিন্তু শ্রীমূর্তির প্রতিষ্ঠার পর অর্চাবতারে শিলাদি বুদ্ধি করা মহা অপরাধ-জনক। 'অগ্নিপুরাণে' বর্ণিত হইয়াছে যে, শ্রীদশ-রথের দ্বারা কোন তপস্বীর পুত্রের মৃত্যু হওয়ায় শোকমগ্ন হইয়া বিলাপ করিতে করিতে উক্ত তপস্বী বলিয়াছিলেন—

'শিলাবুদ্ধিঃ কৃতা কিম্বা প্রতিমায়াং হরের্ময়া।
... ...
যেন কর্মবিপাকেন পুত্রশোকো মমেদৃশঃ॥'

অর্থাৎ আমি কি শ্রীহরির প্রতিমাতে শিলাবুদ্ধি করিয়াছিলাম, যাহার ফলে আমার এইরূপ দারুণ পুত্রশোক হইল?

অর্চাবিগ্রহ যে, স্বয়ং ভগবৎস্বরূপ, এ সম্বন্ধে অনেক ইতিহাস দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। শ্রীবৃন্দা-বন হইতে সাক্ষ্যপ্রদানের নিমিত্ত শ্রীগোপালজীউ পদব্রজে 'বিদ্যানগর' গমন করিয়াছিলেন, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে ইহার উল্লেখ বিদ্যমান। শ্রীবৃন্দাবন-স্থিত শ্রীগোবিন্দজীউর পুরাতন মন্দিরের নিকটে অদ্যাবধি উক্ত শ্রীগোপালজীউর মন্দিরের ধ্বংসাব-শেষ ইহার সাক্ষ্য বহন করিতেছে। উৎকলের

তৎকালীন রাজা শ্রীপুরুষোত্তম 'বিদ্যানগর' হইতে শ্রীগোপালজীউকে 'কটকে' লইয়া আসেন এবং অতিশয় শ্রদ্ধা সহকারে তাঁহার সেবার ব্যবস্থা করেন। তদবধি শ্রীগোপালজীউ 'সাক্ষীগোপাল' নামে সর্বত্র বিখ্যাত। এই প্রসঙ্গে শ্রীগোপালজীউ সম্বন্ধে অপর একটি ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। একদিন রাজমহিষী শ্রীগোপালজীউর নাসায় ধারণ করাইবার জন্য একটি বহুমূল্য মুক্তা লইয়া মন্দিরে উপস্থিত হন, কিন্তু শ্রীবিগ্রহের নাসিকায় ছিদ্র পরিলক্ষিত না হওয়ায় তাঁহাকে বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিতে হয়। রাত্রে স্বপ্নে শ্রীগোপালজীউ তাঁহাকে বলেন যে, বাল্যকালে তাঁহার মাতা তাঁহার নাসায় ছিদ্র করিয়া তাঁহাকে মুক্তা পরাইয়াছিলেন। সেই ছিদ্র এখনও তাঁহার নাসিকায় বিদ্যমান। অতএব তিনি যেন উক্ত মুক্তা তাঁহাকে ধারণ করান। মহিষী এই স্বপ্ন-বৃত্তান্ত রাজাকে জানান এবং উভয়ে দেবমন্দিরে উপস্থিত হইয়া শ্রীগোপালজীউর নাসায় মুক্তাধারণ করাইয়া পরম আনন্দিত হন। উক্ত বৃত্তান্তের দ্বারা ইহা সুস্পষ্ট যে, ভগবৎস্বরূপ ও ভগবন্মূর্তি সর্বতোভাবে অভিন্ন।

শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীল সনাতন গোস্বামীর নিকট তাঁহার আরাধ্যদেব শ্রীমদনমোহনজীউ প্রতিদিন শুষ্ক রুটি ভোজনে সক্ষম না হইয়া লবণ যাচ্ঞা করিয়াছিলেন।

উৎকলে 'রেমুণা' নামক স্থানে বিরাজিত শ্রীগোপীনাথজীউ শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের জন্য 'অমৃতকেলি' নামক ক্ষীর অপহরণ করিয়াছিলেন। তদবধি 'ক্ষীরচোরা গোপীনাথ' নামে তিনি প্রসিদ্ধিলাভ করেন। চৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত হইয়াছে—

'যস্মৈ দাতুং চোরয়ন্ ক্ষীরভাণ্ডং
গোপীনাথঃ ক্ষীরচোরাভিধোঽভূৎ।'
(২।৪।১

অর্থাৎ শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদকে প্রদান করিবার জন্য ক্ষীরভাণ্ড অপহরণ করায় শ্রীগোপীনাথজীউর নাম 'ক্ষীরচোরা' হইয়াছিল। এই সকল ঘটনার দ্বারা অর্চাবিগ্রহ যে সাক্ষাৎ ভগবৎস্বরূপ, ইহা সুস্পষ্টভাবেই অভিব্যক্ত।

কেবলমাত্র উক্ত প্রাচীন ঘটনাবলীই নহে, বর্তমান যুগেও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দিব্যজীবনে এই প্রকার অলৌকিক বৃত্তান্ত বিদ্যমান। এই প্রসঙ্গে উক্ত প্রকার কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করা সম্ভবতঃ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। দক্ষিণেশ্বরে শ্রীমৎ তোতা-পুরী আগমন করিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতি দৃষ্টি পড়িবামাত্র তাঁহাকে বেদান্তসাধনের উপযুক্ত অধিকারী অনুভব করিয়া তিনি স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—'তুমি বেদান্ত সাধন করিবে?' জটাজূটধারী দীর্ঘকায় নগ্নসন্ন্যাসীর উক্ত প্রশ্নের উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণদেব জানান—'কি করিব না করিব, আমি কিছুই জানিনা, আমার মা সব জানেন, তিনি আদেশ করিলে করিব।' তখন সন্ন্যাসী তাঁহাকে বলেন—'তবে যাও, তোমার মাকে ঐ বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া আমাকে উত্তর দাও, কারণ আমি এখানে দীর্ঘকাল থাকিব না।' শ্রীরামকৃষ্ণদেব ধীরে ধীরে শ্রীজগ-দম্বার মন্দিরে উপস্থিত হন এবং ভাবাবিষ্ট হইয়া শ্রীজগন্মাতার বাণী শুনিতে পান—'যাও শিক্ষা কর, তোমাকে শিখাইবার জন্যই সন্ন্যাসীর এখানে আগমন হইয়াছে।' মন্দিরে প্রতিষ্ঠিতা দেবীকে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ঐরূপ মাতৃসম্বোধন করিতেছেন বুঝিয়া তাঁহার বালক-সদৃশ সরলতায় শ্রীতোতা-পুরী মুগ্ধ হইলেও তাঁহার ঐরূপ আচরণ অজ্ঞতা বলিয়াই তাঁহার ধারণা হয়। তাঁহার মতে ইহা ভ্রান্ত সংস্কার বলিয়া প্রতীত হইলেও ইহা কি অর্চাবতারের দিব্যতার পরিচায়ক নহে?

শ্রীনরেন্দ্র আর্থিক কষ্টে নিপতিত। মাতা ও ভ্রাতাগণের ভরণ-পোষণের কোন সচ্ছল

ব্যবস্থা করিতে তিনি সক্ষম না হওয়ায় মনে করেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা শ্রীজগন্মাতা শুনিয়া থাকেন; অতএব তাঁহাকে অনুরোধ করিয়া নিজ মাতা ও ভ্রাতাগণের খাওয়া-পড়ার কষ্ট যাহাতে দূরীভূত হয়, এইরূপ প্রার্থনা করাইবেন। তিনি দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইয়া শ্রীপরমহংসদেবের নিকট উক্ত প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন। শ্রীপরমহংসদেব তাঁহাকে বলেন—"আজ মঙ্গলবার, আমি বলছি আজ রাত্রে 'কালীঘরে' গিয়ে মাকে প্রণাম ক'রে তুই যা চাইবি, মা তোকে তাই দিবেন। মা আমার চিন্ময়ী ব্রহ্মশক্তি,...তিনি ইচ্ছা করলে কি না করতে পারেন!" শ্রীনরেন্দ্র তাঁহার আদেশে সেই রাত্রে শ্রীমন্দিরে উপস্থিত হন এবং সেখানে জগন্মাতার সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করিয়া ভক্তিবিহ্বল চিত্তে তাঁহাকে প্রণাম করিতে করিতে প্রার্থনা করেন—'মা, বিবেক দাও, বৈরাগ্য দাও, জ্ঞান দাও, ভক্তি দাও।' পরম শান্তিতে তাঁহার হৃদয় আপ্লাবিত হইয়া তাঁহার অন্তর হইতে জগৎ-সংসার নিঃশেষে অন্তর্হিত হইয়া যায়।

মন্দির হইতে শ্রীপরমহংসদেবের নিকট প্রত্যাবর্তন করামাত্র তিনি জিজ্ঞাসা করেন, 'কিরে, মার নিকটে সাংসারিক অভাব দূর করবার প্রার্থনা করেছিস্ ত?' তাঁহার কথায় শ্রীনরেন্দ্রের চমক ভাঙ্গে, তিনি বলেন—'না মহাশয়, ভুলে গেছি। তাই ত, এখন কি করি?' তিনি বলেন—'যা, যা, ফের যা, গিয়ে ঐ কথা জানিয়ে আয়।' শ্রীনরেন্দ্র পুনরায় মন্দিরে গমন করেন এবং শ্রীজগন্মাতার নিকট জ্ঞান-ভক্তিলাভের জন্যই প্রার্থনা করিয়া শ্রীপরমহংসদেবের নিকট ফিরিয়া আসেন। উক্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তিনি শ্রীনরেন্দ্রকে আর্থিক কষ্ট বিমোচনার্থে শ্রীজগন্মাতার নিকট প্রার্থনা করিবার জন্য পুনরায় 'কালীঘরে' পাঠান। তৃতীয় বারেও তিনি শ্রীজগন্মাতার নিকট জ্ঞান-ভক্তিই প্রার্থনা করেন, ইহাও প্রার্থনা করেন, 'মা, এখন যেমন তোমায় দেখিতেছি, সব সময় যেন তোমায় এইরূপ দেখিতে পাই।' এবার তাঁহার মা-ভাইদের কষ্ট দূর করার জন্য প্রার্থনা করার কথা মনে ছিল, কিন্তু জগন্মাতার সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করিয়া এইরূপ প্রার্থনা করিতে মন চাহিল না, তাঁহার জীবনের ইহা একটি বিশিষ্ট ঘটনা। অর্চাবতারের উপাসনার গূঢ় রহস্য তাঁহার হৃদয়ে প্রতিভাসিত হইয়া তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। এই ঘটনায় শ্রীপরমহংসদেব বালকের ন্যায় আনন্দিত হইয়া পরের দিন বলিতে থাকেন—'নরেন্দ্র আগে মাকে মানত না, কাল মেনেছে। নরেন্দ্র মাকে মেনেছে! বেশ হয়েছে—কেমন?'

দক্ষিণেশ্বরে প্রতিষ্ঠিতা শ্রীকালীমূর্তি যে চিন্ময়ী, স্বামী বিবেকানন্দজী সম্পর্কিত শ্রীপরমহংসদেবের অপর একটি উক্তিতেও তাহা সুস্পষ্টভাবে অভিব্যক্ত। তিনি বলিয়াছিলেন—"নরেন্দর একবার বলেছিল, 'তুমি এত নরেন্দর-নরেন্দর কর কেন? অত নরেন্দর-নরেন্দর ক'রলে তোমায় নরেন্দরের মত হতে হবে। ভরতরাজা হরিণ ভাবতে ভাবতে হরিণ হয়েছিল।' নরেন্দরের কথায় খুব বিশ্বাস কিনা। শুনে ভয় হল! মাকে বললুম। মা বললে, 'ও ছেলেমানুষ; ওর কথা শুনিস্ কেন? ওর ভেতরে নারায়ণকে দেখতে পাস, তাই ওর দিকে টান হয়।' শুনে তখন বাঁচলুম! নরেন্দরকে এসে বললুম, 'তোর কথা আমি মানি না; মা বলেছে তোর ভেতর নারায়ণকে দেখি বলেই তোর উপর টান হয়।'" উক্ত ঘটনাবলী কি অর্চাবিগ্রহের সাক্ষাৎ ভগবদ্রূপতার পরিচায়ক নহে?

'অচল' ও 'চল'-ভেদে অর্চাবিগ্রহ দুই প্রকার। যে চিন্ময় বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইয়া একই স্থানে সর্বদা বিরাজিত থাকেন, যাঁহাকে সেই স্থান হইতে অন্যত্র লওয়া যায় না, তাঁহাকে 'অচল

বিগ্রহ' বলা হয় এবং যে অর্চামূর্তি উৎসবাদির সময় বিভিন্ন স্থানে গমনাগমন করেন, তিনি 'চলবিগ্রহ' নামে খ্যাত।

প্রগাঢ় মায়ান্ধকারে সদাসমুজ্জ্বল অর্চাবতারই ঘোরতমসাচ্ছন্ন মানবের নিখিল কল্যাণসাধনের মুখ্য অবলম্বন। কারণ ঈশ্বরের 'পর' নামক সাক্ষাৎ মূলরূপের দর্শন কেবলমাত্র মুক্ত জনই করিতে পারেন। তাঁহার 'ব্যূহ' রূপ কখনও কদাচিৎ ব্রহ্মাদি দেবগণের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে, অপরের পক্ষে সে রূপের দর্শন সম্ভব নহে। ঈশ্বরের 'বিভব' অর্থাৎ অবতাররূপের দর্শন অবতারকালেই সম্ভব, কিন্তু তাঁহার অবতাররূপ দর্শন করিয়াও তাঁহার কৃপা ব্যতীত তাঁহাকে অবতার বলিয়া ধারণা করা সকলের পক্ষে সম্ভব নহে। তাঁহার 'অন্তর্যামী' রূপ যোগসাধনে পারঙ্গম জনের নিকটেই অভিব্যক্ত হইয়া থাকে, কিন্তু 'অর্চাবতার' রূপে তিনি সর্বদা সকলের নিকট অতি সুলভ। সকলেই তাঁহার দর্শন ও সেবাদি করিয়া সফলমনোরথ হইতে পারে।

অর্চাবতারেই ঈশ্বরের করুণার সমধিক প্রকাশ। শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে—

'তদিচ্ছয়া মহাতেজা ভুঙ্‌ক্তে বৈ ভক্তবৎসলঃ।
স্নানং পানং তথা যাত্রা কুরুতে বৈ জগৎপতিঃ॥
স্বতন্ত্রঃ সন্ জগন্নাথোঽপ্যস্বতন্ত্রো যথা তথা।
সর্বশক্তির্জগদ্ধাতাপ্যশক্ত ইব চেষ্টতে॥'

অর্থাৎ সেবকের ইচ্ছায় ভক্তবৎসল জগৎপতি ভোজন, স্নান, পানাদি করিয়া থাকেন। পরম স্বতন্ত্র হইয়াও সর্বশক্তিমান্ জগন্নাথ অর্চাবতাররূপে পরতন্ত্র এবং অশক্তের ন্যায় আচরণ করিয়া থাকেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীউদ্ধব মহাশয়কে সাধন সম্বন্ধে উপদেশপ্রদানকালে স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন—

'মদর্চাস্থাপনে শ্রদ্ধা স্বতঃ সংহৃত্য চোদ্যমঃ।
উদ্যানোপবনাক্রীড়-পুরমন্দিরকর্মণি॥'

(শ্রীমদ্ভাগবত, ১১।১১।৩৮)

অর্থাৎ আমার অর্চামূর্তি-স্থাপনে শ্রদ্ধা এবং তজ্জন্য উদ্যান, উপবন, ক্রীড়াস্থলী, পুর এবং মন্দির-নির্মাণে স্বয়ং অথবা অপরের সহিত মিলিত হইয়া উদ্যম করা অন্যতম পরম সাধন। 'ভক্তি-রসামৃতসিন্ধু' গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে যে, চতুঃষষ্ঠী ভক্তি অঙ্গের মধ্যে পাঁচটি অঙ্গ প্রধান। উক্ত পাঁচটির মধ্যে যে কোন একটির সহিত অত্যল্পমাত্র সম্বন্ধ ঘটিলেই ভগবৎপ্রেম লাভ হইয়া থাকে। উক্ত পাঁচটি মুখ্য ভক্তি-অঙ্গের মধ্যে—

'শ্রদ্ধা বিশেষতো প্রীতিঃ শ্রীমূর্তেরঙ্‌ঘ্রিসেবনে'

(১।২।৯০)

—শ্রদ্ধাসহকারে শ্রীমূর্তির চরণসেবায় প্রীতি অন্যতম। অতএব অর্চাবতারের মহিমা অসীম।

অর্চাবতারের অর্চন সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে একটি বিশেষ ইঙ্গিত প্রদান করা হইয়াছে। ভগবান্ শ্রীকপিলদেব নিজমাতা দেবহূতিকে বলিয়াছেন—

'অহং সর্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মাবস্থিতঃ সদা।
তমবজ্ঞায় মাং মর্ত্যঃ কুরুতেঽর্চাবিড়ম্বনম্॥'

(৩।২৯।১৭)

—আমি অন্তর্যামিরূপে সর্বভূতে অবস্থিত, আমাকে অবজ্ঞা করিয়া যে অর্চার পূজা করে, সে পূজার বিড়ম্বনাই করিয়া থাকে। শ্রীকপিলদেবের এই উক্তির দ্বারা আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে, ইহার দ্বারা অর্চাবতারের অর্চনের অনুপযোগিতা প্রতি-পাদিত হইয়াছে; কিন্তু বাস্তব বিচারে এইরূপ ধারণা সঙ্গত নহে। কারণ অর্চাবিগ্রহের অর্চন সম্বন্ধে শ্রীহয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে স্পষ্টরূপে বলা হইয়াছে—

'প্রতিষ্ঠিতার্চা ন ত্যাজ্যা যাবজ্জীবং সমাচরেৎ।'

অর্থাৎ প্রতিষ্ঠিত অর্চামূর্তিকে কখনও ত্যাগ করিবে না, যাবজ্জীবন তাঁহার অর্চনা করিবে। অতএব শ্রীকপিলদেবের উক্তির তাৎপর্য এই যে, কাহারও অবজ্ঞা না করিয়া জীবমাত্রে সম্মানপ্রদান-

পূর্বক অর্চাবিগ্রহের অর্চন করা কর্তব্য। যেহেতু কেবলমাত্র প্রাণীর প্রতি দয়া করিতে প্রবৃত্ত হইয়া ভগবদর্চন পরিত্যাগ করিবার ফলস্বরূপ রাজর্ষি ভরতের ভগবৎপ্রাপ্তিতে মহাবিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছিল। অতএব অর্চাবতারের অর্চন ত্যাগ করা কখনই সমীচীন নহে। যাঁহাকে অর্চায় অর্চনা করিতেছি, তিনিই সর্বভূতে রহিয়াছেন, ইহা স্মরণ রাখার কথাই কপিলদেব বলিয়াছেন।

শ্রীধাম বৃন্দাবনে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতিষ্ঠা বিশেষ তাৎপর্যব্যঞ্জক। ব্রজধামের প্রতি তাঁহার অতিশয় আকর্ষণ ছিল। শ্রীমথুরবাবুর সহিত তীর্থভ্রমণে নির্গত হইয়া তিনি ব্রজধামে আগমন করেন। ব্রজের প্রাকৃতিক শোভা, মনোহর গিরি গোবর্ধন, মৃগ ও শিখিগণের বনমধ্যে নিঃশঙ্ক বিচরণ, সাধুগণের নিরন্তর ঈশ্বরচিন্তায় দিনযাপন এবং সরল ব্রজবাসিগণের নিষ্কপট ব্যবহার অবলোকন করিয়া শ্রীপরমহংসদেবের চিত্ত ব্রজের প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়াছিল। বিশেষতঃ শ্রীবৃন্দাবনের নিধুবনে সিদ্ধপ্রেমিকা বর্ষীয়সী তপস্বিনী শ্রীগঙ্গামাতার দর্শন ও সান্নিধ্যলাভে শ্রীরামকৃষ্ণদেব এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, শ্রীবৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া অন্যত্র কোথাও যাইবার তাঁহার আদৌ ইচ্ছা ছিল না, জীবনের অবশিষ্টকাল তিনি এই স্থানেই অতিবাহিত করিতে অভিলাষী হইয়াছিলেন। তাঁহার এইরূপ মনোভাব অনুভব করিয়া শ্রীমথুরবাবু প্রভৃতির মনে ভয় হইয়াছিল যে, শ্রীপরমহংসদেব সম্ভবতঃ তাঁহাদিগের সহিত আর দক্ষিণেশ্বরে ফিরিবেন না; কিন্তু কার্যতঃ তখন তাহা সম্ভব হয় নাই। পরবর্তীকালে উক্ত বিষয়ে তিনি ভক্তবৃন্দকে স্বয়ং বলিয়াছিলেন "ব্রজে গিয়ে সব ভুল হয়ে গিয়েছিল। মনে হয়েছিল আর ফিরব না, কিন্তু কিছুদিন বাদে মার কথা মনে পড়ল। মনে হল তাঁর কত কষ্ট হবে, কে তাঁকে বুড়ো বয়সে দেখবে, সেবা করবে। ঐ কথা মনে ওঠায় আর সেখানে থাকতে পারলুম না।" অতএব ইহা নিঃসন্দিগ্ধভাবে বলা যাইতে পারে যে, শ্রীধাম বৃন্দাবনে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শ্রীমূর্তি প্রতিষ্ঠার দ্বারা তাঁহার ব্রজবাসের সেই অভিলাষেরই পরিপূর্তি সাধিত হইয়াছে। তাঁহার এই প্রতিষ্ঠা মানব-হৃদয়ে বিমল ভগবদ্-ভাবকে উদ্বুদ্ধ করিয়া চিরপ্রতিষ্ঠিত করুক, এই প্রতিষ্ঠা-উৎসবের পুণ্যমুহূর্তে ইহাই একান্ত প্রার্থনা।*

* গত ১৬ই ফেব্রুআরি, ১৯৭৩ অপরাহ্ণে বৃন্দাবন শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে নবনির্মিত মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণের মূর্তিপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে আয়োজিত সভায় লেখকের ভাষণ।

'বর্তমান ভারত'-এ স্বামীজীর রাজনৈতিক ধ্যানধারণা

ডক্টর শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়

স্বামী বিবেকানন্দের বহুবিদিত ও বহুপঠিত রচনা 'বর্তমান ভারতে'র ভূমিকায় স্বামী সারদানন্দ রচনাটিকে বঙ্গসাহিত্যের 'এক অমূল্য রত্ন' ব'লে বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে, "বহুল পরিভ্রমণ, গর্বিত রাজকুল হইতে দরিদ্র প্রজা পর্যন্ত সকলের সহিত সমভাবে মিলন, ভারত ও ভারতেতর দেশের আচার ব্যবহার এবং জাতীয়ত্বভাবসমূহের নিরপেক্ষ দর্শন, অশেষ অধ্যয়ন এবং স্বদেশবাসীর প্রতি অপার প্রেম ও তাহাদের দুঃখে গভীর সহানুভূতির ফলে স্বামীজীর মনে ভারতের যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছিল, 'বর্তমান ভারত' তাহারই নিদর্শনস্বরূপ।" এই রচনায় স্বামীজী কর্তৃক 'ভারতেতিহাসের জটিল প্রশ্নসমূহের সমাধানে'র প্রচেষ্টার পূর্ণ স্বাক্ষর পাওয়া যাবে বলেই সারদানন্দ মহারাজের ধারণা। তিনি আরও বলেছেন: "অধিকন্তু ইহা একখানি দর্শনগ্রন্থ।"

আমাদের মতে, 'বর্তমান ভারত' ইতিহাসধর্মী সাহিত্য-রচনা হলেও মূলতঃ দার্শনিক রচনা, এবং এই দর্শন হ'ল সামাজিক ও রাজনৈতিক দর্শন (Social and Political Philosophy)। স্বামী সারদানন্দের ভূমিকাতে অবশ্য এর ইঙ্গিত আছে: "ভারতসমাগত যাবতীয় জাতির মানসিক ভাবরাশি-সমুদ্ভূত দ্বন্দ্ব দশসহস্রবর্ষব্যাপী কাল ধরিয়া উহাদিগকে পরিচালিত এবং ধীরে ধীরে শ্রেণীবদ্ধ, উন্নত, অবনত ও পরিবর্তিত করিয়া দেশে সুখ-দুঃখের পরিমাণ কিরূপে কখন হ্রাস, কখন বা বৃদ্ধি করিয়াছে এবং বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণ, বিভিন্ন আচার-ব্যবহার, কার্যপ্রণালীর মধ্যেও এই আপাত-অসম্বদ্ধ ভারতীয় জাতিসমূহ কোন্ সূত্রেই বা আবদ্ধ হইয়া আপনাদিগকে হিন্দু বলিয়া সমভাবে পরিচয় দিতেছে এবং কোন্ দিকেই বা ইহাদের ভবিষ্যৎ গতি, সেই গুরুতর দার্শনিক বিষয়ই 'বর্তমান ভারতে'র আলোচ্য বিষয়।" অন্যভাবে বলতে গেলে, স্বামী সারদানন্দের মতে, 'বর্তমান ভারত' ভারতের সামাজিক ইতিহাসের মূলসূত্রের পর্যালোচনা এবং ভবিষ্যতে এই সমস্ত সূত্রের গতি প্রকৃতি ও কার্যকারিতা সম্বন্ধে আভাসের দ্যোতক। কিন্তু প্রশ্ন হ'ল: 'বর্তমান ভারতে'র প্রতিপাদ্য বিষয় কি শুধু ভারতের অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের মধ্যে সীমাবদ্ধ, না এই রচনায় আরও কিছু আছে যা দেশ ও কালের গণ্ডিকে অতিক্রম করে? সংক্ষেপে উত্তর দিতে হ'লে বলা যায়, 'বর্তমান ভারত' অনাপেক্ষিক (absolute), শাশ্বত, বিশ্বজনীন এবং পরিবর্তনাতীত সামাজিক ও রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণায় পরিপূর্ণ। সুতরাং এই সব ধারণা ও আদর্শ বর্তমানে প্রযোজ্য কিনা, সে প্রশ্ন ওঠে না।

পূর্ণ অর্থে 'বর্তমান ভারত'কে গ্রন্থ বলা যায় কিনা, তা নিয়ে তর্ক উঠতে পারে। বোধ হয় একে 'রচনা' (essay) ব'লে অভিহিত করাই যুক্তিযুক্ত- মোটামুটি ছ' হাজার শব্দের একখানি রচনা। অনেকে হয়ত ভাববেন, ছ' হাজার শব্দের মধ্যে কতটা ধারণা ও আদর্শের ব্যাখ্যা থাকতে পারে। সত্যিই ব্যাখ্যা বেশী নেই, কারণ রচনাটি কোন প্রতিপাদ্য বিষয়কে পরিস্ফুট করবার জন্য লিখিত গ্রন্থ (treatise) নয়। কিন্তু উল্লেখ ও উত্থাপনের পরিমাণ হ'ল প্রভূত। অর্থাৎ, পূর্ণ ব্যাখ্যা না থাকলেও উল্লিখিত তত্ত্ব ও আদর্শ সংখ্যায় বহু, এবং উত্থাপিত সমস্যাও

অত্যল্প নয়। হয়ত একটি মাত্র অনুচ্ছেদ বা একটিমাত্র উক্তিতেই স্বামীজী তাঁর বক্তব্য শেষ করেছেন, কিন্তু বিশ্লেষকের পক্ষে এই একটিমাত্র অনুচ্ছেদ বা উক্তিই যথেষ্ট। মাত্র স্বামী বিবেকানন্দের নয়, অনেক লোকোত্তর পুরুষের—অনেক যুগন্ধরের এই রকম দু'একটি উক্তি সামাজিক বা রাজনৈতিক তাৎপর্যের জন্য প্রখ্যাত হয়ে আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ যীশুখৃষ্টের প্রায় সমার্থক বিখ্যাত উক্তি দু'টির উল্লেখ করা যেতে পারে: "আমার রাজ্য এ পৃথিবীর নয়।" (**My Kingdom is not of this world.—John, XVIII, 36**), এবং "সীজারের প্রাপ্য যা কিছু সীজারকে দাও এবং ঈশ্বরের প্রাপ্য যা কিছু তা দাও ঈশ্বরকে।" (**Render unto Caesar the things that are Caesar's and render unto God the things that are God's.—Matt., XXII, 21 and Mark, XII, 17**)। সীজার শব্দের অর্থ সম্রাট বা যীশুর উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে রোমক সম্রাট এবং উক্তি দু'টির প্রতিপাদ্য বিষয় হ'ল যে ধর্মের ক্ষেত্র লৌকিক ক্ষেত্র থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। এই ধারণাই পরে অন্যতম রাজনৈতিক আদর্শ 'ধর্মনিরপেক্ষতা'র (**secularism**) রূপ গ্রহণ করে।

এখন 'বর্তমান ভারত' থেকে অংশ উদ্ধৃত ক'রে স্বামীজীর মৌলিক রাজনৈতিক ধ্যানধারণার সঙ্গে পরিচয় করা যেতে পারে। উল্লেখ না থাকলে উদ্ধৃতি 'বর্তমান ভারত' থেকে ধ'রে নিতে হবে।

বর্ণচক্র ও সমাজ-বিবর্তন:

কার্ল মার্ক্সের মতে, সমাজের প্রকৃতি ও ক্রমবিকাশের পটভূমিকাতেই রাষ্ট্রের স্বরূপ উপলব্ধি করা সম্ভব। 'বর্তমান ভারতে' স্বামী বিবেকানন্দও রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও ভূমিকা ব্যাখ্যা করেছেন সমাজ-বিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে। ব্যাখ্যা বলতে যা বোঝায় তিনি হয়ত তা ঠিক করেননি, তবে পর্যাপ্ত ইঙ্গিত যে দিয়েছেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই। এই ইঙ্গিত থেকেই তত্ত্ব খাড়া করা হ'ল বিশ্লেষক ও গবেষকের কাজ।

স্বামীজী ছিলেন হিন্দু 'কল্পতত্ত্বে' (**Theory of Cycles**) বিশ্বাসী। এই তত্ত্ব অনুসারে সমগ্র বিশ্ব উর্মিমালার মত চক্রাকারে আবর্তিত হচ্ছে। উত্থান থেকে শুরু করলে দেখা যায় ক্রমশঃ শীর্ষে আরোহণ এবং তারপর পতন। পতনের পর কিছুদিন শূন্যগর্ভে অবস্থান, পরে আবার উত্থান। সত্যই উর্মিমালার সঙ্গে তুলনীয়। "সমগ্র বিশ্বের পক্ষে যা সত্য, বিশ্বের প্রতিটি অংশ সম্বন্ধে তা নিশ্চয়ই প্রযোজ্য। মানব-জীবনেতিহাসের প্রকৃতি ঐ একই।"[১] মানব-জীবনেতিহাসে এই চক্র চার অঙ্কের এক চমৎকার নাটকের অবতারণা করে, যার শেষ অঙ্ক অবশ্য এখনও মঞ্চস্থ হয়নি। এই চার অঙ্কে চারটি জাতি বা বর্ণ—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র পর্যায়ক্রমে মুখ্য ভূমিকা অভিনয় ক'রে যায়।

প্রথম অঙ্কে মুখ্য ভূমিকা হ'ল ব্রাহ্মণের। ব্রাহ্মণ বা "পৌরোহিত্যশক্তির ভিত্তি বুদ্ধিবলের উপর, বাহুবলের উপর নহে; এজন্য পুরোহিতদিগের প্রাধান্যের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাচর্চার আবির্ভাব!...পুরোহিত-প্রাধান্যে সভ্যতার প্রথম আবির্ভাব, পশুত্বের উপর দেবত্বের প্রথম বিজয়, ...[কিন্তু] উন্নতির সময় পুরোহিতের যে তপস্যা, যে সংযম, যে ত্যাগ সত্যের অনুসন্ধানে সম্যক্ প্রযুক্ত ছিল, অবনতির পূর্বকালে তাহাই আবার কেবলমাত্র ভোগ্যসংগ্রহে বা আধিপত্য-বিস্তারে সম্পূর্ণ ব্যয়িত।" সুতরাং অন্যান্য বর্ণের সঙ্গে যে সংঘর্ষ বাধবে তাতে আর আশ্চর্য কি?

এই সংঘর্ষের দলে মঞ্চের সম্মুখে আছে ক্ষত্রিয়-শক্তি, যে 'রাজ-সিংহে মৃগেন্দ্রের গুণদোষরাশি সমস্তই বিদ্যমান' তবে মোটামুটিভাবে "ব্রহ্মণাধিকারে যে প্রকার জ্ঞানেচ্ছার প্রথম উদ্বোধন ও

শৈশবাবস্থায় যত্নে পরিপালন, ক্ষত্রিয়াধিকারে সেই প্রকার ভোগেচ্ছার পুষ্টি এবং তৎসহায়ক বিদ্যা-নিচয়ের সৃষ্টি ও উন্নতি !"

আদিতে ক্ষত্রিয়শক্তি অপরাপর বর্ণের সহায়তায় সমাজ ও রাষ্ট্র শাসন করলেও ক্রমশঃ নৃপতি ভুলে যান যে, "রাজরূপ কেন্দ্র···সমাজ দ্বারা সৃষ্ট" এবং "তাঁহাতে শক্তিসঞ্চয় কেবল 'সহস্রগুণমুৎস্রষ্টুং'।" এর দরুন "পালনের স্থলাভিষিক্ত হয় পীড়ন—রক্ষণের স্থলে আসে ভক্ষণ ! যদি সমাজ নির্বীর্য হয়, নীরবে সহ্য করে, রাজা ও প্রজা উভয়েই হীন হইতে হীনতর অবস্থায় উপস্থিত হয় এবং শীঘ্রই বীর্যবান্ অন্য জাতির ভক্ষ্যরূপে পরিণত হয়।" কিন্তু সমাজশরীর যেখানে বলবান্ সেখানে "শীঘ্রই অতি প্রবল প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হয় এবং তাহার আস্ফালনে ছত্র, দণ্ড, চামরাদি অতি দূরে বিক্ষিপ্ত ও সিংহাসনাদি চিত্রশালিকা-রক্ষিত প্রাচীন দ্রব্যবিশেষের ন্যায় হইয়া পড়ে।"

নৃপতিকে অপসারিত করার পরই অবশ্য শূদ্রশক্তি সমাজের পুরোভাগে আসে না, সমাজের নেতৃত্বাসনে সমাসীন হয় বৈশ্যশক্তি, যার "টঙ্ক-ঝঙ্কার চাতুর্বর্ণের মনোহরণ করিতে সক্ষম।" বৈশ্য-শাসনে "এক প্রান্তের ভক্ষ্য-ভোজ্য, সভ্যতা, বিলাস ও বিদ্যা অন্য প্রান্তে" আনীত হয়, কিন্তু বৈশ্যের স্বার্থপুষ্টি ও ধনসঞ্চয় জনসংখ্যার বাকী অংশকে শূদ্রের পর্যায়ে টেনে আনে।

তখনই শুরু হয় শেষ অঙ্ক "যখন শূদ্রত্ব সহিত শূদ্রের প্রাধান্য হইবে, অর্থাৎ বৈশ্যত্ব ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিয়া শূদ্রজাতি যে প্রকার বলবীর্য বিকাশ করিতেছে তাহা নহে, শূদ্রধর্মকর্ম-সহিত সর্বদেশের শূদ্রেরা সমাজে একাধিপত্য লাভ করিবে।"

এই হ'ল সমাজ-বিবর্তনের নাটক এবং এতে আমাদের সকলেরই ছোটবড় ভূমিকা আছে। শেষ অঙ্ক অবশ্য এখনও অভিনীত হয়নি কিন্তু নাটকটি স্বামীজীর বারবার পড়া ব'লে তিনি জানেন যে ঐ অঙ্কে কি আছে। তা ছাড়া অভিনেতাদের অঙ্গসজ্জা ও দৃশ্যসজ্জার প্রস্তুতি দেখা যাচ্ছে : "সর্বদেশের শূদ্রেরা সমাজে একাধিপত্য লাভ করিবে। তাহারই পূর্বাভাসচ্ছটা পাশ্চাত্য জগতে ধীরে ধীরে উদিত হইতেছে···সোস্যালিজম, এনার্কিজম্, নাইহিলিজম্ প্রভৃতি সম্প্রদায় ঐ বিপ্লবের অগ্রগামী ধ্বজা।"[১]

বিপ্লবতত্ত্ব :

বর্ণচক্র একাধারে সমাজ-বিবর্তনের বিশ্লেষণ এবং বিপ্লবতত্ত্ব। এই তত্ত্ব মহাভারতের হরি-বংশের অন্তর্ভুক্ত। হরিবংশে আছে : "তখন ব্যাসদেব বললেন, 'ক্ষত্রিয়রা রাজ্যচ্যুত হবে এবং ধর্মহীনতা সত্ত্বেও শূদ্রেরা অধিষ্ঠিত হবে সম্মানের আসনে, এই অবস্থায় জনগণের অসন্তুষ্টি সম্পূর্ণ পরিণত হয়ে উঠবে'।" তত্ত্বটির পরিস্ফুটনে অবশ্য স্বামীজী একমাত্র হরিবংশ থেকে আহরণ করেন-নি। এতে কোঁতের (Comte) সমাজ-বিবর্তন-তত্ত্ব এবং সমাজের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে হার্বার্ট স্পেন-সারের ভবিষ্যদ্দৃষ্টি উভয়েরই কিছু কিছু সন্ধান পাওয়া যায়।[২]

এদিক থেকে দেখলে স্বামী বিবেকানন্দের বিপ্লবতত্ত্বকে ভারতীয় ও পাশ্চাত্য তত্ত্বের সং-মিশ্রণ ব'লে বর্ণনা করা যায়। তবু কিন্তু তত্ত্বটি বিশ্বের রাজনৈতিক ইতিহাসে স্বামীজীর উল্লেখ-যোগ্য অবদান ব'লে গণ্য।

কোঁতের মতে, বিবর্তনের ধারায় সমাজ ও রাষ্ট্র পর্যায়ক্রমে তিনটি রূপ গ্রহণ করে: ধর্মীয় (theocratic) সামরিক (military) এবং শিল্পভিত্তিক (industrial)।

১ C.W.IV, p. 120

২ Encyclopædia Britannica, Vol. 6 and D.M Brown : White Umbrella.

আপাতদৃষ্টিতে বিপ্লবের সূচক হ'ল সমাজের নেতৃত্ব পরিবর্তন—এক বর্ণের স্থলে অন্য এক বর্ণের নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠান। এর প্রাথমিক কারণ হ'ল শাসক-বর্ণের বিকৃতি যা তাদের দুর্বল ক'রে তোলে, কিন্তু মৌলিক কারণ হ'ল 'প্রজাপুঞ্জ' থেকে শাসক-গোষ্ঠীর বিচ্যুতি। কোন বিশেষ বর্ণকে শাসনাসনে বসানো হয় সাধারণের কল্যাণ সর্বাধিক ক'রে এবং জনগণকে স্বায়ত্ত শাসনের উপযোগী ক'রে তোলবার জন্য। সুতরাং শূদ্র ছাড়া যে-কোন বর্ণের শাসনকে 'জনপ্রিয় শাসন-ব্যবস্থার' প্রস্তুতিপর্ব বলেই ধরা যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় অধিকাংশ সময়ই শাসক-বর্ণ এই মৌলিক সত্যটি বিস্মৃত হ'য়ে স্বীয় স্বার্থসাধনেই লিপ্ত হয়। 'অমনিই সর্বনাশের সূত্রপাত।' "সর্বংসহা ধরিত্রীর ন্যায় সমাজ অনেক সহেন কিন্তু একদিন না একদিন জাগিয়া উঠেন এবং সে উদ্বোধনের বীর্যে যুগযুগান্তের সঞ্চিত মলিনতা ও স্বার্থপরতা-রাশি দূরে নিক্ষিপ্ত হয়।"

সমাজের পুনরুজ্জীবন ঘটে একটি নতুন শাসক-বর্ণ দ্বারা যার শক্তির আধার হ'ল জন-সাধারণ বা প্রজাপুঞ্জ। কিন্তু মায়ার এমনই বিচিত্র খেলা যে নতুন শাসক-বর্ণ আবার পার্থিব শক্তি কেন্দ্রীভূত করতে যত্নবান হয়। ফলে সমাজ আবার সহ্য করে পীড়ন এবং অপেক্ষা করতে থাকে বিপ্লবের পরবর্তী অধ্যায়ের জন্য যা পুনরায় মুক্তিপথের সন্ধান দেবে। "প্রাকৃতিক নিয়মে জরাজীর্ণের স্থানে নব প্রাণোন্মেষের প্রতি-স্থাপনের স্বাভাবিক চেষ্টায় উহা সমুপস্থিত হয়।" অতএব, সমাজ-বিবর্তনের পাকা সড়ক ব'লে কিছু নেই, চক্রাকারে আবর্তিত হ'তে হ'তে সমাজ বিবর্তন (evolution) এবং উদ্ঘাতনের (involution) পথেই চলছে।

তথাকথিত প্রগতি-বিশ্বাসী হয়ত এই তত্ত্বের প্রসঙ্গে উন্নাসিকের ভাবই দেখাবেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উন্নাসিকতার কোন উপাদান এতে নেই। কারণ, স্বামীজীর মতে, এই সমাজ-বিপ্লব পুনরুদ্ধারেরই দ্যোতক এবং অনেক ক্ষেত্রে পুন-রুদ্ধারের মাধ্যমেই আদর্শের উপলব্ধি সম্ভবপর হয়।

কর্তৃত্ব ও আনুগত্য: 'বর্তমান ভারতে' কর্তৃত্ব ও আনুগত্য সম্বন্ধেও স্বামীজীর ধারণার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। বর্তমানে আমরা কর্তৃত্ব বলতে রাষ্ট্রকর্তৃত্বই বুঝি, স্বামীজীর মতে কিন্তু কর্তৃত্বের প্রকৃতি সম্পূর্ণ সামাজিক, রাজনৈতিক নয়। এর কারণ খুবই সুস্পষ্ট. স্বামীজীর ধারণায় সমাজ হ'ল মৌল সংগঠন এবং সরকার এরই প্রশাসনযন্ত্র। বিশেষ উদ্দেশ্যে সমাজ এই প্রশাসনযন্ত্র সৃষ্টি করেছে। "সাধারণ স্বত্বরক্ষার্থ ব্যক্তিগত স্বার্থত্যাগ পুরাকালের কি কথা আধুনিক সময়েও কোন দেশে সম্যক্‌রূপে উপলব্ধ হয় নাই। রাজরূপ কেন্দ্র তজ্জন্যই সমাজ দ্বারা সৃষ্ট।" অতএব, শাসক বা নৃপতি হলেন জন-সাধারণের প্রতিনিধিরূপে রাজপদে অধিষ্ঠিত (regent) এবং সার্বভৌম হলেন জনসাধারণের আস্থাভাজন সার্বভৌম (fiduciary sovereign) যিনি অছি হিসাবে জনসাধারণের পক্ষেই অন্তবর্তী কালের জন্য অস্থায়িভাবে প্রশাসন পরিচালনা করেন।

এই অছি বা জিম্মাদারের ধারণা লকের (Locke) মতবাদকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। তবে পার্থক্য হ'ল যে লকের ক্ষেত্রে সত্যই এক সরকারী চুক্তি (an actual Governmental contract) সম্পাদিত হয়েছিল ব'লে ধরে নেওয়া হয়। যে চুক্তি স্বামী বিবেকানন্দের তত্ত্বে অন্যতম যৌক্তিক সূত্রমাত্র।

সমাজবিপ্লবের ফলে সরাসরি জনসাধারণ বা প্রজাপুঞ্জের হাতে গিয়ে কর্তৃত্ব পৌছোয় না—সমাজ-পরিচালনার জন্য নতুন অছি নিযুক্ত হয় মাত্র। এই অছি আবার বিশ্বাসভঙ্গ করলে

জনসাধারণ নতুন অছিরই সন্ধান ক'রে বেড়ায়।

অতএব রাজনৈতিক আনুগত্য ভীতি(fear) বা লর্ড ব্রাইস যাকে অনুকরণ-প্রবৃত্তি (imitation) বলেছেন তার ওপর ভিত্তিশীল নয়, ভিত্তিশীল হ'ল 'উপযোগিতার সচেতন উপলব্ধি' বা সংক্ষেপে বিচারবুদ্ধির (reason) ওপর। বিরোধিতার অধিকার এই ধরনের রাজনৈতিক আনুগত্যের অপরিহার্য অঙ্গ।

সার্বভৌমিকতা: রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে কর্তৃত্বকে সার্বভৌমিকতা (sovereignty) ব'লে অভিহিত করা হয়, বলপ্রয়োগের ক্ষমতাই এর বৈশিষ্ট্য। সার্বভৌমিকতার বিভিন্ন সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, এবং এই জন্য অধ্যাপক ম্যাক আইভারের মতে, বিভিন্ন পর্যায়ের সার্বভৌমিকতার ধারণাই গ্রহণ করা উচিত।[৩] এই বিভিন্ন পর্যায়ের সার্বভৌমিকতার তত্ত্বের মধ্যেই সার্বভৌম শক্তি সম্বন্ধে স্বামীজীর ধারণার সন্ধান পাওয়া যায়।

সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে স্বামীজীর ধারণাকে 'সম্প্রদায়ের সাধারণ ইচ্ছা' (General will of the community) ব'লে বর্ণনা করা যায়, যে ইচ্ছা ঠিক রাষ্ট্রের ইচ্ছা নয়, রাষ্ট্রকে সংগঠিত রাখার জন্য জনসাধারণের ইচ্ছা।[৪] স্বামী বিবেকানন্দ কখনই আইনসঙ্গত দ্বন্দ্বসীমার চূড়ান্ত কেন্দ্র হিসাবে কোন শক্তির কল্পনা করেননি—যা তিনি কল্পনা করেছেন তা হ'ল জনসাধারণের সম্মিলিত শক্তি।

এই ক্ষমতা প্রশাসনযন্ত্র বা প্রশাসকের হাতে কিছুদিনের জন্য—সমাজের শৈশবাবস্থায় নিহিত থাকে মাত্র। কিন্তু পরে—সমাজ যৌবনদশায় উপনীত হ'লে—জনসাধারণের কাছে এই ক্ষমতাকে হস্তান্তর করতে হবে। "সমাজ –গৃহের সমষ্টি-মাত্র। 'প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে' যদি প্রতি পিতার পুত্রকে মিত্রের ন্যায় গ্রহণ করা উচিত, সমাজশিশু কি সে ষোড়শবর্ষ কখনই প্রাপ্ত হয় না ?" - এই প্রশ্ন স্বামীজীর প্রশ্ন। সমাজ যৌবনে উপনীত হবার পর এই ক্ষমতাহস্তান্তরকে উপেক্ষা করলে "সাধারণ ব্যক্তিনিচয়ের সহিত শক্তিমান শাসনকারীদের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। এ যুদ্ধের জয়পরাজয়ের উপর সমাজের প্রাণ বিকাশ ও সভ্যতা নির্ভর করে।"

অতএব, জনসাধারণই সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস এবং চূড়ান্ত লক্ষ্য—মাত্র অন্তর্বর্তীকালীন অবস্থায় অর্থাৎ যতদিন পর্যন্ত না এই ক্ষমতা প্রয়োজনীয় দানা বাঁধার পর সমগ্র সমাজে ছড়িয়ে দেবার উপযোগী হয়—শাসকবর্গ দ্বারা এই ক্ষমতা প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে (by Deligation) ব্যবহৃত হয় মাত্র। এই অন্তর্বর্তীকালীন সময়েই শাসকবর্গের জনসাধারণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ রক্ষা ক'রে চলা উচিত। "সমাজের নেতৃত্ব বিদ্যাবলের দ্বারাই অধিকৃত হউক, বা বাহুবলের দ্বারা, বা ধনবলের দ্বারা, সে শক্তির আধার—প্রজাপুঞ্জ। যে নেতৃসম্প্রদায় যত পরিমাণে এই শক্ত্যাধার হইতে আপনাকে বিশ্লিষ্ট করিবে, তত পরিমাণে তাহা দুর্বল।"

সুতরাং তত্ত্বটি হ'ল জনপ্রিয় সার্বভৌমিকতার (popular sovereignty) তত্ত্ব যা আঠার শতকের শেষদিকে গণতন্ত্রের ভিত্তি ও মূলমন্ত্র হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল। তত্ত্ব অনুসারে সার্বভৌমিকতা মাত্র তখনই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ব'লে পরিগণিত হ'তে পারে যখন ঐ ক্ষমতা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ব্যবহৃত হয়। স্বাভাবিকভাবেই আইনের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছিল 'সম্প্রদায়ের সাধারণ ইচ্ছার প্রকাশ' (expression of the general will of the community) ব'লে। রুশোর ধারণায়, আইন

৩. R.M. Mac Iver : The Modren State.
৪. Ibid.

প্রণয়নকে প্রভাবান্বিত করার ক্ষমতাই স্বাধীনতার সূচক।

স্বামী বিবেকানন্দের মতে, এই ক্ষমতা জনগণ থেকেই এসেছে এবং শেষ পর্যন্ত আবার জনগণেই হস্তান্তরিত হবে। ইতিমধ্যে অবশ্য উত্তরোত্তর বর্ধমানহারে জনগণের সঙ্গে সহযোগিতায় এই ক্ষমতা ব্যবহার করতে হবে। এই হ'ল সামাজিক প্রগতির মূলসূত্র। যেদিন ইওরোপে শিক্ষা ও ক্ষমতা জনসাধারণের মধ্যে প্রবাহিত হ'তে শুরু করেছে সেই দিন থেকেই হয়েছে ইয়োরোপের প্রগতির সূচনা।[৫] "শক্তিসঞ্চয় যে প্রকার আবশ্যক, তাহার বিকিরণও সেইরূপ বা তদপেক্ষা অধিক আবশ্যক। হৃৎপিণ্ডে রুধিরসঞ্চয় অত্যাবশ্যক, তাহার শরীরময় সঞ্চালন না হইলেই মৃত্যু। কুলবিশেষে বা জাতিবিশেষে সমাজের কল্যাণের জন্য বিদ্যা বা শক্তি কেন্দ্রীভূত হওয়া এককালের জন্য অতি আবশ্যক, কিন্তু সেই কেন্দ্রীভূত শক্তি কেবল সর্বতঃ সঞ্চারের জন্য পুঞ্জীকৃত। যদি তাহা না হইতে পায়, সে সমাজ-শরীর নিশ্চয়ই ক্ষিপ্র মৃত্যুমুখে পতিত হয়।" অতএব, সমাজের অস্তিত্বের জন্যই জনগণের মধ্যে উত্তরোত্তর ক্ষমতার হস্তান্তর অপরিহার্য।

গণতন্ত্র :

স্বামী বিবেকানন্দ কর্তৃক জনপ্রিয় সার্বভৌমিকতার সমর্থন আবার গণতন্ত্রের প্রতি তাঁর প্রচণ্ড আবেগেরও দ্যোতক, কারণ ব্যুৎপত্তিগত অর্থে গণতন্ত্র জনগণেরই শাসন (**Rule of the people**)। গণতন্ত্র বলতে অবশ্য শুধু শাসনব্যবস্থাই বোঝায় না, বিশেষ প্রকার সমাজব্যবস্থাও নির্দেশিত হ'তে পারে। শব্দটি যখন আমরা এই দ্বিতীয় অর্থে ব্যবহার করি তখনই গণতান্ত্রিক মনোভাবের (**democratic spirit or temper**) কথা বলি এবং স্বাধীনতা সাম্য সৌভ্রাত্র 'ব্যক্তির মর্যাদা' (**dignity of the individual**) প্রভৃতি আদর্শের উল্লেখ ক'রে থাকি।

গণতন্ত্রের রূপ যাই হোক না কেন, সাম্যকে এর মৌলতম উপাদান ব'লে গণ্য করা যায় এবং স্বাধীনতা ও অন্যান্য আদর্শ এর থেকেই উদ্ভূত। সুতরাং সামাজিক গণতন্ত্র বলতে বোঝায় সমগ্র সমাজ-সংগঠনে সাম্যনীতির অভিব্যক্তি। এই পরিবেশে সদস্যরা যে শুধু পরস্পরের সমান তাই-ই নয়, "সমগ্রের অঙ্গ এবং অবিচ্ছেদ্য অংশও বটে।"[৬] এই রকম ধারণা ঐক্যনীতিরই (**Principle of unity**) প্রতিফলন, যা হ'ল বেদান্তের মৌলিকতম উপাদান। অতএব, বেদান্তবাদীর কাছে 'গণতন্ত্র' বলতে এই ধরনের সামাজিক গণতন্ত্রই বোঝায় ; অন্য কিছুকে 'গণতান্ত্রিক' ব'লে অভিহিত করলে তা বড় জোর আদর্শ উপলব্ধির প্রয়াস বলেই গণ্য হ'তে পারে।

কিন্তু গণতন্ত্র সামাজিক রূপ গ্রহণ করেছে কিনা, তার বিচার করতে হবে সামাজিক অগ্রগতির মাপকাঠি দিয়ে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়ের শাসন যদি জনগণের জন্য এবং জনগণের সম্মতিক্রমে (**for the people and with the consent of the people**) হয়, তা হ'লে নিশ্চয়ই তা ঐ আদর্শের পরিপূরক। অপর দিকে শাসকগোষ্ঠী যদি এই 'ডায়ালেক্‌টিক্‌স্‌'-এর বিরুদ্ধে কাজ করে তবে আদর্শের উপলব্ধি ব্যাহত হ'তে বাধ্য। এরূপ ক্ষেত্রে সমাজ নির্বীর্য হলেই বা কি হয়, আর বীর্যবান হলেই বা কি হয়, তার উল্লেখ পূর্বেই করা হয়েছে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, স্বামীজীর মতে, শাসনব্যবস্থা হিসাবে গণতন্ত্র বিশেষভাবে বিবর্তনমূলক। প্রথম পর্যায়ে হ'ল 'জনগণের জন্য, জনগণের শাসন

৫. C. W. VII

৬. **Delisle Burns : Political Ideals**

(**rule for and of the people**) পরবর্তী পর্যায়ে একে হ'তে হবে জনগণের দ্বারা শাসন (**rule by the people, too**)।

স্বামী বিবেকানন্দের এই অভিমতের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য আছে: সমাজ-পদ্ধতি হিসাবে গণতন্ত্র সরকারের যে কোন রূপের সঙ্গেই সঙ্গতিপূর্ণ। এদিক থেকে তাঁকে হারন্‌শ (**Hearnshaw**), গিডিংশ (**Giddings**) প্রভৃতির পূর্বসূরী ব'লে গণ্য করা যায়।

প্রসঙ্গতঃ আরও উল্লেখ করা যেতে পারে যে গণতন্ত্র সম্বন্ধে স্বামীজীর এবং প্রাচীন চৈনিক ধারণার মধ্যে প্রভূত সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। মেনসিয়াস্ (**Mencius**) মন্তব্য করেছেন: জনগণই রাষ্ট্রের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, দ্বিতীয় স্থলে আছে লক্ষ্য-আদর্শাদি এবং রাজার গুরুত্ব হ'ল সর্বশেষে।[৭]

সরকারের রূপ :

'বর্তমান ভারত' থেকে সরকারের বিভিন্ন রূপ সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের ধারণার সুস্পষ্ট পরিচয় লাভ করা যায়।

পর্যায়ক্রমে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র পৃথিবী ভোগ বা শাসন করলেও অনেকক্ষেত্রে মিশ্র শাসন-ব্যবস্থার সন্ধানও পাওয়া যায়। আবার এক বর্ণের স্বাভাবিক শাসন-ব্যবস্থা জনকল্যাণের পরিবর্তে নিজ স্বার্থ-সাধনে লিপ্ত থেকে বিকৃত রূপও ধারণ করতে পারে, সরকার বা শাসন-ব্যবস্থার এই স্বাভাবিক ও বিকৃত এবং মিশ্র রূপকে এই ভাবে সাজানো যেতে পারে :

অবিমিশ্র রূপ	স্বাভাবিক রূপ	বিকৃত রূপ
১। ব্রাহ্মণের শাসন	অভিজাততন্ত্র	ধর্মীয় শাসন
২। ক্ষত্রিয়ের শাসন	রাজতন্ত্র	স্বৈরাচারতন্ত্র
৩। বৈশ্যের শাসন	জনহিততন্ত্র	ধনিকতন্ত্র
৪। শূদ্রের শাসন	গণতন্ত্র	———

মিশ্র রূপ

১। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের মিলিত শাসন

২। ক্ষত্রিয়-বৈশ্যের মিলিত শাসন

৩। বৈশ্য-শূদ্রের মিলিত শাসন বা জনপ্রিয় বণিকপ্রশাসন-ব্যবস্থা।

দেখা যাচ্ছে, সরকারের অবিমিশ্র রূপের মধ্যে একমাত্র শূদ্র বর্ণের দ্বারা শাসনের কোন বিকৃতি নেই। সুতরাং একদিক দিয়ে এই শাসন-ব্যবস্থাই কাম্য। তবে শূদ্র-শাসন স্বামীজীর আদর্শ নয়—আদর্শ হ'ল—ব্রাহ্মণ-যুগের জ্ঞান, ক্ষত্রিয়-যুগের সংস্কৃতি, বৈশ্য-যুগের বিতরণ-প্রবণতা এবং শূদ্র-শাসনের সাম্যের মধ্যে সার্থক সমন্বয়।[৮] এই আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্রের (**ideal society and ideal state**) পরিস্ফুটন অবশ্য তিনি 'বর্তমান ভারতে' করেননি, অন্যত্র করেছেন।

অন্যান্য ধারণা :

তবে অন্যান্য কয়েকটি ধারণার সন্ধান 'বর্তমান ভারত'-এ পাওয়া যায় · যেমন, কর্তব্য-দর্শনের (**philosophy of duty**) ব্যাখ্যা, জাতির উপাদান সম্বন্ধে ধারণা, ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদ সম্বন্ধে ধারণা, হিতকর স্বৈরাচার (**benevolent dictatorship**) সম্বন্ধে ধারণা, ইত্যাদি। প্রত্যেকটি ধারণাই যে কালোত্তীর্ণ তাতে কোন সন্দেহই নেই। হিতকর স্বৈরাচারের দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। স্বামীজী বলেছেন: "হউন যুধিষ্টির বা রামচন্দ্র বা ধর্মাশোক বা আকবর, পরে যাদের মুখে সর্বদা অন্ন তুলিয়া দেয়, তাদের ক্রমে অন্ন উঠাইয়া খাইবার শক্তি লোপ পায়। সর্ব বিষয়ে অপরে যাহাকে রক্ষা করে, তাহার আত্মরক্ষা-শক্তির স্ফূর্তি কখনও হয় না। সর্বদাই শিশুর ন্যায় পালিত

৭ **Lin-utang : Wisdom of China and India** ৮ **C. W. VII, 381**

হইলে অতি বলিষ্ঠ যুবাও দীর্ঘকায় শিশু হইয়া যায় ; দেবতুল্য রাজা দ্বারা সর্বতোভাবে পালিত প্রজাও কখন স্বায়ত্তশাসন শিখে না ; রাজমুখাপেক্ষী হইয়া ক্রমে নির্বীর্য ও নিঃশক্তি হইয়া যায়। ঐ 'পালিত' রক্ষিতই দীর্ঘস্থায়ী হইলে সর্বনাশের মূল।" উক্তিটি কি জন স্টুয়ার্ট মিল বা হেনরী-ক্যাম্বেল ব্যানারম্যানকে স্মরণ করিয়ে দেয় না ?[৯]

উপসংহার :

স্বামী বিবেকানন্দ যে আমাদের জন্য এই সামাজিক ও রাজনৈতিক আদর্শের উত্তরাধিকার রেখে গেছেন সে সম্বন্ধে আমরা আজও বিশেষ সচেতন নই। কারণ হ'ল, স্বামীজীর ভাষাতেই, 'পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা···দাস-সুলভ দুর্বলতা।' আমরা ইংরেজীর মাধ্যমেই আধুনিক শাস্ত্রসমূহে জ্ঞান লাভ করেছি, কিন্তু আমাদের বিভিন্ন লোকোত্তর প্রতিভারও যে বেশ কিছু দান আছে, সে সম্বন্ধে এখনও আমরা বিশেষ সচেতন নই। কিন্তু আর দেরি নয়, দেরি করা উচিত হবে না। 'গৌরবান্বিতের গৌরবচ্ছটা' গায়ে লাগিয়ে গৌরববোধ করার হীন প্রবৃত্তি ত্যাগ না করলে জাতি গড়ে উঠবে না। সুতরাং বহির্মুখী দৃষ্টিকে প্রয়োজনমত অন্তর্মুখী করতে হবে— আমাদের নিজস্ব ঐশ্বর্যের প্রতি প্রয়োজনীয় শ্রদ্ধা গড়ে তুলতে হবে।

৯ "Measure for measure, a good despotism is more obnoxious than a bad one."—Mill. এবং "Better bad government under self-government than good government under alien dictatorship."—H. C. Bannermann

তুমি আমি

শ্রীশান্তশীল দাশ

যেটুকু চলি আমি, সেটুকু চলা যেন
তোমার পানে চলা হয় ;
যে কথা বলি আমি, সে কথা বলা যেন
তোমারই কথা, আর নয়।
যা কিছু স্মরি আমি, স্মরণে পাই যেন
তোমারই প্রেমঘন রূপ ;
আর তো কিছু নয়, আমার মাঝে সদা
জ্বলুক তব স্মৃতি-ধূপ।
সে ধূপ সৌরভে আমার সারা মন
থাকুক সদা আমোদিত ;
জীবন মাঝে তুমি দিবস ও নিশীথে
সদাই থেক' বিরাজিত।

অনেক কোলাহল, কত না সংশয়,
সে সব দূরে যাক সরে ;
কত না বাজে কাজে গেল যে কত কাল,
এখন ফিরে চলা ঘরে।
যে ঘরে তুমি-আমি, তোমার রূপধ্যান,
তোমাতে তদ্‌গত এ হৃদয় ;
স্নিগ্ধ দীপালোকে ধূপের সৌরভে,
আমার অন্তর তুমিময়।

শ্রীশ্রীমাতৃবন্দনা

স্বামী জীবানন্দ

বিষ্ণোর্লোকাৎ করুণনয়নং সম্পপাতাত্র দেব্যাঃ
আয়াতা সা যুগহিতকরী রামকৃষ্ণস্য শক্তিঃ।
পুণ্যস্থানে বিমলসদনে স্বীকৃতঃ পৈত্রভাবঃ
দেব্যা মাত্রা সুবিমলনরে ব্রাহ্মণে রামচন্দ্রে ॥ ১

বঙ্গপ্রান্তে শিশুসুচরিতা সারদা সংননন্দ
সর্বে লোকাঃ কমলচরণস্পর্শনেঽতীব ধন্যাঃ।
উদ্বাহস্তেঽতিশিশুসময়ে রামকৃষ্ণেন সার্দ্ধং
মাতুর্ভাবৈর্ভুবি নবতমৈঃ পূজিতা ত্বং হি পত্যা ॥ ২

সেবামূর্তির্জনভয়হরা ধ্যানগম্যা হি নিত্যং
পিত্রোঃ পার্শ্বে করকমলয়োঃ সুষ্ঠুসেবাপ্যনন্যা।
পশ্চাৎ সেবা হৃদি বিরচিতা স্বামিদেবস্য গেহে
ভক্তস্যার্তের্বিগমনকৃতী রোচতেঽতীব তুভ্যম্ ॥ ৩

ক্ষান্ত্যা মূর্তির্নিখিলভুবনে পাবনী নির্মলত্বাৎ
শান্ত্যা মূর্তির্ভুবনভবনে শান্তিদাত্রী নৃণাং বৈ।
মাতুর্মূর্তির্ভবভয়হরা বন্দনীয়া জনানাং
সংরক্ষ ত্বং সকলবিপদি স্থৈর্যপূর্ণে সদা নঃ ॥ ৪

আদ্যা শক্তিঃ পরমজননী সর্বভূমৌ জনানাং
বন্দ্যা দেবৈর্ভুবনপুরুষৈর্ভক্তিধর্মানুরাগৈঃ।
মাতা শ্রেষ্ঠা ত্রিদিবসদনাবাসিনামাশ্রয়া যা
সংরক্ষ ত্বং সকলবিপদি প্রেমরূপে সদা বঃ ॥ ৫

সর্বাম্নায়া মধুরমহিমাধিশ্রিতো মাতৃদেব্যা
মূর্তিঃ সাক্ষাদমিতকরুণাবারিধেঃ সর্বদা যা।
বিঘ্নং সর্বং বিপুলতরমাহন্তুমায়াতি পৃথ্ব্যাং
সংরক্ষ ত্বং সকলবিপদি ব্যাপ্তিরূপে সদা নঃ ॥ ৬

শীতে গ্রীষ্মে কঠিনতপসি ব্রহ্মশক্তিস্বরূপে
সীতামূর্তে বিপুলসহনক্ষান্তিশক্তির্বিধাত্রী।
পূতা গঙ্গা পতিতকলুষান্যাশু হন্তীব মাতা
সংরক্ষ ত্বং সকলবিপদি স্নেহরূপে সদা বঃ॥ ৭

রাধামূর্তৌ রসঘনতমা হ্লাদিনী যা প্রসিদ্ধা
সেয়ং মাতা ভুবনবিদিতা সারদা নিশ্চিতা বৈ।
কল্পে কল্পে চরণকমলে ভক্তবৃন্দৈঃ সুবন্দ্যে
সংরক্ষ ত্বং সকলবিপদি প্রেমপূর্ণে সদা নঃ॥ ৮

যস্যা মূর্তিঃ সুবিমলতমা বন্দিতা সাধুবৃন্দৈঃ
মাতুর্ভাবং জনগণহিতে স্থাপনায়াগতা যা।
ভক্তির্মুক্তির্ধবলসুমতির্বারিধারা কৃপায়াঃ
সংরক্ষ ত্বং সকলবিপদি ক্ষান্তিরূপে সদা বঃ॥ ৯

জয়তু জয়তু মাতা সারদা বন্দনীয়া
জয়তু জয়তু বিশ্বৈশ্বর্যদীপ্তা সুপূজ্যা।
জয়তু জয়তু সর্বাম্বা মহাসিদ্ধিরূপা
জয়তু জয়তু কল্যাণান্বিতা সর্বশক্তিঃ॥ ১০

জননীং শুভদাং বরদাং জয়দাং
পরমাং প্রকৃতিং বিজয়ামভয়াম্।
করুণানিলয়ামতুলাং মধুরাং
প্রণমামি সদা সুখদাং সদয়াম্॥ ১১

যৎ করোমি জগন্মাতরস্তু তৎ তব পূজনম্।
নিষ্কামমস্তু মে কর্ম কৃপয়া তব সারদে॥ ১২

স্বামীজীর শিক্ষানীতি

অধ্যাপক রেজাউল করীম

স্বামী বিবেকানন্দ কেবলমাত্র গৈরিকবস্ত্রাবৃত কমণ্ডলুধারী সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী ছিলেন না। তিনি ছিলেন প্রথমশ্রেণীর চিন্তাশীল ভূয়োদর্শী সাধক ও প্রকৃত লোকশিক্ষক। একটা অধঃ-পতিত সমাজের জন্য যে-সব কর্মোন্মাদনার প্রয়োজন আছে তা তিনি পরিপূর্ণভাবে দেশ তথা জাতিকে দিয়েছেন। বস্তুতঃ তিনি দেশের সর্ববিধ কল্যাণের কথা গভীরভাবে চিন্তা করে-ছিলেন। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব যখন তাঁকে বললেন, কেবল নিজের মুক্তি তোমার কাম্য হ'তে পারে না, তোমাকে বহন করতে হবে আরও বৃহত্তর দায়িত্ব, করতে হবে আরও বড় কাজ, তোমাকে ভাবতে হবে দেশের সর্বশ্রেণীর মানুষের কথা,—তখন তিনি তাঁর প্রাণের ঠাকুরের সে-নির্দেশ মাথা পেতে গ্রহণ করলেন। তারপর থেকে দেশের মানুষের সর্ববিধ কল্যাণ-সাধন হ'ল তাঁর জীবনের অন্যতম প্রধান ব্রত। দেশের কল্যাণ-সাধন বলতে কি বুঝায় ? দেশ কি ভৌগোলিক সীমার মধ্যে বিধৃত ইট পাথর ও মাটির একটা নির্জীব পিণ্ড মাত্র ? না, দেশ বলতে এ সব বুঝায় না। দেশ মানে দেশস্থিত অগণিত নরনারী। দেশের প্রকৃত কল্যাণ বলতে দেশের মানুষকে আদর্শ শিক্ষায় শিক্ষিত করা। ব্যাপক শিক্ষাবিস্তার ব্যতীত দেশের প্রকৃত কল্যাণ হ'তে পারে না। তাঁর সময় ভারতবর্ষে বৃটিশ সরকার প্রবর্তিত যে-ধরনের শিক্ষা প্রচলিত ছিল তার দ্বারা প্রকৃত মনুষ্যত্ব গড়ে উঠতে পারে না—এ কথা স্বামীজী পরিষ্কার ভাবে উপলব্ধি করলেন। তাতে জাতীয় জীবন সুষ্ঠুভাবে গঠিত হয় না, তাই স্বামীজী প্রকৃত শিক্ষার আদর্শ স্থাপনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলেন। শিক্ষা বিষয়ে তিনি যে-সব মূল্যবান উপদেশ দিয়েছিলেন, এই প্রবন্ধে সে সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা ক'রব।

তাঁর যুগে এ দেশে যে-ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত ছিল তার তিনি যথার্থ মূল্য নিরূপণ করতে পেরেছিলেন। যে কোন কারণেই হোক সমাজের মধ্যে বহু প্রকার পাপাচার দুর্নীতি ও অন্যায়াচার প্রবেশ ক'রে গোটা সমাজের আত্মাকে ধ্বংস করতে উদ্যত। বৃটিশ-পদ্ধতি অনুসরণ ক'রেই আমাদের তরুণ সম্প্রদায় বিদ্যার্চনা করতে লাগল। স্বামীজী উপলব্ধি করলেন যে, যদি অবাধে এই শিক্ষাপদ্ধতি চলতে থাকে, তবে সমাজের পাপ দুর্নীতি ও দুরাচার দূর হবে না। তাদের সামগ্রিক শিক্ষার জন্য উপযুক্ত শিক্ষা-পদ্ধতি প্রবর্তন করা একান্ত প্রয়োজন। শিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁর বাণী ছিল অনুপম। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, প্রত্যেক মানুষ ঐশ্বরিক সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে ঈশ্বরত্ব আছে। শিক্ষকের কর্তব্য হচ্ছে নিজের মধ্যে সেই সুপ্ত ঈশ্বরত্বকে বিকশিত ক'রে তোলা এবং এর বিকাশের জন্য শিক্ষার্থীকে উৎসাহিত করা ও সাহায্য করা। কেবল মুখে মুখে উপদেশ দিলে এ সব কাজ হয় না; শিক্ষককে আগে নিজের জীবনকে উচ্চ আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত ক'রে শিক্ষাদানকাজে অগ্রসর হ'তে হবে। তাঁর মতে শিক্ষক নিজে যদি আদর্শবান না হন, তবে তিনি উপযুক্ত শিক্ষক হ'তে পারবেন না। মানুষের মধ্যে এই যে ঈশ্বরত্ব সদাই বিরাজমান, তা অধিকাংশ লোকের নিকট প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। তিনি একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি

পরিষ্কার ক'রে বুঝিয়েছেন। লোহার পিপার মধ্যে যদি প্রদীপ্ত প্রদীপ থাকে, তবে তা লোহা ভেদ ক'রে বাইরে আলোক বিতরণ করতে পারবে না। সেই লোহাকে ভাঙ্গতে হবে তবেই ভিতরকার প্রদীপের আলো বাইরে বিচ্ছুরিত হবে। তেমনি মানুষের দেহের শক্ত আবরণের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ঈশ্বরত্বকে চেষ্টা ক'রে বিকাশ করতে হবে। শিক্ষক তা তাঁর নিজস্ব পবিত্রতা ও নিঃস্বার্থ সাধনার দ্বারা শিক্ষার্থীর ভিতরকার ঈশ্বরত্বকে বিকশিত করবেন। তখন দেখা যাবে যে, শিক্ষার্থীর মনটি কাঁচের মতো স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে। তাহ'লে শিক্ষকের কর্তব্য হচ্ছে, তিনি ছাত্র বা শিক্ষার্থীকে সুস্পষ্টভাবে মহৎ আদর্শের দিকে পরিচালিত করবেন, তার প্রতিটি কাজে নেতৃত্ব দেবেন, তাকে সর্ব প্রকারে উন্নত হ'তে সাহায্য করবেন। এমন শিক্ষা দিতে হবে যে, ছাত্র যেন তার জাতীয় আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য সম্বন্ধে সচেতন হ'তে পারে, একটা উন্নত মানসিক অবস্থায় উপনীত হবার জন্য অনবরত চেষ্টা করতে থাকে।

আজকাল যে-শিক্ষা দেওয়া হয়, তা কেবল তথ্যবহুল। ছাত্রের চরিত্রগঠনের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয় না। কতকগুলি প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় তথ্য ও সংবাদ দিয়ে শিক্ষার্থীর মস্তিষ্ককে ভরে দিলেই কি প্রকৃত শিক্ষা হয়? স্বামীজী মনে করেন যে, এর দ্বারা প্রকৃত শিক্ষালাভ হয় না। এ সম্পর্কে তিনি বলেন,—কেবল কতকগুলি তথ্য ছাত্রের মধ্যে ভরে দিলে—সেগুলিকে হজম করবার সুযোগ না দিলে - তার মনের মধ্যে বিচার বিশ্লেষণ করবার অবসর না দিলে দেশে প্রকৃত শিক্ষা বিস্তার হবে না।

স্বামীজী বলেন যে, আমাদের দেশের ছেলেমেয়েদের দিতে হবে প্রাণদায়িনী শিক্ষা—যে-শিক্ষা যথার্থ মানুষ তৈয়ার করতে পারবে।—যাকে তিনি বলেন "ম্যান-মেকিং" শিক্ষা। চরিত্রগঠনকারী শিক্ষা— সেই শিক্ষা যা ভাবকে হজম করে জীবনে পরিণত করতে শেখাবে। ছাত্র যদি মহৎ ভাবকে জীবনে ও চরিত্রে ফুটিয়ে তুলতে পারে তবেই হবে মানুষ তৈরির শিক্ষা। পাঠাগারের সমস্ত পুস্তক মুখস্থ করার চেয়ে এই শিক্ষার মূল্য অনেক বেশী। বিবিধ প্রকার তথ্যপূর্ণ বিষয়ে জ্ঞানলাভই যদি শিক্ষা হ'ত, তাহ'লে পাঠাগারগুলি বিজ্ঞতম পণ্ডিত হ'ত। একটা বিশ্বকোষে কত জ্ঞানগর্ভ বিষয় থাকে। কিন্তু তা সব মুখস্থ করলেও প্রকৃত শিক্ষা হয় না। সুতরাং স্বামীজী মনে করেন যে, শিক্ষা এমন হওয়া চাই যার দ্বারা হবে চরিত্রগঠন, বৃদ্ধি পাবে মনের তেজ ও শক্তি এবং যার সাহায্যে মানুষ নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে। আজ আমাদের দেশের জন্য চাই জ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগ সম্বন্ধে সম্যক্ উপলব্ধি, পাশ্চাত্য দেশের টেকনিক্যাল বিষয়েও শিক্ষালাভ করা দরকার—যার সাহায্যে শিল্পের উন্নতি হবে, যেন শিক্ষাপ্রাপ্তির পর ছাত্রগণ কিছু অর্থ উপার্জন করতে পারে। মোটের উপর এমন জ্ঞান লাভ করতে হবে, যা হবে দুর্দিনের সহায়ক। তাঁর মতে সমস্ত শিক্ষা ও ট্রেনিং-এর মুখ্য উদ্দেশ্য হ'ল, "মানুষ তৈয়ার করা"—সমস্ত শিক্ষার লক্ষ্য হবে মানুষকে পূর্ণভাবে বিকশিত করতে সাহায্য করা। এমন শিক্ষা দিতে হবে যার ফলে ছাত্র ইচ্ছাশক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করতে এবং সেই সঙ্গে তাকে কার্যকরী করতে পারবে। সেটাই হবে আসল শিক্ষা। এই শিক্ষা পেশীগুলি লোহার মতো শক্ত করবে, আর শিরা-উপশিরাগুলিকে করবে ইস্পাতের মতো ঘাতসহ। সেই সঙ্গে তৈরি হবে প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি, যাকে কেউ বাধা দিতে পারবে না।-- আনবে গভীর বিশ্বাস যা সমস্ত অজ্ঞান আবরণ ছিন্ন ক'রে মূল বিষয়কে দেখতে সাহায্য করবে। এই প্রকার

শিক্ষার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে। তাই তিনি এই কথার উপর বারবার জোর দিয়েছেন -- **man-making education**। তা নাহ'লে সব ব্যর্থ। বস্তুতঃ আজ যে ধরনের শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে তা উপযুক্ত মানুষ তৈয়ার করতে পারছে না। স্বামীজীর আদর্শ অনুসারে যদি শিক্ষাব্যবস্থা রচিত হ'ত. তাহলে শিক্ষাজগতে এই নৈরাজ্য দেখা দিত না।

স্বামীজী মনে করতেন যে, মানুষ-গঠনের শিক্ষা দেবার পথে যে-সব বাধা আছে, শিক্ষাব্যবস্থার কাজ হবে সেই বাধাগুলিকে অপসারণ করা, শিশুকে স্বাধীনভাবে বিকশিত করতে সাহায্য করা। উদাহরণস্বরূপ তিনি শিশুকে ছোট চারা গাছের সঙ্গে তুলনা করেছেন। আমরা একটি ছোট চারাগাছকে তার স্বাভাবিক পথে যতটা বিকশিত করতে পারি, শিশুকেও সেইভাবে বিকশিত হ'তে দিতে হবে। তার অধিক নয়। চারাগাছের আছে তার প্রকৃতি-প্রদত্ত জীবনী-শক্তি। সে সেই শক্তির বলে নিজের প্রচেষ্টায় বিকশিত হয়, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং পরে ফুলফলে সুশোভিত হয়। শিশুকেও সেইভাবে তার স্বাভাবিক শক্তিবলে বিকশিত হবার সুযোগ দিতে হবে। এদিক দিয়ে শিশুও নিজের শিক্ষক। শিক্ষক কিভাবে শিশুকে শিক্ষা দিতে পারেন? তিনি শিশুকে তার নিজের পন্থায় গড়ে উঠতে সাহায্য করবেন। শিক্ষক শিশুর শিক্ষার জন্য পথের বাধাগুলিকে অপসারিত করবেন। শিশু তার নিজের প্রকৃতি থেকেই জ্ঞান লাভ করবে। জমিতে বীজ বপন করার পর যদি দেখা যায় বীজগুলির উপর জমি চেপে বসেছে—চারা বের হ'তে পারছে না, তখন কি করতে হবে? জমিকে একটু আল্গা ক'রে দিতে হবে। তাহলেই জমি ভেদ ক'রে চারাগুলি জীবন্ত হ'য়ে প্রকাশিত হবে। চারাগাছগুলির বেলায় দেখতে হবে যেন কোন পশুতে সেগুলি নষ্ট না করে। শিশুর বেলাতেও তাই করতে হবে। বাস্তবিকই, একটি শিশু একদিক দিয়ে **self-educator**, নিজের শিক্ষা যে নিজেই লাভ করতে পারে। শিক্ষক যদি সব কিছুই তাকে শিখাতে চান তবে সে কিছুই শিখবে না। তার নিজের শক্তি নষ্ট হয়ে যাবে। শিক্ষক যদি ভাবেন যে, তিনি সব কিছুই শিখিয়ে দিবেন, তবে মস্ত ভুল করবেন। বস্তুতঃ মানুষের মধ্যেই আছে সমস্ত জ্ঞান, শিক্ষার সব উপাদান। দরকার—তার শক্তিকে একটু জাগ্রত ক'রে দেওয়া। আর তাই হ'ল শিক্ষকের কাজ। শিক্ষাদানের সময় এমনভাবে চলতে হবে যেন শিশুরা সব কিছুতেই তাদের নিজস্ব শক্তি নিজেদের পন্থাতেই প্রয়োগ করতে পারে। সে তার হাত পা কান ইত্যাদির ব্যবহার দ্বারা সব দিক দিয়ে নিজেকে শিক্ষিত করতে অভ্যস্ত হবে।

শিক্ষা সম্বন্ধে স্বামীজী আর একটি মৌলিক কথা বলেছেন যে, সব শিক্ষার সার কথা হচ্ছে **concentration of mind** অর্থাৎ মনের একাগ্রতা সাধন। দেখা গেছে যে, নিম্নস্তরের মানুষ থেকে উচ্চতম যোগী পর্য্যন্ত প্রত্যেকের জন্য এই একাগ্রতার একান্ত প্রয়োজন। জ্ঞানলাভের এটাই হ'ল একমাত্র উপায়। ল্যাবরেটরীতে বসে যে কেমিস্ট গবেষণা করেন তাঁর জন্য চাই একাগ্রতা তিনি তাঁর মনের সমস্ত শক্তিকে একটি বিষয়ের উপর নিবদ্ধ করেন। যিনি জ্যোতির্বিদ্যা আলোচনা করেন, তাঁকেও এইভাবে গভীর মনোনিবেশ সহকারে একটি বিষয়ের উপর মনঃসংযোগ করতে হবে। সব ক্ষেত্রেই একই নিয়ম। শিক্ষাক্ষেত্রেও সেই নিয়মই পালন করা চাই। আফিসের করণিক, বিদ্যানিকেতনের শিক্ষক, অধ্যাপক ও ছাত্র—যে-কোন মানুষের পক্ষে জ্ঞানলাভের জন্য একাগ্রতা ও মনঃসংযোগের

একান্ত প্রয়োজন। নতুবা তার সমস্ত প্রচেষ্টা ও সাধনা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে। একাগ্রতার অভাবে তিনি কিছুই করতে পারবেন না। দেখা গেছে যে, একাগ্রতার অভাবে বহু প্রতিভাবান মানুষের চিন্তাশক্তি একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। মানুষ ও পশুর মধ্যে প্রধান পার্থক্য এইখানে—মানুষের একাগ্রতার শক্তি আছে, পশুর যা খুব কম। এখন প্রশ্ন এই, কিভাবে এই একাগ্রতার শক্তিকে বৃদ্ধি করা যায়? এ সম্বন্ধে স্বামীজী বলেন যে, ব্রহ্মচর্য-পালন। তিনি বলেন, যে বার বছর নিষ্ঠার সহিত ব্রহ্মচর্যব্রত পালন করতে পারবে, সে হবে প্রচণ্ড শক্তির অধিকারী, বস্তুতঃ সে-ই হবে প্রকৃত শক্তির অধিকারী। কামনাকে নিয়ন্ত্রণ করলে চরমতম ফললাভ হবে। তাই তিনি বলেন ব্রহ্মচর্যের অভ্যাস দ্বারা যৌনশক্তিকে আধ্যাত্মিক শক্তিতে রূপান্তরিত করতে হবে। এই আধ্যাত্মিক তেজ যতই বাড়বে, মানুষের ব্যক্তিত্ব হবে তত প্রকট। এর জন্য শিক্ষার্থীকে পরিপূর্ণভাবে জিতেন্দ্রিয় হ'তে হবে। সংযমের অভাবেই আমাদের দেশে সব কিছুই ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। ঠিকভাবে সংযম অভ্যাস করলে অল্প সময়ের মধ্যেই সমস্ত জ্ঞানের পূর্ণ অধিকার লাভ করা যায়। বিশুদ্ধ মস্তিষ্কের চরমতম শক্তিলাভের অধিকার আছে। বস্তুতঃ শুদ্ধ মন ব্যতীত কোন প্রকার আধ্যাত্মিক শক্তি লাভ করা যায় না। সংযমের ফলে অদ্ভুত শক্তি লাভ হয়। মানুষের আধ্যাত্মিক নেতারা এভাবেই চরম শক্তি লাভ করেছিলেন

ব্রহ্মচর্যের উপর গুরুত্ব দেওয়ার পর স্বামীজী জোর দেন চরিত্রের অন্যান্য দিকের গঠনের উপর। তিনি বলেন যে, শিক্ষার সার হ'ল চরিত্রগঠন। চরিত্রগঠন কিভাবে সম্ভব হবে তার ব্যাখ্যা ক'রে বলেছেন যে, "চরিত্র" মানে, মানুষের মনের সমস্ত প্রবণতার সমষ্টি। কেবল একটা গুণ নিয়ে চরিত্র হয় না। সমস্ত গুণের সমাবেশ না হ'লে চরিত্র-গঠন হয় না। মানুষের মধ্যে যেসব উৎকৃষ্ট গুণ আছে সেগুলির সমাবেশই হ'ল চরিত্র। সুখদুঃখ, ব্যথাবেদনা, হর্ষবিষাদ, সফলতা-ব্যর্থতা কত কিছু আত্মার সামনে আসে আর চলে যায়। এ সবই আত্মার উপর বিভিন্ন ছাপ এঁকে দেয়। এদের সমষ্টিগত যে সব ছাপ মনের উপর থেকে যায়, তাই হ'ল মানুষের চরিত্র। আমরা গড়ে উঠি আমাদের চিন্তাসমূহের অনুরূপভাবে। মন্দ বিষয় চিন্তা করলে তার প্রভাবও চরিত্রের উপর পড়বে। সুতরাং আমরা কি চিন্তা করি তার উপর লক্ষ্য রাখতে হবে। যদি মানুষ সৎ চিন্তা করে তবে তার চরিত্রও সৎ হয়ে গড়ে উঠবে এবং শত বাধা সত্ত্বেও সে ভাল হ'তে পারবে। তখন তার মনে অন্যায়কে প্রতিরোধ করবার প্রবণতা জাগ্রত হবে। এমনকি সে যদি কোন অন্যায় করতে উদ্যত হয়, তখন তার সৎপ্রবণতাগুলি তাকে মন্দ কাজ থেকে প্রতিনিবৃত্ত করতে থাকবে। এবং সে সম্পূর্ণভাবে সৎপ্রবণতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হ'তে থাকবে। এরূপ যখন অবস্থা হবে তখনই বলা চলে, চরিত্র ঠিকমতো গঠিত হয়েছে। স্বামীজী আরও বলেন যে, যখন তুমি কোন মানুষের চরিত্রের বিচার করতে যাও তখন তার কৃত বড় বড় কাজের দিকে দৃক্‌পাত ক'রো না, বরং লক্ষ্য কর, কেমন ভাবে সে তার দৈনন্দিন জীবনের অত্যন্ত সাধারণ ও তুচ্ছ কর্তব্যগুলি পালন করছে। এইসব ছোট ছোট কাজই তার চরিত্রের প্রকৃত পরিচয় দেবে। নিম্নস্তরের মানুষের জীবনেও অনেক সময় এমন বহু ঘটনা ঘটে থাকে, যা তাকে কোন-না-কোন প্রকার মহত্ত্বে তুলে দেয়। কিন্তু সেই ব্যক্তিই বাস্তবিক বড় ও মহৎ, যার চরিত্র সকল সময় ও সকল অবস্থায় একই রূপ থাকে।

শিক্ষা বিষয়ে আর একটা প্রয়োজনীয় বিষয়ের

কথা তিনি ভোলেননি—তা হ'ল শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব। ব্যক্তিত্বের বিকাশের উপর তিনি কম গুরুত্ব দেননি। তিনি ইতিহাস আলোচনা ক'রে দেখিয়েছেন যে, মানবসমাজের মধ্যে যাঁরা মহান নেতা ব'লে পূজিত তাঁরা সকলেই ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন মহামানব ছিলেন। অতীত যুগে যে-সব মহান চিন্তাশীল ব্যক্তি ছিলেন, তাঁদের কথা ধরা যাক। তাঁরা অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। সে-সব গ্রন্থ বিরাট ও মহৎ। কিন্তু তাঁদের রচিত গ্রন্থ অপেক্ষা তাঁদের ব্যক্তিত্বই আরও বড়। রবীন্দ্র-নাথের ভাষায় বলা যেতে পারে, "তোমার সৃষ্টির চেয়ে তুমি যে মহান।" স্বামীজীর মতে বুদ্ধি ও চিন্তাসমষ্টি হচ্ছে ব্যক্তিত্বের দুই-তৃতীয়াংশ। অপরের মনের ওপর প্রভাববিস্তারের কাজে অপরকে শিক্ষাদানের, কোন আদর্শে অনুপ্রাণিত করার কাজে মানুষের ব্যক্তিত্বই প্রধান কথা। অতীত যুগের মহামানবদের ব্যক্তিত্বের প্রভাব আমাদের যুগেও মানুষকে প্রভাবান্বিত করছে। মানুষের কর্ম হবে তার চিন্তার পরিণত ফলস্বরূপ। সর্বাগ্রে চাই প্রকৃত মানুষ, তারপর তার থেকে কর্ম বেরিয়ে আসবে। সৎ চিন্তা থাকলে তার পরিণত ফলও হবে ভাল।

স্বামীজীর শিক্ষানীতির আর একটা বড় কথা হ'ল, গুরুগৃহে বাস করে শিক্ষালাভ। আজকাল শিক্ষার্থীর সংখ্যা এত বৃদ্ধি পেয়েছে যে, আমরা গুরুগৃহে বাসের কথা চিন্তা করতে পারি না। শুধু তাই নয়—আদর্শ শিক্ষকের সংখ্যাও অতি নগণ্য। প্রশ্ন হ'ল, সে ক্ষেত্রে গুরুগৃহে বাস ক'রে শিক্ষালাভ কিভাবে সম্ভব হবে? স্বীকার করি এতে বহু অসুবিধা আছে। তবুও বলব যে, স্বামীজীর কথা ভেবে দেখতে হবে। একথা সকলকে স্বীকার করতে হবে যে, গুরুশিষ্যের মধ্যে প্রত্যক্ষ ও নিবিড় সম্পর্ক স্থাপিত না হ'লে ভাল শিক্ষা হবে না। সুতরাং স্বামীজীর কথাটা বিবেচনা ক'রে দেখা কর্তব্য। তিনি শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে নিবিড় ও প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপন করার কথা বলেছেন। সুতরাং বাল্যকাল থেকেই এমন শিক্ষক বা গুরুর সান্নিধ্যে বাস করতে হবে যাঁর জীবন অগ্নিশিখার মতো। যিনি চরিত্রে ব্যক্তিত্বে ছাত্রের নিকট আদর্শস্বরূপ। শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে থাকবে একটা নিবিড় সম্পর্ক—শিক্ষক তার পবিত্রতা, জ্ঞানপিপাসার দ্বারা ছাত্রকে করবেন প্রভাবিত। সৎচিন্তা ও মহৎ কর্তব্যজ্ঞানের হবেন তিনি প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত। একটা কথা আছে "যা আমরা চাব তা আমরা পাব"—চাওয়ার মতো চাইতে হবে। যা চাব তার উপর হৃদয়-মন সমর্পণ করতে হবে। সমর্পণ করতে না পারলে আমরা কিছুই পাব না। প্রাপ্তির জন্য অনবরত সংগ্রাম ক'রে যেতে হবে—সব সময় পশু প্রকৃতির বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম করতে হবে। এরূপ করতে করতে উচ্চতর বিষয়ের অভাব অনুভব করতে পারব। অবশেষে আমাদের পূর্ণ শিক্ষা লাভ হবে।

শিক্ষকের যোগ্যতা সম্বন্ধে স্বামীজী বলেন যে, শুধু এম্. এ., ডিলিট, ডিফিল ইত্যাদি হলেই চলবে না। দেখতে হবে যেন তিনি যথার্থ ধার্মিক হন। তিনি যেন ধর্মের মূল ভাবটি উপলব্ধি করতে পারেন। জগতের সর্বত্র ধর্মশাস্ত্র পঠিত হয়, তার অর্থও লোকে কিছু কিছু বোঝে। কিন্তু শাস্ত্রের মূল ভাবটি খুব কম লোকেই বোঝে। এই সব শাস্ত্রপাঠকগণ শব্দতত্ত্ব বা ঐ ধরনের বিষয়েই বেশী ব্যস্ত থাকেন। ধর্মশিক্ষার মর্মমূলে প্রবেশ করতে পারেন না। যে সব শিক্ষক শাস্ত্রগ্রন্থের কেবল শব্দতত্ত্বের উপর জোর দেন, তাঁরা শাস্ত্রের মূল ভাব হারিয়ে ফেলেন। কিন্তু ধর্মশাস্ত্রের মূল বক্তব্য বিষয়ে জ্ঞান থাকা চাই। সে-জ্ঞান লাভ হ'লে সত্যিকারের শিক্ষা হবে। শিক্ষক হওয়ার আর একটা অপরিহার্য গুণ হ'ল তাঁর নিষ্পাপতা।

কোন কোন মহল থেকে প্রশ্ন উঠেছে—কেন আমরা শিক্ষকের ব্যক্তিগত চরিত্রের উপর দৃষ্টি-পাত ক'রব। স্বামীজীর মতে নিজের জন্য সত্যলাভ এবং অপরের মধ্যে সেই সত্যকে সঞ্চারিত করার জন্য অপরিহার্য শর্ত হচ্ছে হৃদয় ও আত্মার পবিত্রতা;—তিনি পবিত্র হবেন ও শুদ্ধ হবেন তবেই তো শিক্ষার্থীর নিকট তাঁর কথা ও উপদেশের মূল্য থাকবে। শিক্ষকের অন্য একটা কাজ হচ্ছে অপরের নিকট মহৎ আদর্শকে উপস্থাপিত করা। সুতরাং শিক্ষককে পবিত্র ও শুদ্ধচিত্ত হ'তে হবে, আদর্শনিষ্ঠ হ'তে হবে। শিক্ষকের মনে কোন অভিসন্ধিমূলক উদ্দেশ্য থাকবে না। শিক্ষককে প্রেম ও ভালবাসার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হ'য়ে কাজ করতে হবে। প্রেমই একমাত্র মাধ্যম যার সাহায্যে আধ্যাত্মিক শক্তি অপরের মধ্যে সঞ্চারিত করা সম্ভব। শিক্ষার্থীকে ধর্মশিক্ষা দিতে গেলে দল-উপদলীয় প্রশ্ন আত্মপ্রকাশ করতে পারে ব'লে কেউ কেউ হয়তো অভিযোগ করবেন। কিন্তু স্বামীজী এক্ষেত্রে ধর্ম বলতে the true eternal principle of religion-এর কথা মনে করেন। ধর্মের চিরন্তন সত্যের উপর জোর দিলে কোনও রূপ উপদলীয় প্রশ্ন উঠতেই পারে না। উদার ধর্মশিক্ষাকে বর্জন করে শিক্ষানীতির কথা স্বামীজী ভাবতে পারেননি। আজকাল আমাদের দেশে যখন শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে নানা জনে নানা মত প্রকাশ করছেন, তখন স্বামীজীর শিক্ষানীতির মূল কথাটা সকলের সামনে তুলে ধরতে পারি। আশা করি শিক্ষাবিদ্‌গণ এ বিষয়ে বিবেচনা ক'রে দেখবেন।

মা

[গান]

স্বামী চণ্ডিকানন্দ

মানুষ হইব আশা ক'রে মাগো এসেছি তোমারি দুয়ারে।
কর মা মানুষ, দাও "মান হুঁশ" আর কাঁদায়ো না আমারে॥
বিষয়-লালসে ভোগের নেশায়
আর ঘুরিব না নরপশু প্রায়
মতি দাও মাগো "ত্যাগ ও সেবা"য়, মিশিব শান্তি-পারাবারে

'সুরেন্দ্রের পট'

স্বামী প্রভানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ বাগবাজারে নন্দ বসুর বাড়ীতে ঈশ্বরীয় ছবি দেখতে এসেছিলেন। দোতলায় হলঘরের চারিদিকের দেওয়ালে টাঙ্গানো বিভিন্ন দেবদেবীর ছবি। ঈশ্বরীয় মূর্তিসকল দেখে তাঁর আনন্দ আর ধরে না। হঠাৎ তাঁর দৃষ্টি পড়ে একটি নূতন ধরনের তৈলচিত্রের উপর। তিনি সহাস্যে ব'লে উঠেন, "ও যে সুরেন্দ্রের পট!"

পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন প্রসন্নের পিতা। তিনি মৃদু হেসে বলেন, 'আপনিও ওর ভিতর আছেন।'

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—"ওই এক রকম, ওর ভিতর সবই আছে—ইদানীং ভাব।"

'সুরেন্দ্রের পট' আধুনিক, ওর ভিতর "সবই আছে"—সকল প্রকার ভাবের সমন্বয় ঘটেছে। পটখানি সত্যসত্যই অসামান্য; ভাব-গাম্ভীর্যে ও ভাবের প্রকাশ-ব্যঞ্জনায় অতুলনীয়, অদ্বিতীয়। পটীয়ান্ পটুয়ার শিল্পনৈপুণ্যে বিধৃত হয়েছে প্রধান সকল ধর্মভাবের সমাবেশ, চিত্রপটে ধর্মে ধর্মে বিরোধের নিষ্পত্তি, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে অনৈক্য ও দ্বন্দ্বের অবসান সুস্পষ্টভাবে বিঘোষিত, নিবিড় ঐক্যের আকর্ষণে অতীতের অশ্রুলবণাক্ত বিচ্ছেদের বাঁধগুলি বিধ্বস্ত। শান্তি-সৌন্দর্য-সংবলিত চিত্রপটে প্রীতি শান্তি সদ্ভাব অপর্যাপ্তভাবে উচ্ছল। এখানে ভাবসমন্বয়ের রহস্যসূত্র অপাবৃত করাই পটুয়ার প্রধান লক্ষ্য। সমন্বয়-বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ, সমন্বয়সূত্রঅনুসন্ধানে নিরত ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র—একজন গুরু, অপরজন শিষ্যের ভূমিকায় অবতীর্ণ। উত্তম গুরু শ্রদ্ধাবান শিষ্যের সামনে তুলে ধরেছেন সমন্বয়ের রাখীবন্ধনে সুসংবদ্ধ ভাবরাজ্যের এক অপূর্ব সুন্দর দৃশ্য। পটের ভিতর পট, যেন পটনাট্য। শ্রীরামকৃষ্ণ ও কেশবচন্দ্র দৃক্, তাঁদের দৃশ্য মর্ত্যলোকে আবির্ভূত এক স্বর্গলোকের দৃশ্যকাব্য। চমৎকার চিত্র-পরিকল্পনা, গভীরভাবদ্যোতক তার ব্যঞ্জনা। ধর্মজগতের অতীত বিষাদের ইতিবৃত্ত ও বর্তমানের বিভ্রান্তিকর সমস্যার আঙ্গিকে মহান ভবিষ্যতের আভাস রঙবিচিত্রার আলোকে উজ্জ্বল হয়ে আছে। শিল্পীর সুপরিকল্পনা, গভীর দৃষ্টিভঙ্গী ও বলিষ্ঠ রেখা ও রঙ-ব্যবহার পটটিকে স্বাতন্ত্র্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ক'রে তুলেছে। আবার পটনাট্যের প্রধান দুই নায়ক, শ্রীরামকৃষ্ণ ও কেশবচন্দ্রের প্রশংসার শীলমোহরযুক্ত এই চিত্রপট ভাববস্তুর প্রামাণিকতায় অবিসংবাদিতভাবে ঐতিহাসিক-গুরুত্বপূর্ণ।

চিত্রপটের ভাববস্তুর যথার্থ রসাস্বাদনের জন্য প্রয়োজন ইতিহাসের কয়েকটি অংশের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচন। মুসলমান রাজত্বকালে কয়েকশত বছরের শাসন ও শোষণে ভারতবর্ষ পর্যুদস্ত, সে সময়ে সোনার ভারতবর্ষে ঝাঁপিয়ে পড়ে ফরাসী, ওলন্দাজ, ইংরেজ। ভারতবাসী ইংরেজের আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদের নিকট আত্মসমর্পণ করে। বলদর্পী বিদেশী রাজদণ্ডের আশ্রয়পুষ্ট খৃষ্টধর্ম ব্যাপকভাবে ভারতবাসীর ধর্মান্তরকরণে নিযুক্ত হয়।[১]

---

১ ১৮৬৬ খৃঃ ৫ই মে তারিখে কেশবচন্দ্রের ভাষণ হ'তে জানা যায় ১,৫৪,০০০ জন ভারতবাসী খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছে। তার জন্য ৫১৯ জন বিদেশী পাদ্রী নিযুক্ত ও তাদের সেবাধর্মের জন্য বার্ষিক ব্যয় ২,৫০,০০০ পাউণ্ড। ১৮৭৬-৭৯ খৃষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্যে ব্যাপক দুর্ভিক্ষের সময় অন্নের সঙ্গে সঙ্গে খৃষ্টধর্ম বিতরণ করা হয়। ব্যাপক ধর্মান্তর ঘটে। ক্রমে ধর্মান্তরের প্লাবন উত্তর-ভারতকে গ্রাস করে।

এদিকে বিবিধ ঐতিহাসিক উপাদানের সংঘাতে ভারতবর্ষে উদ্ভূত হয় নূতন প্রাণশক্তির জাগরণ। দেশী-বিদেশী পণ্ডিতগণের চর্চা ও চর্যায় ভারতীয় সংস্কৃতির ধনরত্ন পুনরাবিষ্কৃত হয়। অতীতের গৌরব দেশবাসীকে সচেতন ও মহান ভবিষ্যতের রূপায়ণে প্রবুদ্ধ করে। নব-জাগৃতির শিহরণ ধর্মপ্রাণ ভারতবাসীর ধর্মজীবনে বিপুল আলোড়ন তোলে। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে রাম-মোহন রায় ব্রাহ্মধর্ম প্রতিষ্ঠা করেন। চৌদ্দ বছর পরে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বে ব্রাহ্ম আন্দোলন বলিষ্ঠ হয়ে উঠে। কেশবচন্দ্র সেনের যোগদানে আন্দোলন জনপ্রিয় ও অধিকতর শক্তিশালী হয়, কিন্তু ভাবগত অনৈক্যে দ্বিধাবিভক্ত হয়। ১৮৬৮ খৃঃ কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা হয়; আদি সমাজের পুরোধায় থাকেন দেবেন্দ্রনাথ। কয়েক বছর পরে সমাজের বিধি-ভঙ্গের অভিযোগে নেতা কেশবচন্দ্রের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ পুঞ্জীভূত হয়। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে কেশব-চন্দ্র সৃষ্টি করেন 'নববিধান'।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে দয়ানন্দ সরস্বতী-প্রতিষ্ঠিত আর্যসমাজ মুসলিম ও খৃষ্টধর্মের আগ্রাসী নীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে মির্জা গোলাম আহমদ-সংগঠিত সদর অঞ্জুমান-ই-আহ-মদীয় মুসলিম ধর্ম সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণে বদ্ধ-পরিকর হয়। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে নিউইয়র্কে গড়ে উঠে থিয়োসফি আন্দোলন, চার বছর পরে মূল কার্যালয় ভারতবর্ষে স্থানান্তরিত হয়। এই আন্দোলনের অন্যতম ফলশ্রুতি, ভারতবর্ষের প্রাচীন ঐতিহ্য সম্বন্ধে দেশবাসী সচেতন হয়। ভারতবর্ষের চতুর্দিকে ধর্মভাবের প্লাবন নূতন যুগের সূচনা করে এবং ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠেন নব-জাগৃতির প্রাণ-উৎস শ্রীরামকৃষ্ণ।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও কেশবচন্দ্রের মিলন ঘটে ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ১৫ই মার্চ। কেশবচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণের পূত-সান্নিধ্যে অভিভূত হন। শ্রীরামকৃষ্ণের দিন-লিপিকার মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত মন্তব্য করেছেন, "ইংরাজী-পড়া কেশবচন্দ্র সেন-আদি পণ্ডিতেরাও ঠাকুরকে দেখে অবাক্ হয়েছেন। কি আশ্চর্য! নিরক্ষর ব্যক্তি এসব কথা কিরূপে বলছেন? এ যে ঠিক যীশুখৃষ্টের মত কথা! সেই গ্রাম্য-ভাষা! সেই গল্প ক'রে বুঝান—যাতে পুরুষ, স্ত্রী, ছেলে সকলে অনায়াসে বুঝিতে পারে। যীশু **Father** **Father** করতে করতে পাগল হয়েছিলেন ইনি মা মা করে পাগল! শুধু জ্ঞানের অক্ষয় ভাণ্ডার নহে—ঈশ্বরপ্রেম 'কলসে কলসে ঢালে তবু না ফুরায়।' ইনিও যীশুর মত ত্যাগী, তাঁহারই মত ইঁহারও জ্বলন্ত বিশ্বাস, পাহাড়ের মত অটল বিশ্বাস। তাই কথাগুলির এত জোর!···কেশব-সেনাদি পণ্ডিতেরা আরো ভাবেন, এই নিরক্ষর লোকের এত উদার ভাব কেমন করে হ'ল! কি আশ্চর্য! কোনরূপ বিদ্বেষভাব নাই, সব ধর্মাবলম্বীদের আদর করেন—কাহারও সহিত ঝগড়া নাই।"[২]

প্রায় পাঁচ বছর পরে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের ২৫শে জানুআরি রবিবারে কেশবচন্দ্র ব্রাহ্ম-বার্ষিক-উৎসবে ঘোষণা করেন তাঁর মানসপুত্র 'নববিধানে'র জন্ম। তিনি আবেগময়ী ভাষায় বলেন, "· অদ্যকার দিন এত আনন্দের দিন হইল কেন? পৃথিবী বঙ্গ-দেশকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, 'আজ তুমি নূতন কাপড় পরিয়াছ কেন?' বঙ্গদেশ পৃথিবীকে বলিতে লাগিলেন, 'পৃথিবী, শুন, পঞ্চাশ বৎসর ব্রাহ্মসমাজগর্ভে ধর্মের শিশু গঠিত হইতেছিল। বহুকালের প্রসবযন্ত্রণার পর···এক সর্বাঙ্গসুন্দর শিশু জন্মগ্রহণ করিয়াছে। সেই শিশুর ভিতরে

২ তত্ত্বমঞ্জরী, চতুর্থ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, পৃঃ ৪৯-৫০

যোগ, ধ্যান, বৈরাগ্য, প্রেম, ভক্তি সমুদায় গুণ সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। সেই শিশুর অন্তরে বেদ-বেদান্ত পুরাণ তন্ত্র বাইবেল কোরাণ সমুদায় রহিয়াছে।...ঈশা, মুষা, শ্রীচৈতন্য, নানক, কবীর, শাক্যমুনি, মোহম্মদ প্রভৃতি আপন আপন শিষ্য-দিগকে সঙ্গে লইয়া শিশুর অভ্যর্থনা করিতে আসিলেন। তাঁহাদের একটি ভাই জন্মিয়াছে শুনিয়া, তাঁহাদের কত আহ্লাদ!.. পৃথিবীতে যত ভাবের অবতার হইয়াছে, শিশু সকলকে আপনার ভিতর এক করিয়া লইয়াছেন। শিশু জন্মিবা-মাত্র অল্পক্ষণের মধ্যে সকলের পদতলে পড়িয়া প্রণাম করিতে লাগিল। সে কি সামান্য শিশু! সেই শিশুর জন্ম হইল, আর দুই ধর্ম থাকিতে পারে না, দুই বিধান থাকিতে পারে না। সকল ধর্ম এক হইল, সকল বিধান এক বিধানান্তর্গত হইল।...নববিধান শিশু সংসারে স্বর্গ দেখাইবার জন্য জন্মিয়াছেন।...নূতন বিধান, নূতন শিশু সকলের ঘরে কল্যাণ বিস্তার করুন।'"[৩]

পরের বছর ২২শে জানুআরি কেশবচন্দ্র কলিকাতা টাউন হলে একটি ভাষণে বলেন, "নববিধানের এই রূপ! যাবতীয় ধর্মশাস্ত্রবিধান ও সকল আপ্তপুরুষের সমন্বয় নববিধান। এটা বিচ্ছিন্ন একটি মতবাদ নয়। নববিধান একটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব যা সকল ধর্মকে গ্রথিত করেছে, প্রকাশ করেছে ও সমন্বিত করেছে।...নববিধান মূল্যবান কণ্ঠহার, যাতে যুগযুগান্তরের ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মণিমুক্তা নিবদ্ধ।.. এভাবে আমরা নূতন মানুষ সৃষ্টি ক'রব, সেই মানুষের ইচ্ছাশক্তি হবে ভগবান যীশু, মস্তিষ্ক সক্রেটিস, হৃদয় শ্রীচৈতন্য, আত্মা হিন্দু ঋষি এবং দক্ষিণ হস্ত জনসেবী হাওয়ার্ড।"[৪] নববিধানের ভাবাদর্শের বাস্তব রূপায়ণের জন্য নূতন পতাকা ও প্রতীক তৈরী হয়, নব-সংহিতা রচিত হয়; 'নিশান-বরণ ও আরাত্রিক', 'হোমানুষ্ঠান', 'ঈশ্বরের ব্যাপ্তিজলে জলাভিষেক অনুষ্ঠান,' 'দোষস্বীকার-বিধির প্রবর্তন' প্রভৃতি সংযুক্ত হয়; নূতন ভাব জনপ্রিয় করার জন্য নগরসঙ্কীর্তন প্রবর্তিত হয়, কয়েকবার 'নব-বৃন্দাবন' নাটক মঞ্চস্থ হয়, 'নবনৃত্য' অনুষ্ঠিত হয়।

কেশবচন্দ্র ও তাঁর সহগামিগণ বিশ্বাস করতেন যে, কেশবচন্দ্র ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ আদেশে নববিধানের সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু বাস্তবে নব-বিধান যে-রূপ ধারণ করে তা বিশ্লেষণ ক'রে ইতিহাস-বেত্তা লিখেছেন, "Thus the thing is coming to this that the New Dispensation is tending to become a stereotyped creed like Mahomedanism, with the New Samhita as an infallible book like the Koran, and with Mr. Sen as the central figure and Minister, like Mahomed the Prophet."[৫] সাধারণ মানুষের কাছে নববিধানের যে ভাবমূর্তি প্রকটিত হয় তার চিত্র অঙ্কন করেছেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথিকার:

কেমন নূতন ধর্ম কেশবের গড়া।
ঠিক যেন বিবিধ কুসুমে বাঁধা তোড়া॥
নববিধানের কথা তোড়া তুলনায়।
সকল ধর্মের কিছু কিছু আছে তায়॥
মহাভাব গৌরাঙ্গের প্রেমসমন্বিত।

৩ উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়: 'আচার্য কেশবচন্দ্র', শতবার্ষিকী সংস্করণ, পৃঃ ১৫৩৬-৩৮

৪ **Keshub Chunder Sen: Lectures in India, Navavidhan Publication Committee**, পৃঃ ৪৫২-৩

৫ **Shibnath Sastri: History of the Brahmo Samaj, Vol. II, P. 106**

কৃষ্ণের প্রকট জ্ঞান গীতায় কথিত ॥
সহিষ্ণুতা ক্রাইষ্টের নির্ভরতা বল।
অপার করুণারাজি ভাব সমুজ্জ্বল ॥
বাল্যভাব শ্রীপ্রভুর পরা যত্নে রাখা।
সন্তানের সমতুল্য মা বলিয়া ডাকা ॥
অন্য অন্য স্থানে যাহা বুঝিল সুন্দর।
লইল তাহার কিছু করিয়া আদর ॥
আগাগোড়া বাদ দিয়া কণাংশ লইয়া।
নববিধানের দেহ দিল সাজাইয়া ॥

(পৃঃ ৩৩৮)

নববিধানে বৈচিত্র্যের সমাবেশ আপাতমনোহর হলেও ধর্মানুরাগী মাত্রই অনুভব করেন "নব-বিধানের গাছে ফল নাহি ফলে ॥ ফল-ফলা অসম্ভব স্পষ্ট দেখা যায়। তোড়াতে ফুলের খেলা গাছ কোথা তায় ॥"

অনেকেই মনে করেন কেশবচন্দ্রের উপর শ্রীরামকৃষ্ণের গভীর প্রভাবের প্রতিফলন নব-বিধানের রূপ ধারণ করেছে। 'বেদব্যাস', (মাঘ ১২৯৪) লেখেন, "পরমহংসদেবের আশ্রয় পাইয়া কেশববাবুর হৃদয়ে যুগান্তর উপস্থিত হয়। সেই পরিবর্তনের ফলে 'নববিধান' প্রসব হয়।" 'তত্ত্ব-মঞ্জরী' (দ্বিতীয় ভাগ, ২য় ও ৩য় সংখ্যা, পৃঃ ২৯) লেখেন, "কেশববাবু যে পরমহংসদেবের ভাব লইয়া নিজের অবস্থা ও বর্তমান ইয়ুরোপীয় ভাবে রঞ্জিত করিয়া নববিধানের নাম দিয়াছিলেন তাহার কিছু-মাত্র সন্দেহ নাই। কারণ যাহা তিনি নববিধানে নূতন বলিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহার মধ্যে কিছুই নূতন নহে। যাহাকে নূতন বলিয়াছেন, তাহা পরমহংসদেবের ভাবের বিকৃতাবস্থা মাত্র।" শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ গ্রন্থের সামগ্রিক অভিমত বিশেষ লক্ষণীয়। "দেখা যায়, একপক্ষে তিনি (কেশবচন্দ্র) ঠাকুরকে জীবন্ত ধর্মমূর্তি বলিয়া জ্ঞান করিতেন···যেখানে বসিয়া ঈশ্বরচিন্তা করিতেন, ঠাকুরকে সেখানে লইয়া যাইয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিয়াছিলেন।··· অপরপক্ষে তিনি ঠাকুরের 'সর্ব ধর্ম সত্য যত মত তত পথ' রূপ বাক্য সম্যক্ লইতে না পারিয়া নিজ বুদ্ধির সহায়ে সকল ধর্মমত হইতে সারভাগ গ্রহণ এবং অসারভাগ ত্যাগপূর্বক 'নববিধান' আখ্যা দিয়া এক নূতন মতের স্থাপনে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। ঠাকুরের সহিত পরিচিত হইবার কিছুকাল পরে উক্ত মতের আবির্ভাবে হৃদয়ঙ্গম হয়, শ্রীযুক্ত কেশব ঠাকুরের সর্বধর্মসম্বন্ধীয় চরম মীমাংসাটিকে ঐরূপ আংশিকভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন।"[৬] (দ্বিতীয় ভাগ, পৃঃ ৪৩৭)

আমরা দেখতে পাই, আলোচ্য চিত্রপটখানির উদ্যোক্তার ধারণাও ছিল অনুরূপ। শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে কেশবের প্রচারের ফলে দক্ষিণেশ্বরে লোকের ভীড় হ'তে থাকে। সেই সঙ্গে আসেন অনুরাগী ভক্তগণ। ক্রমে ক্রমে আসেন রামচন্দ্র দত্ত, মনো-মোহন মিত্র, রাখালচন্দ্র ঘোষ, সুরেশচন্দ্র মিত্র, নরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি। এঁদের মধ্যে সুরেশচন্দ্র মিত্র যাঁকে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর অন্যতম রসদদার ব'লে চিহ্নিত করেছিলেন ও স্নেহভরে 'সুরেন্দ্র' বা 'সুরেন্দর' ব'লে ডাকতেন—তিনি ছিলেন সরল বিশ্বাসী ও বিশেষ উৎসাহী। তাঁর আগ্রাসী দৃষ্টি-

---

৬ বিদেশী দুজন বিখ্যাত রামকৃষ্ণ-জীবনী-লেখকের মতও অনুধাবনযোগ্য। রোমাঁ রলাঁ লিখেছেন, "The essential ideas were already formed when he met Ramakrishna for the first time (p. 169)." অপরপক্ষে ইদানীং কালে ঈশারউড লিখেছেন, "The New Dispensation was fundamentally a presentation of Ramakrishna's teachings —as far as Keshab was able to understand them. ···he regarded Ramakrishna as a living embodiment of his creed." (p. 165)

ভঙ্গী। তিনি যা সত্য ব'লে বিশ্বাস করতেন তা সর্বসমক্ষে প্রচার করতে দেরী বা দ্বিধা করতেন না। অন্যান্যদের মত রাম, সুরেশ ও মনোমোহন শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মসমন্বয়ের ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ হন। তাঁরা লক্ষ্য করেন, ব্রাহ্মনেতা কেবশচন্দ্রের জীবন বা বাণীতে শ্রীরামকৃষ্ণের গভীর ও ব্যাপক প্রভাব। শ্রীরামকৃষ্ণ ও কেশবচন্দ্রের নিকট সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে সর্বধর্মসমন্বয়ের ভাবাদর্শ চিত্রপটে চিত্রায়ণ করার আকাঙ্ক্ষা হয় সুরেশচন্দ্রের। সুরেশ, রামচন্দ্র ও মনোমোহন একই পল্লীতে বাস করতেন। সুরেশ তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে চিত্রপটের পরিকল্পনা করেন। জনৈক গুণী চিত্রশিল্পী সেই সুন্দর পরিকল্পনাটিকে রূপদান করেন একটি তৈলচিত্রের মাধ্যমে। পরিকল্পনাকারীদের অন্যতম রামচন্দ্র লিখেছেন, "এই চিত্রখানি প্রস্তুত করিবার দুইটি ভাব ছিল। প্রথম, এই ভাবটি পরমহংসদেবের নিজের সাধনার ফলস্বরূপ এবং দ্বিতীয়, উহা কেশববাবু পরমহংসদেবের নিকট হইতে পাইয়াছেন।"[৭] রামচন্দ্র অন্যত্র লেখেন, "সেই ছবিতে পরমহংসদেবকে সর্বধর্মসমন্বয়ের গুরুরূপে এবং কেশববাবুকে শিষ্যস্বরূপে প্রদর্শিত হইয়াছিল।"[৮] 'জন্মভূমি' পত্রিকাও লেখে যে, শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনার সারকথা এবং কেশবচন্দ্রের ঐ ভাবগ্রহণ জনসমক্ষে তুলে ধরার জন্যই চিত্রপটের পরিকল্পনা।[৯] সুরেশচন্দ্র তৈলচিত্রখানি কেশবচন্দ্রকে দেখতে পাঠান। কেশবচন্দ্র তাঁর মনের ভাব ব্যক্ত করেন একখানি চিঠিতে। তিনি লেখেন, "**Blessed is he who has conceived this idea.**"[১০] উৎসাহিত সুরেশচন্দ্র একদিন দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণকে তৈলচিত্রখানি দেখিয়ে আনেন। চিত্রপট সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের অবিলম্ব প্রতিক্রিয়া লিখিত নেই, কিন্তু চিত্রের ভাব তাঁর অনুমোদন লাভ করে, সন্দেহ নাই। সুরেশচন্দ্র তাঁর বাড়ীর বৈঠকখানার দেওয়ালে পটখানি টাঙিয়ে রাখেন। শ্রীরামকৃষ্ণ এই বাড়ীতে বসে পটখানি দেখেন, পূর্বে না হলেও অন্ততঃ ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ২৭শে অক্টোবর।

শ্রীরামকৃষ্ণ তৈলচিত্রখানিকে বলতেন 'সুরেন্দ্রের পট'; রামদত্ত প্রভৃতি কয়েকজনের মতে ছবির বিষয়বস্তু 'কেশবের প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ', শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতকারের মতে 'নববিধানের ছবি', সাধারণ লোক ছবিটির নামকরণ করে 'সর্বধর্মসমন্বয়'।[১১] আর নববিধান সম্প্রদায়ের দৃষ্টিভঙ্গীতে ছবিটির নাম দেওয়া যেতে পারে 'নববৃন্দাবন মেলা'। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে চিরঞ্জীব শর্মা-প্রণীত নববৃন্দাবন নাটকের শেষ দৃশ্যে দেখা যায় যাবতীয় ধর্মশাস্ত্র ও ধর্মসম্প্রদায়ের মধুর মিলন। সেখানে নববিধানের বিজয় নিশান উড়িয়ে সব ধর্মের মানুষ একত্রে গাইছে :

জয় দয়াময় দয়াময় দয়াময়
জয় প্রভু পরব্রহ্ম হরি লীলারসময়।
জয় মা আনন্দময়ী জগতজননীর জয়।
আজ নববৃন্দাবনে, লয়ে যত ভক্তগণে
করিলেন প্রেমময় সর্বধর্মসমন্বয়।
জনক নারদ ঈশা যোগী যাজ্ঞবল্ক্য মুশা;
শিব শাক্য মহম্মদ ধ্রুব শ্রীগৌরাঙ্গের জয়।
যত শাস্ত্র যত ধর্ম, যোগ ভক্তি জ্ঞান কর্ম,
সকলেরই এক মর্ম, একেতে হইল লয়॥

---

৭ রামচন্দ্র দত্ত : শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত, পৃঃ ১৪০

৮ তত্ত্বমঞ্জরী, দ্বিতীয় ভাগ, প্রথম সংখ্যা, ১২৯৩ সাল, শ্রাবণ

৯ জন্মভূমি, ১৮ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা

১০ জীবনবৃত্তান্ত, পৃঃ ১৪০; তত্ত্বমঞ্জরী দাবী করেন ঐ চিঠিখানি সুরেশবাবুর কাছে সংরক্ষিত ছিল।

১১ জন্মভূমি, ১৮ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, পৃঃ ৯৯

মূল তৈলচিত্রখানি ৪২"× ৩০" ক্যানভাসের উপর আঁকা। বর্তমানে চিত্রপটের সম্মুখভাগ কাঁচে ঢাকা এবং প্রায় ৩" কাঠের ফ্রেমে বাঁধান।[১২] এই তৈলচিত্রের প্রতিচ্ছবি প্রকাশিত হয় বিভিন্ন পত্র পত্রিকাতে। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে 'Unity and the Minister', Supplementary copy, 'প্রতিবাসী' (দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ১৩১৯, বৈশাখ), 'জন্মভূমি' (২১ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ১৩২০, বৈশাখ) ইত্যাদি। আর জনপ্রিয়তার জন্য তৈলচিত্রের অনুলিপি বিভিন্ন বাড়ীতে ঠাঁই পায় যেমন কেশব-অনুরাগী নন্দ বসু ও শ্রীরামকৃষ্ণ-অনুরাগী মনোমোহন মিত্রের বাড়ীতে।

তৈলচিত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের ছবি, তাঁর ১৮৮১ খৃঃ ১০ই ডিসেম্বর তারিখে বেঙ্গল ফটোগ্রাফার স্টুডিওতে তোলা আলোকচিত্রের প্রায় অনুকৃতি। আরও লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, চিত্রে কেশবচন্দ্র যে প্রতীকচিহ্নটি ধরে আছেন সেটি কেশবচন্দ্র ১৮৮১ খৃঃ জানুআরিতে ব্রাহ্ম উৎসবের দিনে সর্বপ্রথম জনসমক্ষে তুলে ধরেছিলেন[১৩] এবং পরবৎসর জানুআরিতে সেটি নিয়ে নগরকীর্তন করেছিলেন। অনুমান হয়, তৈলচিত্রের রচনাকাল ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুআরি হ'তে সেপ্টেম্বর-অক্টোবরের মধ্যে।

সুদক্ষ পেশাদার শিল্পীর মুন্সিয়ানা চিত্রপটে সুস্পষ্ট। খদ্দেরের অর্ডার মাফিক চিত্রপট আঁকা হলেও শিল্পীর স্বাতন্ত্র্য ও নৈপুণ্য ভাবসম্মেলন ও প্রকাশব্যঞ্জনায় প্রকট। কবি ভাবপ্রকাশের জন্য ব্যবহার করেন ভাষা, চিত্রশিল্পী অনুভূতি প্রকাশ করেন বর্ণিকার সাহায্যে। চিত্র, চিত্রোপকরণ ও চিত্রকরের ভাবের সাম্যে চিত্রপট সার্থক হয়, আবার চিত্রকর ও চিত্রদ্রষ্টার সহমর্মিতায় চিত্রপটের ভাববস্তু হয় প্রাণবন্ত। আলোচ্য চিত্রপট এই বিচারের মাপকাঠিতে সুপ্রশংসিত।

পটভূমিকায় নীলাকাশে চন্দ্রাতপ সবুজ বনানীর শীর্ষরেখা স্পর্শ করেছে। সম্মুখে বামদিকে একটি গীর্জা, মধ্যে একটি মসজিদ, ডাইনে একটি শৈব মন্দির।[১৪] মসজিদ ও মন্দিরের মধ্যে নীলাকাশে ভাসছে একটি শঙ্খচিল, নীচে তাকিয়ে দেখছে বিচিত্র একদল মানুষের জমায়েত। পটভূমিকা ইঙ্গিত করছে মন্দির-মসজিদ, শাস্ত্র-শরিয়ৎ, আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদি ধর্মজীবনে প্রয়োজনীয় হলেও গৌণ। ধর্মজীবনের লক্ষ্য তত্ত্বের অপরোক্ষানুভূতি। উপর্যুক্ত আঙ্গিকের পটভূমিতে উপস্থিত হয়েছেন অপরোক্ষানুভূতিসম্পন্ন মহামানবগণ, যাঁরা ধর্মতত্ত্ব বোধে বোধ করেছেন।

ভাববস্তুর বিচারে দৃশ্যপট দুভাগে বিভক্ত—দৃক্ ও দৃশ্য। বাস্তবসত্তাক শ্রীরামকৃষ্ণ ও কেশবচন্দ্র এখানে দৃক্‌স্বরূপ এবং প্রাতিভাসিক ভাবরাজ্যের আনন্দঘন একটি প্রকাশ এখানে দৃশ্য। বাস্তব ও প্রাতিভাসিক সত্তার মধ্যে পার্থক্য দেখাবার জন্য শিল্পী শুধুমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণ ও কেশবচন্দ্রের গলায় মালা দেননি, ভাবরাজ্যের সকল মূর্তির গলায় দিয়েছেন ঘড়ির টাওয়ার শোভিত এ্যাংলিকান চার্চের সামনে দাঁড়িয়ে কেশবচন্দ্র ও শ্রীরামকৃষ্ণ।

---

১২ মূল তৈলচিত্রখানি সযত্নে রক্ষিত আছে সুরেন্দ্রনাথের মধ্যম ও বয়সে বড় ভাই মহেন্দ্রনাথের প্রপৌত্র উমাপতিনাথ মিত্রের নিকট। তিনি বর্তমানে ৩২, শ্যামপুকুর স্ট্রীট, কলিকাতা-৪ ঠিকানায় বাস করেন। প্রায় ৪০ বছর পূর্বে জনৈক চিত্রশিল্পীকে দিয়ে তৈলচিত্রখানি মেরামত করা হয়।

১৩ J. N. Farquhar: Modern Religious Movements in India, p. 56.

১৪ রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ হতে প্রকাশিত Memoirs of Ramakrishna গ্রন্থে সংযুক্ত এই ছবিতে একটি ব্যতিক্রম দেখা যায়। শৈব মন্দিরের স্থানে দেখা যায় দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দির।

'সুরেন্দ্রের পট'

[সুরেন্দ্রনাথ মিত্র সর্বধর্মসমন্বয়ের এই চিত্রটি অঙ্কিত করাইয়াছিলেন বলিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ এটিকে 'সুরেন্দ্রের পট' বলিতেন]

[ফটোগ্রাফারঃ শ্রীভানু চক্রবর্তী]

যীশুখৃষ্ট ও খৃষ্টধর্মের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত কেশবচন্দ্রের জীবনও সেইকারণে পশ্চাদ্‌ভূমি গীর্জার সম্মুখে কেশবচন্দ্রের প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ধুতি, পাঞ্জাবী ও চাদর পরে কেশবচন্দ্র সর্ববামে দাঁড়িয়ে. তাঁর ডানহাতে একটি পতাকাবাহী দণ্ড, সবুজরঙের পতাকা দণ্ডে জড়ানো, আর দণ্ডের উপর একটি প্রতীক। অর্ধচন্দ্রের উপর একটি ত্রিশূল, বামে একটি ক্রুশ ও ডাইনে একটি পাঞ্জা। অর্ধচন্দ্রের নীচে নক্সা করা পাদপীঠ, তাতে লেখা 'হরের্নামৈব কেবলম্'। নববিধান আন্দোলনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত ধর্মসমন্বয়ের এই প্রতীক।[১৫] ধীর স্থির কেশবচন্দ্র শ্রদ্ধামিশ্রিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন শ্রীরামকৃষ্ণের দিকে। শ্রীরামকৃষ্ণের পরনে সবুজ বনাতের কোট, লালপেড়ে ধুতি, ধুতির আঁচল বাম কাঁধে ঝুলছে। বেঙ্গল ফটোগ্রাফার স্টুডিওতে তোলা আলোকচিত্রের সঙ্গে এই ছবির গভীর সাদৃশ্য থাকলেও পার্থক্য যথেষ্ট। পার্থক্য হাত দুটির বিন্যাসে। আলোকচিত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের ডান হাত একটি স্তম্ভের উপর স্থাপিত, আর বাম হাত বুকের নীচে ভাঁজ করা। তৈলচিত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ বাম হাতে সম্মুখের একটি দৃশ্য নির্দেশ করেছেন, ডান হাত বুকের নীচে বিন্যস্ত কিন্তু তাঁর হাতের আঙ্গুল নির্দেশ করছে প্রাগুক্ত দৃশ্য। আলোকচিত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের পায়ে চটিজুতা. এখানে খালি পা। তা ছাড়াও এখানে শ্রীরামকৃষ্ণের মুখারবিন্দে যে দিব্যদ্যুতির আভাস, আলোকচিত্রে তার অভাব। শ্রীরামকৃষ্ণের চক্ষে ভাবের নেশা, তিনি যেন ভাবমুখে কেশবচন্দ্রকে উপদেশ করছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশ অনুসরণ করলে চোখে পড়ে ভাবরাজ্যের একটি মনোরম দৃশ্য। মন্দির ও মসজিদের মধ্যের ভূখণ্ডে প্রেমোন্মত্ত হয়ে নৃত্য করছেন যীশুখৃষ্ট ও শ্রীচৈতন্য। তাঁরা প্রেমভরে অচৈতন্য হয়ে নৃত্য করছেন, চারিদিকে ছিটিয়ে দিয়েছেন আনন্দের ফাগ। তাঁদের ঘিরে আছেন বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের সাধক ও সিদ্ধ ভক্তগণ। খৃষ্ট ও চৈতন্যের ডাইনে অর্থাৎ পশ্চাদ্‌ভূমি মসজিদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছেন রামানুজ সম্প্রদায়ের একজন বৈষ্ণবাচার্য, তাঁর হাতে শ্রীযন্ত্রসংবলিত দণ্ড. দণ্ডে লাল রঙের ত্রিকোণ পতাকা; তারপর দাঁড়িয়ে একজন তান্ত্রিকাচার্য, তাঁর রক্তাম্বর, মাথায় জটাজুট, হাতে ত্রিশূল। চোগাচাপকানধারী. পাগড়ী-দাড়ি-শোভিত তৃতীয় ব্যক্তি শিখ সম্প্রদায়ের নেতা। হাতে দণ্ডে-বাঁধা সবুজ ত্রিকোণ পতাকা, চূড়ায় প্রতীক পাঞ্জা। তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে একজন এ্যাংলিক্যান চার্চের পাদরী হাতে ক্রুশের প্রতীক; পিছনে দাঁড়িয়ে একজন কনফুশিয়স-ধর্মাবলম্বী চৈনিক, তাঁর মাথার চারদিক চাঁছা—মধ্যে ঝুলছে মোটা বেণী; তাঁর সম্মুখে দাড়ি ও পাগড়ী-শোভিত জনৈক মোল্লা—হাতে দণ্ড, দণ্ডের চূড়াতে অর্ধচন্দ্র। মোল্লাসাহেব ও যীশুখৃষ্টের মধ্যে জনৈক বৌদ্ধ। এই সাতজন দাঁড়িয়ে অবাক বিস্ময়ে যীশুখৃষ্ট ও শ্রীচৈতন্যের দ্বৈতনৃত্য উপভোগ

১৫ সুরেন্দ্রনাথ সর্বধর্মসমন্বয়ের ভাব নিয়ে এই প্রতীক-যন্ত্রটি তৈরী করেন। কেশবচন্দ্র ঐ যন্ত্রটি নিয়ে একবার নগরকীর্তনে বের হন। (পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত, পৃঃ ১৪০; জন্মভূমি ১৮ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা) সম্ভবতঃ সেই দিনটি ছিল সোমবার, ১৮৮২ খৃঃ ২৩শে জানুআরি। কেশবচন্দ্রের সমাধিস্থানের উপর স্থাপিত নববিধানের প্রতীকে দেখা যায় অর্ধচন্দ্র, ত্রিশূল, ক্রুশ ও বৈদিক ওঁকারের সমন্বয়। (**P. C. Mazoomdar : The Life and Teachings of Keshub Chunder Sen, p. 324**) আবার তৈলচিত্রের প্রায় অনুরূপ প্রতীক-যন্ত্র দেখতে পাওয়া যায় শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমাধির অন্যতম আলোকচিত্রে। সেখানে ভক্ত বলরাম বসু প্রতীক যন্ত্রটি ধরে আছেন।

করছেন। শ্রীচৈতন্যের বামে অর্থাৎ হিন্দু মন্দিরের সম্মুখে হিন্দুধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের দশজন ভগবদ্ভক্ত। চৈতন্যের বামে একজন গুজরাতী ও একজন মারোয়াড়ী ভক্ত। সম্মুখভাগে দুইজন খোল বাজাচ্ছে, একজন বাজাচ্ছে রামশিঙা অপর একজন একজোড়া বড় খঞ্জনী। নৃত্যের বিভিন্ন ভঙ্গিমায় এদের দেখা যাচ্ছে। তাঁদের পাশে একজন শৈব ও একজন তান্ত্রিক ও অপর দুজন রামাইৎ সম্প্রদায়ের ভক্ত তালে তালে নৃত্য করছেন। কল্পনা করা যেতে পারে তাঁদের সমবেত কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে বিশ্বধর্মসমন্বয়ের ঐক্যতান। ঐক্যতানে প্রত্যেক সুরের বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট অথচ সব কিছু মিলে সৃষ্টি করেছে সুরলোকের অতুলনীয় সুরব্যঞ্জনা। এটিও লক্ষ্য করার বিষয় যে, বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের প্রতীকচিহ্নগুলি মাল্যশোভিত, কারণ প্রতীকগুলি প্রবর্তকদের নিকট গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ শ্রদ্ধাস্পদ।

ভাবরাজ্যের দৃশ্যটি বিশ্লেষণ করলে পরিস্ফুট হবে একটি গভীর ভাব। মোটামুটিভাবে, নৃত্যরত খৃষ্ট-চৈতন্যের ডানদিকের ব্যক্তিদের সমাবেশ বিভিন্ন ধর্মের সমন্বয় এবং বামদিকের ব্যক্তিদের মিলন হিন্দুধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সমন্বয় সূচনা করছে।[১৬] একদিকে সাম্প্রদায়িক ধর্মে নিষ্ঠা, অন্যদিকে সর্বধর্মসমন্বয়ের উদারতা ও বিশ্ববাসীর সঙ্গে আত্মীয়তা এই দুই-ই শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ শিক্ষা। একদিকে স্বধর্মের মাধ্যমে কল্যাণবন্ধন, অন্যদিকে ধর্মসমন্বয়ের ভাবাদর্শে সঙ্কীর্ণতার বন্ধনমোচন—এই দুইটি ভাবের মিলন ঘটেছে চিত্রপটে। স্বধর্মে নিষ্ঠা ও ও পরধর্মের প্রতি প্রীতি ও আত্মীয়তা—এই আপাতবিরোধী ভাবদ্বন্দ্বের সুষ্ঠু সমাধান করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁর সাধনার ফলশ্রুতিস্বরূপ স্বধর্ম-নদী ও সর্বধর্মের মোহনায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নূতন ভারতবর্ষের তপোবন। সেই তপোবনের কুলপতি যুগাচার্য শ্রীরামকৃষ্ণ, শিক্ষার্থী তাপসগণের প্রতিনিধি কেশবচন্দ্র। এই তপোবনে শিক্ষাদীক্ষা নিয়ে গড়ে উঠবে নূতন ভারতের সমাজ, এখানকার ভাবাদর্শ প্রতিষ্ঠা করবে স্থায়ী বিশ্বশান্তি।

'সুরেন্দ্রের পট' সেই তপোবনের প্রতিচ্ছায়া। পটের অলোকসুন্দর লালিত্য সর্বপ্রকার সামঞ্জস্য ও সমন্বয়ের দ্যোতক, পটের বর্ণালির আভা উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আহ্বায়ক। ফারকুহার মনে করেন এই অলোকসামান্য চিত্রপটখানি 'সামগ্রিক পুনর্মিলনের' স্রষ্টা শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি যোগ্য উৎসর্গ।[১৭] আমাদেরও মনে হয়, যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধাঞ্জলি 'সুরেন্দ্রের পট'। সেই কারণেও 'সুরেন্দ্রের পট' শুধুমাত্র অসামান্য নয়, অদ্বিতীয়।

১৬ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত (১।২।১০): 'কেশবকে ঠাকুর দেখাইতেছেন হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান বৌদ্ধ সকল ধর্মের সমন্বয়। আর বৈষ্ণব শাক্ত শৈব ইত্যাদি সকল সম্প্রদায়ের সমন্বয়।' এই প্রসঙ্গে তত্ত্বমঞ্জরী, চতুর্থ খণ্ড, একাদশ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৭ J. N. Farquhar: Modern Religious Movements in India (1915) p. 199, "It seems to me that nothing could be more fitting than to dedicate this interesting piece of theological art to the versatile author of Re-union All Round."

আজ্ঞাবাহী

শ্রীদিলীপকুমার রায়

তোমার আশ্বাস রাজে, তাই মর্ত্যলোকে
মরিয়াও মরে না দুরাশা। চিরদিন
দুঃখবেদনায় প্রাণ পায় নিরাশার
গভীর অন্ধকারেও তোমার আলোর
নিগূঢ় ভরসা, তার মর্মকোষে বেজে
উঠেছে বলিয়া নিত্য : "আছি আমি আছি
যন্ত্রণারো অন্তরে আনন্দ দৈববাণী
ঝঙ্কারিতে, দেবতার বিদ্যুৎ-ভরসা
বহিয়া আনিতে দৈত্য দম্ভোলি গর্জনে।
অমানিশা আলোকের বাণী বহি' আনে
স্খলন যেমন আনে নব উত্থানের
সঙ্কল্প। যা কিছু নেত্র দেখে এ-ভুবনে
নহে তো সত্যের সত্য। শিবনেত্র শুধু
পায় সাধনায় ভাগবত সত্যদিশা।
যারে ম্লান শিলা বলি তারো প্রাণে রাজে
সুপ্ত চেতনার বিস্ফুলিঙ্গ ধীরে ধীরে
লভিতে সালোক্য সবিতার। মরণ তো
নয় লুপ্তি—নব জীবনের সে তোরণ
চিরন্তন। ভয় নিরাশ্বাস নয় তাই
অন্তিম জ্ঞানের বাণী। অসুরের ঘোর
সিংহনাদে জাগে দৈবী সৈনিকের বুকে
অমরাবতীর তূর্য। তাই সে নির্ভয়ে
বূ্যহ রচে দীপান্বিত আশার নিলয়
সুরক্ষিতে। ফুল ঝ'রে যায় প্রতিদিন
বীজ নির্ঝরণে রাখি' মৃত্তিকার বুকে
নিরন্ত নবফুলের অস্ফুট সন্ততি।
দিন ঢলে অমাগর্ভে—যেথায় রজনী
আসন্নপ্রসবা করে সস্নেহে লালন
স্নেহের সম্পুটে নবশিশু—উষাভ্রূণে।
জানি না সে কী অচিন্ত্য মহাপরিণতি
মুখে ল'য়ে চলো কোন্ নীল মোহানায়।
শুধু জানি এইটুকু—তোমার করুণা
অঘটন-ঘটনী আবহমানকাল,
আলোছায়া জন্মমৃত্যু বিরহমিলন
যুগলপাখায় করে সে নভোবিহারী
মানবের নিয়তিরে নিত্য—দিনে দিনে
ফুটায়ে অক্লান্ত ধৈর্যে অণোরণীয়ানে
মহীয়ানে লভিতে সমাপ্তি। তাই কেন
তোমার এ-পারহীন লীলার বিচার
করি মিথ্যা স্পর্ধাভরে সীমিত বুদ্ধির
বালভাষে? কতটুকু দেখে সে নয়নে
ক্ষীণদৃষ্টি বিচারক? পর্বত-আরোহী
শিখরের শঙ্খ শুনি' সোল্লাসে যখন
দেয় সাড়া—মধ্যপথে গহন কান্তারে
কী দেখে সে নেত্রে—যার আহ্বানে সে ছাড়ে
শৈলমূলে তার নিরাপদ দীপজ্বালা
স্নেহনীড়? পারে কি সে করিতে কল্পনা—
কী মহান্ দৃশ্য উদ্ভাসিবে নেত্রে তার
তুঙ্গ গিরিচূড়ে, হবে দিক্‌চক্রবাল
প্রসারিত, ঢেউ পরে ঢেউয়ের মতন
দেখিবে তুষারোজ্জ্বল আশ্চর্য কৈলাস,
উপরে জলদ, নিম্নে রঙিন কুহেলি
করে যার আবাহন অনন্ত বন্দনে?
বিন্দুচেতনার ম্লানপটে কতটুকু
ফোটে আদিগন্ত জ্যোতি সিন্ধুচেতনার?
এমনি কি নয় তব সুষমাবিধান?
ধীরে ধীরে দাও না কি দৃষ্টিদীক্ষা তুমি
চাহিয়া কেবল—যেন আমরা তোমার
দৈবী আজ্ঞা শুনি কান পাতি', নম্রশিরে
করিয়া পালন তুমি দাও যে-নির্দেশ
গহন অন্তরতলে হে অন্তরযামী?—
যে-নির্দেশ দাও তুমি নীতি প্রীতি স্নেহ
পূজার ভক্তির অঙ্গীকারে বুকে বুকে
অন্তিমে প্রেমের উদ্বোধনে যুগে যুগে?

সম্পাদক-সমীপেষু

স্বামী নিরাময়ানন্দ

২৬শে মে, ১৯২৭। স্কটিশচার্চ কলেজে ভরতি হয়ে ফিরছি একটি বন্ধুর সঙ্গে—স্কুলের সহপাঠী। তার মুখেই শুনলাম স্বামী বিবেকানন্দ অর্থাৎ 'নরেন্দ্রনাথ দত্ত' এই কলেজেই পড়েছিলেন, এবং জানলাম 'জেনারেল এসেম্বলি' মানেই 'স্কটিশচার্চ'। বেশ একটু গর্বভরেই ফিরছি ; কিন্তু প্রচণ্ড রোদে বলবতী পিপাসা মাং পরবশমকরোৎ' অর্থাৎ দারুণ তেষ্টা পেয়ে গেছে। বন্ধুটি বললে, "চলো তোমাকে এমন এক জায়গায় নিয়ে যাব, যেখানে তোমার পিপাসা মিটে যাবে ; সেখানে আছে 'water from the living well।' তখনও বাইবেল পড়িনি, তাই এ-কথার তাৎপর্য ধরতে না পারায় বন্ধুটি বুঝিয়ে দিল।

কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটের ওপর 'বিবেকানন্দ সোসাইটি'তে ঢুকে পড়লাম দুজনে। কুঁজোর জল খেয়ে তৃপ্ত হয়ে হল-ঘরে বিশ্রাম ক'রে উঠি উঠি করছি, এই সময় বন্ধুটি ঠাকুরঘরের দরজা খুলে আমাকে যা দেখালো তাতে আমি একটু অবাক্ ! এর আগে কোন ঠাকুরঘরের মধ্যিখানে শ্রীরামকৃষ্ণের পূজা-করা ছবি দেখিনি। দুপাশে স্বামীজীর দুখানি সুন্দর অয়েল-পেন্টিং—একটি ধ্যানমূর্তি, অন্যটি চিকাগোভঙ্গি। শ্রীরামকৃষ্ণের ছবিটি সাদা-কালোয় ছাপা ; আর সামনে বুদ্ধের একটি ছোট শ্বেতপ্রস্তরের মূর্তি। দেওয়ালে আরও কয়েকখানি ছবি আছে : শ্রীচৈতন্যদেব কৃষ্ণের ছবি কোলে কাঁদছেন, ক্রুশবিদ্ধ যীশু, বুদ্ধের কপিলাবস্তু প্রত্যাগমন—ছবিগুলি দেখে বন্ধুকে জিগ্যেস করলাম, "এই বুঝি তোমার 'Living well' (প্রাণবন্ত জলের কুয়ো) ?" সে হাসলো—একটু ঘাড় নাড়লো, ব'লল, "আমি রোজ এখানে আসি, অনেকক্ষণ একলা থাকি। আরতির প্রদীপ সাজিয়ে চলে যাই।"

আমিও মাঝে মাঝে আসতে লাগলাম। সোসাইটির সহকারী সম্পাদক তারক-দার সঙ্গে আলাপ হ'ল। লাইব্রেরি থেকে বই নিয়ে পড়তে আরম্ভ করলাম, রিডিংরুমের টেবিলে পত্র-পত্রিকা পড়তাম। বছর ঘুরতে লাগলো, ক্রমে টেবিল চাপড়ে আলাপ-আলোচনায় যোগ দিতে শিখলাম।

এদিকে বিজ্ঞান পড়তাম আর ওদিকে কবিতাও লিখতাম। সেবার স্বামীজীর জন্মোৎসব উপলক্ষে সভায় পড়বার জন্য রবীন্দ্রনাথের 'শিবাজী'র ছন্দে 'স্বামীজী' সম্বন্ধে এক বড় কবিতা লিখে তারকদার টেবিলে রেখে দিয়ে চলে গেছি। কয়েকদিন পরে এসে কবিতাটির সম্বন্ধে জানতে চেয়েছি। তিনি বললেন, "তোমার কবিতা ? যিনি বোঝবার তিনি বুঝেছেন ও নিয়ে গেছেন।" "কে তিনি" ? "উদ্বোধনের সম্পাদক স্বামী বাসুদেবানন্দ" ; তাঁকে দেখেছি এখানে বেদান্তের ক্লাস করতে। তবে খুব ঘনিষ্ঠ আলাপ তখনও হয়নি, শুধু মুখ-চেনা।

একদিন বিকেলে শ্যামবাজারের মোড়ে দেখা হতেই "এই যে, আমিই কবির উদ্বোধন করেছি" ব'লে বাসুদেবানন্দজী উদ্বোধনের পাতায় পাইকায় ছাপা প্রায় তিন-চার পৃষ্ঠাব্যাপী কবিতাটি দেখালেন, বইটি চাইতে বললেন – "কাল সকালে 'উদ্বোধনে' গিয়ে নিয়ে আসবে। এটা সোসাইটিতে নিয়ে যাচ্ছি—সেখানে আজ ক্লাস আছে।"

পরদিনই সকালে উদ্বোধনে' গিয়ে হাজির – বোধ হয় এই প্রথম। দোতলায় সরু বারান্দা দিয়ে মন্দিরে প্রণাম ক'রে তেতলায় যেতেই

মহারাজ সাদরে ফাল্গুন সংখ্যার 'উদ্বোধন'টি দিলেন —গর্বে আনন্দে মনটা ভরে উঠল। আমার লেখাও তা হ'লে ছাপা হ'তে পারে। মহারাজ গম্ভীরভাবে বললেন—"চৈত্রমাসের জন্যে একটা কবিতা দে, ঠাকুরের সম্বন্ধে।" "ঠাকুরের সম্বন্ধে আমি কি জানি ?" "স্বামীজীর জীবনীতে কিছুটা পড়েছিস তো ? তাঁর কামকাঞ্চনত্যাগ আর সর্বধর্মসমন্বয়—এই কটা কথা আর লিখতে পারবি না ? খুব পারবি। এক সপ্তাহের মধ্যে চাই।" দিন তিনচার পরেই সকালে গিয়েছি তিনচার পৃষ্ঠার একটি কবিতা নিয়ে। একটু দেখেই খুশী। প্রেসের লোক দাঁড়িয়ে ছিল, সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দিলেন। বললাম, "ছন্দ, idea—কিছু দেখে দিলেন না ?" "দেখেছি তোর প্রথম কবিতায়, আর দেখতে হবে না।"···

এইভাবেই শুরু হ'ল—একের পর অনেক। শ্রীশ্রীমা সম্বন্ধে 'সংঘমাতা' কবিতাটি পড়ে আমার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন ; কিছু পরে বললেন—"দেখি তোর হাতটা।" বেশ কিছুক্ষণ দেখে বললেন—"এইটা এডিটর হবার লাইন।" ভাবলাম—কি জানি, হয়তো 'আনন্দবাজার,' কি 'দেশ' পত্রিকার সম্পাদক হ'তে হবে। সেদিনই মহারাজ বলেছিলেন, "এবার প্রবন্ধ লিখতে আরম্ভ কর্।" একবার পূজাসংখ্যা 'উদ্বোধন' উপহার দিয়ে তাতে লিখে দিলেন : **"Presented to our most beloved poet."** এইভাবে উদ্বোধনে যাতায়াত বাড়তে লাগলো। নীচে অনেকেই ধরবার চেষ্টা করতেন, ওঠার মুখে পারতেন না। নামার মুখে পূর্ণ মহারাজ প্রসাদ দিতেন, আর বলরাম মহারাজ কখনও 'কবি', কখনও 'জিয়লমাছ' বলতেন ; আমি তাঁকে বলতাম, **'Holy Mother's jolly child.'**

নিয়মিতভাবে উদ্বোধনে লেখা বেরুচ্ছে। কখন কখন পত্রিকার প্রথম পাতাতেই, কখন বড় বড় লেখকদের আগে পাচ্ছে। বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, বিমল ঘোষ, সাবিত্রী-প্রসন্ন, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়—এইসব কবিদের সঙ্গে আলাপ করার ইচ্ছা হ'ত ; মনে হ'ত ওঁরা কত বড়। সম্পাদকের ঘরেই আলাপ তাঁর সহকারী ব্রহ্মচারী নগেন মহারাজের সঙ্গে—সে একদিন ফিসফিস ক'রে বললে, "কবির থেকে বড় সাধু বা **Saint**।"

শ্রীরামকৃষ্ণ-শতবার্ষিকী সমাগত। তদুপলক্ষে বাসুদেবানন্দ মহারাজ বললেন, "এবার একটা বড় কবিতা লেখ্—ঠাকুরের জীবনে সর্ব অবতারের সর্বভাবের মেলা।" ততদিনে 'লীলাপ্রসঙ্গ', 'কথামৃত'—পড়া হয়ে গেছে,—অতএব ভাবের আর অভাব নেই। লেখাটি মাঘ সংখ্যা অর্থাৎ প্রথম সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপা হয়েছিল। শতবার্ষিকী সংখ্যার জন্যে লেখা দিতে বললেন স্বয়ং সত্যেন মহারাজ—স্বামী আত্মবোধানন্দজী। দুটি লেখা নিয়ে গেলাম—একটি পছন্দ ক'রে সম্পাদকের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। এর পরই শুনলাম বাসুদেবানন্দজী উদ্বোধন ছেড়ে অন্য কেন্দ্রের কার্যভার নিয়ে চলে যাবেন। একদিন বললেন—"তুই উদ্বোধনের জন্য ছাড়া আর অন্য কবিতা লিখিস না ?" একদিন বিকালে নিয়ে গেলাম—একটি খাতা। মহারাজ সেতার বাজা-বার উপক্রম করছিলেন। আমাকে দেখে বললেন—"চল্ ওই বারান্দায়—তুই কবিতা শোনাবি, আমি সেতার শোনাব।" সেদিন 'সন্ধ্যা-স্বপন' কবিতাটি শোনাই, অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললেন—"মনের সব ক্লান্তি দূর হয়ে গেল, মনটা **refreshed**।" বললাম, "সেতার বাজাবেন না ?" "তুই তো এতক্ষণ সেতার বাজালি।" যাই হোক সেদিন আধ ঘণ্টা সেতার শুনে ফিরে-ছিলাম।

স্বামী বাসুদেবানন্দ চলে গেলেন, এলেন

স্বামী সুন্দরানন্দ নূতন 'ভাবধারা' নিয়ে। আমার আসা-যাওয়া একটু কমে গেল—তাছাড়া কিছুদিন পরেই কলকাতার বাইরে চলে যেতে হ'ল। দেখা হ'লে মহারাজ বলতেন, "কবিতা দাও না আর?" দিয়েছিলাম দু-একটা, অনেকদিন বেরয়নি; আবার দেখা হ'তে জিজ্ঞেস করলেন - বললাম, "দিয়েছি তো।" উনি বললেন, "অত বড় নয় ছোট ছোট। প্রবন্ধের নীচে ফাঁকা জায়গায় পাদপূরণের জন্য।" বললাম—"মহারাজ, কবিতাকে আপনি প্রবন্ধের মর্যাদা দেবেন না?" যাই হোক কিছুদিন পরে 'নিবেদিতা' কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছিল পুরো এক পৃষ্ঠায়। তারপর স্বামীজীর কয়েকটি ইংরেজী কবিতার অনুবাদও বেরিয়েছিল।

ইতিমধ্যে দেওঘর বিদ্যাপীঠ থেকে বেলুড় বিদ্যামন্দিরে এসে গেছি। উদ্বোধনে এলেই সম্পাদক মহারাজের সঙ্গে দেখা করতাম। এক-দিন তিনি খান-কতক বই দিয়ে বললেন - "এগুলি সমালোচনা ক'রে দেবে।" এখন বই-সমালোচনার নাম শুনলে গায়ে জ্বর আসে। তখন খুব উৎসাহে লেগে গেলাম; মাসখানেক পরে 'সমালোচনা' নিয়ে এলাম, পরের মাসে প্রকাশিত হ'ল। এই বোধ হয় আমার 'উদ্বোধনে' প্রকাশিত প্রথম গদ্যরচনা। সুন্দরানন্দ মহারাজও প্রবন্ধ লিখতে বলতেন, আমার কিন্তু ঐ রকম লেখা আসত না। মনে হ'ত প্রবন্ধ লেখা একটা অহমিকার ব্যাপার, কবিতায় নিজেকে লুকিয়ে রাখা যায় প্রবন্ধে তা সম্ভব নয়। এইসব লক্ষ্য ক'রে মহারাজ একদিন বললেন "তুমি তো সারগাছিতে ছিলে, অখণ্ডানন্দ মহারাজের সম্বন্ধে কথা কিছু লিখে বা সংগ্রহ ক'রে দাও।" উৎসাহিত হয়ে পাঁচ-ছটি লেখা সংগ্রহ ক'রে দিয়েছিলাম; আর দুটি দিয়েছিলাম আমার ডায়েরি থেকে। কবিতা আমি আর দিইনি। কিন্তু শ্রীমান্ প্রণবরঞ্জন ঘোষ—আমার খাতা থেকে মাঝে মাঝে কবিতা লিখে নিয়ে আসত এবং 'বৈভব' নাম দিয়ে উদ্বোধনে প্রকাশ ক'রে দিত। সুন্দরানন্দজী তাকে খুবই স্নেহ করতেন, তার নিজের লেখাও এই সময় থেকে উদ্বোধনে বেরুতে থাকে।

এরপর যে সম্পাদক-সমীপে উপস্থিত হলাম, তিনি আমাদের 'বিমলদা' বা সর্বজনপরিচিত শ্রদ্ধেয় স্বামী শ্রদ্ধানন্দ। আমি তখন সাগরদ্বীপে —আমাকে পরমস্নেহে 'বাউল' ব'লে ডাকতেন এবং লেখা দিতে বলতেন—"কবিতা নয়, প্রবন্ধ।" আর বলতেন, "কবিতা আমিও পাদপূরণে দেবো।" শিক্ষা সম্বন্ধে দু-তিনটি প্রবন্ধ লিখি, অভিজ্ঞতা-প্রসূত লেখা পেয়ে বিমলদা খুব খুশী। সেগুলি প্রকাশিত হয়ে সমাদৃত হয়। তারপর বিমলদার কাছ থেকেই সাহস পেয়ে পূজাসংখ্যার জন্য একটি লেখা দিই 'ঈশ্বরের মাতৃভাব'। আমার সামনেই বিমলদা প্রথম পৃষ্ঠার প্রথমাংশ ঘ্যাঁচ ক'রে কেটে দিলেন, মনটায় লাগলো, সহানুভূতির সুরে বললেন—"বেশী ভাবোচ্ছ্বাস ভাল না, ওতে প্রবন্ধ দুর্বল হয়ে যায়।" বিমলদা থাকতে থাকতে পরবর্তী পূজাসংখ্যায় 'হিমালয়ে স্বামী অখণ্ডানন্দ' লিখেছিলাম। প্রবন্ধটি বহু চিঠিপত্র থেকে সং-গৃহীত তথ্য দ্বারা সমৃদ্ধ, ভাষাও ভাবানুযায়ী। খুশী হয়ে বিমলদা বলেছিলেন, "এই প্রবন্ধের মধ্য দিয়েই উদ্বোধনের পাঠক-পাঠিকা পরবর্তী সম্পাদকের লেখার পরিচয় পাবে।" এইখানে একটু মজার কথা আছে। প্রবন্ধে দু-এক জায়গায় ছাপা হয়েছিল 'হিলালয়'। বললাম, "বিমলদা, এটা কি?" "ওটা আর বুঝতে পারছ না? আমাদের এখানকার প্রুফরীডারদের ধাক্কায় হিমালয় 'হিলিয়ে' গেছে!" আমরা খুব একচোট হাসলাম।

এইখানে দুজনের কথা ব'লব - যারা উদ্বোধনের সম্পাদনা-কার্যে ছিলেন তবে অনেকদিন আগে। তাঁদের সমীপে আমি কিভাবে গিয়েছি এবং কত-

টুকু শিখেছি, তা এই সুযোগে লিপিবদ্ধ করি।

শ্রীশ্রীমায়ের শতবার্ষিকীর সময় মায়ের একখানি ছোট জীবনী লেখার প্রস্তাব সাতুদা-ই (স্বামী বীতশোকানন্দ. সহকারী সম্পাদক, শতবার্ষিকী কমিটি) আমার কাছে করেন। পূজনীয় মাধবানন্দজী তা সমর্থন করেন, এবং নির্দেশ দেন একমাস দেড়মাসের মধ্যে অর্থাৎ - পূজার পূর্বেই পাণ্ডুলিপি দিতে হবে। পাণ্ডুলিপি তিনি নিজে সম্পাদনা করেন, এবং বইখানি শতবার্ষিকীর মুখেই প্রকাশিত হয়।

এই আমি প্রথম দেখলাম সম্পাদনা কাকে বলে। লেখকের লেখা যতদূর সম্ভব রেখে, ভাষা একটু অদল বদল ক'রে ভাবটি ঠিক ঠিক ফুটিয়ে তোলার কায়দা দেখলাম। কালিতে নয়—পেনসিলেই মহারাজ সংশোধন করেছেন এবং বললেন. "তুমি যে-সব সংশোধন মনে-প্রাণে মেনে নেবে, সেগুলিই কালি দিয়ে লিখে নেবে, বাকী সব রবার দিয়ে মুছে দেবে।" তাঁর সেই সম্পাদনার গুণেই 'শ্রীশ্রীমা সারদা' ছোট বড় সকলের কাছে আজও প্রিয়।

চার বছর পরে উদ্বোধন পত্রিকার কার্যভার দেবার সময় পূজনীয় মহারাজ বলেছিলেন, "কি, হাতে কলম পেলেই সকলের লেখা কাটতে হবে নাকি? **Keep if you can cut where you must.** (যতদূর পারবে লেখকের লেখা রাখবে, যখন একান্ত প্রয়োজন তখনই কাটবে)।" মনে হয়, কথাগুলি সম্পাদকীয় রীতিনীতির মূল সূত্র।

বিবেকানন্দ শতবার্ষিকীর সময় 'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা'র সম্পাদনার ভার দিয়ে মহারাজ ডেকে পাঠিয়েছেন; যেতেই বললেন, "কি, কি-রকম সব করবে কিছু ভেবে এসেছ তো?" 'ভারতে বিবেকানন্দ' নিয়ে গেছলাম, বললাম, "অনুবাদের ভাষা ও বানান সব আধুনিক করতে হবে।"

মহারাজ বললেন, "হ্যাঁ, বানান 'চলন্তিকা' অনুসরণ করবে। আর ভাষা, কি রকম কি পরিবর্তন করবে?" বললাম, "'সমভিব্যাহারে', 'ভগবল্লাভাকাঙ্ক্ষী'—এসব চলবে না।" "কি করতে চাও?" "সহজ কথা দিতে হবে, 'সমভিব্যাহারে' একেবারে অচল—'সঙ্গে' বা সহিত' করতে হবে। আর 'ভগবল্লাভাকাঙ্ক্ষী'কে করতে হবে—'ভগবান লাভ করতে ইচ্ছুক বা ঈশ্বরলাভেচ্ছু'।" প্রথম পৃষ্ঠা পড়তে পড়তে মহারাজ বললেন, "আচ্ছা, 'কিংকর্তব্যবিমূঢ়' কি করবে?" দুজনে হেসে উঠলাম, বললাম, "কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যাবো।" এই রকম হাসিখুশির ভেতর দিয়েই এই গুরুগম্ভীর কাজের সূত্রপাত হ'ল।

আর একজনের কথা না ব'লে এ প্রসঙ্গ শেষ করতে পারছি না। তিনিও উদ্বোধনের একদা-সম্পাদক - স্বামী বিবেকানন্দের প্রধান প্রধান ইংরেজী গ্রন্থের বাংলা-অনুবাদক -- পূজনীয় স্বামী শুদ্ধানন্দজীর কথা বলছি। ছাত্রাবস্থার পরই তাঁর কাছে যেতাম, কলকাতা অদ্বৈত আশ্রমে - ওয়েলিংটন লেনে। গিয়ে প্রণাম ক'রে বসার পর পাঁচমিনিটের মধ্যেই কোন একটা বই নিয়ে প'ড়ে তাঁকে শোনাতে হ'ত, কখনও Complete Works, কখনও 'জ্ঞানযোগ', কখনও 'ভারতে বিবেকানন্দ'। যখন জানলাম শেষের বইগুলির অনুবাদক মহারাজ স্বয়ং; তখন একদিন সাহস পেয়ে বলেই ফেললাম—"মহারাজ, এগুলির ভাষা পুরানো হয়ে গেছে। এখন পরিবর্তন করা দরকার।" মহারাজ মোটেই রাগ করলেন না, পরন্তু গল্প ফাঁদলেন, বললেন, "জানিস, আমি একদিন স্বামীজীকে বলি, 'স্বামীজী, আপনার এইসব লেকচার ইংরেজীতে,—বাংলাদেশে যারা ইংরেজী জানে না, বিশেষতঃ মেয়েরা কি ক'রে এ সব জানবে? এগুলি বাংলায় অনুবাদ করা

দরকার।' স্বামীজী আমার বুকে এই রকম ছোট্ট একটা ঘুসির মতো মেরে বললেন, 'You are born for that!' তা ছাড়াও দেখেছি—স্বামীজীর কাছে কেউ কোন প্রস্তাব নিয়ে এলে স্বামীজী তাকেই সে কাজ করবার জন্য উৎসাহিত করতেন। ভাবটা এই—তোমার মনে যখন এটা করবার চিন্তা উঠেছে, তখন তোমার ভেতরেই এটা করার শক্তিও আছে।"

গুরুজনদের প্রতি এই স্মৃতির অর্ঘ্য নিবেদন ক'রেই আজ এ প্রবন্ধ শেষ করি। এর পর 'সম্পাদক-সমীপেষু'র জের টানতে গেলে যাদের নাম এসে পড়বে তারা আমার অনুজোপম। তারা নিশ্চয়ই লজ্জা অনুভব করবে, যদি তাদের সম্বন্ধে কিছু লিখে বসি। তবে এইটুকু না লিখলেই নয় "রুদ্র, যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্।" সম্পাদকের দুই মূর্তি—রুদ্র ও দক্ষিণ! হে রুদ্র, তোমার রুদ্র মূর্তি সংবরণ ক'রে দক্ষিণামূর্তিতেই আমার প্রতি দাক্ষিণ্য বর্ষণ কর, অর্থাৎ এতদিন যেমন সাগ্রহে আমার কবিতা-প্রবন্ধাদি প্রকাশ ক'রে এসেছ, চিরদিনই যেন সেইরূপ ক'রো।"

সন্ধ্যাবন্দনা

[মলয়ালম কবিতা]

শ্রীমতী বালামণি আম্মা

[অনুবাদ শ্রীমতী সুজাতা প্রিয়ংবদা]

দিবার অবসানে
আলোক অপস্রিয়মাণ,
পাতালের গর্ভ ফুঁড়ে
উদ্বেল তরঙ্গের মত
ছায়ার প্রবাহ,
শিখায়িত সন্ধ্যাদীপের
সফেন বুদ্বুদ
হবে অবলুপ্ত,
আর আমার বিশ্ব পরিণত হবে
অন্ধকারের সাগরে,

নবোদয়ের হে আকাঙ্ক্ষী মন!
দেবতার কাছেও বরেণ্য
তোমার ব্যথার এই ধন,
এগুলি সমর্পণ ক'রে প্রণাম কর
যজ্ঞের সেই অগ্নিকে
অবিস্মরণীয় মুহূর্তগুলি যেখানে
আপনার সকল সত্ত্বের
আহুতি ঢেলেছে।

মৌমাছি

শ্রীঅমিত বসু

ইচ্ছে সব মাছি হয় মনে
অথচ আমি যে বনে বনে
গন্ধ নয় রঙ নয় শুধু
চৈতন্য ফুলের মধু
খুঁজে ফিরি একা মৌমাছি

প্রিয়তম তুমি এসে
কখন বলবে হেসে
সখা তুমি একা নও
আমিও তোমার কাছে আছি

রামকৃষ্ণ মিশনের সেবা-আন্দোলনের সূচনা ও সর্বভারতীয় প্রতিক্রিয়া*

অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু

স্বামীজীর কর্মধারার দু'মুখী গতি এই কালে (১৮৯৭-৯৯) ভারতবর্ষ লক্ষ্য ক'রল। প্রথম বিদেশে বেদান্তপ্রচার, দ্বিতীয় স্বদেশে লোক-সেবার প্রয়াস। ভারতবাসী দেখল, পরাধীন ও অসম্মানিত দেশের মানুষ হয়েও স্বামীজী ও তাঁর গুরুভাইরা পাশ্চাত্যে বেদান্তসত্য প্রচার ক'রে সেখানকার মানুষদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছেন, যার ফলে ভারতবর্ষে আত্মমর্যাদার জাগরণ ঘটছে। আত্মগরিমাবোধ আরও বৃদ্ধি পেল যখন মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল ভগিনী নিবেদিতা হয়ে ভারত-বর্ষকে তাঁর কর্মক্ষেত্ররূপে বরণ করলেন কিংবা মারী লুই বিবেকানন্দ-প্রদত্ত সন্ন্যাস নিয়ে অভয়ানন্দরূপে ভারতে এলেন বক্তৃতা করতে। স্বামীজীর বেদান্তকে বরণ ক'রে কিছু সময়ের জন্য যখন ভারতবাস করলেন মিস হেনরিয়েটা মূলার, কিংবা ভারতীয় মাটিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন ক্যাপ্টেন সেভিয়ার (মিসেস সেভিয়ার নিজ স্বামীর দেহত্যাগের পরেও দীর্ঘ দিন ভারত-বাস করেছেন) ও মিঃ গুডউইন—তখনো একই ফল হল। এই সমস্ত কিছুই সাধারণ উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিল সত্য, কিন্তু তা কালক্রমে বিলুপ্ত হতে পারত, বিশেষতঃ যখন সমালোচকের বা শত্রুর অভাব ছিল না। স্বামীজীর শত্রুতা করা যাঁরা কর্তব্যকর্ম বলে ধরেছিলেন তাঁদের কথা যদি বাদও দিই, এমন কিছু সদুদ্দেশ্যযুক্ত সমালোচক ছিলেন, যাঁরা এই আন্দোলনের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিশেষ আশাবোধ করেননি। তাঁরা স্থির নির্দিষ্ট কিছু কাজ চাইছিলেন—মানে, তাঁদের বিচার-বুদ্ধিমত 'স্থির নির্দিষ্ট কাজ'। সাধারণভাবে এঁরা ছিলেন মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের সমাজসংস্কারক দল। রামকৃষ্ণ মিশন যখন সেবাকাজ শুরু করল, তখন এঁরা চমৎকৃত হয়ে গেলেন। স্বামীজীর পূর্বাপর অনুরাগীরা পুলকিত হলেন, বলাই বাহুল্য।

বিবেকানন্দ-প্রবর্তিত এই সেবাকাজ ভারত-বর্ষের সমকালীন ইতিহাসে এক অপূর্ব ঘটনা। সেবাকাজ আর্যসমাজ আরও পূর্বে আরম্ভ করে-ছিল। উত্তর-পশ্চিম ভারতে দুর্ভিক্ষের সময়ে ত্রাণকার্যে তাঁরা তৎপর ছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ থেকেও বিক্ষিপ্তভাবে লোককল্যাণমূলক কোনো কোনো কাজ করা হয়। কিন্তু রামকৃষ্ণ মিশনের সেবার মধ্যে একটা নতুন তাৎপর্য দেখল ভারতবর্ষ। সেবার জন্যই সেবা—সর্বমানবের মধ্যে একই আত্মার বাস্তব স্বীকৃতি-রূপ এই সেবা—মানবতার নূতন গভীরতা উন্মোচন ক'রে দিল পরাভূত ভারতের কাছে। মানবপ্রেম মুখের কথা নয়, রক্তের সঙ্গীত—বিবেকানন্দের কর্মিদল প্রমাণ করেছিল সকলের কাছে। সকলে বুঝল, বিবেকানন্দ কেবল বাগ্মিতায় 'ঐশ্বরিক অধিকার' লাভ করেননি, ভালবাসার ঐশ্বরিক অধিকারও তাঁরই, যার স্পর্শে মানুষ পরিবর্তিত হয়ে যায়।

সে কী সব অসাধারণ প্রেমিক মানুষদের আবির্ভাব ঘটেছিল স্বামীজীর প্রাণাগ্নির ভিতর

* প্রবন্ধটি লেখকের প্রকাশিতব্য গ্রন্থ 'স্বামী বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ'-এর অন্যতম অধ্যায় 'রামকৃষ্ণ মিশন'-এর শেষাংশ—তৃতীয় বিভাগ। এ তরকার সংবাদগুলি স্বামীজীর সমকালীন সর্বভারতীয় পত্র-পত্রিকা থেকে সংগৃহীত।

থেকে—যজ্ঞসম্ভব সেই চরিত্রগুলি আমাদের কাছে মানবতার পৌরাণিক বিগ্রহের মত দীপ্যমান হয়ে আছে। এঁদের কিছু নাম আমরা জানি, বহু নাম হারিয়ে গেছে মানবপ্রেমের মহাগঙ্গার কলস্রোতে। কয়েকটি নাম আমরা তারই মধ্য থেকে নির্বাচন ক'রে আনব—অখণ্ডানন্দ, সদানন্দ, নিবেদিতা, কল্যাণানন্দ, নিশ্চয়ানন্দ, শুভানন্দ—একটু বিশেষ বর্ণনার জন্য – কিন্তু পরের পরিচ্ছেদে। বর্তমান পরিচ্ছেদে এই সেবা-আন্দোলনের সর্বভারতীয় প্রতিক্রিয়াই বিশেষভাবে আলোচ্য।

অখণ্ডানন্দ, সদানন্দ, কল্যাণানন্দ, নিশ্চয়ানন্দেরা যখন ভারতের উপরে ছড়িয়ে পড়লেন উত্তপ্ত হৃদয় নিয়ে, তখন সমস্ত ভারতবর্ষ নমস্কার করল এঁদের প্রেরণাপুরুষ বিবেকানন্দকে। সংবাদপত্রে এই সেবাকাজের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা বেরুল। মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের সংস্কারসভার মুখপত্র 'ইণ্ডিয়ান সোস্যাল রিফর্মার' ও 'ইণ্ডিয়ান স্পেকটেটর', মহারাষ্ট্রের চরমপন্থী রাজনৈতিক পত্র তিলকের 'মারহাট্টা', এবং মধ্যপন্থী 'নেটিভ ওপিনিয়ন', লখনৌয়ের বুদ্ধিজীবীদের মুখপত্র 'অ্যাডভোকেট'—সকলেই প্রশস্তি করল। কলকাতার 'ইণ্ডিয়ান মিরার' বা মাদ্রাজের 'হিন্দু' ঐ প্রশংসায় যোগ দেবে, সহজেই ধরে নেওয়া যায়। 'মাদ্রাজ মেল' প্রভৃতি অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সংবাদপত্রগুলিও এক্ষেত্রে উদাসীন রইল না।

ঐ সব প্রশংসার কিছু কিছু আমরা চয়ন করব, অন্য কারণে নয়, এইটুকু দেখিয়ে দেবার জন্য—সমকালীন ভারতীয় সমাজের কাছে এই সেবাকাজ কি ধরনের অভিনব ব্যাপার ছিল।

সংবাদপত্রের মন্তব্যগুলি থেকে বোঝা যায়, ভারতীয় সমাজের মধ্যে পূর্বে অল্পস্বল্প যেসব সেবা-প্রয়াস দেখা গিয়েছিল, তার প্রভাব জনজীবনে ব্যাপক হয়নি, এবং ঐ সকল 'সোস্যাল সার্ভিসের' সঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশনের এই 'মানবসেবার' পার্থক্য যথেষ্ট।

রাজপুতনা ও অন্যান্য স্থানে রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকাজের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ক'রে লখনৌ অ্যাডভোকেট বলেছিল: এঁরা যেখানেই যান, সেখানেই পৃথিবীর সর্বোত্তম মানুষ বলে প্রতীয়মান হন। দরিদ্রতমদের মধ্যে এঁদের কাজ। এই রকম কাজ দরিদ্র ভারতবাসীদের মধ্যে আরো অনেকে করবেন, এই আশাই আমরা করি।[১]

স্বামী অখণ্ডানন্দ মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ-সেবার কাজ করেছিলেন (এ বিষয়ে পরে বিস্তারিত আলোচনা হবে), মহাবোধি সোসাইটি তাতে অর্থ সাহায্য করে। এইসব কাজের ও সাহায্যের সংবাদ অনেকবার মহাবোধি সোসাইটি জার্নাল এবং ইণ্ডিয়ান মিরারে বেরিয়েছে। ১৮৯৮, মার্চ সংখ্যায় মহাবোধি পত্রিকায় 'বৌদ্ধদের জনৈক বন্ধু' একটি রচনায় বিবেকানন্দের সঙ্গে বৌদ্ধরা একযোগে কাজ করলে ভারতের কোন্ বিরাট মঙ্গল ঘটবে, তার বিস্তারিত আলোচনা করার পরে, রচনাশেষে, জীবনযুদ্ধে বিধ্বস্ত

---

১ অ্যাডভোকেটের মন্তব্য প্রবুদ্ধ ভারতের আগস্ট ১৯০০ সংখ্যায় উদ্ধৃত হয়, তার অংশ:

"We are glad to learn that the band of devoted workers of this Order prove themselves the very salt of the earth wherever they go. Their famine relief operations in Rajputana have won them the golden opinion of those who went to the spot; and their Orphanage is a wonder of economy along with efficiency. In Calcutta they are more the less busy. Plague and Cholera have given them a good chance to be of some use to suffering humanity...The work was necessarily confined to the poorest classes who were unable to pay for cleansing and disinfecting their houses, drains and closets...The Chairman and the Health Officer of the Calcutta Corporation were both highly pleased with the help thus rendered by the Mission to the work of sanitation in Calcutta."

অগণিত দরিদ্র ভারতবাসীর জন্য স্বামীজীর সাহায্য-পরিকল্পনার সশ্রদ্ধ উল্লেখ করেন। এ ক্ষেত্রে স্বতঃই তিনি বুদ্ধদেবের মানবপ্রেমের কথা তুলেছিলেন। প্রত্যেক বৌদ্ধের কর্তব্য যে, বিবেকানন্দের পরিকল্পনায় সাহায্য করা, তাও তিনি সুস্পষ্ট জানিয়েছিলেন।[২]

ইণ্ডিয়ান মিরারে অখণ্ডানন্দের মুর্শিদাবাদ-সেবাকাজ ও তাতে মহাবোধি সোসাইটির সাহায্য-বিষয়ে বড় সংবাদ বেরিয়েছিল।[৩] এই পত্রিকা, লাহোরে বক্তৃতা-প্রসঙ্গে স্বামীজী ক্ষুধার্ত নারায়ণকে সেবা করাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলেছিলেন, তাকে গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করেছিল[৪], প্রকাশ করেছিল—কনখলে সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠার জন্য স্বামী বিমলানন্দের দীর্ঘ আবেদনকে[৫], এবং দেওঘরে রামকৃষ্ণ মিশনের 'নীরব, নিঃস্বার্থ, মহান' সেবা-কাজ সম্বন্ধে সরকারী উচ্চ প্রশংসাকে।[৬]

---

২ ১৮৯৮, মার্চের মহাবোধিতে উক্ত A friend of the Buddhist তাঁর The Future of India নামক রচনায় অন্যান্য কথার সঙ্গে লেখেন :

"The poverty of India cannot but touch the heart of every philanthropist and patriot... To relieve and elevate humanity seems to us to be the highest religion. It is for this that Sidhartha left all princely enjoyments and made himself a beggar ; it is for this that Christ died upon the cross, and it is for this that Ramankrishna practised such hard austerities, and wept day and night. The highest Vedantist is he who weeps with those who weep, and smile with those who smile, and who can say... 'my soul is every man's soul.'

"The ghastly spectacle which the late famine presented, cannot fail to teach us the real want of our country... One of the works of Swami Vivekananda, we understand, will be to feed and clothe the masses well and provide lucrative works for the poor struggling mediocrity... It is...a sacred duty of every Buddhist to help and encourage any work the object of which is to feed the hungry and help the poor."

'মহাবোধি' পত্রিকায় ১৮৯৭ জুলাই—আগস্ট সংখ্যায় অখণ্ডানন্দের মুর্শিদাবাদ সেবাকাজের দীর্ঘ বিবরণ বেরিয়েছিল। ডিসেম্বর ১৯০১—জানুয়ারি ১৯০২ সংখ্যায় রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকাজ সম্বন্ধে লেখা হয়েছিল :

"The members of the Mission did some excellent work in different places of India during the famine of 1900... The members of the Mission deserve the best thanks of the public for their disinterested work."

৩ ৬ জুন ১৮৯৭ এবং ২৪ জুন ১৮৯৭-এর মিরারে দুটি সংবাদ ঐ বিষয়ে বেরিয়েছিল।

৪ ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৮-এর মিরারে বেরোয় :

"Swami Vivekananda has been urging on the people of Lahore and Sialkote the need of practical work. The starving millions, he urged, cannot live on metaphysical speculation ; they require bread ; and in a lecture he gave at Lahore... he suggested as the best religion for to-day that everyone should, according to his means, go out in the street and search for hungry Narayanas, take them into their houses, feed them and clothe them. The giver should give to man, remembering that he is the highest temple of God."

৫ ১৬ আগস্ট ১৯০১ তারিখে মিরারে স্বামী বিমলানন্দের আবেদন বেরিয়েছিল।

৬ ডিসেম্বর ১৮৯৭-এর মিরারে (প্রবুদ্ধ ভারতে ১ জানুয়ারি ১৮৯৮ সংখ্যায় উদ্ধৃত) দেওঘরের সাবডিভিশন্যাল অফিসার মিঃ এইচ এইচ হার্ড-এর নিম্নের কথাগুলি সংবাদসূত্রে উদ্ধৃত হয় :

"Mr. Heard said, he has not come to deliver a lecture but only to see the distribution of clothes to the needy recipients of the relief from the Ramakrishna Mission. The work was being carried on so nobly, silently, and disinterestedly that he had not heard of its existence even until he was asked to see the work done by the Ramakrishna Mission. It was an easy thing to come and see the distribution but it was a hard task to go over all the villages and enquire in the huts of the poor, to select the actually needy from the imposters, to start an organisation and carry on the work throughout. Therefore, the whole credit and thanks were due to the sannaysin who was the executive mover and worker of this noble undertaking. What struck most was the system and organisation of the movement."

উপরের মন্তব্যে লক্ষণীয়, প্রশংসাকারী ইউরোপীয় রাজকর্মচারীর চোখে রামকৃষ্ণ মিশনের নিঃস্বার্থ সেবার রূপটিই কেবল ধরা পড়েনি, তার সুশৃঙ্খল সংগঠনের রূপও তিনি বিশেষভাবে দেখেছিলেন।

অমৃতবাজার পত্রিকাতেও মিশনের সেবা-কাজের অল্পবিস্তর বিবরণ বেরিয়েছে।[৭] ইণ্ডিয়ান নেশন ১মে ১৮৯৯ সংখ্যায় নিবেদিতার প্লেগ-সেবা- পরিকল্পনার সুদীর্ঘ সংবাদ ছেপেছিল। বোম্বাইয়ের বিখ্যাত সমাজ সংস্কারক ও লেখক মালাবারির ইণ্ডিয়ান স্পেকটেটর ৩০ এপ্রিল ১৮৯৯ সংখ্যায় রামকৃষ্ণ মিশনের প্লেগসেবা প্রসঙ্গে সন্তোষের সঙ্গে লিখেছিল: স্বামী বিবেকানন্দ দেশের জন্য অনেক কিছু করতে সমর্থ, এ কথা আমরা আগেই বলেছি—আমাদের সে আশা বাস্তবায়িত হবার সম্ভাবনা এখন দেখছি।[৮]

নানা বিষয়ে স্বামীজীর সমালোচক ইণ্ডিয়ান সোস্যাল রিফর্মার এই সেবাকাজের ব্যাপারে কিন্তু বিবেকানন্দ ও রামকৃষ্ণ মিশনের প্রশংসা ভিন্ন আর কিছু করতে পারেনি। দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের সমাজসংস্কারকদের এই মুখপত্রটির প্রশংসার মূল্য আছে। এই পত্রিকার ৯ অক্টোবর ১৮৯৮ সংখ্যায় Renunciation and Service নামক একটি দীর্ঘ সম্পাদকীয় নিবন্ধে বুদ্ধ ও বৌদ্ধমত সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়। পত্রিকাটি লিখছিল: স্বামীজী কদাপি জ'লো মন্তব্য করেন না; পরবর্তী বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষে যে কদাচার এনেছে, তিনি কঠোরভাবে তার সমালোচনা করেছেন; সেজন্য ইতিমধ্যে অনেক অন্তর্দাহ ঘটে গেছে; কিন্তু এই একই ব্যক্তি বৌদ্ধদের ত্যাগ ও সেবার সমুচ্চ স্তুতিও করেছেন; স্বামীজীর অভিপ্রায় 'জাতীয় কর্মশক্তি' বৃদ্ধি করা, যা পুরনো রীতির ত্যাগ-ধর্মের দ্বারা ঘটানো সম্ভব নয়; পূর্বোক্ত ধরনের ত্যাগ একপ্রকার স্বার্থপরতা ছাড়া কিছু নয়; তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে স্বামীজী যে-ভূমিকা নিয়েছেন, ভারতের ভাবী ইতিহাসের গঠনে তার গুরু মূল্য স্বীকৃত হবে; হিন্দু সন্ন্যাসী হয়েও স্বামীজী যে, এই ভূমিকা নিতে পেরেছেন, এটা খুবই বিস্ময়কর ব্যাপার, ইত্যাদি ইত্যাদি।[৯]

কিসেনগড়ে রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষে যে দুর্ভিক্ষ-সেবার কাজ চালানো হয়, রাজপুতনার ফেমিন কমিশনার মেজর ডানলপ তার বিশেষ প্রশংসা করেছিলেন। খাণ্ডোয়ার ফেমিন কমি-শনারও সেখানকার কাজের ব্যাপারে মিশনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন। তাঁদের মন্তব্য উদ্ধৃত করার পরে ১৫ ডিসেম্বর ১৯০১ সংখ্যায় সোস্যাল রিফর্মার মন্তব্য করে: ধর্মতত্ত্বের ব্যাপারে রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে অন্যান্যদের মতভেদ থাকতে পারে, কিন্তু তাঁদের এই অসাধারণ সেবার ব্যাপারে

৭ ২২ অক্টোবর ১৮৯৭ তারিখের অমৃতবাজার দেওঘরের স্বামী বিরজানন্দের দুর্ভিক্ষসেবার সংবাদ দিয়েছিল। একই কাগজ ২৮শে এপ্রিল ১৯০০ তারিখে প্লেগের সময়ে রামকৃষ্ণ মিশনের বস্তী-পরিষ্কার ও অন্য সেবাকাজের দীর্ঘ বিবরণ ছেপেছিল।

৮ মালাবারির ইণ্ডিয়ান স্পেকটেটর ৩০ এপ্রিল ১৮৯৯ সংখ্যায় লেখে:

"Some weeks ago we wrote of Swami Vivekananda as a man who could do much for his country if he would only speak out all that he felt. In the speech he is reported to have delivered at Calcutta recently, we see that he has resolved to do justice to himself. The occasion was a meeting of the Ramakrishna Mission for the relief of the plague-stricken and Swami Vivekananda presided ... He referred in his speech to the strictures of an English journalist on the Bengalees, and declared that such strictures can only be wiped out if his countrymen exerted themselves in the cause of the public good, more than they did at present. It gives us pleasure to see the practical shape which some of the Hindu revival movements have been taking of late."

৯ সোস্যাল রিফর্মারের উক্ত ৯ অক্টোবর ১৮৯৮ সংখ্যায় সম্পাদকীয় রচনার শেষাংশ:

"We consider it a matter of congratulation that a Hindu *Sannyasin* should invest old ideas with a new significance such as will commend itself to the spirit of the times. It may not please all people - and immortal Æsop tells us that it is not wise to try to please everybody—but ideas such as the Swami's will play an important part in the evolution of future India."

মতান্তরের কোনই অবকাশ নেই। রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকাজের অপূর্ব বৈশিষ্ট্য—তার সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক চরিত্র।[১০]

পুণার মারহাট্টা পত্রিকার সংবাদ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকাজ এঁদের কতখানি হৃদয়হরণ করেছিল। বোম্বাইয়ের বিখ্যাত অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান দৈনিক টাইমস অব ইণ্ডিয়ায় সংবাদ বেরুল—স্বামী বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা ক'রে প্লেগ-শুশ্রূষার কাজ আরম্ভ করে দিয়েছেন। উক্ত সংবাদের শিরোনামা ছিল: Tne Plague in India: Bengalis Roused to Activities। মারহাট্টা তার ৩০ এপ্রিল ১৮৯৯-এর সম্পাদকীয় রচনায় ঐ সংবাদকে পরমাগ্রহে স্বাগত জানাল।

ঐ সংবাদকে সমাদর করার বিশেষ কারণ—রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকাজের দ্বারা বাগ্মী ও ধর্মনেতা বিবেকানন্দের বাস্তব কর্মিরূপটি প্রকটিত হয়ে উঠেছিল, এবং মরাঠীরা জাতিগতভাবে কর্মি-চরিত্রের চিন্তার সঙ্গে কর্মকে যুক্ত না ক'রে তাঁরা সন্তুষ্ট থাকেন না। মরাঠী মনস্বিতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি এই পত্রিকা বিবেকানন্দকে আচার্যরূপে স্বীকার ক'রে নিয়েছিল। এই সঙ্গে এই পত্রিকাটি বিস্ময় ও বিরক্তির সঙ্গে লক্ষ্য করেছিল—বিবেকানন্দের প্লেগসেবার মত বৃহৎ ব্যাপার বাংলাদেশের সংবাদপত্রে উপযুক্ত স্থান পায়নি!

মারহাট্টার ৩০ এপ্রিল ১৮৯৯-এর মন্তব্যের কিছু অংশ:

"Swami Vivekananda, the present leader of the movement···called upon Bengalees to belie by practical action the aspersions thrown upon them by the advocates of the Calcutta Municipal Bill. It is somewhat strange, that the native press in Bengal does not give adequate information upon this piece of news. But those that know intimately the spirit of the teachings of the Swami, will, by no means, be surprised if they find the favourite disciple of Rama Krishna Paramahansa thus apparently going out of his way to enroll volunteers in the cause of improving sanitation and preventing plague."

বাংলাদেশের সংবাদপত্রগুলি বিবেকানন্দের প্লেগসেবার মত গুরুত্বপূর্ণ প্রচেষ্টাকে যথোচিত গুরুত্ব দিয়ে কেন ছাপেনি, সে বিষয়ে পুনার সংবাদ-পত্রের বিস্ময় স্বাভাবিক, কারণ পুনা তখনো ইতিহাসের সর্ববৃহৎ প্লেগ-মহামারীর মধ্যে আছে ও পুনার লোকহিতব্রতীরা ঐ মহামারীর সঙ্গে যুঝবার চেষ্টা করছেন। অপরদিকে ঐকালে বাঙালী বুদ্ধি-মানেরা ভাবছিলেন, বক্তৃতা ক'রে, বা কীর্তন ক'রে প্লেগ তাড়ানো সম্ভবপর। এক্ষেত্রে বিবেকানন্দের কাজ তাঁদের পক্ষে বাড়তি উৎপাত। কর্মবিমুখ বাঙালী-মনের বড় অংশ তখন বিবেকানন্দের মতের ঐ বাস্তববাদী অংশটিকে উপযুক্ত মর্যাদা দেবার মত

১০ সোস্যাল রিফর্মারের ১৫ ডিসেম্বর ১৯০১ সংখ্যায় সম্পাদকীয় মন্তব্যের অংশ:

"Testimony such as the above (of Major Dunlop and the famine Officer of Khandwa), our contemporary will admit, counts far more in estimating the worth and genuineness of a movement than controversy regarding its doctrines. The most remarkable feature of the benevolent work of the Ramakrishna Mission is its totally non-sectarian character. Among the orphans received into the Kishengarh Home were Balais, Jat, Gujars, Malis, Musulmans, Charmars, Rejars, Barhais and Brahmins."

মানসিক অবস্থায় ছিল না। কিছু আত্মত্যাগী বাঙালী অবশ্য বিবেকানন্দকে সত্যই বুঝেছিল, বিবেকানন্দ যাদের ধমনীতে রক্তসঞ্চার করেছিলেন, কিন্তু বাগ্‌বিভূতিতে অভ্যস্ত রাজনৈতিকদের পক্ষে বিবেকানন্দকে বোঝা বা গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। সেইজন্য বিবেকানন্দ কেন কলকাতায় এসে বক্তৃতা থামিয়ে দিলেন সে অভিযোগ পর্যন্ত উঠেছিল। তাছাড়া, পাঠকদের নিশ্চয় স্মরণ আছে, বিবেকানন্দের থিয়জফিস্ট-বিরোধী ভূমিকার জন্য কলকাতার সংবাদপত্রের দরজা কিভাবে তাঁর জন্য প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

বহির্বঙ্গের সংবাদপত্রগুলি কিন্তু রামকৃষ্ণ মিশনের প্লেগসেবার বিবরণ যেটুকু পেয়েছে, সাগ্রহে ছেপেছে। মাদ্রাজের হিন্দুপত্রিকার ১৭ এপ্রিল ১৮৯৯ সংখ্যায় 'নোটস্ ফ্রম ক্যালকাটা'র মধ্যে নিবেদিতার নেত্রীত্বে রামকৃষ্ণ মিশনের প্লেগসেবার কাজ শুরু হয়েছে, তার সংবাদ ছিল। বস্তীবাসী অসহায় প্লেগাক্রান্তদের সাহায্য করতে মিউনিসিপ্যালিটিকে এগিয়ে আসতে না দেখে নিবেদিতা এগিয়ে এসেছিলেন এবং ঐ ব্যাপারে ভারতীয় ও ইউরোপীয় সমাজের কাছে সাহায্যের আবেদন জানিয়েছিলেন। 'হিন্দু'র কলকাতা সংবাদদাতা এই সংবাদ দেবার পরে লিখেছিলেন: ভারতীয় সমাজ নিবেদিতার আবেদনে সাড়া দিয়েছেন, কিন্তু তাঁর মত ইউরোপীয় সমাজত্যাগী, হিন্দুধর্মের কুক্ষিগত মহিলার আবেদনে ইউরোপীয়রা সাড়া দেবেন কি না সন্দেহ।

মাদ্রাজ মেল পত্রিকায় ২৬ এপ্রিল ১৯০০ এবং ২৯ জুন ১৯০০ তারিখের Voluntary Sanitary Work in Calcutta এবং The Ramakrishna Mission Sanitary Crusade নামক দুটি সংবাদে রামকৃষ্ণ মিশনের প্লেগসেবার প্রভূত প্রশংসা করা হয়েছিল। স্মরণ করিয়ে দেওয়া যায় এই সময়ের প্লেগসেবায় নিবেদিতার কোন হাত দিল না. তিনি তখন ইউরোপে, সেবাকাজ পরিচালনা করছিলেন স্বামী সদানন্দ। মাদ্রাজ মেলের উল্লিখিত দ্বিতীয় সংবাদটিতে বলা হয়েছিল, রামকৃষ্ণ মিশন 'বিনা আড়ম্বরে কিন্তু কার্যকরীভাবে' কলকাতার দরিদ্রতম মানুষদের মধ্যে প্লেগসেবার কাজ ক'রে যাচ্ছে। অতি দরিদ্র বস্তীগুলি যেভাবে তাঁরা পরিষ্কার করছেন, জীবাণুশূন্য করছেন, অশিক্ষিত জনগণের সামনে পরিচ্ছন্ন জীবনযাপনের আদর্শ স্থাপন করছেন· ভবিষ্যতে তার ফল ফলবেই।

মারহাট্টার সংবাদ-বিশ্লেষণে ফেরা যাক। পূর্বোক্ত ৩ এপ্রিল ১৮৯৯-এর সম্পাদকীয়তে আচার্য বিবেকানন্দের কর্মনেতার রূপকে নমস্কার ক'রে লেখা হয়েছিল: বেদান্ত আপাততঃ যদিও জীবনবিমুখ বলে মনে হয়, কিন্তু তার মধ্যেই রয়েছে শ্রেষ্ঠ কর্মতত্ত্ব। স্বামীজীর উৎকৃষ্ট ভাষণাদির মধ্যে দেখা যায়, অতি শুদ্ধ ঐহিকতার রূপকে তিনি স্বদেশের জাগরণের পক্ষে অত্যাবশ্যক মনে করেন। যাঁর গুরু নিজের মাথার চুল দিয়ে মেথরের পায়খানা মুছে পরিষ্কার করেছিলেন, তিনি যে, শহরের যে-কোনো ইহবাদী নগরপিতার চেয়ে বেশীভাবে শহর পরিষ্কার এবং প্লেগনিবারণের কাজে আত্মনিয়োগ করবেন, তাতে আশ্চর্য কি।[১১]

১১ মারহাট্টার ৩০ এপ্রিল-এর সম্পাদকীয় মন্তব্যের অংশ:

"The gospel of the Swami though based upon the seemingly un worldly principles of the Vedanta is in essence only the gospel of active work in worldly affairs, from the esoteric point of view Swami Vivekananda's religion may appear to some to consist only in spirituality of asceticism: but the esoteric view of the same as disclosed in some of the finest speeches of the Swami shows that nothing lies nearer to his heart than the idea of attempting a regeneration of his country through a highly purified materialism in its best sense. The reformer cleansing with his own hairs the W.C. of the pariah is the worldly ideal of the Swami, and no wonder if he interests himself in the improvement of sanitation and prevention of plague more than any secular city father."

স্বামীজীর সেবাকাজের প্রতি মারহাট্টার এই সাগ্রহ সমর্থনের অন্য বাস্তব কারণও ছিল। তিলকের অনুবর্তীরা স্বামীজীর এই কাজের ভিতরে হিন্দুদের বিরুদ্ধে মিশনারী-সমালোচনার উত্তর দেবার মত বস্তু খুঁজে পেয়েছিলেন। পুনার পণ্ডিতা রমাবাঈয়ের সঙ্গে তিলকের সংঘর্ষ চলছিল কয়েক বছর ধরে। বিদুষী সুন্দরী বিধবা রমাবাঈ খ্রীষ্টান হয়ে পুনায় হিন্দু বিধবা ও অনাথাদের জন্য 'শারদা সদন' নামে আশ্রয়নিবাস স্থাপন করেন। এই প্রতিষ্ঠানের নিয়মাবলীতে কোথাও লেখা ছিল না—খ্রীষ্টধর্মবিস্তারের জন্য এটি স্থাপিত হয়েছে। সুতরাং রানাডে প্রমুখ সমাজসংস্কারকেরা ব্যগ্র কল্যাণেচ্ছায় রমাবাঈয়ের সহযোগিতায় এগিয়ে আসেন। তিলক প্রথমাবধি রমাবাঈয়ের আসল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ ছিলেন। অচিরকালে দেখা গেল, তাঁর সন্দেহ নির্মম সত্য—রমাবাঈয়ের মতলব, অসহায় হিন্দু বিধবাদের খ্রীষ্টান করা।[১২] রানাডের দল অতঃপর ব্যথিত ও সন্ত্রস্ত হয়ে রমাবাঈয়ের কাজের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করেন।[১৩] কিন্তু তাঁরা রমাবাঈয়ের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে পারেননি। রমাবাঈ বলেছিলেন, এই ধরনের প্রতিষ্ঠানের ভার যদি হিন্দুরা গ্রহণ করে, তাহলে সব গণ্ডগোলই মিটে যায়। রামকৃষ্ণ মিশনের মধ্য দিয়ে স্বামীজী যখন সংঘবদ্ধ সেবাকাজ আরম্ভ করলেন তখন তিলক ও তাঁর সহকর্মীরা গৌরবের সঙ্গে ঘোষণা করবার মত কিছু বস্তু হিন্দুসমাজ থেকে খুঁজে পেয়েছিলেন।

রমাবাঈয়ের কার্যকলাপ এবং তিলকের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষের বিষয়ে আরও সংবাদ আমরা অন্য অধ্যায়ে পরিবেশন করব। শ্রীমতী লুই বার্ক তাঁর গ্রন্থে আমেরিকায় রমাবাঈয়ের ভারত-বিরোধী কার্যকলাপের অনেক বিবরণ দিয়েছেন। রমাবাঈ-গোষ্ঠী কিভাবে বিবেকানন্দকে হন্যে হয়ে আক্রমণ করেছিল সেখানে, তার কথাও ঐ সূত্রে জেনেছি। ভারতে ফিরে এসে স্বামীজী যখন দেখলেন, রমাবাঈ ও তাঁর দল এখানেও সক্রিয়, তখন কিছু বাস্তব প্রতিবিধানের ইচ্ছা তাঁর হয়েছিল। আমেরিকার ক্ষেত্রে তিনি চেয়েছিলেন—ঠাকুর পরিবারের সরলা দেবী সেখানে গিয়ে ভারতের সংস্কৃতির যথার্থ রূপ উদ্ঘাটন করুন, এবং ভারতের ক্ষেত্রে চেয়েছিলেন—নিবেদিতা পুনায় বিধবাশ্রম ও অনাথাশ্রম করুন। নানা কারণে স্বামীজীর এই দুটি ইচ্ছার কোনটিই সফল হয়নি। (ক্রমশঃ)

১২ যেন তেন প্রকারে খ্রীষ্টান করা (বা হিদেনদের নরকাগ্নি থেকে রক্ষা করা!) মিশনারীদের মুখ্য মিশন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। দুর্ভিক্ষকালে সাহায্য-অন্নের দ্বারা এঁরা ভারতীয় রণক্ষেত্রে ক্রুসেড চালিয়ে গেছে। প্রবুদ্ধ ভারত পত্রিকায় ফেব্রুআরি ১৯০১ সংখ্যায় এ-সম্বন্ধে লেখা হয়েছিল :

"The great friend of the Missionary Cause in India is not the Bible—it is famine."

সমকালে বহু ভারতীয় পত্রপত্রিকায় একই কথা লেখা হয়। মাদ্রাজের হিন্দু পত্রিকায় অনেকগুলি সম্পাদকীয় রচনায় দুর্ভিক্ষে মিশনারী-আহ্লাদের বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া হয়েছিল।

এক্ষেত্রে স্বামীজীর বিপরীত মনোভাবের রূপ আমরা নানা সূত্র থেকে জানতে পারি। সেবাকে তিনি সাম্প্রদায়িক বা ধর্মীয় স্বার্থের সঙ্গে যুক্ত করার কথা ভাবতেই পারতেন না। অখণ্ডানন্দ মুর্শিদাবাদে অনাথ আশ্রম স্থাপন ক'রে, সেখানে মুসলমান বালক নেওয়া হবে কি না জিজ্ঞাসা ক'রে পাঠালে স্বামীজী বলেছিলেন, অবশ্যই নেওয়া হবে, কিন্তু উক্ত মুসলমান বালকের ধর্ম যাতে রক্ষা হয়, তাও দেখতে হবে।

১৩ রমাবাঈয়ের সংবাদ বাংলা পত্রপত্রিকাতেও প্রকাশিত হয়েছে। 'অনুসন্ধান' পত্রিকায় ১০ অগ্রহায়ণ, ১৩০৪ সংখ্যায় 'রমার কীর্তি" নামক সংবাদে ছিল :

"মাদ্রাজের 'উইকলি রিভিউ' বলেন, পণ্ডিতা রমাবাঈ গত সপ্তাহে ৬৯টি দুর্ভিক্ষপীড়িত বালিকাকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করিয়াছেন। রমাবাঈ মহারাষ্ট্রের ব্রাহ্মণকন্যা—চিরকৌমার্য ব্রতাবলম্বন করিবেন বলিয়া

[শেষাংশ ৫২৮ পৃষ্ঠায়]

মধুময় জগৎসংসার

শ্রীমতী বিভা সরকার

সেদিন সে মধ্যরাত্রে স্তব্ধতার দ্বার—
গেল খুলি ; দূরে গেল পুঞ্জীভূত যত অন্ধকার।
হিরণ্ময় আবরণে ঢাকা পাত্রখানি দিল কে খুলিয়া
সত্যের চেতন স্পর্শে ত্রিভুবন উঠিল দুলিয়া।
একা আমি দাঁড়ালেম আমারই সম্মুখে,
চরাচর এক হল জ্যোতির্ময় আলোর নিরিখে।
ক্ষীণ হয়ে মিলে গেল এ মর্তের যত কলস্বর,
একটি অনাদি সুর মধুমন্ত্রে আছিল ভাস্বর !
বাঁশিখানি বাজালো মরমে মরমিয়া আপনার সুরে
ধূলিময় জগতের বেদনা ভাবনা সব গেল দূরে !
জীবন সত্যেরে ঢাকি খেলা করে অনাদি কিশোর
মোহমন্ত্রে সে যাদুর আত্মহারা মানস বিভোর !
দুর্লভ মুহূর্তে যবে খুলে যায় আবরণ তার
অম্বর উছলি ওঠে মধুময় জগৎ সংসার।

[৫২৭ পৃষ্ঠার পর]

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন। ১৮৮০ সালে তাঁহার জ্যেষ্ঠ শ্রীনিবাস শাস্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া দেশপর্যটনে বহির্গত হন। ঢাকা নগরীতে উপস্থিত হইবার অত্যল্পকাল পরেই শ্রীনিবাস শাস্ত্রী ওলাউঠা রোগে জীবনলীলা সমাপ্ত করেন। পণ্ডিতা রমাবাঈ শ্রীহট্টে যাইয়া সাহাবংশোদ্ভব বাবু বৈকুণ্ঠনাথ দাসকে পাণিপ্রদান করেন। সুতরাং রমাবাঈয়ের এই কীর্তিতে আমাদের কোনো কথা বলা নিষ্প্রয়োজন।"

বামাবোধিনী পত্রিকায় মাঝে মাঝে রমাবাঈ-সংবাদ বেরিয়েছে। কার্তিক ১৩০০ সংখ্যায় রমাবাঈ শারদা সদনে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করছেন, এই সংবাদ দেবার পরে বলা হয়েছিল, "হিন্দুগণ রমাবাঈয়ের কার্যের ব্যাঘাত না করিয়া যদি স্বতন্ত্র একটা স্ত্রী বিদ্যালয় চালাইতে পারেন, তাহা হইলে সকল দিকেই ভাল হয়।" এই পত্রিকার কার্তিক ১৩০২ সংখ্যায় "পণ্ডিত রমাবাঈ ও শারদা সদন" নামে সম্পাদকীয় রচনা বেরোয়, তার মধ্যে কিভাবে শারদা সদন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার অপেক্ষাকৃত বিস্তারিত বিবরণ ছিল। ব্রাহ্ম পত্রিকা হিসাবে বামাবোধিনী রমাবাঈ সম্বন্ধে উদারতা দেখাতে বাধ্য ছিল। সেই সঙ্গে পত্রিকার সম্পাদক জানতেন না— আমেরিকা থেকে কোন্ উদ্দেশ্যে রমাবাঈকে সাহায্য করা হচ্ছে। জানলে, উক্ত সাহায্যকে 'সৎ ও শুভফলপ্রদ' বলা সম্ভব হ'ত না। অতঃপর এই পত্রিকায় পৌষ ১৩০২ সংখ্যায় 'শারদা সদনে খ্রীষ্ট-বিভীষিকা' নামে যে মন্তব্য প্রকাশিত হয়, তার মধ্যে নিরপেক্ষতা ও নির্লিপ্তির পরাকাষ্ঠা: "মারহাট্টা পত্র লিখিয়াছেন, পণ্ডিতা রমাবাঈয়ের শারদা সদনে এককালে ১২টি হিন্দু রমণী খ্রীষ্টীয় ধর্মে দীক্ষিতা হইয়াছেন। ইহাতে হিন্দুরা ভীত হইতে পারেন।"

বিবেকানন্দ : বস্বে থেকে বঙ্কুবর

স্বামী চেতনানন্দ

'আমি নির্বিঘ্নে পৌঁছেছি''—এ রকম ভাষায় পৌঁছ-সংবাদ পড়তে ও লিখতে আমরা অভ্যস্ত। স্বামীজীর পৌঁছ-সংবাদের ভাষা : "(আমেরিকা ২০।৮।১৮৯৩) এখানে আসবার পূর্বে যে-সব সোনার স্বপন দেখতাম তা ভেঙ্গেছে। এক্ষণে অসম্ভবের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হচ্ছে। শত শতবার মনে হয়েছে, এ দেশ হতে চলে যাই ; কিন্তু আবার মনে হয়, আমি একগুঁয়ে দানা, আর আমি ভগবানের নিকট আদেশ পেয়েছি। আমি কোন পথ দেখতে পাচ্ছি না , কিন্তু তাঁর চোখ তো সব দেখছে। ...আমাকে এখন অনাহার, শীত, অদ্ভুত পোশাকের দরুন রাস্তার লোকের বিদ্রূপ—এগুলির সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে চলতে হচ্ছে। ...ভারতের দরিদ্র, ভারতের পতিত, ভারতের পাপিগণের সাহায্য-কারী কোন বন্ধু নেই।...আমি বার বছর হৃদয়ে এ ভার নিয়ে ও মাথায় এ চিন্তা নিয়ে বেড়িয়েছি।... হৃদয়ের রক্ত মোক্ষণ করতে করতে আমি অর্ধেক পৃথিবী অতিক্রম ক'রে এ বিদেশে সাহায্যপ্রার্থী হয়ে উপস্থিত হয়েছি।"

স্বামীজী লিখেছেন, "আমি ভগবানের আদেশ পেয়েছি।" কি ভাবে ? জীবনীকাররা দুটি তথ্য পরিবেশন করেছেন—(১) শ্রীরামকৃষ্ণের সমুদ্রের উপর দিয়ে হেঁটে তাঁকে অনুসরণ করতে বলা -- এরূপ একটা স্বপ্নদর্শন এবং (২) শ্রীশ্রীসারদাদেবীর সম্মতিপূর্ণ আশীর্বাদ-পত্র।

এখানে একটা জিনিস লক্ষ্য করবার বিষয়। স্বামীজী অত কাঁচা ছেলে ছিলেন না যে, স্বপ্নের উপর বিশ্বাস ক'রে সাত-সমুদ্দুর তের নদী পাড়ি দেবেন। আর আদেশ পাবার পর শ্রীশ্রীমার কাছে স্বামীজী সম্মতি চেয়েছেন। একে আদেশ বলা যায় না।

এই আদেশ প্রসঙ্গে আমরা একটা মূল্যবান তথ্যের উল্লেখ করছি। তথ্যটি ১৯৬৬ সালে বেলুড় মঠ শিক্ষণমন্দিরের 'সন্দীপন' পত্রিকায় "একটি দিনের স্মৃতি : শংকরানন্দজী-সকাশে" শিরোনামায় স্বামী তেজসানন্দ কর্তৃক প্রকাশিত।

"দেখ, স্বামীজী সম্বন্ধে অনেক তথ্য এখনও অনেকে জানে না। তোমাকে একটা ঘটনা বলি। আমি আর. এ. নরসিংহাচারিয়ার কাছ থেকে শুনেছি। স্বামীজী Parliament of Religions-এ যাবেন কিনা সে-সম্বন্ধে জল্পনা কল্পনা করছেন এবং ইতস্ততও করছেন। অথচ মাদ্রাজী বন্ধুরা তাঁকে চিকাগোতে পাঠাবার জন্য খুব তোড়জোড় করছেন। মাদ্রাজে স্বামীজী যেখানে ছিলেন তার পাশের ঘরেই নরসিংহাচারিয়া থাকতেন। তিনি পর পর দু-চারদিন গভীর রাত্রে শুনতে পেতেন পাশের ঘরে স্বামীজী যেন কার সঙ্গে বাদানুবাদ করছেন, বেশ অনেকক্ষণ ধরে ওরকম চলত। পর পর কয়েক দিন ঐ রকম হওয়ায় নরসিংহাচারিয়া স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'স্বামীজী, আপনি কার সঙ্গে এত রাত্রে কথা কাটাকাটি করেন ?' স্বামীজী প্রথমে কিছুই তার নিকট প্রকাশ করতে চাননি। তবে নরসিংহাচারিয়াও ছাড়বার পাত্র নন। অনেক পীড়াপীড়িতে স্বামীজী বললেন : 'আমার চিকাগো ধর্মমহাসভায় যাবার ইচ্ছা ছিল না, মনে মনে না যাওয়ারই সিদ্ধান্ত করেছিলাম। কিন্তু ঠাকুর আমাকে দেখা দিয়ে কয়েক দিন ধরে বারবার বলতে লাগলেন, 'আমার কাজের জন্য এসেছিস ; তোকে যেতেই হবে। তোর জন্যই ঐ সভার আয়োজন জানবি। তোর কোন চিন্তা

নেই। তোর কথা শুনে লোক মুগ্ধ হবে।' আমি যতই আপত্তি জানাই, ঠাকুর ততই আমাকে যাওয়ার জন্য জিদ করেন। এইভাবে দু-চার দিন ধরে বাদানুবাদ হয়। শেষে ঠাকুরের আদেশ শিরোধার্য করে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছি।' "

পরবর্তীকালে স্বামীজীর কথাতে আমরা সাক্ষ্য পাই। তিনি জনৈক ব্যক্তিকে বলেছিলেন যে, চিকাগো ধর্মমহাসভা তাঁর জন্য আয়োজিত হয়েছিল।

এ প্রবন্ধে নূতন নূতন তথ্যের আলোকে আমরা বিভিন্ন জীবনীকারদের বর্ণনা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করব। আমাদের সামনে এখন তিনখানা প্রামাণিক জীবনী রয়েছে—(১) The Life of Swami Vivekananda by His Eastern and Western Disciples, (২) স্বামী বিবেকানন্দ—প্রমথনাথ বসু-কৃত ও (৩) যুগনায়ক বিবেকানন্দ—স্বামী গম্ভীরানন্দ-কৃত। সব জীবনী-কারই স্বামীজীর বম্বে থেকে বঙ্কুবরে যাত্রার কাহিনী বিশদভাবে লিখলেও সম্প্রতি আমাদের কাছে এমন কিছু নূতন তথ্য এসেছে যার ঐতি-হাসিক মূল্য যথেষ্ট।

বরানগর মঠের "সংলগ্ন বাগানে একখানা কলাপাতা আনতে গেলে উড়ে মালী যা-তা ব'লে গাল দিত। শেষে মানকচুর পাতায় ভাত ঢেলে খেতে হ'ত। তেলাকুচো পাতা সিদ্ধ আর ভাত—তা আবার মানপাতায় ঢালা। কিছু খেলেই গলা কুট কুট ক'রত।" ঐ দারুণ দুর্দিনে স্বামীজীর মুখ দিয়ে গুরুভ্রাতাদের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে গেল, দেখবি আমাদের নাম ইতিহাসে উঠবে।" ঋষি-বাক্য বিফল হবার নয়। সম্প্রতি ইউনিভারসিটি অফ ক্যালিফর্নিয়া লস এঞ্জেলিসের সাধারণ ইতিহাস বিভাগে The Swami in America : A History of the Ramakrishna Movement in the United States-এর উপর গবেষণা ক'রে Ph. D. পেয়েছেন কার্ল টমাস জ্যাকসন্ নামে এক যুবক।

স্বামীজীর পাশ্চাত্যে যাবার উদ্যোগ ও আয়োজন পর্যায়ের অনেক কথা জীবনীকাররা লিখেছেন। 'যুগনায়ক' গ্রন্থে অর্থ-সংগ্রহের কথা বিশদভাবে বলা হয়েছে। ঐ সঙ্গে আমরা মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের একটা মূল্যবান স্মৃতি যোগ করতে চাই।

"...স্বামীজী রামনাদে এলেন। রামনাদের রাজা বেশ বিদ্বান ছিল, মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট। অনেক কাগজ-টাগজ পড়ত। সে-ই কাগজ দেখে বললে, 'স্বামীজী, আমেরিকায় মস্ত একটা কাজ চলেছে। নানা দেশবিদেশের সব পণ্ডিত ধার্মিক সব নানা সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে চিকাগো ধর্মসভায় যাচ্ছে। আপনার মত বিদ্বান লোক যদি হিন্দুধর্মের পক্ষ থেকে যান ত বেশ ভাল হয়।' স্বামীজী বললেন, 'তা বেশ ত, আমি ত সন্ন্যাসী মানুষ, আমার এদেশ ওদেশ কি? টাকা পেলেই যাব।' তাতে রাজা দশ হাজার টাকা দিতে চাইলে। যা হোক স্বামীজী মাদ্রাজে এলেন। তারাও স্বামীজীকে আমেরিকায় পাঠাতে চাইলে। স্বামীজী টাকা চাইলেন। তারা রামনাদের রাজার কাছে টাকার কথা লিখতে, রামনাদের রাজা লিখে পাঠান, 'স্বামীজী, আমি টাকা পাঠাতে অসমর্থ। আমি এখন টাকা পাঠাতে পারচি না।' একজন খপরের কাগজের এডিটর, আমাদেরই দেশের লোক, তাঁকে বললে, 'রাজা টাকা দিয়ে স্বামীজীকে আমেরিকায় পাঠাবেন, উনি ত দেখা যাচ্ছে বাঙালী বিদ্বান, যদি বিদেশে গিয়ে রাজনৈতিক মতবাদ প্রচার করেন, তাহ'লে রাজারই দোষ হবে।' তখন থেকেই অন্যান্য প্রদেশের লোকদের ধারণা যে বাঙালী খুব রাজ-নৈতিক জাতি। তাই রামনাদের রাজা ভয় পেয়ে ঐ রকম লিখেছিল। স্বামীজী মাদ্রাজীদের, খুব

বিরক্ত হয়ে বললেন, 'আমি চলে যাব।' তাতে ভালই হলো—একজনের নামে তিনি কেন যাবেন —ঠাকুরের ইচ্ছা যে তাঁকে তাঁর দেশের লোক পাঠায়। ·· সুব্রহ্মণ্য ও মন্মথবাবু নিজেরা পাঁচ পাঁচশ টাকা প্রথম দিয়ে বাকী টাকার জোগাড়ে লাগলেন। ···মন্মথবাবু—সব স্টেটের রাজা রাজড়াদের লিখে টাকা জোগাড় করতে লাগলেন। তাঁরাও দেখলে গভর্ণমেণ্টের অনেক বড় বড় কর্মচারীরা দিচ্ছে—বিপদ হয় ত সব দল বেঁধেই বিপন্ন হবো। রামনাদের রাজাও পাঁচশত টাকা পাঠালো···।" (উদ্বোধন : ৩৬ বর্ষ ১২ সংখ্যা)

মহাপুরুষজীর স্মৃতিকথাতে আরও অনেক নূতন নূতন তথ্য আছে যেমন, স্বামীজীর ফরাসী ভাষা শিক্ষা ও বরানগর মঠে ফরাসীতে চিঠি দেওয়া ইত্যাদি। যাহোক কোন জীবনীকাররা উপরোক্ত টাকা সংগ্রহের ঘটনাটা উল্লেখ করেননি। উপরন্তু কে ঐ খবরের কাগজের সম্পাদক যে রামনাদের রাজাকে কুমন্ত্রণা দিয়েছিল—এটি গবেষণার বস্তু।

স্বামীজীর মনে পাশ্চাত্যে যাবার চিন্তা উঠে জুনাগড়ে ও পোরবন্দরে। পরে ক্রমশঃ তা দানা বাঁধতে থাকে। কিন্তু আদেশ ছাড়া যে তিনি যেতে পারেন না। মাদ্রাজে আমরা তার একটা সাক্ষ্য পাই। এ সাক্ষ্য দিয়েছেন মাদ্রাজের জনৈক অধ্যাপক (খুব সম্ভব আলাসিঙ্গা পেরুমল) দেবমাতাকে এবং তা প্রকাশিত হয়েছে 'উদ্বোধনে'র ৩৪ বর্ষের ২য় সংখ্যায় : "আমার মনে আছে তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রসঙ্গে বলেছিলেন, 'হিন্দুদের আরও শক্ত হওয়া দরকার আর পাশ্চাত্যদের আরও শিষ্ট হওয়া দরকার।' আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'আপনি কেন চিকাগো ধর্মমহাসভায় হিন্দুধর্ম উপস্থাপিত করতে যাচ্ছেন না?' তিনি উত্তরে বললেন, 'আমাকে কেহ পাঠালে যেতে আপত্তি নেই।' আমাদের মধ্যে একজন তাঁকে দুটো টাকা দিতে চাইলেন। অপরের নিকট হ'তে টাকা গ্রহণ করা ইহাই তাঁহার প্রথম। তিনি হেসে বললেন সর্বপ্রথমে আমি যে ভিখারীকে পাই তাকেই এই টাকা দিয়ে দেব এবং সত্য সত্যই কোনও গরীব ভিখারীকে তিনি এই টাকা দিয়ে দিয়েছিলেন। চিকাগো যাত্রার জন্য সর্বপ্রথমে যে চাঁদা (দুশত পঞ্চাশ টাকা) সংগৃহীত হয়েছিল, তা পাওয়ামাত্রই তিনি যে সব ছেলেদের খুব ভালবাসতেন তাদের জন্য দোকানে গিয়ে একখানি গাড়ী এবং কতকগুলো খেলনা কিনলেন।"

তারপর 'নাম' রহস্য। শ্রীরামকৃষ্ণের মতো স্বামীজীর নামও রহস্যপূর্ণ। ঐতিহাসিকদের মূল গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে চুপ ক'রে থাকা ছাড়া গত্যন্তর নেই। কালের ব্যবধান ও প্রত্যক্ষদর্শীর অভাব ইতিহাসকে অনুমানের মধ্যে ফেলে দেয়। যেমন 'রামকৃষ্ণ' নামের উপর তিনটি মত আছে[1] (পাদটীকা দ্রষ্টব্য)।

[1] **পাদটীকা :**

প্রথম মত : "আমাদিগের মধ্যে কেহ কেহ বলেন, সন্ন্যাসদীক্ষা দানের সময় শ্রীমৎ তোতাপুরী গোস্বামী ঠাকুরকে 'শ্রীরামকৃষ্ণ' নাম প্রদান করিয়াছিলেন। অন্য কেহ কেহ বলেন, ঠাকুরের পরমভক্ত সেবক শ্রীযুত মথুরামোহনই তাঁহাকে ঐ নামে প্রথম অভিহিত করেন। প্রথম মতটিই আমাদিগের নিকট সমীচীন বলিয়া মনে হয়।" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ২য়, পৃঃ ২৯৩)

দ্বিতীয় মত : "জগবন্ধু (শ্রীমর প্রতি)—ঠাকুরের নাম 'রামকৃষ্ণ' কি ক'রে হলো ?' শ্রীম— বাড়ীতেই দেওয়া নাম বলে আমাদের মনে হয়। বাড়ীর সকলের নামেই প্রায় 'রাম' আছে— রামকুমার, রামেশ্বর, রামকৃষ্ণ। তাঁদের ছেলেরা রামলাল, শিবরাম।···রাণী রাসমণি কালীবাড়ির

সন্ন্যাস গ্রহণকালে নাম গ্রহণের একটা বিধি আছে। 'যুগনায়ক' গ্রন্থের মতে স্বামীজীর সন্ন্যাস নাম হয়—স্বামী বিবিদিষানন্দ। কিন্তু পরিব্রাজক কালে নামযশ ও লোকমান্য এড়াবার জন্য স্বামীজী হরদম নাম পাল্টাচ্ছিলেন। কখনও 'বিবিদিষানন্দ' কখনও 'সচ্চিদানন্দ'। তাঁর 'বিবেকানন্দ' নামের ইতিহাস রয়েছে 'ক্ষেত্রী নরেশ ঔর বিবেকানন্দ' গ্রন্থে। ১৯২৭ সালে গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়। গ্রন্থের লেখক পণ্ডিত ঝাবর-মলজী শর্মা। নামকরণের ঘটনাটি প্রত্যক্ষদর্শী মুন্সী জগমোহনলাল লেখককে বলেছেন। আমরা মূল হিন্দীতে উদ্ধৃতিটি দিচ্ছি :

"খেতড়ী কো প্রথম যাত্রা মেঁ এক দিন স্বামীজী কে পাস রাজাজী বৈঠে হুএ থে। উন-হোঁনে হঁসতে হঁসতে কহা—মহারাজ, আপকা নাম বড়া কঠিন হৈ। বিনা টীকাকার কো সহায়তা সে সাধারণ লোগোঁ কী সমঝ মেঁ ইসকা মতলব নহীঁ আ সকতা। উচ্চারণ করনা ভী সহজ নহীঁ। ইসকে অতিরিক্ত অব তো আপকা বিবিদিষা-কাল (বিবিদিষা কা অর্থ হৈ—জাননে কী ইচ্ছা) ভী সমাপ্ত হো চুকা। স্বামীজী নে রাজাজীকে যুক্তিযুক্ত পরামর্শ কো সুনকর পুছা—আপ কিস নামকো পসন্দ করতে হেঁ? রাজাজী নে কহা—মেরী সমঝ সে আপকো যোগ্য নাম হৈ—'বিবেকানন্দ'। স্বামীজীনে পরমানুরক্ত রাজাজী কী ইচ্ছাকে অনুসার উস দিনসে অপনা নাম বিবেকানন্দ মানকর উসকা হী ব্যবহার আরম্ভ কর দিয়া।"

এখন সমস্যা হল : 'বিবেকানন্দ' নামটি খেতড়ীতে প্রথম যাত্রাকালে না আমেরিকায় যাবার পূর্বে দেওয়া। পূর্বোল্লিখিত তিন জীবনী-তেই রয়েছে আমেরিকায় যাত্রার অব্যবহিত পূর্বে। ইহাই সমীচীন। হিন্দীগ্রন্থে প্রথম যাত্রাকালে নামকরণটি হয় এবং রাজদত্ত নামটি তিনি সেই থেকে ব্যবহার আরম্ভ করেন ব'লে উল্লেখ থাকলেও আমরা দেখি স্বামীজী মাদ্রাজে 'সচ্চিদানন্দ' নামে ঘুরেছেন। মাদ্রাজ থিয়োজফিক্যাল সোসাইটির প্রেসিডেন্ট কর্নেল অলকট তাঁকে 'সচ্চিদানন্দ' রূপেই জানতেন। রাজদত্ত নামটি যে একবার ভালবেসে গ্রহণ ক'রে ছেড়ে দিয়েছেন ব'লে মনে হয় না। উপরন্তু অন্তরঙ্গ আলাসিঙ্গা তাঁকে 'সচ্চিদানন্দ' রূপেই জানতেন। আমরা আবার মাদ্রাজী অধ্যাপকের বিবরণে ফিরে যাই : "আমরা তখন তাঁর সঙ্গে বম্বেতে ছিলুম। আমরা বললুম, 'স্বামীজী! আপনি আমেরিকায় যাচ্ছেন, সেখানে সময়ের বড় মূল্য। তাই আপনার ঘড়ি থাকা বড় দরকার।' তিনি অবিলম্বে উত্তর দিলেন, 'বেশ ত, আমায় একটি কিনে দাও।' আপনার কতকগুলো Visiting Cardsও (দর্শনী পত্র) রাখা উচিত।' 'বেশ ত একশ ছাপিয়ে দাও।' তখন তিনি 'সচ্চিদানন্দ' রূপে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু যখন আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'কার্ডের উপর

রেজেস্ট্রী দলিলে 'রামকৃষ্ণ' নাম উল্লেখ করেছেন। তোতাপুরী তখনও আসেন নাই। বাংলায় একজনের কয়েকটা নামও থাকে।" (শ্রীম-দর্শন ৩।১৮০-৮১)

তৃতীয় মত : "ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র রামলাল বলিয়াছেন, তিনি ঠাকুরের নিকট শুনিয়াছেন যে, রাণী রাসমণির জামাতা মথুরবাবু তাঁহাকে ঐ নাম দেন। ইহা হইতে অনুমান করা যায়, খুব সম্ভবতঃ রামকুমার ও রামেশ্বরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া মথুরবাবু (জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদের সহিত মিল রাখিয়া) ঠাকুরের নাম রামকৃষ্ণ রাখিয়াছিলেন।" (যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ—শ্রীমানদাশংকর দাশগুপ্ত পৃঃ ৭০)

কি নাম দেব।' তিনি বললেন, 'স্বামী বিবেকানন্দ'। এই সময়েই সর্বপ্রথমে তিনি এই নাম গ্রহণ করেছিলেন।"

(উদ্বোধন, ৩৪।২)

কৌপীন-কমণ্ডলুধারী সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের সাজগোজ কেমন হয়েছিল তা ঐ প্রত্যক্ষদর্শী অধ্যাপকের বিবরণ থেকে পাই: "তিনি তাঁর ইউরোপীয় পোষাক বম্বেতে তৈরী করিয়েছিলেন। বাড়ীতে আনা হলে তিনি সেই পোষাকে সজ্জিত হলেন। এই পোষাকে তাঁকে বড়ই সুন্দর দেখা যাচ্ছিল, সারকুলার নোট নেবার জন্য আমরা কুকের বাড়ী গেলুম। সেখান হতে একটা নূতন ঘড়ি কিনতে গিয়েছিলুম। সারকুলার নোট ও গ্লাডস্টোন ব্যাগ সম্বন্ধে এই স্বামীজীর প্রথম অভিজ্ঞতা। নূতন পোষাকের পাজামাগুলো একটু লম্বা হয়েছিল এবং ময়লা হয়ে যাচ্ছিল। আমি এবং আরও কেহ এই বিষয়ে তাঁকে বলেছিলুম। তিনি অবশেষে বললেন, 'তোমরা বার বার আমাকে পাজামার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছ কেন? তারা আমাদের অসভ্য মনে করবে এই ত, তোমরা কি জান না, আমি এই পোষাকে সম্পূর্ণ অভ্যস্ত।"

স্বামীজী জাহাজে উঠলেন। বম্বে – ৩১শে মে ১৮৯৩। এই জাহাজের উপরের একটা সুন্দর ঘটনা উদ্বোধনের (৭ম বর্ষ, পৃঃ ৪৩৮-৩৯) পুরনো পাতায় লুকিয়ে রয়েছে: "বোম্বাই আসিয়া মুন্শিজী সমস্ত জিনিষপত্রের বন্দোবস্ত করিয়া দুই-চার দিন পরে স্বামীজীকে জাহাজে চড়াইয়া দিতে গেলেন। সঙ্গে স্থানীয় ভদ্রলোকও দুই এক জন গেলেন। স্বামীজী আপনার নির্দিষ্ট একটি ফার্স্ট' ক্লাস কেবিনে যাইয়া আপনার আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি জগমোহন কি প্রকার সাজাইয়াছেন দেখিয়া লইলেন। একজন শ্বেতাঙ্গ দ্বারে হাজির, স্বামীজীর পরিচর্যায় নিযুক্ত। আহারের জন্য ঘণ্টা বাজিল, সকলে আহার করিতে গেলেন। স্বামীজী বলিলেন, 'জগমোহন, আমরা যে যেমন লোক, তার সঙ্গে সেই প্রকার ব্যবহার করিনি, তাই ওরাও পেয়ে বসে; এই যে গোরাঙ্গটি দেখছ, এ আমার হুকুম শুনবে বলে হাজির। এখন সব গোরাঙ্গই এক রকম ঢোলের, কেহবা এসে এর সঙ্গে যেন মনিবের মত আপনি হুজুর করবে। তা নয়, ও গোলাম। গোলামের মত ওকে খাটিয়ে নিতে হবে, দাবে রাখতে হবে, রাসভারি হতে হবে; তোমরা রাস হাল্কা করে ফেল সেই হয় দোষ। তুমি দেখবে, আমি কেমন রাসভারি হয়ে ওকে দাবিয়ে নেবো, বাছাধন কেঁচ হয়ে থাকবে।'

"জাহাজের সকল শ্বেতাঙ্গ এক টেবিলে বসে ভোজন, তাহার মাঝখানে স্বামীজী সুন্দর গেরুয়া পরা, মাথায় পাগড়ী। জগমোহন ভাবিলেন, স্বামীজী যেন রাজশোভা ধারণ করে বসেছেন। আহারান্তে পুনরায় ঘণ্টা পড়িল। যাঁহারা বন্ধুগণকে বিদায় দিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা চলিয়া গেলেন। জগমোহন সকলের শেষে কাষ্ঠের সিঁড়ি দিয়া নামিলেন, অমনি জাহাজ খুলিয়া গেল।"

বিবেকানন্দের পৌঁছ-সংবাদে রয়েছে (পত্র, ২০।৮।৯৩): "একদিন সন্ধ্যায় পণ্ডিচেরীতে এক পণ্ডিতের সঙ্গে সমুদ্রযাত্রা সম্বন্ধে তর্কবিতর্ক হয়েছিল। তার সেই বিকট ভঙ্গী ও তার 'কদাপি ন' (কখন না)—এ কথা চিরকাল আমার স্মরণ থাকবে।" গণ্ডিভাঙ্গার পণ নিয়ে জন্মেছেন স্বামীজী। আমেরিকা থেকে ফিরে এসে তিনি শ্রীশ্রীমাকে যে কথাটি বলেন তা কতই না মর্মস্পর্শী! "মা, আপনার আশীর্বাদে এ-যুগে লাফিয়ে না গিয়ে তাদের তৈরী জাহাজে চড়ে সে মুল্লুকে গিয়েছি।" (মায়ের কথা, ২য় ভাগ পৃঃ ২০৪)।

এবার আমাদের সামনে তিনটি সমস্যা—জাহাজ, যাত্রী ও কোথায় কতদিন। আমাদের পূর্বোক্ত তিন জীবনীকারেরা এ ব্যাপরে বিশদভাবে কিছুই লেখেননি। স্বামীজীর সঙ্গে যাত্রা শুরু করবার পূর্বে একটা অপ্রকাশিত মূল্যবান দলিল পেশ করছি। দলিলটি পেয়েছি একটু রহস্যজনকভাবে। গত ৩১শে মার্চ ১৯৭ হলিউড থেকে আমেরিকার উত্তর পশ্চিমে সিয়্যাটেল শহরে ঠাকুরের উৎসবে বক্তৃতা দিতে যাই পূজনীয় স্বামী বিবিদিষানন্দজীর আমন্ত্রণে। তাঁর কাছে আমার একটা অনুরোধ ছিল আমাকে কানাডার বঙ্কুবরে নিয়ে যেতে হবে। সিয়্যাটেল থেকে বঙ্কুবর ১৪০ মাইল। সেখানে ঠাকুর-স্বামীজীর বেশ কিছু অনুরাগী ভক্ত আছেন। পূজনীয় মহারাজের সঙ্গে ২রা এপ্রিল সকালে বঙ্কুবরে রওনা হই এবং রাত ১২টায় ফিরে আসি। সেখানকার সাইমন ফ্রেজার (Simon Fraser) ইউনিভারসিটির জনৈক অধ্যাপক অনেক কষ্টে বঙ্কুবরের জেনারেল লাইব্রেরীর সংবাদপত্রের সংগ্রহশালার মাইক্রোফিল্ম থেকে দলিলটি ছাপিয়ে আমাকে দেন। দলিলটির প্রয়োজনীয় অংশ নীচে দেওয়া হল:

আমাদের পূর্বোক্ত তিন জীবনীতেই রয়েছে যে স্বামীজী পেনিনসুলার এণ্ড ওরিয়েণ্ট কোম্পানীর 'পেনিনসুলার' জাহাজে বম্বে থেকে যাত্রা করেন, অথচ উপরোক্ত দলিল সাক্ষ্য দিচ্ছে যে স্বামীজী বঙ্কুবরে অবতরণ করেন ক্যানেডিয়ান প্যাসিফিক রুটের জাহাজ 'এম্‌প্রেস অব্ ইণ্ডিয়া' থেকে। আশ্চর্য ব্যাপার। স্বামীজী তবে কোথায় জাহাজ পাল্টালেন? কোন জীবনীতে তার উত্তর নেই। স্বামীজীর ০ই জুলাই ১৮৯৩ এর চিঠিতে রয়েছে: "নাগাসাকি থেকে কোবি গেলাম। কোবি গিয়ে জাহাজ ছেড়ে দিলাম। স্থলপথে ইয়োকোহামায় এলাম—জাপানের মধ্যবর্তী প্রদেশসমূহ দেখবার জন্য। আমি জাপানের মধ্যপ্রদেশে তিনটি বড় বড় শহর দেখেছি। ওসাকা এখানে নানা শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত হয়; কিয়োটো—প্রাচীন রাজধানী; টোকিও—বর্তমান রাজধানী।" জীবনীকাররা এমনভাবে লিখেছেন যেন তিনি পুনরায় একই জাহাজে উঠলেন। যাহোক শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্তের শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী'তে (৩য় খণ্ড, পৃঃ) উল্লেখ আছে: "এই স্থানে স্বামীজী জাহাজ পরিবর্তন করিলেন।"

DAILY NEWS-ADVERTISER
VANCOUVER
WEDNESDAY, JULY 26, 1893

EMPRESS OF INDIA

The C P. R. Steamer Empress of India, Capt. Marshall, arrived at 7 o'clock last evening with a full of passenger and freight list The voyage over was quiet and uneventful, with fair weather, and the trip was made on schedule time. On Saturday evening last a ball was given aboard, at which a very enjoyable time was spent...She brought 267 Chinese and 98 Japanese in steerage.

The following is the list of saloon passengers: ...Mr. C. Lullobhoy, ...Mr. Tata and servant, ...Mr. S. Vivskanandra (sic).

জাহাজের কথা যখন চলছে তখন শেষ করা যাক। মেরী লুইস্ বার্কের 'নিউডিসকবারিস' গ্রন্থে আছে যে 'এম্‌প্রেস অব্ ইণ্ডিয়া' ছিল ৬০০০ টনের জাহাজ।

ইয়োকোহামা থেকে ১০ই জুলাই ১৮৯৩ তারিখে আলাসিঙ্গা প্রভৃতিকে লেখা স্বামীজীর দীর্ঘ ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ চিঠির সাহায্য সব জীবনীকাররাই নিয়েছেন। সুতরাং আমরা সেসব কথার আর পুনরাবৃত্তি করব না। তবুও একটা কথা বলে রাখতে চাই এই মূল চিঠিখানির কপি সম্প্রতি আমাদের কাছে এসেছে মেরী লুইস বার্কের সংগ্রহশালা থেকে। গত ২৪শে জুলাই লেক টাহোর বেদান্তকুটীরে ৪।৫ দিনের জন্য বেড়াতে গিছলাম। সেখানে মিসেস বার্কের সঙ্গে এই প্রবন্ধের আলোচনা করছিলাম। তিনি আমাকে দুটি মূল্যবান জিনিস দিয়ে সাহায্য করেছেন—(১) স্বামীজীর ১০ই জুলাই এর মূল চিঠির কপি ও (২) বঙ্কুবর থেকে চিকাগো যাবার টাইম টেবল। এটির উল্লেখ পরে ক'রব।

স্বামীজীর বাণী ও রচনাতে এই চিঠিখানির পূর্ণরূপ অনুবাদ হয়েছে অথচ স্বামীজীর ইংরাজী কমপ্লিট ওয়ার্কসে অনেক বাদ দেওয়া হয়েছে।

এবার আমরা শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্তের পূর্বোক্ত গ্রন্থ থেকে কিছু উদ্ধৃতি দিচ্ছি: "জাপান হইতে তিনি (স্বামীজী) খেতড়িরাজ অজিত সিংকে কয়েকখানি পত্র লিখিয়াছিলেন এবং তাহাতে জাপানের শিল্পকার্য ও জাতিগত উন্নতির বিষয় বিশদভাবে লিখিত ছিল। খেতড়ির রাজা অজিত সিং সেই সকল পত্র নিজের নিকট রাখিয়া দিয়া তাহার নকল করিয়া বর্তমান লেখককে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিতেন এবং সেই সকল পত্র পড়িয়া সকলে আনন্দিত হইতেন।" (ঐ পৃং ১-২)। এ সব পত্র জীবনীকার ও ঐতিহাসিকদের নিকট

এ-সব পত্রের কয়েক টুকরা উদ্ধৃতি ও পটভূমিকা মহেন্দ্রনাথ দিয়েছেন: "বোম্বাই ছাড়িয়া যাইবার পর ভারতবর্ষীয় ইংরাজেরা স্বামীজীর প্রতি একটু গম্ভীরভাব ধারণ করিয়াছিল। কিন্তু কলম্বো ও অন্যান্য বন্দর হইতে যে সকল ইংরাজ জাহাজে উঠিলেন তাঁহারা বেশ সহজ সরলভাবে স্বামীজীর সহিত নানা বিষয় কথাবার্তা কহিতে লাগিলেন। স্বামীজী রাজাসাহেবকে পত্রে লিখিয়াছিলেন, 'এ সকল ইংরাজ তাজা বিলাতী এ জন্য ইহারা ভারতবাসীকে অবজ্ঞা করে না।'"

আরও দুটি খবর: প্রথমটি স্বামীজীর পরিব্রাজক কালে পেটের অবস্থা খুব খারাপ ছিল; কিন্তু জাহাজে উঠে আস্তে আস্তে সেটি ভাল হয়ে যায়। দ্বিতীয়টি, "জাপান হইতে লেন্স কিনিয়া স্বামীজী রাজাসাহেবকে পাঠাইয়াছিলেন এবং লিখিলেন, 'টাকাটা ব্যাঙ্কের মারফৎ একেবারে আমেরিকায় চলে গিয়েছে, নচেৎ যদি টাকাটা আমার হাতে থাকত তা হলে জাপানের শিল্পকার্য ক্রয় করে দেশে ফিরে যেতাম, আমেরিকা যাবার সংকল্প একেবারে ত্যাগ করতাম।'"

(ঐ, পৃ: ৩)

বিবেকানন্দের ছাত্রসমাজ পূর্বোক্ত উক্তির উপর বিশেষ গুরুত্ব দেবেন না। কারণ তিনি শিকাগোয় চলেছেন আদেশ পেয়ে, আর মাঝ পথ থেকে কতকগুলো শিল্পপণ্য নিয়ে ফিরে আসবেন দেশে! তবে ঐ উক্তির সার্থকতা এখানে তাঁর আকাশজোড়া হৃদয় দুঃখী দেশবাসীর জন্য কাঁদত। যেখানে যা ভাল তা এনে দেশবাসীকে দিতে হবে—তাদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে। ১০ই জুলাই-এর পত্র এ সব কথায় ভরা।

এবার আমরা স্বামীজীর সহযাত্রীদের উপর আলোচনা করব। স্বামীজীর প্রথম পরিচিত সহযাত্রী ব্যারিস্টার ছবিলদাস। বোম্বাই-এ যার বাড়ীতে ১৮৯২ সালে প্রায় ২ মাস ছিলেন।

'যুগনায়ক' গ্রন্থে (৪২০-২১ পৃঃ) রয়েছেঃ "পরিচিত ব্যক্তিদের মধ্যে পার্শ্বে রহিলেন একমাত্র ব্যারিস্টার ছবিলদাস, যাঁহার গৃহে স্বামীজী পূর্বে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। ছবিলদাস *চলিয়াছেন নিজ কর্মব্যপদেশে; রাস্তায় নামিয়া* পড়িবেন।" ইংরাজী গ্রন্থে শুধু উল্লেখ আছে যে ছবিলদাস একই জাহাজে রওনা হলেন। এখন প্রশ্ন হল—তিনি কি রাস্তায় নেমে পড়লেন, না স্বামীজীর সঙ্গে আমেরিকা পর্যন্ত যান? যদি স্বামীজীর সঙ্গে আমেরিকায় যান তবে নিশ্চয়ই দ্বিতীয় জাহাজের (এম্‌প্রেস অব ইণ্ডিয়ার) সহযাত্রী ছিলেন না; কারণ ঐ জাহাজের প্রায় ১১০ জন সেলুন প্যাসেঞ্জারের তালিকা আমাদের কাছে আছে। তাতে ছবিলদাসের নাম নেই। অথচ স্বামীজী আলাসিঙ্গাকে চিকাগো থেকে ২রা নভেম্বর ১৮৯৩ লিখছেনঃ "আমার এক মুহূর্তের অবিশ্বাস ও দুর্বলতার জন্য তোমরা সকলে এত কষ্ট পেয়েছে, তার জন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত। যখন ছবিলদাস আমাকে ছেড়ে চলে গেল তখন নিজেকে এত অসহায় ও নিঃসম্বল বোধ করলাম যে নিরাশ হয়ে তোমাদের তার করেছিলাম।" এর দ্বারা মনে হয় ছবিলদাস আমেরিকায় স্বামীজীর সঙ্গে ছিলেন এবং মাঝ পথে স্বামীজীর মতো না থেমে সরাসরি গেছেন।

দ্বিতীয় যাত্রীর নাম পাই 'এম্‌প্রেস অব ইণ্ডিয়ার' তালিকায়—মিঃ সি লালুভাই। স্বামীজীর ২০শে আগস্ট ১৮৯৩ আলাসিঙ্গাকে লেখা পত্রঃ "লালুভাই বস্টন পর্যন্ত আমার সঙ্গে ছিলেন। তিনিও আমার প্রতি খুব সহৃদয় ব্যবহার করেছিলেন।" এই লালুভাইটি কে, আমাদের জানা নেই। আলাসিঙ্গা হয়ত বম্বেতে তাকে জেনে থাকবেন, নতুবা স্বামীজী তার কথা আলাসিঙ্গাকে কেন জানাতে যাবেন। 'পেনিনস্থলারে' সহযাত্রিরূপে তার কোথাও উল্লেখ নেই।

এখন তৃতীয় সহযাত্রী। 'এম্‌প্রেস অব ইণ্ডিয়া'র সেলুন তালিকায় উল্লেখ আছেঃ মিঃ *টাটা ও ভৃত্য; কিন্তু পেনিনস্থলারে টাটার* উল্লেখ নেই। মহেন্দ্রনাথ দ[illegible] গ্রন্থে (পৃঃ ২—৩) উল্লেখ আছেঃ "স্বর্গ[illegible] সেই জাহাজে ছিলেন। স্বামীজী পত্রে [illegible] ছিলেন যে তিনি টাটাকে বলিয়াছিলেন, 'জাপান থেকে দেশলাই নিয়ে গিয়ে বিক্রয় করে জাপানকে টাকা দিচ্ছ কেন? তুমি তো সামান্য কিছু দস্তুরী পাও মাত্র। এর চেয়ে দেশে দেশলাইয়ের কারখানা করলে তোমারও লাভ হবে, দশটা লোকেরও প্রতিপালন হবে এবং দেশের টাকা দেশে থাকবে।' সে সময় টাটার জাপানি দেশলাই একচেটিয়া ছিল।"

ইংরাজী জীবনী (৬২০ পৃঃ) এবং প্রমথবাবুর জীবনীতে (৮০২ পৃঃ) স্বামীজীকে লিখিত জামসেদজী টাটার পত্রে রয়েছেঃ "আমার বিশ্বাস, জাপান হইতে চিকাগো যাইবার পথে সহযাত্রিরূপে আমাকে আপনার মনে আছে।" এ চিঠির ঐতিহাসিক মূল্য প্রচুর। যাহোক আমরা বেশী দূর এগুবো না। স্বামীজী ঐ চিঠির কি উত্তর দিয়েছিলেন তা টাটার সংগ্রহশালায় খোঁজ করলে হয়ত পাওয়া যাবে।

এখন প্রশ্ন হলঃ টাটার সঙ্গে স্বামীজীর কোথায় দেখা হল? প্রথম, জাহাজে স্বীকৃত হ'লে টাটার নিজস্ব পত্রের সঙ্গে সংঘর্ষ হবে। অথচ মহেন্দ্রবাবুর গ্রন্থ মতে স্বামীজী ক্ষেত্রীর রাজাকে টাটার সঙ্গে তাঁর কথোপকথন জাপান থেকে পত্রে লেখেন। আমরা এর সামঞ্জস্য বিধানে দুটি মূল্যবান তথ্য পেশ করব। প্রথম, স্বামীজীর জাপান থেকে লেখা ১০ই জুলাইয়ের পত্রঃ "এদের দেশলাই-এর কারখানা একটা দেখবার জিনিস।

এদের যে কোন জিনিসের অভাব, তাই নিজের দেশে করবার চেষ্টা করছে।”

আমাদের দ্বিতীয় তথ্য নিবেদিতার ৩রা অক্টোবর ১৯০১ সালের লেখা পত্র : “Mr. Tata told me that when Swamiji was in Japan ever [illegible] :o saw him was immediat[illegible] [illegible]k by his likeness to Buddha. [illegible]dha Bharata. November, 1936).”

[illegible]ং “মিঃ টাটা আমাকে বলেছিলেন যে স্বামীজী যখন জাপানে ছিলেন তখন সকলে বুদ্ধের সঙ্গে তাঁর চেহারার সাদৃশ্য লক্ষ্য করে সঙ্গে সঙ্গে অভিভূত হয়ে যেত।”

এই দুই তথ্যের উপর নির্ভর করে আমরা বলতে পারি জাপানেই খুব সম্ভব দেশলাই-এর কারখানা পরিদর্শনকালে স্বামীজীর সঙ্গে টাটার সাক্ষাৎ হয়। আর একটা জিনিস লক্ষ্য করবার বিষয় : স্বামীজী আলাসিঙ্গা প্রভৃতিকে চিঠি লেখেন, ওরিয়েণ্টাল হোটেল, ইয়োকোহামা, ১০ই জুলাই তারিখে আর জাপান থেকে বঙ্কুবরের উদ্দেশ্যে জাহাজে উঠেন ১৪ই জুলাই (নিউ ডিসকবারিজ, পৃঃ ১৪)। এই ৩।৪ দিনের মধ্যে হয়ত স্বামীজী টাটার সঙ্গে কথোপকথনটি ক্ষেত্রীর রাজাকে পত্রে লিখে থাকবেন।

এবার বম্বে থেকে বঙ্কুবর যাত্রাকালে কোথায় কতদিন ছিলেন। ৩১শে মে বোম্বাই ত্যাগ। ১০ই জুলাইয়ের পত্রে আছে—এক সপ্তাহ লেগেছে সিংহলে পৌছাতে (৬ই জুন কলম্বো) এবং সেখানে ১ দিন ছিলেন। তারপর পেনাং, সিঙ্গাপুর ও হংকং। হংকং-এ ৩ দিন (ক্যাণ্টন সমেত)। তারপর হংকং থেকে নাগাসাকি এবং নাগাসাকিতে কয়েক ঘণ্টা থেকে শহর দেখে ঐ একই জাহাজে কোবি। কোবি থেকে স্থলপথে ওসাকা, কিয়োটো, টোকিও দেখে ইয়োকোহামা। এখান থেকে ১৪ই জুলাই রওনা দিয়ে ২৫শে জুলাই মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭টায় বঙ্কুবরে পৌছান।

আরও দুচারটে কথা আমাদের বলা হয়নি। আমাদের কাছে ‘এম্‌প্রেস অব ইণ্ডিয়া’ জাহাজের যে তালিকা রয়েছে তাতে দেখতে পাই সেলুন প্যাসেঞ্জারের মধ্যে স্বামীজীর নাম একদম শেষে এবং ঐ জাহাজে মোট লোকসংখ্যা ছিল প্রায় ৫০০। সেলুন প্যাসেঞ্জার প্রায় ১১০ (প্রায় এজন্য কয়েকটা নাম অনুমান করতে হয়েছে, অস্পষ্টতার জন্য পড়তে পারিনি); জাহাজের ক্যাপটেন, অফিসার, ডাক্তার ইত্যাদি ১১ জন; ২৬৭ জন চীনা ও ৯৮ জন জাপানী—এরা সব নীচের ক্লাসের যাত্রী।

স্বামীজীর পৌছু-সংবাদের চিঠিতে (২০।৮।৯৩) রয়েছে “প্রশান্ত মহাসগরের উত্তরাংশ দিয়া আমাকে যাইতে হইয়াছিল। খুব শীত ছিল। গরম কাপড়ের অভাবে বড় কষ্ট পাইতে হইয়াছিল।” স্বামীজী যখন বম্বে ছেড়েছেন তখন ভারতে গ্রীষ্মকাল, সুতরাং শীতবস্ত্র নেননি। শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত আমাদের একটা নূতন সংবাদ দিয়েছেন, “জাহাজের ক্যাপ্টেন স্বামীজীর কষ্ট বুঝিতে পারিয়া নিজের গরম ‘ক্লোক’ ইত্যাদি স্বামীজীকে পরাইয়া দিলেন।” (ঐ পৃঃ ২)

আমরা স্বামীজীকে বঙ্কুবরে পৌছে দিয়েছি। এখানেই আমাদের প্রবন্ধের ইতি হওয়ার কথা। কিন্তু ইতির পরেও থাকে পুনশ্চ। মিসেস বার্কের দারুণ কষ্টার্জিত স্বামীজীর চিকাগো যাবার টাইম টেবিলটি পাঠকদের উপহার দিচ্ছি :

SWAMIJI'S ROUTE FROM VANCOUVER TO CHICAGO

(Closest Possible Connections)

S. S. Empress of India	Ar.	Vancouver	7:00 p. m.	Tuesday July 25, 1893
Canadian Pacific Rly.	Lv.	Vancouver	10:45 a.m	Wed July 26, 1893
Canadian Pacific Rly.	Ar.	Winnipeg	10:30 p.m.	Friday July 28, 1893
Great Northern Rly.	Lv.	Winnipeg	1:00 p.m. 11:45 a.m.	Sat. July 29 (approx) Sat. July 29
Great Northern Rly.	Ar.	St. Paul	7:30 a.m. 7:05 a.m.	Sun. July 30 (approx) Sun. July 30
Great Western Rly.	Lv.	St. Paul	8:00 a.m.	Sun. (approx)
Great Western Rly.	Ar.	Chicago	10:30 p.m.	Sunday July 30, 1893 (Vide Chicago Tribune, September 1893)

"বেদান্ত সোসাইটি অব নর্দার্ন ক্যালিফর্নিয়ার সৌজন্যে"

ভারতে স্বামী বিবেকানন্দের প্রথম পত্র এসেছিল দারুণ বিপদবার্তা নিয়ে আর দ্বিতীয় পত্র এসেছিল বিজয়বার্তা নিয়ে: "যখন আমি 'আমেরিকাবাসী ভগিনী ও ভ্রাতৃবৃন্দ,' বলিয়া সভাকে সম্বোধন করিলাম, তখন দুই মিনিট ধরিয়া এমন করতালি-ধ্বনি হইতে লাগিল যে কানে যেন তালা ধরিয়া যায়। সেইদিন হইতে আমি একজন বিখ্যাত লোক হইয়া পড়িলাম, আর যে দিন হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে আমার বক্তৃতা পাঠ করিলাম, সেই দিন 'হলে' এত লোক হইয়াছিল যে, আর কখনও সেরূপ হয় নাই।"

অনেকে হয়তো মনে করতে পারেন যে 'চিকাগো ধর্মমহাসভা ও বিবেকানন্দ' ঢের শুনেছি—আর কি শুনব। এরূপ মনে করা ঠিক নয়, সম্প্রতি আমাদের কাছে এমন সব তথ্য এবং কলম্বিয়ান এক্সপজিশনের উপর এমন সব দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ এসেছে যা দেখলে তাজ্জব হয়ে যেতে হয়। পৃথিবীর সভ্যতায় মানবজাতির দান কোন্ শতাব্দীতে কত হয়েছে তা দেখাবার জন্য এই জগৎ-বিখ্যাত প্রদর্শনী এবং এতে উনবিংশ শতাব্দী প্রথম হয়েছে সর্বক্ষেত্রে। এর সঙ্গে ছিল আমেরিকা আবিষ্কারের ৪০০ বছরের পূর্তি-উৎসব।

আর একটা কথা বলে আমরা প্রবন্ধ শেষ ক'রব। প্রারম্ভে প্রথম পত্রে আমরা উল্লেখ করেছি যে, বিষাদের মধ্যে স্বামীজী লিখেছেন, "আমি ভগবানের আদেশ পেয়েছি"; আর দ্বিতীয় পত্রে বিজয়ের দিন স্বামীজী লিখলেন: "আমি দিন দিন অনুভব করছি—প্রভু আমার সঙ্গে সঙ্গে রয়েছেন এবং আমি তাঁর আদেশ অনুসরণ করার চেষ্টা করছি।"

আজকের সমাজতাত্ত্বিক বিচারে ধর্ম

শ্রীমতী সান্ত্বনা দাশগুপ্ত

বর্তমান সময়ে শিক্ষিত মহলে একটি ভ্রান্ত ধারণার অনুপ্রবেশ ঘটেছে। সেটি হল এই যে আজকের সমাজতাত্ত্বিক বিচারে ধর্ম একটি "অলীক দর্শন, প্রগতির পরিপন্থী ও শোষণের মাধ্যম।" দুঃখের বিষয় বৈজ্ঞানিক-মানসিকতা ও ইতিহাস-দৃষ্টি আছে বলে যাদের দাবী আজ সোচ্চার, তাদের মধ্যে অনেকেই আজ এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী। বস্তুতঃ বৈজ্ঞানিক মানসিকতা খুবই বিরল। প্রকৃতপক্ষে ধর্ম সম্বন্ধে উপরি-উক্ত সমাজতাত্ত্বিক বিচার বিগতকালের, আজকের সমাজতাত্ত্বিক বিচারের প্রবণতা বিপরীতমুখী। কিন্তু আমরা সে সম্বন্ধে অবহিত নই। সেজন্য বিগতকালের তত্ত্বসকলের পুনরাবৃত্তি করে চলেছি ক্রমাগত। এ মনোভাব আর যাই হোক প্রগতির পরিচায়ক নয়।

উনিশ শতকে জড়বিজ্ঞানের বিস্ময়কর আবিষ্কার-সমূহ জড়বাদ প্রতিষ্ঠা করেছিল, তারই প্রভাব পড়েছিল জ্ঞানরাজ্যের অন্যান্য শাখার উপর। সমাজবিজ্ঞানীরাও সাধারণভাবে এই প্রভাবের কবলিত হয়েছিলেন। সেজন্য উনিশ শতাব্দীর সমাজ-বিজ্ঞানের প্রবণতা জড়বাদের দিকে, তদনুরূপ বিচারসিদ্ধান্তসকলও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞান আরও অগ্রসর হয়ে গেল, পদার্থ-বিশ্লেষণের মাধ্যমে সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতর হতে হতে তার স্থূলত্ব হারিয়ে ফেলল, ফলে বিজ্ঞানের প্রবণতা দূর হল।[১] ফলে সমাজ-বিজ্ঞানীরাও জড়বাদের মোহ হতে মুক্তি পেলেন। ধর্ম সম্বন্ধে তাঁরা নূতন করে ভাবতে শুরু করলেন। আজকের সমাজবিজ্ঞানের সাধারণ সিদ্ধান্ত : ধর্ম অবৈজ্ঞানিক নয় এবং ইতিহাসে সে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে এসেছে। উনিশ শতকের শেষভাগে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন ধর্মও একটি বিজ্ঞান।[২] হালের সমাজ-বিজ্ঞানীদের বিচার-সিদ্ধান্ত এই মতেরই সমর্থন করে।

সমাজ-বিজ্ঞানীরা এ বিষয়ে তাঁদের বিচার ও বিশ্লেষণ দিয়েছেন প্রধানতঃ তিনটি দিক হতে। প্রথমতঃ তাঁরা ধর্মের মূলভিত্তি অনুসন্ধান করে দেখতে চেয়েছেন। দ্বিতীয়তঃ ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের কোন বিরোধিতা আছে কিনা তা বিচার করতে চেয়েছেন। তৃতীয়তঃ তাঁরা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করে দেখতে প্রয়াস পেয়েছেন ইতিহাসে ধর্মের সঠিক সামাজিক ভূমিকাটি।

উনিশ শতকে সমাজবিজ্ঞানীরা ধর্ম-চেতনার উৎস সন্ধানে প্রাচীন সাহিত্য-আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। প্রাচীন সাহিত্যের বিশ্লেষণ করে তাঁরা দেখতে চাইলেন যে ধর্মচেতনার মূলে রয়েছে বিশ্বপ্রকৃতি সম্বন্ধে অজ্ঞানতা। অনায়ত্ত প্রকৃতির শক্তির প্রচণ্ডতার সম্মুখে মানুষ অসহায় বোধ করেছে। ভীতিবিহ্বল চিত্তে সে তখন কল্পনা করেছে প্রকৃতির প্রতিটি শক্তির পশ্চাতে কোন অতিমানবিক সত্তা আছে। এর থেকে এসেছে

১ "It is now generally if rather vaguely admitted that the trend of socialistic thinking is away from materialistic atheism and toward a hypothesis which does not exclude the concept of a transcendent consciousness".—Christopher Isherwood (Vedanta for the Modern Man—p 13)

২ Necessity of Religion—Complete Works—Vol II

দেবদেবীর কল্পনা ও পূজার্চনা। এই সকল দেবদেবীর পূজার্চনা করে সে তাদের প্রসন্নতা অর্জন করতে চেয়েছে এবং তার দ্বারা আত্মরক্ষা করতে চেয়েছে প্রকৃতির প্রচণ্ড প্রকোপ হতে। এই সকল সমাজ-বিজ্ঞানীদের মতে বিজ্ঞানের প্রসারে পরবর্তী কালে বিশ্বপ্রকৃতির প্রকৃত রহস্য যখন ধরা পড়েছে, তখন প্রমাণিত হয়েছে যে, এই-সকল দেবদেবী অলীক। সুতরাং বিজ্ঞানের অগ্রগতি ধর্মকে ধ্বংস করেছে। বস্তুতঃ এঁদের মতে আজকের এই বৈজ্ঞানিক যুগে ধর্ম ও দর্শনের প্রয়োজন ফুরিয়েছে।[৩] প্রসঙ্গক্রমে এঁদের চিন্তার একটি অসঙ্গতি এখানে লক্ষ্য করা যেতে পারে। এঁরা একবার বলেছেন ধর্ম আদিম সমাজে উদ্ভুত, মানুষের অজ্ঞানতা থেকে তার জন্ম, জ্ঞানের প্রসারে তার অবসান; পুনরায় বলেছেন ধর্ম শ্রেণী-সমাজে উদ্ভুত, শ্রেণী-সমাজেরই সঙ্গে তা বিলীন হবে। কোনটি ঠিক?

ধর্মের উৎপত্তি সম্বন্ধে সমাজবিজ্ঞানীদের অপর একটি মত যা উনিশ শতকে জনপ্রিয় ছিল তা হল এই যে, মৃত্যুই ধর্মচেতনার উৎস। মৃত্যু মানুষের অমোঘ নিয়তি, মৃত্যু আমাদের জীবনে ছেদ ঘটায়, অস্তিত্বের অবসান করে, মৃত্যুর সামনে মানুষ অসহায়। সে মৃত্যুকে স্বীকার করতে চায় না, সেজন্য সে কল্পনা করে (ইচ্ছাপূরণের অভিপ্রায়ে) যে মৃত্যুর পর-পারেও তার আত্মার অস্তিত্ব অটুট থাকে। সুতরাং সে মৃতের উপাসনায় প্রবৃত্ত হল। মিশরের মমি-সংরক্ষণ-প্রয়াসের মধ্যে, আমাদের শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াকাণ্ডের মধ্যে তার সাক্ষ্য মিলবে। এখানেও লক্ষণীয় ধর্মচেতনার মূলে আছে ভীতির মনোবৃত্তি।

এ বিষয়ে অপর দুটি মত মনস্তত্ত্বভিত্তিক একটি মতানুসারে স্বপ্নাবস্থা সম্পর্কে অসম্পূর্ণ জ্ঞান হতে আমাদের ধর্মের ধারণাসকল এসেছে। নিদ্রাকালীন অবস্থায় দেহের বাহ্য ক্রিয়াকলাপ বন্ধ থাকলেও, আমাদের চৈতন্যে কোন ছেদ ঘটে না। এর থেকেই অনুমান করা হয়েছে যে, মৃত্যুর পর দেহবিযুক্তি ঘটলেও অস্তিত্বের নাশ হয় না। এর থেকে আত্মা অবিনশ্বর এই ধারণা এসেছে।

অপর অভিমতটি দিয়েছেন খ্যাতনামা মনস্তত্ত্ববিদ ফ্রয়েড। "The Future Of An Illusion" নামক গ্রন্থে তিনি দেখিয়েছেন ধর্ম অলীক দর্শন, মানুষের ইচ্ছাপূরণ ব্যতীত কিছুই নয়। সমাজ ও বাহ্য প্রকৃতি হতে মানুষ অনেক আঘাত পায়, কিন্তু এই শক্তিদ্বয় তার নিয়ন্ত্রণাধীন নয়, সেজন্য সে উৎকণ্ঠায় ভোগে। তার থেকে মুক্তি পায় সে ঈশ্বরের কল্পনার মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে। ঈশ্বর তার কাছে শৈশবের পিতার প্রতিভূ, যিনি শৈশবের অসহায়তার কালে তাকে এক স্নেহ-ভালবাসার পরিমণ্ডলে সুরক্ষার বোধ এনে দেন। সেজন্য ঈশ্বর করুণাময়, তাঁর কৃপা-করুণাই তার ভরসা। এখানেও দেখা যাচ্ছে ভীতির মনোবৃত্তিই মানুষের ধর্মচেতনার পশ্চাতে কাজ করছে।

উনিশ শতকের শেষভাগে স্বামী বিবেকানন্দ সমাজ-বিজ্ঞানীদের এইসকল ভিন্ন ভিন্ন মতের একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ নূতন ব্যাখ্যা দিলেন।[৪] তিনি বললেন যে, মানুষ মৃতেরই উপাসনা করুক আর প্রকৃতিরই উপাসনা করুক, আর স্বপ্নাবস্থা হতেই আত্মার অস্তিত্ব কল্পনা করুক—এসবের মধ্যে তার একটি প্রয়াসই পরিস্ফুট, সেটি হল ইন্দ্রিয়ের সীমাবদ্ধতা লঙ্ঘন করে যাবার দুঃসাহসিক প্রয়াস। সুতরাং মানুষের ধর্মচেতনার পশ্চাতে যে কেবল

৩ **Marx & Engles—On Religion**

৪ **The Necessity of Religion**

ভীতির মনোভাব নিহিত আছে—একথা ঠিক নয়। তিনিও প্রাচীন সাহিত্য বেদ আলোচনা করে দেখালেন যে ধর্মের জন্ম বলিষ্ঠ জীবনদৃষ্টি হতে, বিস্ময় আনন্দ ও পুলক হতে। সেখানে জীবনের আনন্দে পরিপূর্ণ, প্রকৃতির সৌন্দর্যে মুগ্ধ মানুষ প্রশ্ন করছে সৃষ্টিরহস্য সম্বন্ধে। তার চিত্তের উদ্বোধন যখন ঘটেছে বিস্ময়ের দ্বার দিয়ে তখন মননশীল মানুষ ইন্দ্রিয়ের সীমা অতিক্রম করে সে রহস্যের সমাধান পেয়েছে। ধর্মের ভিত্তিতে তার অজ্ঞানতা ও ভীতি নয়, আছে সাহস ও প্রবুদ্ধ জ্ঞান, আছে মননশীলতা।

(স্বামী বিবেকানন্দ—'পুনর্জন্ম')

এই আলোচনা শেষে বিবেকানন্দ অভিমত দিলেন ধর্মও একটি বিজ্ঞান। বাহ্য জগৎকে জানবার প্রয়াস হতে প্রকৃতি-বিজ্ঞানের জন্ম, অন্তর্জগৎকে জানবার প্রয়াস হতে জন্ম ধর্মবিজ্ঞানের। সুতরাং একই বিশ্বসৃষ্টিকে জানবার দুটি বিভিন্ন প্রয়াস হল—বিজ্ঞান ও ধর্ম। উভয়ের পদ্ধতিও এক—প্রত্যক্ষ জ্ঞান, যুক্তি-বিচার ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা। তাঁর মতে ধর্মের মূল কথা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি, বাস্তবে জানা ("Religion is realisation.")। মন্দির, বিগ্রহ, শাস্ত্র, পূজার্চনা, বিধিনিয়ম এসকলই ধর্মের বহিরঙ্গ বস্তু, এ সকলই ধর্ম নয়।

অত্যাধুনিক সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে অনেকে ধর্মের এই সংজ্ঞাটিই গ্রহণ করেছেন। Ogburn ও Nuinkoff এ সম্বন্ধে বলছেন৫—"ধর্মের উৎপত্তি সম্বন্ধে [আজ] যেসকল জাতিতত্ত্ববিদ গবেষণা করেছেন এবং আধুনিক ধর্মতত্ত্ববিদ—এ উভয়েই বলছেন ধর্মের ভিত্তি বাস্তব ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা।" সুতরাং ধর্ম নিছক কল্পনাবিলাস, ইচ্ছাপূরণ—এ অভিমত একেবারে হালের সমাজবিজ্ঞানীদের নয়। ঐসকল সিদ্ধান্ত বিগত শতাব্দীর যখন বিজ্ঞান আজকের তুলনায় অনেক পিছিয়ে ছিল।

সমাজ-বিজ্ঞানীদের সঙ্গে আজ প্রকৃতি-বিজ্ঞানীরাও একমত। প্রকৃতি-বিজ্ঞানীরা আজ আর বলছেন না যে, ধর্ম অবৈজ্ঞানিক। বরঞ্চ বিপরীত অভিমতই অনেকে প্রকাশ করেছেন। নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত (১৯৬৪) পদার্থ-বিজ্ঞানী চার্লস টাউনসের একটি প্রাঞ্জল সমীক্ষা এ বিষয়ে প্রভূত আলোকসম্পাত করেছে। এই সমীক্ষায় তাঁর মূল বক্তব্যের সারাংশ নিম্নোক্ত রূপ :

১। ধর্ম ও বিজ্ঞানের লক্ষ্য প্রায় এক—ধর্ম সৃষ্টিরহস্যের সমাধান চায়, বিজ্ঞান চায় বিশ্ববিধানকে জানতে—এ দুটি লক্ষ্যের মধ্যে পার্থক্য নেই বললেই চলে।

২। সাধারণের বিশ্বাস ধর্মের ভিত্তিতে আছে কেবলমাত্র বিশ্বাস, আর বিজ্ঞানের ভিত্তিতে আছে কেবলমাত্র যুক্তিপ্রমাণ। কিন্তু এ ধারণা ভুল। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও আছে বিশ্বাসের মস্ত বড় স্থান। একটি স্থির বিশ্বাস নিয়ে অগ্রসর না হলে কোন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সম্ভব নয়। বেশীর ভাগ বৈজ্ঞানিক অবিষ্কার, যুক্তিবিচারের পথে লাভ হয়নি, হয়েছে হঠাৎ আলোকোদয়ের (revelation) পথে, যে পথে অধিকাংশ ধর্মীয় আবিষ্কার ঘটেছে ঠিক সেই পথেই।

৩। ধর্ম ও বিজ্ঞানের জ্ঞানলাভের পদ্ধতি পৃথক নয়, বরঞ্চ এক ও অভিন্ন। এই পদ্ধতির প্রথম ধাপ প্রত্যক্ষ দর্শন বা উপলব্ধি, দ্বিতীয় ধাপ যুক্তি-বিচার, শেষ ধাপ পরীক্ষা-নিরীক্ষা

৫ Ogburn and Nimkoff—Handbook of Sociology, P 327

"That the essence of religion is religious experience is claimed by the ethnologists studying primitive religion and modern theologists."

(Experiment and observation)। ঠিক এই তিনটি ধাপ অতিক্রম করে বিজ্ঞানী তাঁর সিদ্ধান্ত দেন, ধর্ম-সাধকও ঠিক তাই করেন। বিজ্ঞানীও শুরু করেন কতকগুলি প্রত্যক্ষ সত্য নিয়ে—সে-কথা আমরা মনে রাখি না।

৪। পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যাপারে অবশ্য বিজ্ঞানের কাজ অনেক সহজ, কারণ পরিবেশটি তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন। কিন্তু ধর্মের ক্ষেত্রে তা নয়। যে বিজ্ঞানের পরীক্ষা-কেন্দ্র মানুষের জীবনের মধ্যে, সেখানেই পরীক্ষার পরিবেশ নিয়ন্ত্রণাধীন নয়। সমাজ-বিজ্ঞানও এই অসুবিধার সম্মুখীন। এ সকল ক্ষেত্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষা কঠিন কাজ, কিন্তু অসম্ভব নয়। আশ্চর্য একই অসুবিধার সম্মুখীন সমাজ-বিজ্ঞানকে আমরা বিজ্ঞান বলে স্বীকার করি, কিন্তু ধর্ম-বিজ্ঞানকে নয়! নানা দেশে কালে বহু মানুষের জীবনে ধর্মীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা একই অভিজ্ঞতা এনে দিয়েছে। ধর্মীয় আবিষ্কারের সত্যতা বা সিদ্ধি (validity) এইখানে।

৫। এ প্রসঙ্গে চার্লস টাউনস আরও বলেছেন ধর্ম প্রমাণ-সিদ্ধ নয় আর বিজ্ঞান প্রমাণ-সিদ্ধ—এই ভ্রান্ত ধারণার উৎপত্তির মূলে আছে ধর্ম ও বিজ্ঞানের পৃথক পরিভাষা।[৬] বিজ্ঞানের ভাষায় যা পরীক্ষা-নিরীক্ষা [Experiment and observation] ধর্মের ভাষায় তা হ'ল সাধনা। ধর্মের ক্ষেত্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষা আবহমান কাল ধরেই হয়ে আসছে, এরই ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন সাধনপদ্ধতি, প্রতি যুগেই সেগুলি পুনঃ-পরীক্ষিত হয়ে আসছে বহু সাধকের জীবনে। এই যুগে এই সেদিনও এইগুলি পরীক্ষা করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। সুতরাং চার্লস টাউনস যা বলেছেন তা সর্বাংশে সত্য। অর্থাৎ ধর্মবিজ্ঞানও পরীক্ষা-নিরীক্ষা, যুক্তি-বিচার ও প্রমাণ-সিদ্ধির উপর দণ্ডায়মান।

আলোচ্য বিষয়ে সমাজতত্ত্ববিদ্ সোরোকিনের অবদান অনেক। তাঁর বিচারসিদ্ধান্ত সেজন্য এখানে বিশেষ বিচার্য। তিনি একটি সাম্প্রতিক সমীক্ষায়[৭] দেখিয়েছেন কিভাবে আজকের বিজ্ঞান জড়বাদ হতে দূরে সরে এসেছে। তিনি পদার্থ-বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তসমূহ বিচার করে দেখাতে চেয়েছেন সে আজ পদার্থ-বিশ্লেষণের মাধ্যমে সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতর হতে হতে তার স্থূলত্ব হারিয়ে ফেলেছে। আজ সেজন্য বিশ্বের মূলীভূত সত্য (Reality) বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে আর জড়-পদার্থ নয়, সত্য হল আমাদের চিন্তা দ্বারা উৎক্ষেপিত চৈতন্যপ্রবাহ ("Waves of consciousness which our thoughts project afar.")। তাঁর মতে আজকের Electronic Theory, Quantum Mechanics, হেসেনবার্গ-প্রচারিত অনির্দেশ্যবাদ প্রভৃতি পূর্ববর্তী কালের জড়বাদের মূলভিত্তিসমূহ ধ্বংস করেছে। সুতরাং আজ বিজ্ঞানের প্রবণতা জড়বাদ-বিরোধী।

বিশ্বের মূলীভূত সত্য জড়পদার্থ নয়, চৈতন্য-প্রবাহ—একথা বহুকাল পূর্বে বেদান্ত বলেছিল। আজ বিজ্ঞান বেদান্তের পরিভাষায় কথা বলছে। ১৮৯৩ সালে স্বামী বিবেকানন্দ এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন[৮] যে, সেইদিন আসছে যেদিন বিজ্ঞান জড়পদার্থের মাধ্যমে কথা না ব'লে বেদান্তোক্ত চৈতন্যের পরিভাষার কথা বলবে। আজ সেই ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হয়ে উঠেছে। সোরোকিনের অভিমতের মধ্যে তার সুস্পষ্ট প্রমাণ মিলছে।

৬ Charles Townes—"The Confluence of Science and Religion"
৭ The Three Basic Trends of Our Time
৮ Paper on Hinduism—Complete Works—Vol I

সোরোকিন উপরোক্ত সমীক্ষায় আরও দেখিয়েছেন যে, বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে বিশ্বের মূলীভূত সত্য আর জড়পদার্থ নয় ব'লে আজ ইন্দ্রিয়ের সাক্ষ্য-প্রমাণের গুরুত্বও কমে গিয়েছে। আজকের বিজ্ঞানে জ্ঞানের তিনটি পন্থা স্বীকৃত—ইন্দ্রিয়সমূহ, যুক্তি-বিচার আর অতীন্দ্রিয় ও যুক্তি-অতিক্রান্ত-বোধি (Sensory, rational, super-sensory and super-rational ")। এই শেষোক্ত পদ্ধতিটির কথা এতকাল কেবল ধর্মই বলে এসেছে। আজকের বিজ্ঞান যে একে স্বীকৃতি দিয়েছে তা চার্লস টাউনসের পূর্বোক্ত আলোচনায়ও আমরা দেখেছি।

আজকের মনোবিজ্ঞানেও যে অগ্রগতি ঘটেছে তার ফলে জড়বাদ-ভিত্তিক আচরণবাদ (Behaviourism) আজ পরিত্যক্ত। আজকের মনোবিজ্ঞানের মতে মানুষ আর কতগুলি সহজাত-প্রবৃত্তির সমষ্টিমাত্র নয়, স্বাধীন ইচ্ছা ও স্বাধীন বিচারশক্তিসম্পন্ন একটি জীব। (Sorokin—"The Three Basic Trends of our Time")

সর্বক্ষেত্রে বিজ্ঞানের এই অগ্রগতি জড়বাদের ভিত্তিকে ভেঙ্গে দিয়েছে। সমাজ-বিজ্ঞানীরা সেজন্য আজ ধর্মকে এক নূতন দৃষ্টিতে দেখছেন আজকের সমাজ-বিজ্ঞানীরা মনে করছেন যে, ধর্মকে বিচার করতে হলে ধর্মীয় অভিজ্ঞতা যা সকল ধর্মের মূলে নিহিত সেগুলি বিচার করতে হবে। পূজার্চনাবিধি, শাস্ত্র, মন্দির, পুরোহিত—এ সকল ধর্মের বহিরঙ্গ। এগুলি যাদের জীবনে অর্থবহ তাদের জীবনকে বাদ দিয়ে এগুলির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে ভুল বিচার অনিবার্য। এই প্রসঙ্গে Ninian Smart বলেছেন[১]—"ধর্মকে একটি বিজ্ঞান হিসাবে অনুশীলন করা যায়, ধর্মানুভূতিকে বৈজ্ঞানিক নিরাসক্তি সহকারে নিরীক্ষা করলে এটি সম্ভব। ঈশ্বর বা আত্মা বা নির্বাণের বাসনা —যার দ্বারাই হোক না কেন ধর্মপথে চালিত হয়ে ইন্দ্রিয়ের সীমা মানুষ অতিক্রম করেছে—এটি বাস্তব সত্য। Ninian Smart একথা বলেছেন পৃথিবীর যাবতীয় ধর্মীয় অভিজ্ঞতা বিচার করে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, আমরা যখন ধর্মের বহিরঙ্গ হতে ধর্মীয় অভিজ্ঞতার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করছি তখনই ধর্ম সম্বন্ধে সত্য মূল্যায়ন করতে পারছি – ধর্ম তখনই আমাদের নিকট একটি বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞান (কেবলমাত্র আদর্শবাদ বা Idealism নয় রূপে প্রতিভাত হচ্ছে।

সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে কেউ কেউ আজ ধর্মসাধকদের জীবনের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করায় আরও একটি উপকার হয়েছে—একটি অতি প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণা দূরীভূত হয়েছে। সেটি হল এই যে, ধর্ম হল একটি বিশেষ সমাজের অঙ্গ - শ্রেণীসমাজে তার উদ্ভব ও স্থিতি, পুনরায় শ্রেণী-সমাজের বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই ধর্মেরও বিলুপ্তি ঘটবে। Ninian Smart দেখিয়েছেন—ধর্ম মানুষের সত্তার অঙ্গ("Religion is intrinsic to man."), এটি কোন বিশেষ সমাজ-ব্যবস্থায় উৎপাদিত বস্তু (Social product) নয়। এ প্রসঙ্গে Smart উক্তি করেছেন—"এ কথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত যে, মানুষ যোগশাস্ত্র বা বৌদ্ধ অতীন্দ্রিয়-বাদে যার কথা বলা হয়েছে সেই শান্তি বাস্তবে লাভ করতে পারে। অতীতেও মানুষের এ ক্ষমতা ছিল, আজও তা আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। তবে ভবিষ্যতে মানুষ এ ক্ষমতা আর প্রয়োগ করবে কি না সে কথা পৃথক।"

Ninian Smart আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। সেটি হল এই যে, মানবেতিহাসে ধর্ম একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে

১ The Religious Experience of Mankind

আছে, একে বাদ দিয়ে মানুষের ইতিহাস বোঝা যায় না। ইতিহাস বিশ্লেষণ করেও তিনি একই সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, ধর্ম একটি বিশেষ সমাজের অঙ্গ নয়, প্রাগৈতিহাসিক অন্ধকারময় যুগেও দেখা যায় ধর্ম মানুষের একটি অপ্রতিরোধ্য প্রেরণা। মননশীল মানুষ আদিকাল থেকেই ইন্দ্রিয়ের সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে সৃষ্টি-রহস্যের মূলে উপনীত হবার চেষ্টা করেছে।

উপরে আমরা দেখলাম যে, আজকের সমাজ-বিজ্ঞানীদের অভিমত—ধর্মকে বিচার করতে হলে ধর্মীয় অভিজ্ঞতার বিচার করতে হবে। এবং সেজন্য ধর্মসাধকদের জীবনে সন্ধান ও অনুসন্ধান চালাতে হবে। আমাদের বিস্ময় বোধ হয় যে, বিগত যুগের জড়বাদী সমাজতত্ত্ববিদেরা বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, মহম্মদ, কৃষ্ণ প্রভৃতি মহান ধর্মাচার্যদের জীবন এড়িয়ে গিয়েছেন এবং কেবলমাত্র ধর্মের বহিরঙ্গে তাঁদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন। এঁদের রীতি অনুসরণ করে ভারতীয় ধর্মকে বিচার বিশ্লেষণ করবার একটি প্রয়াস আজ আমাদের মধ্যে এসেছে। সে আলোচনায়[১০] বৃহস্পতি, জাবালি, চার্বাক প্রভৃতি নাস্তিক দার্শনিকদেরই একমাত্র প্রাচীন ভারতের প্রতিনিধিমূলক চিন্তানায়ক বলে ধরা হয়। যাঁরা এ ধরনের আলোচনায় ব্যাপৃত তাঁরা দিকপাল ধর্মনায়কদের সম্বন্ধে একেবারে নীরব। বুদ্ধ নানক, চৈতন্য, রামানুজ, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ—এঁরা সকলই তো ঐতিহাসিক চরিত্র। এঁদের সাধনা, অভিজ্ঞতা, প্রামাণ্য উক্তি, কর্মধারা—এ সকল বাদ দিয়ে কি করে ধর্ম সম্বন্ধে কোন বিচার দেওয়া যায়? এগুলি বাদ দিয়ে যে বিচার-সিদ্ধান্ত, সেগুলি কি করে তথ্যভিত্তিক, যুক্তিভিত্তিক ও বৈজ্ঞানিক বলে বিবেচিত হতে পারে?

এ প্রসঙ্গে সুপ্রসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানী উইলিয়াম জেম্‌সের বক্তব্যও[১১] বিচার্য। জেম্‌স পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বহু বিভিন্ন ধর্মসাধকদের বিচিত্র অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে সন্ধান এবং অনুসন্ধান চালিয়ে পরিশেষে সিদ্ধান্ত দিলেন:

(১) আমরা আমাদের অস্তিত্বের যেটুকু প্রত্যক্ষ করছি দেহের মধ্যে অবস্থিত, তার চেয়েও অধিক অস্তিত্ব আমাদের রয়েছে। সেই দেহাতীত অস্তিত্বও অনস্বীকার্য। এই দেহাতীত অস্তিত্ব অদৃশ্য বলে অলীক নয়। কারণ দৃশ্য জগতের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ যত ঘনিষ্ঠ, অদৃশ্যের সঙ্গে তার চেয়ে কিছু কম ঘনিষ্ঠ নয়। এই অদৃশ্য অস্তিত্ব আমাদের জীবনকে প্রতিনিয়ত প্রভাবিত করছে।

(২) ধর্মের শেষ লক্ষ্য ঈশ্বর নয়, জীবন আরও জীবন, আরও দীর্ঘতর, ঐশ্বর্যময়, সুখ-শান্তিপূর্ণ জীবন। ধর্মজীবন প্রেম হতে উদ্ভূত, জীবনের অস্বীকার নয়।

(৩) সেজন্য ধর্মই মানুষের ভাগ্যনিয়ন্তা এবং নিত্যসত্যের সঙ্গে যুক্ত বলে মানুষের ইতিহাসে চিরকালই তার অত্যাবশ্যকীয় একটি ভূমিকা থাকবে।

ইতিহাসে ধর্মের কোন্ ভূমিকাটি দেখা গিয়েছে—এ প্রশ্নটি এখানে এসে পড়ছে। যাঁরা বলতে চেষ্টা করেছেন যে, ধর্ম হল একটি অলীক দর্শন, অবৈজ্ঞানিক এবং শ্রেণী-সমাজের ফল-শ্রুতিস্বরূপ তাঁরা এও প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন তাঁদের ইতিহাস-বিচারের দ্বারা যে—

(১) ধর্ম প্রগতিপরিপন্থী, (২) ধর্ম রাজ-

১০ দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে—"ধর্ম ও প্রগতি" শীর্ষক আলোচনা—দেশ, ১লা বৈশাখ, ১৩৮০: লেখক—জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায়

১১ William James—The Varieties of Religious Experience

নৈতিক চেতনা জাগ্রত হতে দেয় না, (৩) আর্থিক উন্নতির পথে ধর্ম শ্রম ও মূলধনসঞ্চরণে বাধার সৃষ্টি করে, (৪) ধর্ম সমুদ্র-পরিমাণ রক্তপাত ঘটিয়েছে।

সন্দেহ নাই, ইতিহাসে ধর্মের নামে অনেক শোষণ, অনেক রক্তপাত ঘটতে দেখা গিয়েছে। কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে এ সকল ঘটেছে ধর্মের নামে, ধর্মের দ্বারা নয়। এগুলি ধর্মের পরিণাম নয়, অধর্মের পরিণাম। এগুলি যারা ঘটিয়েছে তারা পুরোহিত-তন্ত্রের নায়ক। পুরোহিত-তন্ত্রের স্বরূপ সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন—"এটি হল ধর্মের নামে বিশেষ সুবিধাতন্ত্র, এটি নিষ্ঠুর ও হৃদয়হীন। এর প্রাদুর্ভাব যখন ঘটে তখন ধর্মের অবনতি ঘটে।"[১২] অর্থাৎ পুরোহিত-তন্ত্র হল ধর্মের অভাব। ধর্মের অভাব বা অধর্ম যা ঘটিয়েছে তার জন্য ধর্মকে দায়ী করা কি যুক্তি-সঙ্গত? ঊনবিংশ শতাব্দীর জড়বাদী সমাজবিজ্ঞানীরা পুরোহিত-তন্ত্র ও ধর্মকে এক ও অভিন্ন মনে করে এক বিরাট বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে গিয়েছেন যা সমাজের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকারক। আজও সেই বিভ্রান্তি আমাদের যুব-মানসে অনুপ্রবেশ করিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এবং আমাদের সমাজে আজ তার বিষক্রিয়া সর্বনাশের আকার ধারণ করছে।

অথচ এইসকল সমাজবিজ্ঞানীরা পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস আলোচনা করেননি। তা যদি করতেন তাহ'লে দেখতে পেতেন প্রকৃত ধর্মনায়কদের সঙ্গে পুরোহিততন্ত্রের নিদারুণ সঙ্ঘর্ষ। বুদ্ধ, নানক, চৈতন্য, খ্রীষ্ট, এমনকি আধুনিককালে বিবেকানন্দকে পুরোহিতদের সঙ্গে কঠোর সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হয়েছে। ধর্মনায়কদের জীবন এদের হিসাবের বাইরে রাখাতে এই ভ্রান্তি ঘটেছে।

আর ধর্মের নামে যে রক্তপাত ঘটেছে তা কি সমাজতন্ত্রের নামে যে রক্তপাত ঘটেছে তার চেয়েও বেশী? রক্তপাতের জন্য কি সমাজতন্ত্র পরিত্যক্ত হোক একথা কেউ বলতে পারেন? পারেন না। তাহলে ধর্মের নামে যারা অধর্মাচরণ করেছেন, তাদের সেই কৃতকর্মের দায় ধর্মের ঘাড়ে চাপিয়ে ধর্মকে কেন পরিত্যাজ্য বলা হবে?

প্রকৃত ধর্ম অনুদার নয়, সাম্প্রদায়িকতা বা ভেদবৈষম্যের স্থান তাতে নেই। সকল ধর্মের মূলকথা—'প্রতি জীবে ব্রহ্ম আছেন, প্রত্যেকেরই বড় হবার এবং মহান হবার অনন্ত সম্ভাবনা আছে'। এই মূলকথাটি বিভিন্ন ভাষায় বলা হয়েছে। কিন্তু এই উদার সাম্যভাব সকল ধর্মের সারসত্য। বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, কৃষ্ণ, রামানুজ, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ প্রভৃতি যাবতীয় ধর্মনায়কদের বাণী ও কর্মধারা বিশদ আলোচনা করলে এ সত্য সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয়।

ভারতের ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ধর্মনায়কেরা যে-ধর্মপ্লাবন এনেছেন তার পরিণামে এসেছে এক সমাজ-বিপ্লব, সমাজে অধিকতর সাম্য তার ফলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই ইতিহাস অতি সুন্দরভাবে স্বামী বিবেকানন্দ উদ্ঘাটিত করেছেন তাঁর দুখানি পুস্তকে—('বর্তমান ভারত' ও 'ভারতের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ')। প্রশ্ন করা যেতে পারে—তবে কেন অসাম্য আজও নির্মূল হয়নি? এর উত্তরে বলতে হয় সাম্য আজও পর্যন্ত কোথায়ও কি স্থাপিত হয়েছে? এ বিষয়ে দ্বিমত আছে। বস্তুতঃ বিশেষ সুবিধার দাবীর বীজ মানুষের প্রকৃতির মধ্যে এমনভাবে আছে যে, তা বারবার মাথা চাড়া দেয়। সাম্য-অসাম্যের সংগ্রাম তাই চিরদিনের, বারবার সাম্য-স্থাপকদের সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হয়, ভারতে সেজন্য বারবার ধর্মনায়কেরা এসেছেন ধর্মসংস্থাপনের জন্য এবং সাম্যস্থাপনের জন্য। ভারতের

১২ **Vedanta and Privileges—Complete Works Vol I**

এই ইতিহাস নিঃসন্দেহে প্রমাণিত করছে যে, পূর্বোক্ত সমালোচকরা ইতিহাসে ধর্মের ভূমিকা সম্বন্ধে ভুল বিচার দিয়েছেন।

ধর্ম প্রগতিবিরোধী—এই সমালোচনার উদ্ভবও একই ভ্রান্তিসূত্র হ'তে – ধর্ম ও পৌরোহিত্য এক, এই ধারণা হ'তে। বিজ্ঞানী গ্যালিলিওর উপর যে অত্যাচার হয়েছিল (সে ঘটনাকে সমালোচকেরা এ বিষয়ে প্রমাণস্বরূপ উল্লেখ করেন) তা হয়েছিল পুরোহিতদের দ্বারা, প্রকৃত ধর্মনায়কদের দ্বারা নয়। উনবিংশ শতাব্দীর ভারতে স্বামী বিবেকানন্দ তো বিজ্ঞানকে দুহাত বাড়িয়ে গ্রহণ করেছেন তাঁর শিষ্যা ও মানসকন্যা নিবেদিতা ভারতে বিজ্ঞান-সাধনার প্রসারের জন্য আত্মনিবেদন করেন। এগুলিও ঐতিহাসিক ঘটনা।

ধর্মীয় প্রভাব রাজনৈতিক স্ফুরণে বাধাস্বরূপ—এ অভিযোগই কি সত্য? এ অভিযোগ যে সত্য নয় তার প্রমাণ সমকালীন ইতিহাসে আছে। ভারতেই তার প্রমাণ মিলবে। উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের কালে ভারতে ধর্মজীবনে এক নূতন প্রাণের জোয়ার এসেছিল, আর তখনই ভারতের ইতিহাসে সবচেয়ে বিস্ময়কর, সবচেয়ে গৌরবময় রাজনৈতিক চেতনার স্ফুরণ ঘটে। এই রাজনৈতিক চেতনা প্রধানতঃ যে দুজনের প্রভাবে এসেছিল তাঁরা দুজনেই ধর্ম-নায়ক—স্বামী বিবেকানন্দ ও ঋষি অরবিন্দ। এত নিকটকালের ইতিহাস দৃষ্টি-বহির্ভূত থেকে যায়, এটাই আশ্চর্যের কথা।

পরিশেষে, ধর্ম ধন ও শ্রম সঞ্চরণের বাধা সৃষ্টি ক'রে আর্থিক উন্নতির পথে বাধা সৃষ্টি করে—এও একটি ভ্রান্ত ধারণা। প্রমাণস্বরূপ দেখা যায় যে, উদার প্রোটেস্টাণ্ট ধর্মের প্রাদুর্ভাবের কালে পাশ্চাত্যে শিল্পবিপ্লব ঘটেছিল। তৎপূর্বে সঙ্কীর্ণ পুরোহিততন্ত্রের আধিপত্যের কালেই ধন ও শ্রম সঞ্চরণের বাধা সৃষ্টি ঘটেছিল। ভারতেও পৌরোহিত্যের প্রাধান্যের কালে তাই-ই ঘটেছে। তাছাড়া ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামো এর জন্য কিছুটা দায়ী ছিল, স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম-সমাজ ও বৃত্তিগত কর্মবিভাগ (অর্থাৎ জাতিভেদ) যেখানে বর্তমান সেখানে শ্রম ও মূলধনের বিশেষ সঞ্চরণের কোন প্রয়োজনই নেই। তাছাড়া শ্রম ও মূলধন সঞ্চরণ আরও অনেক জিনিসের উপর নির্ভর করে। ভারতের মুসলমান আমলের শেষভাগে এবং বৃটিশ আমলের প্রথমদিকে যোগাযোগ-ব্যবস্থার যে অবনতি ঘটেছিল শ্রম ও মূলধন সঞ্চরণে তাই-ই প্রধান বাধার সৃষ্টি করেছিল। আর কৃষিনির্ভর সমাজে জমির প্রতি আকর্ষণ স্বাভাবিক, তাও শ্রম ও অর্থ সঞ্চরণে বাধার অন্যতম কারণ ছিল। সুতরাং ভারতে শ্রম ও অর্থ সঞ্চরণে স্থাণুত্বের জন্য ধর্ম কিরূপে দায়ী হয়? উনবিংশ শতাব্দীতে আর্থিক উন্নতি, দারিদ্র্যমোচনের জন্য সক্রিয়-ভাবে প্রচার ও কর্মপ্রয়াস করেছেন রামমোহন, বিবেকানন্দ প্রভৃতি। এ অবস্থায় ধর্ম আর্থিক প্রগতিতে বাধা সৃষ্টি করে এ সিদ্ধান্ত দাঁড়ায় কি?

ধর্মের ধাতুগত অর্থে ধর্ম মানুষকে, তার সমাজকে ধারণ করে, সমাজের শৃঙ্খলা ঐক্য ও সংহতি রক্ষা করে। কিন্তু পূর্বোক্ত সমালোচকেরা বলেন, যদি এ বিষয়ে অতীতের সমাজে ধর্মের কোন প্রয়োজনীয় ভূমিকা থেকেও থাকে আজ আর তা নেই। আজকের সমাজে শৃঙ্খলারক্ষার দায়িত্ব রাষ্ট্রের, সেদিক থেকে আমাদের সমাজ-জীবনে ধর্মের প্রয়োজন ফুরিয়েছে। এখানে এঁরা একটি কথা ভুলে যাচ্ছেন যার জন্য এঁদের একটা বিরাট ভ্রান্তি ঘটছে। সেটি হ'ল এই যে, রাষ্ট্র শৃঙ্খলা-রক্ষক বটে কিন্তু তার হাতে শৃঙ্খল-রক্ষার হাতিয়ার পুলিশ বা মিলিটারি নয়, মানুষের মনের শৃঙ্খলাবোধ, যা ধর্মবোধের ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে আছে। আজ চারিদিকে যে শৃঙ্খলাহীনতা ও নৈতিক শৈথিল্য আমরা দেখছি তার কারণ অনুসন্ধান করতে গেলেই এ সত্যটি পরিস্ফুট হয়।

এখানে আবার এ কথা বলা হয় যে, ধর্মের সঙ্গে নীতির কোন সম্বন্ধ নেই। তার প্রমাণ হিসাবে তাঁরা বলেন যে, পূজার্চনা করে এ-রকম মানুষও ওষুধে ভেজাল মেশায়। যুক্তিটি হাস্যকর। পূজার্চনা করলেই কি ধার্মিক হয়? ধর্মের সংজ্ঞা হল "being and becoming", ধর্ম মানে হওয়া। যাদের মধ্যে ধর্মের বিকাশ হয়নি তারা পূজার্চনা করলেই ধার্মিক হবে এমন কথা ধর্ম-সমর্থকেরা কখনও বলেন না। ধর্ম এক অর্থে নীতির একমাত্র ভিত্তি। সেটি হল এই যে. ধর্ম আমাদের এই বোধ এনে দেয়—সকলেই এক অখণ্ড সত্তার অংশ, সুতরাং অপরের প্রতি অন্যায় করলে তা নিজেরই উপর করা হবে। সমাজের স্থিতি এই ঐক্যবোধের উপর। এই বোধ না থাকলে সমাজ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, রাষ্ট্র তখন কোন-মতেই সমাজকে সেই বিশৃঙ্খলা হতে রক্ষা করতে পারে না।

এ বিষয়ে সোরোকিনের বিচার-বিশ্লেষণ বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি তাঁর সুবিশাল গ্রন্থ, যা তাঁর অক্ষয় কীর্তিস্বরূপ, Social and Cultural Dynamics-এ দেখিয়েছেন যে, ইন্দ্রিয়ানুগতা বা জড়বাদ মানুষকে দেহসর্বস্ব, ভোগসর্বস্ব পশুতে পরিণত করে, ফলে তার সৃজন-শীলতা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়। সৃজনীপ্রতিভাশূন্য, এই দেহসর্বস্ব, স্বার্থসর্বস্ব, ভোগসর্বস্ব পশুদের সমাজে শৃঙ্খলা কি করে থাকতে পারে? তারা তখন নিজ সৃষ্ট সম্পদ ধ্বংসে ব্রতী হয়। তাঁর মতে ইন্দ্রিয়ানুগ সভ্যতা মানুষকে অনেক দিয়েছে—বিজ্ঞানের উন্নতি ঘটেছে. আর্থিক উন্নতি হয়েছে। কিন্তু এ সভ্যতা মনুষ্যত্বকে সংহার করেছে। এই সভ্যতার সৃষ্ট সম্পদ এই মানুষদের হাতে সুরক্ষিত নয়। সেজন্য আজ মানুষের মনুষ্যত্ব-সম্পদ ফিরে পাবার প্রয়োজনে ধর্মের ও ধর্মভিত্তিক সভ্যতার দরকার। কারণ ইতিহাসে দেখা গিয়েছে যে, সম্পদ সৃষ্টি করে ইন্দ্রিয়ানুগ সভ্যতা কিন্তু প্রকৃত মানুষ সৃষ্টি করে একমাত্র ধর্মীয় সভ্যতা। সোরোকিন এ বিষয়ে পৃথিবীর আদি-অন্তকালের বিভিন্ন দেশের ইতিহাস বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত গঠন করেছেন।[১৩]

তাঁর এই অনন্য আলোচনায় তিনি আরও দেখিয়েছেন যে মানব সভ্যতার বিবর্তনের এটি এক অমোঘ ধারা—একবার ইন্দ্রিয়ানুগতার প্রাধান্য ঘটে, পুনর্বার আসে ধর্মীয় সভ্যতা। বর্তমানে আমরা একটি যুগ-সন্ধিক্ষণে উপনীত - যখন ক্ষয়িষ্ণু ইন্দ্রিয়ানুগ সভ্যতার অন্তিম মুহূর্ত উপস্থিত। পরবর্তী কালে ধর্মীয় সভ্যতার উদয়কাল।

Ogburn ও Nimkoffও একথা স্পষ্ট করে বলেছেন যে, মানবসভ্যতা আজ যেখানে এসে উপনীত হয়েছে সেখানে আজ ধর্মের বড় প্রয়োজন ("There seems to be a little question that the trend of modern culture is such as to make this need for religion a very genuine one.")।

মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইনের মত—বিশ্বচৈতন্যকে না জানলে বিজ্ঞানের আবিষ্কার সম্ভব নয়। ধর্ম সেজন্য যে একেবারে বাতিল-হওয়া বস্তু নয় তা ধর্মের বিরোধী পক্ষরাও বোঝেন। সেজন্য তাঁরা এক নিঃশ্বাসে ধর্ম অলীক দর্শন একথা বলেন আবার বলেন যে, এই বিশ্বচৈতন্যকে জানা দরকার। কিন্তু এ জানতে হবে রুদ্রাক্ষে জপে নয়, অর্থাৎ ধর্মীয় পদ্ধতি চলবে না, এ জানতে

[শেষাংশ ৫৪৮ পৃষ্ঠায়]

১৩ P. A. Sorokin—The Social and Cultural Dynamics—Chapter on "The Crisis of Our Age"

বাংলা গদ্যের বিবর্তনে 'উদ্বোধন'-পত্রিকার ভূমিকা 'প্রস্তাবনা'

ডক্টর প্রণবরঞ্জন ঘোষ

'উদ্বোধন'-পত্রিকা প্রকাশের (মাঘ, ১৩০৫) অনতিকাল পরে 'সাহিত্য'-পত্রিকার দশম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় (বৈশাখ, ১৩০৬) এ পত্রিকার সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল—

"উদ্বোধন। নূতন পাক্ষিকপত্র। "প্রস্তাবনা"য় স্বামী বিবেকানন্দ লিখিয়াছেন—"যাহা আমাদের নাই, বোধহয় পূর্বকালেও ছিল না। যাহা যবনদিগের ছিল, যাহার প্রাণস্পন্দনে ইউরোপীয় বিদ্যুদাধার হইতে ঘন ঘন মহাশক্তির সঞ্চার হইয়া ভূমণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিতেছে, চাই তাহাই। চাই—সেই উদ্যম, সেই স্বাধীনতাপ্রিয়তা, সেই আত্মনির্ভর, সেই অটল ধৈর্য, সেই কার্যকারিতা, সেই একতাবন্ধন, সেই উন্নতিতৃষ্ণা; চাই—সর্বদা-পশ্চাদ্দৃষ্টি কিঞ্চিৎ স্থগিত করিয়া অনন্ত সম্মুখসম্প্রসারিত দৃষ্টি, আর চাই—আপাদমস্তক শিরায় শিরায় সঞ্চারকারী রজোগুণ।" * * * রজোগুণের মধ্যে দিয়া না যাইলে কি সত্ত্বে উপনীত হওয়া যায়? ভোগ-শেষ না হইলে যোগ কি করিবে? বিরাগ না হইলে ত্যাগ কোথা হইতে আসিবে? অপরদিকে তালপত্রবহ্নির ন্যায় রজোগুণ শীঘ্রই নির্বাণোন্মুখ, সত্ত্বের সন্নিধান নিত্যবস্তুর নিকটতম, সত্ত্ব প্রায় নিত্য, রজোগুণপ্রধান জাতি দীর্ঘজীবন লাভ করে না, সত্ত্বগুণপ্রধান যেন চিরজীবী; ইহার সাক্ষী ইতিহাস। ভারতে রজোগুণের প্রায় একান্ত অভাব; পাশ্চাত্যে সেই প্রকার সত্ত্বগুণের। ভারত হইতে সমানীত সত্ত্বধারার উপর পাশ্চাত্য জগতের জীবন নির্ভর করিতেছে নিশ্চিত, এবং নিম্নস্তরে তমোগুণকে পরাহত করিয়া রজোগুণপ্রবাহ প্রতিবাহিত না করিলে আমাদের ঐহিক কল্যাণ যে সমুৎপাদিত হইবে না ও বহুধা পারলৌকিক কল্যাণের বিঘ্ন উপস্থিত হইবে, ইহাও নিশ্চিত। এই দুই শক্তির সম্মিলনের ও মিশ্রণের যথাসাধ্য সহায়তা করা উদ্বোধনে'র জীবনোদ্দেশ্য।" ইহা অপেক্ষা আর কোনও মহত্তর উদ্দেশ্য আছে কিনা, জানি না। উদ্বোধনের আহ্বানে এই চিরনিদ্রিত জাতি উদ্বুদ্ধ হউক, এই আমাদের আন্তরিক কামনা।—আমরা আর কখনও বিবেকানন্দ স্বামীর বাঙ্গলা রচনা দেখি নাই। শুনিলাম, এই তাঁহার প্রথম রচনা। স্বামীজীর ওজস্বিনী ভাষার নূতন ভঙ্গী

[৫৪৭ পৃষ্ঠার পর]

হবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মাধ্যমে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও ধর্মীয় পদ্ধতিতে যে কোন পার্থক্য নেই, সেকথা বৈজ্ঞানিক চার্লস টাউনস প্রমাণ করেছেন।

আসলে আমরা যুক্তিহীন, যুক্তিবিচারের নামেই যুক্তিহীন, আমরা শ্রীরামকৃষ্ণ যাকে 'মতুয়ার বুদ্ধি' (dogmatism) বলতেন, তারই বশবর্তী। সেজন্য আমরা অতি আধুনিক বিজ্ঞান ও সমাজ-বিজ্ঞানের প্রবণতাকে উপেক্ষা করছি এবং উনিশ শতকের বাতিল হওয়া বিজ্ঞান ও সমাজ-বিজ্ঞানের প্রবণতাকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে আছি। এ মনোভাবই কি প্রগতির পরিপন্থী নয়?

[স্বা]মী ত্রিগুণাতীতানন্দ
(স্বামী ত্রিগুণাতীত)
[১]৩০৫-১৩০৯ সাল]

উদ্বোধন'-এর প্রথম তিনজন
সম্পাদক

স্বামী শুদ্ধানন্দ
[১৩০৯-১৩১৪ সাল]
পরে ১৩৩৪-১৩৪৩ সাল]

স্বা সারদ
[১৩১৪-১৩১৮ সাল]
পরে : ৩২৯-১৩৩৪ সাল
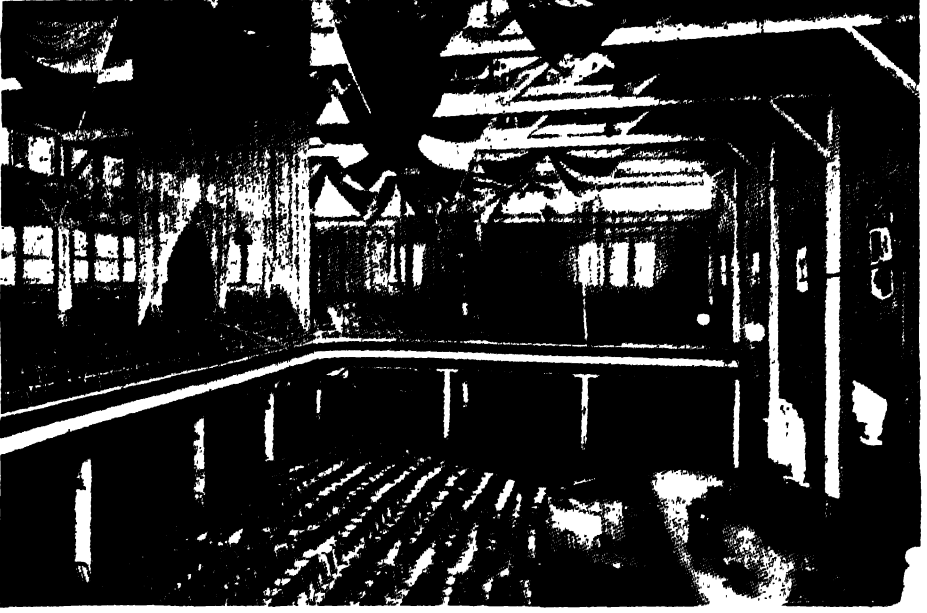
কলম্বাস হল

(এখানে চিকাগো ধর্মমহাসভা অনুষ্ঠিত হয়)

[বেদান্ত সোসাইটি অব সাউথ ক্যালিফর্নিয়ার সৌজন্যে]

"It has shown that every religion can make a stand in the world of thought and has set people to thinking that the Lord is working everywhere."

Swami Vivekananda
Hindu Philosopher

"ধর্মমহাসভা দেখিয়েছে, বিশ্বের চিন্তাজগতে প্রত্যেক ধর্মের দাঁড়াবার সামর্থ্য আছে ; এবং ইহা মানুষকে ভাবতে শিখিয়েছে যে, ভগবান সর্বত্র কর্মরত।"

স্বামী বিবেকানন্দ
হিন্দু দার্শনিক

[চিকাগো ধর্মমহাসভা সম্বন্ধে সমস্ত প্রতিনিধির মত সহ প্রকাশিত একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা থেকে এই অপ্রকাশিত উদ্ধৃতিটি সংগৃহীত]

ও লীলাগতি দেখিয়া মনে হয়, সত্যই প্রতিভা সর্বতোমুখী।"[১]

বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যে 'সাহিত্য'-সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতির বিশিষ্টস্থানের কথা মনে রেখে আমরা 'উদ্বোধনে'র প্রস্তাবনা-প্রবন্ধটির ভাবাদর্শ ও ভাষানৈপুণ্যের প্রতি তাঁর সাধুবাদে স্বাভাবিকভাবেই আনন্দিত। বাস্তবিক, 'উদ্বোধন'-পত্রিকা প্রকাশের আগে স্বামীজীর বাংলা-রচনার সঙ্গে সাধারণ পাঠক-সমাজ প্রায় অপরিচিতই ছিলেন। পরবর্তীকালে 'উদ্বোধনে'র প্রথম চার বৎসরের-'প্রধান লেখক' স্বামী বিবেকানন্দের বিভিন্ন রচনা বাঙালীপাঠকের কাছে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছে। 'উদ্বোধন'-কার্যালয়-প্রকাশিত 'ভাববার কথা'[২] 'বর্তমান ভারত' 'পরিব্রাজক' 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য' প্রভৃতি স্বামীজীর-মৌলিক বাংলারচনাবলীর বহুলসংস্করণ তার অন্যতম প্রমাণ। আর এই-সব রচনায় স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিভার সর্বতোমুখীনতা আরো ভালোভাবে প্রমাণিত।

বিষয়বস্তুর দিক থেকে স্বামীজীর বাংলা-রচনাবলীর বৈশিষ্ট্যপ্রসঙ্গে অন্যত্র আলোচনা করেছি।[৩] উদ্বোধন'-পত্রিকার হীরকজয়ন্তী (পঁচাত্তরবর্ষপূর্তি) উপলক্ষে স্বামীজীর রচনা-বৈশিষ্ট্যের কথা মনে করতে গিয়ে বাংলা গদ্যের বিবর্তনে তাঁর এবং তাঁরই নির্দেশনায় অগ্রসর 'উদ্বোধন'-পত্রিকার নিজস্ব দানের কথা মনে জাগছে।

সাহিত্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে স্বামী বিবেকানন্দ যে একজন সচেতন সুদক্ষ শিল্পী, একথাটি অনেক সময় তথাকথিত সাহিত্য সমালোচকদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। বিভিন্ন ব্যক্তির সম্বন্ধে কতকগুলি প্রচলিত ধারণার গণ্ডীতেই অনেকে আবদ্ধ থেকে যান। যথেষ্ট প্রমাণ প্রয়োগের প্রচলিত মতামত থেকে এঁদের পক্ষে মুক্তি পাওয়া কঠিন। কিন্তু ইতিহাসের বিচারে যে নিরপেক্ষতার প্রয়োজন, সাহিত্যের ইতিহাসের সেইটিই স্বাভাবিক প্রত্যাশা। কূপমণ্ডুক সাহিত্যশাস্ত্রীদের ধারণাকে অতিক্রম করেই পৃথিবীর সব সাহিত্য অগ্রসর হয়। বাংলা সাহিত্যে বিবেকানন্দেরও সেই ভূমিকা।

বিবেকানন্দের গদ্যরচনার ইতিহাস 'উদ্বোধন' পত্রিকার আবির্ভাবের বহু আগেকার। তাঁর প্রথম রচনা কি, এ বিষয়ে নিঃসংশয় না হলেও সন্ন্যাসের আগেই তিনি যে 'সঙ্গীতকল্পতরু'[৪]-গ্রন্থের সংকলন করেন এবং একটি সুবিস্তৃত পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভূমিকা লিখে দেন, তা আজ সর্বজনস্বীকৃত। প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্রে সংকলয়িতাদ্বয়ের মধ্যে প্রথম জন—শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত, বি. এ.। আর এই ভূমিকার অংশবিশেষ থেকেই বাংলাগদ্যে নরেন্দ্রনাথের প্রথম যুগের সিদ্ধির অসামান্য নিদর্শন উদ্ধৃত করা চলে—"ভারতের এই ভাস্বর মাহাত্ম্য-শালী অতীতের স্মৃতিপূর্ণ পরিত্যক্ত এই বিশাল

১ সাহিত্য (মাসিকপত্র ও সমালোচন): সম্পাদক: সুরেশচন্দ্র সমাজপতি: ১০ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃঃ ৬৬ উদ্বোধনের 'প্রস্তাবনা' পরে 'বর্তমান সমস্যা' নামে 'ভাববার কথা' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা: ৬ষ্ঠ খণ্ড: ১ম সংস্করণ: ভাববার কথা: পৃঃ ২৯-৩৪ দ্রঃ

২ 'ভাববার কথা'য় 'উদ্বোধনে' প্রকাশিত হয় নি, এমন পূর্ব-রচনা 'হিন্দুধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ' 'ঈশা-অনুসরণ'। তাছাড়া 'শিবের ভূত' নামে একটি অসমাপ্ত গল্পও সংকলিত।

৩ বর্তমান লেখকের 'বিবেকানন্দ ও বাংলাসাহিত্য' গ্রন্থ দ্রঃ

৪ প্রথম প্রকাশ, ভাদ্র, ১২৯৪ (১৮৮৭)। এই সংস্করণটি দেখবার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার—পূজনীয় শিক্ষাগুরু স্বামী ত্যাগানন্দ মহারাজের সহৃদয়তায়। শ্রীরামকৃষ্ণলোকগত এই সন্ন্যাসীর কাছে লেখক বিবেকানন্দচর্চার ক্ষেত্রে নানাভাবে ঋণী।

রঙ্গভূমির ত সেই সঙ্গীত একটি সর্বাঙ্গপূর্ণ সর্বাবয়ব সম্পন্ন অবিনশ্বর চিহ্ন। হইতে পারে আজি পাশ্চাত্যভূমির বিজ্ঞানচর্চায়, দর্শনচর্চায়, ন্যায়চর্চায় জ্যোতিষচর্চায়, গণিতচর্চায় ও ভৈষজ্যচর্চায়, প্রাচীনভারতকে দূরপরাহত করিয়াছে; কিন্তু ভারতের সঙ্গীত, তুমি সহস্র বিপ্লবের মধ্যে, লক্ষ্য পরিবর্তনের, ঘোর দুর্গতির মধ্যে আত্মজ্যোতি বিকাশ করিয়া ধীর স্থির অথচ নিশ্চিন্ত গতিতে শত লাঞ্ছনা সহিয়া শত বাধা উল্লঙ্ঘন করিয়া আপনার রাজ্য বিস্তার করিতেছে।"[৫]

এর পরের বছর 'ঈশা অনুসরণ'[৬] নামে টমাস-আ-কাম্পিসের অমর গ্রন্থ 'Imitation of Christ'-এর অনুবাদ করতে গিয়ে 'সাহিত্যকল্পদ্রুম' (১২৯৬)-পত্রিকায় স্বামীজী যে ভূমিকা বা 'সূচনা' লিখেছিলেন, সেই অংশের ভাষাভঙ্গীর জলদগম্ভীর মাধুর্যও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। তাছাড়া তাঁর অনূদিত হার্বার্ট স্পেন্সারের 'Education' গ্রন্থের অনুবাদ 'শিক্ষা' (সম্ভবতঃ ১৮৮৬)-র কথা এর আগে 'উদ্বোধনে'র পৃষ্ঠায় আলোচনা করেছি। সব মিলিয়ে দেখলে যুগরীতি-অনুযায়ী স্বামীজী বাংলা গদ্যের সাধনায় সাধুভাষাকেই অবলম্বন করেছিলেন তাঁর সাহিত্যপ্রয়াসের প্রথম পর্বে।

বিষয়বস্তুর দিক থেকে বিচার করলে 'সংগীত-কল্পতরু'র ভূমিকায় ভারতীয় সংগীতের ধারা সম্বন্ধে তাঁর সুচিন্তিত মন্তব্য, স্পেন্সারের 'এডুকেশন' (শিক্ষা) গ্রন্থের বিষয়বস্তুর বঙ্গীয় রূপান্তর সাধনে সমকালীন অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিকের শিক্ষাতত্ত্ব সম্বন্ধীয় গুরুভার বিষয়বস্তুর প্রকাশ অথবা ঈশা-অনুসরণের সূচনায় শরণাগতিসাধনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শনের প্রতি শ্রদ্ধাবনত ভঙ্গিমা— এ সব কিছুরই যোগ্য বাহন স্বামীজীর সেযুগের সাধুভাষা। এ ভাষায় যেমন বক্তব্যপ্রকাশের ঋজুতা, অনুভূতির রূপায়ণে ভাষার অন্তর্নিহিত নমনীয়তা, তেমনি এ ভাষার স্বচ্ছন্দ গতিভঙ্গী। বিশেষভাবে 'সঙ্গীতকল্পতরু'র ভূমিকা ও 'ঈশা-অনুসরণে'র সূচনা সম্বন্ধে একথা বলা চলে। বিবেকানন্দ-ব্যক্তিত্বের অন্তর্নিহিত বজ্রকুসুম মিলনের আভাস এ যুগের ভাষাসৌন্দর্যেই মাঝে মাঝে দেখা গিয়েছে। কিন্তু বাংলা গদ্যে তাঁর মৌলিক দানের জন্য 'উদ্বোধনে'র প্রকাশকালের একবৎসর আগে ১৩০৪ সালে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ৬৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত 'হিন্দুধর্ম কি?'[৭] প্রবন্ধটিই বোধ করি সর্বাগ্রে স্মরণীয়।

কারণ, 'হিন্দুধর্ম কি?' প্রবন্ধেই স্বামীজী প্রথম সচেতনভাবে বাংলাগদ্যের প্রকাশভঙ্গী নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষায় উদ্যত। সে পরীক্ষার ফল 'উদ্বোধন'-পত্রিকার 'প্রস্তাবনা' থেকে 'বর্তমান ভারত', অবধি সাধু গদ্যরচনার মাধ্যমে একদিকে এবং 'ভাব্‌বার কথা' নামে ব্যঙ্গাত্মক রচনাগুচ্ছ থেকে 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' অবধি অন্যদিকে আত্মপ্রকাশ করেছে। সাধু গদ্য ও চলতি গদ্য—এ দুইয়েরই ক্ষেত্রে স্বামীজীর মৌলিক দান রয়েছে। 'হিন্দুধর্ম কি?' প্রবন্ধে প্রথমটির সূচনা।

'উদ্বোধন'-পত্রিকার চতুর্থ বর্ষ নবম সংখ্যায় 'হিন্দুধর্ম কি?' প্রবন্ধটি 'হিন্দুধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ' নামে পরিবর্তিত শিরোনামায় প্রকাশিত হয়। এ পরিবর্তন বিবেকানন্দ-মানসের সাহিত্য-চেতনার দিক থেকেও স্মরণীয়। সমগ্র বিবেকানন্দ-সাহিত্যে বেদান্তই ভাবে ও ভাষায় প্রাধান্য পেয়েছে, কিন্তু

৫ 'সঙ্গীতকল্পতরু': ভূমিকা: 'সঙ্গীত ও বাদ্য' অংশ: প্রথম সংস্করণ দ্রষ্টব্য

৬ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা: ৬ষ্ঠ খণ্ড: ভাববার কথা: পৃঃ ১৬-১৭: প্রথম সংস্করণ

৭ বাণী ও রচনা: ৬ষ্ঠ খণ্ড: ভাববার কথা: প্রথম প্রবন্ধ

বিশেষভাবে বাংলাসাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁর দিশারী শ্রীরামকৃষ্ণ। বেদান্তের সর্বাঙ্গীণ প্রভাব এক্ষেত্রেও অব্যাহত, কিন্তু ভাষাশিল্পের ক্ষেত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ-মনীষা ও ভাষাভঙ্গীই তাঁর গদ্যরীতির প্রাণবস্তু।

'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ' থেকে এ বিষয়ে প্রথম সাক্ষ্য—"এই সেদিন 'হিন্দুধর্ম কি ?' বলে একটা বাংলায় লিখলুম—তা তোদের ভিতরই কেউ কেউ বলছে, কটমট বাঙলা হয়েছে। আমার মনে হয়, সকল জিনিসের মতো ভাষা এবং ভাবও কালে একঘেয়ে হয়ে যায়। এদেশে এখন ঐরূপ হয়েছে বলে বোধ হয়। ঠাকুরের আগমনে ভাব ও ভাষায় আবার নূতন স্রোত এসেছে। এখন সব নূতন ছাঁচে গড়্‌তে হবে। নূতন প্রতিভার ছাপ দিয়ে সকল বিষয় প্রচার করতে হবে। এই দেখ না—আগেকার কালের সন্ন্যাসীদের চালচলন ভেঙ্গে গিয়ে এখন কেমন এক নূতন ছাঁচ দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। ···দেশ, সভ্যতা ও সময়ের উপযোগী করে সকল বিষয়ই কিছু কিছু change (পরিবর্তন) করে নিতে হয়। এর পর বাঙলা ভাষায় প্রবন্ধ লিখব মনে করছি। সাহিত্যসেবিগণ হয়তো তা দেখে গালমন্দ করবে। করুক, তবু বাঙলা ভাষাটাকে নূতন ছাঁচে গড়তে চেষ্টা ক'রব।"[৮]

উপরে উদ্ধৃত (বর্তমান লেখক প্রদত্ত) নিম্নরেখ বাক্যগুলির প্রতি বিশেষভাবে সাহিত্যপাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। বাংলাভাষাকে নূতন ছাঁচে গড়বার সঙ্কল্প স্বামীজীর চিন্তায় এসেছে ১৩০৪ সাল থেকেই, যখন শ্রীরামকৃষ্ণজন্মজয়ন্তী উপলক্ষে তিনি বাংলা সাধুগদ্যকে নূতনভাবে ঢেলে সাজতে চাইলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রেরণায় যে বিপুল মননের উত্তরাধিকার তিনি পেয়েছিলেন, তাই তাঁর ভাষাকে এখন থেকে সংহতগাম্ভীর্যে এক নূতন সম্ভাবনার পথে নিয়ে গেল।

বাংলা গদ্য প্রসঙ্গে স্বামীজীর ভাবনা তখন এইরকম—"এখনকার বাঙলা-লেখকেরা লিখতে গেলেই বেশী verbs (ক্রিয়াপদ) use (ব্যবহার) করে; তাতে ভাষার জোর হয় না। বিশেষণ দিয়ে verb (ক্রিয়াপদ)-এর ভাব প্রকাশ করতে পারলে ভাষার বেশী জোর হয়—এখন থেকে ঐরূপে লিখতে চেষ্টা কর্‌ দিকি। 'উদ্বোধনে' ঐরূপ ভাষায় প্রবন্ধ লিখতে চেষ্টা করবি।"[৯]

১৮৯৮-এর নভেম্বর মাসে বেলুড়ে নীলাম্বর-বাবুর বাগানে যখন স্বামী বিবেকানন্দ ও শিষ্য শরচ্চন্দ্রের মধ্যে এ আলোচনা চলেছে, তখনও 'উদ্বোধন' প্রকাশিত হয়নি। কিন্তু 'উদ্বোধনে'র ভবিষ্যৎ ভূমিকার শুভপ্রস্তুতি এইভাবেই নিষ্পন্ন হতে চলেছে। বাংলা গদ্যে যে ক্রিয়াপদের আতিশয্য লেখকদের কাছে সমস্যা, সে বিষয়ে গদ্যশিল্পী বিবেকানন্দ যথার্থ অঙ্গুলিসংকেত করে বলছেন—"ভাষার ভেতর verb (ক্রিয়াপদ)-গুলি ব্যবহারের মানে কি জানিস ?—ঐরূপে ভাবের pause (বিরাম) দেওয়া; সেজন্য ভাষায় অধিক ক্রিয়াপদ ব্যবহার করটা ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলার মতো দুর্বলতার চিহ্নমাত্র। ঐরূপ করলে মনে হয়, যেন ভাষায় দম নেই। ···ভাষার উপর যার control (দখল) আছে, সে অত শীগগীর শীগগীর ভাব থামিয়ে ফেলে না। তোদের ডালভাত খেয়ে শরীর যেমন ভেতো হয়ে গেছে, ভাষাও ঠিক সেইরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে; আহার চালচলন ভাব-ভাষাতে তেজস্বিতা আনতে হবে, সব দিকে প্রাণের বিস্তার করতে হবে—··যাতে সকল বিষয়েই একটা প্রাণস্পন্দন অনুভূত হয়। তবেই এই ঘোর জীবনসংগ্রামে দেশের লোক survive করতে (বাঁচতে) পারবে।"[১০]

ভাবলে একটু আশ্চর্যই লাগে যে, কেমন

৮, ৯, ১০ বাণী ও রচনা : ৯ম খণ্ড : ১ম সংস্করণ : স্বামি-শিষ্য-সংবাদ : পৃঃ ৯৩-৯৪

করে শ্রীরামকৃষ্ণবাণীর সেই শান্তমাধুর্য এমন দীপ্ত-প্রত্যয়ের খাপখোলা তলোয়ারে পরিণত হলো! বিবেকানন্দ-ব্যক্তিত্বের এ সম্ভাবনার কথা জানতেন শ্রীরামকৃষ্ণ এবং সেই ব্যক্তিত্বই তাঁর গদ্যভঙ্গীর নিয়ামক। কিন্তু সে ব্যক্তিত্বেরও দুটি প্রান্ত—একদিকে সমাহিত মননতন্ময় দার্শনিক বিবেকানন্দ, অন্যদিকে প্রাণচঞ্চল, তেজোদীপ্ত সহৃদয় বিবেকানন্দ। এ দুই বিবেকানন্দে মিলে বাংলা গদ্যের দুটি ভঙ্গী।

১৮৯৮-এর নভেম্বরের সঙ্কল্প ১৮৯৯-এর জানুআরিমাসেই 'উদ্বোধন'-পত্রিকায় 'প্রস্তাবনা'র আকারে রূপ নিল। 'হিন্দুধর্ম কি?' প্রবন্ধে যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ প্রত্যক্ষভাবে এসেছে, উদ্বোধনের প্রস্তাবনায় তেমনভাবে না এলেও বেশ অনুভব করা যায় যে, ভারতীয় সভ্যতার প্রাণসত্য তাঁর কাছে শ্রীরামকৃষ্ণ-ব্যক্তিত্বের সত্ত্বগুণাদর্শের মানদণ্ডেই নির্ধারিত। ভাষাগত বিচারে প্রথম প্রবন্ধটির চেয়ে দ্বিতীয় প্রবন্ধটি অনেক বেশী গতিবেগ-সম্পন্ন, কিন্তু মননভঙ্গীর প্রকাশে বিশেষ পদ্ধতিটি এ দুটি প্রবন্ধেই মূলতঃ এক।

প্রথম প্রবন্ধটির সূচনায় ভাষাভঙ্গীতে সংস্কৃত ভাষার সূত্ররচনার ভঙ্গী—"শাস্ত্র শব্দে অনাদি অনন্ত 'বেদ' বুঝা যায়। ধর্মশাসনে এই বেদই একমাত্র সক্ষম।

"পুরাণাদি অন্যান্য পুস্তক স্মৃতিশব্দবাচ্য; এবং তাহাদের প্রামাণ্য—যে পর্যন্ত তাহারা শ্রুতিকে অনুসরণ করে, সেই পর্যন্ত।

"'সত্য' দুই প্রকার। এক—যাহা মানব-সাধারণের পঞ্চেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য ও তদুপস্থাপিত অনুমানের দ্বারা গ্রাহ্য। দুই—যাহা অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্ম যোগজ শক্তির গ্রাহ্য।

"প্রথম উপায় দ্বারা সঙ্কলিত জ্ঞানকে 'বিজ্ঞান' বলা যায়। দ্বিতীয় প্রকারের সঙ্কলিত জ্ঞানকে 'বেদ' বলা যায়।" (হিন্দুধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ)[১১]

ধীরে ধীরে এ জাতীয় বাক্য পরস্পর সংবদ্ধ হয়ে দীর্ঘতর হয়েছে। অবশেষে ভারত-ইতিহাসের সামগ্রিক পটভূমিকায় শ্রীরামকৃষ্ণ-আবির্ভাবের তাৎপর্য-ব্যাখ্যায় প্রায় পনেরো পঙক্তির একটি দীর্ঘবাক্যে এর পরিণতি। সর্বপ্রকার ভাবালুতাবর্জিত সমাসবদ্ধ বলিষ্ঠ শব্দসংযোজনায় বক্তব্য কোথাও অস্পষ্ট হয়নি, ভারসাম্য আশ্চর্যভাবে বজায় থেকেছে, কিন্তু শ্রুতিসৌন্দর্যের দিক থেকে 'উদ্বোধনে'র 'প্রস্তাবনা'র মতো হতে পারেনি।

উদাহরণটি এই রকম—"কিন্তু কালবশে সদাচারভ্রষ্ট, বৈরাগ্যবিহীন, একমাত্র লোকাচারনিষ্ঠ ও ক্ষীণবুদ্ধি আর্যসন্তান এই সকল ভাববিশেষের বিশেষ-শিক্ষার জন্য আপাত-প্রতিযোগীর ন্যায় অবস্থিত ও অল্পবুদ্ধি মানবের জন্য স্থূল ও বহুবিস্তৃত ভাষায় স্থূলভাবে বৈদান্তিক সূক্ষ্মতত্ত্বের প্রচারকারী পুরাণাদি তন্ত্রেরও মর্মগ্রহে অসমর্থ হইয়া, অনন্তভাবসমষ্টি অখণ্ড সনাতন ধর্মকে বহুখণ্ডে বিভক্ত করিয়া, সাম্প্রদায়িক ঈর্ষা ও ক্রোধ প্রজ্বলিত করিয়া, তন্মধ্যে পরস্পরকে আহুতি দিবার জন্য সতত চেষ্টিত থাকিয়া যখন এই ধর্মভূমি ভারতবর্ষকে প্রায় নরকভূমিতে পরিণত করিয়াছেন—

তখন আর্যজাতির প্রকৃত ধর্ম কি এবং সতত-বিবদমান, আপাত-প্রতীয়মান-বহুধা-বিভক্ত, সর্বথা-প্রতিযোগী, আচারসঙ্কুল সম্প্রদায়ে সমাচ্ছন্ন, স্বদেশীর ভ্রান্তিস্থান ও বিদেশীর ঘৃণাস্পদ হিন্দুধর্ম-নামক যুগ-যুগান্তরব্যাপী বিখণ্ডিত ও দেশকাল-যোগে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ধর্মখণ্ডসমষ্টির মধ্যে যথার্থ একতা কোথায়—এবং কালবশে নষ্ট

১১, ১২, ১৩ 'হিন্দুধর্ম কি?' প্রবন্ধ পরে 'হিন্দুধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ' নামে পরিবর্তিত
বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : ১ম সংস্করণ : পৃঃ ৩; পৃঃ ৪; পৃঃ ৫

এই সনাতনধর্মের সার্বলৌকিক, সার্বকালিক ও সার্বদৈশিক স্বরূপ স্বীয় জীবনে নিহিত করিয়া, লোকসমক্ষে সনাতন ধর্মের জীবন্ত উদাহরণস্বরূপ আপনাকে প্রদর্শন করিতে লোকহিতের জন্য শ্রীভগবান রামকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন।"[১২]

এ জাতীয় বাক্য থেকে অর্থ উদ্ধার করতে যেয়ে যদি কেউ পরিশ্রান্ত হন এবং এর ভাষাগত পরুষস্বভাব যদি কোমলকান্ত পদাবলীর দেশে শ্রুতিপীড়ক লাগে তাহলে খুব বেশী দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু এই অংশটুকুর পরেই ধীরে ধীরে বাক্যপঙ্‌ক্তি স্বাভাবিক গতি ও ছন্দ লাভ ক'রে বিবেকানন্দ রচনাশৈলীর আর একটি বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলেছে। ওই দীর্ঘবাক্যের প্রতিক্রিয়াতেই বাক্যের মধ্যে ছন্দোস্পন্দন নিয়ে এসে এক একটি বাক্যাংশ অমিত তেজে উদ্বেল হয়ে উঠেছে—

"প্রপতিত নদীর জলরাশি সমধিক বেগবান হয়; পুনরুত্থিত তরঙ্গ সমধিক বিস্ফারিত হয়।"...

"বারংবার এই ভারতভূমি মূর্ছাপন্না হইয়াছিলেন এবং বারংবার ভারতের ভগবান আত্মাভিব্যক্তির দ্বারা ইহাকে পুনরুজ্জীবিত করিয়াছেন।"...

"মৃতব্যক্তি পুনরাগত হয় না। গতরাত্রি পুনর্বার আসে না। বিগতোচ্ছ্বাস সে রূপ আর প্রদর্শন করে না। জীব দুইবার এক দেহ ধারণ করে না। হে মানব, মৃতের পূজা হইতে আমরা তোমাদিগকে জীবন্তের পূজাতে আহ্বান করিতেছি "[১৩]

এ ভাষার অন্তর্নিহিত বিদ্যুৎশক্তি বিবেকানন্দের গদ্যরীতির নিজস্ব ভঙ্গিমার আর এক সার্থকতা প্রমাণ করে। দীর্ঘবাক্যসমষ্টিকে অসমাপিকাক্রিয়ার বন্ধনে আবদ্ধ করার মধ্যে যে ইতিহাসের সূত্রবন্ধনপ্রচেষ্টা, তাই আবার ইতিহাসের অন্তরে নবপ্রেরণা-সঞ্চারের উদ্দেশে হ্রস্বতর বাক্যের যতিপাতে পদাতিক বাহিনীর মতো যূথবদ্ধ অগ্রগতির নিদর্শন।

'উদ্বোধনে'র 'প্রস্তাবনা' এক বিরাট মনীষার সিংহাবলোকনে ভবিষ্যৎ সভ্যতা-স্রোতের সঙ্গমতীর্থ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সুচিন্তিত সমীক্ষা। একটি সমগ্র জাতির অন্তর যেন বিবেকানন্দের মন্দ্রকণ্ঠে আত্মসম্বিৎ ফিরে পাবার জন্য ব্যাকুল। কখনো কখনো মনে হয়, বিবেকানন্দই এখানে ভারতবর্ষ। সেই আবিষ্ট তন্ময়তা থেকে ধীরে ধীরে এক উদাত্ত গাম্ভীর্য প্রসারিত হয়ে সমগ্র প্রবন্ধটি ঔপনিষদিক শুদ্ধতায় মন্ত্রোচ্চারণের পূর্ণতালাভ করে।

একদিকে নিপুণ বিশ্লেষণ, অন্যদিকে গভীর আত্মোপলব্ধি। এ দুয়ের মিলনে ভাষা কখনো তরঙ্গায়িত, কখনো গহনসঞ্চারী। ভারত-ইতিহাসের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য—যা অনুধাবনের ফলে স্বামীজীর ভারতচিন্তা ক্রমে এক দার্শনিক সিদ্ধান্তে পরিণতি লাভ করেছে—তার সার্থক সূচনা 'উদ্বোধনে'র প্রস্তাবনার প্রথম অনুচ্ছেদে। ইতিহাস ও দর্শনের বিস্তার ও গভীরতা তাঁর বাক্যবন্ধেও সঞ্চারিত—

"ভারতের / প্রাচীন ইতিবৃত্ত / · এক দেবপ্রতিম জাতির / অলৌকিক উদ্যম, / বিচিত্র চেষ্টা, অসীম উৎসাহ / অপ্রতিহত শক্তিসংঘাত / ও সর্বাপেক্ষা অতি গভীর / চিন্তাশীলতায় পরিপূর্ণ।"[১৪]

প্রথম বাক্যটির ছন্দোভঙ্গী বিশ্লেষণে দেখা যাবে সমগ্র বাক্যটি কয়েকটি ছোট ছোট বাক্যতরঙ্গের সমন্বয় এবং সেইসঙ্গে সমগ্র বাক্যটিই পাঠকমানসকে সমগ্র ভারতের মানচিত্রে উপস্থাপিত করেছে। এর পর এসেছে ইতিহাসপ্রসঙ্গে স্বামীজীর নিজস্ব

১৪, ১৫　বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : ১ম সংস্করণ : পৃ: ২৯

বক্তব্য—"ইতিহাস অর্থাৎ রাজা-রাজড়ার কথা ও তাঁহাদের কাম-ক্রোধ-বাসনাদির দ্বারা কিয়ৎকাল পরিক্ষুব্ধ, তাঁহাদের সুচেষ্টা-কুচেষ্টায় সাময়িক বিচালিত সামাজিক চিত্র হয়তো প্রাচীন ভারতে একেবারেই নাই। কিন্তু ক্ষুৎপিপাসা-কাম-ক্রোধাদি-বিতাড়িত, সৌন্দর্যতৃষ্ণাকৃষ্ট ও মহান্ অপ্রতিহতবুদ্ধি, নানাভাবপরিচালিত একটি অতি বিস্তীর্ণ জনসঙ্ঘ, সভ্যতার উন্মেষের প্রায় প্রাক্কাল হইতেই নানাবিধ পথ অবলম্বন করিয়া যে স্থানে সমুপস্থিত হইয়াছিলেন - ভারতের ধর্মগ্রন্থরাশি, কাব্যসমুদ্র, দর্শনসমূহ ও বিবিধ বৈজ্ঞানিক তন্ত্র-শ্রেণী, প্রতি ছত্রে তাহার প্রতি পদবিক্ষেপ, রাজাদিপুরুষবিশেষবর্ণনাকারী পুস্তকনিচয়পেক্ষা লক্ষগুণ স্ফুটীকৃতভাবে দেখাইয়া দিতেছে। প্রকৃতির সহিত যুগযুগান্তরব্যাপী সংগ্রামে তাঁহারা যে রাশীকৃত জয়পতাকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, আজ জীর্ণ ও বাত্যাহত হইয়াও সেগুলি প্রাচীন ভারতের জয় ঘোষণা করিতেছে।"[১৫]

এমন দীর্ঘবাক্যবন্ধের অনুচ্ছেদ পর পর উপস্থাপিত করে স্বামীজী মাঝে মাঝে একটি একক হ্রস্ব বাক্য বক্তব্যের দৃঢ়তা ও নিশ্চয়তার জন্যই যেন স্থাপন করেছেন এমন বাক্যবন্ধের একটি সুন্দর উদাহরণ—

"অতি প্রাচীনকালে একবার ভারতীয় দর্শন-বিদ্যা গ্রীক উৎসাহের সম্মিলনে রোমক, ইরানী প্রভৃতি মহা-জাতিবর্গের অভ্যুদয় সূত্রিত করে। সিকন্দর সাহের দিগ্বিজয়ের পর এই দুই মহা-জলপ্রপাতের সংঘর্ষের প্রায় অর্ধ ভূভাগ ঈশাদি-নামাখ্যাত অধ্যাত্ম-তরঙ্গরাজি উপপ্লাবিত করে। আরবদিগের অভ্যুদয়ের সহিত পুনরায় ঐ প্রকার মিশ্রণ আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার ভিত্তিস্থাপন করে এবং বোধ হয়, আধুনিক সময়ে পুনর্বার ঐ দুই মহাশক্তির সম্মিলন-কাল উপস্থিত।

"এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ।"[১৬]

পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদের পাশাপাশি 'এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ,' কত হ্রস্ব, অথচ কতো নিশ্চিত, কত ভবিষ্যদ্দৃষ্টির-অমোঘশক্তিসম্পন্ন। কখনো কখনো প্রশ্ন-আকারে এমন বাক্য দেখা দিয়েছে—'প্রস্ফুরিত হইয়া কি হইবে?'[১৭] 'তবে হইবে কি?'[১৮] 'এ পেষণেরই বা কি ফল?'[১৯] এমন এক একটি ক্ষুদ্র বাক্যবন্ধই পরবর্তী ইতি-হাসচেতনার বিস্তার এনে দীর্ঘবাক্যবন্ধের অনু-চ্ছেদ সৃষ্টি করেছে।

'এ পেষণেরই বা কি ফল?'—মুষ্টিমেয় আধ্যাত্মিকতাবাদীদের জন্য সর্বসাধারণকে আধ্যাত্মিকচক্রে নিষ্পেষিত করার পরিণামে সম-কালীন ভারতবর্ষের মানসচিত্র (একালের পক্ষেও সমান সত্য)—"দেখিতেছ না যে, সত্ত্বগুণের ধুয়া ধরিয়া ধীরে ধীরে দেশ তমোগুণসমুদ্রে ডুবিয়া গেল। যেথায় মহাজড়বুদ্ধি পরাবিদ্যানুরাগের ছলনায় নিজ মূর্খতা আচ্ছাদিত করিতে চাহে; যেথায় জন্মালস বৈরাগ্যের আবরণ নিজের অকর্মণ্যতার উপর নিক্ষেপ করিতে চাহে; যেথায় ক্রূরকর্মী তপস্যাদির ভান করিয়া নিষ্ঠুরতাকেও ধর্ম করিয়া তুলে; যেথায় নিজের সামর্থ্যহীনতার উপর দৃষ্টি কাহারও নাই—কেবল অপরের উপর সমস্ত দোষনিক্ষেপ; বিদ্যা কেবল কতিপয় পুস্তক-কণ্ঠস্থে, প্রতিভা চর্বিত-চর্বণে এবং সর্বোপরি গৌরব কেবল পিতৃপুরুষের নামকীর্তনে—সে দেশ তমোগুণে দিন দিন ডুবিতেছে, তাহার কি প্রমাণান্তর চাই?"[২০] স্বদেশের ও স্বজাতীয়দের গ্লানি ও অকর্মণ্যতা-বেদনা বহন ক'রে যে বিবে-কানন্দ ভারতের মুক্তির উপায় অনুসন্ধান ক'রে ফিরেছেন এ তাঁরই হৃদয়মথিত আগ্নেয় বাক্য-

১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১ তদেব: ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪ পৃঃ

পরম্পরা।

এই বেদনামন্থনের ঊর্ধ্বে একসময় আত্মবিশ্বাসের অমোঘ মন্ত্র উপনিষদের ভাষা-অবলম্বনে বীরসন্ন্যাসীর লেখনীতে উচ্চারিত হতে থাকে—"কার্যে আমাদের অধিকার, ফল প্রভুর হস্তে; আমরা কেবল বলি—হে ওজঃস্বরূপ! আমাদিগকে ওজস্বী কর; হে বীর্যস্বরূপ! আমাদিগকে বীর্যবান কর; হে বলস্বরূপ! আমাদিগকে বলবান কর।"

প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠ গুণাবলীর সমন্বয়ে নবযুগের ভারতবর্ষকে গড়ে তোলার সঙ্কল্প নিয়েই 'উদ্বোধনের প্রথম প্রবন্ধ 'প্রস্তাবনা।' আসমুদ্রহিমাচল পরিক্রমান্তে অর্ধেক পৃথিবী পাড়ি দিয়ে দুই জীবনধারার প্রত্যক্ষ পরিচয় বিবেকানন্দ যেমন ক'রে পেয়েছিলেন, সে-যুগে বা এ যুগে আর কোনো ভারতীয় নেতাই তা' পাননি। তাই এ দুই সভ্যতার প্রাণ সত্যের মিলনবাণী উদ্বোধনের প্রথম প্রবন্ধেই স্বামীজী সাধু গদ্যের সুগম্ভীর মৃদঙ্গধ্বনিতে জাতীয় চিত্তে সঞ্চারিত করতে পেরেছিলেন। আবার এই 'উদ্বোধনে'র প্রথম বর্ষের পরবর্তী সংখ্যাগুলিতে তাঁর চলতি গদ্যের অসামান্য নৈপুণ্যও প্রমাণিত। বিবেকানন্দ-প্রতিভার স্পর্শে বাংলা গদ্যও তখন থেকে সর্বতোমুখী।

মা আমার চিরদিন

ডক্টর গোপেশচন্দ্র দত্ত

মা আমার চিরদিন কাছে থাকবে, এ যদি আমার
প্রাণের আকাঙ্ক্ষা হয়, বল তোমরা কি এমন ভুল?
মাকে ছেড়ে থাকা যায়? মাতৃত্বের সে-সুধা বিপুল;
সারাটি প্রাণের সঙ্গে স্মৃতিময় সে-স্নেহ-উৎসার!
মাকে পাওয়া যায়, জানি দিতে হয় বিদায় আবার,
বিজয়া বলে কি তারে? তবু সময়ের নদীতীরে
বেড়াতে বেড়াতে দেখি হাসিভরা সে-মুখখানিরে,
অনন্ত আশ্বাস দিয়ে কাছে যেন টানে বারবার!

এ-মাকেই কাছে চাই, যে রয়েছে স্নেহের সত্তায়,
মায়ের কথায় যেন আশ্বিন নূতন হয়ে যায়।

শোনো ভাই আমার কথা

স্বামী বুধানন্দ

হ্যাঁ ভাই, জানি আজকের ভারতে নানা জটিল সমস্যা ও ভয়ানক নৈরাশ্য। তবু সমস্যা-নৈরাশ্য নিয়ে কোন কথাই বলব না।

কি বলব ?

বলব আমার কথা। উর্ধ্বায়নের কথা।

আজকের দিনে এই দেশের তথা পৃথিবীর বহু ভাব-সংঘাতের উন্মত্ততার মধ্যে স্বেচ্ছায় বিচার-পূর্বক স্বামীজীর আদর্শ-অনুসরণ যে-সব যুবক নিজেদের জীবনপথ বলে বেছে নিয়েছেন তাঁদের জানাব অন্তরের অভিনন্দন। কারণ বহু সমস্যা, মোহ, ভয়, নৈরাশ্য-মথিত বাতাবরণের মধ্যে এই উর্ধ্বমুখী পথ-প্রাপ্তি কম সৌভাগ্যের, কম বীরত্বের লক্ষণ নয়

যাঁরা স্বামীজীর ভাবে অনুপ্রাণিত, তাঁরা স্বভাবতঃই তাঁর ভাব-প্রচারেও ব্রতী। উদ্দেশ্য: যুব-মানসে এমন একটি স্বজনীশক্তি-সম্পন্ন গতি-বেগ সৃষ্টি করা যাতে ব্যষ্টির ও সমষ্টির, দেশের ও জগতের সর্বতোমুখী স্থায়ী কল্যাণ সূচিত হ'তে পারে।

এ কল্যাণ-সম্ভাবনার বনেদ হচ্ছে যুব-মানস। তাঁকেই বলি যুব-মানস যিনি আত্মশ্রদ্ধ, যিনি তাঁতে নিহিত দেবত্বে বিশ্বাসী। যুব-মানস এক অত্যাশ্চর্য শক্তির আধার। এখান থেকে স্ফুরিত হ'তে পারে এমন চিন্তা ও কর্ম যাতে পৃথিবীর কৃষ্টি ও সভ্যতা চূর্ণিত হয়ে যেতে পারে। এখান থেকে এমন সব চিন্তা ও কর্ম উদ্বুদ্ধ হ'তে পারে যাতে এই পৃথিবীতে মানুষের সকল কালের সোনার স্বপ্ন অনেকাংশে বাস্তবে পরিণত হ'তে পারে।

এই আধারে যখন স্বামীজীর জীবন-ধর্মী মহাশক্তিশালী আদর্শ ভাবধারা সঞ্চারিত হয়, ও তার প্রভাব পরিণত হয় একটি উর্ধ্বায়নের আন্দোলনে তখন বুঝতে হবে সকল শংকার মাঝেও অভয়ের দিব্য ব্যঞ্জনা রয়েছে।

এমন আন্দোলনের যে বিশেষ প্রয়োজন আছে তা চিন্তানায়কেরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন। কিন্তু এ আন্দোলনের সফলতা নির্ভর করবে উদ্দীপ্ত যুবগণের ব্যক্তিগত জীবন-সাধনার উপর। সে সম্বন্ধে দু-চারটে কথা বলব। এ সবই তোমার জানা কথা। তবু বলব, কারণ নৈরাশ্য কপচানোর চেয়ে, আশার কথার পুনরাবৃত্তি ভাল নয় কি ?

যাঁরা এই উর্ধ্বায়নের যাত্রী হয়েছেন বা হ'তে চান তাঁদের প্রত্যেককে সব সময়ে মনে রাখতে হবে স্বামীজীর শিক্ষার মূলমন্ত্র: 'মানুষ হও আর মানুষ গড়।'

যদি আমরা মানুষ না হই আর মানুষ না গড়ি, তখন সত্যের জয়ের প্রকাশ হবে এই যে সমস্যাগুলি, আমাদের স্বকর্ম-অকর্ম-বিকর্ম-অপকর্ম-জাত সমস্যাগুলি, আমাদের পিষে ফেলতে উদ্যত হবে। সমস্যাগুলির ততটুকুই শক্তি যতটুকু ওদের আমরা যেচে-সেধে দিয়েছি। তার চেয়ে অণুলেশ বেশী নয়।

আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ আমাদের হাতের মুঠোর মাটির তাল। আমরা সকল সমস্যার সুনিপুণ সমাধান করতে পারি—যদি আমরা মানুষ হই। যদি মানুষ না হতে পারি, যতই বাজাই না ব্যাণ্ড, উড়াই না পতাকা, করি না বাক্য-বিস্তার, যে তিমিরে আমরা আছি সে তিমিরেই আমরা থাকব।

যদি নিত্য সূর্যের আবির্ভাব দেখতে চাও তবে তোমার আত্ম-সম্ভাবনার শিখরে এসে দাঁড়াও।

তাই দায়িত্বসম্পন্ন মৌলিক উর্ধ্বায়নের আন্দোলনের মূল কথা হবে জীবন গড়া নিয়ে, মানুষ গড়া নিয়ে।

এ হবে এক নূতন ধরনের জীবন যাঁর উপাদান-উপকরণ, আমাদের দৈনন্দিন জীবন সোৎসাহে নিত্য নবোদ্যমে আহরণ করতে হবে, আচরণে ফোটাতে হবে ও কর্মে প্রেরিত করবে হবে—স্বামীজীর শিক্ষা থেকে।

স্বামীজীর আদর্শে জীবন গড়ার প্রধান উপাদান হচ্ছে সত্য। উর্ধ্বায়নের যাত্রিগণ কায়মনোবাক্যে সত্যাশ্রয়ী ও সত্যসন্ধ হবেন। সত্যই তাঁদের হাতিয়ার আর বর্ম। সত্যই তাঁদের পতাকা ও দুন্দুভি। কোন ভয়ে, কোন লোভে সত্য কোন কালে ছাড়া হবে না। কারণ মিথ্যার মত সর্ব-কল্যাণ-ধ্বংসী বিষ আর নেই।

সত্য সর্বকালে জয়ী হয়েছে ও হবে। তবে ধৈর্য চাই। যাঁরা সত্যাশ্রয়ী তাঁদের জয় অবশ্যম্ভাবী। সত্য যেখানে নিয়ে যায়, যেতে হবে।

হ্যাঁ বুঝেছি, তোমার চতুর পূর্বপক্ষটি!

এ কথা বলছিলে যে, যাঁরা সত্য ধরে বাঁচবেন তাঁদের জীবনের দুঃখ দৈন্য আসবে না। অনেক অগ্নিপরীক্ষার ভেতর দিয়ে যেতে হবে তাঁদের। তবে তো যাচাই হবে খাঁটি সোনা। যাঁরা সত্যের জন্যে সব সয়ে-বয়ে যাবেন তাঁদের অন্তরে হবে এক অজেয় শক্তির স্ফুরণ।

আর এই শক্তিসহায়ে তাঁরা জীবনে সম্পন্ন করবেন মহৎ কাজ। সত্যই সকল স্থায়ী শক্তির ভিত্তি।

স্বামীজীর আদর্শানুগ জীবন গড়তে হলে চাই শক্তিচর্চা। স্বামীজীর ভাষায়, চাই: লোহার পেশী ও ইস্পাতের স্নায়ু-মণ্ডলি।

দুর্বলের না আছে ইহকাল, না আছে পরকাল। দুর্বলের লাঞ্ছনার অবধি নেই। দুর্বলই পাপী, অত্যাচারিত সমাজের সমস্যা। দুর্বল তার দুঃখের সীমা দেখতে পায় না।

তাই সত্যসংকল্প হয়ে শক্তি আহরণ করতে হবে। চাই দেহের শক্তি, মনের শক্তি ও আধ্যাত্মিক শক্তি। মনের শক্তি দিয়ে দেহের শক্তিকে মার্জিত, সংযত ও সংহত করতে হবে; আধ্যাত্মিক শক্তি দিয়ে মনের শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে।

দিনে দিনে জীবনসমস্যা জটিলতর হয়ে আসছে। এ অবস্থায় যাঁরা উর্ধ্বায়নের যাত্রী হবেন, তাঁদের অনেক বাধা-পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে। ঐ সব বাধাকে সংযত শক্তিবহুল কৌশলে অতিক্রম করতে হবে।

যাঁরা এরূপ আদর্শ-অনুশীলনে আত্মনিয়োগ করবেন শীঘ্রই তাঁরা নিজ অভিজ্ঞতায় আবিষ্কার করবেন যে জীবনের শুদ্ধতা ও পবিত্রতা ভিন্ন সত্য-শক্তি-ভিত্তিক জীবন গড়া অসম্ভব। যার চরিত্রে পবিত্রতা নেই সে অতি ভঙ্গুর মানুষ। ভেতর থেকেই ভাঙা। সে না জানে দাঁড়াতে, না জানে চলতে মানুষের মত। সে কি ক'রে জয়ী হবে কঠোর জীবন-সংগ্রামে উচ্চাদর্শের আলোকে?

সত্য-শক্তি-পবিত্রতা-অনুশীলনের সঙ্গে স্বামীজীর অনুগামী করবেন সম্পূর্ণ নির্ভীকতার চর্চা। জীবন সত্যে, শক্তিতে ও পবিত্রতায় প্রতিষ্ঠিত হলেই এসে যাবে নির্ভীকতা স্বতঃস্ফূর্তভাবে। যাঁরা সত্যবান, শক্তিশালী, শুভ্রচরিত্র তাঁরাই জীবনে মরণে সর্বাবস্থায় হতে পারেন নির্ভীক।

এই সত্য-শক্তি-পবিত্রতা-নির্ভীকতার সঙ্গে স্বামীজীর অনুগামিগণ করবেন শ্রদ্ধার অনুশীলন।

শ্রদ্ধা কি? শ্রদ্ধা জাগ্রত মানুষের অন্তরে এক বিশেষ উন্মেষ যার সাহায্যে সে সকল সত্য-সম্ভাবনাকে, সত্য-প্রকাশকে, সত্য-অনুভূতিকে ভব্যতার সঙ্গে, বিনয়ের সঙ্গে মেনে নিতে পারে।

শ্রদ্ধাবানের জ্ঞান লাভ হয়। আর জ্ঞানবানের

হয় সদসৎ বিচারশক্তি-লাভ।

যাঁর জীবনে সত্য-শাক্তি-পবিত্রতা-নির্ভীকতা-শ্রদ্ধার অনুশীলন চলেছে, তাঁর জীবনে অতি সহজেই চলতে পারে বৈজ্ঞানিক মনীষার চর্চা ও কুসংস্কার থেকে মুক্তি।

বৈজ্ঞানিক মনীষার অনুশীলন না ক'রে স্বামীজীর আদর্শে জীবন গড়া সম্ভব নয়।

সত্যবান, শক্তিধর, পূতচরিত্র, নির্ভীক, শ্রদ্ধাশীল বৈজ্ঞানিকমনীষাসম্পন্ন, কুসংস্কারমুক্ত হয়েছেন যিনি, তিনি সহজেই তিনটি বিশ্বাসের চর্চা করতে পারবেন: আত্মবিশ্বাস, ভগবানে বিশ্বাস ও মানুষে বিশ্বাস আর এ বিশ্বাসের ভিত্তি হবে অস্তিত্বের একত্ব

একাস্তিত্বভিত্তির মানসিকতাই স্বামীজীর জীবন-দর্শনের মূল কথা—কার্যকরী বেদান্তের গোড়ার কথা।

এই মানসিকতাকে নিজের জীবনে, সমাজ-জীবনে ও বিশ্ব-মানবের জীবনে সঞ্চারিত ও ক্রিয়াশীল করতে হলে চাই ত্যাগ ও সেবা।

ওঃ এবার বুঝি তোমার প্রায় ধৈর্যচ্যুতি হল! না ভাই, সেই পুরানো দিনের দায়িত্বজ্ঞানহীন সংসার-পালিয়ে বেড়ানোর উদাসীন রূপকথা বলতে বসিনি। সেই জ্বলন্ত পাবকের কথা বলতে বসেছি, যাঁর একটি ছোঁয়ায় যুগ হতে যুগান্তরে মানুষ হয়েছে উর্ধ্বায়নের যাত্রী।

ত্যাগ বহু পুরাতন শব্দ, মানি। এ শব্দের অপব্যবহার যে হয়নি তা নয়। কিন্তু চেয়ে দেখো বুদ্ধের দিকে, যীশুর দিকে, আচার্য শঙ্করের দিকে, স্বামীজীর দিকে। ভেবে দেখো তাঁদের অত্যাশ্চর্য জীবনজয়ের কাহিনী, তাঁদের মানবসেবার ইতিকথা।

পড়েছ নিশ্চয়, স্বামীজীর শিক্ষায় ত্যাগের কথা। তিনি এই বহু পুরাতন শব্দে নূতন জীবনী-শক্তি ও মর্মার্থ-বিস্তৃতি দিয়েছেন শাস্ত্রের আলোকে।

তিনি শিক্ষা দিয়েছেন: ত্যাগের অর্থ হচ্ছে মানুষের সকল মননের ধ্যানের ও কর্মের মধ্য দিয়ে তার অন্তর্নিহিত সত্য-সুন্দর-অনন্ত সত্তার পূর্ণ বিকাশের দিকে এগিয়ে যাওয়া; এগিয়ে যেতে যেতে যা অবান্তর ক্ষতিকর ও অপ্রয়োজনীয় বলে বোধ হয়, তা পথের ধারে ফেলে রেখে এগিয়ে যাওয়া। এতে হয় ব্যক্তিসত্তার পূর্ণ বিকাশ ও প্রস্ফুটন।

ব্যক্তিসত্তার পূর্ণ প্রস্ফুটনের প্রয়োজনটি এমনভাবে করতে হবে যেন অন্য সকলের আত্ম-প্রকাশের বিকাশের ও উর্ধ্বগতিলাভের সহায়ক হয়। স্বামীজী একেই বলেছেন সেবা।

তুমি কি মনে কর স্বামীজী-কথিত এমন ত্যাগ-সেবায় রয়েছে কেন অসহনীয় সেকেলেমি? শুধু অন্ধ নিম্নগামিতাই কি আধুনিকতা বলে গৃহীত হবে? তাঁকেই বলব সত্য আধুনিক যিনি মানুষের সার্বিক সম্ভাবনাকে সুচিন্তিতভাবে মেনে নেবার সাহস রাখেন।

যাই হোক, যাঁরা স্বামীজীর আদর্শে নিজের জীবন গড়বেন, ত্যাগ-সেবার যুগ্ম ধারাটি তাঁদের জীবনে নিগূঢ়ভাবে অনুভূত হয়ে যাওয়া চাই।

আর সে-জন্যে চাই প্রেম।

প্রেম কি? সাগর-অভিগামিনী নদীর ব্যাকুলতাই প্রেম। সরল কথায় সকলকে একান্ত নিঃস্বার্থভাবে ভালবাসা। এই প্রেম একাধারে করবে সকল মানুষকে আলিঙ্গন, অন্যদিকে করবে আলিঙ্গন পরম সত্যকে যাঁর আলোকে নিখিল বিশ্ব আলোকিত।

একটু কবিতা হয়ে যাচ্ছে বুঝি! আচ্ছা, শোনো ভাই গল্প-কথা: যাঁরা এ ভাবে তাঁদের জীবন গড়বেন, বহিঃপ্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতি আসবে তাঁদের আয়ত্তে। যথাকালে তাঁরা হবেন আজাদ—সম্বিদ্‌সম্পন্ন আদর্শ মানুষ।

এমনি করে নিজের জীবন বহু যত্নে গড়তে

গড়তে, চলতে চলতে উর্ধ্বায়নের যাত্রিগণ রত থাকবেন গৃহ-কর্মে, সমাজ-কর্মে, মানব-কর্মে।

এরই নাম চরিত্র-গঠন। চরিত্র-গঠন-প্রক্রিয়ার প্রবহমানতার সঙ্গে সমাজের কর্ম-ব্যাপৃতিটুকুকে এক করে দিতে হবে।

আমার যে কল্যাণ-ধর্ম-চেষ্টা আমার জীবনে, সাধনায় পরিণত হয়নি, তাতে সমাজের বিশেষ কল্যাণের সম্ভাবনা নেই। সে জন্যেই স্বামীজী সেবাকে পূজার নামান্তর বলে শিক্ষা দিয়েছেন।

হ্যাঁ, তোমার মত চিন্তাশীল ধীমানের কাছে এ প্রশ্নটি আমি আশা করেছি: এই যে এত সব ধর্ম-কথা হল এর সঙ্গে আজকের দিনের লেলিহান দ্বন্দ্ব-সমস্যাগুলির কি নিয়ামক সম্বন্ধ ?

সম্বন্ধটি হচ্ছে অতি গভীর। তাই আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। এ কথা মানো তো বর্তমানের সব সমস্যাগুলিই মানুষ সৃষ্টি করেছে; তবে মানুষকেই সব সমস্যার সমাধান করতে হবে।

নানা ভগবানকে এতে জড়িও না—তিনি গম-গুপ্তি করেননি, মুদ্রাস্ফীতি করেননি, দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি করেননি, তিনি ভেজালের কারবার করেন না! এসব মানুষ করেছে ও করছে।

এস, মানুষ হয়ে, মানুষের মত মানুষের কর্মের দায়িত্ব গ্রহণ করি। তাই বলছিলাম স্বামীজীর শিক্ষার সার কথা: বর্তমানের ও ভাবী কালের সকল সমস্যার সমাধানের মূল কথা: মানুষ হওয়া ও মানুষ গড়া। কিছুসংখ্যক আত্মশ্রদ্ধ, শক্তিশালী, পবিত্রহৃদয়, উর্ধ্বদৃষ্টি, মহানুভব, নিঃস্বার্থ, নিষ্কাম কর্মী সার্বভৌমিক প্রেমিক মানুষ চাই। এরূপ মানুষ যত বেশী সংখ্যায় বেশী তৈরী হবে মানুষের আজকের ও আগামী দিনের আশা-ভরসার ভিত্তি হবে তত দৃঢ়।

স্বামীজী আমাদের তাই প্রার্থনা শিখিয়েছেন: 'মা, আমায় মানুষ কর।' একটু ভেবে দেখ ভাই, স্বামীজীর এই সিদ্ধ প্রার্থনাদানে রয়েছে আমাদের বহু সমস্যা সমাধানের কুঞ্জি।

আমরা যদি এমন মানুষ হতে পারি, যার ভেতরকার শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক সকল শক্তির সুসমঞ্জ বিকাশ হয়েছে, এবং সে একীভূত সকল শক্তির গতিবেগ ভূমার দিকে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে —তা হলে বর্তমানের উর্ধ্বায়নের আন্দোলনের অঙ্গীভূত হয়ে আমরা এমন কিছু করেছি যার মূল্যায়ন বাজারের লাভ-ক্ষতির মাপে সম্ভব নয়।

সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক যে-কোন বিধি-ব্যবস্থাই আমরা প্রবর্তিত করি না কেন। সব কিছুই নিত্য নূতন সমস্যা সৃষ্টি করতে বাধ্য। জীবন সমস্যাসংকুল। শুধু মৃতের রাজ্যে কোন সমস্যা নেই।

হোক না সৃষ্ট শত-সহস্র সমস্যা। তাতে মানুষের বহু প্রয়োজন। মানুষ সমস্যার সঙ্গে লড়াই ক'রে ক'রে এগিয়ে যায়।

হোক না চারদিক অন্ধকার! মানুষকেই হ'তে হবে মশাল। তাকেই হতে হবে আলো।

শুধু নৈরাশ্যের পুরাতন জায়গা ভেঙে আধুনিক নূতন জায়গা গড়লে মানুষের কি লাভ হল ? হতে হবে শুদ্ধ-মুক্ত বহুবল মানুষ। হতে হবে আজাদ।

শুধু আজকের দিনের সমস্যাগুলির চতুর ব্যাখ্যা করে কি হবে ? হতে হবে এমন সত্য-শক্তি-জ্ঞান-বিকশিত, প্রেম-উদ্ভাসিত মানুষ যার সুমুখে সমস্যাগুলি অবাস্তব কেঁচোর মতো হয়ে যায়।

হ্যাঁ, এমন মানুষ হয়ত কিছুকাল বেশীসংখ্যক হবে না। কিন্তু আমরা যেন পরিসংখ্যান-পীড়ায় আক্রান্ত না হই! আমরা যেন সংখ্যা-লঘুতার কথা ভেবে চিন্তান্বিত না হই।

দেখোনি আঁধার রাতে, একটা মশালের আলোয় কত পথ দেখা যায় ? আর এখানে যে রয়েছে অনেক মশাল!

হে উদাত্ত, হে নির্ভীক: চরৈবেতি। এগিয়ে চল। এই আমাদের বৈদিক ঋষির শাশ্বত জাগৃতি-আহ্বান। এগিয়ে চলো, জীবনের ঝঞ্ঝা বয়ে, মরণের তোরণ পেরিয়ে এগিয়ে চল বহুদূর পথ ? কিন্তু তুমিও যে ভাই অনন্ত!

সবাইকে সপ্রেমে বলো: এসো ভাই, আমরা সকলে আত্মার অনন্ত মহিমায় উদ্বুদ্ধ হই। সত্য বটে সুমুখে সমর-ভূমি। অবিনাশীর রণে ভয় কি ?

চরৈবেতি!

আবেদন

পশ্চিমবঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশন বন্যাসেবাকার্য

পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক ভয়াবহ বন্যায় চারটি জেলায় যে প্রচুর ক্ষয়-ক্ষতি এবং প্রাণহানি হয়েছে, এ সংবাদ দৈনিক সংবাদপত্র মারফত সর্বসাধারণ বিশেষরূপে অবগত আছেন।

বন্যার্তদের সেবাকল্পে রামকৃষ্ণ মিশন প্রাথমিক সাহায্য-সামগ্রী সহ মিশন-সেবাকর্মীদের মেদিনীপুর জেলার ঘাটালে পাঠিয়েছেন। সম্ভব হলে অন্যান্য অঞ্চলেও সেবাকাজ সম্প্রসারিত হবে। বলা'বাহুল্য যে জনসাধারণের অকুণ্ঠ সহায়তার ওপর নির্ভর করেই মিশন এই কাজে অগ্রসর হয়েছেন।

আশা করি সহৃদয় দাতাদের উদার দান মিশনের এই সেবাপ্রচেষ্টাকে সার্থক করবে। এই বন্যার্ত-সেবাকার্যের জন্য সব রকম দান নিম্ন ঠিকানায় সাদরে গৃহীত ও স্বীকৃত হবে। চেক "রামকৃষ্ণ মিশন" – এই নামে লিখে রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদকের নিকট বেলুড় মঠের ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

সাহায্য পাঠাবার ঠিকানা :—

(১) রামকৃষ্ণ মিশন, বেলুড় মঠ ৭১১-২০২, হাওড়া

(২) অদ্বৈত আশ্রম, ৫, ডিহি ইণ্টালী রোড, কলকাতা ৭০০-০১৪

(৩) উদ্বোধন কার্যালয়, ১, উদ্বোধন লেন, কলকাতা ৭০০-০০৩

(৪) রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব্ কালচার, গোল পার্ক, কলকাতা ৭০০-০২৯

(৫) রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠান, ৯৯, শরৎ বসু রোড, কলকাতা ৭০০-০২৬

(৬) রামকৃষ্ণ মিশন, খার, বোম্বাই ৪০০-০৫২

(৭) রামকৃষ্ণ মিশন, নিউ দিল্লী ১১০-০৫৫

(৮) রামকৃষ্ণ মঠ, মাদ্রাজ ৬০০-০০৪

(৯) রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, কানপুর ২০৮-০১২

(১০) রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, লক্ষ্ণৌ ২২৬-০০৭

(১১) রামকৃষ্ণ মিশন, পাটনা ৮০০-০০৪

(১২) রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, বারাণসী ২২১-০০১

(১৩) রামকৃষ্ণ আশ্রম, নাগপুর ৪৪০-০১২

(১৪) রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, চণ্ডীগড় ১৬০-০১৭

তারিখ, বেলুড় মঠ
৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩

স্বামী গম্ভীরানন্দ
সাধারণ সম্পাদক

পাতাল রেল

[পূর্বানুবৃত্তি]

অধ্যাপক অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

সোভিয়েত রাশিয়া : তিনটি শহরে (মস্কো ; লেনিনগ্রাদ ও কিয়েভ)-এ পাতাল রেল আছে।

মস্কো : বিগত পঞ্চাশ বৎসরে (ছোট শহর ক্রেমলিন বাদে) মস্কো শহর এমনভাবে গড়ে উঠেছে, যা পৃথিবীর অন্য কোন শহরে দেখা যায় না, এই শহরের মোট ৬৫ লক্ষ লোকের মধ্যে মাত্র লাখখানেকের ব্যক্তিগত গাড়ী (private car) আছে। সুতরাং অন্য বড় শহরের মত রাস্তায় গাড়ীর ভীড় খুব জমে না ; কিন্তু বিস্ময়কর ব্যাপার, এসত্ত্বেও গাড়ীর গতিবেগ এ শহরে মোটামুটি মন্থর। অন্যান্য শহরের পাতাল রেলের মত এখানকার Metropolitan Railway টুকরো টুকরো ভাবে গড়ে ওঠেনি, গোড়া থেকেই একটি সামগ্রিক সংহত পরিকল্পনার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। এজন্য প্রথম থেকেই পরিচালনব্যবস্থা সুষ্ঠু। অধিকাংশ মস্কোবাসীই দুই বা তিন শিফটে কাজ করতে অভ্যস্ত থাকায় ভীড়ের সময় (peak hours) এর চাপ তেমন নেই। মস্কোর মেট্রো সরকারের কোষাগারে প্রতি বছরই বেশ ভাল পয়সা এনে দেয়।

দৈনিক ৩০ লক্ষ লোক মেট্রোতে চলাচল করে, আর ভূপৃষ্ঠ যানবাহনে করে ৩৫ লক্ষ লোক, পরিবহণ-কর্তৃপক্ষের মনোভাব মোটামুটি এই, দূর পাল্লার যাতায়াতের জন্য পাতাল রেল ব্যবহার করো, আর কাছেপিঠে যাবার জন্য ভূপৃষ্ঠ পরিবহণ। উভয়ের তুলনামূলক ভাড়ার তালিকা দেখলে একথাই প্রতীয়মান হয়। তাছাড়া গভীর টিউব ষ্টেশনগুলিতে নামা-ওঠার সময়ও বেশী লাগে। মনে হয়, কর্তৃপক্ষের ইচ্ছা লোকেরা অনেকটাই মেনে নিয়েছে। লণ্ডন মেট্রোপলিটনের "Bull's eye" এর পরিবর্তে মস্কো মেট্রোর প্রত্যেক ষ্টেশনের প্রবেশপথে একটি করে বিরাট "M" অক্ষর লেখা আছে। এছাড়া ষ্টেশনের নাম বা যাতায়াতের নির্দেশসূচক চিহ্নাদি নেই বললেই হয়। ষ্টেশনগুলি আসাধারণ পরিচ্ছন্ন ; কারণ এই পথের সর্বত্র ধূমপান নিষেধ, Rheostatic brake ব্যবস্থা এবং সুড়ঙ্গপথ সপ্তাহে দুইবার উত্তমরূপে ধৌত করা হয়। পরিচ্ছন্নতার আরো কারণ, কোথাও বিজ্ঞাপন নেই এবং সমস্ত পথ উচ্চমাত্রার আলোকমালায় সজ্জিত।

এই রেলের মোট কর্মচারীর সংখ্যা দশ হাজারেরও বেশী—তার মধ্যে অধিকাংশই মহিলা। গাড়ীগুলিতে বহু মহিলা চালক (driver) এবং সহ-চালকও (assistant driver) আছেন। তাঁদের লেখাপড়া অনেকক্ষেত্রে উচ্চ-বিদ্যালয় পর্যন্ত। তাঁদের জন্য ষ্টেশনমাস্টারের পদ পর্যন্ত উন্মুক্ত। বস্তুতঃপক্ষে, পরিচালন-কর্মচারীদের (operating staff) মধ্যে শতকরা ৫ ভাগ ছাড়া আর সবই মহিলা, প্রতি চলমান সিঁড়ির (escalator) ওপরে এবং নীচে তত্ত্বাবধানের জন্য মহিলা কর্মচারীরা থাকেন। কোন যাত্রীর মালপত্র নিয়ে অসুবিধে হলে বা অন্য কোন বিঘ্ন দেখা দিলে তাঁরা যন্ত্রটি থামিয়ে দিতেও দ্বিধা করেন না। প্ল্যাটফরমের ওপর সুশৃঙ্খল মহিলারা তাঁদের বিশেষ ধরনের লালটুপি মাথায় পরে দাঁড়িয়ে থাকেন এবং একটি লাল চাকতি উঁচু করে ধরে গাড়ী ছাড়বার সিগন্যাল দেন। কখনো অতিরিক্ত ভীড় না থাকায় এবং ষ্টেশনের মহিলা কর্মচারীদের তৎপরতায় গাড়ী থামবার সময় প্রতি ষ্টেশনেই খুব অল্প, প্রায় ঘড়ির কাঁটা ধ'রে। ফলে গাড়ীর গতিবেগ ঘণ্টায় গড়পরতা ৩৭ থেকে ৪০ কিমি। প্রতি ১½ মিনিট অন্তর গাড়ী চলে। (ক্রমশঃ)

‘নো মাং মোহয় মায়য়া পরময়া’

স্বামী অমৃতত্বানন্দ

‘হে বিশ্বেশি, তোমার পরমা মায়ায় আমায় আর মুগ্ধ করো না।’ ‘নো মাং মোহয় মায়য়া পরময়া বিশ্বেশি’—এই প্রার্থনা মোক্ষকামী মানুষের। খেলা যখন আর ভাল লাগে না, ঘরে ফেরার আকাঙ্ক্ষা তখন জাগে। ছেলে খেলা ফেলে কাঁদে। ‘যতক্ষণ ছেলে চুষি নিয়ে ভুলে থাকে, মা রান্নাবান্না বাড়ীর কাজ সব করে। ছেলের যখন চুষি আর ভাল লাগে না—চুষি ফেলে চিৎকার করে কাঁদে, তখন মা ভাতের হাঁড়ি নামিয়ে দুড় দুড় করে এসে ছেলেকে কোলে লয়।’[২]

কিন্তু, চুষি ভাল না লাগা চাই ঠিকঠিক আর মাকে দেখার ব্যাকুলতা চাই আন্তরিক—তবেই মা আসেন, কোলে লন।

চুষি সত্যি ভাল লাগে না—এমন হওয়াও তো দুর্লভ দেখি সংসারে। যারা চুষি ছাড়া আর কিছু বোঝে না তারা বরং আছে ভাল। একেবারে প্রবল বৈরাগ্য—হৃদয় নিংড়ানো ব্যাকুলতা এসেছে যাঁদের, মহাভাগ্যবান তাঁদের তো কথাই নেই—মা আসবেনই আসবেন—কোটি-শশাঙ্কসমুজ্জ্বল মূর্তিতে। যাঁর চকিত দর্শনে সংসার পাশ কেটে যায় নিমেষে। মুক্ত তাঁরা।

কিন্তু, যাদের খানিক চেতনা হয়েছে—ত্যাগ বৈরাগ্য হয়েছে—সাধন ভজন, সদসদ্ বিচার করছে—তারা পড়েছে মহাযন্ত্রণাময় অবস্থায়। সংসারের অসারতা বুঝেছে, অথচ অন্তরের অন্তস্তল থেকে সকল সংস্কার দূর হয়নি—মাঝে মাঝে মায়ের মোহিনী মায়ায় বৈরাগ্য টলে টলে যাচ্ছে; বুঝেছে ঈশ্বরই সত্য, তবু প্রাণ মন অন্তরাত্মা তাঁর দিব্য প্রেমে ডুবে যাচ্ছে না—বুঝতে পেরেছে অহংবোধ সর্ব অনর্থের মূল—তবু তাকে উচ্ছেদ করতে গিয়ে শাণিতই করেছে নানা শাস্ত্রের শব্দসায়কে—যন্ত্রণা তাদেরই।

সাধক সাধন করছে গিরিগুহায়, বিজনে-বিপিনে, মঠে-মন্দিরে, শ্মশানে-সংসারে, কর্মেজ্ঞানে, ভক্তিতে-যোগে একই বাধা বিচিত্ররূপে ছলনা ক'রে তাকে সংসারের মোহাবর্তে টানছে। যোগৈশ্বর্যে, যশের সৌরভে, সামন্য সিদ্ধিতে তুষ্ট হয়ে পথহারা হয়ে পড়ছে। মায়ের অভয় অঙ্কে আপন অহংকারকে মিশিয়ে দিতে পারছে না। এই মহাছলনাময়ী মায়ার পার কে হবে আপন শক্তিতে?

আপন শক্তির গর্ব যতদিন না মায়ের শক্তির কাছে বলিরূপে নিবেদিত হবে—ততদিন গর্বই খর্ব করে রাখবে—ব্যবধান থেকেই যাবে।

* * *

ব্রহ্মার গর্ব ছিল সৃষ্টিকর্তা বলে। যখন মধু আর কৈটভ নারায়ণের কর্ণমল থেকে জন্ম নিয়ে তাঁর কমলাসনটি দখল করতে এল তখন ব্রহ্মার চমক ভাঙ্গল। তিনি দেখলেন, মধু-কৈটভের সঙ্গে পেরে ওঠা তাঁর সাধ্যের বাইরে। তাই পালনকর্তা নারায়ণের শরণ নিতে গিয়ে দেখলেন কারণসলিলে অনন্ত শয়নে নারায়ণ জগন্নাথ যোগ-নিদ্রায় নিস্পন্দ। প্রাণের দায়ে প্রার্থনা করলেন ‘হে দীননাথ, হরি, বিষ্ণু বামন ওঠ জাগো। তুমি ভক্তের আর্তি হরণ কর হে হৃষীকেশ, সকল চরাচরের আবাসস্বরূপ জগৎপতি, অন্তর্যামী,

২ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথাসার, পঞ্চম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ২১৬

বাসুদেব···মদোদ্ধত মধু ও কৈটভ আমাকে হত্যা করতে আসছে—আমি তোমার শরণাগত – আমাকে রক্ষা কর।'[২]

কিন্তু তাতে নারায়ণের নিদ্রা ভাঙ্গল না দেখে বিস্মিত ব্রহ্মা ভাবতে লাগলেন।

নূনং শক্তিসমাক্রান্তো বিষ্ণুর্নিদ্রাবশঙ্গতঃ।
জজাগার না ধর্মাত্মা কিঙ্করোমাত্ম দুঃখিতঃ ॥

*   *   *

তুষ্টাব যোগনিদ্রান্তামেকাগ্রহৃদয়স্থিতঃ ॥
বিচার্য্য মনসাহপ্যেবং শক্তির্মে রক্ষণে ক্ষমা।
যয়া হৃতচেতনো বিষ্ণুঃ কৃতোহস্তি স্পন্দবর্জিতঃ ॥
—দেবী ভাঃ ১।৭।১৫ ১৭,১৮

*   *   *

যো যস্য বশমাপন্নঃ স তস্য কিঙ্করঃ কিল।
তস্মাচ্চ যোগনিদ্রেয়ং স্বামিনী মাপর্তেহরে ॥ ঐ২১ ॥

'নিশ্চয়ই শক্তি সমাক্রান্ত হ'য়ে বিষ্ণু নিদ্রাবশ হয়েছেন (শক্তি যদি এঁর অধীন হতেন তবে, ডাকলেই ইনি উঠতেন - ইনিও পরতন্ত্র, স্বতন্ত্র নন) সেজন্য জাগরিত হ'লেন না। এখন দুঃখিত আমি কি ক'রব ?

ব্রহ্মা মনে মনে বিচার করে স্থির করলেন—শক্তিই আমার রক্ষণে সমর্থা যাঁর প্রভাবে বিষ্ণু চেতনাহীন নিস্পন্দ হয়ে রয়েছেন—আমি একাগ্র সমাহিত চিত্তে সেই যোগনিদ্রার স্তব করে তুষ্ট ক'রব। (কারণ) যে যার বশীভূত সে নিশ্চয়ই তার কিঙ্কর সদৃশ। অতএব সেই যোগনিদ্রা দেবীই লক্ষ্মীপতি হরির নিয়োগকর্ত্রী।'

ব্রহ্মা মহামায়া যোগনিদ্রার যে স্তব করেন তা অতি সুন্দর ও সারগর্ভ। শক্তিতত্ত্ব স্তবটিতে সুস্ফুট।[৩]

'দেবী, বেদবাক্যেই জেনেছি, আপনি জগতের কারণ। বিশেষ, সমগ্র জগতমধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক বিবেকবান হরিও আপনার প্রভাবে নিদ্রায় (প্রলয়কালে) বশীভূত তখন আর সে বিষয়ে সংশয় কি ? সাংখ্যবিদ্‌গণ বলেন, পুরুষ নিষ্ক্রিয় চৈতন্য, প্রকৃতি জড় ও জগৎ-কারণ। সত্য কি তাই ? তা হ'লে প্রলয়কালে আপনি কি ভাবে জগন্নিবাসকে অচেতন করে রাখলেন ? আপনি নির্গুণ চৈতন্যস্বরূপা হ'য়েও সগুণারূপে সৃষ্টি করে বিবিধ নাট্যলীলার বিস্তার করেন. বেদবিদ্‌গণও তা সম্যক্ জানেন না। আপনি জগতে বোধকারণ জ্ঞান, সুরগণের সুখদাত্রী শ্রী, আপনি কীর্তি, মতি, ধৃতি, শ্রদ্ধা, রতি। মা, আমি শরণাগত—আমাকে রক্ষা করুন।

ত্বং শক্তিরেব জগতামখিলপ্রভাবা
তন্নির্মিতঞ্চ সকলং খলু ভাবমাত্রম্।
ত্বং ক্রীড়সে নিজবিনির্মিতমোহজালে
নাট্যে যথা বিহরতে স্বকৃত নটো বৈ ॥ ৪২

মা, আপনি এ জগতের অখিল প্রভাব-সম্পন্না শক্তি। সকল বস্তুই আপনার নির্মিত—আপনিই জীবরূপে নিজ নির্মিত মোহজালে খেলা করছেন—স্বরচিত নাটকে নট যেমন (স্বরূপতঃ একরূপ থেকেও) অভিনয় করে।'

মায়ের করুণায় নারায়ণ নিদ্রা থেকে উঠে ব্রহ্মার মুখ থেকে দৈত্য-সংবাদ শুনে ব্রহ্মাকে আশ্বস্ত করলেন—বললেন: তুমি নির্ভয়ে থাক। মূঢ় গতায়ু দানবদ্বয় যুদ্ধার্থে আমার কাছে এলেই আমি তাদের নিহত করব।

নারায়ণের কথা শুনে ব্রহ্মা মনে মনে হেসেছিলেন—কারণ, নারায়ণের বিক্রম তিনি খানিক আগেই প্রত্যক্ষ করেছেন। অধিক কি প্রার্থনাকালে ব্রহ্মা এ-কথাই মাকে বলেছিলেন, 'হে অম্বিকে, আদিযুগে আপনি বিষ্ণুকে সাত্ত্বিক শক্তি দিয়ে পালনকর্তা করেছিলেন—আর এখন

২ দেবীভাগবত, ১।৭।৮-১২ শ্লোক।

৩ স্তবটি ২৭ থেকে ৪৭ শ্লোকে নিবদ্ধ। সামান্যভাবে দেওয়া হ'ল:

আপনিই তাঁকে যোগনিদ্রাভিভূত করে রেখেছেন।' নারায়ণ যে-শক্তিতে অসুর নিধন করবেন সে-শক্তি যে মায়েরই—তা ব্রহ্মার প্রত্যক্ষ।

তারপর, যুদ্ধ বাধল। ঘোরতর সে সংগ্রাম চলল পাঁচ হাজার বৎসর ধরে। শ্রান্ত ক্লান্ত, বুঝি বা ভীত নারায়ণ—দৈত্যদ্বয় অশ্রান্ত নারায়ণকে যেন উপহাস করছে। (মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে এ-অংশটুকু নেই।) ভগবান দৈত্যদ্বয়কে অম্লান দেখে ও নিজের শ্রান্তিতে আশ্চর্য হয়ে ভাবছেন—'ক্ব গতং মে বলং শৌর্যং' আমার সেই বল, সেই শৌর্য কোথায় গেল![৪]

নারায়ণকে চিন্তাপর দেখে হর্ষ করে দৈত্যরা মেঘগম্ভীর স্বরে বলে উঠল—'বিষ্ণু, তোমার যদি আর বল না থাকে, যদি শ্রান্ত হয়ে থাক তবে, মাথা নত করে কৃতাঞ্জলি হ'য়ে আমাদের দাসত্ব স্বীকার কর। নচেৎ সামর্থ্য থাকলে যুদ্ধ কর—তোমাকে হত্যা করে ঐ চতুর্মুখ পুরুষকে নিহত করব।'

নারায়ণ সময় চাইলেন। সান্ত্বনাপূর্ণ মনোহর বাক্যে বললেন—'শ্রান্ত, ভীত, শস্ত্রহীন, পতিত বা বালককে বীরগণ প্রহার করেন না—এটি সনাতন ধর্ম। পাঁচ হাজার বৎসর আমি একাকী তোমাদের দুজনের সঙ্গে যুদ্ধ করেছি। তোমরা দু'জনে পর্যায়ক্রমে বিশ্রামলাভ করেছ—আমি বিশ্রাম পাইনি। দু'জনেই তোমরা সমান বলবান্। অতএব আমি কিয়ৎকাল বিশ্রাম করে আবার যুদ্ধ ক'রব।'

বিশ্রামের অবসরে দৈত্যদ্বয় দূরে গেলে নারায়ণ ধ্যানবলে জানতে পারলেন যে, মহামায়া দানবদ্বয়কে 'ইচ্ছা মৃত্যু' বরদান করেছেন—জেনে হতাশ হলেন। ভাবলেন—একি অসম্ভব যুদ্ধে আমি লিপ্ত হয়েছি! এদের বর দিয়েছেন সাক্ষাৎ ত্রিগুণধারিণী জগতপ্রসূতি মা—তায় ইচ্ছামৃত্যু! কেউ কি স্বেচ্ছায় মরতে চায়? তখন সর্বযোগেশ্বর হরি বদ্ধাঞ্জলি হয়ে ভুবনেশ্বরীর স্তব করতে লাগলেন।

নমো দেবি মহামায়ে সৃষ্টিসংহারকারিণি।
অনাদিনিধনে চণ্ডি ভুক্তিমুক্তিপ্রদে শিবে॥
ন তে রূপং বিজানামি সগুণং নির্গুণন্তথা।
চরিত্রাণি কুতো দেবি সংখ্যাতীতানি যানি তে॥
দেবীভা: ১৷৯৷৪০৷৪১॥

'হে শিবে, চণ্ডি, মহামায়ে সৃষ্টিসংহারকারিণি দেবি, তোমাকে প্রণাম। তুমি নির্গুণা চৈতন্য-স্বরূপা হয়েও ভুক্তি ও মুক্তিদায়িনী। মা, সগুণ-নির্গুণ তোমার রূপ কোনটিই বিশেষরূপে যখন জানতে পারছি না, তখন অনন্তলীলা-চরিত্রের কথা কি বলব?'

নারায়ণ আর্তি প্রকাশ করে বলছেন: যুদ্ধ না করলেও আমার নিস্তার নেই—তোমার বরপ্রভাবে ঐ বলোদ্ধত দানবদ্বয় আমার বিনাশের জন্য কৃত-নিশ্চয়। আর যুদ্ধকর্মে আমি খিন্ন। মা, আমি তোমার শরণাগত। 'সাহায্যং কুরু মে মাতঃ খিন্নোঽহং যুদ্ধকর্মণা।'[৫]

দেবী গগনে মনোহর দিব্য মূর্তিতে দেখা দিয়ে বললেন দানবদের তিনি মোহিত করবেন।

আবার যুদ্ধ শুরু হ'ল। শ্রান্ত নারায়ণ কাতর চক্ষে আকাশে তাকাতেই দেখলেন মোহিনীমায়া কুটিল কটাক্ষে দানব দুটিকে একেবারে জড়ীভূত করে ফেলেছেন। মোহ অহঙ্কার অভিমানে সমাচ্ছন্ন দানব যা নয় তাই-ই করে বসল। সর্বনাশ যখন হয় তখন বুদ্ধিনাশ আগে হয়। 'বুদ্ধিনাশাৎ

৪ দেবীভাগবত ১৷৯৷১৮-২৪ শ্লোকের ভাবটুকু নেওয়া।
৫ দেবীভাগবত ১৷৯৷৪-৪৮

প্রণশ্রুতি।'

আখ্যায়িকার মধ্য দিয়ে সাধনতত্ত্বটি পরিস্ফুট হয়েছে। রজঃশক্তি ব্রহ্মা—মন, নাভি-কমলে তাঁর বাস। বিবেকবান্ হ'লে সাধক মনকে উর্ধ্বে তুলতে চান। বাধা হয় অহং মধু, বাসনা কৈটভ। তাই সত্ত্বগুণের নারায়ণকে প্রবোধিত করতে হয়। কিন্তু, 'যমেবৈষ বৃণুতে' —কার সত্ত্বগুণ জাগে—কার পুরুষকার গর্জে ওঠে? তিনি যে-সাধককে বরণ করেন—তার। 'পুরুষকারও প্রার্থনা করতে হয়।' যতক্ষণ সত্ত্ব না জাগে ততক্ষণ পূজাধ্যানাদি সত্ত্বগুণের যান্ত্রিক আচরণ চলতে থাকে। সত্ত্বগুণ জাগলে বিবেক বৈরাগ্য, শমদম স্বাভাবিক হয়ে আসে। কিন্তু, সত্ত্বও পারে না পৌঁছে দিতে লক্ষ্যে, পথ দেখায় মাত্র। যাঁর শক্তিতে ব্রহ্ম স্রষ্টা, হরি পাতা, হর সংহর্তা—সেই মহামায়ার শরণাগত হতে হয়। তাই নারায়ণ ভুবনেশ্বরীর শরণ নিলেন।

শরণাগতিই সাধকের শেষ সাধন। 'মম মায়া দুরত্যয়া' বলেছিলেন ভগবান অর্জুনকে। 'মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।' 'যে আমার শরণ নেয় সেই মায়া পার হ'তে পারে।' সত্ত্বগুণের পরাকাষ্ঠায় সাধক সাধনের অহংকারটুকু ত্যাগ করেন মহামায়ার নটবৎ নাট্যলীলা দেখে তাঁর শরণাগত হন। তাই সত্ত্বগুণের গর্ব খর্ব করতে হবে। সত্ত্বগুণে চিৎ প্রতিবিম্বই জীবের অহংকার—তাই মধু—আবরণ শক্তি। বিক্ষেপ শক্তি কৈটভ বহুত্বের স্পৃহা।[৬] তাই নারায়ণ নিজ শক্তিতে মধু ও কৈটভকে বধ করতে পারলেন না। মহামায়া মধু ও কৈটভকে কটাক্ষে আপনার মায়ায় বশীভূত করে নিজের ভেতরে লীন করে দিলেন—বিশুদ্ধা চেতনাময়ীর দর্শনে ক্ষুদ্র অহং আর আলাদা থাকতে চায় না স্বেচ্ছায় মরতে চায়। ক্ষুদ্র বাসনার তখন স্থান কোথায়? নিখিল জগতের সকল আনন্দ সেখানে সূর্যসন্নিধানে খদ্যোতের মতো তুচ্ছ।

শরণাগতিতে ছয়টি প্রপত্তি। (১) ভগবদনুকুল ভাবে স্থির থাকার সঙ্কল্প, (২) তৎপ্রতিকূল বিষয়ের বর্জন, (৩) তিনিই আমাকে রক্ষা করবেন এই বিশ্বাসে স্থির থাকা, (৪) ভগবানকেই রক্ষক বলে বরণ করা, (৫) আত্মনিক্ষেপ—মন প্রাণ দেহ সব তাঁতে সমর্পণ, ও (৬) দীনতা।

সাধনের দ্বারা তিনি লভ্য নন। ন তপসা অনাশকেন'—তাই 'শরণাগত দীনার্তপরিত্রাণ-পরায়ণে। সর্বস্যার্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে।' চণ্ডী ১১।১৩॥

"মা আমি তোমার শরণাগত, শরণাগত। তোমার পাদপদ্মে শরণ নিলাম। দেহসুখ চাই না মা! লোকমান্য চাই না, (অণিমাদি) অষ্টসিদ্ধি চাই না, কেবল এই করো যেন তোমার শ্রীপাদ-পদ্মে শুদ্ধাভক্তি হয়—নিষ্কাম অমলা, অহৈতুকী ভক্তি হয়। আর যেন মা, তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই—তোমার মায়ার সংসারে। কামিনী-কাঞ্চনের উপর ভালবাসা যেন কখন না হয়! মা! তোমা বই আমার কেউ নাই। আমি ভজনহীন, সাধনহীন, জ্ঞানহীন, ভক্তিহীন—কৃপা ক'রে শ্রীপাদপদ্মে আমায় ভক্তি দাও।'[৭]

৬ সাধনসমর—প্রথম ভাগ
৭ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, প্রথম ভাগ, ষষ্ঠ সংস্করণ, ১৯৭ পৃষ্ঠা

সমালোচনা

কাব্যবিচিত্রা (প্রথম অর্ঘ্য): শ্রীগৌর-গোবিন্দ ভট্টাচার্য। আলফা পাবলিশিং কনসার্ন, ৭২ গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯। ক্রাউন ১৪৪ পৃষ্ঠা। মূল্য তিন টাকা।

মোট ১০৫টি কবিতার একটি সংকলন। কবি শ্রীভট্টাচার্য খ্যাতনামা কবি নন, কিন্তু তাঁর কবিতাগুলিতে পাকা হাতের ছাপ আছে। এই কবিতাগুলি (৪টি ইংরেজী সহ) কবির সম্পূর্ণ নিজস্ব বস্তু। নানাভাবের নানান ছন্দের কবিতা-রাশির মধ্যে 'মহান্ অভিসার', 'মহান্ পরশ', 'ব্যাপ্তাত্মতা', 'শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ', 'সুন্দর চয়ন', 'প্রেমাবর্ত', 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ' ইত্যাদি কবিতাগুলিতে আধ্যাত্মিকতা সহজেই মনকে আকর্ষণ করে। 'সর্বংসহা সম-মাতৃক মেদিনী'-তে "মূঢ় ওরে দম্ভকারী নীচ স্বার্থপর / ধরণী একার নয় সবার এ ঘর" কিংবা 'একাত্মতা'-তে 'দেশ জাতি ধর্মভেদ প্রাদেশিকপনা—/ ধর্মীয় গোঁড়ামি সহ যতসব ঘৃণা—/ সবারে ভুলিতে হবে করি একাত্মতা / তবে ভবে আসিবেক একাত্মপ্রাণতা' ইত্যাদি পঙক্তিগুলি বর্তমান কালের পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষতঃ জাতীয় সংহতি আন্দোলনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, সন্দেহ নেই। 'অভিযাত্রী', 'প্রেমপাখী মোর যায় গো ডাকি' ইত্যাদি কয়েকটি কবিতায় লিরিকের সাবলীলতা কবির কাছে আমাদের ভবিষ্যতের প্রত্যাশা জাগায়। ঐতিহাসিক পটভূমিতে বিরচিত 'সম্রাট অশোক', 'শিবাজী', 'জয়তু নেতাজী', 'বাংলাদেশ', 'The Wreck of Khukri', এবং 'Mahatma Gandhi' স্মরণযোগ্য কবিতার পর্যায়ভুক্ত হবার যোগ্যতা রাখে।

গ্রন্থটির ছাপা ও অঙ্গসজ্জা মোটামুটি রকমের বলা চলে। ছাপার কিছু ভুল আছেই।

কাব্যবিচিত্রা বৈচিত্র্যপ্রিয় বাঙালী কাব্য-রসিকদের কাছে সাগ্রহে গৃহীত হবে ব'লে মনে করা যেতে পারে। —**যুধিষ্ঠির**

সাধিকামালা স্বামী জগদীশ্বরানন্দ প্রকাশক: শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র, ১০ গ্যালিফ স্ট্রীট, ব্লক নং ২, ফ্ল্যাট নং ২৫, কলিকাতা-৩ পৃষ্ঠা ১৮৮। মূল্য: ২'৫০ টাকা, বোর্ড বাঁধাই ৩'৫০ টাকা।

পশ্চিমবঙ্গের ডি. পি. আই কর্তৃক বালিকা-বিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তকরূপে অনুমোদিত 'সাধিকা-মালা' পুস্তকখানির ইতঃপূর্বে দুইটি সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। বর্তমান তৃতীয় সংস্করণে 'থেরেসা নিউম্যান' ও 'সেণ্ট কাথারাইন'-এর পরিবর্তে 'লাল্লেশ্বরী' ও 'ভগিনী ক্রিস্টিন' সংযোজিত হইয়াছে। সহজ সরল ভাষায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সাধিকাগণের মহাজীবন বালিকা-গণের সম্মুখে তুলিয়া ধরিবার প্রচেষ্টা অভিনন্দন-যোগ্য। গ্রন্থে উপস্থাপিত উল্লেখযোগ্য কয়েকটি সাধিকা-চরিত্র: মীরাবাঈ, ভগিনী নিবেদিতা, সন্ন্যাসিনী গৌরীপুরী, অণ্ডাল, সেণ্ট টেরেসা, তাপসী রাবেয়া, রানী রাসমণি, সঙ্ঘমিত্রা।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

সেবাকার্য

বাংলাদেশে সেবাকার্য: ১৯৭৩ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসের শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশে ৮টি সেবাকেন্দ্রের মাধ্যমে দুঃস্থ জনগণের সেবাকার্যে ২৮,০৪,৪০৬'৯৩ টাকা ব্যয়িত হইয়াছে।

শ্রীহট্ট কেন্দ্র কর্তৃক ১৯৭৩ জুনে বিতরিত দ্রব্যাদি: 'আস্ত্রা' বেবিফুড—৪১২ কেজি, কম্বল—২৩৫, শাড়ী–৪৮২, মশারি ২১১, পুরাতন বস্ত্রাদি–৬২৩, বাসন—১৩২।

ত্রিপুরায় বন্যাত্রাণকার্য: ত্রিপুরায় বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলে সেবাকার্য পরিচালিত হইতেছে। ১৯৭৩ জুলাই-এ রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক বিতরিত দ্রব্যসমূহ:

চাল—৪,৩৮৪ কেজি, ডাল—৯৩১ কেজি, মিল্ক-পাউডার—৪৮৬ কেজি, বিস্কুট—৬৫০ কেজি, ধুতি—২৭৫, শাড়ী—২৫২, শিশুদের পোশাক—৬৮২, কম্বল—১২৮, রান্নার জন্য অ্যালুমিনিয়মের পাত্র, থালা ও জলপাত্র যথাক্রমে ৬৫০, ৬৪৯ ও ৪৪৭, কেরোসিন লণ্ঠন—৬। এই সব জিনিস ৩৫টি গ্রামে ১,০৬৬ পরিবারের ৪,২২১ জনকে প্রদত্ত হইয়াছে। দুইটি চালাঘরও নির্মিত হইয়াছে।

কর্ণাটকে খরাত্রাণকার্য: ১৯৭৩ জুন **বাঙ্গালোর** আশ্রম কর্তৃক গুলবর্গা জেলায় ঘনগপুর সেবাকেন্দ্রের মাধ্যমে ৪৬টি গ্রামের ১,১৫০ ব্যক্তিকে খাদ্য-শস্য দেওয়া হইয়াছে। করাজগীতে দ্বিতীয় সেবাকেন্দ্র খোলা হইয়াছে।

গুজরাতে অনাবৃষ্টি ও খাদ্যাভাবের জন্য সেবাকার্য: রাজকোট আশ্রম কর্তৃক রাজকোট জেলায় ভাদলায় রান্না-করা খাদ্য বিতরণের যে পাকশালা (free kitchen) গত কয়েক মাস ধরিয়া পরিচালিত হইতেছে, তাহার কার্য চলিতেছে।

দেহত্যাগ

আমরা গভীর দুঃখের সহিত সঙ্ঘের তিনজন সন্ন্যাসীর দেহত্যাগ-সংবাদ লিপিবদ্ধ করিতেছি:

স্বামী বৈকুণ্ঠানন্দ

স্বামী বৈকুণ্ঠানন্দ গত ২৬শে জুলাই, ১৯৭৩ বেলা প্রায় সাড়ে এগারটার সময় কনখল সেবাশ্রমে সহসা হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বিকল হওয়ায় দেহত্যাগ করেন। তাঁহার ৭২ বৎসর বয়স হইয়াছিল।

১৯২০ খৃষ্টাব্দে কনখল সেবাশ্রমে তিনি সঙ্ঘে যোগদান করেন। শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের নিকট হইতে তিনি মন্ত্রদীক্ষা ও সন্ন্যাস লাভ করিয়াছিলেন। তিনি অত্যন্ত কঠোর-ভাবে জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিলেন। তাঁহার সাধু-জীবনের অধিকাংশ কাল তপস্যায় অতিবাহিত হইয়াছিল; মাঝে মাঝে তিনি কনখল, রেঙ্গুন, আলমোড়া ও অন্যান্য কেন্দ্রে শ্রীশ্রীঠাকুর স্বামীজীর কাজে নিরত ছিলেন। কিছুকাল যাবৎ তিনি কনখল সেবাশ্রমে অবসর-জীবন যাপন করিতেছিলেন।

স্বামী সিতানন্দ

স্বামী সিতানন্দ (সত্য মহারাজ) গত ৪ঠা আগস্ট, সন্ধ্যা ৭টা ৭ মিনিটে কলিকাতা রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে ৫৭ বৎসর বয়সে দেহ-ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি অনেকদিন হইতে ভুগিতেছিলেন। তাঁহার ডায়াবিটিস ছিল। নানা উপসর্গও দেখা দেয়।

তিনি শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন, ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে যোগদান করেন এবং ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের নিকট সন্ন্যাস-দীক্ষা লাভ করেন। তিনি বিভিন্ন সময়ে গদাধর আশ্রম, উদ্বোধন এবং কালিম্পং আশ্রমে শ্রীশ্রীঠাকুর-স্বামীজীর কাজে ব্যাপৃত থাকেন। শেষের এক বৎসর গত ১৪ই জুলাই (সেবাপ্রতিষ্ঠানে ভরতি হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত) তিনি বেলুড় মঠে ছিলেন। পূজাদি কার্যে তাঁহার পারদর্শিতা ছিল, সংস্কৃতে তিনি বিশেষ পড়াশুনা করিয়াছিলেন। তিনি শান্তপ্রকৃতি ও অমায়িক সাধু ছিলেন।

স্বামী নির্মোহানন্দ

স্বামী নির্মোহানন্দ (কানাই মহারাজ) ৭১ বৎসর বয়সে গত ৩০শে আগস্ট বেলা সাড়ে এগারোটার সময় সেরিব্রাল থ্রম্বসিসে আক্রান্ত হওয়ার ফলে দেহত্যাগ করেন। পূর্বরাত্রে সরিষা আশ্রমে তিনি হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়েন; সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসাদির পর পরদিন সকালে তাঁহাকে অচৈতন্য অবস্থায় সেবাপ্রতিষ্ঠানে লইয়া আসা হয়; কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

তিনি শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন, ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে সরিষা আশ্রমে সঙ্ঘে যোগদান করেন এবং ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার দীক্ষাগুরুর নিকট হইতেই সন্ন্যাস প্রাপ্ত হন। প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত তিনি সরিষা আশ্রমেই শ্রীশ্রীঠাকুর-স্বামীজীর কাজে নিরত থাকেন; ১৯৪১ খৃষ্টাব্দ হইতে তিনি এই আশ্রমের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি সকলের সঙ্গে মিশিতেন, ব্যবহারে অত্যন্ত অমায়িক ছিলেন, এবং বহুজনের প্রীতি ও শ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছিলেন। সংগঠনে ও পরিচালনায় তাঁহার বিশেষ যোগ্যতা ছিল, সরিষা আশ্রমের বিভিন্ন দিকে ক্রমবর্ধমান শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি তাঁহার পরিচালন-কৃতিত্বের স্বাক্ষর বহন করিতেছে। তাঁহার মহাপ্রয়াণে একজন অদম্য কর্মী ও বিনয়নম্র সন্ন্যাসীর অভাব ঘটিল।

এই সাধুগণের দেহনির্মুক্ত আত্মা শ্রীরামকৃষ্ণ-পাদপদ্মে শাশ্বত শান্তি লাভ করিয়াছে।

বিবিধ সংবাদ

বিবেকানন্দ সোসাইটি (১৫১, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৬): ১৯০২ খৃষ্টাব্দে ভগিনী নিবেদিতা কর্তৃক কলিকাতায় বিবেকানন্দ সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। দীর্ঘকাল সোসাইটির কার্যালয় বিভিন্ন স্থানে ছিল, কয়েক বৎসর হইল সোসাইটি নিজস্ব ভবনে স্থানান্তরিত হইয়াছে। ১৯৭১ খৃষ্টাব্দের কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থাগারে ইতিহাস, সাহিত্য, ধর্ম দর্শন ইত্যাদি বিষয়ে পুস্তকসংখ্যা দশ সহস্রাধিক। আলোচ্য বর্ষে গ্রাহকগণ ৯,১০২ খানি গ্রন্থ পড়িবার জন্য লইয়াছিলেন। পাঠাগারে ৩৭টি পত্র-পত্রিকা রাখা হয়। গ্রন্থাগারের শিশু বিভাগটির প্রতি শিশুদের আকর্ষণ ক্রমশঃ বাড়িতেছে। দাতব্য হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয়ে আলোচ্য বর্ষে রোগীর সংখ্যা—১২,৩৩৪। সাপ্তাহিক ধর্মসভাগুলি সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতেছে। প্রতি বৎসর শ্রীশ্রীকালীপূজা ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হয়। সোসাইটির অন্যান্য কর্মের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—কোচিংক্লাস, দুগ্ধবিতরণ ও সেবাকার্য।

শারদীয় অভিনন্দন ঃ
আচার্য স্বামী বিবেকানন্দ-প্রতিষ্ঠিত
'উদ্বোধন'
পত্রিকার উত্তরোত্তর প্রচার
ও
প্রসার প্রার্থনা করি।
শুভাচিন্তক

তোমরা আহারের দ্বারা শরীরের পুষ্টি করিতেছ—কিন্তু শরীর পুষ্ট করিয়া কি হইবে, যদি উহাকে অপরের কল্যাণের জন্য উৎসর্গ করিতে না পার? তোমরা অধ্যয়নাদি দ্বারা মনের পুষ্টি বা বিকাশ সাধন করিতেছ—ইহাতেই বা কি হইবে, যদি ইহাকেও অপরের কল্যাণের জন্য উৎসর্গ করিতে না পার?

—স্বামী বিবেকানন্দ

স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী

সন্ন্যাসীর গীতি—১৪শ সংস্করণ। স্বামীজী-রচিত 'Song of the Sannyasin'-নামক ইংরেজী কবিতা ও উহার পদ্যে বঙ্গানুবাদ। মূল্য ২০ পয়সা।

ঈশদূত যীশুখৃষ্ট—৫ম সংস্করণ. ভগবান ঈশার জীবনালোচনা—মূল্য ০'৯০. উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে মূল্য ০'৭৫।

সরল রাজযোগ—৫ম সংস্করণ। স্বামীজী আমেরিকায় তাঁহার শিষ্যা সারা সি. বুলের বাড়িতে কয়েকজন অন্তরঙ্গকে 'যোগ' সম্বন্ধে যে বিশেষ উপদেশ দান করেন, বর্তমান পুস্তক তাহারই ভাষান্তর। মূল্য ০'৫০।

পত্রাবলী—১ম ও ২য় ভাগ। অভিনব পরিবর্ধিত সংস্করণ : প্রায় ১০৫০ পত্রে সম্পূর্ণ। স্বামীজীর বহু অপ্রকাশিত পত্র ইহাতে সংযোজিত হইয়াছে। তারিখ অনুযায়ী পত্রগুলি সাজানো হইয়াছে। পরিচয়- এবং নির্দেশী-সংযুক্ত। বোর্ড বাঁধাই। স্বামীজীর স্বহস্ত ছবি-সম্বলিত। প্রতি ভাগে মূল্য ৫'৫০; উদ্বোধ-গ্রাহক-পক্ষে মূল্য ৫৲।

ভারতে বিবেকানন্দ—১৩শ সংস্করণ। আমেরিকা হইতে প্রত্যাবর্তনের পর স্বামীজীর ভারতীয় বক্তৃতাবলীর উৎকৃষ্ট অনুবাদ। ৫১৯ পৃষ্ঠা; মূল্য ৫'০০; উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে মূল্য ৪'৫০।

দেববাণী—৯ম সংস্করণ। আমেরিকার 'সহস্র-দ্বীপোদ্যান'-নামক স্থানে কয়েকজন অন্তরঙ্গ শিষ্যকে স্বামীজী যে-সকল অমূল্য উপদেশ প্রদান করেন, ঐগুলির একত্র সমাবেশ। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি, ২১৪ পৃষ্ঠা : মূল্য—২৲ উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে মূল্য ১'৮০।

শিক্ষাপ্রসঙ্গ—৪র্থ সংস্করণ। শিক্ষা-সম্বন্ধে স্বামীজীর বাণীসকল সংকলিত ও ধারাবাহিক-ভাবে সন্নিবেশিত। ১৮৮ পৃষ্ঠা; মূল্য ১'৭৫।

কথোপকথন—৫ম সংস্করণ। স্বামীজীর ছবিযুক্ত। ডবল ক্রাউন, ১৬ পেজি, ১৪২ পৃষ্ঠা। মূল্য ১'২৫ উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে মূল্য ১'১৫

মদীয় আচার্যদেব—স্বামী বিবেকানন্দ-প্রণীত; ১১শ সংস্করণ, ৬৪ পৃষ্ঠা। স্বীয় গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনী ও শিক্ষা সম্বন্ধে আমেরিকাবাসীদের নিকট স্বামীজীর বিবৃতি মূল্য ০'৭৫; উদ্বোধন-গ্রাহক পক্ষে মূল্য ০'৬৫।

জ্ঞানযোগ-প্রসঙ্গে—বিভিন্ন বক্তৃতার সারসংক্ষেপ—ইংরেজীতে প্রকাশিত Discourses on Jnana Yoga পুস্তকের অনুবাদ। 'স্বামীজীর বাণী ও রচনা' হইতে পৃথক্ পুস্তকাকারে প্রকাশিত। আত্মতত্ত্ব ও বেদান্ত-বিষয়ক বহু কঠিন বিষয় সরলভাবে আলোচিত। 'জ্ঞানযোগ' গ্রন্থ পড়িবার পক্ষে সহায়ক। মূল্য দুই টাকা।

স্বামি-শিষ্য-সংবাদ—(পূর্বকাণ্ড — ১৩শ সংস্করণ; উত্তরকাণ্ড—১১শ সংস্করণ)। শ্রীশরৎচন্দ্র চক্রবর্তী প্রণীত। স্বামী বিবেকানন্দের মতামত অল্প কথায় জানিবার উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। স্বামীজীর জীবিতকালে তাঁহার সহিত প্রশ্নোত্তরচ্ছলে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য-দেশীয় আচার-নীতি, দর্শন-বিজ্ঞানাদি এবং ধর্ম ও সমাজগত সমস্যামূলক নানা বিষয়ের বিশদ আলোচনা। সরস ও হৃদয়গ্রাহী এই সব বর্ণনা সত্যই আনন্দদায়ক। বর্তমান যুগের বহু সমস্যার আদর্শস্থানীয় সমাধানও ইহাতে পাওয়া যাইবে। জীবনতত্ত্ব বিষয়ে এই পুস্তকদ্বয় অমূল্য রত্নের সন্ধান দিবে। ২২০ ও ২১০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য প্রতি খণ্ড ২'২৫।

মহাপুরুষ-প্রসঙ্গ—১৩শ সংস্করণ। ১৪৪ পৃষ্ঠা। ইহাতে রামায়ণ, মহাভারত, ভক্ত-ভরতের উপাখ্যান, প্রহ্লাদচরিত্র, জগতের মহৎম আচার্যগণ, ঈশদূত যীশুখৃষ্ট, ভগবান্ বুদ্ধ প্রভৃতি বিষয় আছে। কোমলমতি বালক-দিগের চরিত্রগঠনে ও ভারতীয় সংস্কৃতিতে তাহাদিগকে শ্রদ্ধাবান্ করিতে ইহা বিশেষ সহায়তা করিবে; মূল্য ৩'০০; উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে মূল্য ২'৭০।

প্রাপ্তিস্থান :—উদ্বোধন কার্যালয়, বাগবাজার, কলিকাতা

উদ্বোধন-প্রকাশিত অন্যান্য পুস্তকাবলী

অবতারচরিত—৫ম সংস্করণ। শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য-প্রণীত। এই পুস্তক-পাঠে চরিত্র-কথার গল্পপ্রিয় পাঠক এবং ভক্তগণ ধর্ম ও ধর্মতত্ত্বের সন্ধান পাইবেন। মূল্য ২'০০।

শঙ্কর-চরিত—শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য-প্রণীত ৩য় সংস্করণ: আচার্য শঙ্করের অদ্ভুত জীবনী অতি সুললিত ভাষায় লিখিত। মূল্য ১৲।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বেদান্ত—স্বামী বিবেকানন্দ প্রণীত। ১৮৯৬ খৃঃ মার্চ মাসে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত বক্তৃতা এবং তৎপরবর্তী প্রশ্নোত্তর ও আলোচনা। বেদান্তের মূলতত্ত্ব অতি স্পষ্টভাবে ব্যক্ত: প্রশ্নোত্তর ও আলোচনায় ভারতীয় কৃষ্টি ও হিন্দুধর্মের মূল ভাব সাহসিকতার সহিত সরলভাবে উপস্থাপিত। পৃষ্ঠা ৫৫; মূল্য এক টাকা।

শিব ও বুদ্ধ—৭ম সংস্করণ। ভগিনী নিবেদিতা প্রণীত। ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য রচিত সরল ও সুখপাঠ্য আখ্যান। মূল্য ০'৭৫।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ—শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সর্বপ্রথম অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের বিস্তৃত ধারাবাহিক জীবনী। মূল্য—৫'০০।

ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ—৭ম সংস্করণ। স্বামী ব্রহ্মানন্দের কথোপকথন এবং পত্রাবলীর সংগ্রহ। প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু-লিখিত সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা। মূল্য ২'৫০।

মহাপুরুষ শিবানন্দ—স্বামী অপূর্বানন্দ-প্রণীত। ৩য় সংস্করণ। শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজীর বিস্তারিত জীবনী। মূল্য—৫'০০।

শিবানন্দ-বাণী—২য় ভাগ—৩য় সংস্করণ। স্বামী অপূর্বানন্দ-সংকলিত। মূল্য—২'৫০।

শ্রীরামানুজ-চরিত—স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ-প্রণীত, ৩য় সংস্করণ, ২৫৮ পৃষ্ঠা। শ্রীসম্প্রদায়ে প্রচলিত আচার্য রামানুজের বিস্তৃত জীবনবৃত্তান্ত বাংলা ভাষায় প্রকাশিত। আচার্যের জীবদ্দশায় খোদিত প্রতিমূর্তির ছবি এই গ্রন্থে আছে। মূল্য ৩. । উঃ গ্রাঃ পক্ষে ২'৭৫।

স্বামী অখণ্ডানন্দ—স্বামী অন্নদানন্দ-প্রণীত। এই পুস্তকে শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্নিধানে, তিব্বতে ও হিমালয়ে, স্বামীজীর সঙ্গে, দুর্ভিক্ষে সেবাকার্য, সেবাব্রতের প্রাণপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতি অধ্যায়ে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্যের পথিকৃৎ স্বামী অখণ্ডানন্দের ধারাবাহিক জীবনী। ডিমাই সাইজ, ৩১০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৪৲।

সাধু নাগমহাশয়—শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী প্রণীত। ১১শ সংস্করণ। যাঁহার সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন, "পৃথিবীর বহু স্থান ভ্রমণ করিলাম, নাগমহাশয়ের ন্যায় মহাপুরুষ কোথাও দেখিলাম না।"—পাঠক! তাঁহার পুণ্য জীবন-বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া ধন্য হউন। মূল্য ২'০০।

গোপালের মা—স্বামী সারদানন্দ-প্রণীত (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ হইতে সঙ্কলিত): অতুলনীয়-সাধননিষ্ঠ, পরমভক্ত গোপালের মা-র আদর্শ জীবনের সংক্ষিপ্ত কাহিনী। মূল্য ৫০ পয়সা।

লাটু মহারাজের স্মৃতিকথা—শ্রীচন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়-প্রণীত। ২য় সংস্করণ। শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও ঠাকুরের শিষ্যবর্গ সম্বন্ধে বহু অপ্রকাশিত ঘটনাবলীর সমাবেশ নিজ জীবনের কঠোর ত্যাগ-তপস্যার কথার অদ্ভুত প্রকাশভঙ্গীতে পাঠকগণ চমৎকৃত হইবেন। মূল্য—৪'০০।

স্বামী তুরীয়ানন্দ—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ-প্রণীত। বাল্যাবধি বেদান্তী এই মহারাজের জীবনের অদ্ভুত ঘটনাবলী-পাঠে চমৎকৃত হইবেন ৩৪০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য—৩'৫০।

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিষ্যগণের সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত একত্র এই প্রথম প্রকাশিত হইল। দুই ভাগে সম্পূর্ণ। প্রতি ভাগের মূল্য—৫'৫০।

ভগিনী নিবেদিতা—স্বামী তেজসানন্দ-প্রণীত। ইহাতে তাঁহার জীবনের মুখ্য ঘটনাবলীর সম্যক্ আলোচনা রহিয়াছে। ইহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে "ভগিনী নিবেদিতা-স্মৃতি বক্তৃতামালার" প্রথম বক্তৃতা। মূল্য—১'৫০

প্রাপ্তিস্থান:—উদ্বোধন কার্যালয়, বাগবাজার, কলিকাতা ৩

উদ্বোধন, কার্ত্তিক, ১৩৮০

বিষয়-সূচী

বিষয়-সূচী

বিষয়-সূচী

ভাল চা বলতে
টসের
চা
এ, টস এণ্ড সন্স
ফোন
২২-৪৭৮৫
কলিকাতা—১

দিব্য বাণী

তব রূপং মহাকালো জগৎসংহারকারকঃ।
মহাসংহারসময়ে কালঃ সর্বং গ্রসিষ্যতি ॥ ৩০
কলনাৎ সর্বভূতানাং মহাকালঃ প্রকীর্তিতঃ।
মহাকালস্য কলনাৎ ত্বমাদ্যা কালিকা পরা ॥ ৩১
কালসংগ্রসনাৎ কালী সর্বেষামাদিরূপিণী।
কালত্বাদাদিভূতত্বাদাদ্যা কালীতি গীয়তে ॥ ৩২

—মহানির্বাণতন্ত্র, ৪

জগৎ সংহার করে যে মহাকাল
সে তো তোমারি রূপ, জননী !
মহাপ্রলয়কালে সকলি গ্রাসে কাল
তাই তো নাম তার হয়েছে মহাকাল,
সে মহাকালেরেও গ্রাস মা তুমি তাই
কালিকা নাম তব, তারিণি !
আদি কারণ তুমি—তোমা হতে সবই
সৃষ্ট হয়েছে মা, প্রলয়ে মেশে সবই
তোমারই মাঝে, তাই তোমারে বলে সবে
আদ্যাশকতি মা, আদ্যা-কালিকা !
তুমি এ বিশ্বের সৃজন-বিনাশের
কারণ-রূপিণী মা, পালিকা।

কথাপ্রসঙ্গে

উদ্বোধনের গ্রাহক-গ্রাহিকা, লেখক-লেখিকা, বিজ্ঞাপনদাতা, পাঠক, শুভানুধ্যায়ী প্রভৃতি সকলকেই আমরা ৺বিজয়ার প্রীতিসম্ভাষণাদি জানাইতেছি এবং শ্রীশ্রীজগন্মাতার নিকট সকলের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ প্রার্থনা করিতেছি।

'সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশানাং শক্তিভূতা'

একতাল নরম মাটি লইয়া একটি পুতুল গড়িলাম। কিছুক্ষণ সেটিকে রাখিয়া দিলাম, সেটিকে লইয়া খেলা করিলাম। তারপর ভাঙিয়া আবার মাটির তাল করিয়া দিলাম। এখানে আপাতদৃষ্টিতে পুতুলটির সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশের কর্তা আমি—আমার ইচ্ছা, বুদ্ধি ও দৈহিক শক্তি – মন বুদ্ধি ও প্রাণ সমন্বিত দেহ এবং উহাকে 'আমি' বলিয়া বোধ করা—আমার দেহাত্মবুদ্ধি। যখন আমরা পোষাক তৈরি করি, ঘরবাড়ী, মোটর গাড়ী, রেডিও, রকেট, ঔষধ প্রভৃতি তৈরি করি, পরমাণু ভাঙ্গার চুল্লী তৈরি করি, তখনও এই একই কথা - আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় আমরাই এসবের ভাঙ্গা-গড়া করিতেছি। কিন্তু আসলে কি কেবল আমরাই করিতে পারি এসব?

না। বস্তুর নিজস্ব ধর্মও, যাহাকে প্রকৃতির নিয়ম বলি তাহারও কর্তৃত্ব রহিয়াছে এসব ভাঙ্গা-গড়ার কাজে। মাটির অণুগুলি যদি পরস্পরকে ধরিয়া না রাখিত, তাহা হইলে মাটি দিয়া আমরা পুতুল গড়িতে পারিতাম না; যেমন জল দিয়া উহা করিতে পারি না। তেমনি বস্তুর অণুপরমাণুগুলির মধ্যে যদি বিশেষ নিয়ম মতো চলিবার স্বাভাবিক ধর্ম না থাকিত—যদি কোন বিশেষ পরিবেশে দুই বা ততোধিক বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের অণুপরমাণুগুলির মিলনের সময় পরমাণুগুলি সর্বক্ষেত্রেই একটি বিশেষ পদ্ধতিতে পরস্পরের হাত ধরাধরি করিয়া দল বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া অণু না গড়িত, বা দলছাড়া হইয়া অণু না ভাঙ্গিত,—তাহা হইলে কোন রাসায়নিক প্রক্রিয়াতেই আমরা সাবান ঔষধ প্রভৃতি তৈরি করিতে পারিতাম না, প্রদীপ জ্বালাইতে পারিতাম না, উনুন ধরাইতে পারিতাম না, খাবার খাইয়া হজম করিতে পারিতাম না। আবার পরমাণুর ভিতরের কণাগুলির মধ্যে, তাহারও ভিতরকার শক্তির মধ্যে যদি কতকগুলি নিয়ম মতো পরিবর্তিত হইবার বা পরিবর্তন ঘটাইবার ধর্ম নিহিত না থাকিত, আমরা কখনই পারমাণবিক চুল্লীতে পরমাণু ভাঙিয়া শক্তি উৎপাদন করিতে পারিতাম না, পরমাণু জোড়া দিয়া হাইড্রোজেন বোমা তৈরি করিতে পারিতাম না। এক কথায় বস্তুর নিজস্ব ধর্ম না থাকিলে আমাদের পক্ষে কোন কিছু ভাঙা-গড়া – পদার্থের আকার-গত রাসায়নিক বা পারমাণবিক কোনও পরিবর্তন ঘটানো—কখনই সম্ভব হইত না।

কাজেই আমরা যাহা কিছু সৃষ্টি-বিনাশাদি করি, সেগুলির কর্তা কেবল আমরাই নই—সেগুলি করার শক্তি কেবল আমাদের দেহ-মন-বুদ্ধির শক্তিই নয় সেই সঙ্গে বস্তুর অন্তর্নিহিত তাহার নিজস্ব শক্তিও, প্রকৃতির নিয়মও। বরং বলা যায়, প্রকৃতির নিয়মই, বস্তুর ধর্মই সেগুলি করে, আমরা কেবল প্রয়োজনীয় যোগাযোগ ঘটাই, যে যোগাযোগ ঘটানো এই 'বস্তুর ধর্ম' নিজে নিজে করিতে পারে না, কারণ উহাতে ইচ্ছা-শক্তি নাই।

এ তো গেল আমরা যা কিছু ভাঙা-গড়া করিতেছি তাহার কথা। কিন্তু যে সব বস্তু লইয়া তাহা করিতেছি, বস্তুর যে ধর্ম বা প্রকৃতির নিয়মগুলি আছে বলিয়াই উহা করিতে পারিতেছি—সেই সব বস্তু ও নিয়ম সৃষ্টি করিয়াছে কে? কোন্ শক্তি? এই অচিন্তনীয় বিস্তার ও গভীরতাময় বিরাট বিশ্ব—বিজ্ঞানের এত উন্নতি সত্ত্বেও যাহার সীমার কোন সন্ধান মানুষ আজও পায় নাই, পরমাণু-চূর্ণেরও গভীরতর প্রদেশে ঢুকিয়া যাহার তলের সন্ধান পাওয়া দূরের কথা বিজ্ঞানীরা অধিকতর রহস্যেরই সম্মুখীন হইতেছে, যাহার অন্তর্গত প্রাণিদেহের মতো একটি নিখুঁত, অতি সূক্ষ্ম পদ্ধতিতে সাবলীলভাবে চালিত যন্ত্র তৈরি করা আজও মানববুদ্ধির অসাধ্য—সে বিশ্ব সৃষ্টি করিল কে? উহার স্থিতি ও বিনাশের কারণই বা কোন শক্তি?

•

জড়-বিজ্ঞান এখন পর্যন্ত যতটুকু জানিয়াছে তাহার ভিত্তিতে বলিতেছে, বস্তুর ধর্মই, প্রকৃতির নিয়মই এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছে, প্রকৃতির নিয়মেই ইহার মধ্যে পরিবর্তন ঘটিতেছে, স্থিতি-বিনাশাদিও হইতেছে। কিন্তু বস্তুর মূল উপাদান কে সৃষ্টি করিল? প্রকৃতির নিয়ম তো আর বস্তুর মতো কোন সত্তা নয়—স্বামী বিবেকানন্দ 'মায়া'-র যে সংজ্ঞা দিয়াছেন, প্রকৃতির নিয়ম বলিতে আমরা যাহা বুঝি, তাহাও তাহাই—ঘটনার বিবৃতি মাত্র। তাহা হইলে কাহার শাসনে বস্তু নিয়ম মানিয়া চলে? বিজ্ঞান এখনো তাহার সন্ধান পায় নাই। বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশের যে শক্তি, বিজ্ঞানীদের মতে সে শক্তির ভিতর কোন চেতনা ইচ্ছা বুদ্ধি প্রভৃতি নাই, ইট পাথর প্রভৃতি যেমন চেতনাহীন, ইচ্ছাহীন, সে শক্তিও তাই। আমাদের বুদ্ধিতে বিশ্বসৃষ্টির ধারণায় এই 'শক্তি'র ধারণার সঙ্গে 'জড়বস্তু'র (matter-এর) ধারণাও (ভারতীয় দর্শনের ভাষায় 'প্রাণ' এবং 'আকাশ'-এর ধারণাও) অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশের ব্যাপারে এ-দুটির কোনটিকে বাদ দিয়া কোন ধারণাই করা যায় না। জড়ের সত্তা শক্তি, শক্তির আধার জড়। বলা যায়, শক্তিই জড় সৃষ্টি করিয়াছে, জড়রূপে নিজেকে রূপায়িত করিয়াছে এবং উহাকেই নিজের আশ্রয় করিয়াছে। 'শক্তিই "আধারভূতা চ আধেয়া"—বিশ্বের আধার ও আধেয় দুই-ই'—ভারতীয় দর্শনের এই তত্ত্বটিকে আজ বোধ হয় আধুনিক বিজ্ঞানেরও একটি তত্ত্ব বলা যায়,—পার্থক্য শুধু এই শক্তির স্বরূপ লইয়া। জড়বিজ্ঞান আজ পর্যন্ত এই শক্তিকে অচেতন শক্তিরূপেই পাইয়াছে, ভারতীয় দর্শনে এই শক্তি চৈতন্যময়ী, ইচ্ছাময়ী—যাহা ভগবান, জগন্মাতা ঈশ্বর, সগুণ ব্রহ্ম প্রভৃতি নামে সর্বসাধারণের নিকট অভিহিত।

জড়বিজ্ঞানীরা বর্তমান যুগে বিশ্বের সৃষ্টি-বিনাশাদি বিষয়ে তাঁহাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষালব্ধ সত্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন জন যাহা অনুমান করেন, সেগুলির সমন্বিত রূপ খুব মোটামুটিভাবে এই রকম:

সীমাহীন শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে; সেই মহাশূন্যে[১] রাশিরাশি বস্তুকণার পুঞ্জ—হাইড্রোজেন-পরমাণু ও পরমাণু-চূর্ণের মেঘ ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। সেগুলি ক্রমে আবর্তিত হইতে থাকে এবং তাহার ফলে কেন্দ্রাভিমুখী আকর্ষণে ঘন হইতে ঘনতর, এবং তাহার ফলে বেশী চাপে ও

১ অবশ্য একেবারে শূন্য বলা যায় না। আমরা যে-ছায়াপথের বাসিন্দা—আমাদের সূর্য যে-ছায়াপথের অন্যতম তারকা, তাহাতে সূর্য-তারকাদির মাঝখানের মহাশূন্যে প্রতি ঘন সেন্টিমিটার স্থানে একটি করিয়া পরমাণু রহিয়াছে। আমাদের বায়ুমণ্ডলের তুলনায় অবশ্য ইহাকে শূন্যই বলিতে হইবে—বায়ুমণ্ডলের প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে পরমাণুর সংখ্যা পাঁচলক্ষ-কোটি-কোটি।

কণাগুলির ক্রমবর্ধমান পরস্পর-সংঘাতে উত্তপ্ত হইতে উত্তপ্ততর হইতে থাকে। সেগুলিই ক্রমে খুব ঘন হইয়া তারকার আকার নেয়, তাহার ভিতরের উত্তাপও খুব বেশী বাড়িয়া যায়। এই তারকাগুলির গর্ভেই প্রচণ্ড তাপ ও চাপে পরমাণু-চূর্ণগুলি পরস্পর মিলিত হইয়া প্রথমে হালকা এবং ক্রমে অধিকতর ভারী মৌলিক পদার্থের পরমাণু (হিলিয়াম, কার্বন, লোহা প্রভৃতির পরমাণু) সৃষ্টি করিতে থাকে। যাবতীয় মৌলিক পদার্থের জননী এই তারকাগুলি। ক্রমে তারকাটি আরো ঘন হইতে হইতে শেষে ভাঙ্গিয়া যায় এবং তাহার গর্ভস্থ মৌলিক পদার্থের পরমাণুগুলি বাহিরে ছড়াইয়া পড়ে—যেন সেগুলি ভূমিষ্ঠ বা জাত হয়। এই নবজাতকেরাই অনুকূল পরিবেশে পরস্পর মিলিয়া মিশিয়া, হাত ধরাধরি করিয়া দল বাঁধিয়া আমাদের পৃথিবীর ও অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহগুলির যাবতীয় বিচিত্র যৌগিক পদার্থের রূপ ধরিয়াছে—প্রাণিদেহ হইতে শুরু করিয়া ইট পাথর সব কিছুরই; হাইড্রোজন, কার্বন প্রভৃতি মৌলিক পদার্থের আকারেও অবশ্য রহিয়া গিয়াছে।

যে-শক্তি প্রকৃতির নিয়মকে কাজে লাগাইয়া জীবদেহের সৃষ্টি ও রক্ষণ করিতেছে, একটি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কণার মধ্যে একটি প্রাণিদেহের অসংখ্য বৈশিষ্ট্যের বিকাশের সম্ভাবনাকে নিহিত রাখিয়াছে ও অনুকূল পরিবেশে তাহার বিকাশ ঘটাইতেছে, সেই প্রাণের এবং জীবদেহে চেতনার সহিত যে ইচ্ছা ও বুদ্ধির প্রকাশ দেখা যায়, সেগুলির সৃষ্টি কিভাবে হইল? কোথা হইতে আবির্ভূত হইল সেগুলি? আধুনিক বিজ্ঞানের মতে এগুলি অণু-পরমাণু, আলো-তাপ প্রভৃতির মতো সত্তাবান কিছু নয়, এগুলি বস্তুর বিশেষ পরিবেশে সমুদ্ভূত 'গুণ' মাত্র—যেমন বস্তুর বর্ণ, গুরুত্ব প্রভৃতি তাহার গুণ।

একদল মানুষ কিন্তু সত্যান্বেষণের পথে এখানেই—জড়ের সীমাতেই—থামিতে পারেন নাই। আমরা দেখিয়াছি, আমরা যে সৃষ্টি-বিনাশাদি করি, তাহার কর্তা কেবল প্রকৃতির নিয়ম বা বস্তুর ধর্ম নয়, তাহার পরিকল্পনা, প্রয়োজনীয় যোগাযোগ ঘটানো প্রভৃতির জন্য ইচ্ছা, বুদ্ধি, চেতনা প্রভৃতিরও প্রয়োজন—মন-বুদ্ধি-সমন্বিত চেতন কোন সত্তার প্রয়োজন। একদল মানুষ যেমন বিশ্বসৃষ্টি প্রভৃতি কাজে কেবল বস্তুর ধর্মকেই কর্তা বলিয়াছেন এবং জড়বাদীরা এখনো বলিতেছেন, আর একদল তেমনি বলিয়াছেন মনবুদ্ধি-সমন্বিত কোন চেতন শক্তিই বা সত্তাই এই বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশের কারণ।[২] তাঁহারা ভাবিতেই পারেন নাই, যে-জীবজগৎ একটা নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুসারে সৃষ্ট হইয়া সুশৃঙ্খলভাবে চলিতেছে, তাহার পিছনে মনবুদ্ধি-সমন্বিত কোন চেতন চালক নাই। সত্যান্বেষণের পথে বহিঃপ্রকৃতিতে খুঁজিতে গিয়া, বিচার করিয়া ধরিতে গিয়া ব্যর্থ হইয়া তাঁহারা

২ বিজ্ঞানীদের মধ্যেও অনেকে এরূপ ধারণা পোষণ করিয়াছেন। নিউটন বলিয়াছেন, 'গ্রহ-ধূমকেতু-সমন্বিত এই পরম সুন্দর সৌরমণ্ডল কেবলমাত্র কোন বুদ্ধিমান শক্তিমান সত্তারই পরিকল্পনা-প্রসূত ও নিয়ন্ত্রণাধীন হতে পারে;··· এই সত্তা কেবল বিশ্বের আত্মারূপেই নয়, সর্বাধীশ্বর-রূপে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করছেন।' আর্থার এডিংটন বলিয়াছেন, 'বিশ্বের উপাদান হচ্ছে মন। ··· টেবিলটা, তার ওপরে রাখা কনুইটা, সবই সত্তাহীন, ছায়াময়— যাদুকর মনই এদের রূপান্তর ঘটাচ্ছে (বস্তুর প্রতীতি এনে দিচ্ছে)।' জেমস্ জীন্স্ বলিয়াছেন.' বিশ্বকে একটা বিরাট যন্ত্র নয়, বরং একটা বিরাট মন বলেই মনে হয়। ·· আমাদের এ ধারণা আসা শুরু হয়েছে যে, জড়ের রাজ্যে মন অনধিকার-প্রবেশকারী নয়, মনই জড়ের রাজ্য সৃষ্টি ও নিয়ন্ত্রণ করছে।'

অন্তঃপ্রকৃতির ভিতর—নিজ অন্তরেই, মনবুদ্ধি প্রভৃতিরই ভিতর ডুবিয়া উহার গভীর, গভীরতর, গভীরতম প্রদেশে সত্যের সন্ধান পাইয়াছেন। বিচার করিয়া নয়—মনবুদ্ধির সহায়তায় খোঁজ করিয়া নয়, তাহারও পারে গিয়া সত্যকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। অবশ্য ইহার পূর্বে বিচার করিতে কিছু বাকী রাখেন নাই তাঁহারা– অচেতন বস্তুর ধর্মই বিশ্বসৃষ্টির মূলে, অথবা মনবুদ্ধি প্রভৃতি যে নিয়মে চালিত– সেই অন্তঃপ্রকৃতির নিয়মই ইহার মূলে, অথবা আমাদেরই মতো মনবুদ্ধি-সীমিত-চেতনাসমন্বিত কেহ বিশ্বসৃষ্টি করিয়াছেন, বা কোন আকস্মিক ঘটনায় বিশ্বের সৃষ্টি-বিনাশাদি আরম্ভ হইয়া চলিতেছে, অথবা এ সবকিছুই সমবেতভাবে বিশ্বসৃষ্টির মূল—ইত্যাদি কোন সম্ভাব্য অনুমানই—আজ পর্যন্ত আমরা যাহা কিছু অনুমান করি তাহার কোনটিই সে বিচার হইতে বাদ পড়ে নাই।

তাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়া বলিয়াছেন, বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশ যে শক্তি-বলে ঘটিতেছে, তাহা অচেতন শক্তি নয়, সে শক্তি চৈতন্যময়ী, ইচ্ছাময়ী। বস্তুর ধর্ম, অন্তঃপ্রকৃতির নিয়ামক ধর্ম, বিরাট মন, বিরাট বুদ্ধি প্রভৃতি যাহা কিছুকে বিশ্বের সৃষ্টি, রক্ষা ও বিনাশের কারণ বলিয়া আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, সে-সবই এই মূল শক্তি হইতে উদ্ভূত, সে সবই এই মূল শক্তির রূপান্তর মাত্র—যেমন 'এনারজি'র রূপান্তর অণু-পরমাণু প্রভৃতি।

এই চৈতন্যময়ী ইচ্ছাময়ী মহাশক্তিই 'দেবাত্মশক্তি'—ব্রহ্মশক্তি। ইনিই তন্ত্রের 'কারণানন্দবিগ্রহা' সচ্চিদানন্দময়ী মা। ইঁহাকেই ঈশ্বর, ভগবান, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর, আল্লা, গড প্রভৃতি বলা হয়। বিশ্বের সৃষ্টি প্রভৃতির কারণ সম্বন্ধে, বিশ্বের মূল সত্তা সম্বন্ধে যাহা কিছু আমরা ধারণা করিতে, 'চিন্তা' করিতে পারি—সবই এই 'সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশানাং শক্তিভূতা' মহাশক্তি, মা। চিন্তার রাজ্যের সব কিছুই তিনি, তিনি চিন্তাস্বরূপিণী। আবার চিন্তার ওপারেও এই মা—'নির্গুণা' মা—শক্তির বিকাশ' সেখানে নাই। শ্রীরামকৃষ্ণের কথায়, সাপ যেন সেখানে চলিতেছে না, স্থির হইয়া শুইয়া আছে। এই নির্গুণা মা-ই উপনিষদের ব্রহ্ম। আবার যখন নির্গুণা মা সগুণা হন—তাঁহার মধ্যে শক্তির বিকাশ দেখা যায়, যখন তিনি জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশ করেন, তখন তিনিই সগুণ ব্রহ্ম, তিনিই কালী।

সেই নির্গুণা মায়ের, ব্রহ্মের মধ্যে শক্তির প্রথম বিকাশ ইচ্ছা রূপে। সেই ইচ্ছাসংযুক্ত নির্গুণা মা বা ব্রহ্মই জগন্মাতা ; সেই ইচ্ছাই,মা-ই ক্রমে অহংকার মনবুদ্ধি, স্থূলসূক্ষ্ম যাবতীয় বস্তু – অচেতন শক্তি, জড় বস্তু, মন বুদ্ধি প্রভৃতির এবং জড়বস্তু ও অচেতনশক্তির পরিচালক নিয়ম প্রভৃতি সবই হইয়াছেন। আপেক্ষিক সত্য হিসাবে আমরা যেমন পুতুল গাড়ী বাড়ী রকেট প্রভৃতির সৃষ্টি-বিনাশাদির কর্তা, তেমনি আপেক্ষিক সত্য হিসাবেই জড় প্রকৃতির নিয়মই বা বিদ্যুৎ আলো ইলেকট্রন প্রোটন পরমাণু অণু প্রভৃতি বস্তুর ধর্মই বিশ্বের সৃষ্টির-স্থিতি-বিনাশের শক্তি। আপেক্ষিক সত্য হিসাবেই সূক্ষ্মপ্রকৃতির নিয়ম—মনবুদ্ধি প্রভৃতির ধর্ম, বিরাট মন বিরাট বুদ্ধি—ব্রহ্মা বা হিরণ্যগর্ভই জগৎ-কারণ। কিন্তু জগতের সৃষ্টিস্থিতিবিনাশের মূল কারণ মূলশক্তি হইলেন ঈশ্বর বা জগজ্জননী আদ্যাশক্তি, বা চরম-সত্যের ইচ্ছা—ইচ্ছাসমন্বিত সচ্চিদানন্দ। তাঁহার ইচ্ছাই বিশ্বের সব কিছুর রূপ লইয়াছে, সব কিছু পরিবর্তন ঘটাইতেছে। মাকড়সা যেমন নিজের ভিতর হইতেই জাল সৃষ্টি করিয়া সেই জালের উপরেই থাকে, ইচ্ছাময়ী চৈতন্যময়ী মহাশক্তিও তেমনি নিজের ভিতর হইতেই জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহার মধ্যেই রহিয়াছেন—তিনি জগতের আধার ও আধেয় দুই-ই—

'আধারভূতা চ আধেয়া'।

এই সত্যটিকে সহজভাবে উপনিষদে বলা হইয়াছে, 'তিনি ইচ্ছা করিলেন, আমি বহু হইব' এবং ক্রমে জগৎরূপে রূপায়িত হইলেন। তন্ত্রে বলা হইয়াছে, বিশ্বপ্রসবিনী, বিশ্বপালিনী এবং বিশ্বের সংহারকর্ত্রী মা সচ্চিদানন্দ শিবের ইচ্ছারই মূর্তি। বাইবেলে বলা হইয়াছে, তিনি ইচ্ছা করিলেন 'আলো হউক, তখনি আলো হইল', ইত্যাদি।

সেই ইচ্ছাময়কেই আমরা ঈশ্বর বলি, মা বলি। মন-বুদ্ধির রাজ্যে জগৎকারণ লইয়া যাহা কিছুই আমরা ধারণা ও অনুমান করি না কেন, প্রত্যক্ষ-দর্শীদের প্রত্যক্ষ করা সত্য শ্রীরামকৃষ্ণ সংক্ষেপে বলিয়াছেন—'তাঁর ইচ্ছা ছাড়া গাছের পাতাটিও নড়ে না'।

তাঁহার কি ইচ্ছা, কে জানিবে? স্বামীজী বলিয়াছেন: মা (এই বিশ্ব লইয়া) কিভাবে লীলা করেন, তাহা কে জানে? তুমি একজন ঋষি?—এই মুহূর্তে মায়ের যাহা ইচ্ছা হইয়াছে অদূর ভবিষ্যতে যাহা অমোঘ বাস্তবরূপে পরিণত হইবে, বড় জোর সেইটুকুই তুমি জানিতে পার।

"কে জানে—হয় তো তুমি ক্রান্তদর্শী ঋষি!
সাধ্য কার স্পর্শ করে সে অতল গভীর গহন,
যেখানে লুকানো রয় মা'র হাতে অমোঘ অশনি!

হয়তো পড়েছে ধরা উৎসুক করুণনেত্র শিশুর দৃষ্টিতে
দৃশ্যের আড়ালে কোন ছায়ার সংকেত,
মুহূর্তে যা হতে পারে দুর্নিবার ঘটনাপ্রবাহ।
আসে তারা কখন কোথায়, মা ছাড়া কে জানে!

... ...

সংসারের শ্রেষ্ঠ বিধি—খেয়াল তাঁহার
ইচ্ছামাত্র অমোঘ বিধান।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

[মূল কবিতা: Who Knows How Mother Plays]

ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব*

স্বামী সারদানন্দ

তেজচন্দ্র (মিত্র—আন্দাজ ৪৯ বয়সে ১৬।৯।৪২ বাগবাজারে সাধুমুখে প্রভুর নাম শুনিতে শুনিতে লোভনীয় গঙ্গালাভ) তেজচন্দ্রের নিকট প্রাপ্ত প্রথম দর্শন—১৮৮৩ গ্রীষ্মকালে (April ?) হরি বাবুর (তুরীয়ানন্দ) সঙ্গে যাওয়া। হরি—'চ, সাধু দেখে আসি'। তে-'চলুন'। দক্ষিণেশ্বরে সেদিন কে কে উপস্থিত—রবিবার—বলরাম, মাষ্টার মশাই। ঠাকুর নাম ধাম জিজ্ঞাসা ক'রে—"বেশ, বেশ, এখানে আসা যাওয়া করো"। তারপর হরিমহারাজকে তেজুর বিষয় জিজ্ঞাসা করা আড়ালে। দ্বিতীয় দর্শন—হরি মহারাজকে বল্লেন 'এবার যেদিন যাবি, তুই একলা যাবি'। একদিন হরির বাড়ীতে দেখা পেলুম না। তাই বরাবর দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হলুম—ঠাকুর দেখে খুসী—'এসেছে, বেশ, বেশ'। সেদিন কে কে ছিল মনে নাই। তারপর দক্ষিণের লম্বা বারাণ্ডায় (শনিবার) বুকে জিভে, হাত দিয়ে, (দীক্ষা) দিলেন। ঠা—তোমায় কাকে ভাল লাগে, কোন্ দেবতাকে ? তে—চুপ করে রয়েচি। ঠা—তুমি বলবে না, বুঝি ? আচ্ছা,—একে, না ? (মা কালীকে দেখিয়ে) তে— (ঘাড় নাড়া) —ঠাকুর কর্তৃক ঐ মন্ত্র দিয়ে দেওয়া। পরে—তে—মশাই, আপনি তো এই কল্লেন, কিন্তু আমাদের পৈতৃক গুরু আছে যে, সে রাগ করলে তো খারাপ হবে না ? ঠা—ক্যান্ রে ? তার কাছ থেকেও মন্ত্রটা নিয়ে নিবি। আর যদি মন্ত্র না নিস্, তো তার যা পাওনা থোওনা, তা তাকে দিবি। —২য় দর্শনের দিন—পূর্বদক্ষিণের বারাণ্ডায় ঠাকুর খাইয়ে দিলেন। খেয়ে দেয়ে, সমস্ত দিন থেকে চলে আসা। ৩য় বা ৪র্থ দর্শনের দিন স্বামীজীর সহিত দেখা। বাবুরামের সহিতও দেখা হয়। ১৮৮৪ সালের জ্যৈষ্ঠ অমাবস্যা ফলহারিণী পূজার দিন গিয়েছি, হরি কি নারায়ণও ছিল। বল্লেন 'আজ রাত্রে তোকে থাকতে হবে'। এদিকে উনি বলচেন, আর তখন বাড়ী ছেড়ে কোথাও কোনদিন থাকি টাকি নি—মানে একটা বিষম 'কি করি' 'কি করি' তোলাপাড়া হতে লাগলো। বল্লুম, মশাই, এখানে থাকবো, কোথায় খাবো ? ঠা—'সে তোর ভাবতে হবেনি, আমি তোকে খাওয়াব।' কাজেই থেকে গেলুম, হরি বা নারায়ণকে দিয়ে ব'লে পাঠালুম। রাত দুপুরের সময় আমায় ডেকে

* শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গের জন্য সংগৃহীত তথ্য হইতে [স্বামী সারদানন্দের ডায়েরীর আংশিক প্রকাশ 'ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব' পুস্তিকা হইতে]। —স:

নিয়ে কালীঘরে গেলেন ও পূর্বোক্ত ভাবে মন্ত্র দিয়ে দিলেন। তারপর ১টা ১॥ টায় খাওয়ালেন।

প্রথম দর্শনের দিন জিজ্ঞসা করেন—'বে করেছিস্' ? তে—'আজ্ঞে হাঁ'। ঠা—তা, করেছিস্, করেছিস্। —কালীপূজার দিন—'তোর আর আসতে হবেনি। তা ভাবতে হবেনি তোকে। বেশী ছেলে পুলেও হবেনি'। (ইঁহার একমাত্র পুত্র)—পরে একদিন—'তোর পরিবারকে একদিন দেখাতে পারিস ?' তে—কেমন ক'রে দেখাব মশাই ? (পারিবারিক বেজায় আবরু বিধায়—সঃ) ঠা—'আচ্ছা, হরিকে একদিন দেখাস, তা হলেই হবে'। (তারপর একদিন হরিকে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করেন। হরি বলেন, বেশ ভাল, ইত্যাদি।) মন্ত্র দেবার পর ঘরে এসে সব ছবি দেখিয়ে বল্লেন, 'তুই কি চাস্' ? তেজ —মনে উঠলো, টাকা চাই। —চুপ করে থাকা। ঠাকুর—আচ্ছা, আচ্ছা বুঝেছি, তুই কি চাস্। (তারপর ঘরের সব ছবি দেখিয়ে) এর ভেতরে কি নিবি ? তে—আপনার ঘরের জিনিস, আমি নেব না। —পরদিন সকালে হেঁটে ফেরা বাড়ীতে। বাবুরামের তেজচন্দ্রকে একসময় প্রথম প্রথম জিজ্ঞাসা, ঠাকুরকে কেমন দেখলে ? তেজচন্দ্রের কিছু না বলা—'কি ভাবি আপনাকে তা বলবো কেন' ?—বাগবাজার Gymnastic আখড়ার ধারে একদিন ঠাকুরের তেজচন্দ্রের জন্য (তে—পালওয়ান ছিলেন, সঃ) খাবার নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা। ঠাকুরের সঙ্গে মণি মল্লিকের বাড়ী উৎসবে যাওয়া, অধর সেনের বাড়ী যাওয়া, রামদাদার বাড়ী হরিশ্চন্দ্রের কথা শুনিতে যাওয়া। ··· যদুর মাতাকে ঠাকুরের শিক্ষা দেওয়া—মাহেশের রথে ঠাকুরের সঙ্গে যাওয়া।

নিবেদন

উদ্বোধনের বহুসংখ্যক গ্রাহক-গ্রাহিকা পত্রে ও ফোনে জানাইয়াছেন যে তাঁহারা 'শারদীয়া সংখ্যা উদ্বোধন' পান নাই। সকলের পত্রের উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় নাই, এত অধিকসংখ্যক পত্রিকা পুনরায় পাঠানও সম্ভব নয়। পূজার সময় পোষ্ট অফিসের গোলযোগের জন্য এরূপ ঘটিয়াছে, মনে হয়; আমরা পি. জি. এম.-কেও এবিষয়ে পত্র দিয়াছি। আমাদের মনে হয়, এতদিনে সকলেই পত্রিকা পাইয়া গিয়াছেন। যদি এখনও কেহ না পাইয়া থাকেন, দয়া করিয়া জানাইলে তাঁহাদের নিকট দ্বিতীয়বার পত্রিকা পাঠাইয়া দেওয়া হইবে।—সম্পাদক

বৃন্দাবনে শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির ও তার আধ্যাত্মিক ভিত্তি

স্বামী বীরেশ্বরানন্দ

বৃন্দাবন একটি পবিত্র তীর্থ, ভারতের পবিত্র তীর্থস্থানগুলির অন্যতম। বৃন্দাবনই বোধ হয় একমাত্র তীর্থ যা তিনজন প্রধান অবতারের— শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণের—পাদস্পর্শধন্য। বৃন্দাবন শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলাভূমি, তাঁর বহু দিব্য লীলার—বিশেষ ক'রে 'ভালবাসার জন্যই ভালবাসা'-রূপ উচ্চ আধ্যাত্মিক আদর্শের, অহেতুকী ভক্তির লীলার ক্ষেত্র এটি; শ্রীকৃষ্ণের প্রেমাস্পদ শ্রীরাধা ছিলেন প্রেমের মূর্ত বিগ্রহ। বাস্তবিক, এখানকার ধূলিকণাও পবিত্র। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, বৃন্দাবনের রজ চরম সত্য ব্রহ্মেরই প্রতীক, এবং সেজন্য এখান থেকে রজ নিয়ে গিয়ে তিনি দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটীতলে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। কাজেই এই বৃন্দাবনে, যা আমাদের দেশের প্রাচীন সংস্কৃতি ও ধর্মের কেন্দ্রগুলির অন্যতম, বহু মহাপুরুষের আগমনে যার মহিমা আরো বেড়েছে, সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণের একটি মন্দির থাকা প্রয়োজন —যাতে সেখানে সমাগত তীর্থযাত্রীদের মাধ্যমে আধুনিক জগতের প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী সমগ্র ভারতের জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। এখানে বহু মন্দির আছে, তবু আর একটি মন্দিরের, শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরের স্থান-সঙ্কুলান হয়ে যাবে।

অসীম ভগবানকে কোন সসীম রূপে দেখার, এবং যেখানে তাঁর উপস্থিতি অনুভব করা যায় এমন একটি বিশেষ স্থানে তা দেখার প্রয়োজন সব সময়ই মানুষ বিশেষভাবে অনুভব করে আসছে। যে-কোন ধর্মে, বিশেষ করে আমাদের ধর্মে, মন্দিরের উদ্ভবের পেছনে এই আগ্রহই ক্রিয়াশীল। বৈদিক যুগে কোন মন্দির ছিল না, কিন্তু প্রতি গৃহেই বেদীর ওপর পবিত্র অগ্নি সংরক্ষিত হত, দেবোদ্দেশে আহুতি প্রদত্ত হত সেই অগ্নিতে। কিন্তু বৌদ্ধ যুগে, বিশেষ করে বৌদ্ধযুগের প্রথমাংশের পর থেকে পরিবর্তন দেখা গেল। বৌদ্ধযুগে 'স্তূপ' হল, যা ক্রমে 'চৈত্য' ও 'বিহার'-এ পরিণত হয়—তার ভেতর অনেকগুলিতে বুদ্ধের মূর্তিও স্থাপিত হয়। এর ফল হল এই, বৌদ্ধধর্মের অবনতি শুরু হলে পুনরুদীয়মান হিন্দুধর্ম এ সব ভাব আত্মসাৎ করে নিল—আমাদের বহু মন্দির ও বহু দেবমূর্তি নির্মিত হল। বড় বড় মুনি-ঋষি এবং অবতারগণের মন্দিরও হল। শ্রীমদ্‌ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, 'দু-ধরণের মন্দির আছে দেবতাদের মন্দির এবং মুনি-ঋষি ও অবতারগণের মন্দির। কোন কামনা নিয়ে মুনি-ঋষিদের পুজো করলে তা সফল হয়; আবার নিষ্কাম ভাবে তাঁদের পুজো করলে তাতে মুক্তিলাভ হয়।'

যে কোন সম্প্রদায়ের ধর্মজীবন গঠনে এই পবিত্র মন্দিরগুলির বিশেষ স্থান আছে।

মানবজাতির মহান্ আচার্যগণ বলেছেন, ভগবানের মূর্তি প্রাণহীন প্রতিমা মাত্র নয়, সেগুলি জীবন্ত। এজন্য জীবিত মানুষের সেবা যেভাবে করে, ভগবানের কোন মূর্তির সেবাও সেভাবে করতে হয়। মূর্তিতে অধিষ্ঠিত ভগবানকে শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য দিতে হয়। মূর্তি যে জীবন্ত, সাধু-সন্তদের জীবন থেকে তার বহু উদাহরণ পাওয়া যায়। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনেও এরূপ বহু ঘটনা আছে। এখানে সেগুলির একটি মাত্র উল্লেখ করছি। শ্রীরামকৃষ্ণের মনে সন্দেহ জাগে, দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে

মা-কালীর যে মূর্তির, তিনি পূজা করছিলেন তা জীবন্ত, না পাষাণ-বিগ্রহমাত্র। এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হবার জন্য একদিন তিনি একটু তুলো নিয়ে মা-কালীর নাকের কাছে ধরলেন। দেখে আশ্চর্য হলেন, তুলো নড়ছে—তার মানে মা নিঃশ্বাস নিচ্ছেন। এতে বোঝা গেল, সেখানে পাষাণ-বিগ্রহমাত্র নয়, মা-ই রয়েছেন। তাই তিনি বলতেন, 'আমার মা মৃন্ময়ী নন, চিন্ময়ী।'

এতে বোঝা যায়, মূর্তিতে ভগবান অধিষ্ঠিত, মূর্তি পূজা করে আমরা মুক্ত হতে পারি। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে এ সত্যও প্রমাণিত—মূর্তিতে জগন্মাতার আরাধনা করে তিনি সর্বোচ্চ অনুভূতি লাভ করেছিলেন।

ভারতের সর্বত্রই এই মন্দিরগুলি সাধু-সন্তদের আকর্ষণ করেছে এবং তাঁদের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করেছে। এঁদের অনেকেই মন্দির-সান্নিধ্যে বাস করেছেন, মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত মূর্তির আরাধনা করে সত্য লাভ করেছেন। আধুনিক যুগে শ্রীরামকৃষ্ণ এঁদেরই অন্যতম। যে কালীবাড়ীতে থেকে তিনি মা-কালীর পূজো করতেন, সেটি এখন পৃথিবীর সব দেশের মানুষের কাছে তীর্থক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। নারদ বলেছেন যে, সাধু-সন্তদের দ্বারা তীর্থ পবিত্রীকৃত হয়।[১]

ভাগবতে আছে, উদ্ধবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, 'সুদৃঢ় মন্দির নির্মাণ ক'রে তার মধ্যে আমার মূর্তি প্রতিষ্ঠা করতে হয়; সেই মন্দিরের সংলগ্ন সুরম্য পুষ্পোদ্যান থাকবে। ভূমি, বিপণি, নগর ও গ্রাম দান করে সেই মন্দিরে যাতে নিত্যপূজা, বিশেষ বিশেষ দিনে সভা, উৎসব প্রভৃতি চলতে পারে তার ব্যবস্থা করে দিতে হয়। এরকম যে করে সে আমারই সমান মহিমান্বিত হয় —সাযুজ্য মুক্তি লাভ করে।'[২]

বহু ভক্তের সাহায্য নিয়ে এই বৃন্দাবনে একটি বৃহৎ মন্দির নির্মিত এবং তার মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, নিত্যপূজা চালাবার ব্যবস্থাও অনেকখানি করা হয়েছে; এইসব কাজের জন্য যাঁরা সাহায্য করেছেন, শ্রীকৃষ্ণের কথামতো তাঁরা সত্যই ভাগ্যবান।

স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে জনৈক ভক্তের বাড়ীতে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পূজান্তে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করার সময় এই প্রণাম-মন্ত্র রচনা করেন তিনি: 'ওঁ স্থাপকায় চ ধর্মস্য সর্বধর্মস্বরূপিণে। অবতারবরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ॥'—ওঁ। ধর্মস্থাপক, সর্ব ধর্মের মূর্ত বিগ্রহস্বরূপ, অবতারশ্রেষ্ঠ রামকৃষ্ণ! তোমাকে প্রণাম করি।

এর অর্থ অনুধাবন করা যাক। স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রথমেই বলেছেন 'ধর্মস্থাপক'। ধর্মস্থাপন সব অবতারেই সাধারণ, এদিক থেকে শ্রীরামকৃষ্ণজীবনে এটি বিশেষত্ব নয়। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন, অবতারগণ এই জন্যই আসেন।

স্বামীজী এর পরই শ্রীরামকৃষ্ণকে বিশেষিত করেছেন 'সর্বধর্মস্বরূপিন্' বলে। পূর্ব অবতারগণ সকলেই আমাদের সংস্কৃতির সাধারণ ধারা, সমন্বয়ের ভাব গ্রহণ করেছেন। আমাদের ধর্মজীবনে এই সমন্বয়ের ভাব বৈদিক যুগ থেকেই বর্তমান। একজন প্রাচীন ঋষি ঘোষণা করেছেন, 'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি।'—সত্য এক, বিপ্রগণ তাঁকে বহুনামে অভিহিত করেন। তখন থেকে শ্রীকৃষ্ণের যুগের পূর্ব পর্যন্ত এই সমন্বয়ের ভাব হিন্দুধর্মে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল। তারপর বিরোধের সুর উঠেছিল; শ্রীকৃষ্ণ এসে তৎকালে প্রচলিত সব আধ্যাত্মিক ও সামাজিক আদর্শের আবার সমন্বয় সাধন করেন। মধ্যযুগে শঙ্করাচার্য এসে আবার

১ নারদীয় ভক্তিসূত্র, ৭০ ২ শ্রীমদ্ভাগবত, ১১।২৭।৫০-৫১

ছয়টি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সমন্বয় সাধন করে নিজ দার্শনিক মতবাদ, অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠা করেন। এই জন্যই তাঁকে 'ষণ্মতস্থাপনাচার্য' বলা হয়। ছয়টি সম্প্রদায় হল: সৌর, গাণপত্য, স্কান্দ, শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণব। সূর্য, গণেশ, স্কন্দ, শক্তি, শিব ও বিষ্ণু—এঁদের মধ্যে যিনি যে-সম্প্রদায়ের উপাস্য দেবতা, সে-সম্প্রদায় মনে করে তিনিই হলেন চরম উপাস্য। আজও কোন পূজা করার আগে সূর্যাদি পঞ্চদেবতার[৩] পূজা আগে করতে হয়।

কাজেই জাতির মধ্যে এবং তার সংস্কৃতির ধারায় সমন্বয়ের ভাব বর্তমানই ছিল। কিন্তু আধুনিক যুগে মানুষ বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন হয়েছে—সে আর 'বিশ্বাস' করে কিছু গ্রহণ করতে চায় না, সব কিছুরই প্রমাণ চায়। কাজেই গীতার বাণী বিশ্বাস করে সব ধর্মাদর্শকে স্বীকার করা—এযুগের উপযোগী হবে না। শঙ্করাচার্যও একই ভাবে, বোধ হয় বুদ্ধিবৃত্তির ওপর একটু বেশী জোর দিয়ে, শিক্ষা দিয়েছিলেন; সমন্বয় স্থাপনের জন্য বৈজ্ঞানিক ধারায় বা হাতে-নাতে কিছু করা হয়নি। শ্রীরামকৃষ্ণ কিন্তু বৈজ্ঞানিক ধারায় চলেই সর্বধর্মের সমন্বয় করে ঘোষণা করেছেন যে, সব ধর্মই ভগবানলাভের বিভিন্ন পথ। প্রত্যেক ধর্মনির্দিষ্ট পথে সাধনা করে তিনি একই সত্যে উপনীত হয়েছেন। নিজ সাধনলব্ধ এই অভিজ্ঞতা থেকেই তিনি সিদ্ধান্ত করেছেন যে, সব ধর্মই একই লক্ষ্যে পৌঁছবার বিভিন্ন পথ। সেজন্যই স্বামীজী তাঁকে 'সর্বধর্মস্বরূপিন্'—সব ধর্মের মূর্তবিগ্রহ বলেছেন। আধুনিক জগৎ এই বৈজ্ঞানিক পন্থাবলম্বনে চলার ও প্রত্যক্ষ অনুভূতির প্রমাণই চায়; শ্রীরামকৃষ্ণ তা দিয়েছেন।

তারপর তৃতীয় বিশেষণ 'অবতারবরিষ্ঠ'—অবতার-শ্রেষ্ঠ। প্রশ্ন উঠতে পারে, একজন অবতারের সঙ্গে অন্য অবতারের কোন পার্থক্য থাকতে পারে কি ক'রে? একই ভগবান তো রাম, কৃষ্ণ, গৌরাঙ্গ ও শ্রীরামকৃষ্ণ হয়ে আসেন,—তাঁদের মধ্যে পার্থক্য থাকবে কি ভাবে? আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি। উদাহরণটি একেবারে ঠিক ঠিক হবে না; তবে বিষয়টা বোঝার পক্ষে খুব কাছাকাছি হবে, তাই বলছি। কোন অভিনেতা বিভিন্ন নাটকে বিভিন্ন চরিত্রের অভিনয় করেন, এবং দলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতা বলে তিনি ঘোষিত। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা তো বলে থাকি, 'সে অমুক নাটকে অমুক চরিত্রের অভিনয়টিই সব চেয়ে ভাল করেছে, অতি চমৎকার করেছে।' এতে কি বোঝায়? বোঝায় যে, এই বিশেষ চরিত্রটির অভিনয়ে সে তার অন্তর্নিহিত সব দক্ষতার বিকাশের শ্রেষ্ঠ সুযোগ পেয়েছে—যে-সুযোগ অন্য চরিত্রগুলির ভিতর পায়নি। তাই আমরা বলি, 'এই অভিনয়টিই তার শ্রেষ্ঠ অভিনয়।' সেই রকম, দেশের এবং যুগের প্রয়োজন অনুসারেই অবতারগণ যেন অভিনয় করে যান, যাতে সে প্রয়োজন মিটে যায়।

বৈদিক যুগের প্রয়োজন তত অধিক ছিল না। শ্রীকৃষ্ণের সময় প্রয়োজন খুব বেশী ছিল, তিনি তা মিটিয়েও দিয়েছিলেন। সেজন্য এখনো সারা ভারতে এবং বিদেশেও তিনি পূজিত হচ্ছেন। ভাগবতে আছে, 'এসব অবতার (শ্রীকৃষ্ণের পূর্বে যে সব অবতার এসেছেন, তাঁরা) ভগবানের কলা বা অংশ মাত্র, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ভগবান স্বয়ং।'[৪]

এখন শ্রীরামকৃষ্ণের কথায় আসা যাক।

৩ দক্ষিণভারতে কুমার বা স্কন্দের পূজা খুবই জনপ্রিয় বলে শঙ্কর স্কন্দকে বাদ দিতে পারেননি স্মার্তেরা অবশ্য স্কন্দ ছাড়া বাকী পঞ্চ দেবতাকেই গ্রহণ করেন।

৪ শ্রীমদ্ভাগবত, ১।৩।২৮

স্বামীজী তাঁকে 'অবতার-বরিষ্ঠ', অবতারগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলেছেন। এতে তিনি বলতে চাইছেন না যে, ব্যক্তিরূপে একই ভগবানের মধ্যে কোন পার্থক্য, কোন শ্রেষ্ঠতা রয়েছে; তাঁর বক্তব্য হল, যুগপ্রয়োজন মেটাবার জন্য তাঁর শক্তির প্রকাশের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। আধুনিক-কালে পৃথিবী জুড়ে বহুবিধ বিরোধ - ধনী-দরিদ্রে বিরোধ, জাতিতে-জাতিতে বিরোধ, বর্ণে-বর্ণে বিরোধ, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিরোধ এবং স্ত্রী-পুরুষে বিরোধ। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন এ সব বিরোধেরই সমাধান করেছে। আগেই দেখে এসেছি, ধর্মে ধর্মে যে বিরোধ, তার সমাধান তিনি দিয়ে গেছেন। জাতিগত এবং সামাজিক ও পারিবারিক ক্ষেত্রে বিরোধের সমাধানও তিনি দিয়ে গেছেন। তিনি বলেছেন যে, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে একই আত্মা রয়েছেন, এবং এই দৃষ্টিকোণ থেকে জগৎকে দেখলে এবং জাগতিক ব্যাপারে তদনুসারে আচরণ করলে জীবনের কোন ক্ষেত্রে কোন বিরোধই থাকতে পারে না। এই ভিত্তির ওপরই আমরা এক-পৃথিবী গড়ে তুলতে পারি—যার কথা আজ বহু মনীষী ও নেতার মুখে শোনা যাচ্ছে। তাঁরা এক-পৃথিবীর কথা বলছেন বটে, কিন্তু তার জন্য কোন ভিত্তি-ভূমি নেই। কেবল শ্রীরামকৃষ্ণের উপলব্ধিতেই এই ভিত্তি পাওয়া যায়। প্রত্যেকের ভেতর তিনি একই আত্মাকে প্রত্যক্ষ করেছেন, তাই তাঁর সমদৃষ্টি ছিল। সকলকেই সমভাবে দেখতেন তিনি, সেজন্য তাঁর কাছে 'পর' বলে কিছু ছিল না, সবাই ছিল তাঁর আপনজন। কাজেই সমগ্র জগতের প্রয়োজনই তিনি মিটিয়ে গেছেন—কোন বিশেষ অঞ্চল বা বিশেষ সম্প্রদায়ের নয়। সমস্যা ছিল সমগ্র মানবজাতির; সে সমস্যার সমাধান তিনি করে গেছেন। আর ঈশ্বর-বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন নিজের উপলব্ধি দিয়ে।

জগতে আজ আগ্রাসী মনোভাব প্রবল—এমনকি প্রতিবেশীর ধনাপহরণ করেও মানুষ ধনী হতে চায়। এই মনোভাব যখন চরমে উঠেছে, তখন শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন জগৎকে দেখাচ্ছে চরম ত্যাগের ভাব। কোন ধাতুদ্রব্য তিনি স্পর্শ করতে পারতেন না। তাঁর বিছানার নীচে কোন ধাতুদ্রব্য রেখে দিলেও—যা একবার স্বামীজী করেছিলেন—সে-বিছানায় তিনি বসতে পারতেন না, স্পর্শমাত্র বৃশ্চিক-দংশনের মতো যন্ত্রণা অনুভব করতেন। তাঁর কাঞ্চন এবং বিষয়-ত্যাগ কত তীব্র ছিল, এতেই তা বোঝা যায়। একাধারে তিনি গার্হস্থ ও সন্ন্যাস জীবনের সমন্বয় করেছিলেন। নিজ পত্নীকে তিনি ত্যাগ করেননি, গ্রহণ করেছিলেন; এই দাম্পত্য-সম্পর্ক অতি উচ্চাঙ্গের, অতি পবিত্র, অনবদ্য। এভাবে তিনি একাধারে গার্হস্থ ও সন্ন্যাস জীবনের সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন। বহুদিক থেকেই দেখা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন পূর্বগ অবতারগণের জীবনের চেয়ে জগতের কাছে অনেক বেশী তাৎপর্যপূর্ণ। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই তাঁকে অবতারবরিষ্ঠ বলা হয়। নইলে আর পার্থক্য কোথায়—একই ভগবান তো বিভিন্ন দেহ নিয়ে অবতীর্ণ হন। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেই বলেছেন, 'যে রাম, যে কৃষ্ণ, সেই-ই ইদানীং রামকৃষ্ণ।' চৈতন্যদেবও বাসুদেব সার্বভৌমকে নিজের ষড়্‌ভুজ রূপ দেখিয়ে এ তত্ত্ব বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণও বলেছেন, 'জগতের কল্যাণের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।' অবশ্য যুগের বা দেশের বা জগতের প্রয়োজন অনুসারে শক্তির বিকাশে পার্থক্য থাকে। সেই হিসেবেই বলা হয়, শ্রীরামকৃষ্ণ অবতারবরিষ্ঠ।

আমরা আগেই বলেছি, শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্ম-স্থাপনের জন্য এসেছিলেন। কিন্তু আপত্তি উঠতে পারে, 'কই, তার লক্ষণ তো কিছু দেখছি না—চারিদিকে কেবল স্বার্থপরতা, বিষয়বুদ্ধি,

সংঘর্ষ এবং ঘৃণাই তো দেখা যাচ্ছে!' আমার বক্তব্য, তিনি বাণী দিয়ে গেছেন, এবং ধীরে ধীরে সারা জগতেই, এমনকি আশা করা যায় না এমন সব জায়গাতেও সে বাণী কাজ করে চলেছে। এতেই বোঝা যায়, তাঁর চিত্ত-আলোড়নকারী বাণীর জন্য মানুষের কী তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও আগ্রহ রয়েছে। যে আধ্যাত্মিক শক্তিকে জগতের ওপর ক্রিয়াশীল করা হয়েছে, তার মধ্যে নবযুগ প্রবর্তনের শক্তি ও সম্ভাবনা নিহিত। পুরাতন যুগ চলে যাচ্ছে, নবযুগ আরম্ভ হচ্ছে সেই সন্ধিক্ষণে বাস করছি আমরা।

মানুষের ভগবান

শ্রীকালিদাস রায়

মানুষের ভগবান,
তোমার শাসন নয় তো দণ্ড-দান।
নহ তুমি প্রভু সর্বশক্তিমান
নিজের বিধানে নিজেই বন্দী তুমিও যে অক্ষম —
করিতে তাহার বিতথ ব্যতিক্রম।
মোদের দুঃখ যাতনা যা কিছু সেই বিধানের ফল,
তাই পার শুধু মুছাতে চোখের জল॥

মানুষ কাঁদিয়া ডাকে
প্রতিকার তার করিতে পার না তাই বুকে ধরো তাকে।
ব্রহ্ম তো নও, মানুষের ভগবান,
করুণাময় হে, তুমি যে হৃদয়বান্।
তব মানুষের দুখের অন্ত নাই,
তোমার নয়ন সতত সজল তাই॥

দুঃখীর ভগবান,
নাই তাই তব দুঃখ হইতে কখনও পরিত্রাণ।
তোমার চোখের জলে
এ মরু ধরণী চিরশ্যামল ভরপুর ফুলে ফলে।
সেই তো করুণা তব
তাই এ ভুবনে রূপ ধরে নব নব॥

কাঁদিল শ্রীরাম দণ্ডকবনে সীতা জননীর সনে।
তুমি কাঁদিতেছ জীবজননীর এই দণ্ডকবনে।
নিজ অপরাধে মানুষ তাহার করিলে দণ্ডভোগ
দুর্বল সে যে, তার অশ্রুতে করিছ অশ্রুযোগ॥

শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিশ্বমানবের ঐক্য

ডক্টর অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

মানব-ইতিহাসের অর্থ

বিবর্তন তত্ত্বের টীকাভাষ্য অনুসারে জড়-বিজ্ঞানী বললেন, প্রাকৃতিক উদ্বর্তনের ফলে পাশব জীব দেহে-মনে ক্রমশঃ চৈতন্যময় জীবে পরিণত হল। ভক্ত বলবেন, ঐশী শক্তির ইচ্ছা এবং লীলাবশে জীবসত্তার আবির্ভাব। কয়েক সহস্র বৎসর ব্যাপী ঐতিহাসিক কালবিবর্তনধারা অনুসরণ করলে দেখা যাবে, মানবেতর প্রাণীর বিবর্তন মুখ্যতঃ তার দেহের মধ্যে রয়ে গেছে। তার বিবর্তন মূলতঃ শারীর-বিবর্তন। অপর দিকে মানুষের বিবর্তন প্রধনতঃ চেতনার বিবর্তন। একদা মানুষ গুহাবাসী ছিল। জড় প্রকৃতির কাছে সে ছিল যূপবদ্ধ পশুর মতো। প্রাগৈতিহাসিক মানুষকে প্রায় চতুষ্পদ জন্তুর সহোদরই মনে হবে। পশু যেমন দেহদশাধীন ও দেশ-কালের সহব্যাপী, প্রাচীন নরাকার জীবগুলিও ছিল প্রায় অনুরূপভাবে সীমাবদ্ধ। কিন্তু পশু-সহচর ও প্রকৃতি-তাড়িত ভীরু মানবক বহু সহস্রাব্দের সুকঠোর তপস্যায় ক্রমে ক্রমে নিজ চেতনার স্বরূপ বুঝল; বুঝল যে, পশু-সঙ্ঘের উপরেই তার স্থান। কেন পশুধর্মী মানুষের এই মানসিক বিবর্তন ঘটল এবং পশুরা শারীর ধর্মের উর্ধ্বে উঠতে পারল না, তার কারণ সম্বন্ধে বস্তুবিজ্ঞানীরা এখনও নিঃসংশয় হতে পারেননি।

মানুষ ঐহিক সুখ ও জীবনের নিরাপত্তা হাতে পেয়েছে বসুন্ধরা-গাভীর প্রতিটি দুগ্ধবিন্দু সে আহরণ করে নিচ্ছে—কিন্তু এটাই যে তার জীবনের সর্বোত্তম লক্ষ্য নয়, তা সে কালধর্মানুসারে বুঝতে পেরেছে। সে বুঝেছে যে, মানবেতর প্রাণী নিজেকে বহুগুণিত করে দেশে এবং দেহে, মানুষ নিজেকে সম্প্রসারিত করে কালে এবং মনে। কালপ্রবাহের মধ্যে বেঁচে থাকার অর্থ— চৈতন্যের মধ্যে বেঁচে থাকা। মানুষ যা ভাবে, অর্থাৎ মনের দিক থেকে সে যা হতে চায়—সেটাই হল তার মানবধর্ম। সেই চেতনা তাকে যুগে যুগে অস্থির করে তুলেছে। সে যে কী হতে চায়, কোন্ দুর্নিবার বেগ তাকে ঠেলা দিচ্ছে, তা সে বুঝতে পারে না। সে মঠ-মন্দির গড়ে, রাজপ্রাসাদ বানায়, গ্রন্থ রচনা করে, ছবি আঁকে, দলাদলি করে, রাজ্য ভাঙে এবং গড়ে। কি? না, সে যা আছে তাতে সন্তুষ্ট নয়; যা আছে তার চেয়ে সে আরও নতুন কিছু হতে চায়। এই অসন্তোষ তাকে গুহাবাসের সঙ্কীর্ণতা থেকে সভ্যতার অমরাবতীতে এনে ফেলেছে। এই মানসিক অসন্তোষের পরিণাম কি বস্তুপিণ্ডের অযুত সমারোহ? আসলে মানুষ মনোজীবী। মৃগপক্ষীরা দেহের দ্বারা বাঁচে, মানুষ বাঁচে মনের দ্বারা। বিশ্বে যুগে যুগে মানবত্রাতারা আসেন, মানুষের ঘরে মানবলীলা করে মানুষকে সেই পথ দেখিয়ে দেন, যা তাকে চেতনার সুদৃঢ় প্রত্যয়ে পৌঁছে দেবে। বৈদিক ঋষিরা, উপনিষদের ব্রহ্মবাদীরা, বুদ্ধদেব, যিশুখ্রীষ্ট, শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ—এঁরা মানবচৈতন্যকে নাড়া দিয়ে জাগিয়ে দেবার জন্যই আসেন। তাই মানব-ইতিহাসের মূল কথা হল মানবচেতনার বিকাশের ইতিহাস, জড়ের প্রাণময় হবার কাহিনী, নেতি থেকে অস্তির পথে যাত্রা।

য়ুরোপ এবং মানবচেতনার ঐক্য

দল বাঁধা জীবধর্ম। জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য কেউ পৃথক্ হয়ে থাকতে পারে না। সভ্যতার

অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ ভাবের দিক থেকে কর্মের দিক থেকে পরস্পরের কাছে আসতে চেয়েছে। কেউ মনে করেছে, রাষ্ট্রশাসনের মধ্য দিয়ে মানুষকে কাছে আনা যাবে। য়ুরোপ খ্রীষ্ট-পূর্ব শতাব্দী থেকে সেই চেষ্টাই করেছে। সে চেষ্টা যে কী পরিমাণে ব্যর্থ হয়েছে তার সাক্ষ্য দেবে য়ুরোপের প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাস। খ্রীষ্টান ধর্মকে বন্ধনরজ্জু মনে করে য়ুরোপ দীর্ঘদিন ধরে মানুষকে ঐক্যের মধ্যে আনতে চেষ্টা করেছে, তার জন্য বহু আঘাত সহ্য করেছে। কিন্তু সমস্ত প্রচেষ্টার আন্তরিকতা সত্ত্বেও, তার কোথায় যেন একটা ছিদ্র ছিল, সেই ছিদ্রপথে লোভ-লালসার অনুপ্রবেশ ঘটল, ধর্ম মানুষকে ধারণ করল না, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাকে বাঁধল। তারপর মধ্যযুগীয় য়ুরোপে এল গ্রীক সাহিত্য, শিল্প ও দর্শনের পুনর্জাগরণের যুগ। সংস্কৃতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাধনার মধ্যে য়ুরোপের মানুষ নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করল। মানবচেতনার মধ্যে ঐক্যের যে সুরটি বেজে উঠল, তাহল মানব-মুক্তির সুর। ক্রমে য়ুরোপের মানুষ জ্ঞানবিজ্ঞানের রাজ্যে অধীশ্বর হল। রোগশোক, অভাব-অভিযোগ-পীড়নের ঊর্ধ্বে মানুষকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য সে নানা হাতিয়ার ধরল। কোথাও যন্ত্রবিজ্ঞান, কোথাও সমাজসেবা, কোথাও শিক্ষা-প্রচার, অবহেলিতের অধিকার রক্ষা—এই পথে চলল আধুনিক য়ুরোপের মানবসাধনা। কিন্তু যথার্থ মানব-ঐক্য সুপ্রতিষ্ঠিত হল না। দার্শনিক ও সমাজসেবীর দল 'বহুজনহিতায় চ বহুজনসুখায় চ' এই মন্ত্র পাঠ করলেও য়ুরোপের মানুষ একে অপরকে কাছে টানতে পারল কদাচিৎ। উপযোগ বাদীরা (utilitarians) মানুষের ঐহিক প্রয়োজনের মাপকাঠির দ্বারা মানবতার পরিমাপ করতে গেলেন, ধ্রুববাদীরা (Positivist) ধর্মকে বাদ দিয়ে মানুষের স্থাবর ও বাস্তব সত্তা নিয়ে ব্যতি-ব্যস্ত হয়ে পড়লেন—মনে করলেন ঈশ্বর-ব্যতিরিক্ত ভৌমসত্তাই জীবের একমাত্র অস্তিত্ব। আরও পরে যখন সামাজিক অনৈক্য মানুষকে উৎপীড়িত করছিল, তখন চিন্তাশীল মানবপ্রেমিক দেখলেন, ভোগ্যপণ্যের বণ্টনব্যবস্থা গোষ্ঠীবিশেষের কবলিত বলেই মানুষের এত দুঃখদৈন্য। বিশ্বের যাবতীয় শ্রমজীবী মানুষকে তাঁরা ঐক্যবদ্ধ করতে চাইলেন, প্রচণ্ড আঘাতে কুক্ষিগত বণ্টনব্যবস্থা চূর্ণ করে মানুষকে দীর্ঘকালের বঞ্চনা থেকে উদ্ধার করতে চাইলেন। মনে হল, এবার য়ুরোপ মানব-সাধনার যথার্থ স্বরূপটি অবধারণ করতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু সত্যই মানব-ঐক্য এল কি? আজ বিশ্ব-ময় যে অবিশ্বাস, অনৈক্য বিদ্বেষ মানুষকে গুহা-মানবের অন্ধ তামসিকতায় টেনে নিয়ে যাচ্ছে, সেখান থেকে উদ্ধারের উপায় কি? য়ুরোপের এই বিশৃঙ্খলার মূল কারণ, য়ুরোপ মানব-ঐক্যের যথার্থ চাবি খুঁজে পায়নি। কাজে কাজেই তাকে নানা দুয়ারে মাথা ঠুকে মরতে হয়েছে।

ভারতবর্ষে মানুষের ঐক্যসাধনা

ভারতবর্ষে মানুষের সাধনা একটা বিচিত্ররূপ গ্রহণ করেছে। অতি প্রাচীন কাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত—ভারতবর্ষ ঐহিক উপ-ভোগের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেনি। গাছে ফলটি লগ্ন হয়ে থাকার জন্য একটি বৃন্তের প্রয়োজন। ফল পরিপক্ব হলে আপনা থেকেই বৃন্তচ্যুত হয়ে ঝরে পড়ে। ভারতবর্ষের ঐহিকতা সেই বৃন্তের মতো। বৈদিক যুগ থেকে শুরু করে আধুনিক কাল পর্যন্ত পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে রাষ্ট্র, সমাজসেবা, অর্থনৈতিক বণ্টনব্যবস্থা—এগুলি এ-জাতির জীবন ও সাধনায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেনি। সুদীর্ঘ চার হাজার বৎসরের অভিজ্ঞতায় ভারতবর্ষ বুঝেছে, ঐহিক প্রয়োজনকে মানুষের একমাত্র লক্ষ্য বলে ধরলে য়ুরোপের মতো এদেশেও মানুষে-মানুষে

বিভেদটাই বড়ো হয়ে উঠবে। তাই লোকগুরুগণ মানুষের আবরণের প্রতি গুরুত্ব না দিয়ে অন্তরের দিকে অঙ্গুলিসংকেত করেছিলেন। খণ্ড ক্ষুদ্র বিক্ষিপ্ত মানুষকে তার অন্তরবাসী সত্তার মধ্যে জাগ্রত করে সমস্ত মানবসঙ্ঘকে আচার্যগণ যে ঐক্যের মধ্য দিয়ে অগ্রবর্তী করতে চাইলেন, তা হল আত্মার ঐক্য।

মানুষ বাইরের দিক থেকে যত তুচ্ছ এবং দেহদশাধীন প্রকৃতি-ক্রীড়নক হোক না কেন, অন্তর্লোকে রয়েছে তার অমেয় শক্তি তার যে চেতনা বাইরের জগৎ নিয়ে ব্যতিব্যস্ত, তা থেকে মুক্তি পাওয়া সুকঠিন। এই জড় প্রকৃতি তার মানব প্রকৃতিকে ক্ষণে ক্ষণে আহত করে, খণ্ডিত করে। তাই তাকে আচার্যগণ পরম আশ্বাসের বাণী শোনালেন—বাইরের জগতে বস্তুপিণ্ডের মধ্যে মানুষের সত্য নেই, আছে তার আত্মার মধ্যে। সেই আত্মার স্বরূপ-সন্ধানই ভারতবর্ষের সাধনা এবং তাকেই বলা হয়েছে মানব-ঐক্যের রাজপথ। য়ুরোপের মানব-হিতবাদীরা (positivist) এই সত্যের যথার্থ সন্ধান জানতেন না। তাই তাঁরা মনে করেছিলেন, ঐহিক সুখের সুলভতা হলেই মানুষে মানুষে পরম ঐক্যবোধ সৃষ্টি হবে। মানুষের ভিতরকার সত্তার যথার্থ স্বরূপ না জানলে মানুষের ঐক্য কখনও প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। ভারতবর্ষ আরণ্যক যুগ থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত নানা বিচিত্রতার মধ্য দিয়ে সেই ঐক্যের সাধনাই করে আসছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও মানব-ঐক্যের নবযাত্রা

খ্রীস্টোফার ইশারউড শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে আখ্যা দিয়েছেন—**Phenomenon** ; অর্থ্যাৎ যা ব্যাখ্যাতীত, রহস্যময়, অপরিমেয়। শ্রীরামকৃষ্ণ, তাঁর শিষ্য ও সঙ্ঘ মানবসাধনায় যে ঐক্য প্রচার করেছেন, আধুনিক বিশ্বে, এবং ভবিষ্যতের পৃথিবীতেও সেই পন্থাই হল মানব-ঐক্যের একমাত্র পথ। বেদান্তের উপর ভিত্তি করে, জীবকে শিবজ্ঞানে উপলব্ধি করে সমগ্র মানুষকে একই লক্ষ্যপথে চলতে শেখান—এই হল শ্রীরামকৃষ্ণ-আবির্ভাবের মূল তাৎপর্য। কিন্তু এই ঐক্য মূলতঃ বিচিত্র পথযাত্রার ঐক্য। গীতা-উপনিষদ-বেদান্ত এবং মধ্যযুগীয় সন্তপথ যে সাধন-মার্গ নির্দেশ করেছে শ্রীরামকৃষ্ণ তার নির্যাসটুকুই আমাদের দিয়েছেন। 'যত মত তত পথ'—এই হচ্ছে একালের মানুষের সাধনমন্ত্র। সাধ্যসাধনার যে কোনও পথ ধরেই প্রার্থিত লক্ষ্যে পৌছানো যায়—মানবসাধনার এই হচ্ছে চূড়ান্ত রূপ। মানুষের মধ্যে যদি বৃহৎ সত্তাকে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করা যায়, তা হলে মানুষের খণ্ডতা ও খর্বতা লোপ পেয়ে যাবে। এবং ক্রমে মানুষে মানুষে ভূগোল-ইতিহাসের ব্যবধানও সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হবে। যে পথ দিয়েই হোক না কেন দেবমন্দিরে পৌছাতে পারলেই হল।

জীবশিবভাব শ্রীশ্রীঠাকুর-কথিত একটি পুরাতন আদর্শেরই নতুন প্রতিষ্ঠা। জীবকে শিবজ্ঞানে সেবা করা, অর্থাৎ ভঙ্গুর জীব-সত্তার মধ্যে অখণ্ড সত্তাকে উপলব্ধি করা—আধুনিক কালে এই হচ্ছে মানব-ঐক্যের মূলমন্ত্র। মানুষ যেখানে খণ্ডিত এবং পরস্পরের দ্বারা বিচ্ছিন্ন, সেখানে সে জীবমাত্র। কিন্তু আব্রহ্মস্তম্বে চৈতন্যস্বরূপকে দর্শন করলে মানুষের ভেদরাহিত্যই প্রতিষ্ঠিত হবে। য়ুরোপের জ্ঞানতত্ত্ব ও বস্তুতত্ত্ব সে সমস্যার আজও সমাধান করতে পারেনি। তার কারণ ও-দেশের লোকে জীবের মধ্যে শিবকে দর্শন করতে অনুৎসুক। তারা নর-কে নরোত্তমের পর্যায়ে তুলে ধরতে চেয়েছে, কিন্তু নারায়ণে পৌছাতে সচেষ্ট হয়নি। তাই পশ্চিমে পরহিতব্রতী মানব-সাধকের বহু সৎ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেছে। লোককল্যাণ কেবলমাত্র লোককল্যাণেই সমাপ্ত হলে তা খণ্ডিত হয়ে পড়ে। লোককল্যাণের মূল

উদ্দেশ্য—মানুষের মধ্যে দেশকালহীন বৃহৎ সত্তাকে উপলব্ধি করা। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সেই কথা ও আদর্শ স্বামী বিবেকানন্দ এবং অন্যান্য রামকৃষ্ণ-সেবকেরা সমগ্র বিশ্বে প্রচার করেছেন। ক্রমেই বিশ্ববাসী বুঝতে পারছে, মানুষ একটি দীপবর্তিকা হাতে নিয়ে মহাকালের অন্ধ তমসাবৃত পথ ধরে চলেছে। সে দীপশিখাকে যখন শুধু নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয়, তখন তার নিজের ছায়াটাই দীর্ঘতর হয়ে তার পথ ভোলায়। সেই দীপশিখাকে আরও উর্ধ্বে তুলে ধরলে তার নিজস্ব ছায়া ক্রমে ক্ষুদ্রতর হয়ে শেষে অস্পষ্ট হয়ে যায়, আর সেই আলোকে সুদূরের পথ ক্রমেই কাছে টানে।

ভূগোলে ইতিহাসে মানুষ খণ্ডিত এবং পরস্পর-বিবদমান। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণদেব যে সাধনার পথ নির্দেশ করেছেন তার কোনও দেশকালাস্তৃত সীমাবদ্ধতা নেই। অদ্বয় সত্তা যেখানে মানবসঙ্ঘের নিয়ামক, সেখানেই মানুষের ঐক্য যথার্থ রূপ গ্রহণ করে। আজকের পৃথিবী পারস্পরিক বিদ্বেষে উন্মত্ত ; সে সংঘাত নিবারণের জন্য কত সঙ্ঘ, কত সংস্থার প্রতিষ্ঠা। কিন্তু মানুষের আশ্বাস কোথায় ? মারীবীজে সমস্ত আকাশ ছেয়ে গেছে। মানবসত্তাকে অপঘাত-মৃত্যু থেকে বাঁচাতে হলে শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশই হবে আগামীকালের একমাত্র পাথেয়।

[শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারে আয়োজিত শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসবে প্রদত্ত ভাষণে সংক্ষিপ্ত অনুলিখন।]

চিন্ময়ী

শ্রীধনেশ মহলানবীশ

শারদ আকাশখানি আনন্দমুখর
বিচিত্র ঐশ্বর্যে কত সেজেছে সুন্দর।
শুভ্র বলাকার পাতি উড়ে নীলাকাশে
জলহারা মেঘগুলি যায় আর আসে।
সোনারোদ ঝিকিমিকি শিশিরের 'পরে
শেফালির মধুগন্ধে অবনী শিহরে।
হৃদয়ে হৃদয়ে আজ পরে গেছে সাড়া
কে করিতে পারে এই খুশির কিনারা !
জগৎপালিনী দেবী করুণার খনি
স্বেচ্ছায় এলেন ঘরে বিশ্বের জননী।
কৃপা করে যদি এই মায়া-আবরণ
স্বহস্তে করেন মাতা নিজে উন্মোচন
দরশন পাই তবে চিন্ময়ী মাতার
জ্ঞানসূর্যোদয়ে লুপ্ত হয় অন্ধকার।

বিচার-মার্গ

স্বামী জ্যোতিঃস্বরূপানন্দ

'বেদান্তমার্গ' বা 'জ্ঞানমার্গ' শব্দের অর্থ 'বিচারমার্গ'। প্রত্যক্ষ, অনুমানাদি প্রমাণ সহায়ে বিচারদ্বারা 'ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব কেবলম্'—এই সিদ্ধান্ত মনে সুদৃঢ় সংস্কাররূপে পরিণত করা জ্ঞানমার্গের উদ্দেশ্য। উক্ত সিদ্ধান্ত মনে দৃঢ়নিবদ্ধ হইলে মন স্বভাবতঃই ব্রহ্ম-ধ্যান-প্রবণ হইবে। নিদিধ্যাসনের দ্বারা ব্রহ্মাকারা-বৃত্তিরূপ অপরোক্ষ ব্রহ্মানুভূতি হয়। বিচারের শেষে চিত্ত ধ্যানপ্রবণ হইলে নিদিধ্যাসন স্বতঃ আসিয়া উপস্থিত হয়। নিদিধ্যাসন শব্দের অর্থ সমাধি। (নিদিধ্যাসনং সমাধিঃ—ইতি বিট্‌ঠলেশ উপাধ্যায়-অদ্বৈতসিদ্ধিলঘুচন্দ্রিকা-টীকায়াম্)।

শমদমাদি ষট্‌সম্পত্তিযুক্ত, ইহামুত্রফলভোগ-বিরাগসম্পন্ন, নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকবান্ মুমুক্ষু অধিকারী—'আত্মা বারে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ' এই শ্রুতিবাক্যানুসারে শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকট বেদান্ত শ্রবণের জন্য উপনীত হন। এই শ্রুতিবাক্যেতে আত্মদর্শন অর্থাৎ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারকে অনুবাদ করিয়া শ্রবণ বিধান করা হইয়াছে। শ্রবণের ব্যাপার-রূপে মনন ও নিদিধ্যাসন উক্ত হইয়াছে।

শ্রবণ শব্দের অর্থ শাস্ত্র ও আচার্য হইতে বেদান্তবাক্যের তাৎপর্যনিশ্চয়। 'ইদং বাক্যং প্রত্যগভিন্নব্রহ্মপরং ন সম্ভবতি' ইত্যাদিরূপ বেদান্তসিদ্ধান্ত বিষয়ে প্রমাণের অসম্ভাবনারূপ দোষের নিরসন হয় শ্রবণের দ্বারা।

পুনঃ কর্তাভোক্তারূপে ভাসমান প্রত্যগাত্মা কেমন করিয়া ব্রহ্মসহ অভিন্ন হইতে পারেন—ইত্যাদিরূপ প্রমেয়াসম্ভাবনারূপ দোষের নিবৃত্তি মনন অর্থাৎ ব্রহ্মবিচারসাধ্য।

শ্রবণ ও মননের দ্বারা 'ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা'-রূপ নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান হইলেও উহা পরোক্ষ জ্ঞান। এই পরোক্ষ জ্ঞানের দ্বারা প্রত্যক্ষ অবিদ্যা ও তাহার কার্যের নিরসন হয় না। পূর্ব পূর্ব জন্মের দ্বৈত সংস্কারের প্রাবল্যবশতঃ কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বের অধ্যাস থাকিয়া যায়। ব্রহ্মবিদ্যাভরণ'-কার ইহাকে স্বরসবাহী কর্তৃত্বাদির অধ্যাসরূপ বিপরীত ভাবনা বলিয়াছেন। সমাধিরূপ নিদিধ্যাসনজনিত ব্রহ্মাপরোক্ষ সাক্ষাৎকার দ্বারা অবিদ্যা ও তাহার কার্য-কর্তৃত্বাদি বিপরীত ভাবনার সমূলে উৎখাত হয়।

পাতঞ্জল যোগমার্গ হইতে এই জ্ঞানমার্গ পৃথক। বাশিষ্ঠে কথিত আছে :—

'দ্বৌ ক্রমৌ চিত্তনাশস্য যোগো জ্ঞানং চ রাঘব।
যোগো বৃত্তিনিরোধো হি জ্ঞানং সম্যগবেক্ষণম্ ॥'

যোগমার্গে যম নিয়ম আসন প্রাণায়াম প্রত্যাহার ধারণা ধ্যান ও সমাধির দ্বারা বৃত্তিনিরোধের বিষয় উপদিষ্ট হইয়াছে। অসংপ্রজ্ঞাত সমাধিতে যাবতীয় চিত্তবৃত্তির নিরুদ্ধাবস্থা লাভ হয়। দৃশ্য-দর্শনরূপ বৃত্তিনিচয় উপশান্ত হয়। সাক্ষ্যব্যতি-রেকে কেবলমাত্র এক সাক্ষিচৈতন্যের প্রতিভাস বর্তমান থাকে।

শ্রীমৎ শঙ্কর-ভগবৎ-পূজ্যপাদ-মতোপজীবী ঔপনিষদ্ বেদান্তীগণ বলেন, সাক্ষিচৈতন্যে কল্পিত সাক্ষ্যবস্তু যেহেতু অনৃত, অতএব তাহার পারমার্থিক সত্তা নাই, কেবল একমাত্র সাক্ষীই পরমার্থ সত্য ও নিত্য বর্তমান—ইত্যাদিরূপ বিচারই জ্ঞান এবং তাহাই চিত্তনাশের প্রতি কারণ। তাঁহাদের মতে অধিষ্ঠান ব্রহ্মচৈতন্যের জ্ঞান দৃঢ় হইলে তাহাতে কল্পিত চিত্তের এবং

মনোগ্রাহ্য দৃশ্যের অদর্শন অনায়াসেই উপপন্ন হয়। অতএব পূজ্যপাদ ভগবান্ শঙ্করাচার্য ব্রহ্মবিদ্গণের যোগাপেক্ষা আছে, এইরূপ প্রতিপাদন করেন নাই। অতএব ঔপনিষদ্ পরমহংসগণ গুরুর নিকট গমন করিয়া ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের জন্য শ্রৌত বেদান্তবিচারেই প্রবৃত্ত হন, কিন্তু যোগমার্গে নহে। বিচারের দ্বারাই যখন যাবতীয় চিত্ত-দোষের নিরাকরণ হইয়া যায়, তখন যোগ অন্যথাসিদ্ধ। (গীতা ৬।২৯—গূঢ়ার্থদীপিকা টীকা)।

শ্রুতি ও যুক্তি সহায়ে 'ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা'—এই বিচারের দ্বারা 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' ব্রহ্ম-বস্তুতে মতি স্থির হয় ও রূপরসাদিময় জাগতিক বিষয়ে মিথ্যাত্ববুদ্ধি সুদৃঢ় হয়। জগদ্বিষয়ে মিথ্যাত্ববুদ্ধি দৃঢ় হওয়ার ফলে অবশেষে 'বশীকার'-সংজ্ঞা বৈরাগ্যের উদয় হয়। চিত্ত স্বতঃ রূপরসাদিময় জগৎ হইতে উপরত হইয়া নিদিধ্যাসনপরায়ণ হয় ও অচিরে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হয়।

এই জ্ঞানমার্গ ভক্তি-পথ হইতে ভিন্ন। 'শ্রীমদ্ভগবদ্ভক্তিরসায়ন,' গ্রন্থে এইরূপ লক্ষণ কথিত হইয়াছে—'দ্রুতে চিত্তে প্রবিষ্টা যা গোবিন্দাকারতা স্থিরা। সা ভক্তিরিত্যভিহিতা…।"

সখ্য-দাস্য-বাৎসল্য-মধুর-ভাবসহায়ে চিত্তের কঠিন ও শিথিলাবস্থা বিদূরিত হইয়া যখন দ্রুতাবস্থা (গলিতাবস্থা) প্রাপ্ত হয়, তখন চিত্ত দৃঢ়-নিবদ্ধ সংস্কাররূপে ভগবদ্রূপ চিরতরে গ্রহণ করে। স্থিররূপে ভগবদাকারের এই গ্রহণকে ভক্তি বলা হইয়াছে। বেদান্তে সখ্যদাস্যাদি ভাবসহায়ে ভগবদুপসর্পণের বিষয় উপদিষ্ট হয় নাই।

ঔপনিষদ্গণের 'ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা'—এই বিচারের দ্বারা যখন অধিষ্ঠান ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান দৃঢ় হয় ও জাগতিক বিষয়ে মিথ্যাত্ববুদ্ধি স্থির নিশ্চল হওয়ার নিমিত্ত 'বশীকার'-সংজ্ঞা বৈরাগ্যের উদয় হয়, তখন চিত্ত শান্তভাব ধারণ করে ও দ্রুত হইয়া আত্মাকারে পরিণত হয়। বেদান্তমার্গের অনুশীলনে শান্তভাবের উদয় হইলেও এই শান্তভাব ভক্তি নহে। যেখানে শ্রীহরি-বিরহের ঔৎকণ্ঠ্য, দুঃখ, কাতরভাব ও শ্রীহরি-মিলনের স্বেদ, পুলক, অশ্রু প্রভৃতি নাই সেখানে ভক্তি-রসের স্ফূর্তি নাই।

'আত্মা বারে দ্রষ্টব্যঃ' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে আত্মদর্শনোদ্দেশ্যে শ্রবণের বিধান আছে। শ্রবণের ব্যাপাররূপে মনন ও নিদিধ্যাসন কথিত হইয়াছে। বিধিবাক্যে শ্রবণের প্রাধান্য, অতএব জ্ঞানমার্গকে 'শ্রবণমার্গ' বলাই সঙ্গত, এইরূপ শঙ্কা হইতে পারে। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, জ্ঞানমার্গের সাধককে শ্রবণ ও নিদিধ্যাসনের অপেক্ষায় ব্রহ্মবিচারে অধিক আয়াস, ক্লেশ ও সময়-ক্ষেপ স্বীকার করিতে হয়। সেইজন্য 'জ্ঞানমার্গ' বা 'বিচারমার্গ' বেদান্তপথের ব্যপদেশ হইয়াছে।

জ্ঞান-পথে ঔপনিষদ্গণ দৃশ্যমাত্রে মিথ্যাত্ব দৃষ্টি বা ভাবনা করিতে উপদেশ করেন। দৃশ্যেতে অনিত্যত্বদৃষ্টি করিতে বলেন না। 'মিথ্যাত্ব-ভাবনার ফলে যাদৃশ বৈরাগ্যের উন্মেষ হয়, অনিত্যত্ব-ভাবনার ফলে তদ্রূপ হয় না। মিথ্যত্ব' শব্দের অর্থ 'জ্ঞান-বাধ্যত্ব'। আত্মসাক্ষাৎকারের ফলে যাহার বিলুপ্তি ঘটে তাহা মিথ্যা।

রামকৃষ্ণ মিশনের সেবা-আন্দোলনের সূচনা ও সর্বভারতীয় প্রতিক্রিয়া

[পূর্বানুবৃত্তি]

অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু

১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে মারহাট্টায় প্রকাশিত অনেকগুলি সংবাদে ও সম্পাদকীয় মন্তব্যে রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকাজের প্রশংসা করা হয়। এই সময়ে আর্যসমাজের পক্ষ থেকে বৃহত্তর আকারে যেসব সেবাকাজের চেষ্টা করা হচ্ছিল, তাদের প্রশংসাও দেখতে পাই।[১৪] অর্থসংগ্রহের ব্যাপারে সদ্যোজাত রামকৃষ্ণ মিশন তখন পিছিয়ে ছিল, তা সত্ত্বেও তাঁদের সেবাকাজ মারহাট্টার কাছে সবিশেষ সাধুবাদের যোগ্য মনে হয়েছিল এইজন্য যে, এর দ্বারা ভারতীয় সন্ন্যাসধর্মের নববিকাশের পথ উন্মোচিত দেখা গিয়েছিল। ২২ ডিসেম্বর ১৯০১ তারিখের দুটি সম্পাদকীয় মন্তব্যে যা বলা হয়েছিল তার কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি। সম্পাদকীয় দুটির নাম ছিল—The Work of the Ramakrishna Mission এবং A Good Object Lesson :

"The work of the Ramakrishna Mission have set a noble example to their countrymen of being serviceable to humanity under the changed conditions of modern life. The creed of self-denying and self-sacrificing Swami was upto-now to lead a holy life of abstinence and seclusion and resignation far off from the busy lives of humanity. But it is really more laudable, more meritorious to devote a life of entire resignation and self-denial to relieve distress and help destitution of our fellow creatures. The Ramakrishna Mission have followed this principle in practice, and their work both in plague and famine cannot but inspire great respect.

"The Ramakrishna Mission also did the thankless task of performing sanitary work in connection with the plague of 1900. The volunteers of

১৪ মারহাট্টার ২২ ডিসেম্বর ১৯০১ সংখ্যায় The Problem of the famine Orphans নামক সম্পাদকীয় রচনায় আর্যসমাজের দুর্ভিক্ষসেবার বিবরণ দেওয়া হয়। লাহোর আর্যসমাজ কর্তৃক সংগঠিত 'হিন্দু অরফ্যানস্ রিলিফ অ্যাসোসিয়েশন' দুর্ভিক্ষের সময়ে প্রাণপণ যত্নে ত্রাণকাজ চালিয়েছিল। কর্মীদের অনেকেই ছিলেন লাহোরের 'দয়ানন্দ অ্যাংলো বেদিক্ কলেজে'র ছাত্র। এঁরা রাজপুতনা, কাথিয়াবাড়, মধ্যপ্রদেশ, সিন্ধু ও বোম্বাইয়ের অতি দুর্গম অঞ্চলে গিয়ে সেবাকাজ করেছেন এবং অনেক জায়গায় অনাথাশ্রম স্থাপন করেছেন। এই কাজে এঁদের বহু বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল, সরকার গোড়ায় কোনো সাহায্যই করেনি। মিশনারীরা পদে পদে অসুবিধা ঘটিয়েছিল।—

"The Association had to encounter the strong opposition of the Missionaries who had a busy season of swelling their fold by the conversion of helpless and ignorant orphans."

the Mission confined themselves solely to the houses of the poorest classes who were unable to pay for cleansing and disinfecting them···We hope this admirable record of the practical Vedantists···will call forth better instincts amongst the religious in this part of the country and arouse them to work in a co-operative spirit and systematic organisation."

দক্ষিণ ভারতের প্রধান অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান দৈনিক সংবাদপত্র মাদ্রাজ মেল ১০ সেপ্টেম্বর ১৮৯৭ তারিখে Famine Relief in Bengal নামে যে দীর্ঘ পত্র প্রকাশ করে, তার মধ্যে স্বামী অখণ্ডানন্দ ও স্বামী ত্রিগুণাতীতের সেবাকাজের বিশেষ প্রশংসাপূর্ণ বিবরণ ছিল। এই দুজন ত্যাগী সন্ন্যাসী গ্রামে গ্রামে ঘুরে সেবাকাজ করেছেন, নিজেদের শারীরিক দুঃখকষ্টকে গ্রাহ্য করেননি, দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষদের মতই যৎসামান্য আহারে দিন কাটিয়েছেন, সেবার ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমানে, উচ্চনীচে কোন পার্থক্য করেননি, সেইসঙ্গে এমন অসাধারণ কর্মনৈপুণ্য দেখিয়েছেন, যাতে জেলার সর্বোচ্চ রাজপুরুষ পর্যন্ত পূর্ণ বিশ্বাসে এঁদের উপরে কর্মদায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছেন, সানন্দে খুলে দিয়েছেন সরকারী সাহায্য-ভাণ্ডার—এই সকল সংবাদ ঐ পত্রটিতে ছিল। শেষোক্ত ব্যাপারটি—সরকার এবং সন্ন্যাসীরা হাত মিলিয়ে জনসেবার কাজ করছেন—এই সংবাদপত্রের কাছে নজিরহীন ব্যাপার বলে মনে হয়েছিল।

রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকাজ ভারতীয় সমাজে কি ধরনের নিঃশব্দ বিপ্লবের সূত্রপাত করেছিল, তা মাদ্রাজ মেলেই প্রকাশিত আর একটি চিঠি থেকে বোঝা যায়। উক্ত পত্রের লেখক জানান, সমাজসংস্কার সমর্থন করায় স্বামীজীর জনপ্রিয়তা কমে গিয়েছে। স্বামীজী এক্ষেত্রে অ্যানী বেশান্তের বিপরীত ভূমিতে দাঁড়িয়ে আছেন। বেশান্ত, পত্রলেখকের মতে, 'The back engine to the Hindu race.' স্বামীজীর সেবাধর্ম সম্বন্ধে পত্রলেখক বলেছিলেন, ভারত নবযুগের পথে পদক্ষেপ করছে; সে সমাজসংস্কারের যথার্থ তাৎপর্য, ও সংস্কারকদের উচিত কর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত হচ্ছে, ফলে, বেহিসেবী সংস্কার-পরিকল্পনার উচ্ছ্বাস কমেছে, সেইসঙ্গে সংস্কারকার্যের চরিত্রগুণ বেড়ে যাচ্ছে, এবং সংস্কারকরা অনুভব করতে পারছেন—সাক্ষাৎফল নয়, স্থায়ী ফলই সর্বোত্তম বস্তু।[১৫]

১৫ মাদ্রাজ মেলের পত্রটি ইণ্ডিয়ান সোশ্যাল রিফর্মারে ১১ আগস্ট ১৯০১ সংখ্যায় উদ্ধৃত হয়েছিল :

"We are happy to be able to recognise the stimulating character of much of Swami Vivekananda's latter-day propaganda. He has succeeded in evoking in the minds of his followers an earnest feeling of practical philanthropy that is not very common among us. His disciples are at work in many places engaged in bringing relief to the poor and lowly. The academic spirit is altogether absent from his creed....India is entering on a new era of peaceful activity, and all the signs point to a spell of vigorous progress such as she has never seen before. The century has dawned, indeed, on an India smitten with plague, and subdued by famine, but it is an India on which one feels fresh life is streaming along a hundred beneficent rills and

মহারাষ্ট্রের নেটিভ ওপিনিয়ন পত্রিকায় ১২ জুলাই ১৯০০ সংখ্যায় রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাধর্মের যথার্থ চরিত্র সম্বন্ধে চমৎকার মন্তব্য করা হয়। এই উৎকৃষ্ট সম্পাদকীয় রচনার মধ্যে প্রথমতঃ পাশ্চাত্ত্য চিন্তা কিভাবে আমাদের দেশের সন্ন্যাসীদের পর্যন্ত প্রভাবিত করেছে, কিভাবে রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকর্মে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য ধারার সংমিশ্রণ ঘটেছে, তা বলা হয়। এদের মতে, আর্য সংস্কৃতির খাঁটি সন্তানেরা বাস্তব কর্মের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্ত্য নীতি গ্রহণ ক'রে যে-সমন্বিত জীবনাদর্শ স্থাপন করেছেন, তা দেশবাসীর পক্ষে অনুকরণযোগ্য। তারপর, এই রচনায়, বেদান্তের বিরুদ্ধে মিশনারীদের এবং তাঁদের দ্বারা প্রভাবিত 'প্রগতিশীল' ভারতীয়দের একটি সমালোচনাকে দৃঢ়ভাবে খণ্ডন করা হয়। বেদান্ত নাকি স্বার্থপরতা শেখায়! তা যে কত মিথ্যা, বেদান্ত যে 'প্রতিবেশীদের ভালবাসো' নামক খ্রীষ্টীয় তত্ত্ব থেকে ভাবাদর্শে একটুও দুর্বল নয়, তা এই পত্রিকা রামকৃষ্ণ মিশনের বেদান্তভিত্তিক সেবাকর্মের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে দেখিয়ে দিয়েছিল। নেটিভ ওপিনিয়নের রচনাটির প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধৃত করছি:

"The work of the Ramakrishna Mission ··· shows firstly how Western methods are affecting even our sannyasins. The ideal of sannyasins who have renounced all that makes life dear to the common run of humanity, and whose only resources are knowledge, devotion and charity, working for the relief of suffering humanity by starting an orphanage and conducting it themselves, has in it elements characteristic of both the East and the West. The persons engaged in this noble work are the essential products of Aryanism, while the methods of charity they have persued belong more specifically to the West. The Ramakrishna Mission working in the most practical manner for the alleviation of human misery typifies a fusion of the Eastern and Western ideals, which we should desire to develop in our midst···The idea must be ours, but the form it should assume should be Western. ···

"Another observation which we desire to make in connection with this is that the work of the Ramakrishna Mission utterly proves the hollowness of the contention that the Vedantic system of philosophy preaches a gospel of extreme selfishness. The members of the Ramakrishna Mission are Vedantists to the hilt, and in trying to relieve distress in a practical manner, they are simply following the noblest dictates of their creed. It is indeed difficult to

streams...We start with a truer conception of the meaning of reform and the duties of the reformers. If our idea of the possibilities of the quantity of reform attainable to a single generation has been moderated, our conception of the quality of it has been much improved."

conceive how a system, the corner-stone of which is the oneness of life, can ever be charged with being selfish by those who have really understood its tenets. A true Vedantist is a practical philanthropist through and through···'Love thy neighbour as thyself' is no less a Vedantic than a Christian rule of conduct. It is only those who have altogether misunderstood the Vedanta philosophy that can attribute to the creed of selfishness.

বেদান্ত স্বার্থপরতা ও জীবনবিমুখতা শেখায়—খ্রীষ্টান মিশনারী ও ভারতীয় সংস্কার-পন্থীদের এই তারস্বর প্রচারের বিরুদ্ধে নেটিভ ওপিনিয়নের রচনাটি উপযুক্ত উত্তর সন্দেহ নেই। তবে এঁরা এবং আরো অনেকে রামকৃষ্ণ মিশনের সংঘবদ্ধ সেবাকাজের পিছনে পাশ্চাত্ত্য প্রভাবই মাত্র দেখেছেন কিন্তু মনে করতে ভুলে গেছেন যে, খ্রীষ্টান মিশনারীদের আবির্ভাবের বহু শত বৎসর আগে ভারতবর্ষে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা সেবাব্রত গ্রহণ করেছিলেন। স্বামীজী নিজে সেকথা কিন্তু কখনো ভোলেননি।

স্বামীজীর জীবিতকালে নানা কারণে তাঁর কর্মপ্রয়াস সম্বন্ধে বলা বা লেখায় অনেক বাধা ছিল—তাঁর দেহান্তের পরে সে বাধা দূর হয়ে যাওয়ায় স্বীকৃতি সহজসাধ্য হয়েছিল। তাই শোকভাষণ বা শোকপ্রবন্ধে তাঁর প্রবর্তিত সেবাধর্মের বিষয়ে অনেক সশ্রদ্ধ উল্লেখ পাওয়া যায়। ইণ্ডিয়ান মিরারে ১০ জুলাই ১৯০২ তারিখে ভাবাবেগের সঙ্গে বলা হয়েছিল: "স্বামীজীর অনুগামীরা সেবার সময়ে ফলাফলের জন্য ভ্রূক্ষেপ করেননি। তাঁরা দরিদ্র পল্লীতে দীন আবাসে থেকে ব্যাধি ও মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েও সর্বদা প্রাণশক্তিতে, জীবনপ্রদ বাণীতে, বাস্তব দৃষ্টান্তে চারিপাশের সকলকে সামাজিক বেদনা দূর করার কাজে উজ্জীবিত করেছেন। দুঃখবেদনা-রাশিতে পূর্ণ চারিদিক। ···স্বামী বিবেকানন্দ কলকাতার সীমাহীন প্লেগ-দুঃখ দেখে অশ্রুবিসর্জন করতেন। লোকান্তরিত রাজকবির কবিতায় একটি লাইনের সঙ্গে আমরা পরিচিত— অশ্রু, অলস অশ্রু —কী তার অর্থ বুঝি না!' স্বামী বিবেকানন্দের অনুগামিগণ অশ্রুবিসর্জন করেছিলেন, সত্য, কিন্তু তা রক্ত-অশ্রু···অলস অশ্রু ছিল না। ···কৃতজ্ঞতার সঙ্গে আমরা স্মরণ করি—তাঁরা নোংরাতম বস্তীতে প্রবেশ করেছেন, যেখানে নৈতিক ও বস্তুগত ক্লেদের শেষ নাই। সেখানে গিয়ে তাঁরা প্লেগাক্রান্তদের শুশ্রূষা করেছেন, সমবেদনা জানিয়েছেন ···সকলের ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতা অর্জন করেছেন। তাঁদের এই লোককল্যাণকর্ম এই শহরের ইতিহাসে স্থায়ী কীর্তিরূপে গণ্য হবে।"

গীতা সোসাইটি তৎকালীন কলকাতার একটি বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান; এর সঙ্গে কলকাতার বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি যুক্ত ছিলেন। এর শোকপ্রস্তাবেও অনুরূপ কথা লেখা হয়েছিল।[১৬]

সেকালের বিদ্বৎসমাজে পরিচিত যশোহরের

১৬ গীতা সোসাইটির ৬ জুলাই ১৯০২ তারিখের সভায় গৃহীত প্রস্তাবের একাংশ:

"There is yet another aspect of the surpassing usefulness of the late Swami, worthy of the highest commendation, which brings out in prominent relief, the nobility of his character.·· Rare indeed is the example he has so gloriously set of disinterested and almost selfless philanthropy. We all remember with admiration and gratitude the magnificent work of rescue

'ব্রহ্মচারিন্' পত্রিকায় (দুঃখের বিষয় তার ফাইল আমরা পাইনি) স্বামীজীর দেহত্যাগে লিখিত শোকপ্রবন্ধে ('ব্রহ্মবাদিন' পত্রিকায় জুলাই ১৯০২ সংখ্যায় উদ্ধৃত) 'আধুনিক ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ হিন্দু বিবেকানন্দের'—'নরকুলে নরেন্দ্রের'—বহুবিধ গুণবর্ণনার পরে বলা হয়েছিল—ভারতবর্ষকে স্বামী বিবেকানন্দ যত ভালবেসেছেন তেমন আর কেউ ভালবাসেননি ; বিবেকানন্দ সন্ন্যাসী, কিন্তু তাঁর সন্ন্যাসের অর্থ নয় সমাজ থেকে পলায়ন, সমাজকে সেবা করার জন্যই ঐ সন্ন্যাসের আত্মবলিদান। 'ব্রহ্মবাদিনে'র ঐ রচনায় ক্ষোভ প্রকাশ করে বলা হয়েছিল—ভারতীয় সন্ন্যাসীরা দেশের মানুষের প্রতি কর্তব্য ভুলে গেছেন ; নিজ মুক্তির চেষ্টায় তাঁরা নিতান্ত স্বার্থপর ; এই পরিস্থিতিতে বিবেকানন্দ ভারতীয় সন্ন্যাসের উদারতা ও ত্যাগ ভাবকে পুনরুজ্জীবিত করেছেন - ব্যক্তিমুক্তির স্থলে সমষ্টি-কল্যাণের আদর্শকে নিজ জীবন ও বাণীতে উন্মোচন করেছেন।

কলকাতার সংবাদপত্রগুলির সঙ্গে সুর মিলিয়েছিল সারা ভারতবর্ষের পত্রপত্রিকা। এক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য সোস্যাল রিফর্মারের ১৩ জুলাই ১৯০২-এর মন্তব্য, যার মধ্যে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা হয়েছিল, বিবেকানন্দ-স্থাপিত রামকৃষ্ণ মিশন আধুনিক ভারতের ইতিহাসে অনন্য প্রতিষ্ঠান। ভারতীয় জনজীবনে প্রাণসঞ্চার করতে যাঁরা পরিশ্রম করেছেন, তাঁদের মধ্যে বিবেকানন্দের স্থান অতি উচ্চে, কারণ তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠাতা।

"The philanthropic work of the Ramakrishna Mission which he founded and controlled till his death, makes it out as a unique organisation in the history of Modern India. That alone is enough to raise him high among those who have laboured to infuse life into the Indian people."

রামকৃষ্ণ মিশনের কর্মধারার সর্বাঙ্গীণ পরিচয় দান বর্তমান অধ্যায়ের উদ্দেশ্য নয়। আমি বিশেষভাবে সেবাকর্ম ও তার প্রতিক্রিয়ার ইতিহাসকেই এখানে বিবেচনার জন্য বেছে নিয়েছি, কারণ এই লোকসেবার মধ্য দিয়েই ভারতীয় জনজীবনে রামকৃষ্ণ মিশন প্রথম পর্যায়ে সর্বাধিক পরিচিতি লাভ করেছিল। কিন্তু একথা কদাপি ভুললে চলবে না, রামকৃষ্ণ মিশন প্রচলিত অর্থে সমাজসেবা করতে চায়নি। রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠাতা জানতেন, সন্ন্যাসী সংঘ হয়েও মিশন 'তথাকথিত' সমাজসেবার সঙ্গে কিভাবে নিজেকে যুক্ত করতে পারল, তার কৈফিয়ত (বা দার্শনিক হেতু) তাঁকে দিতে হবেই। স্বামী যোগানন্দের প্রশ্নের উত্তরে স্বামীজী কী বলেছিলেন, তা আমরা আগে দেখে এসেছি। ভগিনী নিবেদিতা তাঁর নানা রচনায় এই প্রসঙ্গ উত্থাপন

and succour undertaken and accomplished by the noble band of self-sacrificing workers of the Ramakrishna Mission, under the inspiration aud guidance of the late Swami. As the accredited head of this earnest band of devoted works he organised with remarkable success, extensive philanthropic works in different parts of India for the alleviation of pain, misery and wretchedness. This silent but practical altruism has left a permanent record in the annals of the country and impressed the popular mind with a profound sense of moral duty, with which asceticism can be associated."

করেছেন, কারণ স্বামীজী যে ভারতীয় সন্ন্যাসী-দের জীবনের মধ্যে নূতন ভাব ও কর্মধারার সূত্রং পাত করেছেন, সে বিষয়ে তিনি সচেতনতা আনতে চেয়েছিলেন। রামকৃষ্ণের কাছ থেকে বিবেকানন্দ 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'-তত্ত্ব লাভ করেছিলেন; তার সঙ্গে নিজের বহু বৎসরের ভারত ও বিশ্বভ্রমণের অভিজ্ঞতা যুক্ত ক'রে তিনি যে সংঘ গঠন করেছিলেন, ভগিনী নিবেদিতার মতে, 'তার ফলস্বরূপ ভারতের ইতিহাসে এই প্রথমবার একটি সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় গঠিত হল—নূতন ধরনের সামাজিক কর্তব্যের রূপ নির্ধারণ ও তাকে কার্যকরী করাকেই যে প্রাথমিক দায়িত্ব বলে দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করেছে।'[১৭] নিবেদিতা ব্যাখ্যা ক'রে বলেছেন: ইউরোপের ক্ষেত্রে এই ধরনের কর্তব্যবুদ্ধিসম্পন্ন সন্ন্যাসী-সংঘ আশ্চর্য-জনক নয়, কারণ সেখানে ধর্মের প্রত্যক্ষানুভূতি অল্পক্ষেত্রেই ঘটে, ও লোকে ঐ উপলব্ধি-ব্যাপারটা অল্পই বোঝে, তাই সাধারণের চোখে লোক-হিতকর্ম ধর্মের কাজ বলে স্বতঃই স্বীকৃত হয়। ভারতবর্ষে অপরপক্ষে সকলে মনে করে, সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের দায়িত্ব উপলব্ধিবান্ পুরুষ সৃষ্টি করা; সামাজিক উন্নয়নের দায়ভার সন্নাসীদের নেবার প্রয়োজন নেই; অদ্বৈত বেদান্তী উপলব্ধির চরম স্তরে যখন একমেবাদ্বিতীয়ম্-এর অনুভূতিকে লাভ করে তখন তার কাছে উপাস্য, উপাসক ও উপাসানায় কোনো পার্থক্য থাকে না, তাই তার পক্ষে কাজ করা তখন অসম্ভব, ইত্যাদি। এক্ষেত্রে স্বামীজীর ভিন্ন বক্তব্যকে নিবেদিতা তুলে ধরেছেন। উপলব্ধির চরমে উপাস্য-উপাসক-উপাসনা এক হয়ে গেলেও তাতে পৌছবার জন্য সাধকের চিত্তশুদ্ধি ঈশ্বর-চিন্তা দ্বারাই লাভ করা সম্ভবপর, কারণ ঈশ্বরচিন্তা অহং-জ্ঞানকে সহজে বিদূরিত করে; জীবকে সাক্ষাৎ শিবজ্ঞান করতে পারলে সন্ন্যাসীরা বাঞ্ছিত চিত্তশুদ্ধি লাভ করতে পারবে, সেবাভাব স্বার্থ-পরতাকে সর্বাগ্রে দূর করবে ইত্যাদি। সন্ন্যাসীরা কেন লোকসেবা করবে, তার দার্শনিক কারণ-সন্ধানে অবশ্য স্বামীজী অতি ব্যস্ত ছিলেন না—তিনি প্রথমতঃ তাঁর প্রত্যেক উপলব্ধি-লব্ধ সিদ্ধান্তকেই প্রবল প্রাণাবেগের সঙ্গে এগিয়ে দিয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে স্বামীজী সকল ভাব ও অনুভূতির মহাসাগর-সঙ্গম দেখেছিলেন—নিজ জীবনেও ঐ সাগর-স্নানের মুক্তিলাভ করেছিলেন—তার ফলে নিবেদিতা বলেছেন:

"কেবল তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের মিলন-ভূমি হননি, অতীত ও ভবিষ্যতের মিলনকেন্দ্রও হয়েছেন। যদি 'এক' ও 'বহু' সম-সত্য হয়, তাহলে কেবল বিভিন্ন ধর্মই নয়, বিভিন্ন কার্যরীতি, সংগ্রামরীতি, সৃষ্টিরীতি সকল কিছুই উপলব্ধির নানা পথস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং আধ্যাত্মিক ও ঐহিকের মধ্যে আর পার্থক্য করা চলে না। অতঃপর শ্রমে ও সাধনায় ভেদ নেই, জয়ে ও ত্যাগে ভেদ নেই। জীবনই ধর্ম। অর্জন এবং ধারণ ত্যাগ ও বর্জনের মতই জীবনের কঠিন দায়িত্ব।

"এই উপলব্ধিই বিবেকানন্দকে কর্মের মহান প্রচারক করেছে। সে কর্ম—জ্ঞান ও ভক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, অপরপক্ষে তা জ্ঞান ও ভক্তিরই

১৭ নিবেদিতা 'দি মাষ্টার এ্যাজ আই স হিম' গ্রন্থে 'আদর্শসংঘাত' অধ্যায়ে ভারতীয় জনজীবনে রামকৃষ্ণ মিশনের ভাবাদর্শের নব তাৎপর্য সম্বন্ধে লিখেছেন:

"For the first time in the history of India an order of monks found themselves banded together with their faces set primarily towards the evolution of new forms of civic duty."

দ্যোতক। তাঁর কাছে কল-কারখানা, পাঠকক্ষ, ক্ষেতখামার—সাধুর কুঠিয়া বা মন্দিরদ্বারের মতই ঈশ্বরের সঙ্গে মানবের সাক্ষাৎ মিলনের যথার্থ পটভূমি। তাঁর কাছে নরসেবা ও দেবসেবার মধ্যে কোনো পার্থক্য ছিল না—পার্থক্য ছিল না পৌরুষ-বীর্য ও ধর্ম-বিশ্বাসের মধ্যে ন্যায়বোধ ও আধ্যাত্মিকতার মধ্যে। একদিক দিয়ে তাই তাঁর সকল উক্তিকেই এক কেন্দ্রীয় বিশ্বাসের ভাষ্য বলা যায়। একদা তিনি বলেছিলেন—শিল্পকলা, বিজ্ঞান ও ধর্ম একই সত্যের বিভিন্ন প্রকাশ ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু তা বুঝতে হলে অবশ্যই অদ্বৈত তত্ত্বকে নিতে হবে।"

স্বামীজী চেয়েছিলেন, আত্মমুক্তির সাধনা বজায় রেখে রামকৃষ্ণ সংঘ যেন ঐ সমষ্টিমুক্তির তত্ত্ব জনসাধারণকে শিক্ষা দেয়। যেখানে যে বস্তুর অভাব, সেখানে সেই বস্তুকে দান করবে সংঘভুক্ত সন্ন্যাসীরা। প্রয়োজনমত তাঁরা কোথাও অধিক দেবেন আধ্যাত্মিকতার শিক্ষা, কোথাও অধিক ঐহিক শিক্ষা। শেষ পর্যন্ত কিন্তু সবই আধ্যাত্মিক—যদি অদ্বৈতকে মনে জাগ্রত রাখা যায়।

রামকৃষ্ণ সংঘ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে রোমাঁ রোলাঁ ভিন্ন ভাষায় একই কথা বলেছেন :

"বিবেকানন্দ যে-ধর্মসংঘ স্থাপন করেছিলেন, তার মধ্যে সুনির্দিষ্ট সামাজিক মানবিকতাবাদী এবং সর্বমানবিক প্রচারের দিকটা সুস্পষ্ট। অধিকাংশ ধর্মেই আধুনিক জীবনের অভাব অভিযোগ ও প্রয়োজনের বিরোধিতা করা হয়, যুক্তির বিরুদ্ধে বিশ্বাসকে তুলে ধরা হয়। বিবেকানন্দের ধর্মসম্প্রদায় তা করেনি—তা বিজ্ঞানকে সর্বাগ্রে স্থাপন করেছে; আধ্যাত্মিক ও ঐহিক প্রগতির সঙ্গে তা সহযোগিতা করবে, কলাশিল্প ও যন্ত্রশিল্পকে তা উৎসাহ দেবে। তার আসল উদ্দেশ্য জনগণের মঙ্গলবিধান। তাঁরা ঘোষণা করেছেন, বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে সৌভ্রাত্র স্থাপন করা তাঁদের ধর্মবিশ্বাসের মূল কথা, কারণ সকল ধর্মের সমন্বয়ই হল চিরন্তন ধর্ম। রামকৃষ্ণের বিরাট হৃদয় তাঁর প্রেমের মধ্যে সমস্ত মানবতাকে আলিঙ্গন করেছিল। তাই রামকৃষ্ণের পতাকাতলে তাঁরা সবকিছু করে থাকেন।"

রামকৃষ্ণ সংঘ ভারতবর্ষে নূতন ভাব ও আদর্শের সূত্রপাত করেছিল, সে বিষয়ে কিছু সমকালীন স্বীকৃতি আগেই লক্ষ্য করেছি। এখানে আর একটি উপস্থিত করছি। লাহোর ট্রিবিউন পত্রিকায় (যার সম্পাদক মনস্বী সাহিত্যিক নাগেন্দ্রনাথ গুপ্ত) স্বামীজীর দেহত্যাগের পরে ১০ জুলাই ১৯০২ তারিখে লিখিত সম্পাদকীয়তে রামকৃষ্ণ মিশনের কর্মচেষ্টার উল্লেখ করার পরে বলেছিল—বিবেকানন্দ-প্রবর্তিত এই সন্ন্যাসী-সংঘের আন্দোলন আধুনিক কালে অভিনব এবং অনন্যসাধারণ।

"It was Vivekananda's genius that gave shape to this new and unique movement of a new school of monks in modern times, though perhaps the force of his revered master's spirit was behind."

রামকৃষ্ণ সংঘের অনন্যতার একটি বিশেষ প্রমাণ—ভারতীয় সাধুসম্প্রদায়ের মধ্যে চিন্তাভাবনা ও জীবনচর্যার ক্ষেত্রে তা সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন ঘটিয়েছে। ভারতীয় গণজীবনে ধর্মের বিপুল প্রভাব বর্তমান (ঠিক এখনো তা প্রবল, প্রচুর) এবং সন্ন্যাসিগণ ধর্মসংরক্ষক বলে সম্মানিত। সন্ন্যাসীর সংখ্যাও ভারতবর্ষে যথেষ্ট। ভক্তদের দানের ফলে বহু সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ে অজস্র অর্থ জমে আছে। বিবেকানন্দের আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত ঐ অর্থ ব্যয়িত হত দেবপূজা, স্ব-সম্প্রদায়ের সাধুসেবা ও আনুষঙ্গিক নানা বিষয়ে। বর্তমানে কিন্তু দেখা যায়, বহুক্ষেত্রে সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় সেবা ও

শিক্ষণ-বিস্তারে অর্থব্যয় করেছেন। সে কাজ যে সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীরাই করুন—তাঁদের সকলের মাথায় রয়েছেন নব শঙ্করাচার্য বিবেকানন্দ। সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের মতি পরিবর্তন একদিনে হয়নি, এখনো সর্বত্র হয়নি, (আমি নিজে কোনো কোনো ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে এখনও সেবাধর্ম প্রবর্তনের জন্য বিবেকানন্দের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট ঘৃণা দেখেছি)—এবং যেটুকু হয়েছে তা ঘটাতে বিবেকানন্দের মতই বিবেকানন্দের অনুগামীদেরও বহু অসম্মান সহ্য করতে হয়েছে সাধুসমাজের নিকটে। অসুস্থ, রোগাক্রান্ত সাধুকে রামকৃষ্ণ মিশনের সাধুরা পথ থেকে কুড়িয়ে এনেছেন, তাঁদের মলমূত্র পরিষ্কার করেছেন, কাঁধে করে দাহ করেছেন, বিনিময়ে তাঁরা সাধুদের কাছ থেকেই উপাধি পেয়েছেন—'ভাঙ্গী সাধু।' সেই বিরক্ত সাধুরাই পরে অনুরক্ত হয়ে সানন্দে স্বীকার করেছেন—সাক্ষাৎ অদ্বৈত-বোধের প্রমাণ যদি কোথাও থাকে, রামকৃষ্ণ মিশনের এই আর্তনারায়ণের সেবার মধ্যেই তা আছে।

সাধুসমাজের আংশিক মত পরিবর্তনের কিছু সংবাদ পুরাতন উদ্বোধন পত্রিকায় আমি দেখেছি। এ বিষয়ে আরও তথ্যসংগ্রহের চেষ্টা আমি করেছি। রামকৃষ্ণ মিশনের কয়েকজন প্রধানের কাছ থেকে তথ্যসংগ্রহের চেষ্টা করেছি। প্রবীণ সন্ন্যাসী সেবাব্রতী স্বামী রঘুবরানন্দ (বর্তমানে অশীতিপর), কনখল সেবাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী কল্যাণানন্দ ও তাঁর সহকারী স্বামী নিশ্চয়ানন্দ সন্ন্যাসী রোগীদের মলমূত্রাদি পরিষ্কারসহ শুশ্রূষা করার এবং মৃতদেহ সংকার করার কাজের জন্য কিভাবে সন্ন্যাসী-সমাজে পতিত ছিলেন, পরে কিভাবে তাঁদের মর্যাদার স্বীকৃতি ঘটে, সে সম্বন্ধে লিখে পাঠিয়েছেন :

"প্রথম প্রথম দুই জনই (কল্যাণানন্দ ও নিশ্চয়ানন্দ) রোগীর ডাক্তার ও পরিচর্যাকারী। রোগীর মলমূত্র পরিষ্কার হইতে আরম্ভ করিয়া সব কার্যই নিজ হস্তে করিতে হইত। এইজন্য (অন্যান্য সম্প্রদায়ের) সাধুরা তাঁহাদিগকে 'ভাঙ্গী সাধু' বলিতেন। সুরথগিরি আশ্রমের মণ্ডলেশ্বর স্বামী মঙ্গলানন্দগিরিজীর সঙ্গে তাঁহাদের খুব হৃদ্যতা হইয়াছিল। মঙ্গলগিরিজী প্রায়ই তাঁহাদের নিকট সেবাশ্রমে আসিতেন। সুরথগিরি-আশ্রমে একজন সাধু কলেরারোগে দেহরক্ষা করেন। তথায় অবস্থিত অন্যান্য সাধুরা কলেরারোগী বলিয়া মৃত সাধুর সৎকার করিতে অস্বীকার করেন ও কোনো কোনো সাধু আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। সেবাশ্রমে খবর পাঠাইলে স্বামী নিশ্চয়ানন্দ যাইয়া সৎকারের ব্যবস্থা করেন। উহাতে মঙ্গলগিরি আরও অনুগত হইয়া পড়েন।

"মঙ্গলগিরি তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া মাঝে মাঝে ভোজন করাইতেন। তাঁহাদের আশ্রমে কোনো ভাল জিনিষ তৈয়ারী হইলে পাঠাইয়াও দিতেন। এক সময়ে অন্য এক আশ্রমে সমষ্টি ভাণ্ডারা হয়। তাহাতে হরিদ্বারে কনখলে যেসব সাধুদের আস্তানা আছে, সকল স্থানে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল কিন্তু কল্যাণ-স্বামী ও নিশ্চয়-স্বামী রোগীদের মলমূত্র পরিষ্কার করেন বলিয়া তাঁহা-দিগকে সাধুমধ্যে গণ্য না করিয়া নিমন্ত্রণ করা হয় নাই। সমষ্টি-ভাণ্ডারা হইলে মণ্ডলেশ্বরকে নিমন্ত্রণ করিতেই হয়। মণ্ডলেশ্বর-রূপে মঙ্গলগিরিজী নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। তিনি যাইয়া দেখেন, প্রত্যেক আশ্রমের সাধুরা আসিয়াছেন কিন্তু কল্যাণ-স্বামী বা নিশ্চয়-স্বামীকে দেখিতে পাইলেন না। তিনি তাঁহাদের না আসার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন, তাঁহাদের নিমন্ত্রণ করা হয় নাই, যেহেতু তাঁহারা ভাঙ্গী সাধু। এই কথা শুনিয়া তিনি খুব রাগিয়া গিয়া তাঁহাদের নিমন্ত্রণ করিতে লোক পাঠাইয়া দিলেন। পূর্বে নিমন্ত্রণ করা হয় নাই বলিয়া তাঁহারা নিমন্ত্রণ নিলেন না।

অতঃপর মঙ্গলগিরি বলিয়া পাঠাইলেন, তাঁহারা না আসিলে আশ্রমের তরফ হইতে কাহাকেও যেন পাঠানো হয়। তখন ব্রহ্মচারী জীবন-মহারাজ সেবক হিসাবে ছিলেন, তিনি গেলেন। মঙ্গলগিরি জীবন-মহারাজকে মোহন্তের মর্যাদা দিয়া নিজের কাছে ভোজন পংক্তিতে বসাইয়া ভোজন করাইলেন। সেই অবধি সাধুসমাজে—ভাঙ্গী-সাধুরা সম্মানলাভ করিয়া আসিতেছেন।"

স্বামী রঘুবরানন্দ তাঁর প্রদত্ত বিবরণে হৃষীকেশ কৈলাস আশ্রমের মণ্ডলেশ্বর ধনরাজগিরির সমর্থন ও আনুকূল্যের কথাও বলেছেন। সর্বজনসম্মানিত এই সুপণ্ডিত সাধুর সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের পরিচয় হইয়াছিল পরিব্রাজক অবস্থায়। অভেদানন্দ এঁর কাছে কিছুদিন শাস্ত্রচর্চা করেছিলেন। এঁর ইচ্ছায় এঁর একজন ভক্ত কনখল সেবাশ্রমে অর্থসাহায্য করেন, যার দ্বারা সেবাশ্রমের গ্রন্থাগার-ভবন নির্মিত হয়।[১৮]

স্বামী অব্জজানন্দ তাঁর 'স্বামীজীর পদপ্রান্তে' গ্রন্থে ধনরাজগিরির রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতি পক্ষপাতের একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। ধনরাজগিরি তাঁর কৈলাসমঠে ভিক্ষা গ্রহণ করতে নিশ্চয়ানন্দকে প্রণোদিত করেছিলেন। একবার গিরিজী তাঁর মণ্ডলীসহ কিছুদিনের জন্য বাইরে যান। যাবার আগে তিনি মঠে নূতন কুঠারীকে বলে যান, কনখল থেকে যে-মহাত্মা নিত্য হৃষীকেশে সাধুসেবা করবার জন্য আসেন। তাঁকে যেন সমাদরে ভোজন করানো হয়। নিশ্চয়ানন্দ অতঃপর কৈলাসমঠে ভিক্ষার জন্য এলে তাঁকে নূতন কুঠারী চিনতে পারেননি, কারণ নিশ্চয়ানন্দের নগ্নপদ, দীনহীন মলিন বসন, হাতে ওষুধের ভাঙা বাক্স—চেনা সত্যই কঠিন। নিশ্চয়ানন্দ ব্যাপার বুঝে চলে যান। ধনরাজগিরি ফিরে এসে নিশ্চয়ানন্দকে দেখতে না পেয়ে প্রশ্ন ক'রে সমস্ত ব্যাপার জেনে নেন এবং কুঠারীকে বিশেষ তিরস্কার করেন। তখন কুঠারী নিশ্চয়ানন্দের কাছে গিয়ে ক্ষমাপ্রার্থনা করে তাঁকে আসতে বলেন। কুঠারীর অনুনয়ে বিব্রত নিশ্চয়ানন্দ তৎক্ষণাৎ মঠে এসে ভিক্ষা নেন।

১৯১৭ সাল থেকে কাশী সেবাশ্রমে কর্মিরূপে সংশ্লিষ্ট স্বামী রঘুবরানন্দ কাশীতে রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকাজ সম্বন্ধে সাধুসম্প্রদায়ের মনোভাব-পরিবর্তনের কিছু কাহিনী ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে জানিয়েছেন। গোড়ায় সাধুরা সেবাশ্রমে চিকিৎসিত হতে আসতেন না, কারণ তাঁদের আশঙ্কা ছিল, মেথরের ছোঁয়া জল তাঁদের খেতে হবে। পরে যখন দেখেন, সাধু-ব্রহ্মচারীরাই তাঁদের জন্য মেথরের কাজ ক'রে দেন, তখন তাঁদের মনোভাবের পরিবর্তন হয়। স্বামী গোবিন্দানন্দজী নামক জনৈক প্রভাবশালী মণ্ডলেশ্বরের এক শিষ্য সেবাশ্রমে সুচিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করায় উক্ত মণ্ডলেশ্বর সেবাশ্রমের পক্ষপাতী হন। তাঁর দেহান্তের পরে তাঁর শিষ্য সুপণ্ডিত ও উচ্চস্তরের সাধু স্বামী জয়েন্দ্রপুরীজীও সেবাশ্রমের সবিশেষ অনুরক্ত হয়ে ওঠেন। ১৯৩৬ সালে শ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকীর সময়ে ইনি উৎসবানুষ্ঠানের ব্যাপারে খুবই সাহায্য করেন। ঐ উপলক্ষে যে-সমষ্টি ভাণ্ডারা হয়, তাতে প্রধানতঃ জয়েন্দ্র-পুরীজীর চেষ্টায় সকল সম্প্রদায়ের সাধু একসঙ্গে বসে ভোজন করেন। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধুরা সাধারণতঃ একত্রে ভোজন করেন না

১৮ স্বামী অব্জজানন্দ লিখেছেন, ধনরাজগিরির প্রচেষ্টাতেই রামকৃষ্ণ মিশনের সাধুরা দশনামী সম্প্রদায়ের সমষ্টি-ভাণ্ডারাতে স্থান পান। মনে হয়, মঙ্গলগিরিজীর প্রয়াসের পরেই ধনরাজ-গিরির প্রচেষ্টার চূড়ান্ত ফললাভ হয়েছিল।

জয়েন্দ্র পুরীজী তাঁদের বলেন, 'রামকৃষ্ণ মিশনের সাধুরা সকল সম্প্রদায়ের সাধুদেরই রোগের সময়ে সমানভাবে সেবা করে থাকেন; সুতরাং তাঁদের আমন্ত্রণে এসে সাম্প্রদায়িকতা দেখানো উচিত নয়। তিনি ব্যবস্থা করেন, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধুরা একই সময়ে মঠের বিভিন্ন স্থানে বসে ভোজন করবেন। তাতে সকলে সম্মত হন। রামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী উৎসবের শোভাযাত্রার সমস্ত আখড়ার ও সমস্ত সম্প্রদায়ের সাধুরা যোগ দিয়েছিলেন। এই উপলক্ষে সাতদিনব্যাপী যে-ধর্মসভা হয়েছিল, তাতে বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন মণ্ডলেশ্বর সভাপতির আসন গ্রহণ করেছিলেন, এবং তাঁদের কেউ কেউ শ্রীরামকৃষ্ণের অবতারত্ব শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত করে প্রমাণ করেছিলেন। পরবর্তী বিবেকানন্দ শতবার্ষিকীর (১৯৬৩) সময়ে কাশীতে পুনশ্চ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধুরা সমবেত হয়ে বিবেকানন্দ-মহিমা ঘোষণা করেছিলেন, এবং কনখল সেবাশ্রমে সকল সম্প্রদায়ের সাধুদের দানে 'ভাঙ্গী সাধু'দের আদি নেতা বিবেকানন্দের মর্মরমূর্তি স্থাপিত হয়েছে।

সাধুদের ধ্যানধারণায় বিবেকানন্দ কতখানি পরিবর্তন এনেছিলেন, তিনি কিভাবে তাঁদের সামাজিক দায়িত্বে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন, ঐসব বিক্ষিপ্ত সংবাদ থেকে কিছুটা বোঝা যায়। সংবাদগুলি মনে হতে পারে কেবল রামকৃষ্ণ মিশন সূত্রেই সংগৃহীত, তা নয়। আমাদের বক্তব্যের পক্ষে বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানীর সিদ্ধান্তকে উপস্থিত করতে পারি। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ-বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান অধ্যাপক জি. এস. ঘুরী (G. S. Ghurye) তাঁর (Indian Sadhus) নামক গবেষণামূলক গ্রন্থের মধ্যে, নানা শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত ভারতের বিশাল সাধুসমাজে বিষয়ে বিস্তারিত সংবাদ দেবার পরে, শেষকালে বিবেকানন্দ-প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন—রামকৃষ্ণের প্রেরণাপুষ্ট বিবেকানন্দ হলেন আধুনিক কালের সর্বাধিক মৌলিক, অদ্বিতীয় সন্ন্যাসী; ভারতীয় সাধুদের আচার-আচরণ, চিন্তা-ভাবনা, জীবন-চর্চায় তিনি সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন এনেছেন। এই সমাজবিজ্ঞানীর মতে—সাধুদের গৈরিক পোশাক, নামশেষে 'আনন্দ' শব্দের ইদানীং সর্বজনীন ব্যবহার, সংগঠন ও প্রচারপদ্ধতি—সবকিছুর মধ্যেই বিবেকানন্দের প্রভাব। সাধুদের মধ্যে এখন যে সাম্প্রদায়িক বিরোধ বহুলাংশে দূর হয়েছে, তাঁরা যে জনসেবার কাজে অগ্রসর হচ্ছেন—তার মূলেও বিবেকানন্দ। হিন্দুধর্মের সীমাকে বিস্তৃত ক'রে বিবেকানন্দ তাকে সর্বজনীন ধর্মে পরিণত করেছেন এবং সন্ন্যাসীদের জীবনাদর্শে এনেছেন বিপুল পরিবর্তন।

অধ্যাপক ঘুরীর রচনার কিছু অংশ:

"The mind of Vivekananda was extremely sensitive to spiritual influences. It was profound too. Small wonder that even a brief contact between these highly developed and sensitive personalities (between Ramakrishna and Vivekananda) led to the magnificent result of the flowering of Vivekananda into the most original and outstanding ascetic of modern times…

"There is a general opinion, outside the Udasi sect, in the matter of both names of the Paramahamsas and the colour of their garment, that their contemporary practices have been influenced by the example of Swami Vivekananda.

"The life of Vivekananda, though

short, proved to be deeply vitalizing. Not only did he extended the bounds of Hinduism so as to turn it into a universal religion, but what is more important from our point of veiw, he also energized and reformed ascetic ideals. Social service of varied kinds has now come to be recognised as a legitimate and important objective of ascetic and monastic life. His personal example has tended to obliterate the rigid sartorial differences between Saiva and Vaishnava ascetics. The ochre-coloured or the saffron-hued garments have come to be recognised as a symbol of asceticism, Ananda-ending names have gained favour among all sects of Indian Sadhus. And, what is more important, his example has reawakened Indian Sadhus to the need of wider organisation and propaganda."

রামকৃষ্ণ সংঘকে বিবেকানন্দ কিন্তু কদাপি ভারতবর্ষে সীমাবদ্ধ রাখতে চাননি। বরং বলা যায়, জন্মলগ্ন থেকেই এই সংঘ বিশ্বপটে স্থাপিত। ভারতীয় ধর্মসত্যকে পৃথিবীর মানচিত্রে স্থাপন করতেই বিবেকানন্দের আবির্ভাব এবং তাঁর অনুবর্তীরা সে কাজ কখনো পরিহার করতে পারেন না। মনে রাখতে হবে, বিবেকানন্দ সর্বজনীন ধর্মের আচার্য। আর তিনি তা না হয়ে পারেন না, কারণ তাঁর গুরু রামকৃষ্ণ ছিলেন ঐ ধর্মেরই অবতার। রোমাঁ রোলাঁ অনবদ্যভাবে বলেছেন: 'সেই পবিত্র হংস পাখা মেলে দিয়েছিলেন; তাঁর পাখার প্রথম আঘাত পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত হয়েছিল।' ইংরেজ সাহিত্যিক ক্রিস্টোফার ইশারউড ঐ বৃহৎ পক্ষচ্ছায়ে বিশ্বধর্মমন্দির নির্মিত হবার সম্ভাবনা ও সূচনায় পুলকিত হয়ে লিখেছেন:

"রামকৃষ্ণ আন্দোলন, নিঃসন্দেহে বলা যায়, আমাদের কালের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ধর্মীয় আন্দোলন।"

তখন তোমাকে ডাকি

শ্রীশান্তশীল দাশ

আমার সকল ব্যথা, সকল যন্ত্রণা
তুমি দূর করে দাও বারে বারে, তাই
তোমার কাছেই আসি, যখন আঘাত
সুদুঃসহ হয়ে ওঠে, সমস্ত সহের
সীমানা ছাড়িয়ে যায়, নিঃশব্দে একাকী
বেদনার অশ্রুজল ঝরাই নিভৃতে—
যে-বেদনা মানুষের হাত থেকে পাই।

কেন পাই জানি না তো, তবু প্রতিদিন
কী আঘাত আসে এই মানুষের কাছে;
হয় তো আঘাত দিয়ে খুশী হয়, তাই।
তখন সে-আঘাতের যন্ত্রণা দুঃসহ
জানাবো যে, সমব্যথী পাই না কোথাও।
তখন তোমাকে ডাকি, যে-তুমি আমার
মোছাও চোখের জল বারে বারে এসে।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও জনমানস

শ্রীনবনীহরণ মুখোপাধ্যায়

শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দকে বলেছিলেন, 'দেখে নিবি বৈকি। দিনে দেখবি রেতে দেখবি।' তা বিবেকানন্দও তাই করেছিলেন। একটু ভাল করেই রামকৃষ্ণকে দেখেছিলেন। দিনে-রাত্রে, স্বপ্নে-জাগরণে, আশার আলোকে, নৈরাশ্যের অন্ধকারে, ভেতরে বাইরে, জীবনে মরণে, বিবেকানন্দ দেখেছিলেন রামকৃষ্ণকে। এমন করে আর ক'জন দেখেছিল? সেই বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে বলেছিলেন, 'আমি তাঁকে অল্পই বুঝেছি। তাঁকে এত বড মনে হয় যে, তাঁর সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে আমার ভয় হয়—পাছে সত্যের অপলাপ হয়, পাছে আমার এই অল্প শক্তিতে না কুলোয়, বড় করতে গিয়ে তাঁর ছবি আমার ঢঙে এঁকে তাঁকে পাছে ছোট করে ফেলি।' আর অন্যের কা কথা?

যে মানুষের জীবন ও চরিত্রই মুখরিত হয়ে দিগ্ দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র বিশ্বে এক নব-উদ্বোধন সৃষ্টি করেছিল, যিনি নিরক্ষর হয়েও অক্ষর-সত্যের কথা 'বহতা নীরের' মত গ্রাম্য ভাষায় প্রকাশ করে তথাকথিত শিক্ষিতের বিদ্যামদোন্মত্ত অভিমানকে লজ্জিত করেছিলেন, যিনি 'আপনি আচরি ধর্ম' লোকারণ্যের বনস্পতিস্বরূপে, তিনি ভগবান হ'ন বা না হ'ন, এই যুগন্ধর মহাপুরুষকে আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। বিবেকানন্দের কথা, 'তাঁকে মানুষ বলো বা ঈশ্বর বলো বা অবতার বলো, আপনার আপনার ভাবে নাও। যে তাঁকে নমস্কার করবে, সে সেই মুহূর্তে সোনা হয়ে যাবে।' ম্যাক্সমূলারের কথা: রামকৃষ্ণ ছিলেন ঈশ্বর ও মানুষের এক অপূর্ব সংমিশ্রণ।

সনাতন ধর্মের জয়ধ্বজা যখন ইতিহাসের ঘাতপ্রতিঘাতে জনমানসে যখন সন্দিগ্ধতা ভিন্ন সকল আস্তিক্যবুদ্ধিই অবলুপ্ত, বক্তৃতা, গ্রন্থ বা প্রবন্ধ রচনা বা সমাজসংস্কার তখন কার্যকর হবার নয়। তাই এর কোনটিই করেননি রামকৃষ্ণ। সংশয়িত মনে প্রত্যক্ষ ভিন্ন বিশ্বাস জন্মায় না। জীবনেই সেখানে অনাস্থা। সেখানে জ্বলন্ত জীবন ভিন্ন আর সকলই নিষ্ফল। রামকৃষ্ণ মানুষের এই মহাসংকটকালে সকল নাস্তিক্যের ভ্রূকুটিকে উপেক্ষা করে সংশয়াকীর্ণ জনমানসের সামনে তাই আপন জীবন-বেদটিকে খুলে ধরলেন। কেন না,

"জীবনে জীবন যোগ করা
না হলে, কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হয় গানের পশরা।"

রামকৃষ্ণের নিজের কথা: "'নাক্ তোর কেটে তাক্' বোল মুখে বলা সহজ। হাতে বাজান কঠিন। সেই রকম ধর্মকথা বলা সহজ, কাজে করা কঠিন।" তাঁর জীবনই তাই হয়ে উঠলো মস্ত কর্ম, তা হয়ে উঠলো গভীর মৌনের মধ্যেও একান্ত মুখর। বিবেকানন্দ এমন জীবনের কথা বলতেই বলেছিলেন, "শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের ভেতর মানুষ-ভাবটা মরে গেছল, কেবল ঈশ্বরত্ব অবশিষ্ট ছিল। এরূপ অল্প কয়েকজন পরমহংসের পবিত্রতাই সমগ্র জগৎটাকে ধারণ করে রেখেছে। যদি এঁদের ধারা লুপ্ত হয়ে যায়, সকলেই যদি জগৎ-টাকে ত্যাগ করে যান, তবে জগৎ খণ্ড খণ্ড হয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে। তাঁরা কেবল নিজে মহোচ্চ জীবন যাপন করেই লোকের কল্যাণ বিধান করেন।"

কিন্তু রামকৃষ্ণ খুব শান্ত হয়ে বসে ছিলেন না। তিনি জানতেন বিজ্ঞানের যুগ এসেছে। বৈজ্ঞানিকের মতই তিনি দক্ষিণেশ্বরের গবেষণা-

গারে নিজ জীবনের ওপরই পরীক্ষা চালালেন নানান পদ্ধতিতে মানব জীবনের তত্ত্বকে নতুন করে বৈজ্ঞানিকভাবে লোকচোখের সামনে তুলে ধরতে। তাই, বিবেকানন্দের কথায়: 'রামকৃষ্ণকে জীবদ্দশায়—নাইন্টিন্থ সেঞ্চুরীর শেষভাগে ইউনিভার্সিটির ভূত ব্রহ্মদত্যিরা ঈশ্বর ব'লে পূজা করেছে।' মনমুখ এক করতে বলে রামকৃষ্ণ দেখালেন কি করে কর্মে ও কথায় আত্মীয়তা স্থাপন করতে পারা যায়। ক্রিয়া বা ব্যবহারের ওপর তিনি গুরুত্ব দিয়ে তা শেখালেন মানুষকে। আর সে পরীক্ষার ফলস্বরূপ সর্বসমক্ষে আবিষ্কৃত হল—কথার কথা হিসেবে নয়—ব্যবহারিকভাবে অদ্ভুত এক তত্ত্ব। নতুনভাবে আবিষ্কৃত হল সর্ববিশ্বের ঐক্য বা সাম্য, যা ভারতের সুদীর্ঘ সুমহান্ সাধনার মূল কথা। বহু পথ দিয়ে গিয়েও তিনি দেখলেন সেই এককে। তাই এই একত্ব নীরস হল না—এ হল বহুত্বের মধ্যে একত্ব। রূপ নিল সেই অমর কথাটি—যত মত তত পথ। ঐক্য বা সাম্য শুধু বোঝা হল না, কাজেও দেখা গেল। যারা তখনকার সমাজের অস্পৃশ্য তাদের কাজ ঝাড়ুর বদলে মাথার চুল দিয়ে করলেন রামকৃষ্ণ, তাদের ও অন্য ধর্মাবলম্বীদের উচ্ছিষ্ট-পাতা তুলতেন, খেতেনও তা থেকে সাম্য বুঝতে। একদল দরিদ্রকে যথোচিত সেবা না হওয়া পর্যন্ত তীর্থযাত্রা পরিত্যাগ করে ধরনা দিলেন। নারীকে দিলেন নতুন সম্মান। স্ত্রীগুরু গ্রহণ করলেন। সকল নারীতে মাতৃজ্ঞান করলেন। সহধর্মিণীকে ত্যাগ করতে হল না, ঈশ্বরীজ্ঞানে পূজা করলেন। পৃথিবীর ইতিহাসে কি পুরাণে এ ঘটনার নজীর নেই। শুধু কি তাই? প্রত্যক মানুষ, কীট পতঙ্গ ও উদ্ভিদের কষ্টও নিজের কষ্ট বলে অনুভব করা যায়, ঐ দক্ষিণেশ্বরের পরীক্ষাগারে বসে দেখালেন। মাঝির পিঠে প্রহারের আঘাত তাঁর পিঠে ফুটে উঠলো, গঙ্গা ফড়িং-এর গায়ে ফোটানো কাঠির বেদনায় ব্যথিত হলেন, পদপিষ্ট দূর্বা ঘাসের ব্যথা অনুভব করলেন। কথার কথা সাম্য নয়! যা কথা তাই কাজ। প্রমাণ হল এ যুগেও গীতার কথা: 'ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।' পরমতসহিষ্ণুতা শুধু নয়; নিজে তন্ময় হয়ে গেলেন অপরের ভাবে। কেউ কোথাও দেখেছে ধর্মান্তরিত না হয়ে পর পর কেউ খৃষ্টান মুসলমান, বৈষ্ণব, শাক্ত হচ্ছে আর বলছে—একই পুকুরে নামায় যেন ভিন্ন ভিন্ন ঘাট। সেই জলে নেমে জলকে কেউ বলে একোয়া, কেউ বলে ওয়াটার, কেউ বলে পানি। ১৮৯৫ সালে তাই মহানন্দে আমেরিকা থেকে এক গুরু ভাইকে চিঠিতে লিখেছেন বিবেকানন্দ "যেদিন শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মেছেন, সেইদিন থেকেই সত্যযুগ আবির্ভাব। এখন সব ভেদাভেদ উঠে গেল। আচণ্ডাল প্রেম পাবে। মেয়ে-পুরুষ-ভেদ ধনী-নির্ধনের ভেদ, পণ্ডিত-বিদ্বান-ভেদ, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল-ভেদ সব তিনি দূর করে দিয়ে গেলেন। আর তিনি বিবাদভঞ্জন—হিন্দু-মুসলমানভেদ, ক্রিশ্চান-হিন্দুভেদ ইত্যাদি সব চলে গেল। ঐ যে ভেদাভেদের লড়াই ছিল, তা অন্য যুগের,…"

ত্যাগীর বাদশা রামকৃষ্ণ ছিলেন জ্ঞানীর অগ্রগণ্য, যোগীর রাজা, ভক্তের শিরোমণি। কিন্তু কর্মেও কম ছিলেন না। তাঁর কাজ মনের ওপর মন যে সব চেয়ে ক্রিয়াশীল। কি অপূর্ব বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। বিবেকানন্দের কথায়—রামকৃষ্ণ কোন মত নন, তিনি একটি শক্তি, একটি পদ্ধতি, তা আজও ক্রিয়াশীল। তাঁর সব কর্মের উৎস ছিল প্রেম. তিনি প্রেমস্বরূপ ছিলেন। প্রেমের সঙ্গে যুক্ত ছিল তাঁর কাজ—তা ছিল রূপকারের কাজ। ভাল রূপ দিতে পারতেন, গড়তে পারতেন রামকৃষ্ণ। কামারপুকুরের প্রাচীন কুমার কাশীনাথের প্রতিমা অপূর্ব। কিন্তু বালক গদাধর তার এক সরস্বতী প্রতিমা কর্ম দেখে

বললে, "হচ্ছে না, হচ্ছে না।" সে কি কথা? "হ্যা গো দেখো না চোখটাই হয়নি।" গদাধর নিজেই গড়ে দিল অনিন্দ্যসুন্দর দেবীমূর্তি। সে কাজ জীবনভরেই করে গেলেন পরে রামকৃষ্ণ। মানুষ গড়ায় সিদ্ধহস্ত, তাই যেন জন্ম জন্মান্তরের নেশা। সানন্দে গড়লেন বিবেকানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, অদ্ভুতানন্দ, আরও কত। পাথর কেটে প্রতিমা গড়ার চেয়ে কাঁচা মাটিই তাঁর পছন্দ। তাই বিবেকানন্দও বলেছিলেন, "আমরা সবাই দেখতাম মানুষ গড়ার কাজ, আর শুধুই তাই, শ্রীরামকৃষ্ণ বয়স্কদের সব সময়েই বাছাই করে বাদ দিতেন। সর্বদা যুবকদেরই তিনি শিষ্যত্বের জন্য পছন্দ করতেন।" কাঁচা মাটিতে রূপ আসবে ভাল। সত্যিই তখনকার সব ঘটনা ভাবলে মনে হয় রামকৃষ্ণ যথার্থই একজন যুবনেতা, জননেতা।

শুধু দক্ষিণেশ্বরে বসেই কাজ নয়। কলকাতায় যাচ্ছেন ছুটে ছুটে। আজ এর বাড়ী, কাল ওর বাড়ী। কার কি করতে পারেন, এই চেষ্টা। যেখানে লোকজন আসে, খুঁজে বেড়ান তেজী যুবকদের। যান এ-সমিতি ও-সমিতি যদি মানুষ গড়ার মত লোক পান কোথাও। এক এক সময় ঈশ্বরোন্মাদ পরমহংস ঠাকুর মানুষ গড়ার তাগিদে রঙ্গমঞ্চেও গিয়ে হাজির হচ্ছেন। যাচ্ছেন কোথায় শাস্ত্রজ্ঞ, সাহিত্যিক, পণ্ডিত, মনীষী ব্যক্তিরা আছেন,—তাঁরাও আসছেন। নতুন যুগের নতুন ভাব ছড়িয়ে দিতে লোক-কল্যাণে। যেখানে দিলে তা বিশ্বের এ-কোণ থেকে ও-কোণে ছড়িয়ে যাবে তা ওই ঘোড়ার গাড়ীতে করে গিয়ে গিয়ে ব্যবস্থা করে আসছেন। কি অপূর্ব বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি! বিরাট মেশিন যেমন ছোট সুইচটি টিপলে চলতে থাকে, তিনি দেখলেন মনের শক্তি যেখানে বেশী মাত্রায় আছে সেখানেই ছোট্ট করে একটু নতুন রূপ দিতে হবে। তা হলে সেই ঢেউ মহাদেশগুলোর তটে তটে গিয়ে লাগবে। আর হোলও ঠিক তাই।

সবার অলক্ষ্যে রাত্রের শিশির যেমন প্রভাতের ফুলের কুঁড়িকে ফুটিয়ে তোলে, তাঁর কোমল হাতের ছোঁয়ায় ও মৃদু কণ্ঠের বলায় ঠিক তেমনই কাজ হতে লাগলো। নতুন জীবন নতুন, ভাব জেগে উঠলো। আর সেই ভাবের ঢেউ আছড়ে পড়তে লাগলো দেশ দেশান্তরের তটে তটে। ঘটনা লক্ষ্য করে তাই বিবেকানন্দ বলেছেন—"এরূপ কোমল থাকের লোকেরাই নতুন ভাব সৃষ্টি করেন আর 'হাঁক-ডাক' থাকের লোক ঐ ভাব চার দিকে ছড়িয়ে দেন।" রামকৃষ্ণ বর্তমান যুগের উপযোগী ধর্মশিক্ষা দিতে এসেছিলেন। তাঁর ধর্ম গঠনমূলক। এতে ধ্বংসমূলক কিছু নেই। বিবেকানন্দ বলেছেন—তাঁকে নতুন করে প্রকৃতির কাছে গিয়ে সত্য জানবার চেষ্টা করতে হয়েছিল, ফলে তিনি বৈজ্ঞানিক ধর্মলাভ করেছিলেন। সে ধর্ম কাউকে কিছু মেনে নিতে বলেনি, নিজে পরখ করে নিতে বলে; বলে, 'আমি সত্য দর্শন করেছি, তুমিও ইচ্ছা করলে দেখতে পারো।' এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ধর্ম পরিস্রুত হওয়ায় বহিরাবরণে যেখানে সংকীর্ণতা, কুসংস্কার, ধর্মোন্মত্ততা, বিভেদ ও কলহের কলঙ্ক আছে তা ধুয়ে যায় এবং রামকৃষ্ণের জীবন ও বাণীতে একটি সর্বমানবিক ধর্মের রূপ ফুটে ওঠে যা গোষ্ঠীগত ধর্মসমূহের প্রতি যথার্থ নিরপেক্ষ ভাব নিতে পারে। গোঁড়ামিহীন রামকৃষ্ণের এই ধর্ম মানুষকে দেয় সমন্বয়ের মহান্ আশীর্বাদ, ঐক্যের আকর্ষণ, ত্যাগের সদ্‌বুদ্ধি ও সেবার প্রেরণা: শিবজ্ঞানে জীবসেবার মন্ত্র।

খৃষ্টের দলের মত রামকৃষ্ণের বিবেকানন্দ এই নতুন সুসমাচার বিশ্বজনের সামনে উপস্থিত

করলেন। তাঁর কাজের প্রারম্ভেই তাই রামকৃষ্ণ-বাণীই প্রতিধ্বনিত হয়েছিল বিবেকানন্দের কণ্ঠে: "শীঘ্রই প্রত্যেক ধর্মের পতাকার উপর লিখিত হইবে, 'বিবাদ নয় সহায়তা; বিনাশ নয়, পরস্পরের ভাব গ্রহণ; মতবিরোধ নয়, সমন্বয় ও শান্তি।'"

ক্রিয়া কুশলতার মধ্য দিয়ে ঐক্য ও সাম্য; পরমতসহিষ্ণুতা, প্রেম ও সেবা—এই রামকৃষ্ণের ব্যবহারিক শিক্ষা। তাঁতে হয়েছিল সব ভাবের অপূর্ব সমন্বয়,—ধর্মসমন্বয়, যোগসমন্বয়, অধ্যাত্ম-ব্যবহারসমন্বয়, ভাব আর ক্রিয়ার সমন্বয়, প্রবৃত্তির সঙ্গে নিবৃত্তির সমন্বয়, সন্ন্যাসের সঙ্গে সংসারের সমন্বয়। এমনটি আর দেখা যায়নি। মানুষের জীবনকে পুরো ফোটাতে গেলে, শান্তি সৌহার্দ্য প্রীতির মধ্যে বাস করতে চাইলে আজ রামকৃষ্ণের কাছেই শিক্ষা নিতে হবে। সাম্য যিনি জীবনে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, ধর্ম-নিরপেক্ষতার ভাব যিনি তুলনামূলক ধর্মচর্চার মধ্য দিয়ে প্রথম আবিষ্কার করলেন, ধর্মের গণতন্ত্র যিনি স্থাপন করলেন, আজ বহুভাবে বিভক্ত সমাজে এমন আদর্শই অনুসরণ করা দরকার। রামকৃষ্ণকথামৃতকে তাই এক মনীষী যথার্থই বলেছেন—আধুনিক কালের সব চেয়ে গতিধর্মী সমাজদর্শন। ধর্ম মানে যা ধারণ করে—ঐক্যবদ্ধ করে। রামকৃষ্ণের ধর্ম জগৎকে তাই শেখাতে চেয়েছে নতুন করে বিবেকানন্দের ভাষায়: 'বিবাদ নয়, সহায়তা; বিনাশ নয়, পরস্পরের ভাব গ্রহণ; মতবিরোধ নয়, সমন্বয় ও শান্তি।'

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

স্-মো-দে

খড় ও মাটির ঘরের মানুষ তুমি
প্রজ্ঞা জ্ঞানের প্রদীপ্ত ভাস্বর
মানবিকতায় করুণার অন্তর,
তোমার পুণ্যে বাংলা তীর্থভূমি।

লেখা-জোখা-পড়া হয়নি অধিক কভু
চিন্তা-মননে ছিলে কবি মহাপ্রাণ
স্বামীজীর গুরু সুধী নর-ভগবান,
শিক্ষা-স্বল্প জ্ঞান-বাণী দিলে তবু।

'ভগবান লাভ নর-সেবা মাঝে হয়।
মুখ্য এ-কথা' শ্রীরামকৃষ্ণ-বাণী—
মানব-সমাজ সাদরে নিয়েছে মানি,
'শ্রীরামকৃষ্ণ-কথা-বাণী' অক্ষয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ ঠাকুর যুগাতবার
শ্রীপাদপদ্মে প্রণিপাত অনিবার।

পাতাল রেল

[পূর্বানুবৃত্তি]

অধ্যাপক অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে মস্কোর পাতাল রেলের কাজ শুরু হয়। সোকোলনিকি (Sokolniki থেকে গোর্কী পার্ক পর্যন্ত পূর্ব-পশ্চিম লাইনটিতে খননা-বরণ পদ্ধতিতে কাজ হয়। এর উদ্বোধন হয় ১৯৩৫ খ্রীঃ ১৫ই মে। এটি ভূতল Subsurface) লাইন। প্রথম ভূগর্ভ (tube) লাইন (৩০ থেকে ৫০ মিটার অর্থাৎ ১০০ থেকে ১৬০ ফুট নীচে অবস্থিত) খোলা হয় ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে। এটি মোটামুটি উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত। সার্কল্ লাইন (Circle Line) ও টিউব—তিন দফায় তৈরী হয় ১৯৫০, ১৯৫২ ও ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে।

এখন এই পাতাল রেলের মোট দৈর্ঘ্য ১০৩½ কিমি বা ৬৪½ মাইল। আরো ১০·৫ কিমি (৭ মাইল) লাইন সম্প্রসারণ হচ্ছে সোকল থেকে পাইওনারস্কায়া পর্যন্ত এতে চারটি ষ্টেশন থাকবে। এছাড়া, সোকোলনিকি থেকে আরো ২ কিমি (১¼ মাইল) এবং পুবদিকে তাগানস্কায়া পর্যন্ত ১৩½ কিমি (৮½ মাইল) লাইন সম্প্রসারণের কথা আছে। দক্ষিণে অটোবাদস্কায়া পর্যন্ত ৮½ কিমি (৫½ মাইল) লাইন বিস্তারের পরিকল্পনা কার্যকরী হলে গোটা মেট্রোর দৈর্ঘ্য হবে ১৫২½ কিমি (৯৫ মাইল)। ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দে পৃথিবীর পাতাল রেলগুলির মধ্যে মস্কোর মেট্রো চতুর্থ বৃহত্তম ছিল; অবশ্য যাত্রিসংখ্যার দিক্ থেকে দ্বিতীয় বৃহত্তম। এই লাইনে বছরে গড়ে ১০০ কোটি যাতায়াত (journey) হয়ে থাকে।

যথেষ্ট জলেভরা চুণাপাথরের মধ্য দিয়ে সুড়ঙ্গ-গুলি খনন করা হয়েছে। ষ্টেশনগুলি খুব প্রশস্ত। সচরাচর দুটো করে প্ল্যাটফর্ম্, প্রতিটির প্রস্থ ১৫ ফুট—প্রায় ৩০ ফুট ব্যাসের জোড়া সুড়ঙ্গের মধ্যে অবস্থিত। দুই সুড়ঙ্গের মাঝে ২৭ ফুট চওড়া একটি সম্মিলন-ক্ষেত্র (concourse) আছে। এর দৈর্ঘ্য প্ল্যাটফরমের পুরো দৈর্ঘ্যের (১৬০ মিটার বা ৫২৫ ফুট) সমান, এর থেকে প্ল্যাটফরমে যাবার অনেকগুলি ফোঁকর (openings) আছে। খননাবরণ পদ্ধতিতে নির্মিত ভূতল ষ্টেশনগুলি অনেকটা দ্বীপের মত দুই সারি স্তম্ভের ওপর প্ল্যাটফরমের প্রান্তে অবস্থিত। প্রতিটি ভূগর্ভ ষ্টেশনে চলমান সিঁড়ি (এসক্যালেটর) আছে; এদের অনেকগুলি আবার অস্বাভাবিক দৈর্ঘ্যের, যেমন, circle line এর ১২টি ষ্টেশনে মোট ৮২টি এসক্যালেটার আছে, এদের সম্মিলিত দৈর্ঘ্য ৭ কিমি (৪½ মাইল)। ৩০° কোণ করে এদের বসান হয়েছে; সেকেণ্ড ০·৭৫মি (অর্থাৎ মিনিটে ১৪৬ ফুট) গতিতে এরা চালিত হয়। পৃথিবীর সর্বত্রই এসক্যালেটরের এই গতিবেগ স্বাভাবিক বলে স্বীকৃত হয়েছে। প্রতি ঘণ্টায় এদের একটিতে গড়ে ৮,০০০ জন যাত্রী চলে থাকে।

লণ্ডন টিউবে যেভাবে লাইন বসান হয়েছে এখানেও প্রায় তাই। কংক্রীট-এর মধ্যে কাঠের স্লীপার বসান। ৬ কামরার ১০৬ খানা গাড়ী (মোট ৬৩৬ কামরা) এবং বাড়তি ৬৪টি কামরা —এই মোট ৭০০ কামরার ব্যবস্থা আছে। প্রতি কামরাই পুরো ইস্পাতে তৈরী, ওপরে হাল্কা নীল এবং নীচে ঘন-নীলে রংকরা—১৯মি (৬২ ফুট ৪ই) লম্বা, ২·৭৫ মি (৯ ফুট) চওড়া এবং ৩·৭৫ মি (১২ ফু ৪ই) উঁচু (রেল লাইন থেকে)। নবীনতম E শ্রেণীর গাড়ীর সর্বোচ্চ গতিবেগ ঘণ্টায় ৯০ কিমি (৫৬ মাইল)।

সাধারণতঃ প্রতি কামরায় ১৭০ জন যাত্রী (৪৪ জন বসে, বাকী দাঁড়িয়ে) যেতে পারে, অবশ্য সর্বোচ্চ ২৫০ জন পর্যন্ত যাওয়ার অনুমোদন আছে। ফলে ৬-কামরার গাড়ীতে ১,০০০ থেকে ১,৫০০ পর্যন্ত যাত্রী যেতে পারে। কখনো কখনো আট কামরার গাড়ীও চালান হয়। প্রত্যেক গাড়ীতেই একটি করে কামরা আসন্নপ্রসবা নারী, বৃদ্ধ ও পঙ্গুদের জন্য সংরক্ষিত আছে।

তিনটি ডিপোতে গাড়ীগুলিকে রাখা হয়। ৬,০০০ মিটার (৩৭২০ মাইল) চলবার পর প্রতিটি গাড়ীর পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা হয়; ৩২,০০০ মিটার (১৯,৮০০ মাইল) চলবার পর সব প্রয়োজনীয় মেরামত করা হয়; ২০০,০০০ মিটার (১২৪,০০০ মাইল) চলবার পর দেহ-সংস্কার (body-lifting) করা হয় এবং ৬০০,০০০ মিটার (৩৭২,০০০ মাইল) চলবার পর পুরো গাড়ীটাই পালটান (complete overhaul) হয় (অর্থাৎ গড়ে প্রতি তিন বছরে একবার)। শীতের সময় সব গাড়ীগুলিকেই ঢেকে রাখতে হয়। ডিপোগুলিতে গরম-রাখার পাইপ তৈরী হয়েছে এবং শেডগুলির প্রবেশপথে যাতে তুষার না জমতে পারে, তার জন্য উষ্ণ বায়ু (ঊর্ধ্বমুখী ও বহির্মুখী) প্রবাহিত করবার ব্যবস্থা আছে।

লেনিনগ্রাদ: লেনিনগ্রাদের কেন্দ্রীয় অংশের পরিকল্পনা করেছিলেন রাশিয়ার জার পিটার দি গ্রেট। আজও এই অংশ রাজপ্রাসাদ ও বিলাসবহুল সৌধসমূহের সেই সুসমঞ্জস পরি-কল্পনার সাক্ষ্য বহন করে চলেছে; কারণ তাদের যত্ন ও গর্বের সঙ্গে সংরক্ষণ করা হয়েছে। দ্রুত শিল্পায়নের ফলে নগরীর লোকসংখ্যা বেড়ে এখন ৪০ লক্ষে দাঁড়িয়েছে (রাশিয়ায় এর থেকে বেশী লোকসংখ্যা একমাত্র মস্কো নগরীতে আছে)। সোবিয়েত রাশিয়ার বাল্‌টিক সাগরে বেরুবার প্রধান পথ এই শহর দিয়ে। গ্রীষ্মে সমুদ্র ও খালগুলির বরফ গলে গেলে বিপুল পণ্য এর মাধ্যমে বহিত হয়। আধ মাইল চওড়া নেভা নদী, তার ব-দ্বীপের অনেক অংশ এবং কয়েকটি বড় খাল এই শহরের ভূপৃষ্ঠ পরিবহনের (surface traffic) প্রতিবন্ধক। মাটির তলায় ভিজে পলি-মাটির স্তর সুড়ঙ্গ খোঁড়ার খুব অনুকূলও নয়।

লেনিনগ্রাদ মেট্রো শহরের মাঝ বরাবর দুটি উত্তর-দক্ষিণ লম্বা টিউব লাইন নিয়ে গঠিত। ৫ লক্ষেরও বেশী লোক এই লাইন দিয়ে প্রতিদিন যাতায়াত করে, রোববারে আরো বেশী সংখ্যায়। অধিকাংশ ব্যবস্থাপনাই মস্কোর মেট্রোর সদৃশ। ভাড়ার ব্যবস্থা একই—একই পদ্ধতিতে দূরের পাল্লার যাত্রীদের পাতালপথে যাতায়াতে (এবং অল্প দূরত্বের যাত্রীদের ভূপৃষ্ঠ-পরিবহনে) উৎসাহ প্রদান, টিউব ষ্টেশনগুলির গভীরতা, মহিলা কর্মীর আধিক্য (এমনকি দূরের সাবষ্টেশনগুলিতেও মহিলা তত্ত্বাবধায়ক)। সাধারণভাবে রাশিয়ান যাত্রীরাও বেশ সুশৃঙ্খল।

ফাঁকা সময়ে তিন মিনিট অন্তর ৬ কামরার গাড়ী চালান হয়, আর ভীড়ের সময় ২ মিনিট অন্তর। দিনে দুটি ভীড়ের সময়—প্রতিটির মেয়াদ প্রায় ২ ঘণ্টা। সব নতুন ষ্টেশনেই আট কামরার গাড়ী চলবার মত ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ষ্টেশনগুলির দূরত্ব অপেক্ষাকৃত বেশী হওয়ায় গাড়ীর গতিবেগও বেশী—ঘণ্টায় ৫০ কিমি বা ৩১ মাইল। যাত্রীদের শৃঙ্খলা ও অন্যান্য উত্তম ব্যবস্থাপনার গুণে এটি সম্ভব হয়েছে।

১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে পাতাল রেলের নির্মাণকার্য শুরু হয়—রেভলিউশন স্কোয়ার থেকে আভটোভা পর্যন্ত (যেখানে একমাত্র ডিপোটি অবস্থিত)। লাইনের উদ্বোধন হয় ১৯৫৫ খ্রীঃ ২২শে অক্টোবর। অন্যান্য প্রধান লাইনগুলির সঙ্গে সংযোগকারী লাইনও এটিই। ১৯৫৮খ্রীঃ এটিকে উত্তরদিকে লেনিন স্কোয়ার পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা

হয়—তখন মোট দৈর্ঘ্য দাঁড়ায় ১৫½ কিমি (৯¾ মাইল)।

দ্বিতীয় লাইন খোলা হয় ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে—পেট্রোগ্রাদস্কায়া থেকে টেকনোলজিক্যাল ইনষ্টিটিউট পর্যন্ত। ১৯৬৩ খ্রীঃ Victory Park পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়—এটির মোট দৈর্ঘ্য দাঁড়ায় ১০ কিমি (৬¼ মাইল)।

পূর্ব-পশ্চিম প্রসারী তৃতীয় একটি লাইনও এখন তৈরি হচ্ছে আলেকজাণ্ডার নেভ্স্কী স্কোয়ার থেকে মিড্ল্ প্রস্পেক্ট পর্যন্ত (১৯৬৭ খ্রীঃ এটি খুলবার কথা ছিল)। এরও দুই প্রান্তেই সম্প্রসারণ পরিকল্পনা আছে। লেনিন স্কোয়ার থেকে লাইন সম্প্রসারিত করে কিরভ ষ্টেডিয়াম পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়ার কথাও আছে। ১৯৮০ খ্রীঃ এর পূর্বেই মোট ১১৬ কিমি (৭২½ মাইল) লাইন তৈরি করে ফেলবার ইচ্ছা।

সুড়ঙ্গপথের ব্যাস ৫·৩৮ মিটার বা ১৭ ফুট ৬ ইঞ্চি (মস্কোতে ৫·৫ মিটার বা ১৮ ফুট)। গাড়ীগুলির আয়তন (চাকা ও অন্যান্য সাজ-সরঞ্জাম) অবশ্য দুই শহরে একই। ষ্টেশনগুলি সব মস্কোপ্যাটার্ন—মাঝে একটি প্রশস্ত মিলন-ক্ষেত্র (concourse) ও দুই পাশে প্ল্যাটফর্ম্। অলংকরণের কাজ বহুল পরিমাণে মার্বেল পাথরে। পুরণো ষ্টেশনগুলিতে কিছু মোজেইক চিত্রণ আছে; কিন্তু নতুন ষ্টেশনগুলিতে অলংকরণ-বাহুল্য কম। অভ্যন্তরীণ অঙ্গসজ্জা অনেকটাই পাশ্চাত্য ক্ল্যাসিক্যাল ঢঙে; কিন্তু প্রত্যেকটি ষ্টেশনের বৈচিত্র্য ও স্বাতন্ত্র্য লক্ষণীয়। মস্কোর মতই সব ষ্টেশন খুব ছিমছাম, বিজ্ঞাপন আদৌ নেই, ফ্লুয়োরেসেণ্ট আলোকমালায় বিভূষিত। পেট্রোগ্রাদস্কায়ার শেষ ষ্টেশনটির (terminal) একটি বৈশিষ্ট্য আছে—তাহ'ল এর কোন প্ল্যাট-ফর্ম্ নেই, অথচ কেন্দ্রীয় মিলনক্ষেত্রটি (central concourse) আছে।

মস্কো মেট্রোর মতই এসক্যালেটর ব্যবস্থা—এক ধাপেই ৬০ মিটার নীচে চলে যাওয়ার ব্যবস্থা। টিউব ষ্টেশনগুলিতে এই চলমান সিঁড়ি-গুলি অত্যাবশ্যক। অস্বাভাবিক দ্রুতগতিতে (মিনিটে ১৯৫ ফুট) এগুলি চালিত হয়। সংকেত-(সিগন্যাল) ব্যবস্থা স্বয়ংক্রিয় হলেও জটিল নয়। গাড়ীগুলির ও ধরনধারন মস্কোর মতই—অবশ্য অপেক্ষাকৃত হাল্কা মোটর এখন ব্যবহার করা হচ্ছে। ঘণ্টায় ৭৫ কিমি (৪৬½ মাইল) পর্যন্ত গতিবেগের ব্যবস্থা আছে, অবশ্য প্রয়োজনমত একে ঘণ্টায় ৬৫ কিমি (৪০ মাইল) এ নামিয়ে আনা যায়।

কিয়েভ: ইউক্রেনের প্রধান শহর কিয়েভ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। এই শহরকে প্রায় পুরোই পুনর্নির্মাণ করতে হয়েছে। একারণেই অতি প্রশস্ত সব রাস্তা এবং গাছ-পালার প্রাচুর্য ও খোলা জায়গা দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু মাইলের পর মাইল নবনির্মিত প্রাসাদগুলি সারি সারি চলেছে তো চলেছেই—অতি একঘেয়ে দৃশ্য।

কিয়েভ মেট্রোপলিটান রেলওয়ের পরিকল্পনা যুদ্ধের পূর্বেই তৈরি হয়েছিল। যুদ্ধের জন্য কাজ স্থগিত হয়ে যায় এবং আরম্ভ করতে করতে ১৯৪৯ খ্রীঃ হয়ে গিয়েছিল। ১৯৬০ খ্রীঃ ২২শে অক্টোবর ৬ কিমি (৩·৭৫ মাইল) দীর্ঘ প্রথম অংশের উদ্বোধন হয়। এতে ৫টি ষ্টেশন। ঐ বছর ৭ই নভেম্বর প্রথম যাত্রী চলে এ লাইনে টারমিনাস থেকে নীপার ষ্টেশন পর্যন্ত। ১৯৬৩ খ্রীঃ এর শেষে আরো ৪ কিমি (২·৫ মাইল) লাইন সম্প্রসারণ হয় এবং দুটি অতিরিক্ত ষ্টেশন (পলি-টেকনিক এবং বলশেভিক ফ্যাক্টরী ষ্টেশন) সংযুক্ত হয়। তারপরেও কাজ চলতে থাকে, যাতে লাইনের মোট দৈর্ঘ্য দাঁড়ায় ১৩ কিমি (৮·১ মাইল) এবং মোট ষ্টেশনসংখ্যা হয় ১০।

১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দে এই লাইনে ৩ কোটির বেশী যাত্রী চলেছিল। নদীর অপর পারে যাবার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হলে যাত্রীর সংখ্যা আরো অনেক বাড়বে। গোড়াতে তিন-কামরার গাড়ী চালান হচ্ছিল; কিন্তু পাঁচ-কামরার গাড়ী যাতে চালান যায় তদুপযুক্ত প্ল্যাটফরম (১০০ মিটার বা ৩২৮ ফুট লম্বা) তখনই তৈরি হয়েছিল। ভীড়ের সময় প্রতি ২ মিনিট অন্তর গাড়ী ছাড়ে, অন্য সময় ২½ থেকে ৩ মিনিট অন্তর। যাত্রীরা এখানেও খুব সুশৃঙ্খল, ৩০ সেকেণ্ডের কমেই ওঠানামা সেরে ফেলে। গাড়ীর গড় গতিবেগ ঘণ্টায় ৩৮ কিমি (২৪ মাইল)। টিকেটের হার flat rate এ হওয়ায় কোন জটিলতা নেই।

ক্রিয়েভের মেট্রো ষ্টেশনগুলি প্রথম সোবিয়েত যুগের কর্মকৃতির গৌরব স্বচ্ছন্দেই করতে পারে। মস্কো ও লেনিনগ্রাদের ষ্টেশনগুলির সঙ্গে এদের অনেক সাদৃশ্য থাকলেও অলংকরণে কিন্তু যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায় - তা হল ইউক্রেনিয়ান শৈলীর প্রাদুর্ভাব। প্রতিদিনই ষ্টেশনগুলি ভাল করে ধুয়ে দেওয়া হয়, এর জন্য সব সময় পালিশ করা ঝক-ঝকে মনে হয়। মস্কোর মতই প্রতি পাতাল ষ্টেশনে দুই প্ল্যাটফরমের মাঝে একটি প্রশস্ত কেন্দ্রীয় সম্মেলন ক্ষেত্র (central concourse) দেখা যায়—এর প্রস্থ ৫.৭ থেকে ৫.৯ মিটার (অর্থাৎ প্রায় ১৯ ফুট) এবং উচ্চতা ৫ মিটার (১৬ফুট)।

গভীরতম ষ্টেশন হল আর্সেন্যাল—এই ষ্টেশনে দুই থাকে তিনটি করে এসক্যালেটর আছে, এদের সাহায্যে ১০০ মিটার (৩২৮ফুট) এরও বেশী নীচে থেকে ওপরে ওঠা যায়। মাঝে একটি হলঘর আছে এই ষ্টেশনে যার আকৃতি চোঙের মত এবং তার ছাদ হল গম্বুজের অভ্যন্তরের ন্যায়। কিয়েভের পাতাল রেলের সাজ-সরঞ্জাম অন্যান্য সোবিয়েত পাতাল রেলের অনুরূপ। গাড়ীর কামরার এক একটির দৈর্ঘ্য ১৯.১৭ মি (৬২ফুট ১০ ইঞ্চি)—উভয় পার্শ্বে চারটি করে দুই পাল্লার চাওড়া দরজা আছে; ৪৪ জনের বসবার এবং ২২০ জনের দাঁড়াবার জায়গা আছে প্রতি কামরায়। ঘণ্টায় সর্বোচ্চ গতিবেগ ৭৫ কিমি (৪৭ মাইল)।

সুড়ঙ্গ পথগুলির ব্যাস ৫.১ মি (১৬ ফু ৯ই)-সবগুলিই রি-ইন্‌ফোর্স্‌ড্‌ কংক্রীটে তৈরী hump pattern এ (অর্থাৎ ষ্টেশনের দিকে ক্রমে ওপরে উঠে গিয়ে দুপ্রান্তে ক্রমশঃ নেমে যাওয়া)। লণ্ডন সেণ্ট্রাল লাইনে এ-পদ্ধতির প্রথম ব্যবহার হয়—এতে ষ্টেশনে পৌছানোর সময় ব্রেকের (brake) কাজ সহজেই হয় এবং গাড়ী ছাড়বার পর সহজেই গতিবেগ ত্বরান্বিত (acceleration) হয়। ফলে ব্রেকের ক্ষয়ক্ষতি কম হয় এবং ত্বরণ ক্রিয়ার জন্য বৈদ্যুতিক শক্তির ব্যয় কম হয়।

সুড়ঙ্গ পথের অনেকটাই নির্মিত হয়েছে কাদা ও শুকনো বলির মধ্য দিয়ে। Rotary digger দ্বারা খনন ও মাটি সরাবার যান্ত্রিক কৌশলের সাহায্যে খুব দ্রুত এই পথের খননকার্য সম্পন্ন হয়েছিল—মাত্র একমাসে ২০০ মিটার (৬৫৫ ফুট) পর্যন্ত তৈরি করা সম্ভব হয়েছিল—অবশ্য University Polytechnic অংশে পথ তৈরি করতে খুব বেগ পেতে হয়েছিল, কারণ সেখানকার মৃত্তিকার গঠনগত দুর্বলতা।

জাপান: তিনটি শহর টোকিও, ওসাকা ও নাগোয়া এই দেশে পাতাল রেলের গৌরবের অধিকারী।

টোকিও: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে জাপানের শিল্পোন্নতি বিস্ময়কর। ১৯৫০ খ্রীঃ থেকে ১৯৬০ খৃঃ এর মধ্যে রাজধানী টোকিওর লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পায় শতকরা ৫০ ভাগ। শহরের কেন্দ্রীয় অংশের উন্নতি হয়েছে উল্লম্ব (Vertical); আকাশচুম্বী বহুতল প্রাসাদসমূহ নির্মিত হয়েছে; যদিও এখানকার মাটি ঠিক তার

উপযুক্ত নয়। রাস্তার ভীড় লণ্ডনের সঙ্গে তুলনীয়। এই সমস্যা সমাধানের জন্য নতুন রাজপথ (highway), পুরাণো সড়কের প্রস্থ বৃদ্ধি, ফ্লাই ওভার (fly over) এবং বিশেষ করে পাতাল রেলের ব্যবস্থা করা হয়েছে টোকিওর পাতাল রেল সাজ সরঞ্জামের বৈচিত্র্যে অতুলনীয়।

মারানুচি (Maranouchi) লাইন বছরে ২৬'৭ কোটি যাত্রী পরিবহনের ব্যবস্থা করে—অন্য সব লাইনের থেকে বেশী। এই লাইনে যাত্রী ভ্রমণের গড় দৈর্ঘ্যও দীর্ঘতম—৬'৪ কিমি (৪ মাইল)। প্রধান (main) লাইনে ছয় কামরার গাড়ী চলে, আর শাখা (branch) লাইনে চলে মাত্র দুই কামরার গাড়ী। প্রধান লাইনে মারনুচি থেকে শিনিজুকো পর্যন্ত ভীড়ের সময় ২ মিনিট অন্তর এবং অন্য সময় ৪ মিনিট অন্তর গাড়ী চলে। গাড়ীর গতিবেগ কোথাও ঘণ্টায় ২৬'৮ কিমি (১৬½ মাইল), কোথাও ২৭'৪ কিমি (১৭ মাইল) কোথাও বা আরো বেশী ৩৪'২ কিমি (২১½ মাইল)।

৩ নং লাইন (জিঞ্জা লাইন-Ginja line), দ্বিতীয় দীর্ঘতম। এর দৈর্ঘ্য ১৪.৩ কিমি (৯-মাইল)—০'৪কিমি ছাড়া বাকী সবটাই সুড়ঙ্গ পথে। এটিই টোকিও পাতাল রেলের প্রাচীনতম লাইন; ১৯২৫ খ্রীঃ থেকে ১৯৩৭ খ্রীঃ এর মধ্যে তৈরি হয়। এর উত্তরাংশে আশাকুশা থেকে শিমবাশি পর্যন্ত ৮ কিমি পথ তৈরি করেছে টোকিও পাতাল রেল কোম্পানী—এর কাজ শেষ হয় ১৯৩৪ খ্রীঃ জুন মাসে।

২নং লাইন (হিবিয়া লাইন-Hibiya line) আধুনিকতম। এ লাইনের কিতা সেঞ্জুর থেকে হিগাশিগিঞ্জা পর্যন্ত ১১'৭ কিমি (৭'৪ মাইল) পথ তৈরি হয় ১৯৫৯ খ্রীঃ এর প্রারম্ভ থেকে ১৯৬২ খ্রীঃ এর প্রায় শেষ পর্যন্ত। এর দ্বিতীয় আর একটি অংশ হিগাশিগিঞ্জা থেকে নাকা সেগুরো পর্যন্ত (৮'৭ কিমি বা ৫'৪ মাইল)-এর কাজ শেষ হয় ১৯৬৪ খ্রীঃ আগষ্টে। ১৯৬৪ খ্রীঃ সেপ্টেম্বর থেকে মিনাসি সেঞ্জু এবং নিন্‌লিয়োচোর মধ্যে ৬'২ কিমি (৪ মাইল) পথের ছয়টি ষ্টেশনের মধ্যে সব গাড়ীগুলিই স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে চলে।

তোজাই লাইন নামে পঞ্চম একটি লাইনের প্রথম অংশের উদ্বোধন হয় ১৯৬৪ খ্রীঃ ২৩শে ডিসেম্বর, এই অংশের দৈর্ঘ্য ৪ ৮ কিমি (৩ মাইল)। একে পশ্চিমদিকে নাকানা পর্যন্ত ৪'১ কিমি এবং পূর্বদিকে তিয়েচো পর্যন্ত ৭'১ কিমি বাড়িয়ে মোট ১৬ কিমি (১০ মাইল) করবার কাজ চলেছে।

টোকিওর সমস্ত পাতাল পথই অগভীর ভূতল (sub-surface লাইন। এর কারণ শহরের মৃত্তিকার গঠনপ্রকৃতি – মধ্যাঞ্চলের ভূত্বক ৩০ মি (৯৮ ফুট) পর্যন্ত খুব নরম, ভিজে পলিমাটিতে গঠিত; উপকণ্ঠগুলি অপেক্ষাকৃত উচ্চভূমিতে অবস্থিত হলেও বেশ উঁচুনীচু এবং ১৫ ফুট থেকে ২৫ ফুট গভীর আগ্নেয় ভস্মে গঠিত এবং তার নীচে আবার কাদা, বালি ও বেলেপাথরের বিভিন্ন এলোমেলো স্তর আছে। উপকণ্ঠ ও মধ্যাঞ্চলের গড় উচ্চতার পার্থক্য কোথাও কোথাও ৫০ মিটার (১৬৪ফুট) পর্যন্ত; সুতরাং কোন অঞ্চলেই গভীর টিউব লাইন টানা হয়নি, কারণ তাতে অনেক বেশী ব্যয় পড়ে যেত। মৃত্তিকার বিভিন্নতা ও এর জন্য অনেকটা দায়ী। তৎসত্ত্বেও টোকিওর পাতাল রেল তৈরি করতে যত রকম ইঞ্জিনিয়ারিং পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে, তা সত্যই বৈচিত্র্যে অসাধারণ। হিবিয়া ষ্টেশনে ২২½মিটার (৭৪ ফুট) নীচে ষ্টেশনের সুড়ঙ্গপথ নির্মিত হয়েছে; ঠিক তার উপরেই আছে ১৮'৯ মি (৬২ ফুট) চওড়া একটি পদযাত্রি-সম্মেলনক্ষেত্র (pedestrian concourse), আর তার ওপরেই (ঠিক সম্মেলনক্ষেত্রের মাথার ওপরে) আছে একটি চার-সারি (four-line) ভূ-নিম্ন মোটরপথ।

৬, ৭, ৮ এবং ৯নং লাইনও প্রস্তাবিত হয়েছে এবং তাদের ছকও তৈরি হয়ে গেছে। ৬নং লাইন হবে ৩০.২ কিমি (১৯মাইল) দীর্ঘ থামাতো-মাচি থেকে কিরিগায়া পর্যন্ত। ৭নং লাইন ২০.২ কিমি (১২৪ মাইল) দীর্ঘ হবে—ইয়াবুচিতো থেকে মেগুরো পর্যন্ত সরাসরি উত্তর দক্ষিণে। ৮নং লাইন ৫নং লাইনের (তোজাই লাইন) সমান্তরালে ঠিক তাঁর উত্তরে অবস্থিত হবে; এর দৈর্ঘ্য হবে ১৭.২ কি মি (১১মাইল)। আর ৯ নং লাইন তৈরি হবে উত্তর-পশ্চিমে আয়াজী থেকে দক্ষিণ পশ্চিমে কিতামি পর্যন্ত ৩২.২ কিমি (২০ মাইল) দীর্ঘ। এই সমস্ত লাইনের কাজ শেষ হলে টোকিও পাতাল রেলের মোট দৈর্ঘ্য দাঁড়াবে ২২০ কিমি (১৩৭ মাইল)।

ওসাকা :—এটি জাপানের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর। ইয়োদো নদীর বদ্বীপে অবস্থিত প্রধান সামুদ্রিক বন্দরও বটে। বোধ হয়, পৃথিবীর কঠিনতম পরি-বহন-সমস্যার সম্মুখীন একে হতে হয়েছিল—মাত্র ৫ বছরেই (১৯৬০-৬৫ খ্রীঃ) এর বেসরকারী গাড়ীর (private cars) সংখ্যা ১৯০,০০০ থেকে বেড়ে দাঁড়ায় ৪৪৭,০০০, অথচ শহরের মোট আয়তনের শতকরা ১০ ভাগ মাত্র রাস্তা (যেখানে লণ্ডনে ২৩% এবং নিউইয়র্কে ৩৬%) ওসাকার প্রতি বর্গমাইল লোকসংখ্যা ৪১,০০০, লণ্ডনে ২৭,৫০ নিউইয়র্কে ২৪,৫০০ এবং শিকাগোতে ১৬,২৫০ ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দে এই শহরের দুই তৃতীয়াংশ কর্মী লোক (working population) শহরতলীতে বাস করতে বাধ্য হয়েছিল; জনসংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এ প্রবণতা নিঃসন্দেহে আরো বাড়বে।

শহরের মাঝখান দিয়ে উত্তর-দক্ষিণ বরাবর ১নং লাইন দক্ষিণ দিকে তার একটি শাখা; শহরের মধ্যস্থল থেকে পশ্চিমে ওসাকা বন্দর (port) পর্যন্ত বিস্তৃত ৪নং লাইন এবং ৩নং লাইন—সব মিলিয়ে পাতাল রেলের মোট দৈর্ঘ্য ২৭কিমি (১৭ মাইল) এবং এতে বছরে যাত্রী চলাচল করে ২৮ কোটি। ১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই আরো ৪০কি-মি (২৫ মাইল) লাইন তৈরি হয়ে যাবার কথা ছিল। পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ হলে ১৯৭৫ খ্রীঃ নাগাদ ওসাকা পাতাল রেলের মোট দৈর্ঘ্য হবে ১১৫ কিমি (৭২ মাইল)। ১৯৬৬ খ্রীঃ এ মোট ষ্টেশন ছিল ২৩টি—এর মধ্যে ৬টি ছাড়া আর সব-গুলিই মাটির তলায় ছিল। ৪নং লাইনে Osaka port থেকে Bentencho পর্যন্ত elevated রেলপথ; ১নং লাইনেরও কিছুটা মাটির ওপর দিয়ে গেছে এবং শিন-ওসাকা পর্যন্ত চলে গেছে। এই শিন-ওসাকা হল জাতীয় রেলপথের নতুন, অনবদ্য টোকিয়াদো লাইনের শেষ ষ্টেশন।

১নং লাইনে ভীড়ের সময় ২২ মিনিট অন্তর আট কামারার গাড়ী চলে। ৩নং ও ৪নং লাইনে প্রথমদিকে দুই কামারার গাড়ী চলত। গভীর ষ্টেশনগুলিতে ওপরে উঠবার জন্য এসক্যালেটার ও নীচে নামবার জন্য সিঁড়ি আছে। ১৯৩০ খ্রীঃ জানুআরি মাসে পাতাল রেলের কাজ আরম্ভ হয়। এবং ১৯৩৩ খ্রীঃ এর মে মাসে ৩২ কিমি (২ মাইল পথ খোলা হয়। তখন মাত্র দশটি এক কামারার গাড়ীতে দিনে গড়ে ১৫,৮০০জন যাত্রী চলত। অন্য লাইনের নির্মাণ কার্যও চলতে থাকে; কিন্তু যুদ্ধের জন্য ১৯৪২ খ্রীঃ এর মে মাসের পরে বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৫০ খ্রীঃ জুনের পরে আবার কাজ শুরু হয়; তদবধি প্রায় নিরবিচ্ছিন্নভাবেই কাজ চলছে।

সমালোচনা

Meditation: By Monks of the Ramakrishna order: London Ramakrishna Vedanta Centre: Indian price Rs 10·00: Available from Advaita Ashrama, 5 Dehi Entally Road, calcutta-14. pp 161 including bibliography and index

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সমালোচনার জন্যে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পুরো বইখানি পড়বার দরকার হয় না—বেছে বেছে অংশবিশেষ পড়লেই চলে। আলোচ্য গ্রন্থখানি কিন্তু কোনমতেই এই পর্যায়ভুক্ত নয়—সমালোচনার জন্য হাতে নিয়ে প্রতিটি লাইন না পড়ে পারিনি। এককথায় ধ্যানের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের এত প্রাঞ্জল বিশ্লেষণ যে সম্ভব হতে পারে সে ধারণা মোটেই আমার ছিল না। স্বামীজীদের বিষয়টি যে সম্পূর্ণ অধিগত শুধু তাই নয়, ভাষাও সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন। আবার শুধু আয়ত্তাধীন বললে অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। সাধারণ অদীক্ষিতদের জন্যে ভাষা কি হওয়া উচিত সে সম্বন্ধেও তাঁরা সম্পূর্ণ সচেতন। এই পাঠকশ্রেণী হলেন সাধারণ ইংরেজ সমাজভুক্ত, তাঁদের জন্যই প্রধানতঃ এই গ্রন্থ-প্রকাশ। তাই ব'লে যে অন্যান্য সমাজে বইখানার উপযোগ নেই, সে ধারণা করলে সম্পূর্ণ ভুল হবে। বইখানা সামান্য ইংরেজী-জানা যে কোন লোকেরই উপযোগী।

ভারতীয় হিন্দুদের ধ্যান সম্বন্ধে কিছু-না-কিছু ধারণা আছে। আমরা ধ্যান-জপ করি, গায়ত্রী মন্ত্র পড়ি, আসন প্রাণায়ামের পথেও কোন কোন সময় চলি। কিন্তু এই নিয়মপদ্ধতি বা discipline-এর তাৎপর্য সম্বন্ধে আমরা অনেকেই অবহিত নই। আবার এই পদ্ধতিতে যে ফাঁক থাকতে পারে, অংশবিশেষ যে বিকৃতরূপ ধারণ করতে পারে সে বিষয়েও সচেতন নই। মনোযোগ সহকারে আলোচ্য গ্রন্থখানি পড়লে সেই সব শূন্যতা, অপূর্ণাঙ্গতার অধিকাংশই দূর হয়ে যাবে।

গ্রন্থখানি বিভিন্ন রচনার সংকলন এবং রচনাগুলির অধিকাংশ লণ্ডন রামকৃষ্ণ বেদান্ত কেন্দ্রের দ্বিমাসিক মুখপত্র 'Vedanta for East and West'-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। বর্তমান গ্রন্থে এর সঙ্গে যোগ করা হয়েছে স্বামী ভব্যানন্দের ভূমিকা এবং Voice of India-য় প্রকাশিত একটি নিবন্ধ। ভূমিকায় প্রাত্যহিক জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে ধ্যানের স্থান নির্দেশ করা হয়েছে এবং দেখান হয়েছে যে ধ্যান আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের পদ্ধতি হিসেবেই ক্রিয়া করতে পারে। তারপর প্রথম অধ্যায়ে স্বামী অশোকানন্দ শিক্ষার্থীদের জন্য প্রস্তুতিপর্বের বর্ণনা করেছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আছে স্বামী ঘনানন্দ কর্তৃক রাজযোগের ব্যাখ্যা। তৃতীয় অধ্যায়ে স্বামী জ্ঞানেশ্বরানন্দ ধ্যানের বিভিন্ন স্তরের ব্যাখ্যা করেছেন, যার ফলে প্রাথমিক শিক্ষার্থী এবং যিনি কিছুটা অনুশীলন করেছেন উভয়েই উপকৃত হবেন। চতুর্থ অধ্যায়ে আছে 'জপ' ও 'মন্ত্রে'র তাৎপর্য-ব্যাখ্যা। পঞ্চম অধ্যায়ে রাজযোগ ও জ্ঞানযোগের সমন্বয় করে দেখান হয়েছে অদ্বৈতবাদী যাকে উপলব্ধি বা realisation বলেন, কিভাবে শ্রুত অর্থের মননের সাহায্যে তাঁতে পৌছান যায়।

বেদান্ত অনুসারে যোগাভ্যাসের বিভিন্ন পদ্ধতি

আছে। পাঠক তাঁর মানসিক গঠন-প্রকৃতি অনুসারে এর যে কোনটি বেছে নিতে পারেন। এই নির্বাচনের ব্যাপারে গ্রন্থখানি বিশেষ সহায়তা করবে। যোগাভ্যাসে গুরুর প্রয়োজনীয়তা কোথায়?—এই সর্বজনীন জিজ্ঞাসার উত্তরদানের প্রচেষ্টা করা হয়েছে গ্রন্থখানিতে।

কেউ কেউ হয়ত প্রশ্ন করতে পারেন: ধ্যানের সার্থকতা কোথায়? সংক্ষেপে এর উত্তর দিয়ে স্বামী ভব্যানন্দ বলেছেন: ধ্যানের সফলতা শান্ত জীবনযাত্রার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত, তারপর তিনি একজন ধর্মগুরুর (হজরত মহম্মদ?) উক্তি উদ্ধৃত করেছেন: কুচিন্তাকে আয়ত্ত করার মত বিজ্ঞান বা শাস্ত্র আর নেই। আস্তিকতার উপযোগ কি? যখনই আমরা নিজেদের দুর্বল বলে মনে করি তখন একমাত্র ঈশ্বরের উপরই নির্ভর করতে পারি। এই প্রসঙ্গে ভোলতেয়ারের সেই বিখ্যাত উক্তিটি মনে পড়ে: "If God did not exist, it would be necessary to invent, Him." উক্তিটি উদ্ধৃত করলাম এই কারণে যে ধ্যান যোগভ্যাস মাত্র যোগী বা মহাপুরুষের জন্যেই সংরক্ষিত নয়. বিষয়টি সাধারণের জীবনচর্যার অঙ্গীভূত। এই সাধারণের জীবনচর্যার দিক দিয়েই গ্রন্থখানি সংকলিত ও সম্পাদিত। আমাদের স্থির বিশ্বাস যে আলোক-সম্পাতক ও ফলপ্রদায়ী প্রকাশন হিসেবে গ্রন্থখানি সর্বস্তরে যোগ্য সমাদর লাভ করবে।

—ডক্টর শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়

লীলায়ন: নিশিকান্ত। প্রকাশক: শ্রীনির্মলেন্দুশেখর বাগচী, ৭ জি মেঘদূত, ১২ রোলাণ্ড রোড, কলিকাতা ২০। পরিবেশক: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনেটোলা লেন, কলিকাতা ৯। পৃঃ ৮০। মূল্য: বারো টাকা।

মুর্শিদাবাদ জেলার গোয়াস পরগণার এক পল্লীতে তিনশতাধিক বৎসর পূর্বে বৈশ্যরায়-বংশীয় জনৈক ভক্তের গৃহদেবতারূপে রাধাকৃষ্ণের যে ধাতুবিগ্রহের, "মুরলীমনোহর"-এর আবির্ভাব, রায়-বংশের বংশধরগণ ও পরে জিয়ড়নৃসিংহ-প্রসাদ বরাট ও তাঁহার বংশধরগণ কর্তৃক সুদীর্ঘ-কাল পূজিত হইবার পর ১৩৭৭ সালের কার্ত্তিক মাসে তাঁহাকে সেখান হইতে বৃন্দাবনে লইয়া আসিয়া শ্রীজীর মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করা হয়; সেই সময় হইতে সেখানেই তিনি পূজিত হইতেছেন।

এই "মুরলীমনোহর" এবং তাঁহার পূর্বোক্ত ইতিহাসই সন্ন্যাসী ভক্ত কবি নিশিকান্তের অনুভূতি ও ভাবানুরঞ্জিত হইয়া "লীলায়ন" কাব্যরূপ ধারণ করিয়াছে। নিশিকান্ত বিগ্রহটিকে চাক্ষুষ দর্শন করেন নাই, কিন্তু তিনি বলিয়াছেন, 'মুরলী-মনোহর'-এর দর্শন তিনি পাইয়াছেন (কাব্যশেষে সংযোজিত কবিকাহিনী পৃঃ ৭৮)।

সেই দর্শনের স্মৃতি দিয়াই কাব্য আরম্ভ এবং প্রতি পৃষ্ঠায় প্রতি কবিতার শেষেও তাই— "শ্যামলসুন্দর, মুরলীমনোহর, দিয়েছে দর্শন দীনজনে॥"

'দিব্যদর্শনের পরে', 'স্মৃতিচারণে জীবন-কাহিনী', অবতারমালা' প্রভৃতি আটটি পালায় লীলায়ন সম্পূর্ণ। 'মুরলীমনোহরে'র ইতিহাস, শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা, একই ভগবান যে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন অবতার হইয়া আসেন—এই সমস্ত ভাবই নিশিকান্ত তাঁহার স্বভাবসুলভ ভাব-লালিত্যময় ভাষায় গ্রন্থটিতে ছন্দোবদ্ধ করিয়াছেন; ভক্ত-হৃদয়-কমলের অনাবিল আনন্দের পরাগ আকীর্ণ রচনাটির প্রায় প্রতি ছত্রেই।

গ্রন্থটির শেষাংশে 'মুরলীমনোহর'-এর সেবাইত-বংশের শ্রীহেমাঙ্গপদ বরাট-লিখিত 'মুরলী-মনোহর কাহিনী' ও 'কবিকাহিনী' সংযোজিত।

অনির্বাণ-লিখিত প্রবেশক এবং শ্রীইন্দ্র দুর্গার-অঙ্কিত ছয়খানি ত্রিবর্ণ চিত্র ও প্রচ্ছদ গ্রন্থটির সৌষ্ঠব বাড়াইয়াছে। ছাপা, বাঁধাই, কাগজ ও মুদ্রণ সবই উচ্চাঙ্গের। গ্রন্থটি পাঠ করিয়া ভক্ত-জন যে আনন্দলাভ করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

জন্মমৃত্যু-রহস্য—শ্রীপ্যারীমোহন বন্দ্যো-পাধ্যায়। দাশগুপ্ত প্রকাশন, সি-১৫ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট কলিকাতা ১২ হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ১৩২+১২। মূল্য ৩'৫০।

জন্মমৃত্যু-রহস্য উদ্‌ঘাটন করা সহজ নয়। সনাতন হিন্দুধর্মশাস্ত্রে এই তত্ত্ব বিভিন্ন দিক হইতে বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। আলোচ্য গ্রন্থখানিতে শাস্ত্রের কথা বর্তমান যুগের উপযোগী করিয়া শাস্ত্রোক্ত কয়েকটি উপাখ্যানের মাধ্যমে সরলভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। মৃত্যু কাহাকে বলে, সূক্ষ্মশরীর কি কি উপাদানে গঠিত, জীবাত্মা দেহ হইতে বাহির হইবার সময় গতিপথের তার-তম্য প্রভৃতি বিষয় সাধারণ লোকের নিকট পরি-ষ্কার নয়। পুস্তকখানি পাঠ করিলে এই সব দুর্বোধ্য বিষয়ে শাস্ত্রসম্মত একটি ধারণা হইবে বলিয়া মনে হয়। পরিশিষ্টে প্রসিদ্ধ হিন্দুশাস্ত্র-গ্রন্থগুলির নাম দেওয়া হইয়াছে।

শ্রমণ সংস্কৃতির কবিতা—শ্রীগণেশ লাল-ওয়ানী। জৈন ভবন, পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭ হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৬৮। মূল্য তিন টাকা।

জৈন আগম-সাহিত্যের শ্রমণ সংস্কৃতিতে যে আলোকবর্ষী আখ্যান-মূলক তথ্য বিদ্যমান, তাহা অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছে কয়েকটি আধুনিক বাংলা কবিতা। এই কাব্যগ্রন্থে প্রকাশিত ৯টি কবিতার মধ্যে দৃষ্টি আকর্ষণ করে : 'মনুষ্যজন্ম দুর্লভ,' 'সংসার দুঃখময়', 'আত্মজয় শ্রেষ্ঠ জয়' ও 'বীরস্তব'। অলংকার ও উপমা বাস্তবানুগ দৃষ্টি এবং সংলাপের শৈলীর জন্য পুস্তকখানি পড়িতে সকলেরই ভাল লাগিবে বলিয়া মনে হয়।

সাধককবি রবীন্দ্রনাথ—ডাঃ রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, ২১ বি রতনবাবু রোড, কাশীপুর, কলিকাতা-২। পৃষ্ঠা ১৫। মূল্যের উল্লেখ নাই।

পুস্তকখানিতে রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মজীবন সম্বন্ধে তাঁহার নিজের কথা আহরণ করিয়া তুলিয়া ধরা হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে তাঁহার স্বজনগণেরও কিছু উক্তি উদ্ধৃত। রবীন্দ্রনাথের প্রতি লেখকের শ্রদ্ধা গ্রন্থে পরিস্ফুট।

গুরু-শিষ্য-সংবাদ—সঙ্কলক : তারাপদ চট্টোপাধ্যায়, ডায়মণ্ডহারবার, নলিনীগঞ্জ, জেলা ২৪ পরগণা। পৃষ্ঠা ৩৩০। মূল্য—শ্রদ্ধাভরে পাঠ।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মহতী বাণী ও যুগা-চার্য স্বামী বিবেকানন্দের অমূল্য উপদেশাবলী আলোচ্য পুস্তকে সন্নিবেশিত। বাণীগুলি নির্ভর-যোগ্য ও প্রামাণিক পুস্তকাবলী হইতে সুষ্ঠুভাবে সঙ্কলিত। শিক্ষাব্রতী চিন্তাশীল সঙ্কলকের সাধু উদ্দেশ্য সফল হইবে যদি ছাত্রসমাজ বিনামূল্যে প্রদত্ত গ্রন্থখানি শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করেন।

পার্থসারথি বিবেকানন্দ সংখ্যা—সম্পাদক শ্রীপ্রীতিকুমার ঘোষ, ৫এ অক্ষয় বোস লেন, কলিকাতা-৪। পৃষ্ঠা ১৭৪। মূল্য তিন টাকা।

বিবেকানন্দ-সাহিত্য যাঁহারা বিশেষভাবে অনুশীলন করিয়া চলিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকের সুচিন্তিত রচনায় সংখ্যাখানি সমৃদ্ধ। প্রত্যেকটি লেখা পড়িবার মতো।

দরিদ্র-বান্ধব ভাণ্ডার সুবর্ণজয়ন্তী সংখ্যা (১৯২২-৭২)- সম্পাদক : ভট্টাচার্য।

এই সুবর্ণজয়ন্তী সংখ্যাটির অনেকগুলি লেখা-তেই স্বামী বিবেকানন্দের মহান সেবাদর্শ জন-সমাজের সম্মুখে উপস্থাপিত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে দেখিয়া আমরা আনন্দিত।

অমর স্মৃতি—শ্রীসন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক : ইনস্টিটিউট অব ন্যাশনাল কালচার, ৪৪ বাদুরবাগান স্ট্রীট, কলিকাতা ৯। পৃষ্ঠা ১৬৭। মূল্য দশ টাকা।

সুধী লেখক তাঁর দীর্ঘজীবনে বিভিন্ন সময়ে সাধক সিদ্ধ মহাপুরুষ হইতে আরম্ভ করিয়া জীবনের সর্বক্ষেত্রে খ্যাতনামা মানুষের সংস্পর্শে আসিয়া-ছেন। গ্রন্থে তাহারই স্মৃতিচারণ করিয়াছেন। লেখায় চমৎকারিত্ব আছে, স্বচ্ছ সাবলীল উচ্ছ্বাসবর্জিত ভাষায় স্মৃতিকাহিনী পরিবেশিত। সাধারণের অনেক অজানা কাহিনীর সমাবেশে ও বহু চিত্রে পুস্তকখানি আকর্ষণীয়

ম-দর্শন—(ত্রয়োদশ ভাগ) স্বামী নিত্যাত্মানন্দ। পরিবেশক : জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১১৯ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা ১৩। পৃষ্ঠা ২৪০। মূল্য আট টাকা।

মাষ্টার মহাশয়ের নিকট শ্রীরামকৃষ্ণদেব-সম্পর্কিত স্থান ব্যক্তি ও ঘটনা কত আনন্দপ্রদ ছিল তাহা ত্রয়োদশ খণ্ডের বিভিন্ন অধ্যায়ে পরি-স্ফুট। শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গে শ্রীম বলেছেন : "সত্য তিনি ঈশ্বর-অবতার। কিন্তু যুগধর্মসাধনের জন্য একেবারে বিশুদ্ধসত্ত্ব শরীর নিয়ে এসেছেন। এতে রজঃ তমঃ সহ্য হয় না। তাইতো স্বামীজী প্রণাম-মন্ত্রে বলেছেন, 'অবতারবরিষ্ঠায়'। ...বিজ্ঞানের প্রভাবে সমস্ত জগৎ এক পরিবারের মত হয়ে গেছে...। বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে সংশয়বাদ, নাস্তিক্যবাদেরও সৃষ্টি হয়েছে। তাই ঠাকুরের অবস্থিতি ভাবমুখে, মানে ঈশ্বরে—জগতে নয়—সর্বদা ঈশ্বরে। এই অবস্থা যাঁরা বুঝতে পারেন তেমন লোকদের চাইতেন। তাঁরা তাঁর কাজ করবেন কি না,—জগতের শান্তি প্রতিষ্ঠা করবেন! (পৃঃ ২১৪-১৫)

অন্যান্য খণ্ডের মতো বর্তমান খণ্ডেও অনেক কথা নূতনভাবে পরিবেশিত।

গীতায় সাধনা—শ্রীপ্রীতিকুমার ঘোষ কর্তৃক সম্পাদিত। পার্থসারথি প্রকাশন, ৫-এ অক্ষয় বোস লেন, কলিকাতা-৪ হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৯৬ + ২০। মূল্য ২.৫০ টাকা।

গীতা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী বলিয়া ভক্তসমাজে সমাদৃত, অতি উদার ভাবের আশ্রয় বলিয়া সর্বজনপ্রিয়। প্রাচীন যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমান যুগ পর্যন্ত গীতার প্রতি মানুষের অত্যন্ত আকর্ষণ। আলোচ্য গ্রন্থখানিতে গীতা-অনুধ্যানের ছাপ রহিয়াছে। জ্ঞান ভক্তি ও নিষ্কাম কর্মের সাধনার কথা ও ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে সহজবোধ্য ও সময়োপযোগী আলোচনা পাঠক-গণকে তৃপ্তি প্রদান করিবে। ভূমিকাটি সুলিখিত।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

সেবাকার্য

বাংলাদেশে সেবাকার্য ১৯৭৩ খৃষ্টাব্দের আগস্ট মাসের শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশে ৮টি সেবাকেন্দ্রের মাধ্যমে দুঃস্থ জনসাধারণের সেবা-কার্যে প্রায় ত্রিশ লক্ষ (২৯,৭৯,৪৯৭'৭৫) টাকা ব্যয়িত হইয়াছে।

গত জুলাই মাসে অনুষ্ঠিত সেবাকার্য :

ঢাকা কেন্দ্র কর্তৃক ২,১৭২ জন রোগী চিকিৎসিত হন। বিতরিত দ্রব্যাদি : গ্ল্যাক্সো ২,৩৬৮ পাউণ্ড, বিস্কুট ১৫০ কেজি, টিন্‌ড ফুড ১০৮ কেজি, মিল্ক পাউডার ৩,৭০০ পাউণ্ড, ধুতি ১৩৮, শাড়ী-৪৯৯, লুঙ্গি-৬০, কম্বল-৬১০, সোয়েটার-৩০৩, গামছা-৯, সার্ট-৭, মশারি-৮, গায়ে-মাখা সাবান-৬০, পুরাতন বস্ত্রাদি-৩৯৮, বাসনপত্র-১৪৩।

বাগেরহাট কেন্দ্র কর্তৃক ১৪টি গৃহ নির্মিত হয় এবং ৫,৯৯৬ জন রোগী চিকিৎসিত হন। বিতরিত দ্রব্যাদি : গুঁড়া দুধ ৭৩০ পাউণ্ড, বিস্কুট ২৩ কেজি, ফলের জেলি .৫ পাউণ্ড, ধুতি-৩৫, শাড়ী-৭২০, লুঙ্গি-১৩, কম্বল-৮২৩, জামার কাপড় ৯২৭৫ গজ, সোয়েটার-২৯৭, নানা রকমের পোশাক-৮০, জুতা ১৩২ জোড়া, সাবান ১৭৮ কেজি, পাঠ্য পুস্তক ৫০ ও শ্লেট ৫০।

দিনাজপুর কেন্দ্র কর্তৃক ১,৮৪১ জন রোগীর চিকিৎসা করা হয়। বিতরিত দ্রব্যাদি : 'আস্ত্রা' বেবি-ফুড ১৩'৫ কেজি, গুঁড়া দুধ ৭৫ কেজি, ধুতি-১২৬, শাড়ী-৫৪৯, লুঙ্গি-৩৮, কম্বল-৪০৩, জুতা ১৬ জোড়া, সাবান ৫৬ খণ্ড ও ভিটামিন ট্যাবলেট ১,৫২৫।

শ্রীহট্ট কেন্দ্র কর্তৃক বিতরিত হয় : 'আস্ত্রা' বেবি-ফুড ৪৫৫৮ কেজি, শাড়ী-৪০৭, মশারি-৩২৫, কম্বল-২৭৫, পুরাতন বস্ত্রাদি-৮।

ত্রিপুরায় বন্যার্তসেবা ১৯৭৩-আগস্ট মাসে রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক ৩৯৫ জন রোগীর চিকিৎসা করা হয়। এতদ্ব্যতীত ৩৭টি উপজাতি-অধ্যুষিত গ্রামে ৭৬৫টি পরিবারের ৪,২৬৮ ব্যক্তিকে নিম্নলিখিত দ্রব্যাদি দেওয়া হইয়াছে :

কম্বল-৯৫২, ধুতি-৮৫১, শাড়ী-১৯৭, গামছা-৬৭৬, বয়নের জন্য তুলার সুতার বাণ্ডিল-২০০, শিশুদের পোশাক-২,০৮৪, পশমী পোশাক-৯১, ডাল ৩৪২ কেজি, বিস্কুট ২০০ কেজি, ল্যাক্টোজেন ৩০ কেজি, চিড়া ৪১ কেজি, গুড় ২৪'৮ কেজি, লবণ ১,১৯০ কেজি, অ্যালুমিনিয়ম বাসন, রান্নার পাত্র, প্লেট, টাম্বলার ইত্যাদি-৩,৪০৬, লণ্ঠন-২০০, কেরোসিন ৫৪ লিটার, পাঠ্য পুস্তক-৩০৫, শ্লেট-২৯৬ ও পেন্সিল-২৯৬, ব্ল্যাকবোর্ড, ডাস্টার ও খড়ি ৬ সেট, ভজন-গানের জন্য ঘণ্টা ও খঞ্জনী ৬ সেট, শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীজীর বাঁধানো ছবি ১৮টি ও ১,৪৭৫ ধর্মীয় পুস্তক দেওয়া হয়।

কর্ণাটকে খরাত্রাণকার্য ১৯৭৩-জুলাই মাসে বাঙ্গালোর আশ্রম কর্তৃক গুলবর্গা জেলায় ঘনগপুর ও করাজগী সেবাকেন্দ্রের মাধ্যমে ৭৫টি গ্রামের ২,০০৭ বক্তিকে খাদ্যশস্য দেওয়া হইয়াছে।

গুজরাতে অনাবৃষ্টি ও খাদ্যাভাবের জন্য সেবাকার্য : রাজকোট আশ্রম কর্তৃক রাজকোট জেলায় ভাদলায় রান্না-করা খাদ্য বিতরণের জন্য যে পাকশালা (free kitchen) গত কয়েক মাস ধরিয়া পরিচালিত হইতেছে, তাহাতে দৈনিক ১,০০০ ব্যক্তিকে খাওয়ানো হইতেছে।

মেদিনীপুর জেলায় বন্যাত্রাণকার্য

মেদিনীপুর জেলার কাঁথি মহকুমার রামনগর ২নং ব্লক-এর অন্তর্গত মাধবপুর, কাদোয়া ও চটা-পদ্মপুকুর ইউনিয়ন এবং দেবরা অঞ্চলে বন্যা-প্রপীড়িত জনসাধারণের মধ্যে গত ৮ই সেপ্টেম্বর হইতে রামকৃষ্ণ মিশন চিড়া, গুড়, দুধ, বিস্কুট, চাল ও কাপড় বিতরণ করিতেছেন। গত ২১ শে সেপ্টেম্বর রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহকারী সাধারণ সম্পাদক স্বামী চিদাত্মানন্দ মহারাজ বন্যাদুর্গত অঞ্চল পরিদর্শন করেন এবং মিশনের দেপাল রিলিফ কেন্দ্রে বস্ত্র বিতরণ করেন। মেদিনীপুরে মিশনের ত্রাণকার্য নিয়মিতভাবে চলিতেছে এবং অন্যান্য অঞ্চলে দ্রুত সম্প্রসারিত হইতেছে

কার্যবিবরণী

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের ১৯৭২-৭৩ খৃষ্টাব্দের কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। এই কেন্দ্রে ৪টি বিভাগের মাধ্যমে কর্মধারা পরিচালিত হইতেছে।

অধ্যাত্ম-সংস্কৃতি: নিত্যপূজা, প্রার্থনা ও ভজন অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীশ্রীঠাকুর, মা, স্বামীজীর জন্মোৎসব এবং বিশ্বের ধর্মগুরুদের শুভ জন্মতিথি পালন করা হইয়া থাকে। আলোচ্য বর্ষে দুর্গাপূজা, কালীপূজা ও সরস্বতীপূজা সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। প্রতি একাদশী তিথিতে রামনামসংকীর্তন এবং প্রতি রবিবার বিকালে ধর্মগ্রন্থপাঠ হয়। ময়নাগুড়ি, বানারহাট চা-বাগান, শিলিগুড়ি প্রভৃতি স্থানে সভাসমিতি ও পাঠের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

ছাত্রাবাস: বিদ্যালয়ে পাঠরত ছাত্রদেরই ছাত্রাবাসে গ্রহণ করা হয়। ১৪টি বালককে ছাত্রাবাসে রাখা হয়, তন্মধ্যে ২টি বিনা খরচে এবং ১টি আংশিক ব্যয়ে। খেলা-ধুলা, স্বাস্থ্যচর্চা, পড়াশুনা ও নিয়মানুবর্তিতা প্রভৃতি বিষয়ে লক্ষ্য রাখা হয়।

লাইব্রেরী: গ্রন্থাগারে ২,৫০৫টি পুস্তক আছে। আলোচ্য বর্ষে ১,০২৭টি পুস্তক পাঠক-পাঠিকাদের পড়িবার জন্য দেওয়া হইয়াছিল। ২১টি মাসিক ও সাময়িক পত্র পত্রিকা এবং ১টি দৈনিক পত্রিকা রাখা হয়।

দাতব্য চিকিৎসালয়: অ্যালোপ্যাথিক বিভাগে নূতন ও পুরাতন রোগী যথাক্রমে ৮,১৬২ ও ১১,৬৭৮ এবং হোমিওপ্যাথিক বিভাগে ১,৭০৩ ও ২,০০৫ জন চিকিৎসিত হইয়াছে।

মাতৃসদন ও শিশুমঙ্গল: এখানে অন্তর্বত্নী মাতা ও নবপ্রসূত শিশুদের চিকিৎসা হইয়া থাকে। সোম, বুধ ও শুক্রবার বহির্বিভাগ বৈকালে খোলা থাকে। প্রতিদিন সকালে ও বৈকালে স্বাস্থ্যপরিদর্শিকা ও সেবিকা রোগীদের গৃহে উপস্থিত হইয়া যথাযোগ্য উপদেশ ও চিকিৎসার ব্যবস্থাদি করিয়া থাকেন। বহির্বিভাগে রোগীর সংখ্যা (মাতা ও শিশু)—১,৬৩২ এবং গৃহপরিদর্শন—১,৪৫৯। ইহা ছাড়া প্রতিদিন সকালে মাতা ও শিশুদের দুগ্ধ ও শিশুপথ্য বিতরণ করা হয়।

চিকিৎসা-বিভাগটি অভিজ্ঞ চিকিৎসক ও সেবিকাদের দ্বারা সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইয়া থাকে।

সরিষা রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের এপ্রিল ১৯৬৮ হইতে মার্চ ১৯৭২ খৃষ্টাব্দের কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। রামকৃষ্ণ মিশনের যে-সব কেন্দ্রে যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাদর্শ-রূপায়ণের কাজ চলিতেছে, তাহাদের মধ্যে গ্রাম্য পরিবেশে অবস্থিত সরিষা আশ্রমের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে।

দক্ষিণ কলিকাতা হইতে ২৮ মাইল দূরবর্তী ডায়মণ্ডহারবার রোডের পার্শ্বে অবস্থিত ২৪ পরগণা জেলার সরিষা গ্রাম। এই গ্রামে ১৯২১ খৃষ্টাব্দে

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম ও একটি নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়টি ক্রমে মধ্য ইংরেজী ও উচ্চ বিদ্যালয়ে এবং ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে বহুমুখী বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়। এতদ্ব্যতীত আরও অনেকগুলি শিক্ষায়তন বৃহৎ ভূখণ্ডের উপর গড়িয়া উঠিয়াছে।

বর্তমানে নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানগুলি সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতেছে:

ছাত্রদের বহুমুখী বিদ্যালয় ও বিদ্যার্থিভবন, বালিকাদের বহুমুখী বিদ্যালয় ও ছাত্রীনিবাস, সিনিয়র ও জুনিয়র বেসিক স্কুল, প্রি-বেসিক নার্সারি স্কুল, শিক্ষিকাদের জন্য জুনিয়র বেসিক ট্রেনিং ইনস্টিট্যুট, টেকনিক্যাল সেকসন্‌, কম্যুনিটি সেণ্টার, বয়স্ক শিক্ষণকেন্দ্র, এরিয়া লাইব্রেরী, টেক্সটবুক লাইব্রেরী, সব-ডিভিসনাল লাইব্রেরী, শিশুদের গ্রন্থাগার, প্রি-ভোকেসনাল ট্রেনিং সেণ্টার।

আশ্রম-পরিচালিত শিক্ষায়তনগুলিতে প্রায় আড়াই হাজার ছাত্রছাত্রী পড়াশুনা ও জীবন-গঠনের সুযোগ লাভ করিতেছে।

স্বামী বিজয়ানন্দের দেহত্যাগ

আমরা অতি দুঃখের সহিত জানাইতেছি, স্বামী বিজয়ানন্দ মহারাজ ৭৫ বৎসর বয়সে গত ১.৯.৭৩ তারিখে রাত্রি ৩টা ২৫ মিনিটে (আর্জেটিনা সময়) বুয়েনিস এয়ার্স-এ দেহ-ত্যাগ করিয়াছেন। গত ৪ মাস যাবৎ তিনি হৃদ্‌রোগে অসুস্থ ছিলেন, শেষের দিকে নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হইয়াছিলেন।

তাঁহার জন্মস্থান সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত সাহেবগঞ্জ। ছাত্রজীবনে তিনি মেধাবী ছাত্র ছিলেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেন, স্নাতক-পরীক্ষায় রসায়ন-শাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হইয়াছিলেন।

তিনি শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন, ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘে যোগদান করেন এবং ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহা-রাজের নিকট হইতে সন্ন্যাস-দীক্ষা প্রাপ্ত হন। অক্টোবর ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে তিনি শ্রীশ্রীঠাকুর-স্বামীজীর কাজের জন্য আর্জেটিনায় বুয়েনিস এয়ার্সে প্রেরিত হন এবং মার্চ ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে আর্জেটিনার রাজধানী বুয়েনিস এয়ার্স হইতে ৪০ কিলোমিটার দূরবর্তী বেল্লাভিস্টা শহরে (1149 Gaspas Campos) আশ্রমের জন্য সুন্দর ভবন সংগৃহীত হয়।

স্বামী বিজয়ানন্দ আর্জেন্টিনা যাওয়ার পর স্প্যানিস্‌ ভাষা শিক্ষা করেন এবং এই ভাষায় ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবনরচিত রচনা করেন; গ্রন্থগুলি অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে এবং ইহাদের মাধ্যমে স্প্যানিস্‌-ভাষাভাষী দেশগুলিতে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবধারা বিশেষ প্রসার লাভ করিতেছে।

স্বামী বিজয়ানন্দ নির্ভীক ও হৃদয়বান সন্ন্যাসী ছিলেন। তাঁহার মধ্যে অদম্য উদ্দীপনা ছিল। তাঁহার দেহনির্মুক্ত আত্মা শ্রীরামকৃষ্ণ-পাদপদ্মে চিরবিশ্রাম লাভ করিয়াছে।

বিবিধ সংবাদ

মন্দিরপ্রতিষ্ঠা

গত ৫ই মে ১৯৭৩ শুভ অক্ষয় তৃতীয়া হইতে দুইদিনব্যাপী উৎসব সহকারে কালীঘাট শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-আশ্রমে নবনির্মিত মন্দিরে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। বেদপাঠ, চণ্ডীপাঠ, গীতাপাঠ, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত ও 'লীলাপ্রসঙ্গ' পাঠ, বিবেকানন্দ-বাণী আলোচনা, বিশেষ পূজা, হোম, কালীকীর্তন, ভজন, সাধুসেবা প্রভৃতি এই উৎসবের অঙ্গ ছিল। বিশিষ্ট বক্তাও ব্যক্তিগণের সক্রিয় সহযোগিতায় উৎসবটি সর্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল।

বন্যার্তসেবা

উত্তর কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ যুব-সঙ্ঘ কর্তৃক সংগৃহীত অর্থ জামাকাপড় চাল ইত্যাদি গত ১৯শে সেপ্টেম্বর কাঁথি মহকুমার এগরা গ্রামে বিতরিত হইয়াছে।

বিবেকানন্দ-কেন্দ্র শিক্ষা ক্রমের উদ্বোধন

বিবেকানন্দ রক মেমোরিয়াল কমিটি স্বামী বিবেকানন্দ-স্মারক পরিকল্পনার দ্বিতীয় প্রকল্প হিসাবে নব-গঠিত বিবেকানন্দ-কেন্দ্রটির উদ্বোধন উপলক্ষ্যে কন্যাকুমারী ৩০-৮-৭৩ তারিখে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন পণ্ডিচেরীর লেফটেনান্ট গভর্নর শ্রীছেদিলাল এবং প্রধানবক্তারূপে উপস্থিত ছিলেন রাজকোট শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী আত্মস্থানন্দ। সংগঠক-সম্পাদক শ্রীএকনাথ রাণাডে সমবেত ভদ্রমণ্ডলীর সমক্ষে বিবেকানন্দ-কেন্দ্রের যাবজ্জীবন স্থায়ী-কর্মিবৃন্দের জন্য ছয়মাসের শিক্ষা-ক্রম পরিকল্পনার তাৎপর্য ও মূলনীতিগুলির ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে বলেন যে, জাতীয় জীবনকে সর্বকলুষমুক্ত ও সর্ববিধ শুভকর্মে উজ্জীবিত করাই এই প্রকল্পের আদর্শ।

কন্যাকুমারীতে তিনমাস শিক্ষা-গ্রহণের পর কর্মিগণকে সমাজ-সেবা বিষয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালাভের জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত করিয়া অনুন্নত স্থানে পাঠানো হইবে। সাতশত আবেদনকারীর মধ্য হইতে বাছাই করিয়া দুইজন মহিলাসহ মাত্র চৌদ্দজনকে মনোনীত করা হইয়াছে। সাড়ে তিন বৎসরের এই শিক্ষা সমাপ্ত হইলে কর্মিগণকে 'আজীবন-কর্মী' হিসাবে গ্রহণ করা হইবে। শিক্ষাগ্রহণের পর কর্মিগণ বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হইলে, বিবাহ করিতে পারিবেন এবং তাঁহাদের সচ্ছল ভরণপোষণের দায় কেন্দ্র বহন করিবে যাহাতে তাঁহারা তাঁহাদের সমগ্র মনোযোগ ও শক্তি এই সেবাব্রতে নিয়োগ করিতে পারেন। প্রতি বৎসর এই ধরনের ব্রত-ধারী নির্বাচন করা হইবে।

শ্রীরাণাডে বলেন: এই কাজের জন্য প্রাথমিক ব্যয় হইবে তিন কোটি টাকা, ইহাতে একটি যোগ সমিতি, থেরাপেটিক ইউনিটসহ একটি গবেষণা বিভাগ ও পুস্তকাগার থাকিবে যাহাতে পণ্ডিতগণ জাতীয় ও আন্তর্জাতীয় ভাবধারা সম্পর্কে অধ্যয়ন ও গবেষণা করিতে পারেন; একটি সর্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ মুদ্রণ বিভাগ থাকিবে, যাহাতে দেশীয় সকল ভাষায় গ্রন্থাদি ছাপানো যাইতে পারে এবং দেশে পাঁচটি এইরূপ কেন্দ্র স্থাপন এই প্রকল্পের অঙ্গ।

স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী

সন্ন্যাসীর গীত—১৪শ সংস্করণ। স্বামীজী-রচিত 'Song of the Sannyasin'-নামক ইংরেজী কবিতা ও উহার পদ্যে বঙ্গানুবাদ। মূল্য ২০ পয়সা।

ঈশদূত যীশুখৃষ্ট—৫ম সংস্করণ, ভগবান ঈশার জীবনালোচনা—মূল্য ০'৪৬।

সরল রাজযোগ—৫ম সংস্করণ। স্বামীজী আমেরিকায় তাঁহার শিষ্যা সারা সি. বুলের বাড়িতে কয়েকজন অন্তরঙ্গকে 'যোগ' সম্বন্ধে যে বিশেষ উপদেশ দান করেন, বর্তমান পুস্তক তাহারই ভাষান্তর। মূল্য ০'৫০।

পত্রাবলী—১ম ও ২য় ভাগ। অভিনব পরিবর্ধিত সংস্করণ। প্রায় ১০৫০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। স্বামীজীর বহু অপ্রকাশিত পত্র ইহাতে সংযোজিত হইয়াছে। তারিখ অনুযায়ী পত্রগুলি সাজানো হইয়াছে। পরিচয়- এবং নির্ঘণ্ট-সংযুক্ত। মনোরম বাঁধাই। স্বামীজীর সুন্দর ছবি সংবলিত। প্রতি ভাগ মূল্য ৫'৫০।

ভারতে বিবেকানন্দ—১৪শ সংস্করণ। আমেরিকা হইতে প্রত্যাবর্তনের পর স্বামীজীর ভারতীয় বক্তৃতাবলীর উৎকৃষ্ট অনুবাদ। ৫১৯ পৃষ্ঠা; মূল্য ৫'০০।

দেববাণী—৯ম সংস্করণ। আমেরিকার 'সহস্র-দ্বীপোদ্যান'-নামক স্থানে কয়েকজন অন্তরঙ্গ শিষ্যকে স্বামীজী যে-সকল অমূল্য উপদেশ প্রদান করেন, ঐগুলির একত্র সমাবেশ। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি, ২১৪ পৃষ্ঠা; মূল্য—২'৫০।

শিক্ষাপ্রসঙ্গ—৪র্থ সংস্করণ। শিক্ষা-সম্বন্ধে স্বামীজীর বাণীসকল সংকলিত ও ধারাবাহিকভাবে সন্নিবেশিত। ১৮৮ পৃষ্ঠা; মূল্য ১'৭৫।

কথোপকথন—৭ম সংস্করণ। স্বামীজীর উক্তি। ডবল ক্রাউন, ১৬ পেজি, ১৪২ পৃষ্ঠা। মূল্য ১'২৫।

মদীয় আচার্যদেব—স্বামী বিবেকানন্দ-প্রণীত; ১১শ সংস্করণ, ৬৪ পৃষ্ঠা। স্বীয় গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনী ও শিক্ষা-সম্বন্ধে আমেরিকাবাসীদের নিকট স্বামীজীর বিবৃতি। মূল্য ০'৭৫।

জ্ঞানযোগ-প্রসঙ্গে—বিভিন্ন বক্তৃতার সারসংক্ষেপ—ইংরেজীতে প্রকাশিত Discourses on Jnana Yoga পুস্তকের অনুবাদ। 'স্বামীজীর বাণী ও রচনা' হইতে পৃথক্ পুস্তকাকারে প্রকাশিত। আত্মতত্ত্ব ও বেদান্ত-বিষয়ক বহু কঠিন বিষয় সরলভাবে আলোচিত। 'জ্ঞানযোগ' গ্রন্থ পড়িবার পক্ষে সহায়ক। মূল্য দুই টাকা।

স্বামি-শিষ্য-সংবাদ—(পূর্বকাণ্ড — ১৩শ সংস্করণ; উত্তরকাণ্ড—১১শ সংস্করণ)। শ্রীশরৎচন্দ্র চক্রবর্তী প্রণীত। স্বামী বিবেকানন্দের মতামত অল্প কথায় জানিবার উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। স্বামীজীর জীবিতকালে তাঁহার সহিত প্রশ্নোত্তরচ্ছলে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য-দেশীয় আচার-নীতি, দর্শন-বিজ্ঞানাদি এবং ধর্ম ও সমাজগত সমস্যামূলক নানা বিষয়ের বিশদ আলোচনা। সরস ও হৃদয়গ্রাহী এই সব বর্ণনা সত্যই আনন্দদায়ক। বর্তমান যুগের বহু সমস্যার আদর্শানুগ সমাধানও ইহাতে পাওয়া যাইবে। জীবনতত্ত্ব বিষয়ে এই পুস্তকদ্বয় অমূল্য রত্নের সন্ধান দিবে। ২২০ ও ২১০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য প্রতি কাণ্ড ২'২৫।

মহাপুরুষ-প্রসঙ্গ—১৬শ সংস্করণ। ১৪৪ পৃষ্ঠা। ইহাতে রামায়ণ, মহাভারত, জড়-ভরতের উপাখ্যান, প্রহ্লাদচরিত্র, জগতের মহত্তম আচার্যগণ, ঈশদূত যীশুখ্রীষ্ট, ভগবান বুদ্ধ প্রভৃতি বিষয় আছে। কোমলমতি বালকদিগের চরিত্রগঠনে ও ভারতীয় সংস্কৃতিতে তাহাদিগকে শ্রদ্ধাবান্ করিতে ইহা বিশেষ সহায়তা করিবে; মূল্য ৩'০০।

[উদ্বোধনের প্রকাশিত পুস্তকাবলী উদ্বোধন গ্রাহকগণকে ১০% কমিশনে দেওয়া হইবে]

প্রাপ্তিস্থান : উদ্বোধন কার্যালয়, বাগবাজার, কলিকাতা ৭০০০০৩

উদ্বোধন-প্রকাশিত অন্যান্য পুস্তকাবলী

দশাবতারচরিত—৫ম সংস্করণ। শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য-প্রণীত। এই পুস্তক-পাঠে চরিত-কথার গল্পপ্রিয় পাঠক এবং ভক্তগণ ধর্ম ও ধর্মতত্ত্বের সন্ধান পাইবেন। মূল্য ২.০০।

শঙ্কর-চরিত—শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য-প্রণীত—৫ম সংস্করণ; আচার্য শঙ্করের অদ্ভুত জীবনী অতি সুললিত ভাষায় লিখিত। মূল্য ১.৫০।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বেদান্ত—স্বামী বিবেকানন্দ প্রণীত। ১৮৯৬ খৃঃ মার্চ মাসে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত বক্তৃতা এবং তৎপরবর্তী প্রশ্নোত্তর ও আলোচনা। বেদান্তের মূলতত্ত্ব অতি স্পষ্টভাবে ব্যক্ত। প্রশ্নোত্তর ও আলোচনায় ভারতীয় কৃষ্টি ও হিন্দুধর্মের মূল ভাব সাহসিকতার সহিত সরলভাবে উপস্থাপিত। পৃষ্ঠা ৫৫; মূল্য এক টাকা।

শিব ও বুদ্ধ—৭ম সংস্করণ। ভগিনী নিবেদিতা-প্রণীত। ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য রচিত সরল ও সুখপাঠ্য আখ্যান। মূল্য ০.৬৫।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ—শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সর্বপ্রথম অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের সবিস্তার ধারাবাহিক জীবনী। মূল্য—৩.০০।

ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ—৭ম সংস্করণ। স্বামী ব্রহ্মানন্দের কথোপকথন এবং পত্রাবলীর সংগ্রহ। প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু-লিখিত সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা। মূল্য ২.৫০।

মহাপুরুষ শিবানন্দ—স্বামী অপূর্বানন্দ-প্রণীত। ৩য় সংস্করণ। শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজীর বিস্তারিত জীবনী মূল্য— ৫.০০।

শিবানন্দ-বাণী—২য় ভাগ—৩য় সংস্করণ। স্বামী অপূর্বানন্দ-সঙ্কলিত। মূল্য—২.৫০।

শ্রীরামানুজ-চরিত—স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ-প্রণীত, ৩য় সংস্করণ, ২৫৮ পৃষ্ঠা। শ্রীসম্প্রদায়ে প্রচলিত আচার্য রামানুজের বিশুদ্ধ জীবনবৃত্তান্ত বাংলা ভাষায় প্রকাশিত। আচার্যের জীবদ্দশায় খোদিত প্রতিমূর্তির ছবি এই গ্রন্থে আছে। মূল্য ৬.।

স্বামী অখণ্ডানন্দ—স্বামী অন্নদানন্দ-প্রণীত। এই পুস্তকে শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্নিধানে, তিব্বতে ও হিমালয়ে, স্বামীজীর সঙ্গে, দুর্ভিক্ষে সেবাকার্য, সেবাব্রতের প্রাণপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতি অধ্যায়ে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্যের পথিকৃৎ স্বামী অখণ্ডানন্দের ধারাবাহিক জীবনী। ডিমাই সাইজ, ৩১০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৪.।

সাধু নাগমহাশয়—শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী-প্রণীত। ১১শ সংস্করণ। যাঁহার সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন, "পৃথিবীর বহু স্থান ভ্রমণ করিলাম, নাগমহাশয়ের ন্যায় মহাপুরুষ কোথাও দেখিলাম না।"—পাঠক! তাঁহার পুণ্য জীবন-বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া ধন্য হউন। মূল্য ২.০০।

গোপালের মা—স্বামী সারদানন্দ-প্রণীত (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ হইতে সঙ্কলিত)। অতুলনীয় সাধননিষ্ঠ, পরমভক্ত গোপালের মা-র আদর্শ জীবনের সংক্ষিপ্ত কাহিনী। মূল্য ৫০ পয়সা।

লাটু মহারাজের স্মৃতিকথা—শ্রীচন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়-প্রণীত। ২য় সংস্করণ। শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও ঠাকুরের শিষ্যবর্গ সম্বন্ধে বহু অপ্রকাশিত ঘটনাবলীর সমাবেশ। নিজ জীবনের কঠোর ত্যাগ-তপস্যার কথায় অদ্ভুত প্রকাশভঙ্গীতে পাঠকগণ চমৎকৃত হইবেন। মূল্য—৪.০০।

স্বামী তুরীয়ানন্দ—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ-প্রণীত। বাল্যাবধি বেদান্তী এই মহারাজের জীবনের অদ্ভুত ঘটনাবলী-পাঠে চমৎকৃত হইবেন। ৩৪০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য—৩.৫০।

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিষ্যগণের সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত একত্র এই প্রথম প্রকাশিত হইল। মূল্য—১ম খণ্ড ৮., ২য় খণ্ড ৫.৫০।

ভগিনী নিবেদিতা—স্বামী তেজসানন্দ-প্রণীত। ইহাতে তাঁহার জীবনের মুখ্য ঘটনাবলীর সম্যক্ আলোচনা রহিয়াছে। ইহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে "ভগিনী নিবেদিতা-স্মৃতি বক্তৃতামালার" প্রথম বক্তৃতা। মূল্য—১.৫০

[উদ্বোধনের প্রকাশিত পুস্তকাবলী উদ্বোধন গ্রাহকগণকে ১০% কমিশনে দেওয়া হইবে]

প্রাপ্তিস্থান:—**উদ্বোধন কার্যালয়**, বাগবাজার, কলিকাতা ৭০০০০৩

বিষয়-সূচী

বিষয়-সূচী

ভাল চা বলতে
টসের
চা
AIR TIGHT
এ, টস্ এণ্ড সন্স
ফোন
২২-৪৭৮৫
কলিকাতা—১

উদ্বোধন, ৭৬তম বর্ষ, ১৩৮০-৮১

নিবেদন

বর্তমান বৎসরের পৌষ মাসে 'উদ্বোধন' পত্রিকার ৭৫তম বর্ষ শেষ হইল। আগামী মাঘ (১৩৮০) মাসে পত্রিকা ৭৬তম বর্ষে পদার্পণ করিবে। পত্রিকার গ্রাহক-গ্রাহিকাগণকে জানানো যাইতেছে, তাঁহারা যেন আগামী ২৫শে পৌষের (৯ই জানুআরির) মধ্যে তাঁহাদের **পুরা নাম-ঠিকানা এবং গ্রাহক-সংখ্যা সহ** বার্ষিক চাঁদা ৮৲ টাকা মনিঅর্ডার করিয়া পাঠাইয়া দেন। **তৎপূর্বে, যত শীঘ্র সম্ভব সংলগ্ন কার্ডখানি পূরণ** করিয়া জানাইবেন মনিঅর্ডার-যোগে বা লোক-মারফত টাকা পাঠাইবেন অথবা মাঘ মাসের পত্রিকা ভি. পি. পি.-তে গ্রহণ করিতে চান; কার্ডটিতে ১০ পয়সার ডাকটিকিট আঁটিয়া পোস্ট করিবেন। ভি. পি. পি.-তে লইলে ৯৲ টাকা ২০ পয়সা লাগিবে।

অনিবার্য কারণে কাহারও পক্ষে আগামী বৎসরে গ্রাহক থাকা সম্ভব না হইলে তাহা উক্ত কার্ডেই জানাইয়া দিবেন।

উক্ত তারিখের মধ্যে বার্ষিক চাঁদা ৮৲ টাকা না আসিলে অথবা কোন পত্র না পাইলে মাঘ মাসের পত্রিকা ভি. পি. পি.-তে পাঠানো হইবে। **ভি. পি. পি. ফেরত দিলে আমাদের অযথা ক্ষতি হয়।**

সুদীর্ঘ ৭৫ বর্ষ ধরিয়া উদ্বোধন-পত্রিকার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবপ্রচারের কাজে আপনাদের সহায়তা আমরা পাইয়া আসিতেছি। আশা করি উহা অব্যাহত থাকিবে।

অফিসে চাঁদা জমা দিবার সময়ঃ { সকাল ৭॥ — ১১টা
বিকাল ২॥ — ৫টা।

[রবিবার অফিস বন্ধ থাকে]

কার্যাধ্যক্ষ
উদ্বোধন কার্যালয় *
১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা ৭০০০০৩

---

* উদ্বোধন কার্যালয় ১নং উদ্বোধন লেন-এর নিকটেই নূতন ভবনে স্থানান্তরিত হইয়াছে। চিঠিপত্রাদি পূর্বের ঠিকানাতেই পাঠাইবেন।

দিব্য বাণী

আধারভূতে চাধেয়ে ধৃতিরূপে ধুরন্ধরে।

ধ্রুবে ধ্রুবপদে ধীরে জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তুতে॥ ১

দয়ারূপে দয়াদৃষ্টে দয়ার্দ্রে দুঃখমোচনি।

সর্বাপত্তারিকে দুর্গে জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তুতে॥ ১১

অগম্যধামধামস্থে মহাযোগীশহৃৎপুরে।

অমেয়ভাবকূটস্থে জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তুতে॥ ১২ —জগদ্ধাত্রীস্তোত্রম্

তুমি এ জগতের আধার, আধেয়ও—
বিশ্ব হ'য়ে নিজে, তাহারি মাঝে রাজ!
ধৃতিরূপিণী তুমি, সর্ব-উত্তমা,
আপন শক্তিতে বিশ্ব ধরি আছ!
তুমি মা সনাতনী, তুমি পরমধাম,
চির-অচঞ্চলা, জননি বরদে!
জগতধাত্রি মা, জগত-জননি,
প্রণাম করি তব ও রাঙা শ্রীপদে!
তুমি মা দয়ারূপা, অসীম করুণাতে
ধন্য কর চিত কৃপা-নয়ন-পাতে!
সবার দুখরাশি আপদ বিনাশিনি,
জগতধাত্রি, মা, প্রণমি তারিণি!
মহাযোগীশ্বর মহেশ-হৃদি-মাঝে
অতুলনীয় ভাব-রাশি মা যেথা রাজে,
বাক্য-মন কভু কাহারো চকিতেও
যেথা পশিতে নারে, বিশ্বজননি,
সে-ধামে থাক তুমি (মহেশ সনে মিশে
আপন স্বরূপেতে ব্রহ্মরূপিণি!)
জগতধাত্রি, মা, প্রণমি জননি!

কথাপ্রসঙ্গে

শক্তির বিকাশ ও তাহার প্রয়োগ

ফুটবল খেলায় গোল করিতে হইলে দুইটি বিষয়ে গোলকারীকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয়। প্রথমতঃ, বলটি গোল হইতে যতখানি দূরে রহিয়াছে, বলটিতে আঘাত করিবার সময় প্রযুক্ত শক্তির পরিমাণ এতখানি হওয়া প্রয়োজন যাহাতে বলটি গোল পর্যন্ত পৌঁছায়। দ্বিতীয়তঃ, শক্তি-প্রয়োগের দিকটি নির্ভুল হওয়া চাই। ইহার যে-কোন একটির অভাব হইলে লক্ষ্যলাভ হইবে না; শক্তি যত বেশীই প্রয়োগ করা যাউক লক্ষ্যের দিকে নির্ভুলভাবে প্রযুক্ত না হইলে লক্ষ্য লাভ হইবে না, আবার লক্ষ্যের দিকে প্রযুক্ত হইলেও শক্তির পরিমাণ কম হইলে তাহা হইবে না।

জীবনের যে কোন ক্ষেত্রে যে কোন শক্তি প্রয়োগ করিয়া যে কোন লক্ষ্যলাভ সম্বন্ধে এই একই কথা। যে কাজটি করিতে চাহিতেছি তাহার জন্য প্রয়োজনীয় যথেষ্টপরিমাণ শক্তিসঞ্চয় সর্বাগ্রে করিতে হইবে, তাহার পর নির্ভুলভাবে উহা প্রয়োগ করিতে হইবে। প্রযুক্ত দৈহিক শক্তির, অচেতন শক্তির (force) ক্ষেত্রে যেমন, চিন্তাশক্তির, ইচ্ছাশক্তির ক্ষেত্রেও তাই—শক্তির পরিমাণ ও দিক্ (magnitude & direction) উভয়ই শক্তিপ্রয়োগে বাঞ্ছিত ফললাভের জন্য অপরিহার্য।

বর্তমান সময়ে, বিশেষ করিয়া আমাদের স্বাধীনতালাভের স্বল্পকিছুকাল পূর্ব হইতে যুবক-গণের মধ্যে ব্যাপকভাবে মানসিক শক্তির বিকাশ পূর্বাপেক্ষা বহুল পরিমাণে অধিক হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে ব্যাপকভাবে আত্মবিশ্বাস জাগিয়াছে, নির্ভীকতা আসিয়াছে, তামসিকতা অনেকখানি কাটিয়া রাজসিকতা বেশ কিছুটা আসিয়াছে। ইহা ব্যক্তির, জাতির উন্নতির পক্ষে শুভলক্ষণ সন্দেহ নাই—এবং বর্তমান সময়ের বহু বিভ্রান্তি, বিপুল ক্ষয়-ক্ষতির মধ্যে এইটাই বোধ হয় আমাদের একমাত্র নিশ্চিত লাভ।

কিন্তু এই মানসিক শক্তির বিকাশ কিছুটা ঘটিলেও এবং বাহ্য দৃষ্টিতে দেশের কল্যাণ, জন-গণের কল্যাণ তাহার লক্ষ্য হইলেও লক্ষ্যাভিমুখে নির্ভুলভাবে তাহা প্রযুক্ত হয় নাই। শক্তির পরিমাণও লক্ষ্যলাভের পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া মনে হয় না। ফলে বিগত কয়েক বৎসর ধরিয়া বিপুল পরিমাণে যুবশক্তি অপচিত হইয়াছে।

আমরা এ বিষয়ে যুব-মানসকে স্বামীজীর জীবনের প্রতি একটু তাকাইয়া দেখিতে, তাঁহার কথাগুলি একটু চিন্তা করিতে অনুরোধ করিতেছি। ছাত্রজীবন জ্ঞান-আহরণের ও শক্তিসঞ্চয়ের সময়। শক্তিসঞ্চয় বলিতে স্বামীজীর ভাষায় বলা যায়, আমাদের মধ্যে পূর্ব হইতেই নিহিত শক্তির বিকাশ সাধন। আমরা জানি, শক্তি-উৎপাদন যাহাকে বলি, বৈজ্ঞানিক সত্য হিসাবেই তাহা হইল কোন বস্তুর মধ্যে পূর্ব হইতেই নিহিত শক্তির বিকাশ সাধন, বা একটি শক্তিকে অন্য শক্তিতে রূপান্তরিত করা; শূন্য হইতে কিছুই উৎপন্ন করা যায় না। যে কোন জড়পদার্থের মধ্যে বিপুল-পরিমাণ অচেতন শক্তি (energy) প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, উহাকে বিকশিত করিবার পদ্ধতি জানিয়া সেইভাবে উহার বিকাশ ঘটাইয়া, উহাকে সঞ্চয় করিয়া, বাঞ্ছিত দিকে প্রয়োগ করিতে পারিলে আমরা তাহাদ্বারা বাঞ্ছিত ফলও

লাভ করিতে পারি, প্রযুক্তি-বিজ্ঞান তাহা করিতেছেও। সেইরূপ চিন্তাশক্তি, ইচ্ছাশক্তি প্রভৃতিও যাহার বিকাশ, সেই সূক্ষ্ম শক্তি আমাদের সকলের মধ্যেই পূর্ব হইতে নিহিত রহিয়াছে; উহা হইতে এই সব মানসিক শক্তির বিকাশ ঘটাইবার পদ্ধতি জানিয়া লইয়া সেইভাবে চলিলে মানসিক শক্তিকে, ইচ্ছাশক্তিকে এবং যে শক্তির বলে মানুষের ব্যক্তিত্ব বাড়িয়া যায় সেই ওজঃ-শক্তিকে প্রভূত-পরিমাণে বর্ধিত করা যায়। ইহা বৈজ্ঞানিক সত্যের মতোই পরীক্ষিত সত্য, এবং আমরা যে-কেহ ইহার সত্যতা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারি। এই শক্তির বিকাশসাধনের প্রকৃষ্ট উপায় হইল সংযম ও একাগ্রতার অভ্যাস। সংযম বলিতে অনেক কিছু বুঝাইলেও সাধারণতঃ যৌনশক্তিকে সংযত করাই বোঝায়, কারণ মানুষের মধ্যে বিকশিত সাধারণ শক্তিগুলির মধ্যে এইটিই প্রবলতম শক্তি; স্বামীজী বলিয়াছেন, কায়মনোবাক্যে এই শক্তির অপচয় রোধ করিতে পারিলে উহা উচ্চতর শক্তিতে, ওজঃশক্তিতে পরিণত হইয়া মস্তিষ্কে সঞ্চিত হয়; এই শক্তির অপচয় রোধে মানুষের আত্মবিশ্বাস ও ইচ্ছাশক্তি—মনের বল—উত্তরোত্তর বাড়িয়া যায়, মনে একটি শান্ত আনন্দের প্রলেপ পড়িতে থাকে। স্বামীজী বলিয়াছেন, যে-কেহ কয়েকদিন মাত্র কায়মনোবাক্যে ইহার অভ্যাসে একথার সত্যতা অনুভব করিবেই। অন্যান্য সর্ববিধ সংযম সম্বন্ধেই একই কথা—কয়েকদিন করিয়া দেখিলেই ফল নিজেই প্রত্যক্ষ করা যাইবে, কাহারো 'কথায় বিশ্বাস করিবার' বা 'মানিয়া লইবার' প্রশ্নই উঠিবে না। সংযম ও একগ্রতার অভ্যাস এই অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশের শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া প্রাচীন ভারতের ছাত্রজীবনের সহিত ইহা অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত ছিল। স্বামীজীর জীবনের প্রতি তাকাইলেও দেখি—ছাত্রজীবনে তাঁহার সর্বশক্তি নিযুক্ত ছিল নিজেকে গড়িয়া তোলার দিকেই। অবশ্য সে সময় নিজ অন্তরস্থ শক্তিকে বিকশিত করিয়া তিনি উহার প্রয়োগ করিয়াছিলেন জীবন ও বিশ্বের চরম সত্য লাভ করিবার জন্য—উহাই তখন তাঁহার লক্ষ্য ছিল। এই লক্ষ্যের দিকে নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়াই তিনি তখন চলিয়াছিলেন, অন্য কোনও দিকে তাকান নাই; মানবসেবা দেশসেবাদি যাহা কিছু তিনি করিয়াছিলেন তাহা পরে। চরম সত্যলাভের পর শ্রীরামকৃষ্ণের আদেশে যখন তিনি কাজে নামিয়াছেন—যে কাজ হইল সমগ্র ভারতকে ও জগৎকে, সমগ্র মানবজাতিকেই যথার্থ উন্নতির নির্ভুল পথ দেখানো—তখনো দেখি তিনি কার্যারম্ভের পূর্বে কাজটির জন্য যথেষ্টপরিমাণ শক্তি তাঁহার আছে কি না, তাহা ভাবিতেছেন; ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারতভ্রমণকালে শরচ্চন্দ্র গুপ্তকে (পরে স্বামী সচ্চিদানন্দ) বলিতেছেন, "বাবা, আমাকে একটি মহৎকার্য সাধন করিতে হইবে। এই কাজের তুলনায় আমার শক্তির স্বল্পতা দেখিয়া মনে হতাশা জাগিতেছে। এই কার্য-সাধনের জন্য আমি গুরু কর্তৃক আদিষ্ট। কাজটি সফল করিতে হইলে আমার মাতৃভূমিকে ঢালিয়া সাজিতে হইবে, তাহার কমে হইবে না।" এবং, কাজে নামিবার পূর্বে অধিকতর শক্তি সঞ্চয় করিয়া তবে কাজে নামিতে চাহিতেছেন বরাহনগর মঠ হইতে হিমালয়ে তপস্যা করিতে যাইবার সময় গুরুভ্রাতাদের বলিতেছেন, "এবার আর স্পর্শমাত্র লোককে বদলে ফেলতে পারার ক্ষমতা লাভ না করে ফিরছি না।"

একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিয়াই আমরা একথা বলিতেছি, এবং বলিতেছি শুধু ইহার প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব বুঝাইবার জন্য; প্রচণ্ড মানসিক, বৌদ্ধিক ও আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী হইবার পরও জনকল্যাণের কাজে নামিবার জন্য স্বামীজীর মতো ব্যক্তিও

আরো শক্তির বিকাশ ঘটাইয়া, কাজের পক্ষে উহার পরিমাণ যে যথেষ্ট ইহা নিশ্চিত হইয়া তবে কাজে নামিতেছেন।

ছাত্রজীবন তাই শক্তির বিকাশ সাধন ও জ্ঞান আহরণে (ইহাও শক্তিরই, বৌদ্ধিক শক্তিরই বিকাশ) প্রধানতঃ ব্যয়িত হইলে, এবং পরে সে শক্তি প্রয়োগের দিকটি কোন সাময়িক উচ্ছ্বাসের বশে নয়, খুব ভালভাবে বিচার ও যাচাই করিয়া নির্ণয় করিয়া লইলে যুবশক্তির অপচয় বহুল পরিমাণে রুদ্ধ হইবে।

অবশ্য এ প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় ভাবিবার আছে। প্রয়োজনীয় শক্তি সঞ্চয় করিয়া লক্ষ্যের দিকে নির্ভুলভাবে প্রয়োগ করিলে লক্ষ্যলাভ হইবে নিশ্চিতই, কিন্তু লক্ষ্য যদি জনকল্যাণ না হইয়া জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে স্বার্থসিদ্ধি হয়, তাহা হইলে কল্যাণের নামে লোকের অকল্যাণই করা হইবে বেশী। এজন্য শক্তিসঞ্চয় ও উহাকে নির্ভুল লক্ষ্যাভিমুখী করার সঙ্গে সঙ্গে অন্তরটিকে নিঃস্বার্থ করিবার চেষ্টাও জনকল্যাণকামী যুবকগণের অপরিহার্য কর্তব্য স্বামীজী। এবিষয়ে প্রাচীনভারতে ছাত্রজীবনে আচরিত পদ্ধতিরই নির্দেশ দিয়াছেন—ভগবচ্চিন্তার বা আমার নিজের ভিতর যাহা সত্য তাহার চিন্তার মাধ্যমে মনকে একাগ্র করিয়া সত্যাবগাহী করিতে বলিয়াছেন—যে সত্যলাভ হইলে স্বার্থপরতা নিঃশেষে লুপ্ত হয়, মানুষ যথার্থ সাম্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া মানবপ্রেমিক হয়।

রাষ্ট্র ব্যবস্থার, শিক্ষা-ব্যবস্থার সক্রিয় দৃষ্টি কবে এদিকে আকৃষ্ট হইবে আমাদের জানা নাই; দেশের যুবমানসের প্রতি আমাদের আবেদন—সে যেন নিজেকে যথার্থ জনসেবকরূপে গড়িয়া তুলিবার জন্য পূর্বোক্ত ভারতীয় পদ্ধতিটি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া একবার নিজে করিয়া, অন্ততঃ উহার ফলাফল পরীক্ষা করিবার জন্য করিয়া দেখে। বহুভাবে তো যুব-জীবনের অমূল্য সময় ও শক্তি অজস্র পরিমাণে ব্যয়িত হইতেছে, অপচিতও হইতেছে; যাচাই-করা হিসাবে দু-চার মাস এভাবে চলিলে ক্ষতি কি? লোকসানের ভয় কিছুই নাই, এবং আমরা জোর দিয়া বলিতে পারি—যুব-মন যাহা চায়, তাহা লাভ করিবার শ্রেষ্ঠ পথ এইটিই।

'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত'

'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত'—এই বাণী কঠোপনিষদের—আত্মজ্ঞান লাভের জন্য আহ্বান। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন—ওঠো, জাগো। তিনি জাতীয় জীবনের পুনর্জাগরণকল্পেও ইহা বলিয়াছেন। দেশবাসীকে বীরের মতো কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়িতে আহ্বান জানাইয়াছেন, অক্লান্ত কর্মতৎপর হইতে বলিয়াছেন। তাঁহার মতে ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র স্বার্থ বিসর্জন দিয়া নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে উদ্যম ও উৎসাহের সহিত কর্ম করিয়া যাইতে হইবে। হাটে বাজারে বিদ্যালয়ে অফিসে আদালতে সর্বত্রই কর্মমুখরতা প্রয়োজন, কিন্তু সর্বক্ষেত্রে সেবার ভাবটিও থাকা চাই। সমস্ত কর্মই ঈশ্বরের পূজা—এই বিশ্বাস অন্তরে জাগাইতে হইবে।

ভারতে উচ্চতম আদর্শের অভাব কখনও ঘটে নাই; অভাব ঘটিয়াছে সর্বসাধারণের জীবনে, আচরণে উহার প্রয়োগের। আদর্শের প্রতি শুধু অনুরাগই চরম মহত্ত্ব নয়, জীবনে তাহার বাস্তব রূপায়ণ ব্যতীত কোন জাতি কোনদিনই যথার্থ উন্নত হইতে পারে না। উচ্চ আদর্শের চিন্তার সহিত কর্মের সম্মিলন হইলেই পুনর্জাগরণ অবশ্যম্ভাবী।

ব্যক্তি লইয়াই সমষ্টি। জাতীয় সম্পদ বলিতে প্রত্যেক ব্যক্তির কর্মের সমষ্টিকেই বুঝায়।

ভুলিলে চলিবে না যে, জাতীয়তার ক্ষেত্রে প্রতিটি ব্যক্তিরই দিবার আছে। প্রত্যেক ব্যক্তি আলস্য ত্যাগ করিয়া অক্লান্তভাবে কর্মনিষ্ঠ হইলেই জাতির উন্নতি হয়, ইহা সকলেই জানেন। যে-জাতির জনসাধারণ স্বেচ্ছায় অনলসভাবে বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে ব্রতী হইয়াছে, এমনকি যে-জাতির কর্ণধারগণ জোর করিয়াও জনগণকে কর্মে ব্রতী করিয়াছে ও করিতেছে সেই সব জাতিই জাগতিক উন্নতির শিখরে আরোহণ করিয়াছে ও করিতেছে —ইহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন—কি শিল্পে, বিজ্ঞানে, বাণিজ্যে ও অন্যান্য বিষয়ে।

এখানে চিন্তার বিষয় আছে। জাতির উন্নতির জন্য স্বেচ্ছায় কর্মে ব্রতী হওয়া আর বাধ্য হইয়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও কাজ করিয়া যাওয়া উভয়ের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। স্বেচ্ছায় কর্ম করিতে গেলে কর্মের প্রতি ভালবাসা ও স্বার্থত্যাগের ভাব যেরূপ জাগে, বাধ্য হইয়া করিলে সেরূপ হয় না। স্বেচ্ছায় বা বাধ্য হইয়া যে কোন ভাবে কর্মনিরত হইলেই জাতীয় সম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি পায় নিঃসন্দেহ ; কিন্তু বাধ্য হইয়া কর্মে ব্রতী হইলে অন্তরে বিক্ষোভ-বহ্নি ধূমায়িত হইতে পারে, সময় পাইলে বিস্ফোরণের আকারে তাহার প্রকাশও অসম্ভব নয়। সেই জন্য জাতির কর্ণ-ধারগণকে ভাবিয়া দেখিতে হইবে, তাঁহারা জনগণকে প্রচণ্ডভাবে কর্মরত করার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের মধ্যে স্বার্থত্যাগের মনোভাব ও দেশপ্রেম সঞ্চারিত করিতে পারিতেছেন কিনা। আর তাহা করিতে হইলে যাঁহারা একাজ করিতে অগ্রসর হইবেন তাঁহাদের আদর্শনিষ্ঠ হইতে হইবে, তাঁহাদের মধ্যে যদি স্বার্থত্যাগের ভাব ও দেশের প্রতি ভালবাসা প্রবল থাকে, তবেই তাঁহারা অপরের মধ্যে তাহা সঞ্চারিত করিতে সমর্থ হইবেন। গীতার বাণী এখানে স্মরণীয় :

'যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ'

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যেরূপ আচরণ করেন, জনসাধারণ তাহারই অনুকরণ করে। অতএব যাঁহারা উচ্চ-স্তরে আছেন, যাঁহারা সংসারে জ্ঞানী গুণী বলিয়া সম্মানিত, তাঁহাদের সর্বদা সচেতন থাকা দরকার, যেন তাঁহাদের আচরণ সর্বপ্রকারে সুষ্ঠু ও অনুপ্রেরণার যোগ্য হয়। ভারতীয় জাতি ত্যাগ ও সেবাকে আদর্শ করিয়াছিল বলিয়াই যুগ যুগ ধরিয়া নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যেও এখনো বাঁচিয়া আছে। পাশ্চাত্যের মহাকর্মোদ্যম ও দেশপ্রেমের সহিত ভারতের চিরন্তন আদর্শ ত্যাগ ও সেবার মিলন ঘটাইতে পারিলেই বর্তমান ভারত উন্নতির উচ্চশিখরে উঠিবে।

স্বার্থত্যাগ কথাটি বলিতে খুবই সোজা কিন্তু তাহাকে কর্মে পরিণত করা, জীবনে বাস্তব করিয়া তোলা অত্যন্ত কঠিন কাজ। লোকে স্বার্থ ত্যাগ করিবে কেন ? স্বার্থ ত্যাগ করিতে গেলে প্রশ্ন জাগিবে. কেন স্বার্থ ত্যাগ করিব ? এই জীবনে যতটা পারি ভোগ করিয়া লই। সমাজের বা রাষ্ট্রের চাপে না পারিয়া মানুষ যেটুকু স্বার্থ ত্যাগ করে, তাহা তো প্রকৃত স্বার্থত্যাগ নয়। কিন্তু যদি জ্ঞান থাকে নশ্বর দেহের মধ্যে অবিনাশী আত্মা বিদ্যমান, তাহা হইলে স্বার্থত্যাগে আনন্দ পাওয়া যায়। শরীর যখন ধ্বংস হইবেই, তখন যতটা পারা যায় ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ করা উচিত, বিনাশশীল শরীরটিকে সৎকাজে নিয়োগ করা কর্তব্য।

আধুনিক বাস্তববাদী মানুষকে স্বার্থত্যাগে উদ্বুদ্ধ করা সহজ নয়। স্বীয় স্বার্থসিদ্ধি অপেক্ষা স্বার্থত্যাগে বেশী আনন্দ ইহা বুঝাইতে পারিলেই তাহাকে স্বার্থত্যাগে ব্রতী করিতে পারা যাইবে। প্রত্যেকের মধ্যে একই পরমাত্মা বিরাজমান। আমার মধ্যে যিনি, আপনার মধ্যেও তিনি, সকলের মধ্যে তিনিই। অতএব অপরকে সুখী দেখিলে নিজেকে সুখী মনে করা অস্বাভাবিক নয়, অন্যের

দুঃখানুভূতিতে নিজের দুঃখবোধও স্বাভাবিক। বিচারে এইটি বুঝিতে পারিলেও কর্মক্ষেত্রে ইহাকে প্রয়োগ করিতে পারা যায় না। কিন্তু অন্যের জন্য সামান্য একটু ত্যাগ ও সেবাতেই মানুষের হৃদয়-দ্বার উন্মুক্ত হইতে থাকে; যতই ত্যাগ ও সেবার আনন্দে মন ভরপুর হয়, ততই অপরের জন্য কাজ করিতে আরও ইচ্ছা জাগে, এমন অবস্থা আসে যখন অন্যের জন্য কাজ না করিয়া থাকা যায় না। আগে স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টায় যে সংগ্রাম করিতে হইত, এখন স্বার্থত্যাগের জন্য সেইরূপ সংগ্রাম করিতে হয়। স্বার্থত্যাগী মানুষ অন্যের জন্য সংগ্রামমুখর জীবনকে বরণ করিতে পশ্চাৎপদ না হইয়া দৃঢ়সঙ্কল্প হন।

শৈশবে গৃহে মাতাপিতা ও অভিভাবকগণ এবং কৈশোরে ও যৌবনে স্কুল-কলেজে শিক্ষকগণ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ত্যাগ ও সেবার ভাব যদি সঞ্চারিত করিতে চেষ্টা করেন তাহা হইলে ভবিষ্যৎ জীবনে অনায়াসেই বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে তাহারা নিঃস্বার্থপর হইতে পারিবে, কারণ অল্প বয়সে যে-ভাব চরিত্রে সঞ্চারিত হয় তাহার প্রভাব সারা জীবনই থাকে। মুখ্যতঃ তাহার দ্বারাই ভবিষ্যৎ জীবন পরিচালিত হয়, অন্যভাব আসিলেও প্রাধান্য পায় না। যাহারা বর্তমানে অল্পবয়স্ক তাহারই ভবিষ্যৎ নাগরিক, তাহাদের শুচিসুন্দর পরিবেশে উপযুক্তভাবে গড়িয়া তোলার দায়িত্ব সম্বন্ধে ঔদাসীন্য অবলম্বন করা উচিত নয়। তাহাদের শরীর-মনের সুষম বিকাশ সাধনের জন্য বর্তমানে উদ্ভাবিত বৈজ্ঞানিক শিক্ষাপ্রণালীর সহিত ত্যাগ ও সেবার কিরূপে সমন্বয় করা যাইতে পারে তাহার জন্য চিন্তাশীল মনীষিগণকে চিন্তা করিতে হইবে এবং তাহা করিতে পারিলে জীবনগঠনের নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবিত হইবে।

স্বামীজী চাহিয়াছেন নূতন ভারত, জাতির সার্বভৌম জাগরণ, মুষ্টিমেয় কতকগুলি মানুষের জাগরণ নয়। তাই তাঁহার প্রাণস্পর্শী আহ্বান:

নূতন ভারত বেরুক! বেরুক লাঙল ধ'রে চাষার কুটীর ভেদ ক'রে, জেলে-মালা মুচি-মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হ'তে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোড় জঙ্গল পাহাড় পর্বত থেকে।

স্বামীজীর ইচ্ছাকে বাস্তবে রূপায়িত করিতে হইলে চাই সর্বস্তরের মানুষের উন্নতির জন্য ঐকান্তিক আগ্রহ। ব্যক্তিগত স্বার্থ ভুলিয়া সমবেতভাবে অনলস ও অতন্দ্র সাধকের ন্যায় প্রত্যেককে কর্মে ব্রতী হইতে হইবে। 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত'—বাণী সকলের অন্তরে নিরন্তর ধ্বনিত হউক।

স্বামী সারদানন্দের অপ্রকাশিত পত্র

[শ্রীপ্রভাতচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত]

(১)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

কলিকাতা
৩রা জ্যৈষ্ঠ
[১৭ই মে, ১৯২৩]

পরমকল্যাণীয় প্রভাত,

তোমার পত্র পাইয়া মর্ম্মাহত হইলাম। নিদ্রালু মাতার স্তন মুখে চাপা পাড়িয়া অথবা শীতকালে গাত্রাবরণ চাপা পড়িয়া শিশুসন্তানের মৃত্যুর কথা শুনিয়াছি। তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতার প্রাণবিয়োগ ঐরূপে হয় নাই ত? যাহা হউক বড়ই দুঃখের বিষয় এবং তোমার পিতামাতার প্রাণে উহাতে কত কষ্ট হইয়াছে তাহা বুঝিতেছি। তাঁহাদিগকে আমার আশীর্বাদ জানাইয়া বলিবে ছেলেটির পরমায়ু শেষ হইয়াছিল সেজন্য ঐরূপ হইয়াছে। অনেকের প্রারব্ধ কর্ম্ম ঐরূপে সহসা শেষ হইয়া মৃত্যু হইবার কথা শাস্ত্রে আছে।

ক্ষিতীশকে ও "সাধু-বাড়ি-গিয়েছিলে"কে আমার আশীর্বাদ ও ভালবাসা জানাইবে। তুমিও আশীর্বাদ ভালবাসা জানিবে। তোমার বাবাকে বলিও তিনি যেন তোমার মাকে সঙ্গে লইয়া নিত্য ৺জগন্নাথদেবকে দর্শন করিতে যান, তাহা হইলে প্রাণের জ্বালা ও শোক অনেকটা কমিবে। যোগীন মা প্রমুখ এখানকার সকলে ভাল আছে। সাতু মহারাজ ভাল আছেন। বিলাস মহারাজ আগামী শনিবার পুরী রওনা হইবে। ইতি

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীসারদানন্দ

(২)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

Ramakrishna Mission
Laksha, Banares City U. P.
10. 3. 25.

কল্যাণবরেষু,

তোমার ৬ই মার্চ তারিখের পত্র আমি যথাকালে পাইয়াছি। তোমার পরীক্ষা ১১ই তারিখ আরম্ভ হইবে জানিলাম। তুমি পরীক্ষার পড়া ভালরূপ তৈয়ারী করিতে পার নাই বলিয়া মনে ভয় করিতেছ। কোনরূপ চিন্তা না করিয়া পরীক্ষার সময় যতটুকু জান স্থির নির্ভয় চিত্তে লিখিয়া আসিবে, তারপর ফলাফল যাহা হইবার হইবে। আশীর্বাদ করি যেন তুমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পার।

ক্ষিতীশের শরীর ভাল যাইতেছে [না] জানিয়া দুঃখিত হইলাম। তাঁহাকে আমার আশীর্বাদ দিও। গদাই এবং তোমার মা ও বাবাকে আমার আশীর্বাদ বলিও। আমার শরীর ভাল আছে। রাজবাড়ীতে গেলে তাহাদের সকলকে আমার অশীর্বাদ দিও। ইতি

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীসারদানন্দ

(৩)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

শশী নিকেতন
পুরী
১৭. ৭. ২৫

পরম কল্যাণীয় প্রভাত,

তোমার ১ই জুলাই-এর পত্রে তোমার ফেল্ হইবার কথা জানিয়া দুঃখিত হইলাম। যাহা হউক পুনরায় পরীক্ষা দিবে বলিয়া পূর্বের কলেজেই ভর্তি হইয়াছ জানিয়া সুখী হইলাম। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারিয়া অত দুঃখিত হইয়াছ কেন? তুমি ত সমস্ত বৎসর পড়িয়াছিলে। পড়াশুনায় ফাঁকি ত দেও নাই। তবে এত মন খারাপ কেন কর। কোনও একটা কাজে সফল হওয়া শুধু যে তোমার উপর নির্ভর করে তাহা নহে। বড় হইলে একথাটী বিশেষ করিয়া বুঝিতে পারিবে। গীতাতে ভগবান ঐ জন্যই বলিয়াছেন—যথাসাধ্য কর্ম কর কিন্তু ফলের প্রতি লক্ষ্য রাখিও না। যাহা হউক এবার বৎসরের গোড়া হইতেই নিয়ম করিয়া পড়িয়া যাও এবং ইহাই উদ্দেশ্য রাখিও যে পাঠ্য পুস্তকগুলির সমস্ত তুমি উত্তমরূপে আয়ত্ত করিবে। নিয়ম করিয়া পড়াশুনা কর এবং নিয়ম করিয়া ব্যয়ামাদিও করিও। কারণ একেবারে যদি exercise ছাড়িয়া দেও তাহা হইলে শরীরে বাত প্রভৃতি নানা ব্যাধি উপস্থিত হইবে এবং ঐজন্য পড়াশুনার ব্যাঘাত হইবে।

ধ্যানের যে সময় যেখানে যে পদ্ম চিন্তা করিতে হইবে তাহা তুমি ঠিকই লিখিয়াছ। অতএব উহাতে সন্দেহ করিও না।

ক্ষিতীশ ৺কাশীতে বায়ু পরির্তনে গিয়াছে জানিলাম। তাহাকে চিঠি লিখিবার সময় আমার আশীর্বাদ দিও। তোমার বাবা মা ও ছোট খোকাকে আমার আশীর্বাদ জানাইও। আমার শরীর এখানে ভাল আছে। অমূল্য মঃ, সাতু, হরিপ্রেম, কিরণ প্রভৃতি সকলে ভাল আছে। সকলের আশীর্বাদ জানিবে এবং আমার ভালবাসা ও আশীর্বাদ সতত জানিও। ইতি

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীসারদানন্দ

শ্রীমৎ স্বামী অখণ্ডানন্দজীর স্মৃতিকথা

স্বামী বীরেশ্বরানন্দ

পূজনীয় গঙ্গাধর মহারাজ যখন প্রথম ঠাকুরের কাছে যান তখন তিনি খুব গোঁড়া নৈষ্টিক (ব্রাহ্মণ সন্তান) ছিলেন। স্বপাকে হবিষ্যি করতেন। নিরামিষ খেতেন। ঠাকুর-দেবতার প্রসাদ হলেও আমিষ খেতেন না। পান খেতেন না। ঠাকুর তাঁকে মার প্রসাদ খেতে বলায় খেলেন। প্রসাদ খাবার পর তাঁকে একটি পানও খেতে বললেন। ইতস্ততঃ করে গঙ্গাধর মহারাজ পানও খেলেন। তখন ঠাকুর তাঁকে বললেন —"দেখ্, নরেন একশ'টি পান খায় মাছ মাংস সবই খায়। কিন্তু পথ দিয়ে যখন চলে তখন সবই ব্রহ্মময় দেখে। ভগবানকে প্রত্যক্ষ করাই আসল ধর্ম।"

ঠাকুর গঙ্গাধর মহারাজকে এই প্রত্যক্ষ উপদেশ দিয়ে যথার্থ ধর্ম কাকে বলে তা বুঝিয়ে দিয়ে গেলেন। ভগবানকে প্রত্যক্ষ করাই আসল ধর্ম; উপবাস করা, নিরামিষ খাওয়া, গঙ্গাস্নান করা, মন্দিরে যাওয়া—এসব ধর্ম নয়। সাধারণ মানুষ বাইরের এইসকল আচার-অনুষ্ঠানমাত্রকেই ধর্ম ব'লে ভুল করে। তাই মাঝে মাঝে মহাপুরুষরা এসে তাঁদের জীবনের আচরণ এবং উপদেশ দিয়ে ঠিক ঠিক ধর্ম কি তা বুঝিয়ে দিয়ে যান। তাঁদের দৃষ্টান্ত দেখেই আমরা ঠিক ঠিক ধর্মপথে চলতে পারি। ভগবানকে লাভ করাই আসল ধর্ম। নিজের ভিতরকার পূর্ণতার বিকাশ করার নামই ধর্ম। স্বামীজী রাজ-যোগে এই কথাই বলেছেন। ভগবানকে দর্শন করা,—ভালবাসাই আসল ধর্ম। শুধু আচার-অনুষ্ঠানকে ধর্ম ব'লে মনে করলে আমাদের ধর্ম-সম্পর্কে সংকীর্ণ বুদ্ধি এসে যায়।

ঠাকুরের দেহ যাবার পর তাঁর কয়েকজন ত্যাগী সন্তান বাড়ীঘর ছেড়ে বরানগর মঠে এসে যোগ দিলেন। গঙ্গাধর মহারাজ কিন্তু মঠে এলেন না। তিনি তপস্যা এবং তীর্থ-ভ্রমণের জন্য চলে গেলেন উত্তরাখণ্ডে, হিমালয়ে। পরিব্রাজক সন্ন্যাসীর বেশে তীর্থে তীর্থে এবং দেশে দেশে ঘুরে বেড়াবার প্রতি তাঁর খুব ঝোঁক ছিল। তিনি বলেছিলেন যে, তাঁর ইচ্ছা ছিল হিমালয় পার হয়ে পায়ে হেঁটে তিব্বত ও মধ্য-এশিয়ার ভেতর দিয়ে বেরিং প্রণালীতে গিয়ে সমুদ্রস্নান করবেন।

পরিব্রাজক-সন্ন্যাসি-জীবনের প্রতি তাঁর অনুরাগ থাকা সত্ত্বেও তিনি স্বামীজীর আদেশে নীচে নেমে এসে সঙ্ঘের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। স্বামীজীর প্রতি আকর্ষণ ও ভালবাসার জন্য তিনি নিজের রুচি-পছন্দকে বিসর্জন দেন। স্বামীজীর প্রতি তাঁর প্রীতি ও ভালবাসা ছিল অপরিসীম। পরিব্রাজক-জীবনে তিনি সুযোগ পেলেই স্বামীজীর সঙ্গে মিলিত হয়ে দুজনে আনন্দে ভ্রমণ করতেন। পরে স্বামীজী তাঁকে একা একা চলতে বলে নিজে আলাদা হয়ে গেলেন। কিন্তু গঙ্গাধর মহারাজ ঠিক একসঙ্গে না হলেও স্বামীজীর পিছু পিছুই ভ্রমণ করতে লাগলেন। স্বামীজীর প্রতি ভালবাসার জন্যই তিনি স্বামীজীকে খুঁজে খুঁজে বের করতেন। স্বামীজীর প্রতি তাঁর এই আকর্ষণ তাঁর জীবনের আর একটি বৈশিষ্ট্য।

পরিব্রাজক-জীবনে স্বামীজীর মতো গঙ্গাধর মহারাজও বহু দেশীয় রাজার রাজ্য পরিভ্রমণ করেন। সেখানকার গরীব-দুঃখীদের দুঃখে কাতর হন। তাঁদের দুঃখ-দুর্দশা দূর করবার জন্য

রাজা ও রাজকর্মচারীদের উপদেশ দেন। নিজেও তাঁদের মধ্যে নারায়ণজ্ঞানে সেবাকার্য আরম্ভ করেন।

শিক্ষাবিস্তারের প্রতি গঙ্গাধর মহারাজের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। সংস্কৃতশিক্ষার প্রচার ও প্রসারের জন্য তিনি আজীবন চেষ্টা করে গেছেন। যথাযথ স্বর ও ছন্দে উচ্চারণসহ ভারতের বেদ-বিদ্যার চর্চা হয়, এ ইচ্ছা তাঁর ছিল। জামনগরে তিনি একটি বেদবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। নিজে তিনি বেদপাঠ শুনতেন। ভাল স্তোত্র আবৃত্তি করতেন। পরবর্তীকালেও তিনি সকলকে সংস্কৃত ভাষার ও বেদ-বিদ্যার চর্চা করতে উৎসাহ দিতেন।

খেতড়ি রাজ্যে সাধারণ লোকের অভাব ও দুঃখ-দুর্দশা দেখে তিনি খুবই কাতর হন। ভাবলেন, এদের জন্য কিছু করতে হবে। স্বামীজীকে চিঠি লিখলেন। স্বামীজী তাঁর শিক্ষা-বিস্তারের ও নরনারায়ণসেবার ইচ্ছাকে খুবই উৎসাহ দিলেন। স্বামীজীর আদেশ পেয়ে তিনি খেতড়িতে ৫০ জন ছাত্র নিয়ে বিদ্যালয় আরম্ভ করলেন। দেখতে দেখতে সেই বিদ্যালয়ে ছাত্র-সংখ্যা হল ২৫০। সেখানে বেদবিদ্যালয়ও স্থাপন করলেন। এইভাবে তিনি উদয়পুর রাজ্যেও গরীব-দুঃখীর জন্য অনেক সেবামূলক কাজ করেন। নরনারায়ণসেবার ভাবটি তাঁর মনে সহজেই স্থান করে নিয়েছিল।

আমেরিকা থেকে ফিরে আসার পর স্বামীজী যখন মিশনের আদর্শে জনসেবার কাজ করতে ইচ্ছা করেছিলেন—তখন অনেকেই তাঁর ভাবের তাৎপর্য বুঝতে পারেননি। এমনকি তাঁর গুরু-ভাইদেরও অনেকের মনে দ্বিধা এবং সংশয় ছিল। গঙ্গাধর মহারাজ কিন্তু অতি সহজেই স্বামীজীর নরনারায়ণসেবার মাধ্যমে 'নিজের মুক্তি এবং জগতের কল্যাণ'-এর আদর্শটি ধরে নিতে পেরে-ছিলেন।

পূজনীয় বাবুরাম মহারাজেরও স্বামীজীর কর্মযোগের নতুন সাধনার প্রতি সংশয় ছিল। স্বামীজীকে বাবুরাম মহারাজ সরাসরি প্রশ্নই করে বসেছিলেন। স্বামীজী তাঁকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, শিবজ্ঞানে জীবসেবার মাধ্যমে নিজের মুক্তি (ব্রহ্মজ্ঞান) এবং জগতের কল্যাণ দুই-ই হয়। ইহাই বর্তমান জগতে স্বামীজীর নতুন অবদান। বাবুরাম মহারাজজীও কাশীতে থাকাকালে স্বামীজীর লেখা ভাল করে পড়ে তাঁর নরনারায়ণ-সেবার মাধুর্য বুঝতে পারলেন। তিনি শেষে আমাদের সকলকে স্বামীজীর এই সেবার কথা বিশেষভাবে জোর দিয়ে বোঝাতেন: "স্বামীজী ব'লে গেছেন, 'কর্মযোগই - নরনারায়ণ-সেবার ভাবই আমার নতুন দান।'" পূজনীয় রাজা মহারাজও স্বামীজীর এই আদর্শে আমাদের অনু-প্রাণিত করতেন। তিনি বলতেন—"অনেক জীবন-ই তো বৃথা গেছে। আর একটা জীবন না হয় যাবে স্বামীজীর ভাবে কাজ করতে গিয়ে। কিন্তু আমি তোমাদের বলছি—স্বামীজী মহাপুরুষ ছিলেন। তাঁর আদেশমতো তোমরা যদি কাজ কর, তোমরা ধন্য হয়ে যাবে, মুক্ত হয়ে যাবে।"

আসলে স্বামীজীর এই 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র ভাব ঠাকুরেরই দান। "আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ"—এই হল স্বামীজীর মতে সন্ন্যাসীর আদর্শ। প্রাচীনকালের সাধু-সন্ন্যাসীরা সমাজে থাকতেন না। পর্বতের গুহায় নির্জনে তপস্যাদি করে নিজের মুক্তি লাভ করতেন। তাঁদের সমাজ-সেবার কোন কাজ করতে হ'ত না।

স্বামীজীই প্রথম সন্ন্যাসীদের সমাজসেবার মাধ্যমে নিজের মুক্তিসাধনা করবার নির্দেশ দিলেন। আগে ধারণা ছিল কাজকর্মের মাধ্যমে ভগবানলাভ সম্ভব নয়। কারণ ভগবানলাভের

জন্য 'নিবাত-নিষ্কম্প দীপশিখা'র মতো, বা 'অবিচ্ছিন্ন তৈলধারা'র মতো—মনকে একাগ্র করে ভগবানে লাগিয়ে রাখতে হয়। কাজকর্ম করতে গেলে মনের বিক্ষেপ হওয়াই স্বাভাবিক। সেইজন্য আগে সন্ন্যাসীরা কর্ম ত্যাগ করতেন। তাই কাজে নেমে আধ্যাত্মিক ভাবটি যাতে নষ্ট না হয়, তার জন্য স্বামীজী 'উপাসনা' হিসাবে, 'সেবা-পূজা' হিসাবে কাজ করবার নির্দেশ দিলেন। পাথরের প্রতিমায় পূজা ক'রে যদি ভগবদ্দর্শন হয়—তাহলে জীবন্ত মানুষের প্রতিমায় ভগবানের পূজা করছি—এই ভাব নিয়ে সেবা করলে কেন ভগবানলাভ হবে না? ভারতে সাধারণ মানুষের অন্নবস্ত্র ও শিক্ষার অভাব দেখে স্বামীজী সন্ন্যাসি-সঙ্ঘকে নরনারায়ণ-সেবার আদর্শে, নতুন ধারায় সাধনা করবার ও সাধারণ মানুষের সেবা করবার নতুন পথ দেখিয়ে গেলেন।

বর্তমানে আমরা রাজনীতির ক্ষেত্রে 'সোস্যালিজম্'-এর কথা খুবই বলি। ধর্মভাব—এবং জীবের প্রতি ঈশ্বরবুদ্ধি না থাকলে যথার্থ সোস্যালিজম্ করা যায় না। মানুষমাত্রেই স্বার্থপর। "পরের জন্য কাজ করে আমার কি লাভ?" এই সহজ প্রশ্নটি তার মনে স্বাভাবক ভাবেই আসে। সমস্ত জীবের মধ্যেই যদি 'আত্মদর্শন' করতে পারা যায়, তাহলে তখনই যথার্থ সোস্যালিজম্ বা নিঃস্বার্থ সেবা করা সম্ভব হয়।

স্বামীজীর এই নরনারায়ণ-সেবার ভাবটি গঙ্গাধর মহারাজের জীবনে বিশেষভাবে মূর্ত দেখা যায়। তিনি দুর্ভিক্ষের সময় এই দেশে সেবার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। অনাথ বালকদের নিয়ে সারগাছিতে আশ্রম স্থাপন করলেন। শিক্ষা-প্রসারের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করলেন। তাঁর তপস্যার ফলে এখন এখানে কত বড় বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। ভবিষ্যতে আরও হবে। ঠিক এমনি মাদ্রাজে পূজনীয় শশী মহারাজের (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের) উৎসাহে সাধারণ একটি বিদ্যালয় থেকে কত বড় বড় বিদ্যালয়ের ও কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়েছে।

রাজনৈতিক নেতারা বলেন, ধর্ম মানুষের দুঃখ কষ্ট সম্বন্ধে উদাসীন থাকে। এটা কিন্তু ঠিক নয়। মহাপুরুষরা কখনও লোকের দুঃখকষ্টের প্রতি উদাসীন হন না। পূজনীয় বিজ্ঞান মহারাজের কাছে শুনেছি, একদিন রাত দুটোর সময় স্বামীজীর ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছে, বারান্দায় পায়চারি করছেন। বিজ্ঞান মহারাজ জিজ্ঞাসা করলেন, "কি স্বামীজী! আপনার ঘুম হচ্ছে না?" স্বামীজী তার উত্তরে বললেন, "দেখ্ পেসন, আমি বেশ ঘুমিয়েছিলাম হঠাৎ যেন একটা ধাক্কা লাগল, আর আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। আমার মনে হয়, কোন জায়গায় একটা দুর্ঘটনা হয়েছে, এবং অনেক লোক তাতে দুঃখকষ্ট পেয়েছে।"

বিজ্ঞান মহারাজ আমাদের বললেন, "স্বামীজীর এই কথা শুনে আমি ভাবলাম, কোথায় কি দুর্ঘটনা হল আর স্বামীজীর এখানে ঘুম ভেঙ্গে গেল—এটা কি সম্ভব! এরকম চিন্তা করে মনে মনে একটু হাসলাম। কিন্তু আশ্চর্য—পরদিন সকালে খবরের কাগজে দেখি, ঠিক সেই সময় ফিজির কাছে কোন একটা দ্বীপে অগ্ন্যুৎপাত হয়ে অনেক লোক মারা গেছে। খবরটি পড়েই আমি অবাক্ হয়ে গেলাম। দেখলাম সিস্‌মোগ্রাফের (পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ কম্পন মাপার যন্ত্রের) চেয়েও স্বামীজীর **nervous system** (স্নায়ুজাল) **more responsive to human miseries** (মানুষের দুঃখকষ্টে অধিকতর সংবেদনশীল)।"

এতেই বোঝা যায়, ধার্মিক পুরুষ কখনো মানুষের দুঃখকষ্টের প্রতি উদাসীন হতে পারেন না। উচ্চহৃদয় হলে বেশী কষ্ট পেতে হয়। মানুষের ভিতর ভগবানকে দেখলে উদাসীন থাকা

যায় না। গঙ্গাধর মহারাজ তাঁর জীবনে এটা বিশেষভাবে দেখিয়েছেন।

এক সময় (April, 1927) 'প্রবুদ্ধ ভারতে' একটা Neo-Hinduism নামে প্রবন্ধ বেরিয়েছিল। সেই প্রবন্ধে এই শ্লোকটি ছিল—

"ন ত্বহং কাময়ে রাজ্যং ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্।
কাময়ে দুঃখতপ্তানাং প্রাণিনামার্তিনাশনম্॥"

গঙ্গাধর মহারাজের এই শ্লোকটি খুব ভাল লেগেছিল, কারণ এর ভাবটি তাঁর ভাবের সঙ্গে মিলে গিয়েছিল। বহুদিন পরে তিনি আমাকে চিঠি লিখে এই শ্লোকের reference চেয়ে পাঠান। আমি তখন অদ্বৈত আশ্রমের চার্জ-এ ছিলাম। উনি referenceটি পেয়ে খুব হয়েছিলেন।*

* ১৯৭২ খৃষ্টাব্দে সারগাছি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে প্রদত্ত ভাষণ হইতে অনুলিখিত।—সঃ

সাধন কি ?

"সাধন কি ?—যা কর তাই সাধন মনে ক'রে কর। যখন কোথাও যাচ্ছ, মনে কর তাঁকে পাবার উপায় ব'লে যাচ্ছি। যখন খাচ্ছ, মনে কর খাওয়া থেকে শরীরধারণ, শরীর শক্ত সবল হ লে সাধনোযোগী হবে, সাধনভজন করতে পারবে। খাচ্ছি—বাঁচব ব লে, বাঁচছি—তাঁকে পাব ব'লে ; সব কাজই সাধন। যে কাজে তাঁকে পাব না ব'লে মনে হবে, সে কাজ—সে ভাব তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করবে। সব কিছুর ভেতর দিয়ে তাঁর কাছে এগিয়ে যাবার চেষ্টাই সাধন।"

—স্বামী অখণ্ডানন্দ

আর এক মা

শ্রীমতী প্রণতা দে

দৃশ্যপট লণ্ডন। খ্রীষ্টাব্দ ১৮৯৬। একজন সর্বত্যাগী প্রাচ্যের সন্ন্যাসী, অপরজন প্রতীচ্যের প্রাচুর্যের জীবনে অভ্যস্তা নারী। সন্ন্যাসী নিঃসঙ্কোচে সেই নারীকে মা বলে সম্বোধন করলেন। প্রাচ্যের পক্ষে যে সম্বোধন অত্যন্ত স্বাভাবিক, পাশ্চাত্যের পক্ষে তা পরম বিস্ময়। নারী শুধু বিস্মিতাই হলেন না,—অভিভূতা হলেন। পরবর্তী জীবনে সেই নারী একাধিক সংসারত্যাগী যোগী কর্মীর 'মা'রূপে পরিচিতা হয়েছিলেন। সবাই বলতেন 'মাদার'। পূর্ণ নাম শার্লট্ এলিজাবেথ সেভিয়র।

মাদারের দেহরক্ষার বহু পরে আবেগভরে একবার কালীকৃষ্ণ মহারাজ বলেছিলেন, "তিন মা ছিল। প্রথম গর্ভধারিণী, পরে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী, তারপর মাদার'।"

মা মানেই জন্মদাত্রী,—লালনপালনকারিণী। গর্ভধারিণী জন্ম দিয়েছিলেন শরীরের, দ্বিতীয়া জন্ম দিলেন অমৃতময় জীবনের, তৃতীয়া তাঁদের করলেন লালনপালন,—লোকচক্ষুর অন্তরালে সংসারের কোলাহল থেকে দূরে—বহু দূরে হিমালয়ের গহন কোণে মায়াবতীর চিড়-দেওদারের ঘন বনের আবেষ্টনের মাঝে। শুধুই কী লালনপালন? জন্ম দিলেন ইনিও স্বামীজীর ইচ্ছায় মায়াবতীর আশ্রমটির (১৮৯৯, ১৯ মার্চ, ঠাকুরের জন্মদিনে)।

ব্রিটিশ সেনাবিভাগের অবসরপ্রাপ্ত ক্যাপ্টেন সেভিয়র ও শ্রীমতী সেভিয়র স্বামীজীর সংস্পর্শে এসেছিলেন সেই সময় যখন তাঁদের অন্তরাত্মা সত্যের সন্ধানে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। স্বামীজীকে দেখামাত্র, বিশেষ করে হিন্দু-অদ্বৈতবাদের কথা তাঁর কাছে জেনে সেভিয়র দম্পতি গভীরভাবে অভিভূত হন এবং সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় এই সেই মহাপুরুষ এবং অদ্বৈতবাদই সেই সত্য যাকে আমরা এতদিন ধরে খুঁজে বেড়িয়েছি।' স্বামীজীকে তাঁরা শুধু গুরুরূপেই বরণ করলেন না,—সন্তানরূপেও।

স্বামীজীর এক কথায় নিঃসন্তান সেভিয়র-দম্পতি তাঁদের সমস্ত সম্পত্তির বিলিব্যবস্থা করে, সম্পত্তির বিক্রয়লব্ধ অর্থ গুরুর চরণে অর্পণ করে ভারতে চলে এলেন বানপ্রস্থ জীবনযাপনের উদ্দেশ্যে।

১৮৯৬ খৃঃ ১৬ই ডিসেম্বর স্বামীজী সশিষ্য-শিষ্যা ভারতের পথে পাড়ি দিলেন। ভারতে এসে সেভিয়র-দম্পতি স্বামী স্বরূপানন্দের সঙ্গে আলমোড়া জেলার বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়িয়ে দেখতে লাগলেন ধ্যানধারণা ও কর্মযোগের একটি উপযুক্ত স্থান কোথায় পাওয়া যায়। অতঃপর খুঁজে পেলেন লোহাঘাট থেকে মাইল ছয়েক দূরে, আলমোড়ার নিভৃতকোণে—শান্ত পারবেশে দীর্ঘ ঘন বনস্পতির শ্যামল আচ্ছাদনে ঘেরা এলাকা, উচ্চতা ৬,৫০০ ফুট, নাম মায়াবতী। সংসারের মায়াত্যাগীর দল মায়াবতীর মায়ার আকর্ষণ অনুভব করলেন, প্রতিষ্ঠিত হ'ল অদ্বৈতবাদের আশ্রম।

মনে আছে প্রথম মায়াবতীতে যেতেই ডাক্তার মহারাজ ডেকে নিয়ে গেলেন হাসপাতাল দেখতে। হাসপাতাল দেখে ফিরে আসতেই দ্বিপ্রাহরিক ভোজনে ডাকলেন। দ্বিধাভরে বললাম, 'আগে ঠাকুরঘরটা হয়ে আসি।' হাসলেন মহারাজ, 'আমাদের তো ঠাকুর ঘর নেই।' তাই

তো যাঁদের সাধনা 'যাঁহার মধ্যে এই ব্রহ্মাণ্ড, যিনি এই ব্রহ্মাণ্ডে অবস্থিত, আবার যিনিই এই ব্রহ্মাণ্ড, যাঁহার মধ্যে আত্মা, যিনি এই আত্মার মধ্যে অবস্থিত···'—তাঁকে চার দেওয়ালের বাঁধনে বাঁধবেন তাঁরা কেমন করে? 'তবে হ্যাঁ', হেসে বললেন মহারাজ, 'নিজের মনের ধ্যান-ধারণায় তাঁকে সাকারভাবে ভাবতে তো কোন বাধা নেই আমাদের।' বটেই তো! তিনি নিরাকার হয়েও আকারের বাঁধনে।

যাক। ফিরে যাই সেই উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিনগুলোতে, যখন সাগরপারের এক মহীয়সী নারী 'মাদার'রূপে এসে অক্লান্ত পরিশ্রমে এই আশ্রমটিকে গড়ে তুলেছিলেন। মায়াবতীর আশ্রমের কাজে মাদারের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ যোগা-যোগে যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে স্বামী স্বরূপানন্দ ও বিরজানন্দজী উল্লেখযোগ্য। স্বামী বিরজানন্দের স্মৃতিচারণায় পাই "স্বামীজীর সঙ্গে লণ্ডন হতে তাঁর শিষ্য-দম্পতি ক্যাপ্টেন ও মিসেস সেভিয়র এসেছিলেন···মাদার শীলেদের বাগানে স্বামীজীর সেবাস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য সর্বদাই ব্যস্ত থাকতেন।···সেভিয়র-দম্পতি আলমবাজারের মঠেও দু'একবার এসেছিলেন। তাঁদের দেখা-শোনা নিরঞ্জন মহারাজ ও হুট্‌কো গোপালদা করতেন। নিরঞ্জন মহারাজের সৌম্যমূর্তি, বীরের মত চালচলনের জন্য মিসেস সেভিয়র তাঁকে খুব পছন্দ করতেন,—বলতেন, "**He looks like a prince.**"

স্বামী বিরজানন্দ অন্যত্র বলেছেন "···তখন নীচের বাংলোতেই (মায়াবতীতে) সকলে থাকতুম। আশ্রমের ম্যানেজার ছিলেন ক্যাপ্টেন সেভিয়র। সকালে চা খেয়ে সকলে কাজে বেরুতুম, কুড়ুল কোদাল দা প্রভৃতি নিয়ে। ২।৩ ঘণ্টা কঠিন পরিশ্রম চলতো। খুব খিদে পেত। মাদারের আলমারি থেকে চুরি করে খেতুম।" "···ক্যাপ্টেন সেভিয়রের জীবন খুব কৃচ্ছ্রতাপূর্ণ ছিল। আশ্রমের জন্য অসামান্য পরিশ্রম করিতেন। আজন্ম ভোগবিলাসের মধ্যে লালিত-পালিত একজন বিদেশী ব্যক্তি পরিণত বয়সে ভারতীয় ভাব এবং জীবনধারায় এতদূর উদ্‌গত হইতে পারেন এবং ভারতের সেবার জন্য স্বেচ্ছায় দারিদ্র্য এবং কঠোরতাকে এই ভাবে বরণ করিতে পারেন ইহা দেখিয়া সকলেই অবাক হইয়া যাইতেন।" পাহাড়ী জনসাধারণের কাছে এই বিদেশী গৃহী যোগীর পরিচয় ছিল পিতাজী। ১৯০০ খ্রীঃ ২৮শে অক্টোবর এই সংসারত্যাগী যোদ্ধা একরকম বিনা চিকিৎসায় দেহত্যাগ করলেন। তাঁরই ইচ্ছায় হিন্দুমতে তাঁর সৎকার-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

স্বামীজী ক্যাপ্টেন সেভিয়র ও ইংরেজশিষ্য স্বর্গীয় গুডউইন সম্বন্ধে পরে বলেছিলেন—"শহীদ কোথাও থাকে তো এরাই তাই।" তাঁর ২৬শে ডিসেম্বর ১৯০০ খ্রীঃ তারিখের পত্রে তিনি মিস্ ম্যাক্‌লাউডকে জানাচ্ছেন 'ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ শোণিতধারায় ভবিষ্যৎ ভারতের চারাগাছটি মহামায়া যেন বারিসিঞ্চিত করছেন। মহামায়ারই জয় হোক।'

শ্রীমতী সেভিয়রকে সান্ত্বনা দেবার জন্য স্বামীজী তাঁর মিশর-ভ্রমণ স্থগিত রেখে তাড়া-তাড়ি দেশে ফিরে এসে মায়াবতী যাত্রা করলেন। এই তাঁর শেষবার মায়াবতী-ভ্রমণ। শরীর তখন বেশ খারাপই ছিল তাঁর। তবুও তিনি ছুটে এসেছিলেন মাদারকে সান্ত্বনা দেবার জন্য। মাদার সম্বন্ধে স্বামীজীর মনে খুব গভীর শ্রদ্ধা ছিল। এই শ্রদ্ধা তিনি নানাভাবে নানাস্থানে কখনও মুখে কখনও পত্রে প্রকাশ করেছেন। মিস্ ম্যাক্‌লাউড্‌কে লিখিত স্বামীজীর পত্রে আমরা পাই, "**The Saviers are the only English people who do not hate the natives···**

Saviers are the only persons who did not come to patronise." এইবার এসে স্বামীজী দেখলেন অদ্বৈত আশ্রমে ঠাকুরের পট-পূজা হচ্ছে। তিনি এর তীব্র সমালোচনা করেন এবং ফলে ঠাকুরের পটপূজা বন্ধ করা হয়।

১৯০২ খ্রীঃ স্বামীজীর দেহরক্ষার পর মাদার, স্বরূপানন্দজী ও বিরজানন্দজী অদ্বৈত আশ্রমটিকে ভালভাবে গড়ে তোলবার জন্য ও প্রবুদ্ধ ভারতের প্রচারের জন্য সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করলেন এবং ১৯০৩ খ্রীঃ আশ্রমের জন্য একটি ট্রাস্টের ব্যবস্থা করলেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, প্রবুদ্ধ-ভারত পত্রিকাটি প্রথমে প্রকাশিত হয়েছিল মাদ্রাজ থেকে। কিন্তু তৎকালীন সম্পাদক শ্রীরাজম্ আয়ারের আকস্মিক মৃত্যুতে পত্রিকাটির প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়। মায়াবতী আশ্রমের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে স্বামীজীর ইচ্ছায় পত্রিকাটির নতুন করে প্রকাশনা শুরু হয় মায়াবতী থেকে।

শ্রীমতী সেভিয়র তাঁর ১৭ বছর মায়াবতী বাসকালে (মাঝে ১৯০১ ও ১৯০৯ খ্রীঃ কিছু দিনের জন্য ইংলণ্ডে গিয়েছিলেন) অসীম কার্য-ক্ষমতা, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা, স্নেহ-ক্ষমা-ধৈর্য-সহনশীলতা ও ত্যাগের আশ্চর্য স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন। ক্ষীণাঙ্গী ছিলেন। কিন্তু কর্মক্ষমতা ছিল খুব। নিজে লিখতেন খুব সুন্দর। তাঁর রচনায় প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনা পড়লে বোঝা যায় তিনি কিভাবে প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম ছিলেন। স্থানাভাবের ভয়ে তাঁর রচনা থেকে উদ্ধৃতি দেবার লোভ সংবরণ করলাম। দৈনন্দিন কার্য-ব্যবস্থায় মাদার নিয়মানুবর্তিতা সম্বন্ধে খুব সচেতন ছিলেন। অতি প্রত্যূষে উঠে ধ্যানজপের পর নিজের বাংলোটি (মাদারস্ বাংলা নামে অভিহিত আজও) একটি ভৃত্যের সাহায্যে নিজের হাতে প্রতিটি জিনিস ঝাড়ামোছা করতেন। তারপর নিজের জন্য যৎসামান্য রান্না করতেন। প্রতিদিন বিকেলে আশ্রমের কারুকে না কারুকে নিজের সঙ্গে চা খেতে ডাকতেন। তারপর স্বামী বিরজানন্দ প্রভৃতির সঙ্গে নিয়মিত 'ক্রোকে' (Croquet) খেলতেন। ঐ সময় মাদার ও বিরজানন্দজী স্বামীজীর জীবনালেখ্য রচনায় প্রবুদ্ধ ভারতের কাজে সর্বক্ষণ কঠিন শ্রমে ব্যাপৃত থাকতেন। তৎকালে মাদারের দুটি প্রবন্ধ A Breath from the Himalayas ও In the Land of the Mummies প্রকাশিত হয়েছিল।

তাঁর তিরোধানের পর, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলির উদ্দেশ্যে যে প্রবন্ধ প্রবুদ্ধ ভারতে প্রকাশিত হয়েছিল (জানুআরি ১৯৩১) তার থেকে উদ্ধৃত করছি, "Her life at Mayavati was a unique one. It was a life of consecration and service. She combined in her life the best of Eastern and Western nunhood. She was cut and out Advaitin (Monist) as she signed herself in her articles,···and not only believed in it as a creed but also translated it into practice."

মায়াবতীতে গিয়ে একটা কথা বারবার মনে হয়েছিল কি করে এই দুর্গম পার্বত্য স্থানে একটি নিঃসঙ্গ বর্ষীয়সী নারীর পক্ষে এমনভাবে দারিদ্র্য ও কৃচ্ছ্রতায় দিন কাটানো সম্ভব হয়েছিল? বিশেষ করে তিনি বিদেশিনী! তাও বলি, আমি মায়াবতীতে গিয়েছি আশ্রম-প্রতিষ্ঠার ৬৬।৬৭ বছর পরে। শুনেছি তখন নাকি আরও বনজঙ্গল ও জনহীন ছিল। বাজার হাটও কিছু ছিল না। মনে সন্দেহ হয়, তিনি কি সত্যিই নিঃসঙ্গ ছিলেন? শ্রীযুক্ত সেভিয়রের মৃত্যুর পর কোন বিদেশী বন্ধু তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "তুমি কি করে এই নির্জন স্থানে একা একা থাকো?" মাদার উত্তর দিয়েছিলেন, "গুরুকে স্মরণ করি।" এমন কি

স্বামীজীও তাঁকে (ক্যাপ্টেন সেভিয়রের মৃত্যুর পর) জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "এখন তুমি নিজের সম্বন্ধে কী স্থির করলে?" শ্রীমতী সেভিয়র উত্তর দেন, "এখানেই থাকব।" আসলে উৎসর্গীকৃত যাঁর জীবন তাঁর নিজের ব'লে স্বতন্ত্র কোন্ ভাবনা? পরার্থে যিনি নিবেদিত, স্বার্থের প্রশ্ন তাঁর কোথায় আসে? গুরুর প্রতি বিশ্বাস কর্মের প্রতি নিষ্ঠা এবং স্বরূপানন্দজী ও বিরজানন্দজীর মত সন্তানের সেবাযত্নে যাঁর চিত্ত পরিপূর্ণ তাঁর মত বিত্তশালিনী কে? যিনি ফুলের ভাষা, গাছের ভাষা (তাঁরই রচনায় আছে) ও পশুর ভাষা বুঝতে পারতেন নিঃসঙ্গতা তাঁর জীবনকে দুঃসহ করতে পারে নাকি? নিঃসঙ্গতার প্রশ্ন কোথায়? পোষা কুকুর ঘ্রামা, পনি মঙ্গলা, আশ্রমের ছাগল গরু পর্যন্ত তাঁর স্নেহধন্য হয়েছে। এমনকি চোরকে চোর জেনেও তাকে জেলে যাওয়া থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর মতে **'Believe in moral conquest rather than in brute force.'**

অভাবগ্রস্ত গ্রামবাসীদের আশ্রমের বাগান থেকে নিজে হাতে উৎপন্ন ফল, তরকারি ইত্যাদি বিতরণ করতেন। এমন কি অর্থ সাহায্যও হ্যাঁ, অনেক সময় লুকিয়েই দিতেন। জানতেন, এতখানি দানে বাধার প্রশ্ন আসতে পারে। সেকালে ঐ সমস্ত জায়গায় খাবার জিনিসপত্র মোটেই সুলভ ছিল না। ঐ সময় লোকে মানস-সরোবর, কৈলাস প্রভৃতি দর্শনে যেতেন—পথে পড়ত মায়াবতী। মাদার লোকালয় থেকে অত দূরে বাস করেও অতিথিদের আদরযত্ন আপ্যায়নে কোন ত্রুটি রাখতেন না। ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। কারণ এই যুগে মায়াবতীতে গেলেও মনে হয়, এ স্থান অতি নির্জন। তৎকালে মিস ম্যাক্‌লাউড, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, সস্ত্রীক জগদীশচন্দ্র বসু একাধিকবার মাদারের আতিথ্যে মায়াবতীতে বসবাস করে গিয়েছেন (পরবর্তী যুগে শিল্পী নন্দলাল বসুও)।

মাদার অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে অদ্বৈতবাদকে জীবনের মূল মন্ত্ররূপে গ্রহণ করেছিলেন। পরমহংসদেব সম্বন্ধে তিনি নির্দ্বিধায় জানিয়েছিলেন "Of all the perfect men that have appeared on the earth, I consider him the greatest."

আশ্রমের অর্ধশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে প্রবুদ্ধ ভারতের একটি প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃত করছি—"The Advaita Ashrama has not ignored the practical side of religion. It has kept in touch with life and society through philanthropic work carried on in the Mayavati Charitable Hospital. ··· The activities of the Advaita Ashrama are broadly twofold—preaching and philanthropic work.···The Ashrama has taken active part in spreading the doctrine of Vedanta and the universal message of Sri Ramakrishna and Swami Vivekananda in India and abroad···True to the design of its great architect the Ashrama had stood uncompromisingly for Advaita and Advaita alone." ভাবলে কোন অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় না যে, যে মানুষ ছোট ওষুধের বাক্স নিয়ে গ্রামবাসীর মধ্যে ওষুধ বিতরণ করে বেড়াতেন, যিনি পরে দাতব্য চিকিৎসালয়টির স্থাপনা করেন তাঁরই স্বামী বিনা চিকিৎসায় প্রাণ দিলেন, তবুও মাদারের কর্মনিষ্ঠা ও বিশ্বাসের কোন ঘাটতি হয়নি।

স্বামীজীর তিরোধানের মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই (১৯০৬ খ্রীঃ) স্বামী স্বরূপানন্দ দেহত্যাগ

করেন। শুধু সহকর্মী নয়, স্বামিহীনার পুত্রতুল্য এই সন্ন্যাসীর মৃত্যুতে শ্রীমতী সেভিয়র অত্যন্ত শোকবিহ্বলা হয়ে পড়েছিলেন। তিনি যেন অনুভব করলেন এতখানি দায়িত্বসম্পন্ন কর্মবীর আর তিনি পাবেন না এবং এত শ্রম, সাধনা ও স্বপ্ন দিয়ে গড়া স্বামীজীর প্রতিষ্ঠিত অদ্বৈত আশ্রম বুঝি অচিরেই গুটিয়ে ফেলতে হবে। আশ্রম-প্রতিষ্ঠার সাত বছরের মধ্যে যথাক্রমে স্বামী, গুরু ও পুত্রপ্রতিম সহকর্মীকে হারিয়ে অমন স্থিরবুদ্ধি, কর্মযোগিনী নারীও হতাশ হয়ে পড়লেন। শেষ পর্যন্ত স্বামী বিরজানন্দ মাদারকে ভরসা দিলেন স্বামীজীর পতাকা তিনি উড্ডীন রাখবেন।

বিরজানন্দজী মায়াবতীর অধ্যক্ষ হলেন। মাদার বুঝলেন স্বামীজীর প্রতিষ্ঠিত এই আশ্রম উঠে যাবার নয়। মাদার ও বিরজানন্দজী সারাদিন কাজ করেন। মাঝে মাঝে মতান্তর ঘটে। মাদার রেগে যান। এক এক সময় তর্ক বেশ উচ্চ গ্রামে চড়ে। তবুও সম্পর্ক যে মা ও ছেলের।

১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে মাদার বছর তিনেকের জন্য ইংলণ্ডে গিয়েছিলেন। দেশে গিয়ে খুবই পরিশ্রম করতে হ'ল। তাঁর এক বোনকে দেখাশোনা ও সবরকম দায়িত্ব তাঁর ওপরেই পড়েছিল। ফিরে এলেন ১৯১২ মার্চে। ঐ বছরই কিছুদিন আগে ভগ্নী নিবেদিতা দেহরক্ষা করেন।

আশ্চর্য দুই বিদেশিনী। একটি ভগ্নী অপরটি মাতারূপে ভারতের অগণিত অজ্ঞ কুসংস্কারাচ্ছন্ন জনতার কল্যাণার্থে আত্মনিবেদন করেছিলেন। ভগ্নীটি সূর্যের মত তেজস্বিনী। মা চাঁদের মত স্নিগ্ধা। ভগ্নী সমাজের মাঝে, লোকালয়ের মধ্যে আলোড়ন এনেছিলেন। অন্তঃপুরস্থিতা ভারতীয় নারীর মধ্যে শিক্ষাপ্রচার করে, তাদের বহির্বিশ্বের কর্মক্ষেত্রে এগিয়ে আসতে, সংস্কারমুক্ত হতে, আত্মসম্মানবোধ সম্বন্ধে সচেতন হতে উদ্বুদ্ধ করেছেন,—অপরজন লোকচক্ষুর আড়ালে সুদূর হিমালয়ের কোণায় বসে অগণিত দরিদ্র পাহাড়ী জনগণের সুখদুঃখের ভাগী হয়ে তাদের জন্য স্বেচ্ছায় দারিদ্র্যকে বরণ করে, তাদের সেবায় নিজের অর্থ ব্যয় করে তাদের হৃদয় জয় করে গেছেন। একজন জ্যোতির্ময়ী অপরজন কিরণময়ী, মূলতঃ দুজনেই ত্যাগের প্রতিমূর্তি!

এই সময় স্বামীজীর একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনচরিত প্রকাশের ইচ্ছা প্রকাশ করেন স্বামী বিরজানন্দ। মাদার এ ব্যাপারে খুবই উৎসাহিতা হন এবং বিরজানন্দের গ্রন্থরচনার জন্য বহু জায়গা থেকে উপাদান-সংগ্রহের কাজে লেগে গেলেন। এরই মাঝে একটি ঘরোয়া পরিবেশে গৃহত্যাগী সন্তানেরা মাদারের ৬৩তম জন্মদিবস পালন করলেন (১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে—১৮ই অক্টোবর)। সেই বছরই মাদার ও বিরজানন্দজী—শ্যামলাতালে হ্রদের পাশে এক টুকরো জমি পছন্দ করলেন নতুন আশ্রমের জন্য। নিভৃতে বসে বিরজানন্দজী স্বামীজীর জীবনীটি সম্পূর্ণ করতে চান। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে ২১শে মে এই আশ্রমের গৃহপ্রবেশ হ'ল। মাদার আশ্রমের নাম দিলেন বিবেকানন্দ আশ্রম।

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দ। মাদারের বয়স হয়েছে। মাদার দেশে যাবেন। মহাযুদ্ধ চলছে। কবে আসবেন আবার—কে জানে। যাবার আগে ক'দিনের জন্য বেলুড়ের অতিথি-আবাসগৃহে আছেন।

বিরজানন্দজীর সঙ্গে গিয়ে দক্ষিণেশ্বরের ৺ভবতারিণীর মন্দির, মা ঠাকুরাণীর কলিকাতাস্থ বাসস্থান প্রভৃতি দর্শন করে বেড়াচ্ছেন। বোলপুরে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ও এণ্ড্রুজের সঙ্গেও দেখা করলেন।

শ্রীমতী সেভিয়র আর ভারতে ফিরে আসেননি। বিরজানন্দজীর সঙ্গে পত্রের আদান-প্রদান ছিল। মাদার সেখান থেকে নানা সাময়িক পত্রিকা পাঠাতেন ও যুদ্ধের খবরাখবর দিতেন। আশ্রমের জন্য তখনও অর্থসাহায্য করতেন। গভীর দূরদৃষ্টির ক্ষমতায় তিনি তখনই জানাতেন যুদ্ধের ফলাফল কি হবে এবং একথাও জানাতেন—"It is the beginning of a worldwide conflagration." মহারাজও নিয়মিত এদিককার খবর দিতেন এবং বড়দিন ও জন্মদিন উপলক্ষ্যে মাদারকে উপহার পাঠাতেন।

ঘুরে এল ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই অক্টোবর—আবার সেইদিন, মাদারের জন্মদিন বিলাতে বৃদ্ধা মাদার তখন রোগে শয্যাশায়িনী এই বিশেষ দিনটিতে বিরজানন্দজী উদ্বোধনের ঘরে বসে স্মৃতিচারণ করছেন। মনে পড়ছে বিদেশিনী মায়ের স্নেহচ্ছায়ায় একত্র থাকা সেই প্রথমদিককার কঠোর পরিশ্রমের দিনগুলি! মনে পড়ছে মা তাঁর স্নেহের পরশ দিয়ে কত সহজে সেই দিনগুলিকে উত্তীর্ণ হতে সহায়তা করতেন! সব কাজের শেষে প্রতিদিন মা আশ্রমের সকলকে ডেকে কেমন করে কোন বই বা পত্রিকা থেকে বিশেষ কোন বিষয় বা অংশ পড়ে শোনাতেন। তাঁর বাচনভঙ্গী নাকি বড় মধুর ছিল।

খবর এল ক'দিন পরেই। ২০শে অক্টোবর মাদার ৮৩ বৎসর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মাদারের ভ্রাতুষ্পুত্রী মিস কন্‌স্‌টান্‌স্‌ মিচেলের কাছ থেকে বিরজানন্দজী চিঠি পেলেন। "তাঁর ইচ্ছামত তাঁর দেহ দাহ করে দেহভস্ম হাওয়ায় উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে,—তাঁর বিশেষ নির্দেশে। তিনি বলেছিলেন অযথা অর্থের অপব্যয় করে তাঁর দেহে যেন ফুল না দেওয়া হয়। অথচ আমরা জানি নিসর্গের প্রতিটি সৌন্দর্যের প্রতি তাঁর কী গভীর ভালবাসা ছিল। যাই হোক, আমরা তাঁর দেহে সাদা চন্দ্রমল্লিকা ও লিলিফুলের ক্রশ রচনা করে দিয়েছিলুম। আজই সকালে একজনের চিঠি পেয়েছি, তিনি লিখেছেন aunt সম্বন্ধে—'Mrs. Sevier never preached religion, she lived in it.' What better could we say or hear of anyone!" এই পত্র বিরজানন্দী শ্যামলাতালে ফিরে এসে পেয়েছিলেন। মাদারের পুণ্যস্মৃতি-স্মরণে তিনি শ্যামলাতালের গ্রামবাসীদের ৬ই ডিসেম্বর একটি ভোজ দিলেন। অনুরূপ একটি ভোজ ১২ই ডিসেম্বর মায়াবতীতেও দেওয়া হল। মায়াবতীর গ্রামবাসীরা মাদারকে ব'লত দেবী। গ্রামবাসীরা তাঁর স্মৃতি চৌদ্দ বছরের ব্যবধানেও ভোলেনি। বিরজানন্দজী যেন সত্যই মাতৃহারা হলেন!

আজও মায়াবতীতে গেলে দেখবেন মাদারের একটি বড় সাইজের ছবি। অদ্বৈতবাদের আশ্রমে প্রতিষ্ঠাত্রী ছবির ফ্রেমের সীমানায় বাঁধা হয়ে অমর্ত্য হয়ে আছেন। সীমার মাঝেই তাঁর সীমাহীন ভক্তিবিশ্বাস, স্নেহ ও কর্মশক্তির স্বাক্ষর।

অদ্বৈতবাদিনীর দেহভস্মরাশি মিশে গেল পঞ্চভূতে, থাকল শুধু মহিমামণ্ডিত কীর্তি অবিস্মরণীয়—অবিনশ্বর হয়ে।

'স্বার্থমলিনতা অগ্নিকুণ্ডে কর বিসর্জন'

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

কবে আমি সুখী হবো, দুঃখ-শোকের পারে যাবো—এই প্রার্থনা কোন্ মানুষের হৃদয়ের গভীর থেকে উৎসারিত না হচ্ছে? স্বামীজীর কবিতার সেই অবিস্মরণীয় লাইনটি, প্রাণ-সাক্ষী শিশুর ক্রন্দন, হেথা সুখ ইচ্ছ মতিমান্?' এরই ভাষ্য ক'রে স্বামীজী অন্যত্র বলেছেন: শিশু যখন মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হয় তখন সে প্রথম পৃথিবীতে পদার্পণ করিয়াই কাঁদিয়া থাকে। শিশুর ক্রন্দন —ইহাই মহাসত্য ঘটনা। ইহা হইতেই প্রমাণিত হয় যে, এ জগৎ কাঁদিবারই স্থান।

বুদ্ধদেবের প্রচারিত প্রথম আর্যসত্যে স্বামীজী বিশ্বাস করতেন। এই আর্যসত্যটি হ'ল, সমগ্র জগৎ দুঃখপূর্ণ। গৌতমবুদ্ধের ঘোষিত প্রথম আর্যসত্য গীতারই প্রতিধ্বনি। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় পার্থকে বলছেন, এই সংসারে ব্যক্তি বলো আর বস্তুই বলো সবই পরিণামশীল। সুখ ব'লে কিছু নেই এই অনিত্য জগতে। অতএব পরিণামশীল কোন বস্তুতে বা ব্যক্তিতে হৃদয় অর্পণ ক'রে লাভ কি? 'ভজস্ব মাম্।' সেই প্রভু ভগবানই একমাত্র অপরিণামী। আনন্দস্বরূপ তিনি। আবার তিনি প্রেমস্বরূপও বটে। তাঁর ভালবাসার কখনো অভাব হয় না। অতএব 'মন্মনা ভব'। সমস্ত মনটা ঈশ্বরের দিকে ফেরাও—অনুক্ষণ ভগবচ্চিন্তায় চিত্তকে পূর্ণ ক'রে রাখো অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার মতো।

এই যে জগৎ-জোড়া দুঃখ—এই দুঃখের উৎপত্তি কোথা থেকে? স্বামীজী বলেছেন: হৃদয়ের ভালবাসায় কেবল একজনের মাত্র অধিকার। কাহার অধিকার? তাঁহারই অধিকার, যাঁহার কখনো কোন পরিণাম নাই। কে তিনি?—ঈশ্বর। ভ্রান্তিবশতঃ কোন পরিণামশীল বস্তু বা ব্যক্তির প্রতি হৃদয় অর্পণ করিও না; কারণ তাহা হইতেই দুঃখের উদ্ভব।

'অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্।' স্বামীজীর দুঃখের উৎপত্তির কারণ-বিশ্লেষণের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের বাণীরই ব্যাখ্যা। কৃষ্ণ যা বললেন তা সর্বকালের সর্বদেশের মানুষকেই লক্ষ্য ক'রে। সংসারে সর্বত্রই দুঃখ। মানুষ, তুমি এই দুঃখ থেকে মুক্তি পেতে চাও? তবে তো দুঃখের কারণ তোমাকে জানতে হবে। দুঃখের কারণ তোমার অবিদ্যা। এই অবিদ্যার প্রভাবেই তুমি তোমার হৃদয়ের সমস্ত ভালবাসা ঢেলে দিচ্ছ বস্তু ও ব্যক্তিতে ঈশ্বরে নয়। বস্তু বলো আর ব্যক্তিই বলো—সবই পরিণামশীল। মনুষ্য-বিশেষকে তুমি ভালবাসতে পার—কিন্তু প্রিয়জন ম'রে গেলে তোমার জীবন শুকিয়ে যাবে। তুমি বন্ধুবিশেষকে তোমার হৃদয় অর্পণ করতে পার। কিন্তু বন্ধু শত্রু হ'তে কতক্ষণ? এই পরিবর্তনের স্রোতে ভাসতে ভাসতে জগৎ চলেছে। জগতে সব-কিছুরই পরিণাম আছে—ভ্রান্তির বশে এই সত্য ভুলে যাই আমরা। ভুলে গিয়ে যা জলবুদ্বুদ, 'যা শূন্য দিগন্তের ইন্দ্রজাল ইন্দ্রধনুচ্ছটা' তাকে হৃদয় অর্পণ করি সুখের আকর্ষণে। বুদ্বুদ ফেটে যায়; যা ভেল্কি তার মিথ্যের আয়ু কতক্ষণ? সুতরাং পরিণামশীল ব'লেই যাকে ভালবাসা, মানে শুধু দুঃখকেই ডেকে আনা, তাকে ভালবাসতে গীতা বারণ করেছে। ভাল যদি বাসতেই হয় তবে এমন কিছুকে ভাল-বাসো যা সমস্ত পরিবর্তনকে অতিক্রম ক'রে আছে। সমস্ত পরিবর্তনের পশ্চাতে যা বিদ্যমান,

সমস্ত পরিবর্তনের মধ্যেও যার অস্তিত্বকে সাধকেরা অনুভব ক'রে থাকেন, যার কখনও কোন পরিণাম নেই

গীতায় ভগবান বলছেন, যদি অনুক্ষণ ভাবনার দ্বারা কারও ভজনা করতে হয় তবে আমারই ভজনা কর। 'ভজস্ব মাম্'। কেন? কারণ আমি নিত্য। জগৎকে ভালবাসবে না কেন? কারণ জগৎ অ-সৎ বা অ-সত্য। আমাকে ভালবাসবে কেন? কারণ সত্য হচ্ছি আমি। কালের দ্বারা, দেশের দ্বারা, বস্তুর দ্বারা পরিচ্ছিন্ন যা তাই অ-সৎ। আমি অ-সৎ-এর বিপরীত অর্থাৎ আমি সর্বকালে আছি সর্বকালে ছিলাম এবং সর্বকালেই থাকবো। আমি সর্বব্যাপী। আমিই মায়া, জীব, জগৎ, চতুর্বিংশতি তত্ত্ব সব হয়েছি। একমাত্র আমিই অপরিণামী। আমার ভালবাসার কখনও অভাব হয় না। যে-কেউ মন-মুখ এক ক'রে আন্তরিকতার সঙ্গে আঘাত করে আমার দরজায়—তার কাছে আমার দুয়ার কখনও বন্ধ থাকবে না। যত মহাপাপই সে ক'রে থাকুক—সে শুদ্ধ মুক্ত আত্মা হয়ে যাবে। ঠাকুর বলতেন, 'পাপ তুলার পাহাড়। তাঁর কৃপা হ'লে এক পলকে নিশ্চিহ্ন।'

দুঃখের মূলে পরিণামশীল বস্তুতে বা ব্যক্তিতে অনুরাগের আতিশয্য—এই জ্ঞানের দ্বারাই শুধু অজ্ঞান বিনষ্ট হ'তে পারে আর ভারতবর্ষীয় জীবন-দর্শন বলে, অজ্ঞানই সকল অনর্থের গোড়ায়। কঠোপনিষদের গোড়াতেই নচিকেতার মর্মস্পর্শী উপাখ্যানে জ্ঞানেরই জয়-জয়কার। নচিকেতা যমের কাছে জানতে চাইলেন মৃত্যুর রহস্য। কেউ বলে মৃত্যুর পরেও মানুষ থাকে, কেউ বলে থাকে না। এর মধ্যে কোন্‌টি সত্য? যম ঋষি-পুত্রের প্রশ্নের উত্তরে বললেন, 'নচিকেতো মরণং মাঽনুপ্রাক্ষীঃ'। তোমাকে দীর্ঘায়ু পুত্র-পৌত্র, বিপুল বিত্ত, সুদীর্ঘ পরমায়ু, সসাগরা ধরণীর রাজ-মুকুট এবং লাবণ্যময়ী ললনা দিচ্ছি। এই সব নিয়ে খুশী থাকো। মৃত্যুর রহস্য জেনে লাভ কি? নচিকেতা বললেন, আমার কিছুতেই দরকার নেই। 'কালস্রোতে ভেসে যায় জীবন-যৌবন-ধন-মান।' যম যা যা দিতে চেয়েছিলেন নচিকেতাকে, তারা সবই ছিল পরিণামশীল। তাদের অনিত্যত্ব চিন্তা ক'রেই নচিকেতা প্রেয়কে গ্রহণ করতে রাজী হননি। নচিকেতা জ্ঞানী ছিলেন। জ্ঞানীরা সদসৎ বিচার ক'রে শ্রেয়কেই গ্রহণ ক'রে থাকেন।

'শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতঃ
তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।'

জ্ঞানীরা কেন প্রেয়কে বর্জন ক'রে শ্রেয়কে গ্রহণ করেন? কারণ 'তয়োঃ শ্রেয়ঃ আদদানস্য সাধু ভবতি'। প্রেয় এবং শ্রেয় এতদুভয়ের মধ্যে শ্রেয়কে যে গ্রহণ করে তার কল্যাণ হয়। শ্রেয়কে ভালবেসে নচিকেতা পরমতম কল্যাণকেই বেছে নিয়েছিলেন। যম প্রেয় দিয়ে, আপাত-সুখের উপকরণরাশি দিয়ে প্রলুব্ধ করতে চেয়েছিলেন নচিকেতাকে। যম কৃতকার্য হলেন না। নচিকেতার মন ছিল নিত্যে যার কখনো কোন পরিণাম নেই। আর শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলছেন, সেই প্রভু ভগবানই একমাত্র অপরিণামী।

যে সদসৎ বিচারকে সহায় ক'রে নচিকেতা শ্রেয়কে বেছে নিলেন ঠিক সেই বিচারকেই সহায় ক'রে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করলেন টাকা। টাকায় ডাল ভাত হয়, বাড়ী গাড়ী হয়। টাকায় ঈশ্বর লাভ হয় না অর্থাৎ যা অপরিণামী, যা নিত্য, যা সৎ তাকে পাওয়া যায় না। অতএব টাকাও যা মাটিও তাই—যেহেতু কোনটাই ঈশ্বরলাভের পথে অনুকূল নয়। এই সদসৎ-বিচার থেকে দক্ষিণেশ্বরের গঙ্গায় একদা টাকা আর মাটি দুই-ই নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। খ্রীষ্টের বাণীতে আছে: The Truth shall make you

free. মুক্তিতে পৌঁছানোর রাস্তা সত্যকে জানার মধ্য দিয়ে। ভারতীয় ধর্ম-সাধনায় অবিদ্যাকেই সর্বদুঃখের মূলীভূত কারণ বলা হয়েছে। পরিণামশীল বস্তুতে বা ব্যক্তিতে হৃদয় অর্পণ একটা বিরাট ভ্রান্তির বশেই আমরা ক'রে থাকি এবং চোখের জলে ও দীর্ঘশ্বাসে এই ভুলের ফসল আমরা সমস্ত জীবন ধরে কুড়িয়ে বেড়াই। এই সহজ সরল কথাটা আমরা বুঝিনে ব'লেই তো এত দুঃখ পাই।

হ্যাঁ, অজ্ঞান থেকেই আমাদের সমস্ত দুঃখের শুরু। অবিদ্যার বশেই যা অল্প, যার পরিণাম আছে তাকে আমরা হৃদয়ের ভালবাসার অধিকার দিয়ে থাকি। মর্মের দেউলে 'ম্যামন্'কে আমরা সযত্নে বসাই এবং ষোড়শোপচারে তার পূজা করি। আর যা পরিণামশীল তাকে ভালবাসার অনিবার্য ফল আমাদের কুড়াতেই হয় আমরা কামনা থেকে কামনার পশ্চাতে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে যেখানে প্রবেশ করি তাকে উপনিষদে বলা হয়েছে মৃত্যুর জাল। যারা এইরূপে মৃত্যুজালে প্রবেশ করে তাদের উপনিষদ্ বলেছেন বালকের দল অর্থাৎ যাদের বুদ্ধি নিতান্তই কাঁচা। 'পরাচঃ কামান্ অনুযন্তি বালাঃ।' পৃথিবীশুদ্ধ বুড়ো খোকা খুকীরা অন্তরের নিভৃতে বহন ক'রে চলেছে দু'খের কী দুর্বহ বোঝা!

বিশ্বের সমস্ত মহৎ সাহিত্যই মানুষকে এই আসক্তি-মোচনে সাহায্য করে। আমাদের দেশের রবীন্দ্র-সাহিত্যের এবং বঙ্কিম-সাহিত্যের মহলে মহলে একবার পরিক্রমা করলেই কথাটা দিবালোকের মতোই স্পষ্ট হয়ে উঠে। বঙ্কিম-সাহিত্যের মুকুরে কামনার পিছনে ধাবমান কৃষ্ণকান্তের উইলের গোবিন্দলালের জীবন-নাট্য বুঝবার চেষ্টা করা উচিত। সে জীবন দুঃখপূর্ণ। ইংরেজ সমালোচক ম্যাথু আর্নল্ড ঠিকই বলেছেন, **'Art is the criticism of life'.** জীবন নিয়েই আর্টের কারবার। নিজের জীবনে, চারিপাশের নরনারীর জীবনে ঘটনার পর ঘটনার ভিতর দিয়ে কত না দুঃখ-সুখের অভিজ্ঞতা জমে উঠেছে। আমাদের অধিকাংশের জীবনে ঘটনাগুলি তেমন কোন রেখাপাত করে না। হাঁসের পিঠের উপর দিয়ে যেমন জল চলে যায় কোন চিহ্ন না রেখে, তেমনি বেশীর ভাগ নর-নারীর জীবনের উপর দিয়ে ঘটনাস্রোত ব'য়ে যায়। জীবন থেকে তারা কিছু শেখে না। প্রথমের স্তরের শিল্পীরা নিজেদের এবং অন্যদের জীবনে যা যা ঘটে যাচ্ছে সে-গুলি সম্পর্কে বিলক্ষণ সচেতন এবং সেই অভিজ্ঞতাগুলি যে-সত্যগুলির দিকে অঙ্গুলিসঙ্কেত করে সে-গুলিকে মনের মৌচাকে জমিয়ে রাখেন। শুধু তাই নয়। জীবন থেকে যে-জ্ঞান তাঁরা আহরণ করেন সেই অভিজ্ঞতাগুলি এমন ভাষায় তাঁরা ব্যক্ত করে থাকেন যা সহজেই অন্যদের মনকে নাড়া দেয়। প্রকাশ-ভঙ্গিমার অপরূপ কৌশলে সত্য হয়ে ওঠে প্রাণময়, জীবন্ত এবং তা সহজেই অন্যদের মনে এমন রেখাপাত করে যা সহজে চেতনা থেকে মুছতে চায় না। এই জীবনশিল্পীর স্বচ্ছ দৃষ্টি থেকে গোবিন্দলালের চরিত্র এঁকেছেন বঙ্কিমচন্দ্র।...

রবীন্দ্র-সাহিত্যের, বঙ্কিম-সাহিত্যের, পৃথিবীর সমস্ত মহৎ সাহিত্যেরই একটি দুর্বার আবেদন আছে মানুষের অন্তরের নিভৃতে প্রসুপ্ত স্বর্গলোকের দেবদূতদের কাছে। কারণ মানুষের স্বভাবে প্রেয় যেমন রয়েছে, শ্রেয়ও তেমনি রয়েছে। 'ঈশদূত যীশুখ্রীষ্ট' বক্তৃতাটির উপসংহারে কত প্রাণস্পর্শী ভাষায় স্বামীজী বলেছেন: আমাদের ভুল-ভ্রান্তি যতই থাকুক, আমাদের মন্দ চিন্তা ও মন্দ কর্মের পরিমাণ যতই হউক, আমাদের চরিত্রের কোন না কোনখানে এমন এক স্বর্ণসূত্র আছে, যাহার দ্বারা আমরা সর্বদা সেই ভগবানের সঙ্গে সংযুক্ত।

নিবেদিতার পরিচ্ছন্ন বুদ্ধি এবং মার্জিত রুচির কাছে এই সত্যটি সহজেই প্রতিভাত হয়েছিল যে নিদ্রিত ভারতবর্ষকে নবজীবনের মধ্যে উদ্বুদ্ধ করতে হ'লে দুটি মহাকাব্যকে আশ্রয় করতেই হবে। একটি রামায়ণ এবং অপরটি মহাভারত, যাদের আবেদন অনাসক্তির বিরাট আদর্শের কাছে। কত দুর্লঙ্ঘ্য শৃঙ্গ পেরিয়ে, কত তুষার-ঝঞ্ঝা অতিক্রম ক'রে যুধিষ্ঠির পৌছালেন স্বর্গলোকের তোরণ-দ্বারে। সঙ্গে বিশ্বস্ত সঙ্গী একটি কুকুর। রাজা যুধিষ্ঠির স্বর্গের লোভে শরণাগত কুকুরটিকে ত্যাগ করতে কিছুতেই রাজী হলেন না। ক্ষুদ্র কুকুরকে স্বীয় পুণ্যার্জিত স্বর্গ প্রদান ক'রে স্বয়ং তার জন্য নরকে যেতে প্রস্তুত হলেন। এই অনাসক্তির আদর্শেরই জয়ধ্বনি মহাভারতে। সীতাচরিত্রেও অনাসক্তির একটি জাজ্বল্যমান প্রকাশ। এত দুঃখ সইলেন কিন্তু রামের বিরুদ্ধে একটি কর্কশ-বাক্যও সীতার মুখে কেউ শোনেনি। ক্রোধের বন্ধন থেকে মুক্ত অনাসক্ত সীতা সর্বংসহা—স্বামীজীর ভাষায় 'যেন মূর্তিমতী ভারতমাতা'।

শিশুদের নৈতিক চরিত্র-বিকাশের ব্যাপারে শিক্ষার ক্ষেত্রে মহৎ সাহিত্যের একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। তাই প্রকৃত শিক্ষয়িত্রী ভারতসেবিকা নিবেদিতা রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনীগুলির সঙ্গে শিশুমনের পরিচয় করিয়ে দিতে এতটা উৎসাহী ছিলেন।

বিশ্বসাহিত্যের ক্ষেত্রেও যা-কিছু মহৎ-সাহিত্যের গৌরব লাভ করেছে তাদেরও আবেদন আমাদের অন্তরের অন্তরতম স্থানে, স্বামীজীর ভাষায়, যে 'একটি ক্ষুদ্র জ্যোতির্ময় বৃত্ত' আছে তারই কাছে।...

মহৎ সাহিত্যের স্রষ্টারা সবাই জীবনশিল্পী। মানুষের জীবন-নাট্যে যা-কিছু ঘটছে, শিল্পীর নিজের জীবন-নাট্যে যা-কিছু ঘটেছে তাদেরই জয়-পরাজয়ের, হাসি-কান্নার কাহিনী প্রকাশভঙ্গীর যাদুকে আশ্রয় ক'রে সাহিত্যে রূপ নেয়। আর নিরাসক্ত দ্রষ্টার ভূমিকা নিয়ে জীবননাট্যের অঙ্কে অঙ্কে যে বিচিত্র দৃশ্যগুলির অবতারণা হচ্ছে সেগুলি অবলোকন করলে একটা শিক্ষা আমরা লাভ করবো। এই শিক্ষাটি হ'ল, পরিণামশীল বস্তুতে বা ব্যক্তিতে হৃদয় অর্পণ করলে অথবা আসক্ত হলে সেই আসক্তি আমাদের আত্মার মৃত্যু ঘটায়। ঐ আসক্তি থেকেই যত দুঃখের উদ্ভব।

স্বামী তুরীয়ানন্দকে একজন আসক্তির অর্থ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেছিলেন, 'আমি ও আমার'—এর নাম হচ্ছে আসক্তি। যতক্ষণ আসক্তি পরিণামশীল বস্তুতে অথবা ব্যক্তিতে, ততক্ষণ দুঃখ থেকে মুক্তি কোথায়? যাকে সমস্ত হৃদয় অর্পণ করেছি সে বিবাদ করলে, শত্রু হ য়ে দাঁড়ালে অথবা ম'রে গেলে দুঃখ তো পাবোই। কিন্তু যাঁর কখনো কোন পরিণাম নেই, আমরা যা কিছু করিনে কেন যিনি কখনই রাগ করেন না, যাঁর হৃদয় সর্বদাই আমাদের প্রতি সমান প্রেমপূর্ণ, যিনি আমাদের চিরকালের আশ্রয় আমাদের চিত্তের ষোলো আনা ভালবাসায় কেবল সেই নিত্য এবং আনন্দস্বরূপের অধিকার। তাঁকে সমস্ত আত্মা, সমস্ত চিত্ত, সমস্ত হৃদয় এবং সমস্ত শক্তি দিয়ে ভালবাসতে পারলে তবেই আমরা সিদ্ধ, অমৃত এবং তৃপ্ত হ'তে পারি।

এর থেকে দুটো প্রশ্ন আমাদের মনে স্বতই জাগতে পারে। প্রথম প্রশ্ন, ঈশ্বরকে হৃদয়ের সমস্ত ভালবাসা ঢেলে দিলে মানুষের জন্য অবশিষ্ট রইলো কি? তবে কি মানুষকে আমরা ভালবাসবো না? এর জবাবে স্বামীজী বলছেন: আমাদের তাঁহাকে ভালবাসিতে হইবে, আর জগতের যত প্রাণী আছে, তাহাদিগকে কেবল তাঁহার প্রকাশ বলিয়া ভালবাসিতে হইবে। ইহাই মূলমন্ত্র করিয়া জীবন পথে অগ্রসর হইতে

হইবে। স্ত্রীকে অবশ্য ভালবাসিতে হইবে, কিন্তু স্ত্রীর জন্য নহে। 'ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবত্যাত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি।' অর্থাৎ স্বামীকে যে স্ত্রী ভালবাসে, তাহা স্বামীর জন্য নহে, কিন্তু তাহার মধ্যে সেই আত্মা আছেন বলিয়া,—ভগবান আছেন বলিয়া পতি প্রিয় হইয়া থাকেন।

আর একটা প্রশ্ন। যাঁরা ঈশ্বর মানেন না কিন্তু যাঁরা অনাসক্ত, সর্বভূতে যাঁদের ভালবাসা পরিব্যাপ্ত তাঁরা কি দুঃখ-জলধির পারে আত্মার চিরপ্রশান্তিতে পৌঁছাবেন না? অপরে ভক্তি, যোগ বা জ্ঞানের দ্বারা যে পূর্ণ অবস্থা লাভ করে তা লাভ করবেন না?

এই প্রশ্নের উত্তর ভগবান বুদ্ধ সম্পর্কে এক বক্তৃতার উপসংহারে স্বামীজী বলছেন:

অনেকের পক্ষে একজন ঈশ্বরে বিশ্বাস করতে পারিলে সাধনপথ খুব সহজ হইয়া থাকে। কিন্তু বুদ্ধের জীবনালোচনায় স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, যদি কোন ব্যক্তি আদৌ ঈশ্বরে বিশ্বাসী না হয়, তাহার যদি কোন দার্শনিক মতে বিশ্বাস না থাকে, যদি সে কোন সম্প্রদায়ভুক্ত না হয়, অথবা কোন মন্দিরাদিতে গমন না করে, এমন কি, প্রকাশ্যতঃ নাস্তিক বা জড়বাদীও হয়, তথাপি সে চরমাবস্থা লাভে সমর্থ। তাঁর মতামত বা কার্য-কলাপ বিচার করিবার আমাদের কোন অধিকার নাই। আমি যদি বুদ্ধের হৃদয়বত্তার লক্ষাংশের একাংশেরও অধিকারী হইতাম তবে আমি নিজেকে ধন্য বোধ করিতাম।

স্বামীজী কোন কিছুতে বিশ্বাস করাকে বিশেষ কোন গুরুত্ব দিতেন না। মুখে ধর্মের কথা, ঈশ্বরের কথা আওড়িয়েই বা লাভ কি? তিনি বিশ্বাস করতেন: নিঃস্বার্থপরতা সম্পূর্ণভাবে অহংশূন্যতাই সাক্ষাৎ মুক্তিস্বরূপ; কারণ অহং ত্যাগ হইলে ভিতরের মানুষ মরিয়া যায়, একমাত্র ঈশ্বরই অবশিষ্ট থাকেন।

এবার তব চরণ দেহি

ডঃ সচ্চিদানন্দ ধর

নিত্য চণ্ডী করি পাঠ, নিত্য চণ্ডী শুনি।
'দেহি, দেহি'-স্তুতিকেই বড় বলে' গণি।
"রূপং দেহি, জয়ং দেহি"—মন্ত্র করি' সার।
সপ্তশতী চণ্ডীগ্রন্থ পড়ি বার বার।
আরো কত "দেহি" আছে, গ্রন্থে নাহি লেখা।
চাহিবারে তব পাশে মনে দেয় দেখা।
'দেহি দেহি'-করি পুনঃ প্রেয়ঃ লাভ ক'রে।
সব পেয়ে ক্লান্ত তবু কাঁদি কা'র তরে?
'দেহি, দেহি' ক'রে দেখি বেড়ে যায় লোভ।
দাও যদি মা তবেই খুশী, নাহি দিলে ক্ষোভ!
সকল পেয়ে রিক্ত আমি তোমাকেই চাই।
যাঁরে পেলে পাবার বাকী অন্য কিছু নাই।
এবার তব চরণ দেহি, অন্য দেওয়া ফাঁকি।
তোমায় যদি পাই মা দুর্গে! কি রহিবে বাকী?

বিবেকানন্দ-জননী ভুবনেশ্বরী দেবী প্রসঙ্গে

স্বামী তথাগতানন্দ

'আপনি আমার দুঃখিনী মা ও ছোটভাইদের দেখিতে গিয়াছিলেন জানিয়া সুখী হইয়াছি। কিন্তু আপনি আমার অন্তরের একমাত্র কোমল স্থানটি স্পর্শ করিয়াছেন। আপনার জানা উচিত যে, আমি নিষ্ঠুর পশু নই। এই বিপুল সংসারে আমার ভালবাসার পাত্র যদি কেহ থাকেন, তবে তিনি আমার মা। ··· একদিকে ভারতের ও বিশ্বের ভাবী ধর্মসম্বন্ধীয় আমার পরিকল্পনা, এবং যে উপেক্ষিত লক্ষ লক্ষ নরনারী দিন দিন দুঃখের তমোময় গহ্বরে ধীরে ধীরে ডুবিতেছে, যাহাদিগকে সাহায্য করিবার কিংবা যাহাদের বিষয় চিন্তা করিবারও কেহ নাই, তাহাদের জন্য আমার সহানুভূতি ও ভালবাসা, আর অন্যদিকে আমার যত নিকট আত্মীয়-স্বজন আছেন, তাঁহাদের দুঃখ ও দুর্গতির হেতু হওয়া—এই দুইয়ের মধ্যে প্রথমটিকেই আমি ব্রতরূপে গ্রহণ করিয়াছি, বাকী যাহা কিছু তাহা প্রভুই সম্পন্ন করিবেন।' ১৮৯৪-এর ২৯শে জানুআরি তারিখে লিখিত এই পত্র। (বাণী ও রচনা ১ম সং, ৬।৩৯৩-৯৪) ১৮৯৪-এর শেষভাগে স্বামীজী তাঁর বিখ্যাত 'ভারতীয় নারীর আদর্শ' নামক ভাষণের মধ্যে তাঁর জননীর উদ্দেশ্যে হৃদয়ের ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদন করেন। তিনি বলেন—'জননীর নিঃস্বার্থ স্নেহ ও পূত চরিত্র উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হওয়াতেই তিনি সন্ন্যাসজীবনের অধিকারী হইয়াছেন। এবং তিনি জীবনে যা কিছু সৎকার্য করিয়াছেন, সমস্তই সেই জননীর কৃপাপ্রভাবে।' (যুগনায়ক, ১ম সং, ২।২১৪-৫)

ছেলে মাকে শ্রদ্ধা করে। এতে নতুন কিছু নেই। বিশেষ সে যুগে। ভুবনেশ্বরী দেবীর চরিত্রে এমন কিছু ছিল যা তাঁর জগৎবিখ্যাত পুত্রকে মুগ্ধ করেছিল। আমরা সে-সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করব: ভুবনেশ্বরী দেবীর জন্ম হয় ১৮৪১ খৃঃ সিমুলিয়ার বিখ্যাত বসুবংশে। তাঁর গায়ের রং ছিল ফর্সা, আর কণ্ঠ ছিল সুমধুর। তাঁর প্রতি পদক্ষেপে একটা আভিজাত্যের পরিচয় পাওয়া যেত, তিনি ছিলেন বুদ্ধিমতী, কার্যকুশলা ও দেব-দ্বিজে ভক্তিপরায়ণা, তাঁর স্মৃতিশক্তি খুবই প্রখর ছিল। রামায়ণ ও মহাভারত তাঁর বেশ জানা ছিল। নরেন্দ্রনাথ তাঁর কাছ থেকে শিশুকালেই এসব কাহিনী শুনেন। তিনি ছিলেন মিতভাষিণী, গম্ভীরপ্রকৃতি, আলাপে মিষ্ট-স্বভাবা ও তেজস্বিনী। রাজরানীর মতো মানুষের শ্রদ্ধা ও মর্যাদা আকর্ষণ করতেন। সংসারের যাবতীয় কর্ম সুচারুরূপে করেও পড়াশুনা, সূচীকর্ম ও প্রতিবেশীদের সুখ-দুঃখের কাহিনী শোনার সময় ও হৃদয় তাঁর ছিল। প্রতিবেশিনীরা সর্বদাই তাঁর হৃদয়বত্তার পরিচয় পেতেন। কোন গরীব দুঃখী রিক্তহস্তে ফিরে যেত না তাঁর দ্বার থেকে। আর্তের দল তাঁকে করুণাময়ীরূপেই সর্বদা দেখত। হৃদয়বান বিশ্বনাথের তিনি উপযুক্ত সহধর্মিণী ছিলেন। ভুবনেশ্বরী দেবী কবিতা রচনা করতে পারতেন, ইংরেজীও তাঁর সাধারণভাবে জানা ছিল। ছেলেমেয়েদের প্রাথমিক ইংরেজী শিক্ষা তিনিই দিয়েছেন। বালক নরেন্দ্রনাথ তাঁরই কোলে বসে ভারতের মহাপুরুষগণের ও দেবদেবীর মাহাত্ম্য শুনেছিলেন। শুধু লৌকিক শিক্ষাই তিনি দেননি, দিয়েছেন নৈতিক শিক্ষাও। তাঁর মতে সংসার-সমুদ্রের নানা আবর্তে পড়েও নৈতিক জীবনকে অবহেলা করা অত্যন্ত দূষণীয়

ব্যাপার এবং জীবনের পরম আশ্রয় শ্রীভগবানের প্রীতির জন্য কায়মনোবাক্যে তাঁর সেবা করাই মহৎ জীবনের লক্ষণ। একটি ঘটনার উল্লেখ করলে তাঁর চরিত্র-মাহাত্ম্যকে ধারণা করা একটু সহজ হবে। একবার ভুল করে নরেন্দ্রের শিক্ষক তাঁকে অযথা শাস্তি দেন। নরেন্দ্র প্রতিবাদ করলে শাস্তি বেড়েই যায়। জর্জরিতদেহ নরেন্দ্রনাথ পরে মাতার নিকট সাশ্রুলোচনে ঘটনাটি বিবৃত করলে স্নেহময়ী জননী বলেন —'…ফল যা হোক না কেন, সর্বদা যা সত্য বলে মনে করবে, তাই করে যাবে। অনেক সময় হয়তো এর জন্য অন্যায় ও অপ্রীতিকর ফল সহ্য করতে হবে, কিন্তু তবু সত্য কখনও ছাড়বে না।' জননী আরও শিক্ষা দিতেন, 'আজীবন পবিত্র থাকিও, নিজের মর্যাদা রক্ষা করিও, এবং কখনও অপরের মর্যাদা লঙ্ঘন করিও না। খুব শান্ত হইবে, কিন্তু আবশ্যক হইলে হৃদয় দৃঢ় করিবে।'

বিশ্বনাথ দত্তের জীবিতকালেই যৌথপরিবারের কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তিনি স্বগৃহচ্যুত হন। বিশ্বনাথের তিরোধানে সংসারে আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। ঋণের পরিমাণ ছিল আতঙ্ক-জনক। সুদিনের বন্ধুবর্গ ও তাঁর স্বামীর অন্নে প্রতিপালিত আত্মীয়বৃন্দ এই দুর্দিনে কোন সাহায্য করেননি। বসতবাটীর জন্য আদালতে মামলা চলতে থাকে বিশ্বনাথের জীবনকালেই। পিতার শ্রাদ্ধাদি কাজের আগে থেকেই নরেন্দ্র-নাথকে সংসারের জন্য চাকরির খোঁজ করতে হয়। এইকালে শ্রীযুক্ত ভুবনেশ্বরী দেবীর চারিত্রিক দৃঢ়তার কথা জানা যায় স্বামী সারদানন্দের লেখনী থেকে: 'স্বামীর মৃত্যুর পর দারিদ্র্যে পতিত হইয়া তাঁহার ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও তেজস্বিতা প্রভৃতি গুণরাজি বিশেষ বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল। সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়া যিনি প্রতিমাসে সংসার পরিচালনা করিতেন, সেই তাঁহাকে মাসিক ত্রিশ টাকায় আপনার ও নিজ পুত্রগণের ভরণ পোষণ নির্বাহ করিতে হইত। কিন্তু তাহাতেও তাঁহাকে একদিনের নিমিত্ত বিষণ্ণ দেখা যাইত না। তাঁহার অশেষসদ্‌গুণসম্পন্ন জ্যেষ্ঠপুত্র নরেন্দ্রনাথ নানা প্রকার চেষ্টা করিয়াও অর্থকর কোনরূপ কাজকর্মের সন্ধান পাইতেছেন না এবং সংসারের উপর বিতরাগ হইয়া চিরকালের নিমিত্ত উহা ত্যাগের দিকে অগ্রসর হইতেছেন -- এইরূপ ভীষণ অবস্থায় পতিত হইয়াও শ্রীমতী ভুবনেশ্বরী যেরূপ ধীরস্থির-ভাবে নিজ কর্তব্য পালন করিয়াছিলেন, তাহা ভাবিয়া তাঁহার উপর ভক্তি শ্রদ্ধার স্বতই উদয় হয়।" (লীলাপ্রসঙ্গ রাজ সং ২য়-৯৫-৯৬ পৃঃ)

শুধুমাত্র নরেন্দ্রনাথের গৃহত্যাগ নয়, তাঁর অপর দুইপুত্রের জন্যও তিনি অত্যন্ত চিন্তান্বিত অবস্থায় দিন কাটিয়েছেন। মধ্যম পুত্র মহেন্দ্রনাথ ১৮৯৬ খৃঃ বিলেত যান পড়ার জন্য। স্বামীজীর মহাপ্রয়াণের পর ১৯০২ খৃঃ তিনি দেশে ফিরে আসেন। এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে তিনি মাকে কোন চিঠিপত্র না লেখায় ভুবনেশ্বরী দেবী দুঃসহ মানসিক অশান্তির মধ্যে দিন কাটিয়েছেন। কনিষ্ঠপুত্র ভূপেন্দ্রনাথ ১৯০৩ খৃঃ বিপ্লব-আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯০৭ খৃঃ যুগান্তর পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে রাজরোষে বন্দী হন। এক বছর পরে ছাড়া পেয়েই তিনি আমেরিকা পালিয়ে যান। ১৯১৫ খৃঃ দেশে ফিরে আসেন। স্বদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের কাজে ভূপেন্দ্রনাথের উৎসর্গীকৃত জীবনকে তিনি প্রেরণা দিয়েছিলেন।

পরিব্রাজক সন্ন্যাসীর চিত্তে মায়ের জন্য "উদ্বেগ" ছিল সর্বদা। মাদ্রাজে বাসকালে তিনি একদিন স্বপ্নে দেখলেন তাঁর জননী দেহত্যাগ করছেন। স্বামীজী অত্যন্ত বিমর্ষ। কলকাতায় সংবাদের জন্য তার করলেন মন্মথবাবু। আর মন্মথবাবুর অনুরোধে এবং নিজের মনের উদ্বেগ-বশতঃ শহরের বাইরে এক পিশাচ সিদ্ধের কাছে

যান সঠিক সংবাদের জন্য। মার সুস্থতার কথা জানায় সেই পিশাচ সিদ্ধ লোকটি। (বাণী ও রচনা ৯।৮৭)। ১৮৯৮ খৃঃ ১লা ডিসেম্বর স্বামীজী তাঁর প্রিয় শিষ্য খেতড়ীরাজকে লিখেছিলেন যে, রাজা তাঁর জীবনের এক 'ভয়ানক উদ্বেগ' অপসারিত করেন। আমেরিকা যাওয়ার ঠিক পূর্বে স্বামীজীর পরামর্শে রাজা তাঁর মায়ের জন্য মাসিক একশত টাকা সাহায্য করতে রাজী হন। তিনি নিয়মিত সে সাহায্য পাঠাতেন এবং রাজার অকালে দেহত্যাগের পরেও তা পাঠানো হ'ত (যুগনায়ক, ১।৪২৪ পৃঃ)। আমেরিকায় থাকাকালে খৃষ্টান মিশনারী, প্রতাপ মজুমদার ও থিয়োসফিস্ট-দের সমবেত চেষ্টায় স্বামীজীর নামে অনেক কুৎসা রটনা করা হয়। ঈশ্বর প্রেরিত পুরুষ স্বামীজী এসব রটনাকে গ্রাহ্য করতেন না। কিন্তু এসবের প্রতিক্রিয়া তাঁর মায়ের উপর কিভাবে হবে এ-চিন্তা তাঁকে বিমর্ষ করত। একপত্রে তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করেছেন, '···আমার বুড়ী মা এখনও বেঁচে আছেন, সারাজীবন তিনি অসীম কষ্ট পেয়েছেন, সে সব সত্ত্বেও মানুষ আর ভগবানের সেবায় আমাকে উৎসর্গ করার বেদনা তিনি সহ্য করেছেন। কিন্তু তাঁর শ্রেষ্ঠ আশার, তাঁর সবচেয়ে ভালবাসার যে ছেলেটিকে তিনি দান করেছেন, সে দূরদেশে গিয়ে– কলকাতার মজুমদার যেমন রটাচ্ছে তেমনিভাবে—জঘন্য নোংরা জীবনযাপন করছে, এ সংবাদ তাঁকে একেবারে শেষ করে দেবে।' (যুগনায়ক ২।১৩৭)

স্বামীজী স্বীয় জননীকে আজীবন প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন এবং তাঁর উপদেশ মতো চলতেন। তিনি বলতেন, 'যে মাকে সত্য সত্য পূজা করতে না পারে, সে কখনও বড় হতে পারে না।' আর বহুবার তিনি সগর্বে ঘোষণা করেছেন, **'আমার জ্ঞানের বিকাশের জন্য আমি মার নিকট ঋণী।'** সুযোগ পেলে তিনি তাঁর মায়ের প্রতি অশেষ শ্রদ্ধা প্রকাশ করতেন মুক্ত কণ্ঠে। এক বন্ধুর সাক্ষ্য উদ্ধৃত করা গেল: "তিনি বলিয়াছিলেন, তাঁর মাতার সংযমশক্তি ছিল অপূর্ব··· তাঁহার মা এক সময় সুদীর্ঘ চৌদ্দ দিন উপবাসে কাটাইয়াছিলেন।···

'মা-ইতো আমাকে এই প্রেরণা দিয়েছিলেন। তাঁহার চরিত্র ছিল আমার জীবন ও কার্যের চির প্রেরণা-স্থল' " (যুগনায়ক ২।২৭৫)। ১৮৯৪ খৃঃ শেষ দিকে শ্রীযুক্তা ওলিবুলের বাসগৃহে তাঁর ভারতীয় নারীর আদর্শ নামক ভাষণটি ওদেশের সম্ভ্রান্ত মহিলাদের হৃদয়কে প্রবলভাবে নাড়া দেয়। তাঁরা স্বামীজীর অজান্তে যীশুখৃষ্টের জন্মদিন উপলক্ষ্যে বিবেকানন্দ-জননী শ্রীযুক্তা ভুবনেশ্বরী-দেবীকে এক পত্র দেন। পত্রাংশে আছে: "কয়েকদিন পূর্বে তিনি এখানে 'ভারতীয় মাতৃত্বের আদর্শ' সম্বন্ধে যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহাতে বলেন যে, এখানকার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার কল্যাণার্থ তিনি যাহা কিছু করিতে সমর্থ হইয়াছেন তাহা কেবল আপনার শ্রীচরণাশীর্বাদে। সেদিন যাঁহারা তাঁহার কথা শুনিয়াছিলেন, তাঁহারা মনে করেন, তাঁহার জননীকে অর্চনা করিলে দিব্য-শক্তি ও আত্মোন্নতি লাভ হয়।···" (যুগনায়ক ২।২৭৪)। ঐ বক্তৃতায় স্বামীজী বলেন: আমাকে পৃথিবীতে আনিবার জন্য তিনি [মা] তপস্বিনী হইয়াছিলেন। আমি জন্মাইব বলিয়া তিনি বৎসরের পর বৎসর তাঁহার শরীর-মন, আহার-পরিচ্ছদ, চিন্তা-কল্পনা পবিত্র রাখিয়াছিলেন, এই জন্যই তিনি পূজনীয়া।' (বাণী ও রচনা ৫।৪৩৪)। তাঁর মাতৃভক্তির পরিচায়ক একটি ঘটনার উল্লেখ করা গেল: সেদিন (১৮৯৮-৯৯) স্বামীজী বলরামবাবুদের বাড়ীতে ছিলেন, স্বামী ব্রহ্মানন্দও ছিলেন। স্বামীজী তখন বহুমূত্ররোগে কাতর; রাত্রে প্রায়ই নিদ্রা নাই। তাই দিনের বেলায় অনেক সময় বিছানায় শুয়ে

থাকতেন বা ঘুমাতেন। সেদিন তাঁদের বাড়ীর ঝি এসে জিজ্ঞেস করল,—'নরেন কোথায়?' ব্রহ্মানন্দজী উঁকি মেরে দেখলেন, তিনি নিদ্রিত। তাই তাঁকে ডাকেন নাই এবং ঝি চলে যাওয়ার পর স্বামীজীকে সে-কথা জানান। স্বা মহারাজকে এর জন্য তিরস্কার করেন। বিশেষ প্রয়োজনে মা ডেকেছেন ভেবে সঙ্গে সঙ্গে একটি গাড়ীতে করে মার কাছে উপস্থিত হন। মা তাঁকে ডাকার জন্য ঝিকে পাঠাননি। ঝি নিজেই একবার নরেনের খোঁজ নেবার জন্য গিয়েছিল। এটা জানতে পেরে স্বামীজী গাড়ী পাঠিয়ে রাজা মহারাজকে ঐ ঘরে এনে বলেন, 'রাজা (ব্রহ্মানন্দ) বড় অন্যায় করেছি; তোকে শুধু শুধু গালাগালি দিয়েছি।'

১৯০১ খৃঃ অগ্রহায়ণের শেষে স্বামীজী স্বীয় জননীর ইচ্ছা পূরণের জন্য কালীঘাটে গিয়ে গঙ্গা স্নানান্তে ভিজেকাপড়ে মায়ের মন্দিরে প্রবেশ ক'রে মায়ের পাদপদ্মের সামনে তিনবার গড়াগড়ি দেন, সাতবার মন্দির প্রদক্ষিণ করেন এবং নাট-মন্দিরে নিজেই হোম করেন। তাঁর বাল্যকালের এক 'মানত পূজার' জন্য এ সব করেন মায়ের আদেশে। ১৯০১ খৃঃ ২৯শে মার্চের এক পত্রে জানতে পারি ঢাকা গমনকালে তাঁর মা ও বোন সঙ্গে গিয়েছিলেন ব্রহ্মপুত্রে পবিত্র স্নানের যোগে। চন্দ্রনাথ ও সম্ভবতঃ কামাখ্যাদর্শনের পর সবাই কলকাতায় ফিরে আসেন। এ ছাড়া মঠের সাধুদের সঙ্গে শ্রীমতী ভুবনেশ্বরী দেবী উত্তর ভারত ও ৺পুরী গিয়েছিলেন। স্বামীজীর দেহত্যাগের সংবাদ পেয়ে মঠে যান এবং এ-দুঃসহ মৃত্যুতেও জননী ভুবনেশ্বরী দেবী একেবারে ভেঙ্গে পড়েননি—বীর জননীর মতোই তিনি সে-আঘাত সয়েছিলেন। আঘাত-সংঘাতের মধ্যেও তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তা ও আদর্শনিষ্ঠা আমাদের বিস্মিত ও শ্রদ্ধাযুক্ত করে। ৮৬ বৎসর বয়সে তিনি দেহ-ত্যাগ করেন। এই মহীয়সী নারীর তপস্যা-বলেই জগৎ পেয়েছে স্বামী বিবেকানন্দকে। তাঁকে আমরা প্রণাম জানাই।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ

আলোক দেবতা তুমি প্রেমের আধার
লাবণ্য অমৃতোপম প্রশান্ত ভাবুক
পদব্রজে পরিক্রমা করেছ এ দেশ
পরনে কৌপীনবাস সর্বত্যাগী বেশ
কৃষ্ণরূপে কৃষ্ণধ্যানে দৃষ্টি নির্নিমেষ
ক্ষমায় কৃপায় ধন্য করেছ সংসার,
হে প্রেমিক, হে উদার, প্রশান্ত ভাবুক
তোমার প্রেমের মন্ত্রে ভাষা পায় মূক।

জীবনবীণায় দিলে হ্লাদিনী ঝঙ্কার
ভাবকম্প্র রসকম্প্র অপার্থিব সুখ,
কমললোচন প্রভু মূর্ত কমলেশ
গৌর অবয়বে নেই মালিন্যের লেশ
শুদ্ধমনে শুদ্ধাভক্তি অনন্ত অশেষ
সীমাহীন তপস্যার জ্যোতিপারাবার
উজ্জ্বল করেছ বঙ্গজননীর মুখ
জগৎকে প্রেমধর্ম দিয়েছ যৌতুক।

বিশ্বাসের সাগর গিরিশচন্দ্র

ডক্টর জলধিকুমার সরকার

শ্রীরামকৃষ্ণের পদতলে গিরিশচন্দ্রের কণ্ঠে— "ব্যাস বাল্মীকি যাঁর ইয়ত্তা করতে পারেন না…", অথবা অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় "তুমি আমার ছেলে হবে বল"—গিরিশবাবুর এই এক দিক, অন্য দিকে তিনি মহাকবি, নট ও নাট্যকার। এই মহাপুরুষের কথা মনে হ'লেই, তাঁর— দুটি দিকই সকলের মনে পড়ে।

গিরিশচন্দ্রের চরিত্রাধ্যয়ন করতে হলে তাঁর শৈশবের পারিবারিক পরিবেশ এবং তৎকালীন দেশের সামাজিক ও নৈতিক ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত হওয়া দরকার। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে যখন একদিকে ইয়ং বেঙ্গলের পুরোভাগে সংস্কারকামী নানাদিগন্তবিসারী তরুণ যুবকের দল, অপরদিকে ব্যঙ্গরসিক প্রতিভামণ্ডিত গুপ্ত-কবির নেতৃত্বে চালিত প্রাচীন রসসাহিত্যের পুনরভ্যুদয়, সেই সন্ধিযুগে কলিকাতা বাগবাজার বসুপল্লীতে ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে ২৮শে ফেব্রুআরি বাংলা ১২৫০ সালের ১৫ই ফাল্গুন সোমবার গিরিশচন্দ্র আবির্ভূত হন। গিরিশচন্দ্র যখন জন্মগ্রহণ করেন, শ্রীরামকৃষ্ণ অষ্টমবর্ষীয় বালক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর চব্বিশ বৎসরের যুবক, মধুসূদন বিংশতিবর্ষীয়, বঙ্কিম ও কেশব ছয় বৎসরের বালক এবং ঈশ্বরগুপ্ত তেত্রিশবর্ষীয় পূর্ণ যুবাপুরুষ।

গিরিশের জন্মের পরেই তাঁর মাতা সূতিকারোগাক্রান্তা হন। মাতৃস্তন্যে বঞ্চিত গিরিশচন্দ্র একজন বাগ্দিনীর ক্ষীরধারায় শৈশব অতিক্রম করেন। এদিকে গিরিশচন্দ্র অষ্টমগর্ভের সন্তান হওয়ায় মাতা সন্তানের মঙ্গলকামনায় তাঁকে কোনরূপ আদর করতেন না। সে যাই হোক মাতার কঠোর শাসনে গিরিশের বাল্যহৃদয়ে— সত্যনিষ্ঠার বীজ উপ্ত হয়েছিল। যদি বালসুলভ চপলতাবশতঃ গিরিশ কখনও মিথ্যাকথা বলতেন, মাতা শুধু কঠোর শাস্তি দিয়েই বিরত হতেন না, বালকের মুখে গোময় পুরে দিয়ে মুখের শুদ্ধি করে দিতেন। কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিক্ষণে পিতার পরলোক-গমনের পর গিরিশ তাঁর বিষয়সম্পত্তি নিয়ে এক মোকদ্দমায় জড়িত হন। সাক্ষ্য দেবার কালে অম্লানবদনে সত্য কথা বলার ফলে তাঁকে মামলায় হারতে হয় এবং আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়। গিরিশ বুঝলেন, সংসারে সত্যের আদর নাই, মিথ্যারই গৌরব। এতে তাঁর হৃদয়ে আঘাত লাগে এবং পরবর্তী রচনায় তাঁর সেই আঘাতের চিহ্ন পরিস্ফুট হতে দেখা যায়।

বিধাতা গিরিশের জীবন যেন দুর্ভাগ্যের কঠোর হস্ত দিয়ে গড়েছিলেন। শৈশবে স্নেহ-দানে মাতার উপেক্ষা, কৈশোরে জননীর মৃত্যু, যৌবনের প্রারম্ভে পিতার পরলোকগমন, ভ্রাতা-ভগিনীর বিয়োগ ও অভিভাবকহীনতা, বিবাহ-রাত্রিতে ভীষণ অগ্নিদাহ, পাঠ্যাবস্থায় বিদ্যালয়ে অকৃতিত্ব, লোকসেবার প্রচেষ্টায় 'বয়াটে' খ্যাতি, এবং রসপিপাসু মন নিয়ে সওদাগিরি অফিসে হিসাবরক্ষকের চাকরি গ্রহণে বাধ্য হওয়া—এই সব মিলে তাঁর মনকে যেন সামাজিক সকল বিষয়ে বিদ্রোহী করে তুলেছিল। দেখা গেছে যে, তিনি আজীবন সংসারের সমাদর ও সুখ্যাতির প্রতি উদাসীন ছিলেন; শুধু উদাসীন নয়, উপেক্ষাও করেছেন। গিরিশের মনের এটাও একটা বৈশিষ্ট্য।

বাল্যকালে খুল্ল পিতামহীর নিকট সন্ধ্যায় রামায়ণ-মহাভারতের গল্পের ভিত্তিতে গিরিশের মধ্যে যে রসপিপাসু মনের জন্মলাভ হয়েছিল, পাড়ায় হাফ-আখড়াই, কথকতা এবং রামায়ণগান

শ্রবণের মাধ্যমে তা পুষ্টিলাভ করে। কবি ঈশ্বর গুপ্তের নাম শুনে তিনি কবিতা-রচনায় মনোনিবেশ করেন। তাঁর সর্বপ্রথম রচিত গীতেও তাঁর চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়:

সুখ কি সতত হয় প্রণয় হ'লে।
সুখ-অনুগামী দুখ—গোলাপে কণ্টক মিলে।
শশিপ্রেমে কুমুদিনী, প্রমোদিনী উন্মাদিনী
তথাপি সে একাকিনী, কত নিশি ভাসে জলে।

১৮৬২ খৃষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ার ফলে যদিও বিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়, কিন্তু তাঁর জ্ঞানপিপাসু মন অধ্যয়ন হতে বিরত হয়নি। এমনকি বিবাহের যৌতুকহিসাবে পাওয়া অর্থে ইংরেজী বই কিনে তাতেই ডুবে থাকতেন। তাঁর জ্ঞানের পরিধির আভাস পাওয়া যায়, তাঁর নানাবিধ রচনায় এবং যখন দেখি যে তিনি হ্যামিলটন, হার্বট স্পেনসার, টিণ্ডেল বা হাক্‌স্‌লের লেখা নিয়ে ঘোরতর তর্ক করছেন জ্ঞানসূর্য বিবেকানন্দের সঙ্গে, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, মহিমাচরণ ও ত্রৈলোক্যের যুক্তি-তর্ককে খণ্ডন করে অবতারবাদ প্রমাণ করছেন, অথবা জ্ঞানাভিমানী ডাক্তারকে বলতে বাধ্য করছেন 'তোমার কাছে হেরে গেলাম, পায়ের ধুলা দাও।' তাঁর জ্ঞানপিপাসা এরূপ ছিল যে, প্রৌঢ়বয়সেও ডাক্তার সরকারের প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানসভায় বিজ্ঞানশিক্ষা ও আলোচনার জন্য সুযোগ পেলেই যেতেন। লোকচরিত্র-অধ্যয়নে ও মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে বিদ্যার্থীর ন্যায় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বুঝতে চেষ্টা করতেন। এরূপ অবস্থায় নিজ দেহে কঠিন জঘন্য রোগের আক্রমণের আশঙ্কায়ও পশ্চাৎপদ হননি।

গিরিশবাবু অভিনেতা বা সঙ্গীতরচয়িতারূপে প্রথম প্রথম তৎকালীন নূতন প্রচলিত সখের থিয়েটারে যোগ দিতে আরম্ভ করেন। ক্রমে রঙ্গামোদীদের ক্রমবর্ধমান আগ্রহ মেটাবার জন্য নাট্যরচনাযও অগ্রসর হলেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁর নাট্যরচনা শুরু হয় ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে, যদিও ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে তাঁর তিনখানি গীতিনাট্য রচিত হয়েছিল। তাঁর নাট্যপ্রতিভা যে বিভিন্ন দিকে কিরূপ বিকশিত হয়েছিল, তা বুঝা যায় যখন আমরা সামগ্রিকভাবে তাঁর রচনাবলীর হিসাব করি। তাঁর ৬৩ খানি উপন্যাস, প্রবন্ধ ও গল্প বাদ দিলেও, তাঁর রচিত নাট্যের সংখ্যা ৭৬।

ঈশ্বরের অস্তিত্বে সন্দিহান, কখনও বা নিরাকারবাদী নরেন্দ্রনাথকে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর যাদুস্পর্শে কিভাবে ধীরে ধীরে তাঁর মনের মতো গড়ে তুলেছিলেন তা সকলেরই সুবিদিত। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের পূর্ববর্তী মানসিক ধারা এবং তার অভূতপূর্ব পরিণতি সকলেরই বিস্ময়ের উদ্রেক করতো। নরেন্দ্রনাথ তাঁর ক্ষুধিত ও অশান্ত মন নিয়ে নানা দ্বারে ঘুরছিলেন শান্তির জন্য এবং সেই অবস্থায় এসে পৌঁচেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের দ্বারে। গিরিশবাবু ঠিক সেইভাবে আসেননি। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর জীবনে এসেছিলেন অযাচিতভাবে, কতকটা যেন গিরিশচন্দ্রের অনিচ্ছাসত্ত্বেও। পাওয়া পটভূমি এরূপ হলেও, ঠাকুরের কৃপা যেন উপচে পড়েছিল তাঁর উপর। এ অবস্থাটা ভাববার বিষয়।

সকলেই জানেন গিরিশচন্দ্রের 'চৈতন্যলীলা'ই ঠাকুরকে তার সান্নিধ্যে এনে দিয়েছিল। যে-নাটক দেখাকালে শ্রীরামকৃষ্ণ 'ভাবে বিভোর' এবং ক্ষণে ক্ষণে সমাধিস্থ হয়েছিলেন এবং যা দেখে একজন বৈষ্ণব বাবাজী তাঁকে ভক্ত-বৈষ্ণব ভেবে দেখা করতে গিয়ে সুরার বোতল হস্তে দেখে স্তম্ভিত হয়েছিলেন, সেই নাটকটি কি গিরিশবাবু ভক্তিতে আপ্লুত হয়ে লিখেছিলেন? আশ্চর্যের বিষয় যে ঘটনাটা তা নয়।

প্রথম প্রথম গিরিশবাবু ঐতিহাসিক নাটক লিখতে আরম্ভ করেছিলেন। কিন্তু ক্রমে বুঝতে পারলেন যে এ দেশে অধিকসংখ্যক দর্শককে

আকৃষ্ট করতে হলে পৌরাণিক ও ধর্মবিষয়ে নাটক লেখা অপরিহার্য। অর্থাৎ প্রয়োজনের তাড়নাতেই তিনি দেবদেবী ও অবতারদের চরিত্রাঙ্কণে ব্রতী হয়েছিলেন। তার উদ্দেশ্য ছিল দর্শকের চিত্ত-বিনোদন নামযশ ও অর্থোপার্জন। শুধু যে তিনি ভগবৎপ্রেমিক ও ভক্ত ছিলেন না, তাই নয়, বরং তিনি ভগবৎবিশ্বাসের ঘোর বিরোধী ছিলেন। একবার শারদীয় পূজার পূর্বদিনে কে বা কারা তাঁর অজান্তে তাঁর প্রাঙ্গণে দেবী প্রতিমা রেখে দিয়েছিল। নিদ্রোত্থিত গিরিশ মদ্যপানান্তে কুঠার হস্তে প্রতিমাকে খণ্ড-বিখণ্ড করলেন এবং স্তূপীকৃত ধ্বংসরাশিকে গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করে নিশ্চিন্ত হলেন। তাঁর দিদির আর্তনাদ, প্রতিবেশীর প্রতিবাদ—কিছুতেই সঙ্কল্পচ্যুত হলেন না। শুধু আঘাত ও দুর্ভাগ্যের মধ্য দিয়ে মানুষ হওয়ার জন্যই যে গিরিশচন্দ্রের এইরূপ অশাস্ত্রীয় ও অসামাজিক মনোভাব গড়ে উঠেছিল তা নয়। সেই সময়-কার প্রচলিত চিন্তাধারা সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন, "সে সময় জড়বাদী প্রবল, ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করা একপ্রকার মূর্খতা ও হৃদয়দৌর্বল্যের পরিচয়। সুতরাং সমবয়স্কের নিকট একজন কৃষ্ণবিষ্ণু বলিয়া পরিচয় দিতে গিয়া 'ঈশ্বর নাই' এই কথাই প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করা হইত। আস্তিককে উপহাস করিতাম এবং এ-পাত ও-পাত বিজ্ঞান উল্টাইয়া স্থির করা হইল যে ধর্ম কেবল সংসার-রক্ষার্থ কল্পনা, সাধারণকে ভয় দেখাইয়া কুকার্য হইতে বিরত রাখিবার উপায়।"

উপরে উক্ত মনোভাবের পরিপ্রেক্ষিতে, কেবল প্রয়োজনের খাতিরে দেবদেবী ও মহাপুরুষদের চরিত্রাঙ্কন সম্ভব হলেও যে ভক্তিমাধুর্য ও আন্ত-রিকতা ফুটে উঠেছে চৈতন্যলীলা, প্রহ্লাদচরিত্র, নিমাইসন্ন্যাস ও বুদ্ধদেবচরিত নাটকে, তাতে স্বভাবতঃই মনে হয়, হয়তো নাস্তিকতার অন্তরালে ভগবদ্‌বিশ্বাসের অঙ্কুর নিঃশব্দে এমনকি গিরিশ-চন্দ্রের অজ্ঞাতে, তাঁর মনে ধীরে ধীরে গজিয়ে উঠছিল; উচ্ছৃঙ্খল জীবনের ক্লান্ত ও শ্রান্ত মন অবিশ্বাসের শূন্যতার গণ্ডি পেরিয়ে নির্ভরতা-পোতের সন্ধানে ফিরছিল। সেই অন্তর্বিরোধের অবসান ঘটালেন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ,—তাঁর চৈতন্যলীলা দেখতে এলেন। নূতন ভাবধারায় গিরিশচন্দ্রের জীবনে নূতন রঙ ধরল। যা তাঁর কল্পনার আদর্শ ছিল, যাঁর বাস্তব রূপ তিনি 'চৈতন্যলীলা'য় মানসচক্ষে দেখেছিলেন, তাঁর সজীব পরিপূর্ণরূপ শ্রীরামকৃষ্ণে প্রত্যক্ষ করে অপার্থিব প্রেমের স্পর্শে আত্মহারা হলেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে গিরিশচন্দ্রের এই রূপান্তর ঘটে।

কিন্তু ঘটনা ঠিক এত তড়িৎগতিতে ঘটেনি। যে বিশ্বাসের পাল তুলে গিরিশবাবু বাকি জীবন নিশ্চিন্ত হয়ে কাটিয়েছিলেন, যে ভক্তি-বিশ্বাসের গভীরতা দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তবৃন্দ স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন, তা হঠাৎ আবেগের মতো গিরিশ-বাবুর মনে উদিত হয়নি। তাঁর চরিত্র সে ধাতে গড়া ছিল না। চৈতন্যলীলার সময় তিনি প্রথম তাঁর সান্নিধ্যে আসেন, কিন্তু এ তাঁর শ্রীরামকৃষ্ণের তৃতীয় দর্শন। প্রথম দর্শন হয়েছিল ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে বসুপাড়ার দীননাথ বসুর বাড়ীতে। কৌতূহল-বশে সেখানে গিয়ে দেখেন যে কেশববাবু প্রমুখ অন্যান্য অনেকে সানন্দে তাঁর উপদেশ শুনছেন। সন্ধ্যাসমাগমে একজন সেজ জেলে এনে তাঁর সম্মুখে রাখলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'সন্ধ্যা হয়েছে?' শুনে গিরিশ ভাবলেন: 'ঢং দেখ! সন্ধ্যা হয়েছে সম্মুখে সেজ জ্বলছে, তবু বুঝতে পারছেন না যে সন্ধ্যা হয়েছে কি না।' সুতরাং আর থাকা নিষ্প্রয়োজন মনে করে বাড়ী ফিরলেন।

বলরাম-মন্দিরে কয়েক বৎসর পর তাঁর দ্বিতীয়

দর্শন। পৌরাণিক চিত্রাঙ্কনে নিপুণ নাট্যকার দেখলেন যেন বাস্তবের নিকট কাল্পনিক চিত্র মলিন হয়ে গেল। চৈতন্যলীলার মাধ্যমে তৃতীয় দর্শন-কালে শ্রীরামকৃষ্ণদেব স্বেচ্ছায় নিকটে এলেও সন্দেহ ও দম্ভের ঘোর কুজ্ঝটিকা ঠিক কাটেনি, ঠাকুরকে নিজ হ'তে প্রণাম, এমনকি নমস্কার করারও প্রয়োজনীয়তা বোধ করেননি। বলরাম-মন্দিরে চতুর্থ দর্শনের পর তাঁহার মনে হ'ল তাঁর দম্ভের বাঁধ যেন ভেঙে পড়ছে; হয়তো বা এই দেব-মানবের নিকট মস্তক নামাতেই হবে। গিরিশের মন স্তরে স্তরে উঠতে লাগল। পঞ্চম দর্শনে ঠাকুরের পদধূলি নিলেন ও জিজ্ঞাসু গিরিশকে অন্য কিছু না ছেড়ে বিশ্বাসের রাজপথে চলতে বললেন।

গিরিশচন্দ্র সে বিশ্বাস কোনদিন হারাননি। তিনি লিখেছেন "মন এখন আনন্দে পরিপ্লুত। যেন নূতন জীবন পাইয়াছি। পূর্বের সে ব্যক্তি আমি নই—হৃদয়ে বাদানুবাদ নাই। এই মহাপুরুষের আশ্রয়লাভ করিয়াছি, এখন ঈশ্বর-লাভ আমার অনায়াসসাধ্য। মহাভয়, মৃত্যুভয়, তাহাও দূর হইয়াছে।" এমনকি মাষ্টার মশাইও অবাক হয়ে গিয়েছিলেন যখন গিরিশকে বলতে শুনলেন, "প্রভু, তুমিই ঈশ্বর—মানুষদেহ ধারণ করে এসেছ, আমার পরিত্রাণের জন্য।" এই বিশ্বাসেই শ্যামপুকুরে কালীপূজার দিন ঠাকুরের পায়ে প্রথম পুষ্পাঞ্জলি দিয়েছিলেন, কল্পতরু হবার অল্পক্ষণ পূর্বে পদপ্রান্তে হাঁটু গেড়ে বসে উর্ধ্ব-মুখে করজোড়ে গদ্‌গদস্বরে বলেছিলেন, "ব্যাস-বাল্মীকি যাঁর ইয়ত্তা করতে পারেননি আমি তাঁর সম্বন্ধে আর কি বলতে পারি।" আমরা দেখতে পাই শ্রীরামকৃষ্ণের রোগশয্যার পাশে নাক কান মলছেন আর বলছেন "মহাশয়! নাক কান মলছি। আগে জানতাম না আপনি কে। তখন তর্ক করেছি, সে এক!" ঠাকুর বলেছেন গিরিশের "পাঁচসিকা পাঁচ আনা" বিশ্বাস। তিনি বিশ্বাসের তরঙ্গে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। 'গম্ভীরাত্মা' ডাক্তার সরকারের মতো তার্কিক মন নিয়ে অনমনীয়তার বেড়াজালে নিজেকে জড়িয়ে রাখেননি। তিনি সোজাসুজি ঠাকুরকে বলে-ছিলেন "মহাশয়, ওসব আমি বুঝি না। মনে করলে সব্বাইকে নির্লিপ্ত আর শুদ্ধ করে দিতে পারেন।" ঠাকুরের গলা হ'তে নির্গত পুঁজরক্ত দেখিয়ে বলেছিলেন, "এইবারে এই সব খেয়ে কীট পিপীলিকা পর্যন্ত উদ্ধার হয়ে যাবে, তাই এই রোগ।" বিজয় শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট চক্ষু বুজে ধ্যান করেন শুনে বলেছিলেন, যাঁকে পলকহীন নেত্রে দর্শন করা উচিত, তাঁর সামনে চোখ বুজে বসে থাকে, আবার কেমন লোক!"

আর শ্রীরামকৃষ্ণ? তিনি যেন তাঁর ভালবাসা উজাড় করে দিয়েছিলেন গিরিশকে। লাটুকে দিয়ে তামাক সেজে খাওয়াচ্ছেন, ফাগুর দোকানের গরম কচুরি খাইয়ে নিজ হাতে জল গড়িয়ে দিচ্ছেন, নিজের গলা হতে মালা খুলে তাঁকে পরিয়ে দিচ্ছেন, সুরাপানে অপ্রকৃতিস্থ গিরিশ ঘোড়ার গাড়ীতে কিছু ফেলে এসেছেন কি না দেখতে বলছেন, মত্ত অবস্থায় তাঁকে গালা-গালি করে যাওয়ার পরেও গিরিশের অনুতাপ-জনিত মনঃকষ্ট দূর করবার জন্য তাঁর কাছে ছুটে চলেছেন, এবং সর্বশেষে তাঁর বকল্‌মা নিচ্ছেন। গিরিশের প্রাণস্পর্শী ভাষায়—"তিনি আমায় আমার অপেক্ষা অধিক ভালবাসতেন।"

শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীকে রূপ দেবার চেষ্টা করে-ছিলেন গিরিশচন্দ্র তাঁর পরবর্তীকালে রচিত 'নসীরাম' 'মায়াবসান' 'ভ্রান্তি' ও 'শঙ্করাচার্য' নাটকে এবং নানা প্রবন্ধে। যতদিন তিনি বেঁচে-ছিলেন তাঁর গৃহ ছিল ত্যাগী ভক্তদের একটি আনন্দের স্থান। ঠাকুর ও স্বামীজীর কথায় মাতোয়ারা হয়ে থাকতেন জীবনের শেষদিন পর্যন্ত।

১৯১২ খৃষ্টাব্দের ৮ই ফেব্রুআরি এই মহাকবি "প্রভু! আমায় শান্তি দাও, আমায় তোমার বুকে টেনে নাও" বলে মহাপ্রয়াণ করেন।

ইলাপুত্র

[জৈন কথানক]

শ্রীগণেশ লালওয়ানী

সেকালে ইলাবর্ধন নামে এক নগর ছিল। সেই নগরে ধনদত্ত নামে এক শ্রেষ্ঠী ছিলেন।

শ্রেষ্ঠীর অনেক ঐশ্বর্য ছিল। কিন্তু মনে সুখ ছিল না। কারণ তাঁর কোনো সন্তান ছিল না। তাই তাঁর সেই এক ভাবনা—তাঁর মৃত্যুর পর কে তাঁর বংশে বাতি দেবে, কে তাঁর ঐশ্বর্য উপভোগ করবে।

ভাগ্যকে সুপ্রসন্ন করবার জন্য শ্রেষ্ঠী যে যা বলেছে তাই করেছেন। দান দক্ষিণা, পূজোর্অর্চা এমনকি সুদূর তীর্থযাত্রা পর্যন্ত তিনি করে এসেছেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয়নি। শেষে তিনি তাঁদের কুলদেবতা ইলাদেবীর মন্দিরে ধরনা দিলেন।

ধরনা দেবার পর ছ'দিন ছ'রাত কেটে গেল। শেষে সাত দিনের দিন রাত্রে শ্রেষ্ঠী স্বপ্ন দেখলেন। দেখলেন দেবী যেন তাঁর সামনে এসে উপস্থিত হয়েছেন আর বলছেন, তিনি অচিরেই পুত্রমুখ দর্শন করবেন।

দেবীর বরে বছর না ঘুরতেই সত্যি শ্রেষ্ঠীর এক পুত্র হল। ইলা দেবীর বরে পুত্র হয়েছে বলে শ্রেষ্ঠী তার নাম দিলেন ইলাপুত্র।

ইলাপুত্র ক্রমশঃ বড় হয়ে উঠল। শ্রেষ্ঠীর একমাত্র পুত্র বলেই নয়, তার স্বভাব ও সৌজন্যের জন্য সে সকলের প্রিয় হল। যেমন তার মেধা তেমনি তার বিনয়, যেমন সে কর্মঠ তেমনি সে কুশলও। রূপও তার কিছু কম নয়!

তাই শ্রেষ্ঠীর আনন্দের পরিসীমা ছিল না। তিনি ভাবছিলেন ভাগ্যের কথা। ভাগ্য শুধু তাঁকে বঞ্চনাই করেনি, দিয়েছেও অনেক কিছু। এবারে সংসারের দায়িত্ব ছেলের হাতে তুলে দিয়ে তিনি নিশ্চিন্ত জীবন যাপন করতে পারবেন।

কিন্তু না—তাঁকে নিশ্চিন্ত জীবন যাপন করতে দেওয়া বোধ হয় বিধাতার ইচ্ছা ছিল না।

ইলাপুত্র সেদিন ইন্দ্রমহল দেখে বয়স্যের সঙ্গে ঘরে ফিরছিল। হঠাৎ পথের ধারে লোকের ভিড় দেখে সেদিকে সে এগিয়ে গেল। দেখলে একটি নটের দল নানা ধরনের শারীরিক খেলা দেখাচ্ছে। লোক তাই চিত্রার্পিত হয়ে দেখছে।

বয়স্যের সঙ্গে ইলাপুত্রও সেই খেলা দেখতে লাগল। দেখল একটি লোক তর তর করে বাঁশের মাথায় উঠে গেল। বাঁশের আগায় একটি [illegible]রি রাখা। সেই সুপুরির ওপর সে তার দেহের ভারসাম্য রক্ষা করে গোল হয়ে ঘুরতে লাগল ও দু'হাতে ঢাল তলোয়ার নিয়ে নানা ধরনের খেলা দেখাতে লাগল।

তার খেলা শেষ হতে সামনে এগিয়ে এলো একটি মেয়ে। শ্রাবণের জলভরা মেঘের মতো তার চুল। শরতের ফুটন্ত পদ্মের পাপড়ির মতো তার চোখ। যে দেখল সেই বিস্মিত হ'ল।

ইলাপুত্রও কম বিস্মিত হয়নি। কিন্তু শুধু বিস্মিত হওয়াই নয়। দেখামাত্রই ইলাপুত্র ভালবেসে ফেলল সেই মেয়েটিকে।

মেয়েটি ততক্ষণে নাচতে শুরু করেছে। পায়ে পায়ে নূপুর বেজে উঠেছে। ঘুরে ঘুরে সে নাচছে। মণ্ডলাকার সেই নৃত্য।

তারপর এক সময় সেই নাচ শেষ হল, খেলাও। জনতার ভিড় ভেঙে গেল। নটের দলও পুরস্কার কুড়িয়ে চলে গেল। ইলাপুত্রও

ঘরে ফিরে এলো।

ঘরে ফিরে এলো কিন্তু কেমন যেন উন্মনা হয়ে রইল। তার চোখে ঘুম নেই, আহারে রুচি নেই। কিছুতেই সে ভুলতে পারছে না সেই মেয়েটিকে।

তার অন্যমনস্কতা চোখে পড়ল শ্রেষ্ঠীর। এ নিয়ে তিনি তাকে প্রশ্ন করলেন।

ইলাপুত্র কিছুই গোপন করল না। সমস্ত কথা খুলে বলল। বলল, সেই মেয়েটিকে না পেলে তার জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে।

শুনে শ্রেষ্ঠী দুঃখিত হলেন। তিনি তার জন্য ধনী শ্রেষ্ঠীর এক সুন্দরী মেয়ে দেখে রেখেছিলেন। ইলাপুত্রকে তিনি তাই অনেক বোঝালেন। কিন্তু ইলাপুত্রের সেই এক কথা. তাকে না পেলে তার জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে। শ্রেষ্ঠী তখন রাগ করে বললেন, যা ভাল বোঝ তাই কর।

ইলাপুত্র তখন তার বয়স্যকে দিয়ে সেই নটের দলের অধিকারীকে ডেকে পাঠাল। মেয়েটির কথা জিজ্ঞাসা করল।

অধিকারী বলল, মেয়েটি তারই।

ইলাপুত্র বলল, আমি ওই মেয়েটিকে বিয়ে করতে চাই।

অধিকারী সেকথা শুনে খুশী হল বলে মনে হল না। সে কি ভাবল তারপর বলল, আমি ওকে তারই হাতে দেব যে আমাদের একজন।

ইলাপুত্র বলল, তার মানে ?

তার মানে, যে আমাদের দলে থেকে খেলা দেখাবে তাকে। কারণ ও না থাকলে দল ভেঙে যাবে।

তার উপায় ?

উপায় ? ওকে যদি পেতে চাও তবে আমাদের দলে যোগ দাও।

ইলাপুত্রের উপায়ান্তর ছিল না, তাই সে পিতামাতার স্নেহ মমতা ও ধন ঐশ্বর্য সমস্ত কিছু পরিত্যাগ করে সেই নটের দলে যোগ দিল।

ইলাপুত্র এখন সেই দলেরই একজন। এখন সে নিজেই সেই খেলা দেখায়, একদিন যে-খেলা দেখে সে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। সে এখন তরতর করে বাঁশের আগায় উঠে যায়। বাঁশের মাথায় রাখা সুপুরির ওপর দেহের ভারসাম্য রক্ষা করে গোল হয়ে ঘুরতে থাকে ও দু'হাতে ঢাল তলোয়ার নিয়ে নানা ধরনের খেলা দেখায়। আরো ভালো খেলা। আরো সুন্দর খেলা। আরো রকমারি খেলা।

তার খেলার উৎকর্ষে সেই দলের খ্যাতি এখন চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। দূর দূর হতে খেলা দেখাবার জন্য তাদের আমন্ত্রণ আসে। রাজবাড়ীতেও ডাক পড়ে। অধিকারী তাই ভালও বাসেন ইলাপুত্রকে খুব।

কিন্তু আজো ইলাপুত্র বিয়ে করতে পারেনি সেই মেয়েটিকে। সে প্রশ্ন তুললে অধিকারী বলে, তার কি এত তাড়া ? আরো কিছুদিন যাক না।

আরো কিছুদিন করে গড়িয়ে যায় আরো ক'টা বছর। মেয়েটি আরো রূপসী হয়ে ওঠে।

সেদিন রাজবাড়ীতে খেলা দেখাতে এসেছে সেই নটের দল। রাজবাড়ীর মস্তবড় উঠোনে খেলা হবে। রাতভর খেলা। গিস্‌গিস্ করছে লোকজন।

মাঝ রাত তখন অতীত হয়ে গেছে। শেষ হয়েছে আর আর নটের খেলা। এবারে খেলা দেখাবে ইলাপুত্র।

ইলাপুত্র রাজাকে নমস্কার করে মেয়েটিকে কী বলে তরতর করে উঠে গেল বাঁশের আগায়। তারপর সুপুরির ওপর দেহের ভারসাম্য রক্ষা করে সে গোল হয়ে ঘুরতে লাগল দু'হাতে ঢাল তলোয়ার নিয়ে। দ্রুত আরো দ্রুত। নির্বাক্ বিস্ময়ে লোকে তাই দেখতে লাগল—অপলক

নেত্রে।

সকলেই দেখল, কিন্তু দেখলেন না কেবল রাজা। তাঁর চোখ গিয়ে পড়েছিল সেই মেয়েটির ওপর যখন ইলাপুত্র তার সঙ্গে কথা বলছিল। বিস্মিত হলেন রাজাও মেয়েটির অসামান্য রূপ দেখে। এই মেয়েটিকে তাঁর চাই-ই। কিন্তু এও বুঝতে পেরেছেন তিনি, তাঁর বাধা ইলাপুত্র। ইলাপুত্রকে তাই শেষ করে দিতে হবে।

ইলাপুত্র ততক্ষণে খেলা শেষ করে নীচে নেবে এসেছে। রাজার কাছে গিয়ে বলছে, আমার পুরস্কার ?

সকলেই ভাবছে রাজা তাকে অনেক ধনরত্ন দেবেন। কিন্তু না। রাজা তাকে পুরস্কার দিলেন না। বললেন, ইলাপুত্র, রাজ্যসম্বন্ধীয় একটি চিন্তায় মন হঠাৎ বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। তাই তোমার খেলায় মনঃসংযোগ করতে পারিনি। তুমি কি আমায় আর একবার খেলা দেখাতে পার না ?

কেন পারব না ? বলে ইলাপুত্র আবার বাঁশের আগায় উঠল। আবার সেই খেলা দেখাতে লাগল। আরো ভালো করে, আরো সুন্দর করে।

খেলা শেষ করে ইলাপুত্র দ্বিতীয়বার নেবে এল।

কিন্তু সেবারও সে পুরস্কার পেল না। রাজা সেই কথাই বললেন আবার। বললেন, লোকের হর্ষধ্বনিতে বুঝতে পারছি তোমার খেলা খুব সুন্দর হয়েছে। কিন্তু সে-খেলা আমি উপভোগ করতে পারিনি। তুমি আর একবার খেলা দেখাও।

রাগে ইলাপুত্রের শরীর এবার রী রী করে উঠল। কী চান রাজা তার কাছে ? কিন্তু মুখ ফুটে সে কিছু বলতে পারল না।

ইলাপুত্র তৃতীয়বার তাই উঠল বাঁশের আগায়। দ্রুত আরো দ্রুত সে ঘুরতে লাগল। রাত তখন প্রায় ভোর হয়ে এসেছে। লোকেরাও চিত্রার্পিত-স্থির।

খেলা শেষ করে তৃতীয়বার ইলাপুত্র রাজার কাছে গিয়ে পুরস্কার চাইল।

কিন্তু রাজা সেবারও তাকে পুরস্কার দিলেন না। বললেন, ইলাপুত্র, তুমি আর একবার খেলা দেখাও।

ইলাপুত্রের ইচ্ছা করল হাতের তলোয়ার দিয়ে সেই মুহূর্তেই সে রাজাকে টুক্‌রো টুক্‌রো করে ফেলে। একি অন্যায়! একি অবিচার! জনতার মাঝেও গুঞ্জন শোনা গেল। এমনকি রাণীও ক্ষুব্ধ হলেন। কিন্তু রাজার ইচ্ছা! কর-বার কিছু উপায় ছিল না।

আবার সেই বাঁশের আগায় উঠবে কি উঠবে না স্থির করতে পারছিল না ইলাপুত্র। তিন তিনবার সে বাঁশের আগায় চক্রাকারে ঘুরেছে। ফলে শিথিল হয়েছে তার দেহবন্ধ। মাথার ভেতর কেমন যেন ঝিমঝিম করছে। এরপর খেলা দেখানো, মৃত্যুকে হাতছানি দিয়ে ডাকা।

উত্তেজিত হয়ে সে ফিরে যাচ্ছিল কিন্তু অধি-কারীর মেয়েই তাকে শান্ত করল। বলল, ইলা-পুত্র, আমাদের পুরস্কার পেতে হবে। আমাদের সুনাম রক্ষা করতে হবে। তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে জানি, তবু আর একবার তোমায় উপরে উঠতে হবে। এই শেষ।

তবে তাই হোক—বলে, ইলাপুত্র চতুর্থবার সেই বাঁশের আগায় গিয়ে উঠল। আরো বেগে সে ঘুরতে লাগল। আরো দ্রুত। হঠাৎ তার মনে হল তার গলা কেমন যেন কাঠ হয়ে এসেছে।

না, এ পিপাসা সে জল দিয়ে শান্ত করবে না, রাজার রক্তে শান্ত করবে।

ইলাপুত্র যখন সেকথা ভাবছিল ঠিক সেই

মুহূর্তে সূর্যোদয় হল। ভোরের সুন্দর আলো সবখানে ছড়িয়ে পড়ল।

আর সেই সময় ইলাপুত্রের চোখ গিয়ে পড়ল রাজবাড়ীর প্রাচীরের সীমা পেরিয়ে অনেকদূরের এক শ্রমণের ওপর। শ্রমণটি এক গৃহস্থবাড়ীর দরজায় দাঁড়িয়ে জলভিক্ষা নিচ্ছিলেন। একটি সুন্দরী মেয়ে তাকে জল ঢেলে দিচ্ছিল।

ইলাপুত্র দেখল। দেখল শ্রমণটি কেমন অলিপ্ত। যে মেয়েটি তাকে জল ঢেলে দিল তার দিকেও তিনি চেয়ে দেখলেন না। তিনি জল নিলেন ও চলে গেলেন। কি শান্ত! কি নিরুদ্বিগ্ন!

ইলাপুত্র তখন নিজের কথা ভাবতে লাগল। ভাবতে লাগল রাজার চাইতেও তার ঐশ্বর্য কিছু কম ছিল না। সেই ঐশ্বর্য, পিতামাতার আশ্রয় পরিত্যাগ করে এ কি সে করে বেড়াচ্ছে! যে হাজারো অর্থীকে ভিক্ষা দিয়েছে সে আজ দরজায় দরজার পুরস্কার ভিক্ষা করছে। শুধু তাই নয়, তার জন্য তার নিজের জীবনকেও বিপন্ন করছে। কিন্তু কেন? কিসের জন্য? মেয়েটির ভাল-বাসা? সেও কি সে পেয়েছে? পেলে মেয়েটি তাকে আর একবার খেলা দেখাতে বলত না। মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে তাকে উত্তেজিত করত না।

মৃত্যুর কথা মনে হতে সংসারের অনিত্যতার কথা তার মনে এল। একদিন তারও মৃত্যু হবে। তবে কেন এই উঞ্ছবৃত্তি? জীবনের অপব্যয়। যে-সময় সে মেয়েটিকে পাবার জন্য ব্যয় করেছে সেই সময় যদি সে দিত নিজেকে পাবার জন্য, তবে সে এতদিনে সংসারবন্ধন হতে মুক্ত হতে পারত।

ইলাপুত্র যতই এসব কথা ভাবতে লাগল, ততই তার কর্মবন্ধন ক্রমশঃ ক্ষয় হয়ে যেতে লাগল। যতই ক্ষয় হয়ে যেতে লাগল, ততই সে উত্তরণের পথে ক্রমশঃ এগিয়ে যেতে লাগল। তারপর এক সময় সেইখানে সেই অবস্থায় তার সমস্ত কর্মবন্ধন ক্ষয় হয়ে গেল।

ইলাপুত্রের খেলাও সেই সঙ্গে শেষ হ'ল। সে বাঁশের আগা হতে ধীরে ধীরে নেমে এল। তারপর কারু দিকে না চেয়ে সেখান হতে সে গভীর অরণ্যের দিকে চলে গেল। মেয়েটির প্রসন্নতা কি রাজার পুরস্কার কোনোটিতেই তার আর প্রয়োজন ছিল না।

পাতাল রেল

[পূর্বানুবৃত্তি]

অধ্যাপক অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

নতুন গাড়ীর অধিকাংশই জোড়া কামরার (৫০ খানা)। প্রত্যেক কামরার দৈর্ঘ্য ৫৯ ফুট, প্রস্থ ৯ফুট ৬ইঞ্চি এবং রেল লাইনের থেকে উচ্চতা ১২ ফুট ৩ইঞ্চি। নবীনতম কামরার এক একটির ওজন ৩৬ টন—বসতে পারে ৪৮ জন এবং দাঁড়িয়ে যেতে পারে ৮২ জন। ১৯৬৬ খ্রীঃ-এর পরে যে সব পরিকল্পনা অগ্রাধিকার পেয়েছে তারা হল যথাক্রমে ২নং লাইনের দক্ষিণে তামিমাচি পর্যন্ত সম্প্রসারণ; ৪নং লাইনের তানাজি পর্যন্ত (৪¾ কিমি); ৫নং লাইনের উত্তরে আমোজা ও নাম্বা পর্যন্ত বিস্তার এবং একটি নতুন লাইন (৬নং) গঠন যেটির দৈর্ঘ্য ৭কিমি এবং উত্তর-দক্ষিণে ২নং ও ৩নং লাইনের সমান্তরাল।

নাগোয়া—জাপানে তৃতীয় বৃহত্তম নগরী—প্রায় ২০ লক্ষ লোকের বাস, আয়তন ১২২ বর্গমাইল। ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ৭৫.২ কিমি (৪৭ মাইল) পাতাল-পথ তৈরির পরিকল্পনা করা হয়। তার মধ্যে ১৪.৮ কিমি (৯¼ মাইল) লাইনের কাজ শেষ হয় ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দে। ১নং লাইন নাগোয়া মেইন লাইন ষ্টেশন থেকে শুরু হয়ে পূর্বদিকে শহরকেন্দ্রে অবস্থিত সাকিমাচি পর্যন্ত (২.৬৩ কিমি), তারপর সাকিমাচি থেকে ইকেশিতা পর্যন্ত (৩.৪৫ কিমি), ইত্যাদি বিভিন্ন পর্যায়ে তৈরী হয়েছে। লাইনটির মোট দৈর্ঘ্য ১৮.৫ কিমি (১১½ মাইল)।

২নং লাইন উত্তরে ওজোন থেকে পোতাশ্রয় পর্যন্ত ১৪.৪ কিমি (৯ মাইল) দীর্ঘ। এর ষ্টেশনগুলিতে প্রশস্ত ভূতল সম্মেলনক্ষেত্র (Sub-surface concourse) আছে সেখানে টিকিট ঘর, বিভিন্ন দোকানপাট ইত্যাদি আছে; সিঁড়ি দিয়ে আরো নেমে প্ল্যাটফরমে পৌঁছাতে হয়। দ্বীপাকৃতি প্ল্যাটফরমের দৈর্ঘ্য ১০০ থেকে ১১২ মিটার (অর্থাৎ ৩২৫ থেকে ৩৬৭ ফুট) এবং প্রস্থ ৯ থেকে ১১ মিটার (২৯ থেকে ৩৬ ফুট)।

তিন-কামরার গাড়ীগুলি সারাদিনই চলে; ভীড়ের সময় ছয়-কামরার গাড়ী চালাবার কথাবার্তা চলছে। প্রতি ষ্টেশনে থামবার সময় গড়পরতা মাত্র ২০ সেকেণ্ড। কিন্তু গতিবেগ ঘণ্টায় মাত্র ৩২.৩ কিমি (২০ মাইল)। ভীড়ের সময় ২মিনিট অন্তর এবং অন্য সময় ৪মিনিট অন্তর গাড়ী ছাড়ে। যে কোন দূরত্বের জন্য গাড়ী-ভাড়া সমহারে ২০ ইয়েন মাত্র। প্রায় অর্ধেক যাত্রীরই সিজ্‌ন্ টিকিট আছে। শহরের অনেকটাই সমুদ্রের থেকে নিচু (কোথাও কোথাও ৪ফুট পর্যন্ত); উচ্চতম বিন্দু সমুদ্রের থেকে মাত্র ৩৬৮ ফুট ওপরে। ভূ-নিম্ন মৃত্তিকা (sub-soil) অধিকাংশই জলপরিপূর্ণ বালি; এজন্য চওড়া রাস্তাগুলির নীচে খননাবরণ পদ্ধতিতে সুড়ঙ্গ তৈরী হয়েছে আয়তক্ষেত্রাকার বাক্সের ধরনে। দুই লাইনের মাঝে সারি সারি স্তম্ভ নির্মিত হয়েছে।

মোট ৬০ খানা গাড়ী। করিডোরওয়ালা তিন-কামরার গাড়ী। এদের মধ্যে ১৬টি করে নিয়মিত চালু থাকে। যখন যেগুলি চালু থাকে না তখন তারা থাকে ইকেশিতা ডিপোতে। প্রতি কামরায় দ্রাঘিম (longitudinal) আসন-ব্যবস্থা। এক একটি কামরায় বসে যেতে পারে ৩৬ জন আর দাঁড়িয়ে যেতে পারে ৮০ জন।

পরিকল্পিত ৩নং লাইন তৈরি হবে উত্তরে কামি-ওতাই থেকে দক্ষিণ-পূর্বে তেমপাকি পর্যন্ত—মোট দৈর্ঘ্য হবে ১৮.২ কিমি (১১¼

মাইল)। ৪ নং লাইনের দৈর্ঘ্য হবে ১৬·৮ কিমি (১০½ মাইল)—ওজোন থেকে কানাযামা পর্যন্ত। এটিকে ৫ নং লাইন সম্প্রসারিত করবে ফ্লেশিয়া পর্যন্ত। পরিকল্পনাগুলি সুসংহত ও সুবিন্যস্ত—অন্যান্য শহরের পরিকল্পনার মত বারে বারে পরিবর্তনের সম্ভাবনা তাই খুব কম। কিন্তু সবগুলির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার ও নির্মাণের সঠিক তারিখ এখনো স্থির হয়নি।

ক্যানাডা : মাত্র দুটি শহর- (টরোণ্টো ও মনট্রিয়াল) এ পাতাল রেল আছে।

টরোণ্টো—অন্টারিয়ো হ্রদের তীরে অবস্থিত তরুণ শহর এটি, ১৯২১ খ্রীঃ ১লা সেপ্টেম্বর টরোণ্টো ট্র্যান্সপোর্টেশন কমিশন গঠিত হয় এবং শহরের ৩৫ বর্গ মাইল এলাকার সমস্ত যাত্রী পরিবহনের ভার এর ওপর অর্পিত হয়। এই কমিশন খুব শীঘ্রই একটি পাতাল রেল নির্মাণের কাজও শুরু করে দেয়। ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে এই কমিশনের পরিবর্তে টরোণ্টো ট্রান্জিট কমিশন গঠিত হয় এবং তার হাতে শহর এবং উপকণ্ঠের ১২টি মিউনিসিপ্যাল এলাকার (মোট ২৪০ বর্গমাইল এবং ১৭½ লক্ষ লোক অধ্যুসিত) যাত্রী পরিবহনের সম্পূর্ণ ভার দেওয়া হয়। ক্যানাডার প্রথম পাতাল রেল এই শহরেই খোলা হয় এবং সেটি হল Yonge Street Line ১৯৫৪ খ্রীঃ ৩০শে মার্চ। এগ্‌লিংটন এ্যাভিন্যুর ভুগর্ভ টার্মিনাস থেকে শুরু হয়ে দক্ষিণে ১½ মাইল উন্মুক্ত পরিখার (trench) মধ্য দিয়ে গিয়েছে, তারপর আরো ৩ মাইল 'খননাবরণ' সুড়ঙ্গপথে চলে গিয়ে ইউনিয়ন ষ্টেশনে শেষ হয়েছে। ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে 'ইউনিভার্সিটি লাইন'টি খোলা হয়; এটি Yonge Street Line-এর সম্প্রসারণ। ১৯৬৬ খ্রীঃ পর্যন্ত মোট লাইনের দৈর্ঘ্য ছিল ৬½ মাইল; অবশ্য আরো ৮ মাইল (পূর্বপশ্চিমে Bloor Street-এর নীচে দিয়ে এবং Danforth Avenue বরাবর লাইন-সম্প্রসারণের কাজও দ্রুত চলছিল। তখনই আরো ৩ মাইল সম্প্রসারণের পরিকল্পনা অনুমোদিত হয়ে ছিল—তাহলে মোট দৈর্ঘ্য হবে ২ মাইল।

১৯৬৬ খ্রীঃ নাগাদ Yonge Street Line বছরে গড়ে ৭½ কোটি লোকের যাতাযাতের ব্যবস্থা করছিল, University Line ৮৫ লক্ষ লোকের এবং Bloor-Danforth Line-এর অনুমানিক যাত্রী সংখ্যা তখনই ছিল ১০ কোটির ওপরে। ইয়ঙ্গ ষ্ট্রীট ও ইউনিভার্সিটি লাইনের মোট ৮টি ষ্টেশনের মধ্যে St Patrick এবং Queen's Park যথার্থ ভূগর্ভ বা টিউবরেল; এছাড়া আর সবটাই অগভীর লাইন। ইউনিভার্সিটি লাইনের সব ষ্টেশনেই এসক্যালেটর আছে এবং ভূগর্ভে টিকেট ঘরও আছে। এ লাইনের প্রায় সবটাই খননাবরণ পদ্ধতিতে নির্মিত। শুধুমাত্র Osgoode Street এবং Queen's Park এর উত্তর প্রান্তে টিউব পদ্ধতিতে সুড়ঙ্গ তৈরী হয়েছে। এর কারণ হল, ঐ দু জায়গায় লাইনের গভীরতা এবং ঐ গভীরতার কারণ আবার সন্নিহিত হাসপাতাল ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রাসাদগুলিতে যাতে কোলাহল না পৌছায় এবং প্রাদেশিক পার্লামেণ্ট ভবনের underpinning এর সম্ভাবনা। এই টিউব অংশ রাস্তার থেকে ৩০ ফুট পর্যন্ত গভীর; কিন্তু 'খননাবরণ' (cut and cover) অংশগুলি মাত্র ৮ ফুট নীচেই।

টরোণ্টোর পরিবহন কর্তৃপক্ষ যুগের সঙ্গে তাল রেখে চলতে চান, এ তাঁদের আচরণ থেকেই বোঝা যায়। প্রথম ১০৪টি গাড়ী তাঁরা ব্রিটেনের কাছ থেকে নিয়েছিলেন। ইয়ঙ্গ ষ্ট্রীট লাইনের জন্য। এগুলি সবই লণ্ডন পরিবহনের গাড়ীগুলির অনুরূপ। প্রতিটি ৫৭ ফু ১½ ই লম্বা, ১০ ফু ৪ই চওড়া এবং রেল লাইন থেকে ১২ ফুট উঁচু— ৬২

জন যাত্রী বসতে পারে, আর দাঁড়িয়ে যেতে পারে ১৬৮ জন। কিন্তু ইউনিভার্সিটি এ্যাভিন্যু প্রান্তে যে সম্প্রসারণ হয়েছে, তার জন্য মন্‌ট্রিয়ালে ৩৬টি এ্যালুমিনিয়ম গাড়ীর অর্ডার দেওয়া হয়। মন্‌ট্রিয়ালের কারখানাই ক্যানাডার প্রথম পাতাল গাড়ীর কারখানা। এ কারখানার তৈরী গাড়ীগুলি অস্বাভাবিক লম্বা—৭৪ ফুট ৫৳ ইঞ্চি। প্রস্থ ১০ ফুট ৩২ইঞ্চি এবং উচ্চতা ১২ ফুট। প্রতিটিতে ৮৪ জন বসে যেতে পারে, আর দাঁড়িয়ে যেতে পারে ২২৬ জন।

মন্‌ট্রিয়াল—১৯৪০ এই শহরে প্রথম পাতাল রেল তৈরি করার প্রস্তাব করা হয়। তখন এর লোকসংখ্যা ছিল মাত্র ৫ লক্ষ; কিন্তু গাড়ীর ভীড় ছিল খুবই বেশী। ১৯৬১ লোকসংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ২০ লক্ষ, অথচ সব প্রস্তাবই নাকচ হয়ে যাওয়াতে তখনো পাতাল রেলের কাজ শুরুই হয়নি। ১৯৬২ খ্রীঃ ২৩শে মে প্রথম কাজ শুরু হয়। ৩টি লাইনে মোট ২১২ মাইল দীর্ঘ লাইন তৈরির ছক তখন ছিল এবং তার অধিকাংশটাই সুড়ঙ্গপথে (tunnel) হওয়ার কথা।

১ নং লাইন পূর্ব-পশ্চিম প্রসারী Atwater থেকে Frontenac পর্যন্ত। শহরের কেন্দ্রস্থল ভেদ করে চলে গিয়েছে ৪'৩৩ মাইল দীর্ঘ এই লাইন। ১৯৬৫ খ্রীঃ জানুআরি পর্যন্ত পাথর গুঁড়িয়ে (blasting rock) ৩২ মাইল সুড়ঙ্গপথ খনন করা হয়েছিল এবং তার মধ্যে ২ মাইলেরও বেশী কংক্রীটে বাঁধানো হয়ে গিয়েছিল। ২নং লাইন উত্তরে Henri Bonrassa থেকে শুরু হয়ে ১ নং লাইনকে ছেদ করে পশ্চিমে Bonaventure পর্যন্ত চলে গেছে—মোট দৈর্ঘ্য এর ৮'২২ মাইল; এর মধ্যে ৭ মাইলের খনন এবং ৫২ মাইলের কংক্রীট-বাঁধানো ১৯৬৫ খ্রীঃ জানুআরির মধ্যেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। ৪নং লাইন সেণ্ট লরেন্স নদীর নীচে দিয়ে (নদীখাতের ৪০ ফুট নীচে দিয়ে) চলে গেছে—Berri-de-Montigny থেকে পশ্চিমে Ile St. Helene পর্যন্ত। এটি ৩'০১ মাইল দীর্ঘ। ১৯৬৫ খ্রীঃ জানুআরির মধ্যেই ১৫২ মাইল টানেল খননের কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল এবং তার অর্ধেকেরও বেশী কংক্রীটে বাঁধানো হয়ে গিয়েছিল।

মন্‌ট্রিয়াল পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত। এই শহরের নীচে অবস্থিত ধূসরবর্ণ চূণাপাথর বিস্ফোরকের সাহায্যে উড়িয়ে দিয়ে পাতাল-রেলের ১৫২ মাইলের মধ্যে ১১ মাইল পথের টানেল খনন হয়েছে। অসমতল মাটির জন্য লাইনের গভীরতা বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রকম যেখানে বেশ খানিকটা মাটি আছে, সেখানে খননাবরণ পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে। রাস্তার উপরিভাগের যাতায়াতের (surface traffic) যাতে অসুবিধা না হয়, তার জন্য অপ্রধান রাস্তাগুলির নীচে দিয়ে এবং প্রধান রাস্তাগুলির সমান্তরাল করে পাতাল রেল নির্মিত হয়েছে। সুড়ঙ্গগুলি ২৩ ফুট ৪ইঞ্চি চওড়া এবং ১৬ফুট ৩ ইঞ্চি উঁচু। ২৬টি ষ্টেশন আছে মোট—তার প্রতিটিতে সুড়ঙ্গের প্রস্থ ৪৪ ফুট। প্ল্যাটফরমগুলি ৫০০ ফুট করে লম্বা—৯ কামরার গাড়ী পর্যন্ত ধরতে পারে। টিকেট ঘরগুলি সবই ভূনিম্ন, প্রবেশপথগুলিও (entrances) তাই। মোট ১২৫টি এসক্যালেটার বসানোর কথা কোথাও যাত্রীদের ১২ ফুটের বেশী সিঁড়ি ভাঙতে হবে না। Berri-de-Montigny ষ্টেশনটি তিনটি লাইনের সঙ্গে যুক্ত—ওখানে ২ নং লাইনের নীচে অবস্থিত ১নং লাইন এবং পাশে ৪ নং লাইন। ১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্বমেলার সময় ৪ নং লাইনের উদ্বোধন হয়।

প্যারিস এর পরেই মন্‌ট্রিয়াল পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম ফরাসীভাষী শহর। সুতরাং "Le

metro de Montreal" প্যারিস মেট্রোর আদর্শে গড়ে উঠেছে। RATP'র ইঞ্জিনিয়াররাও তাই প্রায়ই এ শহরে আসছেন এবং কারিগরি পরামর্শ দিচ্ছেন। মন্ট্রিয়ালে 'Canadian Vickers' কারখানায় গাড়ীগুলি সব তৈরি হচ্ছে; শতকরা ৮০ ভাগ সরঞ্জামই ক্যানাডার আভ্যন্তরীণ; বাকী সরঞ্জাম আসছে ফ্রান্স, ব্রিটেন ও সুইডেন থেকে। প্যারিসের মত pneumatic tyre-ওয়ালা বগি এখানেও ব্যবহার হচ্ছে। ভীড়ের সময় ৯-কামরার গাড়ী ১½ মিনিট অন্তর চলে। প্রত্যেক গাড়ী মোটর, ট্রেইলার ও মোটর স্থায়ীভাবে তিনটিতে যুক্ত এককে গঠিত। একটি এককের দৈর্ঘ্য ১৬৬ ফুট ৮½ ইঞ্চি। প্রত্যেক কামরায় ৪০ জন বসতে পারে এবং ১২০ জন দাঁড়াতে পারে। মোট ৩৬৯টি কামরা, ২৪৬টি মোটর এবং ১৮৩টি ট্রেইলার আছে—১৫০ অশ্বশক্তির দ্বারা চালিত। গাড়ীর সর্বোচ্চ গতিবেগ ঘণ্টায় ৫০ মাইল।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র (ইউ.এস.এ.): চারটি শহরে (নিউইয়র্ক, শিকাগো, ফিলাডেলফিয়া এবং বোষ্টন) পাতাল রেল আছে।

নিউইয়র্ক:—এই শতাব্দীর (বিংশ) গোড়াতে নিউইয়র্ক শহরের পরিবহন চলত elevated রেলপথে। ধীরে ধীরে তাদের তুলে দিয়ে বিকল্প হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে পাতাল রেল। বর্তমানে এলিভেটেড্ রেলপথের দুটি অংশ মাত্র অবশিষ্ট আছে—থার্ড এ্যাভিন্যু ও মার্ট্‌ল্ এ্যাভিন্যু লাইন দুটির কিয়দংশ। পৃথিবীর অন্য যে কোন পাতাল রেলের তুলনায় নিউইয়র্ক পাতাল রেল বেশী যাত্রী বহন করে; কিন্তু ভূপৃষ্ঠ পরিবহন ও পাতাল পরিবহন যোগ করলে লণ্ডনের স্থানই এখনো শীর্ষে। নিউইয়র্ক শহরের লোকসংখ্যা ৮০ লক্ষের ওপরে; কিন্তু নিউইয়র্ক মেট্রোপলিটান অঞ্চল ধরলে লোকসংখ্যা এর দ্বিগুণ অর্থাৎ সমস্ত যুক্তরাষ্ট্রের মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-দশমাংশ। মোটামুটি হিসেবে মানহাট্টান ব্যবসায় অঞ্চলের ৯ বর্গমাইল এলাকাতেই প্রতি-৯০ লক্ষ লোক যাতায়াত করে—তার মধ্যে অর্ধেক সংখ্যারই ভীড়ের সময় (rush hours)। রোববার ছাড়া সপ্তাহের প্রতিদিন পাতাল রেলের ৪৮৬টি ষ্টেশন দিয়ে গড়ে প্রায় ৫০ লক্ষ লোক চলাচল করে। পাতাল রেলের মোট দৈর্ঘ্য ২৩৭½ মাইল—তার মধ্যে সুড়ঙ্গপথে (tunnel) ১৩৪ মাইল।

দু'ধরনের গাড়ী চলে—১১-কামরার এক্সপ্রেস গাড়ী এবং ৮-কামরার লোক্যাল গাড়ী। এক্সপ্রেস গাড়ীগুলির গতিবেগ ঘণ্টায় ২০ মাইল; এরা মাত্র প্রধান প্রধান ষ্টেশনগুলিতে থামে। আর লোক্যাল গাড়ীগুলি সব ষ্টেশনেই থামে; তাদের গড়পরতা গতিবেগ ঘণ্টায় ১৬ থেকে ১৮ মাইল। অনেক রুটে চারটি করে লাইন আছে; কিন্তু কোন কোনটিতে তিনটি লাইনও আছে—২টি লোক্যাল গাড়ী চলবার জন্য এবং তৃতীয়টি এক্সপ্রেস গাড়ী চলবার জন্য (সকালের দিকে 'আপ' এক্সপ্রেস গাড়ীর জন্য এবং সন্ধ্যার দিকে 'ডাউন' এক্সপ্রেস গাড়ীর জন্য—দুইটিই ভীড়ের সময়)। প্রতি ঘণ্টায় এক একদিকে (আপ বা ডাউন) সর্বাধিক গাড়ীর সংখ্যা ৩২। পাতাল রেলের অধিকাংশটাই অগভীর এবং খননাবরণ পদ্ধতিতে নির্মিত। এসক্যালেটর বা লিফটের সংখ্যা লাইনের মোট দৈর্ঘ্যের অনুপাতে কমই বলতে হবে—মোট ৮২টি এসক্যালেটর এবং ২৪টি মাত্র লিফ্‌ট্ আছে।

পাতাল রেলের প্রাচীনতম অংশ হল ব্রডওয়ে এবং ফোর্থ এ্যাভিন্যু লাইন। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে এদের উদ্বোধন হয়। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণপূর্বে মানহাট্টান থেকে ব্রুকলীন পর্যন্ত লাইন সম্প্রসারিত হয়—এর নাম Interborough

System। দ্বিতীয় দফা পাতাল রেল তৈরি করেন "Brooklyn-Manhattan Transit Company" ১৯১৩ থেকে ১৯২০ খ্রীঃ-এর মধ্যে এবং তৃতীয় দফা নির্মাণ করেন "The City of New York" ১৯২৫ থেকে ১৯৩০ খ্রীঃ এর মধ্যে। শেষোক্ত প্রতিষ্ঠানটি ১৯৪০ খ্রীঃ জুন মাসে পুরনো দুই অংশের মালিকানাও নিয়ে নেয়। পরবর্তী-কালে "The New York City Board of Transportation" ট্রাম, বাস ও ট্রলিবাসের অনেক রুটও নিজের হাতে নিয়ে নেয়। ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে Board of Transportation-এর পরিবর্তে "The New York City Transit Authority" প্রতিষ্ঠিত হয়। এই নতুন কর্তৃপক্ষই বর্তমানে নিউইয়র্ক পাতাল রেলের তিনটি অংশকে পরিচালিত করেন, এমনকি elevated রেলপথের অবশিষ্ট অংশগুলোকেও। এ ছাড়া, নিউইয়র্কের বন্দর কর্তৃপক্ষ (Port Authority) হাডসন নদীর তলা দিয়ে দুটি রুটের পরিচালনা করে থাকেন—ডবল ট্র্যাকের এই দুটি রুটের মোট দৈর্ঘ্য ৮ মাইল; এতে বছরে যাত্রী চলাচল করে থাকেন ৩'১ কোটি জন; সুড়ঙ্গগুলির (tunnels) ব্যাস ১৫ ফুট এবং ১৮ ফুট।

সংকেত (সিগন্যাল) ব্যবস্থা স্বয়ংক্রিয়। বিশ্বমেলায় ব্যবহৃত Flushing Line-এ গাড়ী-চলাচল নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রোগ্রাম মেশিন ব্যবস্থা আছে। এটি লণ্ডন ট্র্যান্সপোর্ট ব্যবস্থার অনুরূপ। ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে ৪ঠা জানুআরি টাইম্‌স্ স্কোয়ার থেকে গ্র্যাণ্ড সেন্ট্র্যাল শাট্‌ল্ পযন্ত স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা পুরোপরি অবলম্বিত হয়।

এই পাতাল রেলের গাড়ীর কামরা-সংখ্যা মোট ৬৭০০, তার মধ্যে ৪৬০০টি ১৯৪৭খ্রীঃ-এর পরে এসেছে। পুরনো Interborough লাইন-গুলিতে সুড়ঙ্গপথগুলি সংকীর্ণ বলে কামরাগুলির দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা অপেক্ষাকৃত কম—যথাক্রমে ৫১ ফুট ৪ ইঞ্চি, ৮ ফুট ৯½ ইঞ্চি এবং ১১ ফুট ১১ ইঞ্চি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বেকার কামরাগুলি বদলে ফেলে ২৮৫০টি নতুন কামরা করা হয়েছে। অবশ্য ১৯৩৯-৪০ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্বমেলা উপলক্ষ্যে ক্রীত ৫০টিকে দ্রষ্টব্য হিসেবে রাখা হয়েছে। 'ব্রুকলীন-মানহাট্টান' এবং 'ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট' (Independent) লাইনের কামরাগুলি বৃহত্তর, তাই Interborough লাইনের কামরাগুলির সঙ্গে বদলাবদলি (interchange) করা যায় না। এখন মোটামুটি স্থির নীতি একটি অনুসৃত হচ্ছে—তাহল ৩৫ বছর একনাগাড়ে চলবার পর গাড়ী-গুলিকে একদম অবসর দিয়ে দেওয়া হবে। তদনুযায়ী বছরে গড়ে ২০০টি নতুন গাড়ী (কামরা) কিনতে হচ্ছে।

সর্বশেষে কেনা হয়েছে ৬০০টি বে-দাগ ইস্পাতের (Stainless Steel) Brightliner গাড়ী (কামরা)। এদের প্রতিটি ৬০ ফুট ৬ ইঞ্চি লম্বা, ১০ ফুট চওড়া এবং ১২ ফুট ২ ইঞ্চি উঁচু। দ্রাঘিম আসনে ৫০ জন করে বসতে পারে, হাতল (handgrips) ধরে ৬৮ জন দাঁড়াতে পারে এবং ভীড়ের সময় মোট ২২০ জন পর্যন্ত যেতে পারে। নিউইয়র্কে ষ্টেশনগুলি খুব কাছাকাছি হওয়ায় উচ্চ গতিবেগ অপ্রয়োজনীয়, কখনই ঘণ্টায় ৪০ মাইলের বেশী বেগে চলবার দরকার হয় না।

(ক্রমশঃ)

উদ্বোধনের পঁচাত্তর বৎসরে

স্বামী জীবানন্দ

পঁচাত্তর বৎসর কালগর্ভে প্রায় অন্তর্হিত
সেই দিন থেকে,
যেদিন বিবেকানন্দ 'উদ্বোধন' ক'রে প্রতিষ্ঠিত
দেন টিকা এঁকে ;
প্রভাময়ী কালজয়ী সে তিলক চির-সমুজ্জ্বল
বার্তাবহ-ভালে,
পত্রিকার গতি নহে রুদ্ধ আজো সুদৃঢ় সচল,
দৃষ্টি ভাবী কালে।

সুদীর্ঘ সময়ে এই কি করেছে কাজ 'উদ্বোধন'
প্রশ্ন জাগে মনে,
আদর্শের কতটুকু কর্মক্ষেত্রে সুষ্ঠু রূপায়ণ
বলিব কেমনে,
তবে জানি স্বামীজীর বাণী সে তো করেছে প্রচার
হয়ে অতন্দ্রিত,
ফলেছে সুফল তার দিকে দিকে ঘটেছে প্রসার,
বাণী সুরক্ষিত।

অশরীরী বাণীরূপে স্বামীজী যে সদা বিদ্যমান
পথের দিশারী,
'উদ্বোধন' অনুপম দেহ তাঁরে করেছে প্রদান,
করেছে শরীরী,
তাই তাঁর গ্রন্থ প'ড়ে বিদ্যুতের স্পর্শ অনুভূত,
জাগে যে চেতনা,
স্বার্থক্লিন্ন জড়প্রায় বুকে হয় নিঃস্বার্থ স্পন্দিত,
অপূর্ব মূর্ছনা!

স্বামীজী কি চেয়েছেন বা চাননি কি তা 'উদ্বোধন'
দিয়েছে জানিয়ে,

সাধারণ মানুষের কাছে কিছু রাখেনি গোপন
সদা নিঃসংশয়ে,
তাই আজ অধিকার বলিবার আছে সবাকার
লক্ষ্য এত দূরে,
জীবনের অগ্রগতি ব্যাহত না ক'রে বারবার
যাইব গভীরে।

স্বামীজীর যুগশঙ্খ 'পাঞ্চজন্য' তুমি 'উদ্বোধন',
তোমারে প্রণাম,
সেবায় তোমার যাঁরা করেছেন চিন্তা অনুখন
তাঁদেরো প্রণাম।

সমালোচনা

Swami Vivekananda: By Prof. Kamakhya Nath Mitra: Published by the Vivekananda Society, 151 Vivekananda Road, Calcutta-6: Pages 54+5 Price Re. 1·00.

পুস্তিকাখানি ১৯১২ খৃষ্টাব্দে বাঁকিপুর, পাটনায় প্রদত্ত গ্রন্থকারের একটি বক্তৃতারই মুদ্রণ, এবং প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল পরবর্তী বৎসর বা ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে। বর্তমান সংস্করণ হ'ল দ্বিতীয় সংস্করণ। ভূমিকায় বিবেকানন্দ সোসাইটির সভাপতি স্বামী নিরাময়ানন্দ লিখেছেন: ধুলোয় ভরা র‍্যাক থেকে পেড়ে এনে, ছাপিয়ে উঠতি-বিবেকানন্দ-অনুগামীদের উপহার দিলাম। প্রথম সংস্করণের মুখবন্ধে কামাখ্যানাথ মিত্র মহাশয় লিখেছিলেন: 'স্বল্প আয়তনের মধ্যে বিশ্ববিশ্রুত স্বামীজীর জীবন ও শিক্ষার মৌল বিষয়গুলির পরিচয় দেওয়া হয়েছে এ-রকম কোন পুস্তিকার কথা আমার জানা নেই।' কথাটা আজও সত্য এবং বলা যায় পুস্তিকাখানি মোটামুটি অর্ধশত পৃষ্ঠার মধ্যে স্বামীজীর জীবন, জীবনবেদ এবং বৃহত্তর জীবনে স্বামীজীর প্রভাবের পরিচয়-প্রদানের এক সার্থক প্রচেষ্টা। আবার শ্রীরামকৃষ্ণকে আলোচনায় না এনে স্বামীজীর অবদানের মূল্যায়ন করা অসম্ভব বলে স্বভাবতই শ্রীরামকৃষ্ণের প্রসঙ্গ এসে পড়েছে। অতএব, স্বল্প সময়ের মধ্যেই এই দুই যুগন্ধরের মোটামুটি পরিচয় পাওয়া যাবে।

পুস্তিকাখানিতে আছে স্বামীজীর কর্মযোগের পর্যাপ্ত ব্যাখ্যা; আর স্বামীজীর অদ্বৈত বেদান্তের প্রতিপাদ্য বিষয় কি তাও বিস্তৃতভাবে বলা হয়েছে। স্বামীজী সম্বন্ধে কতকগুলি ভ্রান্ত ধারণাও যুক্তির মাধ্যমে খণ্ডন করা হয়েছে।

গ্রন্থকারের ভবিষ্যৎ দৃষ্টি সত্যই প্রসংশনীয়। ১৯১২-১৩ খৃষ্টাব্দেই তিনি স্বামীজীকে 'The Great World-teacher and Prophet of New India' বলে আখ্যাত করেছেন। এ শ্রদ্ধাবানের দ্যোতক। ভাষা উনিশ শতকের ধাঁচের হলেও খুব সাবলীল। পণ্ডিত হয়েও গ্রন্থকার সাধারণের জন্যেই গ্রন্থখানি রচনা করেছেন।

প্রকাশন-কর্তৃপক্ষের কাছে বক্তব্য হ'ল যে মলাটের শেষ পৃষ্ঠায় গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত জীবনী থাকলে ভাল হ'ত।

—ডক্টর শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়

আয়ুর্বেদের প্রাথমিক জ্ঞাতব্য—কবিরাজ শ্রীবীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কবিরত্ন, জ্যোতির্ভূষণ। প্রকাশক: ডাঃ গোপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ডি. এম্. এস, ১৪ কালীকৃষ্ণ ঠাকুর রোড, কলিকাতা-৩৫। ১৮০ মূল্য পাঁচ টাকা।

আয়ুর্বেদ প্রাচীন ভারতের গৌরবের বস্তু। আলোচ্য গ্রন্থখানিতে আয়ুর্বেদ চিকিৎসা বিজ্ঞানের মহিমা সহজ সরলভাবে সর্বসাধারণের বোধগম্য করিবার উদ্দেশ্যে অভিজ্ঞ আয়ুর্বেদ-চিকিৎসক সুচিন্তিত গ্রন্থখানি প্রণয়ন করিয়াছেন। আয়ুর্বেদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস সুন্দরভাবে পরিবেশিত হইয়াছে। চরক সংহিতা ও সুশ্রুত সংহিতা রচিত হইবার পর কায়চিকিৎসা ও শল্যচিকিৎসার ক্ষেত্রে যে সকল সুচিকিৎসকের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন দৃঢ়বল, ভল্বনাচার্য, নাগার্জুন, বাগ্‌ভট্ট, মাধবকর, বৃন্দ, চক্রপাণি, চক্রদত্ত, শার্ঙ্গধর, জীবক, ভাবমিত্র, বঙ্গসেন প্রভৃতি। ইঁহাদের বিষয় উল্লেখ থাকায় পুস্তকের মর্যাদা বাড়িয়াছে, তবে এই সব যুগন্ধর চিকিৎসকগণ সম্বন্ধে জনসাধারণের নিকট আরো জ্ঞাতব্য বিষয় উপস্থাপিত হইতে ভাল হইত, অবশ্য ইহা আয়ুর্বেদের প্রাথমিক পুস্তক বলিয়াই এরূপ করা হয় নাই মনে হয়; পরবর্তী খণ্ড প্রকাশিত হইলে গ্রন্থকারের এই দিকটিতে দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে আশা করি। গ্রন্থে আয়ুর্বেদের মূল ভিত্তির সহিত আধুনিক বিজ্ঞানের নীতিগত পার্থক্য সম্বন্ধে যে মনোজ্ঞ আলোচনা রহিয়াছে, তাহা বর্তমান সময়ে খুব উপযোগী হইয়াছে। শেষাংশে 'টোটকার পল্লীছড়া' মনে রাখিতে পারিলে সাধারণ অসুখবিসুখে লোকের খুব কাজে লাগিবে। আয়ুর্বেদ-প্রচারে গ্রন্থকারের গবেষণামূলক গ্রন্থখানি বহুল প্রচারিত হউক।

উপনিষদ ভাবনা—(প্রথম খণ্ড) ডক্টর মহানামব্রত ব্রহ্মচারী। প্রকাশক: ব্রহ্মচারী শিশিরকুমার, সন্ত আশ্রম, কল্যাণী, নদীয়া। পৃষ্ঠা ৩২৮+২০। মূল্য পাঁচ টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থখানিতে সুধী লেখকের উপনিষদের উপর চিন্তাধারা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই খণ্ডে ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, ঐতরেয়, তৈত্তিরীয় ও শ্বেতাশ্বতর মূল-সহ আলোচিত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোন বিশেষ মতবাদের উপর জোর না দিয়া উপনিষদের মূল ভাবটিকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

গ্রন্থখানি পাঠ করিলে ভারতের আধ্যাত্মিক ভাবনার উৎস উপনিষৎ পাঠে আগ্রহ হইবে

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

শ্রীশ্রীদুর্গোৎসব

বেলুড় মঠে প্রতিমায় শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা মহাসমারোহে শান্ত আনন্দময় ও ভাবগম্ভীর পরিবেশে যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সপ্তমীপূজার পর হইতে আবহাওয়া ভাল থাকায় দর্শনার্থীর সংখ্যা বেশী হইয়াছিল। মহাষ্টমীর দিন দর্শনার্থীর সংখ্যা সর্বাধিক হয়। পূজার কয়দিন প্রত্যহই সকলকে হাতে হাতে অন্নপ্রসাদ দেওয়া হইয়াছিল, মহাষ্টমীর দিন প্রায় পঁচিশ হাজার ব্যক্তিকে।

এই বৎসর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের নিম্নলিখিত ২২টি কেন্দ্রে প্রতিমায় শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়:

আসানসোল, করিমগঞ্জ, কামারপুকুর, কাঁথি, গৌহাটি, জয়রামবাটী, জলপাইগুড়ি, জামসেদপুর, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, পাটনা, বারাণসী (অদ্বৈত আশ্রম), বালিয়াটি, বোম্বাই, মালদহ, মেদিনীপুর, রহড়া, লখ্নৌ, শিলং, শিলচর, শেলা (খাসিপাহাড়) ও শ্রীহট্ট।

সেবাকার্য

বাংলাদেশে সেবাকার্য: ১৯৭৩ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশে ৭টি সেবাকেন্দ্রের মাধ্যমে দুঃস্থ জনগণের সেবাকার্যে ত্রিশ লক্ষাধিক (৩০,০৭,৯৪০'৯৯) টাকা ব্যয়িত হইয়াছে, প্রাপ্ত দানসামগ্রীর মূল্য এই টাকার অন্তর্ভূত নয়।

গত আগস্ট মাসে অনুষ্ঠিত সেবাকার্য:

ঢাকা কেন্দ্রে চিকিৎসিত রোগীর সংখ্যা ৩,৩২৮। বিতরিত দ্রব্যাদি: মিল্ক-পাউডার ৭০০ পাউণ্ড, গ্ল্যাক্সো ২৫৬ পা, 'আস্ত্রা' ৬৫'২৫ কেজি, বিস্কুট ৬৪ কেজি, কম্বল ২,৩১৮, ধুতি ৫০, শাড়ী ১,৩৪৩, লুঙ্গি ৩৭, সোয়েটার ৫০২, মশারি ১৫, গামছা ৫, সার্ট ১, পুরাতন বস্ত্রাদি ২৬১, জুতা ১ জোড়া, সাবান ২০০ খণ্ড এবং বাসনপত্র ২০০।

বাগেরহাট কেন্দ্র কর্তৃক ৯টি গৃহ নির্মিত হয়। চিকিৎসিত রোগীর সংখ্যা ৯,৬৯২ এবং বিতরিত দ্রব্যাদি:

মিল্ক-পাউডার ৩৭৬'৫ পা, জেলি ৩৮ পা, বিস্কুট ১৪০ কেজি, কম্বল ৯২৬, ধুতি ২৯২, শাড়ী ২,৭৮৩, লুঙ্গি ২১৯, সোয়েটার ৭৭, পুরাতন বস্ত্রাদি ৪০০, সাবান ১৩৪ খণ্ড, পাঠ্য পুস্তক ২৩৪, শ্লেট ৩৫৮, কলম ১১৫, স্কেল ২৭২, লেড-পেনসিল ১৭৮, খাতা ৩০।

দিনাজপুর কেন্দ্র কর্তৃক ২,৬৬৫ জন রোগী চিকিৎসিত এবং ৩টি গৃহ নির্মিত হয়। বিতরিত দ্রব্যাদি: মিল্ক-পাউডার ৪৫০ পা, বিস্কুট ৪০'৫ কেজি, কম্বল ১,৩৪৭, ধুতি ২৬৫, শাড়ী ২,৪২৯, লুঙ্গি ৯০২, পুরাতন বস্ত্রাদি ৬৮৮, সাবান ২৭৭ খণ্ড, জুতা ৪০৯ জোড়া এবং ভিটামিন ট্যাবলেট ১,৩৫৩।

বরিশাল কেন্দ্রে ৬৪৭ জন রোগীর চিকিৎসা করা হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গে বন্যাত্রাণকার্য: মেদিনীপুর জেলার রামনগর, পিছাবালি ও দেবরা—এই তিনটি বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলে রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক গত ৯ই সেপ্টেম্বর হইতে সেবাকার্য শুরু করা হইয়াছে। এই জেলার ঘাটাল মহকুমাতেও সেবাকার্য সম্প্রসারিত হইয়াছে।

প্রতি সপ্তাহে প্রত্যেক পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিকে ২ কেজি ও প্রতি শিশুকে ১ কেজি করিয়া চাল দেওয়া হইতেছে। গত ৯ই সেপ্টেম্বর হইতে ১৯শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৩৪'৬৯ কুইণ্টাল চাল,

৩২'৩১ কুইঃ চিড়া, ৬'২৩ কুইঃ গুড়, ১'২০ কুইঃ লবণ, ৩৪টিন ও ৭৭ প্যাকেট বিস্কুট বিতরিত হইয়াছে। মিল্ক-পাউডার, শিশুদের পোশাক, শাড়ী প্রভৃতিও দেওয়া হইয়াছে। এই বন্যার্ত-সেবায় ১৯৭৩ সেপ্টেম্বরে জিনিসপত্রের মূল্য ছাড়া নগদ ব্যয়ের পরিমাণ ৮৫ হাজার টাকা।

কর্ণাটকে খরাত্রাণকার্য: ১৯৭৩ আগস্ট মাসে **বাঙ্গালোর** আশ্রম কর্তৃক ঘনগপুর ও করাজগী সেবাকেন্দ্রের মাধ্যমে ১,৯৯৫ জনকে প্রতি পক্ষকালে মাথা পিছু ৪ কেজি করিয়া খাদ্য-শস্য দেওয়া হইয়াছে। ৪৫ জন কুষ্ঠরোগীকে কম্বল-প্রদান উল্লেখযোগ্য।

গুজরাতে অনাবৃষ্টি ও খাদ্যাভাবের জন্য সেবাকার্য: রাজকোট আশ্রম কর্তৃক রাজকোট জেলায় ভাদলায় রান্না-করা খাদ্য বিতরণের জন্য যে পাকশালা (free-kitchen) খোলা হইয়াছিল, তাহাতে কয়েক মাস ধরিয়া ১৬ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রতিদিন প্রায় সহস্র ব্যক্তিকে খাওয়ানো হইয়াছে।

গুজরাতে বন্যার্তসেবা: রাজকোট আশ্রম কর্তৃক গুজরাতের পাঁচমহল জেলায় গত সেপ্টেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে বন্যাত্রাণকার্য আরম্ভ করা হইয়াছে। বন্যাক্লিষ্টদিগকে খাদ্য-বস্ত্রাদি দেওয়া ছাড়াও আবাসহীনদের পুনর্বাসনের জন্য প্রায় আড়াইশত গৃহ নির্মিত হইবে।

কার্যবিবরণী

কোয়েম্বাতুর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয় (Coimbatore-20) দক্ষিণভারতে সুবৃহৎ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয়ের সমতুল্য। ৪০০ একর পরিমিত বিশাল ভূখণ্ডের উপর গড়িয়া উঠিয়াছে: টিচার্স কলেজ, গবেষণা-বিভাগ, বেসিক ট্রেনিং স্কুল, শারীর শিক্ষা কলেজ, আবাসিক বহুমুখী বিদ্যালয়, উচ্চ বিদ্যালয়, কলা-নিলয়, গ্রামীণ শিক্ষা কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল, কৃষিবিদ্যালয়, আর্টস ও সায়েন্স কলেজ, শিল্পায়তন, অ্যালোপ্যাথিক রুর‍্যাল ডিসপেন্সারী, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, পুস্তক প্রকাশন বিভাগ প্রভৃতি।

১৯৭১-৭২ খৃষ্টাব্দের কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। শিক্ষায়তনগুলিতে আড়াই হাজারের বেশি ছাত্রছাত্রী অধ্যয়নের সুযোগ লাভ করিতেছে। ছাত্রাবাসগুলিতে সহস্রাধিক বিদ্যার্থীর থাকিবার ব্যবস্থা আছে। বিদ্যার্থি-বৃন্দের পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক। বিভিন্ন বিদ্যালয়ে মেধাবী ও দরিদ্র ছাত্রদের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা আছে। এখানে সুকুমারমতি তরুণদের শরীর মনের সুসম বিকাশ সাধনের চেষ্টা করা হয়।

কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থসংখ্যা চল্লিশ হাজারেরও বেশী। আলোচ্য বর্ষে পড়িবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে প্রায় ১৯,০০০ পুস্তক। ডিস্পেন্সারীতে চিকিৎসিত রোগীর সংখ্যা ২৩,৬১৭। বার্ষিক অনুষ্ঠেয় উৎসবাদি যথারীতি সুসম্পন্ন হয়।

দাতব্য চিকিৎসালয়ের উদ্বোধন

গত ২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩ অপরাহ্ণ সাড়ে পাঁচটায় বাংলাদেশে অবস্থিত বাগেরহাট রামকৃষ্ণ আশ্রমে দুঃস্থ জনগণের সেবাকল্পে একটি দাতব্য চিকিৎসালয়ের উদ্বোধনকার্য সুসম্পন্ন হয়। ক্যানাডার একটি জনকল্যাণমূলক সংস্থা 'ইউনিটেরিয়ান সার্ভিস'-এর সক্রিয় সহযোগিতায় এই সেবাপ্রকল্প গৃহীত হইয়াছে। আয়োজিত সভায় সরকারী ও বেসরকারী গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ ভাষণ দেন। স্বামী পরদেবানন্দ রামকৃষ্ণ মিশনের আদর্শ ও সেবার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেন। প্রধান অতিথি মহাপ্রশাসক জনাব মুহম্মদ নাসিম এবং ম্যাজিস্ট্রেট জনাব সাখাওয়াৎ হোসেন সেবাপ্রকল্প রূপায়ণে সরকারী সহযোগিতার পূর্ণ আশ্বাস প্রদান করেন। সমাগত ব্যক্তিগণের মধ্যে

অনেকেই চিকিৎসালয় তহবিলে উপযুক্ত অর্থসাহায্য করিতে ইচ্ছুক হন। উল্লেখযোগ্য যে, রামকৃষ্ণ মিশন ১৯৭২ খৃষ্টাব্দের মার্চ হইতে বাগেরহাট-সহ খুলনা জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে বস্ত্র, শিশুখাদ্য, ঔষধপথ্য প্রদান, গৃহনির্মাণ পরিকল্পনা, কলেজের ছাত্রছাত্রীদের জন্য পাঠাগারের ব্যবস্থা প্রভৃতি সেবামূলক কর্মে নিরত রহিয়াছেন।

স্বামী নিখিলানন্দের স্মৃতিসভা

নিউ ইয়র্ক রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ কেন্দ্রে গত ২রা সেপ্টেম্বর (১৯৭৩) রবিবার বেলা ১১টায় সম্প্রতি (২১শে জুলাই) পরলোকগত স্বামী নিখিলানন্দজীর (ঐ কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা) উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের জন্য একটি সম্মিলনের ব্যবস্থা হইয়াছিল। কেন্দ্রের সভ্য-সভ্যা ও বন্ধুবর্গের উপস্থিতিতে মন্দিরের প্রশস্ত হলটি ভরিয়া যায়। পূজাবেদিটি পুষ্পপত্রে সুন্দরভাবে সাজানো হইয়াছিল। বেদির নীচে স্বামী নিখিলানন্দজীর পুষ্পমাল্যশোভিত একটি বড় ফটো রক্ষিত হয়। কেন্দ্রের বর্তমান পরিচালক স্বামী আদীশ্বরানন্দ একটি প্রার্থনা দ্বারা সভার উদ্বোধনান্তে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজীর এবং কর্মসচিব স্বামী গম্ভীরানন্দজীর এই উপলক্ষ্যে প্রেরিত বাণীদ্বয় পাঠ করেন। অন্যান্য কয়েক-জন প্রাচীন সন্ন্যাসীর বাণীও পড়া হয়। সেণ্ট লুইস কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী সৎপ্রকাশানন্দজী, পোর্টল্যাণ্ড কেন্দ্রের স্বামী অশেষানন্দজী, বস্টন ও প্রভিডেন্স কেন্দ্রের স্বামী সর্বগতানন্দ, স্যানফ্রান্সিস্‌কো কেন্দ্রের স্বামী প্রবুদ্ধানন্দ, হলিউড কেন্দ্রের সহকারী নায়ক স্বামী অসক্তানন্দ, স্যাক্রামেণ্টো কেন্দ্রের স্বামী শ্রদ্ধানন্দ এবং লব্ধ-প্রতিষ্ঠ লেখক মিঃ জোসেফ ক্যামবেল তাঁহাদের ভাষণে স্বামী নিখিলানন্দজীর সহিত তাঁহাদের ব্যক্তিগত অনেক স্মৃতিকথা ব্যক্ত করেন। শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর ও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যান্য সন্ন্যাসী পার্ষদগণের সহিত স্বামী নিখিলানন্দজীর সংস্পর্শ ও প্রেরণা লাভ, তাঁহার সুগভীর পাণ্ডিত্য ও বাগ্মিতা, বেদান্তপ্রচারে তাঁহার অতন্দ্রিত নিষ্ঠা ও উদ্যম এবং ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে তাঁহার পুস্তক প্রণয়ন—বক্তাগণ পরলোকগত সন্ন্যাসীর জীবনের এই সব দিক উল্লেখ করেন। শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণকথামৃত গ্রন্থাবলীর সম্পূর্ণ ইংরেজী অনু-বাদ স্বামী নিখিলানন্দের চিরস্মরণীয় কীর্তি। সভায় কেন্দ্রের গায়কমণ্ডলী সুমিষ্টস্বরে সংস্কৃত স্তোত্রাদি আবৃত্তি করেন।

ঐ দিন এবং পরের দিন সোমবার ৩রা সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় অতিথি-সন্ন্যাসিগণ কেন্দ্রের বক্তৃতা হলে ভক্তদের নিকট 'যে সব মহাপুরুষের সঙ্গ লাভ করিয়াছি' এই বিষয় অবলম্বনে মনোজ্ঞ আলোচনা করেন। ভজনসঙ্গীতও পরিবেশিত হয়। ৪ঠা সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সর্ব-সাধারণের জন্য আর একটি সভা আয়োজিত হয়। বিষয় ছিল- শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দ। দুই ঘণ্টাব্যাপী এই আলোচনা সকলেরই হৃদয় স্পর্শ করিয়াছিল।

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-সংবাদ

গত ২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩ ত্রিবেণী বিবেকানন্দ সংঘে শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজের ১০৮তম জন্মোৎসব পূজা-পাঠাদির মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয়। আয়োজিত সভায় কয়েকজন বক্তা অভেদানন্দজীর জীবনের অনুপ্রেরণাময় দিক্‌গুলি বর্তমানের উপযোগী করিয়া আলোচনা করেন।

* * *

গত ২৮শে সেপ্টেম্বর সকালে মেদিনীপুর জেলার আরিট শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম প্রতিষ্ঠিত আরিট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নবনির্মিত ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন করেন স্বামী বিশোকাত্মানন্দ। বিদ্যালয়-ভবনে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিশেষ পূজা, ভজন, প্রসাদবিতরণ প্রভৃতি হইয়াছিল।

পরলোকে

ডাঃ নরনারায়ণ সরকার

বিহার প্রদেশের কাটিহার শহর নিবাসী ডাঃ নরনারায়ণ সরকার গত ১৬.৮.৭৩ তারিখে অপরাহ্ণ ৪টা ২৫ মিনিটের সময় ৭৩ বৎসর বয়সে সজ্ঞানে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন, ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীতে সস্ত্রীক দীক্ষালাভ করেন। কাটিহার রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের দাতব্য চিকিৎসালয়ের প্রতিষ্ঠার সময় হইতে তিনি চিকিৎসকরূপে দীর্ঘকাল আর্ত-নারায়ণের সেবাকার্যে নিরত ছিলেন। অর্থাগমের প্রতি উদাসীন থাকিয়া তিনি দরিদ্র রোগীদিগের সযত্নে চিকিৎসা করিতেন। তাঁহার দেহত্যাগের সংবাদ পাইয়া বহু গুণমুগ্ধ ব্যক্তি সমবেত হইয়া শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

মধুসূদন বসু

গত ২রা সেপ্টেম্বর বেলা ১০টা ১০ মিনিটে সেরিব্রাল থ্রম্বসিসে মধুসূদন বসু প্রায় ৮৪ বৎসর বয়সে সারদাপল্লীতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

তিনি ছাত্রাবস্থাতেই জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমায়ের কৃপালাভ করিয়াছিলেন। যৌবনে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের লীলাপার্ষদগণের অনেককে দর্শন করেন ও তাঁহাদের স্নেহলাভে ধন্য হন।

তাঁহার জন্মস্থান ছিল অধুনা বাংলা দেশে—ঢাকা জেলার অন্তঃপাতী বজ্রযোগিনী গ্রামে। ঢাকা জগন্নাথ কলেজ হইতে গ্রাজুয়েট হইয়া তিনি বিভিন্ন বিদ্যালয়ে যোগ্যতার সহিত শিক্ষকতা করেন। তাঁহার অক্লান্ত প্রচেষ্টায় বিনোদপুর পঞ্চশরে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপিত হয় এবং দেশবিভাগের পূর্ব পর্যন্ত তিনি এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক থাকেন। দেশবিভাগের পরেও আসামে ও অন্যত্র তাঁহার শিক্ষকতা-কার্য চলিতে থাকে। তিনি ছিলেন আজীবন শিক্ষাব্রতী।

গৌরচন্দ্র রায়

গত ৬ই সেপ্টেম্বর বেলা ৯টায় গৌরচন্দ্র রায় ৮৭ বৎসর বয়সে তাঁহার স্বগ্রাম বর্ধমান জেলার শাখারী গ্রামে ছাত্রছাত্রীদের পড়াইবার সময় সজ্ঞানে দেহত্যাগ করিয়াছেন। জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীতে তিনি শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজী মহারাজের নিকট মন্ত্রদীক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। পাঠ্যাবস্থায় কলিকাতায় থাকাকালে শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপার্ষদগণের সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্য তাঁহার হইয়াছিল। স্বামী সদানন্দজীর অসুস্থতার সময় তিনি খুব সেবা

করিয়াছিলেন। গ্রামের তরুণদের মধ্যে সর্বদা তিনি শ্রীশ্রীঠাকুর-স্বামীজীর ভাবপ্রচারে উৎসাহী ছিলেন। আজীবন শিক্ষাব্রতীর জীবনদীপ শিক্ষাদানকার্যে রত থাকা অবস্থাতেই নির্বাপিত হয়। তাঁহার ছাত্রগণের মধ্যে অনেকেই জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন।

পরলোকগত এই ভক্তগণের দেহনির্মুক্ত আত্মা শ্রীরামকৃষ্ণচরণে চিরশান্তি লাভ করুক।

ভ্রম-সংশোধন

আশ্বিন, ১৩৮০ সংখ্যা

পৃষ্ঠা	কলম	প্যারা	লাইন	এর স্থলে	এই পড়ুন
৪৫৫	—	—	১২	connot	cannot
৪৪৬	—	—	৯	অপরাগ	অপারগ
৪৮১	২	২	২০	দৈত্যগিরি	দৌত্যগিরি
৪৯৯	—		২০ }		
৫০০			৪ ও ১২ }	বঃ	নঃ
৫৪৯	পাদটীকা	৪-এর	২	পূজণীয় শিষ্যাগুরু	পূজনীয় শিক্ষাগুরু
৫৫৬	শিরোনাম			আমার কথা	আশার কথা
৫৫৬	১	৩	১	আমার কথা	আশার কথা
”	১	৫	৩	স্বজনী	সৃজনী
৫৫৭	১	২	২	জীবন	জীবনে
”	১	৬	১	বলছিলে	বলছিনে
”	১	৯	৩	অত্যাচারিত	অত্যাচারিতও
”	২	৭	১	অসুরে	অসুরের
৫৫৮	১	২	১	শাক্তি	শক্তি
”	১	৫	১	একাস্তিত্বভিত্তির	একাস্তিত্বভিত্তিক
”	২	২	১	প্রয়োজনটি	প্রযোজনটি
”	”	৩	২	কেন	কোন
”	”	৪	৩	অনুভূত	অনুস্যূত
৫৫৯	১	৩	১	কলাণ	কল্যাণ
”	১	৬	১	নানা	না না
”	২	৬	১	জায়গা	কারাগার
”	”	”	২	জায়গা	কারাগার

বিজ্ঞপ্তি : জন্ম-তিথিকৃত্য (১৩৮০)

শ্রীশ্রীমা	অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা সপ্তমী	১লা পৌষ	রবিবার	১৬. ১২. ৭৩
স্বামী বিবেকানন্দ	পৌষ কৃষ্ণা সপ্তমী	৩০শে পৌষ	সোমবার	১৪. ১. ৭৪
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব	ফাল্গুন শুক্লা দ্বিতীয়া	১২ই ফাল্গুন	রবিবার	২৪. ২. ৭৪
শ্রীশ্রীঠাকুরের আবির্ভাব মহোৎসব		১৯শে ফাল্গুন	রবিবার	৩. ৩. ৭৪

পথ চলাতেই আনন্দ
গোগো বুট ০৫
৩৮·৯৫
উইকএন্ড ৪৯
৩৮·৯৫
রাখী ৪৭
১৯·৯৫
১০
১২ ৯৫
জুতোর চটকে আর বৈশিষ্ট্যে
বাড়িয়ে তোলে এই
পথ চলায় আনন্দ।
সুঠাম সৌন্দর্যের সঙ্গে
মিশেছে এক মনোমুগ্ধকর
স্টাইল। পায়ে পরে সত্যিকারের
আরাম। বাটার দক্ষ
কারিগরদের হাত থেকে
ঠিক যেমনটা আশা
করা যায়, তেমন।
Bata

উদ্বোধন, পৌষ, ১৩৮০

বিষয়-সূচী

বিষয়-সূচী

ভাল চা বলতে
টসের
চা
এ, টস এণ্ড সন্স
কলিকাতা—১
ফোন
২২-৪৭৮৫

উদ্বোধন, ৭৬তম বর্ষ, ১৩৮০-৮১

নিবেদন

বর্তমান বৎসরের পৌষ মাসে 'উদ্বোধন' পত্রিকার ৭৫তম বর্ষ শেষ হইল। আগামী মাঘ (১৩৮০) মাসে পত্রিকা ৭৬তম বর্ষে পদার্পণ করিবে। পত্রিকার গ্রাহক-গ্রাহিকাগণকে জানানো যাইতেছে, তাঁহারা যেন আগামী ২৫শে পৌষের (৯ই জানুআরির) মধ্যে তাঁহাদের **পুরা নাম-ঠিকানা এবং গ্রাহক-সংখ্যা সহ** বার্ষিক চাঁদা ৮৲ টাকা মনিঅর্ডার করিয়া পাঠাইয়া দেন। **তৎপূর্বে, অগ্রহায়ণ সংখ্যায় সংলগ্ন কার্ডখানি যদি ইতিমধ্যে না পাঠাইয়া থাকেন, তাহা হইলে সেখানি যত শীঘ্র সম্ভব পূরণ করিয়া জানাইবেন।** মনিঅর্ডার যোগে বা লোক-মারফত টাকা পাঠাইবেন অথবা মাঘ মাসের পত্রিকা ভি. পি. পি. তে গ্রহণ করিতে চান; কার্ডটিতে ১০ পয়সার ডাকটিকিট আঁটিয়া পোস্ট করিবেন। ভি. পি. পি. তে লইলে ৯৲ টাকা ১০ পয়সা লাগিবে।

অনিবার্য কারণে কাহারও পক্ষে আগামী বৎসরে গ্রাহক থাকা সম্ভব না হইলে তাহা উক্ত কার্ডেই জানাইয়া দিবেন।

উক্ত তারিখের মধ্যে বার্ষিক চাঁদা ৮৲ টাকা না আসিলে অথবা কোন পত্র না পাইলে মাঘ মাসের পত্রিকা ভি. পি. পি.-তে পাঠানো হইবে। **ভি. পি. পি. ফেরত দিলে আমাদের অনর্থ ক্ষতি হয়।**

সুদীর্ঘ ৭৫ বর্ষ ধরিয়া উদ্বোধন-পত্রিকার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবপ্রচারের কাজে আপনাদের সহায়তা আমরা পাইয়া আসিতেছি। আশা করি উহা অব্যাহত থাকিবে।

অফিসে চাঁদা জমা দিবার সময়ঃ { সকাল ৭॥—১১টা, বিকাল ২॥—৫টা

(রবিবার অফিস বন্ধ থাকে)

কার্যাধ্যক্ষ

উদ্বোধন কার্যালয় *

১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা ৭০০০০৩

* উদ্বোধন কার্যালয় ১নং উদ্বোধন লেন-এর নিকটেই নূতন ভবনে স্থানান্তরিত হইয়াছে। চিঠিপত্রাদি পূর্বের ঠিকানাতেই পাঠাইবেন।

দিব্য বাণী

তয়া বিসৃজ্যতে বিশ্বং জগদেতচ্চরাচরম্। ৫৬
সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে॥ ৫৭
নিত্যৈব সা জগন্মূর্তিস্তয়া সর্বমিদং ততম্। ৬৪
তথাপি তৎসমুৎপত্তির্বহুধা শ্রূয়তাং মম॥
দেবানাং কার্যসিদ্ধ্যর্থমাবির্ভবতি সা যদা। ৬৫
উৎপন্নেতি তদা লোকে সা নিত্যাপ্যভিধীয়তে॥ ৬৬

—শ্রীশ্রীচণ্ডী, ১

মহামায়া সৃজেছেন এ জগৎ বিশ্বচরাচর,
প্রসন্না হইলে তিনি মুক্তিহেতু দেন নরে বর।
জন্ম-মৃত্যু নাই তাঁর—নিত্যা তিনি, তবু অগণন
রূপে তাঁর আবির্ভাব কহিতেছি করুন শ্রবণ।
দেবকার্য-সিদ্ধি-তরে আবির্ভূতা সে বিশ্বজননী
হন যবে, ভাবে সবে জাত বুঝি হইলেন তিনি।

ত্বমেব সূক্ষ্মা স্থূলা ত্বং ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণী।
নিরাকারাঽপি সাকারা কস্ত্বাং বেদিতুমর্হতি॥ ১৫
উপাসকানাং কার্যার্থং শ্রেয়সে জগতামপি।
দানবানাং বিনাশায় ধৎসে নানাবিধাস্তনূঃ॥ ১৬

—মহানির্বাণতন্ত্র, ৪

প্রকাশিত-অপ্রকাশ, স্থূল-সূক্ষ্ম সবই তুমি জগৎ-জননি,
নিরাকারা, সাকারাও,—কে তোমারে জানিবারে পারে মা তারিণি!
ভকতের প্রয়োজনে, জগতের কল্যাণ-কারণ,
দানব-বিনাশ-হেতু নানাবিধ দেহ তুমি কর মা ধারণ!

কথাপ্রসঙ্গে

শ্রীশ্রীমা

"এখানে যারা আসে, অনেকেই জীবনে বহু খারাপ কাজ ক'রে আসে। এমন কোন পাপ নাই যা তারা করে নাই। তবু, 'মা' ব'লে এসে দাঁড়ালে আমি সব ভুলে যাই, আর তারা যার যোগ্য নয়, তার চেয়েও বেশী তাদের দিয়ে ফেলি।" কথাগুলি শ্রীশ্রীমা নিজেই বলিয়াছেন।

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ এই সত্যই প্রকাশ করিয়াছেন অন্য ভাষায়: "মাকে ডাকবে, তাহলেই সব হয়ে যাবে। ঠাকুর কিন্তু বড় দুষ্টু,—একেবারে ঠিক ঠিক না হলে তাঁর কৃপা হয় না। মা বড় ভাল।" একথা তিনি বলিয়াছিলেন জনৈকা স্ত্রীভক্তকে, যিনি জীবনের প্রায় শেষ প্রান্তে আসিয়াও লক্ষ্যলাভ হইল না দেখিয়া আকাঙ্ক্ষিত উপলব্ধির জন্য তাঁহার কাছে প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

তিনি যে মা—ছেলের আব্দারে তিনি সাড়া না দিলে সে যাইবে কোথায়? ছেলে চাহিতেছে—ইহাই মায়ের নিকট যথেষ্ট—ছেলের যোগ্যতা-অযোগ্যতার প্রশ্নই মায়ের মনে ওঠে না। সেখানে কোন হিসাব নাই, আছে শুধু ক্ষমা। বাকী প্রায় সর্বত্রই হিসাব করিয়া দেওয়া-নেওয়া—কিছু দেওয়ার ব্যাপারে সকলেই, কবির ভাষায়, 'মাগে যে হিসাব, কেহ নাহি করে ক্ষমা।' ছেলের অন্তরের সূক্ষ্মতম বেদনও মায়ের হৃদয়ে সাড়া জাগায়। 'তুমি তো মা নও!'—শ্রীশ্রীমা জনৈক সেবককে বলিয়াছিলেন। তখন সময়-অসময়ে বহু ভক্ত আসিয়া নিজেদের দুঃখকষ্টের কথা শ্রীশ্রীমায়ের নিকট বলিত; এতক্ষণ ধরিয়া বসিয়া বসিয়া সে-সব শুনিতে মায়ের যে কষ্ট হইতেছে, সেদিকে কাহারো খেয়াল থাকিত না। সেবকটি এবিষয়ে প্রতিবাদ জানাইতে শ্রীশ্রীমা ঐ কথাটি বলিয়াছিলেন—'তুমি তো মা নও'—ছেলেদের জন্য, ছেলে যেমনই হউক, মায়ের ব্যাকুলতা যে কত গভীর তুমি তাহা কি বুঝিবে?

বুঝিতে চেষ্টা করিলে কিছুটা আভাসমাত্র আমরা হয়তো পাইতে পারি—নিজ নিজ জননীর নিকট যে স্নেহ আমরা পাইয়াছি, সেই স্নেহের কথা চিন্তা করিলে। আমাদের 'মা' কথাটির সঙ্গেই সেই স্নেহ চির-বিজড়িত, যাহাকে লক্ষ্য করিয়া ভগিনী নিবেদিতা বলিয়াছেন, "যে ভালবাসা কখনো কিছু পাইবার কথা ভাবে না, শুধু ভালবাসিয়াই তৃপ্ত হয়; যে ভালবাসা শুধু দান করিয়া চলে, প্রতিদানের অপেক্ষা রাখে না; যে প্রেম-বিকিরণ স্বপ্নেও আমাদের ধারণার অতীত, কিন্তু যাহার উজ্জ্বল চির-দীপ্তিকে অন্তর-বাহির আপ্লুত করিতে দিয়া আমরা চির-তৃপ্ত হই।" এই স্নেহকে অনন্তগুণ বাড়াইয়া ভাবিতে পারিলে যাহা হয়, শ্রীশ্রীমায়ের স্নেহ তাহাই। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যত মা আছে—মানবী মা, দেবী মা, পশুপক্ষী-কীট-পতঙ্গাদির মা—সকলের সন্তান-স্নেহকে একত্র করিলে যাহা হয়, তাহাও এই শ্রীশ্রীমা-রূপিণী জগজ্জননীর স্নেহের আংশিক বিকাশ মাত্র।

আমাদের ধারণাশক্তি যত অধিক হইবে, এই স্নেহের গভীরতা ও ব্যাপকতা তত অধিক পরিমাণে আমরা অনুভব করিতে পারিব। যতই তাঁহাকে 'আপন মা' বলিয়া ধারণা গভীর হইবে, ততই আমাদের হৃদয় এই স্নেহ-পারাবারের অস্তিত্ব অধিক পরিমাণে অনুভব করিতে পারিবে; যতই

আমাদের চিত্ত শুদ্ধ হইবে, ততই আমাদের দৃষ্টি ইহার বিস্তার ও গভীরতার দিকে অধিক প্রসারিত হইবে। ততই আমরা আন্তরিকভাবে 'মা' বলিয়া তাঁহার নিকট যাইয়া কিছু চাহিতে পারিব এবং চাহিবামাত্র তিনি তাঁহার অধ্যাত্ম-অনুভূতির অফুরন্ত রত্নভাণ্ডার খুলিয়া আমাদের প্রার্থিত রত্ন বাহির করিয়া দিবেন। জীবনে যত খারাপ কাজই আমরা করিয়া আসি না, সেগুলি খারাপ বলিয়া বোধ আসিবামাত্র শ্রীশ্রীমায়ের কাছে আসিয়া দাঁড়াইতে পারিলে তিনি আমাদের সব দোষ ভুলিয়া যাইয়া যাহা আমরা চাহিব তাহাই দিয়া দিবেন—যাহার যোগ্য নই তাহারও অধিক দিবেন। প্রয়োজন শুধু, আপন মা-রূপে, জন্ম-জন্মান্তরের মা-রূপে এখনো তিনি রহিয়াছেন—ইহাতে স্থির বিশ্বাস আনা, এবং খেলাঘরের চেয়ে তাঁহার কোলকে বড় আশ্রয় জানিয়া সেখানে উঠিতে চাওয়া।

তাঁহাকে জগজ্জননী বলিয়া জানিয়াও, তাঁহার ইচ্ছামাত্রই অমোঘ বাস্তবের রূপ নেয় ইহা জানিয়াও আমরা যদি তাঁহার কাছে খেলনা চাই, তাহাও তিনি দিবেন; কিন্তু সে চাওয়া তো হইবে 'রাজার কাছে লাউ-কুমড়ো চাওয়া'-র মতোই। খেলনা না চাহিয়া মাকে চাহিলে মা যে বেশী খুশী হইবেন, তাহাতে সন্দেহ কি? এ প্রসঙ্গে মা নিজেই বলিয়াছেন এক সময় যদিও এই ধরনের কথা কদাচিৎ তিনি বলিতেন—"... একটু ভোগ্যবস্তু পেলেই সন্তুষ্ট! বলে আহা, মায়ের কি দয়া!"

শ্রীশ্রীমা যে আমাদের সকলেরই মা, জন্ম-জন্মান্তরের মা, একথা তিনি বহু প্রসঙ্গে নিজেই বলিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ এবং তাঁহার সন্তানগণও নানাভাবে নানা ভাষায় বলিয়াছেন—যাঁহাকে জগন্মাতা, জগদীশ্বরী প্রভৃতি বলা হয়, কালী, দুর্গা, সরস্বতী প্রভৃতি বলা হয়, শ্রীশ্রীমা তিনিই। প্রত্যক্ষে, কল্পনায়, অনুমানে চেতন-অচেতন, স্থূল-সূক্ষ্ম যাহা কিছু আমাদের ধারণায়, চিন্তায় ভাসিয়া উঠে—যাহা কিছু নাম-রূপের মাধ্যমে প্রকাশিত—তাহার সবকিছুরই জননী তিনি, সবকিছু তাঁহা হইতে তৎকর্তৃক সৃষ্ট। আবার মন-বুদ্ধির, নাম-রূপের অতীতে যে সত্তা তাহাও তিনিই। মহানির্বাণ তন্ত্র যাঁহাকে বলিতেছেন, "ত্বমেব সূক্ষ্মা স্থূলা ত্বং ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণী, নিরাকারাঽপি সাকারা কস্ত্বাং বেদিতুমর্হতি" (স্থূল-সূক্ষ্ম, প্রকাশিত-অপ্রকাশিত যাহাকিছু আছে সে-সব তুমিই; তুমি নিরাকারা, সাকারাও; তোমাকে কে জানিতে পারে?)—তিনি সেই সত্তা—"নির্গুণা সগুণাপি চ"—নির্গুণা, সগুণাও। তিনিই আবার অবতার হইয়া আসেন। এই দৃষ্টিতে তিনিই শ্রীরামকৃষ্ণ—তিনি ও শ্রীরামকৃষ্ণ অভেদ—"ঠাকুরের সঙ্গে আমাকে অভেদ জানবে।"

তিনি সাকারও নিরাকারও, সগুণও নির্গুণও, শিবও শক্তিও, ব্রহ্মও মাকালীও—প্রভৃতি বিবৃতি-গুলি আমাদের প্রায় সকলেরই কাছে, চরম-উপলব্ধিমান মানুষ ছাড়া সকলেরই কাছে বিবৃতিমাত্র; ইহা ধারণায় আসে না, তাঁহার কৃপায় প্রত্যক্ষদর্শী-দের কথা ভাবিয়া কাহারো কাহারো বিশ্বাস হয় মাত্র। সর্বসাধারণের ধারণায় এই সত্যটি উপস্থা-পিত করিবার জন্যই একই সত্তার নির্গুণ ও সগুণ দুটি পৃথক 'আকার', দুটি পৃথক নাম-রূপ দেওয়া হইয়াছে। অথবা অন্য ভাষায়, "সাধকানাং হিতার্থায়" অরূপা-জননী দুটি পৃথক রূপ ধারণ করিয়াছেন,—শিব ও শক্তি, নারায়ণ ও লক্ষ্মী প্রভৃতি। ইহারা যে অভেদ, সে ধারণা স্থির রাখিবার জন্য পুরাণে প্রথমে উভয়কে একই নাম-রূপে, অর্ধনারীশ্বররূপে—একই দেহের অর্ধেক শিব অর্ধেক শক্তিরূপে দেখানো হইয়াছে। যতক্ষণ

আমরা নামরূপের—মন-বুদ্ধির এলাকা ছাড়াইয়া না যাইতে পারিতেছি, ততক্ষণ কোন স্থূল অবলম্বন ছাড়া—নাম-রূপ ছাড়া আমরা কোন কিছুর সম্বন্ধে ধারণাই করিতে পারি না। নাম ও রূপ ছাড়া চিন্তাই হয় না—হয় কথার আকারে না হয় রূপের আকারে বা উভয়ের মিলিত আকারে ছাড়া মনে কিছু উঠিতেই পারে না। গুণ, আকার প্রভৃতি যাহা কিছু, যাহা ছাড়া সৃষ্টি বা স্রষ্টার কোন অস্তিত্বের কল্পনাও আমরা করিতে পারি না, সত্যের সেই গুণান্বিত দিকটিকে আমরা 'শক্তি', 'মা', 'জগদীশ্বরী' প্রভৃতি রূপে ধারণাগ্রাহ্য করি, সেই একই সত্যের নির্গুণ দিকটির আভাস পাই 'ব্রহ্ম', 'নির্গুণা মা' প্রভৃতির মাধ্যমে, এবং ধারণাগ্রাহ্য করি 'শিব' রূপে। নিজ প্রত্যক্ষ উপলব্ধির ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া এই দৃষ্টিকোণ হইতেই স্বামী বিজ্ঞানানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণকে 'চৈতন্যস্বরূপ' এবং শ্রীশ্রীমাকে 'চিন্তাস্বরূপিণী' বলিয়াছেন। আবার উভয়কে অভেদও বলিয়াছেন।

নির্গুণ নিরাকার সত্তাই যে আমাদের সর্বংসহা ক্ষমারূপা কৃপা-পারাবার শ্রীশ্রীমা হইয়া আসিয়াছিলেন, শ্রীশ্রীমা নিজেও সেকথার ইঙ্গিত দিয়া গিয়াছেন,—'শেষে ঈশ্বর-টীশ্বর সব উড়ে যায়।' এটি আমাদের ধারণার অতীত জানিয়া তখনি আবার নাম-রূপের সীমার মধ্যে এই সত্যের সর্বোচ্চ ধারণা যাহা করা যায়, তাহাই বলিয়াছেন, 'মা মা, শেষে দেখে মা আমার জগৎ জুড়ে।' আমার দেহ নাই, চিন্তা নাই, সুখ-দুঃখের অনুভূতি নাই, বুদ্ধি নাই, জগৎ নাই, ঈশ্বরও নাই—অথচ আমার অস্তিত্ব আছে—ইহা আমরা ধারণা করিতে পারি না। কিন্তু 'তিনিই সব হইয়াছেন'—যাহা কিছু দেখিতেছি শুনিতেছি কল্পনা করিতেছি সে সবই, দেখা-শোনা-কল্পনা করার যন্ত্র আমার দেহ-মন-বুদ্ধি এবং তাহাতে 'আমি'বোধও তিনি হইয়াছেন, 'তিনিই জগতের উপাদান ও নিমিত্ত-কারণ দুই-ই'—'মা আমার জগৎ জুড়ে'—এটি আমরা ধারণা করিতে পারি।

এটুকুও যদি ধারণা করিতে না পারি, তাহাতেও ক্ষতি নাই। আমার জন্মদাত্রী মায়ের মতোই তিনি জগতের অন্য সব বস্তু হইতে, আমা হইতে পৃথক একজন 'মা', জন্মজন্মান্তরের মা—এই বিশ্বাসটুকু ঠিকমতো আসিলেই হইল। এই বিশ্বাস লইয়া চলা শুরু করিলেই উহাই আমাদের উপলব্ধির পথে ক্রম-অগ্রসর করাইয়া দেখাইয়া দিবে যে, মা আমার শুধু কোন মন্দিরে মূর্তিতে বা পটে আছেন তাই না, তিনি আমার দেহ-মন-বুদ্ধি-অহংকার জুড়িয়া, জগতের সব কিছু জুড়িয়াও রহিয়াছেন—'মা আমার জগৎ জুড়ে!' সেখান হইতেও অগ্রসর করাইয়া শেষে আমাদের উন্নীত করিবে মায়ের, আমাদের নিজেদেরও স্বরূপ-উপলব্ধিতে—যেখানে জগৎ তো নাই-ই, 'ঈশ্বর'-ও নাই, আমাদেরও পৃথক অস্তিত্ব নাই—জীব-জগতের সঙ্গে, মায়ের সঙ্গে সেখানে আমরাও একীভূত।

মায়ের কাছে চাহিতে গেলে এই চরম উপলব্ধির পথে যাহাতে তিনি আমাদের চলা শুরু করাইয়া দেন—যে যেখানে আছি সেখান থেকেই সম্মুখের দিকে—এইটি চাওয়াই তো ভাল। জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া মাকে ভুলিয়া বিষয়-ইন্দ্রিয় লইয়া যে খেলা আমরা খেলিয়া আসিতেছি, সে খেলা হইতে মন একটু না উঠিলে তাঁহার কাছে গিয়া 'মা বলিয়া' আমরা দাঁড়াতেই তো চাহিব না। জীবনের কোন পরম শুভ মুহূর্তে দাঁড়াইতেই যদি পারি, তাহা হইলে যেন কোন খেলনা—'সামান্য একটু ভোগ্যবস্তু'—না চাহিয়া স্বরূপ-বোধের দিকে আগাইয়া যাইবার ইচ্ছাটুকু, শক্তিটুকু চাই। যাহা পাইলে জীবনের আর সব পাওয়া তাহার নিকট তুচ্ছ বোধ হয়, মায়ের কাছে তাহাই যেন চাই।

এতদিন বহু ভুল করিয়াছি, বহু অন্যায় করিয়াছি বলিয়া ভাবিবার কিছু নাই, মাকে ভুলিয়া খেলিতে গিয়া মহাবিপদে পড়িলেও দুশ্চিন্তার কিছু নাই—যে কোন অবস্থায় ব্যাকুল হইয়া তাঁহাকে ডাকিলে, 'মা' বলিয়া তাঁহার কাছে গিয়া দাঁড়াইলে আমাদের সে ডাকে তিনি সাড়া দিবেনই—'ধুলা-কাদা মুছাইয়া' কোলে তুলিয়া লইবেন, বিপদ হইতে উদ্ধার করিবেন, আমাদের যোগ্যতা-অযোগ্যতার কথা ভাবিবেনই না। তিনি যে মা। 'শরৎও যেমন আমার ছেলে, আমজদও তেমনি'—ইহা তাঁহার মুখের কথা মাত্র নয়, তাঁহার বিশ্ব-জননীত্বেরই অনাবরণ প্রকাশ।

তাছাড়া বিপদের সময়, দুর্বলতার অক্ষমতার নগ্ন প্রকাশে অসহায়তার সময় মা ছাড়া আর কাহাকেই বা ডাকিবে সন্তান?—পূজার অন্য সব আয়োজন সারিয়া "ঘট ভরিতে" গিয়া পাঁকে যদি পা আটকাইয়া যায়, সেই নিরুপায় অবস্থায় "মা মা বলিয়া ডাকা ছাড়া" আর করিবারই বা থাকে কি?

"'মা' বলে এসে দাঁড়ালে আমি সব ভুলে যাই" —এই অভয় বাণীর মতো, বলা যায় এর চেয়েও বড় অভয়বাণী শ্রীশ্রীমা আমাদের শুনাইয়া গিয়াছেন, "মায়ের কাছে ছেলের কোন অপরাধ হয় না।" অনন্তশক্তিময়ী অথচ অপার স্নেহপারাবার শ্রীশ্রীমায়ের স্নেহের করুণার পরিচয় তাঁহার এই কয়টি শব্দের মাধ্যমে যতখানি প্রকাশিত হইয়াছে, অন্য কোন ভাষায় তাহার প্রকাশ সম্ভব কিনা জানি না।

"ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি এক ও অভিন্ন; যেমন অগ্নি ও তাহার দাহিকা-শক্তি। শাস্ত্রে এই ব্রহ্মকে বিরাট পুরুষ ও তাঁহার সহিত মিলিতা শক্তিকে জগদম্বারূপে বর্ণনা করিয়াছে। বেদোক্ত সন্ধ্যাদিতেও গায়ত্রীকে দেবী-রূপে ধ্যান করিতে বলা হইয়াছে। কারণ, এই বিরাট জগৎ ব্রহ্মের শক্তির খেলাতেই সমুদ্ভূত। সেই জন্য গায়ত্রীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে কোথায়ও বিরাট পুরুষ, এবং কোথাও সেই বিরাট পুরুষের শক্তি জগন্মাতা বলিয়া বর্ণনা আছে। সেই জন্য (পুরুষ ও তাঁহার শক্তি এক বলিয়া) ঐরূপ উভয়বিধ কল্পনায় Contradiction (বিরোধ) হয় না।"

স্বামী সারদানন্দ (পত্রমালা)

শ্রীশ্রীমা

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ

'ঠাকুর চৈতন্য-স্বরূপ, মা চিন্তা-স্বরূপিণী।'

'ঠাকুর ও মাকে অভেদ-দৃষ্টিতে দেখবে। মনে রাখবে, ঠাকুরের কৃপা না হলে মাকে পাওয়া যায় না, আবার তেমনি মায়ের কৃপা না হলেও ঠাকুরকে পাওয়া যায় না। ঠাকুর যেন নারায়ণ, মা যেন লক্ষ্মী। মার কাছে শক্তি চাইতে হয়। শক্তি না হ'লে কোন কাজ হয় না। ঠাকুরের কাছে শ্রদ্ধা ভক্তি চাইবে।'

'মা সর্বশক্তিময়ী।'

'আমাদের মা-ই Law (ভগবদ্‌বিধান)-রূপে বিরাজমানা। ···একেই (এই ভগবদ্‌বিধানকেই) খৃষ্টানরা Holy Ghost (ভগবানের বিভূতি) বলে, আর হিন্দুরা বলে শক্তি।'

'আমরা যা কিছু করি তা যেন মায়ের চরণ-কমলে অর্পণ করি। তাঁরই বাহ্যিক অভিব্যক্তি হচ্ছে দেশ-কাল-নিমিত্ত। তিনি বুদ্ধিরূপিণী হয়ে কি কর্তব্য তা বলে দেন ; আমাদের তা-ই করতে হবে দাদা, তা-ই করতে হবে !'

'মাকে ডাকবে। তাহলেই সব হয়ে যাবে। ঠাকুর কিন্তু বড় দুষ্টু। একেবারে ঠিক ঠিক না হলে তাঁর কৃপা হয় না। মা বড় ভাল।'

'মায়ের নাম জপ করি 'মা আনন্দময়ী' বলে।···তাঁর নামেতে ভক্তি, বিশ্বাস, শ্রদ্ধা, বুদ্ধি, ধন, দৌলত সবই লাভ হয়। চণ্ডীতেও আছে—তিনি ঋদ্ধি সিদ্ধি সব দিতে পারেন। ঠাকুরের নামের চাইতে মায়ের নামে আমি বল পাই বেশী।'

'মা তো রক্ষা করছেনই, ডাক আর নাই ডাক ! তবে ডাকলে আরো আনন্দে বিভোর হবে।···মাকে কায়মনোবাক্যে ডাকতে পারলে ভারি আনন্দ। এতে দাদা কোন সন্দেহ নেই।···মায়ের সেই আনন্দজ্যোতিঃ তো চারদিকে ওতপ্রোতভাবে রয়েছে ; আশ্চর্যের বিষয়, মানুষ তা উপলব্ধি করতে পারছে না।'

'আমি মা-ঠাকরুনের কাছে বেশী যেতাম না। স্বামীজী কি ক'রে তা জানতে পারেন। শ্রীশ্রীমা তখন বলরাম-মন্দিরে; সেখানে স্বামীজী একদিন আমায় জিজ্ঞেস করলেন, 'পেসন, মাকে প্রণাম করতে গিয়েছিলে?' আমি বললাম, 'না মশাই!' স্বামীজী বললেন, 'সে কি? এক্ষুণি যাও, মাকে প্রণাম ক'রে এসো।' তাই শুনে আমি তো মাকে প্রণাম করতে গেলাম; মনে মনে ভাবছি—কোন রকমে ঢিপ ক'রে প্রণাম ক'রে চলে আসব। মাকে প্রণাম ক'রে উঠতেই স্বামীজী পেছন থেকে বলছেন, 'সে কি, পেসন—মাকে এই ক'রে প্রণাম করতে হয়? সাষ্টাঙ্গ হয়ে প্রণাম কর; মা যে সাক্ষাৎ জগদম্বা!' বলেই তিনি সাষ্টাঙ্গ হয়ে মাকে প্রণাম করলেন।···আমি কিন্তু ভাবতেই পারিনি যে, স্বামীজী আবার পেছনে পেছনে আসবেন।'

'পূর্বে ভগবানকে পিতৃভাবে আরাধনা করারই ঝোঁক ছিল। মাকে ভক্তিশ্রদ্ধা সবই করতাম, কিন্তু বাপের দিকেই টান ছিল বেশী। এখন 'মা মা' বলি সকাল সন্ধ্যায়—আর মনে হয়, ঠিক যেন মায়ের কোলে শিশুর মতন আছি। তাঁর কোলেই বসে রয়েছি।'

'মা আমায় কোলে ক'রে রেখেছেন—সদা রক্ষা করছেন। দেখ না, এই তিপ্পান্ন বছরের মধ্যে মা নিজের মোহিনী মূর্তি আমায় দেখাননি। এমনকি অনেক দূরে কোন বিপদের সম্ভাবনা থাকলেও চট্ ক'রে তা বুঝিয়ে দেন, আর আমায় চতুর্দিকে বেষ্টন ক'রে রাখেন। তার ভেতর অমঙ্গল আসার সাধ্য নেই।'

'সব রকমই তো কিছুটা করা গেল, এখন ঠাকুর আর মা-ই সম্বল। তাঁদের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর ক'রে পড়ে আছি। এখন এই মনে হচ্ছে, যেন তাঁদের নাম ক'রে ক'রে বাকী জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারি।'*

* 'স্বামী বিজ্ঞানানন্দ—জীবন ও বাণী' গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত।—সঃ।

"কার্যের ভিতর দিয়া কি করিয়া তাঁহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া থাকিবে, তাহা ভিতরে চেষ্টা থাকিলে কাজ করিতে করিতে আপনিই বুঝিতে পারিবে।"

"ধ্যান করিতে বসিলে অনেক সময় কাজের কথা মনে আসে লিখিয়াছ; সকলের মনের ঐরূপ দশা। কাজ ছাড়িয়া বনে যাইলেও উহার হাত হইতে নিস্তার পাইবে না। তবে ঈশ্বর-কৃপায় 'সংসার অনিত্য' এ কথা মনে দৃঢ় অঙ্কিত হইলে এবং তিনি আমার একমাত্র গতি—এই ভাবটি প্রাণে চাপিয়া বসিলে ধ্যানের সময় মনের ঐরূপ চাঞ্চল্য অনেক কমিয়া যাইবে।"

"আত্মোন্নতি-সাধনের একটি পথ কর্ম. একথা নিশ্চয়; কিন্তু কর্ম দ্বারা চিত্তের যে বিক্ষেপ ও চাঞ্চল্য উপস্থিত হয় তাহা নিবারণের একমাত্র উপায় ঈশ্বরের বা উচ্চ বিষয়ের চিন্তা ও চর্চা।"

"ধর্মজীবনের যাহা সার পদার্থ—শ্রীভগবানকে প্রাণের সহিত ভালবাসা, তাহার কতদূর কি করিতেছ? যাহাতে তাহা লাভ করিতে পার, তাহার জন্য চেষ্টা কর। তাহা না হইলে যাহাই কর না কেন, সকলই বৃথা।"

"শ্রীশ্রীঠাকুরের পাদপদ্মে যে ষোল আনা মন অর্পণ করিতে পারে তাহার দ্বারাই তিনি যথার্থ জনসেবা করাইয়া লন। নতুবা মতলব আঁটিয়া কেহ কখনও উহা ঠিক ঠিক করিতে পারে না। অতএব তাঁহাকে যাহাতে সর্বস্ব দিতে পার তাহার দিকেই সর্বাগ্রে লক্ষ্য রাখ।"

"তোমার দ্বারা শ্রীশ্রীমা যদি কিছু করাইয়া লন তাহা তো তোমার পরম সৌভাগ্য। ঐ সকল কার্য করিতে যাইয়া নিজের আমিত্ব যদি কিছু আসে তাহা হইলে তিনিই দূর করিয়া দিবেন।"

"আত্মসমর্পণই শ্রেষ্ঠ পূজা।"

—**স্বামী সারদানন্দ (পত্রমালা)**

শ্রীশ্রীমা ও তাঁর ভারী

স্বামী জীবানন্দ

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাসঙ্গিনী। শ্রীশ্রীমা সকলের মা, জন্মজন্মান্তরের মা, চিরকালের মা, তিনি তো শরণাগত সকলের ইহ-পরকালের ভার নিয়েছেন, তাঁর কৃপায় ভববন্ধন ঘুচে যায়, তাঁর ভার আবার কে নেবেন ? শ্রীশ্রীমায়ের ভারী —কথাটি যেন কেমন, ঠিক বোঝা যায় না! তবে শ্রীশ্রীমায়ের উক্তি গূঢ় অর্থবহ, গভীর তাৎপর্যবোধক নিঃসন্দেহ! নরলীলায় যখন অবতীর্ণা তখন সাধারণ মানুষের মতো জীবনযাপন; তা হলেও ছোটখাটো প্রত্যেকটি সাধারণ কর্মের মধ্যেও অসাধারণত্ব বিদ্যমান! জীবনধারণের জন্য তাঁরও তত্ত্বাবধান প্রয়োজন। শ্রীশ্রীমা বলেছেন—'শরৎ আমার ভারী'।

শরৎ মহারাজ—স্বামী সারদানন্দজী। দক্ষিণেশ্বরে তাঁর কোলে একদিন ব'সে শ্রীরামকৃষ্ণদেব দেখেছিলেন তাঁর ভার নেবার শক্তি কতখানি —তাইতো দেখা যায় পরবর্তী সময়ে কী বিপুল শক্তিতে অসামান্য কাজ ক'রে চলেছেন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের এই লীলাপার্ষদ স্থিতপ্রজ্ঞ সন্ন্যাসী— শ্রীরামকৃষ্ণ মঠমিশনের কার্য পরিচালনা, সেবাকার্যে কর্মীদের অনুপ্রেরণা প্রদান, মাতৃসেবা, 'লীলাপ্রসঙ্গ' রচনা আরও কত কী ?

স্বামী সারদানন্দের বিরাট কর্মময় জীবনের একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য দিক শ্রীশ্রীমায়ের সেবা।

শ্রীশ্রীমায়ের উক্তি : আমার ভার নেওয়া কি সহজ ? শরৎ ছাড়া ভার নিতে পারে এমন তো দেখিনি! সে আমার বাসুকি—সহস্র ফণা ধ'রে কত কাজ করছে; যেখানে জল পড়ে সেখানেই ছাতা ধরে।'

শ্রীশ্রীমায়ের শেষ জীবনের দেখাশোনার ভার মূলতঃ স্বামী সারদানন্দ মহারাজের উপর ন্যস্ত ছিল। তিনি জীবনে মাতৃসেবার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন ক'রে চিরস্মরণীয়।

শ্রীশ্রীমায়ের সেবা বলতে শুধু তাঁর দেখাশোনা করাই নয়, জয়রামবাটীতে তাঁর পিতৃগৃহে উদ্ভূত যে-কোন সমস্যার সমাধান, জয়রামবাটীতে ও কলকাতায় শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী তৈরি করানো ভক্তমণ্ডলীর তত্ত্বাবধানও এই সেবার অন্তর্ভূক্ত।

যাঁরা অবতার-পুরুষ বা তাঁর লীলাসঙ্গিনীর সেবায় নিরত হবার দুর্লভ সৌভাগ্যলাভে ধন্য হন, তাঁদের সাধনা ও সুকৃতির ফলে ভগবৎকৃপা অজস্রধারায় তাঁদের উপর বর্ষিত হয়!

সারদানন্দজীর জীবনে দেখা যায়, নরলীলায় অবতীর্ণা জগজ্জননীর সেবা, শিবজ্ঞানে জীবসেবা, সঙ্ঘমূর্তি শ্রীরামকৃষ্ণ-মঠমিশনের সেবা সমকালে সমনিষ্ঠায় সমানভাবে অনুষ্ঠিত। 'অনন্ত প্রশান্তির মধ্যে প্রচণ্ডকর্মশীলতা'-রূপ নিষ্কাম কর্মযোগের যে সূত্র স্বামীজী দিয়েছেন, স্বামী সারদানন্দ তার সজীব ও প্রাঞ্জল ভাষ্য! সম্পূর্ণ অনাসক্ত ও নিরলস ব'লেই তাঁর পক্ষে এত কাজ একসঙ্গে সমান নিষ্ঠায় করা সম্ভব।

শ্রীশ্রীমায়ের প্রতি সারদানন্দজীর কি অপরিসীম ভক্তি ও শ্রীশ্রীমায়ের তাঁর প্রতি কি অভাবনীয় স্নেহ—লেখনীমুখে তার পরিচয় দেওয়া দুঃসাধ্য!

কলকাতায় বাগবাজারে শ্রীশ্রীমায়ের বাটী নির্মিত হ'লে ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ২৩শে মে নিজের বাড়ীতে প্রথম শুভাগমন ক'রে বাড়ী দেখে আনন্দ প্রকাশ করেন শ্রীশ্রীমা; নূতন বাড়ীতে পদার্পণ করেই একান্ত শরণাগত সন্তান সারদানন্দকে

উৎফুল্ল হৃদয়ে অজস্র আশীর্বাদ করেন। শ্রীশ্রীমায়ের উদ্দেশ্যে নির্মিত ভবনে তাঁকে আহ্বান ও আনয়ন করতে পেরে সারদানন্দজীর অত্যন্ত আনন্দ; মাতৃবৎসল সন্তান আপনার শ্রম সার্থক মনে করলেন, নিজেকে মায়ের বাড়ীর 'দরোয়ান' মাত্র জ্ঞান ক'রে জগজ্জননীর তৃপ্তির জন্য পূর্বের মতো সমস্ত কর্ম করতে লাগলেন; এখন তাঁর কর্মশক্তি বহুগুণে বৃদ্ধি পেল।

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী থেকে গঙ্গা অতি নিকটে, গঙ্গাস্নানের খুবই সুবিধা, আবার ছাদে উঠলেই গঙ্গাদর্শন, দূরে দৃষ্টি প্রসারিত হ'লে দক্ষিণেশ্বরের আকর্ষণ, তাই শ্রীশ্রীমায়ের আনন্দ।

শ্রীশ্রীমায়ের অল্পায়ত বাড়ীখানিতে সর্বদা ভক্তসমাগম, তবু অনাবিল প্রশান্তি ও ভাবগাম্ভীর্য বিরাজিত। শত শত ভক্ত নরনারী শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করতে এসে তাঁর শ্রীচরণে ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদন করতেন, তাঁর আশীর্বাদে শোকতাপ দুঃখ দৈন্য ভুলে যেতেন; প্রত্যেকে 'আবার এসো' শ্রীশ্রীমায়ের এই মাধুর্যমাখা স্নেহপূর্ণ কথা শুনে প্রফুল্ল অন্তরে বিদায় নিতেন। স্বভাবতঃ গম্ভীরপ্রকৃতি 'শ্রীশ্রীমায়ের দ্বারী' স্বামী সারদানন্দের দর্শনে সকলেরই সমীহ, কিন্তু তাঁর সঙ্গে আলাপ ক'রে মনে হ'ত—পরম আপন জন, অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর মতো তাঁর স্নেহধারা! শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী ভক্তগণের নিকট অপার্থিব শান্তি ও আনন্দের নিকেতন!

শ্রীশ্রীমায়ের দ্বারী! স্বেচ্ছায় গৃহীত 'দরোয়ানে'র কাজ সব সময় সুখকর ছিল না। এক দিনের একটি স্মরণীয় ঘটনায় সারদানন্দজীর মাতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা, অপূর্ব কর্তব্যপরায়ণতা ও মহাপুরুষত্ব প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করবার জন্য জনৈক ভক্ত বেলা তিনটায় সমাগত। শ্রীশ্রীমা অন্যত্র গিয়েছিলেন, মাত্র কয়েক মিনিট আগে ফিরে একটু বিশ্রাম নিচ্ছেন। সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে আছেন সারদানন্দজী। ভক্তকে গমনোদ্যত দেখে নিষেধ করলেন তিনি। যুবক ভক্ত উত্তর দিলেন, 'মা আপনার একার?'...

উপরে গিয়ে শ্রীশ্রীমায়ের দর্শন ও শ্রীচরণ বন্দন হয়েছে, কিন্তু কৃতকর্মের জন্য অনুতাপ! ভাবছেন—শরৎ মহারাজের সঙ্গে আর দেখা না হলেই ভাল। শ্রীশ্রীমাকে নিবেদন করলেন, 'মা, আজ বড় অন্যায় ক'রে এসেছি। সিঁড়ি দিয়ে আসার সময় শরৎ মহারাজকে ধাক্কা দিয়ে এসেছি। কি ক'রে আবার তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রব? আমার অপরাধ ক্ষমা করুন?' মা বললেন, 'আমার ছেলেরা এমন নয় যে অপরাধ ধরবে, এজন্য তুমি ভেবো না।' নীচে এসে ভক্ত দেখলেন সারদানন্দজী একই স্থানে একই ভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, প্রণাম ক'রে অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলে তিনি তাকে বুকে জড়িয়ে ধ'রে হাসিমুখে বললেন, 'অপরাধ আবার কি? এমন ব্যাকুল না হ'লে কি তাঁর দেখা পাওয়া যায়? এই রকম উৎকণ্ঠাই চাই!'

'লীলাপ্রসঙ্গ' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হওয়ার পর একজন ভক্ত শ্রীশ্রীমাকে বলেছিলেন, 'মা শরৎ মহারাজ কী সুন্দর বই-ই না লিখেছেন?' মা উত্তর দেন, 'শরতের বই বুঝতে বিদ্যাবুদ্ধির দরকার।' লীলাপ্রসঙ্গের রচনাশৈলী গ্রন্থকারের নিজস্ব। বিষয়বস্তু যেখানে জটিল ও দুরবগাহ, ভাষার গাম্ভীর্যও সেখানে তদনুরূপ। যেখানে রয়েছে লীলাংশের বর্ণনা, ভাষা সেখানে সহজ সরল সাবলীল। রচনায় কোথাও বিন্দুমাত্র অস্পষ্টতার ছাপ লক্ষিত হয় না, পাঠকালে পাঠকচিত্তে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রেমঘন দিব্য মূর্তি উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। আধিকারিক পুরুষ ব্যতীত কারও পক্ষে এমন গ্রন্থরচনা অসম্ভব। দিব্য জীবনের ঘটনাবলীর সহিত ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষা, শাস্ত্রীয়

ও অধ্যাত্মভাববিশ্লেষণে আকর গ্রন্থ 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ' অমৃততুল্য, শ্রুতি-যুক্তি-অনুভূতির আলোকে সমুজ্জ্বল। তিনি যেন মহামতি ব্যাস-দেবের মতো প্রজ্ঞাবান্!

লীলাপ্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণজীবনের মানবীয় ভাব আদৌ উপেক্ষিত নয়, অথচ দিব্য জীবনের বিভিন্ন দিক সুষ্ঠুভাবে উপস্থাপনের অপূর্বত্ব বিদ্যমান। এই গ্রন্থে নির্বিকল্প সমাধির যে মনোজ্ঞ বর্ণনা আছে, সে সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হয়ে সারদানন্দজী বলে-ছিলেন, 'লীলাপ্রসঙ্গের কোন কথা আমি না জেনে লিখিনি।' রচনাকালে তিনি সর্বক্ষণ শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবে বিভোর হয়ে থাকতেন, সর্বতোভাবে শ্রীশ্রীঠাকুরের হস্তে নিজেকে সমর্পণ করেছিলেন, ঠাকুর আপন যন্ত্রকে যেভাবে চালিয়েছিলেন তিনি সেভাবেই পরিচালিত হয়েছিলেন। তাঁর কর্ম-প্রেরণার দ্বিতীয় উৎস শ্রীশ্রীমা। প্রতিদিন তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণতি নিবেদন ও শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীচরণকমল বন্দনান্তে লীলাপ্রসঙ্গ লিখতে শুরু করতেন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা লিখে যেতেন, এর উপর মঠমিশনের গুরুদায়িত্বপূর্ণ কাজ, আর শ্রীশ্রীমায়ের তত্ত্বাবধান তো ছিলই! এই কর্ম-ব্যস্ততার মধ্যে কোনদিন বেলা দেড়টার পূর্বে তাঁর আহার হ'ত না, সামান্য বিশ্রামের পর আবার লেখা চ'লত; সন্ধ্যার সময় দপ্তর গুটোতেন। তাঁর নিজের উক্তি: "যখন 'লীলা-প্রসঙ্গ' লেখা হয়, কত দিকে কত গণ্ডগোল ছিল—মা উপরে রয়েছেন, রাধু রয়েছে, ভক্তের ভিড়, হিসাবপত্র রাখা, বাড়ী তৈরি করায় অনেক টাকা ধার হয়েছে। নীচের ছোট ঘরটিতে 'লীলাপ্রসঙ্গ' লিখছি, তখন আমার সঙ্গে কেউ কথা কইতে সাহস পেত না, সকলেই ভয় ক'রত। আমার অনেকক্ষণ ধরে কথা কইবার সময়ও ছিল না। কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করতে এলে, 'চটপট সেরে নাও' ব'লে সংক্ষেপে শেষ করতাম।"

শ্রীশ্রীমায়ের জীবনের যেসব ঘটনা সারদানন্দজী কর্তৃক লীলাপ্রসঙ্গে লিপিবদ্ধ সেগুলির খুঁটিনাটি বিবরণ তাঁরই শ্রীমুখ হ'তে যোগীন-মার মাধ্যমে প্রাপ্ত। শ্রীশ্রীমা বলতেন, 'শরতের বইয়ে সব ঠিক ঠিক লিখেছে।'

দুর্ভিক্ষ মহামারী বন্যা যে-কোন দৈব দুর্বিপাকে আর্তজনগণের দুঃখে স্বামী সারদানন্দের প্রাণ কেঁদে উঠত, জনসাধারণের দুঃখকষ্টে তাঁকে অত্যন্ত বিচলিত হ'তে দেখা যেত, তিনি নিশ্চেষ্ট হয়ে ঔদাসীন্য অবলম্বন করতে পারতেন না। সর্বাঙ্গ-সুন্দরভাবে সত্বর আর্তত্রাণ-কার্য কিরূপে আরম্ভ করা যায়, তার জন্য সচেষ্ট হতেন। প্রতিটি জীবকে শিবজ্ঞানে সেবা করা, নরকে নারায়ণজ্ঞানে উপাসনা করা রামকৃষ্ণ মিশনের মূলমন্ত্র। এই সেবাদর্শের মূর্তবিগ্রহ স্বামী সারদানন্দ। তাঁর লিখিত একখানি পত্রে দুর্গতদের দুঃখদুর্দশা ও তাঁর মর্মবেদনা উপলব্ধি ক'রে করুণাময়ী শ্রীশ্রীমা অশ্রুসংবরণ করতে পারেননি, বলেছিলেন, 'শরতের দিল দেখলে? নরেনের পর এত বড় প্রাণ আর একটিও পাবে না। ব্রহ্মজ্ঞ হয়তো অনেকে আছেন, শরতের মতো এমন হৃদয়বান দিলদরিয়া লোক ভারতবর্ষে নেই—সমস্ত পৃথিবীতে নেই।'

সেবাকার্যের প্রতি তাঁর ছিল আন্তরিক আগ্রহ, তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে রিলিফের ব্যবস্থা ত্বরান্বিত করতেন। আর্তসেবার জন্য জনসাধারণ কর্তৃক প্রদত্ত অর্থের প্রতিটি পয়সা যাতে উপযুক্তভাবে ব্যয়িত হয়, তার দিকে তাঁর বিশেষ দৃষ্টি থাকত; হিসাবপত্র নিখুঁতভাবে রাখতে উপদেশ দিতেন, সেবাকার্যের বিবরণ সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য পাঠাতেন। মানুষের দুঃখে বিগলিতহৃদয় স্বামী সারদানন্দ বলতেন, স্বামীজীকে মানার অর্থ—তাঁর আদর্শে জীবন গঠন করা, তাঁর প্রদর্শিত পথে অবিচলিত ভাবে কাজ করা।

যুগনায়ক স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, মানুষের

মধ্যে অনন্ত শক্তি সুপ্ত হয়ে আছে। সারদানন্দজী তাই প্রত্যেককে বিশ্বাস ক'রে তার আত্মশক্তি জাগিয়ে দিতেন ও বিশ্বস্ত কর্মী তৈরি করতেন—কর্মীদের স্বাধীনতা দান ও তাঁদের কর্মদক্ষতায় বিশ্বাসই ছিল তাঁর কর্ম-পরিচালনার মূলসূত্র। তিনি বলতেন: যদি কাজই করতে চাও, তবে ভগবানের ওপর নির্ভর ক'রে নিজের পায়ে দাঁড়াও। কোন মানুষের মুখ চেয়ে থেকো না, আমারও না। কেউ তোমাকে সাহায্য না করলেও তুমি একলা ঐ কাজ ক'রে দেহপাত করবে—এরূপ তেজ, সাহস ও ঈশ্বরনির্ভরতা নিয়ে কাজ করতে হবে।

স্বামী সারদানন্দের কর্মক্ষমতাসম্বন্ধে বিশেষ অনুধাবনযোগ্য শ্রীশ্রীমায়ের কথা: 'শরৎকে দেখ না, কত কাজ করে, কত হাঙ্গামা পোয়ায়, মুখটি বুজে থাকে। ও সাধু মানুষ, ওর এত সব কেন? ওরা ইচ্ছে করলে দিনরাত ভগবানে মন লাগিয়ে ব'সে থাকতে পারে। কেবল তোমাদের মঙ্গলের জন্য এদের নেমে থাকা। এদের চরিত্র চোখের সামনে রাখবে, এদের সেবা করবে।·· সে (শরৎ) আমার বাসুকি, সহস্র ফণা ধরে কত কাজ করছে।'

জয়রামবাটীতে মাতৃমন্দির-নির্মাণ স্বামী সারদানন্দের একটি উল্লেখযোগ্য কার্য। তিনি বুঝেছিলেন শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্য জন্মস্থান জয়রামবাটীতে মাতৃমন্দির নির্মিত না হ'লে জগজ্জননীর প্রতি তাঁর কর্তব্য অসমাপ্ত থেকে যাবে; মহাতীর্থে মাতৃমন্দির প্রতিষ্ঠিত ক'রে তিনি অগণিত ভক্ত নরনারীর অন্তরের শ্রদ্ধা লাভ করেছেন।

শ্রীশ্রীমাকে সারদানন্দজী কিভাবে উপলব্ধি করেছিলেন, জগজ্জননী তাঁর স্বরূপ সন্তানের কাছে কেমন প্রকাশিত করেছিলেন তার ভাব নিবদ্ধ হয়ে আছে অক্ষয় হয়ে প্রণামমন্ত্রে:

'যথাগ্নের্দাহিকাশক্তী রামকৃষ্ণে স্থিতা হি যা।
সর্ববিদ্যাস্বরূপাং তাং সারদাং প্রণমাম্যহম্॥'

মাতৃপ্রণামের এই অমর মন্ত্রের অনুসরণে শ্রীশ্রীমাকে ও তাঁর অনুপম 'ভারী'কে ছন্দোবদ্ধ বাক্‌পুষ্পমাল্যে প্রণতি নিবেদন করি:

যাদ্যা শক্তিঃ সুশান্তা যুগহিতনিরতা
সর্বলোকস্য মাতা
মায়াতীতা ধরণ্যাং পরসুখনিলয়া
তারিণী বিশ্বপূজ্যা।
বিশ্বেশাং কল্পবল্লীং ধৃতসকলগুণাং
রামকৃষ্ণস্য শক্তিং
ধ্যায়েন্নিত্যং বিমুক্তাং শুচিচরিতবতীং
সারদাং মাতরং তাম্॥

*   *

ধ্যায়েয়ং শুদ্ধবুদ্ধং বিপুলহিমগিরিং
সারদানন্দধীরং
সর্বস্থিত্যাং যথার্থং শিবসমসহনং
মাতৃসেবারতং বৈ।
সেবাকার্যে মহান্তং ধৃতবিপুলবলং
রামকৃষ্ণস্য সঙ্ঘে
ভক্তিশ্রদ্ধাসুপূতং বিমলহিতমতিং
নিত্যমুক্তস্বরূপম্॥
ব্যাসদেবং মহাপ্রাজ্ঞং নবযুগে প্রকীর্তিতম্।
নৌমি শ্রীসারদানন্দং শান্তরূপং যতীশ্বরম্॥

স্বামী বিবেকানন্দ ও 'উদ্বোধন'

['উদ্বোধন' পত্রিকা প্রকাশের প্রারম্ভে বিবেকানন্দ-মানসে যে ভাবনারাজি পর পর উদিত হয়েছিল এবং পরিশেষে তা কিভাবে রূপলাভ করেছিল,—নিম্নে উদ্ধৃত স্বামীজীর পত্রাংশ ও এ-বিষয়ে সম্পর্কযুক্ত অন্যান্যদের লেখার উদ্ধৃতি থেকে তার পরিচয় পাওয়া যাবে]:

"একটা খবরের কাগজ তোমাদের edit করতে হবে, আদ্ধেক বাঙলা, আদ্ধেক হিন্দি—পারো তো আর একটা ইংরেজীতে। পৃথিবী ঘুরে বেড়াচ্ছ - খবরের কাগজের Subscriber সংগ্রহ করতে ক-দিন লাগে? যারা বাহিরে আছে, Subscriber যোগাড় করুক। গুপ্ত—হিন্দি দিকটা লিখুক, বা অনেক হিন্দি লিখবার লোক পাওয়া যাবে।' [২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪]

'যে খবরের কাগজ বাহির হইবার কথা হইতেছিল, তাহার কি হইল?—খবরের কাগজ চালাইবার তোমার ভাবনা কি আমরা জানি না; এখন লোক যে অল্প। চিঠি লিখে, ইত্যাদি ক'রে সকলের ঘাড়ে গতিয়ে দাও; তারপর গড় গড় ক'রে চলে যাবে। বাহাদুরি দেখাও দেখি। দাদা, মুক্তি নাই বা হ'ল, দু'চার বার নরককুণ্ডে গেলেই বা।'—[১৮৯৫খ্রীঃ]

'পুঃ—সারদা কি বাঙলা কাগজ বার করবে বলছে? সেটার বিশেষ সাহায্য করবে, সে মতলবটা মন্দ নয়। কারুর উৎসাহ ভঙ্গ করতে নাই। Criticism একেবারে ত্যাগ করবে। যতদূর ভাল বোধ হয়, সকলকে সাহায্য করবে; যেখানটা ভাল না বোধ হয়, ধীরে বুঝিয়ে দিবে। পরস্পরকে Criticise করাই সকল সর্বনাশের মূল! দল ভাঙবার ঐটি মূলমন্ত্র। 'ও কি জানে?' 'সে কি জানে?' 'তুই আবার কি করবি?' —আর তার সঙ্গে ঐ একটু মুচকে হাসি. ঐগুলো হচ্ছে ঝগড়া-বিবাদের মূলসূত্র। [১৮৯৫ খ্রীঃ]

'.. তোর কাগজের idea অতি উত্তম বটে এবং উঠে পড়ে লেগে যা, পরোয়া নেই। ৫০০৲ টাকা পত্রপাঠ পাঠিয়ে দেবো, ভাবনা নাই টাকার জন্য। ...তুই আপনার দেশী ধর্মের প্রচার এখন ক'রে ওঠ দিকে।...লেখক অনেক চাই। তারপর গ্রাহক যোগাড়ই মুশকিল।—[জানুআরি, ১৮৯৬]

'তুমি খবরের কাগজ এখন বার করতে লেগে যাও।...তুই কোমর বেঁধে তৈয়ার থাক। তুই আর শশী আর গঙ্গাধর—এই তিনজন দেখছি faithful...[১৭ই জানুআরি, ১৮৯৬]

'সারদা যে কাগজ বার করতে চায়. তার জন্য বিশেষ যত্ন করিবে। শশীকে যত্ন করিতে বলিবে ও কালী প্রভৃতিকে।' [২৪শে জানুআরি, ১৮৯৬

'কলকাতায় বাঙলা ভাষায় একখানি পত্রিকা আরম্ভ করতে সাহায্য ক'রব ব'লে কথা দিয়েছি। কিন্তু ব্যাপার এই—প্রথম দু-বছরই মাত্র বক্তৃতার জন্য টাকা আদায় করেছি; গত দু-বছর আমার কাজের সঙ্গে দেনা-পাওনার কোন সম্পর্ক ছিল না। এর ফলে আপনাকে বা কলকাতার লোকদের পাঠাবার মতো টাকা আমার মোটেই নেই।' [১৪ই এপ্রিল, ১৮৯৬]

[উপরের পত্রটি থেকেই বোঝা যায় কি কারণে পত্রিকা প্রকাশে দেরি হচ্ছিল।]

'সারদা যে কাগজ বার করতে চেয়েছে, সে

* পত্রাংশের উদ্ধৃতি বাণী ও রচনার ১ম সংস্করণ থেকে দেওয়া হ'ল।

উত্তম কথা বটে ; কিন্তু সকলে মিলেমিশে করতে পার তো আমার সম্মতি আছে।' [২৭ এপ্রিল ১৮৯৬]

'মেটিরিয়ল যোগাড় ক'রছ না কেন? আমি এসে নিজেই কাগজ start ক'রব। দয়া আর ভালবাসায় জগৎ কেনা যায় ; লেকচার, বই, ফিলসফি—সব তার নীচে।' [১০ই জুলাই, ১৮৯৭]

'ব্রহ্মানন্দকে বলবে, · যে বাঙলা কাগজটা বার করার কথা হচ্ছে, তার জন্য প্রবন্ধ ও প্রয়োজনীয় উপাদান যেন তারা পাঠায়। গিরিশবাবু কি কাগজটার জন্য যোগাড়যন্ত্র করছেন? অদম্য ইচ্ছাশক্তির সঙ্গে কাজ ক'রে যাও ও প্রস্তুত থাকো।' [১১ই জুলাই, ১৮৯৭]

'সারদা বেচারীকে অনেক গাল দিয়েছি। কি ক'রব?...আমি গাল দিই ; কিন্তু আমারও বলবার ঢের আছে।.. আমি হাঁপাতে হাঁপাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওর article লিখেছি।...সব ভাল নইলে বৈরাগ্য হবে কেন?...শেষটা কি আর মা আমায় জড়িয়ে মারবেন? সকলকার কাছে আমার অনেক অপরাধ—যা হয় ক'রো।' [১১ই অক্টোবর, ১৮৯৭]

'নৃত্যগোপাল বলে, ইংরেজী কাগজটায় খরচ অল্প ; অতএব প্রথম উহা বাহির করিয়া পরে বাঙলাটা দেখা যাবে। এ-সকলও বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। যোগেন কাগজের ভার লইতে রাজী আছে?...শরৎকে জিজ্ঞাসা করবে —জি সি., সারদা, শশীবাবু প্রভৃতি articles তৈয়ার রেখেছেন কি না।' [২৩শে এপ্রিল, ১৮৯৮]

'প্রত্যুত আমি কলকাতায় একখানি কাগজ চালাব। তুমি যদি ঐ কাগজ চালু করতে আমায় সাহায্য কর, তবে খুবই কৃতজ্ঞ হবো।' [২৯শে এপ্রিল, ১৮৯৮]

'কাগজের জন্য টাকার চেষ্টা হইতেছে। যে ১২০০৲ টাকা তোমায় কাগজের জন্য দিয়াছি, তাহা ঐ হিসাবেই যেন থাকে।' [২০শে মে ১৮৯৯]

'...সারদার সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছ, তদ্বিষয়ে আমার বক্তব্য এইমাত্র যে বাঙলা ভাষায় magazine paying করা মুশকিল, তবে সকলে মিলিয়া দ্বারে দ্বারে ফিরিয়া Subscriber যদি যোগাড় করা যায় তো সম্ভব বটে। এ বিষয়ে তোমাদের যে প্রকার মত হয়, করিবে। সারদা বেচারা একেবারে ভগ্ন-মনোরথ হইয়াছে। যে লোকটা এত কাজের এবং নিঃস্বার্থ, তার জন্য এক হাজার টাকা যদি জলেও যায় তো ক্ষতি কি?' [১৭ জুলাই, ১৮৯৮]

[ম্যাকলাউডের স্মৃতিকথা থেকে জানা যায়]:

'...One day I said to Swamiji, "Here is a little money you may be able to use." He said, "What? What?" I said, "yes". "How much?" he asked, And I said, "Eight hundred dollars." Instantly he turned to Swami Trigunatita and said, "There, go and buy your press." He bought the press which started the Udbodhan, the Bengali magazine published by the Ramakrishna Mission." [Reminiscences of Vivekananda, 1st Ed, pp. 245]

[উদ্বোধন আত্মপ্রকাশ করল ১৮৯৯এর জানুআরি মাসে, বাংলা ১৩০৫ সনের ১লা মাঘ, পাক্ষিক পত্ররূপে।] 'স্বামীজী ঐ পত্রের "উদ্বোধন" নাম মনোনীত করিলেন এবং উহার উন্নতিকল্পে স্বামী ত্রিগুণাতীতকে বহু আশীর্বাদ করিলেন।...পত্রের প্রস্তাবনা স্বামিজী নিজে লিখিয়া দেন এবং কথা হয় যে, ঠাকুরের সন্ন্যাসী ও গৃহী ভক্তগণই

এই পত্রে প্রবন্ধাদি লিখিবেন। কোনরূপ অশ্লীলতাব্যঞ্জক বিজ্ঞাপনাদি যাহাতে এই পত্রে প্রকাশিত না হয় সে বিষয়ও স্বামিজী নির্দেশ করিয়া দেন। সঙ্ঘরূপে পরিণত রামকৃষ্ণ মিশনের সভ্যগণকে স্বামিজী এই পত্রে প্রবন্ধাদি লিখিতে এবং ঠাকুরের ধর্মসম্বন্ধীয় মত পত্রসহায়ে জনসাধারণে প্রচার করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। পত্রের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইলে শিষ্য একদিন মঠে উপস্থিত হইল।...তিনি তাঁহার সহিত "উদ্বোধন" পত্র সম্বন্ধে এইরূপ কথাবার্তা আরম্ভ করিলেন—

স্বামিজী। (পত্রের নামটি বিকৃত করিয়া পরিহাসচ্ছলে) "উদ্বন্ধন" দেখেছিস্?

শিষ্য। আজ্ঞা হ্যাঁ; সুন্দর হয়েছে।

স্বামিজী। এই পত্রের ভাব, ভাষা সব নূতন ছাঁচে গড়্তে হবে।

শিষ্য। কিরূপ?

স্বামিজী। ঠাকুরের ভাব ত সব্বাইকে দিতে হবেই; অধিকন্তু বাঙলা ভাষায় নূতন ওজস্বিতা আন্‌তে হবে। এই যেমন—কেবল ঘন ঘন verb use কল্লে ভাষার দম কমে যায়। বিশেষণ দিয়ে verbএ ব্যবহারগুলি কমিয়ে দিতে হবে। তুই ঐরূপ প্রবন্ধ লিখ্‌তে আরম্ভ কর। আমায় আগে দেখিয়ে তবে উদ্বোধনে ছাপ্‌তে দিবি।

* * *

শিষ্য। কিন্তু মহাশয়, গেরুয়াপরা সন্ন্যাসীর গৃহীদের দ্বারে দ্বারে ঐরূপে ঘোরা আমাদের চক্ষে কেমন কেমন ঠেকে।

স্বামিজী। কেন? পত্রের প্রচার ও গৃহীদেরই কল্যাণের জন্য। দেশে নবভাব প্রচারের দ্বারা জনসাধারণের কল্যাণ সাধিত হবে। এই ফলাকাঙ্ক্ষারহিত কর্ম বুঝি তুই সাধন ভজনের চেয়ে কম মনে কচ্ছিস্? আমাদের উদ্দেশ্য জীবের হিতসাধন। এই পত্রের আয় দ্বারা টাকা জমাবার মতলব আমাদের নেই। আমরা সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী—মাগছেলে নেই যে, তাদের জন্য কিছু রেখে যেতে হবে। Success হয় ত এর income সমস্তই জীবসেবাকল্পে ব্যয়িত হবে। স্থানে স্থানে সঙ্ঘ গঠন, সেবাশ্রম স্থাপন, আরও কত কি হিতকর কার্যে এর উদ্বৃত্ত অর্থের সদ্ব্যয় হতে পারবে। আমরা ত গৃহীদের মত নিজের রোজগারের মতলব এঁটে এ কাজ করছিনি। শুধু পরহিতেই আমাদের সকল movement—একটা জেনে রাখবি।

শিষ্য। মহাশয়, এই পত্র ১৫ দিন অন্তর বাহির হইবে; আমাদের ইচ্ছা সাপ্তাহিক হয়।

স্বামিজী। তা ত বটে, কিন্তু funds কোথায়? ঠাকুরের ইচ্ছায় টাকায় যোগাড় হলে এটাকে পরে দৈনিকও করা যেতে পারে। রোজ লক্ষ কপি ছেপে কলকাতার গলিতে গলিতে free distribution করা যেতে পারে।

* * *

'উদ্বোধনে' সাধারণকে কেবল positive ideas দিতে হবে। Negative thought মানুষকে weak করে দেয়। দেখছিস্ না, যে সকল মা বাপ ছেলেদের দিনরাত লেখা পড়ার জন্য তাড়া দেয়—বলে 'এটার কিছু হবে না' 'বোকা, গাধা'—তাদের ছেলেগুলি অনেকস্থলে তাই হয়ে দাঁড়ায়। ছেলেদের ভাল বল্লে—উৎসাহ দিলে, সময়ে নিশ্চয় ভাল হয়। ছেলেদের পক্ষে যা নিয়ম, children in the region of higher thoughts সম্বন্ধেও তাই। Positive idea দিতে পারলে সাধারণে মানুষ হয়ে উঠ্‌বে ও নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখ্‌বে। ভাষা, সাহিত্য, দর্শন, কবিতা, শিল্প সকল বিষয়ে যা চিন্তা ও চেষ্টা মানুষ করছে, তাতে ভুল না দেখিয়ে ঐ সব বিষয় কেমন করে ক্রমে ক্রমে আরও ভাল রকমে

করতে পারবে, তাই বলে দিতে হবে। ভ্রম প্রমাদ দেখালে মানুষের feeling wounded হয়। ঠাকুরকে দেখেছি—যাদের আমরা হেয় মনে করতুম—তাদেরও তিনি উৎসাহ দিয়ে জীবনের মতি-গতি ফিরিয়ে দিতেন। তাঁর শিক্ষা দেওয়ার রকমই একটা অদ্ভুত ব্যাপার!···

"ধর্মপ্রচারটা কেবল যাতে তাতে, যার তার উপর নাক সিঁটকানো ব্যাপার বলে যেন বুঝিস্‌নি। Physical, mental spiritual সকল ব্যাপারেই মানুষকে Positive idea-সকল দিতে হবে। কিন্তু ঘেন্না করে নয়। পরস্পরকে ঘেন্না করে করেই তোদের অধঃপতন হয়েছে। এখন কেবল Positive thought ছাড়িয়ে লোককে তুলতে হবে। প্রথমে ঐরূপে সমস্ত হিঁদু-জাতটাকে তুলতে হবে—তারপর জগৎটাকে তুলতে হবে। ঠাকুরের অবতীর্ণ হওয়ার কারণই এই। তিনি জগতে কারও ভাব নষ্ট করেননি। মহা অধঃপতিত মানুষকেও তিনি অভয় দিয়ে, উৎসাহ দিয়ে তুলে নিয়েছেন। আমাদেরও তাঁর পদানুসরণে সকলকে তুলতে হবে—জাগাতে হবে—বুঝলি ?

"তোদের history literature, mythology প্রভৃতি সকল শাস্ত্রগ্রন্থ মানুষকে কেবল ভয়ই দেখাচ্ছে! মানুষকে কেবল বলছে—তুই নরকে যাবি, তোর আর কোন উপায় নাই। তাই এত অবসন্নতা ভারতের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করেছে। সেই জন্য বেদ-বেদান্তের উচ্চ উচ্চ ভাবগুলি সাদা কথায় মানুষকে বুঝিয়ে দিতে হবে। সদাচার, সদ্ব্যবহার ও বিদ্যাশিক্ষা দিয়ে ব্রাহ্মণ চণ্ডালকে একভূমিতে দাঁড় করাতে হবে। 'উদ্বোধন' কাগজে এই সব লিখে আবালবৃদ্ধ-বনিতাকে তোল দেখি। তবে জানব—তোর বেদ-বেদান্ত পড়া সার্থক হয়েছে। কি বলিস্ পারবি ?"
[স্বামি-শিষ্য-সংবাদ, পূর্বকাণ্ড, নবম সং, বিংশবল্লী]

* * *

"রাজা (স্বামীজী) তাঁর বাংলা পত্রিকার জন্য ঘাড় গুঁজে দাসের মত খাটছেন ক্যাবিনে বসে। ···বাংলা পত্রিকাটি তাঁর কাছে কী না আশীর্বাদের মত হয়েছে, তোমাকে তা বলা দরকার। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে এর জন্য একটি দীর্ঘপত্র রচনা করেছেন—মজাদার রসিকতায় তা পূর্ণ, সেইসঙ্গে টিপ্পনী ও মন্তব্য এবং আর্ত ভবিষ্যৎবাণী। সমস্ত মনপ্রাণ ঢেলে দিয়েছেন। বিদেশীয়ানা, ব্রাহ্মপদ্ধতি প্রভৃতির বিরুদ্ধে জ্বলন্ত রোষ, জনগণের প্রতি নিবিড় আশা ও ভালবাসা, গুরুর পতি দীপ্ত ভক্তি, চারিপাশের জীবন সম্বন্ধে ব্যাপক সন্ধানী দৃষ্টি, সর্বোপরি বাংলা ভাষার উপরে কিছু ইচ্ছাকৃত উৎপীড়ন, যার ফলে তাঁর লেখা বোঝা দুরূহ হয়ে উঠেছে যেমন ছিল কার্লাইলের প্রথম আবির্ভাব কালের রচনা, যা সৃষ্ট হয়েছিল দারুণ কোনো লক্ষ্যসিদ্ধির উদ্দেশ্যে !!!"
[নিবেদিতা লোকমাতা পৃঃ ৬৯]

"সারদা বলে, কাগজ চলে না। ···আমার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত খুব advertise করে ছাপাক দিকি —গড় গড় ক'রে subscriber হবে। খালি ভটচায্যিগিরি তিন ভাগ দিলে কি লোকে পছন্দ করে!

'যা হোক কাগজটার উপর খুব নজর রাখবে। মনে জেনো যে, আমি গেছি। এই বুঝে স্বাধীনভাবে তোমরা কাজ কর। 'টাকাকড়ি, বিদ্যাবুদ্ধি সমস্ত দাদার ভরসা' হইলেই সর্বনাশ আর কি! কাগজটার পর্যন্ত টাকা আমি আনব, আবার লেখাও আমার সব তোমরা কি করবে? সাহেবরা কি করছেন? আমার হয়ে গেছে! তোমরা যা করবার কর। ···আমি কাজ চাই, Vigour চাই—যেমরে যে বাঁচে; সন্ন্যাসীর আবার মরা বাঁচা কি ?" [পত্র—১০ই আগস্ট, ১৮৯৯]

স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ ও 'উদ্বোধন'

[মাতৃভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবধারা প্রচারের জন্য একটি পত্রিকা প্রকাশ করা সম্পর্কে স্বামীজী ১৮৯৪-এর সেপ্টেম্বর থেকেই গুরুভাইদের সঙ্গে পত্রালাপ করছিলেন।]:

"সারদা যা করছে, তা আমার সম্পূর্ণ অভিমত। তাকে আমার শত শত ধন্যবাদ। ···সারদাকে আমায় একটা চিঠি লিখতে বলবে। তার সঙ্গে আমার মত মিলবে বোধ হয়।···আমি রামকৃষ্ণ পরমহংসের চেলা নই, আমি কারুর চেলাপত্র নই ইতি; আমি সারদার চেলা।···"

[১৮৯৫ খৃঃ

[স্বামী ত্রিগুণাতীতকে পত্রিকার বিষয়ে উৎসাহী জেনে স্বামীজী খুব উৎসাহিত হন। ত্রিগুণাতীত মহারাজ স্বামীজীকে এক পত্রে বাংলা পত্রিকার বিষয়ে তাঁর ভাব ব্যক্ত করেন। তার উত্তরে ১৮৯৬-এর জানুআরিতে স্বামীজী লেখেন] :—

"প্রিয় সারদা,

...তোর কাগজের idea অতি উত্তম বটে এবং উঠে পড়ে লেগে যা, পরোয়া নেই। ৫০০৲ টাকা পত্রপাঠ পাঠিয়ে দেবো, ভাবনা নাই টাকার জন্য। আপাতত এই চিঠি দেখিয়ে কারুর কাছে ধার ক'রে নে। এই চিঠির জবাব-চিঠির উত্তরে আমি ৫০০৲ টাকা পাঠিয়ে দেবো। ৫ ৲ টাকায় কিছু আসে যায় কি? খ্রীষ্টিয়ান, মুসলমান ধর্ম প্রচারের ঢের লোক আছে, তুই আপনার দেশী ধর্মের প্রচার এখন ক'রে ওঠ দিকি। তবে কোনও আরবীজানা মুসলমান-ভায়া ধ'রে যদি পুরানো আরবীগ্রন্থের তর্জমা করাতে পারো, ভাল হয়। ফার্সী ভাষায় অনেক Indian History আছে। যদি সেগুলো ক্রমে ক্রমে তর্জমা করাতে পারো, একটা বেশ regular item হবে। লেখক অনেক চাই। তার পর গ্রাহক যোগাড়ই মুশকিল। উপায়—তোরা দেশে দেশে ঘুরে বেড়াস, বাংলা ভাষা যেখানে যেখানে আছে, লোক ধ'রে কাগজ গতিয়ে দিবি। ...চালাও কাগজ, কুছ্ পরোয়া নাই। শশী, শরৎ, কালী প্রভৃতি সকলে পড়ে লিখতে আরম্ভ কর। ঘরে বসে ভাত খেলে কি হয়? তুই খুব বাহাদুরি করেছিস। বাহবা, সাবাস! গুঁজগুঁজে-গুলো পেছু পড়ে থাকবে হাঁ ক'রে, আর তুই লম্ফ দিয়ে সকলের মাথায় উঠে যাবি। ওরা নিজেদের উদ্ধার করছে—না হবে ওদের উদ্ধার, না হবে আর কারুর। মোচ্ছব এমনি মাচাবি যে দুনিয়াময় তার আওয়াজ যায়। অনেকে আছেন যাঁরা কেবল খুঁত কাড়তে পারেন; কিন্তু কাজের বেলাতে তো 'খোঁজ খবর নহি পাওয়ে।' লেগে যা, যত পারিস। পরে আমি ইণ্ডিয়ায় এসে তোল-পাড় ক'রে তুলব। ভয় কি? 'নাই নাই বললে সাপের বিষ উড়ে যায়।'—নাই নাই ব'লে যে নাই হয়ে যেতে হবে!···"

*   *   *

"তুমি খবরের কাগজ এখন বার করতে লেগে যাও। * * * তোর টিবেটের কি খবর? 'মিবারে' ছাপা হ'লে আমাকে একখানা পাঠিয়ে দিস। ·· হুটোপাটিতে কি কাজ হয়?···লোহার দিল চাই, তবে লঙ্কা ডিঙ্গুবি। ব্রজবাঁটুলের মতো হতে হবে, পাহাড় পর্বত ভেদ হয়ে যাতে যায়। আসছে শীতে আমি আসছি। দুনিয়ায় আগুন লাগিয়ে দেবো যে সঙ্গে আসে আসুক, তার ভাগ্যি ভাল; যে না আসবে, সে ইহকাল পরকাল পড়ে থাকবে, থাকুক। তুই কোমর বেঁধে তৈয়ার থাক। তুই আর শশী আর গঙ্গাধর—এই তিন-জন দেখছি faithful.···তোদের মুখে শুতে

বাগ্‌দেবী বসবেন—ছাতিতে অনন্তবীর্য ভগবান্‌ বসবেন—তোরা এমন কাজ করবি যে দুনিয়া তাক হয়ে দেখবে। তোর নামটা একটু ছোট-খাট কর্‌ দেখি বাবা, কি নাম রে বাপ! একখানা বই হয়ে যায় এক নামের গুঁতোয়। ঐ যে বলে হরিনামের ভয়ে যম পালায়, তা 'হরি'—এই নামে নয়। ঐ যে গম্ভীর গম্ভীর নাম 'অঘভগ-নরকবিনাশন, ত্রিপুরমদভঞ্জন, অশেষনিঃশেষ-কল্যাণকর' প্রভৃতি নামের গুঁতোয় যমের চৌদ্দপুরুষ পালায়।—নামটা একটু সরল করলে ভাল হয় না কি? এখন বোধ হয় আর হবে না, ঢাক বেজে গেছে, কিন্তু কি জাঁহাদারি যমতাড়ানে নামই করছে! [১৭ই জানুআরি ১৮৯৬

* * *

"Dear Sarada

…টিবেটের সম্বন্ধে তোমার পত্র পাঠ ক'রে তোমার বুদ্ধির উপর হতশ্রদ্ধা হ'ল। প্রথম—নোটোভিচ-এর বই সত্য,—nonsense! তুমি কি original দেখেছ বা India-য় এনেছ? দ্বিতীয়—Jesus এবং Samaritan woman-এর ছবি কৈলাসের মঠে দেখেছ। কি ক'রে জানলে সে যীশুর ছবি, ঘিশুর নয়? যদি তাও হয়, কি ক'রে জানলে যে, কোনও ক্রিশ্চান লোকের দ্বারা তাহা উক্ত মঠে স্থাপিত হয় নাই? টিবেটি-য়ানদের সম্বন্ধে তোমার মতামতও অযথার্থ। তুমি heart of Tibet তো দেখ নাই—only a fringe of the trade-route (শুধু বাণিজ্য পথের ধারে ধারে একটুখানি দেখেছ)। ঐ সকল স্থানে কেবল dregs of a nation (জাতের নিকৃষ্ট ভাগটাই) দেখতে পাওয়া যায়। কলকেতার চিনেবাজার আর বড়বাজার দেখে যদি কেউ বাঙালীমাত্রকে চোর বলে, তা কি যথার্থ হয়?

শশীর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে article প্রভৃতি লিখবে…। [(প্রথম সপ্তাহ) মার্চ, ১৮৯৬

"…তোমার প্রেরিত Indian Mirror ও পত্র পাইলাম। লেখা উত্তম হইয়াছে, বরাবর লিখিয়া যাও। দোষ দেখা বড়ই সহজ, গুণ দেখাই মহাপুরুষের ধর্ম, একথা ভুলিবে না।"
[১৪ই এপ্রিল, ১৮৯৬

['উদ্বোধন' পত্রিকার প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হলে স্বামীজী সম্পাদক স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দকে আশীর্বাদ করেন। 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ' গ্রন্থের ৩১ স্তবক থেকে উদ্ধৃত হল।]:

স্বামীজী। আমাদের centre (কেন্দ্র) তো ঠাকুরই। আমরা এক একজন সেই জ্যোতিঃ-কেন্দ্রের এক একটি ray (কিরণ)। ঠাকুরের পূজা ক'রে কাজটা আরম্ভ করেছে—বেশ করেছে। কই আমায় তো (ত্রিগুণাতীত) পূজোর কথা কিছু বললে না।

শিষ্য। মহাশয়, তিনি আপনাকে ভয় করেন। ত্রিগুণাতীত স্বামী আমায় কল্য বলিলেন, 'তুই আগে স্বামীজীর কাছে গিয়ে জেনে আয়, পত্রের ১ম সংখ্যা বিষয়ে তিনি কি অভিমত প্রকাশ করেছেন, তারপর আমি তাঁর সঙ্গে দেখা ক'র্‌ব।'

স্বামীজী। তুই গিয়ে বলিস, আমি তার কাজে খুব খুশী হয়েছি। তাকে আমার স্নেহাশীর্বাদ জানাবি। আর তোরা প্রত্যেকে যতটা পারবি, তাকে সাহায্য করিস্‌। ওতে ঠাকুরের কাজই করা হবে।

কথাগুলি বলিয়াই স্বামীজী ব্রহ্মানন্দ স্বামীকে নিকটে আহ্বান করিলেন এবং আবশ্যক হইলে ভবিষ্যতে 'উদ্বোধনে'র জন্য ত্রিগুণাতীত স্বামীকে আরও টাকা দিতে আদেশ করিলেন।"

["'উদ্বোধনের' জয়যাত্রা" প্রবন্ধে প্রত্যক্ষদ্রষ্টা শ্রীকুমুদবন্ধু সেন লেখেন]:—

" 'উদ্বোধন' প্রকাশের দিন এখনও স্মৃতিপটে উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। কি অদম্য উৎসাহ, কি মহোচ্চ আদর্শ, কি বৈদ্যুতিক প্রেরণা এবং কি অনাবিল আনন্দ কতিপয় শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবকের হৃদয়ে সঞ্চারিত হইয়াছিল। আজ মনে পড়ে 'উদ্বোধনে'র সর্বপ্রথম সম্পাদক ও প্রতিষ্ঠাতা পূজ্যপাদ স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের কথা। তাঁহাকে প্রতিষ্ঠাতা বলিলাম, কারণ স্বামী বিবেকানন্দের আদেশে, উপদেশে এবং সহায়তায় তিনি কঠোর পরিশ্রম সহকারে 'উদ্বোধন প্রেস' এবং 'উদ্বোধন পত্রিকা'র সম্পাদনার গুরু দায়িত্বভার একাকী বহন করিয়াছিলেন। কঠোর তপস্যাপূত জীবনে অক্লান্ত পরিশ্রমে স্বামীজীর পত্রিকা প্রকাশের ইচ্ছাকে তিনি কার্যক্ষেত্রে আকার দিয়া প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। দেখিয়াছি—শীত গ্রীষ্ম বর্ষায় কতদিন তিনি কখনও অনাহারে, অর্ধাহারে প্রেস ও পত্রিকার কার্য দেখিতেছেন। শুধু পরিদর্শকভাবে দেখা-শুনা নহে, আজ কম্পোজিটার অনুপস্থিত, তাঁহাকে নিজে সন্ধান করিয়া নূতন লোক সংগ্রহ করিতে হইতেছে, কাল প্রেসম্যান অসুস্থ, কোথায় প্রেসম্যান পাওয়া যায়, তাহার সন্ধানে নানাস্থানে তিনি ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, কোথায় সস্তায় প্রেসের কোন্ উপকরণ পাওয়া যায় সেই তথ্য লইবার জন্য কখনও ছুটাছুটি করিতেছেন, আবার কখনও কখনও প্রেসের লোকজনের কাজে সাহায্য করিতেছেন। ইহা ছাড়া তাঁহাকে প্রবন্ধ সংগ্রহ এবং প্রবন্ধ রচনা করিতেও হইত। ঠিক সময়ে পত্রিকা-প্রকাশ না হইলে স্বামীজীর নিকট তিরস্কৃত হইতেন। ইহা ছাড়া ছাপাখানার কাহারও ব্যারাম হইলে তাহার চিকিৎসা ও পথ্যের ব্যবস্থার আয়োজন তাঁহাকেই করিতে হইত। নানাদিকে এই সব কঠোর পরিশ্রমেও তাঁহার মুখে হাসি লাগিয়া থাকিত—ক্লান্তির কোন কালিমা দেখা যাইত না। বেশীর ভাগ কম্পোজিটার ও প্রেসম্যান বস্তীতে বাস করিত। তিনি বিনা-সঙ্কোচে বস্তীর মধ্যে যাইয়া তাহাদের খোঁজ লইতেন। কতদিন দেখিয়াছি—শ্রীশ্রীঠাকুরের শিষ্য ও ভক্ত স্বর্গীয় মণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত মহাশয়ের বড়ীতে অপরাহ্নকালে তৃষ্ণার্ত হইয়া তিনি জলপান করিতেছেন এবং তাঁহার মুখেই শুনিয়াছি তাঁহার তখনও স্নানাহার হয় নাই।··· এদিকে পত্রিকায় কোন প্রকার ভ্রম-প্রমাদ বা প্রুফ দেখিতে ভুল-ত্রুটি থাকিলে কিংবা অশুদ্ধ শব্দ বা ভাবের প্রয়োগ করিলে স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দকে বিশেষভাবে তিরস্কার সহ্য করিতে হইত। পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দের সেদিকে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। একদিন এইরূপ ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। অধ্যাপক মোক্ষমূলর ও শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে শ্রীশ্রীস্বামীজীর লিখিত একটি প্রবন্ধ 'উদ্বোধন' তখন সদ্য প্রকাশিত হইয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি উপলক্ষে স্বামী ত্রিগুণাতীত বেলুড় মঠে গিয়া স্বামী বিবেকানন্দের সম্মুখে উপস্থিত হইলে তাঁহাকে দেখিয়াই 'উদ্বোধনে' তাঁহার লিখিত প্রবন্ধের ভ্রম-প্রমাদের কথা উল্লেখ করিয়া তাঁহার লাঞ্ছনার সীমা রাখিলেন না। স্বামী ত্রিগুণাতীত বলিলেন, "কি রকম মূর্খ নিয়ে কাজ করতে হয় তাতো বুঝতে চাও না!" স্বামীজী বলিলেন, "ওসব কথা রেখে দে—তোরা যখন কাজ হাতে নিয়েছিস্ তখন তাতে গলদ থাকবে কেন? তাদের মানুষ করবার কি চেষ্টা করেছিস্? এ-দেশের লোকই কেবল দোষ ঢাকবার জন্য ওজরের ওপর ওজর তোলে। ওদেশে কম্পোজিটাররাও বিদ্বান নয়—যারা ম্যানেজার, যারা কাজের ভার গ্রহণ করে, তারা কাজটি নিখুঁত করবার চেষ্টা করে। যতক্ষণ নির্ভুল না হয় ততক্ষণ তারা নাছোড়বান্দা। এদেশে দেখি ছাপা হলেই হল—তাতে ভুল-ত্রুটি থাকে থাকুক। একটি শব্দের

এদিক ওদিক হলে লেখার ভাব বা অর্থ একেবারে উল্টে যায়। কত সাবধানে প্রুফ দেখতে হয়। তোরা কাগজে যদি ভুল-ভ্রান্তি ছাপবি—তবে উন্নতিটা কি হল বল?" স্বামী ত্রিগুণাতীত নিরুত্তর রহিলেন। প্রেস ও পত্রিকা দুটীর জন্য স্বামী ত্রিগুণাতীতকে কঠোর পরিশ্রম করিতে হইতেছে—বিশেষ কম্পোজিটার প্রভৃতির সন্ধানে তাঁহাকে বস্তিতে বস্তিতে ঘুরিতে হইতেছে শুনিয়া স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র স্বামী বিবেকানন্দকে প্রেসটি বিক্রয় করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ ও জিদ্ করিলেন। অবশেষে প্রেস বিক্রয় করা হইল। স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ তখন পত্রিকার গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য মনোনিবেশ করিলেন।"

[উদ্বোধন, সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যা, মাঘ, ১৩৫৪ পৃঃ ২১৬-৮]

[স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ সম্পর্কে স্বামীজী শিষ্যকে যা বলেন তা স্বামি-শিষ্য সংবাদে লিপিবদ্ধ আছে]:—

"শিষ্য। মহাশয়, স্বামী ত্রিগুণাতীত এই পত্রের জন্য যেরূপ পরিশ্রম করিতেছেন, তাহা অন্যের পক্ষে অসম্ভব।

স্বামীজী। তুই বুঝি মনে কচ্ছিস, ঠাকুরের এইসব সন্ন্যাসী সন্তানেরা কেবল গাছতলায় ধুনি জ্বালিয়ে বসে থাকতে জন্মেছে? এদের যে যখন কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবে, তখন তার উদ্যম দেখে লোকে অবাক হবে। এদের কাছে কাজ কি করে করতে হয়, তা শেখ্। এই দেখ্, আমার আদেশ পালন করতে ত্রিগুণাতীত সাধনভজন ধ্যানধারণা পর্যন্ত ছেড়ে দিয়ে কাজে নেবেছে। এ কি কম Sacrifice-এর কথা! আমার প্রতি কতটা ভালবাসা থেকে এ কর্মপ্রবৃত্তি এসেছে বল্ দেখি! Success করে তবে ছাড়বে!! তোদের কি এমন রোক্ আছে?"

[স্বামী ত্রিগুণাতীতের রচনার নিদর্শন সামান্য-ভাবে দেওয়া হ'ল। উদ্বোধন, ২য় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা—নববর্ষ প্রবেশ', বিঘ্ননাশক শ্রীগণেশের স্মরণে শ্লোক উদ্ধার করেছেন]:—

যং ব্রহ্ম বেদান্তবিদো বদন্তি,
পরং প্রধানং পুরুষং তথান্যে।
বিশ্বোদ্গতেঃ কারণমীশ্বরং বা,
তস্মৈ নমো বিঘ্নবিনাশনায় ॥"

[অনুষ্টুপ ছন্দে মাতা শিবানীর কাছে উদ্বোধনের জন্য অশীর্বাদ প্রার্থনা করেছেন, করেছেন সকল দেবদেবী কাছেও]:—

মাতঃ প্রণমি শ্রীপদে ॥
মঙ্গল-কারিণী শিবা, ত্রাতা শম্ভু উমাপতি,
সিদ্ধিদাতা গণেশাদি আছেন যত দেবতা,
রবি গুরু যত গ্রহ, পুরন্দরাদি দিক্‌পতি,
পাশী পবন পাবক রাশি যক্ষ সবে তথা,—
সদা করুন মঙ্গল ॥
করুন, করুণা করি,
উদ্বোধন-শিরোপরি—
আশীর্বচন বর্ষণ, শুভদৃষ্টির অর্পণ;—

['বর্ষপ্রবেশ' প্রবন্ধের উপসংহারে লিখেছেন]:—

"অতি মহৎ উদ্দেশ্য সহকারে উদ্বোধন জন-সমাজে শুভযাত্রা করিয়াছেন; কামনা—পরহিত; —না, 'পর'—নহে; স্বজাতির, স্বদেশের,—নিজের অভিন্ন বন্ধুবর্গের হিতকামনা। সমভিব্যা-হারে সম্বল—একমাত্র নিঃস্বার্থপরতা; বিশ্বাস—সেই সম্বলেই কৃতকার্য্য হইবে, স্বদেশের প্রভূত উপকার করিবে। সৎকার্য্যে নানাবিঘ্ন, বিপদ প্রতিপদে,—কেবল সহায়—পরমবন্ধু ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা। ভরসা—উদ্যম। প্রসাদ—জগদীশ্বরের শ্রীচরণাশীর্ব্বাদ। তাঁহারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক।"

[স্বামী ত্রিগুণাতীত প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যা (১৩০৫, মাঘ) হইতে চতুর্থ বর্ষের কর্ত্তিক সংখ্যা (১৩০৯) পর্যন্ত 'উদ্বোধনের' সম্পাদক ছিলেন।]

উদ্বোধনের প্রথম সম্পাদকের আবির্ভাবস্থান

শ্রীসতীশচন্দ্র নাথ

শ্রীরামকৃষ্ণের লীলার প্রধান স্থান দক্ষিণেশ্বরকে কেন্দ্র ক'রে ভাগীরথীর দুই কূলে পূর্ব ও পশ্চিম দিকে তাঁর অনেক লীলাসহচর জন্মগ্রহণ করেছিলেন। খাস কলকাতা শহরকে বাদ দিলে ভাগীরথীর পূর্ব তীরের নানা স্থানে তাঁর লীলাসহচরদের অনেকেই আবির্ভূত হয়েছিলেন। কেউ পর্ণকুটিরে আবার কেউ বা বিত্ত বৈভবের পরিবেশের মধ্যে।

দক্ষিণেশ্বর গ্রামেই জন্মগ্রহণ করেন স্বামী যোগানন্দ আর গঙ্গাতীরের জগদ্দল রাজপুরে জন্মেছিলেন বুড়োগোপাল (অদ্বৈতানন্দ)। মহানগরীর একটু দূরে বারাসতে জন্মগ্রহণ করেন তারকনাথ ঘোষাল (স্বামী শিবানন্দ)। মহানগরীর একটু দূরে পূর্বাঞ্চলে রাজারহাট বিষ্ণুপুরে আর ভাঙ্গর থানার দক্ষিণে নাওরা গ্রামের ভূমি প্রথম স্পর্শ পায় অপর পার্ষদ দুজনের—এঁরা হলেন নিত্যনিরঞ্জন ঘোষ আর সারদাপ্রসন্ন মিত্র। শ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্যপ্রভাবে আর ভাগবতী শিক্ষার গুণে এঁরাই পরবর্তীকালে হলেন স্বামী নিরঞ্জনানন্দ আর স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ।

স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দজীর জন্মস্থান নাওরা দর্শন করার সৌভাগ্য হয়েছিল সম্প্রতি। তারই সামান্য বিবরণ দেবার চেষ্টা ক'রব। শ্রীরামকৃষ্ণলীলাপার্ষদের জন্মস্থান নাওরা গ্রাম ভাঙ্গর থানার অন্তর্গত পইহাটী পরগণার মধ্যে অতি রমণীয় শোভার স্থান। এ হ'ল সবুজ শোভার ধনধান্যসাগরের মধ্যে বিটপীবেষ্টিত সুশোভিত দ্বীপসম। বর্ষাস্নাত বসুন্ধরার এ অঞ্চলের শ্যামশোভা তুলনাহীন

শতাধিক বৎসর পূর্বে ঐ অঞ্চলের অধিবাসীদের কলকাতায় গমনাগমনের অবলম্বন ছিল শালতী বা নৌকা। তারপরে ক্রমোন্নতি হয়ে হ'ল ছোট ছোট লঞ্চ-এর সাহায্যে যাতায়াত আর কলকাতার উত্তরাংশে শ্যামবাজার খালধারে অবতরণ। বর্তমানে সর্বত্রই বাসের পথের সম্প্রসারণে যাতায়াত অনেক সহজ ও সরল হয়েছে।

সারদাপ্রসন্নের জন্ম হয় মাতুলালয়ে ১৮৬৫ খ্রীঃ ৩০শে জানুআরি। মাতামহ নীলকমল সরকারের গৃহপ্রাঙ্গণে পরবর্তী কালে যে স্মৃতিবেদী প্রস্তুত হয়েছে তাতে শ্বেতপ্রস্তরফলকে লেখা আছে "ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপার্ষদ স্বামী ত্রিগুণাতীত (সারদাপ্রসন্ন মিত্র) জন্ম ১৮ মাঘ ১২৭১ সাল, সমাধি ২৬ পৌষ ১৩২১।"

শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মস্থান কামারপুকুরে। শিশু গদাধরের আবির্ভাবের জন্য নির্দিষ্ট ছিল ঢেঁকিশালা। তাঁর পার্ষদের আঁতুড়ের জন্য একটা ঢেঁকিশালাও ছিল না, অস্থায়ী একখানি পাতার ঘর তৈরি ক'রে তাতেই আবাহন করা হ'ল পার্ষদপ্রবরকে। সেই স্থানটি নির্দেশ করে এক সুশোভন তুলসী বেদী। ভক্তের স্থানের চিরন্তন প্রহরী।

জন্মগ্রহণের কিছুকাল পরে তাঁর আগমন হয় পিতৃগৃহে কলকাতার শ্যামবাজার অঞ্চলে। তাঁর পিতা শিবকৃষ্ণ মিত্রের আদি বাসস্থান ছিল কোন্নগরে। শিবকৃষ্ণের দ্বিতীয় পুত্রই সারদাপ্রসন্ন। বিত্তবান পিতা অপরিসীম স্নেহের নিদর্শনস্বরূপ পুত্রকে একটা সোনার ঘড়ি দিয়েছিলেন প্রবেশিকা পরীক্ষার আগেই।

ক্রমে তিনি ছেলেধরা মাষ্টারের হাতে পড়ে সমর্পিত হন শ্রীরামকৃষ্ণপদতলে। অপূর্ব মেধাবী

ছাত্র সারদাপ্রসন্ন কলেজের অধ্যয়ন শেষ করার আগেই গৃহত্যাগ ক'রে স্বামী বিবেকানন্দের ভাবধারায় অবগাহন করেন। স্বামী বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ মিশন স্থাপন করার পরে একখানি পত্রিকা প্রকাশের প্রয়োজন বোধ করেন আর অভাব বোধ করলেন একজন সুযোগ্য পরিচালকের। সে অভাব পূর্ণ হয় স্বামী ত্রিগুণাতীত মহারাজ-দ্বারা। তিনিই উদ্বোধনের প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যা (১৩০৫ মাঘ) হইতে চতুর্থ বর্ষের কার্ত্তিক সংখ্যা ১৩০৯ পর্যন্ত সম্পাদক ছিলেন এবং সুযোগ্য পরিচালনায় উদ্বোধনের প্রভাব বঙ্গ-হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করেন।

স্বামীজীর আজ্ঞা বহন ক'রে পাশ্চাত্য দেশে ভারতের শাশ্বত বাণী প্রচার করতে গুরুস্থান ত্যাগ করেন ১৯০৩ খ্রীঃ। আর তাঁর ভারতভূমিতে ফিরে আসা হ'ল না। এক বিকৃতমস্তিষ্ক যুবকের বোমার আঘাতে আহত হয়ে ১৯১৫ খ্রীঃ জানুআরি মাসে দেহত্যাগ করেন স্যানফ্রান্সিসকো হিন্দুমন্দিরে।

সন্ন্যাসগ্রহণের পর আর তাঁর জন্মস্থানদর্শনে আগমন হয়নি। মাতুলবংশের বিহারীলাল সরকার একজন পদস্থ ব্যক্তি ছিলেন; তাঁদের আগ্রহে স্মারক বেদীটি প্রস্তুত হয়ে আছে।

ঐ পুণ্যস্থান নাওরাগ্রাম-দর্শনে আমার যাওয়া হয়েছিল চাম্পাহাটী রেলস্টেশন থেকে বাস-যোগে ৯ মাইল দূরের বোড়া গ্রামে। এখানে একটি হাইস্কুল, বাজার ও পোস্টাফিস আছে। নাওরা গ্রামের প্রবেশপথে আছে নারায়ণী দেবীর মন্দির আর সরকারগৃহে আছে মধুসূদন-বিগ্রহ (শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি)। আমি যখন পৌঁছলাম তখন বেলা ৯টা। মধুসূদনের পূজা অন্তে পূজারী আমায় প্রসাদী বাতাসা দানে অনুগ্রহ করলেন।

নাওরা গ্রামে যাবার পথে দুটি গ্রাম চন্দনেশ্বর আর নারকেলবেড়িয়া বেশ সমৃদ্ধ। সর্বত্রই তীর্থযাত্রীর সমাদর। নাওরা গ্রাম থেকে ফেরবার অপর পথ আছে। ওখান থেকে পাঁচ মাইল পাকারাস্তা—বোড়া থেকে ভাঙ্গুরের খালের এ পাড় পর্যন্ত; আর সেই খাল পার হয়ে ভাঙ্গুর থানার কাছ থেকে শ্যামবাজার পর্যন্ত বাসযোগে আসবারকালে রাজারহাটে স্বামী নিরঞ্জনানন্দের জন্মস্থান নিরঞ্জনধাম দর্শন ক'রে ধন্য হলাম।

অমৃতের সন্ধানে

শ্রীক্ষিতীশ দাশগুপ্ত

তোমার আলোর পরশমণিটি
ছোঁয়াও আমার প্রাণে
অসীমের মাঝে চেতনা আমার
লয় করে দাও গানে।
বাসনা-মলিন মনকে আমার
অন্তরমুখী করগো এবার
মনের কালিতে ঢেকেছে নয়ন
চলেছি আঁধার পানে।

তোমার আলোর পরশমণিটি
ছোঁয়াও আমার প্রাণে।
গানের আড়ালে প্রণতি আমার
চরণ পরশ পায় যে তোমার
ব্যাকুল মিনতি তব কৃপা যাচে
অমৃতের সন্ধানে।
তোমার আলোর পরশমণিটি
ছোঁয়াও আমার প্রাণে।

পাতাল রেল*

[পূর্বানুবৃত্তি ।

অধ্যাপক অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতায় পাতাল রেল :

কলকাতার পাতাল রেল নির্মাণের কথাবার্তা চলছে আজ প্রায় বছর দশেক ধরে। এর মাঝে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞদল বিভিন্ন দেশ (ফ্রান্স, সোবিয়েত রাশিয়া প্রমুখ) থেকে আনিয়ে তাঁদের মতামত নেওয়া হয়। এই শহরের পক্ষে পাতাল রেলের বিকল্প কিছু আছে কিনা না তা' নিয়েও পত্রপত্রিকায় রকমারি লেখা প্রকাশিত হয়। মোট কথা, পাতাল রেল এ শহরে করতেই হবে, অন্য আর যাই উন্নতি করা হোক না কেন, এ মনোভাব ১৯৭১ খ্রীঃ এর পূর্বে ঠিক ছিল না। ঐ বছর ১৪ই জানুয়ারী আর. জি ক্যাভারিন (R G. Kaverin)-এর নেতৃত্বে ছয়-সদস্য বিশিষ্ট একটি সোবিয়েত বিশেষজ্ঞদল তাঁদের সুপারিশ তদানীন্তন ভারতীয় রেলমন্ত্রী শ্রীগুলজারীলাল নন্দার নিকট পেশ করেন। তাতেই দমদম থেকে টালিগঞ্জ পর্যন্ত ১৬'৫ কিলোমিটার দীর্ঘ একটি মেট্রো লাইন খুলবার সুস্পষ্ট পরিকল্পনা দেওয়া হয়।

উপরিউক্ত সুপারিশেই কলকাতার পরিবহন সমস্যার সমাধানের উপায় হিসাবে পাতাল রেলকে সর্বাগ্রাধিকার দেওয়া হয়। তখন 'U' (under ground) রেলের ব্যয়বরাদ্দ ধরা হয়েছিল ১১০ কোটি টাকা ; অতিরিক্ত ১০ কোটি টাকা ধরা হয়েছিল গাড়ীর চাকা ইত্যাদি (rolling stock) সরঞ্জামের জন্য। সুতরাং দমদম-টালিগঞ্জ লাইন নির্মাণের মোট ব্যয় তখন ধার্য হয়েছিল ১২০ কোটি টাকা। সোবিয়েত বিশেষজ্ঞদের মতে অন্যান্য দেশে মেট্রো লাইন নির্মাণের সাম্প্রতিক ব্যয়ের তুলনায় এ ব্যয় বেশী নয়, বরং অনেকটাই অনুরূপ। তাঁরা লাইনটি নির্মাণ করতে প্রায় ৬ বছর লাগবে বলে ধরেছেন। লাইন চালু হলে এই ১৬'৫ কিমি পথ অতিক্রম করতে যাত্রীদের মোটামুটি ৩০ মিনিটের মত সময় লাগবে।

প্রথমে ঘণ্টায় ৩০ জোড়া করে ট্রেন চলবে দু দিকে, পরে তা' বাড়িয়ে করা হবে ঘণ্টায় ৪০ জোড়া। প্রথমে ঘণ্টায় ৪০,০০০ এর মত যাত্রী চলতে পারবে, পরে তা' বেড়ে হবে ৮৭,০০০ (ভীড়ের সময়)। দুদিকে মিলে গড়ে দৈনিক ১১ লক্ষ যাত্রী চলতে পারবে (অর্থাৎ এক একদিকে প্রায় ৫½ লক্ষ করে)। এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে, পরিকল্পিত মেট্রো লাইন ডবল লাইনের হবে। প্রয়োজনীয় rolling stock (গাড়ীর চাকা ইত্যাদি) এদেশেই তৈরি হতে পারবে। এর জন্য সোবিয়েত বিশেষজ্ঞদল মাদ্রাজ ও দমদমে কারখানা স্থাপনের সুপরিশও করেছেন।

এই মেট্রো লাইনটি দুই পর্যায়ে নির্মাণ করা সম্ভব—প্রথম পর্যায়ে টালিগঞ্জ থেকে ডালহৌসি ; দ্বিতীয় পর্যায়ে ডালহৌসি থেকে দমদমে। কিন্তু সোবিয়েত বিশেষজ্ঞগণ গোটা পথটাই এক পর্যায়ে নির্মাণের পক্ষে মত দিয়েছেন এবং বিভিন্ন অংশের কাজ একই সঙ্গে শুরু করার অনুকূলে রায় দিয়েছেন। তাঁদের মতে, ন্যূনতম ১২ কিমি দৈর্ঘ্য না হলে মেট্রো লাইন তৈরি করতে খরচও বেশী লাগে, আর তার পরিচালন ব্যয় (operational cost)-ও গড়ে বেশী। ভারতীয় কারিগরী বিশারদদের সঙ্গে নিয়ে ঐ সোবিয়েত বিশেষজ্ঞরা

* প্রবন্ধটির ভিতর বিদেশের পাতাল রেলের আরো কিছু বিস্তৃত বিবরণ ছিল ; স্থানাভাববশতঃ এখানে তাহা আর প্রকাশ করা সম্ভব হইল না, শেষাংশটি দেওয়া হইল।

কলকাতার মাটি ভাল ক'রে পরীক্ষা করে দেখেছেন এবং এখানে পাতাল রেল নির্মাণের জন্য খননাবরণ (cut and cover) পদ্ধতিই অনুমোদন করেছেন।

কিন্তু এই পরিকল্পনা কিছুকালের জন্য চাপা পড়ে যায়—একদিকে বাঙ্গলাদেশের মুক্তি-সংগ্রামের জন্য, অপরদিকে ভারতীয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রি-সভার রদবদলের জন্য। অবশ্য কয়েকমাস বাদেই (১৯৭১ খ্রীঃ ৬ই সেপ্টেম্বর) তখনকার কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী শ্রীহনুমন্তাইয়া ঘোষণা করেন, কলকাতায় পাতাল রেল যথাশীঘ্র করা হবে। কিন্তু তৎকালীন অনিশ্চিত রাজনৈতিক পরিস্থিতির জন্য নির্মাণকার্য আরম্ভ করার কোন সঠিক তারিখ তিনি ঐ সময় দিতে পারেননি। সোবিয়েত বিশেষজ্ঞদের মতামত তখন আরো বিশদভাবে প্রকাশিত হয়। তাঁদের মতে, প্রস্তাবিত 'U' রেলের পরিচালন ব্যয় হবে বছরে আনুমানিক ৫·৬ কোটি টাকা। একবার গমনের (one trip) জন্য যদি যাত্রীভাড়া ২০ পয়সা ধার্য হয়, তবে বছরে লাভ হবে ২·৪ কোটি টাকা; আর ৩০ পয়সা ধার্য হলে বার্ষিক মুনাফা হবে ৬·৪ কোটি টাকা। প্রোজেক্ট রিপোর্ট ঐ বছর অক্টোবরের শেষে সম্পূর্ণ করে ফেলার কথা হয়। ভারত সরকার সেপ্টেম্বরের শেষাশেষি নক্সা (design) ইত্যাদি তৈরি করবার জন্য ৯ জন সোবিয়েত পরামর্শদাতা আনবার ব্যবস্থা করেন। পূর্বোক্ত সোবিয়েত রিপোর্টে বলা হয়েছিল, প্রতি যাত্রার (trip) ২০ পয়সা করে মাশুল ধার্য হলে মোট ব্যয়ের ১২০ কোটি টাকা উশুল হতে লাগবে ৫০ বছর, আর ৩০ পয়সা করে ধার্য হলে লাগবে মাত্র ১৯ বছর। অবশ্য এ বিষয়ে শেষ সিদ্ধান্ত নির্ভর করবে ভারতীয় রেলমন্ত্রকের ওপর।

টালিগঞ্জ-দমদম মেট্রো লাইনে মোট ষ্টেশন থাকবে ১৭টি অর্থাৎ প্রায় ১ কিলোমিটারে একটি। প্রস্তাবিত গতিবেগ ঘণ্টায় ৩৩ কিমি। ভীড়ের সময় যাত্রী চলবে ১ লক্ষ ৪১ হাজার এবং ২৪ ঘণ্টায় মোট ১১ লক্ষ। প্রতি যাত্রার (trip) গড় দৈর্ঘ্য ধরা হয়েছে ৭৩ কিমি। পুরো লাইনের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত গমন এবং এ প্রান্তে প্রত্যাবর্তন করতে একটি গাড়ীর মোট সময় লাগবে ৬৪ মিনিট। মাত্র একদিকেই যাচ্ছেন এরূপ যাত্রীর সর্বোচ্চ সংখ্যা ধরা হয়েছে ৪৯,০০০। প্রতি গাড়ীতে ছয়টি করে কামরা থাকবে; ঘণ্টায় গাড়ী চলবে ৩০টি করে। প্রথমে মোট কামরার সংখ্যা হবে ২০৪। যদি আট-কামরার গাড়ী চালান হয় এবং ঘণ্টায় ৪০ খানা করে, তাহলে যাত্রীবহন ক্ষমতা বেড়ে দাঁড়াবে ৮৭,০০০।

১৯৭১ খ্রীঃ ২৪শে সেপ্টেম্বর তারিখে কেন্দ্রীয় সরকারের রেল উপমন্ত্রী মহম্মদ সফি কুরেশী কলকাতায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, প্রস্তাবিত পাতাল রেল নির্মাণে মোট ব্যয় হবে ১৪০ কোটি টাকা, তার মধ্যে ২৩·৭ কোটি টাকা হবে বৈদেশিক বিনিময় বাবদ। তিনি আরো বলেন, যে রাশিয়ান বিশেষজ্ঞদের (৯ জন) আনা হচ্ছে তাঁরা কারিগরী উপদেষ্টা হিসাবেই কাজ করবেন; প্রোজেক্টের অন্যান্য সব কাজই করবেন ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ার ও অন্য কর্মীরা।

এর পরে ভারতীয় রেলওয়ে বোর্ড রাশিয়ান-দের দ্বারা প্রস্তুত কারিগরী-আর্থিক পরিকল্পনাটি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে দেখেন। ১৯৭২ খ্রীঃ ২১শে মার্চ এটি তাঁদের দ্বারা গৃহীত হয়। প্রোজেক্ট রিপোর্টে প্রস্তাবিত পাতাল রেলের সঠিক দৈর্ঘ্য হল ১৬·৪৩ কিমি। রেলওয়ে বোর্ডের হিসাব অনুযায়ী প্রথমদিকে প্রতি ঘণ্টায় গাড়ী চলবে ২৪ খানা করে, দৈনিক যাত্রীসংখ্যা হবে ১৩ লক্ষ এবং লাইনের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে পৌছতে সময় লাগবে ৪০ মিনিট।

সম্পূর্ণ নক্সা তৈরি করতে ১ বৎসর এবং লাইন নির্মাণ করতে করতে ৬ বৎসর—মোট ৭ বৎসর সময় লাগবে এই দমদম-টালিগঞ্জ পথ সম্পূর্ণ করতে। রেলওয়ে বোর্ডের হিসাবে ২০, ২৫ এবং ৩০ পয়সা ভাড়া ধার্য হলে সরকারকে এই রেল-পথের জন্য অনুদান (subsidy) দিতে হবে যথাক্রমে ৬·৮ কোটি, ৩.৯ কোটি এবং ১ কোটি টাকা।

সোবিয়েত বিশেষজ্ঞরা রেলওয়ে বোর্ডের প্রস্তাবগুলিকে মোটামুটিভাবে মেনে নিয়েছেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ২৪শে মার্চ (১৯৭২খ্রীঃ) কলকাতার পাতাল রেল পরিকল্পনাটি অনুমোদন করেন এবং এর নাম দেন Metropolitan Transport Project বা সংক্ষেপে MTP। তদানীন্তন MTP-প্রধান শ্রী জে. এন. রায় ঘোষণা করেন যে এই অনুমোদন পাওয়া মাত্রই বস্তুতঃপক্ষে পাতাল রেলের কাজ শুরু হয়ে গেছে। ঘোষণাটি করেন কলকাতায় ২৭শে মার্চ তারিখে। তিনি বলেন, ঐ বছর আগষ্ট মাসের মধ্যেই পাতাল রেলের বিভিন্ন সাজসরঞ্জামের জন্য টেণ্ডার আহ্বান করা করা হবে, আর খননকার্য আরম্ভ করা হবে ১৯৭৩ খ্রীঃ এর জানুয়ারী মাসের প্রথম দিকে।

MTP দ্রুত নক্সা তৈরি করে ফেলেন এবং নির্মাণ-কার্য শুরু হবার আগেই যাতে অনেকটা সাজসরঞ্জাম হাতে এসে যায় তার চেষ্টাও করেন। তাঁদের হিসাব অনুযায়ী ষ্ট্রাকচারাল ষ্টীল লাগবে ৩৬,০০০টন, মাইল্ড ষ্টীল রড্ লাগবে ৮২,০০০টন, ষ্টীল শীট্ পাইলস্ ২৮,০০০ টন, পাথরকুচি (stone chip) লাগবে ৬ লক্ষ কিউবিক মিটার, বালি ২লক্ষ ৪৫ হাজার কিউবিক মিটার, সিমেন্ট ৩ লক্ষ ২৫ হাজার টন, কাষ্ট আয়রণ লাইনিং ১২,০০০ টন এবং তার লাগবে ১,০০০ টন।

সব কাজ যদি পরিকল্পনা-মাফিক চলে, তাহলে ১৯৭৯ খ্রীঃ জানুয়ারী মাস থেকে এই পাতাল রেলে গাড়ী চলবে। এর জন্য মাদ্রাজে বিশেষ ধরনের ৩১১ খানা গাড়ী (কামরা) তৈরি হবে। উত্তর কলকাতার দমদম থেকে বেলগাছিয়া পর্যন্ত প্রথম পর্বে খনন ও লাইন বসানোর কাজ হবে; ১৯৭৫ খ্রীঃ এর শেষদিকে এই পর্বের কাজ শেষ হবে। এর পরেই অন্যান্য পর্বের কাজ যুগপৎ আরম্ভ করা হবে। নগরীর বিভিন্ন অংশ জুড়ে সেকশন ভাগ করে খননকার্য করা হবে। এর জন্য যাত্রী পরিবহনের যে বিকল্প ব্যবস্থাগুলি (traffic diversion) নেওয়া হবে তার একটি বিশদ পরিকল্পনা তৈরি করেছেন কলকাতা পুলিশ এবং MTP মিলে। MTP এখন শহরের বিভিন্ন স্থানে সাজসরঞ্জাম রাখবার ডিপো তৈরি করবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। নির্মাণের সময় যাতে কোন অসুবিধা না হয়, তার জন্যই এ প্রস্তুতি। শহরের দক্ষিণাংশে ব্রেস ব্রীজ (Brace Bridge) এবং দুর্গাপুর ইয়ার্ডে (Durgapur yard) তিনটি ডিপো এবং উত্তরাংশে কাশীপুরে একটি ডিপো থাকবে। এছাড়া, আরো অনেক ছোট ছোট ডিপো শহরের বিভিন্ন অংশে রাখতে হবে। প্রধান ডিপোগুলির জন্য এম. টি. পি কলকাতা পোর্ট কমিশনার্সের পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস পেয়েছেন। ছোট ডিপোগুলির জন্য তাঁরা প্রথমেই কলকাতা কর্পোরেশনের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন।

সাজসরঞ্জাম সংগ্রহ ও সংরক্ষণ ছাড়া যেটি এ পাতাল রেল নির্মাণের পথে প্রধান বাধা, তা হল জমি সংগ্রহ (land acquisition)। MTP-কে এর জন্য ২০৮ একর জমি সংগ্রহ করতে হবে; তার মধ্যে প্রায় ২৮ একর শহরের এমন সব অঞ্চলে যেখানে ঘর বাড়ীর দাম খুবই বেশী। এই জমি সংগ্রহের জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে হবে আনুমানিক ৭কোটি টাকা। একমাত্র দমদমেই ১৬৮ একর জমি সংগ্রহ করা হবে; এটি অবশ্য অনেকটা সহজসাধ্য, কারণ প্রায় সবটাই চাষের

জমি। এখানে একটি বড় মেরামতি কারখানা হবে; তাছাড়া গাড়ীগুলি রাখবার ডিপো (car-shed) ও এখানেই হবে। জমি সংগ্রহের আইন-আদালত ঘটিত ব্যাপার দেখবার জন্য MTP-এর একটি আইনবিভাগও থাকবে।

রেলপথটি নির্মাণের সময় traffic diversion-এর জন্য কলকাতা পুলিশ যে বিশেষ ব্যবস্থাগুলি নেবেন, তার জন্য MTP-এর খরচ হবে ৩৫লক্ষ টাকা। তাঁদের ধারণা, এর জন্য কলকাতা নগরীর অধিবাসী ও যাত্রীদের যে অসুবিধা হবে তা তাঁরা হাসিমুখে মেনে নেবেন। যদিও পাতাল রেল তৈরির কাজ এই দেশে এই প্রথম, MTP বৈদেশিক বিশেষজ্ঞদের সাহায্য কম নিয়েই পারবেন মনে হয়। নির্মাণকালের সময় মাত্র ২জন বিদেশী উপদেষ্টা থাকলেই চলবে। এর জন্য ৬ লক্ষ টাকার বেশী ব্যয় হবে না। ডিজাইনের কাজে MTP সোভিয়েত বিশেষজ্ঞদের সাহায্য পেয়েছেন। ভবিষ্যতে প্রয়োজন হলে তাঁদের সাহায্য আরো পাবেন, এরূপ আশ্বাসও পেয়েছেন। গত বৎসরের (১৯৭২ খ্রীঃ) শেষের দিকে MTP-র report পুরোপুরি তৈরি হয়ে যায়।

লাইন পাতা হবে ভূপৃষ্ঠের থেকে ৩০ ফুটেরও বেশী নীচে। হিসাব করে দেখা গেছে, যাতে লোকসান না হয়, তার জন্য ৭ কিমি দূরত্ব বাবদ ৩২ পয়সা ভাড়া ধরতে হবে। যদি দমদম থেকে অফিস এলাকার কাছাকাছি সেণ্ট্রাল ষ্টেশন পর্যন্ত ৩০ পয়সা ভাড়া ঠিক করা হয়, তবে সরকারকে বছরে এর জন্য ১ কোটি টাকা অনুদান দিতে হবে

১৯৭২ খ্রীঃ ৩০শে জুন তদানীন্তন রেলমন্ত্রী হনুমন্তাইয়া পুণাতে এক ঘোষণা করেন এই মর্মে যে, আটটি ভারতীয় শহরে (কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, পুণা আহমেদাবাদ, হায়দরাবাদ, কানপুর, এবং বাঙ্গালোর) পাতাল রেল তৈরি করা হবে; তন্মধ্যে প্রথম তিনটি যথাক্রমে অগ্রাধিকার পাবে। আটটি শহরে পাতাল রেল হলে ভারত নিঃসন্দেহে একটি বিশ্বরেকর্ড স্থাপন করবে; কিন্তু রেলমন্ত্রী-সময়সীমা কিছু নির্দেশ না করায় এটি একটি শুভ ইচ্ছার পর্যায়েই থেকে গেছে এখনো। এবছর (১৯৭৩ খ্রীঃ) নূতন রেল মন্ত্রী এল. এন. মিশ্র নূতন রেলবাজেট উপস্থাপিত করবার সময় বলেন, ভারতে চারটি শহরে (কলকাতা, দিল্লী, বোম্বাই এবং মাদ্রাজ) পাতাল রেল নির্মাণ করা হবে। এর মধ্যে কলকাতার কাজ তো আনুষ্ঠানিকভাবে আরম্ভ হয়েই গেছে।

এ-প্রসঙ্গে আর একটি কথা উল্লেখ্য। গত বছর (১৯৭২খ্রী) জুনমাস থেকে দ্বিতীয় আর একটি লাইন খোলার সম্ভাব্যতা নিয়ে অনুসন্ধান চালাচ্ছেন কলকাতা মেট্রোপলিটান পরিবহন কর্তৃপক্ষ (MTP)। এটি হবে শ্যামবাজার থেকে বেহালা পর্যন্ত (সার্কুলার রোড ও ডায়মণ্ড হারবার রোড বরাবর)। এটি করা হবে এই কারণে যে, কলকাতা নগরীর পরিবহনের যে ধরন বর্তমানে দেখা যায়, তার সঙ্গে এটি সঙ্গতিপূর্ণ; তদুপরি এটি নির্মাণেও বেশী সুবিধা হবে বলে মনে হয়। ইতিমধ্যে শিয়ালদা হাওড়া লাইন (যেটিকে দ্বিতীয় পথ বা route বলে ধরা হয়) সম্পর্কে MTP তাঁদের ইঞ্জিনিয়ারিং পর্যবেক্ষণ কার্য (survey) শেষ করেছেন।

গত বছর ৪ঠা জুন থেকে ৭-সপ্তাহব্যাপী এক সফরে বেরিয়েছিলেন ভারতীয় রেলওয়ের তরফে ৭-সদস্য বিশিষ্ট একটি দল। এই দলের নেতা ছিলেন MTP-র মুখ্য অধিকারিক (Chief Administrative officer) শ্রী জে. এন. রায়। এঁরা সোভিয়েত ইউনিয়ন, অন্যান্য কতিপয় পাশ্চাত্য দেশ ও জাপান সফর করেছিলেন। মস্কো, লেনিনগ্রাদ, লণ্ডন, ষ্টকহোম, মিউনিক প্যারিস, বুদাপেস্ত, টোকিও এবং ওসাকা

শহরের পাতাল রেল নির্মাণের বিভিন্ন পর্যায়ে ঐসব শহরের পাতালরেল কর্তৃপক্ষের কি কি অভিজ্ঞতা হয়েছিল তা' জানার জন্যই এসফর। এতে শুধু নক্সা ও নির্মাণ পদ্ধতিই (design of construction) জানা হয়নি পরিচালন এবং সংরক্ষণ (operation and maintenance) সম্পর্কেও যথেষ্ট জ্ঞানলাভ হয়েছে।

কলকাতার সরু সরু রাস্তা ও ঘনসন্নিবিষ্ট ঘরবাড়ী পাতাল রেল তৈরির কাজে নিঃসন্দেহে একটি বিশেষ বাধা; কিন্তু অনতিক্রমণীয় বাধা নয়। ১নং লাইন (দমদম-টালিগঞ্জ লাইন)-এর দমদম প্রান্তে লাইনটি মাটির ওপরে থাকবে। বেলগাছিয়া থেকে শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড় পর্যন্ত টানেল এবং অপেক্ষাকৃত গভীর লাইন তৈরি হবে। বাকী অংশ প্রায় পুরোটাই 'খননাবরণ" পদ্ধতিতে হবে। যদিও এলাইন সম্পূর্ণ তৈরি করে গাড়ী চালানোর তারিখ হল মোটামুটি ১৯৭৯ খ্রীঃ জানুয়ারী, তবে তার অনেক আগেই পরীক্ষামূলকভাবে দমদম থেকে বেলগাছিয়া পর্যন্ত (২'৫ কি মি) নূতন ডিজাইনের গাড়ীগুলি চালিয়ে দেখা হবে। এই গাড়ীগুলি তৈরি হবে মাদ্রাজের পেরাম্বুরে অবস্থিত Integral Coach Factory-এবং ১৯৭৫ খ্রীঃ এর মধ্যেই MTP-র হাতে যাতে এগুলি আসে, তার চেষ্টা করা হবে। বায়ুচলাচল শীতাতপনিয়ন্ত্রণ এবং বিশেষ সংকেত ব্যবস্থার (ventilation, airconditioning and cab-signalling) ক্ষেত্রে সোভিয়েত সাহায্য পাওয়া যাবে না বলে অন্য উৎসের সন্ধান করতে হবে। তবে নক্সা তৈরি ও নির্মাণকার্য অধিকাংশ-টাই দিশী উৎসের থেকে করা হবে। যখন নির্মাণ কার্য পুরোদমে চলবে, তখন প্রায় ১০,০০০ হাজার লোক এ লাইনে নিযুক্ত হবে।

শ্রী জে, এন, রায়ের ঘোষণা অনুযায়ী দমদম-টালিগঞ্জ মোট দূরত্ব (১৬'৪৩ কিমি) অতিক্রম করতে ৩২ মিনিট সময় লাগবে। প্রত্যেক গাড়ী আটকামরার হবে। প্রত্যেক কামরায় থাকবে চারটি দুই-পাল্লার দরজা, যাতে যাত্রীরা দ্রুত উঠতে-নামতে পারে। ডালহৌসি অঞ্চলের কাছাকাছি দুটি ষ্টেশনে এসক্যালেটর থাকবে; বাকী ষ্টেশন-গুলিতে থাকবে সিঁড়ি। ষ্টেশনগুলির গড় গভীরতা হবে ৩০ ফুট করে। প্রথমতঃ, দৈনিক ১৩ লক্ষ যাত্রী চলার ব্যবস্থা করা হবে এ-লাইনে. পরে তা' বাড়িয়ে করা হবে ১৭ লক্ষ। ১৯৭১ খ্রীঃ-এর মূল্যস্তরের ভিত্তিতে মোট ব্যয় ধার্য করা হয়েছে ১৪০ কোটি টাকা; কিন্তু ইস্পাত, সিমেন্ট ও অন্যান্য নির্মাণোপকরণ সব কিছুরই দাম বেড়ে যাচ্ছে বলে শেষ পর্যন্ত ব্যয় অনেকটা বেড়ে যাবে বলেই মনে হয়। পরিকল্পিত মেট্রোলাইনের জন্য শ্রীরায় স্বতন্ত্র বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা এবং আরক্ষা-ব্যবস্থা (police) প্রস্তাব করেছেন।

সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষ কলকাতা কর্পোরেশন MTP-এর জন্য শহরের ৬টি বড় পার্কের অংশবিশেষ সাময়িকভাবে ছেড়ে দিতে রাজী হয়েছেন। এগুলিতে MTP পাতাল রেলের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামসমূহ রাখতে পারবেন। এছাড়া এ রেল ব্যবস্থার ventilating duct, cooling tower প্রভৃতির জন্য ও স্থান প্রয়োজন। তারজন্যও পার্কগুলির কিছু অংশ ব্যবহৃত হবে। পার্কগুলির নাম যথাক্রমে টালাপার্ক, দেশবন্ধুপার্ক, গৌরীমাতা উদ্যান, মার্কাস স্কোয়ার (এগুলি সবই উত্তর কলকাতায় অবস্থিত) এবং দক্ষিণ কলকাতায় কালীঘাটপার্ক এবং অ্যাশলীন রোডে অবস্থিত নর্দান পার্ক। কলকাতা কর্পোরেশন পার্কগুলির এই জায়গা ছেড়ে দেওয়ার জন্য MTP-র কাছে প্রতি ১০০ বর্গফুটে ৪০ টাকা করে বার্ষিক খাজনা দাবী করেছেন।

এক ৭ই মে (১৯৭৩খ্রীঃ) MTP-র জেনারেল ম্যানেজার শ্রীসত্যশরণ মুখোপাধ্যায় (দক্ষিণ-পূর্ব

রেলওয়ের পূর্বতন জেনারেল ম্যানেজার) কলকাতায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে পাতাল রেল সম্পর্কে কিছু নতুন তথ্য প্রকাশ করেছেন। সেগুলি নিম্নলিখিতরূপ :—

পাতাল রেলের পুরোপুরি কাজ শুরু হবে প্রায় বছর দুই পরে। তখনই মোট কর্মীর সংখ্যা এতে হবে ১০,০০০। দমদম-টালিগঞ্জ লাইন শেষ হলে তাদের মধ্যে সাড়ে তিন হাজারের চাকুরি থাকবে; বাকী সাড়ে ছ'হাজার ছাঁটাই হবেন, কিন্তু তাদের বিকল্প কাজের অভাব হবে না, কারণ পাতাল রেলের সম্প্রসারণের কাজ আরো অন্তত ২০।২২ বছর ধরে তো চলবেই। চীফ ইঞ্জিনিয়ার শ্রীজিতেন্দ্রনাথ রায়ও এই সম্মেলনে পাতাল রেলের বিভিন্ন দিক্ নিয়ে আলোচনা করেন।

দ্বিতীয় পর্যায়ে শিয়লদা-হাওড়া, বরানগর-বেহালা লাইনের কাজ হবে। দমদমে কাজের ভার সরকারী পরিচালনাধীন সংস্থা ন্যাশনাল কনস্ট্রাকশন কর্পোরেশনকে দেওয়া হয়েছে। কলকাতা ময়দানেও কাজ শুরু হবার মুখে। চলতি বছরে বর্ষার পরে পুরোদস্তুর কাজ চলবে। মাপের দিক থেকে ১নং লাইনের (দমদম-টালিগঞ্জ) দৈর্ঘ্য সাড়ে আঠারো (১৮$\frac{1}{2}$) কিমি হবে। এর মধ্যে ১৬·৩৫ কিমি পাতাল রেল খননাবরণ (cut and cover) পদ্ধতিতে হবে। চিৎপুর ইয়ার্ডে এবং সার্কুলার ক্যানালে ১ কিলোমিটারের কিছু বেশী লাইন টানেল পদ্ধতিতে বসান হবে। টানেল পদ্ধতিতে যদি পুরো লাইনটা করতে হত, তবে ব্যয় পড়ত প্রায় ৩০০ কোটি টাকা। সুতরাং খননাবরণ পদ্ধতিই বেছে নেওয়া হয়েছে ব্যয় সংক্ষেপের জন্য। তদুপরি কলকাতার মৃত্তিকা টানেল পদ্ধতির চেয়ে খননাবরণ পদ্ধতিই বেশী উপযোগী।

MTPর কর্মসূচী অনুযায়ী ১৯৭৮ খ্রীঃ-এর প্রথমে দমদম-টালিগঞ্জ পাতাল রেলের নির্মাণ কার্য সম্পূর্ণ হবে। তারপর ৬ মাস ধরে পরীক্ষামূলকভাবে গাড়ী চালাবেন চালকবর্গ (drivers) এবং ১৯৭৯ খ্রীঃ থেকে যাত্রীবাহী পাতাল রেলগাড়ী চলতে শুরু করবে। জেনারেল ম্যানেজার পূর্বোক্ত সাংবাদিক সম্মেলনে আরো জানিয়েছেন, ২।৩ সপ্তাহের মধ্যে ভারত থেকে একটি বিশেষজ্ঞ দল সোবিয়েত ইউনিয়নে যাচ্ছেন। তাছাড়া, জাপানের ওসাকা থেকে একটি বিশেষজ্ঞ দল কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ভারতে আসছেন। এরা বায়ুচলাচল ও শীতাতপনিয়ন্ত্রণ বিষয়ে বিশেষ তথ্যাভিজ্ঞ। সিগন্যালিং, বায়ুচলাচল ও শীতাতপ-নিয়ন্ত্রণের যন্ত্রপাতির জন্য বৈদেশিক মুদ্রা লাগবে ২৮ কোটি টাকা। এর জন্য জাপানের ওপরই বেশী নির্ভর করা হবে; কারণ টোকিও এবং ওসাকাতে পাতাল রেলের এই ব্যবস্থাগুলি অত্যুৎকৃষ্ট। নমুনাও নক্সা (model & design) তৈরির জন্য MTP খড়্গপুরের IIT-র সাহায্যে ও সহযোগিতা পাবেন।

পাতাল রেলে মুখ্যভূমিকা নেবে কম্পিউটার যন্ত্র; চালকের ভূমিকা হবে গৌণ। কম্পিউটারের সাহায্যে স্বয়ংক্রিয় সংকেতব্যবস্থা (signalling) হবে। ২ মিনিট অন্তর গাড়ী ছাড়বে; আগের গাড়ী কতদূরে এবং কি অবস্থায় আছে তা' কম্পিউটার যন্ত্রই বলে দেবে। গতিবেগ সম্বন্ধে কোন ভুল হলে তাও শুধরে দেবে। একমাত্র কম্পিউটার বিগড়ে গেলে চালকের দায়িত্ব বাড়বে, নতুবা তার প্রধান কাজ হবে এ যন্ত্রের দিকে নিরন্তর লক্ষ্য রাখা, তাহলেই গাড়ী ঠিকমত চলবে।

উক্ত সাংবাদিক সম্মেলনে শ্রীমুখোপাধ্যায় আরো বলেছেন, দুনিয়ার কোথাও পাতাল রেল বিনা অশ্রুপাতে (without tears) নির্মাণ করা

সম্ভব হয়নি, তবে ভরসাও দিয়েছেন এই বলে যে, আট ঘাট বেঁধে কাজ করলে অশ্রুবিসর্জনের মাত্রা অনেক কমানো যেতে পারে। কলকাতার পাতাল রেলের সমস্যা ও সমাধান, সম্প্রসারণ ও সংহতি-সাধন নিয়ে কালে কালে অনেক নতুন তথ্যই প্রকাশিত হবে।

'অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু' এ স্বস্তিবচন উদ্ধৃত করেই আপাততঃ শেষ করা যাক্।

" 'প্রেম' 'প্রেম'—এই মাত্র ধন"

শ্রীশিবশম্ভু সরকার

আকাশের তারাগুলো দেখছো
ভাবছ অবাক্ বিস্ময়ে
মিষ্টি, কি মধুর ওদের দ্যুতি
দূরে, অতিদূরে, কিন্তু যেন বড় কাছে
প্রাণে আনে প্রবাহ
ভাবে দেয় গভীরতা
পুলকিত মনে ফোটে বার বার
ঈশ্বর কি মহান শিল্পী!

ঘাসের উপর শুয়ে পড়ো
দেখবে—অদ্ভুত কৌশলে
ছোট্ট একটি ঘাসের পাতা
বয়ে আনছে সূর্য হোতে তাপ
কি প্রমত্ত প্রেরণা—
মাটি থেকে টানছে জলকণা
অন্তরীক্ষ হেসে দিল অম্লারক
সেই তো হোল প্রাণের শ্বাস
তবু হল না বিশ্বাস
অসীম স্রষ্টার হাতে সীমার বিলাস!

একটি শিশির-কণা হায়
সীমানায় ভায়
পরক্ষণে শূন্যে উঠে যায়
সাগরের কল্লোলিত রূপে
কত অপরূপে
একই গান ফিরে ফিরে গায়
সৃষ্টি নয়, স্রষ্টা নয়, ঘনীভূত প্রেমে!
লীলায়িত দুই হাত—ভস্মে আর হেমে!

শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীস্বদেশ বসু

তোমার অপার করুণা—মানুষের প্রতি তোমার ভালবাসা
বারে বারে টেনে আনে তোমারে এ মাটির পৃথিবীতে।
যুগে যুগে একটি প্রজ্বলিত দীপশিখা, প্রাণ থেকে প্রাণকে ঘিরে
আলোকিত করে, শাশ্বত জীবনের জাগ্রত দ্বারে আনন্দলোকে উত্তীর্ণ করে।
অধুনা দুই শতকের সুসমাচারে, তুমি এবারে এলে প্রর্থনায় ও প্রণামে
নিত্যানন্দের খোলে চৈতন্যের আবেশে স্বয়ং ঈশ্বর রামকৃষ্ণরূপে।
তোমার মত ভালবাসার ধন আর কিছুই নেই এ সংসারে,
তুমি জ্যোতিঃস্বরূপ, তুমিই সংসার-বৃক্ষের আদিমূলে।
তোমার নিত্য স্মরণে, জগৎ জুড়ে তাপদগ্ধ বিশ্বজনে,
বহে নিরন্তর প্রেমের ধারা অযুত লক্ষ কোটি প্রাণে!

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

সত্য ঢাকা হিরণ্ময় পাত্রে ছলনার!
অপাবৃত করো মাগো আবরণ তার!
তুমিই তো মহামায়া ইন্দ্রিয়-নিচয়
করিয়াছ বহির্মুখী। 'মার'-এর দুর্জয়
বিক্রমে তোমারই খেলা! তৃষ্ণা-জলধির
পারে যাবে কোন্ জন? আনন্দাম্বুধির
অতলে ডুবিতে কার পরাণ পাগল?
মানবশক্তিরে মাত্র করিয়া সম্বল
এমায়া দুরতিক্রম্য। তুমি যদি দ্বার
ছাড়ো তবে আর্তজীব তৃষ্ণা-সাহারার
পারে যেতে পারে চিরশান্তির গভীরে!
অহং-এর মৃত্যুজালে অনশন-তিমিরে
জীবন দুঃসহ! করো আমারে তোমারই!
তৃষ্ণার্ত অধরে ঢালো করুণার বারি।

শ্রীশ্রীমায়ের পবিত্র স্মৃতি

শ্রীপ্রতাপাদিত্য রায়

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে ফাল্গুন মাসে আমি মা, বাবা এবং আরো চারজন ময়মনসিং জেলার বল্লারতন-গঞ্জ হইতে জয়রামবাটি অভিমুখে রওনা হই। আমার বয়স তখন ১৫। ইতিপূর্বে আমরা কেবল ঠাকুরের ও শ্রীশ্রীমায়ের ফটো দেখিয়াছিলাম কিন্তু তাঁহার ও শ্রীশ্রীমার সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান আমাদের ছিল না। ৺সুরেন্দ্রনাথ ভৌমিক, ৺সৌরেন্দ্রনাথ মজুমদার ও ৺সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার (আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক) প্রায়ই বল্লা আসিতেন; তাঁহারা শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজাপাঠ করিতেন এবং প্রচারকার্যও আরম্ভ করেন, যাহার ফলে আমি শ্রীশ্রীমায়ের বিষয় জানিতে পারি ও শ্রীশ্রীমায়ের কৃপা পাইবার আশায় জয়রামবাটি যাত্রা করি। শ্রীশ্রীমায়ের ইচ্ছায় সব যোগাযোগ হইয়া যায়। কলিকাতা যাইয়া ৺সৌরীন্দ্রনাথ মজুমদারের আলিপুরস্থ বাড়ীতে উঠি এবং তৎপর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা আমাদিগকে হাওড়ায় তুলিয়া দে

ভোর ৪ টার সময় বিষ্ণুপুর পৌছাইয়

গাড়ীতে ও পদব্রজে কোয়ালপাড়া মঠে রাত্রি ১০ টার সময় পৌছাই। আমরা সমস্ত দিন পরিশ্রমে ও একরূপ অনাহারে পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। মঠাধ্যক্ষ তৎক্ষণাৎ রান্না করাইয়া আমাদিগকে তৃপ্তির সহিত খাওয়াইলেন। সেখানে রাত্রিযাপন করিয়া পরদিন সকালেই রওনা হইলাম। কোয়ালপাড়ায় জুতা রাখিয়া খালিপায়ে রওনা হই, এবং ৮ টায় জয়রামবাটি পৌছি। শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী পৌছিয়া বাড়ীর বাহিরে একটি বৈঠকখানাঘরের বারান্দায় জিনিস-পত্রাদি রাখিয়া বসিলাম। তখন শ্রীশ্রীমায়ের ভ্রাতা বাহিরে ছিলেন। কেবল আমি ও আমার মা বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলাম। প্রবেশ করিয়া দূর হইতেই শ্রীশ্রীমাকে তাঁহার ঘরের বারান্দায় বসিয়া থাকিতে দেখিলাম—চিনিতে পারিলাম যে ইনিই শ্রীশ্রীমা। কারণ তাঁহার দুই বৎসর পূর্বেকার তোলা ফটো দেখিয়াছিলাম। দেখি শ্রীশ্রীমা তরকারী কুটিতেছেন। আমরা সামনে দাঁড়াইতেই তিনি আমার মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কোত্থেকে এসেছ?' মায়ের উত্তর শুনিয়া বলিলেন, 'বাঙ্গাল'। আমার মা বলিলেন 'হ্যাঁ'।—'আসতে ক'দিন লেগেছে'?—'চারদিন'। শ্রীশ্রীমা বলিলেন, 'এতদূর থেকে এসেছ'! আমার কাছে কেন এসেছ? বেলুড়ে রাখাল, শরৎ, তারক রয়েছে সেখানে গেলেই তো হ'ত।' মা বলিলেন, 'মা, শুনেছি আপনি সাক্ষাৎ কালী। সেজন্য আপনার কাছে এসেছি।' পরে শ্রীশ্রীমায়ের ভ্রাতৃবধূরা বলিলেন, 'আজ সকালেই ঠাকুরঝি বলিয়াছিলেন যে আজ অনেক ভক্ত আসবে—ভোগের জোগাড়টা একটু বেশী করতে হবে। তাই তিনি নিজেই তরকারী কেটে দিচ্ছেন।' তরকারী কোটা শেষ হইলে শ্রীশ্রীমা আমার মাকে বলিলেন, 'চল স্নান করে আসি।' শ্রীশ্রীমায়ের অনুমতি লইয়া মা শ্রীশ্রীমাকে তেল মাখাইয়া দিলেন। তারপর বাড়ীর পিছনে পুকুরে গিয়া স্নান করিয়া আসিয়া উঠানে একটি ছাপড়ার নীচে ঠাকুরের পূজার আয়োজন করিতে লাগিলেন। পূজাসমাপনান্তে শ্রীশ্রীমা সকলকে ডাকিয়া একে একে মন্ত্র দিলেন। আমাকে মন্ত্র দিবার পূর্বে আমার মা বলিয়াছিলেন, 'এ ছোট ছেলে, একেও মন্ত্র দিবেন? জপ করিবে কিনা ঠিক নাই।' শ্রীশ্রীমা বলিলেন,

'না করুক, পরে কাজ দেবে।' আমিও মন্ত্র পাইলাম। ভোগ হওয়ার পর শ্রীশ্রীমা নিজের হাতে মাখিয়া অন্নপ্রসাদ আমাদিগকে পরিবেশন করিলেন এবং দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া আমাদের খাওয়া দেখিলেন। তারপর আমাদের এঁটো পাতা ফেলিবার জন্য নিজে আগাইয়া আসিলেন। তখন আমরা বাধা দিলাম। আমার মা আসিয়া পাতাগুলি সব উঠাইয়া ফেলিয়া দিলেন। এইদিন বৈকালে আমরা সকলে বাড়ীর ভিতর যাইয়া তাঁহার ঘরের বারান্দায় বসিলাম। তিনি আমাদিগকে অনেক কথা বলিতে লাগিলেন। বলিলেন, 'সর্বদা ঠাকুরকে স্মরণ করো, ঠাকুর তোমাদের পেছনে আছেন, কোনও ভয় নাই। নিজ সন্তানকে যেরূপ ভালবাস সেইরূপ ভালবাসা ঠাকুরের উপর রেখো, কোনও চিন্তা নাই।' আর বলিলেন, 'সিংহবাহিনীকে দর্শন কোরো ও এখান থেকে কিছু মাটি নিয়ে যেও – কোন বিপদ আপদ হবে না।' আর ভানু পিসির সঙ্গে দেখা করিয়া আসিতে বলায় আমরা তাঁহার নিকট গেলাম। আমাদিগকে দেখিয়া ভানুপিসি খুব খুশী হইয়া ঠাকুরের কালের অনেক ঘটনা বলিতে লাগিলেন। বলিলেন, 'ঠাকুর সজনে ফুলের চচ্চড়ি ভালবাসতেন।' রাত্রিতে আমার মা শ্রীশ্রীমার ঘরের নীচেই শয়ন করিলেন। শ্রীশ্রীমা খাটের উপর, তখন কথায় কথায় মা শ্রীশ্রীমাকে বলিলেন যে ঠাকুর যে শ্রীশ্রীমাকে কালী বলিতেন, তাহা সত্য কিনা। শ্রীশ্রীমা জবাব না দিয়া অন্য কথা পাড়িলেন। কিন্তু জোর করার পরে বলিলেন, 'ঠাকুরের কথা সবই ঠিক।' পরদিন দোল উৎসব; আমরা শ্রীশ্রীমায়ের পায়ে আবির দিয়া প্রণাম করিলাম এবং সেই পায়ে-দেওয়া আবির সঙ্গে করিয়া আনিলাম। বৈকাল ৪ টার সময় জয়রামবাটি হইতে রওনা হইলাম। শ্রীশ্রীমাও আমাদের সাথে সাথে গ্রামের শেষ সীমা পর্যন্ত হাঁটিয়া আসিলেন। আমরা তাঁহার শ্রীচরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। মা অশ্রুপূর্ণ লোচনে আমাদিগকে বিদায় দিলেন এবং বলিলেন, 'আবার এসো'। তারপর অনেকদূর পর্যন্ত যাইয়া দেখিতে পাইলাম শ্রীশ্রীমা তখনও ঐখানে দাঁড়াইয়া আমাদিগকে দেখিতেছেন। তখন আমাদের মনের অবস্থা যে কিরূপ তাহা সহজেই অনুমেয়। মনে হইল—এ যে আমাদের জন্ম-জন্মান্তরের মা—করুণাময়ী মা !!

পুনরায় ১৯১৯ খ্রীঃ আমি মাকে সঙ্গে লইয়া বাগবাজারে শ্রীশ্রীমায়ের বাটীতে আসিয়া শ্রীশ্রীমার চরণ দর্শন করি। ইহাই শ্রীশ্রীমায়ের প্রকটলীলায় আমার শেষ দর্শন, আমি তখন কলিকাতায় বঙ্গবাসী কলেজে পড়িতাম। তাঁহার দেহত্যাগের পর এইখানেই তাঁহাকে শেষ দর্শন করি

সমালোচনা

সরল বিচারে অদ্বৈতবাদ : শ্রীতেজোময় ঘোষ, এম্. এসসি, এফ-আই. এ। প্রকাশক : শ্রীতেজোময় ঘোষ, ১৮-এ ল্যান্সডাউন টেরাস, কলিকাতা ২৬। পৃষ্ঠা—১৫০, মূল্য—৫·০০ টাকা

শ্রীযুক্ত তেজোময় ঘোষ লিখিত 'সরল বিচারে অদ্বৈতবাদ' গ্রন্থটি আদি হইতে অন্ত পর্যন্ত অবধানতার সহিত পাঠ করিয়া পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছি। গ্রন্থকার বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নশাস্ত্রে কৃতবিদ্য ছাত্র এবং কর্মক্ষেত্রে উচ্চ পদাধিষ্ঠিত ছিলেন। বর্তমানে জীবনসায়াহ্নে উপনীত। বেদান্ত-বিচারধারার সহিত তিনি দীর্ঘকাল সুপরিচিত এবং সাধনবলে বেদান্ত-সিদ্ধান্তে দৃঢ় আস্থাবান্। তাঁহার চিন্তার স্বচ্ছতা পুস্তকে সুস্পষ্ট। কোথাও জড়তা বা জটিলতা নাই। শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনবেদকার স্বামী সারদানন্দের কৃপাপ্রাপ্ত লেখক স্বগুরুচরণে পুস্তকখানি সমর্পণ করিয়া অশেষ গুরুভক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

উপনিষদ্-ভাষ্যসমূহ ও সূত্রভাষ্য রচনা করিয়া ভগবান্ ভাষ্যকার সিংহাবলোকন দ্বারা দেখিলেন যে ঐ সকল অতি গম্ভীর হইয়াছে, ষট্‌শাস্ত্রের জ্ঞান-বিনা উহাতে সাধারণের প্রবেশ দুষ্কর। তাই সাধারণ অধিকারীর জন্য তিনি প্রকরণ-গ্রন্থসমূহ রচনা করিলেন। উহাতে বেদান্তের বিষয় অতি সরল ও সুখবোধ্য করিয়াছেন। পরবর্তী পণ্ডিতগণের খণ্ডন মণ্ডনই অদ্বৈততত্ত্বকে সাধারণের দৃষ্টিতে ভীতিপ্রদ করিয়াছে।

প্রথমেই বলিয়া রাখা ভাল যে এই গ্রন্থে গ্রন্থকার নিজস্ব কোন অভিনব সরল বিচার পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়া তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—পাঠক যেন ইহা আশা না করেন। লেখক মতমতান্তরের খণ্ডন মণ্ডন, কূট যুক্তিতর্কসমূহ পরিহার করিয়া শ্রুতি ও 'বিবেকচূড়ামণি', 'অপরোক্ষানুভূতি', 'পঞ্চদশী' 'মাণ্ডূক্যকারিকা' প্রভৃতি প্রকরণ গ্রন্থোক্ত সরল যুক্তিগুলিই এখানে উপস্থাপিত করিয়াছেন এবং তাহার পুষ্টির জন্য নানা লৌকিক ও জড় বিজ্ঞানের দৃষ্টান্তসমূহের সাহায্য লইয়াছেন। তাহাতে আলোচ্য বিষয়গুলি সুখবোধ্য হইয়াছে।

গ্রন্থকার যথার্থই বলিয়াছেন যে বেদান্তোক্ত বিষয়টি অতি সরল। বস্তুতই ইহা এত সরল যে ইহাপেক্ষা সরল আর কিছু হইতে পারে না। কারণ জন্মাবধিই আমরা 'আমি'র সহিত পরিচিত। এই 'আমি'টি কে ইহাই বেদান্তের প্রতিপাদ্য বিষয়। এই 'আমি' আমার কাছে সর্বাপেক্ষা নিকট, এবং ইহা কাহারও আদেশ বা উপরোধ অপেক্ষা করে না, বা কোন মত বা পদ্ধতি মানিয়া লয় না। ইহা স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে আমরা বিশাল জগতের কত কিছুই জানি বা জানিতে চেষ্টা করি, কেবল জানি না আমার এই 'আমি'টিকে। অথচ এই 'আমি' জ্ঞানের উপর ভিত্তি করিয়াই অন্য যত কিছুর জ্ঞান। 'আমি' না থাকিলে কোন জ্ঞানই হইতে পারে না। আমি আছি, তাই জগৎও আছে বলিয়া মনে হয়। 'আমি'র অভাবে জগতের অস্তিত্ব প্রমাণ করিবে কে? বেদান্ত আমার এই 'আমি'টিরই যথার্থ স্বরূপ জানাইয়া দেয় মাত্র। আমরা আমাদের 'আমি'কেই ভুলিয়া বসিয়াছি। আমার 'আমি' অতি নিকট হওয়াতেই উহার প্রতি এই উপেক্ষা। ভাগবতে নারদ মুনিদের বলিয়াছেন—"সন্নিকর্ষোঽত্র মর্ত্যানামনাদরণ-

কারণম্। গাঙ্গং হিত্বা যথান্যত্তত্রত্যো যাতি শুদ্ধয়ে॥" (১০।৮৪।৩১)

গ্রন্থের সরল বিচার এই 'আমি'রই অনুসন্ধান। তাই গ্রন্থকার প্রথমেই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এই দুই কোটিতে যাবতীয় পদার্থ বিভাগ করিয়া ধীরে ধীরে তাহাদের স্বরূপ সুন্দরভাবে প্রকট করিয়াছেন। জ্ঞাতাই আমি বা আত্মা। আত্মার স্বতঃসিদ্ধ সত্তা, চিদ্রূপতা, আনন্দস্বরূপতা অবস্থাত্রয়ের পরিপ্রেক্ষিতে সুন্দর নির্ণীত হইয়াছে। যুক্তিদ্বারা ইহাও প্রদর্শিত হইয়াছে যে আত্মা অসীম, অনন্ত, নামরূপবিহীন, নির্বিকার, নিগুর্ণ, নিষ্ক্রিয় ও নির্বিশেষ। জ্ঞেয়বস্তু একটি চিত্তস্পন্দন মাত্র বা আরও সূক্ষ্মভাবে বলিতে গেলে মায়াবশে স্পন্দিতরূপে প্রতীয়মান আত্মচৈতন্য ব্যতীত আর কিছুই নহে। বিষয়ের পৃথক্ অস্তিত্বের প্রতীতি মিথ্যা। দৃঢ় জ্ঞানী জগৎ দর্শন করিয়াও তাহাকে নামরূপবর্জিত আত্মচৈতন্যরূপেই অনুভব করেন। দৈনন্দিন জীবনেও যাহা কিছু ভাল তাহাই মূলতঃ অদ্বৈত-তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সর্ব-সদ্গুণরাজি অদ্বৈতে পৌঁছিবার সহায়ক—ইত্যাদি আলোচনা অতি মনোরম হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তের সমর্থনে আচার্যদের বচন উদ্ধৃত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায়ে ঐ উদ্দেশ্যেই শ্রুতি ও স্মৃতি প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে। চতুর্থ অধ্যায়ে অদ্বৈতানুভবের উপায় বর্ণনা করিয়া পঞ্চম অধ্যায়ে জীবন্মুক্ত পুরুষের অপূর্ব আনন্দময় অলৌকিক স্থিতি ঘোষণা-প্রসঙ্গে গ্রন্থকার তাঁহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনার উপসংহার করিয়াছেন। পর পর এই অধ্যায় বিভাগের পরিকল্পনা প্রশংসনীয়।

গ্রন্থোক্ত নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অতি উপাদেয় ও প্রণিধানযোগ্য।

(১) দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈতের সমন্বয়। (৪৪ পৃষ্ঠা)

(২) প্রকৃত সাম্যবাদ একমাত্র অদ্বৈত-তত্ত্বের উপরই সুপ্রতিষ্ঠিত। (৪৭ পৃষ্ঠা)

(৩) কর্মত্যাগ-বিষয়ক আলোচনা। (৫০-৫৪ পৃষ্ঠা)

(৪) 'সিনেমাস্থিত সংসার' শ্লোকটি কৌতুকপ্রদ হইয়াও গভীরভাবদ্যোতক। (৬৬ পৃষ্ঠা)

(৫) সমাধির প্রসঙ্গ। (১২১-১২২ পৃষ্ঠা)

(৬) মনন। (১৩৩ পৃষ্ঠা)

(৭) জ্ঞান ও যোগ। (১৩৫ পৃষ্ঠা)

(৮) জ্ঞান ও ভক্তি। (১৩৭ পৃষ্ঠা)

চতুর্থ অধ্যায়ে অধিকারী ও কর্ম উপাসনাদি সাধনবিষয়ক আলোচনাটি অতীব হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। স্বানুভব প্রসঙ্গে লেখকের নিপুণতার সহিত সূক্ষ্ম তথ্যের অবতারণা বিশেষ অন্তর্দৃষ্টিরই পরিচায়ক।

পুস্তকের দক্ষিণ দিকের পৃষ্ঠাগুলির উপরিভাগে তত্তৎ অধ্যায়ের উল্লেখ থাকিলে ভাল হইত এবং বহু গম্ভীর বিষয় ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে বলিয়া গ্রন্থশেষে একটি নির্ঘণ্ট বা বিষয়ানুক্রমণিকা থাকা উচিত ছিল।

'আধুনিক উগ্র দ্বৈতবাদী শ্রীমদ্ভাগবতকে অদ্বৈত-তত্ত্বের বিরোধী বলিয়া প্রমাণ করিতে প্রয়াসী হন এবং···অনেক শ্লোকের অর্থকে বিকৃত করিতেও কুণ্ঠিত হন না' (৯৭ পৃষ্ঠা)—এই গ্রন্থে লেখকের এইরূপ কটাক্ষ অবাঞ্ছনীয়। অপর আচার্যদের হেয় প্রতিপাদন করা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে। বেদ-বেদান্ত-পুরাণাদির ইহাই এক অপূর্ব বৈশিষ্ট্য যে ইহার মধ্যে সকলেই স্ব স্ব যোগ্যতানুকূল মতসমূহের পরিপোষক সিদ্ধান্ত প্রাপ্ত হইয়া ধন্য হইয়া থাকেন এবং এইরূপেই বিভিন্ন মতাবলম্বী এক বিরাট জনসমাজ একই কালে সনাতন বৈদিক ধর্মের পক্ষপুটের আশ্রয়ে একতা-সূত্রে গ্রথিত হইয়া আছে। একই ভাগবত গ্রন্থের মধ্যে শ্রদ্ধেয় আচার্যগণ দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত,

অদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত, অচিন্ত্যভেদাভেদ প্রভৃতি বিভিন্ন মত বিভিন্ন অধিকারীর জন্য নিরূপণ করিয়াছেন। তাঁহাদিগকে কটাক্ষ না করিয়া উহাদের মধ্যে সমন্বয় প্রদর্শন করিবার চেষ্টাই প্রশংসার্হ। অদ্বৈতবাদের সহিত কাহারও বিরোধ নাই। 'তৈরয়ং ন বিরুধ্যতে' (মা: কা: ৩।১৭।১৮) 'বিবদামো ন তৈঃ সার্ধং অবিবাদং নিবোধত' (মা: কা: ৪।৫) ইত্যাদি স্থলে আচার্য গৌড়পাদও তাহাই বলিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দও বলিয়াছেন—'বিবাদ নয়, সহায়তা; বিনাশ নয়, পরস্পর ভাবগ্রহণ; মত বিরোধ নয়, সমন্বয় ও শান্তি।'

৪২ পৃষ্ঠায় সৎ, চিৎ, আনন্দকে ব্রহ্মের বিশেষণাত্মক বলা হইয়াছে। ইহা বিচার্য। সৎ চিৎ ও আনন্দ ব্রহ্মের স্বরূপ-লক্ষণ। শক্তি-বৃত্তিদ্বারা ঐ শব্দগুলি ব্রহ্মস্বরূপাববোধ উৎপন্ন করে না। লক্ষণাদ্বারাই উহারা অখণ্ডার্থের বোধক হইয়া থাকে মাত্র। ইহারা ব্রহ্মের বিশেষণ নহে। বিশিষ্ট জ্ঞান অখণ্ড ব্রহ্মাববোধক হইতে পারে না। পরে অবশ্য লেখকও এই কথা প্রকারান্তরে বলিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

আধুনিক বিজ্ঞান-ধারায় শিক্ষিত ও যুক্তিবাদী যুবকগণ এই গ্রন্থে বহু চিন্তার খোরাক পাইবেন। যদি তাঁহারা গ্রন্থোক্ত সরল যুক্তির আলোকে শাস্ত্রমর্মে শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া দৈবী সম্পদ্ অর্জনে প্রয়াসী হন তবে তাহাদ্বারা নিজেদের, সমাজের ও দেশের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে এবং উহাতে গ্রন্থকারের মনোগত আকাঙ্ক্ষা পরিপূর্তি লাভ করিবে ও তাঁহার এই গ্রন্থসংকলন-শ্রম তথা প্রকাশন সর্থক হইবে।

পুস্তকের কাগজ, ছাপা, বাঁধাই সবই অতি উত্তম হইয়াছে।

কেবল একটি শুদ্ধিপত্র যোজনা করিলেই ছাপার অসংখ্য অশুদ্ধিজনিত চক্ষুপীড়া কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইত।

গ্রন্থটির বহুল প্রচার শ্রীভগবৎসমীপে প্রার্থনা করি

'স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু'।

—স্বামী ধীরেশানন্দ

Can one be Scientific and yet spiritual? Swami Budhananda. Published by Advaita Ashrama, 5 Dehi Entally Road, Calcutta 14: pp 114 including Notes and References: Price Rs. 2.00

বেশ কিছুদিন আগে স্বামী বুধানন্দের আর একখানি গ্রন্থ—The Mind and Its Control সমালোচনা করবার সুযোগ আমার হয়েছিল। সেই সময় তাঁর রচনা সম্বন্ধে যে প্রাথমিক ধারণা করেছিলাম তা সম্পূর্ণভাবে দানা বেঁধেছে বর্ত-মান গ্রন্থখানি পাঠ করে। বিষয়টি ব্যাখ্যা করবার জন্যে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে একটি প্রসঙ্গের উল্লেখ করব।

আমরা তখন আইন পড়ি। আইন-ক্লাসে একজন অধ্যাপক প্রায়ই বলতেন: সকল আইনজীবী দু' শ্রেণীর হন। প্রথম শ্রেণীর আইনজ্ঞ আইনের বিভিন্ন কেতাব, কেস্-ল ইত্যাদি থেকে বহুল পরিমাণে এবং সবিস্তারে উদ্ধার করে তাঁর প্রতিপাদ্য বিষয় প্রমাণের প্রচেষ্টা করেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর আইনজ্ঞ কিন্তু মাত্র সংশ্লিষ্ট Act খানি হাতে নিয়ে তার ধারা ও অনুচ্ছেদ ব্যাখ্যা করেই বলেন: ধর্মাবতার! এই হ'ল আইন—এর আর অন্য রকম ব্যাখ্যা সম্ভব নয়।

স্বামী বুধানন্দের পর পর দু'খানি গ্রন্থ সমা-লোচনার জন্যে পড়ে আমার দৃঢ় ধারণা হয়েছে যে লেখক হিসাবে তিনি শেষোক্ত শ্রেণীর

আইনস্টাইনদের সঙ্গেই তুলনীয়। তিনি তাঁর বক্তব্য বিষয় বলেন প্রত্যয়ের সঙ্গে, আর যা কিছু বলেন তাকে প্রতিষ্ঠিত করেন দৃঢ় বনিয়াদের ওপর। উপরন্তু বিষয়বস্তু অনুসারেই নির্ধারণ করেন ভাষার 'উচ্চতা ও সমতা'। (বাক্যাংশটি বঙ্কিমচন্দ্রের।)

আলোচ্য গ্রন্থখানি কয়েকটি প্রবন্ধের সমষ্টি। প্রবন্ধগুলো 'বেদান্তকেশরী'র বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল, এবং প্রত্যেকটিই বোধ হয় স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে। প্রত্যেক প্রবন্ধের এই স্বয়ংসম্পূর্ণতা বজায় রেখেও গ্রন্থখানিতে একসংখ্যকতা বা ইউনিটি আনবার সার্থক প্রচেষ্টা করা হয়েছে। ফলে হোয়াইটহেড, শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ, আইনস্টাইন এবং আরো অনেকে একই মঞ্চ থেকে প্রবক্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। খণ্ডন ছাড়া প্রতিষ্ঠা করা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অসম্ভব। সুতরাং এই ধরনের তত্ত্বালোচনায় বিভিন্ন অসম ব্যক্তিত্বের সহাবস্থান সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত—অপরিহার্যও বলা চলে।

গ্রন্থখানি জিজ্ঞাসা এবং উত্তর—দুই-ই। জিজ্ঞাসা হ'ল: কারও পক্ষে একই সঙ্গে কি বৈজ্ঞানিকতা এবং আধ্যাত্মিকতার পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভব? এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রাথমিক প্রশ্ন হ'ল: ব্যক্তির ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিকতা এবং আধ্যাত্মিকতার মধ্যে সমন্বয় সাধনের প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতা কোথায়? শেষোক্ত প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে স্বামী বিবেকানন্দের জীবনবেদের মধ্যে: অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতির ঊর্ধ্বে ওঠবার প্রচেষ্টা করেই মানুষ 'মানুষ' বলে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। অন্তঃপ্রকৃতির ঊর্ধ্বে ওঠবার জন্যে প্রয়োজন হ'ল ধর্মের এবং বহিঃপ্রকৃতিকে জয় করবার জন্যে বিজ্ঞানের। সুতরাং বিজ্ঞান ও ধর্ম পরস্পরের প্রতিযোগী নয়, সম্পূর্ণ পরিপূরক। উভয়েরই উদ্দেশ্য হ'ল মানুষকে মুক্তিপথের সন্ধান দেওয়া। এবং এই মুক্তিই হ'ল পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তিত্ব উপলব্ধির শর্ত।

এখন প্রশ্ন, ব্যক্তির মধ্যে বিজ্ঞান ও ধর্মবিশ্বাসের সহাবস্থান সম্ভব কিনা? হ্যাঁ সম্ভব। শুধু উপরিতলাশ্রয়ী বৈজ্ঞানিক ('surface scientists') এবং উপরিতলাশ্রয়ী অধ্যাত্মবাদীরাই ('surface spiritualists') বলেন 'না'। স্বামী বুধানন্দ দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করেছেন যে এই দুই গোষ্ঠীর কেউই মানুষকে ঠিক জীবন-সমস্যার সমাধানের পথনির্দেশ করতে পারবেন না (p. 84)। সমাধানের সন্ধান পাওয়া যাবে প্রকৃত বৈজ্ঞানিকের মধ্যে যিনি আইনস্টাইনের ভাষায়, দৃঢ় ধর্মবিশ্বাসসম্পন্ন না হয়ে পারেন না। অপরদিকে ধর্মকেও সম্প্রসারিত হতে হবে, কারণ ধর্মের বর্তমান বিপদ হ'ল নিজস্ব দুটি গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটির জন্যে—সংকীর্ণতা ও অগভীরতা। ধর্মের অগভীরতা দূর করতে হ'লে ঈশ্বরকে উপলব্ধির চৌহদ্দির মধ্যে নিয়ে আসতে হবে। বিশ্বাস করতে হবে যে "God can be realised, and has been realised." (P. 10)। ঈশ্বরের উপাসনাকে হোয়াইটহেডের মত 'a flight after the unattainable' (p. 9) বলে বর্ণনা করলে বিজ্ঞান ও ধর্মবিশ্বাসের সমন্বয়ের কাজ এগোবে না। ফলে মানবাত্মার মুক্তির সাধনাও—যে সাধনায় লোকত্তর পুরুষগণ যুগ যুগ নিয়োজিত হয়েছেন—সফল হবে না। এই পরিস্মারকের মধ্যেই রয়েছে পথনির্দেশ। সুতরাং গ্রন্থখানি হিতকারিতার দিক্ দিয়েও মূল্যবান। প্রত্যয়ের সঙ্গে পর্যালোচিত বিষয়বস্তু সাধারণ পাঠকের মধ্যেও প্রতীতি উৎপাদন করবে বলেই মনে করি। অন্ততঃ চিন্তার খোরাক যে যোগাবে তাতে কোন সন্দেহই নেই।

ডক্টর শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়

তন্ত্রাচার্য শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব—শ্রীবসন্ত কুমার পাল। প্রকাশিকা: গীতা দেব, ত্রিবৃত্ত

প্রকাশন, একত্রিবৃত্ত সরণি, কুচবিহার। পৃষ্ঠা ২৫৬+সূচীপত্রাদি ; মূল্য পাঁচ টাকা।

তন্ত্রসাধনার ক্ষেত্রে 'শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব' অবিস্মরণীয় একটি নাম। তন্ত্রচার্যের খ্যাতি বিশ্ব-বিশ্রুত। আলোচ্য পুস্তকখানিতে শিবচন্দ্রের জন্ম, পিতৃপরিচয়, সংস্কৃতে ব্যুৎপত্তি, শাস্ত্রচর্চা, শিষ্য-পরিচিতি, সাধনরহস্য প্রভৃতি নিপুণ লেখনীতে বিবৃত।

প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ্ শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় ভূমিকায় গ্রন্থকারের যে পরিচিতি দিয়াছেন, তাহাতে রহিয়াছে : 'শ্রীবসন্তকুমার পাল আজীবন সাহিত্য সাধক ...আরও বড় কথা, তিনি শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব মহাশয়ের সহিত ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত ছিলেন এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সর্বমঙ্গলা সভার সক্রিয় সদস্য ছিলেন। কাজেই এই দায়িত্বপূর্ণ কর্তব্য সম্পাদনে তিনিই উপযুক্ত ব্যক্তি। তিনি বর্তমানে প্রায় ৮৭ বৎসরে, বৃদ্ধ ও ব্যাধিপীড়িত।' এই বৃদ্ধবয়সে ভগবৎকৃপায় তিনি এমন একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, যাহা জীবনী লেখকগণের নাম-তালিকায় তাঁহার নামটিও উজ্জ্বল করিবে। শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব মহাশয়ের একখানি জীবনীর খুবই অভাব ছিল, ডক্টর আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে এই গ্রন্থখানি প্রকাশিত হওয়ায় সেই অভাব অনেকাংশে পূর্ণ হইয়াছে।

কলিকাতা হাইকোর্টের তদানীন্তন বিচারপতি স্যর জন উড্রফ বিদ্যার্ণব মহাশয়ের পাণ্ডিত্যে ও সাধনায় আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার নিকট তন্ত্রসাধন সম্বন্ধে শিক্ষা গ্রহণ করিয়া কিরূপ অভিজ্ঞতালাভ করেন, তাহার চমৎকার বিবরণ এই পুস্তকে রহিয়াছে। সাধকের মানসিক প্রবণতা, চারিত্রিক লক্ষণ, দক্ষতা, অধিকার প্রভৃতি বিচার করিয়া তন্ত্রাচার্য মহাশয় শিক্ষার্থীকে লক্ষ্যের দিকে লইয়া যাইতেন। বিচারপতি উডরফ তন্ত্রশাস্ত্রে প্রভূত পাণ্ডিত্য অর্জন করিয়া ইংরেজীতে যে গ্রন্থ রচনা করেন, তাহা ভারতের বাহিরে ভারতীয় তন্ত্র-সাধনা ও সাহিত্যের প্রতি বিদ্বজ্জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণে বিশেষ সহায়ক হইয়াছে। আমরা আশা করি গ্রন্থখানি যোগ্য মর্যাদা লাভ করিবে।

আত্মদর্শন ও সাধনতত্ত্ব—(প্রথম খণ্ড) তীর্থস্বামী। প্রকাশক : স্বামী সোমানন্দ। প্রাপ্তিস্থান : দি মডার্ন পাবলিশার্স, ৮এ কলেজ রো, কলিকাতা-৯। পৃষ্ঠা ৩৬০। মূল্য বার টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থে ভগবদ্গীতার সাধনতত্ত্ব ও বেদোক্ত সাধনপদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা আছে। প্রধান প্রধান উপনিষৎ ও অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে সুপ্রযুক্ত উদ্ধৃতিগুলি গ্রন্থকারের শাস্ত্রজ্ঞানের পরিচয় প্রদান করে। 'মায়া' প্রসঙ্গে লেখকের মন্তব্য : "'মায়াবাদ' বলিয়া কোন দার্শনিক মতবাদ তত্ত্বতঃ নাই। অথচ 'মায়াবাদ' সম্বন্ধে অনেকেই নানা প্রকার কথা জিজ্ঞাসা করেন।" মায়া সম্বন্ধে মানবমনে যে শঙ্কা জাগে, তাহার সমাধানের জন্য প্রবন্ধটিতে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

হংসবিদ্যাপ্রসঙ্গে যোগশিখোপনিষদের মন্ত্র উদ্ধৃত করা হইয়াছে :

'হকারেণ বহির্যাতি সকারেণ বিশেৎ পুনঃ।
হংসহংসেতি মন্ত্রোঽয়ং সর্বৈর্জীবৈশ্চ জপ্যতে॥

—প্রাণধর্মী জীব যেন হকার উচ্চারণ করিতে করিতে বাহিরে যাইতেছে, আবার সকার উচ্চারণ করিতে করিতে ভিতরে প্রবেশ করিতেছে। অর্থাৎ নিঃশ্বাসত্যাগে 'হকার' ও উচ্ছ্বাস গ্রহণে 'সকার' ধ্বনিত হইতেছে। সকল জীবই 'হংস' এই মন্ত্র প্রতিনিয়ত নিঃশ্বাসে উচ্ছ্বাসে জপ করিতেছে।" হংসবিদ্যা যে পরমাত্ম-বিদ্যা তাহা শাস্ত্রযুক্তিসহকারে মনোজ্ঞভাবে উপস্থাপিত।

গ্রন্থখানি সুধীসমাজে সমাদৃত হইবে বলিয়া আমাদের ধারণা।

লোকপাবন লোকনাথ—শ্রীহৃষীকেশ দে প্রাপ্তিস্থান—মহেশ লাইব্রেরী, ২।১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। পৃষ্ঠা ৯৮। মূল্য—তিন টাকা

আলোচ্য পুস্তকখানিকে শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারীর প্রতি অনুরাগী ভক্তবৃন্দের শ্রদ্ধাঞ্জলি বলিতে পারা যায়। স্তোত্র, বন্দনা, প্রার্থনা, জীবন-কাহিনী, উপদেশ-সংকলন প্রভৃতির মাধ্যমে অর্ঘ্য নিবেদিত হইয়াছে। গ্রন্থে উদ্ধৃত শ্লোকগুলির মধ্যে কিছু মুদ্রণপ্রমাদ রহিয়া গিয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

সেবাকার্য

বাংলাদেশ সেবাকার্য: অক্টোবর ১৯৭৩ পর্যন্ত সাতটি কেন্দ্রের মাধ্যমে দানসামগ্রীর মূল্য বাদ দিয়া মোট ৩০,০৮,৪৫০'৫৩ টাকা ব্যয় করা হইয়াছে। সেপ্টেম্বর মাসে কৃত সেবাকার্যের বিবরণ:

ঢাকা কেন্দ্রে ২,৫৭৯ জন চিকিৎসিত হন, এবং বিতরিত হয়: গুঁড়ো দুধ ১,৪০০ পাউণ্ড, শিশু-খাদ্য ১৪,২৫০ পা, গ্লাকৃসো ৬০০ পা, আস্রা ৪৭'২৫ কেজি, বিস্কুট ২৩৮৫ কেজি, কম্বল ৫,৩১৯, ধুতি ৩০, শাড়ী ৪,৩৬৩, লুঙ্গি ৮৫, সোয়েটার ৪,৭০৫, শার্ট ৬, মশারি ৪০, গামছা ৪৬, পুরাণো বস্ত্রাদি ৭,৮৫৭, গায়ে মাখা সাবান ৬২ খণ্ড, কাপড় কাচা সাবান ৬০ খণ্ড, বাসন ১৩৬ এবং জুতা ১ জোড়া।

বাগেরহাট কেন্দ্রে ৯,১৫০ জন, চিকিৎসত হন; বিতরিত হয়: বিস্কুট ৫৪কেজি, গুঁড়ো দুধ ৪১৬৫ পা, কম্বল ৭৮২ ধুতি ১০১' শাড়ী ৩,১২০, লুঙ্গি ১৪৫, সোয়েটার ৩৮৬, এবং পুরাণো বস্ত্রাদি ১,৬১৭।

দিনাজপুর কেন্দ্রে ২টি বাড়ী নির্মিত হয় ও ৫,৯০১ জন চিকিৎসিত হন, বিতরিত হয়: বিস্কুট ৪৫ কেজি, গুঁড়ো দুধ ২২৫ কেজি, কম্বল ৫০, ধুতি ৪০৯, শাড়ী ৮২২ এবং সাবান ২১৬ খণ্ড

ফরিদপুর কেন্দ্রে বিতরিত হয়: বিস্কুট ৩০ কেজি, জেলি ৭ পা, গুঁড়ো দুধ ৫০ কেজি, কম্বল ৩২১, শাড়ী ৫০২, সোয়েটার ১১৬, মশারি ৩৬, বর্ষাতি ১০ এবং পুরাণো বস্ত্রাদি ৩২২।

পশ্চিমবঙ্গ বন্যাত্রাণ-কার্য: কাঁথি, ডেবরা ও ঘাটাল এই তিনটি কেন্দ্রের মাধ্যমে ২৪.১০.৭৩ পর্যন্ত দানসামগ্রী মূল্য বাদ দিয়া মোট ১,০৩,৪৪৮'০০ টাকা খরচ করা হইয়াছে। ৯.৯.৭৩ হইতে ২৪.১০.৭৩ তারিখ পর্যন্ত বিতরিত হইয়াছে: চাউল ৬২৫ কুই, গুঁড়ো দুধ ১৭ ৫কুই, চিড়া ৩২ ৩১, গুড় ৬'২৩ কুই, লবণ ১.২১ কুই, বিস্কুট ৩৪টিন ৭১ প্যাকেট, শাড়ী ৪২৯, ধুতি ১২৩, শিশুদের পোশাক ১,৮০৬, চাদর ২৩ এবং ৩০৫টি পুরাণো বস্ত্রাদি। গ্রাহক সংখ্যা ১৯২ গ্রামের ১১,২২০টি পরিবারের ৫৫,৫০৯ জন।

গুজরাটের বন্যাত্রাণ-কার্য: গুজরাটে বন্যাপীড়িতদের জন্য সেবাকার্য সুষ্ঠুভাবে চলিতেছে।

কর্ণাটকে খরাত্রাণ-কার্য: সেপ্টেম্বর ১৯৭৩-এ ২,১৩১ জনকে খাদ্য দ্রব্য দেওয়া হয়।

কার্যবিবরণী

মাঙ্গালোর (মঙ্গলাদেবী) রোড, মাঙ্গালোর-১, দক্ষিণ কানাড়া) রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম ও দাতব্য চিকিৎসালয়ের ১৯৭২-৭৩ খ্রীষ্টাব্দের

(এপ্রিল হইতে মার্চ) কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে।

মাঙ্গালোরে আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে এবং মিশনের কাজ শুরু হয় ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে। আশ্রমে দৈনন্দিন পূজা ভজনাদি ছাড়াও সাময়িক ও বার্ষিক উৎসবগুলি মনোজ্ঞভাবে অনুষ্ঠিত হয়। বালকাশ্রমে দরিদ্র ও মেধাবী বিদ্যার্থিগণ বিনা-খরচে আহার ও বাসস্থানের সুযোগ লাভ করে। আলোচ্য বর্ষে স্কুলের ৪৩ জন ও কলেজের ৬ জন ছাত্র রাখা হইয়াছিল, সকলেরই সম্পূর্ণ ব্যয়ভার আশ্রম কর্তৃক বহন করা হয়। বালকগণকে যথার্থ মানুষ করিয়া তুলিবার জন্য বিশেষ যত্ন লওয়া হয়। তাহাদিগকে গীতা বিষ্ণুসহস্রনাম, ললিতা-সহস্রনাম সুন্দরভাবে আবৃত্তি করিতে শেখানো হইয়া থাকে।

স্থানীয় ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের পীড়িত জন-সাধারণের সেবাকল্পে ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত অ্যালোপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয়ে আলোচ্য-বর্ষে চিকিৎসিত রোগীর সংখ্যা ২৫,৪৩৮, তন্মধ্যে নূতন রোগী ৫,৫২২। রোগগ্রস্ত দরিদ্র জনগণ জাতিধর্ম নির্বিশেষে চিকিৎসালয়টিতে সুচিকিৎসা লাভ করিয়া রোগমুক্ত হইতেছেন।

আশ্রমের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও প্রতিবেদন

রাষ্ট্রীয় দুর্যোগে বিধ্বস্ত বিপর্যস্ত ও লুণ্ঠিত বরিশাল আশ্রম পরকারুণিক শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অসীম কৃপায় ১৯৭২ খৃষ্টাব্দের ২৫শে মে হইতে জাতি-ধর্মনির্বিশেষে স্থানীয় জনসাধারণের সহযোগিতায় আবার পূর্ণোদ্যমে গড়িয়া উঠিতেছে।

গত ২৮মে বরিশালের ভক্তবৃন্দ কীর্তনদল লইয়া বিরাট শোভাযাত্রা বাহির করেন। শোভা-যাত্রার পুরোভাগে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও ...জীর প্রতিকৃতি বহন করিয়া লইয়া যাওয়া হয়। সেদিন বরিশালবাসী সানন্দে দোকানপাট বন্ধ করিয়া শোভাযাত্রীদের অনুগমন করিয়া-ছিলেন।

৪ঠা জুন রবিবার হোম ও শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানের মধ্যে আশ্রম পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। অপরাহ্ণে দাতব্য হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয় ও শিশুখাদ্য বিতরণ কেন্দ্রের উদ্বোধন হয়। ৯ই জুলাই বিবেকানন্দ পাঠাগারের উদ্বোধনও উল্লেখযোগ্য।

শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি যথাবিধি মনোজ্ঞভাবে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। জন্মোৎসবগুলিতে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ সময়োপযোগী ভাষণ প্রদান করেন। অন্যান্য উল্লেখ্য অনুষ্ঠান : শ্রীঅরবিন্দ জন্মশতবার্ষিকী, শ্রীগুরুপূর্ণিমা শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা ও শ্রীশ্রীশ্যামাপূজা।

নবপ্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগার ও পাঠাগার এবং দাতব্য চিকিৎসালয়টির প্রতি জনসাধারণের বিশেষ আকর্ষণ। রিডিংরুমে প্রতিদিনের পাঠক প্রায় ত্রিশ-জন। চিকিৎসালয়ে চিকিৎসিতের সংখ্যা প্রায় ১৪,২৬০।

জনসেবা : ১৯৭২ খৃষ্টাব্দের মে মাস হইতে ১৯৭৩ খৃষ্টাব্দের আগস্ট পর্যন্ত আশ্রম কর্তৃক দুঃস্থ-সেবায় বিতরিত প্রায় ত্রিশ রকম জিনিসের মধ্যে উল্লেখযোগ্য : শাড়ী ৩১,৩৯৮, ধুতি ১০,০০০, কম্বল ৬,৭৫০ সোয়েটার ৯,৩৯৪, তাঁবু ১০৫, পুরাতন জামাপ্যাণ্ট ১৭,৩০০, গুঁড়ো দুধ ৭,৮২৭, সাবান ২,৮৮০ খণ্ড, জুতা ২০ জোড়া।

দশটি নলকূপ বসানো হয়। ৩.টি ঘর নির্মিত হয় এবং নগত সাহায্য দেওয়া হয় ১,৩১৩ টাকা।

সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন : সেণ্ট লুই বেদান্ত সোসাইটি : এপ্রিল ১৯৭২ মার্চ ১৯৭৩

সোসাইটির মন্দিরে সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা যথারীতি প্রতি রবিবার সকালে ও মঙ্গলবারের সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হইয়াছে। মঙ্গলবারের সন্ধ্যায় স্বামী সৎপ্রকাশানন্দ ধ্যান শিক্ষা দেন ও ভগবদ্-

গীতা ব্যাখ্যা করেন। ব্যাখ্যানের শেষে কাহারও কোন প্রশ্ন থাকিলে তাহার উত্তর দেওয়া হয়। বিশেষ দিনে ভজন গাওয়া হয়। ইহা ছাড়া রঙীন ছায়ছবিও দেখানো হয়। সোসাইটির অনুরাগী ভক্ত ও সভ্য ছাড়াও বহু কলেজ হইতে ছাত্র ছাত্রী ও বিভিন্ন চার্চের ভদ্র মহোদয়গণ সভায় আসেন।

যাঁহারা গ্রীষ্মকালীন সভায় উপস্থিত থাকিতে পারেন না, তাঁহারা পূর্বনিয়োগক্রমে অন্য সময়ে স্বামী সৎপ্রকাশানন্দের ভাষণের টেপরেকর্ড শুনিয়া যান।

প্রতিমাসে প্রথম বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতের (The Gospel of Sri Ramakrishna) ব্যাখ্যান হইয়া থাকে। এই সময়ে শ্রোতৃবৃন্দের জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়। প্রতি বছরের ন্যায় এবারেও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীবুদ্ধ, শ্রীশঙ্কর, শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা, স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ এবং স্বামী শিবানন্দের জন্মতিথি-পূজা যথাবিহিত পালিত হয়। এতদ্ব্যতীত গুডফ্রাইডে, খৃষ্টমাস ইভ ও শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার সময় অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে ভক্তদের বসাইয়া প্রসাদ পরিবেশিত হয়।

এই বৎসর আশ্রমে স্বামী গম্ভীরানন্দ, নিত্যবোধানন্দ, আদীশ্বরানন্দ, ভাস্যানন্দ, চেতনানন্দ ও ঋতজানন্দ মহারাজ আশ্রম পরিদর্শনে আসেন, যুক্তরাষ্ট্রের ও ভারত-সহ অন্যান্য দেশ হইতে প্রায় ১৫০ জন অতিথিও আসেন। স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বেদান্তের ভাবধারা প্রচারের জন্য অতিরিক্ত কয়েকটি সাক্ষাৎকার ও সভা হয়।

সোসাইটি স্বামী সৎপ্রকাশনন্দ লিখিত ৬৩ খানি 'মেথডস্ অব নলেজ' (Methods of Knowledge) ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে উপহার দেন। সভ্য, বন্ধু ও অনুরাগিগণ সোসাইটির পাঠাগার ব্যবহার করিয়া উপকৃত হইতেছেন।

বিবিধ সংবাদ

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে শ্যামপুকুরে অবস্থানকালে শ্রীশ্রীশ্যামাপূজা দিবসে বরাভয় মূর্তি ধারণ করিয়া ভক্তগণের পূজা গ্রহণ করিয়াছিলেন; তাহারই পুণ্য স্মৃতিতে ২৫.১০.৭৩ কালীপূজার দিন ৫৫।এ শ্যামপুকুর স্ট্রীটস্থ ভবনে পূজা এবং স্বর্গত ভক্ত কালীপদ ঘোষের ৩১নং শ্যামপুকুর স্ট্রীটস্থ বাসভবনে ধর্মসভা ও ভজন হইয়াছিল। উদ্বোধন কার্যালয় হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের সন্ন্যাসিগণ ও শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী পাঠ-আলোচনাদিতে অংশ গ্রহণ করেন। মাকড়দহ শ্রীরামকৃষ্ণ সাধনালয়ের ভক্তগণ সুন্দর ভজন গাহিয়াছিলেন

ভ্রম-সংশোধন

অগ্রহায়ণ, ১১শ সংখ্যা

কথাপ্রসঙ্গে ৬১৯ পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় কলম ১৬ পংক্তিতে স্বামী সচ্চিদানন্দ' স্থানে স্বামী সদানন্দ পাঠ করিবেন।—স:

উদ্বোধন ১ম বর্ষ

পুনর্মুদ্রণ

[১ম বর্ষ।] ১লা জ্যৈষ্ঠ। (১৩০৬ সাল) [৯ম সংখ্যা।]

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

—:*:—

(শ্রীম—কথিত।)

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সঙ্গে পরমহংসদেবের কথোপকথন।

প্রায় সপ্তদশ বর্ষ অতীত হইল। শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণাসপ্তমী তিথি। শনিবার প্রায় চারিটা বাজিয়াছে। পরমহংসদেব দক্ষিণেশ্বর কালীবাটী হইতে গাড়ি করিয়া কএকটী ভক্তের সহিত শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বাদুড়বাগানের বাটীতে আসিতেছেন। বিদ্যাসাগরকে দেখিবেন ভারি ইচ্ছা।

পরমহংসদেব বিদ্যাসাগরকে দেখিবার জন্য মাষ্টারের সহিত অনেক দিন পরামর্শ করিতে-ছিলেন। অবশেষে তাঁহাকে বিদ্যাসাগরের নিকট পাঠাইলেন। বিদ্যাসাগর জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি রকম পরমহংস? বুঝি গেরুয়া কাপড় পরা?' মাষ্টার উত্তরে হাঁসিতে হাঁসিতে বলিয়াছিলেন, "না মহাশয়, তিনি আমাদের মত কাপড় ও জামা পরেন। দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে থাকেন, ঈশ্বর বই আর কিছুই জানেন না; এক আশ্চর্য্য মানুষ, আপনি দেখ্‌লে বুঝ্‌তে পারবেন।" বিদ্যাসাগর বলিলেন, 'আচ্ছা বেশ, শনিবার বৈকালে আনিও।'

গাড়ি Amherst Street এ আসিয়াছে ও রাজা রামমোহন রায়ের বাড়ীর পার্শ্ব দিয়া যাইতেছে। এতক্ষণ পরমহংসদেব কথা কহিতে কহিতে, আনন্দ করিতে করিতে, আসিতেছিলেন, কিন্তু এক্ষণে হঠাৎ স্থির ও বাক্যশূন্য হইলেন।

মাষ্টার বুঝিতে পারেন নাই যে, পরমহংসদেব জগন্মাতার শ্রীপাদপদ্ম চিন্তা করিতেছেন, তাই বলিলেন, এইটী রাজা রামমোহন রায়ের বাড়ী। পরমহংসদেব বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "থাক্ থাক্, ও সব কথা আমার এখন ভাল লাগ্‌ছে না।"

কিয়ৎক্ষণ পরে গাড়ী বিদ্যাসাগরের বাড়ীর ফটকের সম্মুখে উপস্থিত হইল। পরমহংসদেব একজন ভক্তের হাত ধরিয়া নামিলেন। সঙ্গে ভবনাথ, মাষ্টার, হাজরা ও অন্যান্য ভক্ত। বৈঠকখানা যাইতে সিঁড়ি উঠিবার সময় পরমহংসদেব কিছু উদ্বিগ্ন হইয়া একজন ভক্তকে বলিলেন, 'তুমি কি বল, জামার বোতামগুলি কি বন্ধ করিয়া যাব?'

ভক্তটী বলিলেন, 'এজন্য আপনি ব্যস্ত হইবেন না; বোতাম না দিলে আপনার কিছু দোষ হবে না।' পরমহংসদেব বালকস্বভাব; একথা শুনিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। যেন পাঁচ বছরের ছেলে।

সিঁড়ি উঠিয়াই যে ঘর, সেই ঘরেই সকলকে লইয়া যাওয়া হইল। ঘরটী দক্ষিণমুখো। বিদ্যাসাগর দক্ষিণাস্য হইয়া কেদারায় বসিয়াছিলেন। সাহেবদের ন্যায় সম্মুখে টেবিল্। তাহাতে অনেক গ্রন্থ ও কাগজপত্র ছিল। ঘরে আরো কয়েকটী লোক ছিল তন্মধ্যে একটী ছেলে বিনা বেতনে স্কুলে ভর্ত্তি হইবার প্রার্থী হইয়া আসিয়াছিলেন। একটী ভক্ত অগ্রসর হইয়া বলিলেন, পরমহংসদেব আসিয়াছেন। বিদ্যাসাগর আসন পরিত্যাগ করিয়া দাঁড়াইয়া অভ্যর্থনা করিলেন। পরমহংসদেব পশ্চিমাস্য, একটি হাত টেবিলের উপর, এখনও দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, এক দৃষ্টে নিঃশব্দে বিদ্যাসাগরকে দেখিতেছেন। পরমহংসদেবের মুখমণ্ডল আনন্দে পূর্ণ, মাঝে মাঝে বালকের ন্যায় হাঁসিতেছেন।

ক্রমে ক্রমে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইলেন ও গভীর ভাব সমাধিতে মগ্ন হইলেন।

অনেকক্ষণ পরে হুঁস হইলে আসন গ্রহণ করিলেন ও বলিলেন, 'আমি জল খাব'। সমাধি-ভঙ্গের অব্যবহিত পরে প্রায়ই তিনি জল খাইতে চাইতেন। বিদ্যাসাগর ভক্তদের বলিলেন, "বর্দ্ধমান থেকে মিঠাই আসিয়াছে, উনি কি খাবেন?" ভক্তেরা কোনও আপত্তি না করাতে তিনি বাড়ীর ভিতর হইতে মিঠাই নিজে আনিয়া পরমহংসদেবের সম্মুখে রাখিলেন। পরমহংসদেব জগন্মাতাকে নিবেদন করিয়া কিছু মুখে দিবার পর বিদ্যাসাগর ভক্তদের খাইতে অনুরোধ করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আজ আমার খুব দিন, আজ সাগরে এসে মিলিলাম। এতদিন খাল, বিল, বড় জোর নদী পর্য্যন্ত আসিয়াছিলাম। (সকলের হাস্য)

বিদ্যাসাগর। তা বেশ মশাই, আপনার সাগর থেকে এখন কিছু লোনা জল লইয়া যান।

শ্রীরামকৃষ্ণ। না গো, তুমি কেন লবণ সমুদ্র হতে যাবে? তুমি তো অবিদ্যার সাগর নও! তুমি যে বিদ্যার সাগর, তুমি ক্ষীর সমুদ্র! (সকলের হাস্য)

বিদ্যাসাগর। মশাই, তা বল্‌তে পারেন বটে (সকলের হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তোমার সত্ত্বগুণ, তবে সত্ত্বের রজঃ। দয়া, পরোপকার ইহার ধর্ম্ম। এ রজোগুণের দোষ নাই। অনাসক্ত হয়ে পরোপকার কর্‌লে আর ঈশ্বরে ভক্তি থাকিলে ঈশ্বর লাভ নিশ্চয় হয়। আর আমি বলি তুমিই সিদ্ধ, তুমি যে কালে এত নরম হয়েছ। সিদ্ধ না হলে আলু পটল কখন নরম হয় না। (সকলের হাস্য)

বিদ্যাসাগর। কিন্তু মশাই কলাই বাটা সিদ্ধ হলে শক্ত হয়, নরম হয় না।

(সকলের হাস্য)

শ্রীরামকৃষ্ণ। (হাঁসিতে হাঁসিতে) ওগো তুমি সে সব কিছুই নও। তুমি শুধু পণ্ডিত নও। শুধু পণ্ডিত গুলো শুক্‌নো, একটুও রস্‌কস্ নাই। অনেকে মুখে পণ্ডিত, কাজে কিছুই নয়। পাঁজিতে লিখেছে বিশ আড়া জল, পাঁজি টিপ্‌লে কিন্তু এক ফোঁটাও পড়ে না। সেইরূপ পণ্ডিতরা লম্বা লম্বা কথা কয়, নির্গুণ ব্রহ্মের কথা কয়, তত্ত্বজ্ঞানের কথা কয়, নানাশাস্ত্রের কথা কয়। কিন্তু তাদের মধ্যে কজন ধারণা করে? আর ঈশ্বরকে জানাই জ্ঞান, ঈশ্বরকে জানাই বিদ্যা। শাস্ত্র বল, দর্শন বল, ব্যাকরণ বল, যদি এ সকল ঈশ্বর লাভের পথে না নিয়ে যায়, তা হলে কি হ'ল? ওতে কেবল মনের ভিতর কতকগুলো বোঝা আনা হ'ল।

সমস্ত গীতা পড়্বার কি দরকার? গীতা গীতা দশবার জপ দেখি, তা হোলেই হবে। কেন না দশ বার বোল্‌তে গেলে, 'ত্যাগী' হোয়ে যায়। অর্থাৎ এক কথায় গীতায় বলেছে, 'ত্যাগ কর।' অতএব গীতার সার এই.—হে জীব, ঈশ্বর লাভের জন্য সমস্ত ত্যাগ কর।

সন্ন্যাসী বাহিরের ত্যাগ কর্‌বে ও মনে ত্যাগ কর্‌বে, বিষয়কর্ম্ম ত্যাগ কর্‌বে আর যে কিছু কর্ম্ম কর্‌বে তা অনাসক্ত হয়ে করবে। সংসারী লোকের ঈশ্বর লাভের জন্য মনে ত্যাগ করা উচিত। [ক্রমশঃ]

আমার তিব্বত ভ্রমণের এক পরিচ্ছেদ।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর।)

সাহেব ক্রমশঃ নীচে চলিয়া গেল। আমরাও যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। এক-দিন একটী প্রৌঢ়াবস্থাপন্ন ভুটিয়া ভদ্রলোক আমাদের নিকট উপস্থিত হইলেন। পরিচয়ে বুঝিলাম, ইনিই আমাদের সহিত যাইবেন। লোকটী অপেক্ষাকৃত বিজ্ঞ বলিয়া বোধ হইল। এ ব্যক্তি হিন্দী বঙ্গবাসীর গ্রাহক - সংবাদপত্র রীতিমত পাঠ করে, ইংরাজী শিখিবার জন্য একখানি হিন্দী-ইংরাজী পুস্তক ক্রয় করিয়া সেইটী পাঠ করিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু শিক্ষকাভাবে বড় উন্নতি করিতে পারে নাই। এ ব্যক্তি বলিত, আমার অনেক গুলি প্রশ্ন মনে উদয় হয়, কিন্তু তাহার কিছুই মীমাংসা করিতে পারি না। স্বামী বিবেকানন্দের কথা বলায় বলিত, যদি কখনও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হয়, তাঁহাকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিব। নিজের জাতির মধ্যগত কদাচার সমূহের উল্লেখ করিয়া সময়ে সময়ে দুঃখ করিত। কিন্তু কুসংস্কারের আশ্চর্য্য প্রভাব! একদিন সে আমাদের নিকট অতি ম্লানবদনে আসিয়া উপস্থিত হইল। জিজ্ঞাসিলে বলিল, আমার একটী কন্যার অশুভ নক্ষত্রে জন্ম হইয়াছে, সকলে পরামর্শ দিতেছেন, ইহাকে ত্যাগ কর। কি করি, স্নেহ বশতঃ, একেবারে ফেলিয়া দিতে পারিতেছি না। মনে করিতেছি, অপরকে বিলাইয়া দিব। আমরা তাহাকে নানা প্রকারে প্রবোধ দিলেও সে নিবৃত্ত হইল না। পরিশেষে বিষণ্ণ-চিত্তে পঁচ্‌পন (পঞ্জিকা) খুঁজিতে খুঁজিতে দেখিল, তাহার দিন দেখা ভুল হইয়াছে। তখন একটু স্থির হইল।

ইহার নাম ধনিরাম—গোবরিয়া পণ্ডিতের আত্মীয়। ইহার সহিতই আমাদিগকে তিব্বত যাইতে হইবে—ইহার সহিত গোবরিয়ার পাঠাইয়া দিবার আরও কারণ ছিল। কালী নদীর অপর পারে নেপাল, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই নেপালের মধ্য দিয়া যাইলে তিব্বতীয়েরা কম সন্দেহ করিবে, এই ভাবিয়া গোবরিয়া এই পথ দিয়া আমাদিগকে পাঠান পরামর্শ স্থির করিল। আমরা ধনিরামের সহিত আলাপে বিশেষ প্রীত হইলাম গার্ব্বিয়াঙ হইতে বাহির হওয়া স্থির হইল।

প্রস্তাবের প্রথমে পাঠক-বর্গকে এক অপূর্ব্ব গুহার বিবরণ প্রদানের প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম। এইবার সেই কথা বলিব। আমাদের পণ্ডিত লছমীদতের সহিত প্রত্যহই ধুনির ধারে বসিয়া গল্প

হইত। একদিন পণ্ডিত বলিল—"ছাংরু গ্রামের অনতিদূরবর্ত্তী পর্ব্বতে এক অপূর্ব্ব গুহা আছে, একবার আমরা উহা দেখিতে গিয়াছিলাম। উহার মধ্যে অনেক মহাত্মা যোগ-মগ্ন হইয়া সমাধিস্থ রহিয়াছেন, দেখিলাম। তাঁহাদের অস্থি, চর্ম্ম, মাংস, সমুদয়ই অবিকৃত ভাবে রহিয়াছে, তাঁহারা যে কত বর্ষ বয়স্ক তাহার কিছুই সীমা পরিসীমা নাই।" আরও অনেকে পণ্ডিতের কথা সমর্থন করিল। তবে পণ্ডিত ঐ স্থানে যাইবার দুর্গমতা বর্ণনা করিল। বলিল—যাইবার পথ ভাল নাই। গাছ ধরিয়া ধরিয়া যাইতে হয়, উহার আরও উর্দ্ধে ব্যাসাশ্রম আছে, সেখানে অনেক বৃক্ষ-লতা ও জলাশয়াদি আছে। যাহা হউক, সেখানে কেহ কখন যাইতে পারে নাই। পণ্ডিতের কথা শুনিয়া আমাদের ভয়ানক কৌতূহল হইল। আমরা পণ্ডিত ও অপর সকলের নিকট যথা-সাধ্য এই বিষয়ের অনুসন্ধান লইতে লাগিলাম।

এইবার ছাংরু যাইবার সময় আসিল। চর্ম্ম, কমণ্ডলু, কম্বল, গুড়পাপড়ি প্রভৃতি কোনরূপে লইয়া আমরা চলিতে উদ্যুক্ত হইলাম। পণ্ডিত লছমীদত, জয়মল, পোষ্ট আফিসের মুনসী প্রভৃতি আমাদিগকে অনেক দূর অগ্রসর করিয়া দিতে আসিল। পণ্ডিতজীর গৃহে আমাদের লাঠি ও একটু একটু যা কাগজ পত্র ছিল, সব রাখিয়া গেলাম। কাগজ রাখিয়া গেলাম—কেবল তিব্বতীয়দের ভয়ে। উহাতে পরমার্থবিষয়ক সঙ্গীত ব্যতীত আর বিশেষ কিছু ছিল না। মানুষের একত্রে বাসেই মায়া হয়। পণ্ডিতের সহিত আমরা ১৯।২০ দিন ছিলাম, পণ্ডিতের আমাদের উপর কিছু মায়া হইয়াছিল—বিদায় দিবার সময় কাঁদিয়া ফেলিল। আমরাও তাহাকে কষ্টে বিদায় দিলাম।

চলিতে লাগিলাম—এতদিন যে পথে আসিয়াছিলাম, তাহা যতই দুর্গম হউক না কেন, এক্ষণে যে পথে চলিতে লাগিলাম, তাহা দুর্গমতর প্রতীত হইতে লাগিল। প্রত্যেকের পৃষ্ঠে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ভার আছে। তাহা লইয়া এরূপ পথে চলিতে অতিশয় কষ্ট বোধ হইতে লাগিল। সময়ে সময়ে মনে হইতে লাগিল, বুঝি পড়িয়া যাইব। যাহা হউক, ক্রমশঃ চলিতে লাগিলাম। এ নেপালের সীমানা, এখানকার পথ-ঘাট বড় ভাল নহে দেখিলাম। ক্রমশঃ কালী নদীর নিকটবর্ত্তী লাম—এই নদীর উপর দুইটী জীর্ণাবস্থাপন্ন পুল রহিয়াছে, অতি সাবধানে অপর পারে গেলাম।

(ক্রমশঃ)

অন্নচিন্তা।

(৩)

পূর্ব্ব প্রস্তাবে যে আমরা বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিয়াছি, তদ্দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছি যে, বাল্য বিবাহের দ্বারা লোক সংখ্যা বৃদ্ধির বিশেষ সহায়তা হইয়া থাকে। বাল্য বিবাহের দ্বারা যে কতক পরিমাণে সমাজে লোকবৃদ্ধি হইতেছে, তাহা অতি সহজেই বুঝিতে পারা যায়। বিবাহের বয়স কিঞ্চিৎ পিছাইয়া দিলে স্ব স্ব পরিবারবর্গকে অনেক পরিমাণে লোক বৃদ্ধির হাত হইতে রক্ষা করিতে পারা যায় এবং তাহা ব্যতীত, পুরুষগণের ব বা হের বয়স আরও পরে নির্দ্দিষ্ট হইলে পুরুষগণ সংসারজালে বিজড়িত হইবার পূর্ব্বে উপার্জ্জনক্ষম

হইয়া সংসারের বর্ত্তমান অবস্থাকে অনেক পরিমাণে উন্নত করিতে পারে এবং নিজে নিজেও উপস্থিত ব্যয়ের অল্পতা প্রযুক্ত, আবশ্যকীয় ব্যয় সংকুলান করিয়াও কিঞ্চিৎ অর্থ সঞ্চয় করিতে পারে। আজ কাল ত প্রায়ই ইহা দেখিতে পাওয়া যায় যে, পুরুষ বা বালকগণ উপার্জ্জনক্ষম হইবার পূর্ব্বে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয় এবং উহার ফলে অন্যের গলগ্রহ হইতে হয় কিম্বা দারিদ্র্যে নিষ্পীড়িত হইতে হয়। একবার দারিদ্র্য বা অভাব আসিয়া পড়িলে সঙ্গে সঙ্গে যদি সমধিক আয়ের উপায় না হয়, তাহা হইলে, আর সেই উন্নতিকাম যুবকের মস্তক উত্তোলন করিবার শক্তি থাকে না এবং সেই কোমল ও স্থিতিস্থাপক হৃদয়মনোবিশিষ্ট দম্পতী চিরদিনের মত উদ্যম ও উৎসাহ হীন হইয়া পড়েন। এই সকল কারণে আমাদের মনে হয় যে, বিবাহই আমাদিগের সর্ব্বনাশ করিতেছে এবং যতদিন এই বিবাহের প্রতি লালসা লোকের হৃদয় হইতে না বিদূরিত হইবে, ততদিন সুশৃঙ্খলতা, সচ্ছলতা এবং শান্তিভাব সংসারে স্থান পাইতে পারেই না।

পৃথিবীতে জীবন ধারণ করিয়া চিরদিন দৈন্যদশাগ্রস্ত ও দুঃখে জর্জ্জরিত হওয়া কখনই ঈশ্বরের অভিপ্রেত নহে। যাহারা বলেন যে, ঈশ্বরের সৃষ্টি রক্ষা করিবার জন্য বিবাহ করা নিতান্তই প্রয়োজন, তাঁহাদিগকে আমাদিগের একমাত্র বক্তব্য এই যে, বিশ্বকর্ত্তার সৃষ্টি রক্ষার জন্য তোমার আমার ভাবিবার কোন আবশ্যক নাই, কোন অধিকার নাই। জীর্ণকলেবর, অনাহারী, স্বীয় অন্ন উপার্জ্জনে অক্ষম হইয়া ভগবানের দোহাই দিয়া ঘোর অদূরদর্শিরূপে বিবাহিত হইয়া সংসারের কলেবর অন্যায় রূপে বৃদ্ধি করা ঘোর পাপ বলিয়া মনে হয়। সংসারের অন্যান্য পাঁচটা কাজের ন্যায় ইহাকেও যদি একটা বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে বিবাহ কার্য্যটাকে একটা প্রধান কার্য্য বলিয়া মনে হয় না। আমাদের সমাজে আধুনিক অবস্থায় দেখা যায়, বিবাহ করা জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, সংসারের সুখ দুঃখ ভাবিবার বিষয় নহে। এই অপরিণামদর্শিতার ফলে দেশ মধ্যে অন্নের জন্য এত হাহাকার, বালক বালিকা এই জন্য এত মলিন, যুবক যুবতী উদ্যমহীন ও ক্ষীণকায়, এবং প্রৌঢ়গণ প্রকৃত প্রৌঢ়ত্ব প্রাপ্তির পূর্ব্বেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইতেছেন, ইহা কি অল্প পরিতাপের বিষয় ?

ভারতবাসী যে উদ্যমহীন, উৎসাহহীন, তার কারণ কি ? অল্প বয়সে বিবাহিত হইয়া, তাহারই অচিরকাল মধ্যে সন্তানসন্ততিগ্রস্ত হইয়া অর্থের জন্যে দিগ্বিদিগ্‌জ্ঞানশূন্য হইয়া ছুটাছুটি করিতে বাধ্য হয়। অর্থের জন্য অপরিমিত কায়িক ও মানসিক পরিশ্রম না করিয়া পারে না, তথাপিও যথেষ্ট উপার্জ্জনাভাবে আবশ্যক মত আহার পরিধান ঘটে না!

ইহার পরে দেখা যায়, আজ কালের বিদ্যালয়ে যে প্রণালীতে লেখা পড়া শিখান হইয়া থাকে, তাহাতে বোধ হয়, শত করা নব্বুই জনের ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ একবারে রোধ হইয়া যায়। বিদ্যালয় সমূহে কার্য্যকরী কোন শিক্ষা প্রদানের আজও পর্য্যন্ত কোন ব্যবস্থা হয় নাই। এতদ্ব্যতীত বিদ্যালয় সমূহের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ স্বীয় শিক্ষাভিমানের বশবর্ত্তী হইয়াই বোধ হয়, বালকগণকে সুকোমলমতি মনে করিতে পারে না, অথবা মনে করিয়া থাকেন যে, বালকেরাও তাঁহাদিগের ন্যায়ই প্রতিভাবিশিষ্ট এবং সেই কারণে সেই অপরিণতবয়স্ক বালকদিগকে কঠিন ও অসংখ্য পুস্তক পড়াইবার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। বালকগণ বাল্যকাল হইতেই অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়া জীর্ণ শীর্ণ হইয়া পড়ে এবং অল্প-বয়সেই কঠিন রোগগ্রস্ত হইয়া ইহ জীবনের মত অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষীয়গণের জানা উচিত যে, সকল যুবকই উচ্চ শিক্ষা পাইতে পারে না, আর্থিক অবস্থা সকলের সচ্ছল নহে। সুতরাং অবিমৃষ্যভাবে শিক্ষা দিতে থাকিলে, বালকদিগের সময় নষ্ট হয় মাত্র। এক্ষণে কার্য্যকরী শিক্ষার বিশেষ আবশ্যক হইয়াছে। সুতরাং বাজে পুস্তকাদি পাঠ করাইয়া সময় নষ্ট না করাইয়া, যাহাতে বালকগণ ভবিষ্যতে সংসার ক্ষেত্রে সুখে স্বচ্ছন্দে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারে, সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। উচ্চ ইংরাজি শিক্ষার কুহকে পড়িয়া শিল্পী ও শ্রমজীবিকুল উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে। আর যাহারা মসীজীবী, তাহারাও উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া মস্তকের (বিকার ভিন্ন ইহাকে আর কি বলা যায় ?) বিকারবশতঃ ক্ষুদ্র ব্যবসায় বা চাকরীতে প্রবৃত্ত হইতে পারে না, অথচ অভিলষিত কার্য্যও জুটে না, সুতরাং এই বিষম সমস্যায় পড়িয়া তাহারাও সংসারে দুঃখ আনিবার সহায়তা করিয়া থাকে।

শ্রীপ্রবোধ চন্দ্র দে।

[ক্রমশঃ।]

আচার্য্য শঙ্কর ও মায়াবাদ।

(পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ লিখিত।)

৬ষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিতের পর।

বিষয়ে দোষ দর্শন ও প্রকৃত বৈরাগ্য এই দুইটী গুণই বৌদ্ধধর্ম্মের মূলভিত্তি। স্বভাবের বৈচিত্র্যে ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম্মের উপর অবিশ্রান্ত ভাবে বহুশত বর্ষের কুঠারাঘাতে যে সময়ে বৌদ্ধ-প্রাবল্য ভারতে নষ্টপ্রায় হইয়া আসিয়াছিল, সেই সময়কে আমরা বৌদ্ধবিপ্লব বলিয়া নির্দ্দেশ করিব। বৌদ্ধধর্ম্ম, ধর্ম্মজগতে যুগান্তর আনিয়াছিল, ইহা সত্য; বৌদ্ধ ধর্ম্মের শান্তিময় সুশীতল ছায়ায় বিশ্রাম লাভ করিয়া বৈরাগ্য ও জ্ঞানের অমৃত সরোবরে অবগাহন করিতে করিতে, সহস্র সহস্র লক্ষ লক্ষ নীচজাতীয় মনুষ্য ও প্রাচীন ভারতের সমাজের শীর্ষস্থানে বিরাজমান ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের অপ্রতিদ্বন্দ্বিনী শক্তির প্রতি অবজ্ঞার নয়নে চাহিতে সমর্থ হইয়াছিল, ইহা যে সম্পূর্ণ সত্য, তাহা ঐতিহাসিকের অবিদিত নহে। পীড়িতের ক্লেশ, দুঃখিতের অশ্রুজল, আত্মাভিমানের বৃশ্চিক দংশন, ধনের উন্মত্ততা, ও সৌন্দর্য্যের দুরভিমান প্রভৃতি দুরন্ত রিপু-গণকে দূর করিবার যাহা কিছু সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপকরণ, সেই সকলের একত্রে সমাবেশ বৌদ্ধধর্ম্মে যত অধিক পরিমাণে উপলব্ধ হয়, তাহা বৌদ্ধধর্ম্মের পরে আবির্ভূত অন্য কোন ধর্ম্মে পরিদৃষ্ট হয় না, একথাও অনেক পণ্ডিত এক-বাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন।

সকলিই ছিল সত্য, কিন্তু এই ভারতে যাহা না থাকিলে কোন ধর্ম্মই সার্ব্বভৌম হইয়া চিরস্থায়ী হইতে পারে না, বৌদ্ধধর্ম্মে প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা ছিল না। ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ প্রাপ্তির জন্য বৌদ্ধধর্ম্ম জগতে প্রচারিত হয় নাই। বৌদ্ধ ধর্ম্মের একমাত্র লক্ষ্য নির্ব্বাণ, সংসারের বিষময় বৃশ্চিক দংশনের অবিশ্রান্ত জ্বালা অনুভব করিতে করিতে নৈরাশ্যের অন্ধকারে যাহাদের আত্মপ্রকাশ মলিন হইয়া পড়ে, অনেক দিনের গাঢ় অনুশীলনে জগতের আদি অন্ত ও মধ্য যাহাদের নিকট দুঃখময় ব্যতিরেকে আর কিছু বোধ হয় না, রোগ, শোক, সন্তাপ,

নৈরাশ্য, সংশয় ও ব্যাকুলতা যাহাদের হৃদয়াকাশে শ্রাবণের জলদমালার ন্যায় অবিশ্রান্ত ক্লেশধারাবর্ষণ ও হৃদয়-বিদারণ ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করিয়া থাকে, বৌদ্ধধর্ম্মের শান্তিময় অঙ্ক তাহাদের পক্ষে সুখসেব্য হইতে পারে ইহা স্থির, কিন্তু নির্ব্বাণ সকল জীবেরই যে একমাত্র লক্ষ্য হইবে, তাহা সম্ভবপর নহে। এই সংসারে থাকিয়া সংসারের সুখ সম্পদ্ ভোগ করিয়া, মৃত্যুর পরে আবার সুখরাজ্যের প্রজা হইতে উৎকট বাসনা ভারতীয় হৃদয়ের একটি প্রধানতম বৃত্তি। এই বৃত্তির চরিতার্থতাকে ঘৃণা করিয়া নির্ব্বাণের সর্ব্বশূন্যময় অনন্ত সাগরে মগ্ন হইবার জন্য পূর্ণ বৈরাগ্য সংসারে অতি অল্প লোকেরই হইয়া থাকে। বুদ্ধদেবের চরিত্র ও বক্তৃতার গুণে এবং তাঁহার উপযুক্ত শিষ্যগণের কৌশলময় বাগ্মিতা ও লোকপ্রিয় সচ্চরিত্রতার প্রসাদে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রথমে সার্ব্বজনীনভাব ধারণ করিবার উপক্রম করিয়াছিল তাহা নিঃসন্দেহ; কৃষকের সঙ্কীর্ণ গৃহাগ্র হইতে ভারতসম্রাটের বিশাল প্রাসাদের গগনস্পর্শিধ্বজদণ্ডের উপর লম্বমান পতাকাবলি, বৌদ্ধধর্ম্মের বিজয়প্রকাশক অক্ষরাবলিতে অলঙ্কৃত হইয়া অবিরত বায়ুপ্রবাহে ক্রীড়া করিত, ইহা কে অবিশ্বাস করিবে? কিন্তু কালে বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতে ক্ষীণ হইতে লাগিল। বুদ্ধদেবের ললিত হাস্যময় মধুর বর্ণাবলীতে যে নির্ব্বাণ শারদ-চন্দ্রিকার ন্যায় ফুটিয়া উঠিত, আনন্দ, মৌদ্গলায়ন, শারীপুত্র প্রভৃতি বৌদ্ধধর্ম্ম-বীরগণের স্থবির সম্প্রদায়ের মধ্যে যে নির্ব্বাণের আলোচনা শান্ত হৃদয়ে চিরশান্তির অমৃত প্রস্রবণ ফুটাইয়া দিত, বুদ্ধদেব, আনন্দ, শারীপুত্র, প্রভৃতি সমুজ্জ্বল প্রদীপগুলির নির্ব্বাণের সঙ্গে সঙ্গে সেই নির্ব্বাণ বড় একটা লোকের স্পৃহনীয় রহিল না।

অস্বাভাবিক অথচ নবোদ্দীপ্ত নির্ব্বাণতৃষ্ণার প্রাবল্যনিবন্ধন যাহা এত দিন সমাজহৃদয়ের অন্তস্তলে অতি মৃদুভাবে বহিতেছিল, সেই ধর্ম্মার্থকামের স্বভাবসিদ্ধ কামনা সমাজে আবার জাগিয়া উঠিল। দুর্ব্বল নির্ব্বাণবাসনা ধীরে ধীরে হৃদয়ের এক কোণে মিশাইয়া যাইতে লাগিল; পার্থিব উন্নতির চিরসেবকবৃন্দের প্রতিদিন বিকাশশীল নূতন নূতন আকাঙ্ক্ষা মিটিতে পারে, এমন উপকরণে বৌদ্ধধর্ম্ম গঠিত হয় নাই। মৃত্যুর পর চন্দ্রলোকে গিয়া অমৃতসাগরে ডুবিয়া থাকিতে যাহাদের একান্ত বাসনা, তাহাদের পক্ষে বৌদ্ধধর্ম্ম বড় একটা কার্য্যের উপযোগী রহিল না। বৌদ্ধধর্ম্মের এই সকল অভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়া পরবর্ত্তী বৌদ্ধাচার্য্যগণ যদ্যপি বৌদ্ধধর্ম্মের মধ্যে অনেক বিচিত্র বিচিত্র কর্ম্ম, নানা প্রকার মন্ত্র, কিম্ভূতকিমাকার দেবমূর্ত্তি প্রভৃতি অনেক নূতন উপকরণ প্রবেশ করাইয়াছিলেন, কিন্তু সেই নূতন উপকরণ সকল উপযুক্তভাবে এবং উপযুক্ত সময়ে প্রবেশ লাভ করিতে সমর্থ না হওয়ায় প্রকৃত পক্ষে ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের স্থিতির পক্ষে কিছু অনুকূলতা করিতে পারে নাই। ঐ সকল উপকরণ বৌদ্ধধর্ম্মে প্রবেশের পূর্ব্বেই শুভক্ষণে হিন্দুধর্ম্ম পুনর্ব্বার নিজ সর্ব্বসংগ্রাহক বিরাট ভাবের বিকাশে সর্ব্বসাধারণের পক্ষে অতিপ্রিয় হইতে আরম্ভ হইয়াছিল।

বৌদ্ধবিপ্লবের দিনে ভারতে যে ভীষণ সমাজবিপ্লব হইয়াছিল, তাহার প্রকৃত স্বরূপ জানিবার জন্য শঙ্করদিগ্বিজয় নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ দুই খানি বিশেষ উপযোগী। মগধের সম্রাটকুলের পতনের পর সাম্রাজ্যলক্ষ্মীও এ ভারত পরিত্যাগ করিয়াছিল। নিত্য খণ্ড খণ্ড নূতন রাজ্য গঠিত হইতে লাগিল, নূতন বিশ্বাসে বলীয়ান্ হইয়া কত শত নূতন ধর্ম্ম সম্প্রদায়, ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মের বিষ সমাজশরীরের শিরায় শিরায় ঢালিয়া দিতে লাগিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। ধর্ম্মান্ধতা স্বার্থপরতায় পরিচালিত হইয়া নূতন নূতন রাজা কিম্বা নূতন নূতন ধর্ম্মবীরের উত্তেজনায় শতশত লোক

একত্রিত হইয়া কতবার নররক্তের স্রোতে ভারতের ক্ষেত্র সকল প্লাবিত করিয়াছে, তাহার পরিচয় শঙ্করদিগ্বিজয়ে স্পষ্ট পাওয়া যায়।

শঙ্করদিগ্বিজয় পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, প্রকৃত শিক্ষার ঐকান্তিক অভাবে বৌদ্ধ-বিপ্লবের দিনে এক একটী নূতন ধর্ম্মসম্প্রদায় গঠন করিয়া দেবতার স্থান অধিকারপূর্ব্বক ইষ্ট সিদ্ধি করা বুদ্ধিমান ও বলশালী ব্যক্তি মাত্রেরই সহজ ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছিল। কর্ম্মমার্গের উপসনার প্রকৃত লক্ষ্য হইতে সমাজ বিচ্যুত হইয়া পড়িল, সাম্রাজ্য শক্তির তিরোভাবের অবশ্যম্ভাবী ফলে ছোট ছোট যথেচ্ছাচারী ও অচিরস্থায়ী নরপতির উদয় ও পতনের সঙ্গে জগতে নূতন নূতন বিশ্বাস, নূতন নূতন ধর্ম্ম এবং নূতন নূতন সামাজিক সঙ্ঘর্ষে আবির্ভূত ও তিরোভূত হইতে লাগিল, অঘোর-পন্থী কাপালিক, শাক্ত, পাশুপত নামে বিখ্যাত উদ্ধত ধর্ম্মসম্প্রদায়ের পরস্পর জিগীষা ও অবিশ্রান্ত সঙ্ঘর্ষে সর্ব্বদা বিভীষিকাময় অশান্তি গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে রাজ্য করিতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে পুনর্জ্জীবন লাভের জন্য বদ্ধপরিকর বৌদ্ধ সম্প্রদায় এক একজন নূতন নেতার নেতৃত্বে নূতন নূতন কাল্পনিক ভূত প্রেত পিশাচ সৃষ্টি করিয়া অজ্ঞ নীচ জাতির মধ্যে নিজ প্রাধান্য স্থাপন করিতে লাগিল।

একমাত্র ধর্ম্মান্ধতায় দিগ্‌বিদিগ্‌জ্ঞানশূন্য হইয়া ভারতীয় সমাজ, রাজনৈতিক একতার প্রতি নিতান্ত শৈথিল্য প্রকাশ করিতে লাগিল। ভারতের ন্যায় বিশাল ভূখণ্ডে স্থায়ী সাম্রাজ্য-শক্তির পরিচালনা না থাকিলে যে সকল বিপদ অবিশ্রান্তভাবে সমাজে বিচরণ করিতে থাকে, তাহাদের ভয়ঙ্কর উদয়ে সমাজের ব্যক্তি মাত্রেই উৎপীড়িত হইতে লাগিল। দূরদেশের সহিত বাণিজ্য বন্ধ হইয়া গেল। দস্যুতস্করের ভয়ে যাতায়াত এক প্রকার অসম্ভব হইয়া উঠিল। দেশান্তরের সহিত সকল প্রকার সংস্রব দূর হইবার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্কীর্ণতা সমাজহৃদয়ে একাধিপত্য লাভ করিতে লাগিল। দুইখানি শঙ্করদিগ্বিজয়েই এই প্রকার বৌদ্ধবিপ্লবের বিষময় ফল বিস্পষ্টভাবে চিত্রিত হইয়াছে, আচার্য্য শঙ্করের লিপিতেও মধ্যে মধ্যে দেশের এই দুর্দ্দশার চিত্র ভাল করিয়া বুঝিতে পারা যায়।

বৌদ্ধ বিপ্লবের দিনে সম্প্রদায় প্রবর্ত্তক পণ্ডিতগণের পরস্পর মতের অনৈক্য ও ভিত্তিহীন কল্পনার প্রতি লক্ষ্য করিয়া আচার্য্য বলিয়াছেন যে, "তর্কজ্ঞানানামন্যোন্যবিরোধাৎ প্রসিদ্ধা বিপ্রতিপত্তিঃ, যদ্ধি কেনচিৎ তার্কিকেন ইদমেব সম্যগ্ জ্ঞানমিতি প্রতিপাদিতং তদপরেণ ব্যুত্থাপ্যতে তেনাপি প্রতিষ্ঠাপিতং ব্যুত্থাপ্যতে ইতি প্রসিদ্ধং লোকে। কথমেকরূপানবস্থিতবিষয়ং তর্কপ্রভবং সমগ্‌জ্ঞানং ভবেৎ।" সূত্রভাষ্য ২।১।১২।

(অর্থ)

কেবল তর্কের সাহায্যে যে জ্ঞান হয়, তাহাতে পরস্পর বিরোধ থাকা প্রযুক্ত মতের অনৈক্য (এক্ষণে) প্রসিদ্ধই আছে। কোন এক তার্কিক নিজ তর্কের বলে ইহাই সম্যক্ জ্ঞান বলিয়া যাহা ব্যবস্থাপিত করিতেছেন আর একজন তার্কিক তাহার খণ্ডন করিতেছেন, তাঁহার স্থাপিত মতও অপর একজন তার্কিক খণ্ডন করিতেছেন, ইহা বর্ত্তমান লোকে বিশেষরূপে প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। সুতরাং কেবল তর্কের বলে অব্যবস্থিত ও বিরুদ্ধ নানা বিষয় লইয়া সর্ব্ববাদিসিদ্ধ এক অখণ্ডনীয় সম্যক্ জ্ঞান কি প্রকারে উদিত হইতে পারে ?

[ক্রমশঃ]

উদ্বোধন

বর্ষসূচী

৭৫তম বর্ষ

(মাঘ, ১৩৭৯ হইতে পৌষ, ১৩৮০)

'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত'

সম্পাদক

স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ

যুগ্ম-সম্পাদক

স্বামী জীবানন্দ

উদ্বোধন কার্যালয়

১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা ৭০০০০৩

বার্ষিক মূল্য ৮৲ প্রতি সংখ্যা ৭৫প.

বর্ষসূচী—উদ্বোধন

(মাঘ, ১৩৭৯ হইতে পৌষ, ১৩৮০)

লেখক-লেখিকাগণ ও তাঁহাদের রচনা

চিত্রসূচী ঃ

পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষাপর্ষৎ-কর্তৃক ১৯৭৪-৭৫-এর
৯ম ও ১০ম শ্রেণীর সহায়ক-পাঠ্যরূপে নির্বাচিত

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

স্বামী বিবেকানন্দ

স্বামী বিবেকানন্দের চলতি বাংলায় লিখিত 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' উদ্বোধন পত্রিকায় (২য় বর্ষ, ১৯০০ খৃঃ) প্রথম প্রকাশিত হইতে থাকে। পরে উদ্বোধন কার্যালয় হইতে উহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

গ্রন্থটি সমকালীন বাংলা সাহিত্যের পক্ষে চমকপ্রদ রচনা। পাশ্চাত্য ভ্রমণকালে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আদর্শের তুলনামূলক যে মূল্যায়ন স্বামীজীর মনে আসে, 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' সেই তুলনামূলক আলোচনারই মনোজ্জ্বল রসসমৃদ্ধ প্রকাশ।

প্রাপ্তিস্থান ঃ

উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা—৭০০-০০৩

পথ চলাতেই আনন্দ
গোগো বুট ০৫
৩৮·৯৫
উইকএণ্ড ৪৯
৩৮·৯৫
রাখী ৪৭
১৯·৯৫
১০
১২·৯৫
জুতোর চটকে আর বৈশিষ্ট্যে
বাড়িয়ে তোলে এই
পথ চলার আনন্দ।
সুঠাম সৌন্দর্যের সঙ্গে
মিশেছে এক মনোমুগ্ধকর
স্টাইল। পায়ে পরে সত্যিকারের
আরাম। বাটার দক্ষ
কারিগরদের হাত থেকে
ঠিক যেমনটা আশা
করা যায়, তেমন।
Bata

স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী

সন্ন্যাসীর গীতি—১৪শ সংস্করণ। স্বামীজী-রচিত 'Song of the Sannyasin'-নামক ইংরেজী কবিতা ও উহার পদ্যে বঙ্গানুবাদ। মূল্য ২০ পয়সা।

ঈশদূত যীশুখৃষ্ট ৫ম সংস্করণ, ভগবান ঈশার জীবনালোচনা—মূল্য ০'৪০।

সরল রাজযোগ—৫ম সংস্করণ। স্বামীজী আমেরিকায় তাঁহার শিষ্যা সারা সি. বুলের বাড়িতে কয়েকজন অন্তরঙ্গকে 'যোগ' সম্বন্ধে যে বিশেষ উপদেশ দান করেন, বর্তমান পুস্তক তাহারই ভাষান্তর। মূল্য ০'৫০।

পত্রাবলী—১ম ও ২য় ভাগ। আভনব পরিবর্ধিত সংস্করণ। প্রায় ১০৫০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। স্বামীজীর বহু অপ্রকাশিত পত্র ইহাতে সংযোজিত হইয়াছে। তারিখ অনুযায়ী পত্র-গুলি সাজানো হইয়াছে। পরিচয়- এবং নির্ঘণ্ট-সংযুক্ত। মনোরম বাঁধাই। স্বামীজীর সুন্দর ছবি সংবলিত। প্রতি ভাগ মূল্য ৬'৫০;

ভারতে বিবেকানন্দ—১৪শ সংস্করণ। আমেরিকা হইতে প্রত্যাবর্তনের পর স্বামীজীর ভারতীয় বক্তৃতাবলীর উৎকৃষ্ট অনুবাদ। ৫১৯ পৃষ্ঠা; মূল্য ৫'০০।

দেববাণী—৯ম সংস্করণ। আমেরিকার 'সহস্র-দ্বীপোদ্যান'-নামক স্থানে কয়েকজন অন্তরঙ্গ শিষ্যকে স্বামীজী যে-সকল অমূল্য উপদেশ প্রদান করেন, ঐগুলির একত্র সমাবেশ। ডবল ক্রা ১৬ পেজি, ২১৪ পৃষ্ঠা; মূল্য—২'৫০।

শিক্ষা প্রসঙ্গ—৪র্থ সংস্করণ। শিক্ষা-সম্বন্ধে স্বামীজীর বাণীসকল সংকলিত ও ধারাবাহিক-ভাবে সন্নিবেশিত। ১৮৮ পৃষ্ঠা; মূল্য ১'৭৫।

কথোপকথন—৭ম সংস্করণ। স্বামীজীর ছবিযুক্ত। ডবল ক্রাউন, ১৬ পেজি, ১৪২ পৃষ্ঠা। মূল্য ১'২৫।

মদীয় আচার্যদেব—স্বামী বিবেকানন্দ-প্রণীত; ১১শ সংস্করণ, ৬৪ পৃষ্ঠা; স্বীয় গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবন ও শিক্ষা সম্বন্ধে আমেরিকাবাসীদের নিকট স্বামীজীর বিবৃতি। মূল্য ০'৭৫;

জ্ঞানযোগ-প্রসঙ্গে—বিভিন্ন বক্তৃতার সারসংক্ষেপ—ইংরেজীতে প্রকাশিত Discourses on Jnana Yoga পুস্তকের অনুবাদ। 'স্বামীজীর বাণী ও রচনা' হইতে পৃথক্ পুস্তকাকারে প্রকাশিত। আত্মতত্ত্ব ও বেদান্ত-বিষয়ক বহু কঠিন বিষয় সরলভাবে আলোচিত। 'জ্ঞানযোগ' গ্রন্থ পড়িবার পক্ষে সহায়ক। মূল্য ই৫ টাকা।

স্বামি-শিষ্য-সংবাদ—(পূর্বকাণ্ড — ১৩শ সংস্করণ; উত্তরকাণ্ড—১১শ সংস্করণ)। শ্রীশরৎ-চন্দ্র চক্রবর্তী প্রণীত। স্বামী বিবেকানন্দের মতা ত অল্প কথায় জানিবার উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। স্বামী-জীর জীবিতকালে তাঁহার সহিত প্রশ্নোত্তরচ্ছলে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য-দেশীয় আচার-নীতি, দর্শন-বিজ্ঞানাদি এবং ধর্ম ও সমাজগত সমস্যামূলক নানা বিষয়ের বিশদ আলোচনা। সরস ও হৃদয়গ্রাহী এই সব বর্ণনা সত্যই আনন্দদায়ক। বর্তমান যুগের বহু সমস্যার আদর্শানুগ সমাধানও ইহাতে পাওয়া যাইবে। জীবনতত্ত্ব বিষয়ে এই পুস্তকদ্বয় অমূল্য রত্নের সন্ধান দিবে। ২২০ ও ২১০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য প্রতি কাণ্ড ২'২৫।

মহাপুরুষ-প্রসঙ্গ—১৬শ সংস্করণ। ১৫৪ পৃষ্ঠা। ইহাতে রামায়ণ, মহাভারত, জড়-ভরতের উপাখ্যান, প্রহ্লাদচরিত্র, জগতের মহত্তম আচার্যগণ, ঈশদূত যীশুখ্রীষ্ট, ভগবান বুদ্ধ প্রভৃতি বিষয় আছে। কোমলমতি বালক-দিগের চরিত্রগঠনে ও ভারতীয় সংস্কৃতিতে তাহাদিগকে শ্রদ্ধাবান্ করিতে ইহা বিশেষ সহায়তা করিবে, মূল্য ৩'০০;

উদ্বোধনের প্রকাশিত পুস্তকাবলী উদ্বোধন-গ্রাহকগণকে ১০% কমিশনে দেওয়া হইবে]

প্রাপ্তিস্থান : উদ্বোধন কার্যালয়, বাগবাজার, কলিকাতা ৭০০-০০৩

শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা এবং স্বামী বিবেকানন্দ-সম্বন্ধীয় পুস্তকাবলী

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী ও শিক্ষা-সম্বন্ধে অপূর্ব পুস্তক। স্বামী সারদানন্দ-প্রণীত। দুই ভাগে রেক্সিন-বাঁধাই। মূল্য—১ম ভাগ ১০৲, ২য় ভাগ ১০৲

সাধারণ বাঁধাই পাঁচ ভাগে:

মূল্য—১ম ভাগ	২'৫০
২য় "	৪'৭৫
৩য় "	৩'৫০
৪র্থ "	৫'০০
৫ম "	[illegible]

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি—৭ম সংস্করণ। অক্ষয়কুমার সেন-প্রণীত। সুললিত কবিতায় শ্রীশ্রীঠাকুরের বিস্তারিত জীবনী ও অলৌকিক শিক্ষা-সম্বন্ধে এরূপ গ্রন্থ আর নাই। ৬৪০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য—বোর্ড বাঁধাই ১৫৲।

পরমহংসদেব—ষষ্ঠ সংস্করণ। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু-প্রণীত। সুললিত ভাষায় অল্প কথায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দিব্য জীবনবেদ। ১৪০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য—১'৭৫।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ—১২শ সংস্করণ। শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য-প্রণীত। বালক বালিকাদিগের জন্য সরল ভাষায় লিখিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনী। মূল্য—০'৭০

শ্রীরামকৃষ্ণ চরিত—২য় সংস্করণ। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চৌধুরী-প্রণীত। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাবলীর অপূর্ব সমাবেশ। মূল্য—৩'০০।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ—১৮শ সংস্করণ। সুরেশচন্দ্র দত্ত-সংগৃহীত। ২৬৫ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য—৪৲।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-উপদেশ—স্বামী ব্রহ্মানন্দ সঙ্কলিত। ২২শ সংস্করণ। মূল্য—১৲, কাপড়ে বাঁধাই ১'২৫।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-মহিমা—শ্রীরামকৃষ্ণ-চরিত-মহাকাব্য শ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথির লেখক অক্ষয়কুমার সেনের লেখনী-প্রসূত গ্রন্থ। মূল্য—[illegible]।

রামকৃষ্ণের কথা ও গল্প—১৪শ সংস্করণ। স্বামী প্রেমঘনানন্দ-প্রণীত। এই সুচিত্রিত সুদৃশ্য সুলভ পুস্তকখানি ছেলেমেয়েদের ধর্মীয় ও নৈতিক জীবনগঠনের সহায়তা করিবে। মূল্য—২'০০।

শ্রীমা সারদাদেবী—৪র্থ সংস্করণ। স্বামী গম্ভীরানন্দ-প্রণীত। শ্রীশ্রীমায়ের বিস্তারিত জীবনীগ্রন্থ। পৃষ্ঠা ৭১০; মূল্য ৮৲।

জননী সারদাদেবী—স্বামী নির্বেদানন্দ-প্রণীত। পৃষ্ঠা ১১০; মূল্য—২'০০।

শ্রীশ্রীমা সারদা—স্বামী নিরাময়ানন্দ প্রণীত। পৃষ্ঠা ৯৮; মূল্য ১'৫০।

শ্রীশ্রীমায়ের কথা—শ্রীশ্রীমায়ের সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ সন্তানদের 'ডায়েরী' হইতে সংগৃহীত সারগর্ভ উপদেশ। সংসারতাপে সান্ত্বনাদায়ক ও অধ্যাত্মরাজ্যে পথপ্রদর্শক। দুই ভাগে সম্পূর্ণ। প্রতি ভাগ—৫'৫০।

মাতৃসান্নিধ্যে—২য় সংস্করণ; স্বামী ঈশানানন্দ-প্রণীত। পৃষ্ঠা ২৫৬; মূল্য ৪৲ টাকা।

যুগনায়ক বিবেকানন্দ—স্বামী গম্ভীরানন্দ-প্রণীত। স্বামীজীর অধুনাতন মূল্যবান প্রামাণিক জীবনীগ্রন্থ। তিন খণ্ডে প্রকাশিত; প্রতি খণ্ড ৮৲ করিয়া। একত্র লইলে ২৩৲।

স্বামী বিবেকানন্দ—৩য় সংস্করণ, শ্রীপ্রমথনাথ বসু-রচিত। দুই খণ্ডে প্রকাশিত স্বামীজীর জীবনী। ৯৬০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য—১ম খণ্ড ৪৲, ২য় খণ্ড ৪'২৫ দুই খণ্ড একত্র বাঁধান ৮'৫০।

স্বামী বিবেকানন্দ—১১শ সংস্করণ। শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য-প্রণীত। স্বামীজীর জীবনের প্রধান প্রধান সকল কথাই বলা হইয়াছে। মূল্য—০'৭০।

বিবেকানন্দ-চরিত—৯ম সংস্করণ। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার-প্রণীত। মূল্য—১০'০০

পাঞ্চজন্য—স্বামী চণ্ডিকানন্দ-রচিত পাঁচ শতের অধিক সঙ্গীতের সমাবেশ। মাতৃসঙ্গীত, শিবসঙ্গীত, গুরুসঙ্গীত, মহামানব-সঙ্গীত, রামকৃষ্ণ-লীলাগীতি, সারদা-লীলাগীতি ও দেশাত্মবোধক সঙ্গীত। মূল্য—ছয় টাকা

[উদ্বোধনের প্রকাশিত পুস্তকাবলী উদ্বোধন গ্রাহকগণকে ১০% কমিশনে দেওয়া হইবে]

প্রাপ্তিস্থান:—উদ্বোধন কার্যালয়, বাগবাজার, কলিকাতা ৭০০-০০৩

উদ্বোধন-প্রকাশিত অন্যান্য পুস্তকাবলী

[illegible]—৫ম সংস্করণ। শ্রীচন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য-প্রণীত। এই পুস্তক-পাঠে চরিত-কথার [illegible] পাঠক এবং ভক্তগণ ধর্ম ও ধর্মতত্ত্বের [illegible] পাইবেন। মূল্য ২'০০।

শঙ্কর চরিত্র—শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য-প্রণীত—৫ম সংস্করণ। আচার্য শঙ্করের অদ্ভুত জীবনী অতি [illegible] ভাষায় লিখিত। মূল্য ১'৫০।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বেদান্ত—স্বামী বিবেকানন্দ প্রণীত। ১৮৯৬ খৃঃ মার্চ মাসে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত বক্তৃতা এবং তৎপরবর্তী প্রশ্নোত্তর ও আলোচনা। বেদান্তের মূলতত্ত্ব অতি স্পষ্টভাবে ব্যক্ত। প্রশ্নোত্তর ও আলোচনায় ভারতীয় কৃষ্টি ও হিন্দুধর্মের মূল ভাব সাম্প্রদায়িকতার সহিত সরলভাবে উপস্থাপিত। পৃষ্ঠা ৫৫; মূল্য এক টাকা।

[illegible] ভগিনী নিবেদিতা [illegible] মূল্য ০'৬৫।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ [illegible] মিশনের [illegible] মহারাজের [illegible] মূল্য ৩'০০।

ধর্ম[illegible] সংস্করণ। স্বামী ব্রহ্মানন্দে [illegible] এবং পত্রাবলীর সংগ্রহ। [illegible] শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু-লিখিত [illegible]-কথা। মূল্য ২'৫০।

মহাপুরুষ শিবানন্দ—স্বামী অপূর্বানন্দ-প্রণীত। ৩য় সংস্করণ। [illegible] স্বামী শিবানন্দজীর বিস্তারিত জীবনী। মূল্য—৫'০০।

[illegible]—৩য় সংস্করণ। স্বামী অপূর্বানন্দ [illegible] মূল্য—[illegible]৫০।

[illegible] চরিত্র—স্বামী [illegible]নন্দ-প্রণীত, [illegible] সংস্করণ [illegible] সম্প্রদায়ে [illegible] জীবনবৃত্তান্ত [illegible] আচার্যের বাংলা [illegible] জীবন [illegible] মূর্তির ছবি এই গ্রন্থে আছে [illegible]।

স্বামী অখণ্ডানন্দ—স্বামী অন্নদানন্দ-প্রণীত। এই পুস্তকে শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্নিধানে, তিব্বতে ও হিমালয়ে, স্বামীজীর সঙ্গে, দুর্ভিক্ষে সেবাকার্য, সেবাব্রতের প্রাণপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতি অধ্যায়ে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্যের পথিকৃৎ স্বামী অখণ্ডানন্দের ধারাবাহিক জীবনী। ডিমাই সাইজ, ৩১০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৪৲।

সাধু নাগমহাশয়—শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী-প্রণীত। ১১শ সংস্করণ। যাঁহার সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন, "পৃথিবীর বহু স্থান ভ্রমণ করিলাম, নাগমহাশয়ের ন্যায় মহাপুরুষ কোথাও দেখিলাম না।"—পাঠক! তাঁহার পুণ্য জীবন-বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া ধন্য হউন। মূল্য ২'০০।

গোপালের মা—স্বামী সারদানন্দ-প্রণীত (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ হইতে সঙ্কলিত)। আজন্মনীব-সাধননিষ্ঠ, পরমভক্ত গোপালের মা-র আদর্শ জীবনের সংক্ষিপ্ত কাহিনী। মূল্য ৫০ পয়সা।

আচার্য বাদরায়ণের **বেদান্তদর্শন** (শাঙ্কর ভাষ্য) প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ ও বিস্তৃত ব্যাখ্যা সহ প্রায় ৩৫০০ পৃষ্ঠা, মূল্য ৫২৲ টাকা

স্বামী তুরীয়ানন্দ—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ-প্রণীত। বাল্যাবধি বেদান্তী এই মহারাজের জীবনের অদ্ভুত ঘটনাবলী-পাঠে চমৎকৃত হইবেন। ৩৪০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য—৩'৫০।

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিষ্যগণের সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত একত্র এই প্রথম প্রকাশিত হইল। মূল্য—১ম খণ্ড ৮৲, ২য় খণ্ড ৫'৫০।

ভগিনী নিবেদিতা—স্বামী তেজসানন্দ-প্রণীত। ইহাতে তাঁহার জীবনের মুখ্য ঘটনাবলীর সম্যক্ আলোচনা রহিয়াছে। ইহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে "ভগিনী নিবেদিতা-স্মৃতি বক্তৃতামালার" প্রথম বক্তৃতা। মূল্য—১'৫০

[উদ্বোধনের প্রকাশিত পুস্তকাবলী উদ্বোধন গ্রাহকগণকে ১০% কমিশনে দেওয়া হইবে]

প্রাপ্তিস্থান :—উদ্বোধন কার্যালয়, বাগবাজার, কলিকাতা ৭০০০০৩